CSSSC/KPL

RECORD NO. KPL 5	**CONDITION** brittle
KPL ACC. NO (S). 325, 326, 327, 328, 330, 331, 332, 333, 334.	**COLOUR** illustrations, Colour
TITLE Bangabani (বাঙ্গবাণী)	**SIZE** 24x17.5 cm.
PERIODICITY Monthly	**PLACE(S) OF PUBLICATION** Calcutta.
EDITOR(S) Bijoychandra Majumder	**VOLUMES IN RECORD** Vol 2–6 : 1330–34 B.S. [1923–28]

BLANK PAGE(S)

Tight Binding

BLOCKED INFORMATION.

BRITTLE PAGES.

KONNAGAR PUBLIC LIBRARY
Estd. 1853

"আবার তোরা মানুষ হ"

দ্বিতীয় বর্ষ
১৩২৯-'৩০

ভাদ্র

দ্বিতীয়ার্দ্ধ
১ম সংখ্যা

গান

(সুর—নীলবসনা যমুনা ধাইছে)

(আজি) দীন নয়ন-সজল করুণ, কেন রে পরাণ কাঁদে
লুটাইয়া অবসাদে ?
সোনার স্বপন ভাঙ্গিল নিয়তি নিঠুর চরণাঘাতে।
মরমের কোণে লুকাইল আশ,
কোরকে ঝরিল কুসুম সুবাস,
তপ্ত বেদনা বহিয়া বাতাস
মুরছি পড়ে বিষাদে !
অন্ধ তিমির উজলি কিরণে,
আনি জাগরণ সুপ্ত নয়নে,
উদিল অরুণ পূর্ব্ব গগনে;—
ডুবে গেল পরভাতে।
দেখরে জ্ঞান-সাগর-যাত্রী,
ঊষায় তোদের আসিল রাত্রি,
কে আর অকূলে লয়ে যাবে তরী,
কে আর যাইরে সাথে ?

৺রজনীকান্ত সেন

ইন্দ্রপূজা ও হরিশয়ন

ভাদ্র মাসের শুক্লাদ্বাদশীতে বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান ও বীরভূমের বহুস্থানে ইন্দ্রপূজা হইয়া থাকে। এইদিনে আবার হরির পার্শ্বপরিবর্ত্তন, বামন দ্বাদশী ও বামন পূজা। ১৩২৮ সালে ২৮শে ভাদ্র তারিখে পাঁজীতে লেখা ছিল,—বামন দ্বাদশী, শ্রীশ্রীহরির পার্শ্বপরিবর্ত্তন ও শক্রোত্থান, এবং ১৩২৯ সালে ১৭ই ভাদ্র তারিখে এইসব ব্যাপার হইয়াছিল।

এই তিথিতে (১) বিষ্ণুপুর রাজ পরিবারে এবং জামকুড়ি, ছাতনা, কুঁচিয়াকোল প্রভৃতি যে সকল স্থানে মল্লরাজদের জ্ঞাতিরা বাস করেন সেখানেও এই শক্রোত্থান অনুষ্ঠিত হয়। "শক্রোত্থান" কথাটার অর্থ ইন্দ্রের ধ্বজা উঠান। প্রাতঃকালে দেবমন্দিরে কুলদেবতা অনন্ত দেবতার সহিত সোণার ইন্দ্রের পূজা হয়। তৎপরে এই দুই দেবমূর্ত্তি মস্তকে রাখিয়া জলধারা দিয়া রাজার অভিষেক হয়। ইঁদকুরি নামে এক বিস্তৃত মাঠে একটা বড় শাল গাছকে সাদা কাপড় দিয়া আগাগোড়া ঢাকা হয়, মধ্যে মধ্যে গোলাকার করিয়া চারিদিকে বাখারি বাঁধা থাকে। ইহার উপর দিয়া কাপড় দেওয়া হয় সুতরাং ধ্বজাটি কয়েক থাকে বিভক্ত হয়; এই ধ্বজা প্রথমে মাটিতে শয়ান ভাবে থাকে। পারিষদবর্গ রাজার সহিত হাতী [illegible] আসেন—রাজা পাল্কীতে চড়িয়া আসেন। রাজা সপারিষদ যখন ধ্বজের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করেন, তখন সাওতালেরা বিচিত্রবেশে চারিদিকে ঘুরিয়া নানা বাজনা বাজাইয়া নাচগান করিতে থাকে। কয়েকবার প্রদক্ষিণ করিয়া রাজা ধ্বজাটিতে হাত দিবামাত্র সকলে ধরাধরি করিয়া এটিকে গর্ত্তের মধ্যে বসাইয়া দেয়। তাহার পরেও সাঁওতালদের নাচগান চলিতে থাকে, ইহাই শক্রোত্থান।

ইংলণ্ডে টিউডারদের রাজত্বকালে "মে-পোল" বলিয়া কৃষকদের মধ্যে এক রকম পর্ব্ব প্রচলিত ছিল। ইহা মে মাসে অনুষ্ঠিত হইত। ধ্বজাটিকে ইহারা পত্র-পুষ্পে সজ্জিত করিয়া তাহার চারিদিকে নাচগান করিত। এই মে-পোল পর্ব্বের সহিত শক্রোত্থানের বেশ সাদৃশ্য আছে। ১৬৩৫ খৃঃ আইনে এই উৎসব বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

রাজবংশ [illegible] এই যে অভিষেক ও শক্রোত্থান ইহাকে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উল্লিখিত ঐন্দ্র মহাভিষেক বলা যাইতে পারে। বিষ্ণুপুর রাজবংশের ইংরাজী ইতিহাস প্রণেতা শ্রীঅভয়পদ মল্লিক মহাশয় তাঁহার পুস্তকের ১৩ পৃঃ বলিয়াছেন, "আদিমল্লের পুত্র জয়মল্ল একটা পুরাতন হিন্দুপ্রথার অনুকরণে ইন্দ্রধ্বজ পূজা করিয়া অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।" আদি মল্ল ৬৯৪ খৃঃ রাজা হন—

(১) এই তিথিতে মল্লাব্দ আরম্ভ হয়।

(২) মেদিনীপুর জেলার কর্ণগড়ের ক্ষত্রিয় রাজবংশের উত্তরাধিকারীরূপে নাড়াজোলের রাজারা আবাসগড়ে শক্রোত্থান করেন।

সে বড় কম দিনের কথা নহে। হিন্দুর যে সকল শাস্ত্রে লেখা আছে যে, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ, সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি স্থানে তীর্থ যাত্রা ভিন্ন অন্য কোন কারণে যাওয়া উচিত নহে, সেই সকল শাস্ত্রগ্রন্থের বহুপূর্ব্বে লিখিত ঐতরেয় ব্রাহ্মণে লেখা আছে যে, অঙ্গরাজের ঐন্দ্র মহাভিষেক হইয়াছিল। কতকগুলি প্রমাণে (১) আমি স্থির করিয়াছি যে, যখন আলেক্‌জান্দার ভারত আক্রমণ করেন তখন তিনি প্রাসী ও গঙ্গরিদাই বলিয়া যে সকল রাজ্যের নাম শুনিয়াছিলেন সেগুলি বলি ও বলির পুত্র, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্মের রাজ্য। বলির পাঁচ পুত্রের জন্ম সম্বন্ধে কতকগুলি পুরাণে ও মহাভারতে, রচয়িতা বা অন্য কোন লোকে নানারূপ কুৎসা করিয়াছেন। অথচ একখানি পুরাণে এই বলি রাজা সম্বন্ধে মৎপরোনাস্তি প্রশংসা আছে। নন্দবংশ সম্বন্ধেও যথেষ্ট কুৎসা প্রচারিত হইয়াছিল। চাণক্যের অপমান যেন মধ্যদেশবাসী সংস্কৃতভাষী ব্রাহ্মণদেরই অপমান। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, নন্দবংশ ও বলির বংশ স্বদেশের ব্রাহ্মণের আদর করিতেন এবং মধ্যদেশস্থ ব্রাহ্মণদের অনাদর করিতেন বলিয়াই তাঁহাদের বংশ সম্বন্ধে কুৎসা প্রচারিত হইয়াছিল এবং মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ প্রভৃতি স্থানে তীর্থযাত্রা বিনা যাওয়া নিষিদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু যখন পূর্ব্বে রচিত ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দেখিতেছি যে, অঙ্গরাজের ঐন্দ্র মহাভিষেক হইয়াছিল তখন স্বীকার করিতে হইবে যে, যে রাজবংশের মধ্যে এই ঐন্দ্র মহাভিষেক প্রচলিত ছিল তাঁহারা মধ্যদেশের সংস্কৃতভাষী ব্রাহ্মণদের [illegible] না। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ প্রভৃতি স্থানের রাজবংশগুলি সদলে পরে হিন্দু সমাজের অন্তর্গত হইয়াছিল, এই অর্থে যদি শক্রোত্থানকে পুরাতন হিন্দু অনুষ্ঠান বলা হইয়া থাকে, তবে তাহাতে আপত্তি করিবার কোন কারণ দেখি না।

ইন্দ্রপূজার আর একটি অনুষ্ঠান আছে যাহা সাধারণ লোকের মধ্যে দেখা যায়। পূর্ব্বোক্ত তিন জেলার কোন কোন গ্রামে কাহারও বাটীতে ভাদ্রের শুক্লাদ্বাদশীতে ইন্দ্রের মাটির মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করা হইয়া থাকে। ইন্দ্রদেব ঐরাবতের উপরে আরোহণ করিয়া থাকেন, মস্তকে ছত্র, সর্ব্বাঙ্গে চক্ষু—ইহা সহস্রাক্ষের স্থানে ধরিয়া লইতে হইবে। সন্ধ্যায় পড়ার মেয়েরা তাঁহাদের ভেঁজো ও পূজার জন্য নৈবিদ্য ফুল ইত্যাদি উপকরণ লইয়া আসেন। একটা মাটির পাত্রে ইঁদুর মাটি দিয়া কয়েকদিন পূর্ব্বে মুগ, জনার, বিঁড়ি কলাই প্রভৃতি বপন করা হয়, যাহাতে [illegible] দিন গাছগুলি বাহির হইয়া পড়ে। এই শস্যের গাছের পাত্রটির নাম ভেঁজো। সন্ধ্যার পরে ঘটের পাশে এই ভেঁজোগুলি রাখিলেই পুরোহিত ঠাকুর পূজা আরম্ভ করেন। তাহার পূজা শেষ হইলে তিনি যখন চলিয়া যান, তখন মেয়েরা শাড়ীখানিকে ঘাগরার মত করিয়া পরিয়া অপ্সরীর মত নৃত্যগীত আরম্ভ করেন। সকাল পর্য্যন্ত এই নৃত্যগীত চলিতে থাকে। তৎপরে ভেঁজোগুলি জলে বিসর্জ্জন দিয়া মেয়েরা স্নান করিয়া আসেন। এই পূজায় উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরমণী পর্য্যন্ত যোগদান করিয়া থাকেন।

(১) প্রমাণগুলি সুধী সমক্ষে উপস্থিত করিবার সময় এখনও হয় নাই।

BLOCKED INFORMATION.

আলবেরুণী মামুদের ভারত আক্রমণে কয়েকবার তাঁহার সঙ্গী হইয়া ভারতে আসিয়া ভারতের নানাবিধ বিবরণ তাঁহার পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই পুস্তকখানি ১০৩০ খৃঃ লিখিত হয়। ইহাতে তিনি মাস ও তিথি ধরিয়া হিন্দুর সম্বৎসরের পূজা পার্ব্বণের একটা তালিকা দিয়াছেন। ইহাতে ইন্দ্রপূজার মত একটি পূজার উল্লেখ আছে। সেই বিবরণটির অনুবাদ প্রদত্ত হইল, ঃ—

ভাদ্রপদের তৃতীয় দিবসে রমনীদের হরবালী (?) উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইহার কয়েকদিন পূর্ব্বে রমণীরা একটা ঝুরিতে নানাবিধ শস্যের বীজ বপন করে এবং বীজগুলি অঙ্কুরিত হইলে এইদিন ঝুরিগুলি আনে। তাহারা ঝুরিগুলির উপরে ফুল ও সুগন্ধি দ্রব্য নিক্ষেপ করে এবং সমস্ত রাত্রি ধরিয়া পরস্পরের সহিত খেলা করে। প্রাতঃকালে ঝুরিগুলি পুকুরে বিসর্জ্জন দিয়া স্নানান্তে গৃহে গমন করে। সেখানে তাহারা ভিক্ষা প্রদান করে।

"ঝুরির উপর ফুল নিক্ষেপ" আর কিছুই নহে, ফুল দিয়া পূজা। "পরস্পরের সহিত খেলা" সম্ভবতঃ নৃত্যগীত এবং "ভিক্ষা প্রদান করা" প্রসাদ বিতরণ। তারিখ বা তিথি সম্বন্ধে মোটেই মিল নাই। তথাপি আমার মনে হয়, বাঙ্গালার ইন্দ্রপূজা ও পঞ্জাবের "হরবালী" পর্ব্ব একই। শক্রোত্থানের সঙ্গে মেপোলের সাদৃশ্য থাকিলেও কোন সিদ্ধান্তই করা চলে না কিন্তু পঞ্জাবের সহিত পশ্চিম বঙ্গের সাদৃশ্য দেখিয়া একটা অনুমান করা চলে যে, যে মল্লই জা[illegible]রের ভারত ত্যাগের সময় তাঁহাকে বিব্রত করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে এইরূপ একটা পর্ব্ব প্রচলিত ছিল, সেই মল্লই জাতি পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া এই পর্ব্ব প্রচলিত করিয়াছে। ইহাতে একটা আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, আদি মল্ল যখন ৬৯৪ খৃঃ রাজ্যাভিষিক্ত হন, তখন মল্ল রাজবংশ সম্ভবতঃ ৬৯৪ খৃঃ এর কিছু পূর্ব্বে বাঙ্গালায় আসিলে, আলবেরুণী কেমন করিয়া খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের প্রথমপাদে এই পর্ব্বের অনুষ্ঠান পঞ্জাবে দেখিলেন? কিন্তু যদি ধরিয়া লওয়া হয় যে, পঞ্জাবে তখন যে সকল জাতি বাস করিত সকলের মধ্যেই এই পর্ব্বের অনুষ্ঠান হইত, তাহা হইলে আর কোন গোল থাকেনা।

[illegible] এই ইন্দ্রপূজার উৎপত্তি কোথায়? ঋক্‌বেদে দুইজন ইন্দ্রের পরিচয় পাওয়া যায়। একজন ইন্দ্র [illegible]ষ্যের অধিপতি, (১. ১৭. ২) সোমপায়ী, শত্রুবিনাশক এবং সহস্র গো ও অশ্ব দ্বারা প্রার্থনাকারীকে প্রশংসনীয় করেন (১. ২৯. ১-৭)। অপর ইন্দ্র সহস্রাক্ষ (১. ৩. ২৩) অর্থাৎ সহস্র সহস্র নক্ষত্র খচিত আকাশের দেবতা। তাঁহার নিয়ম অনুসারে নদীসমূহ বহিয়া যায় (১. ১০১. ৩) তাঁহার বজ্র অতিশয় শব্দ করে, তিনি শোভনীয় জল দান করেন, তিনি সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান্ তিনি, গর্জ্জন করেন (১. ১০০. ১৩ (সপ্তনদী তাঁহার যশ ধারণ করিতেছে, দ্যাবাক্ষমা পৃথিবী তাঁহার দর্শনীয় বপু ধারণ করিতেছে, সূর্য্য ও চন্দ্র আলোক বিতরণার্থ পুনঃ পুনঃ একের পর অন্য বিচরণ করিতেছে (১. ১০২. ২) এবং (সূর্য্যরূপ আলোকময় ইন্দ্র (সকল ভূতের প্রাণ

স্বরূপ) রুদ্রদিগকে (অর্থাৎ মরুৎগণকে, গ্রহণ করিয়া উদিত হন (১. ১০১. ৭)। (১) বৈদিক আর্য্যদের অনেকগুলি দেবতার নাম কিছু পরিবর্ত্তিত আকারে ইরাণীয় এবং ইয়ুরোপীয় আর্য্যদের মধ্যে পাওয়া যায় কিন্তু ইন্দ্রদেবতার নাম কোন আকারেই অন্য আর্য্যজাতির মধ্যে নাই। এই ইন্দ্রদেবতা ভবে আসিল কোথা হইতে? অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে আগে বেদ, পরে স্মৃতি—সর্ব্বশেষে পুরাণ। প্রথমটীর ভাষা ছান্দস্, দ্বিতীয়টির সংস্কৃত এবং সর্ব্বশেষেরটির এখন সংস্কৃত। কিন্তু পার্জিটার সাহেবের মতে কতকগুলি পুরাণ প্রথমে প্রাকৃতে রচিত হয়, পরে তাহার সংস্কৃত অনুবাদ প্রচলিত হইয়াছে। আবার এই তিন ভাষা লইয়া একটা মত প্রচলিত আছে যে, প্রথমে বৈদিক ভাষা, পরে সংস্কৃত, তৎপরে প্রাকৃত ভাষার জন্ম হয়। রাজা নহুষ, যযাতি ও তাঁহার পঞ্চপুত্রের নামের উল্লেখ ঋক্‌বেদের অনেক স্থানে আছে এবং কোশলাধিপতি রাজা হরিশ্চন্দ্র ও শুনঃসেফের উপাখ্যানের যৎকিঞ্চিৎ উল্লেখ ঋক্‌বেদে ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে। ইহাতে অনেক পণ্ডিত সিদ্ধান্ত করেন যে, এ সম্বন্ধে পৌরাণিক গল্পের সৃষ্টি বেদ রচনার পরে হইয়াছে। যদি মনে করা যায় যে, বৈদিক ঋষিদের পঞ্জাবে আগমনের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে পৌরাণিক আর্য্যদের আগমন হইয়াছিল এবং তাঁহাদের ভাষা ছিল প্রাকৃত, তাহা হইলে কি সেটা ভুল হয়? রাজা নহুষ ও তদ্বংশীয়দের গল্প এবং রাজা হরিশ্চন্দ্রের [illegible] যখন পুরাণে পূর্ণ আকারে পাওয়া যায়, তখন এমনও সিদ্ধান্ত করা চলে যে, পূর্ণ [illegible] অংশ মাত্র শুনিয়া বৈদিক ঋষিরা বৈদিক সাহিত্যে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে, বৈদিক ঋষিরা পঞ্জাবে আসিয়া পৌরাণিক আর্য্যদের ইন্দ্রদেবতাকে বেদের মধ্যে স্থান দিয়াছেন।

যাহা হউক, পুরাণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ইন্দ্রদেবতা স্বর্গের বা আকাশের অধিপতি; সূর্য্য, চন্দ্র তাঁহার আজ্ঞায় উদিত হয়, বায়ু তাঁহার আজ্ঞায় বহিতে থাকে এবং এই বজ্রধারী ইন্দ্রের আজ্ঞায় মেঘ বারিবর্ষণ করে, সুতরাং ইনি কতগুলি দেবতার রাজা অর্থাৎ দেবেন্দ্র, আবার বারিবর্ষণ ভিন্ন কৃষিকার্য্য চলেনা শস্যও জন্মেনা তাই ইন্দ্র শস্যাধিপতি। ইন্দ্রপূজা ও পঞ্জাবের হরবালী পূজায় তাই শস্যের চারা গাছ দেওয়া হয়। বৈদিক আর্য্যদের আকাশের দেবতা ছিলেন দ্যু এবং বরুণ। এই নাম দুটি লাটিন গ্রীকেও কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে [illegible] বৈদিক ঋষিরা অপরের কাছে ইন্দ্র দেবতাকে না পাইয়া নিজেদের কল্পনা বলে দ্যু এবং বরুণকে আকাশের দেবতার পদ হইতে খারিজ করিলেন ইহা কিছুতেই সম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

বঙ্গদেশে অন্ততঃ রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ কায়স্থদের মধ্যে এবং তাহাদের দেখাদেখি আরও কোন কোন জাতির মধ্যে লক্ষ্মী ঠাকুরাণী শস্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে পূজা পান। তাই ভাদ্র, পৌষ ও চৈত্র এই তিন মাসে বৃহস্পতিবারে তাঁহার পূজা হয়। আমি ঠিক বলিতে পারিনা, লক্ষ্মী শস্যের দেবী বলিয়া কোন পুরাণে বর্ণিত হইয়াছেন কিনা। কোজাগর পূর্ণিমায় যে লক্ষ্মী পূজা

(১) ৺রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বঙ্গানুবাদ।

BLOCKED INFORMATION.

হয় তাঁহাকেই আমি পৌরাণিক লক্ষ্মী বলিয়া মনে করি। আমি "পৌরাণিক ভূগোল" নামক প্রবন্ধে (১) বলিয়াছি যে, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ কায়স্থরা কলিঙ্গ দেশ হইতে বাঙ্গালায় আসিয়াছেন এবং অন্ধ্ররাজবংশের নামের পূর্ব্বে সিরি বা শ্রীশব্দের প্রয়োগ দেখিয়া মনে হয় যে, এই লক্ষ্মীপূজা দাক্ষিণাত্য হইতেই বাঙ্গালায় আসিয়াছে। দাক্ষিণাত্যে খুব সম্ভবতঃ এই তিন মাসেই তিনটি ফসল হয়, তাই বৎসরের মধ্যে তিনবার লক্ষ্মীপূজা প্রচলিত হইয়াছে। সুতরাং যাঁহাদের মধ্যে ভাদ্র মাসে ইন্দ্র পূজা প্রচলিত আছে, তাঁহারা এমনি দেশ হইতে আসিয়াছেন যেখানে বৎসরের মধ্যে কেবল ভাদ্রমাসে ফসল না হউক, ফসলের গাছগুলি বেশ বাড়ে, তাই আনন্দে তাঁহারা ইন্দ্রপূজার অনুষ্ঠান করিয়া নাচগান করিয়া থাকেন। (২)

এখন হরিশয়নের বিচার করা যাউক। আষাঢ়ের শুক্লাদ্বাদশীতে হরিশয়ন, শ্রাবণের শুক্লাদ্বাদশীতে হরির পার্শ্ব পরিবর্ত্তন এবং কার্ত্তিকের শুক্লাদ্বাদশীতে হরির উত্থান হইয়া থাকে। আমাদের দেশের জ্যোতিষীদের মতে সূর্য্যের দক্ষিণায়ন আরম্ভ হইলে সুমেরু বা উত্তর মেরুতে দেবতাদের নিদ্রার সময় আরম্ভ হয়। তাঁহারা ছয় মাস ঘুমাইয়া উত্তরায়ণ আরম্ভ হইলে জাগিয়া উঠেন। এখন দক্ষিণায়ন আরম্ভ হয় ১১ই আষাঢ়ে; কিন্তু যখন চৈত্র সংক্রান্তিতে দিন রাত্রি সমান হইত তখন ১লা শ্রাবণে দক্ষিণায়ন আরম্ভ হইত। সুতরাং কেহ কেহ বলেন ঐদিনই হরিশয়ন হওয়া উচিত ছিল। পুরাণকারেরা তিথি ধরিয়া কাজ করায় কিছু ভুল [illegible]। যেরূপভাবে যুক্তি দেখান হইয়াছে, তাহাতে তফাৎটা বড় বেশী দাঁড়ায় না। কিন্তু বাস্তবিক কি দক্ষিণায়ন আরম্ভ হইলেই সুমেরুতে সূর্য্য অস্ত যায় যে, দেবতারা ঘুমাইবেন? ১০ই আশ্বিন তারিখে সূর্য্য যখন বিষুব রেখায় আসে, তখন হইতে ১০ই চৈত্র পর্য্যন্ত সুমেরুতে রাত্রি। সুতরাং ১০ই বা ১১ই আশ্বিনই বলিতে গেলে দেবতাদের শয়ন আরম্ভ হইয়া থাকে। কাজেই পার্থক্যটা বড় বেশী দাঁড়াইতেছে। ইহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, সুমেরুতে দেবতাদের শয়নের সঙ্গে হরিশয়নের কোন সম্বন্ধ নাই।

পুরোহিত দর্পণে হরিশয়নের অন্যান্য মন্ত্রের মধ্যে একটি মন্ত্র এইরূপ আছে,—"ওঁ পশ্যন্তু মেঘ[illegible] মেঘশ্যামং হ্যুপাগতং সিচ্যমানাং মহীমিমাং নিদ্রাং ভগবান্ গৃহ্লাতু লোকনাথ বর্ষামিমাং পশ্যতু মেঘবৃন্দম্।"—এই মন্ত্র হইতে বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, বারিবর্ষণ আরম্ভ হওয়ায় শ্রীহরিকে ঘুম পাড়ান হইতেছে। কিন্তু বর্ষা সুরু হইলে আমরা প্রত্যক্ষ দেখি সূর্য্যদেবকে কাজের

(১) মেদিনীপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে গঠিত ও "মানসী ও মর্ম্মবাণী" ১৩২৯ বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত।

(২) বাসুদেব কৃষ্ণ গোপদিগকে এই ইন্দ্রপূজা করিতে নিষেধ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে গিরিগোবর্দ্ধন-পূজা করিতে প্রবৃত্ত করেন। তাহাতে ইন্দ্রদেব মেঘদিগকে প্রবল বারিবর্ষণ করিতে আদেশ করেন। ইহা, মনে হয়, বর্ষাকালের শুরু। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় উত্থান একাদশীর ১০ দিন পূর্ব্বে গোবর্দ্ধন পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

অভাবে ঘুমাইতে হয়। সূর্য্য লোকনাথও বটেন। যে বিগ্রহকে শয়ন করান যায় না, তাহার শয়ন কল্পনা করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিতে হয়,—

"ওঁ ত্বয়ি সুপ্তে জগন্নাথ জগৎ সুপ্তং ভবেদিদং।
প্রবুদ্ধে ত্বয়ি বুধ্যতে জগৎ সর্ব্বং চরাচরং॥"

ইহার প্রত্যেক কথাই সূর্য্য সম্বন্ধে খাটে, আবার উত্থানের মন্ত্রে আছে,—

"ত্বয়ি সুপ্তে জগৎসুপ্তং উত্থিতে চোত্থিতং জগৎ।
গতা মেঘা বিয় চ্চৈব নির্ম্মলং নির্ম্মলা দিশঃ॥"

এই তিনটি মন্ত্রে বেশ প্রতীয়মান হইবে যে, বর্ষার আরম্ভে হরি অর্থাৎ সূর্য্য ঘুমাইয়া পড়েন আর শরদে আকাশ মেঘশূন্য হইলে তিনি জাগরিত হন।

বেদে বিষ্ণু নামে সূর্য্যকেই বুঝায়। বিষ্ণু, যে পুরাণের মতে, বামন মূর্ত্তি ধরিয়া তিন পদে স্বর্গ মর্ত্য ও পাতাল অধিকার করিয়া ছিলেন, এবং ঋক্‌বেদে বিষ্ণু, যে তিন প্রকার পদক্ষেপে, জগৎ আবৃত করিয়া ছিলেন, তাহার অর্থ সম্বন্ধে নিরুক্ত ও দুর্গাচার্য্যের মত উদ্ধৃত করিয়া ৺রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন, "সূর্য্যের উদয়গিরিতে আরোহণ, মধ্য আকাশে স্থিতি ও অস্তাচলে অবতরণ এই তিনটি বিষ্ণুর তিন পদক্ষেপ।" ইহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে, বেদে সূর্য্যকেই বিষ্ণু [illegible]। আবার বেদে ৺রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বঙ্গানুবাদে (১. ১০১. ৭) বলা হইয়াছে, "(সূর্য্যরূপ) আলোকময় ইন্দ্র।" ইহা অবশ্য টীকা অনুযায়ী অনুবাদ। একই দিনে ইন্দ্রপূজা ও হরির পার্শ্বপরিবর্ত্তনের পূজা দেখিয়া এবং সূর্য্য, বিষ্ণু ও ইন্দ্র এক কশ্যপ ও অদিতির পুত্র—পুরাণে ইহা পড়িয়া, মনে হয় একদিন সূর্য্য, বিষ্ণু ও ইন্দ্র এই তিনজনেই এক দেবতা ছিলেন। এই দিনে বামনদেবের অর্চ্চনা হইতেও এই অনুমান সমর্থিত হয়।

পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, বৈদিক পণ্ডিতদের মতে বিষ্ণুর তিন পদক্ষেপ আকাশে সূর্য্যের তিন স্থানে অবস্থিতি। তাহা হইলে বিষ্ণুর অবতার বামনদেব ও সূর্য্য হইয়া পড়েন। কিন্তু বামন নাম হইল কেন? আমার মনে হয়, উত্তরমেরুতে (ও দক্ষিণমেরুতে) সূর্য্য সকল স্থান চাইতে কম উপরে উঠে বলিয়া সূর্য্যের বামন নাম হইয়াছে। দুইক্রান্তি বৃত্তের মধ্যস্থ [illegible] মাথার উপরে উঠিতে পারে। ইহার উত্তরে (ও দক্ষিণে) যতই যাওয়া যায়, ততই সূর্য্যের মাথার উপরে উঠা কমিতে থাকে, ১০ই আষাঢ় তারিখে যখন সূর্য্য উত্তরমেরুতে সব চাইতে উপরে উঠে তখন তাহা চক্রবালের ৬৬½° ডিগ্রী উপরে উঠিয়া ক্রমে তিন মাস ধরিয়া নীচে নামিতে থাকে। সুতরাং উত্তরমেরুতে বা তন্নিকটস্থ অঞ্চলে সূর্য্যের বামন মূর্ত্তি। আবার এই সূর্য্যদেব যখন উত্তরমেরুতে ছয় মাস (অর্থাৎ ১০ই চৈত্র হইতে ১০ই আশ্বিন পর্য্যন্ত) থাকিয়া অস্ত যান তখন তিনি অগস্ত্য। অগস্ত্য মুনি বিন্ধ্যপর্ব্বত পার হইয়া দক্ষিণে গিয়া ছিলেন, আর ফিরিয়া আসেন নাই, পুরাণের এই আখ্যায়িকার অর্থ—উত্তরমেরু হইতে সূর্য্যের বহুদিনের জন্য অস্তগমন। যাঁহারা

BLOCKED INFORMATION.

উত্তরমেরুতে গিয়া সূর্য্যের অস্তের পর সূর্য্যোদয় হইতে বিলম্ব দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন তাঁহারাই বোধ হয় এই আখ্যায়িকার সৃষ্টি করেন। অগস্ত্য=ন+গ (ম)+অস্ত অর্থাৎ যিনি অস্ত গিয়া ফিরিয়া আসেন না। অবশ্য ইহা প্রাকৃতমূলক ব্যুৎপত্তি। আমার অনুমানের সমর্থক বামনদেবতার পূজায় অগস্ত্যার্ঘ্য দানের মন্ত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি,—

অপ্রাপ্তে ভাস্করে কন্যাং শেষভূতে স্ত্রিভির্দিনৈঃ।
অর্ঘ্যং দদুরগস্ত্যায় গৌড়দেশ নিবাসিনঃ॥
কাশ পুষ্প প্রতীকাশ অগ্নিমারুত সম্ভব।
মিত্রাবরুণয়োঃ পুত্র কুম্ভযোনে নমোস্তুতে॥
আতাপি ভক্ষিতো যেন বাতাপিশ্চ মহাসুরঃ।
সমুদ্রঃ শোষিতো যেন স মে গস্ত্যঃ প্রসীদতু॥

বরুণ ঋক্‌বেদে প্রাচীন আকাশদেবতা এবং মিত্র আলোকদেবতা, সুতরাং সূর্য্য তাঁহাদের পুত্র। অগস্ত্যকে মিত্রাবরুণের পুত্র বলায়, বেশ প্রতীয়মান হইতেছে যে, সূর্য্য ও অগস্ত্য একই দেবতা। সূর্য্যই সমুদ্র শোষণ করিয়া থাকেন এবং তিনিই কিরণ দ্বারা আতাপি ও বাতাপি নামক ব্যাধিরূপ অসুরকে নাশ করেন। অগস্ত্য আবার কুম্ভযোনি অর্থাৎ মাঘের শেষ দিনের সূর্য্যকে অগস্ত্য বলা হইয়াছে। উত্তরমেরুতে ১০ই আশ্বিন সূর্য্যাস্ত হয়। তাহার পর যতই অগ্রসর হওয়া যায় ততই ক্রমে সূর্য্যাস্তের তারিখে বিলম্ব হয়। ক্রমে এমন একস্থানে পৌঁছান যায়, যেখানে ১লা মাঘ তারিখে, অর্থাৎ এখনকার ১০ই পৌষ তারিখে, কিছুদিনের জন্য সূর্য্যাস্ত হয়। সেইখানেই সূর্য্য বা অগস্ত্য কুম্ভযোনি নাম পাইয়াছিল।

শ্রীরাখালরাজ রায়

পিপাসা

বিষাদে কাঁদে মরুর তীরে তরুণ পিপাসা
"ফটিক জল!" কোথা সে জল? স্বর নীল আকশ তল,
গর্জ্জেনারে মেঘের দল,—মূর্চ্ছে বিভাসা।
বাতাস বহে আকাশ দহে ঘূর্ণী আঁধারে
তপ্ত বালি ছড়ায়ে গায়, তৃষার নেশা পোড়ায়ে যায়,
সুদূর পথে উড়িয়ে যায় ধু-ধু-র পাথারে।

বর্ষায়

(১)

কালি দু'পহরে নির্জ্জন ঘরে
বসিয়াছিলাম একা,
চমকি' গভীর গুরুগর্জ্জনে,
দেখিনু জলদ-জড়িত গগনে,
স্ফুট বিদ্যুৎ-রেখা।

চঞ্চলালোকে পঞ্চছটায়,
হেলিয়া খেলিয়া কুটিল জটায়,
যেন রঙ্গিনী হর-সঙ্গিনী
গঙ্গা দিতেছে দেখা।
দেখিনু জলদ- জড়িত গগনে
স্ফুট বিদ্যুৎ-রেখা।

(২)

দূরে মেঘপট হয়েছে পাটল
উড়িছে ধূসর-ধূলি।
উড়ে শ্যেনদল মণ্ডলাকারে
মৌনা মেদিনী বিবশ আঁধারে
মূর্চ্ছিত তরুগুলি।

ধেয়ে আসে বেগে মত্ত পবন,
কাঁপে নিশ্বাসে নিখিল ভুবন,
থর থর বন, কুঞ্জ ভবন,
তটিনী উঠিল দুলি'।
মৌনা মেদিনী বিবশ আঁধারে
মন্দ্রিত তরুগুলি।

(৩)

দূরে দূরে দূরে কোন্ মেঘপুরে
গুরুগুরু ঘোর নাদে,—
মঞ্জুলমালা লম্বিত গলে
মধু মুখ ছবি ঝাঁপি অঞ্চলে
দশ দিক্ বধূ কাঁদে।

ঝর ঝর ঝর ঝরে বারিধারা,
কি করুণ সুর মধুর মুদারা,—
ভুবন ভরিয়া উঠে শিহরিয়া
চির-রঞ্জন ছাঁদে।
মধু মুখ ছবি ঝাঁপি, অঞ্চলে
দশ দিক্ বধূ কাঁদে।

(৪)

নবমেঘ ছায়া বিথারিল মায়া,
ধারায় ধূম্র ধরা,
তর তর তর নীল সরোবর,
গিরিপাদমূলে নাচে নির্ঝর,
গীতি-গৌরব ভরে!
ইন্দ্রধনুর মায়াছবি লিখি'
দেবদারু তলে সুখে নাচে শিখী,
গর্জ্জনে গানে পাষাণে পাষাণে
কেতকী কেশর ঝরে।

(৫)

কোথা মেঘালোকে কে কাঁদে বিরহী
প্রিয়ামুখশোভা স্মরি',—
পূজার অর্ঘ্য রচি যূথিকায়,
প্রেয়সীরে প্রেম-লিপি দিতে চায়
মেঘে দূত পদে বরি'?
কোথা সে অলকা-প্রেমের স্বপন,
মণিমণ্ডিত শোভন ভবন,
কোথা বনবীথি বেণু-বীণা-গীতি
শোভাময় গিরি-দরী?
প্রেয়সীরে কে সে লিপি দিতে চায়
মেঘে দূত পদে বরি?

BLOCKED INFORMATION.

(৬)

কোথা অচ্ছোদ স্বচ্ছ শীতল
কমল কুমুদ-আঁকা ?
কারে কোলে করি অশ্রুনয়না
রাজবালা করে প্রেম-আরাধনা,
হস্তে রসাল শাখা ?
পরলোক হ'তে চাহে ফিরাইতে,
অভিশাপ ভরা রূঢ় পৃথিবীতে
মূরতি অমিয়-মাখা।
বরষায়, শোক তীব্র আলোক
আঁখি পল্লবে ঢাকা।
রাজবালা করে প্রেম-আরাধনা
হস্তে রসাল-শাখা

(৭)

একবেণীধরা কোথা বিরহিণী
রাক্ষসপুরী মাঝে ?
হোমশিখাসম সুন্দর ক্ষীণ
তনুলতা যেন তরুতলে লীন ;
আঁখি অবনত লাজে ?
চিত্রকূটের কোথা সে চিত্র,
প্রণয়ে মধুর চিরপবিত্র,
চাহি পথপানে আকুল পরাণে,—
কে সে বনদেব সাজে ?
রাক্ষসপুরে কে সে বিরহিণী,
আঁখি অবনত লাজে ?

(৮)

দুঃসহ দ্যুতি,—দীর্ঘ দামিনী !
ছিন্ন তিমির-বন্ধ
ভৈরব রবে গরজে বজ্র,
বকুল মল্লী ঝরে অজস্র,
—গম্ভীর-গীতি-ছন্দঃ—
কত কবি কথা করুণকাহিনী,
জাগায় হৃদয়ে বরিষা-মোহিনী,
হয়ে গেছে ফুল, মকুতা-মকুল,
—শেফালি কোমল গন্ধ।
গগনে গগনে গরজে বজ্র
গম্ভীর-গীতি-ছন্দ।

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ

মগধ

যে প্রদেশে আমরা বাস করিতেছি, এরূপ অন্য একটী জনপদ, ভারতবর্ষের কথা দূরে থাক, ভূমণ্ডলে পাওয়াও দুষ্কর, বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। আধ্যাত্মিকক্ষেত্রে, মহাবীর ও গৌতমের লীলাভূমি এবং গুরুগোবিন্দের জন্মস্থানরূপে ইহা সুপরিচিত।(১) প্রথম দুইটী বৌদ্ধ সঙ্গীতি মগধেই আহূত হইয়াছিল (২) এবং তিষ্য মোগলিপুত্ত এবং উপগুপ্ত নামক প্রধান বৌদ্ধাচার্য্যদ্বয় মগধেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধ এবং জৈন উভয় সম্প্রদায়ের ধর্ম্মশাস্ত্র এইস্থানে বিধিবদ্ধ হইয়াছিল।(৩) ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম এই ভূভাগের প্রতি বিরূপ হইলেও, এই স্থানেই

(১) বিংশতি তীর্থঙ্কর সুব্রত মগধের অন্তর্গত রাজগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং চতুর্ব্বিংশতি তীর্থঙ্কর বর্দ্ধমান মহাবীরের বৈশালীতে জন্ম হইলেও দেহান্ত মগধেই হইয়াছিল। (২) কোস্ব্রজ ভারত ইতিহাস ১।৪৮২ পৃঃ দ্রষ্টব্য। (৩) পাটলিপুত্র হইতে নীত বুদ্ধঘোষই মহাযানের প্রতিষ্ঠাতা বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

সর্ব্বপ্রথম ঐতিহাসিক অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। অর্থনীতির আদিপুরুষ এই প্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা, এই সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও, তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র যে এইস্থানেই ছিল, তাহাতে সন্দেহের কোনই হেতু নাই। অন্যতম অর্থনীতিবিদ্ কামন্দক এইস্থানেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। উপবর্ষ ও বর্ষ, পাণিনি ও পিঙ্গল, বররুচি ও পতঞ্জলি(৪) এই ক্ষেত্রেই প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। খগোল-বিজ্ঞানের জন্মদাতা আর্য্যভট্ট এইস্থানেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। চ্যাবন ও দধীচির ন্যায় ঋষি এই জনপদেই বাস করিতেন। চন্দ্রগুপ্তমৌর্য্যের বহু পূর্ব্বে সুন্দর, বলবান, ধনী, তিন অক্ষৌহিণীস্বামী বৃহদ্রথ ভূপতি(৫) এবং সমসাময়িক সকল নরপতিশ্রেষ্ঠ জরাসন্ধ(৬) অন্যান্য রাজন্যবর্গকে পরাভূত করিয়াছিলেন।(৭) পারস্যবিজয়ী, গ্রীকবীর আলেকজান্দারের বিজয়ী সৈন্য মগধাধিপতির বীর নামের সংবাদেই ভীত হইয়া পশ্চাৎপদ হইয়াছিল।(৮) উত্তর ভারতের প্রথম একচ্ছত্র নরপতি অশোক এবং দ্বিতীয় রাজচক্রবর্ত্তী সমুদ্রগুপ্তের বিজয় পতাকা এই স্থান হইতেই গর্ব্বভরে উড়িয়াছিল। মগধ হইতেই ধর্ম্মযাজকগণ তৎকালীন-সভ্যজগতের নানাস্থানে প্রেরিত হইয়াছিলেন; চিকিৎসকগণ মনুষ্য ও জন্তুর চিকিৎসার্থ নানাদেশে গমন করিয়াছিলেন; দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাকরণার্থ অঙ্গচ্ছেদপ্রথা প্রথমে এই দেশেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।(৯) নালন্দা ও বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয় এই জনপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই নানাদেশে দর্শনাদি প্রচার করিয়াছিল। এই স্থানেই তক্ষণশিল্পের যে পরাকাষ্ঠা দৃষ্ট হইয়াছিল—বিংশ শতাব্দীতেও তদপেক্ষা উত্তম শিল্প দৃষ্ট হইতেছেনা।(১০) মগধেরই শিল্পিগণ বিভিন্নদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।(১১) মগধে প্রবর্ত্তিত রাজধর্ম্মই মুগলরাজধর্ম্ম কর্ত্তৃক অনুকরণ করা হইয়াছিল।(১২)

প্রাচীন ভারতে মগধ রাজ্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। কিন্তু এহেন মগধ বৈদিককাল হইতে হেয় বলিয়া পরিগণিত হইত। বাজপেয়ী সংহিত্যার ত্রিংশৎখণ্ডে মাগধকে অতিক্রুষ্টের নিকট বলিপ্রদানার্থ উৎসর্গকরা হইয়াছিল।(১৩) পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে(১৪) দেখিতে পাই

(৪) ইঁহার গ্রন্থে পাটলিপুত্রের এত উল্লেখ আছে যে, সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় এতদ্দেশেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

(৫) মহাভারত সভাপর্ব্ব ১৭। (৬) মহাভারত, সভা ১২। (৭) হরিবংশ ৯০ অধ্যায়। (৮) ম্যাক্রিণ্ডল প্রণীত, আলেকজান্দারের অভিযান। ধনানন্দের দুইলক্ষ পদাতিক, বিংশতি সহস্র অশ্বারোহী, দ্বিসহস্র রথী ও চারি সহস্র সাদী সৈন্য ছিল। (৯) Vivisection বিহার ও উড়িষ্যার প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধান সমিতির প্রথমবর্ষের পত্রিকায় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। (১০) অশোক। (১১) Kanakasappai-The Tamils 1800 years ago. । (১২) ভিন্‌সেণ্ট স্মিথের অশোক ২৩৮ পৃঃ।

(১৩) এই শব্দের আখ্যা সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। ওয়েবার নামক জার্ম্মাণ পণ্ডিত এই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "What is to be understood by মগধম্ ? If we take *Atikrushta* in the sense of "great noise", the most obvious interpretation of Magadha is to understand it, with Medatithi, in its sense, as signifying ministrel, son of a Vaisya by a Ksatriya." কিন্তু, এ মত অনেকে গ্রহণীয় বলিয়া মনে করেন না। (১৪) ১৭।১৬।

BLOCKED INFORMATION.

যে মগধবাসীর আচরণে ব্রাহ্মণদিগের সহিত পার্থক্যছিল। শ্রৌতসূত্রেও(১৫ মগধবাসীকে নিন্দা করা হইয়াছে। সাংখ্যায়ান আরণ্যকে মগধে বাস নিন্দনীয় বলিয়া কথিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে বৈদিক সকল গ্রন্থেই মগধবাসীকে হেয়জ্ঞান করিয়া ম্যালেরিয়া (?) জ্বরকে তদ্দেশবাসী হইতে আদেশ করা হইয়াছে।(১৬) মগধবাসী ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মবন্ধু—তথাকথিত ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে। কেবল একস্থানেই(১৭) ব্রাহ্মণ মধ্যম প্রতিবোধি পুত্রকে সৎ-ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে। অন্যত্র সর্ব্বস্থানেই মগধদেশ হেয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে এবং মনুর সময়েও মগধকে ব্রহ্মর্ষি জনপদের অন্তর্ভূত করা হয় নাই। অদ্যাবধি মিথিলা দেশীয় ব্রাহ্মণ মগধকে হেয়জ্ঞান করেন এবং মৈথিল ব্রাহ্মণগণ গ্রহণাদি শুভসময়ে মগধে থাকিলে গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া অপর পারে গমন করতঃ স্নানদানাদি করেন।

ঋগ্বেদে মগধ শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই—কীকট শব্দ মাত্র এক স্থলে (১৮) উল্লেখ করা হইয়াছে। এই কীকট শব্দই মগধ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। (১৯) ইতিপূর্ব্বেই আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে মগধ শব্দটী পুরুষমেধযজ্ঞপ্রসঙ্গে ব্যবহৃত হইয়াছে। অথর্ব্ববেদেও ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

মগধের প্রাচীন ইতিহাসের সহিত ব্রাত্য কথাটীর বিশেষ সম্পর্ক আছে। অথর্ব্ববেদে ব্রাত্য খণ্ড পাঠ করিলে এই উক্তির সার্থকতা প্রতীয়মান হয়। মগধকে ব্রাত্য শক্তির কেন্দ্রস্থান বলিয়া সহজেই গ্রহণ করা যাইতে পারে। (২০) এবং ইহাও বলা যাইতে পারে যে, যে সকল আর্য্য ব্রাহ্মণগণ মগধে বাস করিতেন, তাঁহাদিগকে ব্রাত্যের পুরোহিত বলিয়া ঘৃণা করা হইত; সঙ্গে সঙ্গে পুরোহিতদের যজমান—তদ্দেশবাসীদিগকেও হেয় জ্ঞান করা হইত।

কিন্তু, কি কারণে, মগধকে হেয়জ্ঞান করা হইত? কাহার দোষে মগধবাসী নিন্দনীয় পরিগণিত হইত? জার্ম্মাণ পণ্ডিত ফিক্ এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, সম্ভবতঃ ভারতের পশ্চিম প্রান্তের ব্রাহ্মণগণ—মগধে ও তদ্দেশীয় ব্যক্তিবর্গকে হীনজ্ঞান করিত, কারণ পূর্ব্বপ্রান্তে অবস্থিত মগধ তখনও সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্মণ্য প্রভাবে আলোকিত হয় নাই; হয়ত মগধবাসী ব্রাহ্মণগণ অনাচারদোষে দুষ্ট ছিলেন বলিয়াও হেয় পরিগণিত হইতেন। Vedic Index নামক সুপ্রতিষ্ঠিত গ্রন্থের গ্রন্থকারদ্বয়, জার্ম্মাণ পণ্ডিত ওল্‌ডেনবার্গের মতানুসরণ করিয়া বলিয়াছেন যে মগধ সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই বলিয়াই তাহাকে হেয়জ্ঞান করা হইত। ওয়েবার নামক পণ্ডিত মনে করেন যে মগধে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল বলিয়াই এইরূপ করা হইত; কিন্তু, বৌদ্ধধর্ম্ম বহু পরে আবির্ভূত হইয়াছিল, সুতরাং, এ যুক্তি গ্রহণ করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে, ওল্‌ডেনবার্গের

(১৫) ৭, ৬।২৮; ২২, ৪।২২। (১৬) অথর্ব্ব ৫, ২২।১৪। (১৭) কৌশিকের আরণ্যক ৮।১৩। (১৮) ৭, ৫৩।১৪। (১৯) বলা বাহুল্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই শব্দ ও-অর্থে গ্রহণ ও প্রয়োগ করিয়াছেন। Altindinches Leben, 31, 118; Indian Literature 79n; Oldenburg's Buddha 402, 493। (২০) এই প্রসঙ্গে ব্রাত্যায়ণ (৬।২৮) এবং ল্যাট্যায়ণ (২২।৪।২৮) একান্ত দ্রষ্টব্য।

যুক্তি যে অঙ্গ, কাশী, কোশল এবং বিদেহ, মগধের ন্যায় আর্য্য সভ্যতার প্রান্তবর্ত্তী ছিল বলিয়াই উহাদিগকে হেয়জ্ঞান করা হইত।

বস্তুতঃ মগধ আর্য্য সভ্যতার প্রান্ত সীমায় অবস্থিত ছিল। সভ্যতা তৎকালে মগধে সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ করিয়াছিল না এবং মগধে "সভ্যলোকে"র বাস অস্বাভাবিক বলিয়া মনে করা হইত। মগধে তখন আর্য্যদের এক উপনিবেশ মাত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং কুরুপাঞ্চালের সময়েও মগধে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার কথা শ্রুত হওয়া যায়। এই সম্পর্কে মহাভারতের মগধের বর্ণনা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। উহা হইতে আমরা প্রমাণ পাই যে, মহাভারতের যুগেও মগধকে আর্য্যদিগের উপনিবেশ বলিয়া পরিগণিত করা হইত এবং তজ্জন্যই অগ্রগামী যে সকল আর্য্যসন্তান অন্য সকলকে পশ্চাতে রাখিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে হেয়জ্ঞান করা হইত।

আর্য্য সভ্যতার ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। বেদোক্ত পণিগণকেও হেয় জ্ঞান করা হইত। তাহারাও আর্য্য ছিল—তাহারাও ব্যবসায় বাণিজ্য দ্বারা ধনবৃদ্ধির প্রয়াসে স্বজনগণকে পশ্চাতে রাখিয়া অগ্রসর হইয়াছিল—তাই স্বজনগণের নিকট তাহারা লোভী, ও অন্যান্য কুসম্বোধনে অভিহিত হইয়াছিল। মগধ ও মগধবাসী ব্রাহ্মণগণকে তাহাদের স্বজনগণকে হীনচক্ষে দেখিত, ইহাও সেই।

শতপথ ব্রাহ্মণের নায়কের আখ্যান পাঠ করিলে পশ্চিমদিক হইতে পূর্ব্বদিকে আর্য্যসভ্যতা বিস্তার—ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রতিপত্তি বৃদ্ধির ইতিহাস বেশ সুস্পষ্ট হয়। অগ্নিবৈশ্বানর পশ্চিমে সরস্বতী তীর হইতে সদানীর (২১) পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া নিজ গতি সংবরণ করিলেন। অগ্নি সদানীর উত্তীর্ণ হন নাই, সুতরাং কোন ব্রাহ্মণেরই আর ঐ নদী উত্তীর্ণ সঙ্গত বোধ হয় নাই। সদানীরের পশ্চিম ভূভাগে বাস এই জন্যই দূষণীয় মনে হইত। (২২)

যে আর্য্যগণ অগ্রগামী হইয়া মগধে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করিয়া বাস করিয়া তাঁহাদের স্বজনের নিকট হেয় হইয়াছিলেন, তাঁহারা অনার্য্য ছিলেন না—তাঁহারা আর্য্যই ছিলেন; কিন্তু উদার মত পোষণের জন্যই তাঁহাদের উপরি-উক্ত দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল। পঞ্চনদসেবিত ভূভাগে বাস কালীন আর্য্যদের কেহ কেহ স্বজন পরিত্যাগ করিয়া সমৃদ্ধির জন্যই হৌক অথবা মহাবীর বা বুদ্ধদেবের ন্যায় গৃহ-পরিত্যাগ করিয়া লোক শিক্ষার উদ্দেশ্যেই হৌক অগ্রগামী হইয়াছিল। এইরূপেই ব্রাত্যের উদ্ভব হইয়াছিল এবং এই ভাবেই অন্যান্য জনপদে আর্য্য সভ্যতার বিস্তৃতি ঘটিয়াছিল। ব্রাত্য সাধারণের সহিত মিলিত হইত, কখনওবা রাজ-অতিথিরূপে শোভা পাইত, কোন সময় সাধারণ ব্যক্তির অতিথি হইত—কিন্তু সর্ব্বত্রই সম্মানের সহিত পরিগৃহীত হইত। আর্য্য বলিয়া যে ব্রাত্য সর্ব্বত্রই সম্মান পাইত, এই মত সমীচীন বলিয়া গৃহীত হইতে পারে এবং এই কারণেই সে নিজ স্বজনের নিকট হেয় হইত।

(২১) এই সদানীর সম্বন্ধে নানা ঋষি নানা মত পোষণ করেন। (২২) এই প্রসঙ্গে মিঃ পার্জিটার লিখিত এসিয়াটীক সোসাইটীর জর্ণালে ১৮৯১ সালে প্রকাশিত প্রবন্ধ অবশ্য দ্রষ্টব্য।

পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে আমরা যখন দেখিতে পাই যে ব্রাত্য তাহার "নূতন জীবন" পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বতন স্বজনকে সর্ব্বস্ব দান করিলে, পুরাতনের দলভুক্ত হইতে পারিত, তখনই মনে হয় যে ব্রাত্যগণ অনার্য্য হইলে, যে প্রায়শ্চিত্তই করুক না কেন, কখনই আর্য্যসম্প্রদায় ভুক্ত হইতে পারিতনা।

বুদ্ধদেবের সময়ে বর্ত্তমান পাটনা ও গয়াই মগধ ছিল। তৎকালে মগধে অশীতি সহস্র গ্রাম ছিল। (২৩) বিম্বিসারের সময়েই মগধ সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। পিতৃহন্তা অজাতশত্রু নিকটবর্ত্তী কোশল ও বৈশালী রাজ্যদ্বয় জয় করিয়া মগধের বিস্তৃতি সাধন করেন। কথিত হয় যে প্রবল পরাক্রান্ত অজাতশত্রু হিমালয়ের পাদদেশ পর্য্যন্ত নিজ রাজ্য বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত লিচ্ছবিদের যুদ্ধ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ঘটনা এবং লিচ্ছবিপতন হইতেই মগধের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা হয়। সুমঙ্গল বিলাশিমতে ইহার বিস্তৃত উল্লেখ আছে।

পাগ্‌সম্‌জান্‌জঙ্গ নামক তিব্বতীয় গ্রন্থে মুসলমানগণ কর্ত্তৃক মগধ বিজয়ের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। বারান্তরে আমরা উহার আলোচনার প্রয়াস পাইব।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার

বর্ত্তমান বাঙ্গালার অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাসের এক অধ্যায় *

(৭)

রাজনৈতিক ডাকাইতি করিয়া বৈপ্লবিক কর্ম্মের জন্য অর্থ সঞ্চয় করিবার মতবাদ বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতিতে প্রথম হইতেই ছিল। আমি যখন এই সমিতিতে যোগদান করি তাহার পূর্ব্বেই এ মতটা পাকাপাকিরূপে গৃহীত হইয়াছিল। কারণ দেশের লোকে টাকা দেয় না। দু'চারজন রিফ্‌লেস্ ব্যারিষ্টার, যাঁহারা নেতাগিরি করিতেন তাঁহারাই, কিছু কিছু সাহায্য করিতেন, কাজেই স্থির হইল, ইংরাজের টাকা কাড়িয়া লও। কিন্তু স্বদেশী যুগের পর যখন রাজনৈতিক ডাকাইতি আরম্ভ হইল তখন দেখা গেল যে, ডাকাইতি কেবল দেশের লোকেরই উপর হইতে লাগিল। কারণ বোধ হয়, ইংরাজের বা গভর্ণমেণ্টের উপর ডাকাইতি করা তত সোজা নয়, নিরস্ত্র দেশের লোকের উপর করা যত সোজা।

বঙ্গে রাজনৈতিক ডাকাইতির ইতিহাস এক Melo-dramaর অভিনয়। ইহা বঙ্গেই সংঘটিত হইতে পারে। বাঙ্গলা আনন্দমঠ ও দেবীচৌধুরাণীর দেশ, সেই অভিনয় বঙ্গেই পুনঃ পুনঃ

* সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত

(২৩) বিনয়-১।১৭৯।

হইয়াছিল। বাঙ্গলার শেষ রাজনৈতিক ডাকাইতি যাহা ১৯১৭ খৃঃ ঘটিয়াছিল তাহা ত্রিশ জন ১৬।১৭ বৎসরের বালকদের দ্বারাই সংঘটিত হইয়াছিল। শুনিয়াছি, তাহারা ছিপে করিয়া দিন দুপুরে প্রকাশ্যে এক গ্রামে গিয়া সেই যায়গার বাজারে যেখানে বারোয়ারীর যাত্রা হইতেছিল সেইখানকার ২০০।২৫০ শ্রোতা-সম্বলিত দলকে ঘেরোয়া করিয়া লুঠ করিয়া চলিয়া আসিয়াছিল; এবং ইহাও শুনিয়াছি যে, হিন্দুর বাটীতে ডাকাইতির সময় গৃহস্থেরা ভয়ে সব বাহির করিয়া দিয়াছে, আর মুসলমানদের বাটীতে ডাকাইতির সময় রক্তপাত হইয়াছে।

ডাকাইতি বা গুপ্তহত্যা বীরত্বের লক্ষণ নয়। বীর জাতিরা এই সব উপায় অবলম্বন করে না, তাহারা সম্মুখযুদ্ধ করে। বাঙ্গলা ডাকাইতির দেশ, সেই জন্যই রাজনৈতিক ডাকাইতির হুড়াহুড়ি হইয়াছিল। ইহার ফলও শোচনীয় হইয়াছিল। ইহার জন্য নিজেদের মধ্যে দলাদলি হয় এবং দুঃখের বিষয় এই যে যাঁহাদের নিকট টাকা লুকাইয়া রাখা হইত তাঁহারা গচ্ছিত অর্থ অনেক স্থলে আত্মসাৎ করিয়াছেন। প্রয়োজন হইলে ইঁহাদের নামও প্রকাশ করিয়া দিতে পারি, যদিও তাঁহাদের নাম এক্ষণে বহুলোকে জানেন।

ডাকাইতি লইয়া বঙ্গে দলাদলি ছিল। উত্তর বঙ্গের দল ডাকাইতির বিপক্ষে ছিল। খবর শুনিয়া যতদূর বুঝিয়াছি, ডাকাইতিটা অনেকের পক্ষে নেশা এবং পরে পেশা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আমার বোধ হয় কোন কোন লোকের কাছে ইহা economic interpretation of historyতে (ইতিহাসের অর্থনৈতিক অনুবাদে) পরিণত হইয়াছিল। এই সব দলের লোকে বলিয়াছেন যে, মহাশয় যেদিন একটা ডাকাইতি বা হত্যা হইয়াছে তার পরেই সেই স্থানে হুড়হুড় করিয়া দলে সভ্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। ইদানীং এই সব বিভিন্ন দল আসলে যুবক সংগ্রহ করিবার দিকে নজর না দিয়া কেবল মাত্র সভ্য শ্রেণী বাড়াইবার দিকে বিশেষ ঝোঁক দিয়াছিলেন। সেই জন্যই যতসব হুজুগে ছোকরা দলে লওয়া হইয়াছিল। ফলে ১৯১৬—১৯১৭ খৃঃ ধর পাকড়ের সময় অনেক ছেলে ধরা পড়িলেই সব গুপ্তকথা বলিয়া দিত। শেষাশেষি বোধ হয় বেশীর ভাগই বাজে মাল লওয়া হইয়াছিল। অন্ততঃ বিদেশস্থ ex-interneeদের দেখিলে আশা বা শ্রদ্ধার উদয় হয় না এবং ইহাদেরও বিদেশে হুজুক করা একটা নেশায় পরিণত হইয়াছে।

(৮)

যে প্রকারে ভারতের রাজনৈতিক চর্চ্চা পরিচালনার কেন্দ্র রাজা রাজড়ার হাত হইতে সরিয়া ক্রমশঃ জনসমূহের নিকট যাইতেছে, সেই প্রকারে বাঙ্গলার স্বাধীনতা পন্থার নায়কত্ব ও পৃষ্ঠপোষকত্ব ব্যারিষ্টার, জমীদার, উকীল ও মধ্যবিত্ত লোকের হাত হইতে বাহির হইয়া ছাত্রবৃন্দের হস্তে ন্যস্ত হইতেছে। আমাদের সময়ে সমাজের উচ্চ স্তরের ব্যক্তি হইতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক ও ছাত্রগণ সকলেই এক স্বাধীনতা মন্ত্রে গ্রথিত হইয়া কার্য্য করিতেন। কিন্তু যখন বোমা ও terrorismএর আবির্ভাব হইল তখন হইতে উপরের স্তরের লোক ক্রমশঃ স্বাধীনতার কর্ম্ম হইতে

চলিয়া যান বা গা ঢাকা দেন। সুতরাং সমস্ত কার্য্য ছেলেদের হাতে ন্যস্ত হয় এবং সেইজন্যে বঙ্গে স্বাধীনতাবাদ Students' movement হইয়াছিল। গণসঙ্ঘ কখনও বৈপ্লবিকদের হাতে আসে নাই। তাহাদের কি উপায়ে হাতে লইতে হইবে তাহা আমরা জানিতাম না, পরবর্ত্তীরাও জানিতেন না এবং বোধ হয় এখনও নেতারা জানেন না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বঙ্গীয় বৈপ্লবিক দলে দলাদলি ছিল। শেষাশেষি ইঁহারা তিন দলে বিভক্ত হন। উত্তরবঙ্গ, পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ। ভারতের বাহিরে যখন আমি কোন বিপ্লববাদীকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, "এত দলাদলি কেন হইল এবং কি করে বাঙ্গলায় হইল", তাহাতে সেই ভদ্রলোকটি উত্তর দিয়াছিলেন যে, "ইহা আপনারাইত করিয়াছিলেন।" কথাটা এই, আমাদের সময়ে একটি বঙ্গব্যাপী দলই ছিল, কিন্তু স্বনামধন্য নেতাদের দোষে ইহা কেন্দ্রীভূত হইতে পারে নাই। কারণ কি কার্য্য করিতে হইবে তাহা লইয়া মতভেদ ছিল। বঙ্গীয় বৈপ্লবিক সমিতির সভাপতি ছিলেন—পরলোকগত ব্যারিষ্টার * * *। ইঁহার মত ছিল যে, লাঠি, ফুটবল খেলা, Boxing ও কুস্তি করা বাঙ্গালীর যুবকদের অবশ্য কর্ত্তব্য এবং ইহা আমরাও মানিতাম, কিন্তু তাহা লইয়াই যে আমাদের চিরকাল পড়িয়া থাকিতে হইবে, ইহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতাম না। আমাদের মধ্যে জনকতক, প্রচার কর্ম্মের উপর বিশের জোর দিতাম। ফলে কলিকাতায় দুইটি দল হইল, যদিচ মিত্র মহাশয় সকলকার উপর সভাপতি ছিলেন। এই বিভাগ যুবকদের মধ্যে natural selectionএর গতি ধরিয়া সংঘটিত হয়। যাঁহারা প্রচারে বিশ্বাস করিতেন তাঁহারা একত্রিত হইলেন এবং ইঁহাদের সাথে "আত্মোন্নতি সভা" রাজনৈতিক কার্য্যে সহকারিতা করিতেন। "যুগান্তর" কাগজ ইঁহাদের দ্বারা পরিচালিত হইত। বাহিরে রহিল * * * পরিচালিত অনুশীলন সমিতি—এই সমিতি প্রচার কর্ম্ম না করিয়া কেবল লাঠিখেলা, ও কুস্তির দিকে নজর রাখিত। এই সমিতি সভাপতি মহাশয়ের প্রিয় ও পৃষ্ঠপোষিত ছিল। তিনি তাঁহার বন্ধুবর্গকে এই সমিতিকে সাহায্য করিতে অনুরোধ করিতেন। উদাহরণ স্বরূপ একটি ঘটনা বলি, যখন আমরা কাহারও নিকট হইতে এক পয়সাও সাহায্য পাইতেছিলাম না এবং অর্থের অভাবে আমাদের কার্য্য প্রায় দেড় বৎসর বন্ধ ছিল, যখন আমরা সব ঘরের খাইয়া বনের মোষ তাড়াইতেছিলাম ও যথাসাধ্য বৈপ্লবিক কার্য্যকে বাঁচাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলাম সেই সময় একবার ৺দেবব্রত বসু ও আমি, একজন ব্যারিষ্টার—যিনি আমাদের দলের এক বড় পাণ্ডা ছিলেন ও এক্ষণে দেশ বিখ্যাত ব্যক্তি, তাঁহার নিকট অর্থ সাহায্যের জন্য গিয়াছিলাম। তিনি স্বীকার করিলেন যে, সভাপতি মহাশয়ের নিকট অর্থ দিবেন। পরে একদিন আমাদের সম্মুখে সভাপতি মহাশয়কে তিনি ৩০৲ টাকা দিলেন, এবং সেই টাকা তৎক্ষণাৎ সভাপতি মহাশয় অনুশীলন সমিতিকে তাহার ঘর ভাড়ার জন্য দিলেন। আমরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া যে টাকাটা জোগাড় করিলাম তাহা আমাদের হাত হইতে ছোঁ মারিয়া অন্যলোকে লইয়া গেল, ইহা দেখিয়া আমরা হতভম্ব হইয়া

যাইলাম। ইহাতেই সভাপতি মহাশয়ের সাথে আমাদের পরোক্ষভাবে বিবাদ। আমরা তাঁহাকে ছাড়িয়াছিলাম; তিনি নামে মাত্র আমাদের সভাপতি ছিলেন কিন্তু আমরা আর তাঁর নিকট হিসাব দিতাম না।

তৎপরে বঙ্গভঙ্গের হাঙ্গামা ও স্বদেশীর বন্যা আসিল, সেই সঙ্গে আমরাও (প্রচারক বিভাগ) গা ঝাড়া দিলাম। এই সময়ে শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ মহাশয় তাঁহার ভ্রাতা বারীন্দ্রকে 'ভবানী মন্দির'-স্থাপনা উপলক্ষে আবার বঙ্গে পাঠাইয়া দেন। সেই সংস্রবে ঘোষ মহাশয়ের বন্ধু ৺সুবোধ মল্লিক মহাশয়ের সাথে আমাদের আলাপ হয়। এই সময়ে পাবনা সম্মিলনীর দল, যাঁহাদের অনেকে আমাদের দলের লোক ছিলেন, তাঁহাদের নেতা যতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও সভাপতির ঝগড়ার কথা সভাপতি স্বমুখে শুনিয়া সন্দেহ দূরীকৃত করিয়া আমাদের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে যোগদান করিলেন। ইঁহারাই উত্তরবঙ্গে কার্য্যক্ষেত্রের প্রসার করিয়াছিলেন। তাহার ফলে, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি ও পাবনা আমাদের হাতে আসে। ইহার অগ্রে আমি গিয়া, কটকে যে ধর্ম্ম লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, তাহা আবার জাগাইয়া একটি বড় আখড়া স্থাপনা করিয়া আসিয়াছিলাম। এই সমস্ত যোগাযোগ একসঙ্গে সংঘটিত হইবার ফলে "যুগান্তর" কাগজ স্থাপিত হয়।

বহুদিন ধরিয়া আমরা কাগজ বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম। কিন্তু ৺সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয় আমাদের টাকার অভাব দেখিয়া কাগজ বাহির করিতে মানা করেন। পরে স্বদেশীর সময় সভাপতি মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, "ছেলেদের ঠাণ্ডা থাকিতে বল, আমরা প্রেস যোগাড়ের চেষ্টা দেখিতেছি"। এই প্রকার স্তোকবাক্যে ১৯০৪—১৯০৫ সাল বহিয়া যাইল। এই সময়ে 'সন্ধ্যা' কাগজ ৺উপাধ্যায় বাহির করিলেন। কিন্তু এই কাগজে ক্রমাগত destructive criticism বাহির হওয়ায় ইহা শিক্ষিত সাধারণের প্রিয় হয় নাই এবং ইহা বৈপ্লবিক মতাবলম্বী না হওয়ায় আমরা বৈপ্লবিক কাগজ—যাহা দলাদলির বাহিরে থাকিবে—বাহির করিবার জল্পনা কল্পনা করিতে লাগিলাম। এমন সময় কবিরাজ মহাশয় বলিলেন যে, "আমরা যদি কাগজ বাহির করি তাহলে রঙ্গপুরের কেন্দ্র ২০০৲ টাকার সাহায্য করিতে বহু পূর্ব্বেই প্রতিশ্রুতি করিয়াছে"। এই 'যুগান্তর' কাগজ বাহির করিবার প্রধান উদ্যোগী বারীন্দ্র, অবিনাশ ও আমি। তৎপরে ১০০৲ টাকা কলিকাতা হইতে পাওয়া যায়। এই প্রকারে ৩০০৲ টাকা লইয়া বুক ঠুকিয়া আমরা মাথা গরমের দল "যুগান্তর" কাগজ প্রকাশ করিলাম। বারীন্দ্র তাহার "বিজলীতে" লিখিয়াছেন যে, যে যুবক তাঁহার সঙ্গে গৌহাটিতে গিয়া রিভলভারের গুলীর দ্বারা নিজে আহত হইয়াছিল, সেই যুবক ৫০০৲ টাকা রঙ্গপুর হইতে আনিয়াছিল, তাহা ঠিক নহে—সেই যুবক ২০০৲ টাকা রঙ্গপুর হইতে আনিয়াছিল।

"যুগান্তর" নাম আমার মনোনীত। দেবব্রত বসুর সঙ্গে অনেক আলোচনা করিয়া এই নাম নির্দ্ধারিত করিয়াছিলাম। এই নামটি ৺শিবনাথ শাস্ত্রীর "যুগান্তর" নামক সামাজিক উপন্যাস

হইতে ধার লওয়া হয়। আমরা অনেকেই ব্রাহ্ম সমাজের ছায়ায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হই; সেইজন্য এই নামটী আমার বিশেষ পছন্দ হয়। শাস্ত্রী মহাশয় যেমন সামাজিক যুগান্তরের চিত্র দেখাইয়াছেন, আমরাও সেইরূপ রাজনৈতিক যুগান্তরের চিত্র দেখাইব ও এই ভাব দেশে আনিব ইহাই আমাদের ইচ্ছা ছিল। 'যুগান্তর' দলের কাগজ ছিল। টাকা সংগ্রহ, মতামত ও প্রবন্ধলেখা সমস্ত কর্ম্মই পার্টির অভিপ্রায় অনুসারে হইত। কাগজ সম্বন্ধে আমাদের মাথার উপরে ছিলেন—অরবিন্দ ঘোষ, দেউস্কর ও 'চ'-মহাশয়।

"যুগান্তরের" পশ্চাতে সমগ্র বঙ্গদেশব্যাপী বৈপ্লবিক সমিতি ছিল। ইহা তাঁহাদেরই কাগজ। এই সময়ে যাঁহারা পি, মিত্রের তাঁবেদার ছিলেন ও যাঁহারা লাঠি ঘুরাইতেন তাঁহারা একদল হইলেন; তাহা ছাড়া বঙ্গের সমস্ত কেন্দ্র আমাদের সাথে ছিল এবং আমরা অরবিন্দ ঘোষের নেতৃত্বে কার্য্য করিতাম। এই প্রকারে বঙ্গে বৈপ্লবিক দলের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে দলাদলির ছায়া প্রকাশ পায়। কলিকাতার অনুশীলন সমিতি, ঢাকার অনুশীলন সমিতি ও মৈমনসিংহের সুহৃদ সমিতি ও তাহাদের শাখা সমূহ পি, মিত্রের direct অধীনে ছিল; তাহা ছাড়া বঙ্গে যে সব বৈপ্লবিক কেন্দ্র ছিল তাহাদের সকলেই আমাদের সাথে অরবিন্দ ঘোষের নেতৃত্বাধীনে কর্ম্ম করিতেন এবং সংখ্যাতেও আমাদের দিকের লোক বেশী ছিল। অথচ বাৎসরিক কন্‌ফারেন্সে সকলেই পি, মিত্রের নেতৃত্বাধীনে মিলিতাম। আশ্চর্য্যের বিষয় ছিল যে, এক সহরে দুই দল ছিল—যথা ঢাকা, মৈমনসিংহ, ইত্যাদি। তখনও সমিতি কেন্দ্রীভূত বা দৃঢ়ভাবে শৃঙ্খলিত হয় নাই। লোকের সম্মুখে বলিতাম * * * আমাদের সভাপতি, কিন্তু তিনি সতীশ ও পুলীন ছাড়া কিছুই বুঝিতেন না। আসল কার্য্যের সময় এই বিভেদ ধরা পড়িত, তখন লোকে বলিত যে, "আপনাদের কার্য্য condinated ও centralised নয়"। আমার বোধ হয় ভবিষ্যতে এই দলাদলির ছায়ায় শেষে তিনটি দল বঙ্গে ক্রমে বিকাশ প্রাপ্ত হয়।

তিন শত টাকা লইয়া আমরা কাগজ বাহির করিয়া কার্য্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলাম। কিন্তু পরে আরও অনেক টাকা পাওয়া যায়। প্রথমে আমরা যখন কাগজ বাহির করি তখন আমাদের অনেকের নিকট টিট্‌কারী খাইতে হইয়াছিল, বড় বড় কাগজওয়ালা আমাদের ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন ও আমাদিগকে upstart বলিয়া যেন কাগজওয়ালারা ভাবিতেন। কেবল একজনমাত্র প্রাচীন লেখক আমাদের সঙ্গে ছিলেন,—তিনি ৺সখারাম দেউস্কর মহাশয়। কিন্তু আমরাও নাছোড়বান্দা ছিলাম; আমাদের মতলব ছিল একবার মুখ খুলে এই বাঙ্গালাকে, তাহার চক্ষুতে অঙ্গুলি দিয়া, সত্যকথা বলিতে হইবে। গুপ্তভাবে কথা চিরকাল চলিবে না। বৈপ্লবিক কার্য্য করিতেই হইবে ও সেই সঙ্গে কাগজ চালাইতেই হইবে। টাকার টানাটানি চিরকাল ছিল। কাগজের কোষাধ্যক্ষ ছিল অবিনাশ, টাকার খবর সে জানে ও অরবিন্দ ঘোষ জানে। টাকার অনাটন হইলে অরবিন্দ ঘোষ ও 'চ'-মহাশয়ের নিকট যাইতাম। যদিও টাকার অনাটন সর্ব্বদাই ছিল, কিন্তু কার্য্যের সময় টাকা পাওয়া যাইত। এই প্রকারে হাতে চলা প্রেস লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়া শেষে আমরা ইলেকট্রিক মেসিনের ছাপাখানা করি।

শেষে টাকাত চারিদিক হইতে আসিত; জেল ও ফাঁসি যাইতে যুবকের দল ছিল, কিন্তু সর্ব্ব কর্ম্মের পাণ্ডা ব্যারিষ্টার, উকিলের দল কোথায় গেল? ভারত রাজনীতির ক্রম বিকাশের ইতিহাসে এই ঘটনাটি একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বস্তু। যখন আমাদের বৈপ্লবিক কার্য্য আরম্ভ হইল, তখন আমাদের কলিকাতার কথায় স্বদেশহিতৈষী ব্যারিষ্টারের দল "গরমদলের" মোড়লি করিয়া গলাবাজি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কেহ কেহ বিপিনচন্দ্র পালের হাতে পড়িয়া "bloodless revolution"এর সুরে সুর গাহিতে লাগিলেন। এই সময় তাঁহাদের নিকট হইতে এক পয়সা সাহায্য পাওয়া যায় নাই। সেই সঙ্গে উত্তর বঙ্গের উকিল দলও গা ঢাকা দিতে লাগিলেন। একবার আমাদের এক বাৎসরিক অধিবেশনের সময়ে উত্তর বঙ্গের কোন এক নামজাদা উকিল ও জমীদারদের নিকট 'চ'-মহাশয় ইন্দ্রনাথকে ও আমাকে কাগজের জন্য অর্থ সাহায্য চাহিবার জন্য দাঁড় করাইয়া দিলেন। আমরা দু'জনে আমাদের অভাব যথাসাধ্য বলিলাম, কিন্তু যখন টাকার সাহায্য চাহিলাম তখন এই ধনাঢ্য নেতারা এদিক ওদিক যে যার শ্রীমুখ ফিরাইয়া লইলেন। 'চ' মহাশয় ইহাতে বড়ই ভগ্নহৃদয় হইলেন। এই উকিল ও জমীদারের দল আবার "যুগান্তর" আফিসে গিয়া খাতা খুলিয়া টাকার হিসাব দেখিতে গিয়াছিলেন, কারণ তাঁহারা ২০০৲ টাকা সাহায্য করিয়াছিলেন। অবিনাশ পরদিন এই খবর আমায় বলে। শুনিয়া আমি জবাব দিই, অবিনাশ তুমি এই·····দের আফিস হইতে তাড়াইয়া দেও নাই কেন, খাতা কেন দেখাইলে? ঐ উকিল মহাশয়ের সঙ্গে এক ৪০,০০০৲ টাকার মুনাফার জমীদার সঙ্গে ছিলেন, যিনি তাহার দুচার দিন আগে আমাকে কোন কার্য্যের জন্য তাহার প্রতিশ্রুত ২০৲ টাকা চাঁদা দেন নাই। পরে কবিরাজ মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "আমরা যুগান্তরের আয়ব্যয় দেখিতে যাইলে অবিনাশ খাতা খুলিয়া দেখাইলে যখন দেখি টাকার আয়ের কথা দূরে থাকুক তাহার খাবার পয়সা পর্য্যন্ত নাই, তখন আমি নিজে তাহাকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দি'।"

ইহাই আমাদের ব্যারিষ্টার, উকিল ও জমীদারদের স্বদেশ প্রেম ও বৈপ্লবিক কর্ম্মে সহায়তা। গায়ে আঁচোড় না লাগাইয়া যেখানে বিনা ত্যাগে মোড়লি করিয়া নেতা হওয়া যায়, সেইখানেই এই স্বনামধন্য মনীষীরা অগ্রসর হন। ইহাকে বলে বুরজোয়া মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞান। প্রাণটা দিবে পরে, আর নিরাপদে থাকিয়া ফলটা খাই আমরা—ইহাই চিরকাল বুরজোয়াদের (Bourgeois) মতলব। সেইজন্য যখন বঙ্গে বোমার আবির্ভাব হইল, টপাটপ গুলী ছুটীতে লাগিল ও ধরপাকড় হইতে আরম্ভ হইল, তখনই এই বুরজোয়ার দল বৈপ্লবিক সম্প্রদায়ের রঙ্গমঞ্চের পশ্চাৎ দিকে আসন গ্রহণ করিতে লাগিলেন। শেষকালে বুরজোয়ারদল বৈপ্লবিক কর্ম্ম হইতে অন্তর্ধান করিয়াছিলেন, এবং ইহা যুবকদের হাতেই ন্যস্ত হয়।

বাঙ্গালার বদনাম যে, সে চারপয়সা চাঁদা বা ভিক্ষা দিলে চারবার চোখ রাঙায় ও টাকার হিসাব দেখিতে চায়। বাঙ্গালীর নেতারাও টাকার হিসাব দেবার পক্ষে নারাজ। আমাদের

ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের ব্যবহারও সেই প্রকারের জঘন্য ছিল। ইহাদের আচরণের সাথে আমেরিকার ভারতীয় মজুরদের আচরণ কত আকাশ পাতাল তফাৎ! তথায় নিরক্ষর মজুরেরা স্বদেশভক্তি বা "গদারের" নামে শত শত ডলার এক কথায় দান করিয়াছে। এই বার্লিন সহরে একবার ভারতীয় বৈপ্লবিকদের যখন আমেরিকান গভর্ণমেণ্ট ডিপোর্ট করিতে চেষ্টা করিতেছিল, তখন তাঁহাদের অর্থ সাহায্য করিবার জন্য আমি ভারতীয়দের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করি। তাহাতে একজন অতি গরিব আফ্রিদি টাকা পাঠান,—যে অর্থাভাবে দিনে একবেলার বেশী খাইতে পায় না, সে নিজের "কৌমের" স্বজাতির জন্য ৩০ মার্ক চাঁদা তৎক্ষণাৎ দেয়। ইহা আমি widow's mite বলিয়া শ্রদ্ধার সহিত মস্তকে তুলিয়া লইয়াছিলাম এবং এ দান আমি জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত
বার্লিন

রেলের 'তার'-বাবু *

(তামরস ছন্দে)

(১)

করে 'টরে টক্কা'টি 'তার'বাবু দিনরাত ;
শুধু করে যৌবনে রাত জেগে দিনপাত।
যত সহকর্ম্মীরা কয় তারে একদিন,—
"বিয়ে করে' বৌ ছেড়ে বাস করা সঙ্গীন্!
ছুটি নিয়ে যাও বাড়ী, বৌদিদি দেখ্‌বোই ;
মাঝে মাঝে নৌতা-তে (১) দিল্ খুশী কর্‌বোই।
কবে যাবে কও আজি, চাই সোজা উত্তর!
বলো শুনি, বন্ধুহে, ভাব্‌ছো কি,—দুত্তর্!"

(২)

ভেবে-টেবে 'তার'বাবু ঠাওরালো এইবার,
হেথা এনে গিন্নীকে পাত্‌বে সে সংসার।
'বড় বাবু'(২) ক'ন শুনে—"হোন তবে তৎপর।
ছুটি নিয়ে যান বাঁড়ী, চাই আসা সত্বর।
দিবারাতি হাড়-ভাঙা কাজ কত সয় আর?
কচি ছেলে, বৌ নিয়ে হোক্ হৃদি গুল্‌জার (৩)।"
কথা শেষে 'মাল বাবু' (৪) কয় হেসে ফিক্‌ফিক্
"বড়বাবু, ঠিক কথা!—সয় শুধু দিক্-সিক্ (৫)।"

* 'তার' বাবু—Signaller.
(১) নৌতা—নিমন্ত্রণ।
(২) 'বড়বাবু'—Station master.
(৩) গুল্‌জার—শোভাময়।
(৪) 'মালবাবু'—Goods clerk.
(৫) দিক্-সিক্—Trouble.

(৩)

বাড়ী এসে 'তার'বাবু ফূর্ত্তিতে মশগুল্ (১)!
মনে ভাবে সংসারে সব যেন মঞ্জুল!
বনে বনে ফুল ফোটে, বাস ছোটে চৌদিক্ ;
মেতে' উঠে' খুশ্‌বুতে (২) সুখ লোঠে সস্ত্রীক্।
শোনে কত প্রাণ খুলে মৌমাছি-ঝঙ্কার!
দীঘি-জলে স্নান করে, রূপ ছাখে জ্যো'স্নার!
খোলা মাঠে গুঞ্জরে, নাই ঘরে তণ্ডুল ;
প্রিয়া কয় ডেকে,—"সব কাজে ভণ্ডুল!"

(৪)

হেসে বলে 'তার'বাবু,—"যাই, আনি জঞ্জাল।
মনে রেখো, সুন্দরি, নই আমি টাক্‌শাল!
ছেলে সবে একটি তো, কন্যাও হয় নাই ;
আমি, তুমি, একছেলে, আজ তবু চম্‌কাই!"
বধূ কহে,—"চুপ করো—বেশ র'ব রায়পুর।
তবু কেন অমনি এ' বুক কাঁপে দুর্‌দুর্!
অকারণে ডান আঁখি আজ নাচে বার বার।
বলো দেখি, মর্‌বো কি! নাই বুঝি নিস্তার!"

(৫)

থুতি নেড়ে কয় স্বামী,—"থাক্ বাজে বোল্-চাল্!
করো কেন প্রাণ-ভরা প্রেম্ প্রীতি পয়্‌মাল(৩)?
টুটে গেলে স্বপ্নটা বাঁচ্‌তে কি কেউ চায়!
তুমি আছ ভাই আছি, শান্তিতে দিন যায়!"
চলে' এল রায়পুরে 'তার'বাবু পরদিন ;
সাদা সিদে লোক ক্রমে হয় শেষে সৌখীন।
টেড়ি কেটে ফিট্‌বাবু, খুব করে সাজ্-গোজ!
হাসি গানে মজ্‌লিসে রয় মেতে হর্‌রোজ।

(৬)

কেটে গেল সপ্তাহ ; একটানা উল্লাস!
শেষে কিনা বৌ করে যম্-জ্বরে হাঁস্-ফাঁস্!
সে যে ছিল কন্যাটি দীন দুখী বিধ্‌বার!
আঁখি বুজে' মা'র লাগি কর্‌তো কি চীৎকার!
আগে থেকে পায় কোথা খুব ভালো ঔষধ?
টাকা পেলে ডাক্তারে কর্‌তো কি প্রাণবধ!
দুনিয়াতে সব চেয়ে হাম্-বড়া (৪) ডাক্তার!
বাঁচো ভালো, নয় মরো, চায় শুধু ভাগ তার!

(৭)

(কোথা সারে খৈরাতী (৫) ঔষধে ব্যায়রাম?
সাদা জাতি কই করে কার্য্যটি নিষ্কাম?
কাঁদা শুনে' সুদখোরে কই করে সুদ মাপ?
সতী কবে বেশ্যারা? ধনী কবে নিষ্পাপ?
বাঙালীরা বীর কবে?—ফুৎকারে চিৎপাত!
কাঙালীরা পায় কোথা দুই বেলা নুন ভাত?
কত ঘৃণা তুচ্ছতা দুঃখীরা সয়, ভাই!
দরদীরা, আয় ছুটে, চাই খাঁটি প্রাণ চাই!)

(৮)

তবে কিরে 'টাইফডে' আটদিনে হয় শেষ!
চলে' গেল লক্ষ্মীটি, ঘুচ্‌লো রে সব ক্লেশ!
পাখা মেলে' প্রাণ্-পাখী যায় উড়ে' শেষরাত!
গেল উড়ে' নাই যেথা ডাক্তারী উৎপাত!
যেথা ধনী নির্ধনে পায় সম সম্মান ;
নারী যেথা নন্দিতা ; নাই পাজি শয়তান ;
পীলে ফাটা, রাজ্‌ভীতি, নাই যেথা ক্রন্দন ;
গেল সেথা—তাই করি আজ তারি বন্দন!

(১) মশ্‌গুল্—ব্যস্ত।
(২) খুশ্‌বু—আনন্দদায়ক গন্ধ।
(৩) পয়্‌মাল—নষ্ট।
(৪) হাম্-বড়া — দাম্ভিক, আত্মাভিমানী, আত্মম্ভরি, স্বার্থপর।
(৫) খৈরাতী—দাতব্য।

(৯)

আঁখি মোছো, চুপ করো, রো'ক্ সুখে স্বর্লোক !
ডেকে কেন আর আনো, সয় কত রোগ শোক !
কেন পুরে' পিঞ্জরে দাও বেঁধে জিঞ্জীর (১) !
সোনা দিয়ে দাও গড়ে' নয় তবু মঞ্জীর !
কেন কাঁদো, আজ ভাবো তার কিসে কল্যাণ !
মায়া-মোহ নাশ করো, দাও তারে নির্ব্বাণ !
কোনো কিছু হয় না তো নিঃশেষে সংহার !
আসা-যাওয়া ফের্ আসা এই তো রে সংসার !

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচা

লছ্‌মী

১

আমাদের যে এদেশী ঝি ছিল তার নাম লছ্‌মী। লছ্‌মী কাহারের মেয়ে—বয়স আঠা
উনিশ, কি ওই রকম। দেখতে সে কিন্তু মোটেই সাধারণ কাহার-মেয়ের মত নয়, রং
মার্জ্জিত, আর মুখে ভদ্র-সুলভ একটা শ্রীও ছিল। অনেক কষ্টে খুঁজে তাকে বার করা গিয়েছিল।

এরা সব ঠিকে কাজ ক'রে, অর্থাৎ সকালে এসে দুপুরে চলে যায়, আবার বিকেলে
রাত্রে যায়। যাদের ও রকম অভ্যাস নেই তাদের অসুবিধা হয় বটে, কিন্তু এদেশে নাচার।

আমার ছোট ছেলেটা লছ্‌মীর এমনি ন্যাওটো হ'য়েছিল যে, একমুহূর্ত্ত তাকে নইলে
চল্‌তোনা। সেই লছ্‌মী যখন একদিন সমস্তদিন এলোনা, তখন ছেলেটা কেঁদে কেঁদে অ
ক'রে তুললে।

তার-পর দিন আসাতেই লছ্‌মীকে খুব একচোট বক্‌লাম, আর একটা পুরো দিন না আস
কি কারণ থাকতে পারে তার কৈফিয়ৎ চাইলাম।

লছ্‌মী একটু সলজ্জ হেঁসে বললে, কাল আমার নিকে ছিল, মাইজী !

আমি ত গাছ থেকে পড়লাম। কথা নেই, বার্ত্তা নেই, নিকে ! আমি বললাম, তো
প্রথম স্বামী বেঁচে আছে, না ?

লছ্‌মী বললে, হাঁ।

(১) জিঞ্জীর—শৃঙ্খল।

আমি বল্‌লাম, তবে নিকে কিরে ?

লছ্‌মী সহজভাবে বললে, সে ত' আমায় নেয় না, তাই মা বললে আবার একটা নিকে করতে।

আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলাম, সে কিরে, স্বামী বেঁচে থাকতে আমার বিয়ে ?

লছ্‌মী এক গাল হেসে বললে, তা আমাদের হয় মাইজী, ওতে কিছু দোষ হয় না !

আশ্চর্য্য এদের সমাজ, আর আশ্চর্য্য এদের প্রবৃত্তি ! মনে মনে করলাম, মানুষের ভেতর যে আদর্শের একটা প্রভাব আছে, তা এদের একেবারেই নেই ! যে নারী মৃত-স্বামীর স্মৃতিটুকু মাত্র সম্বল করে, দীর্ঘ জীবন কৃচ্ছ্র-সাধনে কাটিয়ে দেয়, এও কি সেই নারী-জাতির অন্তর্ভুক্ত ? ভালং ॥ বলে একটা জিনিষ এরা জানেই না, জন্তু-জানোয়ারের সামিল ব'ল্লেও চলে।

নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ-বংশে আমার জন্ম, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বংশে বিবাহ। সুতরাং এই ঘোর আসুরিক ব্যাপারে লছ্‌মীর ওপর কেমন একটা ঘৃণা হ'য়ে গেল ! আমি বল্লাম, তোর হাতে আর জল খাব না, লছ্‌মী !

লছ্‌মী, কাঁদ কাঁদ মুখে আমার পায়ে হাত দিয়ে বল্‌লে, না মা, ওতে আমার কিছু দোষ নেই, আমার ওপর রাগ ক'রোনা।

২

ছাড়িয়ে দেওয়াও চলে না, তা হ'লে খোকাকে রাখা মুস্কিল হবে। তবে জল-খাওয়াটা সম্বন্ধে ওকে যতদূর পারি বাঁচিয়ে চলতে লাগলাম।

সেদিন একটা বিয়েতে গিয়েছিলাম, তার পর ফিরে এসে তাড়াতাড়িতে আমার দামী হারটা একটা খোলা দেরাজের ভেতর রেখে দিয়ে ভাবলাম, আজ রাত হ'য়েছে, কাল সকালে ওকে ঠিক ক'রে তুলে রাখবো। দু'দিন পরে যখন মনে পড়ল, তখন তাকে রাখতে গিয়ে দেরাজে আর খুঁজে পেলাম না !

একেবারে যেন বসিয়ে দিলে, কারণ হারটা শুধু যে দামী ছিল তা নয়, এর 'পয়'-এরও অনেক পরিচয় পেয়েছি ! কে নিলে আমার এ হার ?

চাকর ত' এ ঘরে আসে না, একমাত্র লছ্‌মীই আসে ! তবে নিশ্চয়ই সেই নিয়েছে, আর আশ্চর্য্যই বা কি ! যে স্বামীর বর্ত্তমানে আবার একটা বিয়ে করতে পারে, তার দ্বারাই এ কাজ হওয়া সম্ভব।

তন্ন তন্ন করে সব কটা দেরাজ খুঁজলাম, আরও সম্ভব অসম্ভব জায়গা খুঁজলাম, কিন্তু কোথাও সে হার পাওয়া গেল না।

তখন গিয়ে স্বামীকে বললাম। তিনি আমার সব কথা শুনে বল্লেন, ও তা হ'লে লছ্‌মীরই কাজ। ও-র পেটে এত বিদ্যে ! তা হ'লে পুলিশকে খবর দিই ?

আমি বল্লাম, আর ত, উপায় দেখি নে !

স্বামী বড় চাকুরী করতেন, সুতরাং পুলিশের আসতে দেরী হ'লো না।

দারোগা ওকে ডেকে নিয়ে গিয়ে একটা পাশের ঘরে জেরা করতে লাগলেন। আ পাশের আর একটা ঘর থেকে শুনতে লাগলাম। প্রথমে মিষ্ট কথায় বুঝিয়ে তার পর প্রলো দেখিয়ে তাতেও যখন হ'লো না, তখন এমনি সব কঠিন শাস্তির কথা বল্‌তে লাগলেন যা শু আমারও রোমাঞ্চ হ'তে লাগলো। শুনে লছ্‌মী ভয়ে কাঁদতে লাগলো, কিন্তু কিছুতেই দো স্বীকার করলে না। তার-পর দারোগা বল্লেন ওকে আজ রাত্রে হাজতে রাখতে হবে।

শুনে ভয়ে লছমী কেঁদে উঠে বল্‌লে, আমি একবার মাইজীর কাছে যাবো। হয়ত' আমার কাছে স্বীকার করতে পারে ভেবে দারোগা বল্লেন, আচ্ছা আমি অপেক্ষা করছি, চট্ ক' আস্‌বি।

তাকে দেখেই আমার বুকের ভেতরটা কেমন ক'রে উঠ্‌ল, এক-ঘণ্টায় ও যেন আর লছ্‌মী নেই। চোখ-দুটো লাল হ'য়ে উঠেছে, সে একেবারে দুই পায়ে জড়িয়ে ধরে বল্লে, মাইজি বাঁচাও আমাকে।

আমি বল্লাম, তুই নিস্‌নি ?

সে আমার পা ছুঁয়ে বল্লে, না মা, আমি নিইনি, আমাকে যে দিব্যি নিতে বলো—

তার মুখ দেখে আমার মনে হ'লো হয়ত সে মিথ্যে বলচে না। তার ভবিষ্যৎ নির্য্যাতনে কথা শুনে অবধি আমারও বুকের ভেতরটা কেমন করছিল, আমি স্বামীকে ডেকে বল্লাম, ক যা হয় হবে, আজ-রাত্রে ও আমার কাছে থাকবে, তুমি দারোগাকে বলো।

সুতরাং দারোগা ফিরে গেল।

লছ্‌মী বল্লে, মা, কোথায় হার রেখেছিলে, আমি একবার খুঁজে দেখব।

কথাটা অসঙ্গত বোধ হ'লোনা, যদিও আমি নিশ্চিত ছিলাম যে হার সেখানে নেই। লছ্‌মী খুঁজতে লাগল, প্রত্যেক দেরাজটা বার ক'রে তার আশে পাশে খুঁজতে খুঁজতে বে পড়ল সেই হার।

যে দেরাজে আমি ওটা রেখেছিলাম, তার শেষের দিকের তলার কাঠ খানিকটা ছিল এবং ঠিক সেইখান দিয়েই হারটা নীচে পড়ে আট্‌কে ছিল।

লছ্‌মী হারটা পেয়ে আমার হাতে দিয়ে বল্‌লে, এই ত ছিল মা !

আমি মনে মনে যথেষ্ট অনুতপ্ত বোধ করতে লাগলাম। সম্পূর্ণ নিজের দোষ, ওটা ক'রে না খোঁজ ক'রেই মিছামিছি এই নির্দ্দোষী মেয়েটিকে কত কষ্ট দিয়েছি। আমি লছ আমার কাছে বসিয়ে তাকে আদর ক'রে বললাম, লছ্‌মী, কিছু মনে করিসনে, ওটা আমারই তুই দুঃখ করিসনে।

লছ্‌মী তার দুই হাতে চোখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

ভেবেছিলাম আর ও আসবে না—কালই বোধ হয় চাকরীর শেষ হয়ে গেল। কেননা আমি নিজে হ'লে বো[illegible]রি আসতাম না।

কিন্তু সকাল [illegible]লা যথানিয়ম লছ্‌মীর স্নেহকণ্ঠের ডাক পড়লো 'খোকাবাবু,' আর খোকাবাবুটি অবিলম্বে তার মা[illegible] পর্য্যন্ত ভুলে লছ্‌মীর কোলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল।

আশ্চর্য্য এ[illegible] লছ্‌মী ! তার প্রফুল্ল সহাস্য মুখে কালকার অপ্রীতিকর ঘটনার একটু ছাপ পর্য্যন্ত ছিলনা—ধুয়ে মুছে একেবারে পরিষ্কার। আমি ভাবলাম আমি হ'লে এর জন্যে কত না অভিমান ক'রে থাকতাম, কিন্তু এই মেয়েটা এক রাত্রিতে সব ভুলে গেল। দুর্বোধ্য এর মন !

তাকে ডেকে আমি দুটো টাকা দিলাম, বল্লাম, লছ্‌মী এই নে বখ্‌শিষ, তুই ত খুঁজে হারটা বার করলি ! সে গোড়ায় অনেক আপত্তি ক'রে শেষে আমার অনুরোধে প'ড়ে যখন নিলে, তখন এই ভেবে আমার অনুতপ্ত মন কতকটা সান্ত্বনা পেলে যে, এই টাকাটা ওর-পক্ষে কম নয়, এবং মনে যদি ওর কিছু-মাত্র দুঃখ থেকে থাকে, ত' আর তা থাকবেনা নিশ্চয়ই !

কিন্তু আমি একেবারে অবাক্ হয়ে গেলাম, যখন দেখলাম বিকেলে সে নিশ্চয়ই ওই টাকা দিয়ে, খোকার জন্যে একরাশ পুতুল গাড়ী ঘোড়া আরও সব কত-কি কিনে নিয়ে এসেছে !

৩

খোকার হ'লো জ্বর, এবং এক-দিন দু'দিন ক'রে সে জ্বর যখন সাতদিন পর্য্যন্ত ছাড়লো না, তখন ডাক্তাররা এমন একটা কঠিন পীড়ার নাম করলেন যা আমাদের বসিয়ে দিলে।

ঔষধ চাই, চিকিৎসা চাই, কিন্তু সব-চেয়ে প্রধান জিনিষ হচ্ছে সেবা। কিন্তু সেবা করবার লোকের ভেতর আমার স্বামী আর আমি—তৃতীয় ব্যক্তি নেই। এবং মাত্র আমাদের দু'জনের দ্বারাই বা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর সেবা কতদিন চলতে পারে ?

কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তি হাজির হ'লো স্বেচ্ছায়, না ডাক্‌তেই। সে লছ্‌মী। কোথায় গেল তার দুপুরে সন্ধ্যায় বাড়ী যাওয়া, কোথায় গেল তার ঠিকে-র কাজ ! দিনের বেলাটা সে সংসারের কাজ কর্ম্ম করতে করতে মাঝে মাঝে তার খোকা বাবুকে দেখে যেত, কিন্তু সন্ধ্যার সময় সকাল সকাল নিজের কাজ শেষ করে সে যে সেই খোকার মাথার কাছটিতে মেঝেয় এসে বস্‌ত, আর সমস্ত রাত্রি উঠ্‌তোনা। আমরা যদি তাকে বিশেষ বকা-ঝকা করতাম ত সেইখানটাতেই শুয়ে পড়ে সে ক্ষণেক বিশ্রামের ভান করত, কিন্তু জায়গা ছাড়ত না।

ক্রমশঃ দেখা গেল তার বুদ্ধিও কম নয়। রোগীর খাবার তৈরি করায় সে আমাদের চেয়ে কম সাবধান নয়, এবং যথাসময়ে ঔষধ খাওয়ানতে সে ঘড়ির কাঁটারই মত নিয়মিত। অর্থাৎ স্নেহের যে উৎসের মুখটিতে আঘাত করলে নারী তার স্নেহ-পাত্রের জন্য আপনার জীবন পর্য্যন্ত তুচ্ছ করতে পারে, খোকা লছমীর হৃদয়ের ঠিক সেই-খানটিতেই আঘাত ক'রেছিল। কিন্তু আমার কাছে সবচেয়ে এইটিই বিচিত্র বোধ হ'ত যে, যে ছোট-ঘরের মেয়ের মন এক-স্বামী বর্ত্তমানে

BLOCKED INFORMATION.

দ্বিতীয় বার বিয়ে করতে কোনও দ্বিধা বোধ করেনি, তার গূঢ় অন্তর-প্রদেশে স্নেহের এমনি অপূর্ব্ব ফল্গু-ধারা কোথায় প্রচ্ছন্ন ছিল ?

খোকার অসুখের বাড়াবাড়ির একুশ রাত্রের মধ্যে একদিনও সে চোখ-বোজেনি, এবং প্রহরের পর প্রহর সে তার দুইটি সতর্ক চোখ খোকার মুখের ওপর রেখে তাহাকে পাহারা দিয়েছে। আমাদের এত চিন্তার মধ্যেও মুগ্ধ করে দিত তার এই অপরূপ সেবা। আমাদের কথা হয়েছিল যে কলকাতা থেকে নার্স আনাই, কিন্তু আমরা ভেবে দেখলাম যে কোন নার্স ই এর-চেয়ে বেশী সেবা করতে পারবেনা, এবং রোগক্লিষ্ট খোকাকে এমন খুসী রাখতে পারবেনা। সুতরাং সংসারের কাজ-থেকে তাকে সম্পূর্ণ রেহাই দেবার জন্যে আর একজন ঝি রাখা গেল।

খোকা সেরে উঠার পর সে সাড়ম্বরে তাদের বটতলার গোঁসাইজির কাছে পূজো দিয়ে এসে ব্রাহ্মণ ভোজন করালে। অথচ তার একটি পয়সাও নিলেনা, আমাদের কাঁছ-থেকে কেননা তা হলে নাকি ফল হবেনা।

৪

লছ্‌মী ক্রমশঃ ক্রমশঃ যেন আমাদের পরিবার-ভুক্তর মতই হ'য়ে দাঁড়াল। সে পরিষ্কার বাঙ্গলা বলতে শিখেছিল, আর আচার-ব্যবহারেও আমাদের ধরণ পেয়ে আসছিল।

এমনি ক'রে আরও বছর দেড়েক কাটার পর হঠাৎ এল বদলীর হুকুম। এ হুকুম আসে নাকি অতি সহজে, কিন্তু যে পরিবারটির ওপর আসে তাকে যেন একেবারে নাস্তা-নাবুদ করে দেয়। অথচ শুনি নাকি এ অমোঘ, এবং এর বিপক্ষে কোন কথাই বলা চলেনা।

কিন্তু খোকাকে নিয়ে কি করা যায়! সেত লছ্‌মীকে ছাড়া একদণ্ড থাকতে চায় না, আর তার খাতিরেই লছ্‌মী দুপুরু বেলা বাড়ী যাওয়াও উঠিয়ে দিয়েছে। অথচ দিনের পর দিন সে কেমন করে লছ্‌মীকে ছেড়ে থাকবে তাও ত বুঝিনে।

লছ্‌মীকে বলব সঙ্গে যেতে? কেমন করেই বা বলি! তারও ত নিজের ঘর আছে, দোর আছে, স্বামী, শ্বশুর-শাশুড়ী সবাই আছে। আমার স্বামীকে বললাম, তিনি শুনে বল্লেন লছ্‌মী অনেক ক'রেছে, মানুষে এত করেনা, আমাদের সুবিধার জন্যে তাকে আর ঘর-ছাড়া করোনা, পাঁড়ে হবে। সেখানে না হয় দেখে শুনে সুবিধামত একটা ঝি রাখব, খোকা দিনকতক কাঁদবে, তার-পর বুঝে যাবে।

যুক্তি মিথ্যা নয়, কিন্তু মা-র প্রাণ ছেলেটার কষ্টের কথা মনে করে যে কিছুতেই মানতে চায় না।

কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে লছ্‌মীর কোন দুঃখ দেখ্‌লাম না। অথচ দুঃখ ত' তার কম হবার কথা নয়, কেননা এতে আর সন্দেহ নেই যে, খোকাকে সে সত্যিই ভালবাসে!

কিন্তু কেমন রহস্যময় তার মন জানিনে, এই আসন্ন-বিচ্ছেদের সম্ভাবনা সত্ত্বেও, সে দিব্যি হেসে খেলে বেড়াচ্ছে! নিজের মনকে বোঝালে নাকি? তাও ও পারে, অদ্ভুত ওই মেয়েটা।

[illegible] আগের রাত্রে বল্লাম, লছ্‌মী, কাল ভোর ছটায় গাড়ী, আমরা পাঁচটায় বেরোবো, তুই [illegible] আসিস্ বুঝলি? তা নয়।—

[illegible] খুব ভোরেই আস্‌ব মা।

৫

সবাই মিলে ষ্টেশনে যখন পৌঁছলাম তখনও গাড়ী আসবার প্রায় ঘণ্টা-খানেক দেরী। খোকা লছ্‌মীর কোলে চড়ে ষ্টেশনের সব অপূর্ব্ব পদার্থ আশ্চর্য্য হ'য়ে দেখছে।

আমার স্বামী আরদালীকে ডেকে আমাদের কজনের টিকিট কিনতে দিলেন।

আমি দেখতে গেলাম টিকেট কিনে ফেরবার পথে আরদালীর সঙ্গে লছ্‌মীর রীতিমত একটা ঝগড়া বেধে গেল। তার কাছে সুবিধে না পেয়ে লছ্‌মী আমার কাছে ছুটে এসে বল্লে মা, তোমরা আমার টিকিট কিনলেনা?

আমি বল্লাম, সে কিরে লছ্‌মী, তোর টিকিট কেন, তুই ত যাবিনে।

লছ্‌মী বল্লে হাঁ যাব, যাবনা কে বল্লে, তোমরা নিয়ে যাবেনা আমাকে?

বলে সে অভিমানে ভরা দুই-চোখ দিয়ে আমার মুখের পানে চাইলে! আমাকে সে যেন স্তম্ভিত করে দিলে। তাকে না নিয়ে যাওয়ার-পক্ষে সাবধানে গড়া আমাদের এতদিনকার অমোঘ যুক্তি সব, তার ঐ দুই চোখ যেন নিমিষে ধূলি-সাৎ ক'রে দিলে। আমি বল্লাম তোর স্বামী, ঘর, শ্বশুর শাশুড়ী এদের ছেড়ে—

লছ্‌মী মাথা নেড়ে বল্লে, না আমি যাব—আমি খোকাবাবুকে ছেড়ে কিছুতেই থাকবনা। বলতে বলতে ঝর ঝর ক'রে তার দু' চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগলো।

এমন ক'রেও মায়ের প্রাণে আঘাত করতে পারে এই মেয়েটা। আমারও দু চোখ জলে ভরে উঠল, মনে মনে বললাম, লছ্‌মী তুই কাহারের মেয়ে নোস, তুই আমার নিজের সন্তানের চেয়ে আপন হ'লি! এই তিন-বছরেও তোর মনের অন্ত পেলাম না। তার দুই হাত ধরে, আমার খুব কাছে টেনে নিয়ে এসে বল্লাম, লছ্‌মি সত্যি যাবি?

লছ্‌মী কথা কইতে পারলেনা, ঘাড় নেড়ে জানালে, হাঁ। আমি জিজ্ঞাসা করলাম তোর স্বামীর মত আছে? সে বিস্ময়ে আমার দিকে চেয়ে বললে, আমি যাব তাতে তার অমত হবে কেন?

এমন সময় অদূরে দেখতে পেলাম, লছ্‌মীর স্বামী একটা পুঁটলি মাথায় নিয়ে আসছে। আমাকে দেখতে পেয়ে সে একগাল হেসে পুঁটলিটা রেখে গড় ক'রে প্রণাম ক'রে বল্লে, এইসব লছ্‌মীর কাপড়-চোপড়। তারপর খানিকটা চুপ ক'রে থেমে আবার হেসে ব'ল্লে দু-চার দিনের মধ্যে আমিও যাব মাইজি, আমাকে চাকর রাখতে হবে কিন্তু।

BLOCKED INFORMATION

আমি চুপ করে রইলেম, সমস্ত বুক জুড়ে একটা আরামের আতিশয্যে যেন দম বন্ধ হ
আসছিল। তার-পর দুখ্‌নাকে বল্লাম, হাঁ দুখ্‌না, এসো, নিশ্চয়ই তোমাকে চাকর রাখব।

শুনে সে মহা খুসী হ'য়ে আবার আমাকে প্রণাম করলে।

আরদালীকে ডেকে বল্লাম, লছ্‌মীর টিকিট নিয়ে এসো, সেও যাবে। আর দুখ্‌নাকে যা
ভাড়া দিয়ে দেও।

* * * *

গাড়ী ষ্টেশন ছেড়ে চলতে সুরু করে দিয়েছে। আমি গাড়ীর এক কোনে চুপ্‌চাপ্‌ ক
বসেছিলাম, জলভারাবনত মেঘের মত মনটা স্তব্ধ নিশ্চল হয়েছিল। পুবের জানালা দিয়ে নূ
সূর্য্যের লাল আলো এসে লছমীর মুখে পড়েছিল। খোকাকে সে আপনার বুকের মধ্যে জড়ি
ধরেছে আর গাড়ীর দোলের সঙ্গে দুজনে দোল খাচ্ছে আর হা হা করে হেসে উঠছে!

আমি তার-দিকে চেয়ে ভাবতে লাগলাম, অপরূ এই মেয়ে। কোন গুরু-আদর্শের
একে প্রপীড়িত করেনা, অথচ কত বড় হৃদয়ের অধিকারী এ। দুঃখ একে পীড়া দিতে পারে
এবং আনন্দে এর মন সদাই ঝলমল করছে! একদিন ভেবেছিলাম ভালবাসা কি এ তা
কিন্তু চোখের সামনে দেখ্‌ছি, ওই আনন্দময়ী আজ এই একরত্তি ছেলের ভালবাসার ডাকে স
ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়ল অনিশ্চিতের পথে। ভাবলেম যে ওর মনের এক সিকি অংশও
পেতাম।

চেয়ে দেখলাম সে ততক্ষণে গাড়ীর মেঝেতে বসে রীতিমত পুতুল-খেলার আয়োজন ক'রে
আর তার সঙ্গে সঙ্গে যোগ দিয়ে আমার বড় মেয়ে থেকে আরম্ভ করে ছোট খোকা পর্য্যন্ত সম
আনন্দের কলরোলে প্রভাতের আকাশ পরিপূর্ণ করে তুলছে।

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ

ঝরে যাই

অঝোর ধারায় ঝরে যাই, গুরু গর্জ্জিয়া মন ব্যথাতে ;
পারি নাই, ওগো পারি নাই, সেই প্রবাহে তোমায় মাতাতে,
হারাই আমারে এ ধরায়, ওরে আমারে ডুবাই আমি গো !
হের শুধু মোর ঝর্ঝর ওগো, আমারে ফুরায়ে নামি গো।

জাপানের সামাজিক প্রথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৬)

বিবাহ কথা

যদি আমরা জীবজগতের সৃষ্টি স্বীকার করি, তবে একথা আমরা নিশ্চয়ই বলিতে পারি যে, জীবসৃষ্টির সেই প্রথম মুহূর্ত্ত হইতেই এই জগতে স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ চলিয়া আসিতেছে। আর যদি ইহাকে অনাদি ও অনন্ত বলিয়াও মানিয়া লওয়া যায়, তবুও জোরের সহিতই একথা বলা যায় যে, সেই অনাদি কাল হইতেই স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ সমানভাবে চলিয়া আসিতেছে, বর্ত্তমানে চলিতেছে এবং ভবিষ্যতেও অনন্তকাল ধরিয়া চলিবে। বাস্তবিকই স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধই আমাদের জীবজগতের ধ্রুবতা।

বিবাহ জিনিসটী এই স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধের একটী বিশেষ দিক্। যদিও পুং-স্ত্রী-সম্বন্ধই জগতের স্বাভাবিক ব্যবস্থা, তবুও মানুষ কোন দিনই স্বাভাবিকতায় সন্তুষ্ট নহে; চিরদিনই সে স্বভাবকে একটু কাটিয়া-ছাঁটিয়া নূতন আকার দিয়া গ্রহণ করিতে ভালবাসে। ইহারই উপর মানুষের সমাজ ও সভ্যতা অনেকখানি গড়িয়া উঠিয়াছে। এখানেও মানুষ তাই এই স্ত্রী-পুরুষের স্বাভাবিক সম্বন্ধের উপর একটী নিয়ম স্থাপন করিয়া তাহাকে নূতন আকার দিয়া গ্রহণ করিয়াছে। এইটী না করিলে নিজেদের খেয়াল অনুসারে আজ একজনের সহিত কাল আবার অন্যজনের সহিত স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর সম্বন্ধ ঘটা একটুও অসম্ভব ছিল না এবং মানবের নীতিধর্ম্ম অনুসারে ইহা অত্যন্ত গর্হিত। হয়ত আদিম কালে সমস্ত দেশেই এইরূপ ব্যবস্থাই ছিল, কিন্তু মনুষ্য-সমাজের উন্নতি ও তাহার নীতিধর্ম্মের উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধের উপর ধীরে ধীরে একটী নিয়ম গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহারই নাম বিবাহ।

এই বিবাহের মধ্য দিয়া স্ত্রী-পুরুষের যে সম্বন্ধ ঘটে তাহা একদিনের নহে, চিরদিনের সম্বন্ধ।

মানুষের সমাজে বিবাহের প্রয়োজন কোথায়, তাহা আমরা সকলেই জানি। তবুও বিশ্লেষণ করিয়া প্রয়োজনের সেই ক্ষেত্রগুলি দেখাইয়া দিতে গেলে আমরা মোটামুটি তিনটী ক্ষেত্র খুঁজিয়া পাই।

বিবাহার্থী যুবক যুবতী নিজেরাই ইহার প্রথম এবং প্রধান ক্ষেত্র। গোত্র ও বংশ ইহার দ্বিতীয় ক্ষেত্র, আর স্বসমাজ ও স্বদেশই ইহার তৃতীয় ক্ষেত্র।

প্রথমটীর সম্বন্ধে বলিতে গেলে এই বলা যায় যে, স্ত্রী-ই বল, আর পুরুষই বল, একমাত্র বিবাহই উভয়ের মনুষ্যত্বকে সম্পূর্ণরূপে অভিব্যক্ত করিয়া তুলে। বাস্তবিক, বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত

BLOCKED INFORMATION.

স্ত্রী ও পুরুষ—উভয়ই অসম্পূর্ণ,—উভয়ই অর্দ্ধেক; বিবাহের পরেই তাহারা যথার্থরূপে সম্পূর্ণ প্রাপ্ত হয়। ইহা কেবল আমার কথা নহে, ভারতের প্রাচীন আদর্শও ইহাই। "যা বিন্দেত জায়াং তাবদর্দ্ধং ভবেৎ পুমান্"—আপনাদের শাস্ত্রগ্রন্থের এই সুন্দর শ্লোকার্দ্ধটী নিশ্চয় আপনারা শুনিয়াছেন।

যৌবনই জীবনের কেন্দ্র বা মধ্যবিন্দু। বিবাহ হইতেছে এই যৌবন ধর্ম্ম; কাজেই বিবাহে পূর্ব্বযুগ হইতেছে যুবক যুবতীর শিক্ষা দীক্ষার যুগ। এই সময়ের মধ্যে সাধারণ জ্ঞানের জ কিছু লেখাপড়া, সামাজিক আচার-ব্যবহার, ও গৃহকর্ম্মে দক্ষতা, জীবন পথের সাধারণ সম্বলরূ অন্ততঃ পক্ষে এই কয়টী বিষয়েও প্রত্যেককে অভিজ্ঞ হইতে হয়। এইরূপে জ্ঞানে ও কর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া বিবাহের পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ হইলেই মানুষ সামাজিক মানুষ বলিয়া গণ্য হয় কাজেই মানুষের যৌবনজীবনে বিবাহের প্রয়োজন যে কতখানি, তাহা আর বলিয়া শেষ ক যায় না।

এখন দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বিবাহের প্রয়োজন কতটুকু তাহা আমরা আলোচনা করিয়া দেখি উপনিষদের একস্থলে সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলা হইয়াছে, "সেই এক পরমাত্মা জ্যো ইচ্ছা করিয়াছিলেন আমি বহু হইব, আমি প্রকৃষ্টরূপে জন্মগ্রহণ করিব।"* তাঁহার এই ইচ্ছা ফলেই এই বিচিত্র বহুরূপী সৃষ্টি অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। পরমাত্মার এই বহু হইবার ইচ্ছ যেন প্রতি জীবাত্মার হৃদয়েই অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে। ইহারই ফলে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে আপনা বহু ও ব্যাপক করিবার ইচ্ছা মানুষের জাগিয়াছে। মানুষের এই ইচ্ছাই আজ তাহার সমা গোত্র ও বংশের আকারে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই গোত্র বা বংশের প্রতিষ্ঠা করিতে হই বা তাহার শুদ্ধি বজায় রাখিয়া চিরস্থায়িত্ব বিধান করিতে হইলে, মানুষকে বিবাহ বন্ধন স্বী করিতেই হয়। বিবাহ দ্বারা স্ত্রী-পুরুষের দাম্পত্যমিলন না ঘটিলে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে বংশধারা ব্যাপ ও বিস্তৃত হইতে পারে না।

"পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" পুত্রের নিমিত্তই পত্নীগ্রহণ—ভারতীয় ধর্ম্মনীতির এই মর্ম্মকথা গোত্র ও বংশের দিক্ দিয়া, বিবাহের প্রয়োজনের কথা ইঙ্গিতে প্রকাশ করিতেছে। আরও আপনা অনেকেই জানেন যে, এদেশে প্রাচীন কাল হইতেই বাৎস্যায়নের কামসূত্র, কল্যাণ মালার অনঙ্গর যতীশ্বরের পঞ্চশায়ক, কুঠিমাত্রের তন্ত্র ইত্যাদি অনেকগুলি কামশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ আছে দম্পতিদের পুত্রোৎপত্তি বিজ্ঞানই ইঁহাদের প্রত্যেকটীর আলোচ্য। ইহাতেও আমরা বুঝিতে পা যে, ভারতবর্ষে পুত্রোৎপত্তি দ্বারা বংশের চিরস্থায়িত্ব বিধানই বিবাহের উদ্দেশ্য। বিবাহের আদর্শ কেবল যে ভারতেরই তাহা নহে, পৃথিবীর সকল দেশেই এইরূপ। কাজেই গোত্র ও বংশ দিক দিয়া বিবাহের প্রয়োজন যে কত অধিক, তাহাও বলা নিষ্প্রয়োজন।

* তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয় ইতি; ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৬।২।৩

এখন স্বসমাজ ও স্বদেশের দিক দিয়া বিবাহের প্রয়োজন সম্বন্ধে আমরা কিছু আলোচনা করিতে চাই। ইহাই আমাদের পূর্ব্বকল্পিত তৃতীয় ক্ষেত্র। সমাজ বা স্বদেশ বলিতে আমরা যাহাই বুঝি না কেন, আসলে উহা কতকগুলি ব্যক্তির সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নহে। অবশ্য ঐ সমষ্টিটী কোন একটী 'ঐক্যের' উপরে গঠিত হওয়া চাই। কোথাও সেই ঐক্যের ক্ষেত্র হয় ধর্ম্ম, কোথাও বা বর্ণ; কখন আচার ব্যবহার, কোথাও বা আকার প্রকার। আবার এই সমষ্টি কোথাও গোত্র বংশ প্রভৃতি বিবিধ স্তরের মধ্য দিয়া বিপুল হইয়া উঠিয়াছে, কোথাও বা কেবল ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির মিলনেই তাহা চরিতার্থ হইয়াছে। প্রথম ক্ষেত্রে বিবাহের প্রয়োজন শুধু দম্পতিদের নিজেদের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তাহা আর একটু ব্যাপক হইয়া পিতা মাতা পুত্রপৌত্র ক্রমে নিকট আত্মীয়স্বজনের মধ্যে বিস্তৃত হয়। তৃতীয় ক্ষেত্রে এই আত্মীয়স্বজনেরও গণ্ডী অতিক্রম করিয়া একেবারে স্বসমাজ ও স্বদেশের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে।

পূর্ব্বে আমরা বলিয়া আসিয়াছি যে, বিবাহ দ্বারাই মানুষ সামাজিক মানুষ বলিয়া গণ্য হয়। বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সমাজের সহিত কাহারও প্রত্যক্ষ যোগ থাকে না। যে অবিবাহিত, সমাজের কোন কর্ত্তব্য, কোন দায়িত্ব, তাহার উপর নির্ভর করে না। প্রাচীন ভারতেও এই ব্যবস্থাই দেখিতে পাই। ব্রহ্মচারীদের বিবাহ করিয়াই গৃহী হইতে হইত; গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিয়াই তাঁহারা সামাজিক কর্ত্তব্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিতেন। আত্মীয়স্বজনের সহিত যোগস্থাপনই বল, বা যাগাদি ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠানই বল, অবিবাহিতের কিছুতেই অধিকার নাই। আসল কথা, গৃহী না হইলে, বিবাহিত না হইলে, গার্হস্থ্যাশ্রমের কোন কর্ত্তব্যেই কাহারও অধিকার থাকিবে না।

সমাজ ও স্বদেশ এ দুই যদি ব্যক্তির সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়, তবুও সমাজ অপেক্ষা স্বদেশ আরও বৃহত্তর সমষ্টির দ্বারা গঠিত হয়। আমরা যাহাকে স্বদেশ বলিতেছি, ইহার ঠিক ইংরাজী প্রতিশব্দ নেশান (Nation)। এই নেশানের অনুবাদে বাঙ্গালায় কেহ কেহ জাতিশব্দ ব্যবহার করেন। কিন্তু জাতিই বল, আর স্বদেশই বল, কোনটীতেই নেশানের প্রকৃত ভাবটুকুর অনুবাদ হয় না। না হইবার প্রধান কারণই এই যে, এই জিনিসটী কোনদিনই এদেশে ছিল না। এই জন্যই স্বজাতি বা স্বদেশের দিক্ দিয়া বিবাহের প্রয়োজনীয়তার অংশ এদেশে তেমন পরিস্ফুট নয়। স্বজাতি বা স্বদেশের পক্ষে বিবাহের প্রধান প্রয়োজনই হইতেছে এই যে, শিশুজন্মের দ্বারা জাতির সমষ্টিশক্তিকে বাড়াইয়া তোলা। যে দেশের জনসংখ্যা যত অধিক সে দেশের সমষ্টিশক্তি যে তত বড়, ইহা নূতন কথা না হইলেও একেবারে খাঁটি সত্য। তবে এখানে একটা প্রশ্ন আসিতে পারে এই যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই যে জাতির শ্রেষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইবে এমন কি কথা? জাতি যদি শিক্ষায় হীন হয় তবে সংখ্যায় বড় হইয়াই বা কি ফল? কথাটী সত্য বটে; কিন্তু এ প্রশ্ন আজকাল চলে না; সকল সভ্য দেশেই এখন শিক্ষা বিস্তারের এতই বিবিধ প্রণালী ও পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে যে, যুবকদিগের শিক্ষার অভাবে একান্তই হীন হইয়া থাকা একেবারেই

BLOCKED INFORMATION.

অসম্ভব। কাজেই বর্ত্তমান কালধর্ম্ম অনুসারে একথা এখন জোর করিয়াই বলা চলে যে, বি
দ্বারা জনসংখ্যাবৃদ্ধির উপরই স্বদেশের বা স্বজাতির উন্নতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে।

এমনকি অনেক সময় ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে, শিক্ষা বিস্তারের অপেক্ষা সংখ্যা বৃ
জাতীয় উন্নতির পক্ষে অধিক উপযোগী। এ বিষয়ে দৃষ্টান্তস্বরূপ ফ্রান্স দেশের উল্লেখ ক
যাইতে পারে। আপনারা সকলেই জানেন যে, এই দেশটী প্রথম শ্রেণীর সভ্য দেশের ম
গণনীয়। এখানে শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিবিধ প্রণালী ও পদ্ধতির মোটেই অভাব নাই। ি
তবুও দেশটী যেন দিন দিন অধঃপাতের অভিমুখেই ধীরে ধীরে চলিয়াছে বলিয়া মনে হয়। ই
কারণ কি? ফ্রান্স দেশবাসীদের মত আয়েসী জাতি বড় একটা দেখা যায় না। ইহা
বিলাসিতার কথা সকল দেশেই কিংবদন্তীর মত প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। এদেশের দম্পতি
এতই বিলাসী যে, নিজেদের জীবন সুখে কাটাইবার জন্য কৃত্রিম উপায়ে সন্তান জন্মের সংখ্যা
করিবার চেষ্টা করে; এবং এই একই উদ্দেশ্যে বিবাহ করে না এমনও ঢের লোক এদেশে দে
পাওয়া যায়। এই জন্যই এখানে মৃত্যু সংখ্যা অপেক্ষা জন্ম সংখ্যা দিন দিন হ্রাস হওয়ায় এদে
অবনতি ঘটিতেছে।

কিন্তু আমাদের জাপানে ঠিক ইহার বিপরীত। সেখানে প্রতিবৎসর মৃত্যু স
অপেক্ষা জন্ম সংখ্যা পাঁচলক্ষ অধিক; এই এক বৎসরের হিসাব দেখিয়া আমাদের দে
জন্ম সংখ্যা যে কিরূপ দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহা আপনারা কতকটা বু
পারিবেন। অবশ্য দরিদ্রের বহু সন্তানলাভ অনেক সময় দুর্ভাগ্যের চিহ্ন বলিয়া মনে
হয়। কিন্তু আমাদের দেশে এই সকল দরিদ্র সন্তানদের শিক্ষা দীক্ষার ব্যবস্থা কেবল
পিতামাতার উপরই নির্ভর করে না, পিতামাতা অসমর্থ হইলে সামাজিক সাহায্যেরও রীতি
বন্দোবস্ত আছে। কাজেই আমাদের দেশে দরিদ্রের বহু সন্তান হইলেও তাহারা কখন খাদ্য
শিক্ষাদীক্ষার অভাবে অমানুষ হইয়া উঠে না। এইজন্য জন্মসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াকে আমরা আমা
দেশের উন্নতির পক্ষে এক বড় কারণ মনে করিয়া খুব সন্তুষ্ট আছি।

বৎসর দুই পূর্ব্বে মার্কিণ দেশের একজন বিখ্যাত রমণী সন্তান জন্মের সংখ্যা
করাইবার জন্য আমাদের দেশে প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন; ইঁহার নাম মিসেস্ মার্গা
সানগার (Margaret Sanger)। ইনি আমাদের দেশে কয়েক মাস থাকিয়া নিজের মত
করিয়াছিলেন; কিন্তু সুখের বিষয়, কেহই তাঁহার কোন কথা কাণে লইত না। ইহাতে
প্রৌঢ়া রমণী অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া জাপান পরিত্যাগ করিয়া কোরিয়া ও চীন দেশে প্রচারার্থে
করিয়াছিলেন।

এ পর্য্যন্ত আমি অনেক বাজে কথা বলিয়া আসিয়াছি; কিন্তু সে সব গুলিরই মর্ম্ম হই
এই যে, জন্ম সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াই সকল দেশের পক্ষেই উন্নতির একটী প্রধান কারণ

বিবাহবন্ধন স্বীকার করিতেই তাহা সম্ভব হয় বলিয়া স্বদেশ বা স্বজাতির উন্নতির পক্ষে বিবাহের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতে হয়।

বলক্ষণ ধরিয়া কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে বিবাহের প্রয়োজন কতটুকু, তাহা মোটামুটি বলা হইল। এগুলি ছাড়াও বিবাহের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলা যায়। এদেশে দেখিতে পাই আ প্রাচীনকা হইতেই বিবাহকে স্ত্রীপুরুষের একটী প্রধান সংস্কাররূপে গণ্য করা হয়। যাহা দোষ নষ্ট করিয়া গুণের অধিকারী করে, সংস্কার শব্দের তাহাই হইতেছে স্থূল অর্থ। বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া যুবক যুবতীদের যে কিরূপ সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ ঘটে ইহা জাপানীদের প্রত্যেকেরই চোখে সত্য। ইহা ছাড়াও অবশ্য ধর্ম্মশাস্ত্রের মতে বিবাহের অনেকখানি আধ্যাত্মিক উপযোগিতাও স্বীকার করা হয়। এইসব কারণে বিবাহ স্ত্রীপুরুষের একটী প্রধান সংস্কার। এদিক দিয়াও বিবাহের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত হইতেছে।

ব্যষ্টি ও সমষ্টি পক্ষে সমান প্রয়োজনীয় এই বিবাহ ব্যাপার সব দেশেই সব জাতির মধ্যেই চলিত আছে; তবে ইহার অনুষ্ঠান প্রণালী সর্ব্বত্র একরূপ নহে, দেশভেদে ও জাতিভেদে কিছু পার্থক্য দেখা যায়। আমাদের দেশে এই বিবাহের অনুষ্ঠানপ্রণালী কিরূপ এইবার তাহার কথা বলিব।

ক্রমশঃ

শ্রীআর, কিমুরা

ভারতীয় চিত্র পরিচয়

গুপ্ত ও পাল রাজগণের সময়ে ভারতীয় সভ্যতা প্রফুল্ল হইয়া চারিদিক আমোদিত করিয়াছিল। সে সময়ের অবশেষ, বর্ত্তমানে সুদুর্লভ নয় এমন সুন্দরশ্রী, ধ্যানপরিণত, পুণ্যসঞ্চয় পাষাণ মূর্ত্তির কথা রাখিয়া এবং চিত্রকর্ম্মের অবশেষ দেওয়াল চিত্র ও পুঁথিপত্রচিত্রের কথা বাদ দিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধে শুধু প্রাচীন সাহিত্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত চিত্র-সম্পর্কীয় উল্লেখের ভিতর দিয়াই প্রাচীন ভারতীয় চিত্র পরিচয়ের চেষ্টা করিব।

মধু কৈটভ বেদ অপহরণ করিলে ব্রহ্মা মধুনিসূদনের শরণ লইলেন। অসুরদলন নারায়ণের অঙ্গভঙ্গিমাদর্শনে লক্ষ্মী এমনই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তাঁর কাছে সে ভঙ্গী নৃত্যের মত সুন্দর লাগিয়াছিল। ত্রৈলোক্যানুকরণ এই নৃত্যের ভার কেশবের তুষ্টি ও অর্চ্চনার জন্য ব্রহ্মা গ্রহণ করিয়া শিবের উপর দিয়াছিলেন। নারায়ণের সেই সুললিত অঙ্গভঙ্গিমার পুনরভিনয় দর্শনেচ্ছাই নৃত্যের প্রবর্ত্তনের কারণ।

BLOCKED INFORMATION.

"যথা নৃত্যে তথা চিত্রে ত্রৈলোক্যানুকৃতিঃ স্মৃতা

* * * * * * *

তএব চিত্রে বিজ্ঞেয়া নৃত্যং চিত্রং পরং মতম্।"

(বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরম্।)

যেমন নৃত্যে তেমনই চিত্রে ত্রৈলোক্যের যাবতীয় বস্তুর অনুকরণ হইয়া থাকে। নৃ
চিত্র পরম সামগ্রী। ত্রৈলোক্যের যাবতীয় সুন্দর বস্তুকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা হইতেই নৃ
চিত্রের উদ্ভাবনা। এখন বিচার্য্য নৃত্য উদ্ভাবনের ঠিক পরেই চিত্রকর্ম্মের প্রচেষ্টা ও প্রবর্ত্তন কি
উদ্ধৃত শ্লোকে প্রাচীন ভারতীয় চিত্রশিল্পের চিত্রসূত্র সূচিত হইয়াছে।

'তাঞ্জুর' গ্রন্থমালাভুক্ত 'চিত্রলক্ষণ' পুস্তিকাতে ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে উল্লিখিত চিত্র
উৎপত্তি বিষয়ক আখ্যায়িকা গুলির উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন বোধ করিলাম।

ভারতীয় চিত্রকলার একটী স্বাধীন সূত্র ছিল। ("অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি চিত্রসূত্রং তবানঘ
ইহাতে বুঝা যায় যে ভারতীয় চিত্রচর্চ্চা বেশ পরিণত অবস্থায় পৌঁছিয়াছিল। কারণ
পরিণত না হইলে তার যেমন একটা ব্যাকরণ গড়িয়া উঠিতে পারে না, তেমনই কোন একটী
পরিণত না হইলে তার একটা সূত্র পড়িয়া উঠে না। পরিতাপের বিষয় চিত্রচর্চ্চার মূল গ্রন্থ এ
পর্য্যন্ত না মিলাতে চিত্রসূত্রের সবিশেষ পরিচয় এখনও পাওয়া যায় নাই। সম্প্রতি 'বিষ্ণুধর্ম্মো
গ্রন্থে ইহার সন্ধান মিলিয়াছে।

স্মিথ সাহেবের মতে ভারতীয় চিত্রকলা শুধু ধর্ম্মের ক্রীতদাস ছিল এবং শুধু চিত্র
আনন্দ উপভোগ করার জন্যই যে চিত্রচর্চ্চা তাহা হিন্দুদের মধ্যে ছিল না; একথা সত্য
চিত্রবিদ্যার স্বাধীন সূত্র একটা গড়িয়া উঠিয়াছিল। ধর্ম্মের গণ্ডীর বাহিরেও চিত্রচর্চ্চার
ছিল তার পরিচয় আমরা নানা সংস্কৃত গ্রন্থে পাই। রামগড় গুহা গাত্রে এমন অনেক ছবি
গিয়াছে যাহা চিত্রকলার ধর্ম্মের দাসত্ব জ্ঞাপন করে না। আদৌ দেবদেবীর মূর্ত্তি নয় ন
প্রেমের ছবি নাটকের জন্য প্রদত্ত গুহা গাত্রে খোদিত দেখা যায়।

প্রাচীন সাহিত্যে ভূরি ভূরি উল্লেখ হইতে আমরা চিত্রচর্চ্চার বহুল প্রসারের কথা জ
পারি। চিত্রলেখা, কলাবতী প্রভৃতি নাম পুরাতন প্রসঙ্গে বিরল নয়। রত্নাবলী, বিদ্ধশালভ
রঘুবংশম্, শকুন্তলম্, উত্তররামচরিতম্ প্রভৃতি গ্রন্থে চিত্রসম্পর্কে যথেষ্ট উল্লেখ পাওয়া
রত্নাবলীতে আছে "চিত্ত সালিয়া দুয়ারে উপবিট্‌ঠ-বসন্তও;" "জহ তুএ মদনো আলিহি
মুত্র রতি আলিহিদা।" ইত্যাদি। বিদ্ধশালভঞ্জিকাতে আমরা চিত্রশালার কথা পাই।
রাজা নায়িকার ছবি দেখিয়া বলিতেছেন ঃ—

সুতনুরিয়মিতস্ততশ্চ চিত্রে গুণগুরুরত্না চ শালভঞ্জিকেয়ং
স্থিতমিহ সুতনোর্বপুশ্চতুর্ধা স্মরশরতাপরুজং বিভজ্য সোঢ়ুম্।

রাণীর ভয়ে রাজা নায়িকাকে ঘরে আনিতে পারেন নাই, তাই তিনি চিত্রশালায় তার চিত্র রাখিয়াছেন; আর তা এমনই ভাবে রাখিয়াছেন যে সে ঘরের চারিদিকে বড় বড় আয়নাতে তার চারিটী প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। তিনি বসিয়া যে দিকেই চাহিবেন সে দিকেই দেখিবেন তাঁর গুণগুরু সেই নায়িকা। আহা, মদনতাপ ভাগ করিয়া বহন করার জন্যই যেন নায়িকা চারিমূর্ত্তিতে প্রকট হইয়াছেন। কারণ এক মূর্ত্তিতে যে সে তাপ সহিতে পারিবে না।

[illegible] উল্লিখিত "তথাপি তস্যা লাবণ্যং রেখয়া কিঞ্চিদন্বিতম্" রেখাবিদ্যার সম্যক্ পরিণতি [illegible] জ্ঞাপন করিতেছে।

কেহ কেহ ভাবেন যে ভারতে প্রাকৃতিক দৃশ্য অঙ্কনের প্রথা ছিল না। এ বিষয়ে প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যেই খোঁজ লওয়া যাক্, যেহেতু এখন গত্যন্তর নাই।

'রঘুবংশম্' এর—

"তয়োশ্চিরাৎ প্রার্থিতমিন্দ্রিয়ার্থান্
নাসেদুষোঽপ্যন্তরমস্য চিত্রবৎসু।
প্রাপ্তাঃ সুখান্যপি দণ্ডকেষু—
সঞ্চিন্ত্যমানানি সুখান্যভূবন্॥"

এই শ্লোকে বিবিধ চিত্রভূষিত রাজপ্রাসাদের কথা পাই। সে চিত্রগুলি ছিল দণ্ডকবনের নানা দৃশ্যের ও ঘটনার।

তারপর 'উত্তর রামচরিতম্'-এর 'চিত্রদর্শন' কত কত সুন্দর স্বভাবের ছবির বর্ণনায় ভরা দেখিতে পাই ঃ—

"সীতা—

বচ্ছ এসো কুসুমিদক অম্বতরুত্তণ্ডবিদবরহিণো। কিনাম হেও গিরী জথ অনুভাব সোহগ্‌গমেত্ত পরিসেস ধূসরসিরী মুহুত্তং মুচ্ছন্তো তুএ পরুন্নেণ অবলম্বিদো তরুঅনে অজ্জউত্তো আলিহিদো।"

(বৎস, এই কুসুমিত কদমগাছ, আর তাতে ময়ূরেরা নেচে নেচে বেড়াচ্ছে, ইত্যাদি।)

"লক্ষ্মণ—

অয়মবিরলানোকহনিবহনিরন্তরস্নিগ্ধনীলপরিসরারণ্যপরিণদ্ধগোদাবরীমুখরকন্দরঃ সতত-মতিষ্যন্দমানমেঘমেদুরিতনীলিমা জনস্থানমধ্যগো গিরিঃ প্রস্রবণঃ।" (ঐ অবিরল বৃক্ষ সমাকুল নিরবচ্ছিন্ন নীলস্নিগ্ধপ্রান্ত বনভূমির মাঝে হারাধারা গোদাবরীর কল কল নাদে মুখর যার গুহা সমুদয় আর সততবর্ষণশীল-মেঘশীতল নীলিমা যায় সেই এই জনস্থান মধ্যবর্ত্তী প্রস্রবণ নামে গিরি।)

BLOCKED INFORMATION.

"রাম—

দেবি, রমণীয়মেতৎ সরঃ,

এতস্মিন্ মদকল মল্লিকাক্ষ-পক্ষব্যাধূত স্ফুরদুরুদণ্ডপুণ্ডরীকাঃ
বাষ্পান্তঃপরিপতনোদ্গমান্তরালে সন্দৃষ্টাঃ কুবলয়িনো ভুবো বিভাগাঃ।"

(দেবি, রমণী এই সরোবর ; এখানে মল্লিকাক্ষ শুক্ল হংসের 'পৎ পৎ' পক্ষচালন শ্বেতপদ্মগুলির ডাঁটা কাঁপছে, চোখে জল আসা ও পড়ার মাঝে যে ফাঁকটুকু কেবল তত্ সময়ের জন্য নীলোৎপল-সমাকুল পাঁকাল জলভূমির নজর হচ্ছে।)

"লক্ষ্মণ—

সোঽয়ং শৈলঃ ককুভস্সুরভি র্মাল্যবান্ নাম যস্মিন্
নীলস্নিগ্ধঃ শ্রয়তি শিখরং নূতন স্তোয়বাহঃ।"

প্রাকৃতিক দৃশ্য অঙ্কনের প্রথা যে ভারতে প্রচলিত ছিল তাহা পূর্ব্বধৃত বিষয়গুলি হ কতকটা বুঝা যায়।

এখন দেখা যাক, প্রাকৃতিক দৃশ্য অঙ্কনের প্রণালী সম্বন্ধে শাস্ত্রে কিছু নির্দ্দেশ আছে 'বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরম্' গ্রন্থে আকাশ, জলা, পর্ব্বত, গুহা, কান্তার, নির্ঝর, নগর, রাত্রি, সন্ধ্যা, প্র বসন্তাদি ঋতু সমুদয় ইত্যাদির দৃশ্য অঙ্কনের বিশেষ বিশেষ নির্দ্দেশ আছে :—

"আকাশং দর্শয়েদ্বিদ্বান্বিবর্ণং খগমাকুলম্। তথৈব দর্শয়েদ্রাজং স্তারকামণ্ডিতং দি ভূমিঞ্চ জাঙ্গলানূপমিশ্রাং স্বৈঃ স্বৈস্তথাগুণৈঃ। পর্ব্বতং তু শিলাজালৈঃ শিখরৈর্ধাতুভি র্দ্রু নির্ঝরৈর্ভুজগৈশ্চৈব দর্শয়েন্নৃপসত্তম। বনং নানাবিধৈর্বৃক্ষৈর্বিহঙ্গৈঃ শ্বাপদৈস্তথা। দর্শয়েদ্বিদ্বাননন্তে র্মৎস্যকচ্ছপৈঃ। * * * সচন্দ্রগ্রহনক্ষত্রাং তথা দর্শিতলৌকিকাম্। আসন্নত রাত্রিং দর্শয়েৎ সুপ্তমানবাম্। * * * সারুণো ম্লানদীপশ্চ প্রত্যূষো রুতকুক্কুটঃ। দ্বিজৈ র্নিয় যুক্তাং রক্তাং সন্ধ্যাং প্রদর্শয়েৎ। * * * তোয়নম্রঘনৈর্যুক্তাং সেন্দ্রচাপবিভূষণৈঃ। বিদ্যুদ্বি ত্রৈর্যুক্তাং প্রাবৃষং দর্শয়েত্তথা।" ইত্যাদি।

এখন দেখা যাক্, ভারতীয় চিত্রকলায় বস্তুতন্ত্রতা বা স্বভাবানুকরণ ছিল কিনা। যে জিনিষ সচরাচর চোখে পড়ে না কেবল সেগুলিরই অঙ্কনের জন্য শাস্ত্রীয় রীতি আছে ; সা লোকের ভাগ্যে কপ্পলতা ও সিংহ, ব্যাঘ্র, প্রভৃতির সাক্ষাৎ লাভ দুষ্কর, তাই চারুশিল্প তাহাদের চেহারা শাস্ত্রীয় ছাঁচে ঢালা। দেবমূর্ত্তির দর্শন এ চোখে ঘটে না ; তাহার আ আমাদের এ জগতে নাই ; ঋষিদের ধ্যানলোকে ছিল ; শাস্ত্রবলেন তাহাও সত্যযুগে ; অবশ্য ব বিশেষের ধ্যান-আকাশে তাহা যে এখন আর থাকিতে পারে না একথা আমরা বলি না ; শাস্ত্র অন্ততঃ কলিতে দেবমূর্ত্তির প্রকটন দুর্লভ ; তাই ঋষিরা ধ্যানদর্শনে যেমনটী পাইয়াছেন

তেমনটীই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন; ব্যক্তিবিশেষের খেয়ালবশে দেবমূর্ত্তিবিশেষের সৃষ্টি নয় ; তাই তাহা আঁকিতে শাস্ত্রীয় নির্দ্দেশ মানিয়া লইতে হয়। এখন বস্তুতন্ত্রচিত্রের কথা বলি। হাতী, ঘোড়া, গরু প্রভৃতি যা অহরহ চোখে পড়ে তা হল এই দলের ; এ সকল আঁকিতে "লোকান্ দৃষ্টা" এই শাস্ত্রীয় অনুশাসনে স্বভাবানুকরণের কথাই স্পষ্ট সূচিত হইয়াছে। খুবই সম্ভব এই দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণীর শিল্পনমুনা দেখিয়া স্মিথ সাহেবের ধারণা হইয়াছিল যে হিন্দুরা কেবল জন্তু জানোয়ার ও গাছপালা গড়িতেই সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

তারপর বাৎসায়নের ব্যাখ্যাতা যশোধরের উদ্ধৃত কারিকা

"রূপভেদপ্রমাণাত্ত্ব ভাবলাবণ্যযোজনং
সাদৃশ্যং বর্ণিকাভঙ্গমিতি চিত্রং ষড়ঙ্গকম্।"

ইহাতে ব্যবহৃত 'সাদৃশ্য' কথাটীর সাহায্যে ভারত-চিত্রের প্রকৃতি বুঝিতে চেষ্টা করিব। "চিত্রে সাদৃশ্যকরণং প্রধানংপণ্ডিতৈরিতি তম্।" ষড়ঙ্গক ভারতীয় চিত্রের প্রধান অঙ্গই হইল সাদৃশ্যকরণ, শ্রদ্ধেয় মৈত্রেয় মহাশয় দেখাইয়াছেন ; আর প্রকৃতিই সাদৃশ্য। এই সাদৃশ্যই আমাদের ললিতকলার আদর্শকে বিশেষত্ব দান করিয়াছে। শাস্ত্রীয় নিয়মতন্ত্র (Conventional) ও বস্তুতন্ত্র (Naturalistic) উভয় শ্রেণীর শিল্পের বেলায়ই সাদৃশ্যবিধান তুল্যভাবে প্রযোজ্য। সচরাচর 'অদৃষ্ট' জিনিসের বেলায় শাস্ত্রসম্মত আকার, আর 'দৃষ্টে'র বেলায় তার স্বাভাবিক আকার 'সাদৃশ্যে'র মহিমায় কতকটা ভাবরাজ্যে মুক্ত হইয়াছে। এই সাদৃশ্যসাধনের অবকাশই শিল্পীকে শাস্ত্রীয় নিগড়ের মাঝে তাঁর ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া তুলিবার সুবিধা দিয়াছে ; কারণ, এই সাদৃশ্যের ক্ষেত্র হইল তাঁর মন—এইখানেই সৃষ্টির অবসর তিনি পাইলেন। তবে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে ব্যক্তিগত খেয়াল যাহাতে প্রাধান্য লাভ না করিতে পারে তাহার বিষয়ও শাস্ত্র সতর্ক। যেমন, অতি ক্ষীণ বা অতি স্থূল দেবমূর্ত্তি অমাঙ্গলিক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যাহ'ক্ সাদৃশ্য 'দৃষ্ট' ও 'অদৃষ্ট', বস্তুতন্ত্র ও শাস্ত্রতন্ত্র আমাদের শিল্পের এই দুই বিভাগকেই অল্পাধিক ভাবমিশ্র করিয়াছে। কিন্তু পাশ্চাত্যশিল্প সাদৃশ্য অর্থাৎ প্রতিকৃতির উপর তেমন জোর না দেওয়ায় এবং অনুকৃতির উপর কিছু ঝোঁক দেওয়ায় তাহাতে বস্তুতন্ত্রতাই প্রবল হইয়াছে। এই জন্যই শরীরের শিরা, মাংসপেশী ও গ্রন্থিগুলি পাশ্চাত্যশিল্পে দেখাশুই রীতি আর ভারতশিল্পে উহা পরিবর্জনীয়, সাদৃশ্যের গৌরবহানিভয়ে উহা নিষিদ্ধ। মোটকথা, এই সাদৃশ্যের কতকটা অভাবে পাশ্চাত্য শিল্পে বস্তুতন্ত্রতার প্রাধান্য লক্ষিত হয়, আর ইহার প্রভাবহেতুই আমাদের চিত্রশিল্পে ভাবময়তার প্রাবল্য, তার নিয়মতন্ত্রতার সুদৃঢ় ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া সংযমের গাঢ় পরিণতিতেই তার মুক্তি।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার

BLOCKED INFORMATION.

দেবত্র

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পথ এমন বেশী নয় এবং পথিকের গতিও তাঁহার সাধ্যের শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছিল, তথা
মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের সেই পথটুকুই অতিবাহন করিতে যেন কয়েক দণ্ডই কাটিয়া গিয়াছে, এ
হতাশাচ্ছন্নভাবে তিনি হরিশ ভট্টাচার্য্যের জীর্ণতর গৃহের দাওয়ার বাঁশের খুঁটি ধরিয়া দাঁড়া
একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। প্রবল বর্ষার আক্রমণে সেই শতছিদ্র গৃহের অ
মাত্রেই কেবল খাড়া হইয়া আছে, কিন্তু তাহাতে যাহারা বাস করে, গৃহবাস শব্দটাই মাত্র তাহা
সম্বল, গৃহের সুখ সুবিধার অবশিষ্ট সে গৃহে আর কিছুই নাই। গোহালখানা হুমড়ি খা
পড়িয়া আছে, গরুটা মাঠে চরিয়া আসিয়া গৃহস্বামীদের সেই আশ্রয়খানার ছাঁচতলায় দাঁড়া
থাকে। সে গৃহে তৈজস বলিতে, সম্বল বলিতে, এখন আর মাটির ভাঁড় ভিন্ন কিছুই নাই। ব্রা
হইয়া গোবিক্রয় তো চলেনা, তাই কেবল গরুটাও মানুষের সামিল্ হইয়াই তাহাদের সঙ্গে এ
সমান দুঃখ দুর্দ্দশা ভোগ করিতেছিল।

দ্বারের সাম্‌নে করুণা ছোট ভাইটীকে কোলে লইয়া বসিয়া আছে, তাহার শীর্ণ পাণ্ডুর
চোখে আতঙ্কের জমাট ভাব। দুইজন প্রতিবাসিনী দূরে দাঁড়াইয়া 'হা-হুতাশ' করিতেছে,
কেহ আসিতেছে যাইতেছে, এবং প্রশ্নের উপর প্রশ্ন বর্ষণ করিয়া দুঃখের প্রাবল্যে বাক্য
বালিকাকে অধিকতর বাক্যরহিত করিয়া তুলিতেছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে দেখিয়াও কর
মূকের মত কেবল ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল মাত্র, কোন শব্দ করিল না।

মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন মলিন শয্যার উপরে ছিন্ন কন্থায় ও চাদরে সর্ব
কাহাকে যেন ঢাকা দিয়া রাখা হইয়াছে,—গৃহের মধ্যে আর কেহই নাই। বুঝিলেন পুত্রশ
পিতা এইরূপে পুত্রের শবকে গৃহকোণে ঢাকা দিয়া রাখিয়া নিজে শোকের প্রাবল্যে উদ্‌ভ্রান্তচি
কোথায় গিয়াছে, কিম্বা কি করিয়াছে তাহা কেহ জানে না। এই নরুকে ছোটবেলা হইতে
দেখিয়া আসিয়াছেন; তাহার বৎসরব্যাপী রোগের জন্য অনেক ঔষধপথ্যও তাঁহারা জোগাইয়াছে
কেবল এই মাস দুই তিনি এবং বুঝি তাঁহার সংসারও নিজেদের দুঃখে এতই মুহ্যমান হইয়াছি
যে জগতের অন্য কাহারো খোঁজ লইয়া উঠিতে পারে নাই। সেই অভিমানে বুঝি এই মৃত বা
তাহার মুখখানাকে উদ্‌ভ্রান্ত পিতার দ্বারা এমনি করিয়া আচ্ছাদন করাইয়া লইয়াছে। হ
জগতের আর কাহাকেও নিজেদের দুঃখ বেদনাও আর জানাইবে না বা মুখও দেখাইবে না
এই বোধ হয় তাহাদের সঙ্কল্প।

দেড় বৎসর পূর্ব্বের স্মৃতি—তাঁহার নিজপুত্র সুনন্দকুমারের মৃত্যুর দিন—চোখের উপর

নূতন হইয়া ভাসিয়া উঠিল। এক হস্তে নিজের ললাটদেশ টিপিয়া অন্য হস্তে মৃৎপ্রাচীরে ভর দিয়া মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দুই চারিজন পুরুষ প্রতিবেশীও তখন আসিয়া জুটিয়াছে। সকলেরই মুখে একই কথা "কোথায় গেল? পাওয়া তো গেল না।" অরুণের কাতর নিবেদনে কয়েকজন প্রতিবেশীও খুঁজিতে বাহির হইয়াছিল একে একে ক্রমে তাঁরা সকলেই ফিরিয়া আসিল। পিতার আগমনের একটু পরে আনন্দকুমারও আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি এক ব্যক্তির দ্বারা থানায় খবর পাঠাইয়া ক্রমে শবদাহের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। সকলেই আন্দাজ করিতেছিল হরিশ ভট্টাচার্য্যকেও খুব সম্ভব জীবিত পাওয়া যাইবেনা। বালক বালিকা তিনটির জন্য একথা সকলেই মনে মনে রাখিয়া, মুখে তাহাদের সান্ত্বনা দিতে লাগিল, "ভয় কি—পাওয়া যাবে বৈকি, ওরত কোন্ বনে বসে আছে। এদিকে ঘরে এতো এমন ক'রে আর রাখা উচিত নয়। বাবা অরু, তুমি আমাদের সঙ্গে চল শবদাহ ক'রে আসি। তারপরে তোমার বাবাকে আনবা—"

"আনন্দকাকা, বাবা যে নরুকে ঘরে শুয়ে থাক'—ব'লে শুইয়ে রেখে গেছেন! তোমরা ওকে ঘরের বার ক'রনা কাকা, বাবা এসে কি বলবেন্ আমাদের!" বলিতে বলিতে অরুণ আর্ত্তভাবে গৃহমধ্যে ছুটিয়া গিয়া সকলকে তাহার ভ্রাতার শব তুলিতে দেখিয়া এতক্ষণ পরে কাঁদিয়া উঠিল। আনন্দকুমার তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া নানা প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। বুদ্ধিমান বালককে ক্রমে শান্ত করিয়া তাহারা শবও সঙ্গে অরুণকে লইয়া চলিয়া গেলে ভট্টাচার্য্য মহাশয় উপস্থিত রমণী কয়জনের প্রতি চাহিয়া বলিলেন,—এই মেয়েটি আর ছেলেটিকে কেউ তোমরা আমার বড় বৌমার কাছে দিয়ে আস্‌তে পার?"

একজন বৃদ্ধা অগ্রসর হইয়া বলিল, "সে আর কি, তবে আপনার সংসারেরও তো লক্ষণ চাই ঠাকুর মশাই! এরা একটু স্নান টান্ করুক—মুখে কিছু দেক্—" বাধা দিয়া গম্ভীরস্বরে ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "আমার তো অলক্ষণেরই সংসার, সেজন্যে তোমরা ব্যস্ত হয়োনা।" তখন অদূরে সনৎকে দাসীর সঙ্গে আসিতে দেখিয়া বলিলেন, "এই যে মা আপনিই পাঠিয়েছেন।" তারপরে করুণার গায়ে হাত দিয়া "দিদি ওঠ্" বলিয়া ডাকিতেই করুণা ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিল "হারুর বড্ড জ্বর,—তেষ্টা বল্লে কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়েছে, ঘুম ভেঙে যাবে।"

ভট্টাচার্য্য তাহার ছিন্ন অঞ্চলে আবৃত শিশুর শীর্ণ শরীর ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "উঃ—তাইত। এরও এত জ্বর! তা জল খেতে দিস্‌নি কেন দিদি? জল দে।"

"কই জল? জলের কলসী নিয়ে বাবা বুঝি গঙ্গাজল আন্‌তে গেছেন—"

হারুর তৃষ্ণার কথা বিস্মৃত হইয়া তখন ভট্টাচার্য্য শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন, "কলসী নিয়ে তাকে কি যেতে দেখেছিস্ করুণা?"

"আমি তো দেখিনি—কেবল ছোট দাদাকে চুমু খেয়ে ভাল ক'রে শুইয়ে দিয়ে বাবা

BLOCKED INFORMATION.

উঠে গেলেন, আমায় বল্লেন, 'শুয়ে থাক্ তোরা চুপ্ করে আমি বাইরে যাচ্চি।' আর পরে খুল্লেন দেখে ভয়ে আমি চোখ্ বুঝি—" একজন প্রতিবাসিনী টিপ্পনি কাটিয়া বলিয়া উঠিল, "এ বোকা ভয়তরাসে মেয়েওতো দেখিনি, ভোর হয়েছিল তখন শুনছি, চোখ্ বুঝলি কেন বাছা তাইতো তোর বাপ্ এমন ক'রে চলে যেতে পার্লে? অরুটাকে ডাক্তেও পারিস্নি?"

বালিকা অপরাধীর মত ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "আমার মাথার উপরই দুয়োর, ঘরে থাক্ছেন বলে বড্ড ভয় লেগেছিল। আর হারু ঘুম ভাঙ্লেই কাঁদবে—খেতে চাইবে, আমি নড়্লেই ঘুম ভেঙে যাবে তাই—"

মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য বাধা দিয়া বলিলেন "জ্বরের জন্য কাল কি ওকে খেতে দিস্নি?"

"কাল আমাদের কারুর-ই খাওয়া হয়নি। বাবা ছোট্দার কাছ থেকে কাল আর নড়েননি। জনৈকা রমণী সখেদে বলিল, "আ কপাল, তা পাড়ার কারু বাড়ী যাস্নি কেন বাছা অরুটাও তো বড় হয়েছে, দুটো চাল্ চড়াতে পার্লে না?"

"পরশু থেকে চাল্ একেবারেই ছিল না। বৈবস্বতের শুক্নো চাল যে ক'টি ছিল ফুটি পরশু আমাদের বাবা একবেলা দিয়েছিলেন, হারুর রাত্রের দুটি জ্বরের জন্য খায়নি, কাল সন্ধ্যা খেয়েছিল।"

মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য শুনিতে শুনিতে মাঝে মাঝে কপাল টিপিয়া ধরিতেছিলেন। বুঝিতেছিলে শুধু শোকে নয়, এই একটিকে রোগেও অনাহারে মরিতে দেখিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণ বুঝি বুঝি পারিয়াছিল,—এইটি মাত্র নয়, ধীরে ধীরে সব ক'টিকেই হয়ত এইরূপে অনাহারে অচিকিৎসায় বি দিতে হইবে। ছোটটার তো পেটজোড়া প্লীহা লিবার, গায়ের রং একেবারে মলিন হরিদ্রা তাহার উপর এই কদন্ন পথ্য, তাহাও জুটিতেছে না। রাত্রি প্রভাতে পুত্রের শবদাহ করিতে লোকের সাহায্য চাহিবে, না, বাকি তিনটিকে খাইতে দিয়া বাঁচাও বলিয়া সকলের দ্বারস্থ হই তাই বুঝি হরিশও সর্ব্ব চিন্তার অতীত স্থানে পুত্রের সহযাত্রী হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কি ক গেল? কোন্ উপায়ে? অন্ততঃ দেহের সন্ধানটুকুও তো পাওয়া চাই। আর যদিই এখ প্রাণটা নষ্ট করিতে না পারিয়া থাকে!—আবার তিনি করুণাকে প্রশ্ন করিলেন, "তোর বাবা কিছুই নিয়ে যায়নি করুণা?"

"জেঠিমা পূজোর সময় আমায় যে একখানা নতুন কাপড় দিয়েছিলেন সেইখানা থেকে টেনে নিলেন। আর তিনি চলে যাবার পর বাইরে জল ফেলার মত শব্দ হয়েছিল প্রতিবাসিনীরা সত্রাসে বলিয়া উঠিল, "হেইমা! কলসী দড়ি সবই তাহলে গুছিয়ে নিয়ে গেছে তা'হলে দাদাঠাকুর—"

সনতের সঙ্গিনী তাহাদের দাসী দাসুরমা সকলকে ভৎর্সনার সুরে বাধা দিয়া বলিল, তোমরা বক্ছ গো, যা কপালে আছে হবে—তাই বলে অগে থাক্তে বাছাদের ভয়ে আধ

দেও না। মনের দুঃখে হয়ত তিনি কোন্ দিকে চলে গিয়েছে দুদিন বাদে এদের মনে পড়লেই আবার ফিরে আসবে।" তারপরে একজন প্রৌঢ়া সধবার পানে চাহিয়া বলিল, "হাঁ বৌ তোমার ননদকে যে দেখ্ছিনে, কৈবর্ত্তদিদি কোথায়? তিনি থাক্লে এ সময়ে এদের একটু দেখ্ত শুন্ত,—তানা'র এদের ওপর ভা মায়া'।"

উল্লিখিতা কৈবর্ত্তগৃহিণী সিঁথার উপ একটু কাপড় টানিয়া দিয়া (কেননা দাসুর মা তাহাকে বৌ' বলিয়া সম্বোধন করায় তিনি বয়সের পর্য্যায়ে পড়িয়াছেন বলিয়া তাঁহার মনে হইল), এবং তৎক্ষণ খুব জোরে জোরে কথা কহিলেও এখন কণ্ঠস্বরকে অপেক্ষাকৃত সংযত করিয়া বলিলেন, আঃ কপাল সে যে আজ সাতদিন জ্বরে বেহুঁস হ'য়ে প'ড়ে আছে, ক্যাঙ্লা দিনরাত কাছে বসে আছে, মুখে জল দিচ্ছে বাতাস দিচ্ছে। তানা'র হুঁস্ থাক্লে কি এতখানি হ'তে পার্ত? আমরা সংসার লিয়ে, কাচ্চা বাচ্চা নে' ভোগ" লিয়ে, বিব্রত দিদি, আমাদের যদি বল্ত একটু ডকে দাও, তাও বা নাহয় কাল রাত্রে বাড়ী কৈবর্ত্তদের কারুকে আগ্লাতে পাঠাতে পারতাম্, তা তারা তো কেউ কিছু বলেনি—কি করে জ্বর যে এতখানি হ'য়েছে।" কৈবর্ত্তগৃহিণীর মৃদুস্বর ক্রমে স্পষ্টতার জাগতায় নিমগ্ন হইয়া গেল। ইহারাই হরিশ ভট্টাচার্য্যদিগের সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ প্রতিবাসী, যদিও সে ঘনিষ্ঠতাটুকু নগরবাসীদের পক্ষে দূরত্বের পর্য্যায়েই পড়ে। মাঝে বিঘাখানেক জমিতে নানা আগাছায় বেশ বন হইয়াছে সেজন্যে গৃহবাসীদের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময়ও চলে এবং ডাকিতে হইলেও কণ্ঠস্বরকে সর্ব্বোচ্চ গ্রামে তুলিতে হয়, তথাপি ইহারা এই ঘটনায় সকলের কাছে নিজেদের লজ্জিত বলিয়াই অনুভব করিতেছিল।

তাহাদেরই উপর হরিশ ভট্টাচার্য্যের পরিত্যক্ত গৃহের ভার দিয়া মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য করুণার হাত ধরিয়া এবং রুগ্ন শিশুটিকে দাসীর কোলে দিয়া নিজগৃহে যাইবার জন্য উঠিতেছেন, এমন সময়ে শ্মশানযাত্রীদের মধ্যে একজন ব্যস্তভাবে আসিয়া তাঁহাকে বলিল, "আনন্দ দা'ঠাকুর" তাঁহাকে শ্মশানে আহ্বান করিতেছেন—তাঁহাকে এখনি একবার যাইতেই হইবে।" আগত ব্যক্তির ভাব ভঙ্গীতে তাহারা যে হরিশ ভট্টাচার্য্যেরই কোন সন্ধান পাইয়াছে তাহা অনুমান করিয়া তখন সনতের হাতে করুণাকে সমর্পণ করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহাদের গৃহে যাইতে আদেশ দিলেন। তাহারা দৃষ্টি পথের বহির্ভূত হইলে "ব্যাপার কি" প্রশ্ন করিতে করিতে তিনি আগন্তুকের সঙ্গে শ্মশানযাত্রার উদ্দেশে পথে বাহির হইতেই দেখিলেন সম্মুখে থানার দারোগা সঙ্গে দুই চারিজন লোক লইয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের আহ্বান জানিয়া 'ব্যস্ত সমস্ত'ভাবে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে তখনি ব্যাপারটা জানাইয়া সেই গৃহেরই দিকে একবার ফিরিবেন কিনা ইতস্ততঃ করিতেছেন কিন্তু সঙ্গী আগন্তুকের নিবারণে তাহার আবশ্যক হইল না। সে বলিল "দারোগা মশাই এসে প'ড়ে ভালই হয়েছে,—উনিও চলুন—গিয়ে যা করা উচিত মনে করেন করুন।"

"কেন—কেন—কি ঘটেছে বলুঁ দেখি? হরিশকে দেখ্তে পাওয়া গেছে?"

BLOCKED INFORMATION.

সমবেত কণ্ঠের এককালীন প্রশ্নে বিব্রত হইয়া সে ব্যক্তি বলিল, "আজ্ঞে ... অনেকটা দূরে যে মুর্দ্দাফরাশ্ দুঘর বাস করে—তাদেরই একজন বল্‌ছে—ভোর্‌বেলা এক... গলায় দেওয়া বামুন নূতন লোক একটা কাপড় কাঁধে ফেলে আর একটা মেটে কলসী নিয়ে ... স্নান করতে নামছিল সে দেখেছে। কে-না-কে বুঝি কোন ছোট ছেলে ফেলে দিতে কি ... এসেছে মনে ক'রে সে আর কোন খোঁজ করেনি—তখনো ভোর ব'লে শুয়ে পড়ে। এ... শুনে আনন্দদাঠাকুরের খুব সন্দেহ হয়েছে, তিনি বল্‌ছেন জেলে ডাকিয়ে ঐখানটা খোঁজাতে ... তাই আপনাকেও ডাক্‌ছেন!"

মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য স্তব্ধভাবে পথেই দাঁড়াইয়া গেলেন—তাঁহার চরণ আর যেন ... চাহিলনা। দারোগা তাঁহার দিকে সহানুভূতির ভাবে চাহিয়া বলিল, "আপনি না হয় বাড়ী ... ভট্‌চায্ মশায়! একেতো শ্মশানে একটী বালক দেহের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ানো—তা... শোচনীয় ব্যাপারের খোঁজে আরও কি কাণ্ড সম্মুখে উপস্থিত হবে বলা যায়না। আ... এসেছি আপনি বাড়ী যান্।"

তারপরে সেই গ্রাম্য লোকটির পানে চাহিয়া দারোগা বলিল, "বাপু তুমি আ... চৌকীদারটাকে গোটাকতক জেলের আর ডিঙ্গির সন্ধান শিগ্‌গির যাতে হয়—"

বাধা দিয়া চৌকীদারদ্বয় "এজ্ঞে আমরা এই গাঁয়েরই তো চৌকীদার, এ গাঁয়ের ... চিনি, ওনাকে আর কষ্ট করতে হবেনা, আমরাই জেলে, ডিঙ্গি সব আনাই" বলিয়া দুইজন ডাকিতে চলিয়া গেলে অবশিষ্ট দুইজনকে লইয়া দারোগা—"আপনি তবে বাড়ী যান ভট্‌চায্ ... বলিয়া শ্মশানের দিকে পদচালনা করিলে মৃত্যুঞ্জয় সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া "না—আমারও ... দরকার" বলিয়া তাহাদের পশ্চাতে চলিলেন; গ্রামস্থ ব্যক্তিটিও তাঁহাদের অনুসরণ করিল।

শ্মশানে তখন চিতা জ্বলিয়া উঠিয়াছে। নিশ্চিতকে ভস্মীভূত করিবার ব্যবস্থা করিয়া সকলে অনিশ্চিতের সন্ধানে গঙ্গার জলের দিকে চাহিয়া আছে। মৃত্যুঞ্জয় গিয়া একেবারে ... উপরেই দাঁড়াইলেন। চিতার দিকেও তিনি চাহিতে পারিতেছিলেন না, আবার জলের ... চাহিয়াও প্রস্তর প্রতিমার মত নির্ব্বাক নিস্পন্দ হইতেছিলেন। বালক অরুণও নির্ব্বাকভাবে ... নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।

দারোগা সঙ্গী দুইটীকে জলে নামাইয়া খানিকক্ষণ হয়রাণ করার পর জেলে ও তাহাদে... আসিল এবং অবিলম্বেই একটু ডুবন জল হইতেই হরিশ ভট্টাচার্য্যের দেহকে তাহারা টানিয়া ... গলায় কন্যার কাপড় দিয়া সেই গৃহের কলসী বাঁধা, এখন তাহা পূর্ণতোয়। এই দৃশ্য দে... শোক মনস্তাপ ও অনাহারজীর্ণ দুর্ব্বল বালক একটা অব্যক্ত শব্দ করিয়া মৃত্যুঞ্জয়ের পায়ের ... পড়িয়া গেল। মৃত্যুঞ্জয়ও সঙ্গে সঙ্গে সেই জলের উপরেই বসিয়া পড়িয়া তাহাকে ক্রোড়ে ... লইয়া দেখিলেন বালকের সংজ্ঞা নাই।

... ভূতি আসিয়া গিয়া ও বালককে জল হইতে তীরে আনিয়া বালকের চৈতন্য ... সাদনের চেষ্টা পাইতে লাগিল। ওদিকে দারোগাও মৃত দেহকে তীরে তুলাইয়া গলার কলসী খুলাইয়া জীবনের কোন চিহ্ন আছে কিনা অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। খানিকক্ষণ নানাবিধ উপায়ও চলিল। শেষে সমস্তই নিরর্থক বুঝিয়া সকলেই নিবৃত্ত হইল।

দারোগার অনুমতিতে নির্ব্বাণপ্রায় পুত্রের চিতার পার্শ্বে পিতারও চিতা সজ্জিত হইল। ... বের যথা ... ব্য সম্পাদন করিয়া চিতা তোলা হইলে মৃত্যুঞ্জয় নিজের ক্রোড়ের নিকটে জড়-প্রায় উপবিষ্ট অরুণকে 'অরুণ' বলিয়া সম্বোধন করিতেই অরুণ 'বাবা' বলিয়া একটা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কম্পিতহস্তে তাহাকে বুকের উপর জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন "আজ হতে আমি তোমার বাবা, আর তুমি তোর বাবা"। বালকের কর্ণে তখন যেন কোন শব্দই প্রবেশ ... করিতেছিল না, স্তব্ধনেত্রে সে কেবল পিতার শেষের পানে চাহিয়াছিল।

মৃত্যুঞ্জয় তাহাকে প্রা... কোলেই লইয়া তাহার হাত ধরিয়া কোনরূপে শবের মুখাগ্নি ক্রিয়া ... ষ করাইয়া দিলেন। চিতা জ্বলিতে লাগিল, হরিশ ভট্টাচার্য্যের সকল জ্বালা গঙ্গার জলেই ... ইয়াছিল, এখন তাহার শোকতপ্ত অনশনদগ্ধ দেহটা আর একবার ধূ ধূ করিয়া সকলের চোখের ... সামনে অগ্নিবৃষ্টি করিতে করিতে শেষে ক্লান্তির অঙ্গারে শান্তির পাংশুবর্ণে রূপান্তরিত হইতে চলিল। মুখাগ্নির পরে বালককে সকলে গৃহে পাঠাইতে চাহিলে সে সম্মত হইল না। নিঃশব্দে বসিয়া পিতার অগ্নিদাহ দেখিতে লাগিল। তাপ লাগিতেছে বলিয়া একটু দূরে সরিতে বলিলেও সে কথা সে কানেও তুলিল না।

জীবিত অবস্থায় হরিশ ভট্টাচার্য্যের সুখ দুঃখে কেহ সাহায্য না করিলেও এখন তাহাদের প্রজ্বলিত চিতায় সপ্তশলাকা নিক্ষেপ করিয়া এবং দাহ অন্তে সপ্তকলসী জল ঢালিয়া উভয় চিতা ধৌত করিয়া শ্মশানযাত্রীরা প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিলেন এবং স্নানান্তে সদ্য পরলোকপ্রাপ্তদের উদ্দেশে তাহার পুত্রের সঙ্গে তিন অঞ্জলী গঙ্গোদকে তর্পণ শেষ করিয়া 'হরিবোল' শব্দে গ্রাম মুখরিত করিয়া নিজ নিজ গৃহে ফিরিলেন।

অরুণকেও স্নান তর্পণ শেষে পুরোহিত বেশে সঙ্গে লইয়া মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য ও আনন্দকুমার নিজেদের গৃহে পৌঁছিয়া দেখিলেন অরুন্ধতী বালকটিকে দুগ্ধ পান করাইয়া শোয়াইয়া রাখিয়াছেন এবং করুণা স্নানান্তে নিঃশব্দে তাহার মাথার কাছে বসিয়া আছে। সুনৎও তাহারের নিকটে ছিল। তাহাদের দেখিতেই করুণা 'দাদা, বাবা?' বলিয়া একটা অবোধ্য আকুল প্রশ্নের সঙ্গে দাঁড়াইতে গিয়াই বসিয়া পড়িল। অরুন্ধতী তাহাকে কোলে করিয়া ধরিতেই মৃত্যুঞ্জয় নিকটে গিয়া নিজ পুত্রবধূর মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, "মনে রেখো মা, আজ থেকে এই তোমার মীরা, এই আমার মীরা"।

বেলা আর তখন নাই। ক্ষুৎপিপাসাতুর শোকার্ত্ত বালক বালিকাদের আহারের জন্য অরুন্ধতী

BLOCKED INFORMATION.

কিছু ফল মূল ও দুগ্ধ আনিয়া উপস্থিত করিতেই মৃত্যুঞ্জয় বলিলেন, "মাটির দুখানি ছোট খানিকটা কাঁচা দুধ গঙ্গাজল আনতো মা"। বধূ যথাদিষ্ট করিলে তখন তিনি অরুণকে "অরুণ চল্, একবার তুলসী তলায় চল্। এই দুধ আর গঙ্গাজলভরা পাত্র দুটো এখানে মনে তোমার বাবাকে আর নরুকে নিবেদন করে দাঁড়া, তাঁরা এখন দেবতা কিনা স্বর্গে এই খাবেন। তাঁদের উদ্দেশে বল—

শ্মশানানলদগ্ধোঽসি পরিত্যক্তোঽসি বান্ধবৈঃ।
ইয়ংক্ষীরং ইদং নীরং ভুক্ত্বা পীত্বা সুখী ভবেৎ॥

পিতা ও ভ্রাতার উদ্দেশে এই দুগ্ধ ও জল নিবেদন করিতে অরুণের সমস্ত শরীর মত কাঁপিতেছিল। পিতার অনশনক্লিষ্ট মুখ ও কোটরপ্রবিষ্ট চক্ষু যেন তাহার চোখে ভাসিতেছিল। এই একটু দুধই যে শেষ বেলায় নরুকে তাহারা দিতে পারে নাই তাহা তাহ পড়িতেছিল।

বালিকা করুণা কিন্তু শোকমুগ্ধচিত্তে এই অনুষ্ঠান দেখিতে ও মন্ত্র শুনিতে ভাবিতেছিল, 'এতক্ষণে বাবা একটু খেতে পেলেন। ক'দিন যে একেবারেই খাননি।' বা অবস্থার কথা বিশেষ করিয়া না শুনিলেও তিনিও যে নরুর সঙ্গেই স্বর্গে চলিয়া গিয়াছি করুণা বেশ বুঝিতেই পারিয়াছিল।

শ্রীমতী নিরুপ

বন্দী

দ্বার খুলে বসে আছি বাতায়ন-পাশে,
চেয়ে আছি অনিমেষ সুদূর আকাশে
যেথায় ঈশান-কোণে নীরব সঞ্চারে
ঘনায়ে উঠিছে মেঘ। কারা-অন্ধকারে
বদ্ধ বায়ু দিবানিশি রুধিছে নিঃশ্বাস,
পাঁজর বিদারে বুকে আকুল তিয়াস।
—আয় রে বৈশাখী ঝড় অশান্ত পাগল,
আয়রে ভাসায়ে ধরা বরষা-বাদল!
খুলে দিনু কেশপাশ, বসন-নিচোল,
বুক পেতে দিনু এই—দে দোল দে দোল
নাচায়ে দোলায়ে প্রাণ! কারাবন্ধ টুটে
বাহিরের মুক্ত বায়ে যাই যাই ছুটে
অধীর উন্মাদ প্রায়, ধারাজল সনে
ডুবে যাই ভেসে যাই অনন্ত প্লাবনে।

শ্রীপরিমলকুমা

আমেরিকায় জাতিভেদ

পাশ্চাত্য জগৎ বরাবর ভারতবর্ষকেই জাতিভেদের জন্য দোষী ক'রে নানারকম ব্যঙ্গ ক'রে আসছে। ভারতবর্ষ সে দোষে যে দোষী সে বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু যাঁহারা সে জন্য ব্যঙ্গ ক'রছেন, তাঁরাও যে সে দোষী সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী নন্, এইটুকু দেখানই আমার এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। পাশ্চাত্যের অন্যান্য দেশের চেয়ে উত্তর আমেরিকা (যুক্তপ্রদেশ) এবিষয়ে যেমন বেশী ব্যঙ্গকারী, নিজেরা তেমনি বেশী জাতিভেদ মেনে চলছে। আমেরিকায় জাতিভেদ বরং বাড়ছে বই কমছে না।

বর্ত্তমানে যারা অমেরিকান বলে পরিচিত, তারা প্রকৃতপক্ষে বিদেশী-অমেরিকান। আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা রেড ইণ্ডিয়ান (Red Indian) নামে পরিচিত। বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতি এসে এদেশ অধিকার ক'রে, রেড ইণ্ডিয়ানদের প্রায় ধ্বংস ক'রে এখন আমেরিকান নামে পরিচিত। ধর্ম্ম, সমাজ, শিক্ষা, আচার, ব্যবহার, চেহারা, ভাষা সকল রকমেই রেড ইণ্ডিয়ানরা বর্ত্তমান আমেরিকানদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এরা যে পাশ্চাত্য সভ্যতার কাছে অস্পৃশ্য জাতিরূপে আছে, সে কথা বলা বাহুল্য। শাদা আমেরিকানের কাছে এদের বেলায় জাতিভেদের নিয়মটা এত কড়া হ'য়েছে যে, এরা প্রকৃতপক্ষে এদেশের মালিক হলেও বর্ত্তমানে আমেরিকার প্রজা (?) (Citizen) রূপে পর্য্যন্ত আইনতঃ পরিচিত নয়। "সাম্য, স্বাধীনতা ও মৈত্রী" এদেশের জাতীয় নীতি হ'লেও ছোট-জাতদের বেলায় তার পৃথক ব্যাখ্যা করা হয়। পাশ্চাত্য দেশ কর্ত্তৃক আমেরিকা বিজয়ের পূর্ব্বে রেড ইণ্ডিয়ানদের সংখ্যা ঠিক কত ছিল তা জানার উপায় নাই, তবে ক্রমশঃ কমতে কমতে বর্ত্তমানে তাদের সংখ্যা মাত্র ৩৪০,৯১৭ জনে (১৯২২ সালের গণনা) দাঁড়িয়েছে। এদের স্বাধীনতা এক রকম নাই বলিলেও চলে। স্থান বিশেষে এদের নির্দ্দিষ্ট সীমানা ক'রে দেওয়া হয়। তার বাহিরে যাওয়ার উপায় নাই। চিড়িয়াখানার বানরের ঘরের মত কতকটা। এদেরও আহারাদির বা প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রের অভাব যাতে না হয়, গভর্ণমেণ্ট থেকে তার ব্যবস্থা করা হয়। এরূপ ব্যবহারের কারণ শুনতে পাওয়া যায় যে, "এরা কখনও শান্তিপ্রিয় নয়, ও হ'তেও পারে না। এদের দেশ দখল করার পর এরা বহুবার শ্বেত আমেরিকানদের হত্যা ক'রেছে ও আরও প্রতিশোধ নিতে চায়। সুতরাং এমন অসভ্যদের স্বাধীনতা দেওয়া বিপদ জনক"—সত্য কথা! যাহোক, যে কোনও কারণে হ'ক সমস্ত রেড ইণ্ডিয়ান জাতটা আজ শ্বেত আমেরিকানদের কাছে জাতহারা অস্পৃশ্য। যতটা সম্ভব তাদের একঘ'রে ক'রে রাখা হয়েছে। এই রেড ইণ্ডিয়ান জাতটী এদেশের প্রথম সমস্যা। আর ১টী অশ্বেত জাতি এদেশের দ্বিতীয় সমস্যা। কল কারখানা আবিষ্কারের বহু পূর্ব্বে যখন পাশ্চাত্য শ্বেত জাতি এ দেশ অধিকার করে—তখন দারুণ শীতে নিজেদের সামান্য লোক নিয়ে এদেশে চাষ ক'রে জীবিকা চালান

BLOCKED INFORMATION.

কিছু ফল মূল ও দুগ্ধ আনিয়া উপস্থিত করিতেই মৃত্যুঞ্জয় বলিলেন, "মাটির দুখানা [illegible] খানিকটা কাঁচা দুধ গঙ্গাজল আনতো মা"। বধূ যথাদিষ্ট করিলে তখন তিনি অরুণকে [illegible] "অরুণ চল্, একবার তুলসী তলায় চল্। এই দুধ আর গঙ্গাজলভরা পাত্র দুটো এখানে [illegible] মনে তোমার বাবাকে আর নরুকে নিবেদন করে দাঁড়া, তাঁরা এখন দেবতা কিনা স্বর্গে এই [illegible] খাবেন। তাঁদের উদ্দেশে বল—

শ্মশানানলদগ্ধোঽসি পরিত্যক্তোঽসি বান্ধবৈঃ।
ইয়ংক্ষীরং ইদং নীরং ভুক্ত্বা পীত্বা সুখী ভবেৎ॥

পিতা ও ভ্রাতার উদ্দেশে এই দুগ্ধ ও জল নিবেদন করিতে অরুণের সমস্ত শরীর মত কাঁপিতেছিল। পিতার অনশনক্লিষ্ট মুখ ও কোটরপ্রবিষ্ট চক্ষু যেন তাহার চো ভাসিতেছিল। এই একটু দুধই যে শেষ বেলায় নরুকে তাহারা দিতে পারে নাই তা পড়িতেছিল।

বালিকা করুণা কিন্তু শোকমুগ্ধচিত্তে এই অনুষ্ঠান দেখিতে ও মন্ত্র শুনিতে ভাবিতেছিল, 'এতক্ষণে বাবা একটু খেতে পেলেন। ক'দিন যে একেবারেই খাননি।' বা অবস্থার কথা বিশেষ করিয়া না শুনিলেও তিনিও যে নরুর সঙ্গেই স্বর্গে চলিয়া গি করুণা বেশ বুঝিতেই পারিয়াছিল।

শ্রীমতী নিরুপ

বন্দী

দ্বার খুলে বসে আছি বাতায়ন-পাশে,
চেয়ে আছি অনিমেষ সুদূর আকাশে
যেথায় ঈশান-কোণে নীরব সঞ্চারে
ঘনায়ে উঠিছে মেঘ। কারা-অন্ধকারে
বদ্ধ বায়ু দিবানিশি রুধিছে নিঃশ্বাস,
পাঁজর বিদারে বুকে আকুল তিয়াস।
—আয় রে বৈশাখী ঝড় অশান্ত পাগল,
আয়রে ভাসায়ে ধরা বরষা-বাদল!
খুলে দিনু কেশপাশ, বসন-নিচোল,
বুক পেতে দিনু এই—দে দোল দে দোল
নাচায়ে দোলায়ে প্রাণ! কারাবদ্ধ টুটে
বাহিরের মুক্ত বায়ে যাই যাই ছুটে
অধীর উন্মাদ প্রায়, ধারাজল সনে
ডুবে যাই ভেসে যাই অনন্ত প্লাবনে।

শ্রীপরিমলকু

আমেরিকায় জাতিভেদ

পাশ্চাত্য জগৎ বরাবর ভারতবর্ষকেই জাতিভেদের জন্য দোষী ক'রে নানারকম ব্যঙ্গ ক'রে আসছে। ভারতবর্ষ সে দোষে যে দোষী সে বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু যাঁরা সে জন্য ব্যঙ্গ ক'রছেন, তাঁরাও যে সে দোষী সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী নন্, এইটুকু দেখানই আমার এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। পাশ্চাত্যের অন্যান্য দেশের চেয়ে উত্তর আমেরিকা (যুক্তপ্রদেশ) এবিষয়ে যেমন বেশী ব্যঙ্গকারী, নিজেরা তেমনি বেশী জাতিভেদ মেনে চলছে। আমেরিকায় জাতিভেদ বরং বাড়ছে বই কমছে না।

কোনে যারা অমেরিকান বলে পরিচিত, তারা প্রকৃতপক্ষে বিদেশী-অমেরিকান। আমেরিকার আদিবাসীর রেড ইণ্ডিয়ান (Red Indian) নামে পরিচিত। বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতি এসে এদেশ অধিকার ক'রে, রেড ইণ্ডিয়ানদের প্রায় ধ্বংস ক'রে এখন আমেরিকান নামে পরিচিত। ধর্ম্ম, সভ্যতা, শিক্ষা, আচার, ব্যবহার, চেহারা, ভাষা সকল রকমেই রেড ইণ্ডিয়ানরা বর্ত্তমান আমেরিকানদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এরা যে পাশ্চাত্য সভ্যতার কাছে অস্পৃশ্য জাতিরূপে আছে, সে কথা বলা বাহুল্য। শাদা আমেরিকানের কাছে এদের বেলায় জাতিভেদের নিয়মটা এত কড়া হয়েছে যে, এরা প্রকৃতপক্ষে এদেশের মালিক হলেও বর্ত্তমানে আমেরিকার প্রজা (?) (Citizen) রূপে পর্য্যন্ত আইনতঃ পরিচিত নয়। "সাম্য, স্বাধীনতা ও মৈত্রী" এদেশের জাতীয় নীতি হ'লেও ছোট-জাতদের বেলায় তার পৃথক ব্যাখ্যা করা হয়। পাশ্চাত্য দেশ কর্ত্তৃক আমেরিকা বিজয়ের পূর্ব্বে রেড ইণ্ডিয়ানদের সংখ্যা ঠিক কত ছিল তা জানার উপায় নাই, তবে ক্রমশঃ কমতে কমতে বর্ত্তমানে তাদের সংখ্যা মাত্র ৩৪০,৯১৭ জনে (১৯২২ সালের গণনা) দাঁড়িয়েছে। এদের স্বাধীনতা এক রকম নাই বলিলেও চলে। স্থান বিশেষে এদের নির্দ্দিষ্ট সীমানা ক'রে দেওয়া হয়। তার বাহিরে যাওয়ার উপায় নাই। চিড়িয়াখানার বানরের ঘরের মত কতকটা। এদেরও আহারাদির বা প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রের অভাব যাতে না হয়, গভর্ণমেণ্ট থেকে তার ব্যবস্থা করা হয়। এরূপ ব্যবহারের কারণ শুনতে পাওয়া যায় যে, "এরা কখনও শান্তিপ্রিয় নয়, ও হ'তেও পারে না। এদের দেশ দখল করার পর এরা বহুবার শ্বেত আমেরিকানদের হত্যা ক'রেছে ও আরও প্রতিশোধ নিতে চায়। সুতরাং এমন অসভ্যদের স্বাধীনতা দেওয়া বিপদ জনক"—সত্য কথা! যাহোক, যে কোনও কারণে হ'ক সমস্ত রেড ইণ্ডিয়ান জাতটা আজ শ্বেত আমেরিকানদের কাছে জাতহারা অস্পৃশ্য। যতটা সম্ভব তাদের একঘ'রে ক'রে রাখা হয়েছে। এই রেড ইণ্ডিয়ান জাতটী এদেশের প্রথম সমস্যা। আর ১টী অশ্বেত জাতি এদেশের দ্বিতীয় সমস্যা। কল কারখানা আবিষ্কারের বহু পূর্ব্বে যখন পাশ্চাত্য শ্বেত জাতি এ দেশ অধিকার করে—তখন দারুণ শীতে নিজেদের সামান্য লোক নিয়ে এদেশে চাষ ক'রে জীবিকা চালান

CONTINUOUS CURLED PAGES

BLOCKED INFORMATION.

তাদের বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। তাই অসভ্য আফ্রিকাবাসী নিগ্রোদের আম[illegible] কোনও শ্বেত আমেরিকান সে সময় স্বপ্নেও ভাব্‌তে পারেন নি যে এই নিগ্রো জাতি এ[illegible] আমেরিকার ১টী সমস্যার মধ্যে গণ্য হ'তে পারবে। তখন নিগ্রোদিগকে কোনও রক[illegible] পশুর চেয়ে পৃথক দেখার প্রয়োজন ছিল না। তারা মাঠে কাজ ক'রত, খাওয়া [illegible]ও,—সমা[illegible] ধর্ম্ম, আচার ব্যবহার দূরের কথা মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তি—দয়া, মায়াটুকু পর্য্যন্ত এদের [illegible] হোত না। মানুষ, গরুর যত্ন কতকটা করে, কারণ গরু দুধ দেয়, গোবর দেয়, জমি চাষ করে[illegible] হিন্দু আবার পূজা করে—মুসলমান, খৃষ্টান মাংস খায়—সে সময়ে নিগ্রোদের যত্নও প্রায় সে[illegible] রকমের ছিল। যতদিন তার সামর্থ্য থাক্‌ত, ততদিন তার যতটুকু যত্ন না হলে শরীর ঠিক [illegible] থাক্‌ত ততটুকু যত্নই করা হোত। যে সকল পশু-বৃত্তির পরিচয় সে সময়কার আমেরিকান[illegible] দিয়েছে তা ব'ল্‌তেও যেন ঘৃণা বোধ হয়। বর্ত্তমানে বহু দেশের মিউনিসিপালিটী বা পশু[illegible] হিতকারিণী দলের লোকেরা অক্ষম পশুকে গুলি করে তার ইহ জন্মের কষ্ট দূর করিয়ে দেয়[illegible] সে সময়ে অক্ষম নিগ্রোরও ঐরূপে দুঃখ যন্ত্রণা দূর করান যেত।

যাহোক, আমার বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয় জাতিভেদ। সংখ্যায় বৃদ্ধি হ'য়ে নিগ্রো [illegible] পশুর চেয়ে একটু ভাল ব্যবহার পাওয়ার দাবী ক'রল অর্থাৎ নানাকারণে যখন শ্বেত আমেরিকা[illegible] তাদের মানুষ ব'লে স্বীকার করতে বাধ্য হ'ল তখন জাতির সমস্যা এল। লাল আমেরিক[illegible] (Red American)দের আবশ্যক বোধে শাদা আমেরিকানদের (White population [illegible] America) সমাজের বাইরে রাখা হয়েছে। কিন্তু কাল আমেরিকান (আমেরিকাবাসী নিগ্রো)দে[illegible] পৃথক করে রাখা সম্ভব হয় নাই। কারণ তাদের দিয়ে কৃষিকাজ, গৃহকাজ, রান্নার কা[illegible] এমন কি অনেকের পাশবিক উপপত্নীর কাজ পর্য্যন্ত করান হ'য়েছে। নিগ্রোর সভ্যতা, নিগ্রো[illegible] ভাষা, নিগ্রোর উন্নত মনুষ্যত্ব বিশেষ কিছু উল্লেখযোগ্য ছিল না—তাই অনায়াসে বা অল্পায়াসে তারা শাদা আমেরিকার অনুকরণ ক'রতে আরম্ভ করল। ফলে আজ কালো আমেরিকানদে[illegible] (নিগ্রো) ভাষা ইংরাজি, ধর্ম্ম খৃষ্টীয়, বেশভূষা ইউরোপীয়। এক কথায় কালো আমেরিকানকে আফ্রিকান নিগ্রো বলা একরকম অন্যায়। সে এখন দুয়ের মাঝখানে, সে এখন বড় সমস্যা না পারে হ'তে শাদা আমেরিকান—না পারে হ'তে খাঁটী আফ্রিকান। অথচ ১০,৪৬৩,১৩[illegible] জনকে (১৯২০ সালের গণনা) বর্ত্তমান যুগে ডুবিয়ে দেওয়াও সম্ভব হবে না। এই নিগ্রো সমস্যা নিয়ে আমেরিকার জাতিভেদটা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

যারা 'টম্‌কাকার কুটীর' প'ড়েছেন তাদের আমেরিকান নিগ্রোদের অবস্থা কতকটা জানা আছে। সে সব শুধু অতীতের স্মৃতি নয়—বর্ত্তমানের বাস্তব ঘটনাও বটে। আমেরিকার সর্ব্বত্র নিগ্রোর অবস্থা বাস্তবিক একরকম; হয় ত কোথায়ও বা কিছু কম—কোথায়ও বা বেশী। কা[illegible] আমেরিকান কখনও শাদা আমেরিকানের সঙ্গে এক বাড়ীতে থাক্‌তে পারে না। অনেক হোটে[illegible]

লোকে খেতে দেবে না। অনেক সহরে কালোর জন্য পৃথক ট্রাম, ট্রেণ, হোটেল, নাপিত, ধোপা, এমন কি বিশু খৃষ্টের গির্জ্জা পর্য্যন্ত পৃথক। কালো আমেরিকান কখনও উচ্চপদ আশা করে না—কেন না সে জানে সে পেতে পারে না। কালো আমেরিকান যতই ধনী হোক, যতই বিদ্বান হোক, বুদ্ধিমান হোক—সে কোনও মূর্খ, নির্ধন শাদার সমান হতে পারে না। কতকগুলা কাজ বাঁধাই করা আছে যা কালোতেই করে—যথা, ট্রেণের বিছানা করা, বাড়ীর কাজ করা, রাঁধাবাড়া করা ইত্যাদি।

কতকগুলি উদার হৃদয় শাদা আমেরিকান এক সময়ে কালোদের উপর পাশবিক অত্যাচার [illegible] করতে চেষ্টা ক'রেছিলেন। স্বনামধন্য প্রেসিডেণ্ট লিঙ্কন কালোদের আইনতঃ স্বাধীনতা দিতে নিজে দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পর্য্যন্ত করেন। একদল কালোদের স্বাধীনতা দিতে চায়—অপর দল [illegible]জ। ফলে কালোর স্বাধীনতা গেল—ভোট দেওয়ার ক্ষমতা পেল, সামাজিক হিসাবে কালো যেখানে ছিল তার একটুকুও উপরে উঠ্‌তে পারল না।

এদেশে এমন বছর যায় না যখন কয়েক ডজন কালোকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা না হয়। তবু এদের আইনতঃ স্বাধীনতা আছে। সামান্য অপরাধে বা অনেক সময় বিনা অপরাধে শুধু সন্দেহ মাত্রে, শাদার দল হাজারে হাজারে মিশে কালোকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারে—জ্যান্ত পুঁতে মারে—লাথি মেরে মেরে, শেষ ক'রে দেয়। পুলিশ বা আইন এদের পশুবৃত্তির কাছে কিছুই করতে পারে না। অনেক সময় দল বেঁধে জেল থেকে এদের কেড়ে নিয়ে যায়। এর প্রতিকার যে নিতান্ত অসম্ভব তা বলা যায় না—কিন্তু যারা প্রতিকার ক'রবে তারাই যে উচ্চ জাতীয়—নীচ অস্পৃশ্য জাতির শাস্তি দিতে তারাও খুব অনিচ্ছুক নয়। গত কয়েক বৎসর এক আইন পাশ ক'রবার চেষ্টা হচ্ছে যে, যে কোনও প্রদেশে (State) এইরূপ জোর ক'রে প্রাণ বিনাশের চেষ্টা বা বিনাশ হবে সেই ষ্টেটের কিছু টাকা জরিমানা হবে—ও যে বিনষ্ট হবে তার পরিবার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কিছু টাকা পাবে। এ আইন এখনও পাশ হয় নাই। স্বাধীনতাপ্রিয় সভ্য শাদা আমেরিকান একটুকু পর্য্যন্ত এখনও এগুতে পারে নাই। গত ৩৩ বৎসরের পাশবিক হত্যার সংখ্যা দিচ্ছি, পাঠকেরা নিজেই বিচার করবেন।

বৎসর	সংখ্যা	বৎসর	সংখ্যা	বৎসর	সংখ্যা
১৮৮৯	১২৭	১৮৯৫	১৭৬	১৯০১	১৩১
১৮৯০	৭৬	১৮৯৬	১২২	১৯০২	৯৫
১৮৯১	১২২	১৮৯৭	১৫৫	১৯০৩	১০২
১৮৯২	২০৮	১৮৯৮	১১০	১৯০৪	৮৭
১৮৯৩	১৩৯	১৮৯৯	১০০	১৯০৫	৬৬
১৮৯৪	১৯২	১৯০০	১১৪	১৯০৬	৬৭

BLOCKED INFORMATION.

বৎসর	সংখ্যা	বৎসর	সংখ্যা	বৎসর	সংখ্যা
১৯০৭	৬৩	১৯১২	৬৪	১৯১৭	৩৮
১৯০৮	৮৬	১৯১৩	৫২	১৯১৮	৬৪
১৯০৯	৭০	১৯১৪	৫২	১৯১৯	৮৩
১৯১০	৭৪	১৯১৫	৬৯	১৯২০	৬১
১৯১১	৭১	১৯১৬	৫৪	১৯২১	৬৪

সাধারণ ভাষায় যাকে হত্যা বলে এ হত্যা তেমন নয়। যখন একজন নিগ্রো কোনও অপ
করে এবং তার সেই কাজ কোনও শাদার অপ্রিয় হয়, তখন শাদা "মার ওকে, খুন কর ওকে
(Lynch him) ব'লে চীৎকার ক
যোগ দেয়, ও যখন দল বেশ বড় হয়, তখন নিগ্রোকে নানা রকমে প্রহার করা হয়, হাতে
থাকলে তাও বৃথা থাকে না। এই ভাবে অর ইহলী শেষ করা হয়—যদি না হয় তবে অ
সময় আরও অদ্ভুত রকমে শেষ করা হয়। অনেক সময় নিগ্রো বন্দী জেলে থাকলে, আগে
পশুবৎ শাদাগুলো সকলকে জানিয়ে দেয় যে কবে কোথায় হত্যা (Lynch) করা হবে।
বহুদূর থেকে এই তামাসা দেখ্‌তে আসে। সঙ্গে খাবার জিনিষও নিয়ে আসে, দেরী
সেখানে ব'সে খাবে, উঠে খেতে গেলে যায়গা যাবার ভয়, ঠিক আমাদের দেশে দূর পাড়া
থেকে লোকে যেমন কলিকাতার সার্কাস্ দেখতে আসে। তারপর জেল থেকে জোর ক'রে
নিগ্রোকে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে তার গায়ে কেরোসিন তৈল ঢেলে দেওয়া হয়। ইতি
যার ইচ্ছা সে এসে যে কোনও ভাবে তাকে গ্রহার ক'রে রাগের প্রতিশোধ নিতে পারে। তার
সকলের প্রবল উৎসাহ আকাঙ্ক্ষা দূর ক'রতে তার গায়ে আগুন জ্বেলে দেওয়া হয়। ছোট-জ
নিয়ে জন্মগ্রহণ করার প্রায়শ্চিত্ত ক'রে নিগ্রো ইহজন্ম শেষ করে।

আরও নানা বিভিন্ন রকমের বীভৎস উপায়ে ছোট জাতের প্রায়শ্চিত্ত বিধান আ
সে সকল লিখে নিজের ও পাঠকের মন খারাপ ক'রতে চাই না।

কিছুদিন আগে এখানকার বিখ্যাত হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের (Harvard University) ছা
বাসে নিগ্রো ছেলেকে রাখা নিয়ে বিশেষ আন্দোলন হ'য়েছিল। প্রথমে যায়গা দেওয়া হয় নি
অনেক আন্দোলনের পর এখন যায়গা দেওয়া হ'য়েছে। সেদিন বষ্টনে কয়েকজন আমেরি
বন্ধুর সঙ্গে এ নিয়ে আলাপ ক'রেছিলাম, তারা এসব বিষয়ে উদার ব'লে আমার জানা ছিল,
হার্ভার্ডের হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে আমি আমার বিস্ময় জানাই। উত্তরে আমার আমেরি
বন্ধুরা বলেন যে হার্ভার্ড্ এতদিন উদার ছিল, তার কারণ, এ অঞ্চলে নিগ্রোর সংখ্যা খুব ক
কিন্তু এখন দক্ষিণদিক থেকে অনেক নিগ্রো বষ্টনে আস্‌ছে। কেন না তারা দক্ষিণের

নে অনেক বেশ ভাল ব্যবহার পায়। যত সংখ্যায় বেশী হবে—গোলমালও তত বেশী হবে। এতে আর আশ্চর্য্য হবার কি আছে?

যাহোক, এ দেশের লোক যতই কেন উদার, মহৎ ও খৃষ্ট-ধার্ম্মিক হোক না এখনও জাতিভেদ অস্থি মজ্জায় রয়েছে। নিগ্রোর উপর যেমন অমানুষিক অত্যাচার আমেরিকায় হয়—ইউরে টা হয় না বটে—কিন্তু ভেদাভেদ পুরা মাত্রায়ই আছে। আমেরিকার নিগ্রো সমস্যা বড় সহজ সমস্যা নয়। দুই পাঁচ হাজার হলে এত বড় দেশে খুব বেশী কঠিন হোত না—কিন্তু ১০,৪৬৩,১৩১ (১৯২০ সালের গণনা) জন নিগ্রোর সমস্যা আমেরিকাকে অনেক চিন্তায় ফেল সন্দেহ নাই। এটাই আবার শেষ সমস্যা নয়।

এদেশবাসীর সমস্যা যদিও এত বেশী জটিল নয় তবু উদারতা, সাম্য, স্বাধীনতা ও মৈত্রী প্রচার ক ও একটা সমস্যা এতদিন পর্য্যন্ত হিন্দুস্থানবাসীরা এদেশে আর্য্যসন্তান ব'লে ছিল। গত মাসে এ দেশীয় উচ্চ আদালতের বিচারে ঠিক হ'য়েছে যে হিন্দুস্থানীরা আর্য্য হোক বা অন্য কোন হোক এ দেশের বাসিন্দা (Citizen) হ'তে পারবে না। হিন্দু মুসলমান সকলেই এদেশে "হিন্দু" এই সাধারণ নামে পরিচিত। হিন্দুদের রং কালো ধূসর, পিঙ্গল, ফর্শা প্রভৃতি নানা রকম হোলেও এ দেশীয় লোকে তাদের আর্য্য সন্তান অর্থাৎ ইউরোপীয়ানদের একই জাতীয় ব'লে জানত, তারা ভাব্‌ত দারুণ গ্রীষ্মই রংএর জন্য দায়ী। যাহোক, আমেরিকা বহু সমস্যা আছে ব'লেই হোক বা অন্য যে কোনও কারণেই হোক, হিন্দুসমস্যার এক রকম শেষ ক'রেছে। এটা হোল আইনতঃ। যে সব হিন্দু এদেশে আছে, তাদের স্থান বিশেষে জাতিভেদের প্রকোপ বেশ সহ্য ক'রতে হয়। এমনকি ভারতবর্ষে যাদের ব্রাহ্মণ বা ঐরূপ কোনও উচ্চ জাতিতে জন্ম—তাদেরও কষ্ট কিছু কম হয় না। এ দেশের শ্বেত ব্রাহ্মণের কাছে আধ ফর্শা, ধূসর, শ্যাম ঘনশ্যাম, কালো, মিশ্ মিশে কালো সকলেই ছোট জাতীয়। অনেক স্থানে কালোকে (হিন্দু বা অহিন্দু) শাদার হোটেলে খেতে বা থাক্‌তে দেয় না, শাদার নাপিতে কালোর কাজ ক'রবে না—অনেক সহরে শাদার বাড়ীতে কালোকে ঘর ভাড়া দেবে না। যখন এ সব দেখি তখন দেশের জাতিভেদের কথা মনে পড়ে। যাক্ জাতিভেদের হিসাবে শাদা আমেরিকার কাছে হিন্দুস্থানীরাও একঘ'রে।

এশিয়ার বাকী সমস্যা চীনা ও জাপানী। আইনতঃ মঙ্গোলিয়ান জাতি (চীনা, জাপানী ব্রহ্মদেশীয় ইত্যাদি) আমেরিকার বাসিন্দা হ'তে পারে না। ব্যবসায়ের জন্য বহু চীনা ও জাপানী এদেশে আছে। ১৯২০ সালে ৬১৬৩৯ জন চীনা ও ১১১,০১০ জন জাপানী এদেশে ছিল। ছাত্র ও ব্যাবসায়ীই অধিকাংশ। এমন সহর বা বোধ হয় এমন গ্রাম নাই যেখানে অগত্যা ১টী চীনা খাবার দোকান (Chinese Chop Suey) না আছে, কাপড় কাচা (ধোপা)র কাজ এদের আর ১টী বড় ব্যবসায়। যদিও শাদা আমেরিকার কাছে এরা, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সমাজ, হাব ভাব, চাল চলন

BLOCKED INFORMATION.

প্রভৃতি বহু বিষয়ে একঘ'রে, তবু ব্যবসায় হিসাবে এরা অনেক একঘ'রে ছোটজা[ত] মানিয়েছে। সামাজিক হিসাবে এদের অবস্থা নিগ্রোর চেয়ে খুব বেশী লোভনীয় নয়। চেয়ে জাপানীদের অবস্থা বরং একটু ভাল। তার কারণ বোধ হয় তারা আধুনিক শক্তিশালী জাতি। হিন্দুদের অবস্থা সামাজিক হিসাবে বোধ হয় সকল জাতিহারাদের চেয়ে ভাল এবার তাও আইনতঃ শেষ হ'য়েছে। সুতরাং দেখা গেল যে জাতিভেদ হিসাবে প্রায় এশিয়া, শাদা আমেরিকার কাছে ছোট জাত। এশিয়ার সমস্যা খুব বেশী কঠিন না হওয়ার যে এশিয়ার জাতিরা সামাজিক হিসাবে এদের কাছে নীচ জাতি, তাই ইচ্ছা ক'রলে তাদের যথা ফিরিয়ে দেওয়া অসম্ভব নয়। যাই হোক এই নীচ জাতির সঙ্গে সামাজিক আদান প্রদান শাদা আমেরিকান সহজে করে না, মুখে যতই উদারতা দেখাক না, কাজের বেলায় ঠিক আছে।

অনেক আমেরিকান তর্কচ্ছলে বলে যে, এ পার্থক্য শুধু বিভিন্ন জাতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা জন্য। আমরা নিজদের মধ্যে ভেদাভেদ করি না, শুধু ভিন্ন জাতির মধ্যে পার্থক্য রক্ষা আর ভারতবর্ষে এক হিন্দু জাতির মধ্যে জাতিভেদ আছে বলে আমরা টাকা খরচ করে মি পাঠাই। কি সাধু প্রবৃত্তি! উদার চরিত্র।

কিন্তু আমেরিকা সে দোষেও সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী নয়। তাই আমেরিকার অপর সম ইহুদি সমস্যা বলা যায়। ইহুদিরা পৃথিবীর প্রায় সর্ব্ব দেশেই আছে। যে যেখানেই আছে, তার বজায় রেখেছে। আমেরিকায় এসে তারা এদের ভাষা, বেশভূষা, আদবকায়দা সবই গ্রহণ ক'রেছে, অথচ তারা সেই ইহুদিই থেকে যাচ্ছে। ধর্ম্ম ব্যতীত এদের তফাৎ আর কিছুতে নাই। তবু এরা শাদা খৃষ্টান আমেরিকানের কাছে এক ঘরে হয়ে আছে সংখ্যায় বেশী বলে এরা সাধারণতঃ নিজেদের গণ্ডীর বাইরে যেতে চায় না বা যাওয়ার দরকার মনে করে কিন্তু জাতিভেদের এমনি মহিমা যে অনেক বাড়ীতে ইহুদিকে ঘর ভাড়া দেবে না—এ হোটেলে ইহুদিকে খেতে বা থাকতে দেবেনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে থাকা নিয়েও ইহুদি বিশেষ গোলমাল হ'য়ে গেছে। অথচ টাকার হিসাবে এই ইহুদিরাই একরকম এদেশটা চালা বিবাহে আদান প্রদান খুব কম শোনা যায়। এরূপ বিবাহ কেন যে হয় না তার কারণ দেখান কঠিন নয়। সেই পুরান জাতিভেদ। কার্য্যতঃ বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে আমেরিকায় জাতি বেশ ভাল রকমই আছে। এছাড়া ইটালিয়ান, গ্রীক, তুর্ক প্রভৃতি অনেক বিভিন্ন জাতি আছে অবস্থা ঠিক ইহুদিদের মত না হোলেও কতকটা ঐ রকম। ভারতবর্ষকে যে জন্য দোষ হয় এখানেও ঠিক সেই রকম বা তার চেয়ে বেশী জাতিভেদ আছে। এ দেশে জাতিভে বলে যে জাতিভেদ ভাল এ ধারণা আমার মুহূর্ত্তের জন্যও হয় না। বরং আমার দৃঢ় বিশ্বাস অস্বাভাবিক ভেদাভেদ যত কম হয় পৃথিবীতে শান্তি তত শীঘ্র আসবে। মানুষ মানুষকে ব'লে না নিয়ে তাকে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ইহুদি, ইংরেজ, জার্ম্মান, ইটালিয়ান, নিগ্রো

[illegible]ত চায় তাই এত শত্রুতা। আমেরিকার জাতীয় জীবনে এরূপ উচ্চ আদর্শ ছিল। [illegible]নও আছে কাগজে কলমে, কিন্তু কার্য্যতঃ এখনও হয় নাই। বরং অনেকটা উল্টা হচ্ছে। এখানে একটী নূতন দল জুটেছে (Ku-Klux-Klan কু-ক্লুক্স্-ক্ল্যান) তারা ক্যাথলিক, ইহুদি, নিগ্রো ও বিদেশী এ সকলকেই এ দেশ থেকে তাড়াতে চায়, এ দেশটা চায় শুধু শাদা প্রটেষ্টাণ্ট্ খৃষ্টানদের জন্য।

শ্রীশরৎ মুখার্জ্জী

বন্দী-জীবন*

দ্বিতীয় খণ্ড—চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বাঙ্গলাদেশে।

(১) কেন্দ্রের কথা।

সুনিয়ন্ত্রিত উপযুক্ত শক্তিশালী সঙ্ঘ না থাকিলে আজকাল কোন কার্য্যই সফল করা সম্ভব নহে; এবং ভারতের পক্ষে স্বায়ত্ব শাসন লাভ করার অর্থই হইল স্বাধীনতা লাভ করা; এইরূপ একটি বিরাট ও কঠিন কার্য্য সফল করিবার জন্য যেরূপ বিশাল ও শক্তিশালী সঙ্ঘের আবশ্যকতা ছিল, আমাদের কেন্দ্রের নেতারা সে কথা তেমনভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তাই ইঁহাদের অধিনায়কত্বে বাঙ্গলায় কোনও বিশেষ দল গড়িয়া ওঠে নাই; ইঁহাদের দলের ক্ষুদ্র গণ্ডি গ্রামের সীমানা অতিক্রম করিতে পারে নাই। এইরূপভাবে কার্য্য করিলে কৃতকার্য্য না হইবারই সম্ভাবনা; তাই শুদ্ধ ইঁহাদের চেষ্টায় বলিতে গেলে terrorism-এর কোন চেষ্টাই সার্থক হয় নাই। এই সব কার্য্য প্রণালী লইয়া ইঁহাদের সহিত আমাদের প্রায়ই ঘোর তর্ক হইত।

এইরূপে দলের আদর্শ কেবল terrorism রাখা হইয়াছিল বলিয়া আমাদের মত অনেক যুবকই ইঁহাদের আদর্শে প্রাণ মন খুলিয়া সায় দিতে পারেন নাই। আর এইরূপ terrorism-এর আদর্শ সত্যই চিন্তাশীল যুবকদিগের প্রাণ মন আকর্ষণ করিতে পারে না। যথার্থই খুব উচ্চ উদার সার্ব্বজনীন আদর্শে অনুপ্রাণিত না হইলে জীবন সর্ব্বস্ব পণ করিয়া কেহ দেশের কাজে পদার্পণ করিতে পারেনা। তাই কেবল মাত্র terrorism-এর আদর্শে লোক সংগ্রহ সম্ভব ছিল না। সেইজন্য লোক সংগ্রহার্থে অন্যান্য অনেক আদর্শের অবতারণা করিতে হইত এবং বিপ্লব সমিতির কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে প্রায় সকলকেই ঘোর অন্ধকারেই রাখা হইত। এইরূপে জনকয়েক মাত্র লোক সংগ্রহ করিয়া কার্য্যকালে তাঁহাদিগের দ্বারা কেবল মাত্র terrorism-এর কাজই করান হইত।

* সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

BLOCKED INFORMATION.

ইহা আমাদিগের মনঃপূত ছিলনা! রাসবিহারী ও তাঁহার মতাবলম্বী যুবকদিগের সহ
হইবার পর যেদিন প্রথম এই সকল নেতাদের সহিত আমার পরিচয় হইল সেদিন আমি এ
স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলাম; ভাবিয়াছিলাম এ আবার কেমন দলে আসিয়া প্রবেশ লাভ কর
অবশ্য তাঁহাদের কথার প্রতিবাদ আমি সেইদিনই করিয়াছিলাম, এবং রাসবিহারীর সহিত
আলাপ হইলে তাঁহার নিকট এবিষয় অনুযোগও করিয়াছিলাম। সেইদিন হইতে রাস
আমায় বলিয়া দেন কর্ম্মযোগ ও ধর্ম্মসাধনা সংক্রান্ত কথা ছাড়া আমাদের কর্ম্ম প্রণালী
কোনও কথা ইঁহাদের সহিত যেন আলোচনা না করি।

রাসবিহারী বাল্যকাল হইতেই ইঁহাদের সংসর্গে ছিলেন, কিন্তু ইঁহাদের প্রকৃতির সহিত
প্রকৃতির মিল ছিল না। একটু বড় হইয়া যখন তিনি ডেরাডুনে চাকরি করিতে যান, তখন হ
তিনি নিজের কর্ম্মের ধারা নিজেই সৃষ্টি করিয়া লন। প্রকৃতি দেবী যেমন সকলকার অল
নিজের কার্য্য গড়িয়া তোলেন, রাসুদাও তেমনি তাঁহার নেতাদের অজ্ঞাতে এক বিশাল দল গ
তোলেন; অবশ্য কার্য্য কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর কেন্দ্রের নেতাদিগকে অনেক
জানাইয়াছিলেন। রাসবিহারী ইঁহাদের মত কেবলমাত্র terrorism-এর পক্ষপাতী ছিলে
বলিয়াই তাঁহার কর্ম্ম প্রণালী এক ভিন্ন ধরণেরই হইয়াছিল। কিন্তু ইঁহাদের সহিত
অমিল থাকা সত্তেও রাসবিহারী বিরোধ ও দলাদলির পক্ষপাতী ছিলেন না, তাই ইঁহাদের
যতটা সম্ভব মিলিয়া মিশিয়াই কাজ করিতেন।

আরও একটি কারণে কেন্দ্রের নেতাদের সহিত আমাদের বিষম বিরোধ বাধিত।
নেতারা মনে করিতেন আধ্যাত্মিকতার গূঢ় মর্ম্ম কেবলমাত্র তাঁহারাই আয়ত্ত করিতে পারিয়া
তাই তাঁহাদের সহিত মতভেদ হইলেই তাঁহারা বলিতেন যে আমরা নিতান্তই পাশ্চাত্য আ
মাতিয়া উঠিয়াছি, যেন terrorism অপেক্ষা খাঁটি বিপ্লব প্রচেষ্টা অধিকতর পাশ্চাত্য আ
প্রণোদিত;—বিরুদ্ধ পক্ষের মত খণ্ডনের এই অকাট্য যুক্তিটা আজকাল অনেকের মুখেই শু
পাওয়া যায়।

ইঁহারা নানারূপেই প্রচার করিতেছিলেন যে বৈরাগ্য সাধনা অথবা ধ্যান ধারণা ও সম
পথই ভগবান লাভ করিবার একমাত্র শ্রেষ্ঠ পথ নহে। তাই ইঁহারা সংসার ত্যাগ না ক
সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম্ম সুচারুরূপে করিয়াও সংসারে অনাসক্ত হইয়া থাকাকেই শ্রে
বলিয়া প্রচার করিতেছিলেন, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে ইঁহারা নিজেদের ক্ষুদ্র গণ্ডিকে রাজনীতি
সযত্নে পৃথক করিয়া রাখিবার সবিশেষ চেষ্টা করিতেন। তাই আমাদের সহিত ইঁহাদের
বিরোধ বাধিত। যেদিন পাঞ্জাবের বিপ্লবায়োজন পণ্ড হইবার পর আমরা এই কেন্দ্রে
একটু হাঁফ ছাড়িবার জন্য আশ্রয় লইলাম সেদিনও ইঁহারা খোঁটা দিয়া আমাদের বলিয়া
"অনেক লাফালাফি ত হইল, এইবার একটু শান্ত হইয়া বসিয়া ভগবানের আরাধনা কর।"

আমার মনে হয় ইঁহাদের প্রকৃতি বিপ্লব ধর্ম্মের বিরোধী ছিল, তাই ইঁহারা নানারূপ ঘটনা
চক্রে পড়িয়া ক্রমশঃ এই বিপ্লবাবর্ত্ত হইতে বহুদূরে সরিয়া পড়েন। ইঁহারা মুখে জ্ঞান, কর্ম্ম ও
বৈরাগ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিবার আদর্শ প্রচার করিতেন বটে, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে
ইঁহারা আর সকলরূপে সংসারে কাজে লিপ্ত থাকিয়াও রাজনীতিকে, বিশেষতঃ যে রাজনীতির
আদর্শকে অনুসরণ করিলে ইংরাজ সরকারের সহিত বিরোধ অবশ্যম্ভাবী, সে পথকে অতি যত্নের
সহিত এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিতেন। অবশ্য যতদিন পর্য্যন্ত ইঁহারা অন্যান্য বিপ্লবীদের সংস্পর্শে
ছিলেন, ততদিন সকলরূপেই ভীষণ বিপদকেও অগ্রাহ্য করিয়া সেই সব বিপ্লবীদের সাহায্য
করিয়াছিলেন, কিন্তু ইঁহাদের প্রকৃতি ভিন্ন ধরণের ছিল বলিয়া ক্রমশঃ ইঁহারা এই সকল বিপ্লবীদের
সাহচর্য্য ত্যাগ করিয়াছিলেন। যেমন বৈরাগ্যভাবাপন্ন মহাপুরুষ প্রথম প্রথম সংসার ও
ভোগের মধ্যেই লিপ্ত থাকেন, কিন্তু স্বধর্ম্মবশে ক্রমশঃ সেই বৈরাগ্যের পক্ষই অবলম্বন করিয়া
অবশেষে সংসার ত্যাগ করেন, তেমনই আমাদের এই নেতারা প্রথম প্রথম বিপ্লব সমিতির সহিত
অন্তরঙ্গভাবেই লিপ্ত ছিলেন, কিন্তু স্বধর্ম্মবশে ইঁহারা সকল প্রকার বৈপ্লবিক অনুষ্ঠান হইতে
ক্রমশঃ দূরে সরিয়া গিয়া অবশেষে বিপ্লবের সকল সম্পর্কই ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু বৈপ্লবিক
কর্ম্মে যোগ না দিলেও ইঁহারা সংসার ত্যাগ করেন নাই, এবং রাজনীতিকে বাদ দিয়া আর সকল
রূপেই ইঁহারা সমাজের সেবা করিতেন।

এইসব নানা কারণে ইঁহাদের সহিত আমাদের মনের মিল হয় নাই। যতদিন রাসবিহারী
দেশে ছিলেন ততদিন তিনি ইঁহাদের নিকট হইতে দূরে দূরে থাকিলেও ইঁহাদের মান্য করিয়া
চলিতেন; বোধ হয় ইহার প্রধান কারণ ছিল রাসবিহারী বাল্যকাল হইতেই ইঁহাদেরই অধিনায়কত্বে
গড়িয়া উঠিয়াছিলেন; কিন্তু ক্রমশঃ রাসুদার চরিত্রেরও এমন পরিবর্ত্তন হইয়াছিল যে ভারত ত্যাগ
করিবার পূর্ব্বে যখন তিনি ইঁহাদের নিকট শেষবার আসিয়াছিলেন তখন ইঁহারা রাসুদার ব্যক্তিগত
প্রভাবের কথা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "একে লুকিয়ে রাখি কেমন ক'রে; একে যে দেখবে
তারই যে দৃষ্টি এখানে আবদ্ধ হ'য়ে যাবে; এ'কে দেখলেই যেন মনে হয় 'হাঁ, একটা মানুষের মত
মানুষ বসে আছে বটে'।" যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময় ইঁহাদের বাড়ি মেরামতের কাজ
চলিতেছিল বলিয়া কুলি মজুরেরা নিত্যই বাড়ির ভিতর যাওয়া আসা করিতেছিল। এই সকল
কুলি মজুরের যাওয়া আসাকেই উপলক্ষ করিয়া তিনি ঐ কথাগুলি বলেন। একদিন ইঁহারাই
রাসুদার গুরুর মতই ছিলেন, কিন্তু শেষে শিষ্যের প্রভাবে তাঁহারা মুগ্ধ হইয়াছিলেন।
রাসবিহারীর বিদেশে চলিয়া যাইবার পর হইতে কিন্তু ক্রমশঃই আমরা এই সকল নেতাদের
নিকট হইতে দূরে সরিয়া পড়ি। এই সময়ে বাঙ্গলাদেশে যে সকল বিপ্লবদল ছিল তাহার
মধ্যে ঢাকার বিপ্লবদলের সহিতই আমরা সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠভাবে মিলিয়া মিশিয়া কাজ
করিতেছিলাম।

BLOCKED INFORMATION.

(৩) ঢাকার অনুশীলন সমিতির কথা।

বাঙ্গলায় সকল বিপ্লব দলেরই ধারণাছিল যে ঢাকার অনুশীলন সমিতি অন্যান্য সমিতির সহিত মিলিয়া মিশিয়া কাজকর্ম্ম করিতে অনিচ্ছুক অথবা বাঙ্গলার কোন বিপ্লব ঢাকার অনুশীলন সমিতির সহিত মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে পারিবে না। কিন্তু কেহই জানিতেন না যে ঢাকার সমিতি চন্দননগর অথবা রাসবিহারীর দলের সহিত সম্ মিলিয়া গিয়াছিল, এবং এই মিলন ইয়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের বহু পূর্ব্বেই সাধিত হয়। যতদূর অভিজ্ঞতা আছে তাহাতে এইটুকু বলিতে পারি যে দোষেগুণে এই ঢাকার অ সমিতি বাঙ্গলার অন্যান্য অনেক বিপ্লব সমিতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল। ইঁহাদের মত দল বাঙ্গলায় আর কোন বিপ্লব দলই ছিল না। পূর্ব্ববাঙ্গলার এবং উত্তর বাঙ্গলার প্রতি জেলাতেই ইঁহাদের শাখা প্রশাখা ছিল। ইঁহারা যে সংখ্যায় এবং প্রসারে সকল বিপ্লব দল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন একথা সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গের বিপ্ল নেতারা পূর্ব্ব বঙ্গের লোকদিগকে অপেক্ষাকৃত অল্প বুদ্ধিমান মনে করি , তাই ই বঙ্গের দলকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন না। পশ্চিম বঙ্গের বিপ্লব দলের যুবকেরা পূর্ব্ব যুবকদিগের অপেক্ষা নিজেদের অধিক cultured মনে করিতেন। এতদ্ব্যতিরেকে অনুশীলন সমিতিকে বাঙ্গলার প্রায় সকল বিপ্লব দলই অল্পবিস্তর পরিমাণে ঈর্ষার চক্ষে দে এইসব কারণে চন্দননগর অথবা রাসবিহারীর দল ছাড়া বাঙ্গলার আর কোন দলই অনুশীলন দলের সহিত মিলিয়া গিয়া এক অখণ্ড দল গড়িয়া তুলিতে ইচ্ছুক হন নাই। অহঙ্কার বড় ভয়ানক বস্তু। ইহা মানুষকে বড় করিবার পক্ষেও যেমন সাহায্য করে আবার ইহা মানুষকে অধঃপতনের দিকে টানিতেও ত্রুটি করে না। বরং অহঙ্কারকে করিয়া রাখাই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কাজ, তাই প্রায় সর্ব্বত্রই এই অহঙ্কার হইতেই যত সৃষ্টি হইয়াছে। বাঙ্গলায় বিভিন্ন বিপ্লব দল যে মিলিয়া মিশিয়া এক বিরাট দলে হইতে পারে নাই তাহার সর্ব্বপ্রধান কারণ এই সকল বিভিন্ন দলের নেতাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি। এই অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়াই বাঙ্গলার কোন দলই অন্য দলের সহিত মিশিয়া এক হইবার চেষ্টাও করে নাই এবং শেষে চেষ্টা করিলেও কৃতকার্য্য হইতে পারে এইজন্য বাঙ্গলা দেশে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিপ্লব দলের অস্তিত্ব ছিল। বাঙ্গলায় মনে হয় কর্ম্মীর অপেক্ষা নেতার সংখ্যাই অধিক। বাঙ্গলায় যিনি দশটি যুবককেও করিতে পারিয়াছেন তিনিই এক নেতা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন; একবার নেতা হইতে আর তিনি অন্য কোন দলের সহিত মিলিয়া যাইতে স্বীকার করেন নাই; তাহার প্রধ এই যে এই সকল তথাকথিত নেতারা মনে করিতেন যে ঐরূপে অন্যান্য দলের সহি হইলে তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্য একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে। আমার মনে হয় বাঙ্গলার

দলের নেতাদের এইরূপ মনের ভাব ছিল বলিয়াই তাঁহারা ঢাকার দলের সহিত কিছুতেই মিলিতে স্বীকার করেন নাই; তাঁহারা মনে করিতেন কোনও বড় দলের সহিত মিলিত হইতে হইলে তাঁহাদের ক্ষুদ্রত্ব প্রকাশ হইয়া পড়িবে এবং সেই বড় দলে হয়ত তাঁহাদের প্রাধান্য কিছুই থাকিবে না। বহুবার আমি স্বয়ং বাঙ্গলার কয়েকটি বিপ্লব দলকে ঢাকার সহিত মিলাইবার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু কোনবারই কৃতকার্য্য হই নাই। অবশ্য এইরূপে মিলন না হইবার আরও একটি বিশেষ কারণ ছিল। বাঙ্গলার বিভিন্ন বিপ্লব দলের মধ্যে এমন কোনও অতিমাত্রায় শক্তিশালী নেতৃত্ব ছিলেন না যাঁহার ব্যক্তিগত মোহিনী শক্তিবলে বিভিন্ন দল নষ্ট হইয়া শেষে একদলে পরিণত হইতে পারিত। অবশ্য সেরূপ কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তি থাকিলেও বাঙ্গলার সকল দল মিলিয়া মিশিয়া এক হইত কি না সন্দেহ।

যে কারণেই হউক বাঙ্গলার প্রায় সকল বিপ্লব দলই ঢাকার সমিতির প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। হয়ত তাহা একটি কারণ এই ছিল যে পূর্ব্ব বাঙ্গলায় অনুশীলন সমিতির প্রায় সকল সভ্যের মনেই একটু এইরূপ গর্ব্বের ভাব ছিল যে তাঁহাদের মত শক্তিশালী দল বাঙ্গলায় আর নাই। বোধ হয় এই জন্যই পশ্চিম বঙ্গের বিপ্লব দল পূর্ব্ব বাঙ্গলার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দু'একটি বিপ্লব দলের প্রতি তেমন বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন না যেমন এই ঢাকা সমিতির প্রতি ছিলেন। এইরূপ হইবার আরও একটি কারণ ছিল। ঢাকা সমিতি পুলিনবাবুর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং এই পুলিনবাবুর প্রকৃতিতে autocracyর ভাব ভয়ানক প্রবল ছিল। পুলিনবাবু সত্যই অন্য কাহারও সহিত মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। পুলিনবাবুর আধিপত্য যেখানে এতটুকুও খর্ব্ব হইবে সেখানে পুলিনবাবুর থাকা অসম্ভব; এই হিসাবে পুলিনবাবু এবং বারীনবাবু সমপ্রকৃতির লোক। এই কারণেই পুলিনবাবুর বর্ত্তমানে ঢাকার সহিত অন্য কোন সমিতির সহিত মিলিতে সক্ষম হয় নাই; এবং পুলিনবাবুর জন্যই সে সময় হইতেই বাঙ্গলার সকল দলই ঢাকা সমিতির প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া যায় ও কালক্রমে সেই অসন্তোষের বহ্নি ক্রমশঃ বিকৃত আকার ধারণ করে। বাস্তবিকপক্ষে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে হইলে যে compromising attitudeএর আবশ্যক, পুলিনবাবুর মধ্যে সে জিনিষটির বিশেষ অভাব ছিল। কিন্তু পুলিনবাবুর জেল হইবার পর ঢাকা সমিতিতে একচ্ছত্র আধিপত্য আর কাহারও থাকে নাই। তখন হইতেই এই সমিতি গণতন্ত্রের আদর্শে অনেকটা গাড়িয়া উঠিয়াছিল। বাঙ্গলার বিভিন্ন দল তাহাদের নেতাদের নামেই পরিচিত ছিল, যেমন যতীনবাবুর দল, বিপিনবাবুর দল ইত্যাদি। কিন্তু পূর্ব্ব বাঙ্গলার এই ঢাকা সমিতির কোনও একজন নির্দ্দিষ্ট না থাকায় ইহা শেষ পর্য্যন্ত ঢাকা অনুশীলন সমিতি নামেই পরিচিত হইয়া আসিয়াছে। এইরূপে সর্ব্বাংশে একজনার নেতৃত্বাধীনে না থাকায় যে এই দল কিছু কম শক্তিশালী হইয়াছিল তাহাও নহে, কারণ যত ঝড় তুফান এই ঢাকা সমিতিকে সহ্য

BLOCKED INFORMATION.

করিতে হইয়াছে এত আর কোন দলকে করিতে হইয়াছে কি না সন্দেহ। বারবার বিব
পড়িয়াও আবার এই দল মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্ব বঙ্গের যুবকদিগের
এক বিশেষত্ব যে তাঁহারা একবার যাহা গ্রহণ করেন তাহাকে জীবনের শেষ পর্য্যন্ত আঁক
ধরিয়া থাকেন। পশ্চিম বঙ্গের লোকেরা পূর্ব্ব বাঙ্গলার যতই, দোষ দেখান, আমার
মনে হয় পূর্ব্ব বাঙ্গলার যুবকেরা পশ্চিম বঙ্গের যুবকদিগের অপেক্ষা অধিক সর
অধিক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। পশ্চিম বঙ্গের লোকেদের মধ্যে আন্তরিকতা কম এবং স্বদেশী
ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় পূর্ব্ব বাঙ্গলা সকলরূপ রাষ্ট্রীয় কার্য্যেই পশ্চিম
অপেক্ষা অধিক অগ্রসর। পূর্ব্ব বাঙ্গলার যুবকেরা আর সকলরূপে ভাল হইলেও
একটি বিশেষ দোষ এই যে তাঁহারা অনেক সময় বড় intriguing এবং তাঁহাদে
হয় সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতার ভাব কিছু প্রবল। সে যাহাহউক পুলিনবাবুর পর যাঁহারা
সমিতির নেতৃস্থানীয় হইয়াছিলেন তাঁহারা অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছিলেন দেশের বি
বিপ্লব দল মিলিয়া মিশিয়া সম্পূর্ণরূপে এক হইতে না পারিলে দেশের মঙ্গল নাই। তাই তাঁ
দেশের সকল দলের সহিতই মিলিবার জন্য ইচ্ছুক ছিলেন; সেইজন্যই সম্ভবত বরিশাল
মামলার সময়েই ঢাকা সমিতি চন্দননগর দলের সহিত মিলিত হইয়া যায়। কাশীর দল
ঢাকা সমিতির মার্ফতই রাসবিহারীর উত্তর ভারতের দলের সহিত পরিচিত হয়। এই
আমাদের দল পূর্ব্ব বাঙ্গলা হইতে আরম্ভ করিয়া পাঞ্জাব প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া এক
কাজ করিতে থাকে। পাঞ্জাবের বিপ্লবায়োজনের সংবাদও অধিকাংশস্থলে এই ঢাকা সমি
মার্ফতই বাঙ্গলার বিভিন্ন বিপ্লব দলের নিকট পাঠান হয়। লাহোর; দিল্লী, কাশী, চন্দনন
ও ঢাকার বিপ্লবদল এইরূপে সর্ব্বাংশে এক হইয়া যায়। একথা কিন্তু বাঙ্গলার অন্য
বিপ্লব দল সে সময় ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারেন নাই।

যেদিন Defence of India actএর প্রকোপে কয়েক সহস্র যুবক কেবল মাত্র সন্দেহে
ফেরে বিনা বিচারে বন্দী হইয়াছিলেন, সেইদিন বাঙ্গলার সকল দলই শক্তিহীন হইয়া পরস্পরের সহি
মিলিয়া মিশিয়া একযোগে কাজ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং অল্প কিছুদিন সেভাবে কার্য্য
চলিয়াছিল। এই মেলা মেশা যদি সময় মত হইত তাহা হইলে হয়ত ফল অন্যরূপও হইতে পারিত
রাসবিহারী ভারত ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে যখন একবার কলিকাতার নিকটে কোথাও আসিয়াছিলে
সেই সময় তিনি আমায় একবার কলিকাতা অঞ্চলের বিভিন্ন দলের নিকট মেলামেশা করিবা
প্রস্তাব বলিয়া পাঠান। কলিকাতা অঞ্চলের কোন দলই কিন্তু এই মেলামেশার প্রস্তাবে তে
গা দেখান নাই। অগত্যা রাসুদাকেও এই চেষ্টা হইতে নিরস্ত হইতে হয়।

যাহাহউক রাসুদার বিদেশ যাত্রার পরও আমরা এই পূর্ব্ব বাঙ্গলার দলের সহিত পূর্ব্বে
মতই মিলিয়া কাজ করিতে লাগিলাম। রাসুদার বিদেশ যাত্রার খরচ, একসহস্র মুদ্রা, এই দ

তের নিকট হইতেই লওয়া হয়। যে সময় রাসুদাকে বিদেশে পাঠান হয় তখন পর্য্যন্তও বাঙ্গলার
বিপ্লবদলের শক্তি কিছুমাত্র কমে নাই। বরং তখন বাঙ্গলার বিভিন্ন বিপ্লবদলের মধ্যে প্রতিযোগিতা
চলিয়াছে, কোন দল কত কাজ করিয়া অন্য দলকে লজ্জিত করিতে পারে। রাসুদাকে বিদেশে
পাঠাইয়া আমরা মনে করিলাম বিদেশ হইতে অস্ত্রের আমদানি করিবার চেষ্টা আমাদের দল হইতেই
সর্ব্ব প্রথম করা হইল, কিন্তু আমরা তখন জানিতাম না যে যতীন বাবুর দলও ঠিক এই সময়েই
নিজেদের লোক বিদেশে পাঠাইয়াছেন। দেশে আমরা বিভিন্ন দল এইরূপে বিচ্ছিন্নভাবে কার্য্য
করিতেছিলাম বটে কিন্তু বিদেশে সে সময় সকল দলই বোধ হয় মিলিত হইয়াছিলেন।

এই সময়কার সকল ঘটনা আমার ভাল করিয়া জানা নাই, বিশেষতঃ বিদেশে কিরূপে
কাজ চলিয়াছিল তাহার কোন কোন সংবাদই আমি জানি না; কারণ রাসুদার বিদেশে যাইবার
মাস দুই তিন পরেই আমি ধরা পড়ি। তবে পূর্ব্ববঙ্গের গিরিজা বাবু যখন নভেম্বর মাসে
(১৯১৫ সাল) ধরা পড়িয়া কাশী আসিয়াছিলেন তখন তাঁহার নিকট শুনিয়াছিলাম যে রাসুদা নাকি
সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন যে, শীঘ্রই তিনি দেশে ফিরিতেছেন। তাঁহার সহিত কথা ছিল যে বিপ্লব
চালাইবার পক্ষে উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি করিবার সুবন্দোবস্ত করিতে পারিলে
তবেই তিনি দেশে আসিবেন; তাই তাঁহার "দেশে ফিরিতেছি" এই সংবাদ পাইয়া আমরা
মনে করিয়াছিলাম যে তিনি অস্ত্রশস্ত্রের আমদানি করিবার একটা কিছু সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন।
কিন্তু ঠিক সেই সময়েই আরও কোন বিশ্বস্তসূত্রে আমরা জানিতে পারি যে সরকার বাহাদুর বিদেশ
হইতে অস্ত্রের আমদানির সকল সংবাদই জানিতে পারিয়াছিলেন এবং ভারতবর্ষের উপকূলে দুই
একটি অস্ত্রপূর্ণ জাহাজও নাকি ধরা পড়িয়া গিয়াছে। পরে Rowlatt committeeর reportএ
অনেক কথাই পড়িলাম। বিগত বিপ্লব যুগের ইতিহাসের এই অংশ শ্রীযুক্ত নলিনীকিশোর গুহ
প্রণীত "বাঙ্গলার বিপ্লববাদ"এ বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে। বিপ্লবযুগের এই অংশটি
আমি নলিনী বাবুর গ্রন্থ হইতেই কতক কতক উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিব।

ক্রমশঃ

শ্রীশচীন্দ্রনাথ সান্যাল

BLOCKED INFORMATION.

আনন্দময়ী

(১)

—ওগো আমার ছোট্ট কচি প্রিয়া !
চিত্ত-ভরা বিত্ত তোমার, স্নিগ্ধ মধুর হিয়া।
মূর্ত্তিমতী স্ফূর্ত্তি তুমি
আনন্দ যায় চরণ চুমি'
তোমায় আমি চিনিনিক' আঁখির আলো দিয়া।

(২)

সাধন-পথের পথিক আমি চল্‌ছি সব বেয়ে,
চিত্ত মম শুদ্ধ করি আলোক ধারায় নেয়ে,
শুনি কত গভীর বাণী,
নিত্য নূতন তথ্য আনি,
পুলক লাগে লক্ষ কবির হৃদয়-পরশ পেয়ে !

(৩)

ভেবেছিলাম তোমার মাঝে প্রাণের দোসর নাই,
আমার লাগি আমার মতই আলোর মানুষ চাই,
জ্ঞান-গরিমা নাইক' যেথা
আনন্দ কি মিল্‌বে সেথা !
জড়্‌লী মেয়ের জড়্‌লী বুলি—মূল্য তাহার ছাই !

(৪)

আজ্‌কে দেখি ভুল সে কথা—ভুল সেযে বিল্‌কুল্‌,
আনন্দ নাই বিশ্বে কোথাও তোমার সমতুল !
তোমার মুখের কথার মাঝে
বীণাপাণির আলাপ বাজে,
আনন্দ সে তোমায় নিয়েই আনন্দে মশ্‌গুল্‌ !

(৫)

তোমার চোখের একটুখানি [illegible] আলো
সৃষ্টি করে আমার মাঝে [illegible] গাত
একটু হাসি, এ[illegible]
দুষ্টুমি ও প্রগল্‌ভতা,
নিবিড়-নীরব আনন্দ দেয় [illegible] দিন-রা

(৬)

অর্থ-বিহীন তুচ্ছ যাহা—তাহাও ভাল লা
দুই অধরের কূজন-বাণী নবীন অনুরাগে !
কোথায় 'শেলী', 'সেক্ষপিয়ার',—
ভাল লাগে তাদের কি আর !
তোমার মুখের অফুট ভাষায় সব মাধুরীই জা

(৭)

কোথায় ছিল এমন ধারা সহজ-সরল প্রাণ
তারে আজি কুড়িয়ে পেনু আকাশ-পারের দা
এইখানে আজ প্রিয়ার সাথে
মিল্‌তে পারি হাতে-হাতে—
জ্ঞান-গরিমার সকল গরব হেথায় অবসান।

গোলাম মো

BLOCKED INFORMATION.

"মেবার-পতন"-এর গান *

[রচনা———স্বর্গীয় মহাত্মা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, এম্‌-এ]

(নট্ট গীত)

রাজকবি কিশোর দাস।

মিশ্র মালকৌষ———চৌতাল।

রাজরাজ মহারাজ মহীপতি, শাস' ধরা [illegible] প্রতাপে।
তব পৌরে রক্ষ রক্ষ অসুর সুর নর—ত্রিভুবন কাঁপে।
তব মহিমা গায় জগজন ;
করে মেঘ মৃদঙ্গ গরজন্‌ ;
করে আরতি আকাশে রবিশশী, টলে মহীধর তব পদদাপে॥

[স্বরলিপি———শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা]

ছায়া।

১	০	২	০	৩	৪			
II সা	-সা | সা	গা | -গা	গা | মা	দা | -দা	মা | -জ্ঞা	মা I		
রা	০ জ	রা ০	জ ম	হা ০	রা ০	জ		
১	০	২	০	৩	৪			
I দা	গা | দা	-মা | জ্ঞা	-া | মা	মা | মা	-সা | সা	-সা I		
ম	হী প	০ তি	০ শা	স' ধ	০ রা	০		
১	০	২	০	৩	৪			
I সা	-গা | গা	-দা | মা	-জ্ঞা | মা	-দা | গা	-সা | সা	-সা I		
অ	০ সী	০ ম	০ প্র	০ তা	০ পে	০		

* "মেবার-পতন"-এর গানের স্বরলিপি 'বঙ্গবাণী'র প্রতি সংখ্যায় ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইবে, এবং নাটকান্তর্গত গানগুলি অভিনয়কালে যে সুরে ও তালে গীত হইয়া থাকে, অবিকল সেই সুরের ও তালের অনুসরণ করা হইবে।

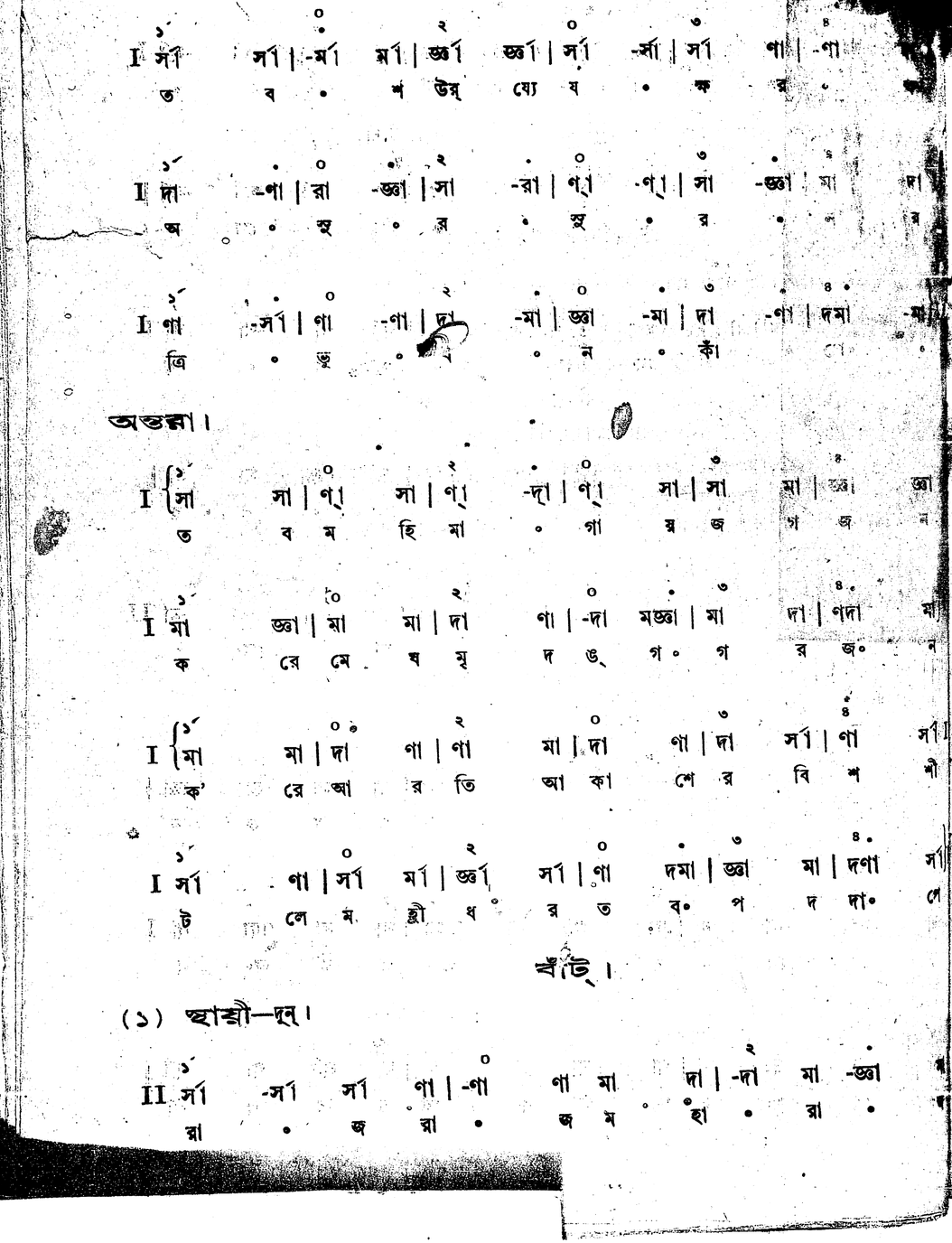

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
I র্সা র্সা | -র্মা র্মা | র্জ্ঞা র্জ্ঞা | র্সা -র্সা | র্সা ণা | -ণা
ত ব • শ উর্ য্যে য • ক্ষ র •

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
I দা -ণা | রা -জ্ঞা | সা -রা | ণ্া -ণ্া | সা -জ্ঞা | মা দা
অ • সু • র • সু • র • ন র

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
I ণা -র্সা | ণা -ণা | দা -মা | জ্ঞা -মা | দা -ণা | দমা -মা
ত্রি • ভু • ব • ন • কাঁ • পে •

অন্তরা।

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
I {সা সা | ণ্া সা | ণ্া -দ্া | ণ্া সা | সা মা | জ্ঞা জ্ঞা
ত ব ম হি মা • গা য় জ গ জ ন

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
I মা জ্ঞা | মা মা | দা ণা | -দা মজ্ঞা | মা দা | ণদা মা
ক রে মে ঘ মৃ দ ঙ্ গ • গ র জ• ন

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
I {মা মা | দা ণা | ণা মা | দা ণা | দা র্সা | ণা র্সা
ক' রে আ র তি আ কা শে র বি শ শী

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
I র্সা ণা | র্সা র্মা | র্জ্ঞা র্সা | ণা দমা | জ্ঞা মা | দণা র্সা
ট লে ম হ্রী ধ র ত ব• প দ দা• পে

বাঁট্।

(১) স্থায়ী—দুন্।

১´ ০ ২ ০
II র্সা -র্সা র্সা ণা | -ণা ণা মা দা | -দা মা -জ্ঞা
রা • জ রা • জ ম হা • রা •

০ ২ ০ ৩ ৪
I দা ণা দা মা | জ্ঞা -া মা মা | মা -র্সা র্সা -র্সা I
হী প • তী • শা স' ধ • রা •

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
I র্সা ণা ণা -দা | মা -জ্ঞা মা -দা | ণা -র্সা র্সা -র্সা |
অ • সী • ম • প্র • তা • পে •

০ ৩ ৪
I র্সা র্সা -র্মা র্মা | র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্সা র্সা | র্সা ণা -ণা দা I
ত ব • শ উর্ য্যে য • ক্ষ র • ক্ষ

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
I দা -ণা রা -জ্ঞা | সা -রা ণ্া -ণ্া | সা -জ্ঞা মা দা |
অ • সু • র • সু • র • ন র

০ ৩ ৪
| ণা -র্সা ণা -ণা | দা -মা জ্ঞা -মা | দা -ণা দমা -মা II
ত্রি • ভু • ব • ন • কাঁ • পে• •

(২) অন্তরা—দুন।

১´ ০ ২
II সা সা ণ্া সা | ণ্া -দ্া ণ্া সা | সা মা জ্ঞা জ্ঞা |
ত ব ম হি মা • গা য় জ গ জ ন

০ ৩ ৪
| মা জ্ঞা মা মা | দা ণা -দা মজ্ঞা | মা দা ণদা মা I
ক রে মে ঘ মৃ দ ঙ্ গ • গ র জ• ন

১´ ০ ২
I মা মা দা ণা | ণা মা দা ণা | দা র্সা ণা র্সা |
ক রে আ র • তি• আ কা শে • র বি শ শী

BLOCKED INFORMATION.

| সা | গা | সা | মা | জ্ঞা | সা | গা | দমা | জ্ঞা | মা | দণা | ম
ট | লে | ম | হী | ধ | র | ত | ব• | প | দ | মা | ০

(৩) স্থায়ী—চৌদুন। আট মাত্রার একএকটী করিয়া তাল-দ্বয় এবং ৪৮ মাত্রায় এক-এক শেষ; যথা—

II সা -সা সা গা -পা গা মা দা | -দা মা -জ্ঞা ম
রা • জ রা • জ ম হা • রা • •

দা পা দা -মা | জ্ঞা -। মা মা মা -সা সা -
ম হী প • তি • শ স' ধ • মা •

এই হিসাবে চলিবে। কিন্তু প্রথম কলিটী 'যক্ষ রক্ষ' পর্য্যন্ত কেবল একবার গা রা, পর বাকি সুর নর ত্রিভুবন কাঁপে'-কইটি কথা দুইবার গাইলে, তখন সমে আসিতে পারা যাইবে।

(৪) অন্তরা—চৌদুন। ইহাও স্থায়ী চৌদুনের মাত্রা ও তালের হিসাবে, 'তব মহিমা' হইতে 'প পর্য্যন্ত, কেবল একবার অন্তরার নির্দ্দেশিত সুরের ঠাটে গেয়।

(৫) স্থায়ী—দুন অতীত-গ্রহ।

সা -সা সা II গা -পা গা মা | দা -দা মা -জ্ঞা
রা • জ রা • জ ম হা • রা •

| মা দা গা • দা | -মা জ্ঞা -। মা | মা মা -সা সা
জ ম হী প • তি • শা স' ধ • রা

I -সা সা -গা গা | -দা মা -জ্ঞা মা | -দা গা -সা
• অ • সী • ম • প্র • তা •

| -সা সা সা -সা | মা জ্ঞা জ্ঞা সা | -সা সা গা -পা I
• ত ব • শ উর্ য্যে ষ • ক্ষ র •

I দা দা -পা রা | -জ্ঞা সা রা গা | -গা সা -জ্ঞা মা |
ক্ষ অ সু • র • সু • র • ন

| দা গা -সা গা | -গা দা -মা জ্ঞা | -মা দা -পা দমা I
র ত্রি • সু • ব • ন • কাঁ • পে•

I -মা সা -সা সা II

(৬) অন্তরা—দুন অতীত-গ্রহ। ইহাও স্থায়ী-দুন অতীত-গ্রহের মাত্রা ও তালের হিসাবে, অন্তরার নির্দ্দেশিত সুরের ঠাটে গেয়।

(৭) স্থায়ী—দুন অনাগত-গ্রহ।

সা II -সা সা গা -পা | গা মা দা -দা | মা -জ্ঞা মা দা |
রা • জ রা • জ ম হা • রা • জ ম

| গা দা -মা জ্ঞা | -। মা মা মা | -সা সা সা সা I
হী প • তি • শা স' ধ • রা • অ

I -পা পা -দা মা | -জ্ঞা মা দা গা | -সা সা -সা সা I
• সী • ম • প্র • তা • পে • ত

BLOCKED INFORMATION.

০ ৩ ৪
| র্সা -র্মা র্মা র্জ্ঞা | র্জ্ঞা র্সা -র্সা র্সা | ণা -ণা দা
ব • শ উর্ য্যে ষ • ক্ষ র • ক্ষ

১´ ০ ২
I -ণা রা -জ্ঞা সা | -রা ণ্া -ণ্া সা | -জ্ঞা দা
• সু • র • সু • র • র

০ ৩ ৪
| -র্সা ণা -ণা দা | -মা জ্ঞা -মা দা | -ণা দমা -মা
• ভু • ব • ন কাঁ • পে •

(৮) অন্তরা—দুন অনাগত-গ্রহ। ইহাও স্থায়ী-দুন অনাগত-গ্রহের মাত্রা ও তালের হিসাবে নির্দ্দেশিত সুরের ঠাটে গেয়।

(৯) আস্থায়ী—দেড়ী।

১ ০
II র্সা -র্সা র্সা ণা -ণা ণা | মা দা -দা মা -জ্ঞা
রা • জ রা • জ ম হা • রা •

২ ০
| দা ণা দা -মা জ্ঞা -া | মা মা মা -র্সা র্সা
ম হী প • তি • শা স' ধ • রা

• • • • • •
| র্সা -ণা ণা -দা মা -জ্ঞা | মা -দা ণা -র্সা র্সা
অ • সী • ম • প্র • তা • পে

১´ ০
I র্সা র্সা -র্মা র্মা র্জ্ঞা র্জ্ঞা | র্সা -র্সা র্সা ণা -ণা
ত ব • শ উর্ য্যে ষ • ক্ষ র •

অন্তরাত্মার ছবি

(Francois de Nion-র ফরাসী হইতে)

মঃ ফ্রেনুজ চিত্রশালা হইতে বাহির হইতেছিল এমন সময় একটা চিত্র-পট তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। পটখানা ছায়ার মধ্যে বেশ একটু প্রচ্ছন্ন ছিল; আসলে ছবিটা ভরা দিনের আলোয় দেখিবার মত জিনিস নহে। কি রং-এর কাজ, কি আঁকার কাজ—কোনটাই ওস্তাদের হাতের নহে। কিন্তু মাঝারি গোছের চিত্রকর হইলেও, যে মুখ সে চিত্র করিয়াছে সেই মুখের অপূর্ব্ব ভাব ও দুর্লভ চিত্রহারী সৌন্দর্য্য তাহার নৈপুণ্যের অভাবেও অপনীত হয় নাই। চিত্র-পটের নিকটে আসিয়া ফ্রেনুজ চিত্রের কত তারিফ করিতে লাগিল। ললাট কি নির্ম্মল; সূক্ষ্ম ভুরুর নীচে চোখ দুটি কি সুন্দর, ওষ্ঠাধরে কি একটা ভীতিপূর্ণ সরলতা; এক কথায়, সমস্ত মুখশ্রীতে একটি আত্মা যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ফ্রেনুজ তাহার তালিকা-পুস্তিকাটি পড়িয়া দেখিল, "জোভীন, তসবীর; চিত্রকরের নাম ফার" ইত্যাদি। তাহার পর, এই স্বপ্নমুগ্ধ যুবক "শাঁজেলিজে" উপবনের নবোদিত বসন্তের সব আনন্দে মাতিয়া দ্রুতপদে চলিতে লাগিল; তাহার স্বপ্নের একটা নাম পাওয়া গিয়াছে, তাহার স্বপ্ন-মূর্ত্তির নাম "জোভীন্"; তাহার চক্ষু দুটি মৃদু নীল বর্ণের; রংটা জানা গিয়াছে, নামটা জানা গিয়াছে,—যাহা হোক্ ইহাও কতকটা আশ্বাসের বিষয়।

ফেনুজ্ জীবনের সুখ ভাল করিয়া আস্বাদ করিয়াছিল; একটু নীরস হইলেও জীবনটা নিতান্ত মন্দ ছিল না। এতটা সঙ্গতি ছিল যে কোন কাজ কর্ম্ম করিবার তাহার প্রয়োজন ছিল না। এই অলস জীবন সে বেশ উপভোগ করিত। তবু মাঝে মাঝে একটা অবসাদের ভাব আসিত—মনে হইত সময় যেন কাটিতেছে না। আজ চিত্রশালাতে পটারণ্যের মধ্যে জোভিনোর চিত্রটি আবিষ্কার করিয়া তাহার অবসাদগ্রস্ত মন একটা কাজ পাইয়া বাঁচিল।

যাহাকে দেখিয়া তাহার মনে একটা সুখের ভাব আসিয়াছে সেই মেয়েটিকে দেখিতে তাহার ইচ্ছা হইল।

ফ্রেনুজ তাহার চিত্রতালিকা পুস্তিকায় বর্ণনা অনুসারে একটা রাস্তা দিয়া নামিতে লাগিল; রাস্তাটা যেখানে শেষ হইয়াছে সেইখানে চিত্রকর "ফারে"র কর্ম্মস্থান। সেইখানে আসিয়া ফ্রেনুজ চিত্রকরকে জোভিনের কথা জিজ্ঞাসা করিল; কিন্তু চিত্রকরকে উত্তর দিতে একটু নারাজ দেখিয়া এবং তাহার স্বভাবটাও খিট্‌খিটে রকমের দেখিয়া, সে আর বেশী জিজ্ঞাসাবার্ত্তা করিল না। মনে করিল হয়ত চিত্রকর নামটা গোপন করিতেছে—সকল পেষাদারদিগেরই একএকটা গুপ্তকথা থাকে তাহারা তাহা প্রকাশ করিতে চাহে না। জোভিনের কথা জিজ্ঞাসা করাটাই তাহার

BLOCKED INFORMATION.

অবিবেচনার কাজ হইয়াছে। এই ভাবিয়া সে ঐখান হইতে প্রস্থান করিল এবং ... আইজ্যাকের ছবির দোকানে গিয়া উপস্থিত হইল। ফ্রেনুজ কখন কখন সময় কাটা... তাহার দোকানে যাইত। চিত্রকর ফারের সহিত আইজ্যাকের বেশ জানাশুনা ছিল... উহার অঙ্কিত চিত্র আইজ্যাক উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করিত না। তাই বেচা কেনার সময়... নীচে ফারের স্বাক্ষরিত নাম খরিদ্দারকে দেখাইতে চাহিত না। সূক্ষ্ম খুঁৎদর্শী আইজ্যাক ...

—"ও ছোক্‌রাটার সঙ্গে কারবার করা চলে না—তবে, নিতান্ত খারাপও নয়।"

—"কিন্তু ঐ তসবীর-চিত্রকরের বেশ একটু নিপুণতা আছে; চিত্রশালায় ও... সেই মুখখানি..."

—"কিন্তু দেখুন মশায় ও জীবনে কখনও তসবীর আঁকে নি, আপনি সেই ছো... জিনিস্‌টার কথা বল্‌ছেন? ওটা একটা জীবন্ত 'মডেলে'র নকল মাত্র।"

তাহার এই কথায় ফ্রেনুজের একটু রাগও হইল একটু কষ্টও হইল।

তবে কি, ঐ মধুর ললাটখানি, ঐ নির্ম্মল চোখ্ দুটী, ঐ ডিম্বাকৃতি মুখের গঠনটা ঘণ্টার হিসাবে ভাড়া-করা লোকের এবং আসল মুখটা নিতান্ত সাদামাটা ধরণের? না, এ... বিশ্বাসযোগ্য নহে। ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা;—এইরূপ মনে মনে ভাবিয়া, ফ্রেনুজ আই... দোকান হইতে চলিয়া গেল—তাহাকে শাস্তি দিবার উদ্দেশে ঐ দিন তাহার দোকান হইতে... জিনিসও কিনিল না। তাহার পর চিত্রশালায় গিয়া সেই ফারের চিত্রিত তস্‌বিরের... দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিতে লাগিল, এবং মনে মনে এইরূপ ভাবিতে লাগিল:—

—"বোধ হয় মেয়েটি কুল-ললনা; শুধু উহার মুখের ছবিটাই আঁকাইয়া লইয়াছে, দেখা যাইতেছে। আইজ্যাকটা আমাকে বলেনি যে, মেয়েটি তার মায়ের সঙ্গে, ভগিনীর একটা পরিবারের মধ্যে বাস করে। এই মুখশ্রী, এই মুখের অবয়ব কখনই একজন ইতর হ'তে পারে না.....কিন্তু অন্তরাত্মাটা—অন্তরের ছবিটা যদি ওর নিজের না হয়—সে বিষয়ে কিছু সন্দেহ থাকে—তা'হলে কিন্তু আমার ভাল লাগ্‌বে না।

সে এইরূপ ভাবিতেছে এমন সময় তাহার কাঁধের উপর একটি হাত স্থাপিত "সুবেল্" বলিল:—

"তবে তুমি ফারকে জান না কি?

—"তেমন ভাল জানিনে—কেন বল দিকি?"

—"কেননা, আমি দেখ্‌ছি, প্রায় সওয়া-ঘণ্টা ধরে, নিতান্ত একটা মাঝারি গোছে... পটের সম্মুখে দাঁড়িয়ে তুমি ধ্যানে নিমগ্ন আছ।"

—"মুখটি অতি সুন্দর।"

—"তুমি কি তার্তিনকে জান না? তার্তিনই ত ফারের সচরাচর ব্যবহৃত "মডেল"। এটা তার্তিনের তস্‌বির। কিন্তু তার্তিনের সঙ্গে সাদৃশ্য নেই।"

—"যাই হোক্ খুব একটা মনমুগ্ধকর জিনিস হয়ে উঠেছে।"

—"এই মুখশ্রী ও মুখাবয়ব তারই বটে, কিন্তু তবু সে নয়।"

"তার্তিন যে আজকাল একজন "নক্ষত্র" হয়ে উঠেছে—সে যে "দেবলোক"-অপেরায় নৃত্য করে।"

ফ্রেনুজ এই কথাটা তার নোট-বইয়ে টুকিয়া রাখিল কিন্তু একজন নাচ-ওয়ালীর কাছে গিয়ে সন্ধান লইতে গেলে একটি কুল-ললনার চিত্রকে অপমান করা হয় মনে করিয়া, সেখানে যাইতে তাহার মন সরিল না। কিন্তু সেইদিনই সায়াহ্নে ইচ্ছা না করিলেও, যেন যন্ত্রের মত চালিত হইয়া সে সঙ্গীত-শালার দ্বারদেশে আসিয়া উপনীত হইল। এবং বাদ্যস্থানের প্রথম সারিতে গিয়া উপবেশন করিল।

ফ্রেনুজ একটু পরেই তার্তিনকে দেখিতে পাইল, দেখিল তার্তিন্ সিঁড়ির উপর খাড়াভাবে দাঁড়াইয়া আছে। তাড়াতাড়ি হাত-দুর্ব্বীনটা চোখের সামনে আনিয়া—যে মুখ কয়েকদিন ধরিয়া তাহার মনকে অধিকার করিয়াছে, সেই মুখখানি ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল। অত আগ্রহ করিয়া যে দুর্ব্বীনটা চোখের কাছে আনিয়াছিল সেই দুর্ব্বীনটা তখনই কিন্তু আবার নামাইয়া ফেলিতে ইচ্ছা হইল। কেন না, তাহার স্মৃতির সহিত বাস্তবের অমিল হইতেছে! ইহা নিশ্চয় রং মাখার বাড়াবাড়ি সত্ত্বেও সেই ছবির মত একই রকম মুখাবয়ব, একই রকম মুখের রেখা, একই রকম রংএর আভা; তবু সুবেল্ যাহা বলিয়াছিল, তাহাই ঠিক্—ইহার মুখ ঠিক্ সেই ছবির মুখের মত নহে। তবু অনেকক্ষণ ধরিয়া, উহার মুখ ছবির মুখের সহিত মিলাইয়া দেখিতে লাগিল।

একদিন সেই ছবির ফ্রেমের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ফ্রেনুজ ভাবিতেছিল, তার্তিন ছবির মত দেখিতে নহে, ঠিক সেই সময় একটা অপূর্ব্ব অনুভূতি তাহার মনে আসিয়া উপস্থিত হইল, প্রকৃত জোভিন্ তাহার সম্মুখ দিয়া এই মাত্র চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু এই মূর্ত্তি সাগর-জলদের ন্যায় তখনই মিশাইয়া গেল। ফ্রেনুজ তাহাকে অনুসরণ করিবার জন্য ছুটিয়া চলিল। একটি তরুণী এই জনমানব শূন্য সময়ে একটা দুঃখের ভাবে ভোর হইয়া, সুকুমার পদক্ষেপে চিত্রশালায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। ফ্রেনুজ চট্ করিয়া তাহাকে ছাড়াইয়া গিয়া, সবিস্ময়ে থমকিয়া দাঁড়াইল। যে ছবি তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল, তাহারই প্রতিবিম্ব, তাহারই আভা, তাহারই মুখের ভাব তাহার সম্মুখে উপস্থিত।—সেই মধুর ললাট, সেই নির্ম্মল ওষ্ঠাধর—সেই সনস্তই যেন ছবি অপেক্ষাও প্রকৃত... কিন্তু তবু, দেখিতে ত তেমন সুশ্রী নহে। তার্তিন ও এই মেয়েটির মধ্যে—আকাশ পাতাল প্রভেদ...যাই হোক্, ছবিটা তার্তিনের—কিন্তু এই মেয়েটিই আসল লোক। ফ্রেনুজ নিকটেই কাহারও কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া ফিরিয়া আসিল।

BLOCKED INFORMATION.

এক বৃদ্ধার সহিত (বোধ হয় ঐ তরুণীর মা) একসঙ্গে আসিয়া, ফার মেয়েটিকে ডাকিল
—"জোভিন্! একবার এই দিকে এসো ত?" যখন মেয়েটি তাড়াতাড়ি সম্মুখ দি
চলিয়া গেল, তখন ফ্রেনুজের মনে হইল যেন সুখ-স্বপ্নের একটা মধুর উচ্ছ্বাস মৃদু-হিল্লো
বহিয়া গেল।

যেদিন জোভিন ফ্রেমিজের বাগদত্তা হইল সেইদিন ফ্রেনুজ জানিতে পারিল,—ফার, মজে
তার্তিনের সমস্ত মুখাবয়ব ঠিক গ্রহণ করিয়া, তার্তিনের ভগিনীর অন্তরাত্মাটা চিত্রপটে ফুটা
তুলিয়াছে। চিত্রকর একজনের সুন্দর মুখের উপর, আর একজনের অন্তরাত্মার মুখ
দিয়াছে। একদিন ফ্রেনুজ জোভিনের ছবিখানি দেখিতে দেখিতে বলিল, "এই ছবি হতেই আ
তোমাকে পেয়েছি—এই সেই ছবি যার সাদৃশ্য তোমার সঙ্গে খুবই কম, আবার খুবই বেশী!"

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠা

বাংলার নবযুগের কথা

ত্রয়োদশ কথা

বঙ্কিম-সাহিত্যে রাষ্ট্রনীতি

(জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার "বঙ্গবাণীর"—৪৩৬—৪৪৩ পৃষ্ঠার অনুবৃত্তি)

(১৬)

রামমোহনের মতন বঙ্কিমচন্দ্রও জীবনের সকল বিভাগেই একটা সমন্বয় প্রতিষ্ঠার চে
করিয়াছেন। তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনায় ইহা বিশেষভাবেই দেখিয়াছি। বঙ্কিম-সাহিত্
রাষ্ট্রনীতিও এই সমন্বয়-প্রতিষ্ঠারই চেষ্টা করিয়াছে। বিরোধ থাকিলেই সমন্বয় করিতে হ
ধর্ম্মেতে এবং সমাজে আমাদিগের মধ্যে বর্ত্তমান যুগে প্রাচীনে এবং নবীনে একটা তীব্র বি
বাধিয়া উঠিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার অনুশীলনধর্ম্মে, ভগবদ্‌গীতার ব্যাখ্যাতে এবং কৃষ্ণ-চ
এই বিরোধের একটা সমীচীন মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি প্রাচীনের
অনুরাগ বশতঃ নবীনকে বর্জ্জন করিতে চাহেন নাই। আবার নবীনের লালসায় প্রাচীন
উপেক্ষা করেন নাই; কিন্তু প্রাচীনের সনাতন সত্য এবং সাধনার উপরে নবীনের প্রে
প্রতিষ্ঠিত করিয়া উভয়ের মধ্যে একটা সমন্বয় গড়িয়া তুলেন। সমন্বয়ের একটা সময় এবং
আছে। কোনও বিরোধ পাকিয়া না উঠিলে সমন্বয়ের সময় উপস্থিত হয় না। দূরদর্শী মনী
প্রয়োজন হইলে, পরিণামে এই সমন্বয় প্রতিষ্ঠার জন্যই, আদিতে বিরোধটা পাকাইয়া তুলিতে
করেন। বিরোধটা যত পাকিয়া উঠে, ততই সমন্বয়ের প্রয়োজন এবং অবসর উপস্থিত

বাংলার বর্ত্তমান যুগে বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্বেই ধর্ম্মে ও সমাজে প্রাচীনের এবং নবীনের মধ্যে বিরোধটা খুবই পাকিয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রকে বিরোধ পাকাইতে হয় নাই। তবে তাঁহার প্রথম জীবনে নবীন সমাজ-ও-ধর্ম্মসংস্কারের দলই অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন। নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অতি অল্প লোকেই সেকালে প্রাচীনের পক্ষপাতী ছিলেন। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম বয়সে কোনও কোনও দিক দিয়া এই দুর্ব্বল পক্ষেরই ওকালতী গ্রহণ করিয়া প্রবল দলকে একটুকু সংযত এবং আত্মস্থ করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু হিন্দু-পুনরুত্থানকারী দল যখন প্রবল হইয়া উঠিলেন তখন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারিলেন না। একদিকে যেমন ব্রাহ্মদিগের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বল্প-বিস্তর বিরোধ বাধিয়াছিল, সেইরূপ অন্যদিকে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের নূতন হিন্দু আন্দোলনের সঙ্গেও কোনও কোনও দিক দিয়া তাঁহার বিরোধ বাধিয়া উঠিল। তিনি এই দুই দলের কাহারও সঙ্গে মিলিতে পারিলেন না; কিন্তু উভয় দল হইতে পৃথক থাকিয়া ইঁহাদের পরস্পরের বিরোধের মীমাংসা করিবার চেষ্টাতেই "প্রচারে" তাঁহার গীতাভাষ্যের ও অনুশীলনধর্ম্মের আলোচনা আরম্ভ করেন।

(১৭)

যেমন ধর্ম্মে ও সমাজে, সেইরূপ রাষ্ট্রনীতিতে বঙ্কিমচন্দ্র একটা সমন্বয়ের সন্ধানেই গিয়াছিলেন। কিন্তু এই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রথম জীবনে, আমাদের মধ্যে স্বদেশ-প্রীতি ভাল করিয়া জাগে নাই। এজন্য, সর্ব্বপ্রথমে তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে আমাদের ও ইংরাজের মধ্যে যে বিরোধটা অল্পে অল্পে বাধিতেছিল, তাকে প্রকারে তাহাকেই পাকাইয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। প্রচ্ছন্নভাবে, এবং কখনও কখনও প্রকাশ্যেও, "বঙ্গদর্শন" আমাদের এই নূতন স্বদেশ-প্রীতিকে বিশেষভাবে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম যুগের উপন্যাসে মুসলমান ইতিহাসের আশ্রয়ে আমাদিগের মধ্যে স্বজাতি-প্রেম এবং সঙ্গে সঙ্গে পরজাতিবিদ্বেষ জাগাইয়া তুলেন। 'চন্দ্রশেখরে' এবং 'আনন্দমঠে' সেকালের নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের অন্তরের ইংরাজবিদ্বেষকে প্রকাশ্যভাবে ফুটাইয়া তুলেন। এইরূপে আমাদের আধুনিক রাষ্ট্রীয় জীবনে বঙ্কিমচন্দ্র সমন্বয়ের ভূমি গড়িবার পূর্ব্বে ইংরাজের সঙ্গে আমাদের বিরোধটাকে খুব ভাল করিয়া পাকাইয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার জীবদ্দশায় এ বিরোধটা কিন্তু পাকিয়া উঠে নাই। পাকিয়া উঠে, তাঁহার স্বর্গারোহণের দশ বার বৎসর পরে, স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু ইহার বহুপূর্ব্ব হইতেই বঙ্কিমচন্দ্র কোন্ পথে এই সাংঘাতিক বিরোধের সমন্বয়ের সম্ভাবনা আছে, তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।

(১৮)

দেখিয়াছি যে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতি তাঁহার ধর্ম্মের অঙ্গ ছিল। ফরাসী-বিপ্লবের পরে য়ুরোপে যে গণতন্ত্র রাষ্ট্রব্যবস্থার আদর্শ ফুটিয়া উঠে, বঙ্কিমচন্দ্র সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। এই আদর্শ সার্ব্বজনীন। য়ুরোপে ফরাসী-বিপ্লব যে সাম্যের সন্ধানে

BLOCKED INFORMATION.

যাইয়াছিল, আমাদের দেশে অতি প্রাচীনকালে ভগবান বুদ্ধদেব সেই আদর্শেরই প্রতিষ্ঠা চাহিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'সাম্য' শীর্ষক প্রবন্ধে এই সার্ব্বজনীন সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শই প্রচার করিয়াছিলেন। সময়োচিত হয় নাই বলিয়া এই প্রবন্ধটিকে তিনি পরে গ্রন্থাবলী হইতে ছাঁটিয়া দিয়াছিলেন। আজিকার বাঙ্গালী পাঠকেরা ইহার কথা জানে কিন্তু আধুনিক সমাজতত্ত্বের দিক দিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক আদর্শ কি ছিল, তাহার প্রমাণ এই মহামূল্য প্রবন্ধটি আবার প্রচারিত হইলে মন্দ হয় না। বঙ্কিমচন্দ্রের সাম্যবাদ মৈত্রীর অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল। ফরাসী-বিপ্লবের অধিনায়কেরা সাম্যের আদর্শটাকেই ভাল ধরিয়াছিলেন; কিন্তু যদিও তাঁহারা Equality (সাম্য) এবং Liberty (স্বাধীনতার) Fraternity'কে (ভ্রাতৃত্ব) জুড়িয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু এই সাম্য ও স্বাধীনতার সঙ্গে Fraternity'র বা ভ্রাতৃত্বের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই। নিরঙ্কুশ সাম্য ও স্বাধীনতার আস্ফালনে সমাজবন্ধন টিকিয়া থাকিতে পারে দেখিয়া, ইহাদের এই ভ্রাতৃত্বের আদর্শকে জুড়িয়া দিয়াছিলেন। বৌদ্ধ সাধনের মৈত্রী ঠিক এই Fraternity'র ছিল না। সর্ব্বভূতে আত্মদৃষ্টির উপরে মৈত্রীর প্রতিষ্ঠা। উপনিষদ কহিয়াছেন, যে সকলের অন্তর্নিহিত আত্মবস্তুকে অন্য সকল জীবের মধ্যে প্রত্যক্ষ করে, সে কখনও তাহাকেও অবজ্ঞা পারে না। এই যে আপনার আত্মবস্তুকে সকল মানুষের মধ্যে দেখা, ইহাই আমাদের মৈত্রীর বনিয়াদ। য়ুরোপ এ-তত্ত্বের সন্ধান পায় নাই। সুতরাং য়ুরোপের সাম্য স্বাধীনতার আদর্শ কেবল বিরোধই জাগাইয়া তুলিয়াছিল; এখনও বিরোধকেই জাগাইয়া রাখিয়াছে। স্বাধীনতার সঙ্গে মৈত্রীর, সাম্যের সঙ্গে আত্মসংযমের, সমন্বয় সাধন করিতে পারে নাই। এই জন্য এই জটিল সমাজসমস্যার মীমাংসার পথ এখনও পরিষ্কার হয় নাই। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে আমরাও এদেশে য়ুরোপীয় শিক্ষা ও সাধনার প্রেরণায় সাম্য এবং স্বাধীনতার এই বিরোধের পথেই চলিয়াছিলাম। তারই জন্য, মনে হয়, কি জানি তাঁহার 'সাম্য' শীর্ষক এই সাংঘাতিক সাম্য ও স্বাধীনতার একদর্শী আদর্শে শক্তিসঞ্চার করিয়া আমাদিগকে, যে সর্ব্বনাশের পথে ছুটিয়াছে, সেই পথেই চালাইয়া লইয়া যায়, এই আশঙ্কাতেই তাঁহার 'সাম্য' শীর্ষক প্রবন্ধের প্রচার বন্ধ করিয়া দেন, এবং গীতোক্ত কর্ম্মযোগের পথে আধুনিক সাধনাকে প্রবর্ত্তিত করিয়া ব্রহ্মাত্মৈকত্ব বা বিশ্বাত্মৈকত্বের অনুভূতির উপরে সাম্য স্বাধীনতার সঙ্গে বিশ্বজনীন মৈত্রীর সত্য সমন্বয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিশ্বজনীন মৈত্রীর বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় বিরোধেরও সমন্বয় করিতে চাহিয়াছেন।

(১৯)

কহিয়াছি যে বিরোধ যতক্ষণ পাকিয়া না উঠে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সন্ধি বা সমন্বয়ের কথা করিয়া উঠিতেই পারে না। আনন্দ-মঠে বঙ্কিমচন্দ্র এই বিরোধটা প্রথমে পাকাইয়া

পরজাতির অত্যাচারপীড়িত না হইলে কোথাও স্বজাতি-বাৎসল্য ভাল করিয়া জাগিয়া উঠে না। এইজন্য আনন্দ-মঠের প্রথম দিকে তিনি সেকালের প্রজার উপরে কি নির্ম্মম অত্যাচার হইতেছিল, তাহার ছবি [illegible] লেন। মানুষ অনেক অত্যাচার সহিয়া যায়। তাহার মান-সম্ভ্রম, ভোগ-বিলাস, এসকলের উপরে আক্রমণ পর্য্যন্ত সে নীরবে সহ্য করিয়া চলে। কিন্তু এসকলের উপরে যখন অত্যাচারীর [illegible] লে, তাহার জীবনের শেষ-অবলম্বন মুষ্টি-অন্ন পর্য্যন্ত আর মেলে না, তখনই মানুষ মরিয়া হইয়া বহু গায়ের অন্যায় অত্যাচারের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হয়। জগতের সর্ব্বত্র এই ভাবেই রাষ্ট্র-বিপ্লবের সূচনা হইয়াছে। আনন্দ-মঠের প্রথম দৃশ্যপটে বঙ্কিমচন্দ্র এই কথাটাই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। চারিদিকের দুর্ভিক্ষের হাহাকারের মাঝখানেই মাতৃপূজার শঙ্খ বাজিয়া উঠিয়াছিল; স্বারাজ্য ব্যতীত মানুষের ঐহিক এবং পারত্রিক কোনও কল্যাণই যে সম্ভব নহে, তাহাই আনন্দ-মঠের প্রথম কথা। ধর্ম্মসাধন করিতে হইলে [illegible] প্রয়োজন; শরীরের স্বাস্থ্য এবং শক্তির উপরে ধর্ম্মসাধনের [illegible] তা নির্ভর করে। মানুষ যদি দুবেলা পেট ভরিয়া না খাইতে পায়, তাহা হইলে তাহার সাধন-ভজন [illegible] হয় না। আর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার উপরেই প্রকৃতি পুঞ্জের অন্ন-সংস্থানের সম্ভাবনা সম্পূর্ণরূপে [illegible] র করে। রাজা যদি প্রজার সর্ব্বস্ব শোষণ করিয়া লয়, তাহা হইলে প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়াও প্রজা কিছুতেই আপনার যথোপযুক্ত অন্ন-সংস্থান করিতে পারে না। আনন্দ-মঠের প্রথম দৃশ্যে এই সত্যটাই ফুটিয়া উঠিয়াছে। স্বদেশের এই দুর্গতির বেদনা যাহাদের কোমল প্রাণে প্রথমে বাজিয়া উঠে, তাঁহারা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া, প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া, স্বদেশের উদ্ধারকার্য্যে আপনাদিগের জীবন উৎসর্গ করেন। স্বদেশই তখন তাঁহাদের একমাত্র শ্রেয় ও প্রেয় হইয়া উঠে। এই স্বদেশপ্রীতির প্রেরণাতেই আনন্দমঠের সন্তানদলের প্রতিষ্ঠা হয়। আর ইঁহারা এই দেশভক্তির প্রেরণায় ধর্ম্মাধর্ম্মবিচার পর্য্যন্ত পরিহার করিয়া দেশবাসীর উদ্ধারকার্য্যে নিযুক্ত হন। কণ্টকের দ্বারা কণ্টক উদ্ধার করিছে, এই নীতির অনুসরণ করিয়া, সন্তানেরা রাজার দস্যুবৃত্তি নিবারণের জন্য নিজেরা দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করেন। ইহাতে তাঁহাদের কোনওই স্বার্থাভিসন্ধি ছিল না। ইঁহারা প্রজার ধন হরণ করিতেন না। প্রজার যে অর্থ শোষণ করিয়া রাজা আপনার উদরস্থ করিতে চাহিত, তাহাই লুটিয়া আনিয়া একদিকে নিজেদের অস্ত্র সংগ্রহের এবং অন্যদিকে দুঃস্থ প্রজার দুঃখ নিবারণের জন্য ব্যয় করিতেন। এই ভাবেই আনন্দ-মঠে একটা প্রজাবিদ্রোহের ছবি ফুটিয়া উঠে। ইহার ভিতর দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র রাজা-প্রজার বিরোধটা পাকাইয়া তুলেন। আর পাকাইয়া তুলেন এইজন্য যে এই বিরোধটা পাকিয়া না উঠিলে, [illegible]ন্ধি বা সমন্বয়ের কথাই উঠিতে পারে না।

(২০)

বিরোধ কেবল পাকিয়া উঠিলেই চলে না। এই বিরোধে প্রজাপক্ষ যতক্ষণ জয়লাভ না করে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সন্ধির প্রস্তাব উঠিতে পারে না। আনন্দ-মঠে 'সন্তানেরা' যখন শেষ-যুদ্ধে

BLOCKED INFORMATION.

যাইয়াছিল, আমাদের দেশে অতি প্রাচীনকালে ভগবান বুদ্ধদেব সেই আদর্শেরই প্রতিষ্ঠা চাহিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'সাম্য' শীর্ষক প্রবন্ধে এই সার্ব্বজনীন সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শই প্রচার করিয়াছিলেন। সময়োচিত হয় নাই বলিয়া এই প্রবন্ধটিকে তিনি পরে গ্রন্থাবলী হইতে ছাঁটিয়া দিয়াছিলেন। আজিকার বাঙ্গালী পাঠকেরা ইহার কথা জানে কিন্তু আধুনিক সমাজতত্ত্বের দিক দিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক আদর্শ কি ছিল, তাহার প্রমাণ এই মহামূল্য প্রবন্ধটি আবার প্রচারিত হইলে মন্দ হয় না। বঙ্কিমচন্দ্রের সাম্যবাদ মৈত্রীর অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল। ফরাসী-বিপ্লবের অধিনায়কেরা সাম্যের আদর্শটাকেই ভাল ধরিয়াছিলেন; কিন্তু যদিও তাঁহারা Equality (সাম্য) এবং Liberty (স্বাধীনতার) Fraternity'কে (ভ্রাতৃত্ব) জুড়িয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু এই সাম্য ও স্বাধীনতার সঙ্গে Fraternity'র বা ভ্রাতৃত্বের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই। নিরঙ্কুশ সাম্য ও স্বাধীনতার আস্ফালনে সমাজবন্ধন টিকিয়া থাকিতে পারে দেখিয়া, ইহাদের এই ভ্রাতৃত্বের আদর্শকে জুড়িয়া দিয়াছিলেন। বৌদ্ধ সাধনের মৈত্রী ঠিক এই Fraternity'র ছিল না। সর্ব্বভূতে আত্মদৃষ্টির উপরে মৈত্রীর প্রতিষ্ঠা। উপনিষদ কহিয়াছেন, যে সকলের অন্তর্নিহিত আত্মবস্তুকে অন্য সকল জীবের মধ্যে প্রত্যক্ষ করে, সে কখনও তাহাকেও অবজ্ঞা পারে না। এই যে আপনার আত্মবস্তুকে সকল মানুষের মধ্যে দেখা, ইহাই আমাদের মৈত্রীর বনিয়াদ। য়ুরোপ এ-তত্ত্বের সন্ধান পায় নাই। সুতরাং য়ুরোপের সাম্য স্বাধীনতার আদর্শ কেবল বিরোধই জাগাইয়া তুলিয়াছিল; এখনও বিরোধকেই জাগাইয়া রাখিয়াছে। স্বাধীনতার সঙ্গে মৈত্রীর, সাম্যের সঙ্গে আত্মসংযমের, সমন্বয় সাধন করিতে পারে নাই। এই জন্য এই জটিল সমাজসমস্যার মীমাংসার পথ এখনও পরিষ্কার হয় নাই। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে আমরাও এদেশে য়ুরোপীয় শিক্ষা ও সাধনার প্রেরণায় সাম্য এবং স্বাধীনতার এই বিরোধের পথেই চলিয়াছিলাম। তারই জন্য, মনে হয়, কি জানি তাঁহার 'সাম্য' শীর্ষক এই সাংঘাতিক সাম্য ও স্বাধীনতার একদর্শী আদর্শে শক্তিসঞ্চার করিয়া আমাদিগকে, যে সর্ব্বনাশের পথে ছুটিয়াছে, সেই পথেই চালাইয়া লইয়া যায়, এই আশঙ্কাতেই তাঁহার 'সাম্য' শীর্ষক প্রবন্ধের প্রচার বন্ধ করিয়া দেন, এবং গীতোক্ত কর্ম্মযোগের পথে আধুনিক সাধনাকে প্রবর্ত্তিত করিয়া ব্রহ্মাত্মৈকত্ব বা বিশ্বাত্মৈকত্বের অনুভূতির উপরে সাম্য স্বাধীনতার সঙ্গে বিশ্বজনীন মৈত্রীর সত্য সমন্বয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিশ্বজনীন মৈত্রীর বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় বিরোধেরও সমন্বয় করিতে চাহিয়াছেন।

(১৯)

কহিয়াছি যে বিরোধ যতক্ষণ পাকিয়া না উঠে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সন্ধি বা সমন্বয়ের কথা করিয়া উঠিতেই পারে না। আনন্দ-মঠে বঙ্কিমচন্দ্র এই বিরোধটা প্রথমে পাকাইয়া

পরজাতির অত্যাচারপীড়িত না হইলে কোথাও স্বজাতি-বাৎসল্য ভাল করিয়া জাগিয়া উঠে না। এইজন্য আনন্দ-মঠের প্রথম দিকে তিনি সেকালের প্রজার উপরে কি নির্ম্মম অত্যাচার হইতেছিল, তাহার ছবি [illegible] লেন। মানুষ অনেক অত্যাচার সহিয়া যায়। তাহার মান-সম্ভ্রম, ভোগ-বিলাস, এসকলের উপরে আক্রমণ পর্য্যন্ত সে নীরবে সহ্য করিয়া চলে। কিন্তু এসকলের উপরে যখন অত্যাচারীর [illegible] লে, তাহার জীবনের শেষ-অবলম্বন মুষ্টি-অন্ন পর্য্যন্ত আর মেলে না, তখনই মানুষ মরিয়া হইয়া বহু গায়ের অন্যায় অত্যাচারের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হয়। জগতের সর্ব্বত্র এই ভাবেই রাষ্ট্র-বিপ্লবের সূচনা হইয়াছে। আনন্দ-মঠের প্রথম দৃশ্যপটে বঙ্কিমচন্দ্র এই কথাটাই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। চারিদিকের দুর্ভিক্ষের হাহাকারের মাঝখানেই মাতৃপূজার শঙ্খ বাজিয়া উঠিয়াছিল; স্বারাজ্য ব্যতীত মানুষের ঐহিক এবং পারত্রিক কোনও কল্যাণই যে সম্ভব নহে, তাহাই আনন্দ-মঠের প্রথম কথা। ধর্ম্মসাধন করিতে হইলে [illegible] প্রয়োজন; শরীরের স্বাস্থ্য এবং শক্তির উপরে ধর্ম্মসাধনের [illegible] তা নির্ভর করে। মানুষ যদি দুবেলা পেট ভরিয়া না খাইতে পায়, তাহা হইলে তাহার সাধন-ভজন [illegible] হয় না। আর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার উপরেই প্রকৃতি পুঞ্জের অন্ন-সংস্থানের সম্ভাবনা সম্পূর্ণরূপে [illegible] র করে। রাজা যদি প্রজার সর্ব্বস্ব শোষণ করিয়া লয়, তাহা হইলে প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়াও প্রজা কিছুতেই আপনার যথোপযুক্ত অন্ন-সংস্থান করিতে পারে না। আনন্দ-মঠের প্রথম দৃশ্যে এই সত্যটাই ফুটিয়া উঠিয়াছে। স্বদেশের এই দুর্গতির বেদনা যাহাদের কোমল প্রাণে প্রথমে বাজিয়া উঠে, তাঁহারা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া, প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া, স্বদেশের উদ্ধারকার্য্যে আপনাদিগের জীবন উৎসর্গ করেন। স্বদেশই তখন তাঁহাদের একমাত্র শ্রেয় ও প্রেয় হইয়া উঠে। এই স্বদেশপ্রীতির প্রেরণাতেই আনন্দমঠের সন্তানদলের প্রতিষ্ঠা হয়। আর ইঁহারা এই দেশভক্তির প্রেরণায় ধর্ম্মাধর্ম্মবিচার পর্য্যন্ত পরিহার করিয়া দেশবাসীর উদ্ধারকার্য্যে নিযুক্ত হন। কণ্টকের দ্বারা কণ্টক উদ্ধার করিছে, এই নীতির অনুসরণ করিয়া, সন্তানেরা রাজার দস্যুবৃত্তি নিবারণের জন্য নিজেরা দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করেন। ইহাতে তাঁহাদের কোনওই স্বার্থাভিসন্ধি ছিল না। ইঁহারা প্রজার ধন হরণ করিতেন না। প্রজার যে অর্থ শোষণ করিয়া রাজা আপনার উদরস্থ করিতে চাহিত, তাহাই লুটিয়া আনিয়া একদিকে নিজেদের অস্ত্র সংগ্রহের এবং অন্যদিকে দুঃস্থ প্রজার দুঃখ নিবারণের জন্য ব্যয় করিতেন। এই ভাবেই আনন্দ-মঠে একটা প্রজাবিদ্রোহের ছবি ফুটিয়া উঠে। ইহার ভিতর দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র রাজা-প্রজার বিরোধটা পাকাইয়া তুলেন। আর পাকাইয়া তুলেন এইজন্য যে এই বিরোধটা পাকিয়া না উঠিলে, [illegible]ন্ধি বা সমন্বয়ের কথাই উঠিতে পারে না।

(২০)

বিরোধ কেবল পাকিয়া উঠিলেই চলে না। এই বিরোধে প্রজাপক্ষ যতক্ষণ জয়লাভ না করে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সন্ধির প্রস্তাব উঠিতে পারে না। আনন্দ-মঠে 'সন্তানেরা' যখন শেষ-যুদ্ধে

BLOCKED INFORMATION.

জয়লাভ করিলেন, বাংলায় মুসলমান প্রভুশক্তি যখন নিঃশেষে বিলোপ পাইল, তখনই সম্প্রদায়ের গুরু ও প্রতিষ্ঠাতা, তাঁহাদের কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে বলিয়া, দলটা ভাঙিয়া দি সন্তানেরা কেবল অত্যাচারী রাজশক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করিবার জন্যই উঠিয়াছিলেন। এই ধ নিবারণের জন্য যে শিক্ষা-দীক্ষার প্রয়োজন, কেবল তাহাই তাঁরা পাইয়াছিলেন। কিন্তু ভাবে রাষ্ট্রশাসনের অধিকার এবং শিক্ষা তাঁহারা লাভ করেন নাই। অ তাঁহাদের অধিকার ছিল। ধর্ম্মরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সাধন তাঁহাদের হয় নাই। যাঁহারা রাজশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েন, প্রায় কুত্রাপি তাঁহারা এই সংগ্রামের অবসা গণতন্ত্র-শাসনের প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন না। লড়াইয়ের একটা মোহ আছে। সংগ্রামে প্রতিষ্ঠার ফলে বিজয়ী সেনানীর অন্তরে পশুশক্তির উপরে একান্ত নির্ভর জন্মিয়া যায়। প্রতিপক্ষের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে গেলে স্বপক্ষের সেনা-মণ্ডলীর উপরে কঠোর শাসন করিতে হয়। এ অবস্থায় সত্য স্বাধীনতার ভূমি কিছুতেই গড়িয়া উঠিতে পারে না। রাষ্ট্রবিপ্লব বা বিদ্রোহের সফলতাতে প্রজাস্বত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হয় না, কিন্তু এক স্বেচ্ছাতন্ত্র রাজ উচ্ছেদ করিয়া তাহার আসনে আর একটা নূতন স্বেচ্ছাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। বঙ্কি মনীষা এই সত্যটাকে ভাল করিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। তারই জন্য বঙ্কিমচন্দ্র (কোথায় ঠিক মনে পড়িতেছে না) যে বিদ্রোহ আত্মঘাতী। আনন্দ-মঠের শেষ অঙ্কে এ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সত্যানন্দ সন্তানদলের নায়ক ছিলেন। যখন "যেমন দুইখণ্ড প্রস্তরের সংঘর্ষে ক্ষুদ্র মক্ষিকা নিষ্পেষিত হইয়া যায়, তেমনই দুই সন্তান-সেনা-সংঘর্ষে বিশাল নিষ্পেষিত হইল—ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের কাছে সংবাদ লইয়া যায়, এমন লোক রহিল না," সত্যানন্দের উপরে আদেশ হইল, সন্তান-দল ভাঙ্গিয়া দাও।

সত্যানন্দ কহিলেন—আমার এক সন্দেহ ভঞ্জন করুন। আমি যে মুহূর্ত্তে যুদ্ধ জ সনাতন ধর্ম্ম নিষ্কণ্টক করিলাম, সেই সময়েই আমার প্রতি এই প্রত্যাখ্যানের আদেশ কেন যিনি আসিয়াছিলেন তিনি বলিলেন—"তোমার কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে, মুসলমান রা হইয়াছে। আর তোমার এখন কোনও কার্য্য নাই। অনর্থক প্রাণীহত্যার প্রয়োজন নাই।

সত্য—মুসলমান রাজ্য ধ্বংস হইয়াছে, কিন্তু হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হয় নাই। কলিকাতায় ইংরেজ প্রবল।

তিনি—হিন্দুরাজ্য এখনও স্থাপিত হইবে না। তুমি থাকিলে এখন অনর্থক হইবে, অতএব চল।.....সত্যানন্দ তীব্র মর্ম্মপীড়ায় কাতর হইয়া মাতৃরূপা জন্মভূমির দিকে ফিরিয়া জোড়হাতে বাষ্পনিরুদ্ধস্বরে বলিতে লাগিলেন 'হায় মা, তোমার উদ্ধার পারিলাম না। আবার তুমি ম্লেচ্ছের হাতে পড়িবে। হায় মা, কেন আজ রণক্ষেত্রে মৃত্যু হইল না?'

চিকিৎসক বলিলেন, সত্যানন্দ কাতর হইও না। তুমি বুদ্ধির ভ্রমক্রমে দস্যুবৃত্তির দ্বারা ন সংগ্রহ করিয়া রণ জয় করিয়াছ। পাপের কখনও পবিত্র ফল হয় না। অতএব তোমরা দেশের উদ্ধার করিতে পারিবে না। আর যাহা হইবে তাহা ভালই হইবে। ইংরেজ রাজা না হইলে সনাতন ধর্ম্মের পুনরুত্থানের সম্ভাবনা নাই। মহাপুরুষেরা যেরূপ বুঝিয়াছেন, একথা আমি তোমাকে সেইরূপ বুঝাই। মনোযোগ দিয়া শুন।.....প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম জ্ঞানাত্মক, কর্ম্মাত্মক নহে। সেই জ্ঞান দুই প্রকার, বহির্ব্বিষয়ক ও অন্তর্ব্বিষয়ক। অন্তর্ব্বিষয়ক যে জ্ঞান, তাহাই সনাতন ধর্ম্মের প্রধান ভাগ। কিন্তু বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান আগে না জন্মিলে অন্তর্ব্বিষয়ক জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। স্থূল কি তাহা না জানিলে, সূক্ষ্ম কি তাহা জানা যায় না। এখন এদেশে অনেক দিন হইতে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কাজেই প্রকৃত সনাতন ধর্ম্মও লোপ পাইয়াছে। সনাতন ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করিতে গেলে, আগে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞানের প্রচার করা আবশ্যক। এখন এদেশে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান নাই—শিখায় এমন লোক নাই; আমরা লোকশিক্ষায় পটু নহি। অতএব ভিন্নদেশ হইতে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান আনিতে হইবে। ইংরেজ বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত, লোকশিক্ষায় বড় সুপটু। সুতরাং ইংরেজকে রাজা করিব। ইংরেজি শিক্ষায় এদেশীয় লোক বহিস্তত্ত্বে সুশিক্ষিত হইয়া অন্তস্তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইবে। তখন প্রকৃত ধর্ম্ম আপনাআপনি পুনরুদ্দীপ্ত হইবে। যতদিন না তা হয়, যতদিন না হিন্দু আবার জ্ঞানবান, গুণবান আর বলবান হয়, ততদিন ইংরেজ-রাজ্য অক্ষয় থাকিবে। অতএব হে বুদ্ধিমান—ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে নিরস্ত হইয়া আমার অনুসরণ কর।"

(২১)

ইহাই আনন্দ-মঠের মূল শিক্ষা। ইহাই আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসের মূলতত্ত্ব। ইহার উপরেই বঙ্কিমচন্দ্রের রাষ্ট্রনীতির সমন্বয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। মুসলমানের উচ্ছেদসাধন যখন স্বজাতির ও স্বধর্ম্মের কল্যাণের জন্য আবশ্যক হইয়াছিল, তখন সন্তানেরা প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া সে কার্য্য সাধন করিয়াছেন। দুর্ব্বল ও অত্যাচারী রাজশক্তির প্রতিকূলে বিদ্রোহ অধর্ম্ম নহে। যুগে যুগে ভারতের ইতিহাসে অবতারগণ যখনই ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইয়াছে, তখনই এইরূপে দুষ্কৃতির বিনাশ সাধন করিয়া ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছেন। মুসলমানের প্রতিকূলে বিদ্রোহ আত্মঘাতী হয় নাই। কিন্তু তখনও ভারতের প্রজাশক্তি জাগিয়া উঠে নাই। প্রতিষ্ঠেয় সন্তানদল মাত্র জাগিয়া উঠিয়াছিলেন। সে অবস্থায় তাঁহাদের উপরে রাজ্য-শাসনের ভার পড়িলে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হইত না। এই গণতন্ত্র আদর্শের প্রচার এবং প্রতিষ্ঠার জন্যই ইংরাজ-শাসন আবশ্যক হইয়াছিল। ইংরাজ আসিবার পূর্ব্বে ভারতবর্ষ যদি জাপানের মত স্বাধীন ও স্বপ্রতিষ্ঠ থাকিত, তাহা হইলে অন্য কথা ছিল। জাপান যে পথে আধুনিক

BLOCKED INFORMATION.

বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান লাভ করিয়া আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে, ভারতবর্ষ তখন তদব
আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান আয়ত্ত করিয়া আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিত।

কিন্তু যাহা হয় নাই, তাহা হইতে পারিত, এরূপ কল্পনা করিয়া যাহা হইয়াছে
প্রত্যক্ষ তাহাকে উপেক্ষা করা বুদ্ধিমানের কর্ম্ম নহে। রাষ্ট্রনীতি কবিকল্পনার উপরে প্র
হয় নাই। প্রত্যক্ষ অবস্থা এবং ব্যবস্থা দ্বারাই সমীচীন রাষ্ট্রনীতির গতি নির্দ্ধারিত হইয়া
বঙ্কিমচন্দ্রের রাষ্ট্রনীতি যাহা আছে, তাহারই উপরে গড়িয়া উঠিয়াছিল। যাহা হইতে
সে কল্পনার আশ্রয় করিয়া চলে নাই। আর যাহা হইয়াছে ও আছে, তাহাকে দৃঢ়
ধরিয়াই বঙ্কিমের রাষ্ট্রনীতি একটা সমীচীন সমন্বয়ের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিল।
বঙ্কিমচন্দ্র রাজারই পথ ধরিয়া চলিয়াছিলেন।

(২২)

কেহ কেহ মনে করেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজের চাকুরি করিতেন, আর ইংরাজ-প্রভু
বিরুদ্ধে দেশের লোকের অন্তরে কোন্ প্রকারের দ্রোহীভাব জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টাতে
দ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত হইতে হয়, এই জন্যই "আনন্দমঠে" এরূপভাবে ই
ওকালতি করিয়াছেন। কিন্তু এরূপ কল্পনা করিতে বঙ্কিমচন্দ্রের মনীষা ও চরিত্রের অ
করা হয়। রাজা রামমোহনের মতন এমন স্বাধীনতার উপাসক, এরূপ স্বজাতিবৎসল দে
কি এই যুগে, কি পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে দেখা যায় নাই, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অথচ
ইংরাজ-শাসনের দ্বারা এদেশের সমূহ কল্যাণ হইবে, এরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া, ইহা
ছিলেন। ভারতবর্ষের কল্যাণের জন্য, মৃত ভারতবাসীদিগের অসাড় দেহে জীবনের শ
করিবার জন্য, আধুনিক বহির্বিজ্ঞান বিষয়ে অজ্ঞ ভারতবাসীদিগকে নূতন শিক্ষা দিবার জন্য,
কিছুকাল ইংরাজ এদেশের রাজা হইয়া থাকুক, ইহা চাহিয়াছিলেন। রাজা তাঁহার
সেক্রেটারী আরনল্ডকে কহিয়াছিলেন যে, এই কাজটা করিবার জন্য আরও চল্লিশ বৎসর কা
ভারতের রাজা হইয়া থাকিবে, ইহর মধ্যে ভারতবাসী য়ুরোপীয়দিগের সমকক্ষ হইয়া উঠিতে

স্বর্গারোহণের কিছুদিন পূর্ব্বে রাজা আরনল্ড্‌কে এই কথা কহিয়াছিলেন। রাজ
ছিলেন হে ১৮৭০-৭ ইংরাজি পর্য্যন্ত, অর্থাৎ মোটের উপরে একশ বা সওয়াশ বৎস
ইংরাজ এদেশে রাজা হইয়া থাকিবে, এই সময়ের মধ্যেই ইংরাজের নিকট হইতে আমা
কিছু প্রাপ্য ও শিক্ষণীয় তাহা আদায় করিয়া লইতে পারিব। এই কারণেই ইংরাজ
রাজা হউক, রাজা হইয়া আমাদিগের নবজাগরণের সহায়তা করুক, ইংরাজের শিক্ষাদী
আমরা বহির্ব্বিষয়কজ্ঞানে পারদর্শী হইয়া উঠি, এবং ক্রমে এইভাবে আধুনিক জগ
স্বাধীন ও স্বপ্রতিষ্ট রাষ্ট্র গড়িয়া তুলি বঙ্কিমচন্দ্রও তাহাই চাহিয়াছিলেন।
মতবাদটাই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

(২৩)

ইহার আরও একটা হেতু, অনুমান করা যাইতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র য়ুরোপের ঝাঁজের
দেশপ্রীতি বা patriotismএর পক্ষপাতী আদৌ ছিলেন না। য়ুরোপীয়েরা নিজের দেশকে
বড় করিতে যাইয়া অপরের দেশের উপরে অকথ্য অত্যাচার করিয়া থাকে, একথা তিনি দেখিয়া-
ছিলেন। স্পষ্ট ভাষায় তিনি য়ুরোপের এই স্বদেশপ্রীতির নিন্দা করিয়াছেন। ভারতবর্ষের লোকে
কোনও দিন যেন, এই আত্মঘাতী, বিশ্বদ্রোহী ও ধর্ম্মদ্রোহী অনুকরণ না করে, বঙ্কিমচন্দ্র
সর্ব্বান্তঃকরণে এই প্রার্থনা করিয়াছেন। এই ধর্ম্মদ্রোহী রাষ্ট্র-নীতির পথ বর্জ্জন করিয়া চলিতে
হইলে, যে ভাবে আধুনিক য়ুরোপে প্রবল পরাক্রান্ত রাষ্ট্র সকল গড়িয়া উঠিয়াছে, ভারতবর্ষকে
সে পথে যাইলে চলিবে না। আর যুদ্ধ বিগ্রহের পথে যদি ভারতবর্ষ আপনার রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা
লাভ করিতে যায়, বা যাইতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে য়ুরোপে যেরূপ সামরিক সাম্রাজ্য সকলের
প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, ভারতবর্ষেও সেই জাতীয় সামরিক-রাষ্ট্রেরই প্রতিষ্ঠা অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে,
বঙ্কিমচন্দ্রের মনীষা এই মোটা কথাটা যে ধরিতে পারে নাই, এরূপও মনে করিতে পারি না।
রক্ষা করিতে হইলেই, সেনা ও যুদ্ধের অন্যান্য সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ করিতে হইবে। আধুনিক
কালে যুদ্ধ ব্যপারটা অতিশয় জটিল হইয়া উঠিয়াছে। কেবল বাহুবলে আজিকালি রণজয়ী হওয়া
সম্ভব নয়। প্রবল পরাক্রান্ত বিপক্ষের সঙ্গে লড়াই করিয়া জয়শ্রী লাভ করিতে হইলে, এখন
জনবল, ধনবল, বুদ্ধিবল, বিদ্যাবল, জাতীয় জীবনের প্রায় সমগ্র শক্তিকে ও সম্পদকে
যুদ্ধকার্য্যে নিযুক্ত করিতে হয়। ইহাতে যুযুৎসু জাতিসকল পুনরায় অভিনব দাসত্বের
শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া পড়ে, সত্য স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রতার আদর্শ আয়ত্ত করিতে
পারা হয় না। এপথে বিশ্বমৈত্রীর প্রতিষ্ঠা অসাধ্য। আর ভারতবর্ষের সনাতন আদর্শই
হইতেছে বিশ্বজনীন মৈত্রী। ভারতবর্ষের হিন্দুরা অতি প্রাচীনকাল হইতে এই আদর্শের পশ্চাতে
ছুটিয়াছে। ইহাই ভারতের সভ্যতা ও সাধনার বিশেষত্ব। এই আদর্শভ্রষ্ট হইলে, ভারতবর্ষ
আপনাকে হারাইবে। আপনাকে যদি হারাইয়া, ভারতবর্ষ য়ুরোপের মতনই হইয়া উঠে,
তাহার স্বতন্ত্রভাবে বাঁচিয়া থাকিবার কোনও হেতু থাকে না। বঙ্কিমচন্দ্র এ সকল
যেরূপ সুস্পষ্ট করিয়া দেখিয়াছিলেন, এযুগে, এক রাজা রামমোহন ছাড়া আর কেহ সেরূপ
দেখিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। আর এই জন্যই, বঙ্কিমচন্দ্র, যেমন ধর্ম্মে ও সমাজে, সেইরূপ
রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রেও একটা সমন্বয় সাধন করিতেই চাহিয়াছিলেন। প্রয়োজন হইলে যুদ্ধবিগ্রহে
প্রবৃত্ত হওয়া যে পাপ, এরূপ কথা বঙ্কিমচন্দ্র কখনও ভাবিতেন না। নিষ্কামভাবে আততায়ীর
আততায়িতা নিবারণের জন্য অস্ত্রধারণ পাপ হওয়া দূরে থাকুক, অতিশয় পুণ্যকর্ম্ম, ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের
মত। আনন্দমঠে, সীতারামে, দেবীচৌধুরাণীতে, অনুশীলন ধর্ম্মে ও অন্যান্য প্রসঙ্গে তিনি অতি
পরিষ্কার করিয়া এই কথাটা কহিয়াছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যেমন যতক্ষণ কৌরবদিগের সঙ্গে

TORN PAGE(S)

পাণ্ডবদিগের সন্ধিতে, আপোষে, বিবাদ নিষ্পত্তির বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা ছিল, ততক্ষণ পর্য্য
প্রবৃত্ত হইতে চাহেন নাই, বঙ্কিমচন্দ্রও সেইরূপ যতক্ষণ স্বদেশের স্বাধীনতালাভের জন্য, বি
প্রভুশক্তির সঙ্গে সন্ধির ও সুলেনামার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা আছে, ততক্ষণ মারাত্মক বিগ্রহে
অবলম্বন অধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন। এই সন্ধি ও সুলেনামার দিকে তাঁর দৃষ্টি সর্ব্বদা
নিবদ্ধ ছিল। এই জন্যই তিনি স্বদেশবাসীদিগকে আপনার বাহুবল, ধনবল, জ্ঞানবল ও বিদ্যাবল
করিবার জন্য প্রণোদিত করিয়াছিলেন। কমলাকাণ্ডের দপ্তরে—আত্মনির্ভরই যে রাষ্ট্রীয়
ও স্বাধীনতালাভের একমাত্র পথ, ভিক্ষাবৃত্তিতে যে স্বাধীনতা মিলে না, এই কথাটা বিশে
বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। অথচ অন্যদিকে এই আত্মশক্তিকে বিরোধ জাগাইবার পক্ষে পরি
না করিয়া, প্রজার "প্রতাপ" প্রতিষ্ঠা করিয়া, রাজার স্বেচ্ছাতন্ত্রকে আপোষে নষ্ট
চাহিয়াছিলেন। বঙ্কিমের রাষ্ট্রনী[illegible] সমরায়োজনের স্থান আছে, কিন্তু তাহার লক্ষ্য সংগ্রাম
কিন্তু সন্ধির দিকে প্রতিপক্ষকে প্রণোদিত করা। এই রূপেই বঙ্কিমসাহিত্যের রাষ্ট্রনীতি
সমন্বয়ের প্রতিই লক্ষ্য রাখিয়া চলিয়াছে। এই কথাটা না ধরিলে, বঙ্কিমচন্দ্রের রাষ্ট্রনীতি
তত্ত্বটা ধরা সম্ভব হইবে না।

শ্রীবিপিনচন্দ্র

ফ্রান্সের দর্শন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১৮ ও ১৯ শতাব্দীয় ফরাসী দর্শনের উপর এই মাত্র সাধারণভাবে যে একটা সি
দিয়াছি তাহাতে সমস্তটা এক সঙ্গে আমাদের নজরে আসিয়াছে। উহার মধ্যে অনেক মনী
আমরা একপাশে সরাইয়া রাখিয়া কেবল প্রধান প্রধান মনীষিদিগের সমন্ধে আলোচনা করি
১৯-শতাব্দীতে কিরূপ হইল ? প্রায় একটিও ফরাসী পণ্ডিত বা ফরাসী লেখক দেখা যায় না
এ শতাব্দীর দর্শন ভাণ্ডারে কিছু না কিছু দান-সাহায্য করেন নাই।

পূর্ব্ববর্ত্তী তিন শতাব্দীতে (inorganic) নিরিন্দ্রিয় বস্তু সংক্রান্ত সূক্ষ্মতাত্ত্বিক (abst
বিজ্ঞান ও স্থূলতাত্ত্বিক (concrete) বিজ্ঞান যেরূপ জন্মলাভ ও পুষ্টিলাভ করে—যথা
যন্ত্রবিদ্যা, জ্যোতির্ব্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন—সেইরূপ ১৯-শতাব্দী, জীবন বিজ্ঞান
খুব গভীর দেশে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল যথা :—জৈবিক-জীবন এবং একটা বিশেষ
পর্য্যন্ত সমাজিক জীবন-বিজ্ঞান। এস্থলেও ফরাসীরা ছিল প্রথম-প্রবর্ত্তক। পদ্ধতিসংক্রান্ত

দের জন্য এবং কার্য্যফলেরও একটা প্রধান অংশের জন্য জগৎ তাঁহাদের নিকট ঋণী। আমরা
ইস্থলে বিশেষ করিয়া Claude Bernard (১) ও Auguste Comte-র (২) নামোল্লেখ করিব।

সূক্ষ্মতাত্ত্বিক বিজ্ঞানগুলার সম্বন্ধে, দেকার্ত্ত-রচিত "পদ্ধতি বিষয়ক সন্দর্ভ" যেরূপ, স্থূলতাত্ত্বিক
জ্ঞানগুলার সম্বন্ধে Chaude-Bernard-রচিত "পরীক্ষামূলক ভৈষজ্যের প্রস্তাবনা", সেইরূপ
পরীক্ষাগার-স্বরূপ হইয়াছিল। এই প্রতিভাবান শারীরতত্ত্ববেত্তা তাঁহার গ্রন্থে স্বকীয় অনুসৃত
পদ্ধতির বিচার-আলোচনা করিয়াছেন এবং স্বকীয় অভিজ্ঞতা হইতে, পরীক্ষা-ব্যাপার ও আবিষ্কার
সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম বাহির করিয়াছেন। Chaude Bernardএর কথা অনুসারে,
বিজ্ঞানিক গবেষণা—মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে কথোপকথন ছাড়া আর কিছুই নহে। প্রকৃতি
আমাদের প্রশ্নের যে সকল উত্তর দেন, সেই উত্তরে [illegible] কথোপকথনটা একটা অনপেক্ষিত
"মোড়" লইয়া থাকে; এবং আমাদিগকে নূতন প্রশ্ন করিতে [illegible]ইয়া দেয়; তাহার উত্তরে
প্রকৃতি আবার নূতন নূতন কথা বা চিন্তাবস্তু (idea) আমাদের সমক্ষে উপস্থাপিত করেন এবং
এইরূপ প্রশ্নোত্তর ক্রমান্বয়ে অনির্দ্দেশ্য কাল পর্য্যন্ত চলিতে থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে, না-তথ্য,
না-চিন্তাবস্তু কোনটাই বিজ্ঞানের উপাদান সামগ্রী নহে। এই বিজ্ঞান, সর্ব্বসময়েই আপাততঃ কাজ
চালাইবার ক্ষনিক ব্যবস্থা মাত্র, অংশতঃ প্রতীক মাত্র; তথ্য ও চিন্তাবস্তুর সম্মিলিত শ্রম হইতে
তার জন্ম। মানুষের যুক্তি ও প্রকৃতির যুক্তি ভিন্নপথগামী এই কথা Claude Bernard-
এর গ্রন্থে ওতপ্রোত রহিয়াছে। এই বিষয় সম্বন্ধে এবং আরও অনেক বিষয় সম্বন্ধে, Claude
Bernard, বিজ্ঞানের "ব্যবহারিক" "(Pragmatic)" সিদ্ধান্তবাগীশদিগকে এগাইয়া গিয়াছেন।

Auguste comte'এর "ধ্রুববাদের ব্যাখ্যান"—আধুনিক দর্শনের একটা বড় গ্রন্থ।
[illegible] হইতে আরম্ভ করিয়া সমাজতত্ত্ব পর্য্যন্ত—বিজ্ঞানগুলার মধ্যে একটা পদমর্য্যাদামূলক

---

(১) ১৮১৩—১৯৭৪।—(২) ১৭৯৮—১৮৫৭।

(২) সমাজতত্ত্বকে কোন ব্যক্তিবিশেষের সন্দর্ভ-হিসাবে আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে বলিয়া, Saint Simon, বা Fourier, or Purre Leroux কিম্বা Proudhon—ইঁহাদের নামোল্লেখ করিব না। একই কারণে যে সব প্রখ্যাত সমসাময়িক মনীষী, সমাজতত্ত্বের দিকে একটু ঝুঁকিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে একপাশে সরাইয়া রাখিব—সেইসব মনীষী যথা :—Espinas, Tarde, Durkhlim, Levy-Bruhl, Bon, Warms, Bongli, Semiand, Halbwaks Lacombe, Izoulet, Richard এবং আরও ব্যক্তি। ফরাসী সমাজ-তাত্ত্বিক গ্রন্থ অনেক; উহা পৃথক্‌রূপে আলোচনা করা দরকার। ইহার উপর নীতিবাদীদিগের গ্রন্থ; যথা, Bureau, Belot, Parodi, Jacob, Lapie, Payot, Landory, Boot, Pradines, Bernes, Gantecar, Desjardins, Delvali, Queyrat, Roberty, Ruyssen, Thomas, Darlu, Pecaut, Pegny ইত্যাদি। এক-একটা আলাদা জায়গা রাখা দরকার—কেননা G. Sorel আর মৌলিক মনীষী কোন তালিকারই অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না।

TORN PAGE(S)

পর্য্যায় স্থাপন করা—এই সহজ ও বিষদ কথাটাকে যখন হইতে Comte সূত্র-বদ্ধ করিলে
হইতেই উহা একটা ধ্রুবসত্য-সুলভ জোরের সহিত আমাদের মনের উপর চাপিয়া
যদিও এই যুগ-গুরুর সমাজতত্ত্বসংক্রান্ত গ্রন্থের কোন কোন বিষয়ের প্রতিবাদ করা যাইতে
তথাপি একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, সমাজতত্ত্বের উপর তিনি তাঁহার একটা "প্রো
দাগিয়া দিয়াছিলেন, এবং এই প্রোগ্রামটাকে ভরাট্ করিয়া তুলিতেও সুরু করিয়া
সক্রেটিস্ ধরণের সংস্কারক কোঁৎ, "আপনাকে জানো" এই মন্ত্রটি সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিয়া
যেহেতু সামাজিক মানবসংক্রান্ত জ্ঞান তাঁহার মতে বিজ্ঞানের চূড়ান্ত সীমা এবং দর্শনের স
উদ্দেশ্য; তিনি এই মন্ত্রটিকে ব্যক্তিবিশেষের উপর প্রয়োগ না করিয়া জনসমাজের উপর
করিয়াছিলেন। আরও আমরা এইকথা বলি যে, যিনি সমস্ত মনস্তত্ত্ব-দর্শনের প্রতিপ
আপনাকে ঘোষণা করিয়াছিলেন, সেই ধ্রুববাদের প্রতিষ্ঠাতার অন্তঃকরণটা আসলে
বেত্তার অন্তঃকরণ ছিল এবং ভবিষ্যদ্‌বংশীয়েরা দেখিতে পাইবে যে, তাঁহার গ্রন্থে বিশ্বমা
দেবতার আসনে বসাইবার জন্য কি প্রবল চেষ্টাই হইয়াছিল। (১) Comteরক।
Renanর (২) মানসিক আত্মীয়তা কিছুমাত্র ছিল না। যে মানবতার ধর্ম্ম ধ্রুববাদের
কল্পনা করিয়াছিলেন, সেই মানবতার ধর্ম্ম তাঁহারও ছিল সত্য—কিন্তু তাঁহার নিজের
ও বিভিন্ন অর্থে। তাঁহার যুগের উপর তিনি যে মোহজাল বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহার
কারণ ছিল। প্রথমতঃ তিনি একজন চমৎকার লেখক ছিলেন; কিন্তু কোন শ
না করিয়াও যদি কোন লেখক পাঠকের মনে ভুল জন্মাইয়া দিতে পারে, তাহ
তাহাকে কি প্রকৃতপক্ষে লেখক বলা যাইতে পারে?—আসল কথা, মনে হয় যেন
চিন্তাধারা একেবারে অব্যবহিতভাবে আমাদের চিন্তাধারার ভিতরে অলক্ষিতে প্রবেশ লা
কিন্তু তা ছাড়া, যে শতাব্দী ঐতিহাসিক বিজ্ঞানগুলাকে পুনর্জীবিত করিয়া তোলে সেই
বেশ উপযোগী—তাঁহার পোষিত আশাবাদসুলভ একটা ঐতিহাসিক কল্পনাও দুই কি
মনোমুগ্ধকর হইয়াছিল। কেননা একপক্ষে তিনি ভাবিতেন,—ইতিহাস বিশ্বমানবতার
ধারাবাহিক উন্নতি লিপিবদ্ধ করিয়া থাকে এবং পক্ষান্তরে তিনি মনে করিতেন, ইতিহাসই
ধর্ম্মের অনুকল্প, প্রতিভূ বা "বদলী"।

বিজ্ঞানের সম্বন্ধে—এই মানবতত্ত্বসংক্রান্ত বিজ্ঞানগুলির সম্বন্ধে—Taineএর গ্রন্থেও
রকমের বিশ্বাস পরিলক্ষিত হয়। Renanর প্রভাবপ্রতিপত্তি ফ্রান্সে Taineএরই সম
বিদেশে রেনা অপেক্ষা বরং আরও বেশী ছিল। (২) তিনি মানবীয় চেষ্টা-উদ্যমের

(১) ১৮২৩—১৮৯২।
(২) ১৮২৮—১৮৯৩।

ত্য, শিল্পকলা ইতিহাস প্রভৃতির বিভিন্ন আকারে; প্রাকৃতিক তত্ত্ববেত্তা ও ভৌতিক বিজ্ঞান-বেত্তার
ত প্রয়োগ করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে, প্রাচীন গুরুদিগের চিন্তাধারায় তাঁহার সমস্ত মন
দ্ধ ছিল। Spinozaর ন্যায়, তিনি "সার্ব্বভৌমিক অবিশ্যম্ভাবিতায়" বিশ্বাস করিতেন; সূক্ষ্মতত্ত্ব-
(abstraction) শক্তি সম্বন্ধে, কতকটা ঐন্দ্রজালিক ধরণের "মুখ্য গুণধর্ম্ম" সম্বন্ধে,
প্রভুত্বকারী মনোবৃত্তিসমূহ" সম্বন্ধে তাঁহার যে-সব মত ছিল তাহা কতকটা আরিষ্টটলের
প, প্লেটোর অনুরূপ। তিনি এইরূপ প্রকারান্তরে, মনস্তত্ত্ব (Metaphysic) বিদ্যার নিকট
বর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু এই মনস্তত্ত্বের চক্রবালকে তিনি মনুষ্যে ও মানবীর ব্যাপারে সীমাবদ্ধ
ছেন। Comteর সহিত তাঁহার সাদৃশ্য বা যোগ Renan অপেক্ষা বেশী ছিল না। তথাপি;
nanর ন্যায় তাঁহাকেও ধ্রুববাদীদের মধ্যে কখন কখন যে এক পর্য্যায়ভুক্ত করা হয় তাহা
অযৌক্তিক নহে। ফলতঃ ধ্রুববাদের নানাপ্রকার লক্ষণ নি করা যাইতে পারে। কিন্তু
দের বিশ্বাস, সর্ব্বাগ্রে উহার ভিতর, বিশ্বজগতের একটা মানব-কেন্দ্রিক ধারণা উপলব্ধি করা
ক।

প্রাবতত্ত্বমূলক দর্শন ও সামাজিক দর্শন—যাহার সৃষ্টি বহুলঅংশে ফরাসী প্রতিভার নিকট
সেই দুই দর্শনের মধ্যে বিশেষতঃ ১৯-শতাব্দীতে যে ধরণের গবেষণা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল
ফরাসী প্রতিভা হইতে প্রসূত। ইহার পূর্ব্বে মুখ্যরূপে ফ্রান্সে, ইংলণ্ডে ও স্কটলণ্ডে
hology) মনস্তত্ত্ব সংক্রান্ত কতকগুলি অন্তর্ভেদী সন্দর্ভ ছিল না এরূপ নহে। কিন্তু
ই বদ্ধ থাকায়, সহজ স্বাভাবিক অবিকৃত
র প্রদেশে, বিশেষতঃ "মগ্নচৈতন্যে"র প্রদেশে প্রবেশ
পারে নাই। সচরাচর যে পদ্ধতি অনুসৃত হইত, তাহার সহিত ১৯-শতাব্দী আর দুইটি
যোগ করিয়া দিল; একদিকে, পরিমিতির সমস্ত প্রক্রিয়া—যাহা পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত হয়;
যাহাকে রোগপরীক্ষাসংক্রান্ত (Clinical) পদ্ধতি বলে, সেই পদ্ধতি; এই পদ্ধতি
রোগীর রোগ পরীক্ষার ফল লিপিবদ্ধ করা হয়, আবার কতকগুলা বিকৃত-অবস্থার
উস্কাইয়া দেওয়া হয়—যথা মত্ততা, সম্মোহন-ব্যাপার ইত্যাদি। এই দুই পদ্ধতির
প্রথম পদ্ধতিটি বিশেষরূপে জর্ম্মাণীতে অনুসৃত হইয়াছে; যদিও এই পদ্ধতিটা উপেক্ষনীয়
বু একথা বলিতে হইবে, উহা হইতে যতটা আশা করা গিয়াছিল, ততটা ফল পাওয়া
। (১)
বিপরীতে, দ্বিতীয় পদ্ধতিটি হইতে এরই মধ্যে বড় রকমের কতকগুলি ফললাভ হইয়াছে।
নেক ফললাভ হইবে বলিয়া কিছু কিছু আভাস পাওয়া যাইতেছে। এক্ষণে এই শেষোক্ত

(১) ফ্রান্সে এই পদ্ধতির উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধি—Alfred Binet।

মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি যাহার অনুশীলন আজকাল অনেক দেশেই হইতেছে ইহা গোড়া
জাতি হইতে সমুৎপন্ন ; এবং এখনও ফরাসী-বিজ্ঞানরূপেই ইহা রহিয়া গিয়াছে। ১৯
প্রথমার্দ্ধে, ফরাসী উন্মাদ-চিকিৎসকগণকর্ত্তৃক ইহা প্রস্তুত হয়, পরে Moreau da Tou
একটা নির্দ্দিষ্ট আকারে গড়িয়া তোলেন। তাহার পর হইতে বরাবর, কোননা কোন ফর
ফ্রান্সে ইহার প্রতিনিধিরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। হয় তিনি নিদান-শাস্ত্র হইতে মনস্তত্ত্ব
আসিয়া পড়িয়াছেন, নয় মনস্তত্ত্ব হইতে মানসিক-নিদান-বিদ্যার ক্ষেত্রে আকৃষ্ট হইয়াছেন।
Charcot, Ribot, Pierre Janet, Georges Dumas ইঁহাদের নামোল্লেখ করি
হইবে।

কিন্তু যেমন ফরাসী দর্শনের একাংশ, শারীরস্থান, মনস্তত্ত্ব ও সমাজ-বিজ্ঞা
ঝুঁকিয়াছিল, সেইরূপ অবশিষ্টাংশ, পূর্ব্ববর্ত্তী শতাব্দীগুলার ন্যায়, সমগ্র প্রকৃতি-রাজ্য
মনোরাজ্যকে অনুশীলনের বিষয়রূপে গ্রহণ করিয়াছিল।

শতাব্দীর আরম্ভভাগে, ফ্রান্সে একজন বড় মনস্তত্ত্ববেত্তার আবির্ভাব হয় ;
মাল্‌ব্রাঁশের পর, ওরূপ দার্শনিক ফ্রান্সে আর জন্মায় নাই—তাঁহার নাম Maine de
যে সময় তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার মতবাদের প্রতি কেহ বড় একটা
নাই, কিন্তু ঐ মতবাদের প্রভাব প্রতিপত্তি ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছিল ; এখন এই ক
করা যাইতে পারে, এই দার্শনিক যে পথ খুলিয়া দিয়াছেন সেই নির্দ্দিষ্ট পথ দিয়া
চলিবে কিনা। Kant প্রতিপাদিত মতবাদের বিপরীতে (ইঁহাকে ফরাসী Kant বলি
করা ভুল) Maine de Biran বিচার করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, অন্তত এক বিষয়ে
পূর্ণস্বরূপে (absolute) উপনীত হইতে, এবং পূর্ণ স্বরূপকে বিচার আলোচনার বিষয় ক
হয়। তিনি দেখাইয়াছেন, আমাদের যে আত্মজ্ঞান আছে, বিশেষতঃ আপনাকে জা
আমরা যে চেষ্টা অনুভব করি, সেই অনুভূতির জ্ঞানের মধ্যে আমরা আমাদের এক
অধিকারে"র পরিচয় পাইয়া থাকি ; উহা নিছক্ "ঘটনাকে" (Phenomena) অতিক্র
স্বরূপ-গত (in itself) বাস্তবতায় আমাদিগকে উপনীত করে। Kant বলিয়াছেন, এ
আমাদের বিচার আলোচনার অনধিগম্য। সংক্ষেপে—Biran এইরূপ একটি মনে
কল্পনা করিয়াছেন যে, আমাদের আত্মজ্ঞান যতই নীচের দিকে নামিবে, যতই আভ্যন্তরি
গভীর দেশে প্রবেশ করিবে, ততই উহা উচ্চ হইতে আরও উচ্চতর দেশে—সাধারণতঃ
দিকে উত্থান করিবে। ইহার ভিতর তিনি কোন তর্কের খেলা খেলিতে যান নাই,
একটা দর্শনতন্ত্র গড়িয়া তোলেন নাই। শুধু প্রসন্ন দৃষ্টিতে দর্শনকে দেখিয়া, তাহা হইতে
পরিণাম ফল বাহির করিয়াছেন মাত্র।

তা ছাড়া Pascalএর সহিত Biranএর যে একটা মানসিক আত্মীয়তা ছিল তাহা B

গ্রন্থপাঠে আমরা জানিতে পাই। Maine-de Biranরই মতো Pascalএর প্রতি আসক্ত,
ক দর্শনেরই মতো গ্রীক-শিল্পকলায় বিমুগ্ধ Ravaisson আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছেন, কেমন
য়া প্রত্যেক ফরাসী-দর্শনের মৌলিকতা, কোন একটা প্রাচীনতন্ত্রের সহিত বন্ধনসূত্রে আবদ্ধ হইতে
কে নিবারণ করে না এবং কেমন করিয়া এই প্রাচীন তন্ত্রটাও নিজে আবার আরও প্রাচীনতর-
গিয়া মিলিত হয়। দেকার্ত্তের মতো কোন ব্যক্তি প্রাচীন দর্শনের বন্ধন যতই ছিন্ন করুক না কেন,
ার গ্রন্থে সেই শৃঙ্খলা ও পরিমাণসামঞ্জস্যের গুণ সংরক্ষিত হইতে পারে যাহা গ্রীক চিন্তাধারার
চায়ক লক্ষণ। Ravaisson, ফরাসী দার্শনিক চিন্তাধারায় এই কলাসৌন্দর্য্যের দিক—এই
ীন গ্রীসীয় চিন্তাধারার দিকটা আলোকে আনিয়াছেন। তিনি নিজেও এমন একটা দর্শনতন্ত্রের
া আঁকিয়াছেন, যাহা পদার্থসমূহের সৌন্দর্য্যের পরিমাণঅনুসারে উহাদের বাস্তবতার পরিমাণ
া থাকে।

Ravaisson এর নামের সহিত Lachelierএর নাম সংযুক্ত না করিয়া, Ravaissonএর
উল্লেখ করা যাইতে পারে না। রাভেসনেরই ন্যায় ইঁহার প্রভূত প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল।
সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন, Victor Cousinএর সহজ ও সৌম্যধরণের মতবাদের মধ্যে
ইয়া পড়িয়াছিল, সেই সময় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনকে, লাশ্‌লিয়ে আবার জাগাইয়া তুলিয়া
ন। (২) ব্যাপ্তিগ্রহের (induction) মূলভিত্তিসম্বন্ধে তাঁহার সন্দর্ভটি স্থায়ী সাহিত্যের
ল হইয়া বরাবর থাকিবে ; কেননা, স্থায়ী সাহিত্যের চরম উৎকর্ষের যে নিদর্শন তাহা উহাতেও
ছে। তাঁহার মতবাদের উপর কান্তিকবাদের (Kantism) দাবীদাওয়া থাকিলেও
বপক্ষে তিনি কান্তের বিজ্ঞানবাদকে (idealism) ছাড়াইয়া গিয়াছেন, এমনকি আর এক
ষ-জাতীয় বিজ্ঞানবাদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই বিজ্ঞানবাদ Maine de Biranর
ানবাদের সহিত একসূত্রে গ্রথিত হইতে পারে। এই অতুলনীয় দর্শনাচার্য্য ভাবীবংশের বহু
াচার্য্যকে স্বকীয় চিন্তার অন্নে পোষণ করিয়াছেন।

Boutroux তাঁহার রচিত "প্রাকৃতিক নিয়মের নৈমিত্তিকতা" (contingence) নামক
র্ড যে এক নূতন ও গভীর মতবাদ ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাকে রাভেসোঁর-দর্শনের কাছাকাছি,
যতঃ তাঁহার অভ্যাসসংক্রান্ত মতবাদের কাছাকাছি এবং কোঁৎ-দর্শনের কাছাকাছি (যে অংশে
বলিয়াছেন বিজ্ঞানগুলা (irreducible) পরস্পরের সহিত মিশিয়া গিয়া একাকারে

(১) ১৮১৩—৫৯০০।

(২) ১৭৯২—১৮৬৭। আমরা কুজ্যাঁর দর্শন সম্বন্ধে বেশী কিছু বলিব না, কারণ উহা বিশেষরূপ একটা
াদ মাত্র। কুজ্যাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে খুব প্রখ্যাত কতকগুলি দার্শনিক যে ছিল না, এরূপ নহে ; যথা—
et, Simon, Frank, Jant. Jouffroiএর জন্ম, (১৭৯৭-১৮৪২) Vacheroyএর জন্ম (১৮০৯-১৮৯৭)
ণের স্থান রাখা আবশ্যক। কুজ্যাঁ অগ্রদূতস্বরূপ আমরা Royer collardএর নামোল্লেখ করিব।

পরিণত হইতে পারে না।) আনা যাইতে পারে। আর এক বিভিন্ন পথ দিয়া প্রত্যয়গুলার (concept) সংগঠন যে সব নিয়মের অধীন, সেই সব নিয়ম বিশ্লেষণ গণিতবেত্তা Henri Poincare (১) ঐ একই রকমের সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন দেখাইয়াছেন, সমস্ত বিশ্বজগতের উপর আমাদের চিন্তা যে জাল বিস্তার করিয়াছে সেই মধ্যে কোন্‌গুলি মনুষ্য সংক্রান্ত, কোন্‌গুলি আমাদের বিজ্ঞানের জরুরি জিনি (exigenny) এবং কোনগুলি বিজ্ঞানের বাঞ্ছনীয় (preference) পদার্থ সংক্রান্ত।

Milhaud-এর মতবাদ উহারই অনুরূপ। (২) ইঁহারই সহিত এক সারীতে Ed Roycকে বসানো যাইতে পারিত, যদি কতকগুলি বাহ্য সাদৃশ্য সত্ত্বেও এই দার্শনি আর এক ভিন্ন মর্ম্মে অনুপ্রাণিত না হইত। তাঁহার "বিজ্ঞান বিচার" সাধারণতঃ সমস্ত সংক্রান্ত, নীতি ও ধর্ম্মসংক্রান্ত কতকগুলি ব্যক্তিগত ও গভীর মতাদির সহিত অ মানব-চিন্তার—সমানরূপে বৈধ—দুই মূর্ত্তির হিসাবে, মনস্তত্ত্ববিদ্যা ও বিজ্ঞানকে মুখামুখী স্থাপন করা—ইহাই হইতেছে Leard-এর মুখ্য মনোভাব। (৩) Fouil

(১) ১৮৫৪—১৯১২।

(২) আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বিশ্লেষণ ও বিচার আলোচনা সংক্রান্ত বাদ দিয়াছি। এ ক্ষেত্রেও ফ্রান্সের প্রভূত কৃতিত্ব লক্ষিত হয়।

অন্য বহু গ্রন্থকারের মধ্যে নিম্নলিখিত নামের উল্লেখ করিতেছি, যথা :—বড় রাসায়নিক Jnles ও Paul Tannery, Lechalas, Contourat, Duhem, Rey, Picard, Perrin, Bontroux, L. Poincare, Bloch, Winter, Goblot, L'auvre de Labande; তা ছাড়া ও de Brunschvigg,—ইঁহারা সকলেই বিজ্ঞানের মতবাদ ও সাধারণ দর্শনের ক্ষেত্রে গণনীয় সিদ্ধান্তের সম্বন্ধে Hannequin-এর যে একটি সুন্দর গ্রন্থ আছে, সে সম্বন্ধেও এই কথা বলা Le Dantrec-এর গ্রন্থে ধ্রুব বিজ্ঞানের একটা যান্ত্রিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

(৩) ১৮৩৮—১৯১২।

আমরা রস-তত্ত্ব (esthetic) সম্বন্ধেও এখানে কিছু বলিতে পারিব না (Sully Leveque, Seailles, Sourlaw, Dauriac, Buzarllas, Gaultred, Combareen, Pa ইত্যাদি) এবং দর্শনের ইতিহাস সম্বন্ধেও কিছু বলিতে পারিব না (Ravaisson, Cousin, Bovill Ianet, Foville, Cm Bontroux, Delbos, Leny Bruhl, Brochard, Croiset, Espena Adam, Halevy, Picavet, X. Leon, G. Leon, Fagnet, Cochin, delaeroin, R Andler, Baruzi, Hamilin. Basch, Berr, Rodier, Robin, Revand, Brehier, হত্যাদি।

(৪) ফ্রান্সে, ধর্ম্মসংক্রান্ত দর্শন, নিজ অধিকারের মধ্যে কতকগুলি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থকে স্থ নিম্নোক্ত নামগুলি শুধু স্মরণ করাইয়া দিতেছি :—Ole Laprune, Blondel, Exeb Lafousegrive, Welbois, H. Bois, Segond, Angurte, Sabatier, Paul Sabntrer, ইত্যা

একই চিন্তা। যেমন একদিকে তর্কবিদ্যাবিশারদ তেমনি অপরদিকে মনস্তত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের পারদর্শী Fouille ("idea force") "প্রত্যয়শক্তি" সম্বন্ধীয় একটা মতবাদ গড়িয়া তুলিয়াছেন—ইহা একটা পরিবর্দ্ধিত যুক্তিবাদ মাত্র। এই প্রখ্যাত মনস্বী, কি তাত্ত্বিক কি ব্যবহারিক, উভয় দৃষ্টিতেই দেখিতে গেলে, কতকগুলি নূতন মত প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন এবং সেই সকল মত খুব ঔৎসুক্যজনক ও আনুষঙ্গিক চিন্তা-উদ্রেককারী। তাঁহার একটি সৌম্য শিষ্য যুটিয়াছিল—তাঁহার নাম Gnyau। Neutzschea ন্যায় ততটা বিখ্যাত না হইলেও, Gnyau, মানব-জীবন চরম বিস্তার ও উচ্চ অবস্থা লাভ করিলে তাহার মধ্যে যে নৈতিক আদর্শ সন্ধান করিয়া পাওয়া উচিত, সেই আদর্শকে জর্ম্মান-দর্শনের পূর্ব্বে খুব সংযত কথায় ও অধিকতর গ্রহণযোগ্য আকারে লোকের সমক্ষে আনয়ন করিয়াছিলেন। এই দ্রুত নাম-গণনার মধ্যে, Maine-de-Biran-এর নামের সহিত দুই প্রথম শ্রেণীর দার্শনিকের নাম যুড়িয়া দিতে পারি নাই—তাঁহাদের নাম Renouvier ও Cournot (১)

Renonvier "কান্তিক বিচার পদ্ধতি" হইতে যাত্রা আরম্ভ করিয়া, যদিও (গোড়া হইতেই একটু বদল করিয়াছিলেন) আস্তে আস্তে উহা হইতে আপনাকে বিনির্ম্মুক্ত করিয়া, এমন কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যাহা শব্দতঃ মনোস্তত্ত্ববাদের সিদ্ধান্ত হইতে বেশী দূরে চলিয়া যায় না। তিনি বিশেষরূপে ব্যক্তিগত মানবের স্বাধীনতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। তিনি জগতে স্বাধীনতাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ধ্রুববিজ্ঞানের গোড়ার কথার কাছাকাছি আসিয়া এই সকল নিবন্ধের তাৎপর্য্যকে নবীকৃত করিয়াছেন, বিশেষতঃ তাঁহার সন্দর্ভের গোড়ায়, মানব-বুদ্ধির একটা বিচার সমালোচনা সন্নিবেশিত করিয়াছেন। তাঁহার নীতিবাদের দ্বারা এবং তাঁহার প্রকৃতি ও মনুষ্য সম্বন্ধীয় মতবাদের দ্বারা তিনি তাঁহার সময়কার দার্শনিক চিন্তার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন (২)

Cournot-ও, বিজ্ঞান-অনুশীলনের দ্বারা, বিশেষতঃ গণিতের দ্বারা দর্শন-ক্ষেত্রের অভিমুখে নীত হইয়া, একটা নূতন ধরণের বিচার-পরীক্ষাপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহা কান্তিক বিচার পরীক্ষা হইতে ভিন্ন। আমাদের জ্ঞানের আকার ও বিষয় সম্বন্ধে, বিবিধ পদ্ধতি ও কার্য্যফল সম্বন্ধে, এই বিচার-আলোচনা যুগপৎ প্রযুক্ত হইয়াছে। নানাবিষয় সম্বন্ধে—বিশেষতঃ দৈব-সম্ভাবনা, ও সাধারণ সম্ভাবনা সম্বন্ধে তিনি কতকগুলি নূতন, অন্তর্ভেদী ও গভীর মত আনয়ন করিয়াছেন। ১৯-শতাব্দীর দার্শনিকদিগের মধ্যে এই দার্শনিককে তাঁহার প্রকৃত আসনে—একটা প্রথম-আসনে—বসাইবার এখন সময় হইয়াছে।

(১) আরও কত সুযোগ্য মনোবিজ্ঞানবেত্তা ও আত্মতত্ত্ববেত্তাদের নাম এইস্থলে করা উচিত।—বিশেষরূপে কয়েকটি নামের উল্লেখ করিতেছে :—Evellin, dunan, Faulhan, Gaultier, Penyon, Noil, Boirag, Dugus, Weber.

(২) Renonvior-এর নামের সহিত অনুযুক্ত Pillon, Dagriac ও Hamelm-এর নাম উল্লেখযোগ্য।

BLOCKED INFORMATION

পরিশেষে, Bergson, দর্শন-ক্ষেত্রে যে-এক নূতন উদ্যোগ চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন সম্বন্ধে দুই একটা কথা এখন বলা যাইতে পারে। পরীক্ষিত অভিজ্ঞতার ভূমিতে-মনোবিজ্ঞা আনিবার উদ্দেশে, এবং বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া ও আত্মচৈতন্যের দোহাই দিয়া, প্রাতিভ-বৃ (intuition) পরিপুষ্ট করিয়া একটা দর্শনপদ্ধতি গঠনের জন্য তিনি প্রয়াস পাইয়াছেন। দর্শনতন্ত্র শুধু যে কতকগুলা সাধারণ ধরণের মতবাদ যুগাইতে সমর্থ তাহা নহে, পরন্তু তথ্য-বিশে স্থূলবস্তুগত (concrete) ব্যাখ্যা করিতেও সমর্থ। এই বিস্তৃতভাবের দর্শনতন্ত্র, ধ্রুববিজ্ঞা ন্যায় তথ্যগুলাকে ঠিক্‌ভাবে, যথাতথভাবে প্রকাশ করিতে পারে। যে সকল পরিণামফল এ অর্জ্জিত হইয়াছে, তাহাতে একটার পর একটা পর-পর আরও যোগ করিয়া, বিজ্ঞানেরই উহা অবিরাম গতিতে অগ্রসর হইতে পারে। কিন্তু তা ছাড়া উহার আর একটা লক্ষ্য আ ইহার দরুণই বিজ্ঞানের সহিত যাহা কিছু পার্থক্য। সে লক্ষ্যটি কি?—না মানব-বু কাঠামটাকে উত্তরোত্তর বাড়াইয়া তোলা (তাহাতে অমুক-অমুক জিনিষ যদি ভাঙ্গিয়া ফে হয় তাহাও স্বীকার) এবং মানবীয় চিন্তাধারাকে অনির্দ্দেশ্যভাবে প্রসারিত করা।

(আগামী সংখ্যায় সমা

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠা

প্রতিধ্বনি

গত ১৫ই শ্রাবণ, মঙ্গলবার, লোকমান্য তিলক মহোদয়ের তৃতীয় তিরোভাব "আনন্দ বাজার পত্রিকা" "লোকমান্য তিলক সংখ্যা" প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে তিলক মহারাজের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ দেশের বহু প্রধান ব্যক্তির প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা নিম্নে তাহা হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিলাম :—

তিলক-চরিত

স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে শ্রীমতী আনিবেশান্ত বলিয়াছিলেন, "প্রথম দৃষ্টিতে তিনি সন্ন্যাসী অপেক্ষা বলিয়াই অনুমিত হইতেন এবং তিনি প্রকৃতই একজন যোদ্ধাসন্ন্যাসী ছিলেন।"

স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় লোকমান্য তিলকও বেদান্তের কর্ম্মযোগে বিশ্বাসী ছিলেন, এবং এক সদ যোদ্ধৃভাব তাঁহার চরিত্রের প্রধান বিশেষত্ব ছিল। মাননীয় মিঃ গোখেল তাঁহার কোন ইংরাজ বলিয়াছিলেন, 'তিলক যদি ১২০ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে তিনি একটী রাজ্যস্থাপন পারিতেন।' একথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতা, এ দেশে প্রচারের ফলে, প ভাব ও আদর্শের মধ্যে লালিত ও বর্দ্ধিত যে সমস্ত সংস্কারক ও রাজনৈতিক দেশে দেখা দিয়াছিলেন, তাঁহাদের সমসাময়িক হইলেও, তাঁহার চরিত্রগঠনের উপাদানের মধ্যে পাশ্চাত্যের কিছু ছিল না।

উদ্দীপ্ত যে মারাঠী ব্রাহ্মণগণ অদ্ভুত মনীষাবলে এক শতাব্দী ধরিয়া ভারতের ইতিহাস ভাঙ্গিয়া গড়িতে উদ্যত হইয়াছিলেন,—মহারাষ্ট্রের সেই গৌরব-রবির শেষ রশ্মিচ্ছটা তিলকের চরিত্রের মধ্য দিয়া সমগ্র ভারতে কিরণ দিয়াছে। লোকমান্য তিলক, রাষ্ট্রবিদ্ মারাঠী-ব্রাহ্মণগণের সর্ব্বশেষ মানববংশধর ছিলেন, একথা বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্রে একক দাঁড়াইয়া এই অমিত-বীর্য্যশালী যোদ্ধৃ-পুরুষ ৪০ বৎসরকাল সমভাবে, শাসক সম্প্রদায়ের অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছেন। আইনের নাগপাশে রুদ্ধকণ্ঠ দেশের বেদনাকে তিনি ভাষা দিয়াছিলেন।

জন্ম ও বাল্যকাল

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুলাই বালগঙ্গাধর তিলক রত্নগিরিতে ভূমিষ্ঠ হন। রত্নগিরি হইতে বলজী বিশ্বনাথের জন্মস্থান অধিকদূর নহে। পেশোয়া বংশোদ্ভূত এই বালক, ভারতবর্ষের এক অতি সঙ্কটাপন্ন রাষ্ট্রীয় অবস্থার সময় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সাম্রাজ্যলোলুপ লর্ড ডালহৌসী, ভারতের স্বাধীন নৃপতিগণের মধ্যে কাপুরুষ, মূর্খ, বিলাসী নরপতিগণের মধ্যে যেখানেই একটু স্বাধীনতাপ্রিয়তা দেখিয়াছেন, তাহাদিগকে নানা উপায়ে বঞ্চিত করিয়া ভারতের মানচিত্রের বহুলাংশ রক্তবর্ণে রঞ্জিত করিয়া তখন সবেমাত্র প্রস্থান করিয়াছেন, দিল্লী ও সাতারার সম্রাট বংশদ্বয় তখন রাজ্যভ্রষ্ট—মোগল ও মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যের গরিমাসূর্য্য অস্ত গিয়াছে—অর্দ্ধচন্দ্রাঙ্কিত ইসলাম পতাকা ও গৈরিক 'ভাগোয়া-ঝেন্দা' ভূলুণ্ঠিত—হিন্দু ও মুসলমান সেদিন একসঙ্গে অবনতশির। সিপাহী-বিদ্রোহ দেখা দিল। কিন্তু জাতীয়তার বোধহীন, স্বাধীনতা বিমুখ জনসাধারণ—অসন্তুষ্ট ও বিদ্রোহী মুষ্টিমেয় রাজা, নবাব এবং সৈন্যদলের সহিত যোগ দিল না। ইংরাজগণ প্রথমে একটু বিব্রত হইয়াছিলেন, কিন্তু পরে দেশবাসীর সাহায্যে এই বিদ্রোহাগ্নি অল্পায়াসেই নিভাইয়া ফেলিলেন। ভারতবর্ষের বুকে ইংরাজ শাসন সুদৃঢ় হইল।

তিলক-জননী সম্বন্ধে অতি অল্পই জানা যায়; তবে তিনি অতি দয়ার্দ্রহৃদয়া ও ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন। তিলকের পিতা ৺গঙ্গাধর রামচন্দ্র তিলক, প্রথম যৌবনেই বহু আয়াসে ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। কিন্তু ভাগ্যবিপর্য্যয়ে এই জ্ঞান-পিপাসু যুবক শিক্ষা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই ১০৲ টাকা বেতনে একটী স্কুলের শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁহার প্রবল জ্ঞান পিপাসা তৃপ্ত হয় নাই—তিনি অবসরকালে সংস্কৃত, অঙ্কশাস্ত্র ও মারাঠীভাষা আলোচনা করিতেন। এই স্কুলমাষ্টার স্বাধীন চিত্ত ছিলেন বলিয়া কর্তৃপক্ষের প্রীতিভাজন ছিলে না কাজেই চাকরীর উন্নতি হয় নাই। ১৭ বৎসর পর কায়ক্লেশে ডেপুটী ইনেস্‌পেক্টার হইয়াছিলেন মাত্র।

ষোড়শ বৎসর বয়সে তিলকের কৈশরের রমনীয় স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল—১৮৭২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতা তাঁহাকে একাকী রাখিয়া সহধর্ম্মিণীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিলেন। পিতৃমাতৃহীন ষোড়শবর্ষীয় যুবক একাকী কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া নিষ্ঠুর ভাগ্যের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।

তিলকের বাল্যশিক্ষা

বাল্যকাল হইতেই তিলকের প্রতিভা তাহার পিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। সেই জন্যই তিনি পুত্রকে বিশেষ যত্ন সহকারে সংস্কৃত ও অঙ্কশাস্ত্র স্বয়ং পড়াইয়াছিলেন। তিলক অশান্ত বালক ছিলেন এবং খেলা ভালবাসিতেন; কিন্তু অধ্যয়নেও অতিশয় অনুরাগ প্রদর্শন করিতেন। তাঁহার পিতার ছোট পুস্তকালয়ে তাহাকে অনেক সময়ে নিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়নরত দেখা যাইত।

BLOCKED INFORMATION.

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে রত্নগিরি জেলার লাড্‌ঘর নিবাসী ৺বাল্লাল বালের কন্যা ৺তাপীবাইয়ের সহিত বিবাহ হয়। তাহার এক বৎসর পরেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়।

কলেজে শিক্ষা ও সতীর্থগণ

সমস্ত প্রকার ভাগ্যের ধিক্কার আগ্রাহ্য করিয়াই তিলক ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্য কলেজে করিলেন, এবং বিশ বৎসর বয়সে সম্মানের সহিত বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। এই কালে তিনি ব্যায়ামচর্চ্চা করিতে ত্রুটী করেন নাই। যৌবনে তিনি বেশ শক্তিসবল ছিলেন।

তিলক বি, এ, পাশ করিয়া আইন অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন এবং ১৮৭৯ সালে এল, এল-বি লাভ করিয়া আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে, যে বৎসর তিলক বি, এ, পাশ করেন, সেই বৎসর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবসান বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র হয়। এই ষড়যন্ত্রের নেতা একজন গবর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব কেরাণী—ওয়াসিদেও ফাড্‌কে। ফাড্‌কে ও তাঁহার সহকর্ম্মীরা তেমনভাবে সার্ব্বজনীন অভ্যুত্থানের আয়োজন করিতে পারেন। গবর্ণমেণ্ট অল্পায়াসেই এই চেষ্টা দমন করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু এই ব্যাপার হইতে মারাঠী ব্রাহ্মণগণকে গ অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। বিশেষভাবে পুণার ব্রাহ্মণগণ, দমন-নীতির ফলে যথেষ্ট উৎপী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। এই ঘটনার পর তিলক অতিমাত্রায় চিন্তিত হন। এই কালেই তিনি বর্ত্তমান পক্ষে সশস্ত্র বিদ্রোহ অসম্ভব বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন বর্ত্তমান ইংরাজগবর্ণমেণ্টকে দুই ভাঙ্গা বন্দুক যোগাড় করিয়া আক্রমণ করিলে, তাহার ফলে অধীনতা বাড়িয়াই চলিবে—চাই ভারতব্যাপী ঐ আন্দোলন—গবর্ণমেণ্ট যেভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া শৃঙ্খলার সহিত কার্য্য চালাইতেন, শিক্ষার মধ্য দিয়া তাঁহারা প্রতিষ্ঠা করিতেছেন, সেই উপায় আমাদিগকেও অবলম্বন করিতে হইবে। তবেই আমরা কৃতকার্য্য হইব।

দ্বিতীয়তঃ ১৮৭৭-৭৮ খৃষ্টাব্দের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ—এই দুর্ভিক্ষে ৫০ লক্ষ ভারতবাসী মারা যায়। এ ক্ষোভে দুঃখে তিলক রাত্রে নিদ্রা যাইতে পারিতেন না। নিজেরা দরিদ্র হইলেও, কতিপয় সহাধ্যায়ীর স তিলক এক সাহায্য ভাণ্ডার করিয়া যথাসাধ্য দরিদ্রগণকে রক্ষায় প্রবৃত্ত হন। ঐ বৎসর যখন ভার লক্ষ নরনারী ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণত্যাগ করিতেছে, সেই সময় ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য পরিচালকগণের পরামর্শে স ব্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া "কৈসর-ই-হিন্দ" উপাধি গ্রহণ করিলেন দেখিয়া তিলক অতীব মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন।

কর্ম্মজীবনের প্রারম্ভ

এই সময় তিলক, আগারকার প্রভৃতি তাঁহার সহাধ্যায়ীদের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, ওকালতী না করিয়া শিক্ষকতা কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবেন। দেশে প্রকৃত শিক্ষার অভাব এবং যো দিয়া মানুষ গড়িয়া তুলিবার জন্য কয়েকজন স্বার্থত্যাগী যুবক কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং মহামতি রাণাডের আ পরামর্শ গ্রহণ করিয়া তাঁহারা ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারী পুণায় এক নূতন ইংরাজী স্কুল প্রতিষ্ঠা ক কেবল তাহাই নহে, শ্রীযুক্ত আগারকার ও চিপ্‌লোনকারের সাহায্যে তিনি 'মারাঠা' ও 'কেশরী' নামক ইংরাজী ও দেশীয় ভাষায় দুইখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। এই পত্রিকাদ্বয়ের সাহায্যে দেশে নূতন ভাব প্রচার করিতে লাগিলেন। কি শিক্ষক ও সংবাদপত্র-সেবক—এই দুই কার্য্যেই তিলক যু শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

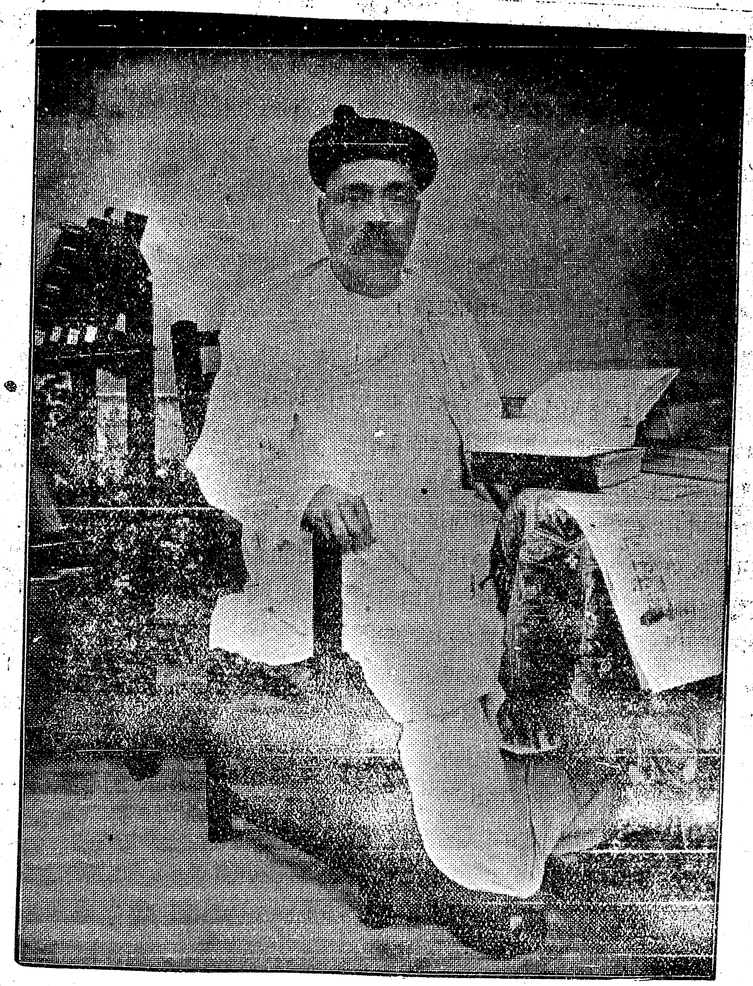

"ভারতমিত্র" পত্রের সৌজন্যে

স্বর্গীয় লোকমান্য তিলক

অটল যে-জন দাঁড়িয়ে ছিল অনেক নির্য্যাতনে
মর্য্যাদারি মৌন ধ্বজা তুলে,
প্রতিষ্ঠা যার লক্ষ লোকের নিষ্ঠাপূত মনে,
চিতায় শুয়ে আজ সে সিন্ধুকূলে!
মারাঠা যার চরণ-পীড়ি,—কীর্ত্তি দিগ্বিদিকে,
দৃষ্টিতে যার উঠ্‌ত কমল ফুটে,
বাংলা-মুলুক সত্যি ভালো বাস্‌ত যে বর্গীকে
নেই রে সে আর হৃদয় নিতে লুটে!

* * * *

চ'লে গেল মৃত্যু-পারে, রেখে অমর-স্মৃতি,
যম-জয়ী যে তার জীবনের ভাতি,
ভবিষ্যতের অন্ধকারে তার সে ভারত-প্রীতি
জাগ্‌বে যেমন বাতি-ঘরের বাতি।
তার সে চিতার ভস্ম-কণা উড়ে হাওয়ার ভরে
পড়্‌বে যেথা নূতন তিলক হবে,
শ্মশান-শিবা যতই বলুক, সত্য-শিবের বরে
কীর্ত্তি তাহার অমর হ'য়ে রবে।

—৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

তিনি কলেজের কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া দেশসেবায় ব্রতী হইলেন, এই সময় সহবাস-সম্মতি আন্দোলন উপস্থিত হয়। তিলক তীব্রভাবে ঐরূপ আইন দ্বারা সমাজ সংস্কারের প্রতিবাদও করেন। রাণাড়ের দল উহা সমর্থন করে। এই বাদানুবাদে সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে মতভেদ হইয়া মারাঠা সমাজে হয়। যাহা হউক, এই সময় হইতেই তিলক রাষ্ট্রীয় কর্ম্মে একাগ্রভাবে আত্মনিয়োগ করেন।

গণপতি ও শিবাজী উৎসব

অতীত ইতিহাসের শিক্ষা ও ইঙ্গিত সম্পূর্ণ গ্রহণ না করিয়া কোন জাতি বড় হইতে পারে না। মহা অতীত গৌরব সম্বন্ধে জাতিকে সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য তিলক বিশেষভাবে গণপতি ও শিবাজী উ প্রবর্ত্তন করেন,—অদ্যাবধি এই উৎসব চলিয়া আসিতেছে।

দেশ-সেবা

১৮৯৬—৯৭ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রদেশে দুর্ভিক্ষ ও প্লেগ মহামারীর বিভীষিকা জাগিয়া উঠিল। তিলক দে দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য গবর্ণমেণ্ট কোন চেষ্টা করিতেছেন না। তাঁহার পত্রিকায় এ সম্বন্ধে প্রবন্ধের সম্পাদনের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থকাম হইলেন। তিলক তাঁহার সার্ব্বজনীন সভার সাহায্যে নানাস্থানে খাদ্য-শস্য বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করেন এবং যথাসাধ্য দরিদ্রদিগকে রক্ষা করিতে ব্রতী হন।

পুণায় যখন প্লেগ দেখা দিল, তখন অনেকেই প্রাণভয়ে পলায়ন করিলেন, কিন্তু তিলক পালাইবার নহেন। তিনি বহুকষ্টে অর্থসংগ্রহ করিয়া এক হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিলেন, এবং প্লেগরোগীর সেবা হইলেন। গবর্ণমেণ্ট প্লেগ দমনে যে ব্যবস্থা করিলেন, তিলক তাহা সমর্থন করিলেন, এবং গবর্ণমেণ্টের একযোগে কার্য্য করিয়াছিলেন; কিন্তু গবর্ণমেণ্টের অতিরিক্ত কঠোরতার নিন্দা করিয়াছিলেন। যা এই ঘটনায় তিলকের অসামান্য স্বদেশপ্রীতির পরিচয় পাইয়া দেশের দরিদ্র জনসাধারণ তাঁহাকে দেবতার ন করিতে লাগিল।

প্রথম রাজদ্রোহে অভিযুক্ত

শিবাজী-উৎসবের মধ্যে দিয়া তিলক মহারাষ্ট্রে বীরপূজার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্র গৌরবময় অভ্যুত্থানের ইতিহাসে মহারাজা শিবাজীর মহিমময় মনুষ্যত্বের তেজ ও বীর্য্যে সমগ্র জাতিকে জ করিয়া তুলিবার চেষ্টায় গবর্ণমেণ্ট শঙ্কিত হইলেন। আমলাতন্ত্রের খরদৃষ্টি তিলকের উপর নিপতিত হইল।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট তিলক বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ইহাতে জন উপর তিলকের প্রভাব যথেষ্ট অনুভূত হইয়াছিল। নিষ্ফল হইলেও তিলক ব্যবস্থাপক সভায় সরকারী বিলের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ১৮৯৭ সালের জুনমাসে 'কেশরী' পত্রিকায় তিলক শিবাজী-উৎসব কয়েকটী প্রবন্ধ লেখেন। দৈবযোগে এই সময় ২২শে জুন মিঃ র‍্যাণ্ড ও এয়ারেষ্ট গুপ্তঘাতকের হস্তে নি অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান কাগজগুলি ইহার জন্য ক্ষেপিয়া উঠে; তাহারা ইহার জন্য পুণা ব্রাহ্মণগণের ষড়যন্ত্র আ সন্দেহ প্রকাশ করিতে লাগিল। ফলে এই হত্যাকাণ্ডের সহিত শিবাজী-উৎসবের ও তিলকের লিখিত সম্বন্ধ আছে সন্দেহ করিয়া রাজদ্রোহের অপরাধে ২৭শে জুলাই বোম্বাইয়ে তিলক মহারাজকে গ্রেপ্তার করা কেবল তিলক নহেন, আরও তিনজন সংবাদপত্র সম্পাদক গ্রেপ্তার হইলেন,—নাথু ভাইরা ১৮১৮ সা আইনে নির্ব্বাসিত হইলেন। লোকমান্য তিলকও ১৮ মাসের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন

তিলকের নাম সমগ্র ভারতে ছড়াইয়া পড়িল। ব্যবস্থাপকসভার সদস্য রাজ্যময় তিলক,—রাজশক্তির অনুকম্পায় লোকমান্য তিলক হইলেন।

নবযুগের পুণ্যপীঠ যারবেদা জেলে লোকমান্য তিলক অবস্থান করিতেছিলেন। কঠোর পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ায়, কারাদণ্ড শেষ হইবার ছয়মাস পূর্ব্বেই তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তৎপরে স্বাস্থ্য লাভার্থ তিলক ছয়মাসকাল সিংহগড়ে বিশ্রাম করেন।

গ্রন্থ প্রণয়ন

রাজনৈতিক আবর্ত্তে পড়িয়া তিলক জীবনে জ্ঞানচর্চ্চার অধিক অবসর পান নাই। তথাপি বৈদিক-সাহিত্যে তাঁহার যে অসামান্য অধিকার ছিল, তাহার সাহায্যে জেলে বসিয়া তিনি বৈদিকযুগে উত্তর মেরুতে আর্য্যনিবাস নামক যে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, খুব অল্প লোকেই এই পুঁথিখানি বুঝিবার ক্ষমতা রাখেন। পণ্ডিত ম্যাক্সমুলার, মিঃ উইলিয়ম হাণ্টার প্রভৃতি দু'একজন ইংরাজ পণ্ডিত বৈদিক সাহিত্যে তিলকের পাণ্ডিত্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। আমেরিকার বোষ্টন ইউনিভারসিটির প্রিন্সিপ্যাল ডাঃ ওয়ারেন তিলকের পাণ্ডিত্যের অজস্র প্রশংসা করিয়াছেন।

তিলক ও কংগ্রেস

প্রথম হইতেই লোকমান্য তিলক কংগ্রেসী আন্দোলনে যোগদান করেন। কিন্তু তৎকালীন কংগ্রেসে তিলকের কোন প্রতিষ্ঠা ছিল না। মডারেট ও ধামাধরার দল তিলককে কংগ্রেসে এক অনাবশ্যক উৎপাত স্বরূপ মনে করিতেন। কংগ্রেসী আন্দোলনকে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিবার তিলক পক্ষপাতী ছিলেন, এবং কথা ছাড়িয়া কাজ করিতে চাহিয়াছিলেন,—ইহাতে গবর্ণমেণ্টের অসন্তুষ্টি হইবে ভয়ে মডারেটগণ সম্মত হয় নাই। ১৮৮৯ খৃঃ অব্দে দাক্ষিণাত্য শিক্ষা-সমিতির সহিত সংশ্রব ত্যাগ করিবার পর তিলক একাগ্রচিত্তে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়েন। ইহার জন্য, বোম্বাইএর বিখ্যাত মডারেট-নেতা ও সংস্কারক, রাণাডে এবং তেলাং তাঁহার সহিত বিরোধিতায় প্রবৃত্ত হন। মিঃ গোখলেও রাষ্ট্রক্ষেত্রে তিলকের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, এবংরূপে নরমপন্থী ও চরমপন্থী—ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্রে দুইটী দল দেখা দেয়।

স্বদেশী-আন্দোলন ও নূতন দল

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালীর তীব্র প্রতিবাদ ও আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া লর্ড কার্জ্জনের গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গলাদেশ দ্বিধা বিভক্ত করিলেন। এই বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ হইতেই স্বদেশী আন্দোলনের জন্ম। বাঙ্গালীর স্বদেশী আন্দোলন জাতীয় জীবনের সকল বিভাগে জাতীয় ভাবের বন্যা আনিল,—বিলাতীদ্রব্য বয়কট ও জাতীয় শিক্ষার আন্দোলনের তীব্রতা দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট দমননীতি আরম্ভ করিলেন। বাঙ্গালীর স্বদেশী আন্দোলনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বাঙ্গলার সীমা লঙ্ঘন করিয়া সমগ্র ভারতের সম্মুখে যে বার্ত্তা বহন করিয়া লইয়া গেল, তাহাকে বরণ করিলেন—মারাঠী তিলক ও পঞ্জাবী লাজপৎ।

এই আন্দোলন বাক্য হইতে কর্ম্মের পথে যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, সরকারী দমন-নীতি ততই প্রবল হইয়া উঠিল। ১৯০৭ সালে লালা লাজপৎ রায় ও সর্দ্দার অজিত সিংহ নির্ব্বাসিত হইলেন। এই স্বদেশী-আন্দোলনের সহিত যোগ দিয়াই তিলক প্রাদেশিকতার সীমা ছাড়াইয়া, অভিনব ও নবগঠিত জাতীয়দলের নেতৃত্ব [illegible] এবং বাঙ্গালীর স্বদেশী-আন্দোলনকে সমগ্র ভারতের আন্দোলনরূপে জাগ্রত করিয়া তুলিবার জন্য

প্রচারকার্য্যে ব্রতী হইলেন। শত শত যুবককে 'স্বদেশী'র পুণ্যমন্ত্রে দীক্ষা দিয়া তিলক সমগ্র প্রচারকার্য্যে প্রেরণ করিলেন। স্বয়ং তিলক মহারাষ্ট্রের প্রতি পল্লী-নগরে স্বদেশীর বার্ত্তা প্রচার লাগিলেন। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, লাজপৎ রায়, খাপার্দ্দে, সুব্রহ্মণ্য আয়ার প্রভৃতি নেতাগণ লোকমান্য তিলকের প্রতিভা, বুদ্ধি, হৃদয়, আত্মত্যাগ, দুঃখভোগ দেখিয়া তাঁহাকেই জাতীয় দলে নেতৃত্বের পদ প্রদান করিলেন। কংগ্রেসে তখন মডারেটগণের প্রভাব অত্যন্ত অধিক। সুরেন্দ্রনাথ মেটা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠাবান্ নেতার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে তিলক রাষ্ট্রক্ষেত্রে দেখা দিলেন,—স্বাধীনতা আন্দোলন, জাতীয়দলের চেষ্টায় স্বরাজলাভের আন্দোলনরূপে জাগিয়া উঠিল। গণতন্ত্রের আদর্শে এই আন্দোলনকে সাফল্যের পথে পরিচালিত করার দুঃসাধ্যব্রত লইয়া তিলক জনসাধারণের মধ্যে ব্রতী হইলেন।

তৎকালীন মডারেট ও জাতীয়দলের রাজনৈতিক আদর্শের পার্থক্য বুঝিতে হইলে,—দুইদলের নেতার কথা স্মরণ করা কর্ত্তব্য।

রাণাডে বলিলেন,—আমাদের অভাব অভিযোগের প্রতীকারকল্পে আবেদন পত্র গবর্ণমেণ্টের নিকট হইবে, সেগুলি দেখিয়া জনসাধারণের রাষ্ট্রবোধ জাগ্রত হইবে।

তিলক বলিলেন,—জাতীয়দল কয়েক ধাপ অগ্রসর হইয়া বলিতে চান—আমাদের সমস্ত কথা দেশের জনসাধারণকে উদ্দেশ্য করিয়াই বলিতে হইবে; গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে তাহা হইতেই দেশের অভিযোগ বুঝিতে পারিবেন।

আজ পর্য্যন্তও জাতীয়দলের আন্দোলনে শেষ কথা ইহাই। তিলকের তীব্র লেখনী, জ্বালাময় অখণ্ডনীয় যুক্তি—অল্পবিশ্বাসী, ভিক্ষাবৃত্তিসার মডারেটদল এবং ভারতের চিরশত্রু অ্যাংলোইণ্ডিয়ানদের ও বিব্রত করিয়া তুলিল। 'বয়কট' লইয়াই প্রধান মতভেদ। মডারেটগণ ইংরাজদের অসন্তুষ্ট সমর্থন করিবার ভরসা পাইতেছিলেন না। মডারেটগণের তিনটী স্পষ্টভাব বুঝা গেল,—(১) গবর্ণমেণ্ট বা ভারতীয় আমলাতন্ত্রের ন্যায়-পরতার প্রতি বিশ্বাস ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহেন, (২) আন্দোলন' এই কথা তুলিয়া বাক্য ছাড়া কাজে কিছু করিতে প্রস্তুত ছিলেন না, (৩) তাঁহারা সর্ব্বদাই প্রবল প্রতাপের গুণকীর্ত্তন এবং দেশবাসীর দৌর্ব্বল্য ও অযোগ্যতার কথাই বিশেষভাবে ব্যক্ত করিতেন।

'বৈধ-আন্দোলন' বিচার করিতে মডারেটগণ অবশ্য সরকারী মাপ কাঠিই ব্যবহার করিতেন। রাষ্ট্রীয় আন্দোলনই আমলাতন্ত্র ইচ্ছা করিলে অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে এবং কার্য্যতঃ মডারেটরা পিছাইয়া রহিলেন এবং প্রাণপণে জাতীয়দলকে বাধা দিতে লাগিলেন।

জাতীয় দল ও কংগ্রেস

এই নবজাগরণের ফলে যে জাতীয়দল গড়িয়া উঠিল, তাহাদিগের সাহায্যে তিলক কংগ্রেসে ম সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। কংগ্রেসকে ভাঙ্গিয়া গড়িবার জন্য তিলক প্রথমতঃ তিনটী কর্ত্তব্য স্থির (১) কংগ্রেস সরকারী কর্ত্তাদের মুখ চাহিয়া থাকিবে না। আমলাতন্ত্রের অনুগ্রহ ভিক্ষার দৌর্ব্ব কংগ্রেসকে মুক্ত করিতে হইবে। (২) কংগ্রেসের প্রত্যেক প্রস্তাবের মধ্য দিয়া যথাসাধ্য দেশ ব্যক্ত করিতে হইবে। (৩) কংগ্রেসকে শুদ্ধ একটা বাৎসরিক সভা না করিয়া দেশের রাষ্ট্রীয় কার্য

গড়িয়া তুলিতে হইবে। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের বারাণসী-কংগ্রেসেই এই কার্য্যের সূচনা হইল। কংগ্রেসী মডারেট-স্বেচ্ছাতন্ত্র প্রতিবাদী হইলেন, কিন্তু জাতীয়দল দমিলেন না। যদিও বারাণসী-কংগ্রেসের সভাপতি মিঃ গোখ্‌লে বঙ্গভঙ্গের তীব্র প্রতিবাদ, কার্জ্জনী শাসননীতির কঠোর সমালোচনা করিয়া 'বয়কট' ও 'স্বদেশী'র প্রয়োজন স্বীকার করিয়াছিলেন, তথাপি লোকমান্য তিলক যখন 'বয়কট' ও 'স্বদেশী'র প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন, তখন মডারেটদল ভীত হইয়া অতদূর অগ্রসর হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তিলক দমিলেন না, পরবর্ত্তী সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে লোকমান্য তিলক 'শিবাজী উৎসব'কালে কলিকাতায় আসেন। কলিকাতায় জাতীয়দল ও জনসাধারণ কর্ত্তৃক তিলক সাদরে অভ্যর্থিত হইলেন;—এইকালে দেশবাসীর উপর তিলকের প্রভাব ও প্রতিপত্তি পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত হইয়াছিল। তিলক মহারাজের প্রতি দেশবাসীর অসামান্য শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস লক্ষ্য করিয়া শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়, আগামী ১৯০৬এর কলিকাতা কংগ্রেসের সভাপতি পদের জন্য লোকমান্য তিলকের নাম তুলিলেন। যাহাতে তিলক কংগ্রেসের সভাপতি হইতে পারেন, সেজন্য শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র অদম্য উৎসাহে লেখনী ধারণ করিলেন,—ইহাতে মডারেটদল প্রমাদ গণিলেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ও মেটা উপায়ান্তর না দেখিয়া বিলাতে দাদাভাই নৌরজীর নিকট তার করিলেন,—তাঁহাকে জানান হইল—কংগ্রেসের অবস্থা সঙ্গীণ, আপনি সভাপতি হইয়া ইহাকে রক্ষা করুন।—এই তার করা হইয়াছিল, সুরেন্দ্র-শিষ্য শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসুর নামে। নৌরজী সরল বিশ্বাসে সভাপতি হইতে স্বীকার করিয়া তার করিলেন। দাদাভাইএর সভাপতিত্বের কে প্রতিবাদ করিবে? এমনি করিয়া মডারেট-শাঠ্য জাতীয়দলকে বঞ্চিত এবং তিলকের সভাপতিত্ব রোধ করিয়াছিল।

কলিকাতা কংগ্রেসে মডারেটগণ বয়কট প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আপত্তি তোলায় 'স্বদেশী' ও 'বয়কট' লইয়া তুমুল দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল। যোদ্ধা তিলক সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন; কিন্তু যখন দেখিলেন, বিষয়-নির্ব্বাচন সমিতিতে মডারেটগণ যাহা খুসী তাহাই করিতেছেন, তখন তিনি ৬০ জন জাতীয়দলের সদস্যসহ অধিবেশন হইতে বাহির হইয়া যান, এবং তাঁহাদের প্রস্তাব প্রকাশ্য কংগ্রেসে উপস্থিত করিবেন বলিয়া প্রকাশ করেন,—দূরদর্শী দাদাভাই এই বিরোধ মীমাংসার জন্য জাতীয়দলের প্রস্তাবটী গ্রহণ করেন।

যাহা হউক ইহার পর হইতেই জাতীয়দলকে কংগ্রেস হইতে বহিষ্কৃত করিবার জন্য মডারেটগণ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন। ১৯০৭ খৃঃ অব্দে ১১ই নবেম্বর লালা লাজপৎ রায় মুক্ত হইলে, জাতীয়দল তাঁহাকে সুরাট কংগ্রেসের সভাপতি মনোনীত করিলেন। কিন্তু মডারেটগণ সকলের ইচ্ছা অগ্রাহ্য করিয়া রাসবিহারী ঘোষকে সভাপতি মনোনীত করিলেন। কেবল তাহাই নহে, সুরাট কংগ্রেসে,—'স্বরাজ, স্বদেশী, বয়কট, ও জাতীয় শিক্ষা' এই গৃহীত প্রস্তাবও পরিত্যক্ত হইবে, এইরূপ শোনা গেল। জাতীয়দল ইহার তীব্র প্রতিবাদ করেন; কিন্তু কোন ফল হইল না। এই দলাদলিতে সুরাট কংগ্রেস দক্ষযজ্ঞে পরিণত হয়। ইহার পর হইতে সুদীর্ঘ আট বৎসরকাল জাতীয়দলকে কংগ্রেসের বাহিরে থাকিতে হইয়াছিল। কংগ্রেস প্রকৃতপক্ষে মডারেট মজলিসে পরিণত হয়।

তিলকের নির্ব্বাসন

মর্লি-উপাসক মডারেটগণ যখন গবর্ণমেণ্টের খোসামুদী ও জাতীয়দলের বিরুদ্ধাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, সেই সুযোগে গবর্ণমেণ্ট অবাধ দমন-নীতি চালাইতে লাগিলেন। ১৯০৮, ২৪শে জুন লোকমান্য তিলক রাজদ্রোহের অপরাধে ধৃত হইলেন। সরকারের প্রচণ্ড দমন-নীতির ফলে একদল যুবক ক্ষিপ্ত হইয়া বিপ্লবের আয়োজন

করিয়া বসিলেন,—মজঃফরপুরে বোমা ফাটিল, বিদ্রোহীদলের আলোচনায় সংবাদপত্রগুলি ভরিয়া
সময় বিদ্রোহের কারণ ও তাহার প্রতীকার সম্পর্কে তিলক 'কেশরী' পত্রিকায় কয়েকটী প্রবন্ধ লেখ
প্রবন্ধগুলিতে বোমা ব্যবহারের প্রশংসা করিয়া বিদ্রোহীদের উৎসাহিত করা হইয়াছিল—গবর্ণমে
নির্দ্ধারণ করিয়া ১২৪ক ও ১৫৩ক ধারায় তিলককে অভিযুক্ত করিলেন। যেখানে রাজশক্তি প্রতিকূল
ন্যায়বিচারের প্রত্যাশা বৃথা। বিচারক লোকমান্য তিলকের ছয়বৎসর কারাদণ্ড এবং সহস্র মুদ্রা অর্থ
করিলেন। তিলক ইংরাজের আদালতে দাঁড়াইয়া অকম্পিতকণ্ঠে বলিলেন,—"জুরীগণ আমাকে
বলিলেও, আমি আমাকে নিরপরাধ বলিয়া জানি। এক মহাশক্তি জগতের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রন করিয়া
ভগবানের ইচ্ছা হয়তো এই যে, আমি যে উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছিলাম, আমি
অপেক্ষা, আমি দুঃখকষ্টে পতিত হইলেই তাহাতে অধিক সাফল্যলাভ ঘটিবে।"

এই নিষ্ঠুর, কঠিন নির্ব্বাসন দণ্ডের কথা শুনিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ চমকিয়া উঠিল—বিশেষভাবে
প্রদেশ বিচলিত হইল। বোম্বাই সহরে জনসাধারণ ৭ দিন সমস্ত কাজকর্ম্ম বন্ধ করিল—পুলিশ শান্তিরক্ষা
গিয়া বন্দুকের গুলিতে ১৫ জন হত এবং ৩৮ জন আহত করিয়া ফেলিল।

দেশান্তরে

কি ভাবিয়া সরকার লোকমান্য তিলককে আন্দামানে না পাঠাইয়া মান্দালাই জেলে আ
রাখিলেন। ভারতের মুক্তি-সাধক লোকমান্য তিলক কারাগারে অনুদ্বিগ্নচিত্তে শ্রীশ্রীগীতার আলোচ
হইলেন। এইকালে রচিত 'গীতা-রহস্য' নামক পুস্তকখানি তিলকের অপূর্ব্ব সৃষ্টি। এই সময়ে তিল
সহধর্ম্মিণী শোকে ভগ্নহৃদয়ে ইহলোক ত্যাগ করেন। এই মৃত্যুসংবাদ লোকমান্য ধীরভাবে গ্রহণ কা
গবর্ণমেণ্ট দিল্লীর দরবার উপলক্ষে বহু অপরাধীকে মুক্তি দিলেও, লোকমান্য তিলকের কথা
করিলেন না।

কর্ম্মক্ষেত্রে প্রত্যাবর্ত্তন

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ৬ বৎসর দণ্ডভোগ করিয়া লোকমান্য দেশে ফিরিয়া আসিলেন। তখন
মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। মিসেস্ বেশান্ত তখন ভারতের রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়া মডারেট
দলের মিলন সাধনের চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের অপ্রীতিভাজন জাতীয়দলের সহি
হইতে মডারেটগণ শঙ্কাবোধ করিলেন। শ্রীযুক্ত গোখলে তিলকের বিরুদ্ধে এক ঘোষণাপত্র প্রচার
যাহা হউক, ১৯১৫ এবং '১৬—পর পর বোম্বাই ও লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে উভয় দলের মিলন সাধিত হয়।
দলাদলির অবসানে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে লোকমান্য 'হোমরুল' আন্দোলন আরম্ভ করেন, এবং নানাস্থানে
জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে লাগিলেন। দেশের উপর তিলকের অসামান্য প্রভাবে আমলাতন্ত্র
হইয়া নানা উপায়ে তিলককে বিব্রত করিতে লাগিল। তিলক সদ্ব্যবহার করিবেন বলিয়া জামীনস্বরূপ
সহস্র টাকা দাবী করা হইল। তিলক টাকা জমা দিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল
যাহা হউক, হাইকোর্ট তাঁহার জামীনের টাকা ফেরৎ দিলেন। তাহার পর ভারতরক্ষা আইনে তাঁ
ও পাঞ্জাবপ্রদেশে প্রবেশ নিষিদ্ধ হইল। যেদিন তিলকের নিকট জামীনস্বরূপ ৪০ সহস্র টাকা দাবী
ঐদিন লোকমান্যের ৬১তম জন্মদিন। সেদিনের অভিনন্দনসভায় পুণাবাসীরা তিলককে
উপহার প্রদান করেন।

মহত্ত্বের দৃষ্টান্ত

লোকমান্য তিলকের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মডারেট নেতা পুণ্যশ্লোক গোখলে ১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে
লোক গমন করেন। গোখলে যদিও লোকমান্যের প্রতিবাদী ছিলেন, এমন কি মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বেও
তিলকের বিরুদ্ধে এক ইস্তাহার প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু লোকমান্য তাঁহার পরালৌকিক ক্রিয়ায় শোকভারা-
ক্রান্ত হৃদয়ে যোগ দিয়াছিলেন এবং তাঁহার স্মৃতি-সভায় উচ্ছলকণ্ঠে বলিয়াছিলেন "ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন,
মহারাষ্ট্রের মুকুটমণি গোখলে স্বদেশসেবায় আত্মোৎসর্গের পুণ্য অবদান-মালা-মণ্ডিত যে জীবন যাপন
করিয়াছেন, সমগ্র ভারতের স্বদেশ-সেবকগণের তাহাই আদর্শ হউক।"

বিলাত গমন

সার ভ্যালেণ্টাইন চিরোল, তাঁহার 'ভারতে অশান্তি' নামক পুস্তকে লোকমান্য তিলককে নানা জঘন্য
অপবাদ প্রদান করায়, ঐ সমস্ত মিথ্যা অপবাদ অপনোদনের জন্য জাতীয়দলের নেতাগণ প্রয়োজন অনুভব
করিলেন। তদনুসারে লোকমান্য বিলাতে গিয়া উক্ত সাহেবের নামে মোকদ্দমা করেন। কিন্তু চিরোলের
পক্ষাবলম্বী জুরীদের জন্য এই মোকদ্দমায় তিনি কৃতকার্য্য হন নাই। এই কার্য্যে ভারতবাসীরা তাঁহাকে
তিন লক্ষ টাকা দিয়া সাহায্য করিয়াছিল।

শেষ-জীবন

গুরুতর পরিশ্রমে ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া তিলক দেশে ফিরিয়া আসিলেন। মণ্টেগু-সংস্কার তখন ঘোষিত
হইয়াছে। এই শাসন-সংস্কার সম্পর্কে লোকমান্যের মত কি, জানিবার জন্য ভারতবর্ষ ব্যগ্র হইয়া উঠিল।
শাসন-সংস্কার ও ইংলণ্ডের পঞ্চমজর্জ্জের নানা মিষ্ট কথায় পূর্ণ ঘোষণাপত্র প্রচারের পর তিলক দেখিলেন, ভারতীয়
আমলাতন্ত্র যে ভাবে চলিয়া আসিয়াছে, তাহাতে শাসক-সম্প্রদায়ের মনোভাব সহসা পরিবর্ত্তন হইবে না। অতএব
শাসন-সংস্কার সম্পর্কে ধীরভাবে বিচার করিয়া মত প্রকাশ করা উচিত।

মহাত্মা গান্ধি, পণ্ডিত মালব্যজী ও নেহেরুজী, রাজকীয় ঘোষণাপত্রে পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া উহা সমর্থন
করিতে প্রস্তুত হইলেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে অমৃতসর-কংগ্রেসে এই বিষয় লইয়া আলোচনা হইল। তিলক-
গান্ধি-মালব্য-নেহেরু-দাশ-একত্র হইয়া রিফর্ম্ম গ্রহণ করিতে স্বীকার করিলেন।

১৯২০ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভ হইতেই তিলক ভারতবর্ষের নেতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ইহার
পরেই খেলাফৎ ও পাঞ্জাবসমস্যা—রাউলাট-আইন—ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্রে এক বিচিত্র পরিবর্ত্তন আনিল।
শান্তিপ্রিয় নিরীহ-বৈষ্ণব মহাত্মা গান্ধি ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্রে সত্যাগ্রহ লইয়া অবতীর্ণ হইলেন। লোকমান্য
তিলক মহাত্মাজীকে সমর্থন করিয়া, কাউন্সিল সম্পর্কে ভিন্ন মতাবলম্বী হইলেন।

বর্ত্তমান সমস্যা সমাধানের জন্য কলিকাতায় বিশেষ কংগ্রেস আহূত হইল। এদিকে ভারতের ভাগ্যে
এক দুর্য্যোগ ঘনাইয়া আসিতেছিল। তিলক পীড়িত হইয়া পড়িলেন। ২৩শে জুলাই জ্বর দেখা দিল; ২৬শে
জুলাই হইতে রোগ ভীষণাকার ধারণ করিল। ৩১শে জুলাই রাত্রি দ্বিপ্রহরে সব ফুরাইল—লোকমান্য তিলক
মহারাজ পার্থিব কর্ম্মক্ষেত্র হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন।

পরদিন প্রভাতে এই দুঃসংবাদ চারিদিকে প্রচারিত হইল। প্রভাতে সমগ্র বোম্বাই সহর আর্ত্তনাদ

BLOCKED INFORMATION

করিয়া জাগ্রত হইল—ভারতের ইতিহাসে এতবড় শোকোচ্ছ্বাস দেখা যায় নাই। দলে দলে নরনারী অশ্রুসিক্তনেত্রে শেষবার পুণ্যদেহ দর্শনের জন্য সমবেত হইতে লাগিল। লক্ষ লোকের দেড় মাইল ব্যাপী শোক লোকমান্যের পবিত্র শবদেহ—মহাত্মা গান্ধি, সৌকতালী, কিচলু, যমুনাদাস, ব্যাঙ্কার ও তিলকের শিষ্যগণ বাহিত হইয়া শ্মশানে নীত হইল। ইতিপূর্ব্বে কোন দেশে কোন দেশ-নায়কের শবানুগমন করিবার এত লোক একত্র হয় নাই। সমুদ্রতীরে—সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে চিতাগ্নি নির্ব্বাপিত হইল—মহাত্মা ভারত অন্ধকার করিয়া অস্তমিত হইলেন—প্রাচীশীর্ষে গুর্জ্জরসিংহ নবারুণ রাগে ভারতবর্ষ আলোকিত উদিত হইলেন;—সেই প্রভাতের আলোকে, ভারতবর্ষ লোকমান্য তিলকের পূর্ব্ব-স্মৃতি মহিমাকে অমর জন্য তিলক-স্বরাজ্য-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করিল!

লোকমান্য

(মহাত্মা গান্ধি)

লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক আর ইহজগতে নাই। তিনি দেশবাসীর নিকট এত অপরিহার্য্য দাঁড়াইয়াছিলেন যে, একথা সহজে বিশ্বাস হইতে চায় না। বর্ত্তমানকালে তাঁহার মত আর কাহারও জনসাধারণের উপর এত প্রভাব ছিল না। দেশের সহস্র সহস্র লোকের তাঁহার প্রতি যে ভক্তি ছিল, তাহা অসাধারণ। দেশবাসীর চক্ষে দেবতার মত ছিলেন। সহস্র লোকের নিকট তাঁহার মুখের কথাই ছিল আইন। আজ অতিমানবের পতন হইয়াছে,—কেশরীর গর্জ্জন স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে।

দেশের লোকের উপর তাঁহার এই প্রভাবের কারণ কি? এ প্রশ্নের উত্তর খুব সোজা। দেশ তাঁহার জীবনের একটা তীব্র ব্যসনের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। দেশের প্রতি প্রেম ছাড়া তাঁহার আর ধর্ম্ম ছিল না। তিনি গণতন্ত্রী হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি অধিকাংশের মতানুসারে কাজ এমন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিতেন যে, তাহা দেখিয়া আমার ভয় হইত। কিন্তু তাঁহার প্রভাবের মূল ছিল তাঁহার ইচ্ছাশক্তি ছিল ইস্পাতের মত দৃঢ়, আর সেই ইচ্ছাশক্তিকে তিনি দেশের কাজে নিয়োজিত করিয়াছি তাঁহার রুচি ছিল অত্যন্ত সাদাসিদে। তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনে একটীও কলঙ্কের দাগ পড়ে নাই। তাঁহার অদ্ভুত মনীষাকে দেশের কাজে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় একাগ্রভাবে এবং সহিত স্বরাজের মন্ত্র আর কেহ প্রচার করেন নাই। সেইজন্য তাঁহার প্রতি দেশবাসীর অসীম বিশ্বাস তিনি কখনও ভয় পান নাই; তাঁহার আশা ও উৎসাহ ছিল অদম্য। তিনি তাঁহার জীবিতকালের মধ্যে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার আশা পূর্ণ হয় নাই, কিন্তু ইহাতে তাঁহার কোনও দো তিনি ইহাকে বহু বৎসরের পথ আগাইয়া আনিয়াছেন। তাঁহার এই স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করিবা আমাদের যাঁহারা পিছনে পড়িয়া আছেন, তাঁহাদের দ্বিগুণ উৎসাহে কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত।

লোকমান্য, আমলাতন্ত্রের দারুণ শত্রু ছিলেন; কিন্তু তাই বলিয়া তিনি ইংরেজ অথবা ইংরেজ ঘৃণা করিতেন, একথা বলা যায় না। আমি ইংরাজদিগের হিতের জন্য বলিতেছি যে, তাঁহারা যেন তাঁহাদের শত্রু মনে করিয়া ভ্রমে পতিত না হন।

গত কলিকাতা কংগ্রেসের সময় হিন্দীকে জাতীয় ভাষায় পরিণত করা বিষয়ে আমি তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা শুনিয়াছিলাম। তিনি তখন, কেবল কংগ্রেস মণ্ডপ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

সম্বন্ধে তাঁহার আলোচনা শুনিয়া আমাদের যথার্থই আনন্দ হইল। তিনি বক্তৃতায় ইংরাজেরা প্রাদেশিক সমস্যাগুলির যত্ন লন বলিয়া তাঁহাদিগকে খুব প্রশংসা করেন। তাঁহার ইংলণ্ডভ্রমণ তাঁহাকে ব্রিটিশ গণতন্ত্রে আস্থাবান করিয়া তুলিয়াছিল, এমন কি তিনি এই অদ্ভুত প্রস্তাবও করিয়াছিলেন যে, সিনেমার সাহায্যে ইংলণ্ডে ভারতবর্ষের ব্যবসাবাণিজ্যের প্রচার করা হউক। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আমিও ইহাতে আস্থাবান বলিয়া আমি এই ঘটনার উল্লেখ করিতেছি না, কারণ ইহাতে আমার বিন্দুমাত্র বিশ্বাসও নাই; তিনি ইংরেজকে ঘৃণা করিতেন না, শুধু তাহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য আমি ইহার উল্লেখ করিতেছি। তিনি সাম্রাজ্যের মধ্যে ভারতের স্থান অন্যান্য অংশের চেয়ে হীন হয়, ইহা একমুহূর্ত্তও সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি মনে করিতেন, সাম্য তাঁহার দেশের জন্মগত অধিকার। আরও স্বাধীনতার সংগ্রামে তিনি গবর্ণমেণ্টকেও ছাড়িয়া দিতেন না, এই সংগ্রামে তিনি কাহাকেও রেহাই দেন নাই। কাহারও নিকট চানও নাই। আমি আশা করি, ইংরাজেরাও ভারতের এই শ্রদ্ধেয় নেতার গুণগুলি হৃদয়ঙ্গম করিবেন।

তিনি ভবিষ্যৎবংশীয়দিগের নিকট বর্ত্তমান ভারতের একজন প্রধান প্রবর্ত্তকরূপে পরিগণিত হইবেন। তিনি সারাজীবন ব্যাপিয়া তাহাদের কাজই করিয়া গিয়াছেন, এই কথা মনে করিয়া তাহারা তাঁহার স্মৃতিকে পূজা করিবে। তিনি মরিয়া গিয়াছেন, এ কথা বলিলে তাঁহার অবমাননা হইবে। তাঁহার সত্তা চিরকাল আমাদের সঙ্গে রহিবে। আমরা যেন তাঁহার সাহস, তাঁহার সরলতা, তাঁহার শ্রমশীলতা এবং তাঁহার দেশ-প্রীতি আমাদের জীবনের মধ্যে গ্রহণ করিয়া ভারতের এই অদ্বিতীয় লোকমান্যের অক্ষয়স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করি। ঈশ্বর তাঁহার আত্মার শান্তিবিধান করুন।

('ইয়ং ইণ্ডিয়া' হইতে 'আনন্দবাজার' কর্ত্তৃক অনূদিত।)

লোকমান্য তিলক

(সি, এফ, এণ্ড্রুজ)

তিলক ও প্রবাসী ভারতবাসী

প্রথমবার ফিজি ভ্রমণের পর ফিরিয়া আসিয়া আমি একদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা শ্রীযুক্ত লোকমান্য তিলকের সহিত বসিয়া তাঁহার নিকট সেই সুদূর দেশে আমাদের ভ্রাতা ও ভগ্নীদের প্রতি কি ভীষণ অবিচার হইতেছে তাহা বিবৃত করিতেছিলাম, তিলক সম্বন্ধে স্মৃতির মধ্যে সেদিনকার কথা আমার খুব পরিষ্কাররূপে মনে পড়িতেছে। যে সকল হতভাগিনী নারীকে উপনিবেশের কৃষিক্ষেত্রসমূহে ভুলাইয়া পাঠান হইয়াছে তাহাদের লজ্জার কথা তাঁহাকে বলিলাম, তখন তাঁহার চোখগুলি যেন আগুনের মত জ্বলিতে লাগিল, রোষের জ্বালায় তিনি তাঁহার হাত গুটাইয়া লওয়ায় তাঁহার হাতের পেশীগুলি কঠিন হইয়া উঠিল। তাঁহার দেশাত্মবোধ, দেশের সাধারণ লোকের প্রতি তাঁহার প্রীতির গভীরতা আমি তখন যেমন বুঝিতে পারিয়াছিলাম এমন আর পূর্ব্বে কখনও পারি নাই। তাঁহার হৃদয়ের গভীর অন্তস্তলে যে প্রীতি এবং দয়ামায়া লুকাইয়াছিল তাহা সেই কথাবার্ত্তার সময় বাহির হইয়া আসিল। ফিজিতে কোনও মারাঠী নাই ইহাতে তাঁহার ভাবের কোনও পরিবর্ত্তন হইল না। মারাঠি নাই থাকুক,—তাহাতে কি? তাহারা উত্তরের যুক্তপ্রদেশেরই হউক আর দক্ষিণের তামিল দেশেরই হউক, তাহারা সকলেই ভারতের সন্তান, সকলেই তাঁহার ভাই এবং ভগিনী, মহীয়সী দেশমাতৃকার পুত্র ও কন্যা।

লোকমান্যের বেশভূষা

সেই দৃশ্যের কথা আমি অনেক সময় ভাবিয়াছি। লোকমান্য তাঁহার আফিস গৃহে বসিয়া... তাহার পরিধানে সাধারণ ধুতি, চারিদিকেই কঠোর ত্যাগের চিহ্ন। তাঁহার মুখে চিন্তার রেখা পড়িয়া... কুঞ্চিত হইয়াছে, উহারা যেন তাঁহার দুঃখদুর্দ্দশার কাহিনী বলিতেছিল। তাহার পর আমি যখন ... অভিজ্ঞতার কথা বলিলাম, তখন তাঁহার মুখখানি জ্বলিয়া উঠিল, চোখদুটি হইতে যেন আগুন বাহির ... হইতে লাগিল। এ আগুন দরিদ্র ও নিপীড়িতদিগের প্রতি তাঁহার প্রীতির শিখা।

বর্ত্তমানের শিক্ষা

আজ তিলকের মৃত্যু-বার্ষিকীর জন্য প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়া আমার শুধু একটা বিষয় মনে আসিতে... এই সময় কেনিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ফিজিতে আমার ভারতীয় ভাইভগ্নীদের অপমানের চূড়ান্ত হইয়া... কেনিয়া সিদ্ধান্ত আমাদের বিরুদ্ধে গিয়াছে, মানুষের নিকট যাহা সবচেয়ে মূল্যবান জিনিষ, সেই সমান নরনারীর... —অধীন ভৃত্যের মত নহে,—পরিগণিত হইবার অধিকার আজ আমরা হারাইয়াছি। আমাদিগকে কেনি... কতগুলি অপবিত্র জিনিষের মত পৃথক রাখা হইবে ;—সহরের আইনানুসারে না হইতে পারে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট... আদেশে আমরা ইউরোপীয়দিগের সহিত এক নির্ব্বাচন তালিকায় ভুক্ত হইবার অথবা মালভূমির নিকট... জমি ভোগ করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইব।

আজ এই লাঞ্ছনার দিনে লোকমান্য তিলক নিশ্চয়ই স্বর্গ হইতে আমাদিগকে এক হইতে বলিতেছে... নিশ্চয়ই তিনি আমাদের বিদেশস্থ ভাই ভগিনীদের জন্য সমস্ত ভেদ, সকল দলাদলি পরিহার করিতে বলিতেছে... যদি ইহার ফলে আমরা এক কার্য্য উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া, আমাদের একমাত্র লক্ষ্যস্থল স্বরাজের জন্য ক... করিতে পারি তবে এই আঘাত পরিণামে আমাদের নিকট আশীর্ব্বাদ হইয়া দাঁড়াইবে।

—"সার্ভেণ্ট" হইতে "আনন্দবাজার" কর্ত্তৃক অনূদি...

পুস্তক পরিচয়

রূপক ও রহস্য—পরলোকগত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের খেয়ালি ধরণে রচিত কতক... সরস রচনা। লেখক মহাশয়ের পুত্র শ্রীঅজরচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক প্রয়োজনীয় টীকা টিপ্পনি সহিত প্রকা... মূল্য দুই টাকা।

বঙ্গ সাহিত্যে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের নাম অতি প্রসিদ্ধ। তিনি যেমন অতি সরস ও সুবোধ্য ভাষা... বিষয়ের আলোচনা করিতে পারিতেন এবং অল্প কথায় অনেক জটিল রাষ্ট্রনীতির তত্ত্বও খুলিয়া বলিতে পারি... তেমনটি আর বড় বেশী দেখিতে পাওয়া যায় না। লেখকের স্বভাবসিদ্ধ প্রফুল্লতার ফলে তাঁহার রচ... সরস হইত এবং হাসির আলোক উজ্জ্বল হইত। সহজবোধ্য রূপকের আবরণ দিয়া এবং একটু হাসাইয়া... শিক্ষণীয় বিষয়ে যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, সেই সরস নিবন্ধগুলি রূপক ও রহস্য নামে প্রকাশিত হইয়াছে...

বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হইবার পর উহার প্রায় গোড়ার দিকেই 'গ্রাবু' ও 'তুলনায় সমা...

প্রকাশিত হইয়াছিল ; রচনা রীতির নূতনত্বে ভাষার সরসতায় ও ভাবের মাধুর্য্যে, ঐ দুইটি প্রবন্ধ এত বিখ্যাত হইয়াছিল যে, সে সময়ের সকল শিক্ষিতেরাই সানন্দে উহার আলোচনা করিতেন। প্রবন্ধ দুইটি এসংগ্রহে ...। অক্ষয় চন্দ্রের নিজের সম্পাদিত 'সাধারণী' পত্রিকা একদিন বঙ্গে শ্রেষ্ঠ স্থান পাইয়াছিল ; সে পত্রিকায় পরিহাসচ্ছলে যে সকল শিক্ষণীয় রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাও এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। সে রচনাগুলিতে এমন অনেক সাময়িক বিষয় উদ্দিষ্ট হইয়াছিল, যাহা এখন অনেকেই ভুলিয়া গিয়াছেন। টীকায় সেই সকল কথা দেওয়া হইয়াছে বলিয়া, একালের পাঠকেরা সে রচনা গুলির রসাস্বাদ করিতে পারিবেন।

বিখ্যাত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়কে certificate দিতে যাওয়া ধৃষ্টতা ; দুই শত পৃষ্ঠার অধিক পরিসরে যত রচনা প্রকাশিত হইয়াছে, একে একে তাহাদের নাম করা সম্ভব নয়। যিনি কৃতী ও সাহিত্যে আদৃত, তাঁহার রচনাবলী যে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা জানাইয়া দেওয়াই যথেষ্ট। যে গ্রন্থ পড়িয়া তৃপ্তি লাভ হয় ও সুশিক্ষা হয়, তাহা সকলেই পড়িবেন আশা করি।

* * *

পাকা রং প্রণালী—ডাঃ টি, এন্ চক্রবর্ত্তী এম্. পি, এস প্রণীত—মূল্য ৵৹ আনা, এবং **গাভী-পরিচর্য্যা**—শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক সংগৃহীত মূল্য ॥৹ আনা—দুই খানিই ভাল বই। প্রথম খানিতে পাকা রং করিবার পাকা সঙ্কেত আছে, এবং দ্বিতীয় খানিতে গো-পালন ও গো-চিকিৎসার অনেক শিখিবার কথা আছে।

* * *

সাহিত্যিকা—শ্রীনলিনী কান্ত গুপ্ত প্রণীত মূল্য ১॥৹ টাকা ; ১৫২ পৃষ্ঠা। এই নানা প্রবন্ধের গ্রন্থখানি খুব সুরচিত ; কাব্য সৌন্দর্য্য বুঝাইবার প্রবন্ধগুলি যুবকদের শিক্ষণীয়।—সাহিত্যে কোন একটি প্রাদেশিক ভাষা চালাইলে যে সাহিত্যের ব্যাপ্তি হয়না, এবং সকল প্রাদেশিকতা ভাঙ্গিয়া একটা জাতীয় সাহিত্যিক ভাষা গড়িয়া ওঠেনা, এ বিষয়টি অতি যোগ্যতার সহিত লিখিত হইয়াছে।

* * *

সালোমে—প্রসিদ্ধ Oscar Wild এর নাটকের তরজমা। শ্রীশৈলেশ নাথ বিশি প্রণীত, ছাপা ভাল ও বাঁধা মলাট। ইউরোপীয় সাহিত্যের ধারা ও প্রকৃতি বুঝাইবার জন্য বিদেশের ভাল সাহিত্যের তরজমা হওয়া উচিত। এ গ্রন্থ পড়িলে অনেকে তৃপ্তি পাইবেন। বিদেশী নাটক নভেলের ছায়া ধরিয়া বাঙ্গলায় অনেক গল্প রচিত হয় ; সে গুলি না হয় ইংরেজী না হয় বাঙ্গলা। বিদেশটা ঠিক কি তাহা জানিবার কৌতূহল, কেবল বিদেশী গ্রন্থের খাঁটি অনুবাদেই চরিতার্থ হইতে পারে।

BLOCKED INFORMATION.

ছিটে-ফোঁটা

মহাভারতের তত্ত্ব—স্বশরীরে একা যুধিষ্ঠিরই স্বর্গে গিয়াছিলেন, কিন্তু তঁ
নরকের ছায়া মাড়াইতে হইয়াছিল। বিনা বাধায় সটাং স্বর্গে গিয়াছিল কেবল প
কুকুরটি। এমন যে কেন হইল, তাহার ঊনপঞ্চাশী ব্যাখ্যায় পাই যে, কুকুরেরা পুণ্যব
কারণ তাহারা অতি অল্প খাইয়াই প্রভুর পা চাটে, আর আপনাদের স্বজাতি দেখিলেই যে
করিয়া তাড়ায়।

ধর্ম্মনিষ্ঠা—লোকে যাহা বলে তাহা ঠিক যে, পুরুষদের চেয়ে স্ত্রীলোকদের স্ব
ধর্ম্মনিষ্ঠা বেশি। তাই দেখিতে পাই যে, স্ত্রীলোকেরা কপালে ফোঁটা কাটে, ও গলায়
পরে; মালা না যুটিলেও তাহারা উহা পরিবার সাধ রাখে। তাহা ছাড়া পৃথিবীর স
স্ত্রীলোকের মাথার চুলের গোছা, একটা প্রকাণ্ড প্রাকৃতিক "টিকি"। দ্রবিড় দেশ ছাড়া
দুনিয়ার স্ত্রীলোকেরা যে কাছাঁ দেন না, তাহাতে তাঁহাদের গৌরাঙ্গভক্তি সূচিত হয়।

বাইবেলের প্রশ্ন—এক গণ্ডে চপেটাঘাত করিলে অপর গণ্ড প্রদর্শন না
যদি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা যায়, তবে বাইবেল মানা হয়, কিনা।

বৃন্দাবনের কবিতা

সাহিত্যিকদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, প্রাচীনকালে বৃন্দাবনের গোপীরা
হারাইয়াছিলেন বাঁশীর রবে, আর একালে তাঁহারা ধৈর্য্য হারাইতেছেন, একালের কবিদের
কবিতার জ্বালায়। তাঁহারা বলেন যে বাঁশীর বদলে নাকি, নাকিসুরের কবিতায় অনেকে
মন উচাটন করিয়া থাকেন। আমি বলি, যে এখনও যদি কতকগুলি "আন্দ" জুড়িয়া বহ
বৎসর বয়সের বুড়ী গোপীদের কথা লেখা যায়, তবে কবিতা জমিতে পারে; দৃষ্টান্ত—

বৃন্দাবনে চন্দ্রাননা,—তুণ্ডে তার দন্ত নাই;
লণ্ড যে হে মুণ্ড, তাহে কুন্তলীন গন্ধ নাই।
পিন্ধনে বা স্কন্ধতলে ছিন্ন ছাড়া কন্থা নাই;
বঞ্জুলের কণ্টকেতে কুঞ্জ-বাটে পন্থা নাই।
ধন্দ হ'ল বঙ্গ দেশ, বৃন্দাবন অন্ধকার;
"আন্দ" খুঁজে অন্ধ কবি রঞ্জে ছবি যন্ত্রণার।

দুনিয়ার খবর

নাভার আন্দোলন—নাভাপতি যে কেন রাজগীতে ইস্তাফা দিলেন, তাহা সরকারী রিপোর্টে যেমন জানা গিয়াছিল তাহাই পূর্ব্বে লিখিয়াছি। রাজার বিবাদ ঘটিয়াছিল তাঁহার জ্ঞাতি রাজা, পাতিয়ালার অধিপতির সঙ্গে। পাতিয়ালাপতি বলিয়াছেন, যে তিনি নাভাপতির রাজ্য-চ্যুতি চাহেন নাই; নাভাপতি নাকি এমন গুরুতর অন্যায় করিয়াছিলেন যে, গবর্ণমেণ্ট অনুসন্ধান করিলেই তিনি বিষম অপরাধের জালে, জড়াইয়া পড়িতেন। তাই নাকি তিনি আপনাকে বাঁচাইবার জন্য রাজগী ছাড়িয়াছেন। অন্যদিকে পাঞ্জাবের দেশমান্য গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটী নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে সরকারী চাপে নাভাপতিকে লঘু অপরাধে, গুরু দণ্ড বহিতে হইয়াছে। উক্ত কমিটীর নেতৃত্বে, পাঞ্জাবের শিখেরা আন্দোলন তুলিয়া বলিতেছেন যে, যত দিন নাভাপতিকে তাঁহারা স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারেন, ততদিন আন্দোলন চালাইবেন। নাভার প্রজারা নাকি রাজাকে চান না।

* * *

বিড়ালের মহামারী—প্লেগ সূচিত হয় ধেড়ে ইঁদুরের (rat এর) মরণে। বিড়ালে বড় একটা ধেড়ে ইন্দুরের কাছে যায় না,—তাহারা মারে লেংটি ইন্দুর (mouse)। পুরীতে দেখা গিয়াছে যে এক এক বৎসর বিড়ালের মহামারী হয়, আর সেটা ইন্দুরের রোগে নয়। লোকে বলে, যে বৎসর বিড়ালের মহামারী হয় সে বৎসর পুরীতে ওলাউঠা বাড়ে। এবৎসর পুরীতে এত বিড়াল মরিয়াছে, যে মিউনিসিপালিটিকে গাড়ী বোঝাই করিয়া সে মড়া ফেলিতে হইয়াছে। বিড়ালের এই রোগ কি ওলাউঠা? এই মহামারীর কারণ ধরিতে পারিলে হয়ত মানুষের ওলাউঠার বা অন্য রোগের প্রতীকার হইতে পারে।

* * *

রুশ সম্রাটের কন্যা—সম্রাট্‌কে হত্যা করিয়া লেনিনের দল রুশিয়ায় নূতন রাজত্ব চালাইতেছে, আর সম্রাটের বংশের লোকেরা ভাগ্যের পরিবর্ত্তনে আপনাদের উপজীবিকার জন্য পথে দাঁড়াইয়াছে। সম্রাটের কনিষ্ঠা কন্যার একটা বিবাহ যোটে নাই; তিনি একটি থিয়েটারের অভিনেত্রী হইয়াছেন। বিলাতি থিয়েটারে ঘৃণ্য শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা অভিনেত্রী হয় না বটে, তবে তাঁহারা নারীর উচ্চ আসনে থাকেন বলিয়া সকলের ধারণা নয়। আমরা সকলেই পিছল পথের যাত্রী; রাজ দুহিতার এই ভাগ্য পরিবর্ত্তনে তাঁহার কল্যাণ কামনা করিতেছি।

* * *

BLOCKED INFORMATION.

পতাকা উৎসবে হত্যা—মহাত্মাগান্ধীকে স্মরণ করিবার জন্য যেদিন অনেক স্থানে প
উৎসব হইয়াছিল, সেদিন মাদ্রাজের অতি দক্ষিণের ত্রিবেন্দ্রামে বিদ্যালয়ের কতকগুলি ছাত্রদের মধ্যে গা
গুণ ও আদর্শ লইয়া তর্ক হইয়াছিল; বালকদের তর্কে ছোট কথাতেও অজা যুদ্ধের মত খানিকটা বা
হয় বটে, কিন্তু কোন উৎপাত ঘটে না; কিন্তু ত্রিবেন্দ্রামে একজন ছাত্র ঐ তর্কের ফলে দুইজন ছাত্রের উপ
ভাবে ছুরি চালাইয়াছিল যে, একজন মরিয়া গিয়াছে ও আর একজনের হইয়াছিল প্রাণ সংশয়।

* * *

কৃত্রিম কাঠ—নরওয়ে দেশে একজন বৈজ্ঞানিক কাঠের করাতের গুঁড়ার সঙ্গে অন্য কিছু
পদার্থ মিশাইয়া এমন চমৎকার কাঠ গড়িবার উপায় করিয়াছেন যে, সে কাঠ দিয়া আসল কাঠের মত
রকমের কাজ করা যায়; আবার মজা এই যে আসল কাঠে শীঘ্রই আগুন ধরে, কিন্তু একাঠে
ধরা খুব শক্ত।

* * *

মুসলমান সমাজে স্ত্রী শিক্ষা—শ্রীযুক্ত মোয়াএদ উল ইস্‌লাম, মুসলমান সমাজে এক
সম্মানিত পদস্থ ব্যক্তি। ইঁহার জ্যেষ্ঠা দুহিতা কুমারী শকিনা বি, এ, পরীক্ষায় ইংরেজীতে ১ম শ্রেণীর "অনা
লইয়া গত বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, আর এখন এম, এ, পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। ঐ
শকিনার কনিষ্ঠা ভগিনী কুমারী সৈয়েদা এবারে বি, এ, পরীক্ষায় ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীর "অনার" প
উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

* * *

বাৎসরিক বিজ্ঞান সভা—প্রতি বৎসরই ভারত বর্ষের এক একটি বড় সহরে বৈজ্ঞা
পণ্ডিতদের সম্মিলন ও সভা হয়, এবং সেই সভায় নানা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের প্রবন্ধ পড়া হয়। আগামী জা
মাসে এই সভার অধিবেশন হইবে মাদ্রাজ অঞ্চলের বাঙ্গালোর সহরে, আর এ বৎসর উহার পৃষ্ঠপোষক
মহীশূরের অধিপতি। এবারকার এই সভার সাধারণ সভাপতি হইবেন সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ম
এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা সভাপতি হইবেন যথা :—(১) কৃষি বিষয়ে—বি
(২) ফিজিক্‌স ও গণিতে—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক—সি, বি, রমণ, (৩) কেমিষ্ট্রি
ডাঃ ই, আর, ওয়াটসন্, (৪) প্রাণী-তত্ত্বে,—কে এন্ বল, (৫) উদ্ভিদ বিদ্যায়—কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের অ
শ্রীযুক্ত আঘারকর, (৬) ভূতত্ত্বে—এইচ্ বস্‌ওয়ার্থ স্মিথ, (৭) চিকিৎসা তত্ত্বে—লেফটেনণ্টে কর্ণেল ক্রিষ্টোফার্স
(৮) নৃতত্ত্বে,—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রায়বাহাদুর—অনন্ত কৃষ্ণ আয়ার।

বিক্রমপুরে প্রস্তর স্তম্ভ—সোনারং নামে এক গ্রামে ১৮ ফাট উঁচু একটি স্তম্ভ
হইয়াছে; এটি একখানি পাথরে গড়া, আর সে পাথর গ্রেনাইট। বাঙ্গালায় এরকম পাথরের
নূতন দেখা গেল।

আইন আদালত

(১) **নূতন আইন**—স্ত্রীদখলের মোকদ্দমায় স্বামী ডিক্রী পাইলে ডিক্রীজারির সময় স্ত্রীকে জেলে দেওয়া চলিত। এখন আইন সংশোধিত হইয়া নূতন আইন পাশ হইল; এ ব্যবস্থায় স্ত্রীলোককে জেলে দেওয়া চলিবে না। স্বামীরা যে স্ত্রীদিগকে জেলে দিতেন, সেটা ধরা বাঁধায় প্রেম জমাইবার জন্য নয়,—সেটা ছিল মনের ঝাল মিটাইবার জন্য।

যাঁহারা ভারী স্বদেশী, তাঁহারা ১৮৯০ খৃঃঅব্দে অল্প বয়সের স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার থামাইবার আইন পাশের সময় দেশ মাথায় করিয়া বলিয়াছিলেন যে, আইনের বিধানে, হিন্দুর সামাজিক নিয়ম ভঙ্গ করা উচিত নয়; এখনও কথায় কথায় সে বুলি শুনিতে পাই, অথচ সেই বুলির দলের লোকেরাই হিন্দুর উত্তরাধিকার বিষয়ে কয়েকটি প্রাচীন নিয়ম বদলাইবার জন্য ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় আইনের খস্‌ড়া উপস্থিত করিয়াছেন। প্রাচীন স্মৃতিকারদের এই মত ছিল, যে কেহই নিজের দায়িত্ব উড়াইয়া ধর্ম্মের ষাঁড় বা খোদার খাসির মত ব্যবহার করিতে পারিতেন না; পৈশাচ বা রাক্ষস পদ্ধতিতে নীচ জাতির স্ত্রীলোকদের সর্ব্বনাশ করিলেও ঐ কুব্যবহারকে বিবাহ বলিয়া মানিয়া লইতে হইত এবং বিবাহের দায়িত্বে সন্তানদিগকে অবস্থা বিশেষে সম্পত্তির কিছু কিছু ভাগ দিতে হইত। এ বিধান একালে ভাল না লাগিতে পারে, কিন্তু ব্যবস্থাপক সভায় জনকতক লোকের খেয়ালে ও ভোটে, হিন্দুর প্রাচীন আইন বদলাইবার একটা অধিকার সৃষ্টি করা বড় বিপদের কথা। গবর্ণমেণ্ট অন্য সময় অন্য আইন বদলাইতে চাহিলে, ধর্ম্ম গেল বলিয়া নাকি সুর ধরা চলিবে না।

বোম্বাই প্রদেশের হিন্দু সমাজে এ পর্য্যন্ত যাহারা উত্তরাধিকারী হয় নাই, তাহাদিগকে উত্তরাঞ্চলে প্রচলিত মিতাক্ষরার নিয়মে উত্তরাধিকারী করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। ময়ূখের নিয়ম আদর্শ না হইতে পারে, কিন্তু মিতাক্ষরা টীকার বিধানই কি আদর্শ? পৃথিবীর কোন দেশেই কি উত্তরাধিকারের আদর্শ নিয়ম আছে? সমাজতত্ত্বের দিক দিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে উত্তরাধিকারের নিয়মগুলি আদর্শ রকমের না হইলে কোন ক্ষতি নাই; সম্পর্কের দাবীতে বিনা পরিশ্রমে, উপার্জ্জনের পথ বন্ধ হইলে সমাজতত্ত্বের বিচারে বুদ্ধি বই ক্ষতি নাই। আদর্শ স্থাপন করিয়া যখন আইন হইতেছে না, তখন যে প্রথা সমাজে অন্যায় বলিয়া বিচারিত হয় না, ও সহিয়া গিয়াছে, তাহা বদলাইবার চেষ্টায় গবর্ণমেণ্টের হাতে নূতন অধিকার দিবার খাল্ কাটা কেন? বিষয়টি বোম্বাইয়ের কথা লইয়া, কিন্তু মৌলিক নীতির হিসাবে, এদেশে ইহার আলোচনার প্রয়োজন আছে।

(২) **ব্যবস্থাপক সভায় গবর্ণর জেনারল**—জুলাই মাসের অধিবেশনে এ বৎসরের মত ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার কাজ শেষ হইয়াছে। নূতন শাসন সংস্কারে ব্যবস্থাপক

সভার কাজের সমালোচনা করিয়া গবর্ণর জেনরল বাহাদুর শেষ অধিবেশনের দিন যাহা বলি... তাহার মধ্যে দুইটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। প্রথম কথা এই যে আইনের বিধানে গবর্ণর জেন... এই ক্ষমতা আছে, যে তিনি অন্যায় মনে করিলে ব্যবস্থাপক সভার নির্দ্ধারণ উল্টাইতে পারেন। ... ক্ষমতা যখন আছে, তখন যেস্থলে ব্যবস্থাপক সভার কাজ অন্যায় বলিয়া মনে হইবে, সে স্থলে ... জেনরলের পক্ষে তাঁহার নিজের হিতবুদ্ধিতে কিছু না করা অন্যায়; গবর্ণর জেনরল বলেন ... ব্যবস্থাপক সভার সভ্যেরা যেমন নিজেদের বিবেকবুদ্ধিতে কাজ করিবেন, তিনিও সেইরূপভাবে ... করিতে বাধ্য এবং অধিকারী। এ উক্তির উত্তরে আইনঅনুসারে কিছু বলা চলে না। ... ক্ষমতা যেভাবে সীমাবদ্ধ আছে, তাহাতে দেশের লোকের হাতে শাসনের কোন প্রকার অধিকার ... আসে নাই।

গবর্ণর জেনারলের দ্বিতীয় উক্তি কেনিয়ায় ভারতবাসীর অধিকার সম্বন্ধে। কেনিয়ার স্বাস্থ্যকর উচ্চভূমিতে ভারতবাসীর উপনিবেশ হইতে পারিবেনা এবং ব্যবস্থাপক সভায় মাদ্রাজ দুইজন লোক নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন,—এই বিধান যে ন্যায়সঙ্গত নয়, গবর্ণর জেনারল তাহা বলিয়াছেন। ইংরেজদের উপনিবেশের লোকেরা যাহাতে বিনা বাধায় ভারতে না আসিতে পারে তাহার জন্য শ্রীযুক্ত হরিসিং গৌর যে আইন পাশ করাইয়াছেন, তাহাতে গবর্ণর জেনারলের অনুমোদন আছে জানাইয়াছেন। আইন কিন্তু যেভাবে পাশ হইয়াছে, তাহাতে উপনিবেশের লোকেরা ... হইবে না। বিদেশে কোথাও যে ভারতবাসীরা ইউরোপীয়দের সমাজে গৃহীত হইতে পারে ... তাহা অতি সুস্পষ্ট ভাষায়, স্মট সাহেব বলিয়াছেন। আইন করিয়া কেহ ইউরোপীয়দের মন ... ভারতবাসীর প্রতি অবজ্ঞা ও বিদ্বেষ দূর করিতে পারেন না; অন্যদিকে ভারতবাসীরা নির্য্যাতন ... করিলে আপনাদের ক্ষমতায়, তাহার প্রতীকার করিতে পারেন না। এরূপ স্থলে আইনের ... গোটাকতক অধিকার বসাইয়া দিলেও ভারতবাসীরা ইউরোপীয় প্রভাবের দেশে আত্মসম্মান ... করিতে পারেন না। যেখানে আইনের বিধান এবং ন্যায়ের বিধানকে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ... প্রয়োগ করা অসম্ভব, সেখানে কেতাবি ব্যবস্থায় কোনপ্রকার উপকার দর্শিতে পারে না।

নির্ব্বাণ

ঝরে যাক্ অশ্রুজল, বেদনার কলকল,
অধীর বিদ্যুৎ-দীপ্তি, দৃপ্ত গরজন,
বাসনাবন্ধন ছিঁড়ে স্নিগ্ধ নীলিমার তীরে
ধীরে ধীরে শূন্য ঘিরে করি সন্তরণ।

বার্লিন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

("কলিকাতা রিভিউ"-র সৌজন্যে)

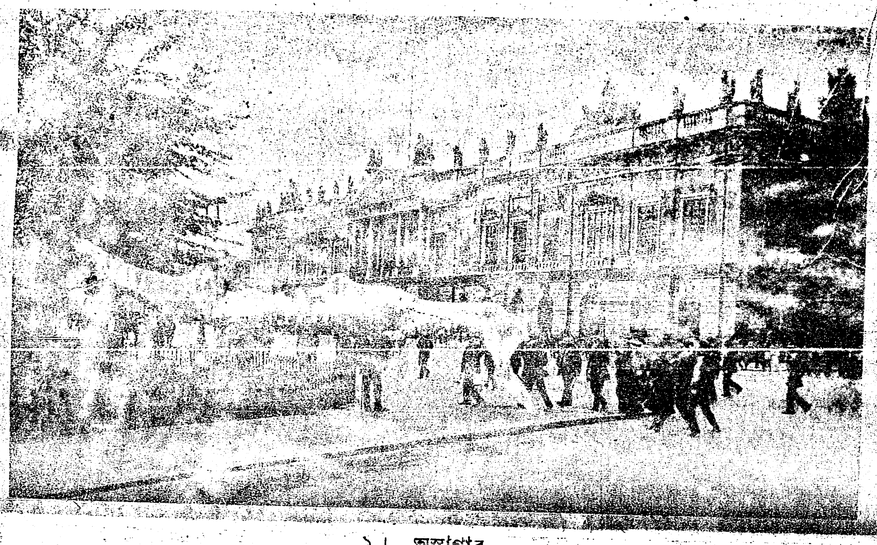

১। অস্ত্রাগার

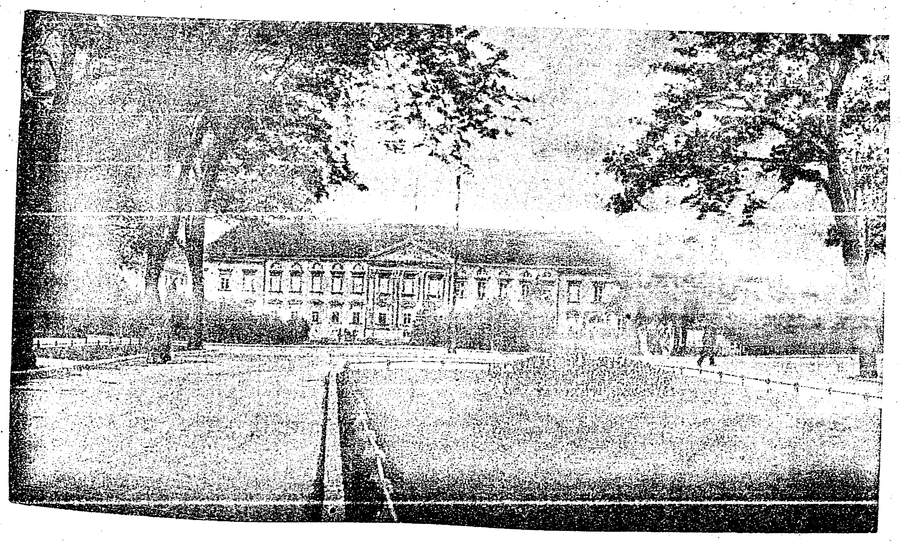

২। বেলেভিউ রাজপ্রাসাদ

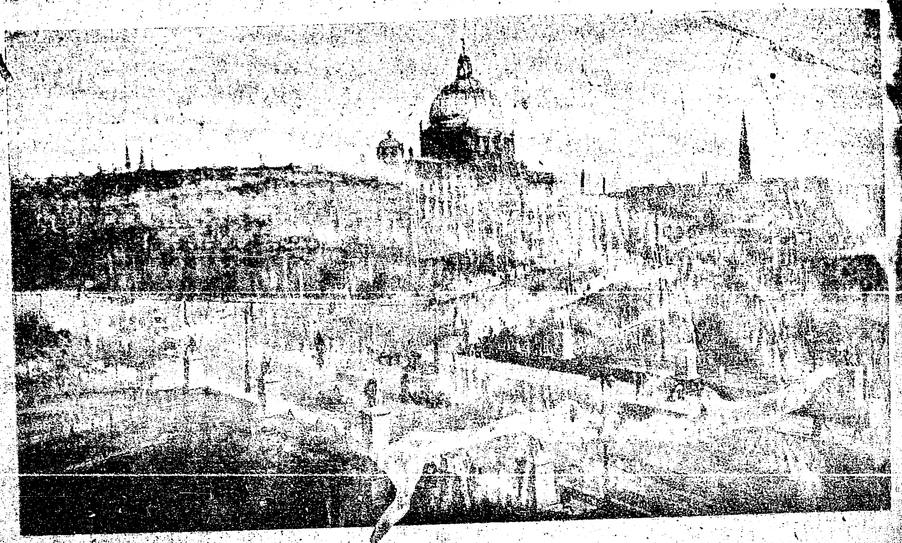

৩। রাজপ্রাসাদ ও তৎসংলগ্ন সেতু

৫। ত্রাণ্ডেনবর্গ প্রবেশদ্বার

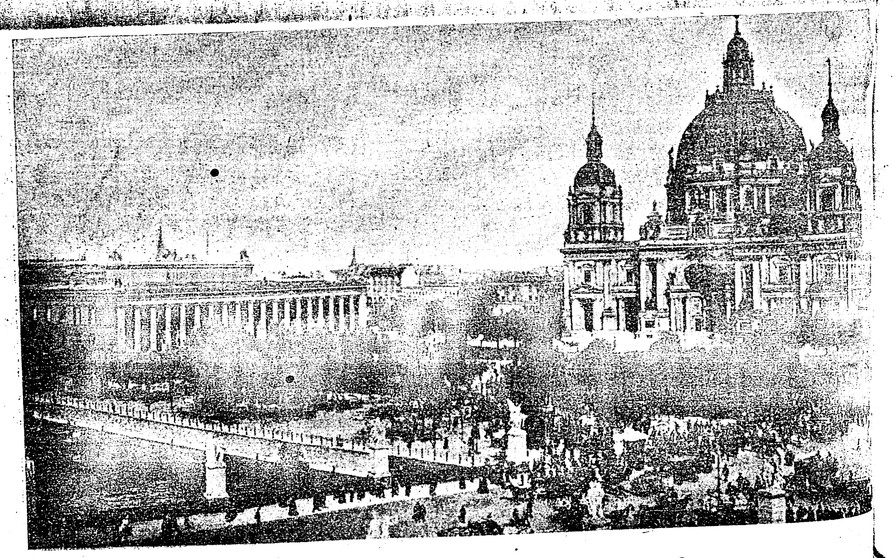

৪। রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন সেতু, যাদুঘর, প্রধান ধর্ম্মমন্দির

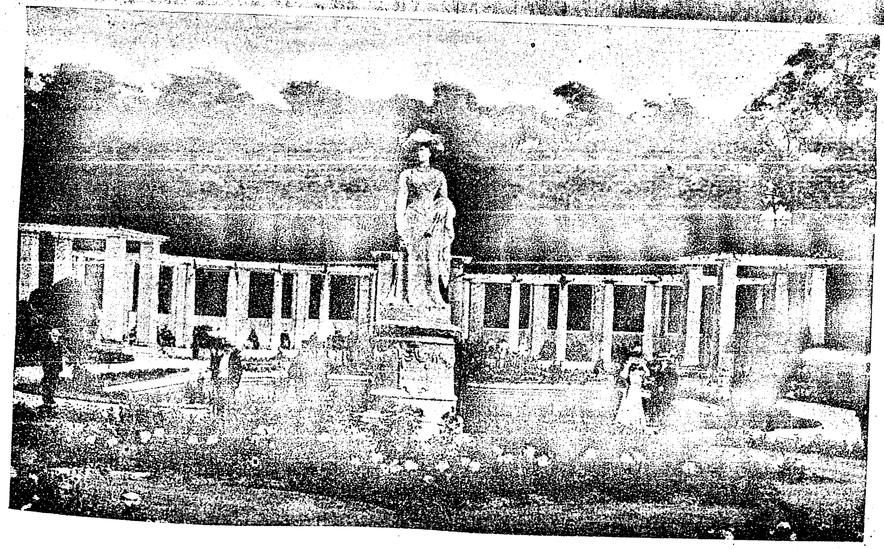

৬। থিরগার্টেনে গোলাপবাগ ও সম্রাজ্ঞী অগষ্টা ভিক্টোরিয়া স্মৃতিমন্দির

BLOCKED INFORMATION.

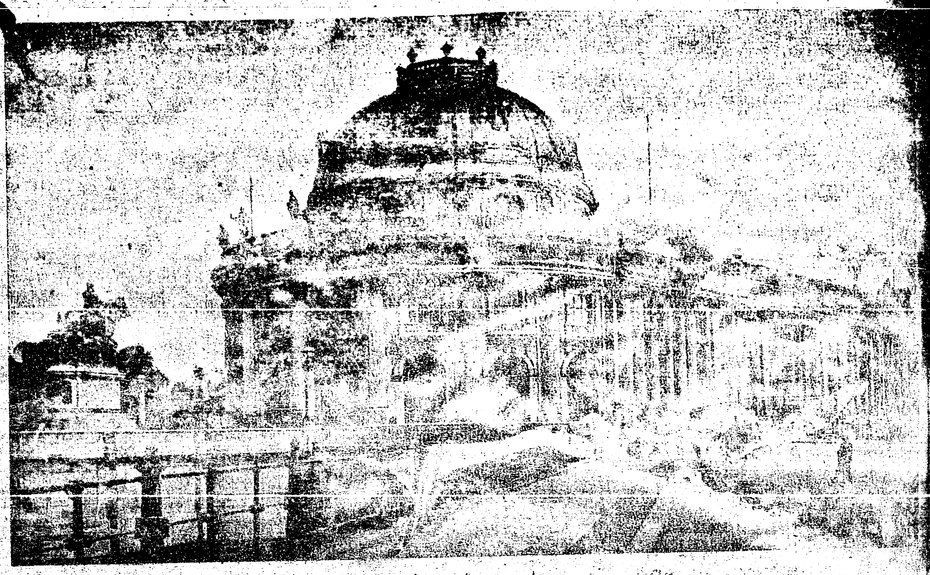

৭। সম্রাট ফ্রেড্‌রিক যাদুঘর

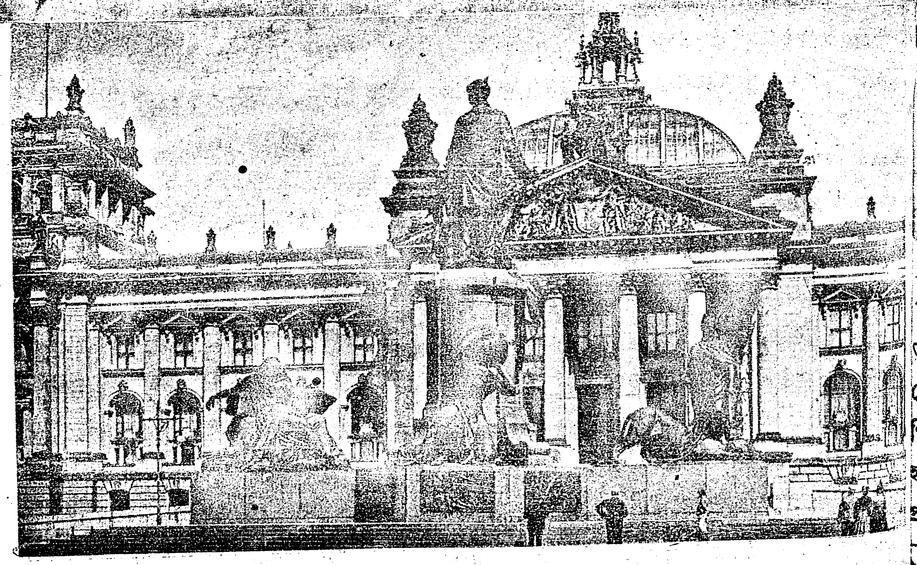

৮। বিস্‌মার্ক স্মৃতিমন্দির

পথের দাবী *

(১০)

শেষোক্ত ঘটনার পরে মাসাধিক কাল অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। তেওয়ারী আরোগ্য ত করিয়াছে, কিন্তু গায়ে এখনও জোর পায় নাই। যে লো[illegible]ামোয় গিয়াছিল সেই [illegible]। তেওয়ারীকে বাঁচাইবার জন্য প্রায় আফিস শুদ্ধ সকলেই অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়াছে, রামদাস নিজে কতদিন ত বাসায় পর্য্যন্ত যাইতে পারে নাই। সহরের একজন বড় ডাক্তার চিকিৎসা করিয়াছেন, তাঁহারই সুপারিশে তাহাকে বসন্ত-হাঁসপাতালে লইয়া যায় নাই। এই ব্রহ্ম[illegible]টা তেওয়ারীর কোনদিনই ভাল লাগে নাই, অপূর্ব্ব তাহাকে ছুটি দিয়াছে, স্থির হইয়াছে আর একটু [illegible]ড়া চা[illegible]র। আগামী সপ্তাহে বোধহয় তাহা অসঙ্গত হইবে না, তেওয়ারী নিজে এইরূপ আশা করে। [illegible]রতী সেই যে গিয়াছে, কোনদিন খবর লইতেও আসে নাই। অথচ, এতবড় একটা আশ্চর্য্য ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে তাহার উল্লেখ পর্য্যন্ত হইত না। ইহাতে তেওয়ারীর বিশেষ অপরাধ ছিল না; বরঞ্চ, সে যেন ভয়েভয়েই থাকিত পাছে কেহ তাহার নাম করিয়া ফেলে। ভারতী শত্রু পক্ষীয়া, এখানে আসা অবধি তাহাদের [illegible] প্রকারে দুঃখ দিয়াছে, মিথ্যা সাক্ষ্যের জোরে অপূর্ব্বকে [illegible] করিয়াছে; মনিবের অবর্ত্তমানে তাহাকেই ঘরে ডাকিয়া আনার কথায় সে লজ্জা ও সঙ্কোচ দুই অনুভব করিত। কিন্তু সে কবে এবং কিভাবে চলিয়া গেছে তেওয়ারী জানে না। জানিবার জন্য ছট্‌ফট্ করিত,—তাহার উদ্বেগ ও আশঙ্কার অবধি ছিল না, কিন্তু কি করিয়া যে জানা যায় কিছুতেই খুঁজিয়া পাইত না। কখনো ভাবিত ভারতী চালাক মেয়ে, অপূর্ব্বর আসার সংবাদ পাইয়া সে নিজেই লুকাইয়া পলাইয়াছে; কখনো ভাবিত অপূর্ব্ব আসিয়া পড়িয়া হয়ত তাহাকে অপমান করিয়া দূর করিয়া দিয়াছে। কিন্তু এই দু'য়ের যাহাই কেননা ঘটিয়া থাক্, ভারতী আপনি ইচ্ছা করিয়া যে এ বাটীতে আর তাহাকে দেখিতে আসিবে না সে বিষয়ে তেওয়ারী নিশ্চিন্ত ছিল। অপূর্ব্ব নিজে কিছুই বলে না, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে তেওয়ারীর এই ভয়টাই সবচেয়ে বেশি করিত পাছে তাহারই জিজ্ঞাসাবাদের দ্বারা সকল কথা ব্যক্ত হইয়া পড়ে। ঝগড়া-বিবাদের কথা চুলায় যা'ক, সে যে তাহার হাতে জল খাইয়াছে, তাহার রাঁধা সাগু বার্লি খাইয়াছে,—হয়ত এমন ভয়ানক জাত গিয়াছে যে তাহার প্রায়শ্চিত্ত পর্য্যন্ত নাই। তেওয়ারী স্থির করিয়া রাখিয়াছিল কোনমতে এখান হইতে কলিকাতায় গিয়া সে সোজা বাড়ী চলিয়া যাইবে। সেখানে গঙ্গাস্নান করিয়া, গোপনে গোবর প্রভৃতি খাইয়া, কোন একটা ছল-ছুতায় ব্রাহ্মণাদি ভোজন করাইয়া দেহটাকে কাজ-চলা-গোছের

* সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত

শুদ্ধ করিয়া লইবে। কিন্তু ঘাঁটা-ঘাঁটি করিয়া কথাটাকে একবার মায়ের কানে তুলিয়া দি[illegible] কিসে কি দাঁড়াইবে তাহার কিছুই বলা যায় না। হালদার বাড়ীর চাকুরি ত ঘুচিবেই [illegible] তাহাদের গ্রামের সমাজ পর্য্যন্ত গিয়া টান্ ধরাও বিচিত্র নয়।

কিন্তু ইহাই তেওয়ারীর সবটুকু ছিল না। এই স্বার্থ ও ভয়ের দিক ছাড়া তাহার অ[illegible] আর একটা দিক ছিল তাহা যেমন মধুর, তেমনি বেদনায় ভরা। অপূর্ব্ব আফিসে চ[illegible] গেলে দুপুর বেলায় [illegible] লইয়া বারান্দায় আসিয়া [illegible] দুর্ব্বল দেহটিকে দেয়ালের গায়ে এলাইয়া দিয়া গলির যে অংশটি গিয়া বড় রাস্তায় মি[illegible] সেইখানে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিত। এই পথে ভারতীর কোনদিন প্রয়োজন হইবে [illegible] মোড় অতিক্রম করিবার বেলা, অভ্যাস বশতঃ একবার এদিকে সে চাহিবেনা এমন [illegible] পারে না। অপূর্ব্ব ভামোয় চলিয়া গেলে এই মেয়েটির সহিত তাহার [illegible] হয়। [illegible] দুপুর বেলা হঠাৎ তাহার মা মরিয়া য[illegible] তেওয়ারীর [illegible] হয় নাই, মেয়েটা [illegible] আসিয়া তাহার রুদ্ধ দ্বারে করাঘাত করে। দিন দুই পূর্ব্বে জোসেফ সাহেব মরিয়াছে, [illegible] ভয় ছিল না, আসিয়া কবাট খুলিতেই ভারতী ঘরে ঢুকিয়া তাহার দুই হাত ধরিয়া সে কি [illegible] কে বলিবে সে ম্লেচ্ছ, কে বলিবে সে কৃশ্চানের মেয়ে! তেওয়ারীর রাঁধা ভাত হাঁড়িতে [illegible] সারাদিন চিঠি লইয়া তাহাকে কোথায় না সেদিন ঘুরিয়া বেড়াইতে হইল! পরদিন কফি[illegible] যাইবার বেলা এই বারান্দায় দাঁড়াইয়া চোখের জল যেন তাহার আর থামিতেই চাহে না। সময় হইতেই ভারতীকে সে কখনো মা, কখনো বা দিদি বলিতে সুরু করিয়াছিল, এবং করিয়া তাহাকে সে চার পাঁচদিন রাঁধিতে দেয় নাই, নিজে রাঁধিয়া খাওয়াইয়াছিল। [illegible] যেদিন ভারতী জিনিস-পত্র লইয়া স্থানান্তরে উঠিয়া গেল, সেদিন সন্ধ্যাবেলাটা তাহার [illegible] কাটিবে না এমনি মনে হইয়াছিল। তাহার বসন্ত রোগে ভারতী কতখানি কি করিয়া ছিল [illegible] ভাল জানিতওনা, ভাবিতও না। মনে হইলেই মনে হইত জাত যাবার কথা। কিন্তু এই [illegible] আর একটা কথা সে সর্ব্বদাই ভাবিবার চেষ্টা করিত। সকাল বেলা স্নান করিয়া মস্ত ভিজা [illegible] রাশি পিঠে মেলিয়া দিয়া সে একবার করিয়া তেওয়ারীর তত্ত্ব লইতে আসিত। রান্নাঘরেও [illegible] কোন কিছু স্পর্শও করিতনা, চৌকাটের বাহিরে মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিত, আ[illegible] রাঁধ্‌লে দেখি তেওয়ারী।

দিদি, একটা আসন পেতে দিই।

না। আবার ত কাচ্‌তে হবে!

তেওয়ারী কহিত, বাঃ, আসন কি কখনো ছোঁয়া যায় নাকি?

ভারতী বলিত, যায় বই কি। তোমার বাবু ত ভাবেন আমি থাকার জন্যে সমস্ত বাড়ীটা [illegible] গেছে। নিজের হলে বোধ হয় আগুন ধরিয়ে একে পুড়িয়ে শুদ্ধ করে নিতেন। ঠিক না তে[illegible]

তেওয়ারী হাসিয়া কহিত, তোমার এক কথা দিদি! তুমি নিজে দেখ্‌তে পারোনা [illegible] বাইকে তাই ভাবো। কিন্তু আমার বাবুকে যদি একবার ভাল করে জান্‌তে ত তুমিও বল্‌তে [illegible] সংসারে নেই।

ভারতী বলিত, নেই তা আমিও ত বলি। নইলে যে চুরি করা আট্‌কালে, তাকেই গেলেন [illegible]র বলে ধরিয়ে দিতে!

এই ব্যাপারে নিজের অপরাধ স্মরণ করিয়া তেওয়ারী [illegible] পড়িত। কথাটাকে [illegible] তাড়াতাড়ি কহিত, কিন্তু তুমিও ত কিছু কম করনি? সমস্ত মিথ্যে জেনেও ত বাবুর কুড়ি টাকা দণ্ড [illegible] দিদি।

ভারতী অপ্রতিভ হইয়া বলিত, তেমনি দণ্ড ত নিজেই নিলাম তেওয়ারী, তোমার বাবুকে ত আর দিতে হ[illegible]!

দিতে হলনা [illegible] দু'খানা নোট দিয়ে তবে তিনি বার হলেন।

আমিও যে স্বচক্ষে দেখ্‌লাম তেওয়ারী, তুমি ঘরে ঢুকেই দুখানা নোট কুড়িয়ে পেয়ে তা বাবুর হাতে তুলে দিলে!

তেওয়ারীর হাতের খুন্তি হাতেই থাকিত,—ওঃ! তাই বটে!

কিন্তু ভাজাটা যে পুড়ে উঠ্‌ল তেওয়ারী, ওযে আর মুখে দেওয়া চল্‌বেনা।

তেওয়ারী কড়াটা নামাইয়া লইয়া কহিত, বাবুকে কিন্তু একথা আমি বলে দেব দিদি।

ভারতী সহাস্যে জবাব দিত, দিলেই বা। তোমার বাবুকে কি আমি ভয় করি নাকি?

কিন্তু এতবড় আশ্চর্য্য কথাটা ছোটবাবুকে জানাইবার তেওয়ারীর আর সুযোগ মিলিল না। কবে এবং কেমন করিয়া যে মিলিবে ইহাও সে খুঁজিয়া পাইত না। একদিন আলস্যবশতঃ সে বাসি হলুদ দিয়া তরকারী রাঁধিতে গিয়া ভারতীর কাছে বকুনি খাইয়াছিল। আর একদিন স্নান না করিয়াই রাঁধিয়াছিল বলিয়া ভারতী তাহার হাতে খায় নাই। তেওয়ারী রাগ করিয়া বলিয়াছিল, তোমরা যে কৃশ্চান দিদি, তোমাদেরও এত বাচ-বিচার? এ যে দেখি আমাদের মা ঠাক্‌রুণকেও ছাড়িয়ে গেলে!

ভারতী শুধু হাসিয়া চলিয়া গিয়াছিল, জবাব দেয় নাই। বস্তুতঃ রান্নার ব্যাপারে একা মা ঠাকুরাণী ছাড়া তাহার শুচিতায় কেহ প্রশ্ন করিতেও পারে ইহাতে সে মনে মনে আহত হইয়াছিল, কিন্তু আচার-বিচার লইয়া এই ম্লেচ্ছ মেয়েটার কাছেই সে সতর্ক না হইয়াও পারে নাই। তখন এ সকল তাহার ভাল লাগে নাই, যাহা ভালও লাগিয়াছে তাহারও তেমন করিয়া মর্য্যাদা উপলব্ধি করে নাই, অথচ, এই সব চিন্তাই যেন এখন তাহাকে বিভোর করিয়া দিত। বর্ম্মায় সে আর ফিরিবেনা। যাইবার পূর্ব্বে দেখা হইবার আর আশা নেই, দেখা করিবার হেতু নাই, যত কিছু সে

BLOCKED INFORMATION.

জানে বলিবার লোক নাই,—দিনের পর দিন একই পথের প্রান্তে নিষ্ফল দৃষ্টি পাতিয়া এবা
ঘরিয়া বসিয়া তাহার বুকের মধ্যেটা যেন আঁচড়াইতে থাকিত।

সেদিন আফিস হইতে ফিরিয়া অপূর্ব্ব হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, ভারতীর বাসাটা কি
জায়গায় রে তেওয়ারী ?

তেওয়ারী সংশয়তিক্তকণ্ঠে জবাব দিল, আমি কি গিয়ে দেখে এসেছি নাকি ?

যাবার সময় তোকে বলে যায় নি ?

আমাকে বলতে যাবে কিসের জন্যে !

অপূর্ব্ব কহিল, আমাকে বলেছিল বটে, কিন্তু জায়গাটা ঠিক মনে নেই। কাল
খুঁজে দেখতে হবে।

তেওয়ারীর মনটা দুলিতে লাগিল, হয়ত কি আবার একটা ফ্যাসাদ জুটিয়েছে, কিন্তু
তাহার হইলনা যে কারণ জিজ্ঞাসা করে। কহিল, বে
জিনিসগুলো এখন পুলিশের লোকে দিতে চায়, কিন্তু ভারতার একটা সই চাই।

তেওয়ারী আর একদিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল, অপূর্ব্ব বলিতে লাগিল, ে
কথাই ত জানাতে এসে তোর অবস্থা দেখে আর ফিরতে পারলেন না। তিনি না দেখে
কবে মরে ভূত হয়ে যেতিস্ তেওয়ারী, আমার সঙ্গে পর্য্যন্ত দেখা হোতো না।

তেওয়ারী হাঁ, না কিছুই কহিলনা, শেষ কথাটা শুনিবার জন্য নিঃশব্দে কাঠের
রহিল। অপূর্ব্ব বলিল, এসে দেখি অন্ধকার ঘরে তুই আর তিনি। দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই,
ঘটবে তার ঠিক নেই, কোথায় খাওয়া কোথায় শোওয়া, দুদিন আগে নিজের বাপ-মা মরে
কিন্তু কি শক্ত মেয়ে মানুষ, তেওয়ারী, কিছুতেই ভ্রূক্ষেপই নেই !

তেওয়ারী আর থাকিতে না পারিয়া বলিল, কবে গেলেন তিনি ?

অপূর্ব্ব কহিল, আমার আসার পরদিনই। ভোর না হতেই 'চললুম' বলে যেন
উবে গেলেন।

রাগ করে চলে গেলেন নাকি ?

রাগ কোরে ? অপূর্ব্ব একটু ভাবিয়া কহিল, কি জানি, হতেও পারে। তাঁকে
যায় না,—নইলে তোর উপর এত যত্ন, একবার খবর নিতেও ত এলেন না তুই ভাল হলি কি
এই কথা তেওয়ারীর ভাল লাগিল না। বলিল, তাঁর নিজেরই হয়ত অসুখ
করেচে।

নিজের অসুখ বিসুখ ! অপূর্ব্ব চমকিয়া গেল। তাহার সম্বন্ধে অনেকদি
কথাই মনে হইয়াছে, কিন্তু কোনদিন এ আশঙ্কা মনেও উদয় হয় নাই। যাবার সময়
রাগ করিয়াই গিয়াছে, এবং এই রাগ করা লইয়াই মন তাহার যত কিছু কারণ খুঁজিয়া

কিন্তু অন্য সম্ভাবনাও যে থাকিতে পারে এদিক পানে ক্ষুব্ধ চিত্ত তাহার দৃষ্টিপাতই করে নাই। হঠাৎ অপূর্ব্বর কথায় এ লইয়া যত আলোচনা সে রাত্রে হইয়াছিল সমস্ত এক নিমিষে মনে পড়িয়া অপূর্ব্ব বসন্ত ছাড়া আর কিছু ভাবিতেই পারিল না। তাহার নূতন বাসায় দেখিবার কেহ নাই, হয়ত হাঁসপাতালে লইয়া গেছে, হয়ত এতদিনে বাঁচিয়াও নাই, মনে মনে সে একেবারে অস্থির হইয়া উঠিল। একটা চেয়ারে বসিয়া আফিসের কলার নেকটাই ওয়েষ্টকোট খুলিতে খুলিতে তাহাদের আলাপ সুরু হইয়াছিল, হাতের কাজ গেল সেইখানেই বন্ধ হইয়া গেল, সে তাহার বন্ধ রহিল, সেই চেয়ারে কাঠের পুতুলের মত বসিয়া এই এক প্রকারের অপরিচিত, অস্পষ্ট অনুভূতি যেন তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল যে সংসারে আর তাহার কোন কাজ করিবার নাই।

কিছুক্ষণ আর কেহই কথা কহিল না। এমনি একভাবে মিনিট কুড়ি পঁচিশ কাটিয়া গেলেও যখন অপূর্ব্ব কথা কহিল না, তখন তেওয়ারী মনে মনে শুধু আশ্চর্য্য নয় উদ্বিগ্ন হইল। আস্তে আস্তে কহিল, ছোটবাবু, বাড়ীওয়ালার লোক এসেছিল ; যদি তেতালার ঘরটাই নেওয়া হয় ত, এই মাসের মধ্যেই বদলানা চাই বলে গেল। আমার ভাবনা হয় পাছে কেউ আবার এসে পড়ে !

অপূর্ব্ব মুখ তুলিয়া বলিল, কে আর আসচে।

তেওয়ারী কহিল, আজ মায়ের একখানা পোষ্টকার্ড পেয়েচি। দরওয়ানকে দিয়ে তিনি লিখিয়েছেন।

কি লিখিয়েছেন ?

আমি ভাল হয়েচি বলে অনেক আহ্লাদ করেছেন। দরওয়ানের ভাই ছুটি নিয়ে দেশে যাচ্চে, তার হাতে বিশ্বেশ্বরের নামে পাঁচ টাকার পূজো পাঠিয়েছেন।

অপূর্ব্ব কহিল, ভালই ত। মা তোকে ছেলের মত ভালবাসেন।

তেওয়ারী শ্রদ্ধায় বিগলিত হইয়া কহিল, ছেলের বেশী। আমি চলে যাবো, মা'র ইচ্ছে ছুটি নিয়ে আমরা দুজনেই যাই। চারদিকে অসুখ-বিসুখ—

অপূর্ব্ব বলিল, অসুখ-বিসুখ কোথায় নেই ? কলকাতায় হয় না ? তুই বুঝি ভয় দেখিয়ে নানা কথা লিখেছিলি ?

আজ্ঞে না। তেওয়ারি ভাবিয়া রাখিয়াছিল আসল কথাটা সে রাত্রে আহারাদির পরে ধীরে সুস্থে পাড়িবে। কিন্তু আর অপেক্ষা করা চলিল না। কহিল, কালীবাবু একেবারে নাছোড়বান্দা হয়ে ধরেছেন। বোধ হয় সকলেরই ইচ্ছে মাঝের চোত্ মাসটা বাদ দিয়ে বোশেখের প্রথমেই শুভ কাজটা হয়ে যায়।

কালীবাবু অতিশয় নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, তাঁহার পরিবারে আচারপরায়ণতার খ্যাতি প্রসিদ্ধ।

তাঁহার কনিষ্ঠ কন্যাকে মাতাঠাকুরাণী পছন্দ করিয়াছেন এ আভাস তাঁহার কয়েকখানা পত্রেই ছিল। তেওয়ারীর কথাটা অপূর্ব্বর ভালো লাগিল না। কহিল, এত তাড়াতাড়ি কিসের। কালীবাবুর গৌরীদানের সবুর না সয়, তিনি ত আর কোথাও চেষ্টা করতে পারেন।

তেওয়ারী একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, তাড়াতাড়ি তাঁর কি মা'র কি কোরে জান্‌বো ছোট বাবু? লোকে হয়ত তাঁকে ভয় দেখায় বর্ম্মা দেশটা তেমন ভাল নয়,—এখানে ছেলেরা বিগ্‌ড়ে যায়।

অপূর্ব্ব খামোকা ভয়ানক রাগিয়া উঠিয়া কহিল, ভাখ তেওয়ারী তুই আমার ওপর পণ্ডিতি করিস্‌নে বলে দিচ্ছি। মাকে তুই রোজ রোজ অত চিঠি লিখিস্ কিসের? আমি ছেলে মানুষ নই!

এই অকারণক্রোধে তেওয়ারী প্রথমে বিস্মিত হইল, বিশেষতঃ রোগ হইতে উঠিয়া নানা কারণে তাহারও মেজাজ খুব ভাল ছিল না। [illegible] বার সময়ে মাকে একথা বলে আস্‌তে পারেন নি? তা'হলে ত বেঁচে যেতাম, জাত-জন্ম খোয়াতে জাহাজে চড়তে হোতো না!

অপূর্ব্ব চোক রাঙাইয়া চট্ করিয়া কলার ও নেকটাই তুলিয়া লইয়া গায় পরিতে লাগিল। তেওয়ারী বহুকাল হইতেই ইহার অর্থ জানিত। কহিল, তা'হলে জলটল্ কিছু খাবেন না?

অপূর্ব্ব তাহার প্রশ্নের জবাবে আল্‌না হইতে কোট লইয়া তাহাতে হাত গলাইতে গলাইতে দুম্ দুম্ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

তেওয়ারী গরম হইয়া বলিল, কাল রবিবারে চাটগাঁ দিয়ে একটা জাহাজ যায়—আমি তাতেই বাড়ী যাব বলে রাখ্‌লাম। অপূর্ব্ব সিঁড়ি হইতে কহিল, না যাস্ তো তোর দিব্বি রইল বলিয়া নীচে চলিয়া গেল।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে প্রভু ও ভৃত্যে কিসের জন্য যে এমন একটা রাগারাগি হইয়া গেল অনভিজ্ঞ কেহ উপস্থিত থাকিলে সে একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া যাইত, সে ভাবিয়াও পাইত না, যে এম্‌নি অর্থহীন আঘাতের পথ দিয়াই মানুষের ব্যথিত বিক্ষুব্ধ চিত্ত চির দিন আপনাকে সহজের মধ্যে ফিরাইয়া আনিবার পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে।

(১১)

অপূর্ব্বর যাবার যায়গা একমাত্র ছিল তলওয়ারকরের বাটী। এখানে বাঙালীর অভাব নাই, কিন্তু আসিয়া পর্য্যন্ত এমন ঝড়-ঝাপটার মধ্যেই তাহার দিন কাটিয়াছে যে, কাহারও সহিত পরিচয় করিবার আর ফুরসৎ পায় নাই। বাহির হইয়া আজও সে রেলওয়ে ষ্টেশনের দিকেই চলিয়াছিল, কিন্তু হঠাৎ মনে পড়িল আজ শনিবারে তাহার সস্ত্রীক থিয়েটারে যাইবার কথা। অতএব, পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ানো ব্যতীত অন্য কিছু করিবার যখন রহিল না এবং কোথায়

যাইবে যখন ভাবিতেছে, তখন অকস্মাৎ ভারতীকে মনে পড়িয়া তাহার প্রতি গভীর অকৃতজ্ঞতা আজ তাহাকে তীক্ষ্ণ করিয়া বিঁধিল। তাহার আহত অপরাধী মন তাহারি কাছে যেন জবাব-দিহি করিয়া বারবার বলিতে লাগিল, সে ভালই আছে তাহার কিছুই হয় নাই; নহিলে, এতবড় জীবন-মরণ সমস্যায় এক [illegible] খবর পর্য্যন্ত দিত না তাহা হইতেই পারে না, তবুও সে ওই জবার-দিহির বেশি আর অগ্রসর হইতে পারে না। তেলের কারখানার কাছাকাছি কোথাও তাহার নূতন বাসা ইহা সে [illegible] ইহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার কল্পনায় মন মাতিয়া উঠিল, কিন্তু এমন করিয়া যে লোক আত্মগোপন করিয়া আছে, এতকাল পরে তাহার তত্ত্ব লইতে যাওয়ার লজ্জাও সে সম্পূর্ণ কাটাইয়া উঠিতে পারিল না। হয়ত সে ইহা চাহে না, হয়ত সে তাহাকে দেখিয়া বিরক্ত হইবে, তাই চলিতে চলিতে আপনাকে আপনি সে একশতবার করিয়া বলিতে লাগিল, পুলিশের লোকে তাহার [illegible] আছে, অতএব কাজের জন্যই সে আসিয়াছে; সে কেমন আছে, কোথায় আছে এ সকল অকারণ কৌতূহল নহে। এতদূর হইতে এ অভিযোগ ভারতী কোন মতেই তাহার প্রতি আরোপ করিতে পারিবে না।

এ অঞ্চলে অপূর্ব্ব আর কখনো আসে নাই। পূর্ব্ব মুখে প্রশস্ত রাস্তা সোজা গিয়াছে, অনেক দূর হাঁটিয়া বাঁ দিকে নদীর ধারে যে পথ, সেইখানে আসিয়া একজনকে সে জিজ্ঞাসা করিল এদিকে সাহেব মেমেরা কোথায় থাকে জানো? লোকটি প্রত্যুত্তরে আশে পাশের যে সকল ছোট বড় বাঙ্‌লো দেখাইয়া দিল তাহাদের আকৃতি, অবয়ব ও সাজ-সজ্জা দেখিয়াই অপূর্ব্ব বুঝিল তাহার প্রশ্ন করা ভুল হইয়াছে। সংশোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, অনেক বাঙালীরাও ত থাকে এখানে, কেউ কারিগর, কেউ মিস্ত্রী, তাদের মেয়েছেলেরা—

লোকটি কহিল, ঢের, ঢের। আমিই ত একজন মিস্ত্রী। আমার তাঁবেই ত পঞ্চাশজন কারিকর—যা কোরব তাই। ছোট সাহেবকে বলে জবাব পর্য্যন্ত দিতে পারি। কাকে খোঁজেন?

অপূর্ব্ব চিন্তা করিয়া কহিল, দেখো আমি যাকে খুঁজি,—আচ্ছা, যারা বাঙালী কৃশ্চান কিম্বা—

লোকটি আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, বোল্‌চেন বাঙালী,—আবার খৃষ্টান কি রকম? খৃষ্টান হলে আবার বাঙালী থাকে না কি? খৃষ্টান—খৃষ্টান! মোচলমান—মোচলমান! বস্, এই ত জানি মশায়!

অপূর্ব্ব বলিল, আহা! বাঙ্‌লা দেশের লোক ত! বাঙ্‌লা ভাষা বলে ত!

সে গরম হইয়া কহিল, ভাষা বল্‌লেই হল? যে জাত দিয়ে খৃষ্টান হয়ে গেল তাতে আর পদার্থ রইল কি মশায়? কোন বাঙালী তার সঙ্গে আহার-ব্যবহার করুক একবার দেখি ত! ওই যে কোত্থেকে সব মেয়ে-মাষ্টার এসেচে ছেলেপুলেদের পড়ায় বস্! তা বলে কেউ কি তাদের সঙ্গে খাচ্চে, না বস্‌চে?

অপূর্ব্ব কুল দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তিনি কোথায় থাকেন জানেন?

সে কহিল, তা আর জানিনে। এই রাস্তায় সোজা গাঙের ধারে গিয়ে জিজ্ঞেস করবেন নতুন ইস্কুল ঘর কোথায়,—কচি ছেলেটা পর্য্যন্ত দেখিয়ে দেবে। ডাক্তারবাবু থাকেন কি না! মানুষ ত নয়,—দেবতা! মরা বাঁচাতে পারেন!—এই বলিয়া সে নিজের কাজে চলিয়া গেল।

সেই পথে সোজা আসিয়া অপূর্ব্ব লাল রঙের একখানি কাঠের বাড়ী দেখিতে পাইল। বাড়ীটি দ্বিতল, একেবারে নদীর উপ[illegible] রাত্রি হইয়াছে, পথে লোক নাই—উপরের খোলা জানালা হইতে আলো আসিতেছে,—কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিবার জন্য সে সেইখানে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কিন্তু মনের মধ্যে তাহার সন্দেহ রহিল না যে এই খানেই ভারতী থাকে, এবং ও জানালাতেই তাহার দেখা মিলিবে।

মিনিট পনেরো পরে জন দুই তিন লোক বাহির হইয়া তাহাকে দে[illegible] যেন চকিত হইয়া উঠিল। একজন প্রশ্ন করিল, কে? কা'কে চাই?

তাহার সন্দিগ্ধ কণ্ঠস্বরে অপূর্ব্ব সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, মিস্ জোসেফ বলে কোন স্ত্রীলোক থাকেন এখানে?—

সে তৎক্ষণাৎ বলিল, থাকেন বই কি—আসুন।

অপূর্ব্বর ঠিক যাবার সঙ্কল্প ছিল না, কিন্তু দ্বিধা করিতেই লোকটি কহিল, আপনি কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন? কিন্তু তিনি ত ঘরেই আছেন,—আসুন। আমরা আপনাকে নিয়ে যাচ্চি, এই বলিয়া সে অগ্রসর হইল।

তাহার ত্বরা দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা গেল ইহারা তাহাকে যাচাই করিয়া লইতে চায়। অতএব দ্বার হইতে এখন না বলিয়া ফিরিতে চাহিলে সন্দেহ ইহাদের এম্‌নিই বিশ্রী হইয়া উঠিবে যে তাহা ভাবিতেই পারিল না। তাই চলুন, বলিয়া সে লোকটির অনুসরণ করিয়া এক মুহূর্ত্ত পরেই এই কাঠের বাড়ীর নিচেকার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহারই এক পাশ দিয়া উপরে উঠিবার সিঁড়ি। ঘরটি হলের মত প্রশস্ত। ছাদ হইতে ঝুলানো একটা মস্ত আলো, গোটা কয়েক টেবিল চেয়ার, একটা কালো বোর্ড এবং সমস্ত দেয়াল জুড়িয়া নানা আকারের ও নানা রঙের ম্যাপ টাঙানো। ইহাই যে নূতন স্কুলঘর অপূর্ব্ব তাহা দেখিয়াই চিনিল। তথায় গোটা পাঁচ জন স্ত্রীলোক ও পুরুষে মিলিয়া বোধ হয় একটা তর্কই করিতেছিল, সহসা একজন অপরিচিত লোককে প্রবেশ করিতে দেখিয়া চুপ করিল। অপূর্ব্ব একবার মাত্র তাহাদের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া যে তাহাকে আনিয়াছিল তাহারই পিছনে পিছনে উপরে উঠিয়া গেল। ভারতী ঘরেই ছিল। অপূর্ব্বকে দেখিয়া তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, কাছে আসিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া চেয়ারে বসাইয়া কহিল, এতদিন আমার খোঁজ নেন্‌নি যে বড়?

অপূর্ব্ব বলিল, আপনিও ত আমাদের খোঁজ নেন্‌নি! কিন্তু কথাটা যে জবাব হিসাবে দিবার

হইল না তাহা সে বলিয়াই বুঝিল। ভারতী শুধু একটু হাসিল, কহিল, তেওয়ারী বাড়ী যেতে চাচ্চে, যাক। না গেলে সে সারবে না।

অপূর্ব্ব কহিল, অর্থাৎ আপনি যে আমাদের খবর নেননা এ অভিযোগ সত্য নয়।

ভারতী পুনশ্চ একটু হাসিয়া কহিল, কাল রবিবার, কাল কিছু আর হবে না, কিন্তু পরশু বারোটার মধ্যেই কোর্টে গিয়ে টাকা আর জিনিসগুলো আপনার ফিরিয়ে আনবেন। একটু দেখে

আপনার কিন্তু একটা সই চাই।

তা জানি।

অপূর্ব্ব প্রশ্ন করিল, আপনার সঙ্গে তেওয়ারীর বোধ হয় দেখা হয়, না?

ভারতী [illegible] কিন্তু আপনি যেন গিয়ে তার ওপর মিছে রাগ করবেন না।

অপূর্ব্ব কহিল, মিছে না হোক্, সত্যি রাগ করা উচিত। আপনি তার প্রাণ দিয়েছেন এটুকু কৃতজ্ঞতা তার থাকা উচিত ছিল।

ভারতী কহিল, নিশ্চয়ই আছে। নইলে, সে তো আমাকে জেলে পাঠাবার একবার অন্ততঃ চেষ্টা করেও দেখ্‌তো।

অপূর্ব্ব এ ইঙ্গিত বুঝিল। আনতমুখে ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে বলিল, আপনি আমার উপর ভয়ানক রাগ করে আছেন।

ভারতী বলিল, কখ্‌খনো না। সারাদিন ইস্কুলে ছেয়েমেয়ে পড়িয়ে, ঘরে ফিরে আবার সমিতির সেক্রেটারির কাজে অসংখ্য চিঠিপত্র লিখে, বিছানায় শুতে-না-শুতেই ত ঘুমিয়ে পড়ি,—রাগ করবার সময় কোথায় আমার?

অপূর্ব্ব কহিল, ওঃ—রাগ করবারও সময়টুকু নেই!

ভারতী বলিল, কই আর আছে? আপনি বরঞ্চ কোন দিন সকাল থেকে এসে দেখ্‌বেন সত্যি না মিছে।

অপূর্ব্বর মুখ দিয়া অলক্ষিতে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। কহিল, দেখবার আমার দরকারি কি! একটুখানি থামিয়া কহিল, ইস্কুলে আপনাকে কত মাইনে দেয়?

ভারতী হাসি চাপিয়া গম্ভীর হইয়া বলিল, বেশ ত আপনি! মাইনের কথা বুঝি কাউকে জিজ্ঞাসা করতে আছে? এতে তার অপমান হয় না?

অপূর্ব্ব ক্ষুণ্ণকণ্ঠে কহিল, অপমান করবার জন্যে ত আর বলিনি। চাকরিই যখন করছেন—

ভারতী কহিল, না করে কি শুকিয়ে মরতে বলেন?

DOUBLE COLOUR PALE

অপূর্ব্ব কুল দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তিনি কোথায় থাকেন জানেন?

সে কহিল, তা আর জানিনে! এই রাস্তায় সোজা গাঙের ধারে গিয়ে জিজ্ঞেসা করবেন নতুন ইস্কুল ঘর কোথায়,—কচি ছেলেটা পর্য্যন্ত দেখিয়ে দেবে। ডাক্তারবাবু থাকেন কি না! মানুষ ত নয়,—দেব্‌তা! মরা বাঁচাতে পারেন!—এই বলিয়া সে নিজের কাজে চলিয়া গেল। সেই পথে সোজা আসিয়া অপূর্ব্ব লাল রঙের একখানি কাঠের বাড়ী দেখিতে পাইল। বাড়ীটি দ্বিতল, একেবারে নদীর উ[illegible] রাত্রি হইয়াছে, পথে লোক নাই—উপরের খোলা জানালা হইতে আলো আসিতেছে,—কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিবার জন্য সে সেইখানে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কিন্তু মনের মধ্যে তাহার সন্দেহ রহিল না যে এই খানেই ভারতী থাকে, এবং ওই জানালাতেই তাহার দেখা মিলিবে।

মিনিট পনেরো পরে জন দুই তিন লোক বাহির হইয়া তাহাকে দে[illegible] যেন চকিত হইয়া উঠিল। একজন প্রশ্ন করিল, কে? কা'[illegible]?

তাহার সন্দিগ্ধ কণ্ঠস্বরে অপূর্ব্ব সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, মিস্ জোসেফ বলে কোন স্ত্রীলোক থাকেন এখানে?

সে তৎক্ষণাৎ বলিল, থাকেন বই কি—আসুন।

অপূর্ব্বর ঠিক যাবার সঙ্কল্প ছিল না, কিন্তু দ্বিধা করিতেই লোকটি কহিল, আপনি কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন? কিন্তু তিনি ত ঘরেই আছেন,—আসুন। আমরা আপনাকে নিয়ে যাচ্চি, এই বলিয়া সে অগ্রসর হইল।

তাহার ত্বরা দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা গেল ইহারা তাহাকে যাচাই করিয়া লইতে চায়। অতএব দ্বার হইতে এখন না বলিয়া ফিরিতে চাহিলে সন্দেহ ইহাদের এম্‌নিই বিশ্রী হইয়া উঠিবে যে তাহা ভাবিতেই পারিল না। তাই চলুন, বলিয়া সে লোকটির অনুসরণ করিয়া এক মুহূর্ত্ত পরেই এই কাঠের বাড়ীর নিচেকার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহারই এক পাশ দিয়া উপরে উঠিবার সিঁড়ি। ঘরটি হলের মত প্রশস্ত। ছাদ হইতে ঝুলানো একটা মস্ত আলো, গোটা কয়েক টেবিল চেয়ার, একটা কালো বোর্ড এবং সমস্ত দেয়াল জুড়িয়া নানা আকারের ও নানা রঙের ম্যাপ টাঙানো। ইহাই যে নূতন স্কুলঘর অপূর্ব্ব তাহা দেখিয়াই চিনিল। তথায় চার পাঁচ জন স্ত্রীলোক ও পুরুষে মিলিয়া বোধ হয় একটা তর্কই করিতেছিল, সহসা একজন অপরিচিত লোককে প্রবেশ করিতে দেখিয়া চুপ করিল। অপূর্ব্ব একবার মাত্র তাহাদের প্রতি কটাক্ষে চাহিয়া যে তাহাকে আনিয়াছিল তাহারই পিছনে পিছনে উপরে উঠিয়া গেল। ভারতী ঘরেই ছিল, অপূর্ব্বকে দেখিয়া তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, কাছে আসিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া চেয়ারে বসাইয়া কহিল, এতদিন আমার খোঁজ নেন্‌নি যে বড়?

অপূর্ব্ব বলিল, আপনিও ত আমাদের খোঁজ নেন্‌নি! কিন্তু কথাটা যে জবাব হিসাবে ঠিক

হইল না তাহা সে বলিয়াই বুঝিল। ভারতী শুধু একটু হাসিল, কহিল, তেওয়ারী বাড়ী যেতে চাচ্চে থাক। না গেলে সে সারবে না।

অপূর্ব্ব কহিল, অর্থাৎ আপনি যে আমাদের খবর নেননা এ অভিযোগ সত্য নয়।

ভারতী পুনশ্চ একটু হাসিয়া কহিল, কাল রবিবার, কাল কিছু আর হবে না, কিন্তু পরশু বারোটার মধ্যেই কোর্টে গিয়ে টাকা আর জিনিসগুলো আপনার ফিরিয়ে আন্‌বেন। একটু দেখে [illegible]

আপনার কিন্তু একটা সই চাই।

তা জানি।

অপূর্ব্ব প্রশ্ন করিল, আপনার সঙ্গে তেওয়ারীর বোধ হয় দেখা হয়, না?

ভারতী [illegible] কিন্তু আপনি যেন গিয়ে তার ওপর মিছে রাগ করবেন না।

অপূর্ব্ব কহিল, মিছে না হোক, সত্যি রাগ করা উচিত। আপনি তার প্রাণ দিয়েছেন এটুকু কৃতজ্ঞতা তার থাকা উচিত ছিল।

ভারতী [illegible], নিশ্চয়ই আছে। নইলে, সে তো আমাকে জেলে পাঠাবার একবার অন্ততঃ চেষ্টা করেও দেখ্‌তো।

অপূর্ব্ব এ ইঙ্গিত বুঝিল। আনতমুখে ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে বলিল, আপনি আমার উপর ভয়ানক রাগ করে আছেন।

ভারতী বলিল, কখ্‌খনো না। সারাদিন ইস্কুলে ছেয়েমেয়ে পড়িয়ে, ঘরে ফিরে আবার সমিতির সেক্রেটারির কাজে অসংখ্য চিঠিপত্র লিখে, বিছানায় শুতে-না-শুতেই ত ঘুমিয়ে পড়ি,—রাগ করবার সময় কোথায় আমার?

অপূর্ব্ব কহিল, ওঃ—রাগ করবারও সময়টুকু নেই!

ভারতী বলিল, কই আর আছে? আপনি বরঞ্চ কোন দিন সকাল থেকে এসে দেখ্‌বেন সত্যি না মিছে!

অপূর্ব্বর মুখ দিয়া অলক্ষিতে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। কহিল, দেখবার আমার দরকার কি! একটুখানি থামিয়া কহিল, ইস্কুলে আপনাকে কত মাইনে দেয়?

ভারতী হাসি চাপিয়া গম্ভীর হইয়া বলিল, বেশ ত আপনি! মাইনের কথা বুঝি কাউকে জিজ্ঞাসা করতে আছে? এতে তার অপমান হয় না?

অপূর্ব্ব ক্ষুণ্ণকণ্ঠে কহিল, অপমান করবার জন্যে ত আর বলিনি। চাক্‌রিই যখন করছেন—

ভারতী কহিল, না করে কি শুকিয়ে মরতে বলেন?

DOUBLE COLOUR PAGE

অপূর্ব্ব বলিল, এ যা চাক্‌রি, এই ত শুকিয়ে মরা। তার চেয়ে বরঞ্চ আমাদের আফিসে একটা চাকরি আছে, মাইনে একশ' টাকা,—হয়ত দু'এক ঘণ্টার বেশি খাট্‌তেও হবে না।

ভারতী প্রশ্ন করিল, আমাকে সেই চাক্‌রি করতে বলেন ?

অপূর্ব্ব কহিল, দোষই বা কি ?

ভারতী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না, আমি কোরব না। আপনি ত তার কর্ত্তা, কাজে ভুলচুক হলেই লাঠি হাতে দরজায়।

অপূর্ব্ব জবাব দিল না। সে মনে মনে বুঝিল ভারতী শুধু পরিহাস করিয়াছে, তথা তাহার সেই একটা দিনের আচরণের ইঙ্গিত করায় তাহার গা জ্বলিয়া গেল। কিছুক্ষণ হইতে একটা তর্ক-বিতর্কের কলরোল নীচে হইতে শুনা যাইতেছিল [illegible] উদ্দাম হইয়া [illegible] অপূর্ব্ব ভালমানুষটির মত জিজ্ঞাসা করিল, [illegible] বোস্‌লো [illegible] ছেলের পড়ায় মন দিয়েছে।

ভারতী গম্ভীরমুখে কহিল, তা'হলে হাঁকা-হাঁকিটা কিছু কম হতো। তাদের শিক্ষকের বোধকরি বিষয় নির্ব্বাচনে মন দিয়েছেন।

আপনি যাবেন না ?

যাওয়া ত উচিত, কিন্তু আপনাকে ছেড়ে যেতে যে মন সরেনা। এই বলিয়া [illegible] টিপিয়া হাসিল। কিন্তু অপূর্ব্বর কান পর্য্যন্ত রাঙা হইয়া উঠিল। সে আর একদিকে চোখ ফিরাইয়া পাশের দেয়ালের গায়ে সাজানো কাঁচা ঝাউপাতা দিয়া লেখা কয়েকটা অক্ষরের প্রতি সহসা দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়া উঠিল, ওটা কি লেখা ওখানে ?

ভারতী কহিল, পড়ুন না।

অপূর্ব্ব ক্ষণকাল মনঃসংযোগ করিয়া বলিল, পথের দাবী। তার মানে ?

ভারতী কহিল, ওই আমাদের সমিতির নাম, ওই আমাদের মন্ত্র, ওই আমাদের সাধনা আপনি আমাদের সভ্য হবেন ?

অপূর্ব্ব বলিল, আপনি নিজে একজন সভ্য নিশ্চয়ই, কিন্তু কি আমাদের করতে হবে ?

ভারতী বলিল, আমরা সবাই পথিক। মানুষের মনুষ্যত্বের পথে চল্‌বার সর্ব্বপ্রকার দাবী অঙ্গীকার করে আমরা সকল বাঁধা ভেঙে-চুরে চল্‌বো। আমাদের পরে যারা আস্‌বে তারা নিরুপদ্রবে হাঁট্‌তে পারে, তাদের অবাধ মুক্ত গতিকে কেউ যেন না রোধ কর্‌তে পারে এই আমাদের পণ। আস্‌বেন আমাদের দলে ?

অপূর্ব্ব কহিল, আমরা পরাধীন জাতি, ইংরেজ নই, ফরাসি নই, আমেরিকান নই,—কোথা পাবো আমরা অপ্রতিহত গতি ? ষ্টেশনের একটা বেঞ্চে বসবার আমাদের অধিকার নেই, অপমান হয়ে নালিশ করবার পথ নেই,—বলিতে বলিতে সেদিনের সমস্ত লাঞ্ছনা,—ফিরিঙ্গি ছোঁড়াদের

আঘাত হইতে ষ্টেশন মাষ্টারের বাহির করিয়া দেওয়া অবধি সকল অপমান—কষ্ট অনুভব করিয়া তাহার দুই চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, কহিল, আমরা বস্‌লে বেঞ্চ অপবিত্র হয়, আমরা গেলে ঘরের হাওয়া কলুষিত হয়,—আমরা যেন মানুষ নই! আমাদের যেন মানুষের প্রাণ, মানুষের রক্ত মাংস গায়ে নেই! এই যদি আপনাদের সাধনা হয়, আছি আমি আপনাদের দলে।

ভারতী কহিল, আপনি কি মানুষের জ্বালা টের পান অপূর্ব্ব বাবু ? সত্যই কি মানুষের ছোঁয়ায় মানুষের আপত্তি করবার কিছু নেই, তার গায়ে বাতাসে আর একজনের ঘরের বাতাস অপবিত্র হয়ে ওঠে না ?

অপূর্ব্ব তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, নিশ্চয় নহে। মানুষের চাম্‌ড়ার রঙ্‌ ত তার মনুষ্যত্বের মাপকাঠি নয়। কোন একটা বিশেষ দেশে জন্মানই ত তার অপরাধ হতে পারে না ? মাপ কর্‌বেন আপনি, কিন্তু [illegible] সাহেব কৃশ্চান বলেইত শুধু আদালতে আমার কুড়ি টাকা দণ্ড হয়েছিল! ধর্ম্মমত ভিন্ন হলেই কি [illegible] হবে, এ কোথাকার বিচার! এই বল্‌চি আপনাকে আমি, এর জন্যেই এরা একদিন মর্‌বে। এই যে মানুষকে অকারণে ছোট করে দেখা, এই যে ঘৃণা, এই যে বিদ্বেষ, এ অপরাধ ভগবান কখ্‌খনো ক্ষমা কর্‌বেন না!

বেদনা ও লাঞ্ছনার মত মানুষের সত্যবস্তুটিকে টানিয়া বাহিরে আনিতে ত দ্বিতীয় পদার্থ নাই, তাই সে সমস্ত ভুলিয়া অপমানকারীর বিরুদ্ধে অপমানিতের, পীড়কের বিরুদ্ধে পীড়িতের মর্ম্মান্তিক অভিযোগে সহস্রমুখ হইয়া উঠিয়াছিল। ভারতী তাহার দৃপ্ত মুখের প্রতি চাহিয়া এতক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়াছিল, কিন্তু কথা তাহার শেষ হইতেই সে শুধু একটু মুচকিয়া হাসিয়া মুখ ফিরাইল। অপূর্ব্ব চমকিয়া উঠিল, তাহার মুখের উপর কে যেন সজোরে মারিল। ভারতীর কোন প্রশ্নই এতক্ষণ সে খেয়াল করে নাই, কিন্তু সেগুলি অগ্নিরেখার মত তাহার মাথার মধ্যে দিয়া সশব্দে খেলিয়া গিয়া তাহাকে একেবারে বাক্যহীন করিয়া দিল।

মিনিটখানেক পরে ভারতী পুনরায় যখন মুখ ফিরাইয়া চাহিল, তখন তাহার ওষ্ঠাধরে হাসির চিহ্ন মাত্র ছিল না, কহিল, আজ শনিবারে আমাদের ইস্কুল বন্ধ, কিন্তু সমিতির কাজ হয়। চলুন না, নিচে গিয়ে আপনাকে ডাক্তারের সঙ্গে পরিচিত করে দিয়ে পথের দাবীর সভ্য করে নিই।

তিনি বুঝি সভাপতি ?

সভাপতি ? না, তিনি আমাদের মূল শিকড়। মাটির তলায় থাকেন, তাঁর কাজ চোখে দেখা যায় না।

শিকড়ের প্রতি অপূর্ব্বর কিছুমাত্র কৌতূহল জন্মিল না। জিজ্ঞাসা করিল, আপনাদের সভ্যরা বোধহয় সকলেই কৃশ্চান ?

ভারতী কহিল, না, আমি ছাড়া সকলেই হিন্দু।

অপূর্ব্ব আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, কিন্তু মেয়েদের গলা পাচ্চি যে ?

ভারতী কহিল, তাঁরাও হিন্দু।

অপূর্ব্ব মুহূর্ত্তকাল দ্বিধা করিয়া বলিল, কিন্তু তাঁরা বোধকরি জাতি-ভেদ, অর্থাৎ কিনা, খাওয়া ছোঁয়ার বিচার বোধকরি করেন না?

ভারতী বলিল, না। তারপরে হাসিমুখে কহিল, কিন্তু কেউ যদি মেনে চলেন, তাঁর মুখের আমরা কেউ খাবার জিনিস জোর করে দিই নে। সাধুর ব্যক্তিগত প্রকৃতিকে আমরা অত্যন্ত সম্মান করে চলি। আপনার ভয় নেই।

অপূর্ব্ব বলিল, ভয় আবার কিসের? কিন্তু,—আচ্ছা, আপনার মত শিক্ষিতা মহিলাও কি আপনাদের দলে আছেন?

আমার মত? এই বলিয়া সে হাসিয়া ফেলিল, আমাদের দেশে অমন কত শিক্ষিতা মহিলা তিনি একলা পৃথিবী ঘুরে এসেছেন,—শুধু ডাক্তার নয়, তিনি অমন কত বিদুষী মেয়ে এ দেশে কেউ নাই।

অপূর্ব্ব বিস্ময়াপন্ন হইয়া প্রশ্ন করিল, আর ডাক্তার যাঁকে বলছেন, তিনি

ডাক্তার? শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে ভারতীর দুই চক্ষু যেন সজল হইয়া উঠিল, কহিল, তাঁর কথা থাক্ অপূর্ব্ব বাবু। পরিচয় দিতে গেলেই হয়ত তাঁকে ছোট করে ফেলবো।

অপূর্ব্ব আর কোন প্রশ্ন না করিয়া চুপ করিয়া রহিল। দেশের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসার তাহার রক্তের মধ্যে—এই দিক দিয়া পথের দাবীর বিচিত্র নামটা তাহাকে টানিতে লাগিল। সঙ্গীহীন, বন্ধুহীন বিদেশে এতগুলি অসাধারণ শিক্ষিত নর-নারীর আশা ও আকাঙ্ক্ষা, চেষ্টা উদ্যম, তাহাদের ইতিহাস, তাহাদের রহস্যময় কর্ম্মজীবনের অপরিজ্ঞাত পদ্ধতি ওই যে নামটাকে জড়াইয়া উঠিতে চাহিতেছে তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ মিলনের লোভ সম্বরণ করা কঠিন, তবুও কেমন যেন একপ্রকার বিজাতীয়, ধর্ম্মবিহীন, অস্বাস্থ্যকর বাষ্প নিচে হইতে উঠিয়া তার মনটাকে ধীরে ধীরে গ্লানিতে ভরিয়া আনিতে লাগিল।

কলরব বাড়িয়া উঠিতেই ছিল, ভারতী কহিল, চলুন যাই!

অপূর্ব্ব সায় দিয়া বলিল, চলুন—

উভয়ে নিচে আসিলে ভারতী তাহাকে একটা বেতের সোফায় বসিতে দিয়া স্থানাভাবে তার পার্শ্বেই উপবেশন করিল।

এই আসনটা এমন সঙ্কীর্ণ যে এত লোকের সম্মুখে ভদ্রতা রক্ষা করিয়া দুজনের বসা চলে এরূপ অদ্ভুত আচরণ ভারতী কোনদিন করে নাই, অপূর্ব্ব শুধু সঙ্কোচ নয়, অত্যন্ত লজ্জা করিতে লাগিল, কিন্তু, এখানে এই সকল ব্যাপারে ভ্রূক্ষেপ করিবারও যেন কাহারও অবসর সে আর একটা বস্তু লক্ষ্য করিল যে, তাহার মত অপরিচিত ব্যক্তিকে আসন গ্রহণ করিতে প্রায় সকলেই চাহিয়া দেখিল, কিন্তু যে বিতণ্ডা উদ্দামবেগে বহিতেছিল তাহাতে লেশমাত্র বাধা

না। কেবল, একটি স্ত্রী লোক যে পিছন ফিরিয়া কোনের টেবিলে বসিয়া লিখিতেছিল সে লিখিতেই রহিল, তাহার আগমন বোধহয় জানিতেই পারিল না। অপূর্ব্ব গণিয়া দেখিল ছয়জন মহিলা এবং আটজন পুরুষে মিলিয়া এই ভীষণ আলোচনা চলিতেছে। ইহাদের সকলেই অচেনা, কেবল একটা ব্যক্তিকে অপূর্ব্ব চকের পলকে চিনিতে পারিল। বেশভূষার কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু এই মূর্ত্তিকেই সে কিছুকাল পূর্ব্বে নিকতিলা রেলওয়ে ষ্টেশনে টিকিট না কেনার দায় হইতে পুলিশের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল, এবং টাকাটা যতশীঘ্র সম্ভব ফিরাইয়া দিতে যিনি একরূপ প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন সে লোকটি চাহিয়া দেখিল, কিন্তু মদের নেশায় যাহার কাছে হাত পাতিয়া উপকার গ্রহণ করিয়াছিলেন মদ না-খাওয়া অবস্থায় তাহাকে স্মরণ করিতে পারিলেন না। কিন্তু ইহার জন্য নয়, ভারতীকে মনে করিয়া তাহার বুকে এই কথাটা অতিশয় বাজিল যে এরূপ সংসর্গে সে আসিয়া পড়িল কিরূপে?

সুমুখে যে একটা কাগজ ছড়ানো ছিল, বসিয়া পড়িতেই অপূর্ব্বর কানের কাছে মুখ আনিয়া ভারতী চুপি চুপি কহিল, উনিই আমাদের প্রেসিডেণ্ট, সুমিত্রা।

বলিবার প্রয়োজন ছিল না। অপূর্ব্ব দেখিয়াই চিনিল। কারণ, নারীকে দিয়াই যদি কোন সমিতি পরিচালিত হইতে দেখা, এই ত সেই বটে! বয়স বোধকরি ত্রিশের কাছে পৌঁছিয়াছে, কিন্তু সেদিন রাত্রি রাণী ; সোনা সোণার মত, দাক্ষিণাত্যের ধরণে এলো করিয়া মাথার চুল বাঁধা, হাতে গাছ কয়েক বালা সোণার চুড়ি, ঘাড়ের কাছে সোণার হারের কিয়দংশ চিক্ চিক্ করিতেছে, কানে সবুজ পাথরের তৈরী দুলের উপর আলো পড়িয়া যেন সাপের চোখের মত জ্বলিতেছে,—এই ত চাই!—ললাট, চিবুক, নাক, চোখ, ভ্রু, ওষ্ঠাধর,—কোথাও যেন আর খুঁত নাই,—একি ভয়ানক আশ্চর্য্য রূপ! কালো বোর্ডের গায়ে একটা হাত রাখিয়া তিনি দাঁড়াইয়াছিলেন, অপূর্ব্বর চোখে আর পলক পড়িল না। সে আঁক কষিয়াই মানুষ হইয়াছে, কাব্যের সহিত পরিচয় তাহার অত্যন্ত বিরল, কিন্তু, কাব্য যাঁহারা লেখেন কেন যে তাহারা এত কিছু থাকিতে তরুণ লতিকার সঙ্গেই নারীদেহের তুলনা করেন তাহার জানিবার আর কিছু রহিল না। সম্মুখে একটি বিশ বাইশ বছরের সাধারণ গোছের মহিলা আনতমুখে বসিয়াছিলেন, ভাবে বোধহয়, তাঁহাকেই কেন্দ্র করিয়া এই তর্কের ঝড় উঠিয়াছে। আবার তাঁহারই অনভিদূরে বসিয়া প্রৌঢ় গোছের একজন ভদ্রলোক। তাঁহার পরণের কাটছাঁট পরিশুদ্ধ বিলাতি পোষাক দেখিয়া অবস্থাপন্ন বলিয়াই মনে হয়। খুব সম্ভব তিনিই প্রতিপক্ষ, কি বলিতেছিলেন অপূর্ব্ব ভাল শুনিতেও পায় নাই, মনোযোগও করে নাই, তাহার সমস্ত চিত্ত সুমিত্রার প্রতিই একেবারে একাগ্র হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার কণ্ঠস্বরে কি জানি কোন্ পরম বিস্ময় ঝরিয়া পড়িবে এই ছিল তাহার আশা। অনতিকাল পূর্ব্বের ক্ষোভের হেতু তাহার মনেও ছিল না। সাহেবি পোষাক-পরা ভদ্রলোকটির প্রত্যুত্তরে এইবার তিনি কথা কহিলেন। এইত! নারীর কণ্ঠস্বর ত একেই বলে! ইহার কণাটুকুও না বাদ যায়, অপূর্ব্ব এম্‌নি

ক্ষণিকাই কান পাতিয়া রহিল। সুমিত্রা কহিলেন, মনোহর বাবু, আপনি ছেলে মানুষ উকিল আপনার তর্ক অসংলগ্ন হয়ে পড়লে ত মীমাংসা করতে পারব না।

মনোহর বাবু উত্তর দিলেন, অসংলগ্ন তর্ক করা আমার পেশাও নয়।

সুমিত্রা হাসিমুখে কহিলেন, তাই ত আশা করি। বেশ, বক্তব্য আপনার ছোট ক আনলে এইরূপ দাঁড়ায়। আপনি নবতারার স্বামীর বন্ধু। তিনি জোর করে তাঁকে নিয়ে যেতে চান, কিন্তু স্ত্রী স্বামীর ঘর করতে চান্ না, দেশের কাজ করতে চান, এতে কিছু ত দেখিনে।

মনোহর বলিলেন, কিন্তু স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্ত্তব্য আছে ত? দেশের কাজ কোরব বল ত তার উত্তর হয় না।

সুমিত্রা কহিলেন, দেখুন মনোহর বাবু, নবতারা কোন্ কাজ ক বেন, না করবেন, সে তাঁর উপর, কিন্তু তাঁর স্বামীরও স্ত্রীর প্রতি যে কর্ত্তব্য ছিল, তিনি তা কোনদিন পালন নি এ আপনারা সবাই জানেন! কর্ত্তব্য ত কেবল একদিকে নয়।

মনোহর রাগিয়া কহিলেন, কিন্তু তাই বলে স্ত্রীকেও যে অসতী হয়ে যেতে হবে সে কোন যুক্তি হতে পারে না! এই বয়সে এই দলের মধ্যে থেকেও উনি সতীত্ব বজায় রেখে যে সেবা করতে পারবেন এ ত কোনমতেই জোর করে বলা চলেনা!

সুমিত্রার মুখ ঈষৎ আরক্ত হইয়াই তখনি সহজ হইয়া গেল, বলিলেন, জোর ক বলাও উচিত নয়। কিন্তু আমরা দেখচি নবতারার হৃদয় আছে, প্রাণ আছে, সাহস আছে, সবচেয়ে যা বড় সেই ধর্ম্মজ্ঞান আছে। দেশের সেবা করতে এইটুকুই আমরা যথেষ্ট জ্ঞান ক তবে, আপনি যাকে সতীত্ব বল্‌ছেন, সে বজায় রাখবার ওঁর সুবিধে হবে কিনা সে উনিই জানেন।

মনোহর নবতারার আনত মুখের প্রতি একবার কটাক্ষে চাহিয়া বিদ্রূপ করিয়া উঠিলেন, খাসা ধর্ম্মজ্ঞান ত! দেশের কাজে এই শিক্ষাই বোধ হয় উনি দেশের মেয়ে দিয়ে বেড়াবেন?

সুমিত্রা বলিলেন, ওঁর দায়িত্ব-বোধের প্রতি আমাদের বিশ্বাস আছে। ব্যক্তি বিশে চরিত্র আলোচনা করা আমাদের নিয়ম নয়, কিন্তু যে-স্বামীকে উনি ভালবাসতে পারেন নি, একটা বড় কাজের জন্য যাঁকে ত্যাগ করে আসা উনি অন্যায় মনে করেননি, সেই শিক্ষাই দেশের মেয়েদের উনি দিতে চান ত আমরা আপত্তি কোরব না।

মনোহর কহিলেন, আমাদের এই সীতা-সাবিত্রীর দেশে এম্‌নি শিক্ষা উনি গৃহস্থ মেয়ে দেবেন?

সুমিত্রা সায় দিয়া বলিলেন, দেওয়া ত উচিত। মেয়েদের কাছে শুধু অর্থহীন উচ্চারণ না করে নবতারা যদি বলেন যে, এই দেশে একদিন সীতা আত্মসম্মান রাখ্‌তে স্বামী করে পাতালে গিয়েছিলেন, এবং রাজকন্যা সাবিত্রী দরিদ্র সত্যবানকে বিবাহের পূর্বে ভালবেসেছিলেন যে অত্যন্ত স্বল্পায়ু জেনেও তাঁকে বিবাহ করতে তাঁর বাধেনি, এবং তিনি যে দুর্বৃত্ত স্বামীকে ভালবাসতে পারেননি তাকে পরিত্যাগ করে এসেছেন, অতএব, আমার অবস্থায় তোমরাও তাই কোরো,—এ শিক্ষায় ত দেশের মেয়েদের ভালই হবে মনোহর বাবু।

মনোহরের ক্রোধে কাঁপিতে লাগিল, প্রথমটা ত তাঁহার মুখ দিয়া কথাই বাহির হইল না, তার পরে বলিয়া উঠিলেন, তা'হলে দেশ উচ্ছন্ন যাবে। হঠাৎ হাত জোড় করিয়া কহিলেন, সেই আপনাদের নিজেরা যা' ইচ্ছে করুন, কিন্তু অপরকে এ শিক্ষা দেবেন না। ইউরোপের অসভ্যতা আমদানি করে যথেষ্ট ক্ষতি হয়েচে, কিন্তু মেয়েদের মধ্যে তার প্রচার করে সমস্ত ভারতবর্ষটাকে আর রসাতলে পাঠাবেন না।

সুমিত্রার মুখের উপর বিরক্তি ও ক্লান্তি যেন একই সঙ্গে ফুটিয়া উঠিল, কহিলেন, রসাতল [illegible] ২৬শোপীয় সভ্যতা সম্বন্ধে আপনার বিশেষ কোন জ্ঞান নেই, সুতরাং, এ নিয়ে তর্ক করলে শুধু সময় নষ্ট হবে। অনেক সময় গেছে,— আমাদের অন্য কাজ আছে।

মনোহর বাবু যথাসাধ্য ক্রোধ দমন করিয়া কহিলেন, সময় আমারও অপর্য্যাপ্ত নয়। নবতারা [illegible]

নবতারা এক্ষণ [illegible] তুলিয়াও চাহে নাই, সে মাথা নাড়িয়া জানাইল, না।

মনোহর সুমিত্রাকে [illegible] করিলেন, এর দায়িত্ব তা'হলে আপনারাই নিলেন?

নবতারার হইয়া জবাব দিল, কহিল, আমার দায়িত্ব আমিই নিতে পারবো, আপনি চিন্তিত হবেন না।

মনোহর বক্রদৃষ্টিতে তাহার প্রতি চাহিয়া সুমিত্রাকেই পুনশ্চ প্রশ্ন করিলেন, কহিলেন, আপনাকেই জিজ্ঞাসা করি স্বামীগৃহে বিবাহিত জীবনের চেয়ে গৌরবের বস্তু নারীর আর কিছু আছে আপনি বল্‌তে পারেন?

সুমিত্রা কহিলেন, অপরের যাই হোক, অন্ততঃ, নবতারার স্বামী-গৃহে তার বিবাহিত জীবনকে আমি গৌরবের জীবন বল্‌তে পারিনে।

এই উত্তরের পরে মনোহর আর আত্ম-সম্বরণ করিতে পারিলেন না। অত্যন্ত কটুকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু এইবার ঘরের বাইরে তার অসতী জীবনটাকে বোধ করি গৌরবের জীবন বল্‌তে পারবেন?

কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, এত বড় কদর্য্য বিদ্রূপেও কাহারও মুখে কোনরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইল না। সুমিত্রা শান্তস্বরে বলিলেন, মনোহর বাবু, আমাদের সমিতির মধ্যে সংযতভাবে কথা বলা নিয়ম।

আর এ নিয়ম যদি না মান্‌তে পারি?

আপনাকে বার করে দেওয়া হবে।

মনোহর বাবু যেন ক্ষেপিয়া গেলেন। জ্যা-মুক্ত শরের ন্যায় সোজা দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিলেন, আচ্ছা চল্‌লুম! গুড্‌বাই! এই বলিয়া দ্বারের কাছে আসিয়া তাঁহার উন্মত্ত ক্রোধ যেন সহস্রধারে ফাটিয়া পড়িল। হাত পা ছুড়িয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, আমি সমস্ত খবর তোমাদের জানি। ইংরেজ রাজত্ব তোমরা ঘুচাবে? মনেও কোরোনা! আমি চাষা নই, আমি অ্যাড্‌ভোকেট্! কোথায় বিচার পেতে হয়, কোথায় তোমাদের হাতে শেকল পরাতে হয় ভাল রকম জানি! আচ্ছা,—এই বলিয়া তিনি অন্ধকারে দ্রুতবেগে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

হঠাৎ কি যেন একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল। উত্তেজনা কেহই প্রকাশ করিল না, কি
সকলের মুখেই যেন কি এক প্রকার ছায়া পড়িল। কেবল যে লোকটা কোণে বসিয়া লিখিতেছি
সে একবার চোখ তুলিয়াও চাহিল না। অপূর্ব্বর মনে হইল এ সে সম্পূর্ণ বধির না হয়, একেবা
পাষাণের ন্যায় নিরাকুল, নির্ব্বিকার। ভারতীর মুখের দিকে চাহিল, কিন্তু সে
ইচ্ছা করিয়াই আর একদিকে ঘাড় ফিরাইয়া আছে। অপূর্ব্বর ব্যক্তিটি সেই লোক রাগের মাথায় এই
সমিতির বিরুদ্ধে যে সকল কথা বলিয়া গেলেন তাহা অত্যন্ত বিদ্রূপজনক। এতগুলি আশ্চর্য্য
নরনারী কোথা হইতে আসিয়াই বা এখানে জুটিয়া গেল, আর ওই যে লোকটি টিকিটের পরিবর্ত্তে এক
হঠাৎ ভারতীই বা কি করিয়া ইহাদের সন্ধান পাইল, আর ওই যে লোকটি টিকিটের পরিবর্ত্তে এক
অনায়াসে মদ কিনিয়া খাইয়া তাহারই চোখের সাম্নে দাঁড়াইয়াছিল,—আর সকলের বড় এ
নবতারা। স্বামী ত্যাগ করিয়া দেশের কাজ করিতে আসিয়াছে,—সতীত্ব সম্বন্ধে কথা তাহার
এখন যাহার সময় নাই,—অথচ এই লোকগুলা এতবড় অপরাধকে শুধু মার্জ্জনা নয়, প্রাণপণে
প্রশ্রয় দিতেছে! এবং যিনি ইঁহাদের কর্ত্রী, স্ত্রীলোক হইয়াও তিনি প্রকাশ্য সভায় এতগুলি পুরুষের
সমক্ষে সতীধর্ম্মের প্রতি তাঁহার একান্ত অবজ্ঞা অসঙ্কোচে প্রকাশ করিতে লজ্জা বোধ
করিলেন না।

কিছুক্ষণ অবধি সমস্ত ঘরটা নিস্তব্ধ হইয়া রহিল; বাহিরে অন্ধকার, অপ্রশস্ত রাজপথ
জনহীন নীরব, কেমন একপ্রকার উদ্বিগ্ন আশঙ্কায় অপূর্ব্বর মনের ভিতরটা যেন ভার হইয়া উঠিল

হঠাৎ সুমিত্রার কণ্ঠ ধ্বনিত হইয়া উঠিল, অপূর্ব্ব বাবু!

অপূর্ব্ব চকিত হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিল।

সুমিত্রা কহিলেন, আপনি আমাদের চেনেন না, কিন্তু, ভারতীর কাছ থেকে আমরা
আপনাকে চিনি। শুন্‌লাম আপনি আমাদের সমিতির মেম্বর হতে চান্। সত্য?

অপূর্ব্ব না বলিতে পারিল না, ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। যে লোকটি এক
লিখিতেছিল সুমিত্রা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, ডাক্তার, অপূর্ব্ব বাবুর নামটা লিখে নেবে
অপূর্ব্বকে হাসিয়া বলিলেন, আমাদের কোন রকম চাঁদা নেই,—টাকা কড়ি দিতে হয় না এই
আমাদের সমিতির বিশেষত্ব।

প্রত্যুত্তরে অপূর্ব্ব নিজেও একটু হাসিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। একটা
বাঁধানো খাতায় যথার্থই তাহার নাম লেখা হইয়া গেল দেখিয়া মনে মনে সে অস্বস্তিতে
উঠিল। এবং চুপ করিয়া থাকিতে আর না পারিয়া বলিয়া ফেলিল, কিন্তু কি উদ্দেশ্যে
আমাকে করতে হবে কিছুইত জানতে পারলাম না!

ভারতী অপনাকে জানান নি?

অপূর্ব্ব ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, কিছু জানিয়েছেন, কিন্তু একটা কথা আপনাকে
জিজ্ঞেসা করি, নবতারার আচরণ আপনারা কি সত্যই অন্যায় মনে করেন না?

সুমিত্রা কহিলেন, অন্ততঃ আমি করিনে। কারণ, দেশের বড় আমার কাছে কিছুই নেই।

অপূর্ব্ব শ্রদ্ধাভরে কহিল, দেশকে আমিও প্রাণ দিয়ে ভালবাসি। এবং দেশের
করবার অধিকার স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই সমান, কিন্তু এঁদের কর্ম্মক্ষেত্র ত এক নয়; আমরা

বাইরে এসে কাজ করব, কিন্তু নারী গৃহের মধ্যে, শুদ্ধান্তঃপুরে স্বামী পুত্রের সেবার মধ্যে দিয়েই
সার্থক হবেন। তাঁদের সত্যকার কল্যাণে দেশের যত বড় কাজ হবে বাইরে এসে পুরুষের সঙ্গে
ভিড় করে দাঁড়ালে ত সে কাজ কিছুতেই হবেনা।

সুমিত্রা হাসিলেন। অপূর্ব্ব লক্ষ্য করিয়া দেখিল সকলেই যেন তাঁহার প্রতি চাহিয়া মুখ
টিপিয়া হাসি গোপন করিল। সুমিত্রা কহিলেন, অপূর্ব্ব বাবু, এটা অনেক দিনের এবং অনেকের
মুখের কথা তা আমরা অস্বীকার করিনে। কিন্তু আপনি ত জানেন কোন একটা কথা কেবলমাত্র
বহুদিন ধরে বহু লোকে বলতে থাকলেই তা সত্য হয়ে ওঠেনা। এ ফাঁকির কথা। যারা
বলে দিন দেশের কাজ করেন এ তাদের কথা, দেশের চেয়ে নিজের স্বার্থ যাদের ঢের বড় এ
তাদের কথা। এর মধ্যে এতটুকু সত্য নেই। আপনি নিজে যখন কাজে লাগবেন, তখনই এই
সত্য হৃদয়ঙ্গম করবেন যে যাকে আপনি নারীর বাইরে এসে ভিড় করা বল্‌চেন সে যদি কখনো
ঘটে, তখনি দেশের কাজ হবে, নইলে কেবলমাত্র পুরুষের ভিড়ে শুক্‌নো বালির মত সমস্ত ঝরে
ঝরে পড়বে, কোনদিন জমাট বাঁধবে না।

অপূর্ব্ব মনে মনে লজ্জা পাইয়া কহিল, কিন্তু এতে কি দুর্নীতি বাড়বে না? চরিত্র কলুষিত
হবার ভয় থাকবে না?

সুমিত্রা বলিলেন, ভয় কি ভিতরেই কম থাকে নাকি? অপূর্ব্ব বাবু, ওটা বাইরে আসার
নয়, দোষ বিধাতার, যিনি নর-নারী সৃষ্টি করেছেন, তাদের মধ্যে অনুরাগের আকর্ষণ দিয়েছেন
তাঁর। অপূর্ব্ব বাবু, মনের মধ্যে একটুখানি বিনয় রেখে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের দিকে একবার
চেয়ে দেখুন দিকি?

এই মন্তব্য শুনিয়া অপূর্ব্ব খুসি হইতে পারিল না, বরঞ্চ, একটুখানি তীব্রতার সঙ্গেই বলিয়া
উঠিল, অন্য দেশের কথা অন্য দেশ ভাবুক, আমি আমাদের নিজেদের কল্যাণ চিন্তা করতে পারলেই
যথেষ্ট মনে কোরব। আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন, কিন্তু এখানে একটা বস্তু আমি লক্ষ্য না
করে পারিনি যে, বিবাহিত জীবনের প্রতি আপনাদের আস্থা নেই, এমন কি নারীত্বের যা' চরম
উৎকর্ষ, সেই সতীত্ব ও পতিব্রতা ধর্ম্মকেও আপনারা অবহেলায় চক্ষে দেখেন। এর থেকে আস্‌বে
দেশের কল্যাণ?

সুমিত্রা ক্ষণকাল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া সকৌতুক স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন, অপূর্ব্ব বাবু,
আপনি একটু রাগ করে বল্‌চেন, নইলে ঠিক ও-ভাব ত আমি প্রকাশ করিনি। তবে, আগা
গোড়াই যে আপনি ভুল বুঝেছেন তাও নয়। যে সমাজে কেবলমাত্র পুত্রার্থেই ভার্য্যা গ্রহণের
বিধি আছে নারী হয়ে তাকে ত আমি শ্রদ্ধার চোখে দেখ্‌তে পারিনে। আপনি সতীত্বের চরম
উৎকর্ষের বড়াই করছিলেন কিন্তু এই যে-দেশে বিবাহের ব্যবস্থা সে দেশে ও-বস্তু বড় হয় না, ছোটই
হয়। সতীত্ব ত শুধু দেহেই পর্য্যবসিত নয়, অপূর্ব্ব বাবু, মনেরও ত দরকার? কায়মনে
ভালবাসতে না পারলে ত ওর উচ্চস্তরে পৌঁছান যায় না? আপনি কি সত্যই মনে করেন মন্ত্র পড়ে
বিয়ে দিলেই যে-কোন বাঙ্গালী মেয়ে যে-কোন বাঙ্গালী পুরুষকে ভালবাসতে পারে? একি
পুকুরের জল যে, যে-কোন পাত্রে ঢেলে মুখ বন্ধ করে দিলেই কাজ চলে যাবে?

অপূর্ব্ব হঠাৎ কথা খুঁজিয়া না পাইয়া কহিল, কিন্তু চিরকাল চলেওত যাচ্চে?

সুমিত্রা তাহার কথা শুনিয়া হাসিয়া মাথা নাড়িয়া কহিলেন, তা যাচ্চে। প্রাণাধিক
স্বামী বলে পাঠ লিখ্‌তেও তার বাধেনা, কর্ত্তব্যবোধে শ্রদ্ধাভক্তি করতেও হয়ত তার

আট্‌কায়না। বস্তুতঃ, ঘর-কন্নার কাজে এর বেশি তার প্রয়োজনই হয়না। আপনি ত গল্প প
কোন্ এক ঋষি-পুত্রের দুধের বদলে চালের গুঁড়োর জল খেয়েই আরামে দিন কাটাতো।
আরাম যেমনই হোক্, যা নয় তাকে তাই বলে গর্ব্ব করা ত যায় না।

এই আলোচনা অপূর্ব্বর অত্যন্ত বিশ্রী ঠেকিল, কিন্তু এবারেও সে জবাব দিতে না পা
কহিল, আপনি কি বল্‌তে চান্ এর অধিক কারও ভাগ্যেই জোটেনা ?

সুমিত্রা কহিলেন, না, তা আমি বল্‌তেই পারিনে। কারণ, সংসারে দৈবাৎ বলেও এক
শব্দ আছে।

অপূর্ব্ব কহিল, ওঃ—দৈবাৎ! কিন্তু কথা যদি আপনার সত্যও হয়, তবুও আমি ব
সমাজের মঙ্গলের জন্য উত্তর পুরুষের কল্যাণের জন্য আমাদের এই-ই ভাল।

সুমিত্রা তেম্‌নি শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, না অপূর্ব্ব বাবু, সমাজ এবং আপনার উ
পুরুষ কোনটারই এতে শেষ পর্য্যন্ত কল্যাণ হবেনা। সমাজ ও বংশের নাম ক'রে ব্যক্তি
একদিন বলি দেওয়া হোতো, কিন্তু ফল তার ভাল হয়নি,—আজ তা' অচল। ভালবাসার
চেয়ে বড় প্রয়োজন উত্তর পুরুষের জন্য না হলে এমন ভয়ানক স্নেহের ব্যবস্থা তাঁর মাঝখানে
পেতনা। এই ব্যর্থ বিবাহিত জীবনের মোহ নারীকে কাটাতেই হবে। তাকে বুঝাতেই
এতে তার লজ্জাই আছে গৌরব নেই।

অপূর্ব্ব ব্যকুল হইয়া কহিল, কিন্তু ভেবে দেখুন আপনাদের এই সকল শিক্ষায়
সুনিয়ন্ত্রিত সমাজে অশান্তি এবং বিপ্লব এসেই উপস্থিত হবে।

সুমিত্রা বলিলেন, হলই বা। অশান্তি এবং বিপ্লব মানেই ত অকল্যাণ নয় অপূর্ব্ব
যে রুগ্ন, জীর্ণ, জরাগ্রস্ত সেই শুধু উৎকণ্ঠিত সতর্কতায় আপনাকে আগ্‌লে রাখ্‌তে চায়, কোন
দিয়ে না তার গায়ে ধাক্কা লাগে। অনুক্ষণ এই ভয়েই সে কাঁটা হয়ে থাকে এতটুকু নাড়াচা
তার প্রাণবায়ু চোখের পলকে বেরিয়ে যাবে। আর এম্‌নি অবস্থাই যদি সমাজের হয়ে
যাক্ না একটা হেস্ত-নেস্ত হয়ে। দু' দিন আগে পাছের জন্যে কি-ই বা এমন ক্ষতি হবে ?

এ কথার অপূর্ব্ব আর জবাব দিলনা, চুপ করিয়া রহিল। সুমিত্রা নিজেও ক্ষণকা
থাকিয়া কহিলেন, ঋষি-পুত্রের উপমা দিয়ে হয়ত আপনাকে আমি ব্যথা দিয়েছি। কি
যে আপনার পাওনা ছিল, তার থেকে আপনাকে আমি বাঁচাতামই বা কি করে ?

তাঁহার শেষের কথাটা অপূর্ব্ব বুঝিতে পারিলনা, কিন্তু বিরক্তির পাত্র তাহা
গিয়াছিল। তাই প্রত্যুত্তরে বলিয়া ফেলিল, জগন্নাথের পথে দাঁড়িয়ে কৃশ্চান মিশনারিরা
অনেক ব্যথা দেয়। তবুও সেই ঠুঁটো জগন্নাথকে ত্যাগকরে কেউ হাত-ওয়ালা খৃষ্টকেও
ঠুঁটো নিয়েই তাদের কাজ চলে যায়, এই আশ্চর্য্য !

সুমিত্রা রাগ করিলেননা, হাসিয়া বলিলেন, সংসারে আশ্চর্য্য আছে বলেই ত মানুষ
অসম্ভব হয়ে ওঠেনা অপূর্ব্ব বাবু! গাছের পাতার রঙ যে সবাই সবুজ দেখেনা এ তারা
না। তবু যে লোকে তাকে সবুজ বলে, সংসারে এই কি কম আশ্চর্য্য ! সতীত্বের
মূল্য জান্‌লে কি—

সুমিত্রা ? যে লোকটি নিঃশব্দে এতক্ষণ লিখিতেছিল সে উঠিয়া দাঁড়াইল। সকল
সঙ্গে দাঁড়াইয়া উঠিল।

অপূর্ব্ব দেখিল, গিরীশ মহাপাত্র।

ভারতী তাহার কানে কানে বলিল, উনিই আমাদের ডাক্তার। উঠে দাঁড়ান।

কলের পুতুলের মত অপূর্ব্ব উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু ক্রুদ্ধ মনোহরের শেষ কথা গুলা তাহার চক্ষের নিমিষে মনে পড়িয়া সমস্ত দেহের রক্ত যেন হিম হইয়া গেল।

গিরীশ কাছে আসিয়া কহিলেন, আমাকে বোধহয় আপনি ভুলে যান্‌নি ? আমাকে এঁরা সবাই ডাক্তার বলেন। এই বলিয়া তিনি হাসিলেন।

অপূর্ব্ব হাসিতে পারিলনা, কিন্তু আস্তে আস্তে বলিল, আমার কাকাবাবুর খাতায় কি একটা ভয়ানক নাম লেখা আছে—

গিরীশ সহসা তাহার হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া চুপিচুপি কহিলেন, সব্যসাচী, ত ? এই বলিয়া পুনশ্চ হাসিয়া বলিলেন, কিন্তু রাত হয়ে গেছে অপূর্ব্ব বাবু, চলুন, আপনাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি। পথটা তেমন ভাল হয়,—পাঠান ওয়ার্কমেন গুলোর মদ খেলে আর যেন জ্ঞান কারু থাকেনা। চলুন। এই বলিয়া যেন একপ্রকার জোর করিয়াই তাহাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া আনিলেন!

সুমিত্রাকে একটা নমস্কার করা হইলনা, ভারতীকে একটা কথা বলা হইলনা,—কিন্তু সবচেয়ে যে কথাটা তাহার বুকে ধাক্কা মারিল সে ওই বাঁধানো খাতাটা। তাহার নাম যাহাতে লেখা হইয়া রহিল।

ক্রমশঃ

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ভাদ্রে

ভারতের প্রদেশ বিভাগে—ইংরেজের নীতি ও আমাদের বুদ্ধি আয়তনে বড় হইলেও গোটা ভারতবর্ষ একটা দেশ; কোন একটি প্রদেশ অন্য প্রদেশের সঙ্গে সম্পূর্ণ গাঁথা না পড়িলে ভারতের স্থিতি অসম্ভব। এই অবস্থাটি সর্ব্বত্র স্বীকৃত মনে করিয়া প্রদেশ বিভাগের নীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

ইংরেজের একছত্র রাজত্বে শাসনের সুবিধার জন্য প্রদেশভাগ হইয়াছে; এ বিভাগে অনেক স্থলে ভাষা ভেদের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে, কিন্তু কোন প্রদেশ-ই যে একটি জাতিসংঘ বা race লইয়া নয়, তাহা আমরা অনেক সময় ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশের উপমা ধরিয়া ভুলিয়া যাই। এ ভুলে অনেক অনিষ্ট হইতেছে। এই ভুলের ফলেই বাঙ্গালীরা নানা প্রদেশে তাড়া খাইতেছে।

কংগ্রেসে যাঁহারা মিলনের কথা বলেন ও ভ্রাতৃভাব করেন, তাঁহারাও এক একটি প্রদেশের স্বার্থের কথা উঠিলে পরস্পরে রেসারেসি করেন ও তাড়াহুড়া জোড়েন। কাজেই কথাটির আশু বিচারের প্রয়োজন।

সকল প্রদেশেই লোকের ধর্ম্মের ভেদে হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি আছে, অহিন্দু ও অমুসলমান "আদিম অধিবাসী" আছে। ধর্ম্মের স্বার্থে বা জাতির স্বার্থে আমাদের প্রদেশগুলি সম্পূর্ণ বিভিন্ন নয়, রাষ্ট্রের বিচারে কে বাঙ্গালী, কে উড়িয়া, কে মরহট্টা, ইহার বিচার করা চলে কিনা, দেখিয়া লইতেছি। সুবিধার হিসাবে বাঙ্গালীকে ধরিয়া বিচার আরম্ভ করিয়া, প্রশ্ন করিতেছি—

আইন সঙ্গত বাঙ্গালী কে?—প্রশ্ন উত্থাপন করা গেল বাঙ্গালীত্বের বিচারে; কিন্তু উহাতেই কে উড়িয়া, কে মাদ্রাজী ইত্যাদি, তাহাও ধরা পড়িবে। ইউরোপের এক দেশের লোক যদি অন্য দেশের লোক হইয়া যাইতে চায়, তবে আইনের বিধান অনুসারে "দেশীকরণ" পদ্ধতিতে গবর্ণমেণ্টকে সে কাজ করিয়া লইতে হয়; আইনের এইরূপ বাঁধা বিধান অনুসারে একজন লে মেসরিয়ার ইংরেজ হইতে পারে। ভারতবর্ষের এক দেশের লোককে অপর প্রদেশের লোক করিবার জন্য এরূপ কোন domicile বিষয়ক আইন নাই এবং কোন দেশের লোক অপর প্রদেশে স্থাবর সম্পত্তি কিনিয়া বাস করিতে পারে, এবং তাহাকে কোন প্রকারের অধিকার লাভের জন্যই "সিটিজেনের" সার্টিফিকেট লইতে হয় না। এ দেশে এইরূপ সকলের পক্ষেই স্বাধীনভাবে যেখানে সেখানে বাস করিবার অধিকার আবহমানকাল চলিয়া আসিয়াছে; এমন ইউরোপীয় আইনের বিধান স্মরণ করিয়া এক প্রদেশের লোকে অন্য প্রদেশে বাসের যে domicile শব্দটি কেহ কেহ উচ্চারণ করেন বটে, কিন্তু আইন অনুসারে সে কোনরূপ নাই। ইণ্ডিয়ান সক্‌শেষন আইনের ডমিসাইলের বিধান ইউরোপীয়দের জন্য, ভারতবাসীর জন্য নয়।

মুসলমান আমলের আগে মরহট্টা জাতির নামে নামাঙ্কিত তথবা ওড্র জাতির নামে নামাঙ্কিত প্রদেশে যখন ব্রাহ্মণেরা বাস স্থাপন করিয়াছিলেন, তখন সে ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগকে মরহট্টা উড়িয়া বলিতেন না; বলিলে তাঁহাদের অপমান হইত। এখনও পুণা অঞ্চলে ব্রাহ্মণকে মরা বলিলে, তিনি চটেন; তিনি আপনাকে মরাঠা জাতি হইতে ভিন্ন বলিয়া পরিচয় দেন, কিন্তু তা সেই ব্রাহ্মণ মরহাট্টা প্রদেশের অধিবাসীর অধিকার হইতে বঞ্চিত হন না। ওড়িশার যে ব্রাহ্মণদের নাম শাসনি ব্রাহ্মণ, তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা উড়িশায় প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ওড় লোকদিগকে বর্ব্বর ও ভেড়া বলিতেন; প্রদেশের নামে নামকরণ না হইলেও একটি প্রদে যে সেই প্রদেশের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতেন না, তাহাই বলা গেল।

আমাদের বাঙ্গলার আদিম অধিবাসী পুণ্ড্র, জাতি, শুহ্ম জাতি, ও বঙ্গ জাতি, সম কোন স্তরে কিভাবে মিশিয়া গিয়াছে, তাহা আমাদের প্রদেশরূপ সাগরের কোন তরঙ্গে পড়ে না। এখন ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলেই বঙ্গের বাসিন্দা বলিয়া, বঙ্গজ বাঙ্গালী নামে পরিচিত।

এ বিচারে বুঝিতে পারি, আমাদের ভারতবর্ষের প্রদেশগুলি ইউরোপের জর্ম্মানি প্রভৃতির মত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেশ নয় এবং কখনও ছিল না। ইহাও দেখিতে পা যে, সামাজিকতায় ও ধর্ম্মে পরস্পরে আকাশ পাতাল প্রভেদ থাকিলেও যাঁহারা একটি প্র বাসীন্দা, তাঁহারাই সকলে মিলিয়া সেই প্রদেশের লোক। এই হিসাবে কাহাকে বা বাঙ্গালী, কাহাকে বা বলি উড়িয়া এবং কাহাকে বা বলি অন্য কিছু। এই নামে, খাঁটি বা Race বুঝায় না; কেবল নিবাস বুঝায়। এই "নিবাস" আবার ঠিক "কত দি হইলে তবে একজন লোক বাঙ্গালী বা উড়িয়া হইতে পারে না, তাহা কেহই আমাদিগকে রীতির নির্দ্দিষ্ট নজীর দিয়া বলিতে বা বুঝাইতে পারেন না।

একজন লোক বঙ্গের "নিবাসী" কিন্তু সে বাঙ্গলায় কথা কয় না; সে বাঙ্গালী ধরুন, কোন দুর্ব্বোধ্য রুচির ফলে আমাদের তেজচন্দ্র গড়গড়ি তাঁহার নামকরণ করি টেঁস্ গ্রেগরি, আর তিনি ও তাঁহার পরিবারের লোকেরা ইংরেজীতে কথা জুটাইয়া পারিলেও বাঙ্গলায় কথা না কহিয়া ফিরিঙ্গী ধরণে অতি অশুদ্ধ হিন্দী বলেন। এ

সংখ্যা অনেক আছে। কেহই বলে না ও বলিবেন না যে ইহারা বাঙ্গালী নয়। টেঁস্ গ্রেগরী ও বোনারজীর দল ছাড়িয়া নিছক ফিরিঙ্গীদের কথা বিচার করিলেও সকলকে স্বীকার করিতে হইবে যে, চাটগাঁয়ের ও প্রাচীন চূণা গলির ফিরিঙ্গীরা আত্মবিস্মৃত হইতে চাহিলেও, বাঙ্গালী। কাজেই নিক্তির ওজনে বিচার করিলে একজনকে বাঙ্গালী বা অবাঙ্গালী বলা চলে না। বংশ ধরিয়া, ধর্ম্ম ধরিয়া, সামাজিক রীতি ধরিয়া ও ভাষা ধরিয়া বাঙ্গালীত্বের দাবী স্থির হয় না; "নিবাস" ধরিলেও পুরামাত্রায় এই দাবী সাব্যস্ত হয় কি না, বিচার করিতেছি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কোন এ কটি বংশের লোক বঙ্গে কত দিন বাস করিলে বাঙ্গালী হইবেন তাহা কেহ আইনের ধারার মত একটা ধারা লিখিয়া বলিতে পারেন না; "বহু" হয় যখন একের আধিক্যে, তখন "বহুদিন" বলিলে কতগুলি এক জুড়িতে হইবে, তাহা ঠিক করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা।

সাহিত্যে বিখ্যাত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও বীরেশ্বর পাঁড়ে প্রভৃতির বংশের লোকেরা বঙ্গের বাহিরে বৈবাহিক সম্বন্ধ খুঁজিলে অবাঙ্গালী হইবেন না নিশ্চিত। যাহার রচিত যাত্রার পালার খাঁটী বাঙ্গলা গানে একদিন সারা দেশ মাতিয়াছিল, সে উৎপত্তিতে উড়িয়া হইলেও বাঙ্গলার নিবাসী ছিল! গোপলা উড়ে বাঙ্গালী কি না? দোবে, চোবে, পাঁড়ে নাম দেখিয়া অথবা বাসের সময় গণিয়া কিছু করা যায় না দেখিতেছি। এ সম্পর্কে অন্য রকমের দৃষ্টান্ত দিতেছি।

ধরুন, নারীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কোথাও এক ছটাক ভূমি ছিল না; তিনি বহু কুলীন ঘরের মেয়েকে বিবাহের মন্ত্রে উদ্ধার করিয়া শ্বশুর বাড়ীগুলিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেন অর্থাৎ তাঁহার একটা নিবাস ছিল না; তাঁহার পুত্র ধনবল্লভ চাটুজ্যে কাশীতে লেখা পড়া শিখিয়া লাহোরে চাকুরী করিতেন, এবং সে অঞ্চলে বাসের বাড়ী ও সম্পত্তি অর্জ্জিয়াছিলেন। চাকুরীর কর্ম্মক্ষেত্রে ঘুরিবার সময় দিল্লীতে তাঁহার পুত্র বিশ্বমোহনের জন্ম হয়। এই বিশ্বমোহন, মধ্য প্রদেশের নাগপুরে ওকালতী করিতেন ও সেখানে বাড়ী ঘর করিয়াছিলেন। ইঁহাদের পরিবারের সকলেই সমান মাত্রায় হিন্দী ও বাঙ্গলা কথা কহিতেন ও মহারাট্টারা বিশ্বমোহনকে বাঙ্গালী বাবু বলিত। বিশ্বমোহন জাতিভেদ মানিতেন না, এবং পাণ্টী ঘর খুঁজিয়া বঙ্গদেশে বিবাহ করিতে আসেন নাই। যদি বিশ্বমোহনকে জিজ্ঞাসা করা যাইত—"আজ্ঞা মহাশয়ের নিবাস?" তবে জন্ম ও বাসের হিসাবে তাঁহাকে কোন স্থানের নাম করা উচিত ছিল বলা কঠিন। সে যদি চট্টোপাধ্যায় বংশের নামে বাঙ্গালী হয়, তবে ত্রিবেদী ও পাঁড়েকে বাঙ্গালী করা যায় না; যদি পিতামহের বিচরণ ভূমি ধরিয়া "নিবাস" স্থির করিতে হয়, তবে এরূপ গণনা কয়েক পুরুষ ধরিয়া চলিবে, তাহা বিচার্য্য। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণেরা কেহই তাঁহাদের নিবাস মিথিলায় বা কনোজে বলেন না।

এই আলোচনায় দাঁড়াইতেছে এই,—যে ব্যক্তি যে প্রদেশের সঙ্গে তাহার ভাগ্য জুড়িয়াছে সে সেই প্রদেশের লোক,—অথচ সারা ভারতের অধিবাসী। শাসনের সুবিধার জন্য যেমন এক প্রদেশে জেলা ভাগ করিলে জেলার লোকে জেলার লোকে প্রভেদ ঘটে না, প্রদেশ বিভাগের বেলায়ও তাহাই হওয়া চাই। বেহারে যখন কতকগুলি বাঙ্গালীকে domiciled Bengali বলা হয় তখন হাসি পায়; বাঙ্গালার উচ্চ জাতির সকলেই যে domiciled বেহারী। ডমিসাইল কথাটা যে আইনের কথা নয়, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মাদ্রাজে ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের বিবাদ আছে; আর সে প্রেসিডেন্সীতে টেলেগু, তামিল, মলয়ালাম ও কানাড়ী ভাষা চলিত আছে; মাদ্রাজী বলিলে একটা Race বুঝায় না; বাঙ্গালী বলিলেও একটা race বুঝায় না। এ বিষয়ের বুদ্ধিটুকু ঠিক না থাকিলে আমাদের কংগ্রেস হাওয়ায় উড়িয়া যাইবে, এবং সকল নীতির বোঝা জলে ডুবিবে। শাসন সংস্কারের

ফলে এখন পাকা রকমে প্রদেশ বিভাগ হইতেছে ; এই সময়ে এ বিষয়ের গভীর বিচারের প্রয়োজন। এখন প্রয়োজন হইলে এমন আইন করা উচিত, যাহাতে ভাবতবাসীরা প্রদেশের প্রাচীরে আটকা না পড়ে।

পরীক্ষার ফল ও উপার্জ্জন—প্রতি বৎসরই পাশের খবর বাহির হইবার পর কয়েকখানি পত্রিকায় এই সমালোচনা চলে, যে এত পাশ করা ছেলে কি করিয়া খাইবে। এই আহাম্মকি কথা যে উপহসিত হয়না, ইহাই আশ্চর্য্য। যাহারা পাশ করা ছেলে কি করিয়া খাইবে। এই অর্থাৎ কম করিয়া পড়িত, অথবা কিছু না পড়িত, তাহা হইলে কি দেশের উন্নতি হইত, ও ঐ হাজার হাজার যুবকের উপার্জ্জনের পথ পরিষ্কার হইত ? যাঁহারা পাশের খপর বাহির হইবার সময়ে এ দেশের লোকসংখ্যার সংবাদ পাইয়া আঁৎকাইয়া ওঠেন, তাঁহারা যদি আমাদিগকে নির্ব্বংশ করিয়া অন্ন সমস্যার সমাধান করিতে চাহেন, তবে তাঁহাদের হিতৈষণার আন্দোলন অন্যদিকে চালাইতে হয়। দেশে যত ছেলের জন্ম হয়, সকলের জন্যই আহার চাই ; যাহারা লেখাপড়া শেখে, তাহাদের চেয়েও অনেক অধিক সংখ্যক লোক উপার্জ্জনের পথ পাইতেছে না। যে ভদ্র লোকের ছেলেরা লেখাপড়া শেখে, তাহারা যদি লাঙ্গল হাতে ধরিত, তবে চাষের জমী পাইত কোথায় ? যাহারা জমী আঁচড়াইয়া খায়, তাহারাই কি যথেষ্ট পেটের ভাত ও শরীরের স্বাস্থ্য পায় ? এ দেশে উচ্চজাতির দরিদ্র ভদ্র লোক আছে বহু লক্ষ ; তাহারা চায় না, তাহাদের ছেলেরা মূর্খ হইয়া থাকে,—তাহারা ঘটিবাটি বেচিয়াও ছেলেদিগকে লেখাপড়া শেখায়, এবং চাষ প্রভৃতি কাজে এক পয়সা রোজগার করিবারও তাহাদের পন্থা বা সুবিধা নাই। যাঁহারা বলেন না যে লেখাপড়া তুলিয়া দিয়া, দেশকে মূর্খ করা উচিত,—যাঁহারা দেখাইতে পারেন না যে মূর্খ হইলেই রোজগার বাড়ে কি করিয়া,—যাঁহারা জানেন যে হাতুড়ি পেটার কারখানা ভবিষ্যতে সৃষ্ট হইলেও সহস্র সহস্র যুবকের উপার্জ্জনের পথ খুলিয়া না,—এবং যাঁহারা জানেন যে সামাজিক সংস্কার প্রভৃতি আমূল না বদলাইলে এ দেশের বহু লোক, না খাইয়া মরিলেও কোন ছোট উপার্জ্জনের পথে যাইবে না, এবং যাঁহারা জানেন ভীষণ দারিদ্র্য বহিয়াও অনেক জাতির লক্ষ লক্ষ লোক তাহাদের সন্তানদিগকে লেখাপড়া শিখাইয়া তাঁহারা পরীক্ষার ফল বাহির হইবার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগকে ধ্বংস করিবার পরা দেন কেন ? হয় এই পরামর্শের তলায় আছে—আহাম্মকি, আর না হয় খলতা। ইংরেজি প্রয়োগে বলিতে পারি, ইহারা হয় fool না হয় knave.

নূতন ছাঁচের ব্যবস্থাপক সভা—মণ্টেগুর ছাঁচের ব্যবস্থাপক সভার কিস্তির পরীক্ষা আগামী ডিসেম্বর মাসে শেষ হইবে। গবর্ণমেণ্ট বলিতেছেন যে, পরীক্ষা ভাল হয় নাই, কারণ এ দেশের লোকেরা কাজে অপটু ; এই অজুহাতে এ দেশের লোক অধিকতর ক্ষমতা দিতে গবর্ণমেণ্ট নারাজ। এ দেশের লোকেরাও বলিতেছেন, পরীক্ষা ভাল হয় নাই ; দেশের লোকেরা বলেন যে, একে ত ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে অল্প, তাহার আবার কিছু করিতে গেলেই গবর্ণমেণ্ট মাথার উপর টিক্ টিক্ করিয়া বাধা দেন, এবং যে করিবার ভার আছে, তাহাও এমনভাবে সীমাবদ্ধ যে গুছাইয়া কাজ করিয়া সুফল দেখান অসা উভয় পক্ষের কথাতেই সত্য আছে মনে হয় ; কেন মনে হয়, বলিতেছি।

দেশের সাধারণ লোকেরা নূতন নূতন' তাহাদের দায়িত্ব বুঝিয়া সকল স্থলে উপযুক্ত নির্ব্বাচন করেন নাই। কাজেই অনেক আনাড়ীর হাতে অনেক গোলযোগ ঘটিয়াছে। এ বিষয়ে অনেক কথা লিখিতে হইবে ; এখন কেবল একটা কথার দৃষ্টান্ত দিতেছি।

ব্যবস্থাপক সভার সভ্যেরা যদি আপনাদের মধ্যে পরামর্শ করিয়া জিজ্ঞাস্য প্রশ্ন তৈয়ারী করিতেন, তবে আলোচ্য প্রশ্নের সংখ্যা অনেক কম হইত। সভ্যেরা প্রতিজনে এত প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছিলেন যে, উহার উত্তর দিতে গেলেই তিন বৎসর কাটিয়া যায়। যাহাতে অনভিজ্ঞ ও অপটু লোক আর নির্ব্বাচিত হইতে না পারেন, তাহার জন্য বিশেষ উদ্যোগ হওয়া উচিত। ক্ষমতা-লোলুপ স্বার্থপর ধামাধরা লোকেরা কি অনিষ্ট করিতে পারে, দেশের লোকে তাহার পরিচয় পাইয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট, সভার সদস্যদিগকে অনেক কাজে বাধা দিয়াছেন, ও অপমান করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত লবণের শুল্কের আইন। হাতে ক্ষমতা থাকিলেও সভার সকল সভ্যের মত উল্টাইয়া দিয়া সভ্যদিগকে নিরুৎসাহ ও অপমানিত করা উচিত হয় নাই ; সভ্যেরা যদি অবুঝের মত টাকার দায়িত্ব না ভাবিয়া আইন পাশ করিয়াছিলেন, তাহা হইলেও অন্যদিক্ হইতে টাকা সরবরাহ করিয়া সভার মাতব্বরী রক্ষা করা উচিত ছিল। এখন দাঁড়াইল এই,—যাহা গবর্ণমেণ্টের অনভিপ্রেত তাহা পাশ হইবে না, এবং যাহা অভিপ্রেত তাহাই পাশ হইবে। তাহা হইলে আর সাক্ষী গোপাল সভা রাখিয়া ফল কি ?

অধিকতর ক্ষমতা না পাইলে, যে সীমাবদ্ধ ক্ষমতায় কাজ হয় না, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। যাঁহার উপরে মেলেরিয়া তাড়াইবার ভার রহিল, তিনি যদি নদী, খাল প্রভৃতির সংস্কার করিতে না পারেন, তবে কামান দাগিয়া মশা মারিবার ব্যবস্থা করিলে কি হইবে ? এক দিকের শাসনের ক্ষমতার সঙ্গে যেখানে অন্য দিকের শাসনের ক্ষমতার যোগ আছে, সেখানে সকল ক্ষমতা হাতে না থাকিলে কেহ কাজ করিতে পারে না।

ক্ষমতা দিতে হয়, ভাল করিয়া দাও, নহিলে দিওনা। আর এক কথা এই, মিনিষ্টার নির্ব্বাচনের ভার যখন সরকারের নিজের হাতে, তখন খাঁটি কাজ করিবার লোক হইল সরকারের অনুগ্রহপ্রার্থী মোটা মাহিনাভোগী লোকেরা। কাজেই কুকাজের জন্য বেশি দায়ী হইলেন গবর্ণমেণ্ট। যে সকল মিনিষ্টারেরা দেশের লোকের অভক্তি ও বিরক্তির পাত্র হইয়াছেন, তাঁহারা যদি আবার মিনিষ্ট্রিতে নিযুক্ত হয়েন, তবে বুঝিব যে সভাগুলিকে সাক্ষীগোপাল করাই সরকারের উদ্দেশ্য। এ দেশের লোকেরা গতবারে সকল স্থলে ভাল লোক নির্ব্বাচিত করে নাই, এবং নির্ব্বাচিতদের মধ্য হইতেও খাঁটি কাজের লোকদিগকে সকল স্থলে মিনিষ্টার করা হয় নাই। কাজেই পরীক্ষার কুফলের জন্য দেশের লোকের অপটুতার ত্রুটি অপেক্ষা সরকারের অবিবেচনা অধিকতর দায়ী।

তুর্কির সন্ধি—বীরকুলতিলক কমাল পাশার নাম ইতিহাসে অক্ষয় হইল। তিনি ও তাঁহার সহকারীরা জাতীর জীবন জাগাইয়া গ্রীকদিগকে পরাভূত করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই ইউরোপের রাজ-সঙ্ঘে তুর্কির স্থান হইল। ইউরোপীয় কোন দেশের ক্ষমতায় ও গৌরবে এখন আর খৃষ্টিয় ধর্ম্মের প্রাধান্য সূচিত হয় না ; সূচিত হয় জ্ঞানের বল, হৃদয়ের বল, দেহের বল। ইউরোপীয়েরা যেখানে অন্য দেশের লোককে "হিদেন" (heathen) বলিয়া অবজ্ঞা করেন, সেখানে, প্রায় অর্থহীন একটি শব্দ প্রাচীন অভ্যাসের বশে উচ্চারণ করিয়া থাকেন ; কিন্তু যেখানে কোন অখৃষ্টিয়ান জাতি আপনার বলে আত্মরক্ষা করিতে পারে, এবং অন্যকে দমাইতে পারে, সেখানে সে জাতি ধর্ম্মের অজুহাতে অনাদৃত হয় না। দৃষ্টান্ত জাপান। তুর্কির গৌরবময় প্রতিষ্ঠাতে আমরা কেবল একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠা দেখিতেছি। তুর্কির সুবিবেচিত ব্যবস্থায় ধর্ম্মের শাসনকে

রাষ্ট্রীয় শাসনের সহিত অসম্পর্কিত করা হইয়াছে; কাজেই ইউরোপের অন্যান্য জাতির মত তুর্কির নামে, কোন বিশেষ ধর্ম্ম সূচিত হইতে পারে না। রাষ্ট্র চালনায় ইহাই শ্রেষ্ঠ অবস্থা। অন্য সভ্য দেশের মত তুর্কিতে স্বাধীন চিন্তার আদর বাড়িবে, এবং এদেশ জ্ঞানে, ন্যায়নিষ্ঠায় ও বাহুবলে পৃথিবীতে একটি শ্রেষ্ঠজাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত রহিবে।

জার্ম্মানির দশা—ফরাসীরা চায় যে শত্রুর শেষ রাখিবেনা; Poincare স্পষ্টই বলিতেছেন যে জার্ম্মানিকে চলৎশক্তিহীন না করিয়া ছাড়িবেন না। ফরাসীরা এমনভাবে তর্ক তুলিয়াছেন, যাহাতে ইংরাজেরা স্পষ্টই বুঝিয়াছেন, যে ফরাসীরা চালাকি করিয়া ইংরাজদের প্রশ্নের উত্তর দিতে এমনভাবে বিলম্ব করিতেছেন, যাহাতে অধিক দিন পর্য্যন্ত রুর দখল চলিতে পারে। ইংরেজদের প্রস্তাব গৃহীত হইলে ফরাসীরা রুর দেশ ছাড়িতে পারেন, এবং আপাতক জার্ম্মানির দুর্দ্দশা একটু কমিতে পারে, কিন্তু স্থায়ী উপকার হইবার সম্ভানা নাই। চতুর্দ্দশলুই জর্ম্মানদের অলসেস্ ও লোরেন অধিকার করার ফলে সীমান্তের রক্ষা না হওয়ায় ফরাসীরা এক সময় জর্ম্মানিকে উৎপীড়িত করিতে পারিয়াছিল; কিন্তু ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে আপনাদের অলশেস্ ও লোরেন উদ্ধার করিয়া জর্ম্মানি নিরুপদ্রব হইয়াছিল। এবারকার সন্ধিতে ফরাসীরা তাহাদের আগেকার দুর্দ্দশা করা আলশেস্-লোরেন পাইয়াছে। ফরাসীরা এখন সুর তুলিয়াছে, যে জর্ম্মানদের রাইন্ প্রদেশে রিপাবলিক্ বসাইয়া উহাকে একটা "ঢাল রাজ্য" (buffer State) করিতে হইবে। ইহা করিলে ফল বিষময় হইবে। একটা ঢাল-রাজ্যের সৃষ্টি হওয়া উচিত বটে; এখন যদি ১৯০১ অব্দের হেগের সভায় উপস্থাপিত ফরাসীদের প্রাচীন প্রস্তাব অনুসারে অলশেস্ লোরেন না একটি ঢাল রাজ্য করা হয় তাহা হইলেই ভবিষ্যতের যুদ্ধ বিবাদ থামিতে পারে। এই ব্যা হইলে ফ্রান্স হারাইবেন, তাঁহার চোরাই মাল, এবং জর্ম্মানেরও লুপ্ত রাজ্যের নূতন বিধানে ফে থাকিবে না। এ প্রস্তাব কিন্তু ইউরোপে উত্থাপিত হয় নাই। আমাদের কথা কেহ শুনি জানি, কিন্তু এ বিষয়ে কেহ ইতিহাস ধরিয়া ন্যায় বিচার করিতে চাহিলে, আমাদের প্রস্তা পক্ষ সমর্থন করিতে প্রস্তুত আজি।

কেনিয়ায় ভারতবাসী—কেনিয়ার উপনিবেশে এ দেশের লোকেরা উঁচু ডা স্থান পাইল না কেন এবং রাষ্ট্রীয় অধিকারে সমান ভাগ পাইল না কেন,—এ প্রশ্ন তুলিয়া বিচারের লড়াই করা বিড়ম্বনা। সারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সকল প্রজার সমান অধিকার বলি মধুর বচন আছে, তাহা যে রাজনৈতিক কপট বাণী—অর্থাৎ মিথ্যা কথা, সেটা আমরা যাই কেন? ইউরোপীয়েরা যে ইউরোপের বাহিরের কোন জাতির গন্ধই সহিতে পারে কারে না পড়িলে সহিবেনা, এ দৃষ্টান্ত ত আমেরিকায় ও সকল উপনিবেশে সুস্পষ্ট,—ভা সুস্পষ্ট। জিজ্ঞাসা করি, ভারতে আমাদের কি অধিকার আছে বা থাকিতে পারে? এই বুঝাইবার জন্য ১৮ বৎসর পূর্ব্বে ভারতী পত্রে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহার একটি কথা দেশ যখন ভারতের লোকের ছিল, তখন উহার নাম ছিল ভারতবর্ষ; মুসলমান অধিকা নাম হইয়াছিল হিন্দুস্থান, আর সেই হিন্দুস্থানে, অর্থাৎ সিন্ধুর পূর্ব্ব পারের দেশে, ভারত নবাগত মুসলমান একসঙ্গে বাস করিয়াছিলেন বলিয়া দেশ ছিল সকলের; এখন দে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া, অর্থাৎ ব্রিটিশদের রাজ্যে আমরা অনুগ্রহ-রক্ষিত প্রজা। আমার এই অনুসরণ করিয়া সুকবি গোবিন্দচন্দ্র দাস লিখিয়াছিলেন,—

"স্বদেশ" "স্বদেশ" করিস্ তোরা, এদেশ তোদের নয়।

সূর্য্যদেবের কৃপায় এখানে ইউরোপের উপনিবেশ হয় নাই,—হইলে এখানে অন্য উপনিবেশের দশা ঘটিত।

এখন আমাদিগকে খুসি রাখিয়া নিরুপদ্রবে শাসন চালাইবার প্রয়োজন আছে বলিয়াই একটু আধটু ক্ষমতার মোয়া হাতে পাই। এখানে পলিসির রুমালে নাক ঢাকিয়া যাঁহারা আমাদের গায়ের গন্ধ এড়াইয়া মধুর বচন বলেন, তাঁহারা শাসন দণ্ডের মুঠাটি শক্ত রাখিয়াই আমাদিগকে সে দণ্ডটি একটু হেলাইতে দোলাইতে দিবেন। এটা বুঝিলে এত নিরাশার কাঁদুনি উঠিত না। দুঃস্থ জার্ম্মাণির বেলায় যখন নামডাকের লীগের দরবারে নিরস্ত্র ন্যায়ের বিচার চলিতেছে না, তখন কালার কথার পালায় কিছুতেই কেনিয়ার বেনিয়াদের মতের বিরুদ্ধে কিছু হইবে না।

বিবাহে পণ—বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের ছাত্র সুশীলকুমার হার, আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে ৩নং ছুতারপাড়া লেনে কলেজের শিক্ষিত যুবকেরা কন্যাপণ তুলিবার উদ্যোগে একটি সমিতি করিয়াছেন, এবং যাহাতে কুপ্রথাটির বিরুদ্ধে প্রবল জনমতের সৃষ্টি হয়, তাহার জন্য যুবকেরা বিশেষ চেষ্টা করিতেছে। যাঁহারা ভবিষ্যতে দেশের মুখ উজ্জ্বল করিবেন, তাঁহাদের সাধু সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া আনন্দিত হইয়াছি! এবারে এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা সম্ভব হইল না, কিন্তু শীঘ্রই আমরা তাহা, করিব।

বিদ্যাসাগর বাণীভবন ও নারী-শিক্ষা সমিতি—নারী জাতির উন্নতি কল্পে প্রতিষ্ঠিত এই দুইটি সুপরিচালিত প্রতিষ্ঠানের যে বিবরণটি শ্রীযুক্ত অসিতকমল মৌলিক লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহা একটু আগে পাইলে আমরা সকল বিবরণ লিখিতাম, এবং এদেশের নারীদের নামে দোহাই দিয়া আমাদের পাঠক পাঠিকাদিগকে ঐ প্রতিষ্ঠান দুইটির সহায় হইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতাম। যাহাতে স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলিত হয়, অনাথা ও বিধবারা সমাজে কল্যাণময়ী হইয়া স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন, এবং সকল শ্রেণীর মেয়েরাই ভালভাবে গৃহধর্ম্ম পালন করিতে পারেন, তাহা শিখাইবার জন্যই এই দুইটি প্রতিষ্ঠান। পরিচালকেরা মফঃস্বলে নানাস্থানে বিদ্যালয় খুলিতেছেন,—অন্তঃপুরের মেয়েদের শিক্ষার জন্য ভাল পুস্তক রচনা করিতেছেন এবং অনেক অনাথাকে আশ্রয় দিয়া পালন করিতেছেন। সার প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সার জগদীশচন্দ্রের পত্নী ও মিউনিসিপালিটীর chairman প্রভৃতি যাহার সহিত সংযুক্ত তাহার প্রতি কাহারও তিলমাত্র বিশ্বাস হইতে পারে না। সকলেই যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করুন, ইহাই অনুরোধ।

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ—এই অতি পুরাতন কলেজটির একটা গৌরবময় ঐতিহ্য আছে, কিন্তু সেই ঐতিহ্য আর যেন থাকিতে পারিবে না মনে হইতেছে। জানি না কি বুদ্ধিতে গবর্ণমেণ্ট রক্ষিত এই কলেজটিকে নিষ্কর্ম্মা করিবার আয়োজন হইতেছে। সহসা ভাল ভাল অধ্যাপকদিগকে হয় বরখাস্ত করিবার, না হয় স্থানান্তরিত করিবার আদেশ প্রচারিত হইয়াছে। ইংরেজীর একজন অধ্যাপককে বরখাস্ত করিবার পর তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। লজিকের অধ্যাপক কাজ ছাড়িয়া দিবার বিজ্ঞাপন পাইয়াছেন, এবং আর কয়েকজন সরকারী চাকুরীতে স্থায়ী অধ্যাপকেরাও তাড়িত হইতেছেন। ধীরেশচন্দ্র আচার্য্য এম্, এ, রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ স্কলারকে একেবারে অধস্তন শ্রেণীতে নামাইয়া মফঃস্বলের এক ইস্কুলের পণ্ডিতিতে পাঠাইবার আদেশ হইয়াছে, কুড়ি বৎসরের চাকুরে রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কাজ হইতে অপসৃত হইবার আদেশ

রাষ্ট্রীয় শাসনের সহিত অসম্পর্কিত করা হইয়াছে; কাজেই ইউরোপের অন্যান্য জাতির মত তুর্কির নামে, কোন বিশেষ ধর্ম্ম সূচিত হইতে পারে না। রাষ্ট্র চালনায় ইহাই শ্রেষ্ঠ অবস্থা। অন্য সভ্য দেশের মত তুর্কিতে স্বাধীন চিন্তার আদর বাড়িবে, এবং এদেশ জ্ঞানে, ন্যায়নিষ্ঠায় ও বাহুবলে পৃথিবীতে একটি শ্রেষ্ঠজাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত রহিবে।

জার্ম্মানির দশা—ফরাসীরা চায় যে শত্রুর শেষ রাখিবেনা; Poincare স্পষ্টই বলিতেছেন যে জার্ম্মানিকে চলৎশক্তিহীন না করিয়া ছাড়িবেন না। ফরাসীরা এমনভাবে তর্ক তুলিয়াছেন, যাহাতে ইংরাজেরা স্পষ্টই বুঝিয়াছেন, যে ফরাসীরা চালাকি করিয়া ইংরাজদের প্রশ্নের উত্তর দিতে এমনভাবে বিলম্ব করিতেছেন, যাহাতে অধিক দিন পর্য্যন্ত রুর দখল চলিতে পারে। ইংরেজদের প্রস্তাব গৃহীত হইলে ফরাসীরা রুর দেশ ছাড়িতে পারেন, এবং আপাতক জার্ম্মানির দুর্দ্দশা একটু কমিতে পারে, কিন্তু স্থায়ী উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। চতুর্দ্দশলুই জর্ম্মানদের অলসেস্ ও লোরেন অধিকার করার ফলে সীমান্তের রক্ষা না হওয়ায় ফরাসীরা এক সময় জর্ম্মানিকে উৎপীড়িত করিতে পারিয়াছিল; কিন্তু ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে আপনাদের অলশেস্ ও লোরেন উদ্ধার করিয়া জর্ম্মানি নিরুপদ্রব হইয়াছিল। এবারকার সন্ধিতে ফরাসীরা তাহাদের আগেকার চুরী করা আলশেস্-লোরেন পাইয়াছে। ফরাসীরা এখন সুর তুলিয়াছে, যে জর্ম্মানদের রাইন্ প্রদেশে রিপাবলিক্ বসাইয়া উহাকে একটা "ঢাল রাজ্য" (buffer State) করিতে হইবে। ইহা করিলে ফল বিষময় হইবে। একটা ঢাল-রাজ্যের সৃষ্টি হওয়া উচিত বটে; এখন যদি ১৯০১ খৃঃ অব্দের হেগের সভায় উপস্থিপিত ফরাসীদের প্রাচীন প্রস্তাব অনুসারে অলশেস্ লোরেন লইয়া একটি ঢাল রাজ্য করা হয় তাহা হইলেই ভবিষ্যতের যুদ্ধ বিবাদ থামিতে পারে। এই ব্যবস্থা হইলে ফ্রান্স হারাইবেন, তাঁহার চোরাই মাল, এবং জর্ম্মানেরও লুপ্ত রাজ্যের নূতন বিধানে ক্ষোভ থাকিবে না। এ প্রস্তাব কিন্তু ইউরোপে উত্থাপিত হয় নাই। আমাদের কথা কেহ শুনিবেন জানি, কিন্তু এ বিষয়ে কেহ ইতিহাস ধরিয়া ন্যায় বিচার করিতে চাহিলে, আমাদের প্রস্তাবের পক্ষ সমর্থন করিতে প্রস্তুত আজি।

কেনিয়ায় ভারতবাসী—কেনিয়ার উপনিবেশে এ দেশের লোকেরা উঁচু ডাঙ্গায় স্থান পাইল না কেন এবং রাষ্ট্রীয় অধিকারে সমান ভাগ পাইল না কেন,—এ প্রশ্ন তুলিয়া ন্যায় বিচারের লড়াই করা বিড়ম্বনা। সারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সকল প্রজার সমান অধিকার বলিয়া যে মধুর বচন আছে, তাহা যে রাজনৈতিক কপট বাণী—অর্থাৎ মিথ্যা কথা, সেটা আমরা ভুলিয়া যাই কেন? ইউরোপীয়েরা যে ইউরোপের বাহিরের কোন জাতির গন্ধই সহিতে পারে না এবং কারে না পড়িলে সহিবেনা, এ দৃষ্টান্ত ত আমেরিকায় ও সকল উপনিবেশে সুস্পষ্ট,—ভারতেও সুস্পষ্ট। জিজ্ঞাসা করি, ভারতে আমাদের কি অধিকার আছে বা থাকিতে পারে? এই কথাটা বুঝাইবার জন্য ১৮ বৎসর পূর্ব্বে ভারতী পত্রে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহার একটি কথা বলিব। দেশ যখন ভারতের লোকের ছিল, তখন উহার নাম ছিল ভারতবর্ষ; মুসলমান অধিকারে উহার নাম হইয়াছিল হিন্দুস্থান, আর সেই হিন্দুস্থানে, অর্থাৎ সিন্ধুর পূর্ব্ব পারের দেশে, ভারতবাসী ও নবাগত মুসলমান একসঙ্গে বাস করিয়াছিলেন বলিয়া দেশ ছিল সকলের; এখন দেশের নাম ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া, অর্থাৎ ব্রিটিশদের রাজ্যে আমরা অনুগ্রহ-রক্ষিত প্রজা। আমার এই কথাগুলি অনুসরণ করিয়া সুকবি গোবিন্দচন্দ্র দাস লিখিয়াছিলেন,—

"স্বদেশ" "স্বদেশ" করিস্ তোরা, এদেশ তোদের নয়।

সূর্য্যদেবের কৃপায় এখানে ইউরোপের উপনিবেশ হয় নাই,—হইলে এখানে অন্য উপনিবেশের দশা ঘটিত।

এখন আমাদিগকে খুসি রাখিয়া নিরুপদ্রবে শাসন চালাইবার প্রয়োজন আছে বলিয়াই একটু আধটু ক্ষমতার মোয়া হাতে পাই। এখানে পলিসির রুমালে নাক ঢাকিয়া যাঁহারা আমাদের গায়ের গন্ধ এড়াইয়া মধুর বচন বলেন, তাঁহারা শাসন দণ্ডের মুঠাটি শক্ত রাখিয়াই আমাদিগকে সে দণ্ডটি এএকটু হেলাইতে দোলাইতে দিবেন। এটা বুঝিলে এত নিরাশার কাঁদুনি উঠিত না। দুঃস্থ জার্ম্মাণির বেলায় যখন নামডাকের লীগের দরবারে নিরস্থু ন্যায়ের বিচার চলিতেছে না, তখন কালার কথার পালায় কিছুতেই কেনিয়ার বেনিয়াদের মতের বিরুদ্ধে কিছু হইবে না।

বিবাহে পণ—বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের ছাত্র সুশীলকুমার হার, আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে ৩নং ছুতারপাড়া লেনে কলেজের শিক্ষিত যুবকেরা কন্যাপণ তুলিবার উদ্যোগে একটি সমিতি করিয়াছেন, এবং যাহাতে কুপ্রথাটির বিরুদ্ধে প্রবল জনমতের সৃষ্টি হয়, তাহার জন্য যুবকেরা বিশেষ চেষ্টা করিতেছে। যাঁহারা ভবিষ্যতে দেশের মুখ উজ্জ্বল করিবেন, তাঁহাদের সাধু সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া আনন্দিত হইয়াছি! এবারে এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা সম্ভব হইল না, কিন্তু শীঘ্রই আমরা তাহা করিব।

বিদ্যাসাগর বাণীভবন ও নারী-শিক্ষা সমিতি—নারী জাতির উন্নতি মূলে প্রতিষ্ঠিত এই দুইটি সুপরিচালিত প্রতিষ্ঠানের যে বিবরণটি শ্রীযুক্ত অসিতকমল মৌলিক লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহা একটু আগে পাইলে আমরা সকল বিবরণ লিখিতাম, এবং এদেশের নারীদের নামে দোহাই দিয়া আমাদের পাঠক পাঠিকাদিগকে ঐ প্রতিষ্ঠান দুইটির সহায় হইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতাম। যাহাতে স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলিত হয়, অনাথা ও বিধবারা সমাজে কল্যাণময়ী হইয়া স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন, এবং সকল শ্রেণীর মেয়েরাই ভালভাবে গৃহধর্ম্ম পালন করিতে পারেন, তাহা শিখাইবার জন্যই এই দুইটি প্রতিষ্ঠান। পরিচালকেরা মফঃস্বলে নানাস্থানে বিদ্যালয় খুলিতেছেন,—অন্তঃপুরের মেয়েদের শিক্ষার জন্য ভাল পুস্তক রচনা করিতেছেন এবং অনেক অনাথাকে আশ্রয় দিয়া পালন করিতেছেন। সার প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সার জগদীশচন্দ্রের পত্নী ও মিউনিসিপালিটীর chairman প্রভৃতি যাহার সহিত সংযুক্ত তাহার প্রতি কাহারও তিলমাত্র বিশ্বাস হইতে পারে না। সকলেই যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করুন, ইহাই অনুরোধ।

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ—এই অতি পুরাতন কলেজটির একটা গৌরবময় ঐতিহ্য আছে, কিন্তু সেই ঐতিহ্য আর যেন থাকিতে পারিবে না মনে হইতেছে। জানি না কি বুদ্ধিতে গবর্ণমেণ্ট রক্ষিত এই কলেজটিকে নিষ্কর্ম্মা করিবার আয়োজন হইতেছে। সহসা ভাল ভাল অধ্যাপকদিগকে হয় বরখাস্ত করিবার, না হয় স্থানান্তরিত করিবার আদেশ প্রচারিত হইয়াছে। ইংরেজীর একজন অধ্যাপককে বরখাস্ত করিবার পর তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। লজিকের অধ্যাপক কাজ ছাড়িয়া দিবার বিজ্ঞাপন পাইয়াছেন, এবং আর কয়েকজন সরকারী চাকুরীতে স্থায়ী অধ্যাপকেরাও তাড়িত হইতেছেন। ধীরেশচন্দ্র আচার্য্য এম্, এ, রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ স্কলারকে একেবারে অধস্তন শ্রেণীতে নামাইয়া মফঃস্বলের এক ইস্কুলের পণ্ডিতিতে পাঠাইবার আদেশ হইয়াছে, কুড়ি বৎসরের চাকুরে রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কাজ হইতে অপসৃত হইবার আদেশ

পাইয়াছেন এবং শোনা যাইতেছে যে ইংরেজী দর্শনের অধ্যাপক মহেন্দ্রনাথ সরকার এবং ইরেজীর অধ্যাপক শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়কে প্রাদেশিক উচ্চ চাকরী হইতে নামাইয়া অধস্তন বিভাগে রাখিয়া অন্যত্র পাঠান হইবে। কলেজের নূতন প্রিন্সিপাল শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী মহাশয়ের আমলে সংস্কৃত কলেজের যে দুর্গতি ঘটিতে বসিল, ইহার জন্য কে দায়ী তাহার অনুসন্ধান হওয়া উচিত। সংস্কৃত কলেজের যে অবস্থা দাঁড়াইল, তাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধান অনুসারে এ কলেজ হইতে ছাত্রদের পরীক্ষা দেওয়ার কোন অধিকার থাকিতে পারে কি না, সেনেট সভায় তাহা বিচারিত হইতেছে। সেনেট সভা প্রিন্সিপালের নিকট এই মর্ম্মে কৈফিয়ৎ চাহিয়াছেন যে, উপযোগিতার অভাব ঘটায় সংস্কৃত কলেজের কেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ছাত্র উপস্থাপিত করিবার অধিকার থাকিতে পারিবে তাহা তাঁহাকে দেখাইতে হইবে। শিক্ষাসচিব এবং ডিরেক্টর মহাশয় সংস্কৃত কলেজের গৌরব নষ্ট করিতেছেন কাহাদের পরামর্শে? আগামী জানুয়ারীতে এই কলেজের শত বার্ষিক উৎসবের সময় কলেজের আয়ু সম্বন্ধে "শতায়ুর্বৈপুরুষঃ" কথাটি খাটিতে পারিবে।

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কৈফিয়ৎ চাহিবার পর গবর্ণমেণ্ট [illegible] সম্বন্ধে এক [illegible] নিবে[illegible] করিয়া জানাইয়াছেন যে, কলেজের ছাত্রসংখ্যা কমিয়া যাওয়াতে [illegible] অধ্যাপককে রাখা আবশ্যক হইতেছে না। কিন্তু ইহার ঠিক অর্থ বুঝা যায় না। যদি পঠিতব্য বিষয় না কমিয়া যায়, তাহা হইলে পূর্ণ একটী ক্লাসের জন্য যে কয়জন অধ্যাপক আবশ্যক, ক্লাসে ৮।১০ জন মাত্র থাকিলেও সেই কয়জন অধ্যাপকেরই আবশ্যকতা। কারণ প্রত্যেক বিষয়েই লেকচারের কমপক্ষে একটী নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা আছে। উদাহরণ স্বরূপ এই সংস্কৃত কলেজের সংস্কৃত অনার ক্লাস লইয়া বলা যাইতে পারে যে, ইহার ছয়টী বিভিন্ন বিষয়ের জন্য মাত্র দুই জন অধ্যাপক রহিলেন। লজিক এবং অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধেও ইহা প্রযোজ্য।

এই ব্যাপারে একটি প্রনিধান যোগ্য বিষয় এই যে প্রিন্সিপ্যালের নিজের কার্য্যকাল পূর্ণ হইয়া গেলেও, তাঁহার কার্য্যকাল পুনরায় বাড়িয়া গিয়াছে, এবং যে-কয়েকজন অধ্যাপক স্থানান্তরিত হইবার বা কার্য্য হইতে অপসৃত হইবার আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন, গত দুই বৎসরের মধ্যে তাঁহারা প্রিন্সিপ্যালের বিরুদ্ধে ডিরেক্টারের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট কোন কোন বিষয়ে অভিযোগ করিয়া তাঁহার বিরাগভাজন হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের যে এইরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছে তাহা প্রিন্সিপাল মহাশয়ের মন্তব্য মতেই হইয়াছে।

শোক-সংবাদ

লাহোরের স্বদেশহিতৈষী রামভুজ দত্ত চৌধুরী মহাশয়ের দেহান্ত হইয়াছে। ইনি পঞ্জাব প্রসিদ্ধ লালা লজপৎ রায়ের মত আর্য্য সমাজের একটি গৌরব-স্তম্ভ ছিলেন। কয়েক বৎসর হইতে রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনেও যোগ দিয়াছিলেন এবং সম্পূর্ণরূপে স্বদেশের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই সেবা-ব্রতে তাঁহার সহায় ও সহচরীরূপে যথার্থ ধর্ম্মপত্নীর মতই বঙ্গদেশে সুপরিচিতা শ্রীমতী সরলা দেবী সঙ্গিনী ছিলেন। পঞ্জাবের গোলযোগের সময় চৌধুরী মহাশয়ের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ পর্য্যন্ত হইয়াছিল, এবং সানন্দে কিছুকাল কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছিলেন। শ্রীমতী সরলা দেবীর বৈধব্যে আমরা তাঁহাকে আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

Printed and published by Jyotish Chandra Ghosh at the Cotton Press, 57, Harrison Road, Calcutta.

স্মৃতির বোঝা

শিল্পী—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী।

INDIAN ART SCHOOL
32 BOWBAZAR ST. CALCUTTA

COLOUR PICTURE

BLANK PAGE(S)

DOUBLE COLOUR PAGE

KONNAGAR PUBLIC LIBRARY
Estd. 1858

বঙ্গবাণী

"[illegible] তোরা মানুষ হ"

দ্বিতীয় বর্ষ ১৩২৯-'৩০ | আশ্বিন | দ্বিতীয়ার্দ্ধ ২য় সংখ্যা

বন্দনা

রহিবে উদাসী আর কত যুগ, ওগো বিষ-ভুক্ শঙ্কর!
আবৃত আকাশ শ্মশানের ধূমে, উর্ব্বরা ভূমে কঙ্কর।
ঝলিছে ঊর্দ্ধে লোহিত দীপ্তি শোণিত-লিপ্ত খড়্গের;
উদ্দাম-গতি পিশাচ-হাস্যে মলিন প্রতিভা স্বর্গের।
পাহাড়ে সাগরে দৈত্যের লীলা, কাননে যক্ষ-রক্ষের;
অম্বরে ঝরে উল্কাপিণ্ড অধীর সৌর-কক্ষের।
উল্কার তলে ক্ষীণ দ্যুতি-হীন চন্দ্রিকা হর-মৌলীর;
নরের দুঃখ-কালিমায় মাখা স্বর্ণ প্রতিমা গৌরীর।

ধ্বনিত রোদনে বন্দনা-গীতি,—ব্যাকুল বিনয়ে নারদের;
"জাগ মঙ্গলে কল্পবিজয়ী, ওগো শঙ্কর ভারতের!
যুগ-যুগান্ত-সঞ্চিত তব শ্মশানভস্ম অঙ্গার,
ধুয়ে মুছে যাক্ ধারায় ধারায় অলকানন্দা গঙ্গার।
সংহার কর পিশাচের লীলা, দেব-মানবের দাস্য;
শৈলে, সাগরে, কাননে, ভুবনে, বিকাশ শৈব হাস্য।
উজ্জ্বল কর গৌরী-প্রতিমা, দীপ্তি ফুটাও চন্দ্রে;
সঞ্জীব কর ভারতবর্ষ; বন্দে, নারদ বন্দে।"

শিল্পশাস্ত্রের ক্রিয়াকাণ্ড

মানব-শিল্পের শৈশবটা কাটলো মানুষের ঘরের এবং বাইরের খুব দরকারি কায করতে। পাথর ঘসে তীরের ফলা তৈরিকরা, হাঁড়িকুড়ি গড়া, কাপড় বোনা, হাড়ের মালা গাঁথা, লোহার বালা গড়া, শীতের কম্বল, বসবার আসন এমনি নানা জিনিষের উপরে শিল্পের ছাপ পড়লো, নানা জিনিষ প্রস্তুতের নানা প্রক্রিয়া আস্তে আস্তে দখল হল মানুষের। মানুষ সভ্যতার দিকে যখন এগোলো তখন কতক শিল্পকলা রইলো ধর্ম্মের সঙ্গে জড়িয়ে, কতক রইলো রাজসভার সঙ্গে জড়িয়ে—প্রধানতঃ এই দুই রাস্তা ধরে শিল্পের ক্রিয়াকাণ্ড চল্লো সা দেশেই। পূজার জন্য যে সব মন্দির প্রতিমা ইত্যাদি তাদের প্রস্তুত করার [illegible] প্রকরণ এ প্রাসাদ-নির্ম্মাণ, হাট বসানো, কুয়ো খোঁড়া ইত্যাদির [illegible] এই হয়ে পণ্ডিতদের দ্বারা শিল্পশাস্ত্রে ধরা হল, নানা শিল্প বিষয়ে নানা কথা নানা অধ্যায়ে বিভক্ত হয়ে শাস্ত্রের মধ্যগত রইলো—এই হল শিল্প শাস্ত্রের গঠনের মোটামুটি হিসেব। তারপর ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চার শাস্ত্রের মধ্যে মধ্যে আনুষঙ্গিক ভাব নানা শিল্পকলার কথাও বলা হল এবং আংশিকভাবে নানা পুরাণেও প্রসঙ্গক্রমে শিল্পের এবং নানা কলা-বিদ্যার কথা লেখা রইলো।

শিল্পশাস্ত্রের মূল গ্রন্থ সব যা ছিল বলেই শুনি, সেইসব প্রাচীন শাস্ত্রের সারসংগ্রহ বলে যে সব পুঁথি নানা কালে এদেবতা ও-ঋষি বা অমুক তমুকের কথিত বলে লেখা হল—রাজারাজড়া পুস্তকাগারে ধরার জন্য সেই গুলোই কতক কতক এখন পাওয়া যাচ্ছে, তা থেকে দেখা যায় ধর্ম্মে সেবায় শিল্পের যে সব দিক জড়িয়ে ছিল তা'রি বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ হল কিন্তু অন্যান্য কা যা সৌখিন রাজারাজড়ার সেবায় লাগতো তাদের বিস্তারিত বিবরণ লেখাই গেল না। পূজা প্রতিমা কেমন করে করতে হবে তার ঠিক ঠাক নিয়ম লক্ষণ সমস্তই পাই কিন্তু কাপড় চোপ নানা গন্ধ তৈল নানা মূল্যবান তৈজস পত্র এদের প্রস্তুতের প্রকরণ ক্বচিৎ ধরা হল শিল্পশা দেখি, এ ধরণের সামগ্রীর মধ্যে এক বজ্র প্রলেপের কথা লেখা আছে দেখি সব শিল্পশা কিন্তু বজ্রমণির বেলায় তার ধারণের কি গুণাগুণ তার বর্ণ ও মূল্যাদির হিসেব হল ধরা বি বজ্রমণিটা বিদ্ধ করা যায় কি প্রক্রিয়ায় এবং কতরকম গহনা হয় কত নাম তাদের এসব বি নেই শিল্পশাস্ত্রের মধ্যে—প্রতিমা লক্ষণ, প্রাসাদ নির্ম্মাণ, কূপ খনন, ইত্যাদি ইত্যাদি নানা শিল্পশাস্ত্রে যেমন নানা অধ্যায়ে ভাগ করে লেখা রইলো তেমন করে ভূষণ শিল্প—যেটা এ খুব বড় art প্রাচ্য জগতের—তার হিসেব ধরা দরকারী বোধ হল না।

এই যে সমস্ত সৌখিন শিল্প, তার উদ্ভাবনা ও গঠনের প্রক্রিয়া সমস্ত শিল্পিদের ঘরে অ অবস্থায় পিতা থেকে পুত্রে অর্শাতে চল্লো। এইসব বিচিত্র শিল্পের নানা আদর্শ বর্ত্তমান রইলে

তাদের প্রস্তুত করণের প্রক্রিয়া সমস্ত কত যে লোপ পেয়ে গেল তার ঠিক নেই। এই কারণে বলতেই হয় আমাদের শিল্পশাস্ত্র, শিল্পশাস্ত্র বলতে যা বোঝায় তা নয়, তাতে অঙ্গবিদ্যা হিসেবে আংশিকভাবে প্রসঙ্গক্রমে কোন কোন কলাবিদ্যার কথা বলা হয়েছে, ভারতশিল্পের প্রায় সাড়ে পনেরো আনা অংশের কথাই পাড়া হয়নি তাতে। এখন ধর্ম্মের সঙ্গে শিল্পের আগেকার যোগ বিচ্ছিন্ন হতেই চল্লো, শিল্পের যে অনাদৃত দিক, বিচিত্র দিক যা নিয়ে মানুষের জীবনযাত্রা সুন্দর হয়ে উঠলো মধুময় হয়ে উঠলো সেই দিকে মানুষের নজর পড়লো, ঘরের শিল্প আবার ঘরেই ফিরছে পরের কায চুকিয়ে!

শিল্পকে ধর্ম্মের সঙ্গে জড়িয়ে না দেখে শিল্পের দিক দিয়ে দেখা খুব অল্প দিন হল ইউরোপে [illegible] চলিত হয়েছে। [illegible] ভারতবর্ষে এইভাবে শিল্পরসের দিক দিয়ে কলা সমস্তকে দেখা আলঙ্কারিক [illegible]। শুধু কাব্য কলার সঙ্গে জড়িয়ে রাখলে অলঙ্কার শাস্ত্র রস শাস্ত্র হত্যাদি [illegible] না, অলঙ্কার শাস্ত্রের বিচার প্রণালী ধরে শিল্পবিদ্যা সমস্তকেই বুঝতে চল্লে ঢের বেশী ফল পাব আমরা! শিল্পের পুরাতত্ত্ব হিসেবে শিল্পশাস্ত্র কাযে লাগবে, প্রাচীনের সঙ্গে শিল্পশাস্ত্রের দিক দিয়ে এখনকার শিল্পিদের আংশিকভাবে যোগ ছাড়া নৌ কিছু হবে না—আমরা হাজার বছর আগে কত বড় শিল্পি ছিলেম এই ভাবের একটা ফুয়ো গর্ব্বও লাভ হতে পারে—কিন্তু সে শুধু পড়ে পাওয়া বিদ্যা হবে শিল্পবোধ তাতে হবে না। রসের ও ভাবের প্রক্রিয়া ধরে কবিতা ছবি মূর্ত্তি এমন কি খেলনাটারও পরিচয় হল ঠিক পরিচয়। বিদেশীয় রসিকেরা এই পথে কায করে চলেছেন অনেকেই।

শিল্পি বা শিল্পরসিক কেমন করে হয় তা ঠিক করে বলা কঠিন। হঠাৎ দেখি কেউ রস পেয়ে গেল কেউ বা সারাবছর অলঙ্কার শাস্ত্র পড়ে পড়ে চোখই ক্ষরিয়ে ফেল্লে। কবি কেমন করে হয় কাব্য-প্রকাশে লেখা আছে দুচরণ শ্লোকে। কলাশাস্ত্রের গোড়ায় ঠিক এই কথা লেখা হলে মানায়—পড়ে পাই বিদ্যা, না পড়ে পাই কলা বিদ্যা! কিন্তু না পড়ে পেলেও কলাবিদ্যাকে পড়ে পাওয়া শক্ত। হাতে কলমে কাজ করা হল শিল্পের নানা প্রকরণ, সহজে দখল করার সহজ উপায়! রংরেখা এদের টেনে দেখলে এদের রহস্য সহজ হয়ে আসে।

পড়া দ্বারা নয় ক্রিয়ার দ্বারা শিল্পকর্ম্মে দক্ষতা যদি এই কথাই হল তবে এমন অনেক মানুষ রয়েছে যারা পড়াশুনো করছে না অথচ artistও হয়ে উঠছে না, তারা কেউ চাষা হচ্ছে কেউ দোকানি পসারি মুটে মজুর হচ্ছে, অবশ্য এদের অনেকের কাজই শিল্পশাস্ত্রের চৌষট্টি কলার কোনটা না কোনটার মধ্যে পড়ে যায়, কিন্তু হ'লে কি হয়; আমরা নিজেদের সবদিক দিয়ে বড়ই কেন cultured বোধ করি না কেন চাষাকে artist ভাবা মজুরকে artist বলা শক্ত হয়েছে, যারা গাধাবোট টেনেই চলেছে তাদের কেউ এখন artist বলে না কিন্তু যে ছেলেরা বাচ খেলায় [illegible] হল তাদের বলি artist!

আজকে আমাদের পক্ষে "Philosopher জ্ঞানী লোক—Cultivator চাষা" এবং artist তারাই যারা নিত্য জীবনযাত্রার থেকে স্বতন্ত্র অতিরিক্ত কিছু নিয়ে রয়েছে। আগে কিন্তু এ ভাবটা ছিল না—তখন সহরের লোক দেখি চোরের সিঁদ কাটার নানা কায়দা দেখে পুলিশ ডাকার কথা ভুলে ফুটো দেওয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে কেমন সিঁদটা কাটা হয়েছে এই নিয়ে art lecture আরম্ভ করে দিয়েছে! হয়তো বা চোর সে নিজের কাটা সিঁদের বাহার দেখে খুসিতে রয়েছে এমন সময় পুলিশ এসে গ্রেপ্তার করলে artistকে! বর্ষাকালে দেখি চাষার ক্ষেতের দিকে চেয়ে গান চল্লো—

"গগন ঘটা ঘহরাণী সাধো
গগন ঘটা ঘহরাণী
পূরব দিস্‌সে উঠিহৈ বদরিয়া
রিম ঝিম বরসত পানী
আপন আপন মেঁড় সম্‌হারো
বহো জাত রহ পানী
সুরত নিরত কা বেল নহায়ন
করৈ খেত নির্ব্বাণী।" (কবীর)

ঘনঘটা ঘনিয়ে এল পূবে বাদল উঠলো রিম্‌ঝিম বারিষ নামলো, সামাল ভাই ক্ষেতের আল ঐযে জল বয়ে চল্লো। দুটি লতা—অনুরাগের বিরাগের—তাদের আজ এই রসের বৃষ্টি ধারায় ভিজিয়ে নাও এমন ক্ষেত লাগাও যেখানে অবাধ মুক্তির ফসল ফলে। ক্ষেতের ফসল কেটে ঘরে তুল্যে পারে তাকেইতো বলি কুশল কিষাণ।

সেকালে তাঁরা art কিসে নেই বা কিসে আছে এটা সুনিশ্চিত করে দিতে অথবা নানা রস কলাবিদ্যার সংখ্যা নির্দ্ধারণ করে চৌষট্টির মধ্যেই artকে অনেকে ধরে রাখতে চাননি, এই জন্যে শাস্ত্রে বলা হল :—

"বিদ্যাহ্যনন্তাশ্চ কলাঃ সংখ্যাতুং নৈব শক্যতে
বিদ্যা মুখ্যাশ্চ দ্বাত্রিংশচ্চতুঃষষ্টিঃ কলাঃ স্মৃতা।" (শুক্রনীতি)

এইভাবে বিদ্যা এবং কলা দুয়ের প্রভেদটা মাত্র মোটামুটি রকমে শাস্ত্রে ধরা হল :—

"যদ্‌যত্ স্যাদ্ বাচিকং সম্যক কর্ম্ম বিদ্যাভিসংজ্ঞকম্
শক্তো মুকোপি যৎ কর্ত্তুং কলা সংজ্ঞস্তু তৎস্মৃতম্"। (শুক্রনীতি)

আমরা এখন artকে fine, industrial—নানাভাগে ভাগ করে নিয়েছি। আগেও এই ভাগ ছিল শিল্পে—কর্ম্মাশ্রয়া দ্যুতাশ্রয়া উপচারিকা ইত্যাদি হিসেব। সেকালের চৌষট্টি কলার মধ্যে যাকে বলি fine art, যাকে বলি industrial art এবং যাকে বলি science

কোঠায় রাখা গেছে। সেকালের হিসেবে ধরলে আজকালের Foot-ball, Billiards ইত্যাদি খেলা artএর মধ্যে এসে পড়ে; সন্তান পালন একটা artর মধ্যে ছিল আগে, এখন ওটা আমরা Medical Scienceএর মধ্যে ফেলে দিয়েছি এমন কি ছেলেদের খেলবার পুতুল গড়া ও কেষ্টনগরের পুতুল গড়া এবং গড়ের মাঠের ধাতুমূর্ত্তি গড়া তিনটেকে সম্পূর্ণ আলাদা জাতের শিল্প বলে ধরে নিয়েছি। মানুষের উন্নত ও সুন্দর এবং সুকুমার বৃত্তিসমূহ যে শিল্প কাযের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয় তাকে বলি fine art, মানুষের প্রতিদিনের জীবনের নানা সাজ সরঞ্জাম যাতে করে শুধু কাযের নয় সঙ্গে সঙ্গে সুদর্শন হয়ে ওঠে তাকে বলি industrial art, এমনি artএর মোটমাট জাতি বিভাগ সৃষ্টি হয়ে গেছে মানুষের নিজের মধ্যে সমাজ বন্ধনের সময়ে নানা বর্ণ বিভাগের প্রথা। artistদের কাছে কিন্তু এরকম একটা বিভাগ নিয়ে artএর উপভোগের তারতম্য ধরা একেবারেই নেই, সেখানে art এক কোঠায়, না-art অন্য কোঠায়, ইতরবিশেষ, মাঝামাঝি, চলনসই এসব কথা নেই, art কি art নয় এই বিচার।

শিল্পশাস্ত্র আমাদের যা রয়েছে তাতে ভাস্কর্য্যের একটা দিক, স্থাপত্যের খানিকটা—যেটা পূজন ও যজন যাজনের সঙ্গে জোড়া তারি উপরে বিশেষভাবে মতামতের জোর দেওয়া হয়েছে দেখা যায়, তাছাড়া এটাও দেখি যে শিল্পশাস্ত্রের সংগ্রহ কার্য্যে ভারি একটা ত্বরা রয়েছে—কোন রকমে একটা প্রাচীনত্বের ছাপ মেরে জিনিষটাকে সাধারণে প্রচার করার ত্বরা—একটা ধর্ম্মবিপ্লব এবং সেই সময়ের ত্বরা—শিল্পকে নিয়ে টানাটানি এসবই লক্ষ্য করি শিল্পশাস্ত্রের সংগ্রহের ধরণ থেকে।

Artএর মধ্যে একটা অনির্ব্বচনীয়তা আছে যেটা artistএর অনুভূতির বিষয় এবং অসাধারণ বলেই artএর অনির্ব্বচনীয় রস যে কি ব্যাপার তা সবাইকে বুঝিয়ে ওঠা কঠিন। রস পেলে তো পেলে, না পেলে তো পেলে না, এসব কথা শিল্পশাস্ত্রকার বিচার করার সময় পান্‌নি, এসব চিন্তা আলঙ্কারিকদের, রসের দিক দিয়ে তাঁরা বিচার করে দেখেন যে সে দিক দিয়ে এতটুকু বা এত বড় নেই সরস বা নীরস নিয়ে কথা। মাটির খেলনা সরস হল তো মগধের মাড়ুর চেয়ে বড় জিনিষ হল এবং মগধ উড়িষ্যা সবশিল্পের বড় বড় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও গণেশের সমতুল্য হয়ে উঠলো একটি সুন্দর আরতি-প্রদীপ। আর্টের জগতে শিল্প কি শিল্প নয় এই নিয়ে উচ্চনীচ ভালমন্দ ভেদাভেদ, দেবতা কি মানুষ কি বানর এ নিয়ে দেখা নয় art কি art নয় এই নিয়ে পরীক্ষা করা সব জিনিষকে, হল অকাট্য নিয়ম। Art for art এই কথাই হল artistএর, art ধর্ম্মের জন্যে কি জাতীয় গৌরবের ধ্বজা সাজাবার জন্যে কিম্বা natureএর সম্মুখে mirror ধরার জন্যে অথবা—বিপশ্চিতাম্ মতম্ কে বলবৎ রাখার জন্যে এ তর্ক আর্টের জগতে উঠতেই পারে না।

Artist যে উদ্দেশ্যেই কায করুক artএর দিকে চেয়ে করাই হল তার প্রধান কায। ময়ূর নিজের আনন্দে তার চিত্র বিচিত্র কলাপ বিস্তার করে, বাগানের শোভা কি বনের

শোভা কি খাঁচার শোভা তাতে হল কি না হল ময়ূরের মনে একথা উদয়ও হল না, এতটা স্বাধীনতা মানুষ শিল্পি চায় কিন্তু পেলে কই—ধর্ম্ম বল্লে তুমি আমার কাযে লাগো, দেশ বল্লে আমার, এমনি নানাদিক দিয়ে শিকল পড়ে গেল শিল্পির হাতেপায়ে, তারপর একদিন চিরকালের ছাড়া পাখি তার মনিবের পোষ মানলে, ইসারাতে পিচ্ছ ওঠালে নামালে যে শুধু তা নয়—জলযন্ত্র ঘোরালে ঘটিযন্ত্র চালালে কামান দাগলে নিয়ম মতো !

"অপিশ্রেয়স্করমনুণাম্ দেব-বিম্বমলক্ষণং
সলক্ষণং মর্ত্ত্যবিম্বম্ নহি শ্রেয়স্করং সদা ॥"

এই হুকুমে এককালে আমাদের শিল্পিরা বাঁধা পড়ে ছিল। পুঁথিকার দেবতা সমস্তের ধ্যান দিলে শিল্পি সেই ধ্যান মতো গড়ে চল্লো এই ঘটনাই যদি পুরোপুরি ঘটতো তবে আমাদের art কেবলমাত্র ধ্যানমালার illustration হয়ে যেতো কিন্তু এর চেয়ে বেশি জিনিষ হয়ে উঠলো বুদ্ধ নটরাজ প্রভৃতি নানা দেবমূর্ত্তি সেটা ধ্যানমালার লিখিত ধ্যানের অতিরিক্ত এবং শিল্পশাস্ত্রের মান পরিমাণ লক্ষণাদির বাঁধা নিয়মের থেকে স্বতন্ত্র আর কিছু নিয়ে! প্রাচীন দেবমূর্ত্তিগুলি আমাদের বাংলার কার্ত্তিকের মতো সম্পূর্ণ কাপ্তেনবাবু বা কলে কাটাছাঁটা মরা জিনিষ হয়ে পড়েনি শুধু শিল্পির শিল্প-ক্রিয়া তাদের অমরত্ব দিলে বলে এবং শুধু সেইটুকুর জন্যে artএর জগতে এইসব দেবতার স্থান হ'ল।

শাস্ত্র বল্লে শিল্পকে ঘাড়ে ধরে দেবলোকটাই আছে তোমার কাছে, মর্ত্তলোক নেই, যদি বা থাকে তো সেদিকে দৃক্‌পাত করবে না—তা হলে অন্ধ হবে! কিন্তু artistর পক্ষে স্বতন্ত্র কেননা art সে অনন্যপরতন্ত্রা, শিল্পিরকাছে দেবলোকের স্বপ্ন সেও যেমন প্রত্যক্ষ ও সুন্দর মর্ত্তলোকের ছবি সেও তেমনি অভাবনীয় সুন্দর ও প্রত্যক্ষ ব্যাপার, দুটোই তুল্যমূল্য, যদি art হল এবং রসের স্বাদ দিলে। শাস্ত্রী চাইলেন মর্ত্তকে ছেড়ে শাস্ত্রীয় স্বর্গ, ইহলোককে মুছে দিয়ে পুঁথির পরলোক ; কিন্তু শিল্পির শিল্পবৃত্তি তাকে অন্য পথ দেখালে, মর্ত্তলোকের মাটির দেহে সবখানি সুন্দর হতে সুন্দর হ'য়ে উঠল, শাস্ত্র যে সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড চেয়েছিল তা হতেই পারলে না, অনেকখানি সৃষ্টিরহস্য শিল্পির মনে ক্রিয়া করে পাগলামির অনাসৃষ্টি থেকে বাঁচিয়ে দিলে এ দেশের প্রতিমা শিল্পকে! শিল্পশাস্ত্রের দেবলোক ও তার অধিবাসী তাঁরা একেবারেই তেত্রিশকোটি গণ্ডীর মধ্যে ঘেরা, নিখুঁত মান পরিমাণ লক্ষণ দিয়ে সম্পূর্ণভাবে বাঁধা শাস্ত্রীয় দেবলোক ও দেবতা হওয়া ছাড়া সেখানে উপায় নেই, শিল্পির মনের দেবতা এবং শাস্ত্রের দেবলোকের সঙ্গে শিল্পি শিল্পলোকের কল্পনায় তফাৎ থাকতে পারে এই ভয় করেই শাস্ত্রকার কসে বেঁধেছেন আপনার বিদ্যে জায়গায় জায়গায়—নান্যেন মার্গেণ প্রত্যক্ষেণাপি বা খলু—পূজার জন্য যে প্রতিমা তা শাস্ত্রমতো না গড়লে তো চলে না সুতরাং শিল্পির উপরে এই কড়া হুকুম জারি করতেই হল নানা ভয় দিয়ে—

হীনাঙ্গী স্বামিনং হন্তি হ্যধিকাঙ্গী চ শিল্পিনম্"—

একচুল এদিকে ওদিকে একেবারে মৃত্যুদণ্ড, বেতের ভয় নয়,—"কৃশা দুর্ভিক্ষদা নিত্যং স্থূলা রোগপ্রদা সদা" অন্ধতা বংশলোপ ইত্যাদি নানা ভয় দিয়ে শিল্পিকে ও শাস্ত্রীয় মূর্ত্তিকে কঠিন নিয়মে বাঁধার চেষ্টা হল, কিন্তু এতে যে কাজ ঠিক চল্লো তা নয়, এদিক ওদিক হতেই থাকলো মাপযোপ ইত্যাদিতে, শিল্পি মানুষতো কল নয়, সে ক্রিয়াশীল ও ক্রীড়াশীল দুইই সুতরাং একটু ঢিলে দিতে হল নিয়মের কসনে

"লেখ্যা লেপ্যা সৈকতী চ মৃণ্ময়ী পৈষ্টিকী তথা,
এতাষাং লক্ষণাভাবে ন কশ্চিৎ দোষ ঈরিতঃ ॥"
"বাণলিঙ্গে স্বয়ম্ভূতে চন্দ্রকান্ত সমুদ্ভবে,
রত্নজে গণ্ডকোদ্ভূতে মান দোষো ন সর্ব্বথা।"

ছবি modelling, plaster cast এমনি অনেক জিনিষ এবং স্ফটিক ও নানা রত্নভূষা এবং ছোটখাট শিল্পদ্রব্য সমস্তই বাঁধনের বাইরে পড়লো, কেবল পাষাণ ও ধাতুজ পূজার জন্য যে মূর্ত্তি তাই রইলো শাস্ত্রের মধ্যে বাঁধা, কিন্তু এখানেও গোল বাধলো, ঠিক ঠিক শাস্ত্রমতো গড়ন যে জানে কেন শিল্পির হাতে এলনা, এদিক ওদিক হতেই থাকলো কিছু কিছু—দেশভেদে কালভেদে শিল্পির কল্পনাভেদে পূজকের অন্তর্দৃষ্টিভেদে, তখন সম্পূর্ণ ছাড়পত্র দেওয়া হল—

"প্রতিমায়াশ্চ যে দোষা হ্যর্চকস্য তপোবলাৎ,
সর্ব্বত্রেশ্বরচিত্তস্য নাশং যান্তিক্ষণাৎকিল ॥"

এই ফাঁক পেয়ে দেশের শিল্প হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো, বিচিত্র হয়ে উঠলো মন্দিরে মঠে।

সেকালে শাস্ত্রের নিয়মমতো গড়ার সে সব ব্যাঘাত পরে পরে এসেছিল, একালেও যদি শিল্পশাস্ত্রের অনুশাসনে আমরা শিল্পিদের বাঁধতে চলি তবে ঠিক সেকালের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হবেই হবে। অনেকে বলেন ইতিহাসে না হয় পুনরাবৃত্তি হলই, তাতে করে যদি তখনকার art ফিরে পাই তো মন্দ কি। এ হবার জো নেই—যা গেছে তা আর ফেরে না, তার নকল হতে পারে। ছোট ছেলে ঠাকুর দাদার হুবহু নকল দেখিয়ে চল্লে যেমন হাস্যকর অশোভন ব্যাপার হয় তাই হবে, গোলদীঘির অজন্তা বিহার হবে, গড়ের মাঠের খেলানা তাজমহল হবে। কুঁড়ে ঘর আর বদলাল না কেননা সে এমন সুন্দর করে সৃষ্টিকরা যে তখনও তাতে যেমন এখনো তাতে তেমনি সচ্ছন্দে বাস চল্লো। কিন্তু সেকালের প্রাসাদে একালে আমাদের বাস অসম্ভব আলো বাতাস বিনা হাঁপিয়ে মারা যাবো পাথর চাপা পড়ে। পুরাকালে আমাদের যাঁরা শিল্প ও শিল্পরসিক ছিলেন তাঁরা ক্ষুদ্রচেতা ছিলেন না তাঁরা নিয়ম করতেন নিয়ম ভাঙ্‌তেন তাঁদের মধ্যে শিল্পি ও শিল্প দুই ছিল কাযেই তাঁদের ভয় ছিল না। এখন আমাদের সেই সেকালের কোন কিছুতে একটু আধটুও অদল বদল করতে ভয় হয় কেননা নিজের বলে আমাদের কিছুই

নেই, সেকালের উপরে আগাছার মতো আমরা ঝুলছি মাত্র, সেকালই আমাদের সর্ব্বস্ব। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে এক আফ্রিকার মূর্ত্তিশিল্প যেমন ছিল তেমনি নিষ্ক্রিয় অবস্থাতেই আছে সেকালকে সে ছাড়াতে একেবারেই পারেনি।

সেকাল ছেড়ে কোন শিল্প নেই এটা ঠিক কিন্তু একাল ছেড়েও কোন শিল্প থাকতে পারে না বেঁচে এটা একেবারেই ঠিক। গাছের আগায় যে নতুন মুকুল গাছের গোড়ায় অতীতের অন্ধকারে তার প্রথম বীজটার সঙ্গে যেভাবে যুক্ত রয়েছে সেভাবে থাকা হল ঠিকভাবে থাকা। আমের নতুন মঞ্জরীর সঙ্গে পুরাতন বীজটার চেহারার সাদৃশ্য মোটেই নেই কিন্তু মঞ্জরীর গর্ভে লুকোনো রয়েছে সেই পুরাতন বীজ যার মধ্যে সেই একই ক্রিয়া এই শক্তি ধরা রয়েছে নতুন আবহাওয়াতেও যেটা ঠিকঠাক আম গাছই প্রসব করবে বর্ত্তমানকালে এই স্বাভাবিক গতি ধরে চলেছে শিল্প এর উল্টোপাল্টা হবার জো নেই

আমাদের দেশের মূর্ত্তিশিল্পকে যে কারণেই হোক এই স্বাভাবিক গতি থেকে বঞ্চিত করা দেওয়া হল এক সময়ে, দেবমূর্ত্তির বাহুল্যের চাপন পেয়ে কিছুদিন গাছ আমাদের মনোমত পথ ধরে প্রায় কল্পতরু হবার জোগাড় করলে কিন্তু কালের নিয়মে হঠাৎ পশ্চিমের হাওয়া বইলো, চাপন পাথর একটুখানি নড়ে গেল অমনি গাছ আবার স্বাভাবিক রাস্তা ধরে মন্দিরের ছাদ তুলসীমঞ্চের গাঁথ ফাটিয়ে নানাদিকে আলো বাতাস চেয়ে গতিবিধি সুরু করলে, পশ্চিমে ঝুঁকলো কতক ডাল পু বাড়লো কতক ডাল এইভাবে আলো বাতাসের গতি ধরে বেড়ে চল্লো গাছ! শুধু ভারতবর্ষ নয়, দেশ এই ভাবে শিল্পের দিকে বেড়ে চলেছে। মঞ্চে বাঁধা গাছ দেখতে মন্দ নয় কিন্তু দিকে বিদি নানা শাখা প্রশাখা বিস্তার করে আছে যে বনস্পতি তার মতো শক্তিমানও নয় ছায়াশীলও সুন্দরও নয়। আমাদের প্রাচীন শিল্প ও শাস্ত্র সমস্তই বোধিবৃক্ষের কলমের চারার সোনার গামলায় নীত হয়েছিল দেশে থেকে বিদেশে, কিন্তু সেই সব যবন দেশের হাওয়া আলো তাদের বেড়ে উঠতে অনেকখানি স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল, ভিক্ষু শিল্পিদের দ্বারায় ব্যাহত হয়নি তবেই তো এককালের ভারতীয় উপনিবেশের অভারতীয় অন্তরের মধ্যে গিয়েছিল ভারতীয় ভাব ও রস। ভারতশিল্প যদি কেবলি টবের গাছ হতো তো কোন সেটা মরে যেতো ঠিক নেই, খালি টব থাকতো আর তাতে সিঁদুর দিয়ে পূজো লাগাতো দে আজও পুত্র কামনায় নিষ্ক্রিয়দেশের শিল্পহীন অপুত্রক হতভাগারা!

সেকালের শাস্ত্রমতো ক্রিয়া করে চল্লে এখনো আমরা সেকালের মতোই বিস্তার লাভ করতে পারি কিন্তু একালকে বাদ দিয়ে ক্রিয়া করা চলবে না বর্ত্তমানকাল এবং বর্ত্তমানের উপযোগী অনুপযোগী ক্রিয়া বলে কতকগুলো পদার্থ যে গুলোকে মেনে চলতেই হবে আমাদের না হলে সেকালটা ভূতের উপদ্রব কিছুই দেবে না আমাদের এবং তাবৎ শিল্পজগতের অধিবাসীকে। দাশরথি রায়ের

আমরা অনেকেই পড়ি কতক কতক ভালও লাগে কিন্তু পাঁচালীর ছাঁদে যদি কবিতাটা চালাই করার কড়া আইন করে দেওয়া যায় হঠাৎ তবে বর্ত্তমানের কোন কবি তাতে ঘাড় পাতবে না, কিম্বা আমি যদি আজ বলি আমার ছাঁদেই বাংলার চিত্রকর যারা এসেছে ও আসছে তাদের ছবি লিখতে হবে এবং গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে এটা হঠাৎ একটা আইনে পরিণত করে নিই তবে কেউ সেটা মানবে না উল্টে বরং শিল্পির স্বাধীনতায় বিষম ব্যাঘাত দেওয়া হল বলে আমাকে শুদ্ধ তোপে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করবে। আমাদের শিল্পশাস্ত্রকারদের কড়া মাষ্টার এবং পাহারাওলা হিসেবে দেখলে সত্যিই আমাদের সেকালের প্রতি অবিচার করা হ'বে, পূর্ব্বেকার তাঁরা তখনকার কালের যা উপযোগী বা নিয়ম তারই কথা ভেবে গেছেন, একালে আমাদের কি করা না করা, শাস্ত্রের কোন আইন মানা না মানা সমস্তই এ কালের উপরে ছেড়ে দিয়ে গেছেন তাঁরা, শাস্ত্রকে মন্ত্রের মতো এ কালে ওপরে নিক্ষেপ করার জন্যে তাঁরা প্রস্তুত করে যান্‌নি!

তখনকার তাঁরা নানা শিল্পের রীতিনীতি ক্রিয়াকলাপ সংগ্রহ করে গেছেন নানা শাস্ত্রের আকারে—"স্বয়ম্ভূর্ভগবান্ লোকহিতার্থং সংগ্রহেণ বৈ, তৎসারন্তু বশিষ্টাদৈরস্মাভিরুদ্ধিহেতবে॥" (শুক্রনীতি সার)। শুক্রাচার্য্য কেন যে নানা শিল্প নানা সামাজিক রীতিনীতি সংগ্রহ করে শুক্রনীতি সার বলে পুঁথিখানা লিখলেন তা নিজেই বলে গেলেন—

"অল্পায়ুর্ভূভূদাদর্থং সঙ্ক্ষিপ্তংতর্কবিস্তৃতম্ ক্রিয়ৈকদেশবোধিনি শাস্ত্রাণ্যন্যানি সন্তিহি।
সর্ব্বোপজীবকম্ লোকস্থিতিকৃন্নিতিশাস্ত্রকম্ ধর্ম্মার্থকাম মূলং হি স্মৃতং মোক্ষপ্রদং যতঃ॥"

মুক্তি দেবার জন্যে শাস্ত্র, অল্পের মধ্যে অল্পায়ুকে অনেকখানি বোঝাবার জন্যে শাস্ত্র, রক্ষার জন্যে শাস্ত্র হননের জন্য নয়!

পৃথিবীর সেকালের ভিত্তির উপরে এ কালের প্রতিষ্ঠা হল স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠা, সেকাল একালের ঘাড় চেপে পড়লো—বাড়ীর ভিত উঠে এল ছাতের উপরে এ বড় বিষম প্রতিষ্ঠা! সেকালের বাস্তুশিল্প হিসেবেও এটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার। প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্যা তার মসলার জন্য সম্পূর্ণভাবে সেকালের উপর নির্ভর করে চলতে বাধ্য,—নতুন প্রথায় প্রত্নতত্ত্ব চর্চ্চা চল্‌লো! শিল্পও তেমনি. সেকাল একাল ও ভবিষ্যকালের যোগাযোগে বঞ্চিত হয়ে চল্লো, কোনো এককালের ক্রিয়া কলাপের মধ্যে তাকে ধরে রাখবার উপায় রইলো না। প্রাচীন ভারতশিল্প শুধু নয় তখনকার আচার ব্যবহার সমুদয় কি ছিল, কেমন ছিল তা প্রাচীন পুঁথির মধ্যে ধরা রইলো বলেই শাস্ত্র পুরাণ ইত্যাদি পড়া কিন্তু এই পড়ে জানা হল একরকম শিল্পকে জানাই; অজন্তা চিত্র কেমন এবং তার বর্ণ দেবার লাইনটানার মাপযোপের হিসেবের ফর্দ্দ পড়ে মনে ছবিটা দেখার কায় হয় না। প্রাচীন ভারতের শিল্পের যে দিকটা প্রত্যক্ষ হচ্ছে বর্ত্তমানে পাথর, মৃৎ, মূর্ত্তি, ছবি, কাপড় চোপড়, তৈজস পত্র ইত্যাদিতে তা থেকে বেশী শিক্ষা পায় শিল্পি!

এ হিসেবে একটা প্রাচীন মূর্ত্তির ফটোগ্রাফও বেশী কাযের হল শিল্পকে বোঝাতে, আসল মূর্ত্তিটা
চোখে দেখলে তো কথাই নেই ! ব্রজমণ্ডলে কি কি আছে ও ছিল সেটা ব্রজপরিক্রমা পড়ে গেলেও
ব্রজমণ্ডল দেখা হ'ল না জানা হ'লনা—যতক্ষণ না তার ফটো দেখছি বা সেখানে তীর্থ দর্শনে যাচ্ছি।
না দেখা ব্রজভূমি যেটা সম্পূর্ণ কল্পনার জিনিষ তার মূল্য বড় কম নয় artর দিক দিয়ে, কিন্তু
শাস্ত্র মতো ব্রজভূমির একটা বর্ণনা বা symbol দুখানা হরিচরণ যদি হয় তবে সেটা দেখে কি
বুঝবো ব্রজের শোভা ! নিছক প্রতীক নিয়ে তন্ত্রসাধনা চলে শিল্পসাধনা তার চেয়ে বেশী কিছু চায়।
সাধকের হিতার্থে শাস্ত্রমতো রূপ কল্পনা হল অরূপের যখন তখন এক খণ্ড শিলা একটা যন্ত্র হলেই
কায চলে গেল, কিন্তু শিল্প এমন নিছক প্রতীকমাত্র হয়ে বর্ত্তে থাকতে পারে না ! অনেকখানি
চোখের দেখার মধ্যে না ধরলে দেবতাকে দেখানই সম্ভব হয়না অথচ দেবতাকে মনুষ্যত্বের দি
বাহুল্য না দিলেও চলেনা এই কারণে নানা মূর্ত্তির নানা মুদ্রা হাত মাথা ইত্যাদির প্রাচুর্য্য দরকা
হয়ে পড়লো, শিল্প শাস্ত্র নিখুঁৎ করে তার হিসেব দিলেন। কিন্তু এতেও পাথর দেবতা য
না উঠে মনুষ্যেতর কিছু হবার ভয় গেল না,—তখন শিল্পির শিল্প জ্ঞান যেটা তার নিজস্ব তার উ
নির্ভর করা ছাড়া উপায় রইলো না।

এই যে শিল্পজ্ঞান এ কোথা থেকে আসে শিল্পির মধ্যে তা কে জানে, তবে
শাস্ত্রকে মেনে চলে কিম্বা শাস্ত্র পড়ে সেটা আসে না এটা ঠিক, এইখানে শিল্পির প্রতিভা
স্বীকার করা ছাড়া উপায় রইলো না—কেননা দেখা গেল শাস্ত্রমতো মান পরিমাণ নি
করেও—"সর্ব্বাঙ্গৈ সর্ব্বরম্যোহি কশ্চিল্লক্ষে প্রজায়তে"—লাখে একটা মেলে সর্ব্বাঙ্গসু
অতএব ধরে নেওয়া গেল "শাস্ত্রমানেন যো রম্যঃ স রম্যো নান্য এব হি" এতে করে শাস্ত্রের
বাড়লো বটে কিন্তু শিল্পক্রিয়া খর্ব্ব হল তাই এক সময়ে একদল বল্লে—তদ্ রম্যং লগ্ন যত্র চ
হৃৎ।" অমনি শাস্ত্রের দিক দিয়ে এর উত্তর এল—"শাস্ত্রমানবিহীনং যৎ অরম্যং তৎ বিপশ্চিতা
পণ্ডিতের মান বজায় করে শাস্ত্রকার ক্ষান্ত হলেন কিন্তু এতে করে আমাদের দেশের শি
শিল্প-ক্রিয়াতে প্রায় বারো আনা যে অপণ্ডিত থেকে যাবে সেকথা শাস্ত্রকার না ভাবলেও তখন
শিল্পিরা যে ভাবেনি তা নয়। প্রতিমা শিল্প সেই এক ছাঁচ ধরে চল্লো কিন্তু অন্যান্য শিল্প সমস্ত
নতুন উদ্ভাবনার পথ ধরে নানা কালের ক্রিয়া প্রক্রিয়ার বৈচিত্র ধরে অফুরন্ত সৌন্দর্য্য ধারা ব
চল্লো দেশে।

চিত্রকলার ইতিহাস এদেশে যেমন বিচিত্র এমন মূর্ত্তি গড়ার ইতিহাস নয়। বাইরে
তাও নানা নতুন ক্রিয়া প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে চলে অব্যাহত ধারায় বইলো নতুন থেকে নতুন নয়
ধরে কিন্তু ঠাকুর ঘরের মধ্যে সেই পুরোনো দেবতা বারবার পুনরাবৃত্তি হতে হতে দেবতার
মুখোস মাত্রে পর্য্যবসিত হতে চল্লো। শাস্ত্রমতো ক্রিয়া করে দেবমূর্ত্তি গড়া প্রায় উঠেই
এখন, ধ্যানগুলো বাহনগুলো কার কি এই নিয়েই কায চলেছে ভাস্কর পাড়ায় কতদিন

যে তার ঠিকানা নেই। দেবশিল্প বলে যদি কোন সামগ্রী হয়ে থাকে এককালে দেশে তো বহুযুগ
আগে তারপর থেকে সে শিল্পের অধঃপতনই হয়েছে বেশী বাঁধাবাঁধির ফলে, ঘরে যে শিল্প এই
বাঁধনে পড়ে মরতে বসলো বাইরে গিয়ে সেই শিল্প বাঁধন শিথিল পেয়ে দিব্বি বেঁচে গেল
দেখতে পাই ! নতুন নতুন প্রক্রিয়া নিয়ে পরীক্ষার স্বাধীনতা শিল্পির থাকলো তবেই শিল্পক্রিয়া
চল্লো, না হলে শিল্পের দুর্দ্দশার সূত্রপাত হ'ল—শাস্ত্রের দ্বারায় সে বিপদ ঠেকানো গেল না।

শিল্পশাস্ত্রে আমাদের দেশে এখানে ওখানে যা ছড়ানো রয়েছে তা থেকে সব শিল্পের তালিকা
এবং বাস্তু ও মন্দির মঠ নির্ম্মাণ, নগর স্থাপন, বিচার পদ্ধতি নাগরিকের চালচোলের সম্বন্ধে নানা কথা
এবং এই রকম নানা ব্যাপারের মধ্যে পূজার অঙ্গ হিসেবে প্রতিমা নির্ম্মাণ তার বাহন ব্যবস্থা ইত্যাদিরই
খুটিনাটি মাপযোপের কথা পাই। চিত্র বিষয়ে দু'একখানা পুঁথিও পাওয়া যায় কিন্তু এইসব পুঁথিতে
কোন কোন শিল্পিকে অঙ্গবিদ্যা হিসেবে দেখে আংশিকভাবে সেই সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হয়েছে
artএর পাঠ্য পুস্তক হিসেবে এগুলো বেশী কাযের হবেনা এই আমার বিশ্বাস। চিত্র যদি শিখতে
চাই তবে চিত্রশালাতে যেতেই হবে আমাদের এবং প্রাচীন চিত্রে কেমন করে রেখাপাত কেমন করে
বর্ণ-প্রলেপ কেমন করে নানা অলঙ্কার বর্দ্ধনা ইত্যাদি দেওয়া হতো তার প্রক্রিয়া ছবি দেখেই আমাদের
শিখে নিতে হবে। কোনো শিল্পশাস্ত্রে এ সমস্ত প্রক্রিয়া নিখুঁৎভাবে ধরা নেই। কেমন কাগজে ছবি লেখা
হতো, কি কি বর্ণ সংযোগ হতো কোথায় কোথায়, কেমন ধারা পালিস দেওয়া হতো ছবিতে, কত রকম
তুলির টান, কত রকম রংএর খেলা, কত বিচিত্র ভাব ভঙ্গী রেখার ও লেখার এসমস্ত এক একখানি
ছবি দেখে শেখা ছাড়া উপায় নেই। শাস্ত্রে কুলোয় না এত বিচিত্র প্রক্রিয়ার রহস্য সমস্ত হয়েছে
ছবির মধ্যে ধরা মোগল বাদসাদের আমল পর্য্যন্ত, তারপর এসেছে ইয়োরোপ জাপান চীন থেকে
নতুন নতুন প্রক্রিয়ায় রচনা করা ছবি ! এর চেয়ে প্রকাণ্ড পরিষ্কার সুন্দর শিল্প ব্যাখ্যানের পুঁথি
আর পাতায় পাতায় ছবি পাতায় পাতায় উপদেশ এমন আর কি হতে পারে; এই পুঁথির একখানি
পাতা সংগ্রহ করে নিয়ে চলেছে বিদেশের তারা কত অর্থব্যয়ে নিজদের শিল্পজ্ঞান জাগিয়ে তুলতে,
আর আমরা টাকার অভাবে একটা ছোট খাটো চিত্রশালাও রাখ্‌তে পারছিনে দেশে। পাথরগুলো
মন্দিরগুলো ভেঙ্গে নেবার উপায় নেই না হলে ভাস্কর্য্যশিল্পের নিদর্শন দেখে আর আমাদের কিছু
শেখার উপায় বিদেশীরা রাখতো না !

ভাবতে পারো original ছবি মূর্ত্তি নাই হল, reproduction দেখেই আমরা শিল্প
শিখে পাকা হয়ে উঠবো পুঁথি পড়ে পাকা হয়ে যাবো এ মতের বিরুদ্ধে আমার কিছু বলবার
নেই কেননা আফ্রিকার অধিবাসী যারা, কোথায় তাদের art gallery কোথায় বা তাদের
চিত্রশাস্ত্র ! ছবির দিক দিয়ে মূর্ত্তির দিক দিয়ে দেশটা উজাড় হলে ক্ষতি এমন কিছু নয়
আমরা মরুভূমিকে চষে আমাদেরই আবার সবুজ করে তুলতে হবে, পূর্ব্বপুরুষদের সঞ্চয় ও ঐশ্বর্য্য অন্যে
গ্রাস করে বড় হতে থাকবে। দেশের স্থাপত্য রক্ষার আইন তাড়াতাড়ি না হলেও ও-জিনিষ সহজে

দেশ থেকে নড়তোনা, সময় লাগতো কিন্তু এইসব ছোটখাটো শিল্প সামগ্রী,—চমৎকার কাঁথা চমৎকার
সাড়ী মন ভোলানো খেলানা চোখ ঠিকরোনো গহনা গাটি ঘটি বাটি অস্ত্র শস্ত্র এবং রামধনুকের
প্রতিদ্বন্দ্বী চিত্রশালা উড়ে চলেছে বিদেশে। যদি এখন থেকে দেশে এদের রাখার চেষ্টা আইনের
দ্বারায় হোক পয়সার দ্বারায় হোক না করা হয় তবে শীঘ্রই শিল্পক্রিয়া আমাদের মধ্যে বন্ধ হয়ে যাবে,
থাকবে শুধু বিদেশ যেটুকু ভিক্ষা দেবে—বিনা রোজগারে বিনা খাটুনির পাওনাটা।

শিল্পি হল ক্রিয়াশীল, শিল্প চাই তো ক্রিয়া করা চাই তার প্রথম ক্রিয়া দেশেরটাকে দেশে ধরে
রাখা, দ্বিতীয় ক্রিয়া বিদেশেরটাকে নিজের করে নেওয়া, তৃতীয় ক্রিয়া শিল্প সম্বন্ধে বক্তৃতা নয়, কাজে
চলা ছবি মূর্ত্তি নাচ গান অভিনয় এমনি নানা ক্রিয়া। বিশ্ববিদ্যালয়ে যেটা একেবারেই করা নয় সেইটে
আগে সুরু করতে হল—বক্তৃতা দিতে হল, যেগুলো দরকারী প্রথম শিক্ষার পক্ষে—ছবির মূর্ত্তির এই
যথাসম্ভব সংগ্রহ তা হলোনা এপর্য্যন্ত। ছবি সম্বন্ধে বই যা শেখাবে, বক্তৃতা যা বোঝাবে,
চেয়ে ঢের পরিষ্কার ঢের সহজ করে বোঝাবে সত্যিকার ছবি এটা কবে বোঝাতে পারে
লোককে তা জানিনে।

আমাদের ছবি মূর্ত্তি ইত্যাদির একটা মস্ত সংগ্রহ চৌরঙ্গীতে রয়েছে কিন্তু সেটার
আমরা দিয়েছি যাদুঘর, কোন দিন সেটা ফুঁয়ে উড়ে যাবে পূব থেকে পশ্চিমে তার ঠিক নেই,
আমাদের ঘর শূন্য—এই ভেবেই ছবি মূর্ত্তি সাধ্যাতীত ব্যয় করেও ধরে রাখলেম; দুচারজন
তা দেখে শিখলে, কাযে এল দুচার দিন তারপর এল দুঃসময় চল্লো সব উড়ে বিদেশে—
সোনার কাঠির স্পর্শে। এ আমি দেখতে পাচ্ছি রইলো না, দেশের শিল্প দেশে রইলো
বিদেশী এলো চোখে ধুলো দিয়ে নিয়ে গেল রাতা রাতি ভাণ্ডার লুট করে, সকালে দেখি আমা
ঘর শূন্য ভাণ্ডার খালি শুধু শিল্পি বসে একটা ভূয়ো কৌলিন্য মর্য্যাদা নিয়ে অথর্ব্ব আমরা
রয়েছি বাইরের দিকে চেয়ে, বাইরেটাও যে কত সুন্দর তার নীল আকাশ সবুজ বন আলো
পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ ফুল ফল নিয়ে তাও বুঝতে পারছিনে, মন ভাবছে না পা হাত চল
নিষ্ক্রিয় অবস্থায় হাত পেতেই বসে আছি হঠাৎ কোন একটা সুযোগ যদি এসে পড়ে এই
এই হল জাতীয় জীবনের সব দিক দিয়ে অতি ভয়ঙ্কর পক্ষাঘাতের প্রথম লক্ষণ—বাইরেটা
ঠিক কিন্তু ভিতরটা নিঃসার শিল্পের দিক দিয়ে। এই মানসিক এবং বাইরেও হাত পায়ের
নিবারণ কেবল শিল্পক্রিয়ার দ্বারায় হতে পারে বহুকাল ধরে হয়েও এসেছে, রাজ্য গেল রাজ
এমন কি ধর্ম্মও অনেকখানি গেল যখন তখন বাঁচবার রাস্তা হল মানুষের পক্ষে শিল্প, আপন
শিল্পের উপর নির্ভর এটা শাস্ত্রের কথা কেননা শাস্ত্রকাররা জানতেন ক্রিয়াশীলতা এবং ক্রীড়া
দুটোই শিল্পের এবং জীবনেরও লক্ষণ তাই ক্রিয়া ভেদে তাঁরা কলা ভেদ নির্ণয় করে
"পৃথক পৃথক ক্রিয়াভির্হি কলা ভেদস্তু জায়তে"—(শুক্রনীতি সার)

শ্রীঅবনীন্দ্র

আগমনী

এস মা শক্তি, এস মা সিংহ-বাহিনি,
ভো মহাবিদ্যা, অভয়া মুক্তিদায়িনি,
এস মা গৌরি শারদা,
ভুবনেশ্বরি বরদা।

জয় শঙ্করি, খর-খর্পর-ধারিণি,
নমস্তে মাতঃ অয়ি সঙ্কট-হারিণি,
চাহ মা ত্রিলোক-জয়িনি—
জয় মহাকাল-মোহিনি।

সপ্ত-সাগরে কনক-কুম্ভ ভরিয়া,
শ্বেত-[illegible]রা বারি ঢালে ঝর্-ঝরিয়া
তব অভিষেক-লীলাতে,
পুণ্য-বোধন-বেলাতে।

নন্দিত ঐ নব আগমনী-তোরণে
জয়-জয়ন্তী গাহিছে নবীন চারণে,—
একি সুর বাজে পরাণে,
আকাশ-পাতাল-তুফানে!

এস মা চণ্ডী-মণ্ডপ-তলে এস মা,
'নব-পত্রিকা'-পুষ্পলতিকা-সুষমা
অপরাজিতার কেশরে,
শিশির-মোতির বেশরে।

গউড়ের এই প্রাচীন পঞ্চবটীতে
নবীন গোষ্ঠী জীয়ায়ে জীয়ন্-কাঠিতে
দাও মা দীক্ষা 'মাভৈঃ'।
হারা নিধি ফিরে পাবই।

এস কল্যাণি, গাঙ্গ-ধারার দু'কূলে,
রাখ' মা চরণ চিত্রোৎপল-মুকুলে,
শরৎ মেঘের ছন্দে,
আরতির তূরী-মন্দ্রে।

সাজায়ে মা তোর পলি-মাটি-গড়া প্রতিমা
কি মন্ত্রে তায় প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করি মা,—
সে তন্ত্র-বেদে অধিকার
'বাহান্ন-পীঠে' আছে কার?

মহাষ্টমীর হোম-টীকা পরি একদা
সিদ্ধ পুরুষ—কোথা সে শাক্ত পুরোধা?
কই সে আহুতি-বলিদান
রক্ত-তিলকে গরীয়ান?

সন্ধি-পূজার তোপের ডঙ্কা ছুটেছে,
অতল-পরশে ওঙ্কার-ধ্বনি উঠেছে,—
সাগর-গর্ভ জ্বলেছে,
অনন্ত ফণা টলেছে।

বাজায় ডমরু যুগ-তীর্থের বারতা
কুম্ভ-মেলায় ছুটেছে ভক্ত-জনতা
ভণ্ড-ভীরুতা দলিয়া,
সত্য-শরণে চলিয়া।

তব করুণার রক্ষা-কবচ পরিয়া,
পরমা শান্তি আনিব বরণ করিয়া,
পিইব মরতে অমৃত,
নাশিব অ-শিব অনৃত।

নাশিব অসুরে বিঁধি' পাশুপাত সায়কে,
রথে তুলে' নেবে তোমার পতাকা-বাহকে
তরুণ-অরুণ সারথি—
রটিবে প্রভাত-ভারতী।

অশনি-আঘাতে নহে নত-শির যাহারা,
পাবে, কবে পাবে বাঞ্ছিত বর তাহারা?
মানবত্বের গরিমায়
দাঁড়াবে অমর-আঙিনায়?

এই না সে দেশ—বহে নবনীর দরিয়া,—
দাও মা ভরসা লক্ষ্মীর 'কাঠা' ভরিয়া,
'অন্ন-মেরু'র বেদীতে
দেহি পরসাদ ক্ষুধিতে।

এস অম্বিকা, পূর্ণ বিভূতি-শালিনি,
গৃহাণ অর্ঘ, অখিল-প্রকৃতি-পালিনি,
বিতর' স্বস্তি-সু-বাণী,
প্রণমামি ত্বাং ভবানি।

জাগৃহি দেবি, গণ-দেবতার জননি,
নাচ' ভৈরবি রক্তবীজের দলনি,
জয় মহামায়া ঈশাণি
চিন্ময়ী হ' মা পাষাণি।

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ঋণোৎপত্তি।

(১)

নিত্য-আয় অনুসারে নিত্য-ব্যয় নির্ব্বাহ করাই গৃহস্থের মূল অর্থনীতি। নৈমিত্তিক ব্যয়ের কারণ উপস্থিত হ'লে, গৃহস্থকে সঞ্চিত অর্থ থেকে (যদি থাকে) অথবা ঋণ গ্রহণ ক'রে তা নির্ব্বাহ করতে হয়। ঋণ করলে এই ঋণের সুদ পরবর্ত্তী নিত্য ব্যয়ের অঙ্গীভূত হয়ে তার কলেবর বৃদ্ধি করে। রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়ের নীতি এ থেকে একটু বিভিন্ন। রাষ্ট্রীয় কর্ত্তব্য কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট আছে—প্রজার ধনপ্রাণরক্ষা, তার স্বাস্থ্য, শিক্ষা, তাদের প্রত্যেক সবলশরীর কর্ম্মক্ষম ব্যক্তিকে জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায়স্বরূপ কার্য্য দেওয়া ইত্যাদি। এই কর্ত্তব্যগুলির পালনের জন্য রাষ্ট্রকে আয়ের সৃষ্টি করতে হয়। নানা প্রকারের শুল্ক ও করই এর মধ্যে প্রধান। এই শুল্ক, কর প্রভৃতির মাত্রা নির্দ্ধারিত হয় এই নির্দ্দিষ্ট নিত্য-ব্যয়গুলির মাত্রা অনুসারে। গৃহস্থ ব্যয় করেন আয়-অনুসারে ; আর রাষ্ট্র আয় করেন ব্যয়-অনুসারে। নৈমিত্তিক ব্যয় সম্বন্ধে রাষ্ট্রকেও গৃহস্থের পন্থা অনুসরণ করতে হয়—সঞ্চিত অর্থ থাকলে তাই থেকে—তদভাবে ঋণ গ্রহণ করে—খরচ করতে হয়। এই ঋণের সুদ পরে নিত্য ব্যয়ের অঙ্গীভূত হয়ে যায় এবং নিত্য আয়ের বৃদ্ধির সহজ সম্ভাবনা না থাকলে নির্দ্দিষ্ট নিত্য ব্যয়গুলির মধ্যে রাজপুরুষদের বিবেচনায় যে গুলি অপেক্ষাকৃত অপ্রয়োজনীয় বা অল্প-প্রয়োজনীয়, যেমন স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পূর্ত্তকার্য্য ইত্যাদি সে গুলির ব্যয় সঙ্কোচ করা হয়। শান্তি রক্ষা, আইনের এবং আইনের পরিচালকদের মর্য্যাদারক্ষা, সমাজে সুশৃঙ্খলতারক্ষা বা এই সকলের নামে যে সকল কর্ম্ম এবং অপকর্ম্ম হয়, তার ব্যয়ের অবশ্য কোন সঙ্কোচ করা হয় না। রাষ্ট্রের নৈমিত্তিক ব্যয়ের মধ্যে যুদ্ধই প্রধান—বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে স্বদেশকে রক্ষা করবার জন্য এবং বিদেশে স্বদেশের শিল্প বাণিজ্যবিস্তারাদি স্বার্থ রক্ষা করবার জন্য প্রকৃত শত্রুর অভাব থাকলে সামরিকদের করকণ্ডূতি চরিতার্থ করবার জন্যও অনেক সময় শত্রুর সৃষ্টি করা হয়। স্বাধীন প্রজাতন্ত্র দেশে যুদ্ধার্থ ঋণগ্রহণ লোকমতের অনুশাসিত। ভারতবর্ষের শাসকদের পক্ষে সে অনুশাসন অস্তিত্ববিহীন, বার্ত্তাশাস্ত্রের অনুশাসনও সম্পূর্ণ বিপর্য্যস্ত।

ভারতবর্ষের সকল বিষয়েই কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, এ বিষয়েও তার ব্যভিচার হয় নি। ভারতবর্ষ পরাজিত হয়েছে, পরাধীন হয়েছে এবং পরশাসিত হয়েছে। কিন্তু সেই পরাজয়ের, পরাধীনতার পরশাসনের ব্যয়ের প্রত্যেক কপর্দ্দকটি ভারতবর্ষ নিজে দিয়েছে, তার বিজেতাকে এই বিপুল ব্যাপারে কিছুমাত্র দিতে হয় নি। পৃথিবীর ইতিহাস এমন আর একটি ঘটনার দৃষ্টান্ত দেখাতে পারে না। এই বিশাল ভারতসাম্রাজ্যলাভ যে ব্যবসায়ের পারিণাম তার মূলধন এবং আনুষঙ্গিক

ব্যয়, কেমন করে ভারতের স্কন্ধে আরোপিত হয়েছে আজ এই নূতন করের, নূতন ঋণের (১) দিনে তার একবার আলোচনা করা যাক।

(২)

তিন শ' বছর পূর্ব্বেও প্রাচী প্রতীচীর কাছে একটা রহস্যময় দেশ বলে পরিচিত ছিল। প্রতীচীর লোক কল্পনায় দেখত প্রাচীর প্রকৃতি যেমন সুন্দর, বসুন্ধরাও তেমনি ধনরত্নে পরিপূর্ণ। কিন্তু প্রাচীর অধিবাসীরা এই অতুল ধনরত্নের প্রতি উদাসীন হয়ে সুখ-সৌন্দর্য্যের কল্পনায় মত্ত। প্রতীচীর লোকেরা সেই জন্য এই অনাবিষ্কৃত ধনরত্নের অনুসন্ধানে নানা দেশ থেকে দলে দলে সুদূর পূর্ব্ব দেশে আসতে লাগল। ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, স্পেন, সুইডেন, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশে সুদূর পূর্ব্বদেশের সঙ্গে বাণিজ্য করবার জন্য কোম্পানি গঠিত হতে লাগল। এর মধ্যে হল্যাণ্ডের কোম্পানি—ডচ ঈষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি—ভারতমহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে মশলার ব্যবসায় একচেটে করে নিয়ে গোলমরিচের দাম হঠাৎ মণকরা ৬৲ টাকা থেকে ৮৲ টাকায় বাড়িয়ে দিলে। এই ঘটনায় পূর্ব্ব দেশের বাণিজ্যে ইংলণ্ডের দৃষ্টি পড়্‌ল। অমনি ইংলণ্ডেও একটা কোম্পানি হ'ল। তার নাম হল The Governor and Company of Merchants of London trading into the East Indies. সংক্ষেপে একেই বলা হ'ত ঈষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি এবং পরে এ দেশের মুসলমান রাজসরকারে অন্য দেশের ঈষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে বিশেষ করবার জন্য একে আরও সংক্ষেপে বলা হত ইংলিশ কোম্পানি। ১৬০০ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর রাণী এলিজাবেথ এই কোম্পানিকে সনন্দ দেন। কোম্পানির মূলধন ৭২০০০ পাউণ্ড এবং অংশীদার ১২৫ জন। এই কোম্পানির গবর্ণর পরে বাঙলার গবর্ণর এবং আরও পরে সমগ্র ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল হবেন বলেই বোধ হয় কোম্পানির নামকরণ হয়েছিল গবর্ণর এণ্ড কোম্পানি।

(৩)

সময়ে সময়ে কোম্পানিকে সনন্দ বদলাতে হয়েছে। ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে ক্রমওয়েল যে সনন্দ দেন তাতে কোম্পানিকে অন্যান্য ক্ষমতার মধ্যে সৈন্য রাখবার, রাজ্য বিস্তার কররার এবং পররাজ্যের

(১) ভারতগবর্ণমেণ্ট বিলেতে কিছু টাকা ধার করবেন ; আপততঃ দু কোটি, পরে আরও কিছু বেশী। সেই মর্ম্মে ভারতগবর্ণমেণ্ট ব্রিটিশগবর্ণমেণ্টের কাছে দরখাস্ত করেছেন। কারণ, পার্লামেণ্টের মঞ্জুরী না হলে বিলেতে তার পাওয়া যায় না। এই জন্য East India Loan Bill বলে একটা বিল পার্লামেণ্টে পেশ করা হয়েছে। সে দিন এই উপলক্ষে যে বাদানুবাদ হয় তাতে একজন মেম্বর বলেন যে বিলেতের লোক টাকা ধার দেবে আর সেই টাকা দিয়ে ভারতগবর্ণমেণ্ট বার্লিনে বা নিউইয়র্কে যাবেন মাল কিনতে, তা হবে না। ভারতগবর্ণমেণ্টকে অন্ততঃ শতকরা ৯৫৲ টাকার মাল কিনতে হবে বিলেতেই। বার্লিনে বা নিউইয়র্কে মাল (প্রধানতঃ Railway materials) কিছু সস্তায় পেলেও, বিলেতের এই যে ২০ লক্ষ লোক সম্প্রতি বেকার আছে, তাদিগকে কায দেবার জন্য মাল রিজার্ভাহের অর্ডার বিলেতের কারখানা-ওয়ালাদের পাওয়া চাই। এর উত্তরে ভারত-সচিব বলেন, "সেজন্য কোন চিন্তা করতে হবে না। এইরূপ স্থলে পূর্ব্বে পূর্ব্বে ভারতগবর্ণমেণ্ট বিলেতে শতকরা ৯৫৲ টাকার মাল কিনেছেন। সুতরাং এর জন্য আইনে কোন সর্ত্ত না করে ভারতগবর্ণমেণ্টের সুবিবেচনার উপর নির্ভর করা যেতে পারে।"

সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ ও সন্ধি করবার ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছিল। এই সকল ক্ষমতা পেয়ে কোম্পানি ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে কেবলমাত্র পণ্যদ্রব্যের ব্যবসায়ে নিযুক্ত না থেকে "রাজ্য রাজ্য ব্যবসায়, অস্ত্রবিনিময়" কার্য্যেও নিযুক্ত হলেন। কোম্পানির ডাইরেকটারগণ অভিপ্রায় করলেন—

"The increase of our revenue is the subject of our care, as much as our trade; 'tis that must maintain our force when twenty accidents may interrupt our trade; 'tis that must make us a nation in India; without that we are but a great number of interlopers united by His Majesty's Royal charter, fit only to trade where no body of power thinks it their interest to prevent."—(Resolution of the Directors of the East India Company. 1689). অর্থাৎ বাণিজ্য বিস্তার ও কোম্পানির যেমন উদ্দেশ্য, রাজস্ববৃদ্ধিও তেমনি। সৈন্যবলের দ্বারা বাণিজ্যের বিঘ্ন দূর করবার জন্য সৈন্য রাখতে হবে। ভারতবর্ষে ব্রিটিশের জাতীয় প্রাধান্য স্থাপন করতে হবে। প্রাধান্য না রাখতে পারলে লোকে বলবে কোম্পানি ইংলেণ্ড-রাজের সনন্দ প্রাপ্ত জলচারী তস্করের দলমাত্র, এবং যেখানে কোন বলশালী শক্তি কোম্পানিকে বাধা দেওয়া অনাবশ্যক এবং অযোগ্য মনে করেন, এই তস্করের দল কেবল সেই খানেই তাদের ব্যবসায় চালায়। এই সময় থেকে এই ঈষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির কার্য্য বিবরণই ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার ইতিহাস বলে খ্যাত।

(৪)

১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে আবার একটা নূতন কোম্পানী গঠিত হল। এঁরা ব্রিটিশ রাজসরকারকে ২০লক্ষ পাউণ্ড ধার দিয়ে একটা সনন্দ নিলেন। পুরাণো কোম্পানিও ৩,১৫,০০০ পাউণ্ড দিয়ে নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখলেন। কিছু দিন পরেই এই দুই কোম্পানি মিলিত হয়ে এক হয়ে এবং তার নাম হল The United Company of Merchants trading to the East. ব্রিটিশ রাজসরকারের তখন অর্থাভাব অত্যন্ত অধিক। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে এই কোম্পানি ব্রিটিশ রাজসরকারকে আরও ১০ লক্ষ পাউণ্ড ঋণ দেন।

(৫)

এক ক্ষেত্রে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবসায়ীর মধ্যে সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। ভারতবর্ষে ইংরেজ ও ফরাসীর মধ্যে তার অন্যথা হয় নি। ভারতবর্ষের নানা স্থানে নানা কারণে ইংরেজ ফরাসী যুদ্ধ হতে লাগল। এর মধ্যে কর্ণাটের যুদ্ধটা খুব গুরুতর। ইংরেজ সেনাপতি ক্লাইব এই প্রসিদ্ধি লাভ করলেন। কিন্তু ইংরেজের ঋণটা অত্যন্ত বেড়ে গেল। সাধারণ পণ্যব্যবসায়ে কোম্পানির যে লাভ হত তা থেকে এই ঋণের গুরু ভার লঘু করা অসম্ভব দেখে যখন কোম্পানি

অত্যন্ত চিন্তিত তখন ব্যবসায়ে লাভ ক্ষতি এবং যুদ্ধে জয় পরাজয়ের ভিতর দিয়ে ইংরেজ কোম্পানি বাঙ্‌লা বিহার-ওড়িষার দেওয়ানি পেলেন। ঋণপরিশোধের একটা উপায় হল, বাঙলার স্কন্ধেই ঋণভারটা চাপিয়ে দেওয়া হল। আরও, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা হল (১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে) এখন থেকে কোম্পানি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে বাৎসরিক ৪০লক্ষ পাউণ্ড দেবেন। এটা ঋণ নয়, বার্ষিক রাজভাগ। কারণ, কোম্পানি এখন অনেক রাজ্য লাভ করে রাজস্ব বৃদ্ধি করেছেন—"in respect of the territorial acquisition and revenues obtained in the East Indies."

(৬)

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ত এমনি করে কোম্পানির কাছে কর আদায় করতে লাগলেন, কিন্তু কোম্পানীর অবস্থা এমনি শোচনীয় হয়ে উঠল যে ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ জনসাধারণের কাছে কোম্পানিকে ১৪ লক্ষ পাউণ্ড ঋণ করতে হল। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এই ঋণ-গ্রহণ মঞ্জুর করলেন বটে কিন্তু একটা আইনও করলেন যে যতদিন এই ঋণ পরিশোধ না হয় ততদিন কোম্পানি অংশীদারদিগকে বার্ষিক শতকরা ৬ পাউণ্ডের বেশী লাভাংশ দিতে পারবেন না। তখন ব্যবসায়ে ক্ষতি হলেও অংশীদারদিগকে লাভাংশ দিতে হত, কারণ তা না হলে কোম্পানির প্রতিপত্তি নষ্ট হয়। যেখানে প্রকৃতপক্ষে লাভ নাই সেখানে লাভাংশ দিতে হলে, অবশ্য ঋণ করেই তা দিতে হয়। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট একথা বেশ বুঝলেন, বুঝে সুঝেই কোম্পানিকে ঋণ করতে অনুমতি দিলেন, কেবল বলে দিলেন যে, লাভাংশটা যখন ধার করেই দেওয়া হবে তখন সেটা যেন শতকরা ৬ পাউণ্ডের বেশী না হয়। ব্যবসায়-জগতে ঋণ করে লাভাংশ দেওয়া যতই আশ্চর্য্যজনক হক, এই অসাধারণ ব্যবসায়ীসম্প্রদায় তাই করলেন! তাঁরা যেন জানতেন এই ঋণ এবং এর আনুষঙ্গিক আরও যত ঋণ আছে সে সমস্তই এক দিন ভারতের স্কন্ধে চাপিয়ে দিয়ে কোম্পানি ঋণের দায় থেকে মুক্তি লাভ করবেন।

(৭)

দশ বছর পরে ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে কোম্পানি কমন্স সভায় আবার ঋণ করবার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। এবারকার প্রার্থনার বিশেষত্ব এই যে ঋণবৃদ্ধির অনুমতির সঙ্গে যেন লাভাংশ-হ্রাসের আজ্ঞা না হয়। অর্থাৎ কোম্পানি অংশীদারদের শতকরা যে ৮ পাউণ্ড লাভাংশ তখন দিচ্ছিলেন, সেটা তাই থাকবে, কিছুমাত্র কমবে না, যদিও এই হারে লাভাংশ দিতে হলে কোম্পানির জমা-খরচে জমার চেয়ে খরচটা ২,৫৫, ৮১৩ পাউণ্ড ফাজিল হয়ে পড়ে। তা হক, কমন্স সভা কোম্পানির প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন—প্রথমে ৫ লক্ষ, তারপর আরও ৩ লক্ষ পাউণ্ড কর্জ্জ করবার অনুমতি দিলেন (১)।

(১) History of India by James Mill edited by H. H. Wilson. Vol IV, p 356.

(৮)

এই বৎসর (১৭৮৩ খৃষ্টাব্দ) আবার সনন্দ বদলাবার সময় হল। এই উপলক্ষে অবশ্য পূর্ব্ব-রীতি অনুসারে নানা তর্ক-বিতর্ক উঠ্‌ল। তার মধ্যে প্রধান কথা এই যে ভারতবর্ষে কোম্পানি যে নূতন নূতন রাজ্য লাভ করছেন, সে রাজ্য কার হবে? কোম্পানির না ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের? কোম্পানি বললেন সে প্রশ্ন উঠতেই পারে না। কোম্পানি যে রাজ্য জয় করেছেন, সে রাজ্য কোম্পানিরই। এত স্বতঃসিদ্ধ। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রীরা বললেন প্রজা যে ভূমি লাভ করে, তাতে যে রাজারই একমাত্র এবং সম্পূর্ণ অধিকার তা চিরপ্রসিদ্ধ এবং রাজবিধি দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত। এই বাদপ্রতিবাদের তখন কোন সর্ব্ববাদিসম্মত মীমাংসা হয়নি। ৭৫ বৎসর পরে ঘটনাচক্রের একটা আবর্ত্তন মন্ত্রীদের কথাই সমর্থিত করল। সে কথার উল্লেখ পরে হবে। এর মধ্যে কমন্স সভায় একটা বিল পেশ হল। তাতে বিধান করবার প্রস্তাব হল যে গবর্ণর জেনারেল তাঁর মন্ত্রিসভার মতের বিরুদ্ধে, নিজের দায়িত্বে বিশেষ বিশেষ কায করতে ক্ষমতাবান হবেন। কিন্তু কমন্স-সভা তখন এ প্রস্তাব আইনে পরিণত হতে দেয় নি। তারপর ১৪০ বৎসর অতীত হয়ে গিয়েছে। এই দীর্ঘ কালের মধ্যে এই প্রস্তাব পরিণতি লাভ করে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের গবর্ণমেণ্ট অফ-ইণ্ডিয়া আইনের ৬৭ ধারারূপে মূর্ত্ত হয়ে গবর্ণর জেনারেলকে লেজিস্‌লেটিভ এসেম্ব্লির মতামত নিরপেক্ষ করে তাঁর ক্ষমতাকে অনিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছে। বিবর্ত্তন (evolution) যে আবর্ত্তনে (revolution) চেয়ে ভাল গবর্ণর-জেনারেলের সর্ব্ববশাসন-বহির্ভূত এই ক্ষমতাবৃদ্ধি তার একটা উৎকৃষ্ট উদাহরণ!

(৯)

আরও দশ বৎসর পরে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে কোম্পানির ঋণটা দাঁড়িয়েছিল এইরূপ—

ইংলণ্ডে	১,০৯,৮৩,৫১৮	পাউণ্ড।
ভারতবর্ষে	৭৯,৭১,৬৬৫	,,
মোট	১,৮৯,৫৫,১৮৩	পাউণ্ড।

অর্থাৎ তখনকার হিসাবে দু শিলিংএ টাকা ধরলে ঋণের পরিমাণটা হয় ১৮ কোটি ৯৫ লক্ষ, ৫১ হাজার ৮শত ৩০ ত্রিশ টাকা! তথাপি কোম্পানির অংশীদারদিগকে লাভাংশ দেওয়া হয়েছিল শতকরা ১৷৷ পাউণ্ড!! এতেও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারত গরর্ণমেণ্টের সুখ্যাতি করতেন সহস্রমুখে!!! কোম্পানীর অংশীদারেরা ত ধনী হয়েই ছিলেন, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টও কোম্পানির কাছে অ সাহায্য পেয়েছিলেন (১)।

(১) "India had fairly begun to be what India would continue to be, a vast s of wealth to the nation (British), affording a surplus revenue, sufficient to the East India Company and contribute largely toward the maintenance British Government. Such were the strains which year after year were sung ears of the nations, and dictated the legislative proceedings."—*History of In James Mill.*

(১০)

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে কোম্পানিকে আবার নূতন সনন্দ নিতে হয়। এবারকার সনন্দের প্রধান কথা হল কোম্পানির বণিগ্‌বৃত্তির অবসান ও রাজবৃত্তির আরম্ভ। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে বন্দোবস্ত হল ভারতবর্ষের রাজস্ব থেকে তাঁদের ভারতবর্ষ সংক্রান্ত সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করে দিতে হবে। এর মধ্যে প্রধান হল ভারতীয় যুদ্ধের জন্য, এবং কোম্পানির অংশীদারদের লাভাংশ দেবার জন্য, যে ঋণ করা হয়েছিল তা পরিশোধ করতে হবে। আর, এর পরেও ভারতবর্ষের ভিতরে বা বাইরে ভারতবর্ষ সংক্রান্ত যা কিছু ব্যয় হবে তাও অবশ্য ভারতবর্ষের রাজস্ব থেকে দিতে হবে। কিন্তু ভারতবর্ষের রাজস্ব এই বিপুল ব্যয়ভার বহন করতে সমর্থ হয়নি। এর জন্য কোম্পানিকে ঋণের উপর ঋণ করতে হ'ল। ১৮৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দ থেকে ঋণের হিসাবটা এইরূপ—

১৮৩৭-৩৮	খৃষ্টাব্দ	৩,৩৭,৭২,৭১৮	পাউণ্ড
১৮৩৮-৩৯	,,	৩,১৯,৬৫,৪৬২	,,
১৮৩৯-৪০	,,	৩,৪৪,৮৬,৯৯৭	,,
১৮৪০-৪১	,,	৩,৫৯,২২,১২৭	,,
১৮৪১-৪২	,,	৩,৮৪,০৪,৪৭৩	,,
১৮৪২-৪৩	,,	৪,০৪,৭৮,৬৪০	,,
১৮৪৩-৪৪	,,	৪,১৮,৮৩,৪৫১	,,
১৮৪৬-৪৭	,,	৪,৬৮,৮৪,২২৫	,,
১৮৪৭-৪৮	,,	৪,৮৭,৫৭,২১৩	,,
১৮৪৮-৪৯	,,	৫,১০,৫৪,৫১৮	,,
১৮৪৯-৫০	,,	৫,৩৯,৩৯,৭৬৮	,,
১৮৫০-৫১	,,	৫,৫০,৯৯,৩১৫	,,
১৮৫১-৫২	,,	৫,৫১,১৪,৬৯৩	,,
১৮৫২-৫৩	,,	৫,৬২,৩৩,৬৮৬	,,
১৮৫৩-৫৪	,,	৫,৩৬,৮৩,৪৬৮	,,
১৮৫৪-৫৫	,,	৫,৫৫,৩১,১২০	,,
১৮৫৫-৫৬	,,	৫,৭৭,৬৪,২৩৯	,,
১৮৫৬-৫৭	,,	৫,৯৪,৬১,৯৬৯	,,
১৮৫৭-৫৮	,,	৬,৯৪,৭৩,৪৮৪	,,

এই ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের শেষে কোম্পানির তিরোভাব হল এবং ভারতশাসন ক্ষেত্রে ব্রিটিশ রাজমুকুটের আবির্ভাব হল। কোম্পানির ডাইরেক্টারগণ এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রিগণ

মিলে স্থির করে দিলেন ভারতের স্কন্ধেই এই ঋণভার সমর্পিত হক, যে হেতু ভারতের মঙ্গলের জন্যই এর সৃষ্টি! তাই হল। ব্রিটিশ রাজমুকুট কোম্পানির পিণ্ড দান করে তাঁদের ধন হরণ করলেন। এই বিরাট ঋণটি সেই ধনের অন্তর্গত। বলা বাহুল্য ধন আর ঋণ একই কথা—একটি positive, অপরটি negative. Negative পদার্থের বিবর্ত্তন (evolution) হয় কি না বিবর্ত্তন তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলতে পারেন। কিন্তু আমরা দেখছি এই negative ধন, ঋণটি, ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই ৬৫ বৎসরে বিবর্ত্তিত হয়ে এখন এমন আকার ধারণ করেছে যে তার বার্ষিক সুদ হয়েছে ১১,০৯,০০,৯৪৬ টাকা! (১) এটি এখন নিত্য ব্যয়ের অঙ্গীভূত এবং এর retrenchment হয় না।

শ্রীহৃষীকেশ সে

কাছে আয়

(কীর্ত্তনের সুরে)

ওরে, কাছে আয়,—তোরা কাছে আয়।
দূর কিনারার—সিন্ধুর পার
কাছে দেখা যায়,—কাছে আয়।

চোখে আলোকের ধাঁধা নাই
পথে সীমানার বাধা নাই,——
পেয়েছি অবাধ, মুক্ত অগাধ,
কিজানি হারাই পাছে তায়।

প্রাণের টানের নিশানায়
ছুটে যাই যেথা দিশা নাই;
ঐ শুনি স্বর সুরে মনোহর——
উদাস বাতাসে নাচে গায়।

---

(১) Budget of the Government of India published in the Gazette of India, Extraordinary, dated, April 3, 1923.

একটি ছোট গল্প

পি, ডব্লু, আই অর্থাৎ পারমানেণ্ট ওয়ে ইনেস্‌পেক্টরের কথা

সে লাইনটি ছিল আমারই অধীন। আর তখন শীতকাল। সবে সকাল হ'য়েছে। কুয়ো আপনার একটা ঝাপ্‌সা পাত্‌লা আবরণ দিয়ে সব ঢেকে ফেলেছে। মানুষের দৃষ্টি একটু চলেই বাধা পাচ্ছিল।

খবর পেয়ে আমাকে সেখানে যেতে হ'ল। সে স্থানটি আসাম-বেঙ্গল-রেলওয়ের একটি ছোট ষ্টেশন থেকে মাইল-খানিক দূরে। পাহাড় তলিতে যদিও শীতকাল-ভোর কুয়ো হয় খুব বেশী, তবু যেন সেদিনের কুয়োর প্রতাপটা কেমন একটু বেতর।

ব্যাপার আর কিছুই নয়; লাইনে দু'টি মানুষ কাটা গিয়েছে। অকুস্থানে এসে দাঁড়ালাম। দেখ্‌লাম, দু'টি দেহ পাশাপাশি শুয়ে রয়েছে। অত বড় 'আপ-প্যাসেঞ্জারখানা' তাদের দেহের উপর দিয়ে চলে গিয়েছে, তবু তাদের কাকেও কারও সঙ্গচ্যুত করতে পারে নাই। মেয়েটি শিথিল মুষ্টিতে ছেলেটির একখানি হাত ধরে আছে। আর ছেলেটির একখানি হাত আল্‌গাভাবে মেয়েটির গায়ের উপর পড়ে রয়েছে।

দু'জনেরই মুখ প্রচণ্ড ঘর্ষণে কোথায় চলে গিয়েছে, তার ঠিকানা নাই। পোষাক অতি সাধারণ। সনাক্ত করা মুস্কিল। কেউই চিন্‌তে পার্‌ল না। কিন্তু আর যাই হোক, তাদের শয়নভঙ্গী যেন সমস্বরে ডেকে বল্‌ছে, তারা নির্ম্মম সমাজের নয়—তারা এ প্রাণহীন জগতের নয়। তারা স্বর্গের অধিবাসী, তারা প্রেমের পুণ্য রাজ্যের লোক।

ষ্টেশন মাষ্টার জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "বলুন ত, এদের বয়স কত হ'বে?"

কে সে নিষ্পেষিত মুখ-হীন দেহ দেখে তাদের বয়সের খবর বল্‌তে দেবে? তবে যাই হোক; তারা চিরকিশোর—তারা চির-তরুণ। সেই শীতের দুর্দ্দান্ত প্রতাপের মধ্যেও তারা বসন্তের নিত্য ভক্ত। তাদের রক্তাক্ত দেহকে জড়িয়ে আছে একখানা করে পাতলা কাপড়। সেই মৃতের গায়ের পাতলা কাপড় যেন বল্‌ছিল, শীতের কুয়ো তাদের মনকে কখনও জমাট করে তুল্‌তে পারে নাই।

যখন কিছুই স্থির করা গেল না, তখন পোষ্ট-মর্টেমের জন্য লাশ হাঁসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করে আমি সেখান থেকে সরে পড়্‌লাম।

* * *

এঞ্জিনের কথা

ভোঁস্—ভোঁস্—ভঁস্—ভঁস্—কিসে বাধা পেলাম; আমার গতি থেমে গেল। পূর্ণিমার আলো ঠিকরে বেরুচ্ছিল। শেষ রাত্তিরের জমাট কুয়াশা কিছুতেই তার স্বপ্রকাশকে ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পার্‌ছিল না।

আমি যন্ত্ররাজের প্রধান সহচর। আমার সাহায্য ভিন্ন কোন যন্ত্রই সচল নয়। টেনে আন্‌ছিলাম একখানি গাড়ী, যার মধ্যে নানান দেশের নানা লোক আপনাদের সব রকম বর্ণভেদ দূর করে বসে আছে। প্রত্যেকেই উন্মুখ—গন্তব্যপথে যাওয়ার একটুও বাধা তখন তারা সহ্য কর্‌তে প্রস্তুত নয়।

কত প্রিয়া-সমাগম-কাঙ্ক্ষিত তরুণ যুবক কল্পনা-নয়নে দয়িতার সুখ-স্পর্শ উপভোগ কর্‌ছিল। হঠাৎ আমাকে থাম্‌তে দেখে তারা সব বিরক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। জানালার ফাঁকে লক্ষ নয়ন সহসা ঝল্‌সে উঠ্‌ল—"ব্যাপারখানা কি ?"

চালকের ইঙ্গিতে আমাকে একটু পিছিয়ে আস্‌তে হ'ল। যেমন নড়ে উঠেছি, গাড়ীর লোকেদের মাথায় মাথায় ধাক্কা লেগে এ ওর ঘাড়ের উপর পড়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকে প্রত্যেকের ব্যবহারের নিন্দা করে তীব্র সমালোচনা সুরু করে দিল।

পিছিয়ে এলাম—বেশী দূর নয়—রশি খানেক পথ, দেখি দু'টি কবন্ধ। একটি নারী অপরটি নর। বুঝি জগতের আদিম মানব মানবীর স্পর্শ-লালসায় আমার লাইনে এসে প্রস্তরে কুসুম-শয়নে শুয়ে রয়েছে।

দু'টি ষ্টেশনের মাঝখানে এই কাণ্ড। দু'দিকে পড়ে প্রকাণ্ড মাঠ পাহাড়ের কোল আপনাকে মিলিয়ে দিতে ছুটে চলেছে। দূর হ'তে দেখা যাচ্ছে ছেয়ে রঙের কাপড়ের মত ঘুম পাহাড়ের বুক জড়িয়ে মাটিতে এসে লুটিয়ে পড়ছে।

এ স্তব্ধ ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য্যের মধ্যে রক্তাক্ত শব-মিথুন অনন্ত নিদ্রায় প্রণয়ের স্বপ্নে বিভোর কিন্তু মানুষ সৌন্দর্য্য বোঝে না—নিদারুণ করুণের কবিত্ব উপভোগ করে না। তারা চায় বাস্তব তারা রস চায় না—চায় রূপ, প্রাণ চায় না—চায় দেহ।

চালক কোন দিকে চেয়ে দেখ্‌ল না। কুয়ো—পাহাড়—জ্যোৎস্না—অনন্ত আকাশ বুক ভেদ করে এতক্ষণ শোঁ-শোঁ করে ছুটে আস্‌ছে, তাদের কোনটির দিকে সে চেয়ে দেখবার গাড়ীখানা থামিয়ে দিল। তার পর সে একবার লাইনে নেমে গেল। মৃতদেহ দু'টির পানে একটিবার—শুধু একটিবার—তাদের আত্মার জন্যে একটি ছোট নিঃশ্বাস রেখে জমাদারকে খবর দিল। সে টেলিফোনের সাহায্যে নিকটস্থ ষ্টেশনে সংবাদ জানা'ল। পরেই একখানি গাড়ী করে S. M. আর সেই লাইনের P. W. I. অর্থাৎ ষ্টেশন মাষ্টার পারমানেণ্ট ওয়ে ইনেস্পেক্‌টার অকুস্থানে এসে পৌঁছিলেন।

আমি প্যাসেঞ্জার ট্রেণ, আমাকে 'ডিটেন' কর্‌তে পারে না—কাজেই লাইন বেঁকিয়ে লাইনের সাহায্যে আমাকে 'পাস' করে দিল। বাধ্য হ'য়ে আমি চল্‌লাম—ভোঁস্—ভোঁস্—ভোঁস্—ভোঁস্।

* * *

লাইনের কথা

গৌতমের শাপে অহল্যা পাষাণ হয়েছিল ; জানি না কার অভিশাপে আমি আজ রেলের লাইন। অহল্যার পাথরের বুকের উপর দিয়ে যতই কেন উৎপীড়ন হ'য়ে যাক্, আমার উপর দিয়ে যে নিদারুণ অত্যাচার চল্‌ছে, তার তুলনায় সে কিছুই নয়। আর রামের চরণধূলায় অহল্যা মুক্তিলাভ করেছিল, কিন্তু কত রামনাথ, রামদাস, রামরঞ্জন, রামকিঙ্কর, রামপ্রসন্নের পদাঘাতেও আমার কিছু হ'ল না। হ'বে কি—আমায় যে রামজী ওঝা (কুলি) এই ভাবে বসিয়ে পাথর দিয়ে ঘিরে রেখেছে।

পড়ে আছি অনড় হয়ে। লোহার প্রাণে কত করুণ দৃশ্য দেখ্‌ছি, কিন্তু করুণা নাই ; কাজেই তার চিহ্ন জল কোথায় ?

আমার বুকের উপর মাথা দিয়ে এত বড় কাণ্ড ঘটে গেল ; যার জন্যে কুলিরা দুঃখিত, পি, ডব্লু, আই রুমালে চোখ মুছ্‌লেন, এঞ্জিন তপ্ত বাষ্পে আমার বুক ভাসিয়ে দিল—আমি কিন্তু তাতেও নির্ব্বিকার নির্ব্বিকল্প।

তবে বল্‌তে পার এত কথা বলি কেন ? মূক আমি ; যখন ভাষা নেইই, তখন নীরব ভাষায় শোকের কথা বলার চেয়ে না বলাই ভাল।

বল্‌তাম না—ওগো আমি একথা বলিতাম না—বুকের মধ্যে পুরে পাথর কামড়ে পড়ে থাক্‌তাম। কিন্তু পান্‌সে চোখ ঐ এঞ্জিনের জ্বালায় না বলে থাক্‌তে পার্‌লাম না।

এ-বি-আরের (A. B. Rএর) ৫৬ নং ইঞ্জিন সে ঘটনার শেষটুকু জান্‌তে পারেনি কিনা…'প্যাসেঞ্জার' নিয়ে চলে যেতে বাধ্য হল…তাই যাওয়ার আগে আমাকে মাথার দিব্যি দিয়ে গেল…আমি যেন শেষটুকু বলি ; তাই আমার এই নাকাল।

পূর্ণিমার আলোয় আমার বুক ভরে ছিল। মন তখন আনন্দে ভরপূর। কারণ সেই জ্যোৎস্না ভেদ করে ঘণ্টা দুই আর আমার বুকের উপর দিয়ে কোনো গাড়ী যাবে না। আমি আলোর স্বরূপে একেবারে আকণ্ঠ ডুবে গেলাম। তখনও কুয়াসা এসে জ্যোৎস্নাকে গলিন করে নাই। ধীরে ধীরে 'নিস্পি' এসে আমার মাথার গোড়ায় দাঁড়াল। সে কুকীর মেয়ে। রং তার দুগ্ধ-ধবল নয়…চেহারায়ও কোনখানে কবির "বর্ণনার কিছুই নাই। উর্ব্বশী বা…তিলোত্তমা নয়…এসে দাঁড়াল কিনা নিস্পি। কিন্তু আমার মনে হ'ল, আমার মন যেন এই রকমই একজনের আসার পথপানে চেয়ে ছট্‌ফট্ করছে। নীরব ভাষা বুক ভরে করে উঠ্‌ল "এসেছ বন্ধু ? বস।"

ওমা, সত্যিই যে সে বস্‌ল। মেয়েটি যে রকম সাড়াহীন, ও যে আর উঠ্‌বে বলে বোধ হ'চ্ছে না। আমার বুক দুর্‌দুর্ করে উঠ্‌ল। আমি ত' জানি ঘণ্টা দুই পরে ভীষণ

দৈত্যের সংহারের পূর্ব্বাভাসের মত 'আপ-প্যাসেঞ্জার' এসে, ওভাবে থাক্‌লে, ওকে দলে পিশে চলে যাবে।

মেয়েটি গান ধর্‌ল ..গানের ভাষা মুখস্থ হয় নি'...কিন্তু ভাব এই—

"এই রকম জ্যোৎস্নায় বাপমার আনন্দের মাঝখানে আমার জন্ম হয়েছিল, আর আজকে এই জ্যোৎস্নায় নিজের আনন্দে আমি নিজে ঝরে যাব...যাব...যাব। এ পৃথিবী স্বার্থপর, মানবসমাজ মমতাহীন। এখানে আমার জায়গা নাই —নাই—নাই।"

গানের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে যে এল...সে কিম্পু। সে হচ্ছে গারো। পুরুষের মত বিশাল বক্ষ...উন্নত শরীর...সবল দেহযষ্টি। সে এসে বল্‌ল,—"তুমি এখানে? আমি যে তোমাকে সারা দেশ খুঁজে হয়রাণ হ'লাম।"

সে একটু ব্যথার হাসি হেসে বল্‌ল,..."আর কেন কিম্পু, আজ আমার শেষ। আর কেন তোমার চোখের জলে আমার যাওয়ার পথ কাদা করে দেও?"

কিম্পু উত্তর দিল..."একা যাবে কেন নিম্পি, আমিও যাব।"

"আমাদের কি অপরাধ?".....

"অপরাধ! অপরাধ আমরা সমাজের শাসন মানি নে'। সমাজ আমায় দলগতি [মেয়ে বিয়ে কর্‌তে বল্‌ল...আমি তা' না করে তোমায় করেছি। মানুষের শাসন না যে মনের শাসন মেনেছি...একি কম অপরাধ? তুমি কুকী হয়ে গারোকে বিয়ে করে এই জন্যই ত তোমাদের সর্দ্দারের হুকুম...আমাকে ত্যাগ করে, তোমায় কালই ওংচাংকে বি কর্‌তে হ'বে। তুমি তা' পার্‌বে না বলে মর্‌তে এসেছ...আর আমি স্বার্থপর হয়ে থাক্‌তে চাই না বলে মর্‌তে এসেছি।"

"সেই ভাল! তোমাকেও রেখে যাব না। তুমি যে এ জগতে আর কারও সে আমার সহ্য হ'বে না। চল, আমরা দু'জনেই পর পারে যাই। আর ভগবানের প্রার্থনা করি,—পর জন্মে যেন মানুষ হয়ে না জন্ম গ্রহণ করি।"

"ও কথা কেন নিম্পি! প্রবল দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার সব প্রাণীতেই করে। দেখ, কুয়োতে আকাশ পাহাড় সব ঢেকে ফেল্‌ল। এখুনি গাড়ী এসে পড়্‌বে। লাইনে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ি। আর তুমি একটি গান গাও। তাই শুন্‌তে শুন্‌তে পরলোকের পথে এগিয়ে চলা যাক্।"

দূরে ট্রেণের মৃদু শব্দ শুনা গেল। আমার বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করে উঠ্‌ল। লোহার প্রাণের স্পন্দন, মানুষের প্রাণে দাগ টান্‌তে পার্‌ল না।

গাড়ীর শব্দ ক্রমে প্রবল হ'তে লাগ্‌ল। আর সেই শব্দকে পরিহাস করে কণ্ঠ তারে তারে ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌ল...।

"জানি নে' জানি নে' বলিতে পারি নে, আমারে কি ভাল বেসেছ স্বামী।"

মুহূর্ত্তেই গাড়ী এসে খানিক দূরে গিয়ে থেমে গেল.....ভঁস্—ভঁস্—ভোস্—ভোস্।

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্যপু

সুর-সন্ধান

(ঘুঘু-ডাক ছন্দ)

নিঝুম পল্লীর মাঝে, মাঝে, মাঝে,
কি-সুর আটপ'র বাজে, বাজে, বাজে!
নানান্ ঝঙ্কার দিশি, দিশি, শুনি!
সুরের জালটাই দুখে, সুখে, বুনি!

ঘুঘুই হায়, হায়, থেকে, থেকে, কা'কে
অমন উন্মন কেঁদে, কেঁদে, ডাকে!
"ঘুঘুর্ ঘুঘ্‌ঘুর্ ঘুরু, ঘুরু, ঘুরু"—
কাঁদন শুন্‌ছিই, হিয়া, উড়ু, উড়ু!

সুরের মন্থন চলে, সারা, বুকে!
হৃদয় আ'ল্-বা'ল্ করে, বড়, দুখে!
কি-এক ক্রন্দন প্রাণে, প্রাণে, বাজে!
জগৎ সংসার কাঁদে, ভাঁজে, ভাঁজে!

যেথায় যার যার ব্যথা, ছিল, চাপা,
জাগায় ওই সুর প্রাণে 'সা-নি, ধা-পা!'
প্রিয়ার প্রাণ আজ কাঁদে, কারো, লাগি'!
প্রিয়ের মন আর কারো, অনু-রাগী!

দুপুর ভোর সাঁজ একা, কেঁদে, মরে!
তেঁতুল বাঁশ্-ঝাড় সুরে, সুরে, ভরে!
নে' যায় কোন্-এক ভুলে-যাওয়া, ভবে!
জীবন যৌবন কাঁদে, ঘুঘু-রবে!

হাজার সুখ থাক্ সারা, মনে, প্রাণে,
উদাস ওই সুর কেন, হেন, টানে!
প্রিয়ায় চুম্ খাই, রাখি, কাছে, কাছে!
আবার চম্‌কাই! কি যে, হবে, পাছে!

নারীর বোল্-চাল্ প্রাণে, সুধা, ঢালে!
সুরের রোশ্‌নাই দিকে, দিকে, জ্বালে!
স্বপন্-চুল্ চুল্ যত, আঁখি-পাখী,
নীরব ঝঙ্কার তোলে, প্রাণে, থাকি'!

সুরের স্পন্দন শিশু, যুবা, নারী,
জাগায় বিল্‌কুল্ বাড়ী, বাড়ী, বাড়ী!
প্রাণের পর্দ্দায় বাজে, ধীরে, ধীরে!
ঘুম শিউরাই! ভাসি, আঁখি-নীরে!

ও-সুর কোন্ সুর? কেন, বুকে, বিঁধে!
যুবক হাৎড়ায় কা'কে, গাঢ়, নিঁদে!
ফাটুক্ বুক, মুখ কবে, খোলে, ছুঁড়ী?
ফোটায় প্রাণটায় সেও, দুটো, কুঁড়ি!

যে যার ভরপূর দুখে, খালি, কাঁদে!
কথায় বলতেই লাজে, কথা, বাধে!
দুখের উচ্ছ্বাস ধনী, মানী, বোঝে!
দুখের মুলটুক্ আঁতি-পাঁতি, খোঁজে!

মিছাই উট্‌কাই! ইতি, উতি, মধু!
মধুর মৌচাক সে যে, নব, বধূ!
সে'-মৌ দাও বৌ! শুধু. খুঁজি, সুধা!
প্রেমের হায়, হায়, কোথা, মেটে, ক্ষুধা!

প্রেমের তৃষ্ণায় সুরে, সুরে, ভাসি!
সবার মুখ চাই! দেখি, শুনি, হাসি!
ভবের আখ্‌ড়ায় তালে, মানে, খুঁজি!
সে'-সুর পাই-পাই! পুনঃ, গেল, বুঝি!

এরূপ দিনরাত, খুঁজে, খুঁজে. মরি!
ধরার খুব সাধ, ধরি-ধরি, করি!
কোথায়! পাই কই! সে-যে, বড়, দূরে!
সুরের যশ গাই ভাঙা, ভাঙা, সুরে!

সুরের হিল্লোল বুঝি, মাঝে, মাঝে,
ব্যাকুল প্রাণটায় বাজে, বাজে, বাজে!
ঘুঘুই তাই আজ থেকে, থেকে, তা'কে,
"ঘুঘুর ঘুঘ্‌ঘুর—" একা, একা, ডাকে!

আমার প্রাণ্ মন ঘুঘু-সাথে, সাথে,
সে-সুর ঢুঁঢ়ছেই সারা, দিনে, রাতে!
সে'-সুর-সন্ধান্ চলে, অহ-রহঃ!
বাতাও একবার! পাখী, কহ, কহ!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

ফ্রান্সের দর্শন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আমরা কতকগুলি ফরাসী দার্শনিকের সমালোচনা করিয়াছি, শুধু তাঁহাদের বৈচিত্র্য, তাঁহাদের মৌলিকতা,—কি নূতন জিনিস তাঁহারা আনিলেন, জগৎ তাঁহাদের নিকট কি কি বিষয়ের জন্য ঋণী—শুধু এই সমস্তের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই আমরা সমালোচনা করিয়াছি। এখন আমরা আলোচনা করিব,—ফরাসী চিন্তাধারায় সাধারণ লক্ষণগুলি কি, পরিচায়ক লক্ষণগুলি কি।

তাঁহাদের কোন একটা গ্রন্থ পাঠ করিলেই, যে-লক্ষণ প্রথমেই চোখে পড়ে—ে হইতেছে—আকারের সরলতা। যদি ১৯ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধ বাদ দেওয়া যায়—যে সময়ে মধ্যে ২০।৩০ বৎসর কাল যাবৎ অল্পসংখ্যক কতকগুলি দার্শনিক, বৈদেশিক প্রভাবের বশবর্ত্ত হইয়া, কখন কখন স্বদেশের চিরাগত উজ্জ্বল পথ হইতে ভিন্ন পথে যাত্রা করিয়াছিলেন,—তখা বলা যাইতে পারে, ফরাসী দর্শন বরাবর নিম্নলিখিত মূল নিয়মের দ্বারা নিয়মিত হই আসিয়াছে :—

যতই গভীর হউক, যতই সূক্ষ্ম হউক, এমন কোন দার্শনিক তত্ত্ব (idea) নাই যা সকলেরই ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারা না যায়। ফরাসী দার্শনিকেরা কোন এক গণ্ডি দীক্ষিত মণ্ডলীর জন্য গ্রন্থ রচনা করেন না, প্রত্যুত স্বকীয় বক্তব্য কথা শুনাইবার জন্য স মানবমণ্ডলীকেই আহ্বান করেন। তাঁহাদের চিন্তাধারার গভীরতার পরিমাণ করিবার সম্পূর্ণরূপে বুঝিবার জন্য দার্শনিক হওয়া আবশ্যক,—পণ্ডিত হওয়া আবশ্যক হইলেও এমন সুশিক্ষিত ব্যক্তি নাই যিনি তাঁহাদের মুখ্য গ্রন্থগুলির মর্ম্মগ্রহ করিতে না পারেন—তাহা হইতে কতকটা ফল লাভও করিতে না পারেন। যখন কোন নূতন কথা প্রচ জন্য তাঁহাদের নূতন বাক্য প্রয়োগের প্রয়োজন হয়, তখন তাঁহারা—যেমন অন্যত্র থাকে—একটা বিশিষ্ট প্রকারের শব্দকোষ গঠনের চেষ্টা করেন না (ভাল হয় নাই এইরূপ কতকগুলি তত্ত্বকথাকে কতকগুলা কৃত্রিম শব্দের মধ্যে আবদ্ধ এই চেষ্টা প্রায়ই পর্য্যবসিত হয়) প্রত্যুত তাঁহারা প্রচলিত শব্দসমূহে এমন একটা রঙের পোঁচ দেন যে তাহার দ্বারা খুব সূক্ষ্ম, খুব গভীর তত্ত্বকথাও ভাষান্তরিত হইতে এইরূপেই—আর বেশী নাম করিব না—দেকার্ত্ত পাস্‌কাল, রুসো—চিন্তার বিশ্লেষণই উদ্দেশ্য হোক (দেকার্ত্ত) কিংবা ভাব-রসের বিশ্লেষণই প্রকৃত উদ্দেশ্য হোক্ (পাস্‌কাল, —ইঁহারা ফরাসী ভাষার শক্তি ও নমনীয়তা খুব বাড়াইয়া তুলিয়াছেন। ফলতঃ ব্যাপারগুলাকে বিশ্লেষণের শেষ সীমায় লইয়া গিয়াও তাহা খুব সরল বাক্যে প্রকা তাঁহারা আবশ্যক মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু, ন্যূনাধিক পরিমাণে, সকল ফরাসী

এই বিশ্লেষণশক্তি আছে। তত্ত্বকথাগুলাকে এমন-কি ভাবের কথাগুলাকেও বিশ্লেষণের দ্বারা সুস্পষ্ট ও পৃথক্ উপাদানে পরিণত করা এবং তাহা প্রচলিত সাধারণ ভাষায় প্রকাশ করা—ইহা গোড়া হইতেই ফরাসী দর্শনের পরিচায়ক লক্ষণ।

এক্ষণে, বাহ্য আকারটা এরূপ না হইলেও, এই পরিচায়ক লক্ষণটা প্রথমেই চোখে পড়ে।

ফরাসী দর্শন চিরদিনই ধ্রুববিজ্ঞানের সহিত ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ; জর্ম্মাণ দেশে, অমুক দার্শনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত হইতে পারেন; অমুক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত দার্শনিক হইতে পারেন; কিন্তু ফ্রান্সে এই দুই স্বাভাবিক দক্ষতা এই দুই মানসিকপ্রবণতা একসঙ্গে দেখিতে পাওয়াযায়—ইহা অন্যত্র দেখা যায় না। ইহা ফ্রান্সের একটা বিশেষত্ব—একটা আগন্তুক ধর্ম্ম বলিলেও চলে। Leibnitz যুগপৎ বড় দার্শনিক ও বড় গণিতবেত্তা হইলেও আমরা দেখিতে পাই, জর্ম্মণ দর্শনের প্রধান পরিণতি যাহা ১৯ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ ধরিয়া চলিয়াছিল—তাহা ধ্রুববিজ্ঞানের বাহিরে সম্পাদিত হয়। ইহার বিপরীতে, বিজ্ঞানের উপর ভর দিয়া থাকাই ফরাসী দর্শনের সার-কথা। দেকার্ত্তের মধ্যে, দর্শন ও গণিত এরূপ ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিল যে, বলা বড় শক্ত দর্শন হইতে তিনি গণিতের আভাস পাইয়াছিলেন, কিংবা তাঁহার দর্শন তাঁহার গণিতেরই একটা অনুবৃত্তি —একটা প্রসারণ মাত্র ছিল। পাস্‌কাল দার্শনিক হইবার পূর্ব্বে একজন পারদর্শী গণিতবেত্তা ছিলেন, একজন মৌলিক ধরণের ভৌতিক বিজ্ঞানবেত্তা ছিলেন। ১৮ শতাব্দীর ফরাসী দর্শন, প্রধাণতঃ জ্যামিতিকদিগের মধ্য হইতে, ভৌতিকবিজ্ঞানবেত্তাদিগের মধ্য হইতে, চিকিৎসকদিগের মধ্য হইতেই (D' Alembert, La Mettrie, Bonnet, Cabanis ইত্যাদি।) কর্ম্মী সংগ্রহ করিয়াছিল। ১৯ শতাব্দীতে, কতকগুলি বড় বড় ফরাসী দার্শনিক—যথা, Auguste Comte, Cournot, Renouvier, প্রভৃতি—গণিতের পথ মাড়াইয়া দর্শন-ক্ষেত্রে উপনীত হইয়াছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে, Henri Poincare একজন প্রতিভাবান গণিতবেত্তা ছিলেন। Claude Bernard যিনি পরীক্ষামূলক পদ্ধতির দর্শন আমাদিগকে দান করিয়াছেন, তিনি শারীরতত্ত্ব-বিজ্ঞানের একজন স্রষ্টাস্থানীয়।

যে সকল ফরাসী দার্শনিক, বিগত শতাব্দীতে, অভ্যন্তরিক পর্য্যবেক্ষণে ব্রতী হইয়াছিলেন, এমন-কি তাঁহারাও তাঁহাদের বাহিরে, শারীরতত্ত্বের মধ্যে, মানসিক নিদানতত্ত্ব প্রভৃতির মধ্যে, এমন কিছু অন্বেষণ করিবার প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়াছিলেন, যাহাতে করিয়া তাঁহারা নিশ্চিত জানিতে পারেন যে, শুধু কতকগুলা idea'র খেলায়, মনের কতকগুলা সূক্ষ্ম (concept) অতিগত সাধারণ সংস্কারের আলোচনায় তাঁহারা গা-ভাসাইয়া দেন নাই; গভীর অন্তর্দৃষ্টি-পদ্ধতির যিনি প্রথম প্রবর্ত্তক সেই Maine de Biran-র মধ্যেও এই প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। এই কথায়, দর্শন ও বিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ সম্মিলন,—ফ্রান্সে এরূপ নিত্যঘটনার বিষয় হইয়াছিল ইহাকে ফরাসী-দর্শন বলিয়া পরিচিহ্নিত ও নির্ণীত করিলেই যথেষ্ট হইবে।

ততটা বিশিষ্ট ধরণের না হইলেও আর একটা লক্ষণও আমাদের খুব চোখে পড়ে—সেটা হইতেছে,—আত্মতত্ত্বের দিকে, আভ্যন্তরিক পর্য্যবেক্ষণের দিকে ফরাসী দার্শনিকদিগের প্রবণতা। অবশ্য, পূর্ব্ববর্ণিত লক্ষণের ন্যায় এ লক্ষণটিকে চিরন্তন ফরাসী ধারার অনুযায়ী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না; কেননা, এই প্রবণতা স্বতঃই আপনাকে তলাইয়া দেখিতে চাহে, অন্যের আত্মাতেও সহানুভূতিযোগে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করে; তাহার দৃষ্টান্ত, এই প্রবণতা ফ্রান্সের ন্যায় ইংলণ্ড ও আমেরিকাতেও ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু যেমন একদিকে বড় বড় জর্ম্মাণ দার্শনিক (এমন-কি Leibnitz, এমন-কি Kant পর্য্যন্ত) আধ্যাত্মিক উপলব্ধির বড় একটা পরিচয় দেন নাই, যেমন একদিকে সম্ভবতঃ একমাত্র জর্ম্মাণ মনস্তত্ত্ববিৎ (Shopen haur ১৮ শতাব্দীর ফরাসী দর্শনে যাঁহার মন সম্পূর্ণরূপে পরিসিক্ত ছিল) আত্মতত্ত্ববিৎ ছিলেন, তেমনি ইহার বিপরীতে বলা যাইতে পারে,—এমন একজনও ফরাসী দার্শনিক ছিলেন না যিনি সময়-বিশেষে, মানব-আত্মার সূক্ষ্ম ও অন্তর্ভেদী পর্য্যবেক্ষণের পরিচয় দেন নাই। দেকার্ত্ত ও মালব্রাঁশের মনস্তত্ত্বিক বিচার আলোচনার সহিত অধ্যাত্মতত্ত্বের আলোচনাও যে মিশ্রিত ছিল, একথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। ভৌতিক জ্যামিতিক, ও দার্শনিক তত্ত্ব সম্বন্ধে প্যাস্‌কালের যেরূপ দৃষ্টি ছিল, আত্মার অনালোকিত প্রদেশে তাঁহার সেইরূপ প্রখর দৃষ্টি ছিল। Condilliac যেমন তর্কশাস্ত্রবেত্তা ছিলেন, তেমনি আত্মতত্ত্ববিৎও ছিলেন! তাহা হইলে যাঁহারা আত্মতত্ত্বঘটিত বিশ্লেষণের নূতন নূতন উন্মুক্ত করিয়াছেন—যথা Rousseau কিম্বা Maine de Biran—তাঁহাদের সম্বন্ধে কথা আরও কত-না বলা যাইতে পারে। সমস্ত ১৭-শতাব্দী ও ১৮-শতাব্দীর মধ্যে, আভ্যন্তরিক জীবনের উপর প্রযুক্ত ফরাসী চিন্তা-ধারাই—১৯-শতাব্দীর যে প্রধান কীর্ত্তি সেই বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক আত্মতত্ত্বের ভিত্তি প্রস্তুত করিয়াছে। তাছাড়া, Moreau de Tours, Charcot, Ribot এই বৈজ্ঞানিকেরা অত্মতত্ত্ববিদ্যার সংস্থাপনে যেরূপ সাহায্য করিয়াছিলেন সেরূপ আর করে নাই। একটা কথা এইখানে বলি—এই সকল আত্মতত্ত্ববিদ্যার পদ্ধতি—যাহা অনেক করিয়া তাঁহারা বড় বড় আবিষ্কার করিয়াছেন—উহা আভ্যন্তরিক পর্য্যবেক্ষণপদ্ধতি একটা প্রসূতি মাত্র। তাঁহারা বরাবর আত্মচৈতন্যের দোহাই দিয়াছেন; কেবল লোকের আত্মচৈতন্যের লক্ষণগুলাকে না ধরিয়া, রুগ্ন লোকদিগেরই লক্ষণগুলা ধরিয়াছেন।

এই দুইটিই হইতেছে ফরাসী দর্শনের মুখ্য লক্ষণ।

এই দুই লক্ষণের একত্র সমাবেশ হওয়ায়, এই দর্শন একটা নিজস্ব আকার হইয়াছে। বাহ্য বাস্তবতার অবয়ব-রেখা যাহা ভৌতিকতত্ত্ববেত্তা নির্দ্দেশ করিয়াছেন আভ্যন্তরিক বাস্তবতার লক্ষণ যাহা আত্মতত্ত্ববেত্তার নিকট প্রতিভাত হইয়াছে—এই দর্শন পরস্পরের খুব কাছাকাছি আনিয়াছে। ইহারই দরুণ, এই দর্শন কোন

বিশেষ দর্শনপদ্ধতি অনুসরণ করিতে নারাজ। এই দর্শন যেমন একদিকে নিতান্ত মূল ঘেঁসা বিচার-আলোচনা পরিত্যাগ করিয়াছে, সেইরূপ আর একদিকে, মত-বিশেষের অতি-পক্ষপাতিতাও পরিবর্জ্জন করিয়াছে। ইহার পদ্ধতি যেমন কাণ্টের পদ্ধতি হইতে, সেইরূপ হেগেলের পদ্ধতি হইতেও দূরে অবস্থিত। একথা বলিতেছি না যে, এই দর্শন ইচ্ছা করিলে কোন একটা বড় ইমারৎ গড়িয়া তুলিতে অসমর্থ। বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান থাকা প্রযুক্ত এবং অবিরাম বাস্তবতার সহিত সংস্পর্শে আসিবার দরুণ, এই দর্শনের ভিতরে ভিতরে সাধারণতঃ যেন এই অনুচিন্তাটি রহিয়া গিয়াছে যে, কোন একটা (idea) তত্ত্বের চরম সীমায় পৌঁছান বরং সহজ, কিন্তু (deduction) অবরোহী সিদ্ধান্তটাকে একজায়গায় থামাইয়া দেওয়াই কঠিন। পাস্‌কাল বলিয়াছেন,—"জ্যামিতিক বুদ্ধি" যথেষ্ট নহে; তাহার সহিত আরও সূক্ষ্মতর বুদ্ধি দর্শনের দ্বারা যোগ করিয়া দিতে হইবে। এবং সেই বড় দার্শনিক দেকার্ত্ত বলিয়াছেন যে, তিনি মনস্তত্ত্বের আলোচনায় অল্প সময়ই আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন;—অবশ্য এই কথার তাৎপর্য্য এই যে, মনস্তত্ত্বঘটিত নিছক অবরোহী সিদ্ধান্ত বা নিছক (construction) সংগঠন কার্য্য—পূর্ব্ব-পক্ষপাতিতা একটু আধটু থাকিলেও—স্বতঃই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।—তবে এইকথা হইতে ইহাই কি প্রতিপাদিত হইবে যে, দর্শনকে ততটা পদ্ধতিবদ্ধ করেন নাই বলিয়া তিনি তাঁহার লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন এবং বাস্তবকে একাকারে পরিণত করাই তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ছিল।—কিন্তু ফরাসী দর্শন এই একীকরণ প্রক্রিয়াকে কখনই পরিত্যাগ করে নাই। কেবল ফরাসী দর্শন, কোন একটা তত্ত্ব গ্রহণ করিয়া সেই তত্ত্বের ভিতর, স্বেচ্ছাক্রমেই হউক, বলপূর্ব্বকই হউক, সব জিনিস সমগ্রভাবে পূরিয়া দিতে নারাজ ছিল। এই তত্ত্বের প্রতিকূলে আর একটা কোন তত্ত্ব আনা যাইতেও পারে, এবং তাহার দ্বারা একই প্রণালী অনুসরণ করিয়া, ভিন্ন দর্শন-পদ্ধতি গঠন করা যাইতেও পারে; তাছাড়া এই দুই পদ্ধতিকেই যুক্তির দ্বারা সমর্থন করা যাইতে পারে, অথচ বাস্তব বলিয়া সপ্রমাণ না-করা যাইতেও পারে। এইরূপে দর্শন একটা খেলার জিনিস হইয়া পড়ে, তর্কযুদ্ধের একটা মার প্যাঁচের ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। এইখানে একটা কথা বলি—কোন তত্ত্ব (idea) আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিরই একটা উপাদান এবং আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিও বাস্তবতার একটা উপাদান; অতএব কোন তত্ত্ব—যাহা একটা অংশের অংশমাত্র—সেই তত্ত্ব সমগ্রকে—সমস্তটাকে কেমন করিয়া আপনার অন্তর্ভুক্ত করিবে? যে প্রকরণ দ্বারা পদার্থসমূহের একীকরণ-ব্যাপার নিষ্পন্ন হয় তাহা অপেক্ষাকৃত আরও কঠিন, আরও দীর্ঘকালব্যাপী, আরও সুকুমার ধরণের। মানবীয় চিন্তাধারাকে কোন একটা তত্ত্বের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ না রাখিয়া এমন একটা সীমা পর্য্যন্ত প্রসারিত করা উচিত—যেখানে গিয়া মহাবাস্তবতার বিভিন্ন অংশ-বিশেষের সহিত উত্তরোত্তর একীভূত হইতে পারে। ইহার জন্য বহু শতাব্দীর সাধনা চাই। ইত্যবসরে, প্রত্যেক দর্শনের নির্দ্দিষ্ট কাজ কি?—না, পদার্থসমূহের

আলোচনার দ্বারা এমন-কতকগুলি বিষয় নির্দ্ধারণ করা যাহা ধ্রুবনিশ্চিত এবং আর কতকগুলি বিষয় নির্দ্ধারণ করা যাহা আপাত-গ্রাহ্য মাত্র। ইচ্ছা করিলে উহাতেও কোন একপ্রকার পদ্ধতির অবতারণা করা যাইতে পারে; কিন্তু দার্শনিক পদ্ধতির চিরপ্রথা অনুসারে, এই পদ্ধতির অন্তর্নিহিত নীতি সূত্রটী বদ্ধভাবাপন্ন না হইয়া, বেশ নমনীয় হইবে, যত ইচ্ছা উহাকে প্রসারিত করা যাইতে পারিবে—এইরূপ হওয়া চাই। আমাদের মনে হয়, ইহাই ফরাসী দর্শনের অন্তর্নিহিত নিগূঢ় ভাব। এই ভাবটা যে সম্পূর্ণ সজ্ঞানভাবে স্বতঃই প্রকাশ পাইয়াছিল তাহা নহে, পরন্তু শতাব্দীর শেষাশেষি সময়ে এই ভাবটিকে একটু কষ্ট করিয়া সূত্রবদ্ধ করা হয়। কিন্তু আরও শীঘ্র উহা যে আপনাকে বিনির্ম্মুক্ত করে নাই, তাহা শুধু এই জন্যই যে, উহা ফরাসী-মনের স্বভাবসিদ্ধ জিনিস। আসলে ফরাসী-মন খুব নমনীয়, খুব সজীব, উহার ভিতর কিছুমাত্র যান্ত্রিক ভাব নাই, কৃত্রিমতা নাই। তাছাড়া ফরাসী মনঃপ্রকৃতি খুব সামাজিকভাবাপন্ন, উহা ব্যক্তিগত গঠনকার্য্যের প্রতি বিমুখ, যাহা কিছু মানবজাতির সাধারণ জিনিস ফরাসী-মন সেই দিকেই ধাবিত হয়।

আমরা যে ২।৩টি প্রবণতার নির্দ্দেশ করিলাম, তাহার দ্বারাই বোধ হয় বুঝিতে পারা যাইবে কেমন করিয়া ফরাসী দর্শন নিয়ত লোকের চিত্তরঞ্জন করিয়াছে ও সৃষ্টিকার্য্যে তৎপরতা দেখাইয়াছে; কেমন করিয়া, যাহা সকল জগতের ভাষা সেই ভাষাতেই কথা কহিয়াছে; কোনপ্রকার দার্শনিক "জাতের" বিশেষ অধিকারের দাবী করে নাই। উহা সকলেরই আয়ত্তাধীনে নিয়ত আপনাকে স্থাপন করিয়াছে; জনসাধারণের কাণ্ডজ্ঞানের (common sense) বন্ধন হইতে—সহজ বুদ্ধির বন্ধন হইতে আপনাকে কখনও বিচ্ছিন্ন করে নাই।

ফরাসী দার্শনিকদিগের মধ্যে কেহ কেহ আত্মতত্ত্ববিৎ, কেহ কেহ জীবন-তত্ত্ববিৎ, কেহ কেহ গানতত্ত্ববিৎ ছিলেন। তাঁহাদের দর্শন যেমন বিজ্ঞানের সংস্পর্শে আসিয়াছিল তেমনি জীবনের সংস্পর্শেও আসিয়াছিল। এইরূপ জীবনের সহিত, বিজ্ঞানের সহিত, সহজ-বুদ্ধির সহিত নিয়ত সংস্পৃষ্ট হওয়ায় ইহা যেরূপ একদিকে ফলপ্রসূ হইয়াছে, সেই সঙ্গে আবার কল্পনাজল্পনা খেলায় আপনাকে আমোদ দিতে বিরত হইয়াছে, কতকগুলা আশমানী-তত্ত্বের দ্বারা পদার্থসমূহকে পুনর্গঠন করিতে নিরস্ত হইয়াছে। কিন্তু ফরাসী-মনের সমস্ত অভিজ্ঞতার লক্ষণকে কাজে লাগাইয়া, যদি এই ফরাসী দর্শন আপনাকে পুনর্জ্জীবিত করিতে সমর্থ হইয়া থাকে তবে কি এই জন্যই নহে যে এইসব লক্ষণ একটা দার্শনিক আকার গ্রহণ করিবার স্বভাবতঃই উন্মুখ? ফ্রান্সে সেরূপ বৈজ্ঞানিক, সেরূপ লেখক, সেরূপ কলাবিৎ, এমন সেরূপ কারিগরও বিরল, যে, নিজ নিজ কার্য্যের ভৌতিকতাটুকুর মধ্যেই নিমগ্ন থাকে;—যে, অদক্ষতা-সহকারেই হউক, অবোধ-সরলতা সহকারেই হউক, স্বীয় বিদ্যা হইতে, শিল্পকলা হইতে, ব্যবসায় হইতে একটা দার্শনিক তত্ত্ব বাহির করিতে

না করে। এই দার্শনিকের কাজ সার্ব্বভৌমিক—এই কার্য্যের বিষয়ীভূত সমস্ত বিচার আলোচনা এমন কি সাংসারিক কাজকর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিচার-আলোচনা স্বাভাবিক গতি তত্ত্ব-রাজ্যের দিকে, মূলতত্ত্বের দিকে। সম্ভবত ইহার দ্বারাই ফরাসী অন্তরাত্মার গভীরতম স্পৃহা যেন ভাষান্তরিত হইয়া থাকে; যাহা কিছু সর্ব্বসাধারণ, যাহা কিছু উদার, ইহা সেই দিকেই সিধা চলিয়াছে। এই অর্থে, ফরাসী মনঃপ্রকৃতি দার্শনিক বুদ্ধির সহিত একীভূত হইয়া গিয়াছে। (সমাপ্ত)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাগ্‌দেবী *

[ঋগ্বেদ ১০ মণ্ডল ১২৫ সূক্ত। বাক্ দেবতা। অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্ ঋষি।]

(আমি) রুদ্রগণের সঙ্গে
বসু সাথে নানা ভঙ্গে,
আদিত্য ও বিশ্বদেবতা সাথে সাথে ঘুরি রঙ্গে।
(আমি) মিত্রবরুণে ধরি,
ধরি' দুয়ে প্রাণ ভরি,
ইন্দ্র, অগ্নি, যুগল অশ্বী আমি যে ধারণ করি।

(আমি) প্রস্তরপেষা সোম
ধরি নিতি অনুপম,
ত্বষ্টা, পূষা, ও ভগদেব রহে আমাতে অনুক্ষণ।
(যেই) হবি দেয় সোমবান্
দেবতোষী যজমান——
তুষ্ট আমি যে তাহার উপর, করি তারে ধন দান।

(আমি) রাজ্যধারিণী, ধন
করি দান—লভে জন,
জ্ঞানবতী আমি যুবতী বিদুষী যজ্ঞভাগ-প্রথম।
এমন ধনদা মোরে
(রাখে) দেবে বহু ঠাঁই ভরে',
ঘুরি ফিরি আমি সব ঠাঁই, আছি বহু-প্রাণী-অন্তরে।

* শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও লেখক কর্ত্তৃক সম্পাদিত প্রকাশ্য "বেদবাণী" পুস্তকের উপকরণ।

আমারি কৃপায় সবে
জীবেরা অন্ন লভে,
চোখে দেখে আর প্রাণে বাঁচে তারা, স্তবে বাক্যে ও রবে।
মানে না আমারে যেই
(তার) ধরাতে জীবন নেই ;
বিদ্বান্ ! আমি বলি যাহা শোন, ভক্তিতে শোন সেই।

আমি বলি—আমি বলি
কত না বাক্যাবলি,
দেবতা মানুষ মানে তাই, চলে তাহারি নিয়মে চলি'।
(আমি) যাহারে ইচ্ছি যথা
তাহারেই করিব তা—
উগ্র ব্রহ্মবিদ্ করি কারে, সুমেধা ঋষি বা স্তোতা !

(আমি) রুদ্রের ধনু নিয়া
তাহারে বিস্তারিয়া
ব্রহ্মদ্বেষী জনারে বাণেতে মারি যে জর্জ্জরিয়া।
(আমি) জন-মঙ্গল-কাজে
চলি সংগ্রাম-সাজে,
স্বর্গে আবার পৃথিবীতে রাজি, প্রবেশি' সবার মাঝে।

(আমি) প্রসব করেছি ধীর
(পিতা) নভে, সে ধরার শির,
বাস করি আমি অগম অতল মাঝারে সাগর-নীর।
সেই সে সদনে থাকি'
(আমি) বিশ্বভুবনে ঢাকি,
ঊর্দ্ধ দ্যুলোকে উন্নত দেহে স্পর্শ করিয়া থাকি।

বায়ু সম ছুটে ভেসে
(চলি) দেশে দেশে হেসে হেসে,
ভেসে ভেসে যাই গড়ে' গড়ে' যাই বিশ্ব-ভুবন-দেশে।
দ্যুলোকের সীমা পার,
ধরণীর সীমানার
ঊর্দ্ধে আমার মহিমা বিরাজে, জাগি আমি অনিবার।

শ্রীপ্যারীমোহন

জাপানের সামাজিক প্রথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৬)

বিবাহ কথা—২য় পর্ব্ব

জাপানীদের বিবাহের অনুষ্ঠান প্রণালীর বিষয় এক কথায় বলিতে গেলে বলা যায়, কতকটা এদেশেরই মত। কাজেই পাশ্চাত্য দেশের বিবাহ প্রণালীর সহিত ইহার অনেকখানি পার্থক্য আছে। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে, ইউরোপে যুবক যুবতীদের বিবাহের বয়স উপস্থিত হইলে তাহারা নিজেরাই নিজেদের ভাবী পতি ও পত্নীকে পছন্দমত মনোনীত করিয়া লয়। এই উদ্দেশ্যে তাহারা নাট্যশালায় বা সঙ্গীতালয়ে—যেখানে যুবক যুবতীদের অবাধ মেলামেশা চলিয়া থাকে, সেইসব আমোদ প্রমোদস্থলে—ঘন ঘন যাতায়াত করে। আজকাল ইউরোপের ধর্ম্মমন্দির বা চার্চ্চগুলিও এই উদ্দেশ্যে মেলামেশার একটী ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহা হউক, এইসব জায়গায় যাতায়াত করিতে করিতে তাহারা নিজেদের আদর্শমত পতি ও পত্নীকে মনোনীত করিয়া লয়। তাহার পর মাতাপিতার সম্মতি লইবার জন্য এবিষয়ে তাঁহাদের সহিত ভাল করিয়া পরামর্শ করে। যদি নিজেদের পছন্দের সহিত মাতাপিতার ইচ্ছার মিল না ঘটে, তবে তাহা ভাঙ্গিয়া যায়, এবং নূতন করিয়া মনোনয়নের পর্ব্ব আরম্ভ হয়। আর যদি মিলই ঘটে তবে সেখানেই বিবাহের সম্বন্ধ পাকা হইয়া যায়। ইহাকেই Engagement বা বাগ্‌দান বলে। এখন হইতেই পরস্পরের মধ্যে courtship বা পূর্ব্বরাগ চলিতে থাকে ; পরে বিবাহ। ইহাই পাশ্চাত্যদিগের বিবাহের স্থূল প্রণালী।

আমি জাপানীদের বিবাহের অনুষ্ঠান প্রণালীর কথা বলিতে গিয়া প্রথমেই তাহার মুখবন্ধ স্বরূপ ইয়োরোপীয়দের অনুষ্ঠান প্রণালী সম্বন্ধে মোটামুটি দুইচারিটী কথা বলিয়া লইলাম। ইহার কারণ এই যে, এদেশের অনেকেই courtship-কেই ইয়োরোপীয় বিবাহ প্রণালীর সবখানি মনে করিয়া নাসিকা সঙ্কুচিত করিয়া থাকেন। তাঁহাদের এই ধারণা যে একান্তই ভুল, তাহারই একটু আভাস দিবার জন্য আমাকে এই কয়টী কথা বলিতে হইল।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, জাপানীদের বিবাহ প্রণালী কতকটা এদেশেরই মত। সেখানেও মাতাপিতাই প্রথমে বিবাহের সম্বন্ধ উত্থাপন করেন এবং পুত্রকন্যার অমত না থাকিলে "নাখাদ" পাঠাইয়া অর্থাৎ লোককে মধ্যস্থ করিয়া সম্বন্ধ স্থির করা হয়। কিন্তু এদেশের বিবাহ প্রণালীর সহিত আমাদের দেশের বিবাহ প্রণালীর একটী বড় বিষয়ে পার্থক্য দেখা যায়। এদেশে দেখিতে পাই, বিবাহ-অনুষ্ঠানটী ধর্ম্মমূলক। পুরোহিতই এই ধর্ম্মমূলক সংস্কারটী সম্পন্ন করেন। কিন্তু আমাদের দেশে

রাজনীতি, সেয়ার মার্কেট ইত্যাদি সম্বন্ধে কি নতুন মত প্রকাশ করিবেন ভাবিতেছি
সবাই এমন স্তব্ধ হইয়া গেল দেখিয়া অবাক হইয়া তিনি মুখ তুলিয়া চাহিলেন।
ব্যঙ্গ করিতে সুনিপুণ বলিয়া তাঁহার নাম আছে, এই
কথা বলিবেন, তাহা শুনিতে সবাই উদ্‌গ্রীব হইয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। আগন্তুক
মহাশয়ের দিকে নির্ম্মলোজ্জ্বল চোখে চাহিয়া বলিল, আমি তিন নম্বর বাড়ীটা খুঁজছি
মহাশয়ের মুখে একটু ব্যঙ্গহাসি খেলিয়া গেল, অন্য কেহ হইলে তিনি বলিতেন, আরে
নম্বরে যাবে! যেখানে নয়টা গলার কনসার্ট দিনরাত বাজছে, যেখানে—

কিন্তু আগন্তুকের উজ্জ্বল চোখ দুটি তাঁহার চোখের উপর আসিয়া পড়াতে তিনি
করিয়া অতি শান্তভদ্রভাবে বলিলেন, তিন নম্বর বাড়ী মশাই, এই গলি দিয়ে বরাবর যান,
গলিটা যেখানে বেঁকেছে সেইখানেই দেখতে পাবেন, লাল রংএর বাড়ী, তবে লাল
কালো হয়ে গেছে—

ধন্যবাদ, মশাই, নমস্কার বলিয়া আগন্তুকটি মাথা একটু নত করিয়া অতি মৃদু হাসি
তাহার সেই মৃদু হাসির দিকে সকলে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া তাকাইয়া রহিল—নিবিড় বনছায়ায় ঢাকা
রূপালি জলধারার মত তাহার কালো গোঁফের ফাঁক দিয়া সুন্দর হাসিটি নিমেষে ঝলসিয়া
একটু খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে দোকান হইতে বাহির হইয়া সে তিন নম্বরের দিকে চলিল।
তাহার চলিয়া যাওয়ার ভঙ্গীটির দিকে চাহিয়া রহিল। নানা জনের মনে নানা প্রশ্ন, নানা
লাগিল, কিন্তু কেহ মুখ ফুটিয়া কিছু বলিয়া উঠিতে পারিল না।

লোকটা কি খোঁড়া, অমন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে কেন! পেছন থেকে দেখলে মনে
বয়স, কিন্তু মুখ দেখলে ত চব্বিশের বেশী বলে মনে হয় না। মুখখানা কচি বটে, কি
নিশ্চয় আছে, অত অল্প বয়স নয় লোকটার। বাপু তিন নম্বরে যাচ্ছে, সুবিধে করে
ওই মিউ মিউ গলা নিয়ে, সেখানে ঢাক ঢোল নিয়ে যাও পাত্তা পাবে। তিন ন
? নিশ্চয়ই সেই বেহায়া মেয়েটার কাছে, সেও দেখি এস্নি রং চং এর সাজ
। চায়ের দোকানে ঢুকে লোকটা চা না খেয়ে চলে গেল! দাদা, ও
চাও জুটবে না, বলে—।

নানা জনের মনে নানা কথা উঠিতে লাগিল বটে, কিন্তু সকলে নিঃশব্দে চা পান
লাগিল। দলপতি মহাশয়ও নীরব, তিনি কাগজ সরাইয়া ভাবিতেছিলেন,
এস্নি দেখলে মনে হয় একটা সৌখীন সং, কিন্তু লোকটা বোধ হয় সাধারণ নয়,
বলিয়া উঠিলেন, ওহে আজকালকার ছোকরারা, তোমাদের ত দাড়ি গোঁফ না
দেখত ওই ভদ্রলোকটি—দাড়িগোঁফ রেখে কি সুন্দর মুখখানা—কিন্তু কোথাও একটু
ঈষৎ পরিহাসের হাসি হাসিলেন।

সে হাসিতে বিশেষ যোগ দিল না। আগন্তুকটি সম্বন্ধে মনে একটি
চুপই রহিল, তাহার সম্বন্ধে কিছুই আলোচনা হইল না। সেদিন চায়ের
না, তর্ক বাধে তর্ক করিতে কাহারও ভাল লাগিতেছিল না।
কলে উঠিয়া চলিয়া গেল।

তিন নং বাড়ীটি গলির কোণে যেমন বাঁকিয়ে গিয়াছে, এ বাড়ীর লোকগুলিও
কেহ সরলভাবে ভাবে সোজা কথা বলে না। বাড়ীর সামনের বাবারের দোকানে
ওয়ালা যখন গরম গরম জিলিপি ভাজে সে তখন তিন নম্বর বাড়াটির দিকে চাহিয়া হাসে।
বাড়ীর লোকগুলির মনগুলি ঠিক এ রকম জিলিপির প্যাঁচ—তাদের মেজাজ এস্নি গরম হইয়াই
আছে। পেঁচার মত সবসময় মুখ ভারি। বাড়ীটি যে চুপচাপ শান্তিতে থাকিবে, এ কাহারও সহ্য
হয় না, সেইজন্য চেঁচামেচি ঝগড়া লাগিয়াই আছে।

উকিল কর্ত্তাটির বয়স বেশী নয়, কিন্তু বেশ পসার—বেশ রোজগার করেন। মাথায় একটু
টাক পড়িয়াছে, কতকগুলি চুল পাকিয়াছে, গম্ভীর পাকা মুখ যেন নির্ম্মম আইনের মায়াময়
বিচারের প্রতীক, টাকা রোজগার লইয়াই আছেন, আপন সংসারের কিছুই দেখেন না। কিন্তু
হয়ত একদিন দেখিলেন, চাকর মস্তবড় ঝুড়িতে বাজার করিয়া ফিরিতেছে, নথি ফেলিয়া
চাকরকে ডাকিয়া বাজারের তরকারি মাছ সব পরীক্ষা আরম্ভ সুরু করিলেন, এত বাজার।
তাহার টাকা বাঁচাইয়া দিবিয়া উড়াইতেছে! টাকা রোজগার করিতে পারে না, রাতে পাতে পাঁচ রকম তরকারি দেওয়া
হইয়াছিল, দুই রকম রাঁধিলেই হইত। বিধবা বোনের ডাক পড়িল, গিন্নির বিধবা বোনের ডাক পড়িল,
জেঠাইমার ডাক পড়িল, বাজারের হিসাবের খাতা আনা হইল, পায়ের রক্ত-জল-করা টাকা লইয়া
সকলে মিলিয়া কিরূপ ছিনিমিনি খেলিতেছে অগ্নিশর্ম্মা কর্ত্তা তাহা সকলকে বুঝাইয়া দিতে
লাগিলেন, গলাবাজী হৈ চৈ পড়িয়া গেল।

গিন্নিটি কুঁড়ে, ঢিলে রকমের, এস্নি সাধাসিধে,-কিন্তু সংসারের ঘুরপাকে মাঝে মাঝে খড়
খোরাল হইয়া ওঠেন। শরীর স্থূল বলিয়া নিজে খাটিতে পারেন না, ঝি চাকর বোন জেঠাই
সবাইয়ের ওপর তম্বি করিয়া বেড়ান। তিনি অত্যন্ত পরিষ্কার বলিয়া তাঁহার প্রধান গর্ব্ব,
নিজে দাঁড়াইয়া কাজ না দেখিলে কিছুই তাঁহার পছন্দ হয় না, তাই মোছা ঘর আবার মোছাইতে,
মাজা কড়াই আবার মাজাইতে, ধোওয়া কাপড় জামা আবার ধোওয়াইতে ঝি চাকরের সঙ্গে
ধাক্কাধাক্কি তাঁহার লাগিয়াই আছে।

আর জেঠাইমা যখন তাঁর তীক্ষ্ণ তীব্র কণ্ঠ লইয়া যোগ দেন তখনই ঝগড়া ঠিক জমিয়া
ওঠে, তিন নম্বরের চারিদিকের বাড়ীগুলির জানলা সব খুলিয়া যায়। তাঁহার গ্রামে সবচেয়ে
ঝগুলে বলিয়া তাঁহার যে খ্যাতি ছিল একথা তিনি প্রতিদিন পাড়ার লোকদের স্মরণ করাইয়া

এরূপ নহে। সেখানে বিবাহ একটী সামাজিক অনুষ্ঠান ছাড়া আর কিছুই নয়; কাজেই তাহার আদি অন্ত সব কাজই ঘটক দ্বারাই করান হয়—পুরোহিতের দরকার হয় না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আমাদের দেশের লোকেরা ধর্ম্মের সহিত কোন ঐহিক ঘটনাকে মিশাইয়া দেখিতে অভ্যস্ত নহে। তাহারা মনে করে যে, ধর্ম্ম কেবল মানুষের আধ্যাত্মিক ও পারলৌকিক জীবনের উন্নতির জন্য আবশ্যক; ইহজীবনের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনার সহিত তাহার কোনই সম্পর্ক নাই। তাহাদের এই অদ্ভুত ধারণার কারণ সম্বন্ধে এখানে দুই একটী কথা বলিয়া রাখিতে চাই। জাপানীদের ধর্ম্ম বলিতে প্রধানতঃ 'বৌদ্ধ ধর্ম্ম' ও 'কনফিউসন্ ধর্ম্ম' বুঝায়। এ উভয়ই বিদেশ হইতে আসিয়াছে। অবশ্য ইহা ছাড়াও 'সিণ্টো ধর্ম্ম' বলিয়া আমাদের দেশীয় আর একটী ধর্ম্মও আছে। কিন্তু ইহাকে একটী পূর্ণাঙ্গ ধর্ম্ম বলা চলে না; ইহা আমাদের স্বদেশীয় পূর্ব্ব-পুরুষগণের উপাসনা পদ্ধতিমাত্র। উপরিলিখিত 'কনফিউসন্' ধর্ম্মও কতকগুলি সামাজিক নীতিনিয়মের সমষ্টিমাত্র—উহাও ঠিক পূর্ণাঙ্গ নহে। একমাত্র বৌদ্ধ ধর্ম্মই পূর্ণাঙ্গ ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইতে পারে। বৌদ্ধ ধর্ম্ম যখন ভারতবর্ষ হইতে চীন ও কোরিয়া হইয়া জাপানে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন উহা কেবল আধ্যাত্মিক ও পারলৌকিক উন্নতির কারণ বলিয়া প্রচারিত হইত। কাজেই তখন হইতেই এই ধর্ম্মের সঙ্গে মানুষের ইহ জীবনের কোন সম্পর্ক নাই বলিয়া আমাদের দেশের লোকেরা বুঝিয়া আসিতেছে। এইজন্যই তাহারা বিবাহকে ধর্ম্মমূলক বলিয়া মনে করে না।

কিন্তু আজকাল দেশীয় শিক্ষা ও ধর্ম্মালোচনার বিশেষ উন্নতি হওয়ায় সকলে বুঝিতেছে এ[ই] ধর্ম্মপ্রচারকেরাও বুঝাইতেছেন যে, বৌদ্ধ ধর্ম্ম হউক বা সিণ্টোধর্ম্ম হউক অথবা যে কোন ধর্ম্মই হ[উক] না কেন, মানুষের পারলৌকিক উন্নতি অপেক্ষা ঐহিক উন্নতিই তাহার অধিক লক্ষ্য। এই[জন্য] আজকাল আমাদের দেশে পূর্ব্ব ধারণার ধীরে ধীরে ব্যতিক্রম ঘটিতেছে; তাই পূর্ব্বে বিবাহ অমু[ষ্ঠান] ঘটক দ্বারা নির্ব্বাহ হইলেও সম্প্রতি অনেকেই নিজের নিজের ধর্ম্মানুসারে কেহ বৌদ্ধ পুরো[হিত] কেহ বা কন্‌ফিউসন্ এবং কেহ কেহ বা সিণ্টো পুরোহিতের দ্বারাই করাইয়া থাকেন। এই[রূপে] আমাদের দেশেও আজকাল বিবাহ ব্যাপারটী ধীরে ধীরে ধর্ম্মমূলক অনুষ্ঠানের মধ্যে গিয়া প[ড়িতে]ছে। ইহা আমাদের সামাজিক ইতিহাসে একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

ছেলেমেয়েদের বিবাহের বয়স হইলে তাহাদের মাতাপিতা পাত্র-পাত্রীর অনুসন্ধান [ক]রিয়া থাকেন। এই অনুসন্ধানের ভার ঘটকের উপর দেওয়া হয়। আমাদের দেশে আইন অ[নুসারে] পুরুষের বয়স ১৭ ও রমণীর ১৫ হইলেই তাহাদের বিবাহের অধিকার আছে। কিন্তু ইহা আইন[সঙ্গত] কেহই এই আইন অনুসারে চলে না। সামাজিক ব্যবহার ক্ষেত্রে মেয়েরা ১৮ হইতে ২[৫] পুরুষেরা ২২ হইতে ৩৫ এর মধ্যে বিবাহ করিয়া থাকেন। ইহা হইতেও অধিক ব[য়স্ক] পুরুষের বিবাহ যে হয় না, এমন নহে। কোন কোন রমণীকে ৩০ বৎসরে এবং কো[ন]

পুরুষকে ৪০ বৎসরেও বিবাহ করিতে দেখা যায়। শিক্ষালাভ ও আর্থিক অসামর্থ্য, প্রধানতঃ এই দুইটী কারণেই বিবাহে এরূপ বিলম্ব ঘটিয়া থাকে।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে শিক্ষা সম্বন্ধে দু'একটী কথা বলিতে চাই। আপনারা বোধ হয় জানেন যে, জাপানে বাধ্যতামূলক শিক্ষা-পদ্ধতির চলন আছে। কাজেই ছেলে বা মেয়ের বয়স ছয় বৎসর হইলেই তাহাদিগকে স্কুলে পাঠাইতে হয়। এই প্রাথমিক শিক্ষা আটবৎসর ধরিয়া চলিতে থাকে। আমাদের ছেলেবেলায় দেখিয়াছি মধ্যবিত্ত গৃহস্থঘরের মেয়েরা এই প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হইলে লেখাপড়া ছাড়িয়া গৃহকর্ম্মে ও সেলাইয়ের কাজে মনোনিবেশ করিত এবং সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক আচার ব্যবহারগুলিও শিখিতে থাকিত। কিন্তু এখন শিক্ষা এমন বিস্তৃত ও উন্নত ধরণের হইয়া আসিতেছে যে, তাহারা প্রত্যেকেই প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিয়া মধ্য শিক্ষা লাভের জন্য মেয়েদের উচ্চ স্কুলে প্রবেশ করে। এই মধ্যশিক্ষা পাঁচ বৎসর ধরিয়া চলে। এখানে সমস্ত বিষয়ের সাধারণ জ্ঞান বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহার পরও কেহ কেহ মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া তিন বৎসর ধরিয়া উচ্চ শিক্ষা লাভ করে এবং ইহা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত বিবাহ করে না। কাজেই মেয়েদের বিবাহের বয়স কম পক্ষেও ১৮ হইতে ২৫ হইয়া থাকে। নীচশ্রেণীর গরিবঘরের মেয়েরা প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হইলে আর লেখাপড়া করে না। তখন তাহাদের কেহ কেহ গৃহকর্ম্ম ও সামাজিক আচার ব্যবহারে অভিজ্ঞ হইবার জন্য মধ্যবিত্ত বা বড়লোক ভদ্র গৃহস্থের বাটীতে চাকরী স্বীকার করে। কেহ কেহ বা মাতাপিতার আর্থিক সাহায্যের জন্য কারখানার কাজে লাগিয়া যায়; এইভাবে ছয়, সাত বা দশ বৎসর পর্য্যন্ত কাটে; পরে তাহাদের বিবাহ হয়। কাজেই ইহাদেরও বিবাহ হইতে ২২।২৩ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া যায়।

পুরুষদের সম্বন্ধেও ঠিক এই একই কথা। মধ্যবিত্ত ভদ্রঘরের ছেলেরা ৮ বৎসর ধরিয়া প্রাথমিক শিক্ষা, ৫ বৎসর ধরিয়া মধ্যশিক্ষা ও ৫ কিম্বা ৬ বৎসর ধরিয়া উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া থাকে। ইহাতে অন্ততঃপক্ষে ২৪।২৫ বৎসর-কাল তাহাদের শিক্ষা লাভেই কাটিয়া যায়। কিন্তু শিক্ষা শেষ হইলেই যে সকলে বিবাহ করিবে, এমন কথা নহে। নিজেদের পরিবার ভরণপোষণের উপযুক্ত পরিমাণ অর্থোপার্জ্জনে সমর্থ না হওয়া পর্য্যন্ত কেহই বিবাহ করে না।

এদেশে একান্নবর্ত্তী পরিবারের প্রথা থাকায় অনেকে উপার্জ্জনে সমর্থ না হইয়াও বিবাহের বয়স হইলেই বিবাহ করিয়া থাকে, কিন্তু জাপানে এরূপ নহে। সেখানে বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পিতার সঙ্গে একত্র থাকিলেও বিবাহের পরে এক জ্যেষ্ঠ পুত্র ছাড়া আর সকলকেই পৃথক্ হইয়া স্বাধীনভাবে থাকিতে হয়। কাজেই উপার্জ্জনে সমর্থ না হইয়া কেহই বিবাহ করিতে পারে না।

ভদ্রঘরে যে ব্যবস্থা গরিব চাষা-ভুষা ঘরেও সেই একই ব্যবস্থা। তাহাদের ছেলেরাও প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিয়া অর্থোপার্জ্জনের জন্য বাড়ী ছাড়িয়া দূরদেশে চলিয়া যায়, এবং যথেষ্ট

[অর্থোপার্জ্জন না হওয়া পর্য্যন্ত বিবাহ করে না। কাজেই সমাজের উচ্চ নীচ সব স্তরগুলিতেই পুরুষদের বয়স ৩২।৩৩ না হওয়া পর্য্যন্ত কেহ বিবাহ করে না।

বিবাহের অনুষ্ঠান প্রণালীর কথা বলিতে বসিয়া অনেক দূরে চলিয়া আসিয়াছি। এখন আবার গোড়ায় ফিরিয়া যাওয়া যাক। যোগ্য পাত্র পাত্রীর সন্ধান মিলিলে ঘটক তাহাদের মাতাপিতাকে আসিয়া বলে; ঘটকের মুখ হইতে সকল কথা শুনিয়া তাঁহারা নিজেরাও যদি যোগ্য বলিয়া মনে করেন তবে উভয় পক্ষ হইতেই ঘটকের মধ্যস্থতায় বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করা হয়। এই সময় উভয় পক্ষই পাত্র ও পাত্রী এবং তাহাদের মাতাপিতারও স্বভাবচরিত্র, কুলমান গোত্র বংশ, শারীরিক স্বাস্থ্য ও সংক্রামক বা গুপ্ত ব্যাধি প্রভৃতির এবং আর্থিক অবস্থার সঠিক সংবাদ পাইবার জন্য গোপনে বিশেষ করিয়া অনুসন্ধান করেন। সঙ্গে সঙ্গে এদেশের মত জ্যোতিষী দিয়া সম্বন্ধটীর শুভাশুভ গণনাও চলিতে থাকে। এইরূপ নানাদিক দিয়া অনুসন্ধানের পরেও কোন আপত্তির কারণ না ঘটিলে মাতাপিতা তাঁহাদের পুত্র কন্যার নিকট সম্বন্ধের কথা প্রকাশ করেন। তাহারা মাতাপিতার নিকট নিজেদের বিবাহের সংবাদ পাইয়া প্রথমেই তাহাদের ভাবী পতি ও পত্নী দেখিতে কেমন তাহা জানিবার জন্য কৌশলে সুযোগ অনুসন্ধান করিতে থাকে। এই সময় পাত্র যদি কার্য্যোপলক্ষে বিদেশে বা দূরদেশে থাকে, তবে আর তাহাদের সাক্ষাৎ দর্শন সম্ভব হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে ফটো বিনিময়ের ব্যবস্থা চলিতে পারে। কিন্তু এই ফটো বিনিময়ের একটা বিশেষ দোষ আছে। ইহাতে সব সময়ে ঠিক প্রকৃত রূপটী ফুটিয়া উঠে না। ফটো তুলিবার কৌশলে অনেক সময় কুৎসিতও সুন্দর হইয়া দেখা দেয়। এরূপ ক্ষেত্রে বিবাহের পর দম্পতীদের পরস্পরের মনোমালিন্য ঘটিবার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে। যাহা হউক, এই ভাবে নিজেদের ভাবী পতি ও পত্নীর সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়া পুত্র কন্যার যদি ব্যক্তিগত কোন আপত্তি না ঘটে তবে এই সম্বন্ধ সফল হইয়া থাকে। আপত্তি থাকিলে মাতাপিতার পছন্দ হইলেও বিবাহ হয় না, পুনরায় নূতন করিয়া সম্বন্ধ স্থির করিতে হয়।

ইহাতে আপনারা বুঝিতে পারিলেন যে, জাপানে বিবাহব্যাপারে মাতাপিতার কর্ত্তৃত্ব ও প্রভুত্ব থাকিলেও ছেলেমেয়েদেরও স্বাধীনতার যথেষ্ট অবকাশ আছে।

যাহা হউক, দেখিয়া শুনিয়া ছেলেমেয়েদের পছন্দ হইলে তখন আর একবার ঘটক পাঠাইয়া সম্বন্ধটীকে পাকা করিয়া লওয়া হয়। সম্বন্ধ পাকা হইলে পাত্র ও পাত্রের পিতা দুই চারি নিকট জ্ঞাতি ও ঘটককে সঙ্গে লইয়া পাত্রীর বাড়ী "ইউইনো" লইয়া যান। "ইউইনো" বলিতে বিবাহ সম্বন্ধ পাকা হওয়ার নিদর্শনে কিছু দেওয়া বুঝায়। ইহা কতকটা এদেশী আশীর্ব্বাদের মত। পাত্রপক্ষের অবস্থা অনুসারে এই "ইউইনো" বা আশীর্ব্বাদী দান ভিন্ন ভিন্ন রকমের হইয়া থাকে। তবে আজকাল প্রায়ই আশীর্ব্বাদী দানরূপে জিনিসপত্র না দিয়া তাহার বদলে টাকা দেওয়া হয়। এই টাকার পরিমাণ কোন একটী বিবাহ পরিচ্ছদের মূল্য অনুসারে ঠিক

লওয়া হয়। কাজেই খুব বেশী লাগে না। বড় লোকেরাই উর্দ্ধপক্ষে পাঁচ ছয় শতের অধিক দেয় না। এই টাকার সঙ্গে একটী লোহিতবর্ণ বৃহৎ সামুদ্রিক ভেট্‌কী মৎস্য উপহার দেওয়া হয়। এদেশের রোহিত মৎস্যের ন্যায় আমাদের দেশে এই লাল ভেট্‌কীগুলিকে বিশেষ শুভ-সূচক বলিয়া মনে করা হয়। এই সমস্ত উপহার দ্রব্য বিশেষভাবে পাত্রের পিতা পাত্রীর পিতার হাতেই দিয়া থাকেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মিষ্ট আলাপ-পরিচয়ের দ্বারা পরস্পরে আত্মীয়তার মধুর বন্ধনে আবদ্ধ হন। এই দিন পাত্রপক্ষকে সেখানে বিশেষ যত্নের সহিত ভোজন করান হয়। ভোজনের পূর্ব্বে সামাজিক প্রথামত "শাকে" অর্থাৎ সুরা পান করিতে হয়। এই "শাকে" পানের সঙ্গে সঙ্গে, বিবাহমঙ্গল গান করা হয়। এই দিনই বিবাহের দিন স্থির হইয়া থাকে। কাজেই এই "ইউইনো" প্রদানকে বিবাহ সংস্কারের একটী প্রধান ও পবিত্র অঙ্গ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

ইহার পরে প্রায় তিন চারিমাস গত হইলে প্রকৃত বিবাহ সংস্কারটীর অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। ইতিমধ্যে পাত্রীপক্ষ পাত্রীর বিবাহের পরিচ্ছদ এবং সঙ্গে দিবার উপযোগী নানাবিধ গৃহস্থালী দ্রব্য ও অনেকগুলি ভাল ভাল পোষাক পরিচ্ছদ কিনিয়া আনিয়া গুছাইয়া রাখেন। জাপানে এদেশের মত, বিশেষতঃ এই বাঙ্গলাদেশের মত, পণপ্রথার চলন নাই। কিন্তু এদেশে যে পরিমাণ অর্থ বরকে পণ বাবদে দিতে হয় আমাদের দেশে তাহারও কিছু অধিক পাত্রীপক্ষ পাত্রীর পোষাক পরিচ্ছদ ও স্বর্ণালঙ্কারাদির জন্য ব্যয় করিয়া থাকেন। এইরূপই আমাদের সামাজিক প্রথা।

অবশ্য গরিব লোকেরা এদিকে বেশী খরচ করিতে পারে না। তাহারা অল্প খরচে দুই একটী পোষাক পরিচ্ছদ কিনিয়া কোন গতিকে মেয়ের বিবাহ দিয়া থাকে। তবে মেয়ের নিজের যদি কিছু সঞ্চিত অর্থ থাকে, তবে তাহা দ্বারা পোষাক পরিচ্ছদের যোগ্য বন্দোবস্ত করা হয়। তাহাদের এই অর্থ বিবাহের পূর্ব্বে কারখানায় বা ভদ্রগৃহস্থের বাড়ীতে চাকরী করিয়া সঞ্চিত হয়, যাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

ক্রমশঃ

শ্রীআর, কিমুরা

বাঙ্গালীর চিতা

(১)

যেথা কালাগুরু কালসাপ, কালাজ্বর
কাপালিক কৌল কৃষ্ণসারের ঘর।
কমলা এবং কামাখ্যা মা'র পুরী
ব্রহ্মপুত্র তীরভূমি এসো ঘুরি,
খোঁজ কর তুমি সেথা
জ্বলে বাঙ্গালীর চিতা।

(২)

গোলাপের সাথে জুহ্রাণ যেথা ফোটে
জড়াজড়ি যেথা আঙ্গুর আখ্‌রোটে,
কমলেরা মেলা বসায় মানস জলে,
শ্যামল ক্ষেত্র ভেসে ফেরে কুতূহলে,
খোঁজ কর তুমি সেথা
জ্বলে বাঙ্গালীর চিতা।

(৩)

যেথা নারিকেল সবুজ তমাল তালে
নীল দরিয়ায় নিজেদের ছায়া ফেলে,
সাগর অধীর, পাষাণ-বলয় পরি,
হাসিছে যেখানে ধরণীর কর ধরি,
খোঁজ কর তুমি সেথা
জ্বলে বাঙ্গালীর চিতা।

(৪)

'কিমোনো' 'ফানুস' 'টোগো' ও 'নগির' দেশে
প্রাচীর বিশাল, প্রাচীন চীনের শেষে,
সাফী ও শিরাজী হাফেজের প্রিয় ভূমি,
আরব নিশির দেশে খোঁজ কর তুমি,
খোঁজ কর তুমি সেথা
জ্বলে বাঙ্গালীর চিতা।

(৫)

মমী ও ফিনিক্‌স্ পিরামিড তারে চেনে
নীল নদী তার তরণী এনেছে টেনে,
ব্রিষ্টলে তার গৌরব চিতা রাজে,
নেপোলিয়নের পিয়ারী নগরী মাঝে
খোঁজ কর তুমি সেথা
পাবে বাঙ্গালীর চিতা।

(৬)

অরোরার আলো দেখেছে তাহার ছবি
দেখেছে তাহারে নব পৃথিবীর রবি।
ঘুরেছে সে হায় ভীম নায়াগ্রার ধারে
ব্রেজিল তাহারে ভুলিয়া ভুলিতে নারে,
খোঁজ কর তুমি সেথা
পাবে বাঙ্গালীর চিতা।

(৭)

আটলাণ্টিকে ডুবেছে পোতের সাথে
অস্থিতে তার প্রবাল শয্যা পাতে,
কাইজার ক্রূপ গেটে হেগেলের থানা
গ্রীস রোম রুষ যত দেশ আছে জানা
খোঁজ কর তুমি সেথা
আছে বাঙ্গালীর চিতা।

(৮)

তাদের মৃত্যু বিশ্বদূতের তারে
রটেনিক বটে বিশ্বের দ্বারে দ্বারে।
কোনো ইতিহাস বলেনা তাদের কথা,
অশ্রুত হায় তাদের মর্ম্মব্যথা।
নয়নের জলে মিতা
ভিজাও তাদের চিতা।

(৯)

ঘরমুখো তারা ফিরিবে না আর ঘরে
মরেছে বিদেশে দেশের সুনাম তরে।
হৃদি-মন্দিরে আনো তাহাদিকে ডাকি,
পরাইয়া দাও প্রীতির অমর রাখী
প্রেমানলে কর হোম
শান্তি শান্তি ওঁ।

শ্রীকুমুদরঞ্জন

অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসী

আমাদের মাদ্রাজের হিতৈষী শাস্ত্রীজী যাঁহাদের বন্দরে এ দেশের জন্য স্বাধীনতা কিনিতে গিয়াছিলেন, এ প্রবন্ধে তাঁহাদের ব্যবহারের কিছু পরিচয় মিলিবে।

কি করিলে অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা একেবারে ধ্বংস না হয়, তাহার বিচারের জন্য ও উপায় খুঁজিবার জন্য অষ্ট্রেলিয়ার ইংরেজ সরকার সম্প্রতি একটা কমিটি বসাইয়াছেন। অসভ্য আদিম অধিবাসীরা তাহাদের এই হিতসাধিনী সভার ব্যয়ের জন্য টেক্স দেয় কিনা, জানিনা। বর্ব্বরদের রক্ষা কল্পে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে কতকগুলি কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন, আর তাঁহাদের নাম দেওয়া হইয়াছিল, Protectors of the Black People। এই সময়ে ইউরোপে কিছুদিন ধরিয়া বিচারিত হইতেছিল যে, ইউরোপীয়দের সভ্যতার জীবন-প্রদ আলোকের তাপে বর্ব্বরেরা পুড়িয়া মরে কেন। তখন অষ্ট্রেলিয়ার ইংরেজদের নামে একটুখানি দুর্নামের রটনা হইয়াছিল; সেই দুর্নাম বা কলঙ্ক ঘুচাইবার জন্য অষ্ট্রেলিয়ার সরকার বাহাদুর সেখানকার বড় আদালতের বিচারপতি জে. ডি. উড্‌সকে একখানি বই লিখিতে নিযুক্ত করেন। উড্‌সের বইখানি প্রকাশিত হইয়াছিল ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে; তখন (বঙ্গাব্দ ১৩০২) সেই বইখানি পড়িয়া নব্যভারতে একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম যে, বর্ব্বরদের ক্ষয় অনিবার্য্য, এবং অষ্ট্রেলিয়ার সরকার তাঁহাদের পক্ষ সমর্থনের জন্য উড্‌সের মত জজকে নিযুক্ত না করিয়া একজন পাকা উকিলকে নিযুক্ত করিলে ভাল করিতেন। আটাশ বৎসর পরে দেখিতেছি যে, স্বয়ং বিধাতাও আর অসভ্যদের প্রাণ বাঁচাইতে পারেন না।

আর চার বৎসর পরে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রেলিয়া আবিষ্কারের ৩০০ বৎসর পূর্ণ হইবে। ইংরেজজাতির এই উপনিবেশ যখন কেবল অসভ্যদের বাসভূমি ছিল, তখন ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজেরা ইহাকে আবিষ্কার করে। ওলন্দাজের আবিষ্কারের দিনের অষ্ট্রেলিয়া এখন একেবারে নূতন রাজ্য। প্রাচীন অরণ্য এখন সুগম বনভূমি,—আর দ্বিগর্ভী কাঙ্গারু, ওয়াল্লাবী ও বান্দিকূট ভয়ে সভয়ে বনে পাহাড়ে বিচরণ করে; যে নদীগুলি তখন গভীর বনের ছায়ায় বহিত, তাহাদের উপর রৌদ্রে দীপ্ত, সভ্যতার আলোকে উজ্জ্বল,—বাণিজ্যপোতে পরিপূর্ণ। তখনকার দিনের বনে ও তমসা নদীর কূলে কূলে যাহারা প্রফুল্লচিত্তে বিচরণ করিত, তাহারা যমের তাড়নায় পীড়িত। ওলন্দাজদের বর্ণনায় পাই—যে উহারা নদীর মাছ, আকাশের পাখী, ও বনের পশু ধরিত, আর নদীর খরস্রোতে গা ভাসাইয়া আনন্দধ্বনিতে উৎসব করিত, এবং কখনও এই অসভ্যদের একজন লোককেও অসুস্থ বা অপ্রফুল্ল দেখা যাইত না।

আজ কোথায় তাহাদের সেই প্রফুল্লতা ও আনন্দধ্বনি? কৃষ্ণকায় হউক, আর কদাকার হউক, বিশ্বস্রষ্টা যাহাদিগকে মানুষ করিয়া গড়িয়াছিলেন,—প্রজাপতি যাহাদিগকে দশ লক্ষের অধিক বৎসর ভূমির অধিপতি করিয়াছিলেন, মহাকালের নব বিধানে তাহারা ক্ষয় পাইতেছে কেন?

যাহারা এই স্বর্ণরাজ্যের স্বর্ণ ভাণ্ডারের প্রহরী ছিল, এই নাতিশীতোষ্ণ মনোহর দেশ যাহাদের অধিকারে ছিল, তাহারা নির্ব্বিবাদে সুসভ্যজাতির চরণপ্রান্তে টিকিয়া থাকিতে পারিতেছেনা কেন?

জে. ডি. উড্‌সের বইখানির কথা বলিয়াছি। সভ্য গবর্ণমেণ্টের কলঙ্ক ক্ষালিতে গিয়া উড্‌স মহাশয় আদিম অধিবাসীদের ক্ষয়ের যে কারণ লিখিয়াছেন, তাহাই একবার আলোচনা করিয়া দেখি।

উড্‌স সাহেব লিখিয়াছেন, যে উপনিবেশ স্থাপনের সময়ে অসভ্যদের জনসংখ্যা অত্যন্ত অধিক ছিল; ১৮৭৬ হইতে ১৮৯৪ পর্য্যন্ত যে হারে এই জনসংখ্যা কমিতেছিল, তাহাতে নাকি ১৮৯৪ হইতে ৫০ বৎসরের পরে, অর্থাৎ ১৯৪৪ খৃঃঅব্দে অষ্ট্রেলিয়ায় একটিও আদিম অধিবাসী রহিবে না। তিনি বলিয়াছেন যে শ্বেতকায় জাতির উপস্থিতি এই ধ্বংসের একটি কারণ বটে, কিন্তু তাহাই নাকি একমাত্র কারণ নয়। কারণ বিবৃত করিবার পূর্ব্বেই উড্‌স্ লিখিয়াছেন যে, ইউরোপের অনেক গণ্যমান্য লোক মিথ্যা করিয়া এই দোষারোপ করিয়াছেন যে, উপনিবেশে সভ্যদের অত্যাচারেই কৃষ্ণকায়দের উচ্ছেদ হইতেছে।

অপবাদ কাটাইবার জন্য উড্‌স যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি বেশি করিয়া আপনাদিগকে ধরা দিয়াছেন। উড্‌স্ বলেন যে, প্রথমতঃ আদিম অধিবাসীদের ধ্বংসের কারণ এই যে, দেশের চাষের জমি উপনিবেশকারীরা লইয়াছে, এবং কাজেই প্রচুর খাদ্য না পাইয়া অসভ্যেরা অনেক মরিয়াছে। এই রকম লেখার নির্লজ্জতা ও ধৃষ্টতা কতখানি, তাহা পাঠকেরা ঐ গ্রন্থের চব্বিশের অধ্যায় পড়িলেই দেখিতে পারিবেন। যাঁহারা অসভ্যদিগকে তাড়ান,—নাই কে তাহাদের উঠান চষিয়াছেন, তাঁহারাই যে দেশের জমীর যথার্থ মালিক ও উপস্বত্বের অধিকারী, আইনের জোরে লেখা হইয়াছে।

অসভ্যের উচ্ছেদের দ্বিতীয় কারণটি ভীষণতর। জজসাহেব বলেন যে, কৃষ্ণকায় শিশু-কন্যা বধ করিয়া ফেলে; এমনকি, অনেক সময়ে শিশু-সন্তান মাত্রই মারিয়া ফেলে বলিয়া ইহাদের লোকসংখ্যা কমিয়া যাইতেছে। পৃথিবীতে এমন কোন বর্ব্বর জাতি নাই যাহারা নিজে শিশু বধ করিয়া ক্ষয়ের পথ প্রশস্ত করে। এ জাতির এই পশুর অধম নির্ব্বুদ্ধিতার কারণ কারণ খুঁজিবার আগে উড্‌স্ নিজেই এই জাতির শরীর মনের যে পরিচয় দিয়াছেন, বলিতেছি।

এই আদিম অধিবাসীরা ৫ ফুট হইতে ৬ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ, ইহাদের ললাট বিস্তৃত, চক্ষু উজ্জ্বল। বক্ষের বেষ্টন ৩৪ হইতে ৩৬ ইঞ্চ পর্য্যন্ত। এ প্রকার দেহ মন্দির ত নির্ব্বুদ্ধি আধার হইতে পারে না। তাহার পর, ইহাদের ভাষা সম্বন্ধে উড্‌সের মন্তব্য এই:— ভাষায় বিংশতি পর্য্যন্ত গণনাঙ্ক আছে; এবং ভাষা এত প্রত্যয়-বহুল যে অনেক ইউরোপীয় ভাষায় এমন নাই। (The Native languages possess inflections which many Euro-

Languages do not—P. 400) ইহারা সহজে যুক্ত শব্দ গড়িতে পারে, এবং সম্পূর্ণ নূতন ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য, অনায়াসে নূতন শব্দ গড়িয়া লইতে পারে। তাহা ছাড়া ইহাদের ভাষায় শব্দালঙ্কার, অর্থালঙ্কার প্রভৃতিরও যোজনা আছে। (The natives evince great facility in compounding words, in forming new ones to represent objects previously unknown to them, and also in inventing figurative expressions—P. 400). উন্নত ভাষা যে মানসিক শক্তি ও সামাজিক উন্নতির সাক্ষী, তাহা বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। এমন লোকেরা বিদেশের চাপে বাড়িতে পারিল না, বরং মরিতে বসিল।

এবারে উহাদের শিশুকন্যা বধের কথা বলিতেছি। উড্‌স বলেন যে বড় হইলে খাইতে দিতে পারিবে না মনে করিয়া ইহারা শিশু হত্যা করে। কথাটা ভাবিলেই বুক ফাটিয়া যায়। ইহাতেও সকল কথার কৈফিয়ৎ মেলে না। দুর্ভিক্ষের ভয়ে কেবল কন্যা বধই করে কেন? মনে রাখিতে হইবে, ইহাদের স্ত্রীপুরুষেরা সকলেই সমানে খাটে। আসল কথাটা উড্‌স্ মহাশয় পাকেচক্রে বলিয়া ফেলিয়াছেন।

উড্‌স্ লিখিয়াছেন যে, মেয়েদের শরীরের সৌষ্ঠব আছে, আর মুখশ্রী সুন্দর না হইলেও নিতান্ত অনাদরের নয়। অন্যস্থানে আবার লিখিয়াছেন যে, উপনিবেশকারীরা অসভ্যদের স্ত্রীলোক সংগ্রহে সময়ে সময়ে যে মন দেন নাই তাহা নয়, তবে শত্রু পক্ষেরা নাকি কথাটা অতিরঞ্জিত করিয়া বলে। ইংরেজিতে এইরূপ আছে:—A great deal of stress has been laid upon the fact, that white men have taken away the black fellows' women and the bad effct this procedure has upon the males of the tribes. No doubt it is a deep injury, but....., 402 p. তারপরেই গোঁজামিল। উড্‌স্ বড় জজ, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের ভাল উকিল নন। তিনি বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, উহাদের মধ্যে সতীত্বের আদর নাই, তাই স্ত্রী অপহরণে বড় বাধে না। সমাজতত্ত্বজ্ঞেরা কেহই একথাটা মানিবেন না; এই শ্রেণীর জাতিদের মধ্যেই সতীত্বের নিয়ম সর্ব্বত্রই বড় কড়া।

যদি লোক সংখ্যা বাড়িলে অনাহারেই প্রাণ যায়, যদি কন্যা সন্তান পুষিলে শ্বেতাঙ্গই অপহরণ করে, তবে আত্মনাশে ইহাদের দুঃখ কি? উড্‌স্ ইহাদের একটা নূতন প্রবর্ত্তিত ভীষণ প্রথার কথা লিখিয়াছেন। শৈশবেই অনেক বালককে খোজা করা হয়, আর বালিকাদিগকেও এমন একটা পীড়াদায়ক অবস্থায় ফেলা হয়, যাহাতে সন্তান ধারণ অসম্ভব হয়। ইহাতে কি আর বুঝিতে বাকী থাকে যে আদিম অধিবাসীরা কি দুঃখে ও ক্ষোভে পৃথিবী হইতে বিদায় লইতেছে?

যে সময়ে সমূলে বিনাশ অনিবার্য্য, সেই সময়ে দেখিতেছি অসভ্যদিগকে রক্ষা করার সভ্যদের মনে পড়িয়াছে। মিউজিয়মে কতকগুলি আদিম অধিবাসীর নিদর্শন রাখিবার

জন্য হয়ত এ কালের এ উদ্যোগ নয়; হয়ত যথার্থ হিতৈষণাতেই ইহাদের রক্ষা করিবার উদ্যোগ চলিতেছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এসব উদ্যোগ হইলে কি হইত জানি না; এখন কিন্তু যমের হাত সরাইয়া দেওয়া অসম্ভব। ইহারা ত মরিবেই, তবে যে কয়েক দিন বাঁচিয়া আছে, সে কয়েক দিন রক্ষকদের কৃপা হইতে দূরে থাকিলেই ভাল হয়; সভ্যেরা যদি ইহাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রাখেন, আর এই বর্ব্বরদিগকে বর্ব্বরের মতই থাকিবার পথে বাধা না দেন, তবে হয়ত বা নিরাশার মধ্যেও আশার সঞ্চার হইতে পারে।

ইহাদের সেকালের বনভূমি আর নাই; প্রখর রৌদ্রে ইহাদের জন্য যে গাছের ছায়া ছিল, তাহা গিয়াছে। এখনি যদি সত্যই ইহাদের জন্য সভ্যদের কৃপার ছায়া প্রসারিত হইতেছে, তা কি বিধাতার করুণার ছায়ায় ইহাদের তাপের শান্তি হইবে না? ইহাদের ভাগ্যে হয়ত এই উক্তি মিথ্যা হইবেনা :—

মধ্যাহ্ন সূর্য্যাংশু নিপীড়িতানাং
নৃণাংতুশান্তৈহি যথাস্তি ছায়া,
সংসার দুঃখানল তাপিতানাং
তথৈব শান্তৈ ভগবৎ কৃপাস্তি।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

দেবত্র

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য আরও খানিকটা বুড়া হইয়াছেন। তাঁহার পুত্র পুত্রবধূ প্রৌঢ় বয়সে পৌঁছিতেছেন আর তাঁহাদের পুত্র এবং পুত্রকন্যার মতই যত্নে যাহারা পালিত হইতেছে তাহারা কেহ কেহ কিশোরত্ব যৌবনে প্রবেশ করিয়াছে, কেহ কেহ বা বালিকা বয়স হইতে কৈশোরে পদার্পণ করিয়াছে একই স্থানের মধ্যে ঠিক্ পাশাপাশিভাবে স্থিত প্রকৃতির বিচিত্রতার চরম আদর্শ যাহা এই জীবন। কলি ফুটিতে যাইতেছে, ফুটিয়াছে, আবার ঝরিতেও চলিয়াছে। তাহাদের মধ্যেও ঠিক্ এমনি বিচিত্রতা। নূতন আশায় নব উদ্যমে তরুণ আদর্শে নবীন ফুল নবীন সৌরভে ফুটিয়া উঠিতে চায়,—মাঝা মাঝি দাঁড়াইয়া প্রৌঢ় জীবন শ্যামল মত তাহাদের আপন স্নেহচ্ছায়ায় ফুটাইয়া তুলিয়া তাহাদের নিজ নিজ সার্থকতা লাভ করিতে দিতে উৎসুক,—ওদিকে বৃদ্ধ বৃক্ষকাণ্ড, ডালপালা নাড়িয়া ধন্যে

বাড়াবাড়ি! এতো ভাল নয় চুপ চাপ স্থির হইয়া থাক বাপু—এ-আলো, এ বাতাস এতো নিত্যকার—এর জন্য উদ্দাম হইয়া নিজের শক্তির অপচয় কেন কর!"

এই সুদীর্ঘ বৎসর গুলির মধ্যেও মীরার মাতার কিম্বা মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের মন নরম হয় নাই। তাঁহারা কেহই কর্ত্তব্যের কিম্বা স্নেহের নিকটে নত হন নাই; মীরা তাহার মাতুলালয়েই পালিতা হইতেছে। ভট্টাচার্য্য জানেন যে, আনন্দ তাহার কর্ত্তব্য সমানেই পালন করিয়া যাইতেছেন এবং সেই জন্যই হয়ত তাহারা আরও তাঁহার নিকটে আসে নাই, ভবিষ্যতের ভাবনাতেও বোধহয় তাহারা নিশ্চিন্ত; কিন্তু তিনি ইহার জন্য এমন কোন বিরক্তি বা বেদনা বোধ করিতেন না, যতটা তাহাদের তাঁহার উপর অবিশ্বাস ও এই অস্নেহ প্রকাশে বোধ করিয়াছিলেন।

সনৎ প্রশংসার সহিত ম্যাট্রিক্ পাশ করিয়া এখন আই-এ পড়িতেছে। বাপের নিকটে থাকিয়া সে প্রায় প্রতিদিনই তাহার কাকিমা ও বোন্‌টির স্নেহ-সঙ্গ পাইয়া থাকে। তাই মাতার অভাব শীঘ্রই তাহার পূরণ হইয়া গিয়াছিল। চন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে তাহাকে সকলে অত্যন্ত সমাদরও করিয়া থাকে। আনন্দকুমারও তাহার সৌজন্যে স্নেহে ও সদ্ব্যবহারে সেই বিরূপ কুটুম্বদেরও তাহাদের প্রতি অতি সদয় রাখিয়াছিলেন।

অরুন্ধতী বৃদ্ধ শ্বশুর এবং তাঁহার সংসার, দেব সেবা ও আশ্রিত গুলিকে লইয়া একইভাবে জীবন অতিবাহিত করিতেছেন। তাঁহার শ্বশুরের এক সময়ের আদেশ এখন তাঁহার অস্থি মজ্জায় রক্তমাংসে মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। করুণা তাঁহাদের সংসারে মীরার স্থান অতি সহজেই অধিকার করিয়াছে এবং বুঝি সনতের স্থানও কতকটা অরুণ ধীরে ধীরে দখল করিতেছে। শ্বশুর অরুণকে যতখানি ভালবাসেন ততখানি স্নেহ যেন প্রবাস হইতে অল্প দিনের জন্য আগত সনৎকেও দিয়া উঠিতে পারেন না, সময়ে সময়ে এই সন্দেহে অরুন্ধতী মনেও বোধ করেন; আবার অরুণের স্নিগ্ধ স্বভাবে ও সদ্‌গুণে নিজেই মুগ্ধা হইয়া পড়েন। করুণা ও অরুণের শিশু ভ্রাতাটিকে ইঁহারা অনেক চেষ্টায়ও বাঁচাইতে পারেন নাই। এবাড়ীতে আসার দুই তিন মাসের মধ্যে সেটিও মৃত পিতা ও ভ্রাতার সঙ্গী হইয়াছিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহাকে গ্রাম্য স্কুলে ম্যাট্রিক্ পাশ করাইয়া লইয়াছিলেন। তাহার পরে এই তিন বৎসর তাহাকে অতি যত্নে সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের সহিত ন্যায় ও স্মৃতির পাঠও কিছু কিছু দিতেছেন। তিনি আজ যৌবনে স্মৃতিতীর্থ, ন্যায়রত্ন কাব্যসরস্বতী ইত্যাদি কতকগুলা উপাধি একাধারেই লাভ করিয়াছিলেন। পণ্ডিত সমাজের বহু সুধী ব্যক্তি তাঁহার নিকটে শাস্ত্রের অনেক গূঢ় তত্ত্বের মীমাংসার জন্য আসিয়া থাকেন এবং পণ্ডিত সভায় তাঁহার সম্মানও যথেষ্ট। পণ্ডিত সমাজের শ্রেণীর মধ্যেও তিনি একজন সমাজপতি। কিন্তু এখন বেদান্তের বিচারে 'শঙ্কর-ভাষ্য' এবং বৈষ্ণব আচার্য্যগণের 'মীমাংসা সূত্র' লইয়াই প্রৌঢ় বয়স হইতে দিন কাটাইতেছিলেন।

যেখানে যেখানে ইহার আলোচনা হইত সেই সভায় কিম্বা উপযুক্ত ব্যক্তি পাইলে তাঁহার সহিত এই লইয়া চর্চ্চা করাই তাঁহার জীবনের সবচেয়ে উপভোগের বস্তু ছিল। বাল্য ও যৌবনের অধীত ন্যায় স্মৃতি কাব্য প্রভৃতির সঙ্গে কোন খোঁজই এতদিন রাখেন নাই। যৌবনে কিছুদিন একটী টোল খুলিয়া কতকগুলি ছাত্রকে শিক্ষা দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু নিজের এই তৃষ্ণ পিপাসু অন্তরের ক্রমবর্দ্ধিত সিদ্ধান্ত তর্ক জালের বেড়ায় কর্ম্মজীবনের আদর্শ ধীরে ধীরে তাঁহার নিকট হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। পৈত্রিক অনেকটা সম্পত্তি থাকায় তিনি মাঝে একটু বেশী বিষয়ীও হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু এখন এই বৃদ্ধ বয়সে নাতি নাতিনীকে পাইয়া সেই যৌবনের উৎসাহ ও আদর্শ কতকটা তাঁহাতে ফিরিয়া আসিয়াছিল। নিজের আদর্শে তাহাদের জীবন ও তাহাদের শিক্ষা দীক্ষা বর্দ্ধিত করিয়া তুলিতে অত্যন্ত সাধ হইয়াছিল। ভাগ্য তাঁহাকে তাহা দিল না, কিন্তু এই শেষ বয়সে অন্তরের অন্তঃসলিলা ফল্গু ধারাকে যাহারা নির্ঝরের আকার দিয়াছিল তাহাদের অভাবেও সেই স্রোত-ধারা তো মরিল না। ভাগ্যের বিপর্য্যয়ে যাহারা তাঁহার কারুণ্যের আশ্রয়ে আসিয়া মস্তক পাতিয়া দাঁড়াইল— তাহাদেরই অভিষিক্ত করিয়া তাঁহার বৃদ্ধ বয়সের এই নব জীবনী ধারা অজস্রধারে নামিতে লাগিল। তাই তিনি অরুণকে মাত্র শিক্ষা দিয়া থামিতে পারিতেন না। করুণাকেও এই পাঁচ বৎসরে বাংলা সঙ্গে বাংলা ব্যাকরণেরও কতকটা পড়াইয়া লইয়া উপক্রমণিকায় প্রবেশ করাইয়াছিলেন। করুণা পড়াইতে পড়াইতে পদে পদে তাঁহার সেই বন উন্মেষিতমেধাস্ফূর্ত্ত শিখাময়ী বালিকা মীরাকে স্মরণ পড়িত। করুণা মীরার এস্থানটি ততখানি অধিকার করিতে পারিতনা! করুণার মনটি অরুন্ধতীর মত কাজের সাহায্য আর ঠাকুর সেবার উদ্যোগের নিখুঁত পারিপাট্য সাধন করিতেই বেশী উৎসুক থাকিত। ভট্টাচার্য্য বুঝিতেন বাল্যে যাহাদের জীবনে এত বড় বিপ্লব বহিয়া গিয়াছে তাহাদের প্রাণশক্তি তত বেশী সজীব হইবার কথাও নয়। মেধা জিনিষটিও সকল পাত্রে সমানভাবে থাকে না। তবুও তিনি এখানেও নিরুৎসাহ হন নাই।

তাঁহার অন্তরের ক্ষুধা বিশেষভাবে মিটিত অরুণকে লইয়া। সে যেন দ্বিতীয় অর্জ্জুন যে পাঠ তাহাকে যেদিন দিতেন তাহা যেন সে পূর্ব্বেই আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছে। 'দৃষ্টিপাতে তাহা শিখিলা অর্জ্জুন'—কাশীরাম দাসের কবিতার এই চরণটি অরুণের সম্বন্ধে সর্ব্বদাই মনে পড়িত।

সেদিন প্রভাতে করুণা একখানি লাল চেলির কাপড় পরিয়া সাজি হাতে উঠানের ফুলের হইতে ফুলগুলি তুলিয়া লইতেছিল। তাড়াতাড়ি ঠাকুর পূজার উদ্যোগের মধ্যে নিজেকে করিয়া ফেলিলে জেঠিমার আর বেশী আপত্তি চলিবেনা, একা তাঁহাকে সংসারের সমস্ত কাজ শ্রান্ত ক্লান্ত হইতে হইবেনা,—এই ইচ্ছায় বালিকা দ্রুতহস্তেই ফুল তুলিতেছিল। এমন সময় বৈষ্ণবী আসিয়া উঠানে দাঁড়াইয়া হাঁকিল, "কই গো-আমার করু মা কি কর্‌ছ গো?"

"এই যে পিসি ফুল তুল্‌ছি" বলিয়া করুণা কুন্দ ফুলের ঝাড়ের আড়াল হইতেই উত্তর দিল। তারপরে একমুখ আনন্দের হাসি লইয়া সম্মুখে আসিয়া বলিল, "কদিন আসনি যে পিসি? ভাল ছিলে ত?"

"আর বাছা ভাল থাক্‌বনা ত আমাদের কি যমে চোখে দেখতে পায়? ঘোলের ননীটুকু আর দুধের সরটুকুর ওপরে একা মানুষের নয় দেবতাদেরও নজর পড়ে! নৈলে সেবার অমন হয়েও মলামনা, যেতে গেল কিনা ভাল ভাল জিনিষ ক'টি। হারে আমার পোড়া কপাল!" বলিয়া নিজের কপালে সজোরে একটা চাপড় মারিয়া কৈবর্ত্তপিসি উঠানেরই এক পাশে পা ছড়াইয়া বসিয়া পড়িল।

করুণার হাসিভরা মুখখানি মুহূর্ত্তে স্মৃতির নিদারুণ স্পর্শে ফুলের মত আওরাইয়া উঠিল, উৎফুল্ল চোখ্ দুটি হাতের সাজির পানে স্থির হইল।

"এই যে কৈবর্ত্ত ঠাকুর্ঝি, এস এস! তোমার কাঙালীচরণ ভাল আছে তো? শুন্‌ছি নাকি তার বিয়ে দিয়ে বৌ আন্‌ছ শীগ্‌গির?"

কৈবর্ত্ত ঠাকুর্ঝি আনন্দগদগদকণ্ঠে "এই তোমাদের 'ছিচরণ' কৃপায় বৌঠান্ যদি হয়, নৈলে আমার কি তেমন ভাগ্যি!" বলিতে বলিতে গলায় আঁচল দিয়া সম্মুখের পট্টবস্ত্রপরিহিতা সদ্যঃস্নাতা শান্ত স্নিগ্ধমূর্ত্তি অরুন্ধতী দেবীর পায়ের নিকটে গোটা কতক ঢিপ্ ঢিপ্ শব্দে প্রণাম সারা করিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল।

"তোমার একা কাঙালী একশো হোক্, মনের মত বৌ আসুক—আর নিজে কিছুদিন তাদের নিয়ে মনের সাধ মিটিয়ে ঘর কর! সেবার তো মরেই গিয়েছিলে! কাঙালীর বৌ দেখবে বলেই বেঁচেছ! তা তোমার কাঙালী ক'বছরের হ'ল ঠাকুর্ঝি? সনতেরই জুড়ি' না?"

"বৌঠানের আমার সব হিসেব ঠিক্ থাকে! যখন সব ঘুচিয়ে' ক্যাঙ্গলাকে কোলে নিয়ে ভাইয়ের ঘরে এনু তখন তোমার সনৎ ঠাকুরও ঠিক্ তাতো বড়ই! তুমি আপুনি বল্‌লে 'আমার সনতেরই জুড়ি'—তাইতে মনে আছে কথাডা; নৈলে আমাদের চাষার ঘরে আবার বয়েসের হিসেব!

"তা হ্যাঁ ভাই, এই বছর সতোরোর ছেলে এখনি বিয়ে দেবে?"

"বৌঠান—তোমাদের ভদ্দরের ঘর নয়ত যে ছেলের নেকা-পড়া হবেনা। আমাদের চরের ছেলের এর চেয়েও ছোটতে বিয়ে হয় দেখনি কি? এতদিন ভাইয়ের ঘরে ছিলাম, এখন নিজের একখানা ঘর করেছি, দুটো গরু বাছুরও ক্যাঙ্‌লার হয়েছে, জোয়ান্ মরদের খাটুনি খাটে এখন, আমিও বুড়ো হয়েছি, এখন একা কি আর সব দিক্ দেখ্‌তে পারি বোঠান্? এই বেলা একটা বৌ এলে তাকে যে ক'বছর বাঁচি শিখিয়ে দেখিয়ে দিয়ে যাই! অমর তো নই, একদিন মরবই, তখন আমার ক্যাঙলার মুখ চাইতে আপনি বল্‌তে পিথিমীতে কে থাকবে? তাই মনে করেছি এইবার ক্যাঙলার বিয়ে দিই!"

"তা বটে" বলিয়া অরুন্ধতী যেন অন্যমনার মত একটু চুপ করিয়া থাকিলেন। নিকটেই সাজি হাতে অরুণাকে দেখিয়া তখনি হাসিয়া বলিলেন, "এই শীতে সকালে ঠাকুর ঘরের কাজে না জুটলেই নয় করু? ঠাকুর এখনি পড়বার জন্য ডাকাডাকি করবেন! ঠিক্ সণ্টুর মত স্বভাব তোর—বাবাকে কেবলই ফাঁকি দেবার চেষ্টা, না?"

করুণা একটু লজ্জার হাসি হাসিতে আবার তাহার পীঠে হাত দিয়া সস্নেহকণ্ঠে অরুন্ধতী বলিলেন "এই শীতের সকালে ঠাণ্ডা চেলি পরে জেঠিমার কাজের সুসার করতে আস্‌তে কে বলে তোমায়? যাও—"

তাঁহার কথায় বাধা দিয়া কৈবর্ত্ত পিসি তাড়াতাড়ি তাহার 'পিসি' পদের উপযুক্ত ভাষায় বলিলেন "ওমা সেকি কথা বোঠান্? এখন তো করু'মা আমার ছেলে মানুষটি নেই! এখন তোমার "হাত্‌নুরকুৎ" হ'য়ে সব না করবে তো ঘর সংসার করা শিখ্‌বে কবে? আর কতদিনই অমন নেকা পড়া শেখাবে? এইবার ঘর কন্নার ভারওতো দিতে হবে। মার আমার ক'বছর হোলো গা বোঠান্? বারো বচ্ছর হ'য়ে গিয়েছে, না?"

"তেরো পুর্‌লো ঠাকুর্ঝি! আমাদের সমাজেও দশ বছরের মেয়েরই বিয়ে দেওয়া এতদি চলেছে তো। আমি, ছোট বৌ আমরা তো আট বছর ন বছরে এ ঘরে এসেছি! কিন্তু মীরার তো এখনো বিয়ে দেওয়া হয়নি, সেও বারো পুর্‌লো,—তার অরু করুর এক সময়েই বি দেওয়া যাবে মনে করা যাচ্ছে। যে রোগা করু—তেরো বছর ব'লে কি মনে হয়? যেন বছরের মেয়েটি; তাই বাবা আরও গা করেন না! আমাদের মীরা শুন্‌ছি খুব বাড়ন্ত হয়েছে তার বিয়ে আর না দিলেই নয়!"

"কেন বৌঠান্ আমার করু মা'কেই কি অসাজন্ত দেখাচ্চে? চেলির কাপড়খানি প ঠিক্ যেন লক্ষ্মী ঠাক্‌রুণ, ঠিক্ যেন বিয়ের কনে—"

"লক্ষ্মীই তো—আমার মা লক্ষ্মী! তাই তো ভাব্‌না ঠাকুর্ঝি কার ঘরে দেব—কাকে দে যাকে দেব সেটি সুপাত্র হওয়া চাই! যাকে তাকে অমনি—"

ঘোরতর বিস্ময়াবিষ্টভাবে কৈবর্ত্ত ঠাকুর্ঝি অরুন্ধতী দেবীর পানে চাহিয়া বলিল, " বল্‌ছ বৌ ঠাকরুণ? কার ঘরে করুণাকে দেবে? আমার করু মা কি তোমারই ঘরের লক্ষ্মী হবে গাঁয়ের শুদ্দুর ভদ্দর, বামুন চাষা, সবাই তো এই কথাই বলে যে, সনৎ ঠাকুরের নিতান্ত ছেলে বলে তোমাদের বামুন ভদ্দরের ঘরে ষোলো সতেরো বছরের ছেলের বিয়ে দেয় না বলেই আমা করু মাকে এতদিন বিয়ে না দিয়ে আইবড় করে রেখেছ! নৈলে তোমাদের ঘরের মেয়ে কি চোদ্দ বছর পর্য্যন্ত বিয়ে না দিয়ে রাখা চলে! ঘরে ঘরে হবে তাই কথা নেই। ঐ মুখুয্যে ঠাকুর রায় বাড়ীর সবাই এই কথাতো বলে! সবাই বলে করু মা-ই আমার সনৎ ঠাকুরের কনে! আজ যে নতুন কথা বল্‌ছ বৌ ঠাকরুণ।"

অরুন্ধতী স্তব্ধ হইয়া গেলেন। ত্রস্তে করুণার দিকে চাহিয়া দেখিলেন সে পিসির সুদীর্ঘ বক্তৃতা শেষ হইবার পূর্ব্বেই ঠাকুর ঘরের দিকে ফিরিয়া চলিয়াছে। অরুন্ধতী এইবার একটু জোরের সহিত বলিলেন "না না, ওকথা বলতে নেই ঠাকুর্ঝি। সনৎ করুণা—"

'পিসি' পরিতুষ্ট হাস্যের সহিত ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল "বৌ ঠাকরুণ, সে কথাও চাটুয্যে গিন্নির কাছে শুনেছি! তোমাদের ঘরে নাকি বিয়ের দুচার্‌দিন আগে আশীর্ব্বাদ না হ'লে মুখ দিয়ে সেকথা আনো না। যে মেয়ের দায় দৈবির পাকে আশীর্ব্বাদ আর সবার জানাজানির পরে বিয়ে ভেঙে যায়, সে মেয়ে 'অন্নপূর্ব্বে' না কি বলে তাই হয়। সে মেয়ে কেউ বিয়ে করে না, করলে জাত্ যায়! তা আমি কি কারু কাছে মুখে আন্‌ব বৌ ঠাকরুণ! এমনি মনের আহ্লাদে ব'লে ফেলেছি বই তো নয়। আর তোমাদের কাছে কি তেমন অন্যায় কিছু হবার যো আছে, ভদ্দর লোকেরাই তেমন কাজ করেনা, তোমরা তো দেবতা। আমার অরুণকে তোমরাই বাঁচিয়েছ, মানুষ করছ, বাছা আমার পথ দিয়ে যায় পথ যেন আলো করে যায়, সাতবার ষাট্ ষাট্ বলে চোখের জল মুছি। সবাই বলে, 'অরুণকে ঠাকুর মশাই নাত জামাই করবেন। আর করুণা তো ঘরের লক্ষ্মী হয়েই আছে!' বল্লেই বা বোঠান্ তাতে দোষ কি! তোমরা কি কথার নড় চড়্ বদ্‌বার মানুষ?"

অরুন্ধতী এতক্ষণ 'কৈবর্ত্ত পিসির' বাক্যস্রোতে বাধা দিতে না পারিয়া মহা বিব্রতভাবে চারিদিকে চাহিতেছিলেন এবং করুণা যে ঠাকুর ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে ইহা দেখিয়া কথঞ্চিৎ আশ্বস্তভাবে এইবারে তাহার বাক্যাবসানের প্রতীক্ষায় ছিলেন। কিন্তু সহসা অঙ্গনের দ্বারের দিকে দৃষ্টি পড়ায় তাঁহার সমস্ত অন্তর যেন শিহরিয়া উঠিল। মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য মহাশয় একহাত দ্বারের উপরে রাখিয়া স্তব্ধভাবে এই কৈবর্ত্ত কন্যার কথাগুলি শুনিতেছেন, শ্বশুরের গম্ভীর স্তব্ধ মুখের পানে চাহিয়া অরুন্ধতীর মুখ একেবারে নীল হইয়া উঠিল। এ মুখভাবকে যে তিনি অন্তিমে লজ্জায় ভাল করিয়াই চেনেন।

একটু পরে ঈষৎ কম্পিত পদদ্বয়কে দৃঢ় করিয়া কর্ম্মান্তরে লইয়া যাইবার জন্য কৈবর্ত্ত পিসির নিকট হইতে একটু পিছাইয়া অরুন্ধতী সন্ত্রস্তভাবে বলিলেন, "এখানে যা বল্‌লে তা বল্‌লে ঠাকুর্ঝি, অমন কথা আর কোথাও মুখে এনো না, কেউ বল্‌লেও কানে করোনা। করুণা সতের বোনের মত, ওরা তিনটি ভাই বোন! আর মীরার বিয়ে তার মামারাই হয়ত দেবে। মানুষ করলেই কি তাদের সঙ্গে ছেলে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে? ওকি কথা! করুণা আমার ঘরে, আমার মীরার জায়গায়!" বলিতে বলিতে তিনি ভাঁড়ার ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন আর 'কৈবর্ত্ত-পিসি' অবাক্ স্তব্ধভাবে গমনশীলা তাঁহার প্রতি চাহিয়া উঠানেই পা ছড়াইয়া বসিয়া রহিল।

নবম পরিচ্ছেদ

কয়েক দিন পরে শ্বশুরের আহারের সময়ে অরুন্ধতি কথাটী পাড়িলেন "বাবা মীরা যে আমাদের তেরো বছরের হল,—সে যে বড্ড বাড়ন্ত হয়েছে সন্টুর মুখে শুনি। তার বিয়ের কি কর্‌ছেন ?"

মৃত্যুঞ্জয় আহারে বিরত হইয়া চকিতভাবে পুত্রবধূর পানে চাহিলেন, "বাড়ন্ত হ'য়েছে! কত বড়টি হয়েছে ? সুনন্দের মতই তাহ'লে দেখতেও হয়েছে, না মা ?"

সে তো জানাই আছে বাবা, বাপ মা মিলিয়ে মীরা তাদের চেয়েও সুন্দর হয়েছে। তেরো বছরের হল, আর তো চুপ করে থাকা উচিত নয়।' মৃত্যুঞ্জয় ক্ষণিক যেন আত্মবিস্মৃত হইয়া এই গত পাঁচ বৎসরের পূর্ব্বের কথা ভাবিতেছিলেন। সেই সাত বৎসরের ক্ষুদ্র বালিকা আজ না জানি কোন অমেঘবাহিনী বিদ্যুৎ লতার মত সুন্দরী হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার বুকে সেই ক্ষুদ্র স্রোত-ধারাটি আজ তাঁহার জীবনের এই আগত বর্ষার উপক্রমে না জানি কেমন কলকলনাদিনী নদীর আকার ধরিতেছে! বধূর এই "আর তো চুপ করে থাকা উচিত নয়" কথাটায় সহসা তাঁহার স্থান-কালের জ্ঞান আসিল! কোথায় তাঁহার জীবনের এই দিবা শেষে উষর মরুভূমির স্রোত-ধারা আর কোথায় তিনি! দূরে বহুদূরে! সে এখন তাঁহার পক্ষে "পর গৃহে পর হ'য়ে আছে", বুঝি তাহার সেই দাদুর কথা এখন আর তার দিনান্তেও একবার মনে পড়ে না। দেখিলে বুঝি আজ চিনিতে পারিবে না। সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া মৃত্যুঞ্জয় বলিলেন "আমি কি করব মা! আমার কি হাত ?"

"এখনো ঐ একই কথা বল্‌বেন না বাবা! আপনাদের ঘরে কি কখনো মেয়ে দশ পেরিয়েছে ? ওঁরা হয়ত আপনি বিয়ে দেবার উদ্যোগ কর্‌বেন ব'লে চুপ্ করে আছেন, আর আপনি এখনো সেই অভিমান নিয়েই আছেন। এত দিন যা হল তা হল, এখনতো মীরার দাদামশায় বেঁচে নেই, এখন আর আপনার চুপ্ করে থাকা উচিত নয়। সবাই আমায় জিজ্ঞাসা করে বলে, তা'দের কি গরজ, তোমরা কি বলে চুপ্ করে আছ ?"

মৃত্যুঞ্জয় কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া বলিলেন "লোকের তো কত রকমই কথা, কতই অপমান তাদের! কিন্তু চন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী না থাক্‌লেও মীরার মামারা আছেন। তাদের মত এখনো বোধ হয় এখন তারা বিয়েই দেবে না। আমি ব'লে কেবল অপমানিত হয়ত! মীরা না এখনো স্কুলে পড়ে ? সন্টু সেদিন খুব স্ফূর্ত্তি ক'রে তোমার কাছে গল্প না, মীরার আর তার মামাতো বোনের কথা ? আমি সম্বন্ধ ক'রে দিলে তারা কি রাজী হবে ?"

"হবে কি না হবে সেতো একবার চেষ্টা ক'রে দেখাও হয়নি। আপনার সম্বন্ধ ঠিক্ করায় তারা সেখানে বিয়ে দিতে রাজী না হয় তাদের মনের মত পাত্রেই তারা মীরার বিয়ে দেক্। ছোট বৌ কিছু অপাত্রে মেয়ে দেবেই না। মীরার মামারা যে পাত্রে বল্‌বেন সেইখানেই না হয় বিয়ে দেওয়া যাবে। তবু বিয়ের কথাটা আপনি একবার তুলুন তাঁদের কাছে।"

মৃত্যুঞ্জয় একটু ভাবিয়া বলিলেন "আচ্ছা, আনন্দ বাড়ী আসুক, তার কাছে আগে জানি যে তাদের এখন মীরার বিয়ে দেবার ইচ্ছে আছে কি না। ছোট বৌ-মারই বা মত কি! আমিই তাদের পর, শত্রু, কিন্তু আর সকলেরই সঙ্গে তাদের তো আত্মীয়তা আছে।"

শ্বশুরের অভিমানে আহত বেদনাটী পুত্রবধূ বুঝিলেন—কিন্তু তাঁহার স্বামী যে উভয় দিকেই নিরুপায় হইয়াই অগত্যা তাহাদের সহিত সন্ধি স্থাপনা করিয়া মীরার মা ও মীরার সঙ্গে এ আত্মীয়তা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন, এবং নিজ কর্ত্তব্যও রাখিয়া চলিতেছেন তাহা অরুন্ধতী জানিত। স্বামী পুত্রের সঙ্গে এ বিষয়ে তাঁহার যোগও ছিল—তবু শ্বশুরের বেদনাকেও তিনি মনে মনে উপেক্ষা করিতে পারিতেন না। একটু পরে তিনি আবার বলিলেন, "আর করুণারও তো এইবার বিয়ে দিতে হয় বাবা, সে যে মীরার চেয়ে এক বছরের বড়! সেতো আর এখন রোগা নেই। এইবার—" অরুন্ধতির স্বর ক্রমে অস্ফুট হইয়া থামিয়া গেল। কেননা শ্বশুর এইবারে একেবারে আহার ছাড়িয়া বধূর মুখের পানে চাহিতেছিলেন। সে দৃষ্টির সাম্‌নে অরুন্ধতির আর ক্ষণ বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না,—তিনি মাথা হেঁট করিলেন।

একটু পরে আবার একটী চাপা অথচ গভীর নিঃশ্বাস ফেলিয়া মৃত্যুঞ্জয় বলিলেন "আচ্ছা, আনন্দ আসুক"। অরুন্ধতি বুঝিলেন। সেই অশিক্ষিতা গ্রাম্য-রমণী কৈবর্ত্ত কন্যার মন্তব্যের মধ্যে যে কিছু সত্য আছে তাহা এখন স্পষ্টভাবেই বুঝিয়া কেমন যেন একটু ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। যেন মনে হইল সম্মুখে বুঝি আবারও এই ব্যাপার লইয়া কোন একটা বেদনার উপস্থিত—তাঁহাদের অজ্ঞাতেই উপস্থিত হইতেছে। শ্বশুরের কাছে সেটা চাপা দিয়া গিতেও তিনি আর ইচ্ছুক হইলেন না। কেননা, কন্যা ও পিতা, শ্বশুর ও বধূ, গুরু ও শিষ্যা রকম অনেকগুলা সম্বন্ধই তাঁহার যে শ্বশুরের সহিত ছিল। তাই স্পষ্ট করিয়াই বলিলেন, দিন ক্যাঙ্‌লার ঠাকুমা—কৈবর্ত্ত ঠাকুর্ঝি—এইজন্যে এমন একটী কথা বল্লে, যাতে মনে হচ্চে র কেউ কেউ ভাবে করুণা আর অরুণকে আমরা ঘরে ঘরেই বিয়ে দেব; তাই এতদিন মীরার কর বিয়ে দেওয়া হয় নি। আমাদের এই দেরী দেখেই লোকে একথা ভাব্‌তে পার্‌ছে। আশ্চর্য্য কথা দেখুনত!"

"আমরা আশ্চর্য্য ভাব্‌লেও লোকে তা ভাবছে না। আমাকেও ক'জন গ্রামের মান্যমান একথা বলেছেন। তাঁদের কাছে কি যে আমি আপত্তি দেখাব ভেবে পাইনে মা।"

"কেন আপনিই তো এখনি বল্‌লেন বাবা যে, মীরার সম্বন্ধে আমাদের কোনই হাত নেই! আমরা বড় জোর তাদের 'বিয়ে দাও' এই কথা বল্‌তে পারি, পাত্র ঠিক্ তো তারাই নিশ্চয় কর্‌বে। লোকে কি দেখছেনা—মীরা কি আর আমাদের আছে যে তার—?"

"মীরা সম্বন্ধে সে উত্তর আমি দিতে পেরেছি। কিন্তু করু? তার বিষয়ে কি আপত্তি লোকের দেখাতে পারি মা! মেয়েটিকে যে তুমি মেয়ের চেয়ে যত্নে পালন করছ, তাতো লোকে দেখ্‌ছে! করুণা কুৎসিতাও নয়, আর তার স্বভাব—"

সহসা অরুন্ধতী নিজের স্বভাবের বিরুদ্ধ উত্তেজিতভাবে শ্বশুরের কথায় বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "চুপ্ করুন বাবা, করু আস্‌ছে।"

মৃত্যুঞ্জয় চাহিয়া দেখিলেন দুধের বাটী হাতে লইয়া করুণা দুয়ারের কাছে 'ন যযৌ ন তস্থৌ' ভাবে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। অরুন্ধতী সহজসুরে বলিলেন "দাঁড়িয়েছিস্ কেন করু, দুধ আন্‌না। দুধের বাটী দাদা মহাশয়ের পাতের গোড়ায় নামাইয়া দিয়া করুণা ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

অরুন্ধতী দেখিলেন বাটী নামাইবার সময় তাহার হাতটী স্পষ্টই কাঁপিতেছিল। মুখখানা যেন শুষ্ক মলিন ভাব। করুণা দৃষ্টির অন্তরালে যাইতেই তিনি আবার সেই উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "করুণাকে আমি মেয়ের মত যত্নে মানুষ কর্‌ছি, সে কি কোন স্বার্থে বা আপনারই ইচ্ছায় নয় কি? আপনি যে বলেছিলেন—সে আমাদের মীরা হয়ে থাক্‌বে মীরাকে হারিয়ে আমরা তাকে নিয়েই তো আছি। আপনি অরুণকে আর তাকে স্বার্থে যে প্রতিপালন করেন নি, তাই লোককে বুঝিয়ে দেন্! তাদের কথাই কর্ত্তব্য কেন নেবেন!"

"মা জান না কি, দশের ইচ্ছার একটা ন্যায্য দাবী থাকে, দশ মুখে ভগবান জান তো।"

"দশের কথা ছেড়ে দেন্ বাবা, আপনার ইচ্ছাই আমাদের একা একশো। কিন্তু এ নিয়ে যে তাদের আপনি পালন করেননি এতো আমি জানি। এখন অন্যের যুক্তিতে আপনার ইচ্ছায় দাঁড়াচ্ছে বোধহয়। কিন্তু বাবা, আমিও একটা মনের কথা আপনাকে আমার এতে এমন কিছু আপত্তি থাক্‌তে পারে না। কেননা, সনতের বৌকে যে করু আমি ভালবাসতে পার্‌ব এতো এখন আমি ভাবতেও পারি না। কিন্তু বোধহয় এ করতে গেলে আবার সংসারে কোন অশান্তি আস্‌তে পারে,—হয়ত—, তার চেয়ে আমার মেয়ে হয়েই থাকুক বাবা।"

"তুমি আনন্দের অসম্মতির আশঙ্কা কর্‌ছ মা? আচ্ছা সে আসুক! তার বুঝে তবে অন্যমত কর্‌তে হয় কর্‌ব। তোমার যে আপত্তি নেই, এইটি জেনেই সুখী তোমারও যদি আন্তরিক ইচ্ছা হয় তা'হলে আনন্দ—আচ্ছা, আসুক আগে সে!

জার্ম্মাণির শিক্ষা সংস্কার

আদর্শের পরিবর্ত্তন:—শিক্ষা সংস্কারের আলোচনায় জার্ম্মাণির শিক্ষার পরিবর্ত্তন বিশেষভাবে দৃষ্টি-আকর্ষণের উপযুক্ত। এই দেশে শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা যেমন তীব্র পৃথিবীর অন্য কোন দেশে সেরূপ নয়। এই সত্যটী জার্ম্মাণির শত্রুরাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। কিন্তু যুদ্ধের পূর্ব্বে সমাজের সকল বিভাগে এই শিক্ষার বাসনা চরিতার্থ হইবার সমান সুযোগ ছিল না। সেইজন্য সমাজের নিম্ন ও মধ্য স্তরে ভিতরে ভিতরে একটা অশান্তির ভাব পরিস্ফুট হইতেছিল। সমাজ তান্ত্রিকদল (Social Democrats) জাতীয় মহাসভায় এই অশান্তির সংবাদ ঘোষণা করিলেও, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সমস্ত ব্যাপারে শাসক সম্প্রদায় এমন শৃঙ্খলার সহিত আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিয়াছিল যে, রাষ্ট্রীয় শক্তিকে সকলেই জীবনের সমস্ত কার্য্যে স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। এই রাষ্ট্রীয় স্বৈরতন্ত্রের ফল বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে বিশেষভাবে অনুভূত হইত। জার্ম্মাণির জ্ঞান পিপাসার কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এই পিপাসা নিবৃত্তির জন্য নিত্য নূতন সত্য আবিষ্কারে নিয়োজিত থাকিলেও, সকল আবিষ্কারই সাম্রাজ্য বুদ্ধি, শক্তিলিপ্সা, ও কর্ত্তৃত্বাভিমানে রঙিন হইয়া দাঁড়াইত। এখানে সত্যের মর্য্যাদা অপেক্ষা শক্তি ও শাসক সম্প্রদায়ের পূজার অধিকতর সুবন্দোবস্ত ছিল। য়ুরোপীয় মহাসমরের ২০ বৎসর পূর্ব্বে জার্ম্মাণিতে সম্প্রসারিত শিক্ষাশালা (Continuation Schools), শিল্পবিদ্যালয় (Technical Schools) ইত্যাদি দ্বারা সর্ব্বত্রই শ্রমিক দিগের শিক্ষার অতি সুন্দর বন্দোবস্ত হয়। ইংলণ্ডে যুদ্ধের পরই এরূপ চেষ্টার সূত্রপাত হইয়াছে এবং নূতন শিক্ষা-আইনের সাহায্যে এরূপ শিক্ষার সুব্যবস্থার চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে বে-সরকারীভাবে কোথাও কোথাও এরূপ শিক্ষার বন্দোবস্ত হইলেও, অর্থাভাব প্রযুক্ত এই উদ্দেশ্য সর্ব্বত্র কার্য্যে পরিণত হইতেছে না। কিন্তু জার্ম্মাণিতে সমাজের সকল শ্রেণীর ভিতর শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা যুদ্ধের পূর্ব্বেই কিরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহা বিংশ শতাব্দীর বিরাট রণক্ষেত্রে অগ্নিবৃষ্টি, বিষাক্ত ধূম, জেপেলীন, ইত্যাদি মরণের নানা অদ্ভুত উপকরণের দ্বারা বিশেষ ভাবেই জগতের জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দিয়াছে।

জার্ম্মাণিতে আদ্য, মধ্য, ও অন্ত্য শিক্ষার এবং শ্রমশিল্প ও বাণিজ্য শিক্ষার এরূপ উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত থাকিলেও, শিক্ষায় ব্যক্তিত্বের ও সামাজিক জীবনের দাবী সর্ব্বত্রই উপেক্ষিত হয়। ব্যষ্টি সমষ্টির ঐশ্বর্য্য-যজ্ঞের সমিধরূপেই ব্যবহৃত হইতে থাকে। রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য ব্যক্তি, গৃহ, ও সমাজের স্বাধীন সুখস্বচ্ছন্দ হৃষ্টান্তঃকরণে বিসর্জ্জন দিবার অভ্যাস অর্জ্জনই জাতীয় শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু এই চেষ্টা সর্ব্বাংশে সার্থক হইলেও, একটা প্রচ্ছন্ন অসামঞ্জস্যের অনুভূতি সর্ব্বত্রই বিরাজমান ছিল। রাষ্ট্রে সমাজের উচ্চতম স্তরের একটী ক্ষাত্র সম্প্রদায়ের (military caste) একাধিপত্যের জন্য, সমাজ-সংস্থানে দ্বন্দ্বের অভাব ছিল না। শিক্ষা বিষয়ে কিরূপে

আধিপত্য অশান্তির কারণ হইতেছিল, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের মরণযজ্ঞে সামাজিক ভেদাভেদের স্থান ছিল না। এখানে প্রতিমুহূর্ত্তে সামাজিক সাম্য অগ্নি পরীক্ষার ভিতর দিয়া লোক চক্ষুর গোচর হইতে লাগিল, এবং রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান পাণ্ডারাও শিক্ষা সম্বন্ধে সমাজের সকল শ্রেণীর সমান অধিকারের দাবী অগ্রাহ্য করিতে সাহস করিলেন না। তাঁহারাও মুক্তকণ্ঠে এই দাবীর স্বপক্ষে মত প্রকাশ করিলেন। যুদ্ধের অবসানে জার্ম্মাণিতে যে রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হয় তাহার ফলে স্বাধীনতার ভাব সমাজের সকল স্তরে অনুস্যূত হইয়াছে, এবং শিক্ষাতেও এই স্বাধীনতা ও সামাজিক সাম্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইতেছে। গণতান্ত্রিক পরিচালনের ফলে শিক্ষায় আর সামাজিক বৈষম্যের স্থান নাই; —এখন জীবনকে বৃহত্তর ও পূর্ণতর করিবার আকাঙ্ক্ষাই দেশব্যাপী শিক্ষা প্রচেষ্টার একমাত্র আদর্শ। জার্ম্মাণি কিরূপ সংস্কারের সহায়তায় শিক্ষায় এই উদ্দেশ্য সার্থক করিবার নিমিত্ত সচেষ্ট হইয়াছে, তাহার আলোচনা শুধু আমাদের দেশের নয়, জগতের সমস্ত সভ্যদেশের দৃষ্টি আকর্ষণের উপযুক্ত।

শিক্ষার ব্যবহারিক আদর্শ

জার্ম্মানির সমাজতান্ত্রিক সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা অত্যন্ত অগ্রসর, শিক্ষা সম্বন্ধে উ
সম্প্রদায়ের এই "বাম অংশের" (Left wing) দাবী হইতে নব সংস্কারের আদর্শ বোধগ
হইতে পারে। এই দলের একজন মুখপাত্র ডক্টার্ ল্যেহেবেন্‌স্টাইন্ (Dr Lowenstien
তাঁহার এক নব প্রকাশিত পুস্তকে জার্ম্মাণির গণতন্ত্রের শিক্ষা সংস্কার বিস্তৃতভাবে আলোচ
করিয়াছেন। তাঁহার মতে দেশে সকল শ্রেণীর শিক্ষার জন্য সমাজতান্ত্রিক আইন হাইট
(Einheitschule) বা বাধ্যতামূলক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এখানে এম
সমাজের নিম্নতম শ্রেণীর প্রত্যেক বালক বালিকাও যাহাতে জন্ম বা জন্মের পূর্ব্ব হইতে
নিজ জীবন যাপনের উৎকৃষ্টতম সুযোগ লাভ করিতে সমর্থ হয়, তাহার দিকে
ভাবে লক্ষ্য থাকিবে। যাহাতে হৃষ্টমনে চিত্তাকর্ষক আবেষ্টনের মধ্যে গর্ভিনীদিগের গর্ভ
অতিবাহিত হয়, তাহার ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়; এবং আবশ্যক হইলে ছোট ছোট শিশু
কুমার কাননের (Kindergarten) অনুরূপ কুমার কুটীরে (Kinderhut) শিক্ষা
বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন। প্রথম শিক্ষা আরম্ভ হইবে কুমার কাননে। এখানে বালক বা
আট বৎসর পর্য্যন্ত শিক্ষা লাভ করিয়া, গ্র-গুস্কুল (Grund School) অর্থাৎ মূল
বিদ্যালয়ে (Foundation School) প্রবেশ করিবে। এই আদ্যবিদ্যালয়ের শিক্ষা কা
বৎসর বয়স পর্য্যন্ত। এই বিদ্যালয়গুলিকে ইংলণ্ডের নিম্ন বিদ্যালয়ের (Elementary Sch
সহিত তুলনা করা ভুল হইবে। এখানে লিখন পঠন ও গণনা কর্ম্মশিক্ষা (Manual trai
অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান বিষয় বলিয়া বিবেচিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। সমষ্টিগত শিক্ষা

আদর্শ থাকিবে না;—ছাত্র ছাত্রীদিগকে ছোট ছোট গুচ্ছে বিভাগ করিয়া, বিদ্যামন্দিরেই কর্ম্ম-সঙ্ঘের (Working Societies) সৃষ্টি হইবে। এখানকার শিক্ষা প্রণালী গতানুগতিকতা বর্জ্জিত থাকিয়া, যতটা অকৃত্রিম ও বাস্তব শিক্ষায় পরিণত হয়, তাহার দিকেই বিশেষভাবে লক্ষ্য থাকিবে। এই শিক্ষা শেষ করিয়া বালক বালিকারা ষোল বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ওবের স্কুল (Oberschule) অর্থাৎ উচ্চতর বিদ্যালয়ে উৎকৃষ্টতর সাধারণ প্রশস্ত শিক্ষা লাভ করিবে। পরে বিভিন্ন প্রকার বৃত্তি শিক্ষার বিদ্যালয়ে নিজ নিজ মনোমত বৃত্তিতে পারদর্শী হইয়া সুযোগ ও প্রবৃত্তি অনুসারে এখান হইতেই সকলের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার অধিকার থাকিবে।

আদ্য ও নিম্নশিক্ষা

কিন্তু ব্যবহারিক জগতে আদর্শ কার্য্যে পরিণত করা খুব সহজসাধ্য নয়, বিশেষতঃ এই জাগতিক অর্থাভাবের দিনে জার্ম্মাণিতেও অর্থের অনাটন কোন দেশ অপেক্ষা কম নয়। সেইজন্য সেখানে শীঘ্রই যে এই আদর্শে শিক্ষা সংস্কৃত হইবে, এরূপ আশা করা যায় না। কিন্তু দেশে বেসরকারী ও অন্য প্রকার বিদ্যালয় স্থাপিত থাকিলেও, বাধ্যতামূলক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দ্বারা সর্ব্বত্রই শিক্ষা সংস্কার বিধিবদ্ধভাবে আরম্ভ হইয়াছে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে আদ্য বিদ্যালয়গুলি প্রথম স্থাপিত হয়। এখানে শিক্ষার সর্ব্বশ্রেণীর বালক বালিকার সমান অধিকার। দেশের সমাজ তান্ত্রিকদিগের অপরাপর সাম্যভাবও এই বিদ্যালয়গুলিতে পরিগৃহীত হইতেছে। শিক্ষায় রেখাঙ্কন (Drawing) চিত্রাঙ্কন (Painting) প্রতিমা গঠন (modelling) প্রভৃতি কর্ম্ম শিক্ষার উপায় গুলিকে খুব উৎকৃষ্ট স্থান দেওয়া হয়। গার্হস্থ্য জীবন ও দৈনন্দিন জীবনই শিক্ষার কেন্দ্র। একই জার্ম্মান ভাষা দেশের বিভিন্ন অংশে অত্যন্ত পৃথক বলিয়া, সকলেই মাতৃ-ভাষার প্রাদেশিক রূপটীতে শিক্ষা পায়, এবং কথোপকথন, মৌখিক রচনা ইত্যাদি দ্বারা এই ভাষাই ব্যবহার করিতে শিখে। শারীরিক শিক্ষার (Physical training), ব্যায়াম, ক্রীড়া (Games) ইত্যাদির পূর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত হইয়াছে এবং যখনই সম্ভব হয়, খোলা জায়গায় (open air) শিক্ষা দানের বন্দোবস্ত থাকে। বালক বালিকারা পরিভ্রমণ ও পর্য্যটনের সাহায্যে খুব সাক্ষাৎভাবে প্রকৃতির সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ পায়; এবং দেশীয় শিক্ষা-সচিবের নির্দ্দেশ অনুসারে একদিন সকল ছাত্র ছাত্রীকেই নিজ নিজ বর্গের শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে অপেক্ষাকৃত দূরদেশে পর্য্যটনে বাহির হইতে হয়।

সকল ছাত্র ছাত্রীই এইরূপ আদ্য বিদ্যালয়ে বার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত চার বৎসরের জন্য থাকিতে বাধ্য। এই সময় অবস্থাভেদে কেহ এখানেই আরো দুই বৎসর থাকিয়া নিম্নশিক্ষা সমাপন করে, আবার কেহ চার বৎসরের শিক্ষা শেষ করিয়া মধ্য বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে। ভবিষ্যতে নিজ আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার পারদর্শী ছাত্রদিগের মধ্যে বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভের সুযোগের আশা

থাকিলেও, এখনও পিতা মাতার আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার উপর এরূপ শিক্ষা নির্ভর করে। কিন্তু সকল শ্রেণীর এবং সকল অবস্থার পারদর্শী ও উৎকৃষ্টবুদ্ধি ছাত্র ছাত্রীদিগের জন্য জাতীয় শিক্ষা বিধানে শিক্ষার সমস্ত দ্বার উন্মুক্ত রাখাই জার্ম্মাণির সাম্যবাদী সমাজতান্ত্রিক দলের এবং জগতের সকল উন্নত দেশের শিক্ষার চরম আদর্শ।

মধ্য শিক্ষা

মধ্যশিক্ষার বিদ্যালয়গুলির বাহ্য সংগঠনে তেমন কোন পরিবর্ত্তন না হইলেও, ইহাদের আভ্যন্তরীণ অনেক সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে। শারীরিক শিক্ষার দিকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঝোঁক দেওয়া হয়, এবং সপ্তাহে একদিন সকল বালকই বিদ্যালয়ের খেলার মাঠে বিভিন্ন ক্রীড়ায় যোগদান করিতে বাধ্য। আজ বিদ্যালয়ে যেমন নিজ নিজ জন্ম স্থান ও প্রদেশকে কেন্দ্র করিয়া মাতৃভাষা, ইতিহাস ও ভূগোল শিক্ষা হয়, এবং মাসে একবার সকল বালককেই শিক্ষকদিগের তত্ত্বাবধানে পর্য্যটনে বাহির হইতে হয়, এখানেও ঠিক সেইরূপ ব্যবস্থা থাকে। ইতিহাস শিক্ষার একটী উল্লেখযোগ্য সংস্কার সাধিত হইয়াছে। পূর্ব্বকার ইতিহাসের পুস্তকগুলি উঠিয়া গিয়াছে এবং এখনও নূতন পুস্তক লিখিত না হইলেও ইহাতে যুদ্ধের মহিমা কীর্ত্তন ও রাজ বংশের উত্থান পতনের বিবরণই একমাত্র আকর্ষণের বিষয় থাকিবে না। নূতন ইতিহাসের পুস্তক নূতন উদ্দেশ্যে ও নূতন ভাবে লিখিত হইবে এবং বিভিন্ন যুগের সভ্যতার উন্নতিই বিশেষভাবে আলোচিত হইবে। ধর্ম্মশিক্ষা বিষয়ে রাষ্ট্রবিপ্লবের পর জার্ম্মাণিতে একটা তীব্র বিতৃষ্ণার ভাব আসিয়াছে। কারণ সাধারণতঃ ধর্ম্মযাজকেরা প্রাচীন মত, প্রাচীন পন্থা, এবং বিশেষ ভাবে জার্ম্মাণির ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের ঘোরতর পক্ষপাতী ছিলেন। তাই এখন বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন ;—এরূপ শিক্ষা সর্ব্বতোভাবে পিতামাতার মতামতের উপর নির্ভর করে। কোন কোন ক্ষেত্রে নীতিশিক্ষা ধর্ম্ম শিক্ষার স্থান অধিকার করিলেও, এই নীতিশিক্ষাও বাধ্যতামূলক নয়। অনেক বড় বড় সহর এখন ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা শিক্ষা-তালিকাভুক্ত থাকে না, এবং স্বাধীন বৈষয়িক শিক্ষাই (Secular Education) জার্ম্মাণির ভবিষ্যৎ শিক্ষার আদর্শ। বালিকা বিদ্যালয়গুলিতেও শিক্ষা সংস্কার গভীরভাবে আরম্ভ হইয়াছে। জার্ম্মাণিতে একত্র শিক্ষার (Co-eduction) ব্যবস্থা নাই ; কিন্তু কোন কোন বিদ্যালয়ে সময় সময় বালিকারা বালকদিগের সহিত শিক্ষা লাভ করে। পুংশিক্ষার অনুকরণেই স্ত্রীশিক্ষা গঠিত হইতেছে, এবং সেইজন্য বালিকা বিদ্যালয়েও নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষা বর্জ্জিত ঐহিক শিক্ষাই স্ত্রীশিক্ষা সংস্কারের একমাত্র উদ্দেশ্য।

শিক্ষকদিগের শিক্ষা

শিক্ষক ও ছাত্রের এবং বিদ্যালয় এবং গৃহের সংযোগ সম্বন্ধে দুই একটী কথা আবশ্যক। জার্ম্মাণিতে শিক্ষকদিগকে অধ্যাপনা ও শিক্ষা পরিচালনে যথেষ্ট স্বাধীনতা প্রদান

করা হইতেছে। পূর্ব্বে নিম্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষকের নিম্নশিক্ষার পর শিক্ষকতার বিদ্যালয়ে (normal schools) ছয় বৎসরের জন্য শিক্ষালাভ করিয়া শিক্ষা বৃত্তির জন্য প্রস্তুত হইতেন। এখন আদ্য বিদ্যালয়ের চার বৎসরের শিক্ষা শেষ করিয়া শিক্ষককেই মধ্যবিদ্যালয়ে আরো পাঁচ বৎসরের জন্য সাধারণ প্রশস্ত শিক্ষা লাভ করিতে হয়। ইহার পর তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন এবং এখানে শিক্ষকদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট বিষয়গুচ্ছ সমাপন করিয়া, নিম্নবিদ্যালয়ের শিক্ষা কর্ম্মে নিযুক্ত হন। নিম্নশিক্ষকদিগকে এইরূপে পূর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সাধারণ শিক্ষার অবসর দিয়া, শিক্ষকতার জন্য বিশেষ শিক্ষার সুযোগ দেওয়া হয়। মধ্যবিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা সাধারণতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শিক্ষার পর শিক্ষকতার জন্য প্রস্তুত হয়। বালিকাবিদ্যালয় গুলিতে এই সংস্কার বিশেষভাবেই আরম্ভ হইয়াছে।

ছাত্রদিগের স্বায়ত্ত্ব শাসন

মধ্য বিদ্যালয়ে ছাত্র ও শিক্ষকের ভিতর হৃদ্যতার ভাব এবং পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সংযোগ সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত বিদ্যালয়ের নিয়মানুশাসনে ছাত্রদিগের ভিতর স্বায়ত্ত শাসনের ব্যবস্থা হইয়াছে। কোন কোন বিদ্যালয়ে মধ্য ও উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্রেরা মিলিত হইয়া সাধারণ ছাত্রসভা গঠন করে ; এবং এখানে বিদ্যালয় সংক্রান্ত নানা বিষয় আলোচিত হয়। কিন্তু এরূপ ব্যবস্থা খুব সাধারণ না হইলেও, দেশীয় শিক্ষা সচিবের নির্দ্দেশ মত প্রত্যেক বিদ্যালয়েই ছাত্রদিগের একটী প্রতিনিধি সভা স্থাপিত হইয়াছে। প্রত্যেক বর্ণ হইতে দুই একজন ছাত্র প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয়, এবং ইহারা বিদ্যালয়ের শাসন পরিচালনে ছাত্র ও শিক্ষকদিগের ভিতর মধ্যস্থের ন অধিকার করে।

অভিভাবক সভা

গণতন্ত্র স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে জার্ম্মাণিতে বিদ্যালয় ও গৃহের সংযোগ রক্ষার জন্য এমন একটী ঠান হইয়াছে, যাহা অনেক দেশের অনুকরণীয়। পিতামাতাদিগের প্রতিনিধি সভা এখানে ক ও অভিভাবকদিগের মধ্যস্থ স্বরূপ থাকিয়া, জার্ম্মাণির নীতি নবীন রাষ্ট্রে শিক্ষায় স্বায়ত্ত-শাসন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠিত করিতেছে। জার্ম্মানির অনুকরণে ইংলণ্ডে এরূপ সভা স্থাপনের চেষ্টা হইলেও, জার্ম্মাণি এ বিষয়ে অনেক দূর অগ্রসর। অনুষ্ঠানটী খুব নূতন ; কিন্তু ইহার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। শিক্ষাব্যাপারে ইহার ফলাফল বিশেষভাবেই অনুসন্ধান যোগ্য।

সভার গঠন

বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রের পিতামাতার এবং প্রত্যেক অভিভাবক ও অভিভাবিকার প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে একটী মাত্র ভোটের অধিকার থাকে। একই পিতামাতার একাধিক সন্তান বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিলেও ভোটের সংখ্যা বর্দ্ধিত হয় না। অভিভাবক সভার

প্রতিনিধিদিগের নিম্নতম সংখ্যা পাঁচ জন এবং প্রত্যেক পঞ্চাশ জন ছাত্রের জন্য একজন অভিভাবক প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন। প্রত্যেক নির্ব্বাচিত সভ্য দুই বৎসরের জন্য অভিভাবক-সভার সভ্য থাকেন। কোন ছাত্র বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিলে এবং তাহার অভিভাবক অভিভাবক-সভার সভ্য থাকিলে, তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হয়। এরূপ অবস্থায় তাঁহার দলের সভ্যপদ প্রার্থীদিগের তালিকায় যে অভিভাবক পূর্ব্ব নির্ব্বাচনে ভোট গণনায় তাঁহার পরবর্ত্তী স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, সেই অভিভাবকই তাঁহার স্থানে সভ্যপদ গ্রহণ করেন। নির্ব্বাচনের আট দিন পরে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নির্ব্বাচিত অভিভাবকদিগের প্রথম সভা আহ্বান করেন; এবং এই সভায় সভার সভাপতি ও অপরাপর কর্ম্মচারী ভোট দ্বারা নির্ব্বাচিত হন। যখনই আবশ্যক হয়, সভাপতি অভিভাবক-সভা আহ্বান করেন এবং প্রত্যেক ছয় মাস অন্তর সভার অন্ততঃ একটী অধিবেশন আবশ্যক হয়। অভিভাবক-সভার এক-তৃতীয়াংশ সভ্যের ইচ্ছাক্রমে, অথবা শিক্ষকদিগের অনুরোধে সভার অতিরিক্ত অধিবেশন হইতে পারে। কোন বিশেষ বিষয়ের আলোচনার প্রয়োজন হইলে সভ্যেতর অপর ব্যক্তির আমন্ত্রণের ব্যবস্থা থাকে, কিন্তু ইঁহাদের ভোট দিবার অধিকার থাকে না। বিদ্যালয়ের প্রধান ও অপরাপর শিক্ষকেরা সভায় উপস্থিত থাকিতে পারেন। ইঁহাদিগেরও পরামর্শ দিবার অধিকার থাকিলেও ভোটে অধিকার থাকে না। সময় সময় শিক্ষকদিগকে আমন্ত্রণ না করিয়াও অভিভাবক-সভার অধিবেশন হয়। আবশ্যক হইলে অভিভাবক-সভা এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা অভিভাবকদিগকে একত্র করিয়া সাধারণ সভায় তাঁহাদের পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারেন।

সভার উদ্দেশ্য ও অধিকার

বিদ্যালয়ের সহিত গৃহের সম্বন্ধ দৃঢ় ও উন্নত করা এবং শিক্ষক ও অভিভাবকদি সহযোগিতা ও পরস্পর প্রভাব সুসংরক্ষিত করাই বিদ্যালয়ের অভিভাবক-সভার এক উদ্দেশ্য। সভা বিদ্যালয়ের পরিচালন ও নিয়মানুশাসন এবং ছাত্রদিগের শারীরিক, মান ও নৈতিক শিক্ষা সম্বন্ধে অভিভাবকদিগের ইচ্ছা ও মতামত প্রকাশ করে। এই সকল কোন প্রকার ব্যক্তিগত আলোচনার প্রকাশ্য অধিকার এই সভার নাই এবং আলোচনার বিষয়গুলি সাধারণভাবেই বিবেচিত হয়। ব্যক্তিগত বিষয়ের আলোচনা সব গোপনীয় মনে করা হয়। এইরূপ গোপনীয় বিষয় ভিন্ন অভিভাবক ও শিক্ষকদি সভার কার্য্য-বিবরণ পরীক্ষা ও পরিদর্শনের অধিকার থাকে। অত্যন্ত নিন্দনীয় গর্হিত আচ জন্য বিদ্যালয় হইতে সময় সময় কোন কোন ছাত্র বিতাড়িত হয়। আবার কখনো কোন কোন ক্ষেত্রে ছাত্রদিগের বিদ্যালয় পরিত্যাগের নিদর্শন পত্রে (Transfer Certi তাহাদিগের চরিত্র ও আচরণ সম্বন্ধে অপকৃষ্ট মন্তব্য লিপিবদ্ধ হয়। এরূপ

ছাত্রদিগের ভবিষ্যৎ উন্নতির পক্ষে বিশেষ বিঘ্ন উৎপাদন করে, অথবা স্থল বিশেষে ইহা দ্বারা ছাত্রসমাজে তাহাদের সম্মানের লাঘব হয়। এই সকল ক্ষেত্রে ছাত্রদিগের অভিভাবক-দিগের সম্মতিক্রমে শিক্ষকেরা অভিভাবক-সভার পরামর্শ গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। উপরোক্ত বিবরণ হইতে বেশ বুঝা যাইবে, যে সকল বিষয়ে এরূপ পরামর্শ প্রদানই অভিভাবক-সভার একমাত্র অধিকার হইলেও, এরূপ ক্ষমতার ভিতর দিয়া বিদ্যালয়ের পরিচালন সম্বন্ধেও এই সভার প্রভূত প্রভাব পরোক্ষভাবে খুব সহজেই সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে থাকিবে।

সভ্য নির্ব্বাচন প্রণালী

বিদ্যালয়ের অভিভাবক-সভার সভ্য নির্ব্বাচনের নিয়মাবলী জার্ম্মাণির শিক্ষাদপ্তর কর্ত্তৃক প্রণীত হইয়াছে। সভ্য নির্ব্বাচনের তারিখ শিক্ষা-বিভাগ কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হয়। ভোটদাতাগণের অধিকারের বিষয় পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ভোট দাতাদিগের তালিকা প্রস্তুত করিয়া, সভ্য নির্ব্বাচনের অন্ততঃ চার সপ্তাহ পূর্ব্বে, সাধারণের অবগতি ও পরিদর্শনের জন্য কোন প্রকাশ্য স্থানে একপক্ষের জন্য তালিকাটি লটকাইয়া রাখেন। ভোট দাতারা উহার প্রতিলিপি গ্রহণ করিতে পারেন এবং এবং নির্ব্বাচনের অন্ততঃ এক সপ্তাহ পূর্ব্বে তালিকা সম্বন্ধে নিজ নিজ আপত্তি প্রধান শিক্ষকের নিকট জ্ঞাপন করেন। এইরূপ আপত্তি গ্রাহ্য করিয়া প্রধান শিক্ষক তালিকা সংশোধন না করিলে, নির্ব্বাচন সমিতির নিকট প্রতিবাদ করা চলে। সমিতি কর্ত্তৃক প্রতিবাদ অগ্রাহ্য হইলে, নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে কোন প্রতিকারের সম্ভাবনা থাকে না। তবে নির্ব্বাচন শেষ হইলে, শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট নির্ব্বাচন সমিতির নিষ্পত্তি বিষয়ে পুনর্ব্বিচার প্রার্থনার অবকাশ থাকে।

নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে প্রধান শিক্ষকের আর একটী বিশেষ কর্ত্তব্য থাকে। অন্ততঃ চার সপ্তাহ পূর্ব্বে তাঁহাকে অভিভাবকদিগের সাধারণ সভার একটী অধিবেশনের ব্যবস্থা করিতে হয়। প্রকাশ্যে বিজ্ঞাপন দ্বারা অথবা ছাত্রদিগের সাহায্যে অভিভাবকদিগকে এসম্বন্ধে সংবাদ দেওয়া হয়। সাধারণ সভার এই অধিবেশনে তিনি অভিভাবক সভার নিয়মাবলী, ভাবী নির্ব্বাচনের সভ্য সংখ্যা, নির্ব্বাচনের প্রয়োজন, ভোট দাতাদিগের তালিকা সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপনের শেষ তারিখ প্রভৃতি বিষয় অভিভাবকদিগকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন। অভিভাবকদিগকে নিজ নিজ দলভুক্ত সভ্য-পদ-প্রার্থীদিগের তালিকা প্রস্তুত করিতে অনুরোধ করা এবং সাধারণ সভার দ্বিতীয় অধিবেশনের তারিখ জানাইয়া দেওয়া—এই আধবেশনের অন্যতম কার্য্য। নির্ব্বাচনের অন্ততঃ দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে দ্বিতীয় অধিবেশন আবশ্যক হয়। প্রথম অধিবেশনের কার্য্যাবলীর পুনরালোচনাই এই সভার বিশেষ কার্য্য। নাম উল্লেখ পূর্বক প্রকাশ্য প্রস্তাব ও

উহার সমর্থনের দ্বারা, অথবা ভোট দানের সাহায্যে নির্ব্বাচন সমিতির তিনজন সভ্য নির্ব্বাচন করাও এই অধিবেশনের অপর একটী কর্ত্তব্য।

নির্ব্বাচনের অন্ততঃ দশ দিন পূর্ব্বে সভ্য-পদ-প্রার্থীদিগের তালিকাগুলি নির্ব্বাচন সমিতির নিকট পেশ হওয়া আবশ্যক। নব নির্ব্বাচনে যতগুলি সভ্য নির্ব্বাচিত হইবেন, প্রত্যেক তালিকায় অন্ততঃ ততগুলি নাম থাকা উচিত এবং প্রত্যেক তালিকায় সহরে অন্ততঃ ২০ জন ও পল্লী অঞ্চলে অন্ততঃ ১০ জন অভিভাবকের স্বাক্ষর থাকার প্রয়োজন। এই নিয়মে কোন তালিকা প্রস্তুত না হইলে, নির্ব্বাচন সমিতি এরূপ তালিকা অগ্রাহ্য করিয়া অপর তালিকাগুলি কোন প্রকাশ্য স্থানে লটকাইয়া দিয়া সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কোন তালিকা পরিত্যক্ত হইলে, নির্ব্বাচনের পর এরূপ কার্য্যের বিরুদ্ধে শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদনের অধিকার থাকে। নির্ব্বাচনে এই প্রকাশিত তালিকাগুলির বিশেষ আবশ্যক। প্রকাশ্য স্থানে খুব প্রকাশ্যভাবে ভোট সংগ্রহ হয়। প্রত্যেক ভোটদাতা ভোটের কাগজে কোন একটী তালিকা নির্দ্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিয়া ভোট প্রদান করেন। কাগজে কোনরূপ পরিবর্ত্তন থাকিলে, অথবা একের অধিক তালিকায় ভোট দান করিলে, ভোটের কাগজ অগ্রাহ্য হয়। ভোটসংগ্রহ সমাপ্ত হইলে নির্ব্বাচন সমিতি একটী প্রকাশ্য অধিবেশনে ভোটের কাগজগুলি বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া উপযুক্ত উপায়ে নির্ব্বাচিত সভ্যগণের নাম প্রকাশ করে এবং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের নিকট তাঁহাদের নাম প্রেরিত হয়। তারপর নির্ব্বাচনের এই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ সমিতির প্রত্যেক সভ্যের স্বাক্ষরযুক্ত হইয়া ভোটের কাগজগুলির সহিত শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হয়। নিম্নবিদ্যালয় সম্পর্কে এরূপ বিবরণ কাগজ পত্র জেলার শিক্ষা পরিদর্শন কর্ম্মচারীর নিকট দাখিল করা আবশ্যক হয়।

সভ্য নির্ব্বাচন, সভ্য-পদ-প্রার্থীদিগের তালিকা, ভোট দাতাগণের তালিকা প্রভৃতি অভিভাবক সভা সংগঠনের নানা বিষয় সম্বন্ধে নানাপ্রকার আপত্তি, নির্ব্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হইবার সপ্তাহ কাল মধ্যে, শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের হস্তগত হওয়া আবশ্যক। আপত্তি মাত্রেই নির্ব্বাচন স্থগিত থাকে না। শেষ নিষ্পত্তি শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। তিনি যদি আপত্তির সত্যতা স্বীকার করেন, সঙ্গে সঙ্গে পুনর্নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা হয়; আপত্তি অগ্রাহ্য হইলে, নির্ব্বাচনের ফলাফলের কিছুই পরিবর্ত্তন হয় না। *

শ্রীমণীন্দ্রনাথ

---

* The Times Educational Supplement, February 4. 1922.—Changes in Education.

বর্ত্তমান বাঙ্গলার অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাসের এক অধ্যায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এই সংখ্যার প্রবন্ধে বাঙ্গলার স্বাধীনতাবাদ বা বিপ্লববাদীদের তৎকালীন রাজনৈতিক দর্শন শাস্ত্রের মতবাদের বিষয় উল্লেখ করিতে এবং আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। যখন আমি এদলে ঢুকিয়াছিলাম, তখন ৺দেবব্রত বসুর সহিত আমার বিশেষ ঘনিষ্টতা জন্মায়। তাঁহার সঙ্গে নানাবিধ ঐতিহাসিক, ধর্ম্ম ও দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা হইত। তাঁহার বাড়ী আমাদের একটি প্রধান আড্ডাস্থল ছিল। তাঁহার নিকট প্রথমে আমি শুনিয়াছিলাম ও তৎপরে অন্যান্য মাতব্বরেরা বলিতেন যে, বিপ্লবের প্রণালী ও তৎপরে জাতীয় শাসন-যন্ত্র সংস্থাপনের জন্য একটী গঠনকারী খসড়া (constructive plan) নেতারা অগ্রেই গড়িয়া রাখিয়াছেন। অবশ্য এ খসড়া দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়াছিল। রণনীতির বিষয়ে এই মত শুনিয়াছিলাম যে, আমাদের প্রথমে গুপ্তযুদ্ধ (গরিলা যুদ্ধ) করিতে হইবে ও দেশী সিপাহিদের হাত করিতে হইবে ইত্যাদি। শাসন-প্রণালী বিষয়ে এই মন্তব্য শুনিয়াছিলাম যে, ভারতবর্ষ একটি নিয়ম তন্ত্রানুযায়ী (constitutional) সাম্রাজ্য হইবে। কিন্তু আমাদের দলের অনেকেরই এ বিধান পছন্দ হয় নাই। আমরা বলিতাম যে, বাঙ্গলায় আমরা রাজাকাজা মানি না,—বাঙ্গলা সম্বন্ধে কি বিধান হইয়াছে? ইহার উত্তর পাইতাম যে, বাঙ্গলার জন্য সাধারণ তন্ত্রের ব্যবস্থা হইয়াছে। আমরা বলিতাম যে সমস্ত ভারতের জন্য এ বিধান হইল না কেন? ইহার উত্তর এই পাইতাম যে, দাক্ষিণাত্য, রাজপুতানা প্রভৃতি প্রদেশ ঘোর রাজতন্ত্রবাদী, তবে স্বাধীন ভারতের শাসনপ্রণালী আমেরিকার যুক্ত সাম্রাজ্য ও জার্ম্মাণীর শাসন-প্রণালীর মাঝামাঝি একটি প্রণালী হইবে। একদিন ৺দেবব্রত বসুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, অরবিন্দ ঘোষের কি মত? তিনি বলিলেন যে, "ঘোষ মহাশয় দক্ষিণাপথ হইতে আসিতেছেন—তিনি রাজতন্ত্রবাদী"। আসল কথা, এই বিধানে আমরা কেহ কেহ সন্তুষ্ট হই নাই। ইহাতে ৺দেবব্রত বসু বলিতেন যে আমাদের এ বিষয়ে ভাবিবার বা মাথা ঘামাইবার দরকার নাই; নেতারা (ব্যারিষ্টারের দল) প্রকাণ্ড মস্তিষ্কশালী ব্যক্তি, তাঁহারা এ বিষয় সব ভাবিয়া চিন্তিয়া প্রণালী ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন। এই প্রকারে রাজনীতিক দর্শন শাস্ত্রের দিকটা চাপা পড়িত। তবে যখন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমাধারী ব্যক্তি নূতন সভ্য হইতেন ও জিজ্ঞাসা করিতেন যে, আপনারা ত ভাঙ্গিবার ব্যবস্থা করিতেছেন, কিন্তু গড়িবার কি ব্যবস্থা করিতেছেন? তখন তিনি উপরোক্ত বাঁধা বুলিই জবাব স্বরূপ দিতেন। তবে সকলেই এক অকাট্য জবাব পাইতেন যে, "অগ্রে ইংরাজ তাড়াও"। তখন প্রশ্ন হইতেছে যে, ইংরাজ তাড়াইবে কে? ইহার উত্তরে ন্যাসানালিজমের একঘেয়ে

এই বাঁধাবুলি শুনিতে পাইতাম যে, 'রাজার দল হইতে চাষা পর্য্যন্ত "জাতীয়ভাবে" প্রণোদিত হইয়া একীভূত হইয়া স্বাধীনতা সমরে যোগদান করিবে।' রাজা, জমীদার, ব্যারিষ্টার ও ডাক্তারের দল যেন স্বাধীনতা পুনঃপ্রাপ্তির জন্য বিপ্লবে যোগদান করিবে,—কিন্তু আমরা —বাবুর দল—চাষাভূষাকে কি প্রকারে হাতে পাইব? বিশেষতঃ বাঙ্গলার কৃষকেরা, যাহারা চৌরঙ্গির হোটেলে আসিয়া ইংরেজের তাড়া খাওয়া, অথবা শ্বেতাঙ্গিনী বিবাহ করিয়াও শ্বেতাঙ্গ সমাজ হইতে "নিগার" বলিয়া দূরীভূত হওয়া, অথবা রেজিমেণ্ট ও ম্যাজিষ্ট্রেটের লাথি খাওয়ার আস্বাদন কখনও পায় নাই—যাহাদের ঐরূপ আক্ষেপ বা অভিযোগ কিছুই নাই, তাহারা কি প্রকারে ইংরাজ-বিদ্বেষী হইবে? ইহার উত্তরে শুনিতাম যে, তাহাদিগকে বুঝাইয়া দাও যে জমীদারের দোষ কি, বিদেশী শাসন-কর্ত্তারা তাহাদের সর্ব্বনাশ করিতেছে। ইংরাজ বিদায় হইলেই চাষাদের সুবিধা হইবে ও মঙ্গল হইবে।

এই সমস্ত কথা আমরা তোতাপাখীর মতন কপচাইয়া ও ধ্রুবসত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া সকলকে দলভুক্ত করিবার চেষ্টা করিতাম। জানি না, অবাঙ্গালী নেতারা কি রাজারাজড়া হাতে পাইয়াছিলেন; বাঙ্গলায় কিন্তু অনেকগুলি জমীদার ও আইন ব্যবসায়ীর আমাদের দলভুক্ত হইয়াছিল। আর গণসংঘ—যাহারা দেশের শতকরা ৯৫ জন—তাহার কয়জন হাতে আসিয়াছিল, ইহার উত্তর ইতিহাসই সাক্ষ্য দিতেছে। একবার আমি জেলার কোন এক গ্রামে প্রচার-কার্য্যে গিয়াছিলাম, তথায় এক চাষা আসিয়া বলিল শুনিলাম, কলিকাতা হইতে এক বাবু চাষাদের দুঃখ কষ্টের কথা শুনিবার জন্য আসিয়াছেন। তাহার দুঃখের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে সে চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইয়া নিজ দুঃখ-কাহিনী বর্ণনা করিল। সমস্ত শুনিয়া শেষে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"মিঞা, তুমি পারিতেছ কি, তোমার এত কষ্ট ও অত্যাচার কাহার দ্বারা হইতেছে?" সে উত্তরে বলিল,—"জানি না বাবু? জমীদার!" আমিও তখন ন্যাসানালিসমের বাঁধা বুলি আওড়াইলাম—"দোষ জমীদার বেচারীদের নহে। কসুর সব বিদেশী শাসন কর্ত্তার!".....মিঞা ড্যাব্‌ড্যাব্‌ করিয়া আমার দিকে অবিশ্বাসের চাহনি চাহিল; আর আমার কথার কোনও উত্তর না দিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া চলিয়া গেল। এই সব কাণ্ড দেখিয়া আমার নিজের মনেই ধিক্কার হইল। বুঝিলাম যে, এই সব নিরক্ষর দরিদ্র কৃষক পর্য্যন্ত আমার মতন কলিকাতার বাবুর কথাটা বিশ্বাস করিল না। জীবনে এ ঘটনা কখন ভুলি নাই; তখনই করিয়াছিলাম যে আমরা কতটা ভূয়ার উপর দিয়া যাইতেছি! হায়রে, তখন বুঝিতাম যে আমি দেশের কার্য্যের নামে বনিয়াদি স্বার্থের (বুরজোয়া শ্রেণী স্বার্থ) এজেণ্ট হইয়া ঘুরিতেছি! এইত গেল আমাদের গণশ্রেণীকে হাত করিবার খবর। তবে অনেক লোক বলিতেন যে, অমুক বাবু পাবনা হইতে ৫০,০০০ লোক দিবেন, অমুক

তার নিজে হাতে লইয়াছেন। কেহ কেহ বলিতেন যে, মেদিনীপুর হইতে সাঁওতাল ও ডাকাতের দল জুটাইতে হইবে! যাহা হউক, একদিন দেবব্রতর সঙ্গে তর্ককালে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'বাঙ্গলায় লড়িবে কে?' উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন "বাঙ্গালার ছাত্রের দল লড়িবে!' এ কথাটা আমার প্রথমে বাজে বলিয়া মনে হইয়াছিল, কিন্তু স্বদেশী আন্দালনের সময়ের ইতিহাস দেখিয়া সে ধারণা পরে চলিয়া যায়। এক্ষণে ইহা সার্ব্বজনীন বিশ্বাস—ভারতের স্বাধীনতার জন্য বাঙ্গলার আশার স্থল বাঙ্গালী ছাত্রের দল।

এই প্রকারে বাঙ্গলায় আমাদের বৈপ্লবিক রাজনীতি ও সমাজনীতির দর্শন শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত ফুটে। একটা নূতন কিছু গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। কি প্রকারেই বা গড়িবে? আমাদের রাজনীতিক জ্ঞানের ভাণ্ডার ছিল—যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণের পুস্তকাবলী, আনন্দমঠ ও ম্যাটসিনির আত্মচরিত। আর ভারতীয় অর্থনীতিক জ্ঞান আমরা আহরণ করিতাম—'ডিগবি' ও দাদাভাই নৌরজীর পুস্তক হইতে। যাঁহার বেশী দৌড় হইত, তিনি ইউরোপীয় রাজনীতিক মতবাদ, সোসালিজিম ও রুষীয় বৈপ্লবিকদিগের ইতিহাস পড়িতেন। এই সব বৈজ্ঞানিক মাল মসলা লইয়া ৺সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয় আমাদের লইয়া ক্লাশ করিতেন। তিনি নার্কি বৈপ্লবিক নেতাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই "দেশের কথা" পুস্তক লেখেন। দেউস্কর মহাশয় আমাদের ভারতীয় রাজনীতিক। ইতিহাসের গূঢ় তত্ত্ব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝাইয়া দিতেন। তাঁহার নিকট আমরা অনেক বিষয়ে ঋণী। এই সব চর্চ্চার ফলে খানকতক ইংরাজী ও বাঙ্গলায় রচিত প্যামফ্লেট, কবিতা ইত্যাদি বেনামায় ছাপাইয়া সাধারণকে বিলি করা হইত। তৎপরে স্বদেশী আন্দোলনের সময় আমরা সংখ্যার পর সংখ্যায় "সোনার বাঙ্গলা" নামক একখানি ম্যানিফেষ্টো ইংরাজী ও বাঙ্গলাতে বাহির করিতাম। তখন এই সব ব্যাপারে কি উৎসাহ ও সাহস ছিল। এই সব কাজের উদ্দেশ্য ছিল,—জনসাধারণকে ইংরেজ বিদ্বেষী করা ও তাহাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে চোখ ফুটাইয়া দেওয়া। তৎকালের বিপ্লববাদের দর্শন ছিল,—"জাতীয়তা"। স্বাধীনতা অর্জ্জন দ্বারা এক-জাতীয়ত্ব সৃষ্টি করিতে হইবে, এবং ইহার জন্য স্বদেশ প্রেমের দ্বারা ব্রাহ্মণ শূদ্র, রাজা ও প্রজাকে একসূত্রে গাঁথিতে হইবে। ইহার বেশী তখন কাহারও দার্শনিক দৌড় হয় নাই। তবে একজন অ-হিন্দু ব্যারিষ্টার, যিনি আমাদের দলের বাহিরে ছিলেন, অথচ কিছু খবরও রাখিতেন ও সহানুভূতি দেখাইতেন, তাঁহার সঙ্গে আমার দেখা হইলেই তিনি কেবল সোসালিজিমের কথা পাড়িতেন।

এস্থলে আমি সে সময়ের ঘটনা বর্ণনা করিতেছি, ইহা বাঙ্গলার বিপ্লববাদী গুপ্ত সমিতির জীবনের প্রথম উচ্ছ্বাসের সময়। আমার বোধ হয় ইহাই গুপ্ত সমিতির খুব ভাল সময়ের সময়, যাহা আলিপুরের মোকর্দ্দমার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। অর্থ হিসাবে এ সময়ের অবস্থা ভাল ছিল না, কিন্তু মনের স্বাস্থ্য ও সভ্যশ্রেণী হিসাবে এ সময় খুব উন্নত ছিল। কারণ নানা শ্রেণীর ও প্রকারের শিক্ষিত ব্যক্তি গুপ্ত সমিতির সভ্য হইতেন বা সহানুভূতি দেখাইতেন। আমার

বিশ্বাস, আলিপুরের মোকর্দ্দমার ব্যাপারের পর হইতে গুপ্ত সমিতির কার্য্যের ও সভ্য
শ্রেণীর পরিবর্ত্তন হয়। আমার দেশত্যাগের পর লোক-মুখে ভিতরের ব্যাপার যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে
ইহা অনুমান হয় যে, বৈপ্লবিক পন্থা যতই উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিতে আরম্ভ করিল, জমীদার, উকিল
এবং ব্যারিষ্টারের দল ততই শনৈঃ শনৈঃ গুপ্ত সমিতির সংস্রব ত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল।
হয়ত কেহ কেহ প্রাণের ভয়ে বা বাটীতে ডাকাতির ভয়ে লুকাইয়া মাঝে মাঝে কিছু সাহায্য করিতেন,
কিন্তু মনে মনে প্রায় সকলেরই "ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি"র অবস্থা হইয়াছিল। শেষে জগতব্যাপী
যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইহা, কেবল ছাত্রশ্রেণীর দ্বারাই পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল। তখন টাকার
অভাবে ডাকাইতি কর আর অত্যাচারী পুলিশের উপর প্রতিশোধ লও, ইহাই বৈপ্লবিক কার্য্যের
চূড়ান্ত হইয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে বিদেশ হইতে টাকাও পাঠান হইয়াছিল, অস্ত্র
পাঠান হইয়াছিল, আর তুর্কির সুলতান ইংরাজের বিরুদ্ধে "জেহাদ" ঘোষণাও করিয়াছিল
ও তুর্কির সেখ-উল-ইসলাম ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমানদের একত্রিত হইয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে
যুদ্ধ করিবার জন্য "ফতেয়াও" দিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না! ইহার কারণ সাধারণে
কি বুঝিতে পারিয়াছেন? ১৯১৫-১৬ খৃঃ অব্দের বিপ্লব চেষ্টার অকৃতকার্য্যতার জন্য
আমাদের কাহারও কাহারও চক্ষু খুলিয়াছে। দেশেতে বিপ্লববাদীর দল গণসংঘ হইতে বিচ্ছিন্ন
থাকিয়া কতটা যে শূন্যে ছিল ইহা অনেকেই বুঝিয়াছে। আর রাজারাজড়া জমীদার
ব্যবহারজীবীর দলের স্বাধীনতা সমরের স্পৃহা যে কত বেশী, তাহার বিশেষ নিদর্শন পাওয়া
গিয়াছিল যখন ইঁহারা দেশ হইতে এক কোটি টাকা দেশবাসীর নিকট হইতে লইয়া ইংরাজের
হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন, ও সর্ব্বপ্রকারে গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিয়াছিলেন।

বিপ্লববাদের চেষ্টার পরিণাম দেখিয়া বেশ জ্ঞান হইয়াছে যে, আমরা যে
ও যে শাস্ত্রানুযায়ী সাধন করিতেছিলাম, ফলও তদনুরূপ পাইয়াছি। যেমন
করিব তেমনই ফল পাইব ইহাই পুরাতন সত্য। তবে প্রত্যেক দেশেই রাজনৈতিক
ক্রমঃবিকাশের পর্য্যায় ইহা অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাটী না ঘটিলে পরবর্ত্তী
ঘটনাটি ঘটিতে পারিত না। কিন্তু আজ অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি যে, আমাদের
দর্শন শাস্ত্রে এক ঘোর ভ্রম ছিল এবং এ ভ্রম আজও অতি অল্প সংখ্যক লোক বুঝিয়াছে।
ভারতবর্ষের ন্যায় দেশে রাজা হইতে চাষা পর্য্যন্ত সকলকে স্বদেশ-প্রেমিকতার
আবদ্ধ করিয়া স্বাধীনতা সমর করিব,—যে যেমনটি আছে, সেই অবস্থাই সে থাকিবে,
ইতর বিশেষ হইবে না, অথচ সকলে নিজের নিজের গদীতে থাকিয়া নিজের
ব্যতিক্রম না করিয়া ভ্রাতৃভাবে সর্ব্বশ্রেণী মিলিত হইয়া দেশ স্বাধীন করিবে,
আমাদের দর্শন শাস্ত্রের বিচমোল্লায় গলদ্, এবং ইহা এখনও আছে।

শ্রীভূপেন্দ্র

কাশী হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়

("সরস্বতী"-র সৌজন্যে)

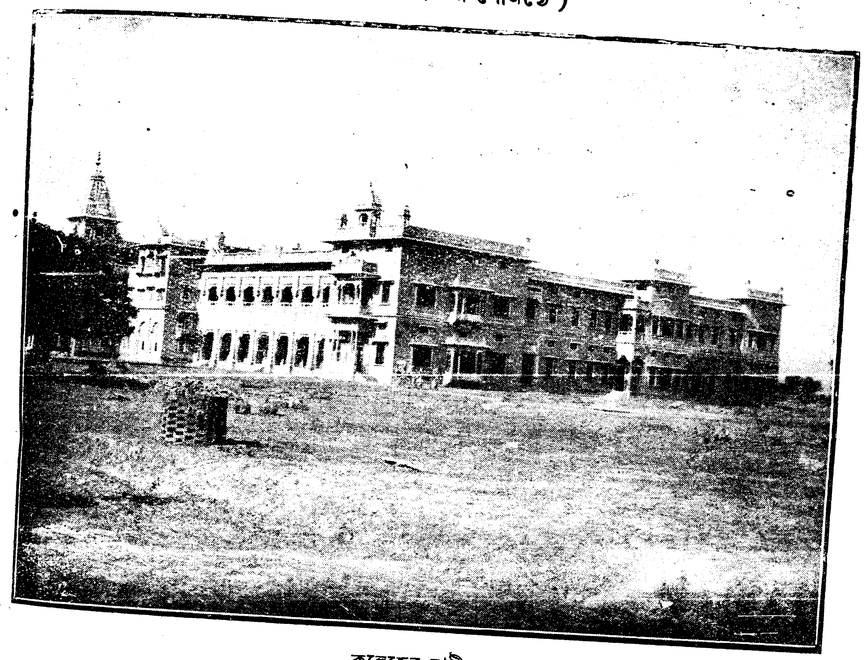

কলেজের বাটী

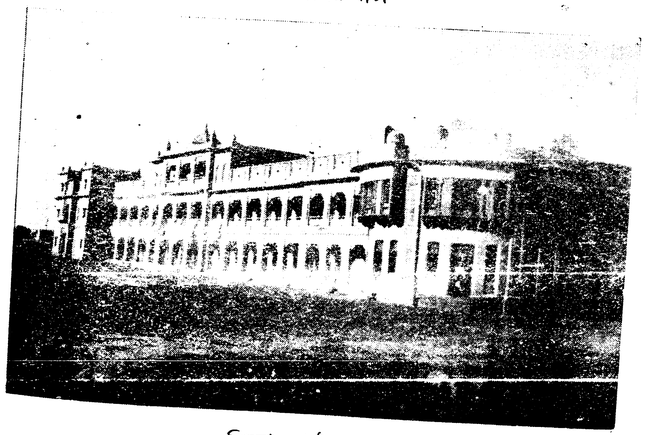

বিরলা হোষ্টেল

পদার্থবিজ্ঞান পরীক্ষাগার

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ড্রয়িং ক্লাস

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের মেকানিকাল লেবরেটারি

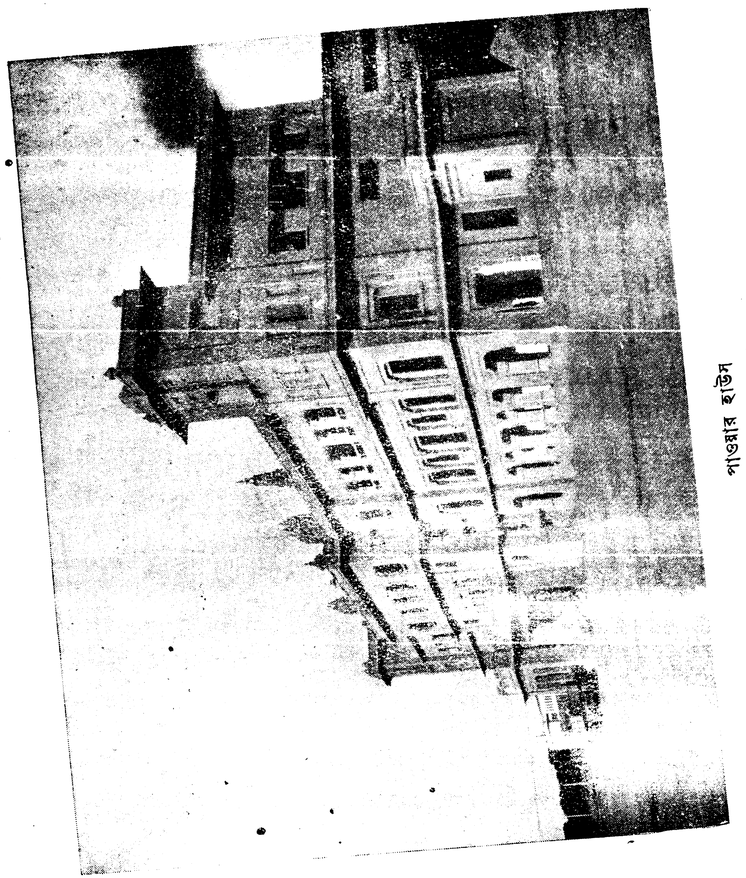

পাওয়ার হাউস

আগমনী

[রচনা——————শ্রীযুক্ত কিরণচাঁদ দরবেশ]

আজি সবুজ শীতল শুভ শরতে,—
ত্রিদিব-নিবাস হ'তে, কনক-কিরণ-রথে,
এসো মা শারদ-রাণী মরতে !
কালো কেশ উড়াইয়া মেঘের শ্যামল ছায়,
অঞ্চল দোলাইয়া চঞ্চল-চল বায় ;
গাঁথিয়া তারার বীথি, সাজায়ে সোণালী সিঁথি,
হাসির সুষমা খেলি তড়িতে ;
এসো মা শারদ-রাণী মরতে !
বরষার ধারা-জলে ধুয়ে বর তনুখানি,
শরতের শুচিতায় সাজিয়াছে ধরা-রাণী ;
কোটা শিউলীর রাশি
বরণ করিছে হাসি,
মালতী বকুল বাস ছড়াতে ;
এসো মা শারদ-রাণী মরতে !

গগনের পথ বাহি' পবনের দোলনায়,
ভুবনের ধূলা-মাখা ভবনে ভবনে আয় ;
দেখ্‌মা খুলিয়া আঁখি, দুখের কি আছে বাকী,
ঘরে ঘরে হাহাকার ভারতে ;
এসো মা শারদ-রাণী মরতে !
ভক্ত দাঁড়ায়ে লয়ে রক্ত-জবার দল্,
শক্তি-বিহীন তবু'—আনন্দ কোলাহল্ ;
রিপু অধীনতা যার, মুক্তি কোথায় তার ?
দৃঢ় এ নিগড়-পরা ধরাতে !
দশ-করে দশদিকে দশ প্রহরণ ধর,
ত্রিদশের চির অরি অসুর বিনাশ কর ;
ছেদিয়া বাঁধন ডুরি, বসো মা আসন জুড়ি,
কোটি কোটি পরাণের পরতে ;
এসো মা শারদ-রাণী মরতে !!

[সুর ও স্বরলিপি——————শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা]

মেঘ——————কাওয়ালী ।

শ্রী ।

II ০	সা	রা	মা	মা	১ পমা	পা	ণা	পা	I ২ মা	পা	-মা	মা	|
	স	বু	জ	শী	ত০	ল	শু	ভ	শ	র	০	তে	
৩	-পমা	-রা	-সা	-া	০ রা	রা	মা	পা	| মা	রা	ণ্‌সা	সা	I
	০০	০	০	০	ত্রি	দি	ব	নি	বা	স	হ০	তে	
২	I মা	রা	মা	পা	৩ পা	ণা	মপা	-ণপা	| ০ মা	পা	মপমা	রা	|
	ক	ন	ক	কি	র	ণ	র০	০খে	এ	সো	মা০০	শা	
		১০											

১ ২´ ৩
| মা রা ণ্‌সা সা I রা মা -পা মা | (-রা -া -া ররা)} |
র দ রা• ণী ম র • তে • • • 'আজি'

৩
| -রা -া -া । II
• • • •

অন্তরা।

০ ১ ২´
II{মা মা পা -া | ণণা ণা পা পা I মা পা পা র্সা |
কা লো কে শ্‌ উ• ড়া ই য়া মে ঘে র শ্যা

৩ ০ ১
| ণা র্সা র্রা -র্সা | র্রা -র্মর্মা র্মা র্পা | র্মা -া র্রা র্রা I
ম ল ছা য় অ ঞ্চ ল দো লা • ই য়া

২´ ৩ ০
II ণা -র্সর্সা ণা -পণা | পা মপা ণর্সা -ণর্সা}|{সা রা মা মা I
চ ঞ্চ ল •• চ ল• বা• •য় গাঁ থি য়া তা

১ ২´ ৩
| পা -া ণণা পা I মা পা পা ণা | পা র্রা র্সণা র্সা |
রা র্‌ বী• থি সা জা য়ে সো ণা লী সিঁ• থি

০ ১ ২´
| র্রা র্মা র্রা র্সা | ণা ণর্সণপা মরা -মপা I রা মা -পণা পা
হা সি র সু ষ্‌ মা••• থে• •লি ত ড়ি •• তে

৩ ০ ১
| -মা -পা -ণা -পা | ণা ণা পা মা | রা মা রমরা
• • • • এ সো মা শা র দ রা••

২´ ৩ ৩
I ণ্‌া সা রা -মপা | (-ণপা -মা -রা া)} | -ণপা -মা -রা
ম র তে •• •• • • • •• • •

১ম সঞ্চারী।

০ ১ ২´
II{রা মা রা মা | সা রা ণ্‌সা সা I ণ্‌া প্‌া ম্‌া প্‌া |
ব র ষা র ধা রা জ• লে ধু য়ে ব র

৩ ০ ১
| ণ্‌া সণ্‌রা রসা রা | রা মা পা পা | মা পা ণা ণপা I
ত নু•• খা• নি শ র তে র শু চি তা •য়

২´ ৩ ০
I র্মা পা ণর্সা র্সণা | মা পা ণপমা ণমপা}|{মা পা মা ণা |
সা জি য়া• ছে• ধ রা রাঁ•• ণী•• ফো টা শি উ

১ ২´ ৩
| মা পা মপণা পা I মা পা ণা ণপমা | মা পা ণর্সা র্সা |
লী র রা•• শি ব র ণ ক•• রি ছে হা• সি

০ ১ ২´
| র্সা র্রা র্সা র্রর্মা | র্রা র্মা র্রা -র্মর্পা I র্মর্রা -র্সা ণা ণপা |
মা ল তী •• ব কু ল •• বা• স্‌ ছ ড়া•

৩
| পা -া -া া} |
তে • • •

আভোগ।

০ ১ ২´
|{র্সা ণা ণা পা | মপা পমপা মপা রা I রা মা পা পা |
গ গ নে র প• থ•• বা• হি প ব নে র

৩ ০ ১´
| ণা পণা ণা -পা | মা পা র্সণা র্রা | র্সা পণা পা পা I
দো ল• না য় ভু ব নে• র ধূ লা• মা খা

| | | |

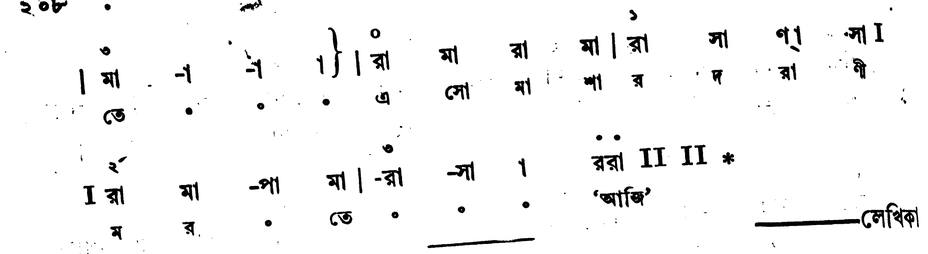

——লেখিকা

কানোজি ব্রাহ্মণ

কান্যকুব্জ বা কানৌজ এক সময়ে আর্য্য সভ্যতার বড় কেন্দ্র ছিল। এখনকার কনৌজ গ্রাম খানিতে সে কালের বড় নগরের অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। এই কানোজে একদিন যে ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহার পাণ্ডিত্যের ও ব্রাহ্মণ্য আচারের খ্যাতি ছিল খুব অধিক। বাঙ্গালা উড়িষা প্রভৃতি অনেক দেশেই সে কালের রাজারা কানোজি সমাজের ব্রাহ্মণ আনিয়া বসাইয়া ছিলেন; বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা কানোজি ব্রাহ্মণ বলিয়াই প্রসিদ্ধ। পশ্চিম অঞ্চলের কানোজি ব্রাহ্মণদের আচার ব্যবহার এখন কেমন, সংক্ষেপে তাহাই লেখা যাইতেছে।

বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদের সঙ্গে পশ্চিম দেশের কানোজিদের অনেক প্রভেদ ঘটিয়াছে; যাঁহারা অযোধ্যায় সরযুপারে আছেন, সেই সরযুপারী বা সরবরিয়াদের সঙ্গেও পশ্চিমের কনৌজিদের সম্পূর্ণ মিল নাই।

উপনয়নের পর ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণকে বঙ্গে ১১ দিন ঘরে বন্ধ থাকিতে হইত; সে প্রথা বিস্মৃত হয় নাই, আর এখনও অনেক স্থানেই উপবীতের পর তিনদিন শূদ্রের মুখ না দেখিয়া ঘরে থাকিতে হয়। পশ্চিমের কানোজিদের মধ্যে যে এ প্রথা ছিল, তাহা ব্রাহ্মণেরাও জানেন না। এদেশে একালে যেমন কালীঘাটে পৈতা দিলে, সেই দিনই অনুষ্ঠান শেষ হয়, পশ্চিমে তাহাই হইয়া থাকে। এদেশে সকল ব্রাহ্মণকেই উপনয়নের পর সন্ধ্যা গায়ত্রী পড়িতে হয়, গায়ত্রী জানেন এমন ব্রাহ্মণ বড় দেখা যায় না। পশ্চিমের কানোজিরা প্রায়ই সন্ধ্যা গায়ত্রীর ধারেনা। ইহাদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার প্রভাব নাই, তবুও বহুকাল হইতে এইটি ঘটিয়াছে।

* **বক্তব্য**।—এ স্বরলিপিতে—'কেন কোমল নিষাদ ব্যবহার করা হইয়াছে'—বলিয়া সঙ্গীতজ্ঞ মধ্যে হয়-ত একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে, কারণ আজকালকার বিখ্যাত 'সঙ্গীত-চন্দ্রিকা' নামক পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগের ৫৬৪ পৃষ্ঠার 'ফুটনোটে' লেখা আছে—"কেহ কেহ মল্লারে কোমল স্বর ব্যবহার করেন, তাহা সম্পূর্ণ ভুল। মেঘ বলিলে মেঘমল্লার এবং দেশ বলিলে দেশমল্লার ইত্যাদি বুঝিতে হইবে।" পুস্তকের এ মন্তব্য ঠিক হইতেও পারে; তবে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী মহাশয় রচিত মল্লার স্বরের 'ঝড় উঠিয়াছে—কেন নিশি পোহায়' গানটি, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় রচিত মেঘমল্লার স্বরের 'ঝড় উঠিয়াছে—কেন ভাসালে তরী' গানটি, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় রচিত মল্লার স্বরের 'রিম্ ঝিম্ ঘন ঘন রে' গানটি, এবং শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কৃত মল্লার স্বরের 'আয়ে বাপতি আয়ে মল্লারো' গানটি দুই নিষাদ সংযোজনেই গীত হইয়া থাকে। বিখ্যাত গায়ক স্বর্গীয় শ্রীযুক্ত বিষ্ণু রাও মহাশয় মেঘ রাগে 'পাওস ঋতু পায়ে বাদর উন উন ঘনঘোর গরজত' গানটি কেবল কোমল নিষাদ সংযোজন করিয়াই গাহিতেন। সুতরাং সকলেই যে ভুল করেন—ইহাও বোধ হয় বলা চলে না।

ব্রাহ্মণের মেয়েদের বিবাহ হয় খুব অল্প বয়সে, কিন্তু মেয়েদের বয়ঃপ্রাপ্তি না হইলে কিছুতেই স্বামীর সঙ্গে দেখা হয়না এবং মেয়েরা দ্বিরাগমন পর্য্যন্ত বাপের বাড়ীতেই থাকে। দ্বিরাগমনকে কানোজিরা "গৌণা" বলে। বিবাহে যৌতুকের টাকা দিতে হয় অনেক। যাহারা যৌতুকের বন্দোবস্ত করিতে পারেনা তাহাদের মেয়েরা ২০।২২ বৎসর পর্য্যন্ত অবিবাহিতা থাকে। দ্বিরাগমনের সময়েও যে যৌতুক দিতে হয়, তাহা দিতে না পারায় অনেক মেয়েকে বহুদিন বাপের বাড়ীতেই থাকিতে হয়।

পাত্র পাত্রী দেখিয়া বিবাহের সম্বন্ধ করা রীতিবিরুদ্ধ। পাড়া পড়শীর মুখে অর্থাৎ পরোক্ষে ছেলে মেয়ের কথা অভিভাবকেরা শুনিয়া থাকেন। অভিভাবকে অভিভাবকে বিবাহের সকল কথা স্থির করেন এবং বিবাহের পরে পাত্র পাত্রীর পিতা মাতারা পাত্রী ও পাত্র দেখিতে পান।

কানোজি ব্রাহ্মণদের মধ্যে এক গোত্রের লোক অপর গোত্রের লোকের হাতে খায় না। বাড়ীর বাহিরে কোথাও খাইতে হইলে যে যাহার নিজের চৌকা গণ্ডী দিয়া আলাদা করিয়া লয়, এবং সেই গণ্ডীর মধ্যে বসিয়া খায়। এক গোত্রের লোকের আঙ্গুলটিও যদি অপর গোত্রের লোকের গণ্ডীতে পড়ে তবে রাঁধা ও খাওয়া নষ্ট হইয়া যায়। রাঁধিবার ও খাইবার এত লেঠা আছে বলিয়া শ্রমজীবী ব্রাহ্মণেরা বাড়ীর বাহিরে কাজ করিতে গেলে দিনের বেলায় ছাতু ও চানা প্রভৃতি খাইয়াই থাকে। কানোজি ব্রাহ্মণদের মধ্যে শ্রমজীবীর সংখ্যা খুব অধিক। ইহারা চাষ করে, গাড়ী চালায়, মোট বয় ও অন্য মজুরী করে।

মেয়েরা ঘরে আটা পেষা, জল তোলা ও ঘরকন্নার অন্য কাজ ত করেই, তাহা ছাড়া উপার্জ্জনের জন্যও অনেক পরিশ্রম করে। বাঁশের সরু সরু কঞ্চি দিয়া অতি সুন্দর সুন্দর পাখা ডালা প্রভৃতি তৈয়ারী করে। সূঁচের কাজও ইহাদের হাতের অতি সূক্ষ্ম আর সুন্দর হয়, ইহাদের হাতের বড়ি, পাঁপর, আচার প্রভৃতি অতি বিখ্যাত।

আহারের সময় এক গোত্রের লোক অপরকে ছোঁয়না তাহা বলিয়াছি। কিন্তু ইহাদের ছুঁৎমার্গ বিচার বাঙ্গলা দেশের মত নয়। ইহারা দুই হাতেই খাইবার সময় রুটি ছিঁড়িতে থাকে, আর সেই হাত গায়ে কাপড়ে লাগাইলে কিছু দোষ হয়না। ইহাদের আহার্য্য সাধারণতঃ রুটি, ডাল ও আচার—নানা রকম তরকারী রাঁধিবার রীতি নাই। কানোজিদের মধ্যে মাছ মাংস খাওয়ার নিষেধ নাই, তবে খায় অতি অল্প লোকেই।

প্রায় সকলেই পরিশ্রম করিয়া খায় বলিয়া ইহাদের স্ত্রীপুরুষেরা সকলেই বলিষ্ঠ, এবং অঙ্গসৌষ্ঠব খুব বেশী দেখা যায়। দরিদ্র বলিয়াই এ সমাজের লোকেরা নানা পরিশ্রমের কাজ করে, মনে হয়। হয়ত এই জন্যই একেবারে লেখাপড়া-না-জানা লোক ইহাদের মধ্যে অত্যধিক। কিন্তু ইহারা বলে যে, ইহাদের সামাজিক প্রথা চিরকালই একভাবে চলিয়াছে, এবং কখনও পরিশ্রমের কাজ দোষাবহ ছিল না।

——— শ্রীরাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী

বন্দী-জীবন*

দ্বিতীয় খণ্ড—চতুর্থ পরিচ্ছেদ

(৪) বিদেশে ভারতীয় বিপ্লববাদিগণ

ভারতের বিপ্লব চেষ্টাকে সার্থক করিতে হইলে বিদেশীয় রাজশক্তির সাহায্য যে নিতান্ত আবশ্যক একথা ভারতের প্রায় সকল বিপ্লববাদীই স্বীকার করিতেন। তাঁহারা জানিতেন যে, পৃথিবীতে ইংরাজের যে সকল শত্রু আছেন সুবিধা এবং সুযোগ পাইলে তাঁহারা ভারতবাসীদের ইংরাজের বিরুদ্ধে সাহায্য করিতে পশ্চাদপদ হইবেন না, এবং যদি ভারতবর্ষে তেমন উপযুক্ত নেতার আবির্ভাব হয় ত' তিনি এমন এক আন্তর্জাতিক সমস্যার সৃষ্টি করিতে পারিবেন যাহার ফলে পৃথিবীর শক্তিশালী সাম্রাজ্যগুলির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ঈর্ষার আগুন ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে, তিনি সেই ঈর্ষার সদ্ব্যবহার করিয়া ভারতবর্ষকে স্বাধীনতার উচ্চ শিখরে লইয়া যাইতে সমর্থ হইবেন।

জগতে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই যেখানে প্রবল রাজশক্তিগুলির পরস্পরের দ্বন্দ্বে ফলে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বলজাতি প্রবলের কবল হইতে মুক্তি পাইয়াছে। এবং পূর্ব্বকাল অপেক্ষা আজকাল একথা বোধ হয় আরও নিঃসংশয়রূপে বলা চলে যে, পৃথিবীতে এমন কোনও দেশ নাই যাহার ভাল মন্দের অথবা উত্থান পতনের সহিত পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কোনও সম্বন্ধ জড়িত স্বার্থ নাই। তাই ভারতের বিপ্লববাদীদের দৃষ্টি প্রথম হইতেই বিদেশের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা ইহাও ভাল করিয়াই জানিতেন যে, ভারতের বিপ্লবদল উপযুক্তরূপে শক্তিশালী হইতে না পারিলে বিদেশীয়দের সাহায্য ভারতবাসী গ্রহণ করিতে পারিবে না, আর সাহায্য গ্রহণ করিবার মত লোক না থাকিলে সাহায্যকারী থাকারও কোন স্বার্থকতা থাকে না। প্রবলের সহিত ও প্রবল দুর্ব্বলকে গ্রাস করিবার চেষ্টা এ দুইয়ের মধ্যেকার প্রভেদ ভারতের বিপ্লববাদীরা বিশেষ বুঝিতেন এবং ঠিক এই কারণেই ঘরকে শক্ত না করিয়া দেশের বিপ্লবদল বহুদিন পর্য্যন্ত বিদেশের দিকে দৃষ্টি দেন নাই।

কিন্তু বিপ্লব প্রচেষ্টার প্রথম হইতেই এইরূপে বিদেশের দিকে লক্ষ্য রাখিলে বিগত মহাযুদ্ধের সময় ভারতের বিপ্লবায়োজন নিতান্ত ব্যর্থ হইতনা। ভারতীয় বিপ্লবদলে তেমন সম্পন্ন প্রতিভাবান উপযুক্ত পুরুষ না থাকায় ঠিক সময় মত তাঁহারা দেশকেও তৈয়ারি করিতে পারেন নাই, অথবা ঠিক কোন সময় হইতে বিদেশীয়দের সহিত সম্বন্ধসূত্র স্থাপন করা তাহাও নির্ণয় করিতে পারেন নাই।

* সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত

বিপ্লববাদী ভারতবাসীদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম শ্যামজি কৃষ্ণ ভর্ম্মা বিদেশে যান ও তাঁহার সংস্পর্শে ও তাঁহার চেষ্টায় বিদেশস্থ অনেক ভারতীয় যুবক বিপ্লবধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে থাকেন। ১৯০৫ সালের ডিসেম্বর মাসে কৃষ্ণ ভর্ম্মা এই কথা প্রচার করেন যে, তিনি ছয় জন উপযুক্ত ভারতবাসীকে ছয় সহস্র মুদ্রা জলপানি দিবেন যাহাতে তাঁহারা ইয়ুরোপ, আমেরিকা ও পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে ঘুরিয়া ভারতবাসীকে স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করিবার উপযুক্ত শিক্ষা অর্জ্জন করিতে পারেন। এই সময়েই এস্, আর, রাণা নামক জনৈক মহারাষ্ট্র ব্যক্তি শ্যামজির নিকট প্যারী নগর হইতে এই মর্ম্মে এক পত্র লেখেন যে, তিনিও তিনটি ভারতবাসীকে ছয় সহস্র মুদ্রা রাহা খরচ বাবদ জলপানি দিবেন, এবং এই জলপানি রাণা প্রতাপ সিং, শিবাজি, ও কোন স্বনামধন্য মুসলমান নরপতির নামে উৎসর্গ করা হইবে। ইঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল এইরূপে উপযুক্ত শিক্ষিত ভারতবাসীকে ভারতের বাহিরে আনাইয়া বিপ্লব কার্য্যের উপযুক্ত কর্ম্মীরূপে গড়িয়া তোলা। কিন্তু ইঁহাদের চেষ্টায় বিশেষ কোন কাজ হইয়াছিল কিনা জানিনা।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ভিনায়ক দামোদর সাভরকর নামক একজন প্রতিভাবান মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ লণ্ডনে ব্যারিষ্টারি পড়িতে যান এবং ইঁহার আগমনে কৃষ্ণ ভর্ম্মার কার্য্য খুব দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকে। কিন্তু ইঁহারাও বিদেশের কোনও রাজশক্তির সহিত কোনও সম্বন্ধসূত্র স্থাপন করিতে পারেন নাই।

ভিয়ানক সাভরকারের লণ্ডনে অবস্থান কালেই বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ হেম দাসও বিলাতে যান, কিন্তু হেম দাস বোমা এবং অন্যান্য প্রকারের বিস্ফোরক পদার্থ প্রস্তুত করা শিক্ষা করিবার জন্যই বিদেশে গিয়াছিলেন; তাই হেম দাসও বিদেশীয় রাজশক্তির সহিত কোনও সম্বন্ধসূত্র স্থাপন করিবার চেষ্টা করেন নাই।

পাঞ্জাবের বিখ্যাত লালা হরদয়ালও এই সময় বিলাতে ছিলেন এবং বিলাতের বিপ্লববাদীদের সংস্পর্শে আসিয়া তিনিও পূর্ণ উদ্যমে বিপ্লব কার্য্যে যোগ দেন, কিন্তু ইনি তখনও কোন রাজশক্তির সাহায্য গ্রহণের দিকে মন দেন নাই।

ইতিমধ্যে স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল বন্যায় বাঙ্গলা দেশ প্লাবিত হয় এবং বাঙ্গলার অশান্ত যুবকদিগের মনপ্রাণ তখন দুঃসাধ্য সাধনে বিপদের মুখে ঝাঁপাইয়া পড়িতে থাকে। এতদিন কেবল ধনীদেরই সন্তানগণ ব্যারিষ্টারী অথবা I. C. S. পড়িবার জন্য অথবা বিলাতের ভোগ-বিলাসের দৃশ্য স্বচক্ষে দেখিয়া আসিবার জন্যই ভারতের বাহিরে যাইতেন, কিন্তু বাঙ্গলার নবজাগরণের ফলে কতক যুবক দেশ সেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া এবং আরও অনেকে যাহারা দেশে শান্ত, সুবোধ, ভাল ছেলে হইবার খ্যাতি লাভ হইতে বঞ্চিত ছিলেন, যাঁহাদের উদ্দাম প্রকৃতির অশান্ত গতি দেশের আবহাওয়ায় প্রকাশের সুযোগ পাইতেছিলনা, এমনও অনেক যুবক আমেরিকায় আসিয়া একত্রিত হন। ইঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত তারকনাথ দাসের নামের সহিত আমরা সুপরিচিত।

শ্যামজি কৃষ্ণ ভর্ম্মা লণ্ডনে কিছুদিন কাজ কর্ম্ম করিয়া শেষে ফ্রান্সে পলাইয়া আসিতে বাধ্য হন। এই সময় প্যারিতে আরও একজন বিপ্লববাদী পারশী রমণী ছিলেন, নাম ম্যাচাম কামা।

লালা হরদয়ালও ইতিমধ্যে একবার দেশে আসিয়া পুনরায় আমেরিকা চলিয়া আসেন। আমেরিকার কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি মাঝে মাঝে কিছুদিন করিয়া হিন্দু দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপকের কার্য্যও করিয়াছিলেন। এই সময় তারকনাথ দাসও আমেরিকার কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতিরেকে আরও কোন একজন বাঙ্গালী এই সময় আমেরিকার কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের কাজ করিতেছিলেন; ইনিই "বাঙ্গলায় বিপ্লববাদে" উল্লিখিত সুরেন্দ্র কর কি না বলিতে পারি না। আমেরিকায় "গদর" দল স্থাপিত হইবার অল্প কিছুদিন পরে লালা হরদয়াল ও ঐ বাঙ্গালী অধ্যাপকটী একবার তদানীন্তন আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সহিত দেখা করেন ও যাহাতে আমেরিকায় ভারতবাসীদিগকে যুদ্ধবিদ্যা শিখিবার ও অন্যান্য কয়েকটি বিষয়ে সুযোগ দেওয়া হয় সেজন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট তাঁহাদের সহিত দেখামাত্রই করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাদের কোন অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। এখানে অকৃতকার্য্য হইয়া তাঁহারা অন্য একটি রাজশক্তির নিকট নিজেদের আবেদন জানান এবং এবার তাঁহাদের আবেদন গ্রাহ্যও হইয়াছিল। এই ঘটনাই বন্দী-জীবন প্রথম খণ্ডের ১৬ পৃঃ উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু আমেরিকার এই বিপ্লবদলের সহিত ভারতের বিপ্লবদলের কোন যোগাযোগ ছিল না।

এই সময়ে অথবা ইহার কিছু পূর্ব্বে বাঙ্গলার কোনও বিপ্লব সমিতির তরফ হইতে একটি যুবককে বার্লিনে পাঠান হয়, কিন্তু ইনি জার্ম্মাণ সরকারের উপর কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই। বিদেশীয় রাজশক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করিতে হইলে যেরূপ উপযোগিতার চরিত্রবলের প্রয়োজন এই যুবকটির মধ্যে সেরূপ কোন উপযোগিতা ছিলনা।

যাহা হউক, যে সময় আমেরিকায় বিপ্লবদল কোন বিদেশীয় রাজশক্তির সহিত সম্বন্ধ স্থাপনে কৃতকার্য্য হইলেন তাহারই অল্প কিছুদিন পরে ইয়ুরোপের মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল এবং লালা হরদয়াল, তারক নাথ প্রভৃতি আমেরিকা ত্যাগ করিয়া ইয়ুরোপে পলাইয়া আসিলে তাঁহাদের সুচারু বিপ্লবায়োজন এইরূপে পণ্ড হইয়া গেল।

লালা প্রথমে কনষ্ট্যাণ্টিনোপলে আসেন ও পরে জেনেভা হইয়া বার্লিনে অন্যান্য ভারতীয় বিপ্লববাদীদের সহিত আসিয়া যোগদান করেন।

ইয়ুরোপীয় যুদ্ধ আরম্ভ হইতেই আলিগড় জেলায় এক বর্দ্ধিষ্ঠ জমিদার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র প্রতাপ সিং সুইটজারল্যাণ্ডে আসেন। লালা জেনেভাতে আসিলে মহেন্দ্র প্রতাপের সহিত তাঁহার দেখা হয়। লালার সহিত তিনি বার্লিনে আসিয়া উপস্থিত হন। এইরূপে মহেন্দ্র প্রতাপ ভারতীয় বিপ্লবদলে আসিয়া সম্মিলিত হন।

লালা হরদয়াল ইত্যাদিরা চলিয়া আসিলে আমরিকার বিপ্লবদলের ভার রামচন্দ্র নামক জনৈক বিপ্লববাদীর উপর দেওয়া হয়।

ইতিপূর্ব্বেই ইয়ুরোপেও ভারতীয় বিপ্লববাদীরা একটি দল গঠন করিয়াছিলেন; এই ইয়ুরোপীয় বিপ্লবদলের নেতাদের মধ্যে ডাঃ চক্রবর্ত্তি ও শ্রীযুক্ত বীরেন চট্টোপাধ্যায় অন্যতম ছিলেন।

এই বীরেন চট্টোপাধ্যায় আমাদের অঘোর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ও 'শামা' পত্রিকার বর্ত্তমান সম্পাদিকা শ্রীমতি মৃণালিনী চট্টোপাধ্যায় এই বীরেন্দ্রেরই ভগিনী হন। বীরেন্দ্র একটি রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মপ্রাণ যুবতীর পাণি গ্রহণ করেন; কিন্তু এই দম্পতিযুগলের পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট ভালবাসা থাকিলেও ইঁহাদের উভয়েরই ধর্ম্মবিশ্বাস এত দৃঢ় যে, তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে এই ধর্ম্মবিশ্বাস লইয়া বহু অশান্তির সৃষ্টি হইত, তাই অবশেষে তাঁহারা পৃথক থাকিতে আরম্ভ করিলেন। এখনও ইঁহারা কেহই পুনরায় বিবাহ করেন নাই, এবং পরস্পর হইতে দূরে দূরে থাকিলেও ইঁহাদের ভালবাসার কোন ব্যতিক্রম হয় নাই। সেই যুবতীটিই এখনও চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সকল ব্যয়ভার বহন করেন।

সে যাহাহউক, ইয়ুরোপীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেলে, আমেরিকার ও ইয়ুরোপের বিভিন্ন বিপ্লবদলের নেতারা জার্ম্মাণীতে একত্রিত হইলেন ও জার্ম্মাণ সরকারের রাজপ্রতিনিধিদের সহিত পরামর্শ করিয়া একযোগে ভারতে বিপ্লব সংঘটন করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

জার্ম্মাণীতে যে সকল ভারতীয় বিপ্লবীরা একত্রিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে হরদয়াল, তারকনাথ, বরকতুল্লা, চন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী, হেরম্বলাল গুপ্ত, বীরেন্দ্র সরকার, মহেন্দ্র প্রতাপ, এবং চম্পকরামন পিল্লাইর নাম আমরা রাওলাট কমিটির সিডিশান রিপোর্টে দেখিতে পাই। চম্পকরামন সুইটজারল্যাণ্ডের বিপ্লবদলের সভাপতি ছিলেন। বীরেন চট্টোপাধ্যায়ের নাম আমরা বহুবার নানা কাগজে দেখিয়াছি।

প্রথমতঃ হরদয়াল প্রমুখ কয়েকজনা জার্ম্মাণীর বাহিরে সম্ভবতঃ ষ্টকহল্ম সহর হইতে একটি পত্রিকা বাহির করেন। এই পত্রিকা বাহির করবার উদ্দেশ্য ছিল, ইয়ুরোপীয় দেশগুলিকে ভারতবাসীর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন করিয়া তোলা এবং ইংরাজ যে কেমন করিয়া এই বিংশ শতাব্দীতে ভারত শাসন করিতেছেন তাহার বিস্তারিত পরিচয় ইয়ুরোপবাসীকে দেওয়া। ইয়ুরোপ ও আমেরিকায় ভারতের কথা প্রচার করার যে কত বড় সার্থকতা আছে আজিও আমাদের দেশ-নায়কেরা তাহা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারেন নাই; কারণ যদি তা' পারিতেন ত' সেদিকে অবশ্যই তাঁহারা মনোযোগ দিতেন।

এইরূপে নিজেদের স্বার্থের দিক দিয়া প্রচার কার্য্যে ইংরাজ যে কত অর্থ ব্যয় করেন ও কত চিন্তাশীল উপযুক্ত ব্যক্তিকে এইসব কার্য্যে নিয়োগ করিয়া সকলরূপে তাঁহাদের কত সহায়তা করেন তাহা আমাদের দেশ-নায়কদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না; তাই আজিও যখন বিদেশে

কয়েকজন ভারতবাসী জগতে ভারতবাসীর স্বাধীন হইবার আকাঙ্ক্ষার কথা প্রচার করিতেছেন তখন আমাদের স্বদেশেই দেশ-নায়কেরা এম্পায়ারের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন।—যাক্ সে সব কথা।

একদিকে যেমন প্রচারের কার্য্য চলিতে লাগিল, অন্যদিকে তেমনি ভারতবাসীকে অস্ত্র শস্ত্র যোগাইবারও আয়োজন আরম্ভ হইয়া গেল; সবই হইল কিন্তু সময়মত কোনটাই হইল না। চীনের শ্যাংহাই সহরে জার্ম্মাণীর যে রাজপ্রতিনিধি ছিলেন (German Consul General) তাঁহার উপরই এই অস্ত্রাদি পাঠাইবার সকল ভার ছিল। ইনিও আবার আমেরিকার ওয়াশিংটন সহরে যে, জার্ম্মাণ রাজ প্রতিনিধি ছিলেন তাঁহার আদেশ মতই সব কাজ করিতেছিলেন। এইরূপে ইয়ুরোপ ও আমেরিকার ভারতীয় সকল বিপ্লব নেতারাই জার্ম্মাণীর রাজপ্রতিনিধি ও যুদ্ধ সচিবদের সহকারিতায় ভারতে বিপ্লবাগ্নি প্রজ্জ্বালিত করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

যে সকল ভারতীয় যুবকেরা জার্ম্মাণীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িতেছিলেন ইংরাজের সহিত যুদ্ধ বাধিতেই জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্ট প্রথমতঃ তাঁহাদিগকে বন্দী করেন ও পরে তাঁহাদের মধ্যে অনেককে ভারতে বিপ্লব প্রচারের কার্য্যে সম্মত করান ও হাতে প্রভূত অর্থদিয়া তাঁহাদিগকে ভারতে পাঠাইয়া দেন; তখনও সম্ভবতঃ ইয়ুরোপীয় বিপ্লববাদীদের সহিত জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্টের কোন যোগা পড়া হয় নাই। এইরূপে যাঁহারা জার্ম্মাণীর প্রদত্ত টাকা লইয়া দেশে আসিয়াছিলেন তাঁহারা প্রায় সকলেই সে টাকা আত্মসাৎ করেন। তাঁহাদের মধ্যে মাত্র দুই একজন দেশের বিপ্লবদলের লোকের সহিত আসিয়া দেখা শুনা করিয়াছিলেন। ইয়ুরোপীয় বিপ্লবদল যদি গোড়া হইতেই তেমন সতর্ক ও সচেতনভাবে কার্য্য করিতেন তাহা হইলে এইসব বিশৃঙ্খলা ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিত না। Rowlatt committeeর রিপোর্ট পড়িয়া ত মনে হয় না যে, ইয়ুরোপে তেমন কোন শক্তিশালী বিপ্লবদল ছিল। আমেরিকার "গদর" দলই ইয়ুরোপে যাইয়া যাহা কিছু করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, German expertদের সহিত পরামর্শে স্থির হয় ব্রহ্মদেশের সীমানার পার্শে ভারতের বিপ্লবপ্রয়াসী লোকদিগকে যুদ্ধ সংক্রান্ত কিছু কিছু শিক্ষা দিয়া ব্রহ্মদেশ আক্রমণ করা হইবে এবং যে কোন উপায়ে হউক বিপ্লব চালাইবার উপযুক্ত অস্ত্র শস্ত্রাদি ভারতবর্ষে বিপ্লববাদীদিগের হাতে পৌঁছাইয়া দিতেই হইবে। গদর দলের কিছু শিখ যেমন ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন তেমনি আবার আরও বহুশিখ তখনও আমেরিকা, চীন ও মলয় উপদ্বীপেও ছিলেন, ইঁহাদিগকে লইয়া ব্রহ্মদেশ আক্রমণের উদ্যোগ চলে। এই সময় ব্যাটেভিয়া, ম্যানিলা, ব্যাঙ্‌কক্, শ্যাঙ্‌হাই প্রভৃতি স্থলে ভারতীয় বিপ্লবীদের আনাগোনা হরদম চলিতে থাকে।

ওদিকে যেমন গদর দলের আয়োজন চলিতে লাগিল, এদিকে তেমনি ভারতের বাহিরের বিপ্লবদলের সহিত মিলিত হইবার সাধ্যমত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যতীন বাবুর দলের শ্রীযুক্ত ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় ব্যাঙ্‌

যান, কিন্তু ইঁহার দ্বারা কার্য্য কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল বলিতে পারি না; যতীন্দ্রনাথ লাহিড়ী নামক একটি যুবকের ইয়ুরোপ হইতে আগমনের পরেই তাঁহার কথামতই যতীন বাবুর দলের নরেন্দ্রনাথ, এপ্রেল মাসে প্রথম ব্যাটেভিয়ায় যান, এবং তখন হইতেই প্রকৃত কার্য্য আরম্ভ হয়। রাসবিহারীও এপ্রেল মাসেই শ্যাঙ্‌হাইতে ছিলেন; ব্যাটেভিয়া এবং ব্যাঙ্‌ককের সকল আয়োজনই শ্যাঙ্‌হাইর জার্ম্মাণ কনসাল জেনারেলের পরামর্শে ও "গদর" দলের সাহায্যে চলিতেছিল। ব্যাটেভিয়ার "গদর" দলের সহিত বাঙ্গলার দলের সংযোগ সাধিত হয়।

১৯১৫ সালের এপ্রেল মাসের ২২ তারিখে ক্যালিফর্ণিয়া স্যান্‌পোড্রো বন্দর হইতে ম্যাভেরিক নামক এক জাহাজ ভারতের উপকূলের দিকে যাত্রা করে। এই জাহাজ সর্ব্বপ্রথম standard oil companyর তেল সরবরাহ করিবার কার্য্যে ব্যবহৃত হইত; পরে স্যানফ্রান্‌সিস্‌কোর এক জার্ম্মাণ কোম্পানি উক্ত জাহাজটি খরিদ করেন। যাত্রা করিবার কালে এই জাহাজে সর্ব্বশুদ্ধ ২৫ জন কর্ম্মচারী ও ৫ জন ভৃত্য নামধারী ব্যক্তি ছিলেন। ইঁহারা নিজেদের পারশ্যদেশীয় বলিয়া পরিচয় দিলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা ভারতবাসীই ছিলেন। স্যানফ্রান্‌সিস্‌কোর জার্ম্মাণ কন্‌সাল ও বিপ্লবদলের রামচন্দ্রের উদ্যোগেই এই জাহাজ পাঠান হয়। কথা থাকে এ্যানি লার্সেন নামক আর একটি ছোট জাহাজ অস্ত্রাদি লইয়া এই ম্যাভেরিকের সহিত পথে মিলিত হইবে এবং লার্সেন হইতে অস্ত্রাদি ম্যাভেরিক তুলিয়া লইবে। কিন্তু এই লার্সেন সময়মত ম্যাভেরিকের সহিত মিলিত হইতে পারে নাই, তাই অগত্যা ম্যাভেরিক কেবলমাত্র কয়েকজন ভারতবাসী ও জার্ম্মাণ expertsদের লইয়া ব্যাটেভিয়া আসিল। ব্যাটেভিয়ার ডাচ্ কর্ত্তৃপক্ষগণ ম্যাভেরিকের খানাতাল্লাসি লইলেন। কিন্তু আপত্তিজনক কিছু না পাওয়ায় ম্যাভেরিককে ছাড়িয়া দিতে হইল। অন্যদিকে Annie Larsen জুন মাসের শেষাশেষি অস্ত্রাদি লইয়া Washingtonএ আসিল, কিন্তু আমেরিকার সরকার সে সকল অস্ত্রাদি বাজেয়াপ্ত করিলেন; ওয়াশিংটনের জার্ম্মাণ কনসাল সেই সকল অস্ত্রাদির দাবী করিলেও আমেরিকান সরকার তাহা গ্রাহ্য করেন নাই। ম্যাভেরিক শেষে ব্যাটেভিয়া হইতে আমেরিকা ফিরিয়া আসে এবং এই জাহাজে করিয়াই নরেন্দ্রনাথ (যাঁহার বর্ত্তমান নাম মানবেন্দ্রনাথ রায়) আমেরিকায় পলাইয়া আসেন।

Henry. S. নামক আরও একখানি জাহাজ অস্ত্রাদি লইয়া ম্যানিলা পর্য্যন্ত আসিয়াছিল, তথায় ডাচ্ কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক সে সব অস্ত্র জাহাজ হইতে নামাইয়া লওয়া হয়। এই জাহাজে বোহেম নামক এক জার্ম্মাণ সেনাপতি ছিলেন, ইঁহারই উপর নাকি ব্রহ্মদেশের সীমানার নিকট ভারতীয় বিপ্লববাদীদিগকে সমর শিক্ষা দেওয়ার ভার ছিল। ইঁনি সিঙ্গাপুরে পড়েন। জাভার জার্ম্মাণ কনসালদের সহিত পরামর্শ করিয়া নরেন্দ্রনাথ ঠিক করিয়াছিলেন, ম্যাভেরিকের সকল অস্ত্রাদি বাঙ্গালায় রায়মঙ্গলের নিকট খালাস করা হইবে। রায়মঙ্গলেও

এই সংক্রান্ত সকল আয়োজন হইয়াছিল, কিন্তু ম্যাভেরিক আসিল না। ১৯১৫ সালের জুলাই মাসে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট সকল কথাই জানিতে পারেন এবং তাহার ফলে ভারতে ধর পাকড় আরম্ভ হইয়া যায়।

ইহার পরেও কিন্তু রাসবিহারী আবার দেশে অস্ত্র পাঠাইবার আয়োজন করেন। এই আয়োজন অনুসারে ১৯১৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতে বিপ্লব আরম্ভ হইবার কথা ছিল। এবারেও তিনটি জাহাজ অস্ত্রাদি লইয়া ভারতের দিকে আসিয়াছিল। এবারকার আয়োজনে এইরূপ ঠিক হয় যে, একটি জাহাজ অস্ত্রাদি লইয়া আণ্ডামানের সকল রাজনৈতিক বন্দীদিগকে মুক্ত করিয়া সোজা ব্রহ্মদেশ আক্রমণ করিবে এবং অন্য জাহাজ দুইটি অস্ত্রাদি লইয়া ভাগুয়ার উপকূলে আসিবে। বাঙ্গলার বিপ্লবদলকে সাহায্য করিবার জন্য ৬৬ হাজার গিল্ডার্স লইয়া একটি চীনা ভারতের দিকে আসিতেছিলেন। ইনিও সিঙ্গাপুরে ধরা পড়িয়া যান। ইঁহার নিকট টাকা ব্যতিরেকে, পেনাঙ্গের একটি বাঙ্গালীর ঠিকানা ও কলিকাতার দুটি ঠিকানা পাওয়া যায়। সিঙ্গাপুরে অবনী মুখার্জ্জি নামক আর একটি বিপ্লবী ধরা পড়িয়া যান। তাঁহার নোট বইতে রাসবিহারীর শ্যাঙ্‌হাইর ঠিকানা, শ্যাঙ্‌হায়ে দুইটি চীনার ঠিকানা, চন্দননগরের মতিলাল রায়ের ঠিকানা, কলিকাতা, ঢাকা, ও কুমিল্লার কয়েকটি ঠিকানা পাওয়া যায়। সায়ামের একটি শিখ ইঞ্জিনিয়ার অমর সিংহের ঠিকানা পাওয়া যায়। শ্যাঙ্‌হাইয়ে খানাতাল্লাসি হয় ও যে দু'টি চীনার ঠিকানা অবনী বাবুর নোট বইতে পাওয়া যায়, তাঁহাদের নিকট বহু রিভলভার ও কয়েক সহস্র গুলি পাওয়া যায়। পূর্ব্বেকার আয়োজনে এই ঠিক ছিল যে, Henry. S. জাহাজ অস্ত্রাদি লইয়া এই সায়ামের ইঞ্জিনিয়ার অমর সিংএর নিকট যাইবে ও সেই অস্ত্রাদির কিয়দংশ এই অমর সিংএর জিম্মায় রাখা হইবে। রাজা কমিটির সিডিশান রিপোর্টে প্রকাশ যে, অমর সিংকে ফাসি দেওয়া হইয়াছে, অথচ অমর সিংএর সহিত আমার আণ্ডামানে দেখা হয়। ইঁহার উপর ফাঁসির হুকুম হইয়াছিল সত্য, কিন্তু আরও অন্যান্য বিপ্লবীদের সহিত ইঁহারও ফাঁসির বদলে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়।

যে কয়টি অস্ত্রপূর্ণ জাহাজ ভারতের দিকে আসিতেছিল, শুনিয়াছি তাহার মধ্যে জাহাজ ডাচ্ সরকার আন্তর্জ্জাতিক যুদ্ধের নিয়মানুযায়ী আটক করিয়া রাখে এবং একটিকে ইংরাজের লড়াইয়ের জাহাজ H. M. S. Cornwall আণ্ডামানের নিকট ডুবাইয়া তৃতীয় জাহাজটির কি হইয়াছে বলিতে পারি না। ইতিমধ্যে যতীন বাবুর দলের একটি যুবক আবার শ্যাঙ্‌হাই আসেন, কিন্তু অতি কষ্টে শ্যাঙ্‌হাই পঁহুছিতেই ধরা পড়িয়া যান।

এইরূপে বিপ্লবায়োজনের তৃতীয় চেষ্টাও ব্যর্থ হইল। ইয়ুরোপীয় মহাযুদ্ধ হইবার বৎসর খানেক পর পর্য্যন্তও ভারতের বাহিরে যাওয়া আসা তেমন শক্ত কথা

কিন্তু যখন ইংরাজ সরকার বিপ্লবায়োজনের সকল সংবাদই পাইয়া গেলেন তখন হইতে ভারতের বাহিরে যাওয়া আসা নিতান্ত কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল এবং এই কারণেই অস্ত্রপূর্ণ জাহাজগুলি ইংরাজের প্রখর দৃষ্টি এড়াইতে সক্ষম হয় নাই। এতদ্ব্যতিরেকে জার্ম্মাণিকেও পশ্চিম সীমান্তের যুদ্ধে ক্রমশঃ এতই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতে হয় যে, এদিকে তাঁহারা তেমনভাবে মনোযোগ দিতে পারেন নাই। ভারতীয় বিপ্লবদলও তাঁহাদের অস্তিত্বের এমন কিছু পরিচয় দিতে পারেন নাই যাহাতে বিদেশীয় রাজশক্তির দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়। যদি যুদ্ধের বহু পূর্ব্ব হইতেই ভারতীয় বিপ্লবদল বিদেশের দিকে তেমনভাবে মনোযোগ দিতে পারিতেন ত' ফল অবশ্যই অন্যরূপ হইত।

যাঁহারা মনে করেন যে, জগতের Imperialistic গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ভারতীয় বিপ্লববাদীদের সাহায্য পাওয়ার আশা নিতান্তই দুরাশা ছিল, তাঁহাদের মনে রাখা উচিত যে, জগতের এই Imperialistic গভর্ণমেণ্টগুলির পরস্পরের শত্রুতার ফলেই চীন এযাবৎ নিতান্ত দুরবস্থায় থাকিলেও একেবারে নিতান্ত অসহায়ভাবে পরাধীনতার নিগড়ে শৃঙ্খলিত হয় নাই; আফগানিস্থান, পারশ্য, তুর্কি এই দেশগুলি এইরূপেই বিভিন্ন রাজশক্তির সহানুভূতি, ভরসা ও সাহায্য পাইয়াই ক্রমশঃই এক একটি শক্তিশালী জাতিরূপে পরিণত হইতে চলিয়াছে; গত বুয়ার যুদ্ধের সময় জার্ম্মাণী বুয়ারদের অস্ত্রশস্ত্র দিয়া কম সাহায্য করে নাই; আর এই সেদিনের যুদ্ধের ফলে তুর্কির দফা ত একেবারে নিকেশই হইয়াছিল, কামালপাশা ত সে সময় একপ্রকার তুর্কি গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া এনাইসদের সন্ধিপত্রকেও নাকচ করিয়া দিল, কিন্তু এরূপ হইতে পারিয়াছিল ফরাসীর সাহায্যে এবং আজিও আবার যাহাতে ফরাসীর হাতেই একান্ত নির্ভর করিতে না হয় সেই জন্যই আমেরিকার সহিত এঙ্গোরার একটা বোঝা পড়ার চেষ্টা চলিতেছে।

আসল কথা, দুনিয়াতে যদি কেহ মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে পারে ত তাহার সাহায্য পাইবার অভাব হয় না; অন্তরের শক্তির অভাবেই যত কিছু লাঞ্ছনা, অন্তরের দীনতাতেই কাঙ্গাল হইতে হয়, "বাহির হইতে দিতেই পারে, কিন্তু নিতে যে হয় নিজের গুণে।" *

ক্রমশঃ

শ্রীশচীন্দ্রনাথ সান্যাল

---

* এই অধ্যায়টি প্রধানতঃ Rowlatt Committee's Sedition Report অবলম্বনেই লিখিত হইয়াছে। নলিনী বাবুর "বিপ্লববাদের" উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারি নাই।

অসিকার মাসামুঁএ ও জাপানী তরবারি

(জাপানীদের গল্প)

জাপানী তরবারি পৃথিবীতে নির্ম্মিত যে কোন তরবারির তুল্য যে তীক্ষ্ণধার, সে কথা সর্ব্বজনবিদিত। অধিকন্তু জাপানীদের মধ্যে এমন রীতি চলিত আছে যে, তাহারা তাহাদের তরবারিকে ধর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ পূজ্য বস্তুর ন্যায় অতি সম্ভ্রমের সহিত শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। পূর্ব্বকালে এই দেশে সামুরাইগণ গৃহে অথবা বাহিরে সর্ব্বদা তাহাদের তরবারিকে সঙ্গে রাখিত। একটি প্রাচীন গাথার মর্ম্ম এই যে,—"তুমি তোমার তরবারিকে কখনও, এক মুহূর্ত্তের জন্যও, ভুলিয়া থাকিও না, তোমার তরবারিই তোমাকে রক্ষা করে জানিও; কখনও পিতামাতাকে এবং ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্যকে ভুলিয়া থাকিও না।"

প্রায়ই বৃদ্ধ সামুরাইগণ গার্হস্থ্য জীবন হইতে অবসর লইবার কালে মুখে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে স্বীয় উত্তরাধিকারীর প্রাপ্য তাহাদের উত্তম সম্পদটিকে তরবারিখানিকে পুত্রের হস্তে ন্যস্ত করিত। আবার, যখন কোন সামুরাই অঙ্গীকার করিত তখন সে ভগবানের নামে শপথ লইত না, তাহার তরবারির নামে শপথ লইত। তরবারি তাহার বিবেকের প্রতীক, সে তাহাকে সত্য ও ন্যায়ের পথে, সামুরাইয়ের হইয়া চলিবার পথে চলিতে বাধ্য করিত। এমনি করিয়াই এই দেশে "বুশিদো" যোদ্ধার যোগ্য পন্থার সৃষ্টি ও উৎকর্ষ হইয়াছিল।

এদেশে এই কারণে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছেদনক্ষম তরবারি সর্ব্বোত্তম বিবেচিত না হইয়া যে তরবারি ন্যায় ও অন্যান্য গুণের উচ্চ আদর্শে সর্ব্বাধিক অগ্রসর তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। যে এই তরবারি নির্ম্মাণ করিবে অনিন্দনীয়-চরিত্র এবং ন্যায় ও ধর্ম্মপ্রাণতার অধিকারী হইতে হইবে। এদেশের তরবারি তাহার স্বীয় নির্ম্মাতার ভাবকে প্রতিফলিত করে; একথা এতই সত্য যে, বিচার করিবার গুণী যাঁহারা, তাঁহারা তরবারির কারুশিল্প বিচার না করিয়াই সহজে নির্ম্মাতাকে চিনিতে পারেন।

ছয়শত বৎসর পূর্ব্বে সাগামী প্রদেশের কামাকুরা গ্রামে গোরো মাসামুঁ একজন অতি বিখ্যাত ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন অসিকার (sword-smith) বাস করিতেন। সকলে তরবারি নির্ম্মাণের প্রাচীন গৌরবের পুনরুদ্ধারক বলিয়া মান্য করিত। তোসিরো য়ুকিমিৎসুত তরবারি নির্ম্মাণে পারদর্শী ছিলেন। মাসামুঁএ বিমাতা পালিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার বিমাতার নিকট তাঁহাকে সকলপ্রকার সহিতে হইত।

মাসামুঁএর বিমাতা সাগামী প্রদেশের মারিকাওয়া উমানোমো নামে এক প্রতিপত্তিশালী রাজকর্ম্মচারীর কন্যা ছিলেন। তাঁহারই সহায়তায় এবং অনুগ্রহে মাসামুঁএর পিতা সেই প্রদেশে অসিকার সমিতির সভাপতি পদে ও তৎসঙ্গে রাজ-কারিকররূপে নিযুক্ত হন। পিতৃশিক্ষার অনুগামী না হইয়া মাসামুঁএর বিমাতা তাঁহার স্বামীর উপরে প্রাধান্য স্থাপন করিয়া নিজের সন্তানকেই সর্ব্বদা আদর যত্ন করিতেন এবং মাসামুঁএর প্রতি অতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতেন। কিন্তু এসকল সত্ত্বেও মাসামুঁএ তাঁহার বিমাতাকে অন্তরের সহিত ভালবাসিতেন ও ভক্তি করিতেন এবং তাঁহার সমস্ত আদেশ আপন মায়ের প্রতি সন্তানের মমতায় সর্ব্বদা পালন করিতেন।

একদিন, শীতকালে, মাসামুঁএর বিমাতা ঠাণ্ডা লাগিয়া পীড়িত হইয়া পড়িলেন এবং উত্তরোত্তর তাঁহার অবস্থা মন্দ হইতে লাগিল, এমন কি অবশেষে ডাক্তার জীবনের আশঙ্কা জানাইলেন। ইহা শুনিয়া মাসামুঁএর মনে অতিশয় দুঃখ হইল, তিনি স্থির করিলেন বিমাতার আরোগ্যের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবেন। মধ্য রাত্রে যখন সকলে নিদ্রা গেল মাসামুঁএ তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র ত্যাগ করিয়া কূপের নিকট আসিয়া কন্‌কনে শীত ও ভীষণ ঠাণ্ডা বাতাস সত্ত্বেও স্নান করিয়া শুদ্ধ অন্তরে পবিত্রভাবে বার বার ভগবানের নিকট তাঁহার বিমাতার শীঘ্র আরোগ্যের জন্য কাতরভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার পিতার একজন শিষ্য কিসের শব্দ হইতেছে ভাবিয়া উন্মুক্ত দরজা দিয়া সেই হৃদয়স্পর্শী দৃশ্য দর্শন করিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার সঙ্গীদের ডাকিয়া সকলকে মাসামুঁএর সেই বিহ্বল প্রাণের একান্ত প্রার্থনার করুণ দৃশ্য দেখাইলেন। এ দৃশ্য দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইলেন। মাসামুঁএর বয়স তখন মাত্র দ্বাদশ বৎসর।

পরদিবস প্রাতে, পূর্ব্বকথিত শিষ্যটি তাঁহার বিমাতার রুগ্ন শয্যার নিকট গিয়া তাঁহাকে পূর্ব্বরাত্রের সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া মাসামুঁএর প্রতি তাঁহার কঠিন অন্তরকে দ্রব করিতে চেষ্টা করিলেন। বিমাতা সেই সকল শ্রবণ করিয়া যেন কতই সন্তুষ্ট হইয়াছেন এইরূপ ভাব দেখাইলেন। পরে শিষ্যটি ঘর হইতে বাহির হইবামাত্রই তিনি মাসামুঁএকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন এবং গত রাত্রে স্নান করিবার সময় তাঁহাকে অভিশাপ দিয়াছেন বলিয়া তাঁহার উপর দোষারোপ করিতে লাগিলেন। এমন কি, ক্রোধে, নিকটে যে একটি কেট্‌লি ছিল, তিনি তাহা উঠাইয়া তাহার কপালে সজোরে আঘাত করিলেন। কপাল কাটিয়া হু-হু করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। মাসামুঁএর পিতার শিষ্যগণ দ্রুত তাঁহার সাহায্যের জন্য ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া অন্য ঘরে লইয়া গেলেন। তাঁহারা সকলে বিমাতার এরূপ পৈশাচিক কার্য্য দেখিয়া অবজ্ঞাসহ ক্রোধে বিক্ষুব্ধ হইয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, "মাসামুঁএ, তুমি তোমার পিতাকে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া বল, আমরা সকলে তোমার হইয়া অন্যকার ঘটনার বিরুদ্ধে তাঁহার নিকট সাক্ষ্য দিব।" কিন্তু উত্তরে মাসামুঁএ বলিলেন, "না ভাই,

তোমরা স্থির হও, আমার জন্য আমি পিতা ও মাতার মধ্যে কলহের কারণ আনিতে ইচ্ছা করি না।”

ইতিমধ্যে তাঁহার পিতা আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কপালে ক্ষত দেখিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মাসামুঁএ বলিলেন, দেরাজ হইতে একটি জিনিস তাঁহার কপালে পড়িয়া যাওয়ায় কাটিয়া গিয়াছে। ইহা শ্রবণ করিয়া অন্যান্য ছাত্রেরা, যাঁহারা সমস্ত ব্যাপার অবগত ছিলেন, সহানুভূতিতে কাঁদিয়া ফেলিলেন।

কিয়ৎদিবসের মধ্যেই তাঁহার বিমাতা সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিলেন কিন্তু তাঁহার ঘৃণা দিন দিন মাসামুঁয়ের উপর বাড়িতে লাগিল। মাসামুঁএকে তাঁহার স্বামী উত্তরাধিকারীকে সর্ব্বস্ব দিবেন এই ভাবিয়া তিনি তাঁহার পুত্র সিনতারোকে তাহার পিতার সমস্ত অর্থের ও ব্যবসার উত্তরাধিকারী করিবার মানসে অতি গোপনে মাসামুঁএকে বিষপানে হত্যা করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। মাসামুঁএ তাঁহার বিমাতার এই ভীষণ অভিসন্ধি জানিতে পারিয়া কয়েক দিন যাবৎ আহার গ্রহণে বিরত হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

অবশেষে নিরুপায় হইয়া তিনি তাঁহার পিতৃ-সহকারী অসিকার সিনতো কুনিমিৎসুর নিকট গমন করিয়া সমস্ত ঘটনা ও তাঁহার বিমাতার ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে সমস্ত বিবৃত করিয়া তাঁহার নিকট হইতে তিনি কি করিবেন জিজ্ঞাসা করিলেন।

বিস্মিত কুনিমিৎসু মাসামুঁএর উপর দয়াপরবশ হইয়া তাঁহার স্ত্রীকে তাঁহার পিতা (মাসামুঁএর পিতা) য়ুকিমিৎসুকে ডাকিয়া আনিতে পাঠাইলেন। তাঁহার পিতা উপস্থিত হইলে কুনিমিৎসু তাঁহার নিকট মাসামুঁএর আগমন সংক্রান্ত সমস্ত ঘটনা করিয়া বলিলেন, “তুমি জাপানের মধ্যে একজন সুনিপুণ প্রসিদ্ধ অসি-কার। তোমার এই পদগৌরব অন্যান্য অসিকারের ঈর্ষার বিষয়। তোমার বংশপরম্পরা সগৌরবে রক্ষা করিবে—বিশেষতঃ তুমি রাজসভার একজন কর্ম্মকার, এবং তোমার রাজসভার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও জায়গীরদারদের নিকট সম্মানের বিষয়। মনে কর পুত্রের যদি অপঘাতে মৃত্যু হয় তাহা হইলে ইহা নিশ্চয় যে, তোমার নির্ম্মিত অসি হইয়া যাইবে। তুমি ত জান জাপানীদের নিকট ন্যায়পরায়ণতা ও লোকহিতৈষণা আদরের ও শ্লাঘার বিষয়। যদি এইপ্রকার ঘটনা ঘটে, লোকে বলিতে পারে যে নির্ম্মিত অসি তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার বটে, কিন্তু উচ্চ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে বহনের যেহেতু তুমি এরূপ নৃশংস, নিন্দনীয় চরিত্রের জন্য অপরাধী। এ অপরাধের কেবল তোমার অপমান হইবে তাহা নহে, পরন্তু যাঁহার নিকট আমরা অসি-নির্ম্মাণ করিয়াছি, আমাদের সেই গুরুর পর্য্যন্ত অপমান হইবে। অতএব তুমি কিপ্রকারে

বিপদকে পরিহার করিয়া চলিতে চাহিতেছ?” এইপ্রকার বাক্যের দ্বারা কুনিমিৎসু য়ুকিমিৎসুকে তাঁহার পত্নীকে ত্যাগ করিবার পরামর্শ দিলেন।

মাসামুঁএর পিতা য়ুকিমিৎসু তাঁহার স্ত্রীর এবম্প্রকার পৈশাচিক চরিত্রের বিষয় অবগত ছিলেন, এবং মাসামুঁএকে তিনি অতিশয় স্নেহ করিতেন—কেননা তিনি তাঁহার বিমাতাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন ও আন্তরিক ভালবাসিতেন। কিন্তু তাঁহাকে (য়ুকিমিৎসুকে) শ্বশুরের সহায়তার উপর নির্ভর করিতে হইত, সেই কারণে তিনি অশ্রুপূর্ণনেত্রে তাঁহার বন্ধুকে তাঁহার সমস্ত অবস্থা বুঝাইয়া কহিলেন, “বন্ধু, আমি কি করিব বুঝিতে পারিতেছিনা।” একথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার বন্ধুও অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না, তিনি তাঁহার সঙ্কট অবস্থা বুঝিতে পারিলেন।

ইতিমধ্যে কুনিমিৎসুর স্ত্রী য়ুকিমিৎসুকে ডাকিয়া আনিবার কালে মারিফাওয়া উমানোমো তাঁহার কন্যার ব্যবহার সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হইয়া যেখানে তাঁহারা কথোপকথন করিতেছিলেন, সেখানে আসিয়া দরজার পাশ হইতে সমস্ত শ্রবণ করিলেন ও তাঁহার কন্যার এপ্রকার বীভৎস কার্য্যাবলীর কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধে উন্মত্তবৎ হইয়া তৎক্ষণাৎ দরজা ঠেলিয়া কক্ষে ঝড়ের বেগে প্রবেশ করিয়া তাঁহার জামাতাকে বলিলেন, “বৎস, অদ্য আমি স্বহস্তে আমার কন্যাকে হত্যা করিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিব।” এই কথা বলিয়াই তিনি বেগে কক্ষত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া মাসামুঁএ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আপনাকে সামলাইয়া লইয়া দ্রুত বাড়িতে উপস্থিত হইলেন এবং বিমাতাকে হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন, “মা, আপনি এই মুহূর্ত্তেই এই স্থান ত্যাগ করুন।” তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতেই ক্রুদ্ধ মারিফাওয়া উমানোমো উন্মুক্ত তরবারি লইয়া তাঁহার কন্যাকে বীভৎস চরিত্রের জন্য গালি দিতে দিতে ছেদন করিতে উদ্যত হইলেন। বিমাতার বিপদ দর্শন করিয়া মাসামুঁএ তৎক্ষণাৎ উত্তোলিত তরবারি ও বিমাতার মধ্যবর্ত্তী হইয়া নিজের পৃষ্ঠার আগাইয়া দিলেন। ক্রুদ্ধ উমানোমো গৃহের অল্পালোকে তাঁহাকে স্বীয় কন্যা জ্ঞানে তৎক্ষণাৎ তীক্ষ্ণধার তরবারি দ্বারা তাঁহার পৃষ্ঠে আঘাত করিলেন এবং পরক্ষণেই মাসামুঁএকে চিনিতে পারিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন।

ইতিমধ্যে য়ুকিমিৎসু ও কুনিমিৎসু উভয়েই এই ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং মাসামুঁএর এরূপ সাংঘাতিক পরিণাম দর্শন করিয়া সকলে মিলিত হইয়া গভীর আক্ষেপের সহিত আহত মাসামুঁএকে শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। এই হৃদয়বিদারক করুণ দৃশ্য দেখিয়া নিষ্ঠুর বিমাতৃহৃদয় পর্য্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়িল—তিনি প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ পিতৃপরিত্যক্ত তীক্ষ্ণ তরবারি দ্বারা নিজের জীবন নাশ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া উহা গ্রহণ করিতে যাইলে কুনিমিৎসু সেই সাংঘাতিক অসি ধরিয়া ফেলিলেন। আন্তরিক দুঃখে ও অনুতাপে অভিভূত হইয়া মাসামুঁএর বিমাতা দিন দিন পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিলেন। তিনি আজকাল যাহা কিছু করেন, সমস্তই কিসে

মাসামুঁএর মঙ্গল হইবে এই চিন্তায় করেন। ভগবানের কৃপায় ও বিমাতার আন্তরিক যত্নে এবং সুচিকিৎসার ফলে তিন মাসের মধ্যেই মাসামুঁএ আরোগ্য লাভ করিলেন। এই দুর্ঘটনার পর হইতেই তাঁহার বিমাতার মনে এক অপরূপ পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হইল। তিনি ইদানীং মাসামুঁএকে নিজের সন্তান অপেক্ষা স্নেহ যত্ন করিতে লাগিলেন। মাসামুঁএর চরিত্র মাতৃভক্ত সন্তানের আদর্শরূপে দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

গুণী শিল্পীর উপযুক্ত পুত্র মাসামুঁএ অসি-নির্ম্মাণ বিষয়ে সহজাত নৈপুণ্যে অধিকার লাভ করিয়া জন্মলাভ করিয়াছিলেন। তরবারি তৈয়ার করিতে হইলে, তাহাতে পান দেওয়া একটি অতি দুরূহ কার্য্য এবং অসি নির্ম্মাণ শিল্পে তাহাই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সে মাসামুঁএ তাঁহার পিতার নিকট হইতে এই গুহ্য বিষয়ে দীক্ষালাভ করিয়াছিলেন এবং অল্পকালের মধ্যেই সুন্দর অসি-নির্ম্মাণ কার্য্যে তিনি বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। তাঁহার নাম যেমন আদর্শ-সন্তান বলিয়া খ্যাতি লাভ করিল, তেমনি তাঁহার অসি-নির্ম্মাণ কার্য্যের প্রশংসা চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল।

পিতামাতা গতাসু হইলে মাসামুঁএ তাঁহার পৈতৃক কার্য্যভার ও বৈমাত্র ভাইদের ভরণপোষণ ও যত্নের ভার গ্রহণ করেন। বিশ বৎসর বয়সে তাঁহাকে সম্রাটের একখানি তরবারি তৈয়ার করিবার ভার দিয়া সম্মানিত করা হয়। এই সম্মানে তাঁহার যশ দেশাদেশান্তরে বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং দেশের মধ্যে তিনি প্রধান অসিকার বলিয়া পরিগণিত হন। তাঁহার অনেকগুলি শিষ্য তাহারাও অসি নির্ম্মাণে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করে। ক্রমে অধিক বয়সপ্রাপ্ত লব্ধপ্রতিষ্ঠ মাসামুঁএ একজন উপযুক্ত উত্তরাধিকারীর জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন—কারণ তাঁহার একটীমাত্র কন্যা ছিল, কোন পুত্র সন্তান হয় নাই। সুতরাং মাসামুঁএ স্থির করিলেন, তাঁহার বহু শিষ্যের মধ্যে যে তিনটি প্রধান দক্ষ শিষ্য আছে তাহাদের মধ্যে একজনকে তাঁহার উত্তরাধিকারী করিবেন এবং যে মনোনীত হইবে তাহাকেই তাঁহার জামাতারূপে বরণ করিবেন।

মাসামুঁএর প্রধান শিষ্য তিন জনের মধ্যে প্রথম শিষ্যের নাম দানকুরো মাসাষিকা, দ্বিতীয় কিজামেঁ। মুরামাসা এবং তৃতীয়টি হিকোশিরো সদামুঁনে। এক দিবস মাসামুঁএ তাহাদিগকে তাঁহার সম্মুখে ডাকিয়া তাহাদের প্রত্যেককে শরীর ও মন পবিত্র করতঃ এক মাসের মধ্যে এক করিয়া অসি নির্ম্মাণের উপযুক্ত লৌহ দিয়া অসি নির্ম্মাণ করিতে বলিলেন।

প্রথম শিষ্য দানকুরো প্রভুর মনোগত উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া তাহার সহকর্ম্মীদের পরাজয় করিবার নিমিত্ত অতি উত্তম অসি নির্ম্মাণ করিতে কৃতনিশ্চয় হইল। সে মনে মনে স্থির করিল, গুরুকন্যাকে লাভ করিতে হইলে, তরবারি নির্ম্মাণের জন্য বিশেষ মনোনিবেশ না করিয়া গুরু কন্যারই মনাকর্ষণ করিতে যত্নবান হওয়া শ্রেয়ঃ। কারণ তাহার দ্বিতীয় বন্ধু মুরামাসার অসি নির্ম্মাণ দক্ষতার প্রতিযোগিতায় জয়লাভ সম্বন্ধে তাহার ভয় ছিল। তৃতীয় বন্ধু সাদামুঁনে

সে সম্পূর্ণই অগ্রাহ্য করিত। তাহার মনের মধ্যে এই প্রকার অপবিত্র ভাব লইয়া সে প্রভু-কন্যার চিত্ত আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইল না। অবশেষে তাহার এক সহপাঠী মুনেসাদার নিকট তাহার অসদভিপ্রায় ধরা পড়িল এবং সে তাহাকে উপদেশ দিয়া সতর্ক করিয়া দিল।

দ্বিতীয় শিষ্য মুরামাসাও গুরুর গুপ্ত অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহার কন্যা লাভের আশায় জয়ী হইবার নিমিত্ত পরম আগ্রহের সহিত কার্য্যে নিযুক্ত হইল।

কিন্তু তৃতীয় শিষ্য সাদামুঁনে গুরুর অভিপ্রায় বুঝিতে পারে নাই—এ বিষয়ে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞান ছিল। সুতরাং সে তাহার মন প্রাণ ও দেহকে পবিত্র রাখিয়া যথাসাধ্য একটি অতি সুন্দর অসি নির্ম্মাণ করিতে যত্নবান হইল।

তিনজনেই নির্দ্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্ব্বে তাহাদের অসি নির্ম্মাণ শেষ করিয়া গুরুকে পরীক্ষা করিতে অর্পণ করিল। মাসামুঁএ শুদ্ধস্নাত হইয়া কাষায় বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক পবিত্রভাব অবলম্বন করতঃ তরবারিগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন। প্রথম শিষ্য মাসাষিকা, দ্বিতীয় মুরামাসা ও অবশেষে তৃতীয় সাদামুঁনের অসি পরীক্ষা করিলেন। পরে প্রথম শিষ্য মাসাষিকাকে ডাকিয়া তাহার সম্মুখে তরবারিখানি রাখিয়া বলিলেন, "তুমি এই তরবারি তৈয়ার করিবার সময় প্রণয় চিন্তায় মুগ্ধ ছিলে, কেননা তোমার এরূপ অসম্বদ্ধ হাতুড়ীর ঘা-ই তাহার সাক্ষ্য, এ প্রকার শিক্ষা আমার শিক্ষা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তুমি কি ভাবিতে সাহস কর যে, তোমার এই তরবারি মনুষ্যকে রক্ষা করিবে—তাহার আত্মাকে রক্ষার কথার উল্লেখই নিষ্প্রয়োজন। যদি উত্তম অসি নির্ম্মাণ করিতে চাও তবে নিজেকে অগ্রে সংশোধন কর। তোমার এ তরবারি সম্পূর্ণ অযোগ্য।" মাসামুঁএ এরূপ কঠোর ও তীব্র তিরস্কারে তাঁহার প্রথম শিষ্যকে বিদায় করিলেন। পরে দ্বিতীয় শিষ্য মুরামাসাকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমি তোমার অসিখানি হইতে কর্ম্মদক্ষতার পরিচয় পাইয়া প্রশংসা করিতেছি—কিন্তু অন্যায় উচ্চাভিলাষের বশবর্ত্তী হইয়া তুমি ইহা করিয়াছ জানিতে পারিয়া দুঃখিত হইতেছি। সর্ব্বদা মনে রাখিও আমরা অসি নির্ম্মাণ করি মনুষ্যকে রক্ষা করিবার জন্য, কখনও অপরকে আঘাত করিবার জন্য বা হত্যা করিবার জন্য নহে। ইহা সত্য যে তোমার অসি আমার অপেক্ষা তীক্ষ্ণধার হইয়াছে, কিন্তু আমি আশ্চর্য্য হইতেছি ইহাকে কেন এত রক্তপিপাসু দেখাইতেছে! সম্ভবতঃ নির্ম্মাণকালে তুমি কোন অসৎভাবকে মনে আশ্রয় দিয়াছিলে। যদি কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এ অসি ধারণ করেন, তবে ইহা তাঁহারই ধ্বংসের কারণ হইবে। তোমার মনকে সংশোধিত করিয়া উন্নতি সাধন করিবার নিমিত্ত ভগবানের নিকট একান্ত হইয়া প্রার্থনা করিবে। বুঝিতে পারিলে কি? আজ হইতে তুমি তিন বৎসর আমার কার্য্যালয়ে প্রবেশলাভ করিবার অধিকার পাইবে না, এই সময় মধ্যে তোমার মনকে পরিবর্ত্তিত করিবার সুযোগ হারাইও না।"

অবশেষে তাঁহার তৃতীয় শিষ্য সাদামুঁনেকে ডাকিয়া বলিলেন, "একমাত্র তুমিই আমার উপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছ এবং কেবল তুমিই অসিখানি নির্ম্মাণকালে আমার উপদেশকে প্রতি ঘাতে মানিয়া চলিয়াছ, কোন দোষে ইহা দুষ্ট হইতে পারে নাই। সুতরাং আমি তোমাকেই উত্তরাধিকারীরূপে গ্রহণ করিলাম এবং তুমিই আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে। অতঃপর তোমাকে আমি পান দিবার গূঢ় তত্ত্ব শিখাইয়া দিব।"

গুরুর এবম্বিধ সদয় প্রস্তাবে সাদামুঁনে তাহার উচ্চ সহপাঠীদের উপর এরূপ অধিকার চাহেন বলিয়া অবনত মস্তকে মাসামুঁকে নিবেদন করিল। কিন্তু মাসামুঁএ তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, তাহার শ্রেষ্ঠ সহপাঠীদিগের জন্য বৃথা চিন্তা করিবার আবশ্যক নাই, কারণ তাহারা দু'জনই তাহার অপেক্ষা কার্য্যে নিকৃষ্ট, এবং তাহাকে (সোদামুঁএকে) তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়া বলিলেন, "বিবাহের পূর্ব্বে আমি তোমাকে পান দিবার গুপ্ত প্রক্রিয়া দেখাইয়া দিব।"

বাহিরে দাঁড়াইয়া এতক্ষণ মাসাষিফা ও মুরামাসা দরজার নিকট হইতে এসকল কথা শ্রবণ করিয়া অন্তরে অন্তরে হিংসায় জ্বলিতে লাগিল। মাসাষিফা প্রতিজ্ঞা করিল যে, সে এই পান সংক্রান্ত গুপ্ত রহস্য চুরি করিয়া শিখিয়া লইবে এবং গুরু কর্ত্তৃক বিতাড়িত তাহার সহচর মুরামাসাকে শিখাইয়া দিবে। এই অভিসন্ধি লইয়া সে অপেক্ষা করিতে লাগিল কবে সাদামুঁনে তাহাদের গুরুর নিকট এ বিষয়ে দীক্ষা লাভ করিবে।

অবশেষে সেই ঈপ্সিত দিন আসিলে দেখা গেল, মাসামুঁএ ও সাদামুঁনে ধর্ম্মানুষ্ঠান যোগে উপযুক্ত বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক তাঁহাদের কার্য্যালয়ে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। মাসাষিফা দরজার নিকট আসিয়া অতি মনোযোগের সহিত তাঁহাদের সমস্ত কথাবার্ত্তা শ্রবণ করিতে লাগিল।

সাদামুঁনে তাহার গুরু মাসামুঁএকে জিজ্ঞাসা করিল, "গুরুদেব এই জল কি এখনও পান দিবার উপযুক্ত হয় নাই?"

"এখনও ইহা অধিক ঠাণ্ডা, আরও গরম করিতে হইবে। হাঁ, এইবার তুমি ইহার মধ্যে তোমার হস্ত প্রবেশ করাইয়া দেখ, কারণ ইহাই ঠিক পান দিবার পক্ষে উপযুক্ত হইয়াছে।"

"বুঝিয়াছি গুরুদেব।"

মাসামুঁএ সাদামুঁনেকে কহিলেন, "এই পরিমাণ তাপই পান দিবার গুহ্য রহস্য এ বিষয়ে কেবল আমার উত্তরাধিকারীর শিক্ষা লাভের অধিকার জন্মিবে।"

সাদামুঁনে গুরুদেবের নিকট হইতে এই অপার করুণা লাভ করিয়া অন্তরের ধন্যবাদ কহিল, "আপনার কৃপায় আমি আজ ধন্য।" এই কথা শেষ হইতে না হইতেই মাসাষিফা পাশ হইতে বেগে বলপূর্ব্বক রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত করিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল এবং জলের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "আমি এখন পান দিবার রহস্য জানিয়া লইয়াছি।"

সে গৃহ হইতে এইকথা বলিয়াই নিষ্ক্রান্ত হইতে চেষ্টা করিলে ক্রুদ্ধ মাসামুঁএ তৎক্ষণাৎ স্বীয় শাণিত তরবারি উন্মোচন করিয়া তাহার দক্ষিণ বাহু ছেদন করিয়া দিলেন; শিষ্যটি তখনই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল, গুরুদেব সেদিকে একবার মাত্র দৃকপাত না করিয়া দ্রুত কক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

সাদামুঁনে তাহার জ্যেষ্ঠ সহচরের এরূপ অবস্থা দেখিয়া অন্তরে অতিশয় আঘাত পাইল এবং তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত বন্ধুর শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল।

মাসাষিফার জ্ঞান সঞ্চার হইলে, সে অতিশয় দুঃখ ও অনুতাপে অভিভূত হইয়া অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বলিতে লাগিল, "আমি বাল্যকাল হইতে আমার গুরুর কৃপা ও ভালবাসা পাইয়া আসিয়াছি—সে ভালবাসা সমুদ্র অপেক্ষা গভীর, পর্ব্বত অপেক্ষায় মহীয়ান। তত্রাচ, হায় ধিক আমাকে, আমি চুরি করিয়া পান দিবার গুপ্ত রহস্য শিখিয়া লইতে গেলাম! তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রর্থনা করিবারও আমি যোগ্য নহি। গুরুর নিকট হইতে এখন আমি উপযুক্ত দণ্ডই প্রার্থনা করি। বাস্তবিক তাঁহার হাতে মৃত্যুই এখন আমার পরম বাঞ্ছনীয়।"

মাসাষিফার এইরূপ আন্তরিক অনুতাপে বিচলিত হইয়া সাদামুঁনে ও অন্যান্য শিষ্যগণ মাসাষিফার জন্য মাসামুঁএর নিকট গিয়া তাহার অনুতাপের কথা নিবেদন করিল; ফলে মাসামুঁএ তাহাকে ক্ষমা করিলেন। সর্ব্ব অবস্থাতেই মাসামুঁএ সুবিবেচনা করিতে পারিতেন।

তাঁহার মনোনীত ভাবী উত্তরাধিকারী সাদামুঁনে অতি সুবিবেচক ও দয়ার্দ্র হৃদয় ছিল। একদিন সাদামুঁনে তাহার গুরু, এবং এখন সম্পর্কে শ্বশুর, মাসামুঁএকে বলিল, "আমার জীবনের আশারও অতীত যে, আমি তরবারি পান দিবার গুপ্ত রহস্যে দীক্ষিত হইব এবং বংশের উত্তরাধিকারী হইতে পারিব। এখন আমার একান্ত প্রার্থনা, আপনি দয়া করিয়া আপনার জ্যেষ্ঠ শিষ্য মাসাষিফাকে আপনার নামের অধিকার অর্পণ করুন।" জামাতার এইরূপ সহৃদয়তায় আকৃষ্ট হইয়া মাসামুঁএ তাহার অনুরোধ রক্ষা করিলেন এবং মাসাষিফাকে তাঁহার নামের অধিকারী হইতে অনুমতি দিলেন। সুতরাং অতঃপর মাসাষিফা "একবাহু মাসামুঁএ" নামে অভিহিত হইল। আন্তরিক অনুতপ্ত হইবার ফলে সে পুনরায় বহু সুন্দর সুন্দর তরবারী তৈয়ারী করিতে সক্ষম হইয়াছিল; সে সকল তরবারী তরবারীপ্রিয় ব্যক্তিদের নিকট আদরে রক্ষিত হইয়াছে।

মাসামুঁএ সাদামুঁনেকে জামাতারূপে গ্রহণ করিয়া এবং মাসাষিফাকে তাঁহার স্বনামের অধিকারী করিয়া, (মাসাষিফার তখন হইতে নাম হইল দ্বিতীয় মাসামুঁএ,) তাঁহার অবশিষ্ট জীবন বৌদ্ধগ্রন্থ অধ্যয়নে অতিবাহিত করিবেন স্থির করিলেন এবং মস্তক মুণ্ডন করিয়া আপনার নাম পরিবর্ত্তন করতঃ হরিউসাই নাম গ্রহণ করিলেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন, তিনি কখনই অপরকে আঘাত করিবার জন্য বা হত্যা করিবার জন্য তরবারি নির্ম্মাণ করেন নাই—পরন্তু মানুষকে কেবল রক্ষা করিতে এবং ন্যায় ও মানবসমাজের মঙ্গলের জন্য সহায়তার নিমিত্ত নির্ম্মাণ করিয়া দেন। তথাপি, একথা বলা যায় না যে, তাঁহার নির্ম্মিত তরবারি সমরক্ষেত্রে যোদ্ধারা ব্যবহার

করে নাই, বা ইহা দ্বারা কাহাকেও হত্যা করে নাই। সেই কারণে তিনি চারিজন শিষ্য পরিবৃত হইয়া সকল প্রসিদ্ধ মঠ ও মন্দির দর্শন করিয়া তীর্থভ্রমণের উদ্দেশ্যে দীর্ঘ পর্য্যটনে বাহির হইলেন; তাঁহার উদ্দেশ্য, যে সকল ব্যক্তি তাঁহার তরবারি দ্বারা হত হইয়াছে তাহাদের আত্মার মঙ্গলের জন্য সর্ব্বত্র প্রার্থনা করিবেন।

তিনি প্রথমে সাম্রাজ্যের তদানীন্তন রাজধানী কিয়োটা নগরে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে আইস প্রদেশস্থ সেকিনোশুকু নগরের এক সরাইয়ে রাত্রি যাপন করেন। মধ্যরাত্রে তিনি তরবারিতে পান দিবার শব্দ শুনিতে পান, শব্দের বিশেষত্ব অনুধাবন করিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার ভূতপূর্ব্ব শিষ্য মুরামাসাই ইহার নির্ম্মাতা, যাহাকে তিনি পূর্ব্বে তাহার তরবারি রক্তপিপাসু বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে, মুরামাসা তরবারি নির্ম্মাণ শিল্পে উত্তরোত্তর উন্নতি করিয়াছেন, কিন্তু তিনি পরদিন প্রভাতে সরাই ত্যাগ করিয়া যাইবার কালে দুঃখ প্রকাশ করিয়া গেলেন যে, মুরামাসার পান দিবার প্রণালী এখনও রক্তপিপাসুভাবে কলঙ্কিত—এরূপ হইবার কারণ এই যে, সে এখনও অনুতপ্ত নহে। কিন্তু তিনি তাঁহার ভূতপূর্ব্ব শিষ্যকে ডাকিয়া এ বিষয়ে শিক্ষা দিতে পারেন না, কারণ তাহাকে এখনও ক্ষমা করা হয় নাই।

সরাইওয়ালা এই সকল কথা তাহার প্রতিবেশী মুরামাসার নিকট ব্যক্ত করিল। মুরামাসা ভূতপূর্ব্ব গুরুদেবের সদয় বাক্য বিপরীত বুঝিয়া মনে করিল, তিনি তাহাকে দোষারোপ করিয়াছেন, এবং ইহার প্রতিশোধের নিমিত্ত তাঁহাকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্য মাসামুঁএর পশ্চাৎ অনুসরণ করিল। কিন্তু মাসামুঁএ কর্ত্তৃক তাহার চেষ্টা বিফল হইল। কারণ মাসামুঁএ তরবারি চালনায় তাঁহার শিষ্য অপেক্ষা অধিকতর দক্ষ ছিলেন। দয়ালু গুরুদেব অন্তরের একান্ত শুভ-ইচ্ছা দ্বারা মুরামাসাকে সাবধান করিয়া দিলেন, ফলে অবশেষে সেও অনুতপ্ত হইয়া পড়িল এবং অন্তস্তল হইতে ক্ষমা পাইবার নিমিত্ত গুরুর চরণপ্রান্তে আপনাকে নিক্ষেপ করিল। গুরুও তাহাকে ক্ষমা করিলেন।

মুরামাসা নির্ম্মিত তরবারিগুলি অত্যন্ত তীক্ষ্ণধার, কিন্তু কেহ কেহ দোষারোপ করিয়া বলে যে, তাহার তরবারি রক্তপিপাসু; একবার কোষ হইতে বহির্গত করিলেই রক্তপাতের কারণ হয়। কিন্তু ইহা অতি একদেশদর্শী মত। সত্য যে, তাহার প্রথম নির্ম্মিত তরবারি রক্তপিপাসু ছিল, কিন্তু পরে, সে অনুতপ্ত হইয়া গুরুকর্ত্তৃক ক্ষমা প্রাপ্ত হইলে পর, তাহার নির্ম্মিত তরবারি দেশের উত্তম অসি সকলের সমতুল্য এবং সর্ব্বগুণসম্পন্ন হইয়াছিল;—সে অসি আঘাত করিবার বা হত্যা করিবার জন্য নহে, মানুষকে রক্ষা করিবার জন্য। *

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

* Kein Kuzunর গল্প হইতে।

শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর বেকার সমস্যা

বেকার সমস্যা লইয়া দেশে এখন বেশ একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। ছেলেদের কি করিতে দেওয়া যায়, যুবকেরা, বিশেষতঃ শিক্ষিত যুবকেরা, কি করিবে, এটা এখন প্রত্যেক চিন্তাশীল অভিভাবকের বিষম দুর্ভাবনার কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এমন কি এ বিষয়ে আমাদের প্রবলপ্রতাপ গভর্ণমেণ্টেরও টনক নড়িয়াছে। প্রচলিত রীতি অনুসারে, এই বেকার সমস্যার কতকটা কারণ নির্দ্ধারণ ও প্রতিকারের উপায় নির্দ্দেশের জন্য গভর্ণমেণ্ট এক কমিটিও নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। এই কমিটি মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙ্গালী ও এ্যংগ্লোইণ্ডিয়ান দিগের বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য নিযুক্ত। বস্তুতঃ বেকার সমস্যা এই মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে বড়ই সঙ্গীণ বলিয়া বোধ হয়। কৃষিকার্য্যে কাঁচামাল তৈয়ারী দেশের জনসাধারণের যে পেশা, তাহাতে বেকারের সংখ্যা মরসুম ব্যতীত অন্য সময়ে যে কত অধিক ও দেবতার 'অনুগ্রহে' কোন বৎসর বৃষ্টির অভাব হইলে ইহা যে কি ভীষণ ভাব ধারণ করে, সে সম্বন্ধে মাথা ঘামানো কেহ বড় একটা আবশ্যক মনে করেন না। কারণ ভারতের স্বল্প-সন্তুষ্ট কৃষককুল চিরদরিদ্র,—দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ ইহাদের চির সহচর। ইহাদের দারিদ্র দূরীকরণ, ও দুর্ভিক্ষকালীন কদাহার ও অনাহার জনিত ব্যাধি হইতে ইহাদের উদ্ধার,—এত বড় সমস্যা যে তাহার আলোচনা করিতেও ভয় হয়। তাহার উপর দেশে এক বৎসর সুবৃষ্টি হইলেই ইহারা সব দুঃখ ভুলিয়া যায়। অভাব অভিযোগ লইয়া আবেদন নিবেদন আন্দোলনে ইহারা একেবারে অভ্যস্ত নয়, ইহারা মুখ বুজিয়াই কষ্ট সহে, মরিতে হইলেও বেশ মুখ বুজিয়াই মরে। কাজেই ইহাদের মধ্যে বেকার সমস্যা আছে কি না, ও তাহার প্রকৃত প্রতিকার কি, এ সম্বন্ধে দুই চারি জন সহৃদয় দেশহিতৈষী ব্যতীত কাহাকেও বড় একটা উচ্চবাচ্য করিতে দেখা যায় না। কিন্তু এ কথা কখনও ভুলিলে চলিবেনা যে দেশের যে কোন বড় একটা জনের অবস্থা দেশের সাধারণ অবস্থার সহিত ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট। কারণ দেশের উৎপন্ন ধনের পরিমাণের উপরই যে, দেশের সর্ব্ববিধ লোকের অবস্থা বিশেষরূপে নির্ভর করে, ধনবিজ্ঞানের এই সূত্রটি স্বতঃসিদ্ধ। অবশ্য এই উৎপন্ন ধন বিভাগের সময় শ্রেণী বিশেষ নিজেদের বিশেষ বিধা করিয়া লইতে পারেন, কিন্তু তাহাতে মূল কথাটির কোন ব্যতিক্রম হয় না। আর মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ভদ্র বাঙ্গালী বলিতে আজ কাল বাঙ্গলা দেশের বেশ একটি বড় দলকেই বুঝায়। ইহার পর ইহাদের সহিত এ্যংগ্লোইণ্ডিয়ানদের যোগ দিলে দলটি যে আরও অনেক বড় হইয়া পড়ে, তাহাতে আর কোন সন্দেহই নাই। এই মূল কথাগুলি স্মরণ রাখিয়া এক্ষণে দেখা যাউক যে এই মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙ্গালী ও এ্যংগ্লোইণ্ডিয়ানদিগের মধ্যে বর্ত্তমান ভীষণ বেকার সমস্যার কারণ কি? গভর্ণমেণ্ট নিযুক্ত কমিটির প্রশ্ন পত্রে কারণ গুলিকে মোটামুটি নিম্নলিখিত পাঁচ দফায় ভাগ করিয়া বার কথা বলা হইয়াছে:—

১। জন্মগত বা মজ্জাগত (Inherent).
২। ইহাদের মধ্যে প্রচলিত বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি জনিত।
৩। কয়েকটি সুপরিচিত কার্য্যক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য কর্ম্মক্ষেত্র সম্বন্ধে অজ্ঞতা প্রসূত।
৪। অর্থাভাব সম্ভূত।
৫। অন্যান্য।

কারণগুলি পৃথক পৃথক দফায় আলোচনা করিবার সুবিধা ও অসুবিধা দুইই আছে। সুবিধা এই যে, পৃথক পৃথক দফায় আলোচনা করিলে আলোচনাটি জটিল ভাব ধারণের সম্ভাবনা কম এবং এক বিষয়ের আলোচনা করিতে গিয়া অন্য বিষয় আসিয়া পড়িয়া "ধান ভানিতে শিবের গীত" হইয়া পড়িবার আশঙ্কাও অল্প। বোধহয় এই জন্যই কমিটির প্রশ্নের উত্তরগুলি এই রকমে দফায় দফায় দিবার অনুরোধ করা হইয়াছে। তবে এই রকম দফায় দফায় উত্তর দিতে হইলে অনেক সময় উত্তরগুলি খাপছাড়া হইয়া পড়িয়া দুর্ব্বোধ হইয়া যায় ও তাহাতে নিজে অসুবিধাও ঘটিয়া থাকে। কাজেই বর্ত্তমান আলোচনায় মোটামুটি দফাগুলি মানিয়া চলিলেও আমরা আবশ্যকমত এক দফার মধ্যে অন্য দফার বিষয় আনিতে কুণ্ঠিত হইব না।

১। মজ্জাগত বা জন্মগত কারণ।

মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙ্গালী বা এ্যাংগ্লোইণ্ডিয়ানদের বেকার সমস্যার জন্মগত মজ্জাগত কারণ খুঁজিতে গেলে প্রথমেই আমাদের চোখে পড়ে ইহাদের কায়িক পরিশ্রমে অনিচ্ছা। অবশ্য বসিয়া বসিয়া কলম পেষায় শারীরিক পরিশ্রম যে একেবারে হয় না তাহা বলিতে পারি না, তবে এখানে তাহাকে আমরা কায়িক পরিশ্রম বলি ধরিতেছি না। এই কায়িক পরিশ্রমে অনিচ্ছা মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙ্গালী হিন্দুদিগের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কিন্তু মুসলমান ভ্রাতৃগণের মধ্যে ইহা অপেক্ষাকৃত কম। এ্যাংগ্লোইণ্ডিয়ানদিগের মধ্যে আরও কিছু কম হইলেও, ইহা বিলক্ষণ বর্ত্তমান আছে। এই কায়িক পরিশ্রমে বিমুখতা সাধারণতঃ দুইরকমের দেখিতে পাওয়া যায়। কতকগুলি কার্য্য অনভ্যাসের জন্য ইহাদের শরীরের পক্ষে একেবারে অসম্ভব, যেমন,—রৌদ্র বৃষ্টি সহ্য করিয়া হলকর্ষণ বা আবার কতকগুলি কার্য্য ইহাদের শারীরিক শক্তিতে কুলাইলেও হীনকার্য্য বলিয়া পরিত্যক্ত যেমন,—ছুতার, কামার, ফেরিওয়ালার কার্য্য। প্রথম প্রকারের পরিশ্রমে অনিচ্ছা কাহাকেও বড় দোষ দেওয়া যায় না এবং ইহাকে শ্রমবিমুখতা না বলিয়া শ্রমে অক্ষমতা বলা উচিত। দ্বিতীয় প্রকারের অনিচ্ছা দোষার্হ সন্দেহ নাই। কিন্তু পৃথিবীর সর্ব্বত্রই সর্ব্বদিগের মধ্যে ইহা যথেষ্ট দেখা যায়। পৃথিবীর সর্ব্বত্র ওকালতি, ডাক্তারী, কেরাণীগিরি এবং সমস্ত কার্য্যে শ্রমজীবীর কাজ অপেক্ষা লোকের ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া যায়।

আমেরিকা ছাড়া পৃথিবীর সর্ব্বত্রই শিক্ষিতাভিমানী যুবকেরা নিজের সামাজিক মর্য্যাদার হানিকারক কোন কাজ করিতে চাহে না। এ দোষের জন্য তাহাদের কি তাহাদের সমাজকে, দায়ী করা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত তাহা পাঠক বিচার করিবেন।

কেবল শিক্ষিত বাঙ্গালী বা এ্যাংগ্লোইণ্ডিয়ান যুবকেরা এই দোষে দোষী না হইলেও পারিপার্শ্বিকের গুণে এই দোষগুলি ইহাদের মধ্যে অধিকতর স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। একে বাংলার আবহাওয়া দীর্ঘকাল কঠোর কায়িক পরিশ্রমের কোনরূপে অনুকূল নয়, তারপর অনেকদিন ধরিয়া মানুষের চেষ্টা এবিষয়ে সর্ব্বরকমে প্রকৃতিদেবীকে সাহায্য করিয়া আসিতেছে। ব্যাপারটা তলাইয়া বুঝিতে হইলে এই আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী ও এ্যাংগ্লোইণ্ডিয়ানদিগের উৎপত্তির ইতিহাসের একটু বিশদ আলোচনা একান্ত প্রয়োজনীয়।

ইংরেজ যখন বাংলা দেশের মালিক হইলেন তখনও এদেশে একদল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক ছিল। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা বর্ত্তমান কালের মত এত অধিক ছিল না। এ্যাংগ্লোইণ্ডিয়ানদের তখন উৎপত্তির আরম্ভ হয় নাই। বাঙ্গালী হিন্দুদিগের মধ্যে তখন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী কেবল ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ এই তিনটি জাতির মধ্যে আবদ্ধ ছিল। ইহারা ও ইহাদের মুসলমান ভ্রাতৃগণ প্রধানতঃ নিজ নিজ ভুমি সম্পত্তির আয়ের উপর নির্ভর করিয়া গ্রামে বাস করিতেন। তখন চাকুরী ও চাকুরী-প্রার্থী উভয়েরই সংখ্যা যৎসামান্য ছিল সেজন্য বেকার সমস্যারও কোন অস্তিত্ব ছিল না। তখনকার জীবন অনাড়ম্বর, এবং সর্ব্বোচ্চ শিক্ষিতদের মধ্যেও অভাবের পরিমাণ অতি অল্প ছিল বলিয়া গ্রামে সামান্য ভূসম্পত্তির আয়ে তখন এখনকার অপেক্ষা অনেক বেশী সহজেই লোকের চলিয়া যাইত। এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের দল গ্রামেও একেবারে অলস হইয়া বসিয়া থাকিতেন না। নিজেদের দৈনিক ব্যবহারের অনেক দ্রব্যই ইহারা নিজেরাই তৈয়ার করিয়া লইতেন। গরুর দুধ, পুকুরের মাছ, বাগানের ফলফুলুরি ও তরিতরকারী এমন কি বস্ত্রবিস্তর কাপড়চোপড় সকলেই নিজের ব্যবহারের মত নিজের বাড়ীতেই তৈয়ার করিতেন বা করাইতেন। তার উপর ইহারা গ্রামের বিবাদ গ্রামেই মিটাইতেন, নানারকমের সহজ উপায়ে গ্রামেই গ্রামবাসীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেন, নানা রকমে তাহাদের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি উৎপাদনে সাহায্যতা করিতেন, ও অন্যান্য অনেক রকম উপায়ে তাহাদের জীবনযাত্রার পথ সুগম করিয়া দিতেন। কিন্তু ভালই হউক, আর মন্দই হউক, বৃটিশরাজ্য স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে এই শান্ত অনাড়ম্বর পল্লীজীবন লুপ্ত হইতে আরম্ভ হইল। এই সময় আমাদের জাতীয় জীবনের যে পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল, আজিও তাহা শেষ হয় নাই, আজিও আমরা যুগ পরিবর্ত্তনের ভীষণ কষ্ট মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি। আমাদের পুরাতন জীবনযাত্রা-পদ্ধতি প্রায় একেবারে লোপ পাইয়াছে এবং তাহার স্থলে আমরা এখনও সুবিধাজনক নূতন কোন পদ্ধতি গড়িয়া উঠিতে পারি নাই। সেজন্য আমাদের অভাবগুলি দিন দিন হু হু করিয়া বাড়িয়া উঠিতেছে কিন্তু একমাত্র যে কার্য্যকরী

শক্তির দ্বারা এই সমস্ত অভাবের মোচন সম্ভব তাহার বিকাশ একেবারে হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমাদের সহর ও সহরবাসীর সংখ্যাও যথেষ্ট বাড়িতেছে কিন্তু একমাত্র যে পল্লীগ্রাম হইতে সহরে জীবন ধারণ ও কর্ম্মক্ষম হইবার উপযুক্ত দ্রব্যাদি যোগাড় হইতে পারে সেই গ্রাম-সমূহ ক্রমশঃ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। পূর্ব্বে নিজ নিজ প্রয়োজনানুসারে নিজ নিজ দ্রব্যাদি উৎপন্ন করিবার যে পদ্ধতি ছিল (System of domestic production for home consumption) তাহা লোপ পাইয়াছে অথচ বড় বড় বাজারে যোগানের জন্য সুনিয়ন্ত্রিত বহুল দ্রব্যোৎপাদন পদ্ধতি (Organised production for the supply of large markets) এখনও প্রচলিত হয় নাই। আমাদের নূতন নূতন অভাবগুলির পুরণের ভার আমরা বিদেশী শিল্পী, ব্যবসায়ী, বিশেষজ্ঞদিগের হাতে দিয়া বেশ নিশ্চিন্ত হইয়াছি। এরূপ স্থলে যে, দেশে বহুলোক বেকার থাকিবে তাহা আর বিচিত্র কি!

আবার ইংরেজের বাংলা ও ভারতজয় শেষ হইতে না হইতেই দেশ শাসন ও দেশের উন্নতি (Development) বা শোষণের (Exploitation) জন্য একদল ইংরেজী জানা * লোকের দরকার হইয়া উঠিল। ইংরেজের সাহায্যকারী এই ইংরেজী শিক্ষিতের দলকে সহজেই মান এবং ক্ষমতা অর্জ্জন করিতে দেখিয়া দেশে ইংরেজী শিখিবার ইচ্ছা চড়্ চড়্ করিয়া বাড়িতে লাগিল। লোকে এখন লক্ষ্মী সরস্বতীর পুরাতন বিবাদের কথা একেবারে ভুলিয়া গেল। ঘরে ঘরে এখন নূতন প্রবাদ চলিতে লাগিল—"লেখাপড়া করে যেই গাড়ীতে চড়ে সেই", "সাহেব ছুঁলে বড়লোক হয়", "যেমন তেমন চাকুরী ঘি ভাত" ইত্যাদি। মোক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার এমন কি ইংরাজীওয়ালা কেরাণীদের প্রথম দলের সুখ সুবিধা দেশের লোকের মাথা একেবারে বিগড়াইয়া গেল। সরকারী চাকুরীর 'ইজ্জত' এবং রাখিবার ক্ষমতা (Security) এই বিগড়ানোর যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। দেশের জনসাধারণের নিকট সর্ব্বপ্রকার দায়িত্বশূন্য, নিরঙ্কুশ আমলাতন্ত্র স্বীয় পুষ্টিসাধনাকাঙ্ক্ষায় ক্রমাগত নিত্য নূতন পদ ও বিভাগ (Department) সৃষ্টি করিয়া এই অনর্থকর চাকুরীর যথাসাধ্য পরিপোষণ করিয়া অবশেষে এখন নিজেই এমন অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছে যে অপেক্ষা ব্যয় অনেক অধিক হওয়ায় ইহাকে বিলাত হইতে বিশেষজ্ঞ আনিয়া ব্যয় সংক্ষেপের লইতে হইয়াছে। মোটের উপর দাঁড়াইয়াছে এই যে, দেশশুদ্ধ লোকের মনে এমন ধারণা যে খানিকটা ইংরেজী শিক্ষাই শিক্ষা; এবং আমাদের বাংলা দেশের বালক ও যুবক বৃন্দের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অংশ ইংরেজী শিখিবার চেষ্টায় নিযুক্ত রহিয়াছে। ইউনিভার্সিটি বা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কা এখন অধিকাংশের নিকট ইংরাজী শিক্ষার পরিচায়ক ও ইংরাজ

* ইংরেজী শিখিয়া ইংরেজের সাহায্য করিয়া বড় হইবার পথে বাঙ্গালী, বিশেষতঃ বাঙ্গালী অগ্রণী ছিলেন বলিয়া হিন্দুস্থানীরা বহুদিন বাঙ্গালীকে "ইংরাজকো গুরু" বলিত।

সুখ সুবিধার পথে চাবীকাঠি বলিয়া বাংলার যুবকবৃন্দের নিকট এগুলি ক্রমশঃ এতই লোভনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, ডিগ্রির উপযুক্ত শিক্ষা হউক, আর নাই হউক, ডিগ্রিটা কিন্তু চাই-ই চাই। ফলে যোগান-টানের কঠোর অনুশাসন অনুসারে (The unexorable law of supply and demand) ডিগ্রির বাজার দরের অঙ্ক এখন ক্রমশঃ নামিয়া নামিয়া শূন্যে দাঁড়াইলেও এই লোভ এখনও বাঙ্গালীর মন সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া বসিয়া আছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

আবার আর্থিক মূল্য ছাড়া ইংরেজী শিক্ষার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কার আর একটা দাম আছে। সেটাকে আমরা ইহার সামাজিক দাম বলিব। এই জন্যও ইংরেজী শিক্ষা আমাদের দেশের সর্ব্বসাধারণ, বিশেষতঃ অশিক্ষিত নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে, বিশেষ লোভনীয় হইয়াছে ও এখনও অনেক দিন এইরূপ থাকিবে। বাঙ্গালী হিন্দুদের জাতিগুলির বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই আমরা দেখি, যে মোটামুটি সমস্ত মূল জাতি এখন শিক্ষিত ও অশিক্ষিত দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। শিক্ষিতেরা এখন পারতপক্ষে অশিক্ষিতদের সহিত বিবাহ সম্বন্ধ স্বীকার করিতে নিতান্ত নারাজ। চাকুরে ধোপা, কাপড়কাচা-ধোপার ঘরে মেয়ে দিতে ও তার ঘরের মেয়ে আনিতে চায় না। চাকুরে তাঁতি, তাঁতবোনা-তাঁতির সহিত কারবার করিতে চায়না ইত্যাদি। ইহার ফলে অশিক্ষিত থাকের ছেলেদের যেমন করিয়াই হউক লেখাপড়া শিখাইয়া শিক্ষিত থাকে উঠিবার একটা প্রবল চেষ্টা জন্মিয়াছে। মুসলমানদিগের মধ্যে এই ব্যাপার চলিতেছে কি না, ঠিক বলিতে পারি না; তবে বাহির হইতে দেখিয়া চলিতেছে বলিয়াই মনে হয়। এই নিচু হইতে উপরে উঠিবার উৎকট চেষ্টার ফলে বাংলা দেশে শ্রমজীবীর এরূপ অভাব হইয়াছে যে, বাহির হইতে ধোপা, নাপিত, ছুতার, কামার প্রভৃতির আমদানী না হইলে বাঙ্গালীর, অন্ততঃ কলিকাতা সহরে, দিন চলা ভার হইত।

এ্যাংগ্লোইণ্ডিয়ানদিগের অবস্থাও শিক্ষিত হিন্দু ও মুসলমানের ন্যায়ই শোচনীয়। রাজার স্বজাতি বলিয়া ইহারা শ্রমজীবীর কাজ করিতে স্বভাবতঃই লজ্জা পায়। এই গরম দেশে ইংরেজী চালে থাকিয়া কায়িক পরিশ্রম যে সম্ভব তাহাও ঠিক বলা যায় না। শিক্ষিত বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমানের যে সব উপজীবিকা ইহাদেরও তাহা। ইহাদের একটু সুবিধা এই যে, ইংরেজ সরকারে, রেলওয়ে ও অন্যান্য বড় বড় ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানে (Organisations) কতকগুলি কাজে ইহাদের একচেটিয়া অধিকার আছে। পর্দ্দার অভাব ইহাদের আর একটি সুবিধা বলা যাইতে পারে। কারণ ইহাদের মেয়েরাও পুরুষদের মত স্বাধীনভাবে রোজগার করিতে পারে। তবে ইহার অসুবিধাও এই যে, চাকুরী লইয়া ইহাদের মেয়েপুরুষে লড়াইও অবশ্যম্ভাবী।

২। শিক্ষা জনিত

অনেকেই এই বেকার সমস্যার বোঝা বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতি, বিশেষতঃ কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপর চাপাইয়া নিশ্চিন্ত আছেন। অবশ্য শিক্ষা অর্থে যদি আমরা সমস্ত পারিপার্শ্বিকের প্রভাব বুঝি, তাহা হইলে একথা যে সম্পূর্ণ সত্য তাহা পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু শিক্ষা পদ্ধতি সচরাচর যে অর্থে ব্যবহৃত হয় সে অর্থে ব্যবহৃত হইলে কথাটা পূর্ণ সত্যের বহিরাবরণ মাত্র হইয়া পড়ে। কারণ প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি সমগ্র পারিপার্শ্বিকের একটি সামান্য অংশ মাত্র এবং যে সমস্ত সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণের কথা পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে তদ্বারা নিরূপিত। অবশ্য বুদ্ধি বিবেচনার সাহায্যে পারিপার্শ্বিকের উপর জয়লাভ করিবার ক্ষমতা মানুষের অনেকটা আছে তাহার সন্দেহ নাই এবং সুচিন্তিত শিক্ষা পদ্ধতির প্রবর্ত্তন এবিষয়ে অনেকটা সাহায্য করিতে পারে নিঃসন্দেহ। কিন্তু শুধু শিক্ষা প্রণালী পরিবর্ত্তন হইতে এই জটিল সমস্যার সমাধানের আশা দুরাশা মাত্র বলিয়াই বোধহয়। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর দোষ কাহারও বোধহয় অবিদিত নাই। জানিয়া শুনিয়া তবুও দলে দলে লোক এই শিক্ষা নিতে আসিতেছে কেন? এই শিক্ষাপ্রণালীই বা কেন এমন ভাবে গড়িয়া উঠিল? এই দুইটি প্রশ্নের উত্তর দানের চেষ্টা করিলেই সকলে একথা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় প্রতিষ্ঠিত জাতীয় শিক্ষাপরিষদের ইতিহাসও ইহার স্বপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই পরিষদের সাধারণ (general) শিক্ষার সহিত কার্য্যকারী (practical) শিক্ষা মিলনের চেষ্টার নিষ্ফলতা এবং বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইনষ্টিটিউটের ১৯০৮—১৯১৫ পর্য্যন্ত ক্রমিক অবনতি ও তৎপরে গত মহাযুদ্ধের ফলে পারিপার্শ্বিকের আংশিক পরিবর্ত্তন জনিত উন্নতি ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

৩। অজ্ঞতা-প্রসূত

কেহ কেহ বলেন এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী ও এ্যাংগ্লোইণ্ডিয়ানদল কয়েকটি সুপরিচিত কার্য্যক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য কার্য্যক্ষেত্রের কথা অবগত নহে বলিয়াই ইহাদের এত কষ্ট। আমার মনে হয় এই মতটি কয়েকজন উর্ব্বরমস্তিষ্ক সবজান্তা বিশেষজ্ঞের কল্পনা মাত্র। হইতে পারে এই মধ্যবিত্ত বেকারদলের বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি, বিশেষ বিশেষ কার্য্যক্ষেত্র সম্বন্ধে একে অনভিজ্ঞ, কিন্তু দেশের মেরুদণ্ডস্বরূপ সমস্ত শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণী যে কতকগুলি সুনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মক্ষেত্র সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ তাহা কল্পনাও আসে না।

৪। অর্থাভাব সম্ভূত

অনেকে বলেন এই শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর মূলধনের অভাবই ইহাদের মধ্য বেকার প্রধান কারণ। ইহারা যতই অর্থ উপার্জ্জন করুক না কেন, অর্থ সঞ্চয় বা মূলধন সংগ্রহ

পক্ষে একেবারে অসম্ভব এবং উপযুক্ত মূলধনের অভাবে শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে (Fields of manufacture and commerce) প্রবেশলাভ ইহাদের পক্ষে একেবারে অসম্ভব। কথাটি আপাতঃদৃষ্টিতে সত্য বলিয়া বোধ হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে সত্য নহে। মূলধন ব্যতীত ব্যবসায় অসম্ভব হইলেও খুব কম শিল্পী ও ব্যবসায়ী নিজের মূলধনে কাজ করিয়া থাকে। পাশ্চাত্য দেশে ব্যবসায়ী (Organiser) ও ধনী (Capitalist) দুইটী স্বতন্ত্র শ্রেণী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের দেশে এখনও এইরূপ অবস্থা আসিবার বিলম্ব থাকিলেও ব্যবসায়ী মাত্রেই বোধহয় স্বীকার করিবেন যে, মূলধন সংগ্রহ অপেক্ষা ব্যবসায় 'শিক্ষা (Business Training) ব্যবসায়ের সাফল্যে অধিকতর আবশ্যকীয়; কৃতী ব্যবসায়ীর কখনও মূলধনের অভাব হয় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বাংলার চটের ব্যবসায়ের কথাও এইস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই ব্যবসায় এখন প্রায় স্কচব্যবসায়ীদের একচেটিয়া বলিলেও হয় কিন্তু ইহাতে বিস্তর বাঙ্গালীর মূলধন খাটিতেছে। দেশ হইতে লোটা কম্বল সম্বল মাত্র করিয়া আসিয়া কলিকাতার ব্যবসাক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জনের দৃষ্টান্ত এখনও মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদের মধ্যে নিতান্ত বিরল নহে।

এখন এই কঠিন সমস্যা সমাধানের উপায় কি? এখন সংবাদ পত্রে দেখিতেছি নানা জনে নানা প্রকার উপায় নির্দ্দেশ করিতেছেন; কেহ বলিতেছেন যে, গবর্ণমেণ্ট ভূমি ও ঋণ দান করিয়া বেকার দিগকে কৃষিকার্য্যে লাগাইয়া দিলে এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে। কেহ বলিতেছেন যে আমদানী দ্রব্যের উপর শুল্কের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দেশের শিল্প সংরক্ষণ (Protection) ইহার প্রকৃষ্ট উপায়। আমার মনে হয় এই জটিল ও বহুপুরাতন সমস্যার সমাধান এত সহজসাধ্য নহে। সরকারি কার্য্য দ্বারা তাড়াতাড়ি ইহার কোন প্রতিকার করিতে গেলে কুফলের সম্ভাবনা অধিক। কারণ জনসাধারণের হৃদয়ে বদ্ধমূল ভাবরাশি সরকারের এক হুকুমে বদলাইবার নহে। নিম্নলিখিত উপায় গুলি অবলম্বন করিলে ক্রমশঃ এই সমস্যা সরল হইয়া আসিয়া কালে ইহার সমাধান হইতে পারে :—

(১) পল্লীসংস্কার—

নানাকারণে বাংলাদেশের ক্রমবর্দ্ধনশীল সহর গুলির চারিপার্শ্বের পল্লীগ্রামগুলির অবস্থা নিতান্ত হীন হইয়া পড়িয়া অনেকস্থলে সেগুলি ভদ্রলোকের বাসের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। কলিকাতার খানিক দূরে চারিদিকে এই ব্যাপার বিশেষ পরিস্ফুট। এদেশের এবং ইউরোপের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এখন নানা কারণে দেশের লোকেদের গ্রামে ও জমিতে ফিরিবার (Back to village and back to land) উপদেশ দিতেছেন। সুচিন্তিত উপযুক্ত সাহায্য দ্বারা এই বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করিলে বেকার সমস্যা অনেকটা সরল হইয়া আসিতে পারে।

(২) আমাদের কৃত্রিম ও লৌকিক অভাব (Artificial or conventional wants)

সংক্ষেপ—

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অনেকেই বলেন যে, অভাবের প্রসারই সভ্যতার ভিত্তি। কথাটা সত্যই হউক, আর মিথ্যাই হউক, কি প্রাচ্য, কি পাশ্চাত্য, কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিই বোধ হয় অস্বীকার করিবেন না যে, সুস্থ সবল ও কার্য্যক্ষম থাকিবার জন্য আবশ্যকীয় অভাবগুলি পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে কৃত্রিম ও লৌকিক অভাবের প্রসার আত্মবিনাশের পথ মাত্র। ইহাকে কিছুতেই সভ্যতার বিকাশ বলা যাইতে পারে না। পাশ্চাত্য সভ্যতার এই অযথা অনুকরণের চেষ্টায় আমরা নানাদিকে এই আত্মবিনাশের পথে ছুটিতেছি। একটা সামান্য উদাহরণ এখানে দেওয়া যাইতে পারে। আমাদের দেশে গ্রীষ্মকালে খালি গায় থাকা আরামদায়ক ও স্বাস্থ্যপ্রদ—এটা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। ইহাতে ব্যয়ও যে কিছু বাঁচিয়া যায় তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু সাহেব গুরু আমাদের শিখাইয়াছেন যে, খালি গায়ে থাকা অসভ্যতা—আর এই শিক্ষা আমাদের এখন এমন মজ্জায় হইয়াছে যে, পেটের ভাত মারিয়াও, আমাদের ভদ্র লোকদের দারুণ গ্রীষ্মেও বাড়ীর বাহিরে যাইতে হইলেই, গায়ে কিছু দেওয়া চাই-ই। পোষাক পরিচ্ছদে, গৃহসজ্জায়, সামাজিক অনুষ্ঠানে সর্ব্বত্র এই সভ্য হইবার উৎকট ইচ্ছায় আমরা আমাদের কৃত্রিম ও লৌকিক অভাবগুলি অযথা বাড়াইয়া ফেলিয়াছি ও ফেলিতেছি। আমাদের শাসক ইংরেজ ইহার জন্য অনেকটা দায়ী। তাঁহারা এ আমাদের পুরাতন চিরন্তন অনাড়ম্বর সরল সুখকর জীবন যাত্রার পথে যতটা সম্ভব ফিরিয়া যাই সাহায্য করিবেন কি? লৌকিক অভাব সংক্ষেপের কথা বলা সহজ, কিন্তু কার্য্যে পরিণত করি হইলে যতটা চরিত্রবল থাকা আবশ্যক সেটা কোথায়?

৩। সুশিক্ষা—

আমাদের এখন এমন শিক্ষা চাই যাহাতে আমাদের মনে দৃঢ় ধারণা হয় যে, ধর্ম্মপথে থাকি জীবিকা অর্জ্জনের জন্য যে কোন প্রকার পরিশ্রম মর্য্যাদা হানিকর নহে। আলস্য এবং প্র যোজনই প্রকৃত হীনতা। আমাদের যুবকদের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল করিয়া দিয়া আমাদের "জাতীয় বিভাজ্যধন" (National Dividend) বৃদ্ধি পাইতে পারে এবং যাহাতে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি যতদূর সম্ভব আমরা নিজেরাই তৈয়ার করিয়া লইতে পারি সেই সমস্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিলেই এই সমস্যার সমাধান সম্ভব।

শ্রীপঞ্চানন

"ভাগ্যের বোঝা"

(১)

ভাগ্যধরের বাপ মুরলীধর যেদিন যমরাজের নোটিশে ভাগ্যধরের কাঁধের উপর দুঃখের-বোঝা চাপিয়ে দিয়ে পৃথিবী হ'তে সরে' পড়্লো, সেদিন ভাগ্যধরকে সংসার-পথের প্রথমেই একটু থম্কে দাঁড়াতে হয়েছিল।

সে সংসারে পেয়েছিল তার স্ত্রী অণিমা আর পাঁচ বছরের মেয়ে লীলাকে। এই নিয়েই সে তা'র থম্কে-দাঁড়ানো জীবনটাকে সংসার-পথে অনেকটা নির্ব্বিবাদে চালাতে পেরেছিল। তা'র কারণ, সে তা'র স্ত্রীর মধ্যে পেয়েছিল প্রেয়সীর অনন্ত প্রেম ও সন্তানের মাতৃত্ব, এবং লীলার ভিতর ছিল সরলতার শিশু মূর্ত্তি। আর সে নিজেও বরাবরই একটু অতিরিক্ত মাত্রায় ছিল ভাগ্যবিশ্বাসী। এই ক'টার জোরেই সে নিজেকে সোজা করে' দাঁড় করাতে পেরেছিল।

ভাগ্যধরের মনে কি জানি কেমন একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, তার ভাগ্যের জোরটা অন্য সকলের চেয়ে কিছু বেশী। এর অবশ্য কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ সেও ঠিক দেখাতে পারত না। তবুও সে ভাগ্যদেবীর একজন প্রধান উপাসক ছিল। ভাগ্যদেবী তাঁর এই ভক্তটির ভক্তি দেখে আড়ালে কি ভাব্তেন তা' তিনিই জানতেন। কিন্তু এপর্য্যন্ত কখনো কোনো পুরস্কার দিয়ে ভাগ্যধরের বাপের দেওয়া নামটাকে তিনি সার্থক প্রতিপন্ন করেন নি।

অণিমা প্রথম প্রথম তা'র এই অতি ভাগ্য-বিশ্বাসী স্বামীর সঙ্গে প্রায়ই ঝগড়া কর্তো। ঝগড়ার কারণ যে ভাগ্যধরের ভাগ্যকে বড় করে' দেখার জন্যে, তা' ঠিক নয়। পাড়ার লোকে যখন ভাগ্যধরকে এইজন্যে বিদ্রূপ কর্তো, তখনি অণিমা রেগে উঠ্তো, আর ভাগ্যধরকে সাম্নে পেলেই ঝগড়া লাগিয়ে দিতো। কিন্তু ইদানীং যখন সে দেখ্লে যে, সকলেই তা'কে বেশ একটু উপেক্ষার চোখে দেখ্ছে—এবং তা'তে ভাগ্যধরের ভাগ্যস্পৃহা কিছুই কম্ছে না, বরং বাধা পেয়ে আরো বেড়ে যাচ্ছে, তখন হ'তেই সে ভাগ্যধরকে একটু করুণার চোখে দেখ্তে লাগ্লো। প্রতিবেশীদের অহেতুক কূজনে সে আর কান দিতো না বরং ভাগ্যধরকে তা'র প্রফুল্লতা দিয়ে ঘিরে রাখ্তো—বাইরের উৎপীড়ন হ'তে বাঁচাবার জন্যে।

ভাগ্যধর যখন রাস্তায় চল্তো তখন বেশ চোখ চেয়েই চল্তো। প্রায়ই খবরের কাগজে সে দেখ্তে পেতো যে, কেউ নোটের তাড়া বা মূল্যবান্ দলিল পত্র হারিয়েছে, আর সে গুলো ফিরে পাওয়ার জন্যে বেশ মোটা রকমের পুরস্কার ঘোষণা করেছে। এই সব দেখে তা'র মনে হ'তো যে, সে একদিন হয় তো এই রকম কোনো একটা মূল্যবান্ জিনিষ

কুড়িয়ে পেয়ে যাবে আর তা'র জন্যে বেশ মোটা রকম কিছু পেয়ে, রাতারাতি বড় লোকও হ'য়ে যেতে পারবে। এই-সব ভাবনাই কেবল তা'র মাথার মধ্যে জলপ্রপাতের ফেনিল জলরাশির মত ঘুলিয়ে বেড়াতো; কিন্তু কোনো দিন সে ভুলেও ভাব্‌তো না তা'র কুড়িয়ে পাওয়া জিনিষটাকে একেবারে হজম কর্‌বার কথা। জিনিষটাকে আপনার কাজে লাগানো থেকে তা'র দরুণ পাওয়া প্রশংসা ও পুরস্কারটার উপরেই তা'র লোভ ছিল বেশী। যদিও সে কোনো দিন কিছুই কুড়িয়ে পায়নি, তবুও হয় তো একদিন পাবে, এই আশাতেই সে পথ চল্‌তো রাস্তার উপর তার সতর্ক দৃষ্টিটাকে বেশ করে' মেলে দিয়ে।

যে আপিসে সে কাজ কর্‌তো সেখানে সবাই তাকে তার ভাগ্য-বিশ্বাস ও অতিরিক্ত সতর্কতার জন্য ক্ষ্যাপাতো। সে সে-সব দিকে ভ্রূক্ষেপও কর্‌তো না। এক এক দিন তা'র সতর্ক দৃষ্টিকে রাস্তায় সন্ধানী-আলোর মত ছড়াতে ছড়াতে আপিসে যেতে বেলা হ'য়ে যেতো, তবুও তা'র হুঁস হ'তো না। কতদিন এর জন্যে সে আপিসের বড় বাবুর কাছে বকুনি খেয়েছে, তবুও তার স্বভাব বদ্‌লাতে পারেনি।

লটারীর টিকিটের নাম শুন্‌লেই সে আগে গিয়ে টিকিট কিন্‌তো—যতই তা'র হোক্ না কেন। এরজন্য অণিমা কত দিন তা'কে বলেছে,—'এত দিন তো টিকিট কিনে ঘরে জঞ্জালের রাশিই বাড়িয়েছো, কোনো দিন তো একটা আধ্‌লাও তোমার উঠ্‌লো না, তবে আর কেন শুধু শুধু টাকাগুলো নষ্ট করা; এতে যে লক্ষ্মী তাঁর দেখে রুষ্ট হ'য়ে ছেড়ে চলে' যাবেন।'

ভাগ্যধর হেসে অণিমার চিবুক ধরে' মুখটা উঁচু করে' বল্‌তো,—'লক্ষ্মীকে করবার ফন্দিতেই তো এই চার ফেলা। তা' তাঁকে যদি ধর্‌তে নাই পারি, এই লক্ষ্মীটির করুণা যত দিন আমার উপর থাকবে ততদিন আমি লক্ষ্মীছাড়া হবার ভয় করি না।'

এই উত্তরে অণিমা লজ্জায় রাঙা হ'য়ে উঠ্‌তো। ভাব্‌তো—ওগো, আমি যে ব লজ্জা থেকে তোমাকে আর আড়াল করে' ঘিরে রাখ্‌তে পার্‌ছি না।—কিন্তু লজ্জা ফুট বেশী কিছু বল্‌তে পার্‌তো না। কারণ সদা-প্রফুল্ল ভাগ্যধর তা'কে এমন জবাব দে, ভাগ্যধরকে লজ্জা হ'তে বাঁচাতে গিয়ে ভাগ্যধরের কাছে নিজের লজ্জা ঢাকাই য় হ'য়ে পড়্‌তো।

কাজেই অণিমা বাইরের সমস্ত লজ্জাকে নিজের মধ্যে টেনে নিয়ে, লজ্জাবতীর মতই ক্রমশঃ বাইরের কাছে সঙ্কুচিতা হ'য়ে পড়্‌ছিল।

আপিসে যাবার বেলা হয়েছে। বাঁধ দেওয়া জলের বাঁধ কেটে দিলে যেমন খুঁৎ খুঁৎ কর্‌তে লাগ্‌লো। প্রতিজ্ঞা কর্‌লে আর কোনো দিনও সে এরকম অন্যমনস্ক জলটা অসীম বেগে এক দিক দিয়েই বেরিয়ে যেতে থাকে, তেমনি এখন সমস্ত লোক হ'য়ে চল্‌বে না। আজ ভাগ্যদেবীর ছোট দান এড়িয়ে গেল, কাল হয়তো বড় রকমের ট্রাম গুলোর দুয়ারের দিকে প্রবলবেগে চল্‌তে আরম্ভ করেছে, যেন এতক্ষণ কোথাকিছু চোখ এড়িয়ে যাবে।

ছিল এখন হঠাৎ মুক্ত হয়েছে। ট্রামের পর ট্রাম চলেছে প্রায় জোড়া লেগেই। যে ট্রামে বেশী ভিড়, সেই ট্রামেই লোক উঠ্‌ছে বেশী করে, যেন ঐ ট্রামটা ছাড়া তা'র ঠিক পেছনেই প্রায় জোড়া লেগেই যেটা আস্‌ছে সেটাতে গেলেও দেরী হ'য়ে যাবে। কিন্তু দেরীর ভাবনা যত হোক বা না হোক পয়সা বাঁচানর উদ্দেশ্য নিয়েই ভিড়ের উপর ভিড় বাড়ানো।

ভাগ্যধর তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে সেদিন একটু সকালেই বেরিয়ে পড়েছিল। ট্রামে বা গাড়ীতে সে সাধ্যপক্ষে কোন দিনই চড়্‌তো না, পাছে কখন্ কোন্ মুহূর্ত্তে ভাগ্যের দান তা'র চোখ এড়িয়ে যায়। রাস্তা দিয়েই হেঁটে চলেছে, এমন সময় তা'র ছেলেবেলার বন্ধু কিরণের সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল।

কথা বল্‌তে বল্‌তে হঠাৎ কিরণ একটু সরে' গিয়ে ফুটপাথের ধারে প্রায় ভাগ্যধরের পায়ের কাছে একটা আধুলি আর একটা পয়সা মাটি থেকে কুড়িয়ে নিলে। ভাগ্যধরকে দেখিয়ে বল্‌লে—'ওহে, আজ বরাত ভাল। সকালেই কিছু লাভ হ'য়ে গেল।—বলেই ভাগ্যধরকে কুড়িয়ে-পাওয়া পয়সাগুলো দেখালে। জিজ্ঞাসা কর্‌লে,—'তোমার পকেট থেকে এগুলো পড়ে' যায়নি তো?'

ভাগ্যধর কিরণকে পয়সা কুড়িয়ে পেতে দেখেই কেমন চম্‌কে উঠ্‌লো, যেন তার ভাগ্য বিশ্বাস তা'কে চাড়া দিয়ে সজাগ করে' দিলে। সে যদি একটু চোখ চেয়ে ভাল করে' দেখ্‌তো তাহ'লে তো আর কিরণ পেতো না। একটু সামান্য ভুলের জন্যে কি বোকামিই না সে করেছে। কেন সে কিরণের সঙ্গে এমন অন্যমনে কথা বল্‌ছিল। ভাগ্যদেবী তো সেটা তা'র জন্যেই কার পকেট-চ্যুত করে' রেখে দিয়েছিলেন। তিনি তো আর কিছু হাতে তুলে দিতে পারেন না, তাঁর দান তো এই রকম করেই।

কিরণ যখন জিজ্ঞাসা কর্‌লে যে, পয়সাগুলো তা'র কিনা, তখন সে একবার ভাব্‌লে যে, বলে ওগুলো তা'রই পকেট থেকে পড়ে' গেছে। কারণ তারই প্রাপ্য জিনিষ, সামান্য একটু ভুলের জন্যে কিরণ কুড়িয়ে পেয়েছে। কিন্তু তখনই তা'র বিবেক তা'কে ধাক্কা মেরে বল্‌লে—ছিঃ! সামান্যর জন্যে মিছে কথা। তোমার জন্যে হয়তো ভাগ্যদেবীর এর চেয়ে কোনো বড় দান অপেক্ষা কর্‌ছে, সেই জন্যেই ইহা তুমি পাওনি। লোভ দমন কর। ভাগ্যধর পকেটে হাত দিয়ে দেখে বল্‌লে—'না ভাই, আমার পয়সা নয়।'

ভাগ্যধর সেদিন আপিসে গিয়ে মন দিয়ে কাজ কর্‌তে পার্‌লে না। মনটা কেমন

কুড়িয়ে পেয়ে যাবে আর তা'র জন্যে বেশ মোটা রকম কিছু পেয়ে, রাতারাতি বড় লোক হ'য়ে যেতে পার্‌বে। এই-সব ভাবনাই কেবল তা'র মাথার মধ্যে জলপ্রপাতের ফেনিল জলরাশির মত ঘুলিয়ে বেড়াতো; কিন্তু কোনো দিন সে ভুলেও ভাব্‌তো না তা'র কুড়িয়ে পাওয়া জিনিষটাকে একেবারে হজম কর্‌বার কথা। জিনিষটাকে আপনার কাজে লাগানো থেকে তা'র দরুণ পাওয়া প্রশংসা ও পুরস্কারটার উপরেই তা'র লোভ ছিল বেশী। যদিও সে কোনো দিন কিছুই কুড়িয়ে পায়নি, তবুও হয় তো একদিন পাবে, এই আশাতেই সে পথ চল্‌তো রাস্তার উপর তার সতর্ক দৃষ্টিটাকে বেশ করে' মেলে দিয়ে।

যে আপিসে সে কাজ কর্‌তো সেখানে সবাই তাকে তার ভাগ্য-বিশ্বাস ও অতিরিক্ত সতর্কতার জন্য ক্ষ্যাপাতো। সে সে-সব দিকে ভ্রূক্ষেপও কর্‌তো না। এক এক দিন তা'র সতর্ক দৃষ্টিকে রাস্তায় সন্ধানী-আলোর মত ছড়াতে ছড়াতে আপিসে যেতে বেলা হ'য়ে যেতো, তবুও তা'র হুঁস হ'তো না। কতদিন এর জন্যে সে আপিসের বড় বাবুর কাছে বকুনি খেয়েছে, তবুও তার স্বভাব বদ্‌লাতে পারেনি।

লটারীর টিকিটের নাম শুন্‌লেই সে আগে গিয়ে টিকিট কিন্‌তো—যতই তা'র হোক্ না কেন। এরজন্য অণিমা কত দিন তা'কে বলেছে,—'এত দিন তো টিকিট কিনে ঘরে জঞ্জালের রাশিই বাড়িয়েছো, কোনো দিন তো একটা আধ্‌লাও তোমার উঠ্‌লো না, তবে আর কেন শুধু শুধু টাকাগুলো নষ্ট করা; এতে যে লক্ষ্মী তাঁর দেখে রুষ্ট হ'য়ে ছেড়ে চলে' যাবেন।'

ভাগ্যধর হেসে অণিমার চিবুক ধরে' মুখটা উঁচু করে' বল্‌তো,—'লক্ষ্মীকে করবার ফন্দিতেই তো এই চার ফেলা। তা' তাঁকে যদি ধর্‌তে নাই পারি, এই লক্ষ্মীটির করুণা যত দিন আমার উপর থাকবে ততদিন আমি লক্ষ্মীছাড়া হবার ভয় করি না।'

এই উত্তরে অণিমা লজ্জায় রাঙা হ'য়ে উঠ্‌তো। ভাব্‌তো—ওগো, আমি যে লজ্জা থেকে তোমাকে আর আড়াল করে' ঘিরে রাখ্‌তে পার্‌ছি না।—কিন্তু লজ্জা ফুটে বেশী কিছু বল্‌তে পার্‌তো না। কারণ সদা-প্রফুল্ল ভাগ্যধর তা'কে এমন জব্দ ভাগ্যধরকে লজ্জা হ'তে বাঁচাতে গিয়ে ভাগ্যধরের কাছে নিজের লজ্জা ঢাকবার য় হ'য়ে পড়্‌তো।

কাজেই অণিমা বাইরের সমস্ত লজ্জাকে নিজের মধ্যে টেনে নিয়ে, লজ্জাবতীর মতই ক্রমশঃ বাইরের কাছে সঙ্কুচিতা হ'য়ে পড়্‌ছিল।

আপিসে যাবার বেলা হয়েছে। বাঁধ দেওয়া জলের বাঁধ কেটে দিলে যেমন খুঁৎ খুঁৎ কর্‌তে লাগ্‌লো। প্রতিজ্ঞা কর্‌লে আর কোনো দিনও সে এরকম অন্যমনস্ক জলটা অসীম বেগে এক দিক দিয়েই বেরিয়ে যেতে থাকে, তেমনি এখন সমস্ত মনো হ'য়ে চল্‌বে না। আজ ভাগ্যদেবীর ছোট দান এড়িয়ে গেল, কাল হয়তো বড় রকমের ট্রাম গুলোর দুয়ারের দিকে প্রবলবেগে চল্‌তে আরম্ভ করেছে, যেন এতক্ষণ কোথা কিছু চোখ এড়িয়ে যাবে।

ছিল এখন হঠাৎ মুক্ত হয়েছে। ট্রামের পর ট্রাম চলেছে প্রায় জোড়া লেগেই। যে ট্রামে বেশী ভিড়, সেই ট্রামেই লোক উঠ্‌ছে বেশী করে, যেন ঐ ট্রামটা ছাড়া তা'র ঠিক পেছনেই প্রায় জোড়া লেগেই যেটা আস্‌ছে সেটাতে গেলেও দেরী হ'য়ে যাবে। কিন্তু দেরীর ভাবনা যত হোক বা না হোক পয়সা বাঁচানর উদ্দেশ্য নিয়েই ভিড়ের উপর ভিড় বাড়ানো।

ভাগ্যধর তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে সেদিন একটু সকালেই বেরিয়ে পড়েছিল। ট্রামে বা গাড়ীতে সে সাধ্যপক্ষে কোন দিনই চড়্‌তো না, পাছে কখন্ কোন্ মুহূর্ত্তে ভাগ্যের দান তা'র চোখ এড়িয়ে যায়। রাস্তা দিয়েই হেঁটে চলেছে, এমন সময় তা'র ছেলেবেলার বন্ধু কিরণের সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল।

কথা বল্‌তে বল্‌তে হঠাৎ কিরণ একটু সরে' গিয়ে ফুটপাথের ধারে প্রায় ভাগ্যধরের পায়ের কাছে একটা আধুলি আর একটা পয়সা মাটি থেকে কুড়িয়ে নিলে। ভাগ্যধরকে দেখিয়ে বল্‌লে—'ওহে, আজ বরাত ভাল। সকালেই কিছু লাভ হ'য়ে গেল।—বলেই ভাগ্যধরকে কুড়িয়ে-পাওয়া পয়সাগুলো দেখালে। জিজ্ঞাসা কর্‌লে,—'তোমার পকেট থেকে এগুলো পড়ে' যায়নি তো?'

ভাগ্যধর কিরণকে পয়সা কুড়িয়ে পেতে দেখেই কেমন চম্‌কে উঠ্‌লো, যেন তার ভাগ্য বিশ্বাস তা'কে চাড়া দিয়ে সজাগ করে' দিলে। সে যদি একটু চোখ চেয়ে ভাল করে' দেখ্‌তো তাহ'লে তো আর কিরণ পেতো না। একটু সামান্য ভুলের জন্যে কি বোকামিই না সে করেছে। কেন সে কিরণের সঙ্গে এমন অন্যমনে কথা বল্‌ছিল। ভাগ্যদেবী তো সেটা তা'র জন্যেই কার পকেট-চ্যুত করে' রেখে দিয়েছিলেন। তিনি তো আর কিছু হাতে তুলে দিতে পারেন না, তাঁর দান তো এই রকম করেই।

কিরণ যখন জিজ্ঞাসা কর্‌লে যে, পয়সাগুলো তা'র কিনা, তখন সে একবার ভাব্‌লে যে, বলে ওগুলো তা'রই পকেট থেকে পড়ে' গেছে। কারণ তারই প্রাপ্য জিনিষ, সামান্য একটু ভুলের জন্যে কিরণ কুড়িয়ে পেয়েছে। কিন্তু তখনই তা'র বিবেক তা'কে ধাক্কা মেরে বল্‌লে—ছিঃ! সামান্যর জন্যে মিছে কথা। তোমার জন্যে হয়তো ভাগ্যদেবীর এর চেয়ে কোনো বড় দান অপেক্ষা কর্‌ছে, সেই জন্যেই ইহা তুমি পাওনি। লোভ দমন কর। ভাগ্যধর পকেটে হাত দিয়ে দেখে বল্‌লে—'না ভাই, আমার পয়সা নয়।'

ভাগ্যধর সেদিন আপিসে গিয়ে মন দিয়ে কাজ কর্‌তে পার্‌লে না। মনটা কেমন

কর্ম্মক্লান্ত দেহটাকে টেনে নিয়ে যখন ভাগ্যধর বাড়ী এলো, তখন তা'র মুখ বিষাদের কালিমায় লিপ্ত হ'য়ে রয়েছে। অণিমা সাহস করে' কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারলে না। যত দুঃখে কষ্টে দিন চলুক না কেন ভাগ্যধরের মুখের প্রফুল্লতা কোনো দিনই নষ্ট হয় না। আজ এ কি!

অণিমা কিছু ভেবে না পেয়ে লীলাকে নিয়ে এসে ভাগ্যধরের কাছে ছেড়ে দিলে। ভাগ্যধর লীলাকে বুকের ভিতর চেপে ধরলে। প্রাণ যেন কতক শান্ত হলো। মুখের হারাণো প্রফুল্লতা আবার ফিরে এলো।

আশার লুব্ধ প্রলোভনে ভাগ্যধর এত দুঃখ কষ্টের ভিতরও তা'র মনকে খাঁটি মেরে প্রফুল্লতা বজায় রাখতে পেরেছিল, তা'র কারণ তা'র সবচেয়ে প্রিয় ছিল অণিমা আর লীলা। তাদের দেখলে সে তা'র ভাগ্য-বিশ্বাসকেও যেন প্রাণের কোন্ অন্ধকার গুহার ভিতর হারিয়ে ফেলতো। সমস্ত দিন খেটেখুটে যখন সে বাড়ী এসে অণিমার আর লীলার হাস্যোজ্জ্বল মুখ দেখতো তখন দিনের সব ভাবনা চিন্তাগুলো যেন যাদুকরের যাদুদণ্ডের স্পর্শে উড়ে যাবার বাজীর মত প্রাণ থেকে মুহূর্ত্তে কোথায় উড়ে যেতো। সে ভুলে যেতো যে, সে গরীব, এ পয়সার তার সংস্থান নেই, আজ যদি সে বসে' থাকে কাল তা হ'লে তা'র অবস্থা একেবারে দুঃখের সাগরের মাঝে এসে পৌঁছাবে। তবু সে সদাই আশার প্রলোভনেই প্রলুব্ধ হ'য়ে থাকতো।

রাত্রে যখন ভাগ্যধরের খাওয়া শেষে পান নিয়ে অণিমা ঘরে এলো, তখন ভাগ্যধর লীলার আবোল-তাবোল কথার জবাব দিয়ে চলেছে লীলার মতই বিরামহীনভাবে। অণিমা এসে তাদের দু'জনের কথার মাঝখানেই একটু কিন্তু হ'য়ে ভাগ্যধরকে জিজ্ঞাসা করলে—'কি তোমার শরীরটা ভাল নেই?'

ভাগ্যধর হেসে অণিমার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে বললে—'আমার মুখ দেখে বড় ভয় পেয়েছিলে, না? শরীর ভাল আছে, মন একটু প্রফুল্লতার রাস্তা গাম্ভীর্য্যের রাস্তায় ভুলে পা দিয়ে ফেলেছিল সেইজন্যে এই গোলমাল।' তারপর মুখটাকে খুব গম্ভীর করে' সে বললে—'তোমার উপর কখনো রাগবার অবসর পাইনে বলে' আজ ইচ্ছে তোমার উপর একটু রেগেছিলাম।'—বলেই অণিমাকে লজ্জা-চকিত করে' উচ্চহাস্যে ভরিয়ে তুললে।

(২)

সংসারে এমন এক এক জন লোক থাকে, যারা নিজেকেই বাইরের সব জিনিষের বড় করে' দেখে; নিজেকেই নিজের একমাত্র লক্ষ্য করে' রাখে। নিজের পরিচয় নিতে কি এতই সস্তা যে, জানি বললেই জানা হ'য়ে গেল। তা'রা ভুলে যায় যে, বাহ্য জগতের তাদের কোথায় কোন্ এক সূক্ষ্ম তার দিয়ে সংযোগ আছে। অর্জ্জুন যেমন লক্ষ্যভেদ দেবার সময় শুধু পাখীর চোখটুকুই দেখেছিলেন, সে রকম ক'রে, নিজেকে দেখলে

না। নিজেকে দেখতে হ'বে, যেমন করে' দুর্য্যোধন প্রভৃতি শুধু পাখীটাকে না দেখে, পাখীটার সঙ্গে গাছপালা, আত্মীয় অনাত্মীয়, বন্ধু বান্ধব, সকলকেই দেখেছিলেন তেমনি করে'। তবেই নিজেকে ঠিক বোঝা যাবে। নিজের কাছ থেকে নিজেকে আড়াল করে' রাখতে গেলে কেবল বিড়ম্বনাই বেড়ে যাবে, নিজের পরিচয় কিছুই পাওয়া যাবে না।

ভাগ্যধরও তেমনি নিজেকেই নিজের লক্ষ্য মনে করে' বাইরের কাছে নিজেকে আড়াল করে' রাখতো বলে,' নিজের খবরটুকু ছাড়া বাইরের কোনো খবরই রাখতো না।

রেলগাড়ী চলবার সময় নিজের গন্তব্য স্থানে আসবার খবর ছাড়া আর কিছুই খোঁজ রাখেনা। কোন্ লাইন দিয়ে তা'কে যেতে হ'বে, সে বিষয়ে সে নিশ্চিন্ত থাকে এক অজানা অচেনা লোকের কলের টিপুনির উপর। ভাগ্যধরও তা'র সমস্ত ভাবনা চিন্তার ভার ভাগ্যদেবীর উপর অগাধ বিশ্বাসে ন্যস্ত করেছিল।

তা'র ভাগ্য-বিশ্বাস তা'কে না-পাওয়ার কাছ হ'তে অসীম বেগে পাওয়ার দিকে টেনে নিয়ে চলেছে, ঠিক যেন গ্রহ উপগ্রহের নির্দ্দিষ্ট উদ্দাম গতির মত। কি একটা অজানিত আকর্ষণে যে সে ছুটে চলেছে, তা' সে নিজেই জানে না। তবু সে ক্রমাগত চলেছে পাওয়ার আনন্দলাভের জন্যে। মনের গতি সব লাভ লোকসান খতিয়ে দেখবার বাইরে গিয়ে পৌঁছেছে। আছে শুধু পাওয়া আর পাওয়া। সংসারও তো এই পাওয়ার আনন্দেই সব সময়ই মেতে আছে। এই তো হ'লো জাগতিক নিয়ম। ভাগ্যধরকেও এ নিয়ম ডিঙিয়ে যাবার ক্ষমতা দেওয়া হয়নি।

ভাগ্যধর সেদিন হঠাৎ একটু অতিমাত্রায় প্রফুল্ল হ'য়ে উঠেছিল। কোনো ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীকে সামনে বাঁধ দিয়ে বেঁধে দিলে, সে যেমন ফুলতে ফুলতে এক সময়ে বাঁধ উপ্‌ছে পড়ে', ভাগ্যধরের আনন্দও আজ তেমনি তা'র সারা দেহে উপ্‌ছে পড়েছে। তা'র চলায়, বলায় আনন্দ-রশ্মি বিচ্ছুরিত হ'য়ে পড়ছে, চক্‌মকি পাথরে ইস্পাত-ঠোকা আগুনের স্ফুলিঙ্গের মত।

কিছুদিন আগে সে আপিসের বড় সাহেবের মারফত্ কি একখানা বড় রকমের লটারীর টিকিট কিনেছিল। আজ সেই টিকিটের নম্বর ওঠার খবর পাওয়া যাবে। সকালেই সে শুক ভাগ্য-গণকের কাছে বেশ মোটা রকমের দক্ষিণা দিয়ে গুণিয়ে দেখেছে যে, প্রথম পুরস্কারটা নিশ্চিত তা'রই কপালে উঠ্‌বে,—এর কিছুতেই অন্যথা হ'বে না। তাই তার এত আনন্দ।

গণক-বাড়ী হ'তে ফিরে এসে এক মুখ হেসে অণিমাকে ডেকে বললে,—'রাণী, আজ আমায় একটু সকাল করে' ভাত দিয়ো তো—একটু দরকার আছে। বিকেল বেলা এসে তোমায় একটা সুখবর দেবো। আমায় কিন্তু বক্‌শিস্ দিতে হ'বে।'

কোনো রকমে নাকে মুখে চারটি ভাত গুঁজে ভাগ্যধর তাড়াতাড়ি আপিসে যাবার জন্যে বেরিয়ে পড়লো। রাস্তায় একমনে ভার্‌তে ভাব্‌তে চললো, কি রকমে টাকাগুলো খরচ করা এত তন্ময় হ'য়ে ভাব্‌তে ভাব্‌তে চলেছে যে, তার আশপাশে কি হচ্ছে না হচ্ছে তার হুঁস নে

'এ'বাবু দেখ্‌কে যাতা নেই—আন্ধা হ্যায় কা',—বলে' একটা ঝাঁকা মুটে ভাগ্যধরকে ধরে খুব জোরে একটা ঝাঁকানি দিয়ে দিলে। ভাগ্যধরের চমক ভেঙে গেল। দেখ্‌লে তা'র ধাক্কা লেগে মুটেটার এক ঝাঁকা বই মাথা থেকে পড়ে' গিয়ে রাস্তাময় ছড়িয়ে গেছে। এত কাণ্ড হ'য়ে গেছে তবু তা'র হুঁস হয়নি, এমনি তন্ময় হ'য়ে সে পথ চলেছে। ভাগ্যধর তাড়াতাড়ি পকেট থেকে একটা আধুলি বার করে' দিয়ে মুটেটার পিঠ চাপ্‌ড়ে বল্‌লে,—'কসুর হো গিয়া ভাই মাপ করো'। —বলে' আবার হন্ হন্ করে' চল্‌লো। কিন্তু মন কেমন মুস্‌ড়ে গেল এই বাধা লাগার দরুণ।

সেদিন আপিসে বসে' ভাগ্যধর কিছুই কাজ কর্‌তে পার্‌ছিল না। কেউ লটারীর টিকিটে সম্বন্ধে কোনো কথা বল্‌ছে কি না শোনবার জন্যে তা'র কাণ উৎকর্ণ করে রেখেছিল। জল খাবার সময় হয় হয় এমন সময় বড় সাহেব বড় বাবুকে ডেকে পাঠালেন। বড় বাবুর এই অসময়ে সাহেবের ঘরে যাওয়াতে, ভাগ্যধর কলম ছেড়ে, কি ব্যাপার জান্‌বার জন্যে, চুপ করে' বসে' রইলো। তা'র মন কেবলই ছট্‌ফট্ কর্‌তে লাগ্‌লো, কখন এই শুভ সংবাদ এসে পড়ে'।

খানিক পরে বড় বাবু সাহেবের ঘর হ'তে এসে বল্‌লেন,—'ওহে, লটারীর টিকিটের দ এসেছে। তোমরা টিকিট গুলো নিয়ে এস।'

যারা টিকিট কিনেছিল সবাই বড় বাবুর কাছে টিকিট নিয়ে গেল। ভাগ্যধরও তা'র কম্পান্বিত হৃদয় নিয়ে বড় বাবুর কাছে উপস্থিত হ'লো। না জানি কার ভাগ্যে কি উঠ্‌বে, সবাই উদ্‌গ্রীব হ'য়ে কি হয় দেখবার জন্যে বড় বাবুর টেবিলের উপর ঝুকে পড়্‌লো। ভাগ্য সকলের পেছনে চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইলো।

বড় বাবু অন্য সকলের টিকিট এক এক করে' দেখে ফেরত দিয়ে দিলেন। তা'রা ম্লান মুখে দাঁড়িয়ে রইলো। সব শেষে বড় বাবু ভাগ্যধরের টিকিটখানা নিয়ে মিলিয়ে দে লাগ্‌লেন। হঠাৎ তাঁর মুখ প্রফুল্ল হ'য়ে উঠ্‌লো। তিনি সবাইকে ডেকে বল্‌লেন—'ে সবাই ভাগ্যধরকে ক্ষ্যাপাও, কিন্তু দেখ তা'র বরাতে তা'র টিকিটই প্রথম পুরস্কার পেয়ে কাল' যে টেলিগ্রামে নম্বর ওঠার খবর এসেছিল সেটা সকলের সাম্‌নে বের করে' দে নম্বর মিলে গেল চার হাজার পাঁচশ' একাত্তর।

ভাগ্যধরের মুখ আনন্দের আতিশয্যে হযোজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌লো। খুব বেশী আনন্দের ধাক্কাতেও লোক মরে যায়। কিন্তু ভাগ্যধর সে ধাক্কা সাম্‌লে নিলে। কা মন বাঁধা ছিল আশার চড়া-সুরের পঞ্চমে। এ ধাক্কা তো তা'র কাছে বাঁধা সুরের কাজেই তার ছিঁড়্‌লো না। তবু তা'র সমস্ত দেহ কেমন শিউরে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। বাতাসে, আলোতে, যেন আনন্দের পুষ্পবৃষ্টি হ'তে লাগ্‌লো, ভাগ্যধরের ইচ্ছে হ'তে লা তাকে ছুটোছুটি কর্‌তে। কিন্তু নিজেকে সাম্‌লে নিলে। কারণ তা'র কাছে পাওয়াটা দেবা সত্য, না-পাওয়াটা কিছুই নয়। কাজে বস্‌লো মাত্র, মন দিতে পার্‌লে না।

ছট্‌ফট্ কর্‌তে লাগ্‌লো কখন্ বাড়ী গিয়ে অণিমাকে খবর দেবে। আর যারা তা'কে ঠাট্টা করে তাদের দেখাবে তা'র ভাগ্যের জোর কত। কেবলই প্রতীক্ষা কর্‌তে লাগ্‌লো কখন্ ছুটি হ'বে। আজ সে ঘাড় সোজা করে' গর্ব্বান্বিত হ'য়ে বস্‌লো। আপিসের সবাই দেখুক তা'কে বিদ্রূপ করার সার্থকতা কোথায়।

ছুটি হবার মিনিট দশেক আগে বড় বাবু সাহেবের ডাকে ঘর হ'তে চলে' গেলেন। কিছু পরে বিষণ্ণ মুখে একখানা টেলিগ্রাম এনে ভাগ্যধরের টেবিলের উপর ফেলে দিয়ে দুঃখের ভগ্ন-সুরে বল্‌লেন,—'ওহে, আগের নম্বরটা কেমন ভুল হ'য়ে টেলিগ্রাম হয়েছিল। এই নম্বরটা ঠিক চার হাজার পাঁচশ' সতরো।'

ভাগ্যধরের মুখটা প্রায় টেবিলে ঠুকে যাবার উপক্রম হ'লো। যে আনন্দ এতক্ষণ তা'র প্রাণে উদ্দাম শিশুর মতন নৃত্য কর্‌ছিল, তা' এক মুহূর্ত্তে কোথায় মিলিয়ে গেল, ঠিক শিশুর বিভীষিকা দেখে মায়ের আঁচলের মধ্যে লুকোনর মত। আকাশে, বাতাসে, আলোয় যে আনন্দের পুষ্প বরিষণ সে দেখ্‌ছিল, সেগুলো এখন রং বেরংয়ের হরেক রকমের মূর্ত্তি ধরে' তা'র চারিপাশে ভূত প্রেতের মত নৃত্য করে' বেড়াতে লাগ্‌লো। তার মনে হ'তে লাগ্‌লো যে, তা'র ভাগ্য-ঈর্ষান্বিত সহকর্ম্মীরা এখন তা'কে ব্যঙ্গের কৌতুক-চাহনির চাবুক খুব জোরে সপাসপ্ করে' মার্‌তে আরম্ভ করেছে। মাথার মধ্যে তালে বেতালে কত রকমের বাজ্‌না বেজে উঠ্‌লো রিম্ ঝিম্ করে'। সমস্ত মুখটা মড়ার মুখের মত সাদা ফ্যাকাশে হ'য়ে গেল। সেখানে তা'র বসে থাকা কেমন অসহ্য হ'য়ে উঠ্‌লো। বাতাস আলো যেন হঠাৎ অসম্ভব ভারী হ'য়ে উঠ্‌লো, তাড়াতাড়ি ছাতা চাদর নিয়ে সে রাস্তায় বেরিয়ে পড়্‌লো।

ভাগ্যধর তা'র পরিচিত রাস্তা দিয়েই বাড়ী ফির্‌ছিল। সকালে যে রাস্তা তা'র কাছে কত পরিচিত, কত আপনার মনে হয়েছে, এখন তাই যেন কত অপরিচিত, কত দূরে সরে' গেছে। পা' দু'টো যেন মাটির সঙ্গে জড়িয়ে যেতে লাগ্‌লো। যেখানে একবার পা ফেলে সেখান হ'তে কিছুতেই যেন উঠ্‌তে চায় না। যে প্রফুল্লতার পসরা নিয়ে সে সকালে আপিস গিয়েছিল, সে প্রফুল্লতা হারিয়ে তা'র স্থানে দুঃখের ভারী বোঝা মাথায় নিয়ে, বেলা শেষে সন্ধ্যাভারাক্রান্ত দিনের মত বাড়ী ফিরেছে। বৃষ্টি-ধোয়া খোয়া-বের-করা রাস্তাগুলো তা'কে যেন তা'দের দাঁত খিঁচিয়ে ভ্যাঙ্‌চাতে লাগ্‌লো। বাড়ীর কাছে এসে ভাগ্যধর থম্‌কে দাঁড়ালো। চুণবালী-খসা জীর্ণ বাড়ীখানা আজ তা'র চোখের সাম্‌নে বড় হ'য়ে ধরা পড়্‌লো। সেখানা যেন তা'র দৈন্যের জীর্ণ পঞ্জর খুলে দেখাচ্ছে যে, তা'র দৈন্য কত প্রবল। সন্ধ্যার ম্লান অন্ধকার বাড়ীটাকে আরো ভীষণ করে' তুলেছে। বাড়ীটার ছাদের এক কোণের আলিসার ধারে একটা প্রকাণ্ড অশথ গাছ মাথা খাড়া করে' উঠেছে, যেন মহাজন তা'র সমস্ত বল দিয়ে পেষণ করে' তা'র খাতকের সকল সত্তা ভেঙে চুরমার করে' দিতে চাচ্ছে।

ভাগ্যধর বাড়ী ঢুক্‌তে সাহস কর্‌ছিল না, যদি অণিমার সঙ্গে দেখা হ'য়ে যায়। তার যে বিকেলে শুভ সংবাদ এনে দেবে বলেছিল। আর অণিমাও হয় তো সেই আশাতে তা'র পথ চেয়ে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে বসে' আছে। এখন কি তা'কে এই মরণের মত সত্য দুঃখের সংবাদ দেবে।

ভাগ্যধর আস্তে আস্তে চোরের মত সন্তর্পণে বাড়ী ঢুক্‌লো অণিমার চোখ এড়িয়ে। অণিমা তখন রান্না ঘরে ছিল। ভাগ্যধর একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে, অন্ধকার ঘরের মধ্যে গিয়ে, আপিসের জামা কাপড় না খুলে, অবশভাবে শুয়ে পড়্‌লো।

(৩)

অণিমা যখন রান্না ঘরের কাজ সেরে ভাগ্যধর এসেছে কিনা দেখ্‌তে এলো, তখন ভাগ্যধর সেই রকম করে' শুয়ে আছে। অণিমা একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল। অন্যদিন ভাগ্যধর এসে লীলাকে ডেকে নিয়ে তা'র সঙ্গে খেলা করে; কিন্তু আজ এ রকম চুপ করে শুয়ে থেকে সেও ডাক্‌তে সাহস কর্‌লেনা। পাশে চুপ করে' বসে' থাক্‌তে থাক্‌তে সেও কখন ভাগ্যধরের পায়ের কাছে ঘুমিয়ে পড়েছে।

রাত যখন নিশীথ হ'য়ে উঠেছে, তখন ভাগ্যধর আস্তে আস্তে উঠে অণিমার মুখের দিকে তাকিয়ে একটা গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে, সামনের খোলা ছাদে এসে দাঁড়ালো।

অমাবস্যার স্তব্ধ নিশীথে আকাশে দীননেত্রে চেয়ে আছে শুধু তারার দল। মাঝে মাঝে এক একটা তারাদল থেকে আলোকের পুচ্ছ দুলিয়ে গভীর দীর্ঘ নিশ্বাসের মত পৃথিবীর উপর খসে' পড়্‌ছে। রাত্রিটাকেও জমাট বাঁধা দীর্ঘ নিশ্বাসের মত মনে হ'চ্ছে।

ভাগ্যধর ছাদে এসে পায়চারি করে' বেড়াতে লাগ্‌লো। তা'র মাথার মধ্যে যেন হাতুড়ির ঘা মার্‌ছে। দুঃখের ধাক্কা সইবার মত বল যে ক্রমশঃ তা'র হ্রাস হ'য়ে আস্‌ছে। ধাক্কাতো কম্‌ছে না। বরং ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মত অবিরাম গতিতে ক্রমাগত আস্‌ছে।

পুরাকালে দোষীর শাস্তি হ'তো রক্ত-রাঙা গরম লোহার মানুষকে জড়িয়ে ধরিয়ে। কষ্ট হোক না কেন দোষীকে সেটা জড়িয়ে ধর্‌তেই হ'তো,—পীড়নের বলে—মরণ আলিঙ্গনে পারেন। ভিতর যত কষ্টই লুকোন বা সামনে থাক না কেন, তা'কে জড়িয়ে ধর্‌তেই হ'বে—যদি আমরা সব সময় ঠিক অনুভব কর্‌তে পার্‌তাম তা'হ'লে তো দুঃখকে দুঃখ বলেই মনে হ'তো জেনেও। তা' ছাড়া যে আর উপায় নেই। দুঃখের ভিতর যে সত্য আছে, সেটাও পারি না বলেই তো যত গোল।

সেটা তো অবহেলা কর্‌বার উপায় নেই।

ভাগ্যধর আস্তে আস্তে গিয়ে ছাদের আলিসার উপর হাতের মধ্যে মাথাটা দাঁড়ালো, কত রকমের ভাবনা তা'র হৃদয়ের মধ্যে তরঙ্গায়িত হ'তে লাগ্‌লো, ঝড়ে তরঙ্গে মেলো ঢেউয়ের মত।

অণিমার হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতেই সে ধড়্‌ফড়িয়ে উঠে বস্‌লো, কিন্তু বিছানায় ভাগ্যধরকে দেখ্‌তে পেলে না। তাড়াতাড়ি তা'র খোঁজে বাইরে বেরিয়ে আস্‌তেই তা'কে ছাদের উপর দেখ্‌তে পেলে। আস্তে আস্তে এসে ভাগ্যধরের পিছনে চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইলো, ডাক্‌তে সাহস কর্‌লে না। অণিমার মনের মধ্যেও কম কষ্ট হচ্ছিল না। ভাগ্যধরের বিরস মুখ সে যত দেখ্‌ছিল, ততই তা'র প্রাণ হু' হু' করে' উঠ্‌ছিল। আকাশ যতক্ষণ গুমোট করে' থাকে ততক্ষণ প্রাণ কেমন হাঁপিয়ে উঠ্‌তে থাকে। একটা ঝড় হ'য়েও যদি আকাশ পরিষ্কার হ'য়ে যায় তাহ'লেও মন কতক যেন হাল্‌কা হ'য়ে যায়। আর যদি অমনি অমনি গুমোট কেটে যায় তা' হ'লে তো কথাই নেই।

ভাগ্যধর খানিক পরে খুব জোরে দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে হাতের মধ্যে থেকে মাথা তুলে, ঘরে আস্‌বার জন্যে পিছন ফির্‌তেই, মূর্ত্তিমতী শুভ্র সান্ত্বনার মত অণিমাকে দেখ্‌তে পেলে। অণিমার হাত ধরে' ঘরে এসে বিছানার উপর বসে' পড়্‌লো। অণিমা তা'র মুখের দিকে আকুল ব্যগ্র চাহনিতে চেয়ে রইলো, যেন তা'র চাহনির শান্তি বারি দিয়ে ভাগ্যধরের সমস্ত গ্লানি দূর করে' দিতে চায়। নিজের ক্ষমতার ক্ষুদ্রতা যখন নিজের কাছে বড় হ'য়ে ধরা পড়ে', তখন আর কোনো দিকেই কূল পাওয়া যায় না। সব হাল ছেড়ে দিতে হয়। কাজেই অণিমার এই চোখের সান্ত্বনা ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

ভাগ্যধর অণিমাকে সব কথা বল্‌বে কি না বল্‌বে ভাব্‌তে ভাব্‌তে সব কথাই খুলে বল্‌লে। বলে' যেন সে কতকটা স্বস্তি পেলে। যে দুশ্চিন্তাগুলো তা'র প্রাণের ভিতর ঢাকা থেকে, ঢাকা খুলে ফেল্‌বার জন্যে কেবলই মাথা চাড়া দিয়ে উঠ্‌ছিল—সেগুলো তা'কে আঘাত কর্‌ছিলই বেশী—এখন মুক্তি পেয়ে, যেন খোলা বাতাসের স্পর্শে হাল্‌কা হ'য়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ভাগ্যধরের প্রাণ থেকেও যেন একটা ভারী বোঝা নেমে গেল।

অণিমা কোনো সান্ত্বনার কথা খুঁজে পেলেনা। তা'র মন তখন করুণার পরিপূর্ণতায় সান্ত্বনা দেবার বাইরে চলে' গেছে। ভগবানও কি ভাগ্যধরকে নিয়ে এই রকম করে' দুঃখের নাগর দোলায় কেবলই ঘুর্‌পাক্ দোল খাওয়াবেন? কি ইষ্ট যে তার মধ্যে নিহিত আছে তা' কেবল তিনিই বল্‌তে পারেন। তাঁর ইষ্টের যে সাড়া আমাদের প্রাণের ভিতর প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হচ্ছে তা'র স্পন্দন যদি আমরা সব সময় ঠিক অনুভব কর্‌তে পার্‌তাম তা'হ'লে তো দুঃখকে দুঃখ বলেই মনে হ'তো পারি না বলেই তো যত গোল।

সেইদিন থেকেই ভাগ্যধর একেবারে সম্পূর্ণ বদলে গেল। তা'র সেই সদাপ্রফুল্ল ভাব প্রাণ থেকে একেবারে কোথায় চলে গেল, তা'র রেশটুকুও খুঁজে পাওয়া যায় না। লোকের সঙ্গেও সাধ্যপক্ষে দেখা কর্‌তো না। রাস্তায় যখন চল্‌তো তখন জোর করে' কোনো দিকে না তাকিয়ে ঘাড় সোজা করে' চল্‌তো। যদি কখনো তা'র বদ্ধমূল পাওয়ার আশা তা'কে রাস্তায়

ধাক্কা দিতো, সে তখনি দাঁতের উপর দাঁত দিয়ে নিজের মনকে বল্‌তো—'না ওসব আশা আর চল্‌বে না। সোজাসুজি চল।'

আপিসে গিয়ে সে ঘাড় গুঁজে নিজের কাজ করে' যেতো, কোনো দিকেই তাকাতো না। লোকের সঙ্গে কথা কইতে কেমন লজ্জা কর্‌তো। আপিসে যখনই দু'চারজনে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা কইতো তখনই তা'র মনে হ'তো যে, তা'রা তা'র কথা নিয়েই হয়তো বিদ্রূপের ঢেউ খেলিয়ে দিচ্ছে। সে তাড়াতাড়ি নিজেকে সরিয়ে নিয়ে আড়াল কর্‌তো। যেন কি একটা মস্ত দোষ করেছে। টিকিটের এই নম্বর বদলটা যেন তা'র দোষেই হয়েছে!

শীতের সন্ধ্যার কুয়াসা ঢাকা অন্ধকারে পৃথিবীকে ঠিক ছানিপড়া চোখের ঝাপসা দৃষ্টির মত দেখাচ্ছে। রাস্তার গ্যাসের আলোগুলো জ্বলি কি না জ্বলি করে' মিট্ মিট্ করে' জ্বলে নেত্রে চেয়ে আছে। সমস্ত জিনিষের ভিতরেই যেন একটা জড়তার সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। কুকুরগুলো কুণ্ডলী পাকিয়ে ময়রার দোকানের বড় উনানের হাওয়া যাবার খোলা মুখের কাছে চোখ বুঁজে শুয়ে আছে। পাশে লোক এসে দাঁড়ালে অতি বিরক্তিভরে মিট্ মিট্ করে' দেখ্‌ছে। যেন বল্‌ছে—'আঃ! সরে' দাঁড়াও না বাপু। একটু আরাম কর্‌বার উপায়ও তোমাদের জ্বালায়।'

ভাগ্যধরের সেদিন আপিসে কাজের জন্যে দেরী হ'য়ে গিয়েছিল। রাস্তা সংক্ষেপ করার জন্যে একটা সরু গলি দিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ী চলেছে। গলিটায় আলো আবছায়া অন্ধকার। হঠাৎ তা'র গায়ে লেগে কি একটা জিনিষ ঠিক্‌রে গড়িয়ে গেল। তা'র মজ্জাগত পাওয়ার আশার কুহকে ঝুঁকে সেটা কুড়িয়ে নিতে গিয়েই, ছিলা ধনুকের মত সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে, সেটার দিকে না তাকিয়েই খুব জোরে পা চলে' গেল।

ভাগ্যধরের মনটা কিন্তু কেমন খুঁৎ খুঁৎ কর্‌তে লাগ্‌লো—জিনিষটা কি একবার দেখা দোষ কি? কুড়িয়ে নেওয়া না নেওয়া পরের কথা। আবার ভাব্‌লে, না দেখ্‌লে হয়তো কুড়িয়ে নিতে ইচ্ছে হ'বে, কাজ নেই ফিরে। এই রকম যাবে, কি না যাবে ভাব্‌তে নিজের অজ্ঞাতসারে কখন্ এসে যে সেই ঠিক্‌রে-পড়া জিনিষটার কাছে তা' সে নিজেই জান্‌তে পারেনি। চারিদিকে চেয়ে দেখ্‌লে কেউ দেখ্‌ছে কিনা আস্তে আস্তে সেটা কুড়িয়ে নিয়েই পকেটে ফেলে বাড়ীর দিকে রওনা হ'লো। করে' দেখ্‌তেও সাহস হ'লো না, কি জিনিষ।

বাড়ী এসে নিজের ঘরে বসে' ভাব্‌তে লাগলো—সেটা পকেট থেকে দেখ্‌বার আগে—হয়তো আবার কি বিফলতার ব্যঙ্গ তা'র মধ্যে লুকিয়ে আছে কোলে মরণ-রূপী বিদ্যুৎ যেমন সেই রকম হয়তো এক মুহূর্ত্তে চিকণা

বল্‌সে প্রাণটাকে প্রলয় গর্জ্জনে ধ্বংসে দিয়ে যাবে। যাক্, তবু সে দেখ্‌বে কি পেয়েছে। আস্তে আস্তে পকেট থেকে বের করে' দেখ্‌লে, একটা কাগজ গোল করে' গুটিয়ে ফর্সা কাপড়ের টুক্‌রোয়, যত্নের সঙ্গে বাঁধা। কাপড়টা খুলে দেখ্‌বার সাহস হ'লো না কি জানি কি বেরিয়ে পড়্‌বে। কিন্তু তবু তা'র মনে কেমন আশা হ'লো, এবার সে কিছু সত্য জিনিষই কুড়িয়ে পেয়েছে। বিফলতাই তো সার্থকতার সোপান।

অণিমাকে ডেকে বল্‌লে—'এটা রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছি। বেশ ভাল করে' বাক্সে তুলে রেখে দাও। হয়তো আমার সৌভাগ্য বাড়াবার জন্যে কার পকেটচ্যুত হ'য়ে পড়ে গেছে' —বলেই হো হো করে' হেসে উঠ্‌লো। তারপর বল্‌লে—'কেউ যদি খোঁজ করে' তো তা'কে ফিরিয়ে দিতে হ'বে।'

অণিমা সেটা হাতে নিয়ে ভাগ্যধরের দিকে একবার করুণাভরা দৃষ্টিতে চেয়ে দেখ্‌লে। তা'রও কেমন এবার মনে হ'লো এবারকার পাওয়াটা আর কিছুতেই বিফল হ'বে না, বারবারকার বিফলতার শেষ এবার সার্থকতায়। খুলে কি আছে দেখ্‌বার কৌতূহল দমন করে' বাক্সে যত্ন করে' তুলে রাখ্‌লে।

ভাগ্যধরের সেই দিন থেকে কাজ হ'লো প্রত্যেক খবরের কাগজের হারাণো ও পাওয়ার ঘরটা খোঁজ করা, কেউ কোনো, তা'র পাওয়া জিনিষের মত, কিছু হারিয়েছে কিনা। মাসের পর মাস সে খবরের কাগজ দেখে যেতে লাগলো, কিন্তু কোনো খবরই পেলে না। শেষ কালে নিজে খরচ করে' খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে, তারও কোনো জবাব পেলে না। তখন হতাশভাবে সেটাকে বাক্সে ফেলে রেখে দিলে; যদি কখনো দরকার হয় তখন দেখ্‌বে এই ভেবে সে উপস্থিত দেখার কৌতূহলকে দমন কর্‌লে। শেষে প্রায় সেটার কথা এক রকম ভুলেই গেল।

সেদিন আপিস থেকে এসে ভাগ্যধর যখন লীলাকে ডেকে বাড়ী ঢুক্‌লো, তখন লীলার মা অণিমা ঘর হ'তে বেরিয়ে এসে বল্‌লে—'তা'র বড় জ্বর হয়েছে, শুয়ে আছে। ভাগ্যধরের মনটা কি একটা অমঙ্গল আশঙ্কায় ছাঁৎ করে' উঠ্‌লো। রোজ সে আপিসে যাবার সময় লীলার চুমু নিয়ে তবে বেরুতো। আবার বাড়ী ঢুক্‌তেও লীলাকে ডেকে তা'র চুমু খেয়ে। আজও সকালে যথা নিয়মেই বেরিয়েছিল, বিকেল বেলা এই ব্যতিক্রম। সে গিয়ে লীলার কাছে ধপ্ করে' বসে' পড়্‌লো। লীলার গা তখন জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে, অজ্ঞানে শুয়ে আছে।

লীলার অসুখ ক্রমশঃ বেড়েই যেতে লাগ্‌লো। প্রায় দু'মাস হ'য়ে গেল তবু ভাল দিকে না গিয়ে খারাপের দিকেই অগ্রসর হ'তে লাগ্‌লো। ভাগ্যধর তা'র শেষ সম্বল পর্য্যন্ত খরচ করে' তা'কে ডাক্তার দেখাতে লাগলো। দু'মাস আপিস কামাই হওয়াতে সেখান থেকে তা'র চাকুরীটি পর্য্যন্ত গেছে। রোগের খরচ যোগাতে গিয়ে ভিটেটি পর্য্যন্ত বাঁধা পড়েছে।

সেদিন লীলার অসুখ বেড়ে একেবারে বাড়াবাড়ির শেষ সীমানায় এসে পৌঁছেছে। ডাক্তারকে ভাগ্যধর জিজ্ঞাসা করলে—'কেমন দেখ্‌লেন?' তিনি হেসে বল্‌লেন—'ভালই।' কিন্তু এ হাসি যে, কি ভালর হাসি তা' বাপের চোখে ধরা পড়ে' গেল। ডাক্তার বল্‌লেন অক্সিজেন গ্যাস দিতে। তখন এমন একটা পয়সা নেই যে, এক পয়সার সাগু আনে। অক্সিজেন আসবে কোথা হ'তে। একমাত্র ভগবানের কৃত অক্সিজেন ছাড়া অন্য অক্সিজেনের ভরসা তখন আর ছিল না।

অণিমা শুনে বল্‌লে—'এই চাবি নেও, আমার বাক্সে তুমি যেটা কুড়িয়ে পেয়েছিলে সেটা আছে, ছাখো যদি তা'র মধ্যে কিছু পাও।' অণিমা লীলাকে বুকে করে' বসে' রইলো। ভাগ্যধর অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠে' গেল। লীলাকে ছেড়ে যেতে তার মন সর্‌ছিল না। কে বল্‌ছিল লীলাকে আর দেখ্‌তে পাবে না।

বাক্স খুলে মোড়কটা বের করে' হাতে ধরে' স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইলো—খুল্‌বে ভাব্‌তে লাগ্‌লো। তারপর অন্যমনস্ক হ'য়ে খুলে ফেল্‌লে। কাপড়ের টুক্‌রোর বন্ধন হ'য়ে বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়্‌লো, তা'র ভাগ্যকে যেন ব্যঙ্গ করবার জন্যেই, কা'র ভাগ্যলিপি কোষ্ঠি। তখনি তা'র মনে পড়্‌লো যে, লোক মরে গেলেই তবে তা'র কোষ্ঠি ফেলে দে না জানি কোন্ মৃতের অমঙ্গলের কোষ্ঠি তা'র ঘরে অমঙ্গল বাড়াতে এসে ঢুকেছে।

ঠিক এমনি সময় অণিমা চীৎকার করে' পাশের ঘর হ'তে কেঁদে উঠ্‌লো—শীগ্‌গির এসো দেখ্‌বে লীলা যে আমাদের ছেড়ে চলে' গেল জন্মের মত।

ভাগ্যধরের কানে গলিত সীসের মত এই কান্না এসে ঢুক্‌লো। চোখের দৃষ্টি হ'য়ে গেল। পা' দু'টো মাটির সঙ্গে অসম্ভবভাবে জড়িয়ে গেল। সে পড়্‌তে পড়্‌তে গরাদ দু'টো দু'হাতে চেপে ধর্‌ল। কিন্তু মুখটা গরাদের উপর ঠুকে গেল। অবশ শিথিলভাবে ঝুলে পড়্‌লো। ছড়ানো কোষ্ঠিটা তা'র বুকের লেখাগুলো তা'কে উপহাস করতে লাগ্‌লো।

শ্রীপ্রেমোৎপল বন্দ্যো

বৈঠকী কথা

রাষ্ট্রীয় ভারত—হিন্দু ও মুসলমান

বৈঠকী কথায় উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

১। বিষ্ণুশর্ম্মা—যাঁর বাড়ীতে বৈঠক বসে।
২। ভজহরি—নৈষ্ঠিক নন্‌কো-ওপারেটর।
৩। শক্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়—স্বদেশী যুগের যুবক।
৪। হরিবিলাস চট্টোপাধ্যায়—সংবাদ পত্র সম্পাদক।
৫। কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়—বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।
৬। বিশ্বেশ্বর ঘোষ—পেন্‌সন্ ভোগী ডিপুটি।

ভজহরি—কই, আর কেউ ত এখনও আসেননি দেখ্‌ছি। দাদা, শক্তিপদ যে কি বলে তার মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারি না। আপনিও কি ভাবেন, হিন্দু-মুসলমানে এক না হলে আমরা কখনও স্বরাজ পেতে পারব?

বিষ্ণুশর্ম্মা—স্বরাজ কাকে বলে, আগে তাই ঠিক কর, তার পর এ কথার মীমাংসা হতে পারবে।

কৃষ্ণধন—(ঘরে ঢুকিয়া) ওঁরা ত স্বরাজ পেয়েছেনই। গান্ধী মহাত্মা আমেদাবাদের কংগ্রেসের পরে লিখেছিলেন যে সে কংগ্রেসে এমন অনেক লোক উপস্থিত ছিল যারা স্বরাজ পেয়েছে।

বিষ্ণুশর্ম্মা—স্বরাজ যদি একটা মনের ভাব হয়, তাহলে সে স্বরাজ লাভ করবার জন্য এতটা হুজুগ জাগাবার আবশ্যক নেই। কেবল চোখ বুঝে ভাবলেই ত হল, আমরা স্বরাজ পেয়েছি।

ভজহরি—ও ঠাট্টা তামসার কথা নয়, দাদা। সর্ব্বং আত্মবশং সুখং। সকল জিনিষকে নিজের আয়ত্তের ভিতরে আনতে হবে। এই দেখুন, আমরা এখন পরণের কাপড়খানার জন্য পর্য্যন্ত বিদেশীর মুখ চেয়ে থাকি। এই কাপড় যদি আমরা নিজে তৈয়ার করতে পারি, তাহলে জীবনের একটা অতি প্রয়োজনীয় জিনিষ সম্বন্ধে আমরা স্বাধীন হই না কি? তার পর খাওয়া সম্বন্ধে এখনও ভগবানের দয়ায় আমরা পরাধীন হই নাই। আমাদের দেশে যে ধান ও গম জন্মায়, তাই আমাদের প্রধান খাদ্য। বিদেশ হতে আমাদের খাদ্য আমদানী হয় না। খাওয়া পরা সম্বন্ধে যদি আমরা স্বাধীন হতে পারি, তাহলে একরূপ স্বরাজ আমরা পাই না কি? তার পর লেখাপড়া। এ বিষয়ে আমরা একান্ত পরাধীন হয়ে গেছি। ইংরেজের স্কুল-কলেজ না হলে আমাদের লেখাপড়া শেখা হয় না। নিজেরা যদি আমরা নিজেদের লেখাপড়া শিখিবার ব্যবস্থা করে নিতে পারি, ইংরেজের স্কুলে যদি না যাই, তাহলে লেখাপড়া সম্বন্ধেও আমরা স্বাধীন হই না কি? তারপর ইংরাজের আইন আদালত আমাদিগকে অষ্টপাশে বেঁধে রেখেছে। নিজেরা যদি নিজেদের মামলা-মোকদ্দমা মিটাইয়া লইতে পারি, ইংরেজের আইন আদালত পাপবোধে বর্জ্জন করতে পারি, আর নিজেদের সালিশী কমিটি গড়ে তুলে তাহার দ্বারা আমাদের নিজেদের

মধ্যে যখন যা বিবাদ ঘটে, তাহার বিচারের ব্যবস্থা করিতে পারি, তাহা হইলে ইংরাজের সঙ্গে
একরূপ আমাদের সকল সম্বন্ধই চুকিয়া যায়। এগুলি করে তুলতে পারলে আমাদের জীবনটা
আমাদের নিজেদের বশে আসে না কি? যে পরিমাণে আমরা এগুলি করতে পারি সেই পরিমাণে
আমরা স্বরাজ লাভ করি। মহাত্মার কথা মিথ্যা নয়। আমেদাবাদের কংগ্রেসে এমন অনেক লোক
উপস্থিত ছিলেন, যাঁরা বিলাতী কাপড় পরেন না, কোনও বিলাতী জিনিষ ব্যবহার করেন না,
ইংরাজের স্কুল ও আইন-আদালতের সঙ্গে যাদের কোনও প্রকারের সম্বন্ধ নাই। সত্যই ত তাঁদের
জীবনটা নিজেদের বশে এসেছে। তাঁরা যে স্বরাজ পেয়েছেন, এ কথা কি অস্বীকার করতে পারেন?

বিষ্ণুশর্ম্মা—পারি কি না পারি, নির্ভর করবে স্বরাজ কথার অর্থের উপরে। আগে তোমরা
স্বরাজের একটা কদর্থ করে নাও, তার পরে এই কদর্থটাকে ধরে জাহির কর যে স্বরাজ পেয়েছ।
মোট কথা, তোমরা স্বরাজ বলতে যা বুঝ, আমরা স্বরাজ বলতে তা বুঝি না, দেশের লোকে, তোমা
ছাড়া, কেউ তা বুঝে না।

কৃষ্ণধন—ওঁরাই কি তা বুঝেন? কেবল খদ্দর পরলে আর স্কুল-কলেজ ও আইন-আদা
ছাড়লেই যদি স্বরাজসিদ্ধি হয়, তাহলে মহাত্মাজীই বা কেন এই ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ কর
জন্য কোমর বেঁধে লেগে গেছেন।

বিষ্ণুশর্ম্মা—তাত সত্যই। ইংরাজ-শাসনকে নষ্ট করবার জন্যই ত এই নন্-কো-অপা
সংগ্রামের আয়োজন হয়েছে। ওঁরাও ত সকলেই ইংরাজ-রাজের উচ্ছেদকে স্বরাজ বলে
নিয়েছেন। এই যে শক্তিপদ—এস, তোমার জন্য আমরা বসে আছি।

শক্তিপদ—কি কথা হচ্ছিল?

বিষ্ণুশর্ম্মা—তোমার সেদিনের কথাটাই আবার উঠেছে। স্বরাজ লাভের জন্য হি
মুসলমানের এক হওয়া অত্যাবশ্যক কি না?

শক্তিপদ—স্বরাজলাভ অর্থ যদি ইংরাজ তাড়ান হয়, তার জন্য হিন্দু-মুসলমানে এক
যে একান্ত আবশ্যক নয়, সে কথাটা ত সে দিনই প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু এই
লাভ, অর্থাৎ ইংরাজ তাড়ান, আর ভারতবর্ষে একটা আধুনিক আদর্শে নেশন গড়ে তোলা এ
নয়; কেবল ইংরেজকে তাড়িয়ে ভারতবর্ষে একটা মোগল-রাজ বা পাঠান-রাজ, শিখ
গুর্খা-রাজ প্রতিষ্ঠিত করা অত্যন্ত কঠিন হইলেও একান্ত অসম্ভব নাও হতে পারে। কিন্তু
যাকে স্বরাজ বলে বুঝি, এই স্বরাজ লাভের জন্য হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটা ঐক্য
হওয়া অত্যাবশ্যক।

বিষ্ণুশর্ম্মা—তুমি স্বরাজ বলতে কি বুঝ?

শক্তিপদ—সে কথা ত অনেকবারই বলেছি। প্রথম, স্বরাজ বলতে আমি একটা রা
অবস্থা বুঝি না। স্বরাজ বলতে আমি একটা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাই বুঝি। আমার নিকটে

একটা বিশিষ্ট আকারের গভর্ণমেণ্ট বা শাসন প্রণালী। প্রত্যেক গভর্ণমেণ্টের পশ্চাতে একটা অনন্যপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির প্রতিষ্ঠা হয়। যার পিছনে এরূপ শক্তি নাই, তাকে আমরা গভর্ণমেণ্ট বলে বুঝি না। শাসন মাত্রেই শক্তির শাসন। All Government is, at the final analysis, based upon force.

ভজহরি—ও কথা আমরা মানি না। যে গভর্ণমেণ্ট শক্তির বা forceর উপরে প্রতিষ্ঠিত, তাহা শয়তানী গভর্ণমেণ্ট। আজ পর্য্যন্ত দুনিয়ার সব গভর্ণমেণ্টই শয়তানী গভর্ণমেণ্ট। এখনও এইজন্য সংসারে এত কাটাকাটি মারামারি লাগিয়াই আছে। ইহাই Government by force এর ফল। এরূপ গভর্ণমেণ্ট স্বদেশীই হউক বা বিদেশীই হউক, সবই পাপে পরিপূর্ণ। এইজন্য আমরা কোনও গভর্ণমেণ্টই চাই না। আমরা যা চাই, তা সত্য বলতে গেলে স্বরাজ নয় কিন্তু বৈরাজ। আমাদের আদর্শে পুলিশ পাহারা, সিপাহী-সান্ত্রী, আইন-আদালত, এ সকলের কোনও স্থান নাই। এই খানেই ত তোমাদের সঙ্গে আমাদের ঝগড়া।

শক্তিপদ—তা জানি। তোমাদের সঙ্গেও আমাদের এই খানেই ঝগড়া। তোমরা স্বরাজ চাও না; তোমরা একটা আজগুবীরাজ চাও। এ আজগুবীরাজ কোনও দিন দুনিয়ায় ছিল না। মানুষ যতদিন মানুষ আছে, ততদিন এই পৃথিবীতে এই আজগুবীরাজের প্রতিষ্ঠাও হবে না। এ সব কল্পনা ছেড়ে আমরা বস্তু চাই। আমরা স্বরাজ বলতে একটা বিশিষ্ট আকারের শাসন-ব্যবস্থা বুঝি। শাসন ব্যবস্থার বা গভর্ণমেণ্টের দুটো প্রধান অঙ্গ। একটা Legislative আর একটা Executive. গভর্ণমেণ্ট আইন করেন। এই আইন করার ব্যবস্থাকেই Legislative function বলি। আর এই আইন মতে রাজ্য শাসন করতে গেলে একটা Executive যন্ত্রেরও প্রয়োজন হয়। একদিক দিয়ে গভর্ণমেণ্ট আইন করেন। অন্যদিক দিয়ে এই আইন কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যথাযোগ্য রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত করেন। একদিকে ব্যবস্থাপকমণ্ডলী বা Legislative Councils বা Parliaments আর একদিকে রাজকর্ম্মচারীর দল বা Executive Councils বা Cabinets—এই দুই অঙ্গে সকল শাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠে। আর আমরা যাকে স্বরাজ বলি, তার প্রথম লক্ষণ এই যে রাজকর্ম্মচারীদল কিম্বা Executive Councils বা Cabinets ব্যবস্থাপক মণ্ডলীর কিম্বা Legislative Councils বা Parliaments এর সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিবেন। রাজা বা রাজকর্ম্মচারীরা নিজের খেয়াল মত রাজ্য শাসন করিতে পারিবেন না। ব্যবস্থাপক সভা বা Legislative Councils বা Parliaments যেভাবে রাজ্যের শাসন কার্য্যের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন, রাজা এবং রাজকর্ম্মচারীরা তাহাই মানিয়া চলিবেন। ইহাই আমরা যাকে স্বরাজ বলে জানি, তার প্রথম লক্ষণ। তার দ্বিতীয় লক্ষণ এই যে দেশে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিমাত্রেই এই ব্যবস্থাপক মণ্ডলীর বা Legislative Councilsএর বা Parliamentএর সভ্য নির্ব্বাচন করিবার অধিকার পাইবেন। সোজা কথায় দেশের সর্ব্বসাধারণের আম-মোক্তারেরা দেশের

আইন-কানুন তৈয়ার করিবেন। আর যে সকল রাজ-কর্ম্মচারী এই আইন কানুন দেশে চালাইবে
এবং এই সকল আইন কানুন মাফিক দেশের শাসন-সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিবেন, তাঁ
সকলে এই সকল আম-মোক্তারদের সভার অধীন হইয়া চলিবেন। এই যে শাসন-ব্যব
ইহাকেই আমরা স্বরাজ বলিয়া জানি। এখন আমাদের স্বরাজ নাই। কেবল ইংরাজ-রা
আমাদের শাসনের কর্ত্তা হইয়া আছেন বলিয়াই নহেন, কিন্তু দেশের লোকের নিজেদের শা
ব্যবস্থার উপর কোনও হাত নাই বলিয়াই এখন আমাদের স্বরাজ নাই। এই ইংরাজ-রাজ
গিয়া যদি একজন হিন্দু বা মুসলমান এ দেশের রাজা হন, এবং তাঁর হুকুম মত যদি রাজ
চলে, আইন-কানুন রচনাতে কিম্বা শাসন-কার্য্য পরিচালনাতে যদি দেশের জনসাধারণের ম
অধিকার না থাকে, তাহা হইলে কেবল হিন্দু বা মুসলমান রাজা হইয়াছেন বলিয়া আমরা য
পাইব না। মানুষ পরের হুকুম মানিয়া যতক্ষণ চলে বা চলিতে বাধ্য হয়, ততক্ষণ তার ম
বিকাশ পায় না, পাইতেই পারে না। সে হুকুম বিদেশী রাজার হুকুমই হউক, আর স্বদেশী
হুকুমই হউক, দুই'ই তার মনুষ্যত্বকে খাটো করিয়া রাখে। এইজন্য আমরা সেই স্বরাজ
যে স্বরাজ পাইলে কেবল ইংরাজ-রাজেরই অন্তর্ধান হইবে তাহা নহে, কিন্তু যাহাতে
শাসন ব্যবস্থার উপরে দেশের সর্ব্বসাধারণের অনন্য-প্রতিদ্বন্দ্বী অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবে।
স্বরাজ পাইতে হইলে আগে বা তার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতবর্ষে একটা নেশন গড়িয়া তুলিতে
এই নেশন গড়ার জন্য হিন্দু-মুসলমানে এক হওয়া অত্যাবশ্যক। ইংরাজ তাড়ানোর জন্য
মুসলমানের ঐক্য আবশ্যক নহে। এই কথাটা না বুঝিলে বর্ত্তমান হিন্দু-মুসলমান
প্রকৃতিটা যে কি, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে না।

কৃষ্ণধন—আপনি হিন্দু-মুসলমানকে এক করিবেন কি করিয়া? হিন্দু যা
মুসলমান তাই মন্দ বলে। মুসলমান যা ধর্ম্ম বলে, হিন্দু তাই অধর্ম্ম বলে পরিত্যা
এ অবস্থায় হিন্দু-মুসলমান এক হইবে কিরূপে?

শক্তিপদ—আপনি এখানে ধর্ম্মের দিক দিয়াই হিন্দু ও মুসলমানকে দেখিতেছেন
ধর্ম্মের সঙ্গে মুসলমান ধর্ম্মের বিরোধ আছে—

বিষ্ণুশর্ম্মা—এই বিরোধ কি কখনও যাবে?

শক্তিপদ—সে কল্পনা আমি করি না।

কৃষ্ণধন—হিন্দু কি কখনও মুসলমান হইয়া যাইবে? না মুসলমানই কখনও আপ
ছাড়িবে? আর হিন্দু এবং মুসলমান সকলে মিলিয়া আর একটা তৃতীয় ধর্ম্ম এ
এরূপ কল্পনাও ত করা যায় না।

শক্তিপদ—আমি এরূপ কল্পনা করি না। হিন্দু চিরদিনই হিন্দু থাকিবে
চিরদিনই মুসলমানই থাকিবে। অর্থাৎ নিজেদের ধর্ম্মসাধন সম্বন্ধে এবং সামাজিক আ

আদানপ্রদানাদি বিষয়ে হিন্দু আপনার ধর্ম্মশাস্ত্র মানিয়াই চলিবে। মুসলমানেও এসকল
বিষয়ে ইসলামের শাসন মানিয়া চলিবে। হিন্দুকে হিন্দু থাকিতে দিয়া, মুসলমানকে
মুসলমান থাকিতে দিয়া যদি ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানে ঐক্য না হয়, তবে কোনও
দিনই ভারতবর্ষে একটা আধুনিক আদর্শে নেশন প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। হিন্দু-মুসলমানের
ঐক্য ধর্ম্মের ভূমিতে হবে না; সমাজের ভূমিতেও হবে না। হবে কেবল নেশনত্বের ভূমিতে। হিন্দু
এবং মুসলমান আপনাদের রাষ্ট্রিয় জীবন বা political life'কে এই নেশনত্বের বা nationalism'এর
ভিত্তির উপরে গড়িয়া তুলিতে পারিলেই কেবল এই হিন্দু-মুসলমান সমস্যার একটা মীমাংসা
সম্ভব। এ না পারিলে ভারতবর্ষে কোনও দিন নেশন গড়িবেনা। নেশন না গড়িলে ভারতবর্ষে
স্বাতন্ত্র্য এবং স্বরাজেরও প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে না।

ভজহরি—তোমরা কি তবে ভারতবর্ষে একটা patriotic national state গড়ে তুলতে
চাও? য়ুরোপ এই patriotic national state গড়তে গিয়ে দুনিয়ায় কি অশান্তি ও উপদ্রব এনেছে,
ইতিহাস তার সাক্ষী। ভুক্তভোগী য়ুরোপের রোমা রোলা প্রভৃতি বড় বড় মনীষীরা এখন এই
patriotic national stateএর আদর্শের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করেছেন। য়ুরোপ যাকে বিশ্বের
একটা বিরাট উপদ্রব বলে বর্জ্জন করতে উদ্যত হয়েছে, আমরা কি তাকেই আমাদের উদ্ধারের
উপায় বলে এদেশে বরণ করিয়া লইব?

শক্তিপদ—দেখ, ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয়ে ছুটিয়া পলায়। তার পক্ষে
এটা স্বাভাবিক। কিন্তু বাস্তবিকই ঐ সিদুঁরে মেঘ বিশ্বে আগুন লাগাইয়া দেয় না। এই
দুনিয়ায় যা কিছু ভাল হয়েছে, তারই বাড়াবাড়িতে আবার অনেক অমঙ্গলও ঘটেছে। ধর্ম্মে
মানুষকে পশুত্বের ভূমি হতে ক্রমে দেবত্বের ভূমিতে তুলিয়া লইয়াছে। আবার এই ধর্ম্মেরই
অপব্যবহারে দুনিয়ার অশেষ অমঙ্গলও ঘটেছে। ধর্ম্মের নামে মানুষ মানুষের উপরে অকথ্য
অত্যাচার করেছে। কিন্তু তাই বলে কি ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করতে হবে? আগুনে ঘর পুড়িয়া
যায়। কিন্তু তাই বলিয়া কেউ এমন কথা বলেন না যে আগুন কখনও ব্যবহার করতে হবে না।
Patriotismএর অপব্যবহার দুনিয়ায় অনেক হয়েছে; এখনও হচ্ছে। ভালবাসার অপব্যবহার
দিবারাত্র চারিদিকে দেখতে পাচ্ছি; কিন্তু তাই বলে ভালবাসাটা মন্দ, একথা বলব কি? বাৎসল্যের
অপব্যবহারে অশিষ্যে কত লোকের অনিষ্ট হয়, কিন্তু তাই বলে বাৎসল্যের সাধন কেউ করবে না? মাধুর্য্যের
অপব্যবহার দুনিয়াময় দেখতে পাই। ইহার ফলে কত সোনার সংসার ছারখার হয়েছে। দেবতার
কৃপা যে মানুষ সে পশু হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া কেউ কখনও মাধুর্য্যের অনুশীলন পাপ,
একথা বলে কি? সংসার-বন্ধনকে যারা শয়তানের ফন্দি বলে, সে সকল মর্কট-বৈরাগী ভিন্ন
আর কেউ এসংসারের বাৎসল্য সখ্য মাধুর্য্যকে পাপ বলে বর্জ্জন করতে বলে না। Patriotismএর
অপব্যবহার হচ্ছে বলে ইহাকে বর্জ্জন করতে হবে, এমন কথা কে বলবে?

Nationalismএরও অপব্যবহার হয়েছে, হচ্ছে। দুনিয়াময় হচ্ছে। অথচ এই nationalismএর সাধন এবং শাসন ব্যতিরেকে পূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশও যে হয় না, এই কথাটাই বা অস্বীকার কর কেমনে? মানুষ আপনার পরিবারের সঙ্গে মিলেমিশে পরিবার পরিজনের সেবায় নিযুক্ত হ আপনার জীবনকে ফুটিয়ে তুলে। পারিবারিক জীবনে এবং ধর্ম্মসাধনে মানুষের স্বার্থ-প্রবৃ সঙ্কুচিত হয়। ইন্দ্রিয়-লালসা সংযত হয়। পরমার্থমুখিনী বৃত্তিসকলের অনুশীলন হয়। আমাদে কর্ম্মের সুখ এবং সেবার পরিসর বাড়িয়া যায়। আবার এই পারিবারিক সম্বন্ধ এবং গৃহধর্ম্ম ক্ষেত্র ছাড়াইয়া বহু পরিবারের মিলনে যে সমাজ গঠিত হয়, সেই সমাজের সঙ্গে আমাদের যে সম্ব তাহার অনুশীলনের দ্বারা আমাদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থের গণ্ডী ভাঙ্গিয়া যায়, এবং পরার্থপ্রবৃ বৃত্তি সকলের আরও বিস্তৃত অনুশীলন হয়। বহু পরিবারের মিলনে যেমন সমা সৃষ্টি হয়, সেইরূপ বহু সমাজের মিলনে এক একটা নেশন গড়িয়া উঠে। সমাজ-ধ দ্বারা আমাদের মনুষ্যত্বের যে বিকাশ হয়, নেশন-ধর্ম্মের বা nationalismএর অনুশী তার চাইতে বেশী বিকাশ হয়। এই নেশনত্বের ভূমিতে আমাদের পরার্থমুখিনী সকল আরও বিস্তৃত ক্ষেত্রে যাইয়া ফুটিয়া উঠে। এইরূপে নেশন-ধর্ম্ম বা nationa আমাদের মনুষ্যত্ব সাধনের সহায়তা করে। এই নেশনধর্ম্মের বা nationalismএর উপর এইখানে। মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশে যেমন পরিবার-ধর্ম্মের একটা স্থান আছে, স এবং সমাজ-ধর্ম্মের একটা স্থান আছে, সেইরূপ নেশনের ও নেশনধর্ম্মেরও একটা স্থান ব্যক্তির শক্তি, সাধ্য, কল্যাণ এবং বিকাশ বা উন্নতি পরিবারের উন্নতির উপরে নির্ভর এইজন্য ব্যক্তিগত স্বার্থ সঙ্কুচিত করিয়া পরিবারের সেবা করিতে হয়। যেখানে স্বার্থের সঙ্গে পরিবারের সমষ্টিগত স্বার্থের বিরোধ, সেখানে ব্যক্তিগত স্বার্থকে উপেক্ষ পরিবারের সমষ্টিগত স্বার্থের প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। না করিলে, পরিবারের স্বার্থহানির ব্যক্তিরও স্বার্থ ও সার্থকতা সিদ্ধির সম্ভাবনা নষ্ট হয়। এইরূপ পরিবারের শক্তি, স্বার্থ সমাজের শক্তিসাধন, স্বার্থ ও উন্নতির উপরে নির্ভর করে। এইজন্য পরিবারের স্ব করিতে যাইয়াই সঙ্কীর্ণ পারিবারিক স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া সমাজের সমষ্টিগত স্বার্থ সাধ করিতে হয়। আবার সমাজের উপরে নেশন। এখানেও সেই নিয়মই খাটে। ক্ষুদ্রতর স্বার্থকে সঙ্কুচিত করিয়া সমাজের আত্মরক্ষা এবং আত্মচরিতার্থতা লাভের জন্য সমষ্টিগত শক্তিসাধন এবং স্বার্থরক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হয়। এইরূপে আপনাকে বাড়াইয়া তুলে। এই ভাবেই উত্তরোত্তর উদারতর ভূমিতে যাইয়া মানুষ ক্রমে বিশ্বজনীন মৈত্রীর ভূমিতে যাইয়া উঠে। মনুষ্যত্ব সাধনে এইজন্য নেশনত্বের বা nation একটা বিশিষ্ট উচ্চস্থান আছে। এই কথাটা ভুলিলে চলিবে কেন? ভারতবর্ষে অতি হইতেই একটা বিরাট সমাজ গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা হইয়াছে। ভারতবর্ষের এই বি

নাম হিন্দু সমাজ। এই সমাজের ভিতরে ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন গোষ্ঠী বা মণ্ডলী আসিয়া মিলিয়াছে। হিন্দু আপনার বর্ণাশ্রমের ছাঁচে ঢালিয়া শক, হূন, মৌর্য্য প্রভৃতি বিদেশীয় ও ভিন্ন সমাজের লোককে আপনার সমাজভুক্ত করিয়া লইয়াছে। মুসলমান এদেশে আসিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এইভাবেই ভারতবর্ষে নেশনও গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই নেশন ছিল হিন্দু নেশন। বর্ণাশ্রমের ছাঁচে ঢালাই করিয়া সকল অভ্যাগতদিগকে আমাদের প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষেরা হিন্দু সমাজ বা হিন্দু-নেশনভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। এটা সম্ভব হয়েছিল এইজন্য যে সে সকল অভ্যাগতেরা খৃষ্টান বা মুসলমান ধর্ম্মের মত একটা মতবদ্ধ শাসনের দ্বারা শাসিত হন নাই। মুসলমানেরা যখন এদেশে আসিলেন, তখন হইতে ভারতবর্ষে সমাজ ও নেশন স্বতন্ত্র হইয়া উঠিতে লাগিল। তখন সমস্যা হইল এই—কি করিয়া এই ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী, ভিন্ন সমাজশাসনাধীন ভারতবাসীদিগকে হিন্দুর সঙ্গে মিলাইয়া একটা নেশন গড়িয়া তুলিতে পারা যাইবে? মুসলমান আমলে এ সমস্যা উঠে নাই। তখন কেবল এদেশে কেন, পৃথিবীর কুত্রাপি আধুনিক নেশনত্বের বা nationalismএর আদর্শ প্রকাশিত হয় নাই। এই আদর্শটা ইংরাজ আমলেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভারতবর্ষে কি করিয়া একটা নেশন গড়িয়া তুলিতে পারা যায়, ইহাই বর্ত্তমানে আমাদের প্রধান রাষ্ট্রীয় সমস্যা। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা যেভাবে প্রাচীনকালে বিরাট হিন্দু সমাজকে গড়িয়া তুলিয়াছেন, সেভাবে আধুনিক ভারতবর্ষে একটা বিরাট নেশন গড়া সম্ভব নহে। আধুনিক ভারতবর্ষে অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের এবং ভিন্ন ভিন্ন সমাজের স্থান হইয়াছে। এ সকলকে বর্ণাশ্রমের ছাঁচে ঢালিয়া আগেকার মতন এক করা সম্ভব নহে। আবার অন্যদিকে হিন্দু সমাজের সনাতন ছাঁচকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া মুসলমানী বা খৃষ্টিয়ানী ছাঁচেও ঢালাই করা সম্ভব নহে। এ অবস্থায় ভারতবর্ষে নেশন গড়িতে হইলে হিন্দুকে হিন্দু রাখিয়া, মুসলমানকে মুসলমান রাখিয়া, খৃষ্টিয়ান্‌কে খৃষ্টিয়ান্ রাখিয়াই ইহাদের মধ্যে একটা ঐক্য বাঁধিতে হইবে।

কৃষ্ণধন—এইত সমস্যা। আর এর মীমাংসাত আদৌ সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না।

শক্তিপদ—ধর্ম্মের উপরে এ ঐক্য হইতেই পারে না, হবে না। আর সমাজ-ব্যবস্থাও ধর্ম্মেরই অনুগত, তখন হিন্দুদিগের মধ্যে যেমন পন্থা বিভাগ আছে, সেইরূপ একটা ঈশাই-পন্থা, একটা মহম্মদী পন্থা, এইরূপ ভাবে সাধারণ ভারত-সমাজ-ব্যবস্থার অন্তর্গত পন্থাবিভাগ করিয়াও এই ঐক্য গড়িতে পারা যাইবে না। হিন্দু, খৃষ্টিয়ান, মুসলমান, এই তিনটিই এক একটা প্রাচীন পন্থা। এই তিনটিই এক একটা world-religion—ইহাদের প্রত্যেকের পশ্চাতে এক একটা বিরাট সাধনা বা culture এবং বহুশতাব্দব্যাপী traditions বা ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির ধারা পড়িয়া আছে। এই সাধনা এবং অভিব্যক্তিধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে এ সকল ধর্ম্ম পঙ্গু হইয়া পড়িবে। এগুলিকে নষ্ট করিলে জগতের সমূহ ক্ষতি হইবে। এইজন্য মুসলমান নষ্ট হইয়া যাউক, ইহা কখনওই চাহি না। বরঞ্চ মুসলমান মুসলমানই থাকুক, মুসলমান পন্থার

অনুসরণ করিয়াই বিশ্বধর্ম্মের বা Universal Religionএর দিকে ফুটিয়া উঠুক, ইহাই চাই। খৃষ্টিয়ান্ খৃষ্টিয়ান্ থাকিয়াই খৃষ্টধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া তাহার অভ্যন্তরে যে বিশ্বজনীন আদর্শ সকল লুকাইয়া আছে, সে সকল আদর্শকে ফুটাইয়া বিশ্বধর্ম্মের অভিমুখে গড়িয়া উঠুক, ইহাই চাই। হিন্দুও হিন্দু থাকিয়াই হিন্দুত্বের অভ্যন্তরে যে বিশ্বজনীনত্ব আছে তাহাকেই আশ্রয় করিয়া বিশ্বধর্ম্মের অভিমুখে ফুটিয়া উঠুক, ইহাই চাই। মুসলমানের মুসলমানত্ব নষ্ট হইলে তাহার স্বাভাবিক বিকাশের পথ বন্ধ হইয়া যাইবে। খৃষ্টিয়ান এবং হিন্দু সম্বন্ধেও তাহাই সত্য। মুসলমান মানুষ হইলেই ভারতের সাধারণ মনুষ্যত্বকে ফুটাইয়া তুলিতে পারিবে। হিন্দুও সেই আপনার মনুষ্যত্বকে ফুটাইয়াই ভারতের সাধারণ মনুষ্যত্বকে ফুটাইয়া তুলিতে পারিবে। এই জন্যই, আমা নেশনকে ভাল করিয়া গড়িয়া তুলিতে চাই বলিয়াই, মুসলমান, খৃষ্টান বা হিন্দুকে তাহার এবং সাধনার ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে চাহি না। গাছ হইতে ডাল কাটিয়া লইলে যেমন জীবনীশক্তি আর থাকে না, সেইরূপ কোনও মানুষ বা সম্প্রদায়কে তাহাদের বিশিষ্ট সমাজ, ধর্ম্ম, বিশিষ্ট সাধনা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নিলে তাহাদের মনুষ্যত্বের বিকাশের ব্যাঘাত যাহারা ভারতবর্ষে নূতন নেশন গড়িতে চায়, সকলের আগে তাহাদিগকে এই সত্যটা ধরিতে এই ধর্ম্মসম্বন্ধীয় এবং সমাজসম্বন্ধীয় স্বাধীনতার উপরেইত ভারতবর্ষের নেশন গড়িতে স্বাধীন-ভারত গড়িবার জন্য প্রত্যেক ভারতবাসীকে যেমন তার ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, সেইরূপ ভারতের ভিন্ন ভিন্ন সমাজ এবং সম্প্রদায়কেও নিজদের স্বা উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিতে হইবে। এইজন্য হিন্দুকে হিন্দু রাখিয়া, মুসলমানকে রাখিয়া, খৃষ্টিয়ান্‌কে খৃষ্টিয়ান্ রাখিয়া, অন্যান্য ধর্ম্ম ও সমাজকে তাঁহাদের বৈশিষ্ট্যের উ করাইয়াই, ভারতবর্ষে আধুনিক নেশন গড়িতে হইবে। এই সাম্প্রদায়িক ও সামাজিক স্ব সঙ্গে national unity বা জাতীয় একতার কি করিয়া সমন্বয়সাধন করিতে হইবে আমাদের প্রধান রাষ্ট্রীয় সমস্যা। হিন্দু-মুসলমান সমস্যার ইহাই মূল কথা। এই মূল কথা রাখিয়াই এই জটিল প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

বিষ্ণুশর্ম্মা—নেশন মান্‌লে ত ন্যাশন্যাল ইউনিটি! মুসলমান্ মাতব্বরেরা, বলুন না কেন, ভারতবর্ষের নেশনকে নিজেদের নেশন বলে মানেন না।

শক্তিপদ—ঐখানেই ত যত গোল। আর এই গোলের মূল মুসলমানের দেশপ্রীতি।

ভজহরি—তুমি দেখ্‌ছি নতুন নতুন ভাষা তৈরি করছ। পরকীয়া কাকে বলে?

শক্তিপদ—নিজের দেশের চাইতে যে পরের দেশকে বেশী ভালবাসে, তার পরকীয়া দেশপ্রীতি বলা যায় না কি? আর মুসলমান মাতব্বরদের ex

patriotism'এর অর্থই কি তা নয়? এঁরা সনাতন কাল হইতে এই patriotism শব্দের বাক্যের সঙ্গে অর্থের যে যোগ ছিল তা ওলটপালট করে—এই সোণার পাথর বাটির সৃষ্টি করেছেন।

কৃষ্ণধন—কথাটা পরিষ্কার করে বলুন।

বিষ্ণুশর্ম্মা—কথাটা ত খুবই সোজা ঠেক্‌ছে। আমরা patriotism শব্দে চিরদিন স্বদেশপ্রীতি বুঝে এসেছি। ল্যাটিন patria—মানে fatherland বা পিতৃভূমি—আমরা যাকে মাতৃভূমি বলি। এই যে পিতৃভূমি বা মাতৃভূমি ইহা একটা বিশিষ্ট দেশ-ভাগ। যে দেশেতে আমরা জন্মেছি; যে দেশেতে আমাদের পূর্ব্বে, স্মরণাতীত কাল হইতে, আমাদের পূর্ব্বতন পূর্ব্বপুরুষেরা জন্মেছিলেন, যে দেশে আমরা বেঁচে থাকি ও জীবনের সুখদুঃখ ভোগ করি—যে দেশ আমাদের কর্ম্মভূমি, যাহা আমাদের পূর্ব্বতন পূর্ব্বপুরুষদেরও কর্ম্মভূমি ছিল—যে দেশ আমাদের সভ্যতা ও সাধনার লীলাভূমি—সেই দেশকেই আমরা মাতৃভূমি বলি। আর এই patria বা পিতৃ ভূমির প্রতি যে অনন্যমমতা, তাহাই patriotism'এর অর্থ। এই মাতৃভূমির প্রতি যে অনন্য অনুরাগ ও অনুগত্য তাহাই স্বদেশপ্রীতি। এই অনুরাগ দেশগত—territorral—দেশবিশেষের সীমাতে আবদ্ধ। চিরকাল patriotism'এর এই অর্থ বুঝে এসেছি। এখন মহম্মদ আলি সাহেব ও তাঁর বন্ধুরা কিছুদিন হ'তে বলে আস্‌ছেন যে তাঁহাদের দেশপ্রীতি বা patriotism, দেশগত বা territorral নহে। অর্থাৎ তাঁদের অনুরাগ ও আনুগত্য ভারতবর্ষকে একান্তভাবে আশ্রয় করিয়া নাই। ভারতবর্ষের সীমা ছাড়াইয়া—জগতের যে দেশে মুসলমান আছে, সেই দেশকেই আশ্রয় করিয়া আছে। এই জন্যই ত মুসলমানের দেশপ্রীতিকে পরকীয়া বলা যায়। আর patriotism শব্দের ধাতু বদলাইয়া যাহা territorial তাহাকে extra-territorial করবার চেষ্টাতে এই অদ্ভুত patriotism সোণার পাথর বাটি হয়েছে। আমি ত এই বুঝি।

শক্তিপদ—আমার মানেও তাহাই। আর এই extra-territorial patriotism'এর আদর্শ ভারতবর্ষে হিন্দুমুসলমানে মিলিয়া যে একটা জাতি বা নেশন বা রাষ্ট্র গড়ে তুল্‌বার চেষ্টা কচ্ছি,—যাকে আমরা স্বরাজ বলিতেছি, তার বিরোধী।

ভজহরি—কেন? আমরা—

শক্তিপদ—কেন? এইজন্য যে ভারতবর্ষের নানা সম্প্রদায়ের লোকে যদি আমাদের এই রাষ্ট্রকেই তাদের একমাত্র "স্বদেশ" বলে না মনে করে এবং এই রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার না করে, তাহা হইলে এই স্বরাজ-লাভ সম্ভব হইলেও, অর্থাৎ ইংরাজ তাড়ান সম্ভব হইলেও, এই স্বরাজ রক্ষা একেবারেই অসম্ভব হবে।

ভজহরি—তোমার এই সংকীর্ণ patriotism'এর আদর্শইত দুনিয়ায় যত ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি করেছে। আমার দেশ অন্য দেশের চাইতে বড় হবে, আমার দেশ অন্য দেশের

চাইতে শক্তিশালী হবে, অন্যদেশ গোল্লায় যায়, যাউক, আমার দেশের ভাল হলেই হ'ল—
এই যে patriotic nationalism—এরই জন্য ত য়ুরোপ রসাতলে যাচ্ছে। মুসলমানেরা যে
এই সংকীর্ণ দেশ-সীমাবদ্ধ বা territorial patriotism'এর গণ্ডী ছাড়িয়ে উঠ্‌তে
এ' ত অতি ভাল কথা।

শক্তিপদ—তুমি patriotic nationlism'এর যা দোষ দেখাচ্ছ, তা মানি। আমাদে
nationalism এই সংকীর্ণ দেশ-প্রীতির উপরে গড়িয়া উঠুক, ইহা কিছুতেই ইচ্ছা করি
কিন্তু দেশ-প্রীতির সঙ্গে বিশ্বপ্রেমের কি সঙ্গতি ও সমন্বয় হয় না? তুমি patriot
nationalism'এর অপব্যবহারটাই দেখ্‌ছ। য়ুরোপে এই অপব্যবহারই হচ্ছে ও হয়েছে। কি
বস্তুর অপব্যবহার হয় বলে, তার সদ্ব্যবহার ও প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। তুমি যে
রোলার বুলি আওড়াও, সেই রোমা রোলা প্রভৃতি য়ুরোপের বড় বড় মনীষীরা এ বিষয়ে
বলেছেন, তা চো'খে পড়েছে কি? কিছুকাল পূর্ব্বে তাঁরা সকলে মিলিয়া এ
menifesto ছাপিয়ে ছিলেন। তাহাতে তাঁরা patriotism কোথায় দোষের ও
গুণের হয়, ইহা অতি পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন। তাঁরা বলেন—

To promote one's country's welfare as a step towards altru
internationalism is a vertue, to make it an end in itself is a crime.

ভজহরি—আমিও ত ঐ কথাই বলি। তোমার patriotism কোথায় altru
internationalism'এর দিকে গিয়েছে? কোথাও ত ইহা দেখি নি।

শক্তিপদ—তুমি য়ুরোপ ভিন্ন আর কোনও দিকে তাকাও না বলে দেখ না। অ
দেশে কি patriotism ছিল না? না থাকিলে "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"
কথার সৃষ্টি হতো না। অথচ এই স্বদেশপ্রীতি আমাদিগকে বিশ্বপ্রীতির আহ্বানে বা
নাই। আমাদের সকল ধর্ম্মই যেমন পরিণামে বিশ্বধর্ম্মে যাইয়া পৌঁছিয়াছে,
দেশ-ধর্ম্ম বা দেশ-চর্য্যাও বিশ্বধর্ম্মে যাইয়া পৌঁছিয়াছে। সকল বিষয়েই আমরা জগ
ও জগতের অধীশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি খুঁজিয়াছি। "জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায়"
আমরা সকল ধর্ম্মকর্ম্মেরই সংকল্প করিয়া আসিয়াছি। বিষ্ণুপ্রীতিকাম হইয়াই আম
পরিবারের সেবা করতে চেয়েছি। ঈশ্বর প্রীতিকাম হইয়া—"জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায়
আমরা গৃহধর্ম্ম পালন করিয়াছি। ঈশ্বর প্রীতিকাম হইয়াই আমরা স্বদেশ সেবা
অরাতি বিনাশেও আমরা নিষ্কামভাবে, অর্থাৎ ঈশ্বরপ্রীতি কামনার দ্বারা পরিচালি
ইহাই ভারতের সনাতন আদর্শ। এষো ধর্ম্মঃ সনাতনঃ—এই কথাটা ভুলিয়া যাও কেন?
সকল বিষয়ে ঈশ্বর প্রীতিকাম হইয়া কাজ করিতে চাহিয়াছি বলিয়াই আমাদের patrio
never an end in itself—কিন্তু সর্ব্বদাই altrustic internationalism এর

করিয়া চলিয়াছে। এই জন্যই আমাদের স্বদেশপ্রীতির সঙ্গে য়ুরোপের স্বদেশপ্রীতির একটা জাতিগত পার্থক্য আছে। আমাদের nationalism বা রাষ্ট্রাভিমান internationalism বা ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে প্রীতি ও সাহচর্য্যের সম্বন্ধের অন্তরায় নহে, কিন্তু সহায়ই হইবে। একদিক দিয়া দেখিতে গেলে আমাদের এই patriotismকেও extra-territorial বলিতে পারা যায় না যে তাহা নহে। আমাদের দেশকে ভালবাসি বলিয়া অন্যদেশকে যে ভালবাসিতে পারি না, এমন নয়। কিন্তু এই অন্যদেশপ্রীতি আমাদের বিশ্বমানব বা Humanity'র্ প্রেমের অঙ্গীভূত হইয়া আছে। কিন্তু মুসলমান মাতব্বরেরা যাহাকে extra-territorial patriotism বলেন, তাহা এই internationalism বা humanitarianism নহে। আমাদের প্রীতির আদর্শ আমাদের স্বদেশকে ছাড়াইয়া সমুদয় বিশ্বকে আশ্রয় করিতে গিয়াছে। মুসলমানদের extra-territorial patriotism ইহা করে নাই। তাঁদের এই প্রেম স্বদেশকে ছাড়াইয়া সমগ্র মুসলমান সমাজকে যাইয়া আশ্রয় করিতে চাহিয়াছে। সমগ্র মানবজাতিকে ভালবাসাই বিশ্বপ্রেম। এই প্রেমেতে জাতি, বর্ণ, ধর্ম্ম প্রভৃতির কোনও ভেদ-বিচার নাই। মানুষ মানুষ বলিয়াই এই বিশ্ব-প্রেমের আশ্রয় হইয়াছে। এ মানুষ হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, খৃষ্টিয়ান হোক, বৌদ্ধ হোক, যাই হোক্ না কেন, মানুষ বলিয়াই আমাদের প্রেম ও সেবার সম্পূর্ণ ও সমান অধিকারী। এই জন্য আমাদের স্বদেশপ্রীতি যখন দেশের সীমা ছাড়াইয়া যায়, তখন সে হিন্দুও জানে না, মুসলমানও জানে না, কেবল মানুষ বলিয়াই মানুষকে আলিঙ্গন করে। এই জাতীয় extra-territorial patriotismএর সঙ্গে patriotic nationalismএর কোনও বিরোধ নাই। মুসলমান মাতব্বরেরা যে বস্তুকে extra-territorial patriotism কহেন, তাহা বিশ্বজনীন নহে। এ প্রেম মানব প্রেম নহে কিন্তু মুসলমান-প্রীতি। যেখানে যে মুসলমান আছে, মুসলমান বলিয়াই এই extra-territorial patriotismএর চক্ষে দুনিয়ার অপর সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের লোকের অপেক্ষা বেশী প্রিয়। এই প্রেমের প্রেরণায় যখনই মুসলমানের স্বার্থের সঙ্গে অন্য ধর্ম্মের লোকের স্বত্ব-স্বার্থের বিরোধ হইবে, তখনই এই extra-territorial patriotএর দল মুসলমানের পক্ষ অবলম্বন করিবেন। এ অবস্থায় এই extra-territorial patriotismএর সঙ্গে patriotic nationalismএর সঙ্গতি ও সমন্বয় আদৌ সম্ভব নহে।

এই পরকীয়া স্বদেশপ্রীতি যতদিন ভারতবর্ষের মুসলমানদিগকে মুগ্ধ করিয়া রাখিবে, ততদিন পর্য্যন্ত হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সত্য একতা প্রতিষ্ঠা হইতেই পারে না।—ধর্ম্মের উপরে এ একতা গড়িবে না। সামাজিক ঐক্যের উপরেও হিন্দু-মুসলমানের সম্বন্ধের সমন্বয় সম্ভব নহে। এক দেশপ্রীতির উপরেই এই একতা গড়িয়া উঠিতে পারে। কিন্তু মুসলমান ভারতবর্ষকে একান্তভাবে আপনার দেশ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছে না; ভারতের রাষ্ট্রকে বা nationকে অনন্যমমতা প্রদান করিতে পারিতেছে না। তাহার নিকটে ভারতবর্ষ অপেক্ষা তুর্কী প্রিয়তর। তুর্কীর সঙ্গে

ভারতবর্ষের লড়াই বাধিলে ভারতের মুসলমানেরা ভারতের হইয়া লড়াই করিতে রাজী হইবে না। ভারতের বিরুদ্ধেই তুর্কীর হইয়া হয়ত সম্ভব হইলে অস্ত্রধারণ করিতে যাইবে। এ অবস্থায় রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধের উপরে কিম্বা নেশন অভিমানকে আশ্রয় করিয়া হিন্দু-মুসলমানের মিলন হইতে পারে না। হিন্দু-মুসলমানের মিল হইতে হইলে ভারতবর্ষে বর্ত্তমান প্যানইস্‌লামিক আদর্শের একা উচ্ছেদ অত্যাবশ্যক। মুসলমান মাতব্বরেরা যতদিন পর্য্যন্ত তাঁদের এ অদ্ভুত extra-territorial patriotismকে সরলভাবে বর্জ্জন না করিয়াছেন, ততদিন পর্য্যন্ত হিন্দু-মুসলমানের সত্য মিল অসম্ভব। এই Pan-Islamism প্রচারের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের এমন বিরো ছিল না। এই Pan-Islamismএর প্রচার বন্ধ না হইলে বর্ত্তমান বিরোধ মিটিবে না।

কৃষ্ণধন—Pan-Islamismএর কি একটা ভাল দিক নাই ?

শক্তিপদ—আছে বই কি। সকল জিনিষে যেমন ভালমন্দ মিশিয়া আছে, ইহাতেও তেমনি আছে।—কিন্তু মুসলমান মাতব্বরেরা সে দিকটা-ফুটাইয়া তুলিবার জন্য তত বেশী যত্ন করিতেছে না। Pan-Islamismএর দুটা দিক। একটা রাষ্ট্রীয় বা political ; আর একটা সাধনার সভ্যতার দিক—cultural. এই সাধনার বা cultural Pan-Islamism অতি বড় জিনি দুনিয়ায় এ জিনিষের প্রয়োজন আছে। ইহার সঙ্গে ভারতের nationalism এর কো বিরোধ নাই। কিন্তু রাষ্ট্রীয় বা political Pan-Islamism নিকৃষ্ট বস্তু। মুসলমানকে দুর্দ্ধ রাষ্ট্রশক্তিতে সর্ব্বশক্তিমান করিয়া তোলাই এই রাষ্ট্রীয় বা political Pan-Islamism দুরাকাঙ্ক্ষা। আর ইহারই সঙ্গে কেবল ভারতবর্ষের নহে, কিন্তু দুনিয়ার যত অ-মুসলমান রাষ্ট্র সকলেরই বিরোধ।

কৃষ্ণধন—এই সাধনার Pan-Islamismটা কি ?

শক্তিপদ—সে অনেক কথা। আজ সে কথা তুলিব না। রাত ফুরাইবে, কিন্তু সে ফুরাইবে না। মুসলমানেরা পর্য্যন্ত এই cultural Pan-Islamismকে ভাল করিয়া ধ পারেন নাই। ধরিতে পারিলে, এই রাষ্ট্রীয় PanIslamismএর আলেয়ার পিছনে ছুটিয়া ভারতের রাষ্ট্রসমস্যাকে এমন জটিল করিয়া তুলিতেন না। কিন্তু একথা আজ তুলিব না।

শ্রীবিপিনচ

ছিটে-ফোঁটা

গবেষণা

পণ্ডিতজি বলিলেন "ওহে বাবুজি, ইংরেজি mill কথাটা সংস্কৃত থেকে নেওয়া ; আমাদের সেকালে আগুনের শক্তিতে মীল চালাইবার ব্যবস্থা ছিল, আর সে মীল চালাইতেন ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা। প্রমাণ—অগ্নিমীলে পুরোহিতং।" বাবুজি ইহার উত্তরে বলিলেন—"কিন্তু দেখুন পণ্ডিতজি, সেকালে মেঘ-বর্ষায় মাথা বাঁচাইবার ছাতা ছিল না ; আর মাঘের শীতে শরীর রক্ষার শীতবস্ত্র ছিল না ; তাই লোকে দীর্ঘকাল বাঁচিত না। প্রমান—মেঘে মাঘে গতং বয়ঃ।"

মহালয়া

লীগের হাতে তিলোদক, মুখে মন্ত্র—তৃপ্যতাং ;
আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত জগৎ তাহে চিৎপটাং।
ব্রিটন কহেন সবিস্ময়ে "ওহে লীগ বলীয়ান !
একি অশাস্ত্রীয় কাণ্ড, জ্যান্তে জলাঞ্জলি দান !
শান্তি সন্ধির গায়ে জল দিলে তুমি চট্‌পটাং
দুর্ব্বলেরা ইহার ফলে ভূমিতলে ছটফটাং।
ফরাসীরা Ruhr-এর শিরা শুষে করে রক্তপান,
অষ্ট্রিরিয়ায় হিষ্টিরিয়া তবু আছে শক্ত প্রাণ।
মুসলেনির মুসলখানি গ্রীসের নাশে বর্দ্ধমান
তর্পণেতে ব্যস্ত মিছে কর্ত্তা তুমি বর্ত্তমান।"
কহেন কর্ত্তা, "তর্পণেতে হবে সর্ব্ব সমাধান
গয়া, গঙ্গা, গদাধর সবায় দেবে সমান টান।
কালের ঘড়ী চল্‌বে সটাং যতই কর তুলকেলাম ;
অটল দোলে চল্‌বে দুলে দুঃখসুখের পেণ্ডুলাম।"

* * *

মহিম্ন স্তোত্র

(বক্তা মন্যু)

ওহে মহাকাল, ওহে ভৈরব, ওহে চণ্ড
নর হিংসায় উদ্যত তব দণ্ড !
তুমি কুৎসিৎ, তুমি বীভৎস অতি দৃশ্যে ;
প্রচণ্ড ঘোর চণ্ডাল তুমি বিশ্বে।

PUBLIC LIBRARY Estd. 1858

কূর্ম্মের মত, শূকরের মত, কদাকারে অবতীর্ণ!
সর্পের মত বিষম ভীষণ, স্পর্শে অশুচি ভিন্ন।
নখরে হিংস্র তুমি নৃসিংহ, রক্তে রাঙ্গিছ স্বস্তি,
পিশাচ সাজিয়া শ্মশান প্রস্থে, চিবাও পিশিত অস্থি!
প্রলয়ের কাল জাপানরাজ্যে, রূঢ়ের বক্ষে ফরাসী
ইটালির মত চলিছ ছুটিয়া গ্রীকের বিভব গরাসি'
অধৃষ্য তুমি দুর্গম তুমি গুহ্য
কুৎসিৎ তুমি চণ্ডাল,—তবু পূজ্য।

(মনীষীর উক্তি)

যন্ত্রণা তুমি সান্ত্বনা তুমি অদ্ভুত!
দুঃখ সাগরে জাগরে দীপ্ত বুদ্বুদ।
নিঃশ্বাসে বহ, বিশ্বাসে রহ, উৎসাহে পড় মন্ত্র;
কর্দ্দমে ক্লেদে মর্দ্দিত তুমি মৃত্যু-যোজিত যন্ত্র।
সন্ধ্যায় তুমি বিন্ধ্যারণ্য-নিবিড় মৃত্যু-শঙ্কা
উষার রজত হাস্যে ব্যক্ত তুমি কাঞ্চন জঙ্ঘা।
শঙ্কর তুমি সংহার তুমি সূর্য্য
অদ্ভুত তুমি প্রার্থিত তুমি পূজ্য।

(কবির উক্তি)

চন্দ্রিকা-স্নাত সুন্দর তুমি স্নিগ্ধ;
সুস্মিত তুমি, পুষ্পিত তুমি, হৃদ্য।
কম্পিত সুখ-চুম্বন তুমি, সঞ্চর সারা অঙ্গে;
শ্বাসের সুবাসে শিহরে বিকাশ ললিত গতি-বিভঙ্গে।
জীবনে তরুণ, ব্যথায় করুণ, প্রেমেতে অরুণ বর্ণ
ধীর উল্লাসে চির প্রফুল্ল শারদ সরোজ পর্ণ।
স্পন্দিত প্রেম-সঙ্গীতে সুখ ছন্দ;
অন্তরে তুমি সন্তর নবানন্দ!

BARANAGAR PUBLIC LIBRARY Estd. 1858

দুনিয়ার খবর

জাপানে মহাপ্রলয়—আমাদের জাপানী বন্ধু কিমুরা "বঙ্গবাণী"তে তাঁহার দেশের কথা আনন্দে লিখিতেছিলেন; আজ সে আনন্দ আর নাই। আজ আমরা নিজে লিখিতেছি জাপানের দুর্ভাগ্যের কথা। ভূমিকম্পে, টাইফুন ঝড়ে, সাগরের বানে, আগ্নেয়গিরির উৎপাতে ও অন্য রকমে আগুন ধরিয়া প্রায় ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে সারা জাপান দেশে যে ধ্বংসের লীলা হইয়া গেল, তাহা বড়ই ভীষণ, বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। মানুষের একালের সভ্যতার গৌরব এই যে, মানুষেরা প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে আপনাদের বশে ও অধীনে আনিয়া লোকস্থিতির মহিমা বাড়াইয়াছে। জাপানের এই প্রলয়ে বৈজ্ঞানিকেরা দেখিতেছেন,—অর্থাৎ ভূতের ওঝারা দেখিতেছেন, যে ভূতেরা তাঁহাদের মন্ত্র না মানিয়া যখন তখন ঘাড়ে চড়িতে পারে, এবং ওঝাদের ঘাড় মটকাইতে পারে। জাপানে বহু যুগ ধরিয়া যাহা অর্জ্জিত ও সঞ্চিত হইয়াছিল, কালের ফুৎকারে নিমেষে তাহা উড়িয়া গেল। ১লা সেপ্টেম্বর জাপানে যখন প্রথম ঝড় উঠিল,—তখনও দেশের লোকে বিশেষ বিপদের শঙ্কা করে নাই; তাহার পর ভূমিকম্পে মাটি ফাটিতে লাগিল, বাড়ী ঘর ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল,—আর মানুষেরা আশ্রয় খুঁজিয়াও আশ্রয় পাইল না। গোলাগুলির কারখানায় আপনা আপনিই আগুন লাগিয়া এমন অগ্নিকাণ্ড হইল যে কাহারও বাঁচিবার পথ রহিল না। টোকিওর মত বড় সহরের দুই তৃতীয়াংশের বেশি একেবারে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে ও সেখানে বহুলক্ষ লোক প্রাণ হারাইয়াছে। য়োকোহামা বন্দরে বাড়ী ভাঙ্গিল, মানুষ মরিল, আর অগ্নিদাহে সমস্ত বন্দর ভস্মসাৎ হইয়া গেল; তাহার পর আবার—সমুদ্রে বান ডাকিয়া সেই ভস্মটুকুও ধুইয়া মুছিয়া ফেলিল। যাহা টোকিও এবং য়োকোহামাতে ঘটিয়াছে, তাহাই প্রায় দেশের সর্ব্বত্র ঘটিয়াছে। চারি বৎসর ধরিয়া যুদ্ধে সারা য়ুরোপে যে অনিষ্ট ঘটে নাই, একদিনে জাপানে তাহা ঘটিয়া গেল। যাহারা এখন বাঁচিয়া আছে, তাহাদেরও আহার্য্য নাই, পরিধেয় নাই। কালের এই অভিশাপের সময়েও জাপানীরা যেরূপ প্রশান্তভাবে বিপদ সহিয়াছে, তাহাতে আশা হয় যে, এই খণ্ডপ্রলয়ের পর সে দেশে উন্নততর সভ্যতা ও মহত্তর জীবন প্রতিষ্ঠিত হইবে।

* * *

য়ুরোপের অবস্থা—মহাযুদ্ধের পর যখন লীগের প্রতিষ্ঠা হইল, তখন ফরাসীরা ও ইতালীয়েরা সকলের চেয়ে লম্বা গলা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, য়ুরোপে আর অন্যায় যুদ্ধ হইতে পারিবে না। ফরাসীরাই সকলের আগে—লীগকে তুচ্ছ করিয়া দুঃস্থ জার্ম্মানীর রক্ত শোষণ করিতে ছুটিল, আর এখন ইতালীয়েরাও লীগের শাসন অগ্রাহ্য করিয়া গ্রীকদিগকে পীড়ন করিতে ছুটিয়াছে। লীগের সভাটি যেন আমাদের দার্শনিকদের বর্ণিত আত্মা; অর্থাৎ তিনি কর্ত্তা হইলেও কেবল দ্রষ্টা মাত্র,—তিনি প্রকৃতিকে শাসন করিতে পারেন না। প্রকৃত-পক্ষে লীগের সভা রচিত হইয়াছে ইংলণ্ড, ফরাসী ও ইতালীকে লইয়া; এখন ফরাসী ও ইতালীকে বাছিয়া ফেলিলে লীগের গাঁ উজাড় হয়, অথবা লীগের কম্বলের কম্বলত্ব থাকে না। চিরকালই ফরাসীর লোলুপ দৃষ্টি ছিল রাইন প্রদেশের দিকে; বাসনার সেই জ্বালা মিটাইবার জন্যই ফরাসীরা নানা ছলে রূঢ়ের বুক চাপিয়া বসিয়াছে। ইতালীয়দেরও কথা তাই; তাহারা আলবিনিয়া গ্রাস করিবার জন্য চিরদিনই হাঁ করিয়া ছিল, এবং সন্ধির সময়েও ফিউমে পাইবার জন্য জিদ ধরিয়াছিল; এখন ছুতা খুঁজিয়া আলবিনিয়া দখল করিবার উদ্যোগ করিতেছে। আলবিনিয়ার জঙ্গলে

য়ানিনাতে কে যে ইতালীয় রাজপুরুষদিগকে মারিয়াছে, তাহার স্থিরতা নাই; নিরপেক্ষ বিচারে যদি স্থির হয় যে, গ্রীক গবর্ণমেণ্টের দোষে সে হত্যাকাণ্ড হইয়াছে, তবে প্রতীকারের চেষ্টা করিলে ভাল হইত। ইতালী কিন্তু সে বিচারের প্রতীক্ষা করিল না; সুযোগ পাইয়াই তাড়াতাড়ি গ্রীককে জব্দ করিতে গেল। আমরা প্রথম বায়রণের কবিতায় শিখিয়াছিলাম যে আলবিনিয়ার জঙ্গল দস্যুতে ভরা, এখনকার ইতিহাসেও তাহাই পাই। সে দেশে রাজ-কর্ম্মসংশ্লিষ্ট তিন চার জন ইতালীয়ের হত্যাকাণ্ড লইয়া যুদ্ধ বাধিত না, যদি গ্রীক দুর্গ না হইত। ইতালী যে অন্যায় করিয়া কর্ফু প্রভৃতি দখল করায় গ্রীকের গভীর অপমান হইল, লীগ তাহার বিচারেই আনিলেন না; লীগের সভায় ইতালির জিদ রক্ষা করিয়া নিষ্পত্তি হইল য়ানিনার হত্যাকারীরা গ্রীক হউক, আর দস্যু হউক, গ্রীককে দাঁতে কুটা করিয়া, গলায় কাপড় দিয়া হাঁটু পাতিয়া ইতালিকে সেলাম করিবে, ঘাট মানিয়া নাকে খত দিতে হইবে এবং পরে যখন বিচারে স্থির হইবে যে, হত্যাকারীরা কাহারা অপরাধের গুরুত্ব ধরিয়া খেসারতের টাকা দিতে হইবে। ইহারই নাম লীগের হাতে দুর্ব্বলের রক্ষা।

* * *

বুড়ার যৌবন—বহু পূর্ব্বে আমরা এ সংবাদ দিয়াছি যে, বৈজ্ঞানিকেরা বুড়াকে নবযৌবন দিবার হদিস্ পাইয়াছেন। কথাটি লইয়া এখন খুব আন্দোলন চলিতেছে। আমাদের শরীরের মধ্যে কতকগুলি গ্ল্যাণ্ড আছে; তাহাদের কতকগুলির সংস্কার করিতে পারিলে এই নবযৌবন আনা চলে। "গ্ল্যাণ্ড" কথাটি সকলে বুঝিবেন না; উহার একটু পরিচয় দিতেছি। আমাদের গলায় থাইরয়েড নামে একটা গ্ল্যাণ্ড উহার বিকৃতিতে যে গলগণ্ড হয়, তাহা কতকটা এদেশের লোকে জানেন। কিন্তু শৈশবে উহার বিকৃতি ঘটিলে যে মানুষ আকৃতিতে খর্ব্ব হয়, কদাকার হয়, নির্ব্বোধ হয়, এ সকল কথা নূতন আবিষ্কৃত যেখানে ঐ বিকৃতির লক্ষণ দেখা যায়, সেখানে চিকিৎসকেরা অন্য জন্তুর থাইরয়েডের অংশ খাওয়াইয়া সারাইবার চেষ্টা করেন। সে চেষ্টায় অধিকাংশ স্থলে ভাল ফলও দেখা গিয়াছে। থাইরয়েডের ন্যায় নানা গ্ল্যাণ্ড আমাদের শরীরে আছে। উহারই গ্ল্যাণ্ডবিশেষের এমন সংস্কার বা পরিবর্ত্তন করার চেষ্টা যাহাতে মানুষের শরীরে যৌবনসুলভ দক্ষতা ফিরিয়া আইসে। দুই এক স্থলে বুড়াকে এই নূতন জোয়ানের মত খাড়া করা হইয়াছে, কিন্তু সে যৌবন স্থায়ী হইবে কি না, তাহা এখনও বলা আর এ কথাটাও বলা চলে না যে, যৌবনের কতকগুলি লক্ষণ দেখা দিলেই মানুষের আয়ু বাড়িবে যৌবন ফিরিয়া পাইয়া বুড়াদিগকে হয়ত যযাতির মতই বলিতে হইবে যে, পৃথিবীর সকল ভোগেও যখন তৃপ্তি হয় না, তখন যৌবনের তৃষা পরিহার করাই ভাল।

* * *

চির মুক্তের জেল মুক্তি—যাঁহারা চির মুক্ত তাঁহাদের পক্ষে জেল যাওয়া—পাওয়া, একটা সাধারণ দুনিয়ার খপর মাত্র। শাসন ধর্ম্মের নিয়মে, যে চির মুক্তেরা জেলে তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে; লালা লজপৎ রায় ও মওলানা শ্রীজিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এখন জেলের বাহিরে, এবং শুনিতে পাইতেছি, শ্রীযুক্ত গান্ধীজি জেলের বাহিরে রাখা হইবে। আবার বলি এটা মহাত্মাদের সংবাদ নয়,—সরকারী ব্যবস্থার একটা

আশ্বিনে

ব্যবস্থাপক সভায় লর্ড লিটন—ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রথম কিস্তির অবসানের আসরে গবর্ণর-জেনেরল রেডিং বাহাদুর যাহা বলিয়াছিলেন, আমরা গত মাসে তাহার আলোচনা করিয়াছি। আর যাহাই হউক, রেডিং বাহাদুর সদস্যদিগকে মিষ্ট কথা বলিতে ভুলেন নাই এবং নিজের কাজের কৈফিয়ৎ দিতে গিয়া অপরের ঘাড়ে দোষ চাপান নাই। আমাদের গবর্ণর কিন্তু এদেশের ব্যবস্থাপক সভার প্রথম কিস্তির আখিরি সভায় তাঁহার মনের কথা মধুর করিয়া বলেন নাই; বরং স্পষ্ট ভাষায় সকল বে-সরকারি সদস্যকে তিরস্কার করিয়াছেন। মুখ্যভাবে গবর্ণমেণ্টের দোষেই যে নূতন সংস্কারের ব্যবস্থাপক সভাগুলি ভাল কাজ করিতে পারে নাই, তাহা গেল বারে বিশেষভাবে লেখা গিয়াছে; সে কথা আর তুলিব না। লর্ড লিটনের যে মন্তব্যগুলি বিশিষ্টভাবে নূতন, তাহার একটু আলোচনা করিব।

লর্ড লিটন বলিয়াছেন যে, বে-সরকারী সদস্যেরা একগুঁয়েমির জিদ্ ধরিয়া "তাঁহার" অর্থাৎ গবর্ণমেণ্টের সকল রকমের প্রস্তাব ভণ্ডুল করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, আর যে মিনিষ্টারেরা সদস্যদের "নিজেদের" লোক, সদস্যেরা প্রাণপণে তাঁহাদের প্রস্তাব সমর্থন না করিয়া মিনিষ্টারদের প্রতিকূলে যাইবার পাপ অর্জ্জন করিয়াছেন। উক্তিটি বিশ্লেষণ করিলে মনে হয় না যে, ইহা একজন বিজ্ঞ দেশশাস্তার বাণী। প্রথম নম্বরেই এই কথাটি বুঝা যায় না যে "তাঁহার গবর্ণমেণ্ট" বলিতে লাট সাহেব ঠিক্ কি পদার্থটি বুঝিয়াছেন, যাহার পক্ষ সমর্থন না করায় সদস্যদের অপরাধ ঘটিয়াছে। আমরা ত বুঝি যে গবর্ণরের অধিনায়কত্বে সকল সদস্যকে লইয়া যে সভা, তাহারই নাম গবর্ণমেণ্ট বা রাষ্ট্রপরিচালনের সভা। এ সভায় সকল সভ্যের মত এক হইতে পারে না, কাজেই অধিক সংখ্যক সভ্যের মতে যাহা স্থির হয়, তাহাই আইন বলিয়া গৃহীত হয়। যাহা অধিকাংশের মতে স্থির হয়, তাহা যদি গবর্ণরের মতের অনুকূল না হয়, আর গবর্ণর যদি veto বা "নেতি" চালাইয়া সে মত উড়াইতে না পারেন, তবে তিনি তাহা চালাইতে বাধ্য। এই নিয়মই ত ইউরোপের সকল দেশের নিয়ম। যাহা গবর্ণরের মতের সঙ্গে মিলিবে না, তাঁহাই যদি অন্যায় হয়, তবে ব্যবস্থাপক সভা রাখা হইবে কেন? গবর্ণর নিজে যে বুদ্ধি আঁটেন, তাহারই নাম যদি হয় "তাঁহার" গবর্ণমেণ্ট, তবে সদস্যদিগকে গবর্ণমেণ্টের অঙ্গ করা চলে না। সদস্যদিগকে ছাড়িয়া যে গবর্ণর বাহাদুর একটা আলাদা "তাঁহার গবর্ণমেণ্ট" ভাবিতে পারেন, ইহাই নিতান্ত বিস্ময়ের কথা।

দ্বিতীয় নম্বরে সদস্যদের অযথা জিদের কথা বলিতেছি। যাহা লিটন বাহাদুরের মতের সঙ্গে মিলে না, সেই মতেরই যে উৎপত্তি অন্যায়ের জিদে, একথা প্রমাণ করা বড় শক্ত। এ কথায় পাকেচক্রে স্বীকার করিতে হয় যে সদস্যদের কাজ হইল ধামা ধরা। "তাঁহার

গবর্ণমেণ্ট” যে নির্ভুল পথেই চলিয়াছিলেন, আর সদস্যেরা চলিয়াছিল ভ্রান্তভাবে গোঁ ধরিয়া, তাহাও একটা যুক্তি দিয়াও গবর্ণর দেখান নাই। বরং একটা উল্টা দৃষ্টান্ত পাইতেছি। “তাঁহার গবর্ণমেণ্ট” বিশ্ববিদ্যালয়ের শাসনের জন্য দুইটি বিল্ খাড়া করিয়াছিলেন। আর সেই বিলের উপস্থাপনার দিনেই স্যর আশুতোষ চৌধুরী প্রমুখ কয়েক জন বে-সরকারি সদস্য আপত্তি তুলিয়াছিলেন। সে বিল্‌গুলি লইয়া অনেক তুল্‌কেলাম হইয়া গিয়াছে, পাঠকেরা তাহা জানেন। “তাঁহার গবর্ণমেণ্ট” বরাবর জিদ্ ধরিয়াছিলেন যে সে বিল্ বদ্‌লাইবেন না, আর সেনেটকে উহা মাথা পাতিয়া লইতে হইবে। Englishman পত্রিকায় যাহা পড়িলাম তাহাতে স্পষ্ট জানা গেল যে “তাঁহার গবর্ণমেণ্ট”-এর ঐ বিল্ দুইটি নিতান্ত অচল বলিয়া গবর্ণমেণ্টের আহূত সভায় উহা পরিত্যক্ত হইয়াছে ও সেনেট কর্ত্তৃক নূতন বিধির খস্‌ড়া প্রস্তুত হইবার ভার হইয়াছে। এখানে “তাঁহার গবর্ণমেণ্ট”কে অভ্রান্ত না মানায় গুরুতর অপরাধ দেখা যাইতেছে না।

তৃতীয় নম্বরের কথা মিনিষ্টার লইয়া। সদস্যেরা মিনিষ্টার নির্ব্বাচন করেন না, মিনিষ্টার নিযুক্ত হয়েন গবর্ণরের নিজের ব্যক্তিগত বিচারে। নিজের মিনিষ্টারকে নিজে আদর না করার অপরাধে সদস্যেরা দায়ী নহেন। মিনিষ্টার যদি সদস্যদের মনোনীত ব্যক্তি হইতেন, তবুও তাঁহার যে কোন মতের সমর্থন করা সদস্যদের কর্ত্তব্য হইতে পারে না।

* * *

অরাজকতা—আনিবার জন্য এ দেশে গুপ্ত বিদ্রোহীদলের সৃষ্টি হইতেছে, হইল গবর্ণর বাহাদুরের অন্য একটি বিশেষ মন্তব্য। এই অতি গুরুতর বিষয়ের আলো কয়েকখানি ইংরেজি পত্রিকার ইংরেজ সম্পাদকেরা দেখাইতেছেন যে, বোমার যুগ এ পর্য্যন্ত এইরূপ অনেক রাষ্ট্রদ্রোহী দলের জন্ম হইতেছে; খুব কড়া শাসনে এই বিদ্রোহ না করিলে যে দেশের লোকের সুখশান্তি নাই, তাহাও উল্লিখিত হইতেছে। আমরাও এরূপ অরাজকতার বীজ ধ্বংস করাই গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। তবে এ প্রসঙ্গে কথা ক্রমাগতই বিশ বৎসর ধরিয়া। এইরূপ গুপ্ত বিদ্রোহী দলের সৃষ্টি হইতেছে কেন? দুষ্ট করিতে হইবে তাহা ঠিক্, কিন্তু এই দুষ্ট দলের সৃষ্টির মূলে কর্ত্তাগিরির কাজে কি না, ভাবিতে হইবে। একটি ঘরে যদি নিরন্তরই চাকরেরা অবাধ্য হইয়া চেঁচা করে, বাড়ীর ছেলেরা বেয়াড়া হইয়া উঠে ও নিরন্তরই কলহ চলে, তবে কর্ত্তা চালাইবার সময়ে কর্ত্তাকে ভাবিয়া দেখা উচিত যে ঐ উৎপাৎ সৃষ্টির মূলে তাঁহার কি কতখানি। সরকারি মন্তব্যে পাই যে উপার্জ্জনের পথ না পাইয়া অনেক ভদ্রলোকের চুরি-ডাকাতি ধরিয়াছে। কিসে বে-রোজগার বন্ধ হইয়া দেশের লোক শাসনে সন্তুষ্ট

গারে, তাহার জন্য কি বিলাতি উদ্যোগের শতাংশের একাংশ উদ্যোগও এ দেশে হইয়াছে? একটা দৃষ্টান্তই দিলাম। কথায় বলে যে, রোগীর রক্ত সংশোধনের চেষ্টা না করিয়া যদি ফোঁড়ার গায়ে প্রলেপ দিবার ব্যবস্থা হয়, তবে ফোঁড়া সারে না। অবশ্যই বিদ্রোহ দমন করিতেই হইবে কিন্তু কেবল পুলিশের প্রলেপ বাড়াইলে পূর্ণ উপকারের আশা নাই। ভাল করিয়া শাসন-সংস্কার করিতে হইবে, দেশের লোককে শাসনে সন্তুষ্ট রাখিতে হইবে।

* * *

লোকলক্ষ্মী—সভ্যতা বাড়ে না, সৌভাগ্য বাড়ে না, যদি লোকসংখ্যা না বাড়ে—এটা সমাজতত্ত্বের ক-খ। বৈজ্ঞানিকদের হাতে মেল্‌থাসের এই কাল্পনিক পচা মতবাদ টেকে নাই,—টিকিতেও পারে না—যে খাদ্যের উৎপত্তির হারের চেয়ে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার অধিক। জীবিকার জন্য যাহা চাই, পৃথিবীতে তাহা অফুরন্ত। প্রয়োজনের পদার্থ যে অফুরন্ত পাওয়া যায়, তাহা মানুষের বুদ্ধিতে (প্রয়োজনের তাড়নায়) ধরা পড়িতেছে ও ধরা পড়িবে। কি করিলে জনসংখ্যা বাড়ে ও প্রবল হয় এবং কি করিলে সকলেই উপার্জ্জনের পথ পায়, তাহাই হইল রাষ্ট্র পরিচালনার প্রধান সমস্যা। কিসে দেশের লোকেরা কিছুতেই মুর্খ না থাকে, কিসে নীচের স্তরের লোকেরা ভাল বাসস্থান পায় এবং কিসে উপার্জ্জনপটু লোকেরা উপায় না পাইয়া বেরোজগারে না থাকে, তাহার ব্যবস্থার জন্য ইংলণ্ডে বহু কোটি টাকার সংস্থান করা হইতেছে। বিলাতের সেই নীতি প্রবর্ত্তকেরাই এ দেশের কর্ম্মহীন ও উমেদারদিগকে এমনভাবে তিরস্কার ও উপহাস করেন যেন তাহাদের জন্ম লওয়া ভুল হইয়াছে, যেন তাহাদের লেখাপড়া শেখা ভুল হইয়াছে, যেন তাহাদের জন্য তাহারা ছাড়া আর কেহ দায়ী নয়।

ইউরোপে উপার্জ্জনের পথ আছে বহু। সমর-বিভাগ আছে, নৌ-বিভাগ আছে, খনি-বিভাগ আছে, আরও কত কি আছে। নানা দিকে ছুটিবার পথ আছে বলিয়াই নানা লোক নানা দিকে চলিবার উপযোগী শিক্ষা পাইয়া আশায় বুক বাঁধে। এ দেশে ভবিষ্যতের রোজগারের যে সকল পথ খোলা আছে, তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন রকমের শিক্ষা পাইবার জন্য যুবকেরা উৎসাহিত হইতে পারে না। শিক্ষার যে পথ আছে, তাহা ধরিয়া চলে বলিয়া যুবকেরা গালি খায়। দেশের কোন লোকই বে-রোজগারের কষ্টে সরকারের সহানুভূতি পায় না। কবে বিবিধ শিল্প শিখাইবার জন্য স্কুল খুলিবে, জানি না। কিন্তু সেই ভবিষ্যতের স্কুলে লোকে ভর্ত্তি হইতেছে না কেন বলিয়া তিরস্কার চলিতেছে। শিল্প শিখিলেও যে উপার্জ্জনের ক্ষেত্র কোথায় হইবে এবং কাহার হাতে কাহার মাল বিকাইবে, তাহাও কেহ জানে না। এইরূপ শাসনে ও এইরূপ ব্যবস্থায় যদি আমরা টিকিয়া থাকি, তবে আমাদের টেক্‌সই প্রাণকে ধন্যবাদ।

* * *

সাদাসে কালাসে—লোকচরিত্র বুঝিতে পারাই শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞতা ; না পারাই শ্রে আহাম্মকি। আমাদের প্রতি ইউরোপীয়দের প্রেম কতখানি, সেটা আমরা দুই চারিজন সাধু লোকে ব্যবহারের মোহে ভুলিয়া যাই। তাহা ছাড়া অনেককে এই অদ্ভুত আহাম্মকিতে ধরিয়াছে- তাহারা খাঁটি কথা জানিতে চায়না, ইউরোপীয়েরা আমাদের সম্বন্ধে কি মনে করে, তাহা জানিতে চায় না। দৃষ্টান্ত দিব।

Statesman কাগজ তিলকের মৃত্যুর সময়ে অশিষ্ট ব্যবহার করায় দেশের অনেক লো ক্ষেপিয়া উঠিলেন। আন্দোলন দেখিয়াই প্রথম কথা বোঝা গেল যে, ইউরোপীয়েরা যে ঐ অশিষ্ট ব্যবহার করিতে পারে, তাহা যেন লোকে সেই প্রথম দেখিয়া বিস্মিত হইল। দ্বি অবস্থাটি দেখা গেল এই যে আন্দোলনের চাপে Statesmanকে জব্দ করিয়া—অর্থাৎ ক সাজাইয়া আমাদের সম্বন্ধে দুই চারিটি মিষ্ট কথা বলাইয়া লওয়াই যেন সকলের ইচ্ছা।

লর্ড নর্থক্লিফ্ তাঁহার মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে, আড়ির আন্দোলনের সময়ে যখন ভায়স বেড়াইতেছিলেন, তখন তাঁহার রোজ নামচায় যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা শিক্ষণীয়। তিনি লিখিয়াছে ভারতবর্ষের লোককে দেখিলেই তাঁহার ঘেন্না করে। সংস্কৃত "ঘৃণা" বলিতে ঠিক "ঘে বুঝায় না ; তাই ঘেন্না শব্দ ব্যবহার করিলাম। ভারতের লোকেরা নোংরা, মিথ্যাবাদী ও আর ইংরেজি-শিক্ষিতেরা বেজায় ডেঁপো। তাহারা অসভ্য হইলেও আপনাদের নির্ব্বুদ্ধিতায় জাতির সমকক্ষ হইতে স্পর্দ্ধা করে। এই কথাগুলি এদেশে প্রচারিত হওয়া উচিত। নর্থক্লিফ ছিলেন এক শ্রেণীর উচ্চশিক্ষিতদের মুখপাত্র, আর ইংলণ্ডের সকল সমাজেই বিশেষ অ

* * *

চাকুরি ছাড়িয়া শিল্প-বাণিজ্য ধর—এই হইল পাকেচক্রে উমেদারদে সরকারের উপদেশ। উপদেশটা ভাল ; তবে কথা এই, যাহাদের মূলধন আকারে পৃথিবীর কোন দিকেই চাপা নয়, তাহারা কিসের ব্যবসা-বাণিজ্য করিবে ? যে দশজনের অন্ন মি টাকা আছে, তাহারা এক সঙ্গে জুটিয়া যদি একটা কারখানা বা কারবার খোলে, তবে সেখা দশজনের ভাগ্যে বাবু-চাকুরি মিলিতে পারে। কিন্তু এ দেশের কোন ব্যবসা-বাণিজ্যের এত বড় হইতে পারে না যেখানে বহু লোকের অন্ন হয়। এ দেশের ব্যবসায়ীরা যদি কারবার খুলিয়া ইউরোপীয় বণিকদের তাঁবেদারি করেন, অর্থাৎ তাঁহাদের মাল ইউরোপীয়ে যাহা কিছু ভাগ্যে থাকে, তাহাই লাভ করেন, তবে কাজ চলিতে পারে। যে মুহূর্ত্তে তাঁহা ভাবে মুক্তবাণিজ্য করিতে বসিবেন, সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহাদের সকল কারবার ধূলিসাৎ হইয়া অনুগ্রহে রক্ষিত বিদেশের বণিকেরা নানা ছলে ও কৌশলে স্বাধীন বাণিজ্য ভাঙ্গিয়া দিবে আদা জাহাজে রপ্তানি হয় নহিলে বলিতাম যে এ দেশের বড় বণিকদের পক্ষেও কে

ব্যাপারী হওয়া চলে,—কিন্তু জাহাজের খবর লওয়া চলে না। বিদেশীদের যে মাল এ দেশে কাটে, তাহার কারবার খুলিলেই ধ্বংস অনিবার্য্য। প্রায় সকল মালের সম্বন্ধেই একই কথা ; সকলপ্রকার শিল্পজাত সামগ্রীকেই ইউরোপীয়ের হাতে না সঁপিলে উপার্জ্জনের পথ নাই। একবার বহরমপুরের রেশমওয়ালারা এ দেশের ইংরেজ বণিকদের মধ্যস্থতা এড়াইয়া বিদেশের সঙ্গে সাক্ষাৎ কারবার করিতে গিয়া অত্যন্ত অপদস্থ হইয়াছিলেন। এবারকার একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। বাঙ্গলা দেশের কয়লা ব্যবসায়ীরা একটু অন্যায়ভাবেই বোম্বাইয়ে চড়া দামে কয়লা বেচিতেছিলেন। সেই সুযোগ পাইয়া রাজঅনুগ্রহরক্ষিত বণিকেরা বোম্বাইয়ে আফ্রিকার কয়লা সস্তাদরে বেচিল,—নিজেদের লোকসান করিয়াই সস্তায় বেচিল। বাঙ্গলার ব্যবসায়ীরা যখন হটিয়া গেল, তখন বোম্বাইয়ে পাকাদর চড়াইয়া বাঙ্গলায় আসিয়া সস্তাদরে কয়লা বেচিল। ইহার ফলে অনেক কয়লার কারবারী দেউলিয়া হইয়া কারবার ছাড়িয়াছে। এ দেশের কারবারীরা গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে রক্ষিত হয় না, কিন্তু "বিশ্বাসী" ইউরোপীয়েরা এ দেশে কারবার খুলিলেই সরকারের রক্ষার ঢাল পায়। উহারা জমি চাহিলে চা চাষ প্রভৃতির জন্য জমি পায় ও ব্যবসায়ের অনুকূলে নূতন নূতন আইন পায়। আমরা সেই সকল কারবারের পাশে একটু আধটু স্থান পাইতে পারি। একটা ছোট দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতে পারি যে এ দেশে কাগজের কল করিবার জন্য স্যর প্রফুল্ল রায়ের অধিনায়কত্বে যে কোম্পানি খুলিল, তাহারা রাজার অল্প একটু অনুগ্রহ পাইয়াও কোম্পানিটিকে সুরক্ষিত করিতে পারিবে কি ? ইহার মধ্যেই শুনিতেছি যে সরকারের নেক্‌নজরের ছায়ায় কাগজের কারখানার জন্য ইউরোপীয় উদ্যোগ হইতেছে। দেখিতেছি আমাদের কোন কারবার স্বাধীনভাবে বুক ফুলাইয়া প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। আফিসে হউক, কারবারে হউক, চাকুরি না জুটাইতে পারিলে রোজগারের পন্থা নাই। নিজেরা শিল্পাদিতে উপার্জ্জন করিতে পারিলেও ইউরোপীয়দের তাঁবেদারিতে সে উপার্জ্জন পাকা করিতে হয়। লোকে এ দেশে বিদেশী গবর্ণমেণ্টের চাপের কথা বলে, সেটা একরকম ভুল বলিলেই হয়। আমাদের ঘাড়ের উপর আসল চাপ পড়িয়াছে বিদেশীয় বণিকদের। আমরা যদি অক্ষত শরীরে স্বাধীন বাণিজ্য করিতে পারিতাম, যদি অনুগ্রহ-রক্ষিত কোম্পানিগুলির পাশে তুল্যভাবে সুরক্ষিত কোম্পানি সাজিতে পারিতাম, অর্থাৎ যদি অন্যান্য স্বাধীন দেশের মত এদেশে বিদেশীয় বণিকেরা বাণিজ্য করিত, তবে আমরা বিদেশ-বাণিজ্যকে ও বিদেশীর বাণিজ্যকে দেশের সম্পদবৃদ্ধির উপায় মনে করিতাম এবং নিজের দেশের লোককে নূতন নূতন উপার্জ্জনের পথে চালাইবার সুবিধা পাইতাম। এখন যে পথে হউক চলিতে গেলেই এদেশের শিক্ষিত যুবকদিগকে বাবু-চাকর অথবা মজুর হইয়া থাকিতে হইবে। তবে চাকুরির উমেদারেরা গালি খাইবে কেন ?

* * *

সাহিত্যের কৈফিয়ৎ প্রসঙ্গে—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শ্রাবণ মাসের "বঙ্গবাণী"তে সাহিত্য' সমালোচনার প্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার দুই একটি কথার সমালোচনা করিয়া অধ্যাপক শ্রীকমলকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় যাহা আমাদিগকে পাঠাইয়াছিলেন, তাহা মুদ্রিত হইতে পারিল না। শরৎ বাবু কিংবা আমরা প্রতিবাদ সহিতে অপ্রস্তুত নহি, তবে কমলকৃষ্ণ বাবুর প্রবন্ধে শরৎ বাবুর মূল প্রবন্ধের,—অর্থাৎ প্রধান বক্তব্য বিষয়ের—কোন প্রতিবাদ নাই; আছে কেবল শরৎ বাবুর দেওয়া দুই একটা দৃষ্টান্তের সমালোচনা। সাহিত্য যে একটা প্রাচীন রীতিনীতির বেড়ার মধ্যেই বদ্ধ থাকিবে না, একথা হয়ত কমলকৃষ্ণ বাবুও স্বীকার করেন। শরৎ বাবুর প্রবন্ধে দৃষ্টান্ত স্বরূপ বঙ্কিম বাবুর রোহিণী-চরিত্রের কথা ছিল। রোহিণীকে মারা গোবিন্দলালের পক্ষে কেন স্বাভাবিক ছিল, কমলকৃষ্ণ বাবু তাহার আভাস দিয়াছেন। এ বিষয়টি বাদ-প্রতিবাদের বিষয় হইতে পারে না।

শোক-সংবাদ

সাহিত্যিক প্রতিভায় যুবকবর্গের মধ্যে আমি যাহাকে অদ্বিতীয় মনে করিতাম সেই যুবক সুকুমার রায় দুই বৎসর কালা জ্বরে ভুগিয়া ৩৫ বৎসর বয়সে জীবনলীলা করিলেন। মরণের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও তাঁহার জীবনের প্রফুল্লতা ও সাহিত্য-রস শুষ্ক নাই; রোগশয্যায় শুইয়াই তিনি দুই বৎসর ধরিয়া "সন্দেশ" পত্রিকা পরিচালনে অ মনোহর রচনা করিয়াছেন, এবং মরণের আগেও ডাক্তারের কথা অগ্রাহ্য করিয়া কিছু লিখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। লণ্ডন হইতে B. Sc. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ আসিবার পর ৭।৮ বৎসর ধরিয়া যে অক্লান্ত পরিশ্রমে নানা সৎকার্য্য সাধনে ছিলেন, এখানে তাহার পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। সুকুমারের প্রতিভা যে অসামান্য পরিহাস রচনায় যে কেহ তাঁহার সমকক্ষ ছিল না, সে পরিচয় ভবিষ্যতে দিব।

Printed and published by Jyotish Chandra Ghosh at the Cotton Press, 57, Harrison Road, Calcutta.

KONNAGAR PUBLIC LIBRARY Estd. 1858

COLOUR PICTURE

বঙ্গবাণী

শিল্পী—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার · শিবের আত্মনিন্দা

তং বীক্ষ্য বেপথুমতী সরসাঙ্গযষ্টি র্নিক্ষেপণায় পদমুদ্ধৃতমুদ্বহন্তী।
মার্গাচল ব্যতিকরা কুলিতেব সিন্ধুঃ শৈলাধিরাজতনয়া ন যযৌ ন তস্থৌ।
(কুমারসম্ভব,—৫ম সর্গ—৮৫ শ্লোক)

INDIAN ART SCHOOL

DOUBLE COLOUR PAGE

"আবার তোরা মানুষ হ"

দ্বিতীয় বর্ষ
১৩২৯-'৩০

কার্ত্তিক

দ্বিতীয়ার্দ্ধ
৩য় সংখ্যা

যাত্রা

আশ্বিনের রাত্রিশেষে ঝরে'-পড়া শিউলি-ফুলের
আগ্রহে আকুল বনতল ; তা'রা মরণ-কূলের
উৎসবে ছুটেছে দলে দলে ; শুধু বলে, " চল, চল !"
অশ্রুবাষ্প-কুহেলিতে দিগন্তের চক্ষু ছলছল,
ধরিত্রীর আর্দ্রবক্ষ তৃণে তৃণে কম্পন সঞ্চারে,
তবু ওই প্রভাতের যাত্রিদল বিদায়ের দ্বারে
হাস্যমুখে ঊর্দ্ধপানে চায়, দেখে অরুণআলোর
তরণী দিয়েছে খেয়া, হংস-শুভ্র মেঘের ঝালর
দোলে তার চন্দ্রাতপতলে।

ওরে, এতক্ষণে বুঝি
তারা-ঝরা নির্ঝরের স্রোতঃপথে পথ খুঁজি খুঁজি
গেছে সাতভাই চম্পা ; কেতকীর রেণুতে রেণুতে
ছেয়েছে যাত্রার পথ ; দিগ্বধূর বেণুতে বেণুতে
বেজেছে ছুটির গান ; ভাঁটার নদীর ঢেউগুলি
মুক্তির কল্লোলে মাতে, নৃত্যবেগে ঊর্দ্ধে বাহু তুলি'

উচ্ছলিয়া বলে, " চল, চল ! " বাউল উত্তরে-হাওয়া
ধেয়েছে দক্ষিণ মুখে, মরণের রুদ্রনেশা-পাওয়া,
বাজায় চঞ্চল ছন্দে তালপল্লবের করতাল,
ফুকারে বৈরাগ্যমন্ত্র ; স্পর্শে তা'র হয়েছে মাতাল
প্রান্তরের প্রান্তে প্রান্তে কাশের মঞ্জরী, কাঁপে তা'রা
ভয়কুণ্ঠ উৎকণ্ঠিত সুখে,—বলে, " বৃন্ত-বন্ধহারা
যাব উদ্দামের পথে, যাব আনন্দিত সর্ব্বনাশে,
রিক্তবৃষ্টি মেঘ সাথে, সৃষ্টিছাড়া ঝড়ের বাতাসে,
যাব, যেথা শঙ্করের টলমল চরণ-পাতনে
জাহ্নবীতরঙ্গমন্দ্রমুখরিত তাণ্ডবমাতনে
গেছে উড়ে জটাভ্রষ্ট ধুতুরার ছিন্নভিন্ন দল,
কক্ষচ্যুত ধূমকেতু লক্ষ্যহারা প্রলয়-উজ্জ্বল
আত্মঘাত মদমত্ত আপনারে দীর্ণ কীর্ণ করে
নির্ম্মম উল্লাস-বেগে, খণ্ডখণ্ড উল্কাপিণ্ড ঝরে,
কণ্টকিয়া তোলে ছায়াপথ । "

ওরা ডেকে বলে, " কবি,
সে তীর্থে কি তুমি সঙ্গে যাবে, যেথা অস্তগামী রবি
সন্ধ্যামেঘে রচে বেদী নক্ষত্রের বন্দনা-সভায়,
যেথা তা'র সর্ব্বশেষ রশ্মিটির রক্তিম জবায়
সাজায় অন্তিম অর্ঘ্য ; যেথায় নিঃশব্দ বেণুপরে
সঙ্গীত স্তম্ভিত থাকে মরণের নিস্তব্ধ অধরে ? "

কবি বলে, " যাত্রী আমি, চলিব রাত্রির নিমন্ত্রণে
যেখানে সে চিরন্তন দেয়ালির উৎসব-প্রাঙ্গণে
মৃত্যুদূত নিয়ে গেছে আমার আনন্দ দীপগুলি,
যেথা মোর জীবনের প্রত্যূষের সুগন্ধি শিউলি
মাল্য হয়ে গাঁথা আছে অনন্তের অঙ্গদে কুণ্ডলে,
ইন্দ্রাণীর স্বয়ম্বর বরমাল্য সাথে ; দলে দলে
যেথা মোর অকৃতার্থ আশাগুলি, অসিদ্ধ সাধনা,
মন্দির অঙ্গনদ্বারে প্রতিহত কত আরাধনা

নন্দন-মন্দারগন্ধ-লুব্ধ যেন মধুকর-পাঁতি,
গেছে উড়ে মর্ত্ত্যের দুর্ভিক্ষ ছাড়ি' !

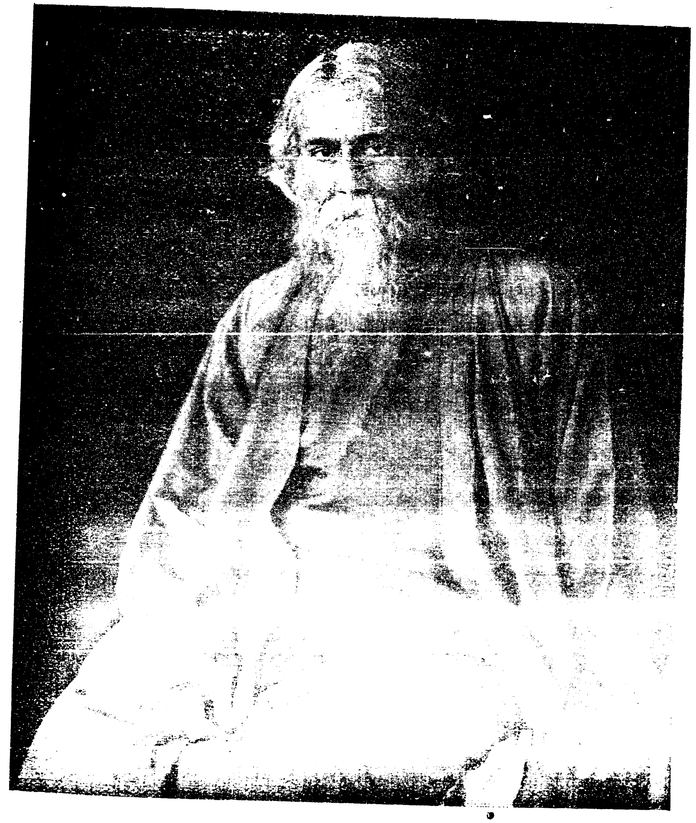

আমি তব সাথী,
হে শেফালি, শরৎ-নিশির স্বপ্ন, শিশির-সিঞ্চিত
প্রভাতের বিচ্ছেদ-বেদনা ! মোর সুচিরসঞ্চিত
অসমাপ্ত সঙ্গীতের ডালিখানি নিয়ে বক্ষতলে
সমর্পিব নির্ব্বাকের বাণীর নির্ব্বাণ-হোমানলে । "

৫ই আশ্বিন

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"গোলাপের" অপরাধ

Jeande Bourgogueর ফরাসী হইতে)

(১)

সাল্‌মো-গৃহিণীর একটা টুপীর দোকান ছিল। সেই নগরে একদল দুর্গ-সৈন্যের আড্ডা ছিল বলিয়া, সামরিক দ্রব্যসামগ্রীও দোকানে রাখা হইত। লাল রংএর টুপি, নীল রংএর টুপি, জরি লাগানো টুপি, পালক লাগানো টুপি—এই সব জিনিসে দোকানের শার্সি আলমারি ঝিক্‌মিক্ করিত।

তাছাড়া সাল্‌মো-দম্পতির কাজ বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল; এখন তাহাদের বেশ যচ্ছল অবস্থা। তাহাদের গোড়ার কথাটা এখন আর কাহারও মনে নাই। যে সময়ে সাল্‌মোর পিতা রোদে পুড়িয়া, বৃষ্টিতে ভিজিয়া, সহরের পথ দিয়া চলিতে চলিতে হাঁক্ দিয়া যাইত—"পুরোনো কোর্ত্তা, চাই পুরোনো কাপড়!"—সে সময়ের কথা এখন আর কাহারও স্মরণ নাই।

কিছুকাল পরে, বৃদ্ধ আর বেশী হাঁটাহাঁটি করিতে পারিত না বলিয়া একটা দোকানে বসিয়া তাহার ব্যবসা চালাইত। কিন্তু তাঁহার পরে তাঁর পুত্রটি ফেরী-করা ব্যবসায়ে ক্লান্ত হইয়া পুরোনো রদ্দি মাল বিক্রয় করিয়া সেই টাকায় পারী নগরের ধরণে একটা জম্‌কালো রকম টুপির দোকান খুলিয়া বসিল।

তাহার স্ত্রী দুঃখদৈন্যের সময়েই সাল্‌মোকে বিবাহ করে; এবং তখন তাহাদের কাজ কর্ম্মের অবস্থা ছিল, সেই অনুসারেই হিসাব করিয়া চলিত। কিন্তু এখন সে বেশ পরিচ্ছন্ন হইয়া থাকে, বেশভূষায় বেশ সুসজ্জিত হইয়া থাকে। এখন সে রেশমি পরিধান করে, কাণে হীরার কাণবালা, আঙ্গুলে হীরার আংটি পরে। বেশ নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করে।

সাল্‌মো-গৃহিণী দোকানের হিসাবপত্র রাখে, খরিদ্দারদিগকে আদর অভ্যর্থনা করে যে খুব ধনী, এবং তাই ব্যস্ত না হইয়া ধীরে সুস্থে কাজ করে—ইহাই দেখাইবার জন্য সে রাস্তার দিকে দরজার কপাটে ঠেস দিয়া অলস-ভঙ্গীতে, বাহুদ্বয় বক্ষে আড়াআড়িভাবে রাখিয়া, মুখ ধরিয়া বসিয়া থাকে। সম্মুখ দিকে সিধা চাহিয়া থাকে—সেই চাহনীতে একটা অলস লক্ষিত হয়—যেন একটা স্বপ্ন হইতে সদ্য জাগিয়া উঠিয়াছে।

আর সাল্‌মো লোকটি বেঁটেখেটে, নাদুশ-নুদুশ, আমুদে; সুবেশী বলিয়া তাহার একটা অহঙ্কার আছে। নিজের ব্যবসায়ের উপযুক্ত কাপড় চোপড় ছাড়িয়া দিয়া সে দুরস্ত ভাল ভাল কোর্ত্তা, ভাল ভাল পেণ্টুলুম—ভাল ভাল ফোতুই সর্ব্বদাই পরিয়া থাকে।

এই টুপির দোকানদার, তার দোকানের সম্মুখে লম্বালম্বি ভাবে পায়চালি করিতে ভাল বাসিত। পকেটে হাত গোঁজা, মুখে মৃদুহাস্য, খরিদবিক্রীর কাজের উপর নজর আছে অথচ যেন নির্লিপ্ত। শেষ-জাত ছেলেটির খেলাধূলা দেখিতেছেন, আর আনন্দে আত্মহারা হইতেছেন।

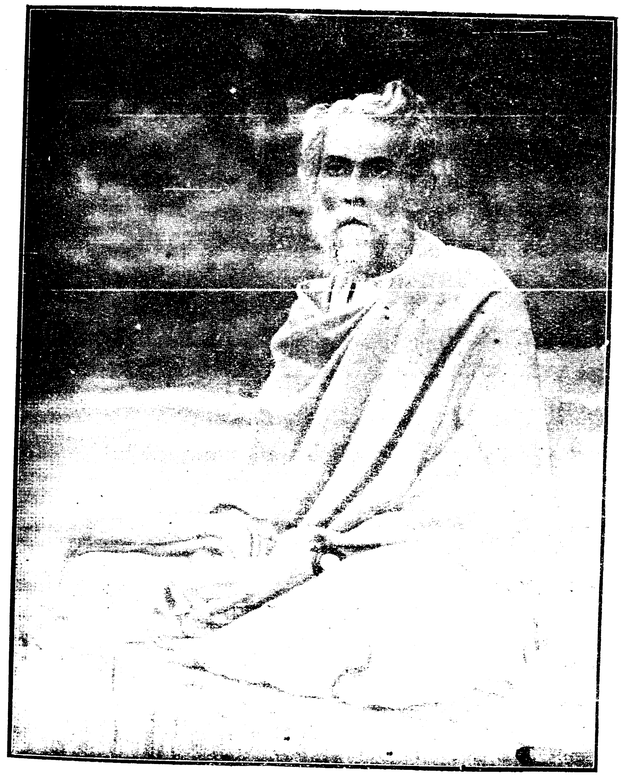

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

পল্লীগ্রামে এইরূপ ছেলেকে নাবী বর্ষার মত "নাবী" ছেলে বলে। কেননা, তার ভগিনী "গোলাপের" ১০ বৎসর পরে ওর জন্ম হয়। তাই এই ছেলেটির উপর বাপমায়ের ভালবাসা অপরিসীম।

বাপমায়ের চোখের সাম্‌নে ছেলেটা খেলা করিত, মখমলের পাজামাটা ফুটপাথের উপর দিয়া টানিয়া টানিয়া চলিত। পার্শ্ববর্ত্তী ময়রার দোকান হইতে নানাবিধ মিষ্টান্ন মুখে ভরিয়া

কাঠবিড়ালীর মত তার সুন্দর ঠোঁট্ চট্‌চটে করিয়া তুলিত; তার পর তাহার মার কাছে আসি
আধো আধো খোকার ভাষায় বলিত—"আমার এখনো পেত ভরে নি—তবু দিদি বলে কিন
আল্ খাস্‌নে।"

সে যাহা চাহিত, ময়রা তাহাই দিত—জানিত, যতই কিনুক না, ওর মা সব টাকা শো
করিয়া দিবে।

সাল্‌মো-গৃহিণীর এখনও বয়স কম, দেখিতেও বেশ সুশ্রী। নিজ কন্যার সঙ্গ তার
লাগিত না। গোলাপের এখনও "খুকী" ডাক নাম ঘোচে নাই, এখনও ছোট মেয়ের মত খা
ঘাগ্‌রা পরে, কিন্তু আসলে সে এখন ষোড়শী রমণী।

মেয়েটি রূপসী। ইহার রূপ প্রাচ্য ধরণের,—কোন ক্ষয়ের চিহ্ন দেখা দিলেও এই রূ
বদল হয় না। এবং বোর্ডিং-স্কুল সুলভ খাটো কাঁপড় পরা সত্ত্বেও, সৌরকরোজ্জ্বল দে
কন্যাদের ন্যায় ইহার গতিভঙ্গী অতি নমনীয়; অতি কমনীয়, অজ্ঞাতসারে বিলাসলালসা
তপ্ত কাঞ্চনের মত গায়ের রং; ডালিম ফুলের চেয়েও উজ্জ্বল ওষ্ঠযুগল; সরল নাসিকা;
ভারী ভারী চোখের পাতা; সেই নেত্র পল্লবে অর্দ্ধাবৃত ঘোর কৃষ্ণবর্ণ নেত্রযুগল; তমসাচ্ছন্ন
বিলম্বে যে সব তারার উদয় হয় সেই তারার মত, ঐ নেত্র হইতে একটা মধুর জ্যোতি নি
হইতেছে। তাহার চুলও কালো রেশমি ধরণের, ঢেউ-খেলানো,—একটা স্থূল জালে বদ্ধ
পিঠের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এইরূপ কেশ বন্ধনে তাহার ছোট মেয়ের ভাবটা
গিয়াছে। কিন্তু এই কেশ বন্ধনে তাহাকে বেশ মানাইয়াছে। ইহা ছাড়া তাহার
কতকগুলা সোণার মোহর শোভা পাইতেছে অথবা মহম্মদের দেশের রঙ্গিণীদের ন্যায়
শেষ-প্রান্তটা মুক্তার পাড় দেওয়া একটা বস্ত্রখণ্ডে আবদ্ধ।

এইরূপে, মেয়েটি তাহার মায়ের আত্মাভিমানে যেরূপ আঘাত করিল, সেইরূপ
সতর্কবুদ্ধিকেও একটু উষ্‌কাইয়া দিল। সাল্‌মো-গৃহিণী মেয়েকে দোকানে আর আসিতে
না—এই ছুতা করিয়া আসিতে দিত না যে, তাহার দোকানের খদ্দের সবই পুরুষ—এই
পুরুষ খদ্দেরদিগের সংস্পর্শে আসা "খুকীর" পক্ষে সুবিধাজনক নহে।

এই বিশুদ্ধ নীতির দোহাই দিয়া, বাড়ীর এক তেতালা ঘর তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট হই
এক ইহুদী ধাত্রী পাচিকার উপর তাহার তত্ত্বাবধানের ভার ন্যস্ত হইল। এই ঘুরঘুরে পাড়া
স্ত্রীলোকটা যারপরনাই নোংরা; কিন্তু গৃহিণী মনে করিতেন, সে ভাল ভাল গুণে বি
কেননা সে ইহুদী ধর্ম্মগ্রন্থের খুব ছোটখাটো অনুশাসনও অক্ষরে অক্ষরে পালন করিত।
ব্যঞ্জনাদি আদৌ উৎকৃষ্ট নহে। নিম্ন শ্রেণীর মাংস; কিন্তু উহা শাস্ত্রনিদেশানুসারে
কাটিয়া, অর্দ্ধঘণ্টা বিশুদ্ধ জলে ধুইয়া তাহার পর একঘণ্টা ধরিয়া লুনে কচ্‌লানো হইত।
মাংসের খারাপ "ইস্টু", সুরুয়া স্বাদহীন, মাখন-বর্জ্জিত। তরকারিগুলা কি একটা ঘো

পদার্থের মধ্যে ভাসিত। তাহার এক সমধর্ম্মী যে বুট-জুতা বেচিত সে মিষ্টান্নও প্রস্তুত করিত। ধর্ম্মান্ধ সাল্‌মো-গৃহিণী, এই সমস্ত ব্যঞ্জন ও মিষ্টান্নে সন্তুষ্ট ছিলেন, কারণ তিনি মনে করিতেন, এই সমস্ত ঈশ্বরেরই ইচ্ছার অভিব্যক্তি।

ধাত্রী নোয়েমী, তরকারী-রান্নার বাসনের সহিত মাংসরান্না-বাসন মিশাইত না বটে, কিন্তু কোন বাসনই ভাল করিয়া ধুইত না। সে শুক্রবারে এমন করিয়া আগুন জ্বালাইয়া রাখিত, সাত-ডেলে প্রদীপে এমন করিয়া তেল ভরিয়া রাখিত যে, ইহুদী স্যাবাথের শনিবার রাত্রি পর্য্যন্ত উহা সমানভাবে জ্বলিত। কেননা, বাইবেল গ্রন্থে আছে:—"স্যাবাথের দিনে কোন কাজ করিবে না; কি তোমার পত্নী, কি তোমার পুত্র, কি তোমার গরু, কি তোমার গাধা—কাহাকেও সে দিনে কাজে খাটাইবে না।" এই ধাত্রী, ধূলা-গর্দ্দার প্রতি কটাক্ষপাত না করিয়া উহার মনিবদিগকে এই সব পূর্ব্ব দিনের বাসী রান্না জঘন্য খাদ্য সামগ্রী অম্লানবদনে পরিবেষণ করিত।

বোর্ডিং-স্কুল হইতে বাহির হইবার পর হইতে সাল্‌মো-দুহিতা "গোলাপ" এই প্রকার রমণীর সঙ্গ লাভ করিল। ধাত্রীর সঙ্গে রন্ধন কার্য্যে যোগ দেওয়াই তাহার এক প্রধান আমোদ ছিল। একটু পিয়ানো শিখিয়াছে, একটু শেলায়ের কাজ করিতে পারে, একটু রাঁধিতে পারে—আর কি চাই? গোলাপের মা ইহাতেই সন্তুষ্ট আছেন। তিনি ভয় করিতেন, পাছে কেহ মেয়ের প্রশংসা করে। সে যে ভদ্র-সঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অলস জীবন যাপন করিতেছে, ইহাতে তাঁহার কোন ভয় হইত না।

(২)

অক্টোবর মাসের কোন এক অতি-ধূসর অতি-বিষণ্ণ দিনে, সাল্‌মো-গৃহিণী তাঁহার দোকানে এক প্রতিবেশিনীর সহিত কথা কহিতেছিলেন। তাহার মুখের ভাব গুরুগম্ভীর, ঠোঁট্ চাপা,—দেখিলে মনে হয় যেন সে কি-একটা গুপ্ত কথা জানে এবং তাহা প্রকাশ করিবার জন্য তাহার প্রাণ ছট্‌ফট্ করিতেছে। সাল্‌মো-গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন:—

"তুমি কি কথাটা খুব ঠিক্ করে জেনেছ?"

ভালনর-গৃহিণী যেন তাঁহার বিশ্বস্ততার সাক্ষ্য দিবার জন্য, বাহুদ্বয় উপর দিকে উত্তোলন করিয়া বলিলেন:—

এবিষয়ে আমি খুব নিশ্চিন্ত! আমি যে তাদের দেখেছি, নিজের চক্ষে দেখেছি! আমি শুধু নয়, আরও দশজনে দেখেছে,—হাত দিয়ে পরস্পরের গলা জড়িয়ে ধরে ওরা মাঠ দিয়ে চলেছে—এত কাছাকাছি হয়ে কথা কচ্চে যে মনে হয় যেন কথার সঙ্গে চুম্বনেরও বিনিময় চলচে।

সাল্‌মো-গিন্নির মুখ ফ্যাঁকাশে হইয়া গেল—সমস্ত মুখের মধ্যে কেবল তাঁর নেত্রযুগল অগ্নিশিখার মত জ্বলিতে লাগিল; তিনি বলিয়া উঠিলেন:—

—আঃ! এ বড় বেশী রকম! এ কথা আমি বিশ্বাস করিতে পারিনে ;—নিশ্চয় বাছি
বলেছে! গোলাপ ছেলে মানুষ একটা অবিবেচনার কাজ করতে পারে, কিন্তু তুমি যে রকম বল
সে একটা দোষ পুনঃপুনঃ করচে, তা কখনই তার দ্বারা হতে পারে না। একজন পুরুষ যদ
তার পিছনে পিছনে গেছে, এমন কি তার সঙ্গে কথাও কয়েছে একথা আমি স্বীকার করতে পারি,
জানি এই সব খৃষ্টানরা বড় অভদ্র! * * * গোলাপ যদি তার কথার উত্তর না দিয়ে নীরবে চলে গে
তাহলে আরও ভাল হত একথা আমি মানি * * কিন্তু ঐ পুরুষের হাত ধরা, রোজ রোজ তার
দেখা করা—না, না—হাজার বার না—এ কখনই হতে পারে না—এ ডাহা মিথ্যে কথা!

এই শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির পাত্‌লা ঠোঁটের উপর দিয়া একটু মৃদু হাসির রেখা চলিয়া গে
সে গোলাপের সমস্ত গুপ্ত ব্যাপার প্রকাশ করিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত। গোলাপের মায়ের কথা
যে একটা যন্ত্রণার ভাব প্রকাশ পাইতেছিল, তাহার জন্য তাহার কিছুমাত্র দয়ার উদ্রেক হইল না
তাহার কথার সত্যতা সমর্থন করিবার জন্য আরও অনেক খুঁটিনাটির বর্ণনা করিল।

—তোমার কি ভাই বিশ্বাস হয়, আমি একটা মিথ্যে গল্প, একটা অস্পষ্ট জনরবের ব
বিশেষতঃ এমন একটা বিষয় সম্বন্ধে—তোমাকে আমি বল্‌তে আস্‌ব? * * * বরং আমার জিব
ফেল্‌ব! * * * তবু—কিন্তু এ যে ইজ্জতের কথা। এ ইজ্জতের কথা; ইজ্জতের চেয়ে
কিছুই নেই! আমার স্বর্গীয় স্বামী এই কথা বল্‌তেন। তিনি তাঁর উপর-ওয়ালাদের
খোসামুদে কথা বল্‌তে পারতেন না বোলে, তাঁর পদোন্নতি হল না। খোসামুদি দূরে
তিনি সব হক্ কথা বলে দিতেন। এই বিষয়ে আমি কতকটা তাঁর মতন এবং এই জন্যই লো
কেলেঙ্কারি আমি তোমাকে জানাতে এসেছি।

খুকি এসব কিছু বোঝে না; তার এত অল্প বয়স,—নিতান্ত অবোধ, এতে যে কো
আছে সে তা জানে না। কিন্তু তার ধাত্রী—সেই পাকা ঘাগী—সে ত সব জানে। তার উ
দেওয়া উচিত ছিল। তাকে বিশ্বাস করাটাই তোমার ভুল। পাছে প্রেমিকযুগল বা
স্ত্রীইজন্য সে দূরে দূরে থাকে, তারা ধরা না পড়ে এইজন্য সে চারিদিকে নজর রাখে।
না—তাকে শুধু চাব্‌কে দেওয়া উচিত—একটা প্রকাশ্য জায়গায় চাব্‌কে দেওয়া উচিত।
তার উচিত শিক্ষা হয়।

গোলাপ ঐ উপর-তলায় আছে বলে তুমি বেশ নিশ্চিন্ত আছ—না ভাই? * *
কি করে তাকি জান? সাম্‌নের বাড়ীতে যে ছোঁড়াটা থাকে সে চুম্বনের ইঙ্গিত
গোলাপ তার জানালার পিছনে অর্দ্ধ-প্রচ্ছন্ন থেকে খিক্-খিক্ করে হাসে। প্রায়ই
সেই ছোঁড়াটা তার বারণ্ডায় দাঁড়িয়ে আছে, সেখান থেকে নড়ে না। ছোঁড়াটা
ছিপছিপে, দেখতে সুশ্রী। যদি সে গোলাপকে বিয়ে করতে রাজি হয়, তা'হলে
সুন্দর জামাই পাবে * *

চিত্তের অটল ধীরতা সত্ত্বেও, ভালনর-গিন্নি, সাল্‌মো-গিন্নির ভীষণ মুখের ভাব দেখিয়া একটু থতমত খাইয়া গেল। সাল্‌মো-গিন্নির নেত্র হইতে অনলশিখা নিঃসৃত হইতেছিল, ঠোঁটের রেখা বাঁকিয়া পড়িয়াছিল, সমস্ত শরীর থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। মায়ের প্রাণে দুঃখের দারুণ রোষ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল। যে ব্যক্তি সচরাচর শান্তপ্রকৃতি, আজ তাহার এই ভীষণ রূপান্তর দেখিয়া ভালনর-গিন্নি এই সময় "পিট্টান" দেওয়াই সুবুদ্ধির কাজ বলিয়া মনে করিল। সে উঠিয়া পড়িয়া বলিল :—

"যাক্ যাক্, তুমি ভাই এর জন্য মন খারাপ করো না—এখনও বেশীদূর গড়ায়নি—তুমি দু'কথায় পাগলী মেয়েটাকে বুঝিয়ে দিতে পার্‌বে। শীঘ্রই আবার তোমার সঙ্গে দেখা করব। আজ আসি।"

সেই সময় সাল্‌মো দরজার পায়চালি করিতেছিল—কিন্তু তাকে কোন কথা না বলিয়া সাল্‌মো-গিন্নি ঝড়ের মত সিঁড়ি দিয়া অন্তর্হিত হইল।

এই সময়ে, ক্রোধান্ধ জননী ও ভয়ভীতা দুহিতা—এই উভয়ের মধ্যে একটা তুমুল ব্যাপার চলিতে লাগিল। কান্নাকাটি, চীৎকার ও ভৎর্সনাবাক্য শুনা যাইতে লাগিল। * *

ধাত্রী নোয়েমী তাড়া খাইয়া, সিঁড়ির নীচে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছিল, মেয়েটার পক্ষ সমর্থন করিয়া কিছু বলিতে তাহার সাহস হইতেছিল না। ভীতিবিহ্বল হইয়া, হাঁ করিয়া দন্ত বিকাশ করিয়া সে সব শুনিতেছিল; তারপর হঠাৎ দরজার পিছনে সালোম-গিন্নির পায়ের শব্দ শুনিয়া সে পলায়ন করিল। ইতিমধ্যে সাল্‌মো-গৃহিণী আবার শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, নীচে নামিলেন এবং টুপির বিচিত্র বর্ণের উজ্জ্বল পালোক, ও জরি-জরাওর মধ্যে, দোকানের দফ্‌তর-ডেস্কের সম্মুখে তাঁহার সেই চিরন্তন অলস ভঙ্গীতে আসিয়া বসিলেন।

কয়েক ঘণ্টা পরে যখন সাল্‌মো উপরের ঘরটায় প্রবেশ করিলেন, তখন গোলাপকে দেখিতে পাইলেন না—সে তখন অন্তর্হিত হইয়াছে।

দম্পতীযুগল একটু ভাবিত হইয়া পড়িলেন; তাহার পর, গোলাপ প্রস্থান করিবার সময় যে সব চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছিল তাহা ধরিয়া ফেলিলেন। চিত্তহরণকারী কোন সুন্দর পুরুষের দৃষ্টি যাহাতে তাহার উপর পড়িতে না পারে এই জন্যই গোলাপের মা গোলাপকে একটা ছোট ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না। সে তাহাদের চোখে ধূলা দিয়া পলায়ন করিয়াছে। একটা চ্যালা-কাঠ ঘরের মেজের উপর পড়িয়াছিল, সেই কাঠটা উঠাইয়া লইয়া ঘরের তালাটার উপর সজোরে আঘাত করায় তালাটা ভাঙ্গিয়া যায়। তখন ঘর হইতে বাহির হইয়া, খাবার ঘরের বাসন-আলমারির উপর একটা চাবি ঝোলানো ছিল সেই চাবিটা দিয়া প্রবেশদ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া পড়ে; যাইবার সময় দরজার কপাটও ভেজাইয়া যায় নাই। যেন মূক দেওয়াল গুলাকে বলিতেছে এইভাবে গোপালের বাপ নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিল :—
"কোথায় সে?"

সাল্‌মো-গৃহিণী আরও রাগিয়া, ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল :—

ব্যাদ্‌ড়া মেয়ে ! * * খারাপ কাজত করেইছে—তার উপর আবার একগুঁয়েমি। বাপমায়ে শাসন মানে না—কি আস্পর্দ্ধা ! বাপ মা ত উচিত শাস্তিই দিয়েছিল। আচ্ছা, আচ্ছা, একবা ফিরে আসুক, তখন দেখা যাবে।" * * টুপির দোকানদার বারম্বার সেই এক কথা বলিতে লাগিল

—"সে সব ত পরে হবে—এখন কোথায় সে ?"

—"আমি তার কি জানি। সেই বেহায়া মেয়েটাকে তুমি খুঁজে দেখ না, হয়ত গেছে। যাও যাও শীগ্‌গীর যাও, আর দেরী কোরো না।"

সাল্‌মো-গিন্নি তাঁর ছেলেটিকে খাওয়াইলেন, তাকে বিছানায় শুয়াইয়া দিলেন। তারপর গজর-গজর করিতে করিতে স্বামীর অপেক্ষায় রহিলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তাঁর মেয়ে জ থতমত খাইয়া, অনুতপ্তা হইয়া ফিরিয়া আসিবে।

কিন্তু যখন তাঁর স্বামী হতবুদ্ধি হইয়া ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইতে তাকাইতে একা ফিরিয়া আসিল, তখন গিন্নির বুকে যেন একটা শেল বিঁধিল। একটা ভীষণ সন্দেহ হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল। তাঁর মেয়েকে কেহ হরণ করিয়াছে ! * * নিশ্চয়ই, ছোঁড়াটার কাজ। সেই হতভাগা !

—"নিশ্চয়ই সে, নিশ্চয়ই সে—ঐ সামনের বাড়ীর ছোঁড়াটা * * যাও দৌড়ে তাকে পাক্‌ড়াও করতে হবে।"

সাল্‌মো একেবারে হুড়মুড় করিয়া সেই বাড়ীতে গিয়া পড়িল—কাকে খুঁজিতে যাইবে কি বলিতে হইবে সে বিষয়ে তার স্পষ্ট কোন ধারণাই ছিলনা। সে আম্‌তা আম্‌তা ক লাগিল, অসংলগ্ন কথা বলিতে লাগিল, একটি সুন্দর ছেলে সেখানে আছে কিনা জিজ্ঞাসা ক লাগিল * *

হোটেলের কর্ত্তা তাঁর প্রতিবাসীর এলোমেলো পরিচ্ছদ দেখিয়া বিস্মিত হইয়া জি করিলেন :—আপনি কার সঙ্গে কথা কইতে চান্ ? পরিষ্কার করে বলুন না—মাথামুণ্ডু যে কিছুই বুঝতে পারচিনে।

সাল্‌মোর সহজবুদ্ধি আবার ফিরিয়া আসিল—সাল্‌মো ভাবিল, ঠিক কথাটা হইবে। মুখে একটু শান্তভাব আনিবার চেষ্টা করিল।

—আমি একটু ব্যস্ত ছিলাম বলে, আমার কথাগুলা একটু খাপছাড়া রকম হচ্ছিল। তেতালায় যে সুন্দর ছেলেটি থাকে তার সঙ্গেই আমি দেখা করতে চাই—কেবল আমি তার ভুলে গিয়েছি।

—"সেই বেলা, যে দেশ বিদেশে রেশ্‌মি কাপড় বেচে বেড়ায় ?"

—"বোধ হয় সেই, আমি জানিনে। আরে সেই সুন্দর ছোড়াটা যে সর্ব্বদাই তাদের বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে থাকে।" হোটেল-কর্ত্তা একটু চাপা হাসি হাসিলেন। বেশ যাহোক্, সাল্‌মো মশায় এমন একজনকে খুঁজছেন যাকে তিনি জানেন না। * * আপনার সেই সুন্দর ছোক্‌রা কাল যে চলে গেছে। তার ঘোরাঘুরির কাজ শেষ হয়েছে, ৬ মাসের মধ্যে সে আর ফিরবে না।

এই কথা শুনিয়া দুর্ভাগ্য সাল্‌মোর মনে হইল যেন তাহার মাথায় ছাদটা ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

চলে গেছে, কাল চলে গেছে ? * * সে যখন হরণ করে নিয়ে যাইনি—তবে আমার মেয়ে এখন কোথায় ?

চট্ করিয়া উঠিয়া সাল্‌মো রাস্তায় নামিয়া পড়িল এবং লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া পাগলের মত রাস্তা দিয়া চলিতে লাগিল ; তারপর এক-এক লাফে সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া, দরজায় দাঁড়াইয়া স্ত্রীকে বলিল :—

—"সে না, সে চলে গেছে।" গোলাপের মা বলিয়া উঠিল :—

ওমা কি হবে ! আমার মেয়ে ! * *

এখন আর বিবেচনার সময় নাই, যে রকমেই হোক্ মেয়েকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। প্রতিবাসীদের খবর দেওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই কথাটা তাহাদের মধ্যে খুব রাষ্ট্র হইয়া গেল।

পল্লীগ্রামে এইরূপ কোন ঘটনা ঘটিলে লোকেরা খুব কুতূহলী ও বাচাল হইয়া উঠে ; কিন্তু যারা বহুকাল হইতে পরস্পর জানে, পাশাপাশি একত্র বাস করিয়াছে, বুড়াইয়া গিয়াছে, একই রকম জীবন যাপন করিয়াছে—তাহাদের মধ্যে একটা প্রগাঢ় একাত্মভাব থাকে। ২০ জন পুরুষ বাড়ী হইতে তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া পড়িল—সেই সময় কেহবা খাইতে খাইতে গুল্‌গুজব করিতেছিল, কেহবা তাস খেলায় মাতিয়াছিল। কিন্তু এই খবর পাইবামাত্রই তাহারা সব ছাড়িয়া গোলাপকে খুঁজিতে চলিল।

মাতৃভাবে ঘা লাগায় রমণীগণ আসিয়া সাল্‌মো-গৃহিণীকে ঘিরিয়া রহিল ; নানাপ্রকার সান্ত্বনা বাক্য বলিতে লাগিল ; তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল, তাহার ভয় নিতান্ত ছেলেমানুষী। প্রত্যেকেই উহারই সদৃশ ঘটনা উল্লেখ করিল, কত অভিমানী মেয়ে বাড়ী থেকে চলে গিয়েছিল, তারপর সহরময় ঘুরে আবার ভাল মানুষের মত ঘরে ফিরে এসেছে—বেড়াল-বাচ্চা যেমন খামখেয়ালি ভাবে বাহিরে চলে গিয়ে আবার ঘরে এসে ঢোকে—এ সেই রকম। বিশেষতঃ ভালনর গৃহিণী—যাহার মন অনুতাপে একটু বিচলিত হইয়াছিল, সে আরও বেশী রকম আশ্বাস দিল।

কিন্তু সালমো-গৃহিণী ও-সব কিছুই শুনিল না। একটু শব্দেই চমকিয়া উঠিতে লাগিল ; দরজার দিকে ছুটিয়া গিয়া আবার হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিল। প্রত্যেক মিনিটেই তার দুর্ভাগ্য আরও যেন গাঢ়রূপে অনুভব করিতে লাগিল।

অবশেষে, মনের যন্ত্রণায় অভিভূত হইয়া, সিঁড়ির তলদেশ হইতে আর নড়িল না, লোহার রেলিং-এ ঝুঁকিয়া তাহাতে ভর দিয়া রহিল—লোহার ঠাণ্ডায় তাহার জ্বালা যে একটু উপশম হইল। সেখান হইতে, সিঁড়ির অন্ধকারের মধ্যে, চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল, আর সেই এক কথাই বার-বার বলিতে লাগিল :—"গোলাপ! আমার খুকী!" ঐ পুরাতন বাড়ী, উহারই বিষাদ-ঘন ঘোরতর প্রতিধ্বনি করিতে লাগিল।

অনুসন্ধানকারীরা প্রথমে ষ্টেশনের দিকে গেল, কিন্তু পলাতকের কোন সন্ধান পাইল না। সহরের মাঝে গিয়াও কোন খবর পাইল না। কিন্তু একটা বিশেষ রাস্তায় গিয়া পড়ায় একটু খোঁজখবর পাওয়া যাইতে লাগিল।

কতকগুলি লোক যাহারা প্রায় ৫টার সময় তাহাদের দরজার দাওয়ায় দাঁড়াইয়া হাঁ করিয়া আকাশের পানে চাহিয়াছিল, তাহারা ঐ সুন্দর মেয়েটিকে দেখিতে পাইয়াছিল—খুব ফর্সা—চুল খুব কালো। কোয়াসার মধ্য দিয়া মেয়েটি মাথা নীচু করিয়া, খুব দ্রুতপদে চলিতেছিল। তাহারা ভাবিয়াছিল, কোন প্রেম-মুগ্ধা বালিকা, এই কোয়াসার মধ্যে পাইয়া কোন সংকেত-স্থানে যাইতেছে।

আর কতকগুলি লোক বলিল, তাহাকে বড়-গির্জার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াতে দেখিয়াছে। যেন কোন কষ্টে পড়িয়া নীরব ভাষায় দেবতার সাহায্য চাহিতেছে। মজুর বলিল, তাহাকে গলিঘুঁচির মধ্যে ছাতা-ধরা পোড়ো বাড়ীর আশপাশে ঘুরিতে দেখিয়াছে।

কতকগুলি রমণী বলিল, মেয়েটির রকম-সকমে আশ্চর্য্য হইয়া তাহার পিছু খানিক দূর গিয়াছিল, কিন্তু সে একটা রেলওয়ে সাঁকোর নীচে ঢুকিয়া পড়িল—তাহার চুল ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাওয়া গেল না।

তখন রাত্রি ৭টা। নগরের কাজকর্ম্ম সারা হইয়া গিয়াছে। এই সাঁকোর পর ফাঁকা মাঠ ধুধু করিতেছে; কেবল একটা খাল ও একটা নদী মাঠকে খণ্ডিত করিয়াছে। নদীর কর্ণবধিরকর কল কল শব্দ শুনা যাইতেছে।

(৩)

কালোসাপের মত একটা খাল আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলিয়াছে—যেন তাহার আর নাই। ঐ খালের ধার দিয়া গোলাপ কাঁপিতে কাঁপিতে চলিয়াছে—তাহার সর্ব্বাঙ্গ জমিয়া গিয়াছে। সে স্বপ্নচারীর মত চলিয়াছে—কোথায় যাইতেছে জানে না; হইতে আসিয়াছে ঠিক্ মনে করিতে পারিতেছে না—কেবল ধমকানি ও নিষ্ঠুর প্রহারের তার মনে ছিল * * মার খাওয়া! * * সে যেন হল—ছোট মেয়েকে শাসনের জন্য প্রহার যেতেও পারে; কিন্তু অপমানিত হওয়া! ওরা ওকে পাপীয়সী মনে করেছে। মা ক্রোধান্ধ হইয়া, কোন ঢাকাঢাকি না করিয়া, কঠোরভাবে স্পষ্ট কথা শুনাইয়া

তার মুখের সাম্‌নে এমন কতকগুলা জঘন্য কথা বলিয়াছে যার অর্থ বালিকা কিছুই বুঝিতে পারে নাই। এইটুকু মাত্র আন্দাজে বুঝিয়াছিল, তাকে কলঙ্কিনী মনে করা হইয়াছে।

সে পাপীয়সী! * * সে এমন কি কাজ করিয়াছে যাহাতে ঐ নামে সে অভিহিত হইতে পারে?

সর্ব্বদাই একলা থাকে, কোন কাজ নাই; সে তার প্রতিবাসী সুন্দর ছোকরাটার গুপ্ত প্রেমের হাব্‌ভাবে আমোদ পাইত এই মাত্র। ইহাতে তার মনের উপর বিন্দুমাত্র আঁচ লাগে নাই।

পর্দ্দার আড়ালে থাকিয়া, পর্দ্দার একটু ফাঁক হইতে, সে তার রঙ্গভঙ্গ দেখিয়া, জানালার ধারে তাহার দাঁড়াইবার ভঙ্গী দেখিয়া, তার শূন্যে নিক্ষিপ্ত চুম্বনের ইঙ্গিত দেখিয়া সে ও নেওমী দু'জনেই হাসিত।

তারপর এই রঙ্গলীলার মজাটা খানিকক্ষণ উপভোগ করিয়া সে প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িত। তখন পাচিকা পোড়া চাম্‌ড়ার দাগে চিহ্নিত তার মুখখানা নির্ল্লজ্জভাবে বাহির করিত এবং নানাপ্রকার মুখভঙ্গী করিয়া প্রেমের হাবভাব প্রকাশ করিত। তখন সেই ছোকরা সেই কদাকার পাচিকার হৃদয় জয় করিয়াছে দেখিয়া একটু ভীত হইয়া পড়িত।

গোলাপ যখন বাহিরে যাইত, সেই ছোক্‌রা তার পিছনে পিছনে দ্রুতপদে চলিত—চলিতে চলিতে হাঁপাইয়া পড়িত। কেবল একবার ঘোড়-দৌড়ের মাঠে তাহাকে কাছাকাছি পাইয়া, ইয়ারকীর ধরণে কতকগুলি কুৎসিৎ কথা বলিয়াছিল, একথা সত্য; তখন গোলাপ ভীত হইয়া তাহার ধাত্রীর হাত ধরিয়া পলায়ন করে। এবং মনে মনে ভাবিয়াছিল, যখন এরূপ খারাপ পরিণাম হইয়াছে, সে আর কখন তাহার রঙ্গভঙ্গ দেখিয়া হাসিবে না।

গোলাপের একটা ভুল হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। তাকে কি এইজন্য প্রহার করা, অপমান করা, ইঁদুর ছুঁচোর মত, আবর্জ্জনার মত একটা নোংরা জিনিস মনে করিয়া সেইরূপ তাহার প্রতি ব্যবহার করা উচিত হইয়াছিল? * * তার মা তাকে ভালবাসে না, যদি ভালবাসিত তাহা হইলে ধমকাইয়া তাহার পর আবার তাকে কোলে তুলিয়া লইত * * না, মা তাকে দুচক্ষে দেখ্‌তে পারে না—মা ছোট ভাইটিকেই খুব ভালবাসে; মেয়েকে কখনই ক্ষমা করবে না * * তাহলে এখন দূরে চলে যাওয়াই ভাল। এইরূপ ভাবিয়া সে আবার পথ চলিতে লাগিল—তার মায়ের ভীষণ রুদ্র মুখ তাহাকে যেন বরাবর অনুসরণ করিতে লাগিল।

বালিকা চলিতে চলিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িল, পাথরে ঠোকর খাইতে লাগিল, ছেঁড়া জুতা পায়ে, চোট্ লাগিয়া পা থেঁথ্‌লিয়া গেল। সেখানকার অস্বাস্থ্যকর জোলো-বাতাসে সে ভিজিয়া গেল। গলায় কোন গলবন্ধ ছিল না; কিছুতেই গরম হইতে পারিতেছিল না।

বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ হইতেছে—দুইধারে গাছের সারি—গাছের পাতা ঝরিয়া

পড়িতেছে—ঘোর অন্ধকার, চারিদিক নিস্তব্ধ—বালিকার বড় ভয় হইল। তার
লাগিতে লাগিল—মনে হইল তার মৃত্যু আসন্ন।

সমস্ত জায়গাটাই যেন মৃতবৎ—তাহার মধ্যে সেই একমাত্র প্রাণী জীবন্ত।
মত কালো মেঘে, কাঞ্চন-কান্তি তারাগুলা ডাকিয়া গিয়াছে, অলস চন্দ্রমা অদৃশ্য
পড়িয়াছে—আকাশ হইতে কিছুই নামিতেছে না * * পথ দেখাইয়া দিবে এমন একটি
আসিতেছে না * * তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য একটু আলোও বন্ধুর মত অলক্ষ্যে
কপালের উপর আসিয়া পড়িতেছে না।

বালিকা হতাশ হইয়া পথের ধারে বসিয়া পড়িল, অশ্রুপাত করিতে লাগিল—চীৎকার
কাঁদিতে লাগিল—বলিতে লাগিল :—"ওগো তোমরা কেউ এসে আমার সঙ্গে দুটো কথা
আমার উপর একটু মমতা কর—আমি শীতে কাঁপছি—আমার শরীর একটু গরম করে দেও।"

গোলাপ ভাল মেয়ে, অতি কোমল-প্রকৃতি, কোন খারাপ কাজ সে কখনই করে
সে যদি সুন্দরী হয়—সে তাহার দোষ নহে * * এই জন্যই তার মা তাকে দেখিতে
না, তার সুন্দর চোখ, সুন্দর ঠোঁট, তার বয়স ১ বৎসর, এই জন্যই কি সে অপরাধী
অন্য ছেলে মেয়ের মা আছে—কিন্তু তার মা নেই—তার মা বড় হিংসুটে—
কেবলই কষ্ট দিচ্চে—যন্ত্রণা দিচ্চে * * এত দূরে চলে যাই যাতে কেউ না আমাকে
পায়—আমাকে খুঁজে না পেলে হয়ত মায়ের একটু দুঃখ হবে।

মরণের কথা তার মাথায় আসিল, ক্রমে তার সমস্ত মনকে দখল করিয়া
সে কল্পনা করিতে লাগিল, এই একমাত্র উপায়ে তাহার মায়ের স্নেহকে সে জয় করিবে।

এইরূপ ভাবিয়া তার মন যেন একটু ক্লান্ত হইল। কিন্তু তখনও সে কাঁদি
সে মরে গেলে আবার হয়ত মায়ের ভালবাসা পাবে, তার কথা মনে করে আহা,
দুঃখ করবে—এই কথাটা তার অশ্রুর মধ্যেও একটা মাধুর্য্য আনিয়াছিল।
সে পাপ বলিয়া মনে করে নাই—সে মনে করিয়াছিল, সে তার মায়ের কাজে
বলি দিতেছে।

এ কাজটা খুব সহজ, খালটা দুই-পা দূরে; খুব মৃদু কলধ্বনি শুনা
খালের বদ্ধ জল কুয়াসায় ঢাকা। গোলাপ মনে করিল, এইবার আস্তে আস্তে
ভিতর প্রবেশ করিবে।

খুকী, একটু অপেক্ষা কর্, একটু অপেক্ষা কর্ * * তুই ঠাণ্ডায় ভয় কর্‌ছিলি—
করছিলি—কিন্তু এখন যে ভোর হয়ে এল—এইবার চারিদিক আলো হয়ে
মনটাও একটু প্রফুল্ল হবে—তবে একটু অপেক্ষা কর্, একটু অপেক্ষা কর্!!!

কিন্তু বালিকা আর অপেক্ষা করিল না; সেই গভীর খালের মধ্যে

পড়িয়া গেল—একটু যুঝাযুঝি করিল, ভয়ে ও যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া উঠিল—তারপর সব
শেষ হইয়া গেল।

(৪)

পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের ক্ষেত্রভূমি হইতে গোলাপের মৃত শরীর এক্ষণে বাড়ীতে আনিতে
হইবে।

রোরুদ্যমান কতকগুলি লোকে তাহাকে আড়কোলা করিয়া লইয়া আসিল; দুই দিন
পূর্ব্বে যে সিঁড়ি দিয়া দ্রুত নামিয়া আসিয়াছিল, সেই সিঁড়ি বাহিয়া আবার উপরে উঠিল।
দরজার চৌ-কাঠে তাহার মা আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল এবং চুম্বনে চুম্বনে তাহাকে
আচ্ছন্ন করিল। কিন্তু তাহার সেই সুন্দর চোখ দুটি চিরকালের মত মুদিত হইয়াছে—
তাহার মুখের হাসিটি চিরকালের মত অন্তর্হিত হইয়াছে—মায়ের অজস্র আদরেও তার
ওষ্ঠযুগল আর স্পন্দিত হইতেছে না;—সে মৃত্যুর মূল্যে এই আদর কিনিয়াছে—কিন্তু
তার মা আর তাকে এই পৃথিবীতে ফিরিয়া আনিতে পারিবে না।

সালমো-গৃহিণী ঘোরতর বিষাদে অভিভূত। এই আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে ১০
বৎসরের মত বুড়াইয়া গিয়াছে; মাথার চুল সাদা হইয়া গিয়াছে; তাহার চোখে কালী পড়িয়াছে,
মুখ চুবড়িয়া গিয়াছে। অনুতাপে তাহার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে; তার মেয়ের আত্মহত্যার জন্য সে
আপনাকেই অপরাধী মনে করিতেছে। হৃদয়বিদারক কথা বলিয়া মেয়ের নিকট ক্ষমা
প্রার্থনা করিতেছে, আর ক্রমাগত মাটীতে কপাল ঠুকিতেছে। সে এইরূপ বলিতে লাগিল :—

"গোলাপ, আমার গোলাপ, আমার চির-আনন্দ, আমার প্রাণ-পুত্তলী, একবার আমার সঙ্গে কথা ক'।
তুই মরিস্ নি; তুই এমন করে কখনই আমাকে ছেড়ে যাস্‌নি * * বাছা আমার, তোকে—
আমার পেটের মেয়েকে—আমি মেরেছি—তোর নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের উপর মিথ্যে দোষ দিয়ে তোকে
আমি কলঙ্কিত করেছি—তাই তোর হতভাগিনী মাকে ছেড়ে তুই চলে গিয়েছিস। * * ভগবান
তোমাকে একটি নিষ্কলঙ্ক শুভ্র কপোতী দিয়েছিলেন—আমি তাকেই কি না বধ করেছি! * * প্রভু!
আমাকে যত ইচ্ছা শাস্তি দেও—আমি শাস্তিরই যোগ্য। আমার চুল কেটে ফেল্‌ব, মুখে মাখায়
এঁ মাখ্‌ব, যতদিন বাঁচি সন্ন্যাসিনীর মত জীবন যাপন কর্‌ব * * গোলাপ আমার, খুকী আমার,
আমারিণী আমার—একবার চোখ্ খুলে আমার দিকে চা—মা আমার!—একটিবার—একটিবার * *

সেখানে যাহারা উপস্থিত ছিল তার মধ্যে ভালনর-গৃহিণীকে দেখিতে পাইয়া গোলাপের
মা তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। এবং বিদ্বেষপূর্ণ কর্কশস্বরে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল;
"আমি ওকে বধ করেছি, কিন্তু তুই-ই আমাকে কতকগুলা মিথ্যা কথা বলে আমাকে দিয়ে কাজটা
করিয়েছিস্—আমরা দুজনেই খুনের অপরাধে অপরাধী!"

উহার হাত হইতে ভালনর-গৃহিণীকে ছিনাইয়া লইতে হইল—নচেৎ গোলাপের মা উহার
গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিত।

জীবনের মধ্যে এই একবার শুধু সাল্‌মো-গৃহিণী ইহুদি পোষাক বর্জ্জন করিল। অন্ত্যেষ্টি
সাদা কাপড়ে তাহার মেয়েকে না ঢাকিয়া, ক'নের যে প্রকৃত পরিচ্ছদ সেই রেশমী শাড়ী তাহাকে
পরাইয়া দিল, কেন না সে এইবার অনন্তের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইবে। তাহার বক্ষদেশ
তাহার সুগোল স্কন্ধ, তাহার সুকুমার বাহুদ্বয় টাট্‌কা গোলাপ গুচ্ছে আচ্ছাদিত হইল। তাহার
কাণের মুক্তা-অলঙ্কার হইতে শুভ্র কিরণ বিচ্ছুরিত হইতেছে। তাহার রেশমী কোমল খোলো চুল
কেশগুচ্ছ যেন আদর করিয়া তাহার গলার উপর এলাইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ সাজ সজ্জায়
ভূষিত হইয়া রূপসী গোলাপ-বালা তাহার কোন এক অজ্ঞাত প্রিয়তমের নিকট চলিয়া গেল।

গোলাপকে যখন কবরস্থ করা হয় তখন আমি উপস্থিত ছিলাম। যেরূপ ক্যাথলিক
মধ্যে সেইরূপ ইহুদীদিগের মধ্যেও আত্মহত্যা একটা মহাপাপ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থা
এইজন্য পাড়ার মেয়েরা সমাধি-শকটের রজ্জু কেহই ধরিতে রাজি হইল না। তাহাদের
হইল যেন এই কুমারীর শবাধার হইতে জ্বলন্ত অভিসম্পাত ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতেছে। উহারা
সংস্পর্শে বিপন্ন হইবে।

গোলাপের বোর্ডিং-স্কুলের বন্ধুরা খুব ভালো খৃষ্টান, তাহারা সমস্ত বিপদ ঘাড়
লইল; তাহারা তাহাদের গোলাপকে কখনই একা যাইতে দিবে না, তাহারা অনুযাত্রী
শবের পিছনে পিছনে চলিল।

ইহুদী-পুরোহিত অন্ত্যেষ্টি মন্ত্র পাঠ করিলেন। পুরোহিত গোলাপকে জন্মাইতে দেখে
তাহাকে খুব ভালবাসিতেন। পুরোহিত এই মর্ম্মস্পর্শী বিদায়-অভিভাষণ করিলেন;—

—যাও গোলাপ, বসরাই গোলাপ, মৃত্যু তোমাকে চয়ন করিয়াছে। অনন্ত পুরুষ তোমার
সদয় হইবেন, তুমি স্বর্গে আবার ফুটিয়া উঠিবে, তোমার সৌরভ আর কখনো উবিয়া যাইবে না।

তারপর পুরোহিত হিব্রু ভাষায় বড় বড় বাক্য উচ্চারণ করিয়া কি বলিলেন
এক বর্ণও বুঝিতে পারিলাম না। কেবল দেখিলাম, সেই সজ্জন পুরোহিত অশ্রুপাত করে
এবং আমি এই আশাটুকু বহন করিয়া সঙ্গে আনিলাম যে, একজন বৃদ্ধের অশ্রুজল, গোলাপ
সমাধির উপর মার্জ্জনার আশ্বাসবাণীরূপে পতিত হইল।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র

গোষ্ঠ গমন

ব্রজকুল চাঁদ আঁধ করি গোকুল
দরবিয়া দারু পাষাণ
জননীগণ মন- ধন ধটী আঁচরে
বাঁধি ভেল আগুয়ান।
সখি! শ্যামসুন্দর বনে যায়,
আধ খলিত পদ আনন্দে গদগদ,
নটন ভঙ্গী নটরায়। ধ্রু।

গগনে দেবগণ ঘন ঘন গরজই
জয় জয় নন্দ-কুমার।
সুর রমণী কত সুরভি ফুল বরিখত
আনন্দ মূরত অবতার॥
গোপী নয়ন জল পথ কিয়ে শীতল
তপনক' তাপ নিবারি,
আপন কমল দিঠি শেজ বিছাওল
ব্যাকুল ব্রজকুল নারী।
লাখ লাখ নিজ প্রাণ নিরমঞ্ছই
যা নখ কিরণ কণ আগে,
সো অব গোধন চারণে বনে ধাবই
গোপী, মরণ বর মাগে।

অতি সুবিশাল ভাল তট সুন্দর
টলমল তরল নয়ান,
দশ দিশ নিরীক্ষন সঘনে মধু বরিখন
পুন হি জীবন মাগে দান!
কমল পরশ জিতি ও পদ কোমল
হরি! হরি! কি কহব আজ,
নন্দরাণী ধরি' ধরি' চুম্ব দেওত
সো কণ্টক বন মাঝ।
দাহিনে রাম সুবল চলু বামহি
নূপুর রুণু রুণু বোলে।
নন্দীশ্বর পুর- দ্বার পার ভেল
হৈ হৈ আবাঁ আবা রোলে।
নৌতুন শ্যামল তৃণময় প্রান্তর
শীতল যমুনা কিনার
নাচত শ্যাম সুন্দর ধন হরখিত
গাবত সকল কুমার।
মণি মুরলী রহি রহিয়া উগারত
সঞ্জীবন মধু ধারা।
শ্রীকৃষ্ণ দাসীক' প্রাণ পঁহু খেলত
জয় জয় গোঠ বিহারা॥

শ্রীসুশীলাসুন্দরী দেবী

বাজপাখী

রহিম একে গরিবের ছেলে, তায় অনাথ—এতিম্। তাহার না আছে আশ্রয়, আর
আছে কোনো নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম। প্রকৃতির কাছে প্রশ্রয় পাইয়া তাহার মনটা হইয়াছিল বিচি
উচ্চাকাঙ্ক্ষায় ভরা।

রহিমের চোখ দুটা দিনের রূপের দর্পণ যেন ;—সন্ধ্যায় তাহা ম্লান নিষ্প্রভ হইয়া রাত্রি
অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িত, আবার উষার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার চোখ দুটিও উজ্জ
হইতে আরম্ভ করিত ; উষার গোলাপী আভার উপর যখন নবারুণের লালিমা-সম্পাত হইত তখ
রহিমের চোখ দুটাও গলা সোনার মতন উজ্জ্বলতায় টলটল করিত ; শরতের সোনালি রো

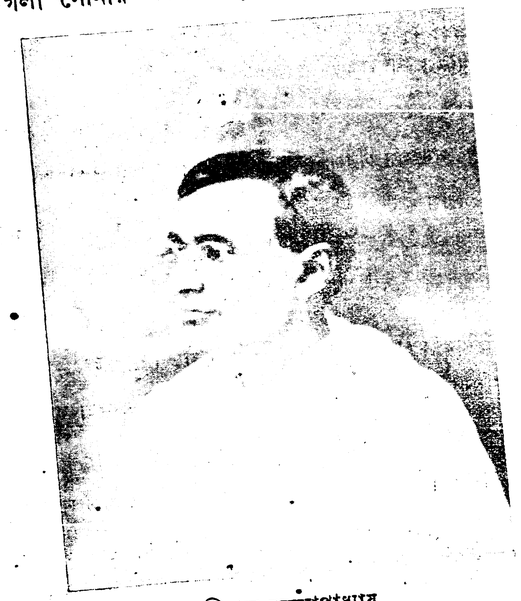

শ্রীচারু বন্দ্যোপাধ্যায়

যখন তাহার কালো বাবরী চুলের উপর ও তাতারী ফর্সা মুখের উপর আসিয়া পড়িত, তখন
চোখ দুটাও অগ্নিশিখার প্রসারণ-সঙ্কোচনের মতন জ্বল জ্বল করিতে থাকিত—সে দৃশ্য
ক্ষেত-ভরা শস্যের উপর শিশির পড়িয়াছে, তাহার উপর উষার গোলাপী আলো ও অরুণ
সোনালি আভা তেরছা হইয়া পড়িয়াছে, দূরে দিক্-বলয়ের ধারে নীল বনের কোলে ঘুম
পাতলা জাল ঝুলিতেছে—যেন সুন্দরীর নীল নয়নের ছানি ; একটা মেটে রঙের খরগো
ক্ষেতের ভিতর দিয়া গাছগুলিতে দোলা দিয়া ঢেউ তুলিয়া শিশির ঝরাইয়া রামধনুর রং

ছুটিয়া গেল ; পাখীরা ডাকাডাকি করিয়া পরস্পরকে জাগ্রত করিয়া বাসা ছাড়িয়া উড়িতেছে আর হঠাৎ ভার-মুক্ত হইয়া পল্‌কা ডালগুলি দুলিতেছে।

তাহার দৃষ্টি ছিল তীক্ষ্ণ এবং ব্যগ্র, উচ্চাকাঙ্ক্ষায় জ্বল জ্বল,—যেন খাপেরুদ্ধ শাণিত ছোরার জলুশ, বাদ্‌শাজাদীর হাওয়া-কাপড়ের ওঢ়্না-ঢাকা বাদ্‌শাজাদীর শুভ্র বুকের উপরকার মণিহারের ধুক্‌ধুকির উপর আলোর ঠিক্‌রিয়াপড়া! তাহার খালি-পায়ের গতিতে ছিল ছন্দ—বাদ্‌শাজাদার আরবী ঘোড়ার দুল্‌কি চাল। তার সর্ব্বাঙ্গের বলনিতে ছিল আনন্দ ও আগ্রহ—তখনও তাহা প্রকাশ পাইত যখন সে তাহার হাতীর দাঁতের মতন গোল গোল ফর্সা বাহুর বলনির উপর একমাথা কালো লম্বা চুল ছড়াইয়া সটান লম্বা হইয়া মাটিতে শুইয়া পড়িয়া শুনিতে পাইত দূরে বাজ শিকারীদের এক বিশেষ ধরণের চীৎকার আর তাদের ব্যস্ত পায়ের ছুটোছুটির দাপাদাপি। পরক্ষণেই সব চুপচাপ—আশ্চর্য্যকরা চমৎকার সুগম্ভীর স্তব্ধতা—অসহন অপেক্ষার শিহরণ যেন গুম্বজের খোলের মতন গভীর নিস্তব্ধ হইয়া বুকের উপর চাপিয়া বসিয়াছে। তার পর? তার পর দুটি শাদা-কালো দাগ জড়াজড়ি করিয়া ঘুরপাক খাইতে খাইতে স্বচ্ছ নীল আকাশের শামিয়ানার সীমানার দিকে উঠিয়া চলিয়াছে—ইহা দেখিয়াই রহিম্ হাতের কনুইএ ভর করিয়া কাত হইয়া উঠিয়া পড়ে, তখন তাহার চক্ষু বিস্ফারিত, দৃষ্টি স্থির, মুখ আগ্রহে ঈষৎ উন্মুক্ত! তার পর? তার পর যখন সেই শাদা-কালো ফোঁটা দুটি হঠাৎ এক যায়গায় মিশিয়া গিয়া পরক্ষণেই বিচ্ছিন্ন হইয়া নীচে পড়িতে থাকে, শাদা ফোঁটাটা আঁকা-বাঁকা শিথিলগতিতে আর কালো দাগটা বরাবর তার উপরে থাকিয়া নামিয়া আসে সোজা—বল্লমের মতন, তীরের মতন, তখন নীল আকাশের খোল শিকারীদের চীৎকারের আঘাতে বড় একটা উপুড়-করা ঘণ্টার মতন বাজিতে থাকে, সওয়ারেরা ঘোড়া ছুটাইয়া বাজের নখে বিদীর্ণবক্ষ বকের ও বিজয়ী বাজের পতন ও অবতরণ দেখিতে যায়। আর সঙ্গে সঙ্গে বালক রহিমও ছুটিয়া চলে। যখন প্রত্যাবৃত্ত বিজয়ী বাজের চোখ বাঁধিয়া তাহার প্রভু হাতের উপর বসাইয়া তাহার জয়ের উল্লাসে বিকম্পিত ও যুদ্ধে শ্রান্ত শিথিল ডানার উপর হাত বুলাইয়া দিতে থাকে, তখন রহিম আনন্দে হাততালি দিয়া চীৎকার করিয়া উঠে।

সে প্রায়ই শিকারীদের সহিত বাজ-বাহাদুর নবাবজাদার আস্তাবলে ফিরিয়া গিয়া দেখিত বাজ-বরদার সোনার গাম্‌লায় গোলাপজলে বাজের রক্তমাখা হলুদবর্ণ পা দুখানি ধোয়াইয়া নয়নসুখ রেশমী রুমালে কেমন যত্নে সন্তর্পণে মুছাইয়া দেয়, যেন সে বাদ্‌শাজাদারই ছেলে ; তার পর বাজের গলায় হাত বুলাইয়া সুড়সুড়ি দিয়া চুমকুড়ি দিয়া দিলাসা দিতে থাকে, আর বাজ সুখাবেশে চোখ বুজিয়া বাজবর্‌দারের কাঁধে মাথা রাখিয়া শিকার করার সুখস্বপ্ন দেখিতে থাকে।

রহিম নিজের পরমায়ুর দশ বৎসর বা নিজের হাতের দশ আঙ্গুলের একটার বিনিময়ে যদি একদিন অমনি করিয়া ঐ গর্ব্বগম্ভীর বাজপাখীকে হাতে লইয়া আদর করিতে পারিত! কিন্তু ঐ বাজপাখীকে ত তাহার ছুঁইবার জো নাই—উহারা যে বাদ্‌শাহী পাখী। নবাবের

হুকুম—নবাব-বংশ ও আমীর-ওম্‌রাহ্ ছাড়া আর কারো বাজ পোষা বা বাজের শিকার দে
নিষেধ—বাজ বাদ্‌শাহী পাখী। তাদের তীক্ষ্ণ নখ কিংখাবের দস্তানার খাপে ঢাকা থাকে, তা
চোখ কোমল রেশমী সুতার ফুলকাটা সাটিনের পটিতে বাঁধা থাকে, তারা তাজা মাংসের শিক-কা
খায় আর বিশেষজ্ঞ খিদ্‌মদ্‌গারেরা তাদের সঙ্গে বিচিত্র শব্দ করিয়া কায়দা-দুরুস্ত আলাপ ক
রহিম যখন বাজপাখীর আলস্য-ঢুলুঢুলু বড় বড় চোখের দিকে তাকাইয়া দেখিত তখন কেমন
লজ্জায় তাহার মন ভরিয়া উঠিত—বিশেষতঃ নবাবজাদার তাতারী বাজকে দেখিলে,—
চোখের ঠুলি লাল কিংখাবের, তাহার নখ-ঢাকা দস্তানা লাল কিংখাবের, তাহার পায়ে রূপার ঘু
তাহার পায়ে বাঁধা রেশমী ডুরী, তাহার দৃষ্টিতে গর্ব্বিত অবহেলা, আর তাহার সঙ্গে ফিরে
বীরত্বের কাহিনীর অপূর্ব্ব ছটা প্রভামণ্ডলের মতন তাহাকে ঘিরিয়া।

বাচ্চা বাজদের ধরিয়া আনিয়া পোষ মানানো হয়—অন্ধকারে উপবাসে রাখিয়া; ম
বন্দীদশার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে এখনো থাকিয়া থাকিয়া রাগে ফুলে, চোখ-ঢাকা ঠুলির আবরণ-রা
আবৃত হইয়া তাহারা মুক্তপক্ষ বিস্তার করিয়া শিকার ধরিবার সুখস্বপ্নে থাকিয়া থাকিয়া ঝি
হইয়া উঠে, ডাকিবার উপক্রমে গলা লম্বা করিয়া ফুলাইয়া ফুলাইয়া তুলে।—ইহাদের সে ক
কখনো খাঁচা হইতে বাহির করিয়া হাতে করিয়াছে। সে ইহাদের চোখের ঠুলি খুলিয়া আ
দেখাইয়াছে এবং উহারা আলোকাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে চকিত হইয়া নখ দিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরি
কিন্তু পরক্ষণেই তাহাদের চোখে আলো সহিয়া চোখ সঙ্কুচিত হইয়া আসিয়াছে, তাহার
হইয়া পড়িয়াছে, যেমন শান্ত থাকে যখন সে তাহাদিগকে টাট্‌কা-কাটা গরম রক্তমাখা
টুক্‌রা আদর করিয়া খাওয়ায়। কিন্তু ইহাদের নাড়িয়া-চাড়িয়া তাহার তৃপ্তি ছিল না,
লইবার সখ তাহার শীঘ্রই মিটিয়া গিয়াছিল—ইহাদের কাহারোই ত তাতারী বাজের মতন
পুষ্ট বক্ষ নয়, অমন লম্বা-চওড়া ডানা নাই, অমন সংযত শান্ত শক্তি নাই। কিন্তু
বাচ্চা বাজদের শিকারে কায়দা-দুরুস্ত রকমে তালিম করিয়া তোলা দেখিতেও কম আনন্দ
না—ক্রমে তাহাদের স্বাধীনতার স্মৃতি যতই মুছিয়া আসে তাহারা ততই গম্ভীর অন্ধ
হইয়া তাহাদের দাঁড়ে বসিয়া ঝিমায়।

প্রথমে তাহাদের বন্দী-দশায়-আড়ষ্ট ডানা মেলিয়া আবার স্বচ্ছন্দে উড়িতে শিখা
কিন্তু তখনো তাহাদের পায়ের সঙ্গে ঘুড়ির সূতার মতন লম্বা ডুরি বাঁধা থাকে; ক্রমে
বাজবর্‌দারদের ডাকে বকের-ডানা-লাগানো লাল কাপড়ের নকল পাখীর উপর পাক
মারিতে শিখিলে তাহাদের পায়ের দড়ির বাঁধনও খোলা হয়। বাজবরদারেরা যখন নকল
দড়িতে বাঁধিয়া শূন্যে বিশেষ ছকের চক্রাকারে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বাজপাখীদের প্রলুব্ধ করিতে
সে কী চমৎকার দৃশ্য! সেই নকল পাখীর বুকে মুরগীর বুক থেকে টাট্‌কা-ছেঁড়া রক্তমাখা
বাঁধা থাকে—বাজ পাখী ছোঁ মারিয়া নকল পাখীর বুক ছিঁড়িয়া সেই কলিজা পুরস্কার

লালসায় পরের হুকুমের বশ হওয়া তাহাদের সহিয়া যায়—বন্ধন-দশার রোষ তাহাদের ক্ষীণ হইয়া আসে। ক্রমে তাহারা প্রভুর হুকুমে উড়িতে ও ফিরিয়া আসিতে এমন অভ্যস্ত হইয়া উঠে যে বাজের পায়ের বন্ধন-ডুরিতে পলায়ন-চেষ্টার টান আর লাগে না, মুক্ত হওয়ার বন্য আগ্রহের উজ্জ্বলতা তাহাদের চোখে আর দেখা যায় না; তাহারা দস্তুর-মত এখন কোন্ শিকারের পিছু ছুটিতে হইবে সেই হুকুমের প্রতীক্ষায় শান্তভাবে ঝিমায়, এবং হুকুম পাইলে যথারীতি দস্তুর-মাফিক উড়িতে আরম্ভকরে ধনুকের মতন বক্র পথে—যথাসময়ে শিকারের উপর ঘুরিয়া আসিয়া অলসভাবে খেলাচ্ছলে ছোঁ মারিয়া ঝুঁকিয়া পড়িবে বলিয়া; তাহাদের পায়ের বাঁধন খসাইয়া দিলেও তাহারা এখন আর মুক্তির আনন্দ অনুভব করে না—স্বাধীনতার উন্মাদনায় শিহরিয়া উঠে না।

তখন তাহাদের প্রত্যেকের যোগ্যতা বিচার করেন তাহাদের প্রভু—কোন্‌টা হরিয়াল শিকারে পটু, কোন্‌টা তিতির শিকারে দক্ষ, আর কোন্‌টার বা চড়ুই-পাখীর চেয়ে বড় পাখী শিকারের যোগ্যতা নাই। বড় বাজগুলিকে খর্‌গোশ-বক চিল শিকারে নিযুক্ত করা হয়—চিল শিকারে—কাকের মতন ঘৃণ্য পাখী, কিছুতেই পোষ মানে না, তীক্ষ্ণ নখচঞ্চুতে দুর্দ্ধর্ষ ভয়ঙ্কর।

প্রথম প্রথম তাহাদের হন্তব্য পাখীর আকারের নকল পাখী উড়াইয়া তাহাদের তালিম করা হয়—সেই নকল পাখীর বুকের মধ্যে ভরিয়া দেয় তাহাদের প্রিয় খাদ্য, তাহারা তাহা নকল পাখীর বুক ছিঁড়িয়া খুঁজিয়া বাহির করিয়া পুরস্কার লয়। তাহার পরে তাহাদিগের সাম্‌নে জখমী পাখী ছুড়িয়া দিয়া তাহাদের তালিম করা হয়—জখমী পাখীর বুক ছিঁড়িয়া কলিজা উপ্‌ড়াইতে সহজেই পারে, অথচ জীবন্ত প্রাণী বধ করিবার হিংস্র আনন্দ তাহাদের উত্তেজিত করিয়া তোলে। ক্রমে তাহারা ধরা কঠিন শিকার ধরিতে অভ্যাস করে এবং শিকারের নেশার পরিচয়ে শিকারের প্রতীক্ষায় উন্মুখ হইয়া থাকে। এইরূপে তাহাদের বন্য হিংস্রতা পুনর্ব্বার পূর্ণজাগ্রত হইয়া উঠে, কিন্তু তাহা সংযমে মহিমান্বিত—তাহারা মরণাহত শিকারের বুক চিরিয়া রক্তের নেশার মত্ততায় এক মুক রক্ত পান করিয়াই তাহাকে ত্যাগ করে,—তাহাদের শিকার যখন মাটিতে রক্তাপ্লুত হইয়া লুণ্ঠিত হয়, তখন তাহারা বাজবর্‌দারের হাতে বসিয়া নক্‌সাকাটা রেকাবি হইতে মস্‌লাদার খুশ্‌বু দার নবাবী চালে চাখিয়া চাখিয়া খাইতে থাকে—নবাবের পাখী তাহারা নবাবী কায়দায় অভ্যস্ত।

তাহাদের চক্ষু আলস্যভরা অথচ গর্ব্বিত—দিনের আলোকের দর্পণ। তাহাদের চোখের ঠুলি যখন খোলা হয় তখন তাহার দৃষ্টি থাকে কালো; যখন শিকারের পিছনে তাড়া করে তখন তরল সোনার মতন জ্বল্‌জ্বলে; আর যখন ভয়ার্ত্ত শিকারের কাতর ক্রন্দন অনুসরণ করিয়া তাহারা ছোঁ মারে তখন তাহাদের চোখ হয় যেন আগুনের ফুল্‌কি!

তাহারা সকলেই রহিমের রোদপোড়া ফর্সা হাতের উপর আদরে গলিয়া ঝুঁকিয়া পড়ে বটে, কিন্তু এরা কেউ সেই তাতারী বাজের সমকক্ষ নয়—তাহার চক্ষে কী বাদ্‌শাহী আলস্য আর অবহেলা! রহিম ইহাদের সকলের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল—তাহারা তাহার সহিত খেলা

করিতে চেষ্টা করিলে সে তাহাদের খেলায় খোলা ঠোঁট ধরিয়া জোরে চাপিয়া বুজাইয়া
এবং তাচ্ছিল্যভরে তাহাদের হাত হইতে ঝাড়িয়া ফেলিত, এবং চিলের ডাক নকল ক
তাহাদিগকে অস্বস্তিতে কাঁপাইয়া তুলিত—তাহারা খাঁচা ছাড়িয়া মিথ্যা চিলের ডাকে প্রলুব্ধ
ছুটিয়া বাহির হইত—সাম্‌নে তাহাদের শূন্য মাঠ ও পশ্চাতে তাহাদের আগলদারদের গালাগালি।

নবাবজাদা রোজ আরবী ঘোড়ায় সওয়ার হইয়া শিকার খেলেন—রক্তের মতন
মখ্‌মলে জরির কাজ করা কিংখাবের পোষাক! রূপার ঘুঙুর বাজাইয়া তাতারী বাজ যখন
তখন নবাবজাদার অন্তরে যেন গান বাজে, তিনি ঘন ঘন নিশ্বাসে প্রভাতের হাল্কা বাতাস
মতন পান করিয়া উত্তেজিত হইয়া উঠেন।

একদিন নবাবজাদার পরম সখের তাতারী বাজ একটা শ্বেতপদ্মের মতন একটা বকে
ছিঁড়িয়া তাহাকে রক্তকমলে পরিণত করিল—বকটা শরবনের পাশে জলার উপর পড়িয়া
শিকারীরা গিয়া মৃত্যুযন্ত্রণায় বিলুণ্ঠিত বকের গলা জবাই করিয়া উহাকে উঠাইয়া আনিয়া
কিন্তু বাজের আর কোনো সন্ধানই তাহারা পাইল না।—সে হয় অন্য কোনো শিকারের
উধাও হইয়া গিয়াছে, কিংবা কালো জলে নিজের ছায়া দেখিয়া ভয় পাইয়া ভাগিয়াছে
মনের আনন্দে বাতাসে গা ভাসাইয়া নিরুদ্দেশ যাত্রা করিয়াছে। বৃথাই তাহারা তাহাকে
বৃথাই তাহারা তাহাকে বাছা বাছা আদরের নামে ডাকাডাকি করিল, বৃথাই তাহারা শীশ
বাজাইয়া বন কাঁপাইয়া তুলিল। নবাবজাদা সর্দ্দার বাজবরদারের মুখে ঘোড়ার কোড়া
তাহাকে রক্তাক্ত করিয়া দিল এবং জলা জঙ্গল না মানিয়া সটান সোজা ঘোড়া দৌড়া
ফিরিয়া চলিল—তাহার ঠোঁট জোরে চাপা ও অলস চোখের উপর চোখের পাতা ঝুঁকিয়া
অন্ধকার ঘনাইয়া তুলিয়াছিল। বাজপাখী তাহারা খুঁজিয়া পাইল না।

কিন্তু রহিম তাহাকে পাইল। একটা ঝোপের কাঁটায় তাহার পায়ের রেশমী সূ
সোনার ঘুঙুর জড়াইয়া আট্‌কাইয়া গিয়াছিল—সে গাছের ডাল নখে চাপিয়া ডানা
বাড়াইয়া চোখ পাকাইয়া ঠোঁট শানাইয়া বন্ধন-দশায় শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত ক
একেবারে যুদ্ধোদ্যত হইয়াছিল—তাহার সর্ব্বাঙ্গের ভঙ্গীতে মরীয়া ভাব—সে অনশনে মৃত্যু
করিতেছে। ঝাঁকড়া সবুজ গাছে বড় বড় বৈঁচী পাকিয়া লাল হইয়া আছে এবং তা
বসিয়া আছে বাদ্‌শাহী তাতারী বাজ—যেন চুনীর মিনা-করা পান্নার সিংহাসনে বাদ্‌
যুদ্ধ ঘোষণার হুকুম দিতেছে! রহিম তাড়াতাড়ি তাতারী বাজকে মুক্ত করিতে গে
আটক হইতে বাজের পায়ের ঘুঙুর ছাড়াইতে হাত বাড়াইয়াই আনন্দের উত্তেজনায়
কাঁপিতে লাগিল, বাদ্‌শাজাদার মোহর-খোদা সোনার ঘুঙুর তাহার আঙুলের নাড়া পা
উঠিল ও সেই সঙ্গে তাহার অন্তরও আনন্দে বাজিতে লাগিল, তারপর যখন সে বাজ
করিয়া নিজের হাতের উপর তুলিয়া বসাইল ও বাজ তাহার তীক্ষ্ণ নখ ফুটাইয়া

চাপিয়া ধরিল তখন সে উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল—এই হারানো বাজ সে খুঁজিয়া পাইয়াছে,
এ এখন তাহার—এই বিস্তৃতবক্ষ দীর্ঘপক্ষ স্বর্ণচক্ষু বাদশাহী বাজ! এ যে সম্পূর্ণ তাহার—আর
কাহাকেও ত সে ইহাকে দেখাইতেও পারিবে না—এ শুধু তাহার, একান্ত তাহার! গহন বনের
গোপন বুকে ইহার জন্য একটা খাঁচা বানাইতে হইবে, ভোর বেলা ইহার চোখের ঘুম ভাঙিবার
আগেই সে চুরি করিয়া চুপি চুপি বনের মধ্যে যাইবে, তাহারা দুজনে বিজন প্রান্তর দিয়া ভোরের
গোলাপী আকাশে সন্ধানী দৃষ্টি বুলাইতে বুলাইতে শিকার খুঁজিয়া ফিরিবে, তাহারা পরস্পরে পরিচিত
হইয়া উঠিবে—বাজপাখী তাহাকে ভালোবাসিবে, সে ত তাহাকে ভালোবাসেই। তাহাদের
মাথার উপর প্রভাতের সোনালি আলো ঝরিয়া পড়িবে, তাহাদের দুজনের গোপন আলাপ প্রভাতের
শীতল বাতাসে মিলাইয়া যাইবে, রহিম তাহার প্রাণের যত্নে বাজপাখীর কিংখাবের দস্তানা আর
মুক্তার ঝালর দেওয়া চোখের ঠুলি আর রাজভোগের অভাব ভুলাইয়া রাখিবে।

রহিম বাজপাখীকে এক গাছে বাঁধিয়া রাখিয়া ছুটিয়া নিকটের এক পুষ্করিণীর পাড়ে গেল।
সেখানে জলে কাহার হাঁস চরিতেছিল, এক ঢিলে একটাকে জখম করিয়া সাঁতার দিয়া গিয়া
ধরিল ও তার পর চুরি করিয়া আবার বনের মধ্যে ছুটিয়া আসিয়া লুকাইল। বাজপাখী
জখমী হাঁসের উপর ছোঁ মারিয়া পড়িয়া তাহার কলিজা ছিঁড়িয়া গরম রক্ত পান করিল। ইহা
দেখিয়া রহিমের মাথা আনন্দের নেশায় ঝিমঝিম করিতে লাগিল, তাহা হইলে বাজপাখী তাহাকে
ঘৃণা করে নাই, বাজপাখী তবে তাহার হইতে রাজী আছে!

সে তাহার হইল। রহিম যখন ভোরের অন্ধকারে শিশির-ভেজা ঝরা পাতা মাড়াইয়া তাহার
কাছে আসে তখন সে গলা বাড়াইয়া স্থির বিস্ফারিতচক্ষে তাহার পদধ্বনি শোনে ও তাহার আগমনের
প্রতীক্ষা করে। রহিম আসিয়া হাত বাড়াইয়া দিলেই সে তাহার খাঁচা হইতে লাফাইয়া বাহির হইয়া
তাহার হাতের উপর বসে, উড়িবার ভঙ্গীতে ডানা উঁচায়, কিন্তু উড়ে না—তাহা শুধু স্মরণ করাইয়া
দিবার নির্বাক্ ইঙ্গিত, তাহার পরই তাহারা দুজনে তাড়াতাড়ি কোমল আলোকে ক্রমশ প্রকাশমান
প্রান্তরে ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়ে।

তাহাদের চক্ষু গোলাপী আকাশে শিকার সন্ধানে ব্যস্ত হয়। দূরের পাহাড় জমাট
ধোঁয়ার মতন, তাহার কোলে বন কাজলের পদ্দার মতন—সমস্ত বৃক্ষ নিদ্রামগ্ন স্তব্ধ, তাহাদের
পাখা নিদ্রাচ্ছন্ন পাখীর ভারে আক্রান্ত। ক্রমে আকাশে জ্বলন্ত স্বর্ণ ও সিন্দুর ছড়াইয়া পড়িতে
থাকে, কালো রেখা নীল হইয়া উঠে, পেঁচা মাটি ঘেষিয়া উড়িয়া নিজের গোপন কোটরের দিকে
চলিয়া যায়, দিবাচর পাখীরা পাখা ঝাড়া দিয়া জাগিয়া উঠিলে প্রথমে মৃদুস্বরে ও ক্রমে কলকাকলিতে
এবং আলোক-বিভাসিত শীতল বায়ু ভেদ করিয়া উহারা বাণের মতন বেগে বাসা ছাড়িয়া বাহির
হইয়া যায়। কিন্তু রহিম ও বাজ ইহাদের পরিহার করিয়া চলিতেই থাকে—চড়ুই বুলবুল দোয়েল—
এ ছোট পাখী—তাহারা তাহাদের শিকারের যোগ্য নয়। জলার দিক্ হইতে বক আর চকাচকীর

টানা ডাক ও তাহাদের ডানার ঝটপটানি শোনা যায়—ঐ ত তাহাদের যোগ্য শিকারের দে
তখন রহিম বিস্তারিত-বক্ষ বাজকে উপরে ছুড়িয়া দ্যায়, তাহার পাখা অরুণালোকে জ্বলিয়া উ
রহিম অন্ধপ্রায় চোখে হতচেতন বুদ্ধিতে পাখীর দিকে তাকাইয়া থাকে—সে শিশির-ধোয়া নি
নীল আকাশের কোলে গুটিসুটী হইয়া বাণফলকের মতন উড়িয়া যায়, তাহার পায়ের সোনা
ঘুঙুর পাখীদের প্রভাত কাকলিকে উপহাস করিয়া বাজিতে থাকে।

বকগুলা বাজের ভয়ে চাকার মতন ঘুরপাক খায়, এই জলের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িতে
তাহাদের লম্বা গলা ও বোকার মতন ছোট্ট মাথার উপর পিঠের দিকে ঝুলানো হলদে
টিকি দুলাইয়া তাহারা অসম্ভব রকম স্থানে লুকাইবার চেষ্টা করিয়া হাস্যাস্পদ হয়,
আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য পাকাইয়া পাকাইয়া উপরে উঠিতে থাকে, এবং লম্বা
ডানা মেলিয়া শত্রুর নাগালের বাহিরে গিয়া পড়িবার প্রাণপণ চেষ্টায় তাহাদের রক্তশূন্য
হৃদয় প্রভাত-সমীরণে বাঁশ-পাতার মতন থরথর করিয়া কাঁপিতে থাকে।

কিন্তু বাজপাখী বকের দল থেকে প্রথমের সবচেয়ে বড় জোরালো ও ঠিক তাহার
উড্ডীন একটাকে বাছিয়া নিজের লক্ষ্য স্থির করিয়া লয়, কারণ সে নিজের বলবিক্রমের
দিতে সদাই ব্যগ্র এবং সে খাড়া সোজা উপরে উঠিয়া যাইবার সময় নিজের পাখায়
স্নিগ্ধ লঘু বাতাসের স্পর্শ লাভের আনন্দ সর্ব্বাঙ্গ দিয়া অনুভব করিতে চায়, তাই যেন
বাহিয়া উপরে উঠার ন্যায় একটা অরুণরশ্মি বাহিয়া উপরে উঠিয়া যায়। শীঘ্রই
পাখীকে পরাস্ত করিয়া সকলের উপরে উঠিয়া যায়; তাকে তখন চড়াই-পাখীর চেয়ে
দেখায়; কিন্তু তাহার ডানা বিস্তারের অবলীল ভঙ্গী, তাহার অঙ্গের শক্তিমান্ সঞ্চালন
অনুভব করা যায় তাহার ক্রূর হিংস্র দৃষ্টির স্বচ্ছ উজ্জ্বলতা ও তাহার চঞ্চু-নখের প্রখরতা
সে ডানা গায়ের সঙ্গে গুটাইয়া লইয়া বাণের ভারী ফলার মতন উপর হইতে বকের
অসহায় গলার উপর আসিয়া পড়ে এবং একসঙ্গে একখণ্ড পাথরের মতন সটান সোজা
আসিয়া পড়ে—এক ডানাও এদিক-ওদিক বাঁকিয়া যায় না। তখন রহিম দৌড়াইয়া
কাদা ভাঙিয়া বনজঙ্গল ঠেলিয়া পতনের আঘাতে অভিভূত ও ভয়ে জড়ীভূত বকের
যায়—যেন সে মরিয়া হইয়া হতাশার সাহসে হিংস্র হইয়া তাহার লম্বা ঠোঁট দিয়া
প্রত্যাঘাত না করে। বাজ শীঘ্রই তাহার শিকারকে মরণ-মার মারিয়া তাহার বড়
চোখের উজ্জ্বল দৃষ্টি ফিরাইয়া নিজের প্রভুর দিকে দেখে, এবং সত্বসংহার করা
কলিজা পুরস্কার পাইবার প্রতীক্ষা করে।

ইহার পর সেদিন সে আর উড়ে না। রহিম যখন তাহাকে বাতাসে ছুড়িয়া
দিলাশা দিবার বিশেষ ধ্বনি করিতে করিতে তাহার আগে আগে ছুটিয়া যায়, তখন সে
ঝাপ্টায় রহিমের নাগাল ধরিয়া তাহার হাসিমুখের পাশে কাঁধের উপর গিয়া দাঁড়ি

বসে। উহার যেন ছেলেখেলা ভালো লাগে না এবং রহিমও বাজের দূরপ্রসারিত দৃষ্টির গম্ভীরতায় আচ্ছন্ন হইয়া খেলা হইতে ক্ষান্ত হয়।

রহিম সেই বাজকে এমন ভালোবাসিল যেমন ভালো সে আর কাহাকেও ও কিছুকেই বাসে নাই; সে যেন তাহার প্রাণ, তাহার বাসনা, তাহার তৃষ্ণা—উহার ডানা কত প্রশস্ত, উহার দৃষ্টিতে জয়ের কি নিশ্চয়তা! কিন্তু রহিমের এই গুপ্তপ্রণয়ে বেদনা বিদ্ধ হইয়াছিল, একটা আসন্ন দুর্ভাগ্যের আশঙ্কার কালিমা তাহার আনন্দ আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। কখনো কখনো রহিমের ভয় হইত যে, বাজপাখী হয়ত একদিন দারুণ তাচ্ছিল্যভরে তাহাকে ছাড়িয়া উড়িয়া চলিয়া যাইবে এবং তাহার পায়ের ঘুঙুর বিদ্রূপে বাজাইয়া দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া যাইবে, এবং সেই তাহার প্রাণ-সদৃশ পাখীহারা শূন্য অস্তিত্ব মৃত্যুরই সামিল হইবে। কখনো কখনো রহিমের মনে হইত যে এই বাজপাখী যেন মূর্ত্তিমান্ মহিমা—তাহা নীলের জমিতে সূর্য্যালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উড়িয়া বেড়ায়, অথবা তাহার কাঁধের উপর বসিয়া নূতন কীর্ত্তি অর্জ্জনের প্রতীক্ষা করে; এই সম্ভ্রমের আনন্দে রহিম নিজের তুচ্ছতার অনুভবে কাতর হইয়া পড়িত, তখন সে ঐ মহিমামণ্ডিত বাজপাখীর দিকে তাহার হীন দৃষ্টি তুলিয়া আর চাহিতে সাহস পাইত না। তাহার মনে এই দুঃখ জমিয়া ছিল যে ঐ পাখী তাহার আনন্দের দিকে দৃক্‌পাত করে না, উহার চক্ষুর তীব্র দৃষ্টি তাহার চোখে চোখে মিলিয়া স্নেহপ্রীতিতে গলিয়া কোমল হইয়া আসে না। এইসব চিন্তা করিতে করিতে রহিম স্বপ্নের রাজ্যে উড়িয়া যাইত।

রহিম খোলা মাঠের মাঝখানে লাল-মাটির ঢিপিতে মাথা রাখিয়া চিৎ হইয়া শুইয়া শুইয়া দেখে আকাশের বুকের উপর দিয়া মানুষের অদৃষ্টের মতন মেঘ ভাসিয়া চলিয়াছে—কখনো মন্থর ভারাক্রান্ত, কখনো লঘু; কোনোটা নির্দ্দিষ্ট সীমারেখায় রূপস, কোনোটা বিচ্ছিন্ন রূপহীন; বাতাসের অদৃশ্য হাত মেঘের ঘাড়ে ধাক্কা দিয়া লইয়া চলিয়াছে নিরুদ্দেশ অসীমের দিকে; গাছপালার পল্‌কা ডালপাতা ঝুরঝুর করিয়া কাঁপিয়া বাতাসের অস্তিত্বের কথা রহিমের কানে কানে বলে; এবং রহিম তাহার প্রাণের দোসর বাজপাখীকে রূপকথা শোনায়।

আরব্য-উপন্যাসের বাদ্‌শা হারুন্-অল্-রসিদের রহস্যপূর্ণ আমদরবারের মহৈশ্বর্য্যের কথা। রহিমও সেকালে সেখানে ছিল—মন্ত্রী জাফর। প্রকাণ্ড শাদা আরবী ঘোড়া তাহাকে পিঠে করিয়া ভক্তির আবেগে নৃত্য করিত এবং এখনকার এই নতশির তন্দ্রাতুর এই বাজপাখী তাহার উঁচু হাতের উপর বসিয়া আনন্দোজ্জ্বল দৃষ্টিতে ইঙ্গিত অন্বেষণ করিত এবং বীরত্বগাথার মহিমাচ্ছটা তাহাদের জনকে বেষ্টন করিয়া থাকিত।

মানুষের অদৃষ্টের মতন মেঘপুঞ্জ অদৃশ্য বায়ুর ধাক্কা খাইয়া খাইয়া কালো হইয়া রহিমের মাথার উপর জমিতেছিল যেন আরব্য-উপন্যাসের দৈত্যপুরীর গিরিগহ্বরের খিলান। তাহার ফাঁক দিয়া পড়ন্ত রৌদ্র বল্লমের ফলার মতন বাহির হইয়া আসিতেছিল। এবং বাজপাখী মাথা

DOUBLE COLOUR PAGE

ঝুঁকাইয়া ঝিমাইতে ঝিমাইতে দুঃস্বপ্নের নিষ্ফল ক্রোধে জাগ্রত হইয়া গা ঝাড়া দিয়া তীক্ষ্ণ চীৎকার করিয়া উঠিল।

কয়েকজন ছেলে টো টো করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে আসিয়া দেখিল বাদ্‌শাজাদার হাতের বাজ রহিমের হাতে! এর পরেই বাদ্‌শাজাদার পেয়াদারা যমদূতের মতন আসিয়া রহিমকে গ্রেপ্তার করিল এবং তাহাকে ব-মাল বাদ্‌শাজাদার দরবারে লইয়া গেল। তাহারা যখন তাহার হাত হইতে বাজপাখী ছিনাইয়া লইল তখনও বাজ যথারীতি নিরুদ্বেগ ও গর্ব্বগম্ভীর, সে একবারও উদ্ধত গ্রীবা ফিরাইয়া তাহার উদাস অগ্রাহ্য দৃষ্টি দিয়া রহিমকে দেখিল না—ইহাতে রহিমের রক্ত জল হইয়া গেল।

তাহারা বাজপাখীকে তাহার প্রভুর নিকটে লইয়া গেল, কিন্তু তিনি তাহাকে ফিরিয়া একটুও আনন্দ প্রকাশ করিলেন না, তাঁহার হারাণো প্রিয় পাখীকে একটা আদরের কথা না—ছোটলোকের ছুত লাগিয়া তাহার আভিজাত্য-গৌরব ম্লান হইয়াছে, তাহার জাত গিয়াছে।

নবাবজাদা গম্ভীরভাবে একবার রহিমের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং তাহার দিকে থাকিতে থাকিতেই তাঁহার মনে পড়িয়া গেল বাদশাহী হুকুম—শিকারের কানুনের কথা। ভয়ঙ্কর আনন্দে তাঁহার মন ভরিয়া উঠিল। ক্রূর আনন্দে তাঁহার ভ্রূ ও ললাট কুঞ্চিত হইয়া বাদ্‌শাজাদার আইনের কথা মনে পড়িল—বাদ্‌শাহী শিকারের বাজপাখী চুরি করিলে বারো টাকা জরিমানা দিতে হয়, অথবা ক্ষুধার্ত্ত বাজপাখীর তীক্ষ্ণচঞ্চু দ্বারা বিদীর্ণ বক্ষ তোলা রক্ত দিতে হয়।

বাদ্‌শাজাদা রহিমের দারিদ্র্যের কথা জানিতেন। তিনি রহিমের সুস্থ শরীরের পুষ্ট বক্ষের দিকে চাহিয়া তাঁহার হাত বাড়াইয়া, যেমন করিয়া লোক হাটে গিয়া নির্দ্দয় ভাবে মাছ বা ছাগলের গা টিপিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখে তেমনি করিয়া, রহিমের বক্ষ টিপিয়া দেখিলেন। তাহার পর তিনি নদীর ওপারের নবাব সাহেবকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়া নবাব-সাহেব যদি তাঁহার যুগল কন্যারত্নদের সঙ্গে করিয়া বাদ্‌শাজাদার গরিব খানায় কদমবুসি তাহা হইলে আজ হইতে তিন দিন পরে একটা মজাদার শিকারের খেলা তাঁহাদের অধিকতর মনোরম হইয়া উঠিবে।

কারাগারের অন্ধকারে রহিমের চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিয়াছে; তাহার কারাগারের অন্ধকারের চেয়েও কালো চোখ স্থির অচঞ্চল। তাহার চক্ষুতারকা কারাগারের বাহিরে আবির্ভাবে সূর্য্যালোকের দর্পণের মতন একটু উজ্জ্বল ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে মাত্র।

বাদ্‌শাজাদা শিকারের মাঠে চলিয়াছেন, পিছনে পিছনে চলিয়াছে জাত-খোয়ানো বাজ—তিন দিন উপবাসের দারুণ ক্ষুধায় হিংস্র দৃষ্টি ঠুলিতে ঢাকা এবং উদগ্র প্রখর নখ কঠিন করিয়া বাঁধা।

তাহার পিছনে আসিতেছে শুধু এক সার রং—অগ্নিশিখার মতন জ্বলজ্বলে।—ছয়টি তাজী ঘোড়া, তাহাদের গা মাজা ঘষা মসৃণ চক্‌চকে, বাঁকা ঘাড় পর্য্যন্ত জরির সাজ, কিংখাবের উর্দ্দি-পরা সহিস তাহাদের আগে আগে ছুটিতেছে; ছয় ঘোড়ায় টানিয়া আনিতেছে রক্তবর্ণ সওয়ারী গাড়ী রূপালি সোনালি কারচুপীতে মণ্ডিত; তাহার মধ্যে নবাব-সাহেবের যুগল কন্যার বুকের উপর সোণা-জহরতের ছড়াছড়ি! সেই গাড়ীর পিছনে মখমলের ঘেরা-টোপ ঢাকা ছয় পাল্কীতে আসিতেছে নবাবজাদিদের ছয় বাঁদী—তাহাদের চুলে মেহেদির পাটল রং আর চোখের কোলে কালো সুর্ম্মা! তাহাদের পিছে নবাব-সাহেব আসিতেছেন প্রকাণ্ড দাঁতাল হাতীর পিঠে সোনার ছত্রী দেওয়া হাতীর দাঁতের হাওদায়!

ছয় জন শিকারী একসঙ্গে শিঙা বাজাইয়া খেলা সুরু ঘোষণা করিল,—সেই শব্দ বাঁকা শিঙার মুখ হইতে শব্দের চাকার মতন পাক খাইতে খাইতে মাঠের উপর দিয়া গড়াইয়া গেল। খোলা মাঠের উঁচু নীচু বাঁকা রেখা সেই শব্দে যেন নাচিতে লাগিল; ভোরের আকাশের শরাব-রঙা আলো মেঘের কিনারায় পড়িয়া মেঘগুলি প্রজাপতির ডানার মতন জ্বলজ্বল করিতেছিল।

সকলে আসিয়া একটা ঝোপ ঘিরিয়া ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া দাঁড়াইল—সে খানেই শিকার বাঁধা আছে। ঘোড়ার পিঠের আস্তরণ বাতাসে পতপত করিয়া উড়িতে লাগিল; তাহার উপর যেখানে যেখান ছায়া পড়িয়াছিল সেখানে সেখানে লাল রং অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার মতন গাঢ়তর দেখাইতেছিল, এবং যেখানে রৌদ্র লাগিতেছিল সেখানে সেখানে জয়ের উল্লাসের মতন উজ্জ্বলতা উচ্ছলিত হইয়া উঠিতেছিল। বাদ্‌শাজাদীদের কৌতূহলী চোখের উৎসুক দৃষ্টি গাড়ীর পর্দ্দার জালির ফুকোরে উঁকি মারিতেছিল, এবং তাহাদের শুভ্র কোমল কণ্ঠ বেড়িয়া কাঁধের ঢালুর উপর দিয়া রেশমী ওড়না নীচে ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। গাড়ীর পর্দ্দা সরাইয়া একটু ফাঁক করিয়া রাখিয়াছিল একখানি হাত। যেন একটী বক—বন্দী রহিম দেখিতে দেখিতে ভাবিতেছিল—শিঙার শব্দে ভয় পাইয়া এখনি বুঝি সে চীৎকার করিয়া উড়িয়া পলাইবে। নিক্ষিপ্ত পাথরের মতন শিঙা শব্দ ছুড়িয়া দিল। সকলে নিস্তব্ধ।

শিঙার শব্দে সচকিত হাত গাড়ীর পর্দ্দা অনেকখানি সরাইয়া ফেলিল—রহিম দেখিল দুটি তন্বী তরুণী, তাহাদের ঠোঁট দুখানি যেন খোসা-ছাড়ানো একজোড়া কাগজী বাদাম, তাহাদের চক্ষু দুটি স্বপ্নাবেশে তন্দ্রাতুর, সেই চোখের দৃষ্টি যেন বহুদূরের অদৃশ্য কিছুকে দেখিতেছে, এবং তাহাদের হাতগুলি কোলে পড়িয়া আছে কুলায়ে ঘুমন্ত শাদা পাখীর মতন, তাহাদের জমকালো পোষাকের প্রাচুর্য্য—সব মিলিয়া তাহারা রহিমের চোখে বেহেস্তের হুরী আর রূপকথার পরীর মতন মহিমান্বিতা অপূর্ব্বসুন্দরীর রূপে প্রতিভাত হইল। তাহাদের সাম্‌নে বন্ধনে বন্দী বলিয়া রহিমের অত্যন্ত ক্লেশ ও লজ্জা বোধ হইতে লাগিল।

হঠাৎ সে তাহার দৃষ্টি দূরে প্রসারিত করিয়া দিল—সুন্দরীদের ছাড়াইয়া, ভয়ে বিস্ময়ে হাঁ করা জনতা ছাড়াইয়া, তাহাকে ছুটাইয়া ক্লান্ত করা ধূসর মাঠ পারাইয়া।

রহিম জানিত তাহার অদৃষ্টে কি শাস্তি অপেক্ষা করিতেছে। কিন্তু যখন সে দেখিল তাহার বাজকে চোখ ঢাকিয়া নখ বাঁধিয়া লইয়া আসিতেছে, তখন সে বুঝিল ঐ পাখীর উপরই তাহার শাস্তি দিবার ভার পড়িয়াছে। তখন আনন্দের হাসিতে তাহার সমস্ত অন্তর ভরিয়া উঠিল—যখন ঐ পাখীর মালিক হইয়া দীর্ঘ দিনগুলি বাতাসের গান শুনিয়া ও গাছের নাচ দেখিয়া কাটাইত ঠিক সেইসব দিনের মতন এখনও তাহার হৃদয় গর্ব্বে ধকধক করিয়া বাড়িতে হইতে লাগিল।

চোখের ঠুলি খোলা হইলে বাজপাখী যখন তিন দিন পরে আলো দেখিতে পাইল, সে তাহার দৃষ্টি চারিদিকে ফিরাইয়া একবার দেখিয়া লইল; সে ডানা নাড়িয়া উড়িবার শক্তি সঞ্চয় করিয়া প্রস্তুত হইয়া বাজবরদারের হাত হইতে আকাশে নিক্ষিপ্ত হইবার অপেক্ষায় উৎসুক হইয়া রহিল। তাহার দৃষ্টি আকাশে তাহার শিকার খুঁজিয়া বুলাইতে লাগিল—সে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, ক্ষুধায় ক্ষিপ্ত আগুনের ফুল্‌কির মত জ্বালাময়,—তাহাতে স্মরণের লেশ নাই, মমতার ছায়া নাই, সে দৃষ্টি কাহাকে আপনার বলিয়া চিনিল না।

রহিম একদৃষ্টে পাখীর দিকে চাহিয়াছিল—যদি তার সঙ্গে একবার চোখোচোখি হয় তাহা হইলে বাজ নিশ্চয়ই তাহাকে চিনিতে পারিবে কিন্তু বাজের দৃষ্টি তাহার দৃষ্টির সঙ্গে মিলিল না। রহিমের চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। রহিম বাজের চোখে তাহার জীবনের পরম আকাঙ্ক্ষিত আনন্দ সুখের স্বপ্ন প্রতিফলিত দেখিবে আশা করিয়াছিল, কিন্তু দেখিল সেখানে শুধু শিকার ক্ষুধার্ত্ত লোলুপতা নবাবজাদার পাতলা ঠোঁটের কোণের ঘৃণা বিদ্রূপ ঔৎসুক্যের মানবীয় মতন। রহিমের হৃদয় বাজের তাচ্ছিল্যে যেন ছিন্ন হইয়া গেল—সে মুখ ঘুরাইয়া লইল, চোখ বুজিয়া গেল, তাহার চিন্তা যেন একখাঁচা পাখী খাঁচার ছোট দরজা খোলা পাইয়া মুক্তি পাইবার আগ্রহে পরস্পরে ঝটাপটি করিয়া মরিতে লাগিল।

রহিম যখন এই রকম অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল তখন নকিব ফুকারিয়া উঠিল—"কানুন বাদ্‌শাহী খেলা খেলাপ করিলে হয় বারো তোলা রূপা, নয় ছয় তোলা বুকের রক্ত হইবে—এই কানুন বাদ্‌শাহী আমোদের পাহারাদার!"

রহিম আর চোখ খুলিল না। তাহার বুক চিরিয়া রক্ত পাত করা হইল যেন রক্ত বাজপাখী সেখানে গিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তীক্ষ্ণ নখর হানিয়া বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া তীক্ষ্ণ বিদ্ধ করিয়া দিতে পারে। রহিম তবু চোখ মেলিল না। বাজপাখী যখন তাহার ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহার বক্ষে চঞ্চু বিদ্ধ করিয়া দিল তখনও রহিম চোখ মেলিল না, একটু না, কেবল একবার তাহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল এবং সেই শিহরণে বাজপাখীর ক্রোধ

হইয়া উঠিল, তাহার চোখ হইতে আগুন ঠিকরিয়া পড়িতে লাগিল, সে দুই ডানা বিস্তারিত করিয়া দিল—যেন সে ডানার ঝাপটে রহিমকে প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছে।

নবাবজাদীদের কৌতূহলী মাথা সাম্‌নের দিকে আর একটু ঝুঁকিয়া গেল, তাহাদের স্বপ্নালস নেশাভরা চোখের অদ্ভুত দৃষ্টিতে কৌতুকের দীপ্তি একটু জ্বলিয়া উঠিল; কিন্তু তাহাদের শিথিল হাত যেমন কোলে পড়িয়াছিল, তেমনি রহিল, তাহাদের জরির পোষাকের প্রত্যেকটি ভাঁজ যেমন ছিল তেমনি রহিয়া গেল। কিন্তু রক্তের গন্ধে ঘোড়াগুলা নাকের ভিতর দিয়া ফুৎকার দিতে লাগিল ও মাটিতে পা ঠুকিয়া অস্থির হইয়া উঠিল—তাহাদের পিঠের রক্তবর্ণ চারজামার ঝুলের ফালর নীল আকাশের গায়ে ঝট্‌পট্ করিতে লাগিল। শিকারীরা বৃথাই মুখে শিঙা লাগাইয়া মুখে বাতাস ভরিয়া গাল ফুলাইয়া প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল—রহিম আর্ত্তনাদ করিলে তাহারা শিঙার শব্দে তাহার চীৎকার ডুবাইয়া ঢাকিয়া দিবে;—রহিম নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ পড়িয়াই রহিল।

আঘাতের প্রথম বেদনা রহিমের সহ্যশক্তিকে প্রবলবেগে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহার মনে হইয়াছিল তাহার হৃদয় বুঝি ছিঁড়িয়া উপ্‌ড়াইয়া বাহির হইয়া পড়িবে; কিন্তু পরে সেই ব্যথার তীব্রতায় তাহার অনুভূতি এমন অভিভূত হইয়া পড়িল যে সেই অনুভব প্রায় সুখের কোটায় গিয়া পৌঁছি পৌঁছি করিতে লাগিল; এবং যখন তাহার বিদীর্ণ বক্ষ হইতে গরম তাজা রক্তের স্রোত প্রবাহিত হওয়া সে অনুভব করিতে পারিল এবং বাজের তীক্ষ্ণ চঞ্চু বারম্বার তাহার বিদীর্ণ বক্ষে আঘাত করিতেছে বুঝিতে পারিল, তখন রহিম আনন্দের স্বপ্নলোকের নীলিমায় ডুবিয়া গেল—তখন বাদশাহী বাজের চঞ্চুনখের আঘাতে মৃত্যুর গৌরবে তাহার জীবন জ্বলিয়া উঠিল—অগ্নিবর্ণ প্রভামণ্ডল তাহার জীবনকে বেষ্টন করিয়া তাহার দৃষ্টি ধাঁধিয়া বীরত্বগাথার তালেতালে নৃত্য করিতে লাগিল।

বাদ্‌শাজাদার যখন মনে হইল যে কানুন-মোতাবেক ছয় তোলা রক্ত আদায় হইয়া গিয়াছে, তখন তিনি তাঁহার লোকদের ইশারা করিলেন। শিকারীরা শিঙার চোঙায় মুল্‌তবী ফুঁ ছাড়িয়া দিল; তাহারা বাজপাখীকে তুলিয়া লইল—রক্তপানে পরিতৃপ্ত হইয়া তাহার দৃষ্টি আবার শান্ত গর্ব্বে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে; সিপাহীরা বাদ্‌শাহী খেলা দেখার তৃপ্তির তালে পা ফেলিয়া নবোদিত রৌদ্রে স্বর্ণমণ্ডিত দিগ্বলয়ের দিকে মুখ ফিরাইয়া শহরে ফিরিয়া চলিল। কিন্তু রহিমকে আর জাগ্রত করা গেল না—ভাবুক ছোক্‌রা আনন্দ মৃত্যুর স্বপ্নে একেবারে ডুবিয়া গিয়াছিল; তাহারা উহাকে কেবল বন্ধনমুক্ত করিয়া সেইখানেই লাল মাটির উপর ফেলিয়া চলিয়া গেল।

বাদ্‌শাহী তাতারী বাজ আর বাদ্‌শাজাদার চিড়িয়াখানায় স্থান পাইল না—ছোটলোকের ছুত লাগিয়া তাহার জাত গিয়াছে!*

শ্রীচারু বন্দ্যোপাধ্যায়

* সুইডেনের গল্পলেখক পের্ হাল্‌ষ্ট্রোম লিখিত একটি গল্প অবলম্বনে।

"বাদল-মাদল"

(১)

কে শুনেছে, কে শুনেছে
বাদল রাতের বাঁশীর সুর ?
মাদল বাজে মাতিয়ে আজি
মেঘলা পুরীর অন্তঃপুর !
চিকুর হানে—তারি মাঝে
জলতরঙ্গ বাজনা বাজে,—
কান দিয়ে তায় শুন্‌তে গেলে
যায় না শোনা এতই দূর !

(২)

কবে কোথায় কোন্ দেশেতে
নীল যমুনার কোল ঘেঁসে,
বেজেছিল গোকুল বীণা
রাই-কিশোরীর উদ্দেশে ;
অভিসারের রঙ ফলায়ে,
রাই-কিশোরীর মন গলায়ে
ক'বে কোথায় বেজেছিল
কি জানি তা কোন্ দেশে ?

(৩)

আজ্‌কে রাতে শুন্‌ছি আমি
ঝাপ্‌সা করা আকাশ-গায়,
সেই গোকুলের বীণার সাথে
দিক্‌বধূরা ফুঁপিয়ে গায় !
ঐ যে বাঁশী পাগলপারা
শোন্ গো শোন্ বাজায় কা'রা,
সেই সুরেতে উথ্‌লে ওঠে
মন যে আমার, হায় গো হায় !

(৪)

আকাশ শেজের পিদিম গুলি
নিবে গেছে কাল মেঘে,
দিগ্‌বলয়ে কালোর রেখা
কাজল লতার রং লেগে !
আকাশের ঐ আবছায়ায়,
জল সরে আজ চক্ষেতে হায়,—
কালো লোহার কস লাগান
নীলাম্বরীর অঙ্গে কে ?

(৫)

কোন্ অজানায় পথ ভুলেছে
পথ ভুলেছে রাত কাণা,
বাদ্‌লা রাতের অন্ধকারে
পথ বুঝি তার নাই জানা ?
পথ দেখিয়ে আজ্‌কে তা'রে
নেই কিগো কেউ আন্‌তে পারে
বাঁশীর সুরে কাঁদতে শুধু
ফাটিয়ে সে তা'র বুকখানা !

(৬)

কাঁদন সুরে বাজায় কেরে
বাজায় বীণা ঠায় আজি,
এতই মিঠে—কান ফিরাতে
মন যে আমার নয় রাজি !
বল দেখি আজ আকাশ কোলে,
কোন্ বেদনা ফুটিয়ে তোলে
বুক-ফাটা এ রাতের কাঁদন
কোন্ অ-কবির কারসাজি !

শ্রীরমেশ

নিমেষের ভুল

(সুরেশের ডায়েরি)

২০শে ফেব্রুয়ারি

আমায় এদেশ ছেড়ে এখন যেতেই হবে। একটী scholarship যখন পেয়েছি তখন আর হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা নয়। কিন্তু এই কি লক্ষ্মী ? এই লক্ষ্মীকে বরণ করতে গিয়ে যদি আমার কমলাকে হারাই ? না, তা হবে না। তা কখনও হতে পারে ? কেন হতে পারে না—জানি না ; কিন্তু ছেলেবেলা থেকে সব জিনিষের উপর ভরসা রেখে চলা আমার স্বভাব, ঠকিও নি তা'তে।

আমার স্কলারশিপের খবরে মা যেমন খুসী হয়েছেন, রজনী বাবুও তেমনি। রজনী বাবু বল্‌ছিলেন এবার আমার সবদিক খুলে যাবে। আর কোন দিক না খুলুক, কমলাকে পাবার দিকটা খুল্‌লেই বাঁচি। রজনী বাবু কি আমার মনের কথা জানেন ? রাজি হবেন কি তাঁর মেয়েটিকে আমার হাতে দিতে ? আমি নেহাৎ অযোগ্য জানি, কিন্তু কে যে কমলার যোগ্য তাও ত জানি না। মা কিছুই জানেন না ;—মা, আমার দুঃখিনী মা—কত কষ্টে আমাদের দুটি ভাইকে মানুষ করেছেন। আমি বিলেত থেকে ফির্‌লে ভুলুর ভার নিতে পারব। ভাইটিকে সঙ্গে নিতে পারলে হত, কিন্তু টাকার অভাব, আর তা ছাড়া মা যে তা'হলে বড় একলাটি হয়ে পড়বেন। তিন বছর কোন মতে কাটিয়ে ফিরতে পারলে তখন ভাবনা কি ?

২৮শে ফেব্রুয়ারি

যাবার আগে কয়েকটি বন্ধু নিয়ে আজ আমোদ প্রমোদ করা গেল। রজনী বাবুদের বাড়ীর সবাই এসেছিলেন। ওঁরা যে এত বড় লোক তবু আমাদের সঙ্গে সমানে মেশেন। রজনী বাবু বোধ হয় বাবার সঙ্গে বন্ধুত্বের খাতিরেই আমাদের এত স্নেহের চক্ষে দেখেন। তা আজ কালকার দিনে মৃত বন্ধুর কথা ক'জন মনে রাখে,—তায় যদি সে আবার গরীব হয় ?

কমলার সঙ্গে আজ আমার বন্ধু অজয়ের আলাপ করিয়ে দিলাম। অজয় কখনও মেয়েদের সঙ্গে স্বাধীনভাবে মেশে নি, তাই কেমন যেন ঘাবড়ে গিয়েছিল। যে orthodox জমিদার বাড়ীর ছেলে! কিন্তু বাড়ী ফেরবার সময় আমায় বলে গেল, "কলেজে পড়া মেয়ে এমন সরল হয় ? এঁদের আলাপ করবার মধ্যে কোথাও লজ্জাহীনতা নেই, আবার জড়সড় ভাবও নেই। কি সুন্দর সংযত অথচ স্বচ্ছন্দ চলা-ফেরা, কথা বলা, হাসি—সব।" আমি বলতে যাচ্ছিলাম "তুমি যে best specimenটিকেই দেখেছ তাই মুগ্ধ হচ্ছ। অন্য রকমও আছে।" আবার সামলে নিয়ে বললাম, "আমি ত কতদিন তোকে আলাপ করিয়ে দিতে চেয়েছি,—তুই কেবল পালিয়ে বেড়াতিস্। কেমন [illegible] দেখ্।"

কমলাকে আজ কি সুন্দর দেখাচ্ছিল। সাদাসিদে পোষাকে ওর অনন্যসাধারণ রূপ আরও ফুটে ওঠে। ১৭ বৎসরের মেয়ে অথচ এমন ছেলেমানুষ! যাবার আগে ওকে জানান অসম্ভব বল্‌লেই হয়। তিন বছর বিদেশে থাকব, একটা আশার কথা না শুনেই কেমন করে। ততদিনে যদি অন্যের হয়ে যায়?

সমুদ্রের বুকে দোল খাচ্ছি। দেশের মাটি আর দেখা যাচ্ছে না, তবু জলে আকাশে দিকে যেন কমলার স্নিগ্ধ চোখের আলো দেখ্‌ছি। বলি বলি করেও বুকের বোঝা কোথায়

শ্রীসুনীতি দেবী

নামিয়ে সোজা বেরিয়ে পড়লাম। না বলা ভালই হয়েছে। আগে যোগ্যতা লাভ হয়ে ফিরি, তখন না হয় বিজয়লক্ষ্মীর দেওয়া মালা গলায় পরাব। এখন আমি

কমলাকে দাবী করতাম? একটা কথা কিন্তু বড় বুকে বেধে রইল। অজয় কমলার জন্য মরেছে। মুখে বলেনি অবশ্য, কিন্তু আলাপ করবার পর থেকে ক্রমাগত কমলার কথা কয়দিন বলেছে। আমি আসবার আগের দিন ষ্টেসনে কমলাকে দেখ্‌বামাত্র ওর মুখে যে আনন্দের ঢেউ খেলে গেল তা আমার চোখ এড়ায় নি। একলা কেবিনে ব'সে এখন ভাবছি, নিমেষের ভুলে কমলাকে হারাতে বসিনি ত? যদি বলে আসতাম কিংবা যদি অজয়ের সঙ্গে আলাপ না করিয়ে দিতাম। উঃ আমার কি হল। এত নীচ আমি! কমলা ত আমার সম্পত্তি নয়, আমাকে ভালবাসে বোধ হয় ভাইয়ের মতন। অজয় আমার চেয়ে রূপে গুণে আর অর্থে সবদিক দিয়ে বড়। কমলা যদি তাকেই বরমাল্য দেয় তবে হতভাগ্য আমি কেন তাদের সুখের পথে দাঁড়াই? ইচ্ছা করছে সব ফেলে দেশে ফিরে যাই। না, তা হবে না। এ দুর্ব্বলতাকে জয় করতে হবে। আমার কর্ত্তব্য আমি করে যাই। বাড়ীতে মা ভাই মুখ চেয়ে আছেন; আর আমার দুর্ভাগা দেশ—তারও আশার স্থল আমার মতন সব যুবক। একজনও যদি পিছিয়ে পড়ে তবে দেশ-মায়ের চোখে আরও আঁধার ঘনিয়ে আসবে। একজনও যদি এগোয় তবে উষার সূচনা হবে। তিনটি বছরের প্রত্যেকটী মুহূর্ত্ত গণনা করে আমাকে এই সুকঠিন ব্রত উদ্‌যাপন করতে হবে। ভগবান আমার সহায় হোন্।

(কমলার চিঠি)

ভাই বেলা,—

অনেকদিন পরে তোমার চিঠি পেয়ে খুব আনন্দ হ'ল। বিয়ে হ'লে সবাই পুরাণো বন্ধুদের ভুলে যায়, আর অবিবাহিত বন্ধুদের উপর খুব সর্দ্দারি করে, এই শুনতে পাই। তোমার পক্ষেও সেটার ব্যতিক্রম হয়নি দেখছি। বিয়ের পরে এই বোধ হয় দু বছরের মধ্যে প্রথম চিঠি আমায় লিখলে। আর তার মধ্যেও কেবল উপদেশ, বাপ্‌রে বাপ্! তুমি লিখেছ আমার বি, এ, পরীক্ষা হয়ে গেলে আর আমার বিয়ে করার পক্ষে কোন আপত্তি থাকতে পারে না, কেন না এতদিন ধরে কেবল পড়ার ছুতো দেখিয়েই নাকি আমি তোমাদের মত লেজকাটা শেয়ালের দলে ঢুকিনি। সত্যিও তাই ভাবলে? তা'হলে একটু খুলে বলি। লেখাপড়া করাটা আমার পক্ষে ছুত নয়, বিয়ে এড়ানোর কৌশল নয়। সত্যি কথা বলতে গেলে আমি নিজের বিয়ের কথা এ পর্য্যন্ত ভাবিই নি, আর বাবাও কিছুই বলেন নি। অনুরোধ করবার মধ্যে চিরকাল তোমরা বন্ধুর দল আছ, যারা marriage marketএ নামাটাই জীবনের চরম লক্ষ্য বলে ঠিক্ করেছ। তোমাকে লক্ষ্য করে বল্‌ছি যে মন খারাপ করো না। তোমার বিয়ে করার জন্য মস্ত কারণ ছিল—প্রেমে পড়া। কিন্তু আর ভাইর কথা ভেবে দেখ। প্রেমে পড়লে আমারও আপত্তি ছিল না, কিন্তু সে জিনিষটাও বুড়ো হ'ল! পর্য্যন্ত (আর দুমাস পরেই কুড়ি বছর হবে—কাজেই বুড়ী) জান্‌লাম না। তোমার ভাই—বৃথাই আমার ইংরাজী, বাঙ্গলা, সংস্কৃত সব কাব্য নাড়াচাড়া! তবে লোকে আমাকে যতটা সুন্দর মনে করে ততটা বোধ হয় নই। এই দেখনা সুরেশ বাবু পর্য্যন্ত বিলাত থেকে, মাণিক,

টুনু, রাণী—এদের সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও মাঝে মাঝে picture post cards পাঠান। যাবার সময় বলে গেলেন চিঠি লিখব, এদিকে সেখানে গিয়ে এত জ্ঞানবৃদ্ধ হয়ে পড়লেন যে আমাকে কচি মেয়ে ছাড়া কিছু বোধ হয় মনে করতে পারলেন না, তাই দু এক খানা ছবি পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত। ভাগ্যিস্ একখানা nursery rhymes উপহার পাঠান নি। ভেবেছিলাম একথা তাঁকে লিখব, কিন্তু পড়া নিয়ে এত ব্যস্ত থাকি, ঠিক mail dayর দিন কোন মতে যেন চিঠি লেখা ঘটে উঠে না।

যাক্ কি বলছিলাম? ছেলেমানুষির কথা? না ভাই, আমি আর বিশেষ ছেলেমানুষ নই হয়ত তোমাদের মত অত বুঝি না, কিন্তু আজকাল একটু একটু চোখ ফুটেছে। একটী চুপি চুপি তোমায় বলি, শোন। তুমি যে লিখেছ অজয়বাবুর সঙ্গে আমার বিয়ের একটা শুনেছ, সেটা একেবারে মিথ্যা নয় বোধ হয়। তুমি ত জান সুরেশবাবুর যাবার আগে অজয়ের সঙ্গে আলাপ হয়। সেই থেকে আমাদের বাড়ীতে তিনি প্রায়ই আসেন। লোকটি অমায়িক, কিন্তু একটু লাজুক। ক্রমে যখন আমাদের সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেল, তখন পড়াশুনায় খুব সাহায্য করতেন, আর সেই সূত্রে আমরা অনেকক্ষণ ধরে গল্প করতাম। বাবুর কাছে যেমন নিঃসঙ্কোচে আমার সব আদর্শ ইত্যাদির কথা বলতাম, এঁর সঙ্গেও করেই কথা বলতাম্। ইঁনিও খুব উৎসাহ দিতেন; তবে লোকটি একটু impulsive কখনও খুব উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন, কখনও বা একেবারে চুপ্। একদিন সন্ধ্যার একটু খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ আমার মুখের দিকে চেয়ে বলে উঠলেন, "কমলা।" একটু অবাক হলাম যে, নামধরে ডাকলেন কেন। পরমুহূর্ত্তে দেখ্লাম একেবারে রক্তে উঠেছেন। তারপর কোন কথা না বলেই চলে গেলেন। এ কয়দিন আর আসেন নি। প্রথমে ভারি থতমত খেয়ে গিয়েছিলাম, তারপর চুপ করে ভাব্তে ভাব্তে বেশ বুঝতে ব্যাপারটা কি। একলা বসে বসেই লজ্জা করতে লাগ্ল। আর ততটা ছেলেমানুষ নই আমাকে কেউ কোনদিন ভালবাসবে—কাব্য নাটকে যেমন লেখে তেমনি করে—এ ভাবি ঠেক্ল। তার দু'দিন পরেই রাত্রে পড়া সেরে, বাতি নিভিয়ে, আমার শোবার ঘরের দি মার ঘরের দরজা পর্য্যন্ত যেতেই শুন্তে পেলাম, বাবা বলছেন, "অজয় কমলাকে বি চায় লিখেছে। এখন ওকে বলে কাজ নেই, শেষে চটে যাবে, পরীক্ষা হয়ে যে করলেই হবে। আমার ত অজয়কে খুব পছন্দ।" মার উত্তর শোনবার জন্য দাঁড়া দৌড়ে বিছানায় আশ্রয় নিলাম। ভাগ্যিস্ পরীক্ষার পর পর্য্যন্ত মুলতুবি রেখেছে জিগেস্ করলে নূতনত্বের মোহে হয়ত বা "হাঁ" বলেই ফেলতাম। এখন দু'দিন বুঝতে পারছি "না"টাই আমরা ঠিক উত্তর; কেন না, অজয়বাবুর প্রতি আমার মনের ভা নির্ব্বিকার, প্রেমের কোন চিহ্ন ত খুঁজে পাচ্ছি না। ভালবাসলে আর এত করে

করে দেখতে হত না নিশ্চয়। তা'হলে নিজেই ধরা পড়ত। তোকে এখন থেকে সব লিখ্লাম বলে তুই যেন রটিয়ে দিস্ না।

আমরা ভালই আছি। পরীক্ষা হয়ে গেলে চিঠি লিখে খুব জ্বালাতন করব। তোমার স্বামীবাবুটিকে নমস্কার দিও। তুমি ভালবাসা নাও, আর খোকন মণিকে মাসীর চুমো দিও।

তোমার কমলা

(অজয়ের কথা)

সেদিন যে মুহূর্ত্ত থেকে কমলাকে দেখেছি, সেই মুহূর্ত্ত থেকে আর কিছু যেন ভাববারও অবকাশ নেই! আমার যেমন চিরকাল সবতাতে বাড়াবাড়ি, তেমনি ভালবাসাতেও বাড়াবাড়ি। সমস্ত পৃথিবীর আশা আনন্দ, বাসনা কামনা যেন ঐ একটি কিশোরীর মধ্যে রূপ ধরে আমায় দেখা দিয়েছে।

মা ক্রমাগত বিয়ের জন্য তাড়া দিচ্ছেন,—বড় ঘরের ছেলে, তায় আবার চার চারটে পাশ, সে কি কখনও আইবুড়ো থাকে? দিনে যে কটা বিয়ের সম্বন্ধ আসছে,—আর সবগুলই নাকি অর্দ্ধেক রাজত্বের সঙ্গে এক রাজকন্যা গোছের—সব গুলিতে রাজী হলে অতি বড় কুলীনকেও লজ্জা দিতে পারি। মাকে তাই বললাম যে, এত ভালর মধ্যে বেছে নেওয়া ভারি শক্ত, আমি তার চেয়ে সব কটিকে বিয়ে করি। মা এক ধমকে চুপ্ করিয়ে দিলেন, বল্লেন, "সব তাতে ঠাট্টা"—ঠাট্টা না করেই বা কি করি। পঁচিশ বছর বয়সে একটি আট বছরের খুকিকে এনে প্রথম ভাগ পড়ান আমার দ্বারা হবে না—এ কথা বলেও আজকাল নিস্তার নেই! আমাদের সমাজ দ্রুত সভ্য হয়ে উঠেছে, সেখানে সুন্দরী শিক্ষিতা ষোড়শীরও অভাব নেই! মা বলেন, "তুই চাইলে লেখাপড়া জানা ডাগর বৌ ঠিক্ জোগাড় করব।" এঁরা অর্থাৎ এই "ডাগর" মেয়েগুলি সুন্দরী হতে পারেন, ষোড়শী অষ্টাদশীও অবিশ্বাস্য নয়, কিন্তু শিক্ষিতা—এই শুনলেই আমার গায়ে জ্বর আসে। ইংরাজিতে চিঠির উপরে ঠিকানা লিখতে পারা, আর বাংলায় খানকুড়ি কিংবা তারও বেশী বাজে উপন্যাস গলাধঃকরণ করা এর নাম হচ্ছে শিক্ষা। সঙ্গে সঙ্গে এঁরা অশিক্ষিতাদের গৃহকর্ম্মপটুতাটুকু পর্য্যন্ত হারিয়ে অহঙ্কারে ধরাকে সরা জ্ঞান করেন। এই রকম একটি গলায় বেঁধে নিতে আমি মোটেই রাজি নই। কেন আর মিছে বেচারীদের উপর ঝাল ঝাড়ছি, আসলে কমলাকে দেখে পর্য্যন্ত সে ছাড়া কাউকে চোখে ঠেক্ছেনা, এই হল প্রকৃত ব্যাপার। মাকে বলব নাকি? বোধ হয় অমত করবেন না, আমার সুখের জন্য মা সইতে পারেন না এমন জিনিষই নেই।

* * *

ছি ছি কি করলাম। কেন মনের ভাব ইঙ্গিতেও প্রকাশ করলাম। কমলাকে মনে ম
দেবীর মত পূজা করে এসেছি, আবার এদিকে তাকে জীবনসঙ্গিনীরূপে পাবার জন্য সাধ
করেছি। তিনটি বছর ধরে সাধনার ফল ব্যর্থ হয়ে গেল—এক নিমেষের ভুলে। সেদিন সন্ধ্যা
সন্ধ্যায় আত্মহারা হয়ে ডাকলাম "কমলা"। সরলা কিশোরী কিছু না বুঝে কেমন চকিতা হরিণী
মত আমার দিকে চাইলে। তার সেই দৃষ্টির সম্মুখে ভারি লজ্জা বোধ হল, এমন ছলাকলাহী
বালিকার কানে প্রেমের কথা, ছিঃ। তখনই ছুটে বেরিয়ে এলাম। তারপর আর গেলাম না
ভাবলাম কিছুদিন পরে যখন ভুলে যাবে, তখন যাব। তখন যদি মুখ থেকে বেরিয়েই গিয়েছি
তবে কেন একেবারেই আত্মপ্রকাশ করলাম না। কমলা আমাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে—য
আমার প্রেমের আকর্ষণে ভালবাসতেও পারত, হয়ত প্রত্যাখ্যান না করতেও পারত। নি
নিমেষের ভুল—সে নিমেষ ত ফেরান যায় না। আমি পালিয়ে এলাম আর গেলাম না, এ
সে মনে করল কাপুরুষ আমি। ভালবেসেও সমাজের ভয়ে হয়ত তাকে বিয়ে করতে রাজি ন
তাই আমার এই ধরা দিতে গিয়ে পালিয়ে আসা। উঃ, এ যন্ত্রণাও আমি নীরবে সয়ে য
যদি পেলাম না তাকে, তবে কেন আভাসেও তাকে জানালাম।

একমাস ধরে নানা জায়গায় ঘুরে এখানে ফিরে শুনলাম সুরেশ বিলেত থেকে ফিরে
দৌড়ে দেখা করতে গেলাম। সে বাড়ী ছিলনা, ভুলু বল্‌ল সে রজনীবাবুর বাড়ী গেছে। সে
যাব কি যাব না ভাবছি, মনে হল বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাব, এতে আর দোষ কি? অন্য লোকে
সাম্‌নে কমলার কাছে অত লজ্জাও করবে না, সামলে নিয়ে এবার ঠিক মনের কথা
খুলে বলব, নয়ত রজনীবাবুকে আগে জিগেস করে তাঁর অনুমতি নিয়ে কমলাকে একখানা
লিখে ফেল্‌ব। তিনি ত তাঁর মত জানিয়েছিলেন, বলেছিলেন কমলা যদি চায় তাঁর
হবে না, এ সম্বন্ধে কমলার কথাই শেষ কথা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাব্‌ছি, হঠাৎ ভুলু ঘরে
"জানেন অজয়বাবু, কমলাদি আমার বৌদি হবে।" আমি হাঁ করে চেয়ে রইলাম, আস্তে
বল্‌লাম "বৌদি মানে"? ভুলু গম্ভীরভাবে বল্‌ল, "মানে দাদার স্ত্রী।" বুকের ব্যথাটি
শরীরে ছেয়ে গেল, তবু বল্লাম "সত্যি নাকি? সুরেশের সঙ্গে বিয়ে"? ভুলু বল্লে, "
এসেই ঠিক হল। কেউ ভাবিনি, কমলাদি রাজি হবে, কিন্তু এক কথতেই রাজি হয়
আমার মনে সেই সন্ধ্যার—সেই নিমেষটি জেগে উঠ্‌ল। হয়ত কমলা "না" বলত, হয়ত
মনে সুরেশকে বরাবর ভালবাসে, তবু—তবু মনের মধ্যে একটা ভুলের স্মৃতি আগুনের
লেখা রইল।

কমলা সুরেশকে একসঙ্গে দেখে বুঝলাম, এমন মিলন সুলভ নয়। সুরেশের তপস্যা
কি আনন্দের আভা! আর কমলা? তার মধুর হাসিটি গৌরব-লজ্জা-জড়িত হয়ে
হয়েছে। বোঝা যাচ্ছে বটে, সে তার মনের মানুষকে পেয়েছে। তখন মনে হল, তাহলে

ভুলের নিমেষটাও সার্থক হল। আসছে মাসে সুরেশের বিয়ে। বাড়ী এসে মাকে বললাম, পনের দিনের মধ্যেই আমার বিয়ে করা চাই, দেরী করলে বুড় হয়ে যাব। মা বেজায় খুসী—পাগল ছেলেকে এবার বাঁধতে পারবেন। কমলার কাছে নিমেষের ভুলটুকু বিয়ে করে সারিয়ে নিতে হবে। সে যেন ভেবে নেয়, সেটা শুধু—ভুলই, আর কিছু নয়।

শ্রীসুনীতি দেবী

শরতের প্রথম দিবসে

আজ নিশীথে পূজার ঘরে
জ্বাল্‌লে নিশি সন্ধ্যা দীপ্‌
সন্ধ্যারাণীর ললাট হ'তে
মুছিয়ে নিয়ে সোনার টিপ্‌
বইছে ধীরে বর্ষা বাতাস—
ফুলের রেণু ঝরিয়ে পায়
তরঙ্গেরা বেলার বুকে
মনের সুখে দোলন খায়
বেল্‌ওয়ারীর হাজার ঝাড়ে
জ্বাল্‌ছে তারা আকাশ বাতি।
চাঁদের আলোর আস্তরণে
শয্যা বিছায় জ্যোৎস্না রাতি।
গন্ধরাজের গন্ধ দেখে
নিশাগন্ধার গর্ব্ব অঙ্গি
পড়ল ঝরে কদম-কেশর
লজ্জারাঙ্গের রাঙ্গায় রাঙি

নীপের শাখে ঝুলন দোলা
দোলন দিয়ে দুলিয়ে দেছে—
মেঘের চোখে কাজল রেখা
তুলির টানে বুলিয়ে দে'ছে।
হাসির মতন্ বাঁশীর আওয়াজ
উঠ্‌লো বেজে মেঘের ডাকে
দাদুরীদের ছুটোছুটি
দোল খাবে আজ নোড়ের শাখে।
ইন্দ্রধণুর বর্ণ দিয়ে
পুচ্ছদেশে চন্দ্র আঁকা।
মেঘের স্বরে পেখম ধরে
বনের পথে নাচ্চে 'কেকা',
খালে বিলে জল ধরে না
কমল কুমুদ সালুক ভাসে।
বসে আছে বৈরাগী বক
মৎস্য শিশুর আসার আশে।*

শ্রীইন্দিরা দেবী

---

* কবিতাটী সম্ভবতঃ অসমাপ্ত।

"ধনভাজাং ভীতিঃ"

"মরবার আগে তোমাকে শোধরাতে দেখা আর আমার অদৃষ্টে ঘট্‌ল না। এত চেষ্টা করলুম কোনই ফল হ'ল না। তুমি আমার কথা বরাবর অগ্রাহ্য করলে।"

উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে গৃহস্বামী প্রৌঢ় জনার্দ্দন রায় নতমস্তক দণ্ডায়মান ভ্রাতুষ্পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া কথাগুলি বলিলেন।

যুবক মাথা নীচু করিয়াই উত্তর দিল "আমি আপনার কথা কোন দিনই অগ্রাহ্য করি নি।"

"অগ্রাহ্য করা কাকে বলে আর? চেষ্টা করলে এতদিনে তুমি নিজকে শোধরাতে পারতে না?"

"আমি অনেক চেষ্টা করেছি—পারিনি। আমি আপনার কোন কথা অগ্রাহ্য করি জেঠা মশায়?" যুবকের চোখে জল আসিল।

"আমিও অনেক চেষ্টা করে এলে গেছি। এবার শেষ চেষ্টা করে দেখ্‌ব যদি কিছু হয়। ভেবেছ আমি মর্‌লেই টাকার ভাবনা থাক্‌বে না—তখন যা খুসী তাই কর্‌বে। তোমার সে পথ বন্ধ কর্‌ছি। উইল কর্‌ছি তাতে তোমার জন্য খোরপোষ ছাড়া কোন বন্দো থাক্‌বে না। এবার তোমার যদি চৈতন্য হয়।"

যুবক এবার মুখ তুলিল। তাহার চোখে তখন যেন জলের বদলে বিদ্যুৎ ছুটিতেছিল। মনের বিচলিত ভাব দমন করিয়া সে বলিল—"তা আপনি অনায়াসে কর্‌তে পারতেন যদি আমি পার্‌তুম আপনার কথাতেই কর্‌তুম। সম্পত্তির লোভ আমার নেই।"

"হ্যাঁ তুমি নির্লোভ—একেবারে গৌতম ঋষি—বেশ এখন যাও। রাত হয়েছে।"

যুবকের গৌরবর্ণ মুখমণ্ডল লজ্জা ও অপমানে আরক্ত হইয়া উঠিল। অতি কষ্টে দমন করিয়া সে ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

"সুধীর শোন——"

দুয়ারের কাছ হইতে সুধীর ফিরিয়া আসিল।

জনার্দ্দন রায় বলিলেন—'তুমি বোধহয় ভেবেছ সুধীর, আমি তোমাকে ফাঁকি তোমাকে শাসন করা আমার উদ্দেশ্য নয়, ফাঁকি দেওয়াই উদ্দেশ্য।'

সুধীর বলিল—'আমি কি কখনো সে কথা বলেছি জেঠা মশায়? আমায় পায়ে হতে হলেও সে কথা আমার মনে হবে না। আপনার পায় হাত দিয়া আমি এ পারি।' সুধীর নত হইয়া তাহার জেঠা মহাশয়ের পায়ে হাত দিতে গেল।

জনার্দ্দন রায় দুই হাত দিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রকে উঠাইয়া বলিলেন—"সুধীর, উঠ্‌ বাবা, তোকে কি আমি একটা কুটো থেকে বঞ্চিত কর্‌তে পারি? যা কিছু আমার আছে তার অর্দ্ধেক তোর আর অর্দ্ধেক তোর দাদার। এই দেখ্‌—"

ড্রয়ার খুলিয়া জনার্দ্দন রায় একটা সদ্য-সমাপ্ত উইল বাহির করিলেন। উইলের একটি স্থানে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া পড়িলেন—আমার যাহা কিছু স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি আছে তাহা আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ সুধীর রঞ্জন রায় ও আমার পুত্র শ্রীমান্ সুধাংশু ভূষণ রায় সমানভাবে পাইবে।

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য

উইল হইতে মুখ তুলিয়া জনার্দ্দন বলিলেন—"এই আলমারীতে নগদ যা আছে তাতেই তোমাদের দুজনার রাজার হালে চলে যাবে। আমি আর কয়দিন! যে কয়দিন থাকি একটু সুস্থ হয়ে থাক্‌তে দে। জোর করে তাড়াস্‌নি আমায়। বল্‌, ও ছাই পাশ খাওয়া ছেড়ে দিবি?"

সুধীর জেঠা মশায়ের পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—'দেখুন জেঠা মশায়! আমায় আর একবার ক্ষমা করুন।'

"একবার কেন, তোকে একশ বার ক্ষমা কর্‌ব, রঞ্জিত আমার কিছু ভোগ কর্‌তে পেলে না। ও তার ছেলে। আমাকে আর তাকে দেখে কেউ কোন দিন বুঝ্‌তে পারিনি যে আমরা ওদের ভাই নই, বৈমাত্রেয় ভাই। কেউ একথা ভাব্‌তেও পার্‌ত না। দুভাইএ আমরা চিরদিন একপাতে বসে খেয়েছি—বড় হয়ে পর্য্যন্ত। এখন বুড়ো হয়েছি, এখন সে যদি থাক্‌ত তেমনি করে একপাতে বসে খেতুম। পারিস্‌ তোরা?"

জনার্দ্দনের চোখ দিয়া হু হু করিয়া জল পড়িতে লাগিল। দুই হাত দিয়া তিনি সুধীরকে উঠাইয়া বুকের কাছে জড়াইয়া ধরিলেন।

একটু পরে চোখ মুছিতে মুছিতে সুধীর ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। দুয়ারের ছিদ্র দিয়া একজন লুকাইয়া ঘরের ভিতরকার সমস্ত কথাবার্ত্তা সমস্ত ব্যাপার অখণ্ড মনোযোগের সহিত প্রত্যক্ষ করিতেছিল। সুধীর দুয়ারের কাছে আসিতেই সে লঘু ও ক্ষিপ্র গতিতে দূরে সরিয়া গেল। যে চলিয়া গেল সে জনার্দ্দন রায়ের একমাত্র পুত্র সুধাংশু।

(২)

অত্যন্ত উদ্বিগ্নমুখে সুধাংশু অন্তঃপুরের একটী কক্ষে ফিরিয়া আসিল। সেখানে সুধাংশুর স্ত্রী প্রমীলা সুন্দরী স্বামীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।

স্বামী দ্রুতপদে আসিতেই প্রমীলা জিজ্ঞাসা করিল—'কি-হ'ল ? কি শুন্‌লে ?'

সুধাংশু বিরক্তির সুরে বলিল—'ঠিক তাই !'

"বিষয় আশয় সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হচ্ছিল ?"

"হ্যাঁ।"

"কি-কথা, কি রকম ভাব ?"

"কথা আমার মাথা, আর ভাব আমার মুণ্ডু।"

"তোমার কথার ঐ দুটো অঙ্গই অর্থাৎ মাথা ও মুণ্ডু কিছুই বোঝা গেল না। একটু পরি করে বল। হেঁয়ালিতে এখন কোন লাভ নেই।"

"উইলের খসড়া হয়েছে। একেবারে আধাআধি।" বলিয়া দুয়ারের ফাঁক দিয়া যাহা সে দেখিয়াছিল সব সবিস্তারে বর্ণনা করিল।

"শেষটা আধাআধি ! তবে যে বল্‌তে বাবা ভারি চটে গেছেন !" প্রমীলা জিজ্ঞাসা করি

"আগে তো তাই জান্‌তুম। এখন দেখ্‌ছি ছাই চটেছেন। আদর ও আলিঙ্গনে বাড়াবাড়ি করেছেন। বুড়ো হয়ে ভীমরতি হয়েছে বাবার।"

"তা যেন হয়েছে ! কিন্তু এখন কি কর্‌বে ?"

"কর্‌ব আমার পিণ্ডি ! তোমার কথা শুনে এত হাঙ্গাম এত খরচ পত্র কর্‌লুম। লাগিয়ে—সুধ্‌রেকে মদের পিপে করে তুল্‌লুম, তার এই ফল ! মাঝে থেকে তোমার তিনটি বছর ধরে সাধু-পুরুষ সেজে থাক্‌তে হল। তিন বছরের মধ্যে দিনের বেলায় খেতে দাওনি।"

"তাতে আর কি ক্ষতি হয়েছে ! রাতে তো তার শোধ তুলেছ, এক এক রোজ করেছ এক রাত্তিরে, আর বেলা আটটায় উঠেছো। আমিই তো এমন ব্যবস্থা কর

যে আসল কথা কেউ জান্‌তে পারে নি ; আর সাধুপুরুষ বলে তোমার খ্যাতিটাও বজায় আছে। তবুও আমায় দুষ্‌ছ ?"

"কেন দুষ্‌ব না ? কি লাভ হ'ল আমার ? দিন-মান গুলো কি কষ্টে কাটাতে হয়েছে ! এবার থেকে তার শোধ তুল্‌ব। দাও 'ত' চাবিটা একবার।"

"এখন যাক, আর একটু রাত হ'ক। যদি শ্বশুর ডাকেন আবার !"

"ডাকেন তো বয়ে গেল। তিনি যখন সুধ্‌রেকে ডেকে আদর করে অর্দ্ধেক বিষয় দিতে পারেন তখন তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ কি ? দাও, চাবি দাও।"

প্রমীলা কি একটা মতলব আঁটিতে আঁটিতে আচল হইতে চাবির রিং খুলিয়া স্বামীর হাতে দিল।

সুধাংশু আলমারী খুলিয়া একটা হুইস্কির বোতল বাহির করিয়া টিপয়ের উপর রাখিল ও একখানা চেয়ার তাহার কাছে টানিয়া লইল।

প্রমীলা উঠিয়া সাবধানে ভিতর হইতে দুয়ার বন্ধ করিয়া দিল।

দুয়ার বন্ধ করিয়া স্বামীর কাছে ফিরিয়া প্রমীলা দেখিল স্বামী তাহার মধ্যেই অর্দ্ধেক উদরস্থ করিয়া ফেলিয়াছে।

ঈষৎ অনুযোগ করিয়া প্রমীলা কহিল—"ছিঃ, এরি মধ্যে এতখানি খায় ! রাত যে মোটে ন'টা !"

"তা হোক্, Don't care এবার থেকে ! তুমি আর মাষ্টারি কোরো না।"

বলিয়া স্ত্রীর পানে একবার ভাল করিয়া চাহিল।

প্রমীলাকে বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। সে রাত্রে তাহার সাজসজ্জাও খুব মনোরম হইয়াছিল। সুধাংশু মুগ্ধ হইয়া স্ত্রীকে দুই হাত দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া কোলের উপর বসাইল ও সশব্দে তাহার বদিরাসিক্ত ওষ্ঠ দিয়া চুম্বন করিল।

মুখখানা একটু বিকৃত করিয়া বাঁ হাত দিয়া প্রমীলা চুম্বিত স্থানটা ধীরে ধীরে মুছিয়া ফেলিল।

"ছিঃ, তোমার এই কাজ ! চুমুর অপমান !" বলিয়া ঠিক সেই স্থানটায় আর একবার ঘন করিল।

বোধ হয় তৃতীয় চুম্বনের ভয়ে প্রমীলা এবার আর সে জায়গাটা মুছিল না !

সুধাংশু খুসী হইল ও একটু পরে স্ত্রীকে কোল হইতে মুক্তি দিল।

প্রমীলা মুক্তি পাইয়াও বড় দূরে গেল না। জিজ্ঞাসা করিল—"কি কর্‌বে এখন ভাব্‌ছ ?"

"সংসার ত্যাগ করে দুজনে মিলে বদরিকাশ্রমে গিয়ে থাক্‌ব।"

সুধাংশু রোদনের মত অনুনাসিক সুরে কথাগুলি বলিল।

প্রমীলা কহিল—"বদরিকাশ্রম একটু দূরের পথ, এখনি আর গিয়ে কাজ নেই। এখন বারাণসীধামে থেকে একটা বিহিত কর।"

"কিসের ?"

"উইলের।"

"উইলের ? উইলের আর কি কর্‌ব। সাক্ষী হব ?"

"সাক্ষী তোমার হতে হবে না ; সাক্ষীর লোকের অভাব হবে না। সকলকে জানিয়ে উইল রেজেষ্ট্রি কবে হবে ?"

"কাল হবে।"

"কাল ? আচ্ছা, আজ্‌কের মধ্যে উইল বদ্‌লাতে পার্‌বে না ?"

কথাটা সুধাংশুর মস্তিকে অত্যন্ত উত্তেজনার সৃষ্টি করিল। সুধাংশু লাফাইয়া উঠিল।

"ঠিক বলেছ ! ও উইল বন্দ করতেই হবে। কি করা যায় বুদ্ধি দাও দেখি !"

"আমার বুদ্ধি কি তুমি শুন্‌বে ?"

"শুন্‌বনা ? কোন্ কথাটা তোমার না শুনেছি ! তিনটি বচ্ছর তোমার কথা মত ভিজে বোরলটি হয়ে আছি !"

"তবে শোন। শ্বশুরকে আজ রাতেই ভয় দেখিয়েই হোক্, যেমন করে হোক্, উইল বদ্‌লে নিতে হবে। এখনও অনেকক্ষণ তিনি ঐ ঘরে একা থাক্‌বেন। তুমি যাও ঐ গিয়ে তাঁকে আট্‌কাও। তিনি সহজে ভয় পান। ভয় পেলেই যা বল্‌বে তাই কর্‌বেন।"

"যদি না করেন, তখন ? যদি বেঁকে বসেন ?"

"তখন পেটে তোমার যা পড়েছে তার ঘাড়ে দোষ চাপানো যাবে। তবে আমি যদি ভয় দেখাতে পার তাহলেই কার্য্যসিদ্ধি। কালই আমি একখানা ডিটেক্‌টিভ পড়েছিলুম রিভলবর নিয়ে একজন তার বাপের সাম্‌নে গিয়ে ধর্‌লে, আর তার বাপ করে লোহার সিন্দুকের চাবি ছেলের হাতে ফেলে দিলে।

"ঠিক বলেছ ! যাহাঁতক বায়ান্ন তাঁহাতক তিপ্‌পান্ন। দাওতো রিভলভারটা ; সেরে আসি।

তখন সুধাংশুর পূরাদস্তুর নেশা হইয়াছিল। আর খানিক অপেক্ষা করিয়া রিভলভার পকেটে ফেলিয়া সুধাংশু ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

(৩)

জনার্দ্দন রায় কলিকাতার সুবিখ্যাত ধনী। লোকে বলিত কলিকাতায় নাকি রাস্তা নাই যেখানে তাঁহার একখানি বাড়ী না আছে। তাঁহার নগদ অর্থের পরিমাণ অঙ্ক লোকের মুখে ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিত।

পঞ্চাশের পর হঠাৎ তাঁহার মনে হইল এই সব অর্থ সম্পত্তির ভার যাহাদের কাঁধে ফেলিয়া দিয়া স্বামীস্ত্রী মিলিয়া তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইবেন। মাসিক নির্দ্দিষ্ট একটা অর্থ ছাড়া বিষয় সম্পত্তির সহিত তাঁহার আর কোন সম্বন্ধ থাকিবে না। কিন্তু বিষয়ের মোহ এমনিই, আর এমনি তাহার আকর্ষণ যে সহসা বিষয় ত্যাগ করিয়া থাকিতে তাঁহার মন সরিল না ; তাই তাড়াতাড়ি একটা উইল স্থির করিয়া ফেলিলেন। একজন হিতৈষী বন্ধু তাহাকে পরামর্শ দিলেন——'ওহে শঙ্করাচার্য্যের মোহমুদ্গর পড় মোহ ঘুচিবে ; তাই মোহ ঘুচুক আর না ঘুচুক, কার্য্যান্তে নিত্য তিনি একবার বইখানি খুলিয়া পড়েন—কা তব কান্তা কস্তব পুত্র ইত্যাদি। কিন্তু হায় রে কান্তা কে বলিতে সেই কান্তার প্রতি লুব্ধচিত্ত লুব্ধ ভ্রমরের মত আসক্ত হয়ে পড়ে। কান্তা যে কেহই নহে, কথাটা নিতান্তই অমূলক বলিয়া মনে হয়। 'পুত্রকে' বলিতে পুত্রের সুন্দর হাসিমাখা মুখ মনে হয়। বৈরাগ্য কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

জনার্দ্দন রায় ভ্রাতুষ্পুত্রকে বিদায় করিয়া খানিকক্ষণ নানাকথা ভাবিলেন। মনে হইল যে বিষয় তিনি ত্যাগ করিতে চাহিতেছেন তাহার মূল তাহার হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। বিষয়কে বিচ্ছিন্ন করিতে হইলে হৃদয়কেও ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলিতে হইবে সে কি সহজে মানুষ পারে ? জোর করিয়া ত্যাগ এক, আর হৃদয়ে বৈরাগ্যের উদয় হইলে ত্যাগ অন্যবিধ।

নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি মোহমুদ্গর পড়িতে লাগিলেন। জনার্দ্দন পড়িলেন——

মূঢ় জহিহি ধনাগমতৃষ্ণাম্
কুরু তনু বুদ্ধে মনসি বিতৃষ্ণাম্
পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ—
সর্ব্বত্রৈষা কথিতা নীতিঃ।

কথাটা তাঁহার মনঃপূত হইল না। মনে মনে বলিলেন শাস্ত্রকার ও ধর্ম্মপ্রচারকেরা মনের আবেগে অনেক দূর অগ্রসর হইয়া যান। অতিশয়োক্তি বড় বেশী—অতটা না করিলেও চলিত। বিষয়কে খর্ব্ব করিতে হইবে তাই নিরীহ পুত্রের স্কন্ধে সব দোষ চাপান হইয়া গেল। তাঁহার মুখে একটা অবিশ্বাসের হাসি দেখা দিল।

হঠাৎ মনে হইল পিছনে যেন কে দাঁড়াইয়া ! মুখ ফিরাইয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তাঁহার এক মাত্র পুত্র সুধাংশু রিভল্‌ভার হাতে দাঁড়াইয়া ! মুখে চোখে তাহার লোভ ও হিংস্রভাব ফুটিয়া বাহির হইতেছে। পিতার দিকে রিভল্‌ভারের লক্ষ্য রাখিয়া সুধাংশু বলিল—আপনি ও উইল বদ্‌লান্। আমার যা প্রাপ্য তা থেকে একটা কড়িও আপনি সুধীরকে দিতে পারবেন না।

জনার্দ্দনের সমস্ত শরীর যেন পাথরের হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার মুখ হইতে একটি কথাও বাহির হইল না ; হাত নড়িল না।

সুধাংশু পুনরায় বলিল—"নিন্ ওটুক বদলে দিন।'

উইল পাশেই ছিল তাহা লইয়া তিনি কম্পিতহস্তে ভ্রাতুষ্পুত্রের নাম কাটিয়া দি
সেখানে শুধু পুত্রের নাম বজায় রাখিলেন।

"দিন্ এ উইল আমার কাছে।" গম্ভীর ও জড়িতস্বরে সুধাংশু বলিল।

জনার্দ্দন হাত উঠাইবার একটু চেষ্টা করিবামাত্র সুধাংশু চিলের মত তাহা ছোঁ দি
উঠাইয়া লইল। "আপনার আলমারীটা খুলুন" আদেশের স্বরে সুধাংশু কহিল।

একটু দেরী হইতেছিল; সুধাংশু অধীর হইয়া বলিল 'দেরী করবেন না, খুলুন।'

কাঁপিতে কাঁপিতে জনার্দ্দন রায় উঠিয়া আলমারীর চাবি খুলিয়া দিলেন। নোটের তাড়া
শুভ্রতা স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার শোভা ও ঔজ্জ্বল্য চোখের সম্মুখে ছুটাছুটি করিতে লাগিল।

উইলটি পকেটে ফেলিয়া সুধাংশু অগ্রসর হইল। আলমারীটা স্বহস্তে বন্ধ করিয়া দি
চাবিটি আপনার কাছে রাখিল। তারপর একবার পিতার পানে চাহিয়া বুঝি বা তার পি
বা বিতৃষ্ণা কোন্‌টির পরিমাণ বেশী তাহাই অনুমান করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল।

বিমূঢ় স্তম্ভিত ও বজ্রাহতের ন্যায় জনার্দ্দন রায় আপনার আসনে বসিয়া পড়িলেন। ম
কাছে কে যেন অতি গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন—

পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ।
সর্ব্বত্রৈষা কথিতা নীতিঃ॥

(৪)

সে দিন গভীর রাত্রে জনার্দ্দন রায়ের অট্টালিকায় অত্যন্ত ব্যস্ততা দেখা গেল। জন
গৃহিণী বিন্ধ্যবাসিনী রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত স্বামীর জন্য অপেক্ষা করিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন।
১১টার বেশী তিনি কখনও বাহিরে থাকেন না। তাঁহাকে ডাকিবার জন্য লোক পাঠান
সে আসিয়া খবর দিল বাবু সেখানে নেই। তখন সুধীর ও সুধাংশুকে জানান হইল।

খবর লইয়া এইটুকু জানা গেল যে বড়বাবু কর্ত্তার সহিত দেখা করিয়া আসার ঘণ্টা
পরে কর্ত্তা একবার বাহিরে আসিয়াছিলেন। একজন বলিল 'রাত্রি ১২টার সময় তাঁ
একবার বাহিরে দেখিয়াছিল। সে সঙ্গে যাইতে চাওয়ায় তাহাকে নিষেধ করিয়াছিলেন।
ঘরে গিয়া জানা গেল যে এক বস্ত্রে তিনি ঘরের মধ্যে ছিলেন সেই অবস্থায় তিনি বাহি
যান। এমন কি তাঁহার জুতা পর্য্যন্ত পড়িয়া আছে। টেবিলের উপর মোহমুদ্গরখানি খো

সারা রাত্রি ভরিয়া সন্ধান চলিল। সুধীর পাগলের মত কলিকাতার সমস্ত রাস্তা
বেড়াইল। সুধাংশু এঘর ওঘর খুঁজিল। এরূপ আকস্মিক অন্তর্দ্ধানের কারণ কে

পাইল না। শুধু সকলের অগোচরে সেই অর্থরাশি সাবধানে স্থানান্তরিত করিয়া রাখিল। গৃহিণী অনেকক্ষণ উদ্বেগ ভোগ করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

পরদিনেই রাষ্ট্র হইয়া গেল জনার্দ্দন রায় বৈরাগ্যভাবে সংসার ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। সুধাংশু প্রকাশ করিল যে তাহার পিতা গত রাত্রে তাহাকে ডাকিয়া লোহার আলমারীর চাবি দিয়া বলিয়াছিলেন 'চাবিটা তোমার কাছে রাখ—কখন কি দরকার হয়। কিন্তু চাবি হইলে কি হইবে, আলমারি একেবারে খালি! কে খালি করিল?'

উইলের কোন উল্লেখ সুধাংশু করিল না। সুধীর যে উইল দেখিয়াছিল অবস্থা বুঝিয়া তাহা চাপিয়া গেল। জেঠাইমার সহিত পরামর্শ করিয়া সে শুধু জেঠামশায়ের অনুসন্ধানে রহিল। কত স্থানে লোক পাঠাইল। কত তার দিল, বিজ্ঞাপন ছাপিল; কিন্তু সব ব্যর্থ হইল। জনার্দ্দন রায়ের কোন সন্ধান কেহ দিতে পারিল না।

কিছুদিন পরে সুধীর পর্য্যন্ত নিরুদ্দেশ হইয়া গেল।

(৫)

দুই বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। জনার্দ্দন রায়ের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। মাস ছয় নানা দেশে জেঠামহাশয়ের অনুসন্ধান করিয়া সুধীর ফিরিয়া আসিয়াছিল। সংসারের সমস্ত সুধাংশুর অধিকারে দেখিয়াও সুধীর কিছু বলিল না। অনেক সন্ধান করিয়া একটা আফিসে ৫০৲ বেতনে একটা কাজের যোগাড় করিয়া লইল।

রাত্রি ১০টা বাজিয়া গিয়াছে। জনার্দ্দন রায়ের গৃহিণী বিন্ধ্যবাসিনী একটা কম্বলের আসনে বসিয়া মালা জপ করিতেছিলেন, স্বামীর সংসার ত্যাগের পর হইতে তিনি ধীরে ধীরে সংসার হইতে মন উঠাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। চোখের জল ফেলিয়া ফেলিয়া তাঁহার দৃষ্টিও ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল।

'বিন্ধ্য' বলিয়া অতি ধীরে পিছন হইতে কে ডাকিল। বিন্ধ্যবাসিনী চমকিয়া উঠিলেন। এতদিন পরে নাম ধরিয়া কে ডাকে! চাহিয়া দেখিলেন খালি পায়ে সন্ন্যাসীর বেশে সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহার স্বামী। বিশ্বাস হইল না। চক্ষু ভালরূপে মার্জ্জনা করিয়া আবার চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার ভুল হয় নাই। সত্যই তাঁহার সম্মুখে সেদিনকার ধনকুবের জনার্দ্দন রায় ভিখারীর বেশ দাঁড়াইয়া! মালা ফেলিয়া বিন্ধ্যবাসিনী স্বামীর চরণ জড়াইয়া ধরিলেন। কাঁদিয়া বলিলেন, কোন্ দোষে আমায় ত্যাগ করে গেছ্‌লে?'

জনার্দ্দন রায় স্ত্রীকে উঠাইয়া শান্ত করিলেন, মৃদুস্বরে বলিলেন 'কেন গেলুম সে সব কথা হবে। তুমি তোমার ছেলেদের আর সংসার নিয়ে থাক্‌বে, না, আমার সঙ্গে আস্‌বে?'

বিন্ধ্যবাসিনী চক্ষু মুছিয়া বলিলেন—'তোমার সঙ্গে যাব।'

"তাহলে ঘর বাড়ীর টান, ছেলের মায়া, সব ফেলে আমার সঙ্গে আস্‌তে হবে। পার্‌বে?'

দৃঢ়স্বরে বিন্ধ্যবাসিনী উত্তর দিলেন "পার্‌ব।"

"তবে এস। যে দুয়ার দিয়ে লোকের অগোচরে এসেছি সেখান দিয়াই দুজনে যা যাই।" বলিয়া জনার্দ্দন রায় স্ত্রীর হাত ধরিয়া বাহির হইলেন।

পরদিন জানা গেল জনার্দ্দন রায় তাঁহার সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির নূতন উইল ক অর্দ্ধেক তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে আর অর্দ্ধেক লোকহিতকর কার্য্যে দান করিয়া গিয়াছেন। পুত্রের ভাগে কিছুই দিয়া যান নাই।

কখন তিনি আসিলেন, কখন স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া গেলেন, কখন উইল করিলেন এসব সকলেরই অজ্ঞাত রহিল।

শ্রীমাণিক ভট্টা

অভিসারিকা *

(তিলক কামোদ ঝাঁপতাল)

নয়ন-মনোহারিকে ! গহন বন চারিকে !
নব-বকুল-মাল গলে, প্রেম অভিসারিকে !
নূপুর-পদ-চঞ্চলে, চপলা খেলে অঞ্চলে,
হরি-মিলন-ত্র্যস্ত হৃদি—প্যারী অনুচারিকে !
কুঙ্কুম সুদিগ্ধ তনু চর্চ্চিত সুচন্দনে,
মালতী সুগন্ধ লুটে পীন কুচ বন্ধনে ;—
দলিত পদে বল্লরী, চ্যুত-কুসুম-মঞ্জরী,
মধুর-মৃদু-গীতি-চির-মূক-শুক-সারিকে।

শ্রীরজনীকা

* অপ্রকাশিত

উপ্‌পলা

(সেকালের গল্প)

তখন জেতবনে ভগবান বুদ্ধদেবের বৈঠক চলিতেছিল। উপ্‌পলা আপনার দুঃখের বোঝা আর বহিতে পারিতেছিল না ; সে ভাবিল,—আর একবার বুদ্ধদেবকে দেখিয়া আসি, মহাপুরুষকে দেখিয়া আসি, তথাগতকে দেখিয়া আসি। ভাবিতে ভাবিতেই তাহার সারা শরীরে আগুন জ্বলিয়া উঠিল ; উঠানে বসিয়া পড়িল। সে সর্ব্বস্ব হারাইয়াছে,—জীবনের যাহা কিছু প্রিয়,—যে কেহ প্রিয় সকলেই চলিয়া গিয়াছে ; তবুও সে বাঁচিয়া থাকিতে চায় কেন, শান্তি খোঁজে কেন,—তাহাই ভাবিয়া আকুল হইল। ভাবিল,—তাহার প্রাণের মধ্যে কে এক রাক্ষসী আসিয়া বাসা বাঁধিয়াছে, আর সেই রাক্ষসী তাহাকে শান্তি খুঁজিবার পথে ঠেলিতেছে।

তরুণী উপ্‌পলার কোন কুলে কেহ ছিল না ; তাহার জীবনের আশ্রয় স্বামী চলিয়া গেলেন, তাহার কোলের আশ্রিত শিশুটি চলিয়া গেল, তবুও সে কিসের সান্ত্বনা চায় ভাবিয়া পাইল না ; কিছুই ভাবিয়া না পাইয়া আপনার কঠিন মুঠায় মাথার চুল টানিয়া বলিল,—রাক্ষসী !

অনেকক্ষণ উঠানে বসিয়া রহিল ; মেঘের মত কত স্বপ্ন ভাসিয়া আসিল ও ভাসিয়া গেল। একটি ভিক্ষু ভিক্ষাপত্র হাতে করিয়া তাহার ঘরের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। ভিক্ষু চলিয়া গেল, কিন্তু উপ্‌পলা ভাবিতে লাগিল,—ভিক্ষুকে দিবার মত তাহার কিছু আছে কিনা। ঘরে কিছুই নাই না,—চোরে তাহার সকল সম্পত্তি চুরি করিয়াছিল। উপ্‌পলা পথের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিল—"অতিথি, আমার সম্পত্তির মধ্যে আছে অশেষ দুঃখ, অপরিমিত শোক, অফুরন্ত যন্ত্রণা। তাই উহাই ভিক্ষাপাত্র ভরিয়া লইতে আসিয়াছ ? তোমাকে প্রণাম করি।"

উপ্‌পলা জানিত না সে কাহাকে প্রণাম করিল ; সে উঠানে মাথা লুটাইয়া আছে, আর দয়াময় উপ্‌পলাকে কিছু খাওয়াইবার জন্য পাড়ার একটি স্ত্রীলোক একখানি থালা হাতে করিয়া কাছে দাঁড়াইয়া তাহাকে ডাকিল। উপ্‌পলা উঠিয়া বসিয়া তাহার উৎপলের চোখে দয়াময়ী মুখ দেখিতে লাগিল। সে একদিন বুদ্ধদেবকে দেখিতে গিয়াছিল ; শুনিয়াছিল, তথাগতের গেলে, সকল জ্বালা জুড়ায়,—তাই একদিন ছুটিয়া গিয়াছিল। যাঁহার সকল বাসনার নির্ব্বাণ হইয়াছে, তাঁহার প্রশান্ত সৌম্যমূর্ত্তি,—তাঁহার জ্ঞানের বাণী উপ্‌পলাকে আকর্ষণ করিতে পারে নাই ; বুদ্ধদেবের সম্মুখে বিপুল জনতা দেখিয়া সে আতঙ্কে পালাইয়াছিল।

শ্যামার মা তাহার কেহ নয়,—সে পাড়ার স্ত্রীলোক,—পাতান মাসী। শ্যামার মা বেশি কিছু বহিত না,—কেবল কাছে আসিয়া বসিত, আর দুবেলা দুটি খাওয়াইয়া যাইত। শ্যামার মার মুখের দিকে তাকাইয়া, সেই পাতান মাসীর কাছে বসিয়া, উপ্‌পলা অতি অলক্ষ্যে যে শান্তি পাইত, হয়ত তাহার পক্ষে জেতবনে বা জেতবনে পাওয়া অসম্ভব ছিল।

তাহার সেই মাসীর মুখপানে তাকাইয়া খাইতেছিল, এমন সময়ে শ্যামা তাহার দাদার শিশুছেলেটি
কোলে করিয়া সেখানে আসিল। শিশুটি বড়ই কাঁদিতেছিল।

শ্যামার মা বলিল,—নানা অসুখে তাহার বৌমার দুধ শুকাইয়া গিয়াছে, তাই নাতিটি
শান্ত রাখা যায় না। উপ্‌পলা তাড়াতাড়ি হাতে মুখে জল দিয়া শিশুটিকে টানিয়া কোলে নি
আর তাহার মুখে মাই দিয়া বলিল,—অনেক দুধ আছে। শিশু দুধ খাইয়া ঘুমাইল। উপ্‌প
বলিল, সে এখন থেকে দুবেলা পেট ভরিয়া খাইবে; তাহা হইলে সে শিশুটিকে যথেষ্ট
খাওয়াইতে পারিবে।

শ্যামা এঁটো পাড়িয়া থালাখানি তুলিতে তুলিতে তাহার মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "
ধর্ম্ম কি, নিব্বাণ কি ?" শ্যামার মা একখানি মাদুর পাতিয়া ও মাদুরের উপর একটা বালিস রা
বলিল, "সব্বজ্ঞ ঠাকুরের সকল কথা কি আমরা বুঝিতে পারি মা ? আমাদের কাছে মায়া-
ঘর-সংসার ; ঠাকুরের সে সব কিছুই নাই।" উপ্‌পলা একটা নিঃশ্বাস ছাড়িল, আর তাহার
শিশুটিকে শোয়াইয়া তাহার কাছে শুইল। শ্যামা চলিয়া গেল, শ্যামার মা পা ছড়াইয়া
আর দেখিতে দেখিতে উপ্‌পলা ঘুমাইয়া পড়িল। (মানুষে বাঁচে পরের "আহা"
ও প্রাণ বিলাইয়া ; গুরু কাড়িয়া নয়, ধর্ম্ম-তত্ত্ব কুড়াইয়া নয়।)

শরৎ

এস প্রফুল্ল শারদ-লক্ষ্মী বঙ্গে !
উৎসব তুমি, উৎসাহ তুমি, উল্লাস প্রাণে অঙ্গে।
শ্যামল সরস সতেজ হরষ-ভূষণা !
পদ্মে কুমুদে কহ্লারে ফোটে সুষমা।
অম্বর-প্রতিবিম্বিত জলে অঞ্চল দোলে রঙ্গে।
দীনতা দুঃখ ঢাকিব কক্ষে বক্ষে,
হাসির দীপ্তি ঝলিবে সজল চক্ষে ;
ধুয়ে যাবে যত মলিন বিষাদ নবীন গীতিতরঙ্গে।

লক্ষ্ণৌ-দৃশ্যাবলী

("কলিকাতা রিভিউ"র সৌজন্যে)

Emambara, Lucknow.

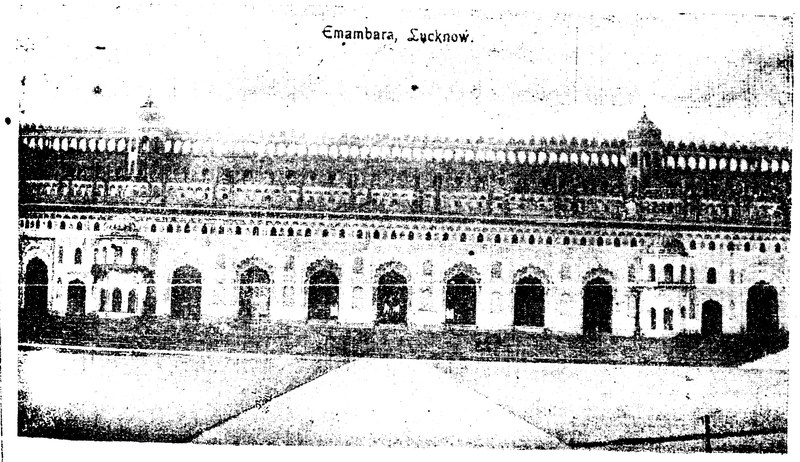

ইমামবারা

Chattar Manzi, Lucknow.

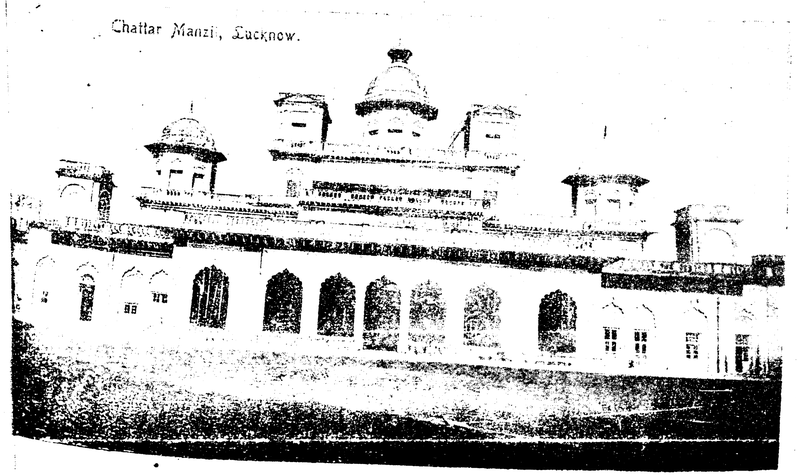

ছত্র-মঞ্জিল

Hosenabad with Taj, Lucknow.

তাজ-সহ হোসেনাবাদ

Dilkusha, Lucknow.

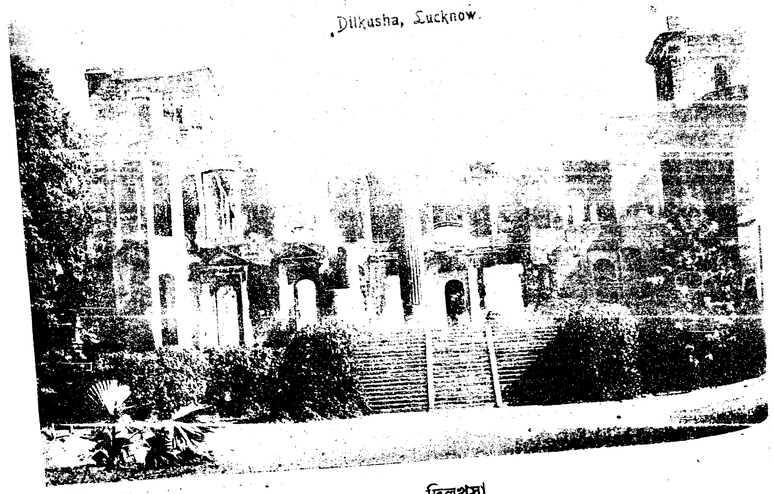

দিলখুসা

Hosenabad, Lucknow.

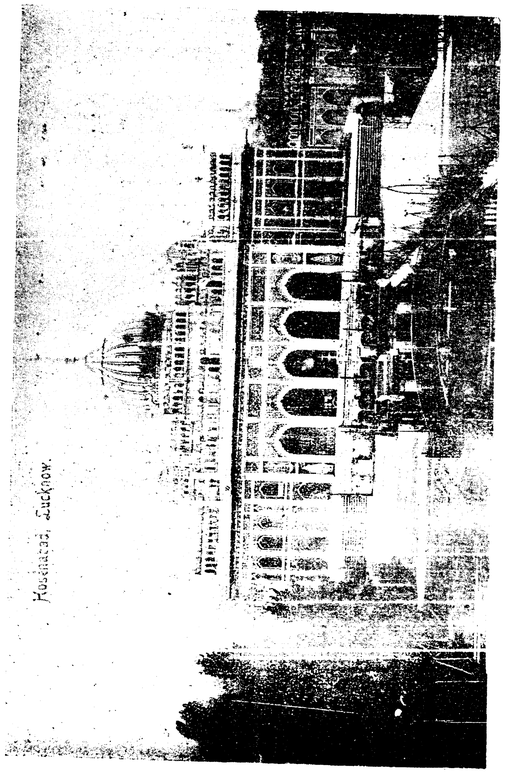

হোসেনাবাদ

KOLKATA PUBLIC LIBRARY Estd. 1858

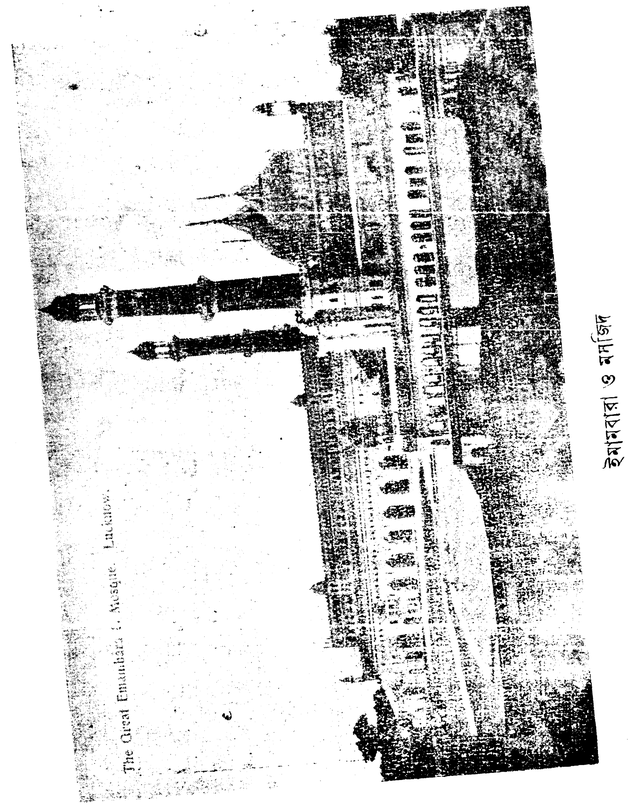

The Great Emambara & Mosque, Lucknow

হুসেনাবাদ ও মসজিদ

ঔপন্যাসিক

কলিকাতার কোনও একটী মেসের বাসায়, নবীন ঔপন্যাসিক নগেন্দ্রবাবু বসিয়া তাঁহার প্রথম উপন্যাসের শেষ প্রুফ সংশোধন করিতেছিলেন। ভাদ্রমাস, রবিবার, বেলা নয়টা, আকাশে থম্‌থম্ করিতেছে, একটুও বাতাস নাই, মাঝে মাছে তাঁহার ললাট হইতে ঘর্ম্মবিন্দু ঝরিয়া টের উপর পড়িতেছে। মাঝে মাঝে প্রুফগুলার উপর দোয়াত চাপা দিয়া, পার্শ্বস্থ পাখা উঠাইয়া লইয়া নগেন্দ্র বাবু নিজেকে বাতাস করিতেছেন;—আবার সংশোধন কার্য্যে মনোনিবেশ ছেন। সম্মুখে পূজা, বহিখানি এই সপ্তাহেই বাহির করা প্রয়োজন।

এই নগেন্দ্র বাবুর বয়স এখন ২৬ বৎসর মাত্র। নিবাস, পাবনা জেলার কোনও এক দূর ামে। আই-এ পরীক্ষায় একবার ফেল করিয়া; আর পড়িবার সঙ্গতি হয় নাই—বাড়ীর অবস্থা হল না—অনেক চেষ্টা চরিত্র ও সহি-সুপারিসের বলে গ্রিন্‌লে ফিওর্‌ কোম্পানির আপিসে ৎসর হইল সামান্য বেতনে কেরাণীগিরি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; এখন বেতন ও পদবৃদ্ধি ছ। অস্বচ্ছল অবস্থায় বিবাহ করা অনুচিত বলিয়া, দেশস্থ আত্মীয়াগণের প্রবল অনুরোধ আজিও বিবাহ করেন নাই।

বাল্যকাল হইতেই নগেন্দ্র বাবুর মনে ঔপন্যাসিক হইবার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল। ত ভর্ত্তি হইয়া প্রথম বৎসরে তিনি একখানি উপন্যাস রচনা করিয়া, মাসিকপত্রে প্রকাশিত র চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু কোনও সম্পাদকই তাহা গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। রণে বৎসর খানেক ধরিয়া তিনি ভগ্নোদ্যম হইয়া বসিয়াছিলেন। তার পর বঙ্গসাহিত্যে সর "আর্ট"-এর যুগ আরম্ভ হইল। এবং যাঁহারা "আর্ট"মূলক উপন্যাস লিখিতে ন, তাঁহাদের পুস্তক (বিশেষ করিয়া বিদ্যালয়গামী বালক ও তরুণ যুবকগণের মধ্যে) রিয়া বিকাইতে লাগিল। এই উপন্যাসগুলি, নানা কাগজে যতই "অশ্লীল" বলিয়া ইতে লাগিল, ততই ইহাদের কাট্‌তি বাড়িতে লাগিল।

ইহা দেখিয়া, নগেন্দ্র বাবুও আবার খাতা বাঁধিলেন। ৩।৪ মাস পরিশ্রম করিয়া আর্ট-একখানি উপন্যাস লিখিলেন। ইহাতে তিনি দেখাইলেন, স্ত্রীলোকের সতীত্ব এমন কোনই জিনিষ নহে, যাহার জন্য প্রাণপাত করিতে হইবে। পুরুষেরা যে স্ত্রীলোকের সতীত্ব সতীত্ব ৎকার করিয়া থাকে, তাহার মূলে ঘোর স্বার্থপরতা ছাড়া আর কিছুই নাই। শাস্ত্র ও সমাজে ড়যন্ত্র করিয়া এতকাল স্ত্রীজাতির প্রতি যে অত্যাচার করিয়া আসিয়াছে, এ নূতন আলোর আর তাহা চলিবে না। পুরুষের যেমন যা-খুসী করিবার অধিকার আছে, স্ত্রীলোকেরও প অধিকার থাকাই ন্যায়সঙ্গত—ইত্যাদি। লিখিলেন বটে, তাহাতে আর্টও কিছু রহিল বটে,

কিন্তু আর্টের "নগ্নচিত্র" তাহাতে তেমন ভাল করিয়া ফুটিল না। হাজার হোক ভদ্রলোকের ছেলে, কতকটা লেখাপড়াও শিখিয়াছেন, তাই একটু সঙ্কোচের হাত এড়াইতে পারিলেন না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও, একজন উত্তমশীল প্রকাশক বহিখানি ছাপাইবার ভার লইলেন; পুস্তকের মধ্যে

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

আর্টের যেটুকু অভাব ছিল, প্রকাশক তাহা বিজ্ঞাপনের দ্বারা পরিপূরণ করিয়া, ঘুরিতেই প্রথম সংস্করণ কাটাইয়া দিয়া দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করিলেন। কিছুটাকা বাবুর করতলগত হইল।

এইরূপে উৎসাহ পাইয়া, নগেন্দ্র বাবু তাঁহার এই তৃতীয় উপন্যাস খানি রচনা করি এবার, পূর্ব্ব সঙ্কোচ অনেকটা কাটাইয়া উঠিয়াছেন—বেশ "নির্ভীক" ভাবেই এবার আর্টে অঙ্কিত করিয়াছেন। এই উপন্যাসে তিনি দেখাইয়াছেন, আমাদের মুর্খ অন্ধ সমাজ পতিতা বলিয়া দূরে ঠেলিয়া রাখিয়াছে, তাহারাই যথার্থ স্বর্গের দেবী—তাহাদে

কুসুমের মত কোমল ও পবিত্র—দয়া মায়া, স্নেহ মমতা, পরদুঃখকাতরতা, আত্মমর্য্যাদাবোধ প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলীতে তাহারা ভূষিত; অপর পক্ষে গৃহস্থ মেয়েদের মন অতি নীচ, সঙ্কীর্ণ; তাহারা নিতান্ত স্বার্থপর, ক্রোধী, কটুভাষিণী—এক কথায়, তাহাদের হাড়ে হাড়ে বজ্জাতী।

নগেন্দ্র বাবু বসিয়া বসিয়া প্রুফ দেখিতে লাগিলেন, ক্রমে দশটা বাজিল, সাড়ে দশটা বাজিল। ঝি আসিয়া স্নানের জন্য তাগাদা জানাইল; নগেন্দ্র বাবু সে কথা কাণে তুলিলেন না। ক্রমে সুধীর নামক একজন সুদর্শন যুবা আহারান্তে পাণ চিবাইতে চিবাইতে আসিয়া তাঁহার পাশে বসিল। বলিল, "দাদা, আর বাকী কত?"—সুধীরও এই বাসাতেই থাকে।

নগেন্দ্র বাবু অসংশোধিত কাগজগুলি গণিয়া বলিলেন, "আর চার শীট আছে।"

সুধীর বিনীত মিনতির স্বরে বলিল, "স্নান আহার করে' ওগুলো দেখ্‌লে হত না?"

নগেন্দ্র বলিল, "দেরী হয়ে যাবে যে ভাই। আজকেই তারা পেজ বেঁধে অর্ডার প্রুফ দেবে বলেছে, সেই জন্যেই আজ রবিবার হলেও ছাপাখানায় লোক বের করেছে। কালই তারা ছাপা শেষ করতে চায়। বইখানা যাতে এই হপ্তার মধ্যে বেরিয়ে যায়, তার জন্যে প্রকাশক তাদের কড়া তাগাদা দিচ্ছেন।"

সুধীর বলিল, "আচ্ছা দাদা, এক কাজ করুন না! আপনি স্নানাহার করতে যান, প্রুফ যতগুলো দেখা হয়েছে, আমি এখনই গিয়ে ছাপাখানায় দিয়ে আস্‌ছি। ততক্ষণ তাদের কায চলুক। বলে' আসবো, আর ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যে বাকীটুকু দিয়ে যাব।"

নগেন্দ্র বলিল, "এই রোদ্দুরে, দু'দুবার তুমি সেই দর্জ্জিপাড়া হাঁটাহাঁটি করবে? তার চেয়ে বরঞ্চ, আধঘণ্টা খানিক বস, শেষই করে দিই—একেবারে নিয়ে যেও।"

সুধীর বলিল, "না দাদা, দু'বার প্রেসে যেতে আমার কোন কষ্টই হবে না। আপনি উঠুন, স্নান করে' ভাত খান। কলের জল ত বহুক্ষণ চলে' গেছে, চৌবাচ্চার জলও তলানি পড়ে গেছে। তাতও প্রায় শুকিয়ে উঠলো।"

এই সুধীর, কলেজের একজন ছাত্র এবং নগেন্দ্র বাবুর একজন পরম ভক্ত। কেহ নগেন্দ্রনাথের লেখা নীতিবিগর্হিত বলিয়া নিন্দা করিলে সুধীর তাহার সহিত কোমর বাঁধিয়া তর্কে লাগিয়া যায়;—বলে, "তোমরা সব পেঁচার জাত, এতকাল অন্ধকারেই অভ্যস্ত ছিলে; এখন সাহিত্যের এই নবযুগের আলো দেখে কিচির মিচির আরম্ভ করেছ।" আরও কত কি বলে।

ভক্তের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া, নগেন্দ্র উঠিল। সংশোধিত শীটগুলির পত্রাঙ্ক মিলাইয়া, পিনে গাঁথিয়া, সুধীরের হস্তে দিয়া, স্নানার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিল। সুধীর প্রুফগুলি লইয়া প্রেসে দিতে গেল।

(২)

নগেন্দ্রনাথের নূতন উপন্যাস "সমাজদ্রোহী" প্রকাশিত হইয়াছে। সপ্তাহ খানেক পরে, আপিসের ফেরৎ একদিন বিকালে নগেন্দ্র তাহার প্রকাশকের দোকানে আসিয়া দর্শন দিল। প্রকাশক

মহাশয় তখন তাঁহার খাস কামরায় বসিয়া চা পান করিতেছিলেন, সংবাদ পাইয়া নিজে আসিয়া নগেন্দ্রকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গিয়া, চেয়ারে বসাইয়া বলিলেন, "এক পেয়ালা চা দিক ?" নগেন্দ্র সম্মতি জানাইলে প্রকাশক মহাশয় হাঁকিলেন, "ওরে, নগেন বাবুকে এক পিয়ালা চা দে ; আর আমার জন্যেও আর এক পেয়ালা আনিস।"

নগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "সমাজদ্রোহী কিরকম বিক্রী হচ্চে ?"

প্রকাশক বলিলেন, "বেশ টানছে। এই এক সপ্তাহ ত বই বেরিয়েছে ? এরই মধ্যে প্রায় ২৫০ গেছে। পূজোর মধ্যে ৪।৫ শো কেটে যাবে বোধ হয়।"

শুনিয়া নগেন্দ্রের মনটি পুলকিত হইয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল, "লোকে কেমন বলছে ?"

প্রকাশক বলিলেন, "তা—ভালই বলছে। কিন্তু কেউ কেউ আবার বলছে, অন্য জায়গা ভাল হয়েছে, কিন্তু গণিকা-চরিত্রগুলো ভাল হয়নি।"

নগেন্দ্র একটু শ্লেষের হাসি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "রুচিবাগীশ মহাশয়েরা বুঝি ?"

প্রকাশক ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, "না, তারা রুচিবাগীশ দলের লোক নয়। বরং এ—অর্থাৎ—ইয়ে দলের। তারাই ত বেশীভাগ খদ্দের কিনা। তারা বলছে', 'মশায় নগেন বাবু যে গণিকা চরিত্রগুলি এঁকেছেন, ও সাফ কল্পনা। তাদের চাল চলন কি ঐরকম, না তাদের কথা ঐরকম রবিঠাকুরী ধাঁজের ? নগেন্দ্র বাবু বোধ হয় জ্যান্ত গণিকার সঙ্গে কখনও কারবার করেন তাই তাদিকে এমন অদ্ভুত করে এঁকেছেন। চিত্রগুলি যদি বাস্তব হত, তা হ'লে বইখানি আরও হৃদয়-গ্রাহী হতে পারতো।' এই কথা তে তারা বলে।" বলিয়া প্রকাশক মহাশয় অবনত মুখে কিছু কিছু শুনা কথা মাত্রই ত তাহার অবলম্বন! এই সকল কথা ভাবিতে পান করিতে লাগিলেন।

নগেন্দ্র এই সমালোচনা খণ্ডন করিতে পারিল না। বাস্তবিকই ত, গণিকা চরিত্র করিতে সে নিজ অভিজ্ঞতার কিছুমাত্র সাহায্য পায় নাই। নাটকে উপন্যাসে গণিকাদের বর্ণ নগেন্দ্র চা পান শেষ করিল।

নগেন্দ্রকে নীরব দেখিয়া প্রকাশক বলিলেন, "আপনি যদি ঐ সব দলে মাঝে মাঝে আধটু মেশেন, তাতে আর ক্ষতিটা কি ? বিলাতী ঔপন্যাসিকেরা, যাঁরা দরিদ্রপল্লীর গল্প তাঁরা রীতিমত দরিদ্র সেজে তাদের পল্লীতে গিয়ে বাস করে', তাদের সঙ্গে মেলামেশা করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে' এনে নভেল লেখেন শুনেছি।"

আর কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর নগেন্দ্র উঠিল। প্রকাশক বলিলেন, "আমার কথা দেখ্‌বেন তা হলে ?"

"হাঁ—ভেবে দেখ্‌ব বৈ কি।" বলিয়া নগেন্দ্র বিদায় গ্রহণ করিল।

(৩)

সেই দিন রাত্রে আহারের পর, বাসার নির্জ্জন ছাদে বসিয়া, নগেন্দ্র সুধীরকে তাহার প্রকাশকের মন্তব্য ও প্রস্তাবটা জানাইল। শুনিয়া, সুধীর প্রথমটা শিহরিয়া উঠিল ; বলিল, "ছি ছি, তাও কি হয় ?"

নগেন্দ্র সুধীরকে বুঝাইল, উদ্দেশ্য যখন মন্দ নহে, উদ্দেশ্য যখন কেবলমাত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় —জ্ঞান আহরণ, তখন আর ইহাতে দোষটা কি ? কিছুক্ষণ তর্ক বিতর্কের পর সুধীর স্বীকার করিল যে, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ওরূপ কার্য্য দোষাবহ হইবে না বটে। জিজ্ঞাসা করিল, "তা, আপনি তাদের সঙ্গে কি করে মিশবেন ? কাউকে ত আপনি জানেন না ?"

নগেন্দ্র হাসিয়া বলিল, "তাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের জন্যে কোনও সুপারিশ বা পরিচয় পত্র আবশ্যক হয় না হে! কিঞ্চিৎ অর্থ থাকলেই হল। কিন্তু, আমি যে মৎলবটি ঠিক করেছি, তাতে বোধ হয় টাকারও কোনও আবশ্যক হবে না।"

সুধীর কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি রকম ?"

নগেন্দ্র বলিল, "আমাদের ব্রজনাথ মল্লিক—আমাদের চা বাগানগুলিতে যিনি কোদাল আর কম্বল সরবরাহ করেন, তিনি বছর দুই আগে আমাকে একবার তাঁর বাগান পার্টিতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সেখানে, ঐ দলের একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। এমন তার স্বভাব, এমন কথাবার্ত্তা যে, সে আর তোমায় কি বলব। সে আমায় তার ঠিকানা দিয়েছিল ; তার সঙ্গে গিয়ে দেখা সাক্ষাৎ করবার জন্যে বিশেষ করে' অনুরোধ করেছিল। ভাবছি, তাকেই চিঠি লিখে তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করি। তার মন যে রকম উঁচু, কখনই সে আমার কাছে টাকা চাইবে না। কিছুদিন মাঝে মাঝে সেখানে যাতায়াত করলে, তাকেও বেশ চিন্‌তে পারবো, ঐ দলের আরও কত স্ত্রীলোক ত সেখানে যাওয়া আসা করে, তাদেরও চাল চলন, কথাবার্ত্তা, জীবন যাত্রা প্রণালী 'রিসার্চ' করবার বেশ সুযোগ পাব।"

সুধীর কিয়ৎক্ষণ বসিয়া ভাবিল। শেষে বলিল, "কিন্তু দাদা, মানুষের মন ; শেষে হিতে বিপরীত ঘটিয়ে বস্‌বেন না ত ?"

নগেন হাসিয়া বলিল, "সে ভয় নেই। আমি তার গোড়া মেরে রেখে তবে গিয়ে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হব।"

সুধীর কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি করে' দাদা ?"

নগেন বলিল, "সে তুমি কাল জানতে পারবে।"

(৪)

নগেন্দ্র রাত্রে শয়নঘরে খিল বন্ধ করিয়া এই পত্রখানি লিখিল :—

স্নেহের ভগিনী,

তোমার স্মরণ আছে কি না জানি না, প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে, কাশীপুরের এক বাগানে ... রাত্রে তুমি মুজরা করিতে গিয়াছিলে, সেইখানে তোমার সহিত আমার পরিচয় হইয়াছিল। ... একটু অধিক হইলেই, সমবেত স্ত্রীপুরুষ সকলেই সুরাপানে হতজ্ঞান অবস্থায় ভূমিতে লুটাইতে... কেবল তুমি এবং আমি স্বাভাবিক অবস্থায় ছিলাম। তুমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমার ... আসিয়া আলাপ করিয়াছিলে, এবং আমাকে ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর দেখিয়া, তুমি নিজে উদ্যো... হইয়া পাকশালা হইতে খাবার আনাইয়া পরম যত্নে আমায় খাওয়াইয়াছিলে। আশা করি ... তোমার সব কথা মনে পড়িবে।

সে রাত্রে তোমার ঠিকানাযুক্ত একখানি কাগজ তুমি আমায় দিয়াছিলে, এবং অনু... করিয়াছিলে যে, আমি যেন একদিন গিয়া তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। আমি তখন ... মৌখিক সম্মতি জানাইয়াছিলাম, যদিও মনে মনে স্থির জানিতাম যে, তোমার অনুরোধ আমি ... পালন করিব না। কারণ তখন ওরূপ কার্য্যকে আমি অত্যন্ত নীতি-বিগর্হিত বলিয়া মনে করি... তাই আমার সে মৌখিক প্রতিশ্রুতি এতদিন রক্ষা করি নাই। কিন্তু এখন নবযুগের নূতন ... আমার মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে এখন আমি অভিলাষী হ... তোমার ব্যবহারে ও তোমার সঙ্গে সেই অল্পক্ষণ আলাপেই আমি বুঝিয়াছিলাম যে, জগতের ... একজন পতিতা নারী হইলেও, তোমার অন্তঃকরণ অতি কমনীয় সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত। আজ স্বীকার ... বাধা নাই, আমি তোমাকে দেখিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলাম। কিন্তু তাহা কোনও ... বশবর্ত্তী হইয়া নহে;—ফুলের সৌন্দর্য্যে, পাখীর কলগানে মনুষ্য-হৃদয় যে কারণে ... আমিও সেই কারণেই মুগ্ধ হইয়াছিলাম। (আর, এ পত্রখানিও কোনও কুভাব প্রণোদি... আমি যে লিখিতেছি না, উপরে যে শব্দে তোমায় সম্বোধন করিয়াছি তাহা ... বুঝিতে পারিবে।) দুই বৎসর হইতে চলিল, কিন্তু আজিও তোমাকে আমি ভুলিতে পা... তোমার সেই হাসিতে ঢল ঢল সুন্দর মুখখানি আমার মানস পটে অঙ্কিত হইয়া আ... তোমার হৃদয়খানি আরও কাছাকাছি পাইবার জন্য—সেখানির পরিচয় আরও ... করিবার জন্য, আমার মনে প্রবল বাসনা জন্মিয়াছে। আমি জানি, তোমাদের জীবন ... বড় একা—কেহ তোমাদের আপনার হয় না—বা তোমাদিগকে যথার্থ আপনার ... হাটের বিকিকিনি মাত্র। আমার অভিলাষ, আমি তোমার বন্ধু হই, সখা হই, ... এই জন্যই আমি তোমার দর্শন কামনা করিতেছি; অন্য কোনও অভিপ্রায়ে নহে। ইতি

আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী
শ্রীনগেন্দ্রনাথ ...

ঠিকানা—২৭ নং দুর্গাচরণ ... ইয়া গিয়া, উহার এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করিয়া দিবে।
বউবাজার, কল...

পুনশ্চ—খামে পত্র দিও।

... দিন প্রাতে এই পত্রখানি পড়িয়া সুধীর একেবারে মোহিত হইয়া গেল। বলিল, "দাদা, ... খানা চিঠি লিখেছেন, তাতেও জিনিয়সের ছাপ! এই ঠিক হয়েছে। সকল কথা গোড়া ... ষ্ট করে বলা রইল, ভালই হ'ল।"

(৫)

দুইদিন ধরিয়া নগেন্দ্রনাথ পত্রোত্তরের জন্য ব্যাকুল প্রতীক্ষায় কালযাপন করিল। তৃতীয় দিনে পত্রোত্তর আসিল।

পত্রখানি সুলিখিত নহে, সুরচিত নহে, বানান ভুল অত্যন্ত বেশী। সংশোধনান্তে নিম্নে উহার প্রতিলিপি আমরা প্রকাশ করিলাম:—

মহাত্মন্,

আপনার সুধামাখা পত্রখানি পাইয়া আমি যে কি পর্য্যন্ত সুখিনী হইলাম তাহা এই সামান্য পত্রে লিখিয়া কি জানাইব। আপনি অধিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন ইহা আমার পরম সৌভাগ্য। আপনি যে কথা লিখিয়াছেন তাহা সমস্তই আমার স্মরণ আছে। সেই বাগানে আপনার সহিত সাক্ষাতের পর আপনার নাম আমি জপমালা করিয়াছি জানিবেন। আপনি দয়া করিয়া আগামী মঙ্গলবার দিবস সন্ধ্যার পরে আসিবেন, আমি তৃষিতা চাতকিনীর ন্যায় আপনার আশাপথ চাহিয়া থাকিব।

আপনার চিরাধিনী
শ্রীমতী প্রভাবতী দাসী।

এই পত্র যথাসময়ে নগেন্দ্রনাথ, সুধীরকে দেখাইল। সুধীর পত্র পড়িয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিল। বলিল, "আপনার কাছে তার কথাবার্ত্তা শুনে আমার মনে কেমন ধারণা হয়েছিল যে লোকটি বেশ শিক্ষিতা। রাম রাম, এত দেখছি নিতান্ত মূর্খ!"

সুধীরের এ উক্তি শুনিয়া নগেন্দ্র মনে মনে যেন একটু বিরক্ত হইল। বলিল, লেখাপড়া শেখবার সুযোগ কখনও পায় নি, কাযেই এ রকম চিঠি সে লিখেছে। কিন্তু লেখাপড়া জানলেই যে মানুষ একেবারে অপদার্থ হয়ে গেল তা মনে করা ভুল সুধীর।"

সুধীর একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "না, তা মনে করিনি দাদা। তবে শুধু এই বলছিলাম ভাষাটা—"

নগেন্দ্র বাধা দিয়া বলিল, "চিঠির ভাষার কথা ছেড়ে দাও। তার মুখের ভাষা শুনলে তাকে মূর্খ বলে মনে হবে না। এমন কি, তাকে—সে যা, তাই বলেই মনে হবে না।"

নগেন্দ্র মনে মনে স্থির করিল, মঙ্গলবার সন্ধ্যার সময় সে ত নিজে যাইবেই, সুধীরকেও

(৬)

ঠিক এক সপ্তাহ কলিকাতা হইতে অনুপস্থিতির পর, আজ মঙ্গলবার প্রাতে, বেহালা হার্ম্মোনিয়ম বিছানা বাক্স ভৃত্য ওস্তাদজি ও কুকুর সহ নর্ত্তকী প্রভাবতী মফঃস্বল মুজরা করিয়া তাহার বাসায় ফিরিল। এ বাড়ীখানি তাহার নিজের নহে, এগ্রিমেণ্ট লওয়া; ত্রিতলের সমস্ত কক্ষগুলি সে নিজে অধিকার করিয়া আছে। দ্বিতলের কক্ষ দুইজন ভাড়াটিয়া আছে—ইহারাও নর্ত্তকী, তবে তাহাদের তেমন পশার নাই। যে প্রভার ৫০৲ টাকায় বায়না হয়, সে আসরে ইহারা ১০৲ টাকার বেশী পায় না। এই কারণে মনে মনে প্রভার বিলক্ষণ ঈর্ষা করে; কিন্তু প্রভা বাড়ীওয়ালী, মুখে কিছু প্রকাশ করিতে করে না। একতালায় পাকাদি হয়, ভৃত্যেরা থাকে।

প্রভাবতী দ্বিতলে উঠিয়া, সম্মুখে কুসুমকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাই, বাড়ী সব ভাল ত?"

কুসুম বলিল, "বাড়ীর খবর ত এক রকম ভালই। কিন্তু পাড়ায় বড় ভয় হয়েছে

প্রভা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, কি হয়েছে?"

কুসুম বলিল, "বড় গুণ্ডার উপদ্রব হয়েছে। পশু রাত্রে একটা গুণ্ডা, বাবু সেজে ঘরে এসেছিল। ছুরি দেখিয়ে, তার গহনাগুলি সব কেড়ে নিয়ে, পালিয়ে গেছে।"

"সে চেঁচামেচি করেনি?"

"তার মুখ বেঁধে ফেলেছিল, চেঁচাবে কোত্থেকে? ভাগ্যিস একটু পরে একজন সে ঘরে গিয়ে পড়েছিল, সে তার মুখ থেকে কাপড়ের বাঁধন খুলে দিলে, নইলে হয়ত দম বন্ধ মরে যেত।"

"পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছিল?"

"হাঁ হয়েছে বৈকি। তা, সে চোরকে পুলিশ আর কোথা খুঁজে পাবে?"

প্রভা জিজ্ঞাসা করিল, "আমার চিঠিপত্র কিছু এসেছিল?"

কুসুম বলিল, "হ্যাঁ এসেছিল একখানা। তোমার ঘরের দরজার ফাঁক দি ফেলে দিয়েছি।"

এমন সময় অপর ভাড়াটিয়া সারদাসুন্দরী হাঁপাইতে হাঁপাইতে সিঁড়ি উঠিয়া বলি

প্রভা দিদি, এই আসছ বুঝি? দাঁড়াও, হাঁপ ছাড়ি। ছুটতে ছুটতে বাড়ী এসেছি।"

প্রভা ও কুসুম যুগপৎ জিজ্ঞাসা করিল, "কেন? কেন? কি হয়েছে সারদা?"

"ওগো ঐ গলিতে পুলিসে পুলিসে ছেয়ে গেছে। গলি দিয়ে যে যাচ্ছে তা তাই দেখে আমি ভয়ে ছুটতে ছুটতে অন্য পথ দিয়ে পালিয়ে এসেছি।"

প্রভা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, এত পুলিস কেন?"

"খুন হয়েছে যে গো!"

"কে খুন হল?"

"কামিনী।"

"অ্যাঁঃ—কামিনী খুন হয়েছে? কি করে খুন হল? কে খুন করলে?"

"শুনলাম, কাল রাত্রে একজন গুণ্ডা, বাবু সেজে কামিনীর ঘরে এসেছিল। তারপর অনেক রাত্রে, কামিনীকে খুন করে', তার গয়নাগাঁটি সব নিয়ে সরে পড়েছে। গায়ের গয়না ত নিয়েছেই, আঁচল থেকে লোহার সিন্ধুকের চাবি নিয়ে লোহার সিন্ধুক খুলে, বাকী গয়না, টাকা কড়ি সমস্ত নিয়ে গেছে।"

শুনিয়া প্রভাবতী ও কুসুম উভয়েই হায় হায় করিতে লাগিল। আর দুই চারি কথার পর, প্রভা ত্রিতলে উঠিয়া নিজ শয়ন ঘরের চাবি খুলিল। খুলিয়া, ভিতরে প্রবেশ করিবামাত্র দেখিতে পাইল, কুসুম-কথিত ডাকের চিঠিখানা মেঝের উপর পড়িয়া রহিয়াছে।

চিঠিখানি কুড়াইয়া প্রভা শিরোনামা দেখিল, হস্তাক্ষর অপরিচিত। চিঠিখানা টেবিলের উপর রাখিয়া, ভৃত্যকে চায়ের জল চড়াইতে আদেশ দিয়া, মুখ হাত ধুইয়া, বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিল। বাজার আনিবার জন্য ঠাকুরকে টাকা দিয়া, চা পান করিতে করিতে চিঠিখানি খুলিল।

চিঠি পড়িয়া, প্রভার মুখ শুকাইয়া গেল, তাহার হাত পা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। ছুটিয়া বারান্দায় বাহির হইয়া, কম্পিতকণ্ঠে ডাকিল, "ও কুসুম, ও সারদা, তোরা শীগ্‌গির আয়।"

কুসুম ও সারদা, উভয়েই একত্র বসিয়াছিল। এই ডাক শুনিয়া তাহারা পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করিয়া একটু হাসিল। পরে বাহির হইয়া বলিল, "কেন দিদি? ডাকছ?"

উপর হইতে পূর্ব্ববৎ আর্ত্তকণ্ঠে উত্তর আসিল—"শীগ্‌গির আয়—সর্ব্বনাশ হয়েছে।"

কুসুম ও সারদা তখন মুখের হাস্যরেখা গোপন করিয়া, মুখে উদ্বেগ ও ভয়ের চিহ্ন লইয়া, ছুটিতে ছুটিতে উপরে উঠিয়া গেল। গিয়া দেখিল, মেঝের উপর চা ঢেউ খেলিতেছে, পেয়ালা ও পিরিচ টেবিলের উপর হইতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, প্রভা চক্ষু কপালে তুলিয়া, তাহার ফরাস বিছানায় বসিয়া হাঁপাইতেছে।

কুসুম ও সারদা প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি দিদি, কি হয়েছে?"

প্রভা চিঠিখানা তাহাদিগকে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, "পড়ে দেখ।"

কুসুম তখন চিঠি লইয়া পড়িল।

চরণকমলেষু— মেছুয়াবাজার।

প্রিয়সি, একদিন কোনও স্থানে তোমার মুজরো শুনিয়া আমি প্রাণে এতই আনন্দ পাইয়াছিলাম, যদিও আমি একজন গুণ্ডা, সেই অবধি মনে মনে তোমায় অত্যন্ত ভালবাসি ও ভক্তি

করি। তাই এ পত্র তোমায় লিখিতেছি। আমাদের দলের লোকেরা স্থির করিয়াছে যে, রাত্রে তাহারা তোমার নিকট বাবু সাজিয়া যাইবে এবং তোমাকে হত্যা করিয়া তোমার ... টাকা কড়ি অপহরণ করিবে। তোমার গলায় ছুরী দিবে ইহা আমার সহ্য না হওয়াতে, লিখিয়া তোমায় সাবধান করিয়া দিলাম। এ পত্র পড়িয়া তুমি পুড়াইয়া ফেলিবে, ক... আমাদের দলের লোকের হস্তগত হইলে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তাহারা আমাকেই হত্য... সন্দেহ নাই। ইতি—

তোমার প্রেমাকাঙ্ক্ষী অন...

শ্রীগুণ্ডা।

চিঠি পড়িয়া কপটী কুসুম দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিল, "তাই ত দিদি, কি হবে!"

সারদা পেচকের মত গম্ভীর স্বরে বলিল, "এখন উপায়?"

প্রভাবতী শুইয়া পড়িয়াছিল। তাহার মুদিত চক্ষু হইতে অশ্রু গড়াইতে লাগিল।

সারদা কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল, "হ্যাঁ ভাই কুসুম, যদি আমাদিগেও খুন করে? কোথাও পালাই চ'।"

কুসুম বলিল, "পালিয়ে যাব কোথা? কোনও চুলো কি আছে? আর, আমাদে... বা কি ভাই, যে নেবে? তবে, প্রভা দিদির বোধ হয় পালানোই উচিত। সাতদিনের ... মফঃস্বলে গেছে, অনেক টাকা কড়ি নিয়ে আজ তার ফিরে আসবার কথা, তা বোধ হ... করে' তারা টের পেয়েছে। দিদি, ও দিদি, ও রকম করে পড়ে' থাকলে কি হবে ভাই... একটা পরামর্শ যুক্তি করা যাক।"—বলিয়া সে সারদার পানে চাহিয়া, অলক্ষ্যিতে একটু ...

প্রভা উঠিয়া বসিল। বলিল, "আমার চাকরকে ডাক ত।"

ভৃত্য নিম্নতলে বসিয়া মশলা বাঁটিতেছিল, কুসুমের ডাক শুনিয়া, হাত ধুইয়া উপরে ...

প্রভা বলিল, "একঠো ট্যাক্সি বোলাও—জল্‌দি।"

সারদা ও কুসুম জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কোথা যাবে দিদি?"

প্রভা বলিল, "লালবাজার। পুলিস কমিশনর সাহেবকে গিয়ে চিঠিখানা দেখা... আমার প্রাণরক্ষা করেন কিনা দেখি।"

ট্যাক্সি আসিবার শব্দ শুনিয়া, প্রভা উঠিয়া তাহার কেশবেশে একটু পরি... করিয়া লইল। তাহার পর জুতা মোজা পরিয়া, সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেল।

সারদা বলিল, "পুলিসে গেল, আমার কিন্তু ভয় করছে ভাই।"

কুসুম বলিল, "একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল।"

সারদা বলিল, "শেষে আমরাই জাল করার দায়ে পড়ে যাব না কি?"

...সুম বলিল, "ঈস্! আমাদের কে ধরে? কিছু প্রমাণ আছে? হাতের লেখা ত আর ... কারু নয়।"

...রদা বলিল, "সেই ভরসায় কি নিশ্চিন্দি থাকা যায় ভাই?"

"তুই তবে বসে 'চিন্দি' কর্। আমি যাই, নেয়ে নিই গে, আবার কলের জল চলে' যাবে।"

(৭)

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই নগেন্দ্র আপিস হইতে ফিরিয়া আসিল। আপিসের বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া বলিল, "ওঃ আজ কি গরমটা'ই গেল! আপিসে ঘেমে একবারে নেয়ে উঠেছিলাম। স্নান করে ফেলি।"

সুধীর বলিল, "দাদা, এই অবেলায় স্নান করবেন? তার চেয়ে না হয় ভিজে গামছা দিয়ে—"

নগেন্দ্র বলিল, "না না—কিছু হবেনা!"—বলিয়া সে নিজ সাবানদানী ও তোয়ালে লইয়া নীচে নামিয়া গেল।

স্নান করিয়া আসিয়া, সাবধানে কেশ বিন্যাস করিয়া, নগেন্দ্র খাবার খাইয়া চা পান করিল। সুধীরকে বলিল, "ওহে তৈরি হয়ে নাও।"

সুধীর বলিল, "আমি—আমার আর যাবার দরকার আছে কি? হয়ত একজন তৃতীয় ব্যক্তি উপস্থিত থাকলে সে নিজের জীবন কাহিনী—"

নগেন্দ্র বলিল, "জীবন কাহিনী কি আজই সে বলছে? আজ একটু আলাপ পরিচয় করে আসা মাত্র। চল চল। অন্ততঃ আজকের দিনটে ত চল। অন্যদিন না হয় আমি একাই যাব।"

সুধীর অগত্যা কাপড় বদলাইতে গেল। নগেন্দ্রের ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, ঘরখানি সৌগন্ধে ভুর ভুর করিতেছে। নগেন্দ্র, জামাই বাবুটি সাজিয়া বসিয়া বসিয়া সিগারেট ফুঁকিতেছে। প্রভাবতীকে উপহার দিবার জন্য হাতে একখানি "সমাজদ্রোহী" পুস্তক। উভয়ে তখন বাসা হইতে বাহির হইল। বড় রাস্তায় পৌঁছিয়া নগেন বলিল, "ওহে একখানা ট্যাক্সি ধরা যাক।"

সুধীর বলিল, "কত দূরই বা? মিছামিছি আর ট্যাক্সি কেন দাদা?"

নগেন্দ্র বলিল, "ওহে, গরমটি কি রকম দেখ্‌ছ? হেঁটে গেলে, ঘামে ভিজে, ভিজে বিড়ালটি ... সেখানে পৌঁছে, ঘেমো গন্ধে কি তার মাথাটি ধরিয়ে দেবো?"

রাস্তা হইতে একটি ট্যাক্সি ধরা হইল। দশমিনিটের মধ্যে ট্যাক্সি ঠিকানায় পৌঁছিল।

নগেন্দ্র ট্যাক্সি হইতে নামিয়া, দরজার উপর বাড়ীর নম্বরটি দেখিল। ঠিক হইয়াছে জানিয়া, ...পি ভিতরে প্রবেশ করিতে একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। এমন সময় একজন ভৃত্যকে ...র হইতে দেখিয়া নগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "এজি দেখো, প্রভাবতী বিবি হিঁয়া রহতা হায়?"

ভৃত্য বলিল, "হ্যাঁ বাবু, তেতালায় আছেন।"

দুইবন্ধু তখন অঙ্গনে প্রবেশ করিল। নির্জ্জন অঙ্গন পার হইয়া সিঁড়ি উঠিয়া, দ্বি
ক্রমে ত্রিতলে উঠিল। দেখিল, একটি কক্ষে বিদ্যুৎ আলোক জ্বলিতেছে, পাখা
ফরসা বিছানায় একজন স্ত্রীলোক বিমর্ষ বদনে বসিয়া আছে। দুইবৎসর পরে দেখিলে
তাহাকে চিনিতে পারিল।

অগ্রে অগ্রে নগেন্দ্র, পশ্চাতে সুধীর। দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়া নগেন
"প্রভাবতী—ভাল আছ ত?"

প্রভাবতী দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "আপনারা কে? চিনতে পারছিনে ত?"

নগেন্দ্র বলিল—"চিনতে পারছনা?"—বলিয়া হাসিতে হাসিতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ
সুধীর তখনও বাহিরে দাঁড়াইয়া।

প্রভাবতী রুক্ষস্বরে বলিল, "কি রকম ভদ্রলোক মশাই আপনি? বলা নেই কওয়া নে
ঢুকে পড়লেন যে?"—বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—"পুলিস, পুলিস।"

পর মুহূর্ত্তে, পাশের ঘরখানির বন্ধদ্বার খুলিয়া গেল। চারিজন কনেষ্টবল তন্মধ্য হইতে
বাহিরে আসিয়া "শালা গুণ্ডা"—বলিয়া, এক এক জনের উভয় হস্ত, দু'দুজনে ধরিয়া ফেলিল।

প্রভা বলিল, "এই লোক গুণ্ডা হায়। হামকো খুন করনে আয়া হায়।"

নগেন্দ্র বলিল, "প্রভা, এ কি কাণ্ড? আমি নগেন্দ্র—নগেন্দ্র—এদের বল—"

প্রভা বলিল, "নগেন্দ্র তোমার কুন্দনন্দিনীর কাছে যাও। এখানে কেন ময়রা
পাহারাওয়ালা, এই দুনো আদমি গুণ্ডা হায়, হামকো খুন করনে আয়া হায়। পাকড়কে লে
"চল্ রে চল"—বলিয়া ধাক্কা দিতে দিতে কনেষ্টবলদ্বয়, ঔপন্যাসিক ও তাঁহার
থানায় লইয়া চলিল।

সেখানে হাজত ঘরে সারারাত্রি বন্ধ থাকিয়া, পরদিন প্রাতে থানার ইনস্পেক্টর বাবু
তাহারা নীত হইল। নগেন্দ্র আমূল বৃত্তান্ত ইনস্পেক্টার বাবুকে নিবেদন করিল। সৌভা
প্রভাবতীর স্বাক্ষরিত পত্রখানি নগেন্দ্রের পকেটেই ছিল, সেখানি বাহির করিয়া
বাবুকে সে দেখাইল। প্রভাকে উপহার দিবার জন্য যে বইখানি আনিয়াছিল, তাহাও দে

ইনস্পেক্টর বাবুটি শিক্ষিত লোক, এবং ভদ্রলোক। নগেন্দ্রের কথায় তাঁহার সন্দে
জন্মিল। উভয় আসামীকে মুক্তি প্রদান করিলেন।

যাইবার সময় নগেন্দ্র ইনস্পেক্টর বাবুর হাতটি ধরিয়া বলিল, "দোহাই মশাই
যেন খবরের কাগজে না ওঠে। তা'হলে আমার মান ইজ্জৎ ত যাবেই, বই বিক্রিও বন্ধ
ইনস্পেক্টর বাবু হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, খবরের কাগজে যাতে ব্যাপারটা
তার ব্যবস্থা করব এখন। কিন্তু, সাবধান, আপনি আর ওসব পাড়ায় হাঁটবেন না।"

নগেন্দ্র বাসায় ফিরিয়া আসিল। রাত্রে অনুপস্থিতির কৈফিয়ৎ স্বরূপ বাসার লোককে
খিদিরপুরে নিমন্ত্রণ ছিল, আহার শেষ হইতে অধিক রাত্রি হইয়া গেল, ট্রাম পাওয়া গেল
উভয়ে সেইখানেই শয়ন করিয়া ছিল। তাড়াতাড়ি স্নানাহার শেষ করিয়া নগেন্দ্র আপিসে
গেল। পরদিন নিজ গ্রন্থাবলী একসেট ইনস্পেক্টার বাবুকে "ভক্তি উপহার" স্বরূপ
া দিল।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

শারদীয় সঙ্গীত

মাকে মেয়ে সাজাইয় মেয়ের আদরে আহ্বান করিতে আমরা এখন ভুলিয়াছি। তাই এখনকার বিজয়ার গানেও কন্যা-বিচ্ছেদ-আশঙ্কার কাতরতা তেমন আর ফুটিয়া উঠে না। যে ভাবের প্রেরণায় কমলাকান্ত গান করিয়াছিলেন—

"আমি কি হেরিলাম নিশি স্বপনে।
গিরিরাজ, অচেতনে কত না ঘুমাও হে।
এই, এখনি শিয়রে ছিল, গৌরী আমার কোথা গেল হে
আধ আধ মা বলিয়ে বিধুবদনে॥" ইত্যাদি

সে ভাবের ধারা এখন শুখাইয়া গিয়াছে। এখন আর মেনকারাণী মেয়ের স্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠেন না; এবং মেয়েকে নিকটে পাইলেও একথা বলিতে পারেন না—

"উমা এলি মা, আয় মা, মা বলে ডাক চাঁদ-বদনে,
পেলাম যদি এত দিনে, অঞ্চলের স্বর্ণ,
আর ছাড়বো না, আর ভুলবো না,
আর দিব না, চাইলে অন্য।" ইত্যাদি—রসিক রায়।

কন্যার উপর জননীর যে এই ভালবাসার দাবী—এই অপত্য-স্নেহের জবরদস্তি, এটুকু ফুটাইতে না পারিয়া এ যুগের কবি মায়ের মুখে মেয়ের আগমন-সমাচার এই ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন,—

"আহা কি অতুল শোভা, আজিরে গিরি-ভবনে।
ভূধরে সারদা-শশী, শারদ-শশী গগনে॥
ভূধরে বিরাজে তারা, আকাশ-বিহারী তারা,
বিকশিয়ে আঁখি-তারা, দেখে তারা সুখী মনে॥

যামিনী কামিনী আজি, চন্দ্রিকা-বসনে সাজি,
নিশির শিশিরে ভিজি, হেরিছে উমায়।
কুমুদী ফুটিয়া জলে, নমে তারা পদ-তলে ;
চকোরেরা কুতূহলে চাহে উমা-শশী পানে ॥"—রাজা ৺ মহেন্দ্রলাল

—ইহাতে ভাষার সৌন্দর্য্য আছে, অলঙ্কারের প্রাচুর্য্যও আছে, কিন্তু মাতৃ-হৃদয়ের
ভাব বা বেদনা বিকশিত হইয়া উঠে নাই। বলা বাহুল্য, বিজয়ার গানও এখন এই ঢঙে
ভঙ্গীতে রচিত হইতেছে। এমন কি, নবীনচন্দ্রের ন্যায় উচ্চদরের কবিও বিজয়ার গান
গিয়া বহিঃপ্রকৃতির কথাই একটু বেশী রকম বলিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি গাহিয়াছেন—

"যেও না যেও না নবমী রজনী,
সন্তাপহারিণী লয়ে তারাদলে।
গেলে তুমি দয়াময়ি, উমা আমার যাবে চলে।
তুমি হলে অবসান,
যাবে মেনকার প্রাণ,
প্রভাত-শিশিরে আমায় ভাসাবে নয়ন-জলে।
প্রভাত-কাকলি-গান,
কাঁদাবে মায়ের প্রাণ,
উষার আলোকে প্রাণ উঠিবে রে জ্বলে।" ইত্যাদি

কাজেই বলিতে হয় যে, আধুনিক শারদীয়-সঙ্গীতে শরৎই ফুটিয়া উঠে,—বাৎসল্য রস তেমন
উঠে না। এ যুগের কবিরা কি আগমনী, আর কি বিজয়া, যাহাই যখন গায়িতেগিয়াছেন,
তখন 'উষার আলোক", 'নিশির শিশির' ও 'কাকলির গান' প্রভৃতি জুড়িয়া দিয়া
প্রগাঢ়তার লাঘব ঘটাইয়াছেন। অন্তঃপ্রকৃতির সহিত বহিঃপ্রকৃতির যে বিশেষ সম্বন্ধ
অবশ্য এমন কথা বলি না। মনের অবস্থা-বিশেষে একই বাহ্য দৃশ্য কখনও বা সুখকর এবং
বা দুঃখকর বোধ হয়। কিন্তু এই সঙ্গে এটুকুও মনে রাখিতে হইবে যে, চিত্ত যখন কোন
তীব্র ভাবাসক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়, তখন বাহিরের দিকে তাহার বড় দৃষ্টি থাকে না;—
অনুভূতিরই চিত্রটুকু প্রকাশ করিবার জন্য সে ব্যস্ত হইয়া উঠে। তাই কমলাকান্ত নবমী
করিতে গিয়া নবীনচন্দ্রের ন্যায় বাহ্যদৃশ্যের কোনও কথা বলিতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—

"কি হলো নবমী নিশি, হৈলো অবসান গো।
বিশাল ডমরু ঘন ঘন বাজে, শুনি ধ্বনি বিদরে প্রাণ গো।
কি কহিব মনোদুঃখ, গৌরী পানে চেয়ে দেখ, মলিন হয়েছে অতি
ও বিধু-বয়ান ॥

ভিখারী ত্রিশূলধারী, বা চাহে তা দিতে পারি ; বরঞ্চ জীবন চাহে,
তাহা করি দান।
কে জানে কেমন মত, না শুনে গো হিতাহিত ;
আমি ভাবিয়ে ভবের রীত, হয়েছি পাষাণ গো ॥
পরাণ থাকিতে কায়, গৌরী কি পাঠান যায় ; মিছে আকিঞ্চন কেন,
করে ত্রিলোচন।" ইত্যাদি

এই প্রাচীনের সহিত কি নবীনের তুলনা হয়? প্রাচীন কবি, নবমী নিশি-অবসানের কথা
ভাবিতে গিয়া মাতৃ-হৃদয়ের কথাই ভাবিয়াছেন ;—মাতৃ-হৃদয়ে উহার আঘাত কি প্রকার, উহার
জ্বালা কেমন, তাহাই দেখিয়াছেন। প্রথম ছত্রটা পড়িলেই বক্ষে একটা আঘাত লাগে। এই ক্ষুদ্র
গানের মধ্যে বহিঃপ্রকৃতির কোন কথাই নাই, দর্শনের কোন তত্ত্বই নাই ;—আছে কেবল চিরকালীন
মাতৃ-হৃদয়ের আত্ম-প্রকাশ। আগমনী এবং বিজয়া বাঙ্গালার মাতৃ-হৃদয়েরই গান। আমরা
বাঙ্গালী,—মাকে কন্যাভাবে সাজাইয়া কন্যাভাবাসক্তির পূর্ণ পরিতৃপ্তি আমরা যেমন লাভ করিয়াছি,
এতটা তৃপ্তিলাভ ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশের সাধকের ভাগ্যে ঘটে নাই। মাকে কন্যা
সাজাইয়া যত খেলা বাঙ্গালী ভাবুক খেলিয়াছে, তত আর কেহ পারে নাই। তাই বাঙ্গালার শারদীয়
সঙ্গীতের তুল্য আর কিছু আর কোথাও দেখিতে পাই না। অন্য কোন দেশের কবিকে
রামপ্রসাদের ন্যায় বলিতে শুনি না,—

"ওহে প্রাণনাথ গিরিবর হে, ভয়ে তনু কাঁপিছে আমার।
কি শুনি দারুণ কথা, দিবসে আঁধার ॥
বিছায়ে বাঘের ছাল, দ্বারে বসে মহাকাল, বেরোও গণেশ-মাতা,
ডাকে বার বার।
তব দেহ হে পাষাণ, এ দেহে পাষাণ প্রাণ, এই হেতু এতক্ষণে
না হলো বিদার ॥" ইত্যাদি

বাঙ্গালা দেশের শ্বশুর বাড়ীর-কড়া তাগিদ এবং সেই কড়া তাগিদের বিরুদ্ধে মাতৃ-স্নেহের
স্বাভাবিক অধিকার কিরূপ বৃথা আছাড় খাইয়া মরে, তাহারই চিত্র ঐ কয় ছত্রে উজ্জ্বল হইয়া
উঠিয়াছে। মেনকারাণীর এই করুণ ক্রন্দনের মধ্যে বঙ্গীয় জননীর হৃদয়ের চিরন্তন বেদনার
ছিটেটুকুই দেখিতে পাওয়া যায়। বিজয়ার গান—মাতৃ-হৃদয়ের শোকের গান। আগমনীতে
মাতৃ-হৃদয়ের সুখ-দুঃখ, আশঙ্কা ও আনন্দ প্রভৃতি অনেক রকমের কথা শুনিতে পাওয়া যায়,
কিন্তু বিজয়া কেবল কাঁদিয়া কাঁদিয়া বিরহ-গাথাই গাহিয়া গিয়াছে। এই শারদীয় সঙ্গীতের
ধার রামপ্রসাদ হইতে আরম্ভ হইয়া দাশরথি ও ব্রজ রায় পর্য্যন্ত পূরাদমে পৌঁছিয়াছিল, কিন্তু

তার পর হইতেই উহার সুর বিগড়াইয়াছে। তার পর হইতেই বাঙ্গালী কবি চাঁদের আলো
কিরণ, ভ্রমর-ঝঙ্কার ও পদ্মের গন্ধ, হইতে মায়ের আগমন-সমাচার ও বিসর্জ্জনের বা
করিয়া, তাহাই ছন্দোবন্ধে প্রচার করিয়া আসিতেছেন।

কেন এমন হইল? বাঙ্গালার সে খাঁটি সুর বাঙ্গালী ভুলিল কেন?—মনে হয়, কো
ব্রাহ্ম-সমাজের সংস্পর্শে আসিয়াই বাঙ্গালী সে সুর ভুলিতে আরম্ভ করিয়াছিল।
ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র 'শারদীয় উৎসব' উপলক্ষে বলেন,—"হে দয়াময়, শরতের শোভার
অন্তরের অন্তরে কৃপা করিয়া প্রকাশ কর।"—সেই দিন হইতেই শিক্ষিত বাঙ্গালী
মাকে আহ্বান করিতে ভুলিয়াছে। এমন কি, বঙ্কিম বাবুও 'কমলা কান্তের দপ্তরে' 'দুর্গে
লিখিতে গিয়া মাকে মেয়ে সাজাইতে পারেন নাই;—তিনি জাতীয়তার বেদীর উপর দাঁড়াই
কন্যা-পূজার ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। এ যুগে এই প্রভাব এড়াইয়া সেই পুরাণো সুরে
গায়িতে পারিয়াছিলেন—স্বর্গীয় নাট্যকার মনোমোহন বসু। আর পারিয়াছিলেন—গিরিশ
তিনিই একমাত্র আবার বাঙ্গালী ভক্ত ভাবুকের ঠিক সেই পুরাতন সুরটিকে জাগাইয়া
বাঙ্গালীর কর্ণে আগমনীর অমৃত ধারা ঢালিয়া দিয়াছিলেন। তিনিই নবমীর গান করিয়া
বলিতে পারিয়াছিলেন,—

"কাল্‌কে ভোলা এলে বল্‌বো—
উমা আমার নাইকো ঘরে।
কনক-প্রতিমা আমার পাঠিয়ে দেব কেমন করে॥
বলে বলুক যে যা বলে, মান্‌বো না আর জামাই ব'লে,
যায় যাবে সে, গেলে চলে—
যা হয় তখন দেখ্‌বো পরে॥
কারু বাপের কড়ি পেয়ে, বেচে কি খেয়েছি মেয়ে,
উমা গেলে কারে নিয়ে, রব আর পরাণ ধরে॥
আঁচোল ধরে' পাছে ছোটে,
ঘুমিয়ে উমা চমকে উঠে,
শ্বশুর ঘর কি জানে মোটে, কত বাকি তারি তরে॥"

কন্যাভাবাসক্তির প্রগাঢ়তা দেখাইয়া এমন ভাবের বিস্তার করিতে এ যুগে আর
পারেন নাই। অপ্রাপ্তবয়স্ক অনভিজ্ঞ কন্যাকে শ্বশুর-গৃহে পাঠাইবার সময় মায়ে
ব্যাকুলতা জন্মে, ইহা তাহারই সজীব স্নিগ্ধোজ্জ্বল চিত্র। গিরিশচন্দ্র মাতৃহৃদয়ে
চিত্রকর। মাতৃস্নেহের অনেক আলেখ্যই তিনি নিখুঁত করিয়া আঁকিয়া গিয়াছেন।
এখানে আর সে সব কথা উত্থাপন করিলাম না।

াগমনীর গান বাঙ্গালায় অগণিত আছে, কিন্তু বিজয়ার গান বিরল। তবে বিরল হইলেও
সাবে হীন নহে। সে সকল গানের প্রায় প্রত্যেকটিই যেন ভাষার সুমস্তক মণি;—
সে, অলঙ্কারের ঝঙ্কারে পূর্ণ। দুঃখের বিষয়, এই সব রত্ন ক্রমেই লুপ্ত হইয়া আসিতেছে।
এই সকল লুপ্ত রত্ন উদ্ধার করিবার জন্য যদি কেহ উদ্যোগী হন, তবে ভাল হয়।—বাঙ্গালা
সাহিত্যের ইহা একটা নিজস্ব সম্পত্তি—একটা গৌরবের সামগ্রী। আমাদের উপেক্ষাও ঔদাসীন্যে
যদি উহার কিছু নষ্ট হয়, তবে সেটা আমাদেরই ক্ষতি,—আমাদেরই কলঙ্কের কথা।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়

মন্দের ভালো

(১)

মিসেস্ খাস্তগীরের ছেলেবেলার আদরের নাম ছিল মিনি, ভাল নাম ছিল মৃণালিনী এবং
বিবাহের পরে ব্যাঙাচির লেজের মত এ দুই নামই খসিয়া গিয়া হইয়াছে একেবারে মার্জ্জরী।
মিসেস্ মার্জ্জরীকে ঈর্ষাপরায়ণা প্রতিবেশিনীরা মার্জ্জারী বলিয়া বিদ্রূপ করিতেও ছাড়িতেন না।
তবে একটা সুবিধা ছিল এই যে, পাড়ার কাহারও সহিত ইঁহাদের কোনও ঘনিষ্ঠতা ছিল না।
তাহার কারণ শিমলা পাহাড়ে যে পল্লীতে মিসেস শ্রীমতী খাস্তগীর বাস করিতেন, সে পাড়ায় ছিলেন
জনকয়েক মাদ্রাজী, দু'এক ঘর বাঙ্গালী ও অবশিষ্ট ফিরিঙ্গি। মিষ্টার খাস্তগীর বড় লাটের
দপ্তরে কাজ করিতেন এবং পূরা সাহেব ছিলেন। তাঁহার বাড়ীর নাম ছিল কেণ্টাকী গ্রোভ্।

মিঃ খাস্তগীরের পূরা নাম ছিল ভবানন্দ। তাঁহার দরজায় পিত্তল ফলকে উৎকীর্ণ ছিল
Mr. B. A. Khastgir. কখনও কখনও খাস্তগীর সাহেব নাকি নামটি ফিরাইয়াও লিখিতেন
Khastgir B. A. ইহাতেও তিনি যে বি, এ পাশ সে বিষয়ে দুষ্ট লোকের মনে খট্‌কা
গিত না, এমন নহে।

বস্তুতঃ খাস্তগীর সাহেবের বিদ্যা যে কতদূর, তাহার খবর খুব কম লোকই রাখিত। অফিসে
ার ছিল তিনি বিলাত ফেরত। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই, তিনি বোম্বাই হইতেই ফিরিয়াছিলেন।
ইহাতেই তাঁহার বিলাত গমনের কাজ হইয়া গিয়াছিল। প্রথমতঃ বিলাতের চাল চলন হাবভাব
দি তিনি অনেকটা বম্বে বসিয়াই আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি বিলাত যাইবার
হাতে মৃণালিনীর পিতার নিকট হইতে যে দশ হাজার টাকা পাইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে এক
র বাদে আর নয় হাজার টাকা তাঁহার হস্তগত হওয়াতে আর্থিক স্বচ্ছলতা হইয়াছিল বিশেষ।
কথাটা আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলা যাক্। ভবানন্দ যখন কলেজে পড়েন, তখন

তাঁহার ভগ্নীপতির নিকট কাণপুরে বেড়াইতে আসেন। সেই সময়ে মৃণালিনীর পিতা রা
অধিকারী কাণপুরের সদরালা। প্রবাসী বাঙ্গালীর পক্ষে কন্যার বিবাহ দেওয়া এক মহ
মৃণালিনী শুক্ল পক্ষের চন্দ্রকে ধিক্কার দিয়া ষোলকলা পার হইয়া ঊনবিংশ কলায়
চেষ্টা করিতেছে। ভবানন্দকে দেখিয়া রামগোপালের বেশ পছন্দ হইল। কন্যাদায়
এমন সুযোগ তিনি পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। কিন্তু এক অসুবিধা ছিল এই যে,
সাংসারিক অবস্থা ভাল নহে, তার উপর লেখা পড়া—পঞ্চবিংশ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত টানাটানি
সে তাহার কোনও কূল কিনারা পায় নাই। রামগোপালের কন্যাটি কিন্তু অনেক শিখিয়া
ছিল। কাণপুরের এক পাদরিণা, ফিরিঙ্গি মেয়েদের লইয়া একটি স্কুল করিয়াছিলেন;
স্কুলে অষ্টাদশবর্ষ পর্য্যন্ত মিস্ মিনি অধিকারীর শিক্ষাদীক্ষা রীতিমত হইয়াছিল।
দেখিলেন জামাতাকে একবার বিলাত ঘুরাইয়া আনিতে পারিলে ঠিক 'পাষাণভাঙ্গা' হয়।
জামাতার মধ্যে ওজনের যে তারতম্য আছে, তাহা রামগোপাল বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন।
সংকল্প মনে উঠিতেই রামগোপালের বক্ষ ব্যারিষ্টার জামাতালাভের সৌভাগ্য-সুখ-কল্পনায়
পরিমাণ স্ফীত হইয়া উঠিল। কত ভাল ভাল ব্যারিষ্টার তাঁহার আদালতে মোকদ্দমা
আসিয়া তোরঙ্গ বোঝাই করিয়া টাকা লইয়া গিয়াছে, সে কথা তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল।

শুভদিনে শুভ লগ্নে বিবাহ সংস্কার নিষ্পন্ন হইয়া গেল। স্থানীয় হিন্দুস্থানী
বাবুরা ভবানন্দের কর নিষ্পেষণ করিয়া স্বস্তিবাচন করিলেন। সাহেবেরা কেহ কেহ
অতুলনীয় সৌভাগ্যে কটাক্ষ করিতেও ছাড়িলেন না। তাঁহারা অনেকেই মিনিকে
পশ্চিমের বাঙ্গালী মেয়েরা পরদা মানিয়া উঠিতে পারেন না।

পি, এণ্ড ও কোম্পানীতে ভবানন্দের জন্য টিকিট কাটা হইল। র‍্যাঙ্কেন কোম্প
পোষাক সরবরাহ করিলেন। যাত্রার দিন স্থির হইয়া গেলেই, ভবানন্দের ভগ্নীপতি
রামগোপাল বাবু টমাস্ কুকের হিসাবে (খরচ বাদে) ন' হাজার একশ' এক টাকা
দিলেন। অবশিষ্ট টাকা পি, এণ্ড ও, এবং র‍্যাঙ্কেনকে দিতে ব্যয়িত হইয়াছিল।
রামগোপাল ভবানন্দকে কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন :—"বাপু আমার কথাও
তাই ; তোমার ভগ্নীপতিকে বলো।"

বিবাহের পর ভবানন্দ কোনও গতিকে কাল-রাত্রিটা কাটাইয়া দিয়া ফুলশয্যার
মিনিকে জিজ্ঞাসিল :—

"আমি বিলাত গেলে তুমি খুসী হও, না—না গেলে খুসী হও ?"

মিনি ইতস্ততঃ না করিয়াই বলিল :—'কেন, তোমার ত বিলাত যাওয়া ঠিক হয়ে

"যদি না যা.....ই ?"

"সে, বাপু আমি জানি না।"

সে দিকে উৎসাহ না পাইয়া, ভবানন্দ একটি বেশ দীর্ঘ রকমের নিঃশ্বাস বক্ষপঞ্জরের ভিতর
টানিয়া বাহির করিয়া বলিল :—

"ফিরে আস্‌তে তিন বছর ত লাগবেই—বেশীও লাগতে পারে। তোমার কোনও কষ্ট
হবে ?"

মিনি এবারেও নিঃসংশয়ে বলিল—"না, কষ্ট আবার কি ? বাপমায়ের কাছে থাক্‌লে আবার
কষ্ট কি ?"

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

ভবানন্দের একটা ছোটখাটো বাসভবন যে না ছিল, তা নয়। কিন্তু তাহার পিতামাতা কেহ
থাকায়, সে জোর করিয়া বলিতে পারিল না যে, 'এখানে থাক্‌বে কেন ? আমার বাড়ীতে গিয়ে
থাক্‌বে।' শ্বশুর ভবনে যাইবার নাম শুনিলে হয় ত মৃণালিনীর উৎসাহের আবেগটা একটু কমিতে
পারে, এই মনে করিয়া একবার ভবানন্দের ইচ্ছা হইয়াছিল যে বলে। কিন্তু সাহসে কুলাইল না।
তখন ভবানন্দ মনে মনে স্থির করিল যে, প্রথম দর্শনেই আমি যেমন হৃদয়খানি হারাইয়া ফেলিয়াছি,
মৃণালিনীর বোধ হয় ততটা হয় নাই। যাহা হউক, বিলম্বেই সুমিষ্ট ফল পক্কতা প্রাপ্ত হয়, মনকে

এইরূপ প্রবোধ দিয়া ভবানন্দ চট্ করিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। মিনি কিছুক্ষণ চুপ করি
রহিল, তারপর নিরন্তর স্বামীর নাসিকাধ্বনিতে ঘুম আসিবার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত ম
মাতার বিছানার এক পার্শ্বে গিয়া ঘুমাইল।

যথাসময়ে যাত্রা করিয়া ভবানন্দ বম্বে মেলে আরোহণ করিল। বম্বে গিয়া সমু
ঢেউ দেখিয়াই হউক, অথবা মিনির হাস্যোচ্ছল মুখখানি মনে পড়িয়াই হউক, ভবানন্দের
জাহাজের কামরার অভিমুখে কিছুতেই যাইতে চাহিল না। কাণপুর হইতে যাত্রা করিয়া
দিন ভবানন্দের চোখ দিয়া দু চার ফোঁটা জলও পড়িয়াছিল, এবং আরও পড়িবার জোগা
তাহা দেখিয়া মিনি বেচারী হাস্য সংবরণ করিতে পারে নাই। ভবানন্দ চট্ করিয়া
সু-পালিশ 'কফে' চোখ মুছিয়া লইয়া অনিমেষ নয়নে মিনির সেই হাস্যবিস্ফারিত বদনমণ্ডল
চাহিয়াছিল। ব্যালার্ড পিয়ারে পৌঁছিয়া সেই মুখখানিই কেবল মনে পড়িতে লাগিল।
তরঙ্গ দ্বিপ্রহরে যত উদ্বেলিত হইয়া উঠিতে লাগিল, ভবানন্দের ভাবসাগরে ততই প্র
উঠিয়া, অনবরত ঘাত প্রতিঘাত ও সংঘাতে তাহার হৃদয় তরণীকে ঐ জাহাজেরই মত
লাগিল। এক সময়ে এমন সম্ভাবনাও হইল, যে মনের কথা হঠাৎ অমিত্রাক্ষর ছন্দে অন
হইয়া পড়ে।

দ্রুতপদে সেখান হইতে বাহির হইয়া ভবানন্দ এক দৌড়ে গিয়া, মনের আ
ট্যাক্সিতে উঠিয়া বসিল এবং হস্তের দ্বারা সম্মুখে যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিল। চালক
হাতোল ঘুরাইয়া বুঝাইয়া দিল সাহেবের সময়ের মূল্য তারও জানা আছে। জিনিষপ
জাহাজে উঠিয়াছে। নিজের বিলাত গমন সম্বন্ধে ভবানন্দের মনে সন্দেহ জন্মিলেও, তাঁহা
বিছানা প্রভৃতির আসন্ন বিলাত গমনে কোনও সন্দেহই রহিল না! তাহার নিজের
হ্যাণ্ড ব্যাগ মাত্র ছিল। তাহাকেই সম্বল করিয়া সে মোটরে উঠিয়া বসিয়াছি
নক্ষত্রবেগে ছুটিল। কিছুদূর গিয়া মুখ ফিরাইয়া শোফেয়ার হাঁকিল 'কাঁহা যাইয়েগা'!
কত বড় অনিশ্চিত ছিল, তাহা ভবানন্দ ব্যতীত আর কেহই জানিত না। ভবা
হস্তের দ্বারা ইঙ্গিত করিল। মোটর চলিতে লাগিল। সহরের সীমা ছাড়িয়াও বহু
পড়িল। আবার শোফেয়ার জিজ্ঞাসা করিল; এবারে একটু রুক্ষভাবে।
ভাবিত; কথা কহে না। লোকে পরিহাসচ্ছলে অনেক সময়ে বলিয়া থাকে যে
নাই। কথাটা অনেক সময়ে খাটে না, এক্ষেত্রেও খাটিল না। শোফেয়ার দুটিন বা
পর মোটর থামাইল, এবং গাড়ী হইতে নামিয়া আস্তেন গুটাইয়া রীতিমত দ্বন্দ্বযুদ্ধে
আহ্বান করিল।

ভবানন্দ ভাব দেখিয়া আতঙ্কিত হইল, তখন সে হঠাৎ প্যাণ্টুলুনের পকেট হইতে
বাহির করিয়া শোফেয়ারের মুষ্টিবদ্ধ হস্তে জোর করিয়া প্রবেশ করাইয়া দিল এবং বলিল

"বেমার হ্যায়; হাঁসপাতালমে লেচলো।" ব্যারামের কথায় যত না হউক, পাঁচটি মুদ্রার
পর্শে ভাটিয়া মোটর চালকের ক্রোধ প্রশমিত হইল। সে মোটর ঘুরাইয়া লইয়া চালাইয়া
ং অবিলম্বে গোকুল দাস তেজপাল হাঁসপাতালের দ্বার দেশে উপস্থিত হইল। ভবানন্দ
তাহার মস্তকে মন্দ বুদ্ধি জোগায় নাই। সে চুপ করিয়াই রহিল। শোফেয়ার তাহাকে
লইয়া গিয়া ডাক্তারের সম্মুখে হাজির করিল। সেখানেও ভবানন্দ মৌন; ইংরাজীতে এই
মাত্র বুঝাইয়া দিল যে সে পীড়িত। কি পীড়া, লক্ষণ কি! এসব প্রশ্ন সে যেন কিছুই বুঝিতে
পারিতেছে না; এইরূপ ভাব করিল। শোফেয়ার ভাড়া চাহিতেই সে প্যাণ্টুলুনের পকেট হইতে
কতকগুলি টাকা বাহির করিয়া তাহাকে দিয়া দিল, একবার গণিয়াও দেখিল না।

এবংবিধ ব্যবহার ও পোষাক পরিচ্ছদ দেখিয়া ডাক্তার তাহাকে সম্ভ্রান্ত লোক বলিয়া স্থির
করিলেন এবং একটি ঘর তাহার বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিলেন। ঘরটি ছোট হইলেও বেশ
পরিষ্কার। সেই ওয়ার্ডের বিকৃতমস্তিষ্ক রোগিগণের কোলাহলে কিছু অসুবিধা ঘটিলেও, মোটের
উপর সমুদ্র মধ্যে ভীষণ তরঙ্গ দোলায়িত অর্ণবপোতের ক্ষুদ্র কেবিন হইতে শত সহস্র গুণে ভাল
মনে হইতে লাগিল!

কেহ তাহাকে দর্শন করিতে আসিলেই, ভবানন্দ মস্তকে বারংবার তর্জ্জনী ঠুকিয়া মৌন
ভাবে জানাইয়া দিত যে, তাহার শরীরের ঐ অংশের কল কবজা বিলকুল বিগড়াইয়া যাইতে
বসিয়াছে। ডাক্তার তাহাকে ঘুম পাড়াইবার ঔষধ দিলেন এবং তেড়ী ফিরানো চুলগুলির মাঝখান
হইতে নির্ম্মমভাবে কতকগুলি কাটিয়া লইলেন। ভবানন্দ আয়নায় দেখিল, তাহার চেহারা কতকটা
দক্ষিণী ব্রাহ্মণের মত হইয়াছে। এক্ষণে গোটাকতক ঋজু ঋজু ঊর্দ্ধ রেখা টানিতে পারিলে হয়।

গোকুল দাস তেজপাল হাঁসপাতালে এক জন নূতন সাহেব ডাক্তার আসিয়াছিলেন, তিনি
মানসিক ব্যাধির বিশেষতত্ত্বজ্ঞ। তাঁহারই হস্তে ভবানন্দ সমর্পিত হইল। যুবক ডাক্তার মনস্তত্ত্বে
পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া অনেক বেতনে নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছেন। কতকগুলি বদ্ধ পাগলের
চিকিৎসা তাঁহার স্কন্ধে ফেলিয়া দেওয়াতে তিনি কিছু বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার
চিকিৎসায় তাহাদের পাগলামী দিন দিন বাড়িয়াই চলিতেছিল। কিন্তু ভবানন্দকে রোগী রূপে
পাইয়া তিনি একটু আরাম বোধ করিলেন। কারণ সূত্রপাতেই তাঁহার চিকিৎসা ফলবতী হইতে আরম্ভ
করিল। তিনিও খুব উৎসাহের সহিত ভবানন্দের চিকিৎসায় মনোযোগ করিলেন এবং
কেসের (case) এক বিস্তৃত বিবরণ লিখিতে সুরু করিলেন। ভবানন্দের কথাবার্ত্তায় উত্তরোত্তর
মনের লক্ষণ-বিকাশ দেখিয়া তিনি অপূর্ব্ব আনন্দ পাইতে লাগিলেন। অন্ততঃ একটিও মানসিক
ব্যাধিগ্রস্ত রোগী যে তাঁহার চিকিৎসায় উন্নতি লাভ করিতেছে, এই বিজয়োল্লাসে তাঁহার সুপরিসর
বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিল এবং তিনি খুব জোরে জোরে পাইপ্ টানিতে লাগিলেন।

ভবানন্দের অসুখের টেলিগ্রাম পাইয়া রামগোপাল বাবু ছুটিয়া আসিয়াছিলেন কিন্তু তাহার

ভাব গতিক দেখিয়া ফেরত ট্রেণেই তিনি কাণপুরে পৌঁছিয়াছিলেন। জামাতার বিলা
এমন অসম্ভাবিতরূপে পণ্ড হইয়া যাওয়ায় তিনি ছোটখাটো একটি আঘাত হৃদয়ে বহন করি
গেলেন। কিন্তু পাছে তাঁহার স্নেহের কন্যা সেই আঘাতে একেবারে নুইয়া পড়ে এই
তিনি কাণপুরে সমস্ত কথা প্রকাশ করিলেন না। স্বামীর অসুখের সংবাদ পাইয়া মৃণালিনী
চায়ের সঙ্গে টোষ্ট্ কোনও মতেই খাইল না।

এদিকে ভবানন্দ সেই সাহেব বিশেষজ্ঞের যত্ন ও চিকিৎসায় খুব দ্রুত আরোগ্যে
অগ্রসর হইতেছে। ডাক্তারের বাড়ীতে তদুপলক্ষে এক সান্ধ্য সম্মিলন আহূত হইল,
অনেক ডাক্তার ও প্রধান লোক নিমন্ত্রিত হইলেন, ভবানন্দকে একখানা কুশন-মণ্ডিত
সযত্নে শয়ান করাইয়া তিনি সহাস কৌতুকে সব লোক ডাকিয়া ডাকিয়া দেখাইলেন।
নিকটে তিনি যে রোগের নিদান ও অনুক্রমের ব্যাখ্যা করিলেন, তাহাতে বেচারী ভবানন্দের
আভাস মাত্র হইতেও বঞ্চিত বদন-মণ্ডলে দুশ্চিন্তার গভীর রেখা অঙ্কিত হইল; সে চেয়ারে
শয্যাকণ্টকগ্রস্ত রোগীর ন্যায় ছট্ ফট্ করিতে লাগিল। ডাক্তারের মহিলা বন্ধুরা তদ্দর্শনে দুঃ
পড়িলেন। ডাক্তার সকলকে বুঝাইয়া দিলেন, যে রোগীর মস্তিষ্ক যেরূপ ভয়ানক বিকৃত হ
তাহাতে এই সময়ের মধ্যে একেবারে আরোগ্য লাভকরা অসম্ভব। তবে আশাতীত অল্প
মধ্যে যে অভাবনীয় উপকার দর্শিয়াছে, তাহা বর্ত্তমান মস্তিষ্ক-চিকিৎসা-বিজ্ঞানে যুগান্তর উপস্থিত
দুই একজন দেশী ডাক্তার সাহেবডাক্তারকে অভিনন্দন করিবার সময়ে যে একটু সন্দে
অধর কোণে ফুটাইয়া ছিল, তাহা কেহ লক্ষ্য করিল না!

মজলিস্ যখন ভাঙ্গিয়া গেল তখন তিনি যত্ন সহকারে নিজের মোটরে করিয়া
হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দিলেন।

ইহার কিছুদিন পরেই ভবানন্দ ডাক্তার সাহেবের নিকট হাজির হইয়া বলিল
এইবার বর দাও। যে ব্যাধি তুমি দয়া করিয়া সারিয়া দিলে, আবার সে অসুখে না
ব্যবস্থা করিয়া দাও। এখন খাইব কি করিয়া তাহা বল।

সাহেব বলিলেন:—ঠিক বলেছ, এটা আমারই আগে মনে হওয়া উচিত ছিল।
ব্যাধিতে তোমাকে ধরিয়াছে, তাহাতে তোমার একটা অর্থাগমের পথ আবিষ্কার
না পারিলে, আমার সব চেষ্টা যে ব্যর্থ হইয়া যাইবে!

সাহেব তৎক্ষণাৎ দন্তের মধ্যে পাইপ্‌টি চাপিয়া ধরিয়া একখানি সুপারিষ
বসিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, 'টাকা কড়ি সংক্রান্ত ব্যাপারে তোমার কিছু অভিজ্ঞতা
ভবানন্দ বলিল:—"বিলক্ষণ, তা আর নেই! আমার শ্বশুরের টাকা কড়ি
দিন কারবার করিতেছি। তিনি আমার কাজে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার ব্যবসায়ে

লইতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমাকে আরও উচ্চতর কার্য্যে চালিত
ছে। এক্ষণে, সাহেব, তুমি হে ভরসা মম অকূল পাথারে।"

সাহেব দ্রুতবেগে একখানি চিঠি লিখিয়া ভবানন্দের হস্তে দিলেন। ভবানন্দ সেই মহাস্ত্র
করিয়া পরদিন মার্কিণ ট্রেডিং ব্যাঙ্কের বড় সাহেবকে আক্রমণ করিল। বড় সাহেব তাহাকে
প্রধান কেরাণীর অস্থায়ী সহকারীরূপে নিযুক্ত করিলেন।

(২)

ছয়মাস কাল মার্কিণ ট্রেডিং ব্যাঙ্কে হাত পাকাইয়া ভবানন্দ কাণপুরে যখন পদার্পণ করিলেন
তখন তাঁহাকে সকলে সম্মান না করিয়া পারিল না। কারণ সকলেই বুঝিতে পারিল যে, ভবানন্দ
যেরূপ ভাবে কথাবার্ত্তা কহে, যেরূপ ভাবে চলে, যেরূপ ভাবে মন্তব্য প্রকাশ করে, যেরূপ ভাবে
শিস্ দেয়, তাহাতে সে নিশ্চয়ই অনেক উচ্চপদের দাবী লইয়া ঘরে ফিরিয়াছে। রাম গোপালও
ভাবভঙ্গী দেখিয়া প্রথমটা সেইরূপ ধারণা করিয়াছিলেন কিন্তু শেষে যখন দেখিলেন যে বাবাজি
রীতিমত তাঁহার গৃহেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার যোগাড় করিতেছেন, তখন তিনি ও তাঁহার স্ত্রী
জামাতৃ-তর্পণের বিষয়ে ক্রমশঃ উদাসীন হইয়া পড়িলেন; ষোড়শোপচার হইতে দশোপচার
এবং দশোপচার হইতে ক্রমে পঞ্চোপচারে নামিয়া আসিল। তাহারও ব্যতিক্রম ঘটিবার সম্ভাবনা
আসন্ন হইয়া পড়িল। এক দিন মিনি কাঁদো কাঁদো সুরে বলিয়া ফেলিল যে, সে মিস্ এলিসের
স্কুলে পনেরো টাকা মাহিনায় শিক্ষয়িত্রীর কাজ করিতে মনস্থ করিয়াছে।

ভবানন্দ বুঝিল যে দু'দিন একটু বিশ্রাম করিবার স্থান এসংসারে—এমন কি শ্বশুর
বাড়ীতেও—দুর্ল্লভ। সে তাহার পুরাতন বন্ধু ডাক্তার সাহেবকে পত্র লিখিল:—তাহার
মানসিক ব্যাধি যাহা তাঁহার সুচিকিৎসা গুণে একেবারেই সারিয়া গিয়াছিল—তাহা আবার
বৃদ্ধি পাইবার আশঙ্কা হইয়াছে। সত্বর প্রতিবিধান না করিলে কি হয় বলা যায় না। ডাক্তার
সাহেব প্রত্যুত্তরে অনেক আশ্বাস বাক্য লিখিলেন এবং মার্কিণ ব্যাঙ্কের বড় সাহেবের নিকট
হইতে খুব জোরালো এক পরিচয়-পত্র ভারত গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব-সচিবের বরাবর
পাঠাইয়া দিলেন।

ভবানন্দ সেই পরিচয়-পত্র ও প্রিয় পরিবার সহ দিল্লী রওনা হইলেন। চাঁদনী
চকের উপরে, ফিরিঙ্গি-পরিচালিত এক হোটেলে উভয়ে বাসা লইল। রাজস্ব-সচিবের সঙ্গে
সাক্ষাৎ করিতেই তিনি হাঁ না কিছু না বলিয়া সেক্রেটারীর নিকটে মার্কিণ ব্যাঙ্কের বড়
সাহেবের চিঠিখানা সহ তাহাকে পাঠাইয়া দিলেন। সেক্রেটারীও তাঁহাকে কোনও আশাই
দিতে পারিলেন না। কর্ম্ম খালি হইলে বিবেচনা করা যাইবে, এইরূপ এক সুদূর সম্ভাবনার
প্রান্ত অনিশ্চিত আভাস দিয়া তাঁহাকে বিদায় করিবার চেষ্টায় ছিলেন। কিন্তু ভবানন্দ
ফিরিবার পাত্র নহেন, তিনি সাহেবের বাড়ীতে প্রতিদিন দুইবার করিয়া হাজিরা দিতে লাগিলেন

এবং পরিবারের মৃণাল বাহু নিজ ভুজবন্ধনে বেষ্টন করিয়া আলিপুর রোড দিয়া প্রতি
পদচারণা করিতে লাগিলেন। শীঘ্রই সাহেব মহলে ভবানন্দের সুনাম পড়িয়া গেল
নবাগত খাস্তগীর দম্পতী যে দেশীয়দিগের মধ্যে অতি উচ্চ-শিক্ষাপ্রাপ্ত, ইহা নি
প্রতিপন্ন হইয়া গেল। সাহেবেরা প্রথমতঃ ছড়ি, পরে হাত এবং তৎপরে টুপী
দম্পতীকে সম্মান দেখাইতে লাগিল। সাহেবদের সহিত ভবানন্দের যেমন যেমন
হইতে লাগিল, মিনিকেও তাহাদের সঙ্গে ক্রমশঃ পরিচয় করিয়া দেওয়া হইল।

মিনি ইংরেজি লেখাপড়া শিখিয়াছে, সাহেবী চালচলন কতকটা অভ্যাস ক
পশ্চিমে থাকিয়া থাকিয়া অতিরিক্ত লজ্জাশীলতাকেও বিদায় দিয়াছে, কিন্তু এমনভাবে গে
রাস্তায় যার তার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিতে সে একান্তই কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল।
ভবানন্দ তাহাকে বুঝাইল যে, বিলাতী নিয়মে স্ত্রীই স্বামীর উন্নতির একমাত্র সহায়।
দেশীয় প্রথা অবলম্বন করিলে উৎসন্ন যাইতে হইবে। বিলাতে যাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ
তাঁহাদের স্ত্রীরাই প্রথমে রাস্তা কাটিয়া সমাজের উচ্চতর স্তরে প্রবেশপথ প্রস্তুত ক
দিয়াছেন। পার্লেমেণ্টের সদস্যপদপ্রার্থীদের মধ্যে যাঁহাদের সুন্দরী ও যুবতী স্ত্রী
তাঁহাদেরই চেষ্টা সম্যক্ ফলবতী হয়, ন চ বিদ্যা ন পৌরুষং। অতএব মার্জরী
ভাবিও না। দেখিয়াছ ত, বজ্রের দ্বারা হীরা চুনী পান্নায় বিঁধ করিলে, তাহার ভিতরে কোন
গাছটি প্রবেশ করিতে পারে, তেমনি এই বড় সাহেবগুলির পাষাণ হৃদয় তোমার শাণিত ক
দ্বারা উৎকীর্ণ হইলে তন্মধ্যে আমার প্রবেশ সুসাধ্য হইয়া পড়িবে। এমনিতর অনেক
পূর্ণ উপদেশ ও অনুনয়ের দ্বারা মিনি বশীভূত হইলে, দিল্লীর শ্বেতাঙ্গ-সমাজে বেশ এক
পড়িয়া গেল। ভবানন্দ ব্যাঙ্কের কার্য্যে প্রবীণ বিশেষজ্ঞ বলিয়া খ্যাতিপ্রাপ্ত হইলে
সেই সঙ্গে সকলেই বাহাবা দিয়া বলিল, ভবানন্দের স্ত্রী সুন্দরী বটে।

বোম্বাইয়ের পরিচয় পত্র, বিলাতী সাজপরিচ্ছদ ও সুন্দরী স্ত্রীর সমষ্টিগত প্রভা
হইতে পারে না। সুতরাং ভবানন্দের সিদ্ধি অদূরবর্ত্তিনী হইয়া আসিল। পরে
সত্য সত্যই লাল পোষাকধারী চাপরাশী লম্বা খামে এক পত্র আনিয়া আরও লম্বা এক
করিল। পত্রে ভবানন্দকে একবৎসরের জন্য তিনশত টাকা বেতনে ভারতীয় ব্যাঙ্ক
কার্য্যের সংবাদ-দাতা বা রিপোর্টার নিযুক্ত করা হইয়াছে। খাস্তগীর সাহেব এক
টাকা বখশিশ্ দিয়াও চাপরাশীকে খুসী করিতে পারিলেন না।

(৩)

রেসিনায় যেখানে নূতন সহর হইয়া উঠিতেছে, তাহারই প্রান্তে গবর্ণমেণ্টের
বাংলো খালি পড়িয়া ছিল। দূরত্বের জন্য কেহ সেখানে যাইতে চাহিত না।
সঙ্গে রফা করিয়া খাস্তগীর দম্পতী সস্তায় তাহারই একটি বাংলো অধিকার করিলেন।

আসবাবগুলি চক্‌চকে, পরদাগুলি চটকদার। সবই ভবানন্দের সাহেবী মেজাজের
। সুতরাং আর কোনও অসুবিধাই রহিল না। বাড়ীর নাম দেওয়া হইল "ফেয়ারী
ফেয়ারী হলে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই চায়ের পার্টি বসিত। সকল দিকে ব্যয় অসম্ভবরূপে
এই সকল আনন্দ সম্মিলনের ব্যবস্থায় খাস্তগীর সাহেব মন দিলেন। ইহাতে প্রথম
দুই চারিটি দেশী মূর্ত্তি থাকিলেও ক্রমশঃ তাহা বিরল হইয়া উঠিল। মার্জরী রীতিমত
মেম সাহেব সাজিয়া সাহেব মেমদিগকে আ-পরিতোষ চা-কেক্-স্যাণ্ডউইচাদি ভোজন করাইতে
লাগিলেন। মুসলমান বাবুর্চ্চি ও যুবক খানসামা সাদা ধবধবে পায়জামাচাপকান ও মনোগ্রাম
যুক্ত পাগড়ীতে মণ্ডিত হইয়া টেবিলে খাদ্যাদি পরিবেশন করিয়া দিত। অনেক সময়ে নিমন্ত্রিতেরাও
আবার খাস্তগীরদের নিমন্ত্রণ করিয়া আপ্যায়িত করিতে লাগিল। কখনও কখনও ডিনারের
নিমন্ত্রণে নাচের ব্যবস্থাও থাকিত। প্রথম প্রথম খাস্তগীরেরা কোনও না কোনও অজুহাতে
সকাল সকাল ছুটী লইয়া আসিতেন। কিন্তু ভবানন্দের মন ইহাতে পরিতৃপ্ত হইত না। কাজেই
তিনি সাহেবিয়ানার এই শেষ বাধাটুকু নির্ম্মূল করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। প্রাট্ কোম্পানী
হইতে মাসিক ৩৲ ভাড়ায় এক পুরাতন পিয়ানো আনিয়া উভয়ে নাচ শিখিতে আরম্ভ করিয়া
দিলেন। শিখাইবার এক ওস্তাদও জুটিল—সে রেসিনার সেণ্ট মেরী গির্জ্জার গায়ক। তাহার
গানে উপাসনা-নিরত খৃষ্টানগণের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিত। কিন্তু দিল্লীর মত স্থানে এবং অল্প খরচে
ইহা অপেক্ষা ভাল শিক্ষক মেলা দুর্ঘট। বিশেষ গীতবাদ্য বিষয়ে মিনির কিঞ্চিৎ অধিকার
থাকিলেও, ভবানন্দ ছিলেন একেবারে নীরেট। সুতরাং খাস্তগীর পরিবারে অল্প দিনেই মিষ্টার
পেরির যথেষ্ট প্রতিপত্তি হইল।

মিষ্টার পেরীর সঙ্গীত-বিদ্যা সম্বন্ধে পারদর্শিতা যেমনই হউক, তাহার দ্বারা মিসেস্
খাস্তগীরের একটি মহৎ উপকার হইল। পেরীর বয়স পঞ্চাশের কোঠায়; কিন্তু মার্জরীর রূপ
ও গুণের প্রভাবে সে এত আকৃষ্ট হইয়া পড়িল যে, পিয়ানো ও নৃত্য শিখাইবার ব্যপদেশে সে
প্রায়ই খাস্তগীর ভবনে বিরাজ করিত। তাহার প্রথম ফল হইল এই যে বিলাতী সংস্কারগুলি
ইহাদের আরও মজ্জাগত হইয়া পড়িল। আর একটি ফল হইল যে, পেরীর গতিবিধি যে
পরিমাণে বাড়িয়া গেল, অপর বন্ধুগণের লোলুপ দৃষ্টি সেই পরিমাণে সংযত হইতে বাধ্য হইল।
পেরী মিসেস্ খাস্তগীরের অভিভাবক স্বরূপ হইল এবং পেরীর সঙ্গেও মার্জরীর সম্বন্ধ অনেকটা স্নেহ
সৌহার্দ্দের সম্পর্ক হইয়া দাঁড়াইল।

খাস্তগীর সাহেব আফিসে কাজ করেন, সাহেব উপরওয়ালার খোসমেজাজের জন্য প্রাণান্তিক
চেষ্টা করেন এবং দেশীয় অফিসারগণের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিহার করেন। মার্জরীকে বিবি
বোম্বাইয়া সাহেবমেম মহলে বাহির করাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। ইহাতে মার্জরীরও যে
উৎসাহ ছিল না, তাহা নহে। সে মেমের স্কুলে পড়িয়া, মেমদের সঙ্গে বেড়াইয়া মনে মনে মেম

হইয়া উঠিয়াছিল বাল্যকালেই। স্বামীর সঙ্গে পড়িয়া তাহাই ঘসিয়া মাজিয়া বিলাতী উপযুক্ত করিয়া লওয়া তাহার পক্ষে কঠিন হইল না। যে সকল সাহেব তাহার প্রতি হইয়া ধাবিত হইত, তাহাদের প্রেম-নিবেদন যে তাহাকে স্পর্শ করিত না, তাহার কারণ হইলেও ব্রাহ্মণকন্যা। তাহার হিন্দুয়ানির তটভূমি নূতন ভাবের ঢেউয়ে ঢেউয়ে ধসি পড়িতেছিল। কিন্তু তুলসীতলার সন্ধ্যা-প্রদীপের মত সাবিত্রীর আদর্শটুকু সে সমস্ত নিবিড় আচ্ছাদন দিয়া রক্ষা করিতেছিল। সেখানে তাহার স্বামীর অধিকারও মস্তক নত সম্ভাবনা আছে, তাহা হইলে সে আর কিছুতেই যাইতে চাহিতনা—স্বামীর নিতান্ত অনুরোধে তার এই মেমসাহেবী বেশ-বিন্যাসের মধ্য দিয়া একটুখানি কুসংস্কার যে কেমন করিয়া তুলিয়া সব ওলট্‌পালট্ করিয়া দিত, তাহা ভবানন্দ কিছুতেই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিত না।

একদিন সে বড় ফাপরে পড়িল। ভবানন্দের চাকরীর একবৎসর পূর্ণ হইয়া তিনশত হইতে একেবারে তাহার মাহিনা আটশত হইয়াছে। এখন আর সে শুধু রিপোর্টার সে একটা অফিসের কর্ত্তা। ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধে সে গবর্ণমেণ্টের পরামর্শদাতার পদ পাই অনেক বড় বড় সাহেবের বাড়ী হইতে তাহার নিমন্ত্রণ আসিতেছে। একদিন সেইরূপ এব আসিয়াছে লাটপ্রাসাদ হইতে। ভবানন্দ পাড়ার এক সাহেবের সহিত স্থির করিয়া আসি তাহারা সন্ধ্যায় সেই সাহেবের সঙ্গে তাহারই মোটরে যাইবে।

ভবানন্দ যখন সেই বন্দোবস্ত করিয়া ফিরিল, তখন মার্জরী দীর্ঘ দর্পণের সম্মুখে পোষাক পরিতেছিল। সান্ধ্য পোষাকে শরীরের অধিকাংশই অনাবৃত থাকে। মার্জরীর দেহে বিদ্যুতালোক পড়িয়া যেন ঠিকরাইয়া যাইতেছিল। ঘন কৃষ্ণ কেশগুচ্ছের উপ ছোট মোতির মালা দর্পণের মধ্যে যেন হাসিয়া উঠিতেছিল। তাহার সে রূপের মোহে আচ্ছন্ন হইতেছিল। এমন সময়ে ভবানন্দ সে ঘরে প্রবেশ করিল। তখন মার্জরী গোড়ালীবিশিষ্ট জুতা পরিয়া নৃত্যভঙ্গী করিতে করিতে বেশ-বিন্যাস করিতেছিল। আয়নার দিকে চাহিয়াও কিছুই লক্ষ্য করিল না। সে কেবল সেই মোটরের সংবাদ জানা বলিল, "আর আধ ঘণ্টার মধ্যে যেতে হবে।" মার্জরী তাহার শুভ্র দশন পংক্তির মধ্যে অধরটি চাপিয়া আয়নায় ভবানন্দের মুখখানি দেখিতে লাগিল। দেখিল, সে মুখে ভাবান্তর নাই; একটুও আনন্দের ছায়া তাহাতে পড়িল না। মনে করিল, স্বামী বুঝি আছেন; তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিবার অভিপ্রায়ে বলিল, "মোতির মালাটা কি তুলে দেবো?"

"ওঃ মোতির মালা?—তা দিলে হয়।"

"দেখ ত, আমার জামার পিঠের বোতাম দুটো বুঝি দেওয়া হয় নি!"

বানন্দ কাছে আসিল; খোলা বোতামের খোঁজ করিতে স্ত্রীর অনাবৃত পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ র্জরী আয়নার দিকে অতি নিবিষ্টভাবে চাহিয়া রহিল, একটুও পুলক শিহরণ যদি ভবানন্দের দেখিতে পায়! কিছুই সে দেখিতে পাইল না। তখন সে গ্রীবা বাঁকাইয়া ভবানন্দের তি নিকটে মুখখানি ফিরাইয়া জিজ্ঞাসিল:—

দেখ্‌তে পাওনি? আর একটু নীচে।"

ভবানন্দ সেই বোতামের অনুসন্ধানেই ব্যাপৃত হইল, একখানি মুখ যে ব্যাকুল অন্বেষণে জায়ই দিকে প্রসারিত হইয়াছিল, তাহার খোঁজ সে রাখিল না।

বোতাম লাগাইয়া ভবানন্দ বলিল, "মিষ্টার মার্টিন এখনই মোটর নিয়ে এসে পড়বেন। আমি প্রস্তুত হয়ে নিগে।"

মার্জরী বলিল "মার্টিন না হয়ে আর কারু সঙ্গে গেলে হ'ত না?"

"কেন, মার্টিন কি দোষ করলে? সে একদিন হয়ত কমার্স সেক্রেটারী হবে।"

এবারে মার্জরী একটু বিরক্ত হইল। সে বলিল "তাতে কিছু আসবে যাবে না। তবে আমি তার সঙ্গে ভিতরে বস্‌তে পারবো না বাপু।"

"কেন? তুমি না বস্‌লে কে বস্‌বে?"

"দেখ, ওর উচিত, আমাদের ভিতরে বস্‌তে দিয়ে নিজের বাইরে বসা! কিন্তু তা না করে' তোমায় যে বাইরে বসায়, এটা কোনও ভদ্রতা-সম্মত নয়।"

"তা হ'লই বা! ওসব ছোট্টখাট্টো ব্যাপার নিয়ে মাথাঘামানো মেয়ে লোকেরই সাজে। কি আশ্চর্য্য!"

"ঠিক কথা! মেয়ে লোক বলেই মাথা ঘামাতে হয়। মেয়ে লোক অমনভাবে একজন পুরুষ মানুষের পাশে বসে যেতে পারে না। বিশেষ সে যদি তোমার মত মেয়ে লোকের রূপ যৌবন সম্বন্ধে উদাসীন না হয়।"

"এ সব খেয়াল আবার তোমার মাথায় কে ঢুকিয়ে দিলে, বল ত? বাঃ—একজন বড় দরের সাহেবের সঙ্গে এক গাড়ীতে বসে যাবে, এটা ত মস্ত সৌভাগ্যের কথা। ক'জন বাঙ্গালী মেয়ে এ গৌরব করতে পারে, ভেবে দেখ দেখি!"

"বেচারী বাঙ্গালী বামুনের মেয়ের পক্ষে বড় দরের সাহেবের অঙ্গ-স্পর্শ কি এতই দামী জিনিষ! মেমদের অঙ্গস্পর্শ লাভ করতে পারলে তোমাদের পুরুষদেরও মনে বুঝি এমনি গৌরব বোধ হয়?"

"তুমি কি বল্‌ছ, তা আমি ভাল বুঝতে পারছি নে। এতদিন এত উচ্চশিক্ষা লাভ করে' দেখ্‌ছি তুমি এখনও জাতবুলি ছাড়্‌তে পারনি। এত করে'ও, যে সব বাঙ্গালীমেয়েরা ঘরের কোণে পচে মরে, দেখ্‌ছি তুমি তাদেরই একজন। যে তিমিরে, সে তিমিরে।"

"যে সব বাঙ্গালী মেয়েরা ঘরের কোণে পচে মরে এবং স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষের করে' কৃতার্থ হয় না, তাদের পায়ের ধূলো নেবার যোগ্যতাও আমাদের নেই।"

"এসব বাজে কথা শোনবার সময় নেই।" এই বলিয়া ভবানন্দ প্রস্থানোদ্যত মার্জরী চুলের কাঁটা অধরোষ্ঠে চাপিয়া আয়নায় খোঁপা ঠিক করিতেছিল। কাঁটাটি লইয়া বলিল!

"তোমার সময় না থাকতে পারে। আমি কিন্তু বলে রাখ্‌ছি তোমার মার্টিন-সায়েব সঙ্গে আমি গাড়ীর ভিতর বস্‌তে পারবো না।"

"কি আপদ! তা হলে' যে তাকে বড্ড অপমান করা হবে।"

"কেন? তুমি তোমার স্ত্রীর সঙ্গে বস্‌লে, তার অপমান হতে যাবে কিসে?"

"সে তুমি বুঝ্‌তে পারবে না! সে ত ভদ্রতার খাতিরে আমাকে ও তোমাকে গাড়ীর ভিতর দিয়ে নিজে শোফেয়ারের পাশে বস্‌তে চাইবে। কিন্তু আমারও ত উচিত তার মর্য্যাদা রক্ষা করা। আমার ভদ্রতা হচ্চে যে তোমাকে তার সঙ্গে দিয়ে, আমার বাইরে বসা।"

"তা হতে পারে! কিন্তু মার্টিন ত ভদ্র না হলেও পারে।"

"এ কথা তোমায় কে বল্‌লে? ঐ পেরী বুঝি তোমাকে বলেছে? পেরীর জন্যে ত দেখি কারও সঙ্গেই সদ্ভাব রক্ষা করা চল্‌বে না! রাজ্যের খবর ঐ ব্যাটার কাছে। ওকে না তাড়াতে পারলে কিছু সুবিধে হবে না দেখ্‌ছি।"

"সে যা হয় করোগে তুমি। আমি কিন্তু বল্‌ছি যে মার্টিনের মত বদ্‌লোকের সঙ্গে অন্তত এক গাড়ীতে পাশাপাশি বসে' যেতে আমি পারবো না,—পারবো না,—পারবো না।"

সেদিন সহস্র ইচ্ছা সত্ত্বেও ভবানন্দ মার্টিনের সঙ্গে সৌজন্য রক্ষা করিয়া উঠিতে পারিল। খাস্তগীর যুগল সেদিন অত্যন্ত বিরসবদনে গাড়ীর ভিতরে অন্ধকারে বসিয়া রহিল। একটিবার পরস্পরের অঙ্গস্পর্শ ঘটিল না। মার্টিনও কথা কহিল না। ফলে এই হইল যে, রাত্রি ১১ যখন লাটভবনে নৃত্যগীত শেষ হইল, তখন মার্টিনকে কোথাও খুঁজিয়া না পাইয়া ভবানন্দ মাঘ মাসের নিশীথেও গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া উঠিল। তাহাকে নিতান্ত নিরুপায় দেখিয়া মার্জরী বলিল, "ভয় নেই! মার্টিনের দয়ার অভাবে আমরা একেবারে মরে যাব না। বাইরে সেখানে আমাদের জন্য ট্যাক্‌সি অপেক্ষা করছে।"

ভবানন্দ একটু আশ্বস্ত হইল বটে; কিন্তু ট্যাক্‌সির যাতায়াতের ভাড়া বহন করিতেই এই জন্য বিরক্ত হইয়া উঠিল।

"ফোণ করে আনিয়েছ, বুঝি? কত লাগবে, একবার দেখে নিয়ো এখন!"

(৪)

মার্জরী একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "যতই লাগুক, তবুও সস্তা।"

সুদীর্ঘ তিনটি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। মার্জরীর রূপের ছটা আরও বাড়িয়া গিয়াছে। উন, গোলাপী ব্লাউজ, ও খড়ের নামানো টুপী পরিয়া এক হস্তে নু রঙের ছাতা ও রূপার রুমালের ব্যাগ লইয়া সে যখন বেড়াইতে বাহির হয়, তখন কেহ তাহার দিকে একবার নজর না দিয়া যাইতে পারে না। শিমলায় তাহারা বৎসরে একবার করিয়া গিয়া কয়েক মাস বাস করিত; তখন সে খাকী রঙের টাইট্ জ্যাকেট পরিয়া, পায়ে চর্ম্মের গেটার আঁটিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া মাঝে মাঝে বাহির হইত; আর রাস্তার লোক অনিমেষ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিত। খাস্তগীর সাহেবও তাহার পাশে ঘোড়ায় থাকিতেন। শ্বেতাঙ্গ পুরুষদের প্রশংসমান দৃষ্টিতে তিনি আপনাকে অতি সৌভাগ্যবান বলিয়া গণনা করিতেন।

এখন খাস্তগীরকে না চেনে, শিমলা বা দিল্লীতে এরূপ লোকের সংখ্যা শ্বেতাঙ্গ অথবা দেশীয় সমাজে বড় বেশী ছিল না। তিন বৎসরে তাঁহার আশাতীত পদোন্নতি হইয়াছে। এখন তিনি দু হাজার টাকা বেতনের অফিসার। গবর্মেণ্টের রাজস্ব বিভাগ তাঁহার পরামর্শ লইয়া সমস্ত আর্থিক সমস্যার সমাধান করে। শিমলায় ম্যালের কেন্দ্রভাগে, খাস্তগীরের নাম উজ্জ্বল অক্ষরে কাষ্ঠ ফলকে উৎকীর্ণ রহিয়াছে। তাঁহার অফিসের মেজেয় সুচিক্কণ কার্পেট আস্তৃত। সমস্ত আসবাবের মধ্যে তাঁহার উচ্চপদের গরিমা মুদ্রিত রহিয়াছে। জানালার দিকে একখানি ছোট টেবিলের উপর একটি টাইপরাইটারে, একজন ইংরেজ যুবতী বসিয়া শুভ্র ফুলস্ক্যাপে চিঠিপত্র সকল নকল করিতেছে। লাল উর্দিপরা চাপরাশীর দল সেগুলি লইয়া ঘরে ঘরে বিলি করিয়া ছুটিতেছে। মিষ্টার খাস্তগীর দিনের মধ্যে শতবার মিস্ প্যাজেট্‌কে ডাকিয়া নিজের সম্মুখে বসাইতেছেন। তিনি চিঠির মুশাবিদা মুখে মুখে বলিয়া যাইতেছেন আর মিস্ প্যাজেট্ তাহা রেখাক্ষরে টুকিয়া লইতেছেন। কখনও কখনও সাহেব যে হাঁ করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকেন, এবং মুশাবিদার সূত্র হারাইয়া ফেলেন সেটা তাঁহার চিন্তাশীলতার পরিচয় বলিয়াই মেম সাহেব মনে করেন। কিন্তু স্বভাবচতুরা স্ত্রীজাতির কাছে লুকোচুরি বেশী দিন চলে না। খাস্তগীর সাহেবের চিন্তার সূত্রে যে অনেক সময়ে জড়াবটী বাঁধিয়া যায়, তাহা যে সেই কুন্দেন্দুতুষারধবলা বরাঙ্গিনীর হসিতাননের প্রভাবে, একথা বুঝিতে তাহার বড় অধিক সময় লাগিল না।

খাস্তগীর সাহেব তাঁহার পদোচিত গাম্ভীর্য্য এবং মিস্ প্যাজেটের প্রণয়াকাঙ্ক্ষার মধ্যে প্রচণ্ড ভাবে দোল খাইতে লাগিলেন। ভাবিতেন "একদিন খোলসা করিয়া মিস্ প্যাজেটকে সব বলিব না কি?" আবার ভাবিতেন "শেষটা যদি 'উল্‌টা বুঝিলি রাম' হইয়া যায়।" এই মনে করিয়া তিনি ধৈর্য্য ধারণ করিতেন। তবে মধ্যাহ্নে একত্র চা-পান ও অফিসের ফেরত কিয়দ্দূর মেম-সাহেবকে পৌঁছাইয়া দিয়া যতদূর আনন্দ উপভোগ করা যায়, তাহা খাস্তগীর সাহেব পূরামাত্রায় আদায় করিয়া লইবার জন্য সতত সচেষ্ট ছিলেন।

সিমলায় অনেকে খাস্তগীরের সম্বন্ধে প্রকাশ্যেও ঈর্ষা করিতে ছাড়িতেন না। তিনি যে

সদরে ও অন্দরে সর্ব্বত্র সমান ভাগ্যবান একথা সকলেই স্বীকার করিতেন। সুতরাং তাঁহা
প্রতিপত্তি হু হু করিয়া বাড়িয়া চলিল। কিন্তু মনে তাঁহার শান্তি ছিল না। এদিকে তাঁহার
বন্ধুবান্ধব কারণে অ-কারণে তাঁহার কামরায় আসিয়া সময় অপহরণ করিতে লাগিলেন।
গৃহে মার্জরীও নানা প্রকার বিদ্রূপবাণে তাঁহাকে বিব্রত করিতে ছাড়িত না।
কিছুতেই বুঝিতে পারিলেন না, তিনি মিস্ প্যাজেটের একটু পক্ষপাতী হইলে মার্জরী কেন
ঈর্ষায় জ্বলিয়া যাইবে। তাঁহার মতে স্ত্রী ও পুরুষের স্বাধীনতা থাকা সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ
পক্ষে একান্ত আবশ্যক এবং তিনি বিলাত না গিয়াও বিলাতী সমাজ সম্বন্ধে যতদূর জানেন,
সে সমাজে ঐ প্রকার স্বাধীনতা আছে নিশ্চয়। তিনি মিস্ প্যাজেটের সঙ্গে মাস কয়েক
বিলাত প্রবাস করিবেন এমনই একটা কল্পনা মনে মনে রচনা করিতেছিলেন। একদিন
ফেলিলেন :—

"মিস্ প্যাজেট, আমি বোধ হয় এবার গ্রীষ্মে বিলাত যা'ব। আমার এখানকার
তেমন সহ্য হয় না। তোমাদের ত আরও অসহ্য হ'বার কথা।"

মিস্ প্যাজেট্ একটু গ্রীবা বাঁকাইয়া, পেন্সিলটা তাহার চম্পকাঙ্গুলির মধ্যে
বলিল :—"আমার খুব গরম লাগে না এখানে। তবে বিলেত যেতে আমার খুব ভাল লাগে।"

সঙ্গে সঙ্গে একটি ছোট দীর্ঘশ্বাসও ফেলিল।

খাস্তগীর বলিলেন :—"তোমার বাড়ী যেতে নিশ্চয়ই খুব আগ্রহ আছে।"

খাস্তগীরের বিশ্বাস ছিল যে মিস্ প্যাজেট্ সদ্য বিলাত হইতে আসিয়াছে। এইরূপ
কথা মেম সাহেব নিজেই প্রচার করিয়াছিল তাহা মনে পড়িল। সে তাড়াতাড়ি
করিয়া বলিল :—

"হাঁ! বিলাতের সম্বন্ধ আমার একরূপ ফুরিয়েছে। এখন বিলেতে যাওয়া
মরীচিকা মাত্র।"

খাস্তগীর উৎসাহের সহিত বলিল "কেন? যদি এমন কোনও সঙ্গী পাওয়া যায় যে
কিছুরই জন্য ভাব্‌তে না হয়; কেবল জাহাজে উঠে বসা মাত্র প্রয়োজন হবে!"

উত্তরের জন্য তাঁহার যে উৎকণ্ঠা তাহা প্রচ্ছন্ন রহিল না। মিস্ প্যাজেট্ জানালার
কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। তার পর কণ্ঠ ঈষৎ কাঁপাইয়া বলিল :—

"অশেষ ধন্যবাদ, মিষ্টার খাস্তগীর। আপনার সঙ্গে বিলেত যেতে পারবার মো
আমার হবে! আপনার দয়া আমি জীবনে ভুল্‌তে পারব না। ভারতীয় লোকদের মধ্যে
মত দয়ালু যে থাক্‌তে পারে, এ আমি জানতাম না।"

এই সকল উচ্চ প্রশংসায় খাস্তগীর সাহেব পুলকে কণ্টকিত হইয়া উঠিলেন
উল্লেখ করিতে গিয়া শ্রীমতীর অশ্রু উথলিয়া উঠিল। ভবানন্দ চেয়ার হইতে লাফাইয়া

সাহেবের চোখে জল! এরূপ ঘটনাও প্রত্যক্ষ করিবার সৌভাগ্য হইল!—তিনি দ্রুতগতিতে
চেয়ারের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন। যদি হঠাৎ মূর্চ্ছা হয় কি কিছু হয়, তবে সযত্নে
টেনে তাহাকে সামাল করিবেন, সেই মহেন্দ্র মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষায় তিনি চেয়ারের পশ্চাৎভাগ-
অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিন্তু হতভাগা চাপরাশীরাও ঠিক সেই মূল্যবান
কয়েকের মধ্যে কেন যে পুনঃ পুনঃ ঘরে ঢুকিয়া ফাইল দিয়া ও নিয়া যাইতে লাগিল,
তাহা তিনি স্থির করিতে পারিলেন না। পূর্ব্বজন্মের পুঞ্জীভূত পাপরাশির মত ফাইলগুলি টেবিলের
উপর জমিতে লাগিল। ফলে তাঁহার আশাকুসুমকলিকা চাপরাশীদিগের অনবরত প্রবেশ ও
প্রস্থান ঘটিত ঝঞ্ঝাবাতে ঝরিয়া খসিয়া পড়িল। কিন্তু তিনি যে কয়েক মুহূর্ত্ত চেয়ারের পিছনে
দাঁড়াইয়া ছিলেন, সে সময়টাও নিতান্ত ব্যর্থ হয় নাই। তিনি তদবস্থায় জাগ্রত স্বপ্ন দেখিতেছিলেন,
মিস্ প্যাজেট যেন কাঁদিতে কাঁদিতে আত্মহারা হইয়া তাঁহার স্কন্ধে ঢলিয়া পড়িয়াছে আর তিনি
ঘন ঘন চুম্বনের দ্বারা তাহার অশ্রু বিন্দু সকল শুষিয়া লইতেছেন। বস্তুতঃ তাহার চন্দ্রকিরণ-
সন্নিভ কচকলাপ হইতে কেতকী ও জেসমিনের মিশ্রিত সুগন্ধ খাস্তগীর সাহেব শ্বাসে শ্বাসে অনুভব
করিতেছিলেন।

ইহার পরে আর তাঁহার সন্দেহ রহিল না যে মিস্ প্যাজেট্ তাঁহার প্রতি অতি সুপ্রসন্না।
সেদিন চারিটা না বাজিতেই যখন মিসেস্ খাস্তগীর ঘোড়ার পৃষ্ঠে জিন্ কষিয়া আফিসে আসিয়া
পৌঁছিলেন তখন সাহেব নিতান্ত অনিচ্ছাক্রমে দেরাজের চাবি চাপরাশীর গায়ে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া
স্ত্রীর অনুবর্ত্তন করিলেন বটে; কিন্তু তাঁহার মন-ভ্রমর সেই টাইপিষ্ট ললনার টেবিলখানি
ঘেরিয়া গুঞ্জন করিতে লাগিল।

পরদিন আফিস হইতে ফিরিয়া হ্যামিল্টন কোম্পানীর নিকট হইতে মিস্ প্যাজেট্ একটি
সুদৃশ্য মখমলের কেসের মধ্যে একছড়া মুক্তার মালা পাইল। বুঝিল, কোথা হইতে এই মূল্যবান
উপহার! এই প্রথম প্রণয়োপহার পাঠাইয়া খাস্তগীর সঙ্গে সঙ্গে একবিন্দু প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন
করিলেন; কিন্তু তাহা কেহ দেখিল না। ক্রমশঃ এই প্রেম নাটিকার প্লট্‌টি জমাট বাঁধিয়া আসিল।

খাস্তগীর দম্পতীর সাজসজ্জাবহুল ঘরকন্নার মধ্যে এতদিন প্রণয় জিনিষটি নিতান্ত অনাবশ্যক
বিলাসিতার মধ্যে গণিত হইলেও আজকাল একটু ভাবান্তর ঘটিয়াছে। খাস্তগীর সাহেবের পোষাক
পরিচ্ছদের চটক্ যেমন দিন দিন বাড়িয়া যাইতে লাগিল, তেমনি স্ত্রীর প্রতিও টানটা হঠাৎ কিছু
অতিমাত্রায় দেখা দিল।

একদিন সান্ধ্য ভ্রমণে বাহির হইবার সময় খাস্তগীর দেখিলেন মার্জরীও সজ্জিত হইয়া
আসিল। তখন সাহেবের দৃষ্টি ঘন ঘন ঘড়ির দিকে চালিত হইতেছে, মনের গোপন কোণে একটি
আনন্দের ফোয়ারা খেলিতেছে, সুচিক্কণ কোটের বোতামে অর্কিডের গুচ্ছ দুলিতেছে,—মার্জরী
সংশয়াকুল মনে বারান্দার এক পাশে আসিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল। অন্য সময় হইলে খাস্তগীর

জরুরী কাজের দোহাই দিয়া অল্প কথায় বিদায় লইতেন। কিন্তু আজ তিনি বড়ই খোস
বাহিরে যাইতেছেন। সুতরাং মার্জরীর অতি নিকটে আসিয়া এক হস্তে ছড়িগাছটি ও
করিয়া ধরিয়া, শরীর একদিকে অনেকটা হেলাইয়া, যে হাত মুক্ত ছিল সেই হাতে তাহার
বেষ্টন করিয়া তাহাকে চুম্বন করিয়া ফেলিলেন। শার্ট পাছে একটুও কুঞ্চিত হয়,
আলিঙ্গনটি অর্দ্ধপথে থমকিয়া গেল।

"আজ আমাকে একলাই যেতে হচ্চে, ডিয়ার।"

মার্জরী ইহার জন্য প্রস্তুত ছিল। সে একটুও না কুণ্ঠিত হইয়া বলিল :—

"আমাকেও যে বেরুতে হবে, ডার্লিং। তুমি কোন্ দিকে যাবে?"

খাস্তগীর বলিলেন :—"আমি এই ইয়ে—বার্ণস্ কোটের দিকে যাচ্ছি। তুমিও কি
দিকে যাবে?" এই বলিয়া তিনি হাত ঘড়ির দিকে অতি মনোযোগের সহিত দৃষ্টিপাত করিলে

মার্জরী শুধু বলিল :—"না।"

খাস্তগীর ধাঁ করিয়া তাহার গালে একটি ছোট টিপ দিয়া বাহির হইয়া গেলেন। ম
মনে করিল, মন্দের ভালো। এ প্রকার আদর সম্ভাষণ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কেণ্টাকী গ্রোভে
একটা দেখা যায় নাই।

খাস্তগীর সবেগে ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে এবং মনের উল্লাসে বে-সুরো শিস্ দিতে
ফটকের বাহির হইয়া গেলেন। মার্জরী অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া ভাবিল।

মার্জরী সত্যই বার্ণস্ কোর্টের বিপরীত দিকে চলিল। তাহার পা আর চলে না।
চাকায় তাহার মন ক্রমাগত ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছিল। একদিকে স্বামীর প্রণয়
অন্যদিকে ঘনায়মান সন্দেহ—বেচারী কোনও কূল কিনারা করিতে পারিতেছিল না।
সম্প্রতি শিমলায় আসিয়াছে। আজ এই বিপদের দিনে পেরীর নিকটে তাহার নিয়ে
পরামর্শের জন্য ধাবিত হইল। পেরী প্রস্পেক্ট পাহাড়ের নীচে একটি বাড়ীতে আসিয়া
—মার্জরী সে বাড়ী চিনিত। সে কার্ট রোড ধরিয়া অনেকটা পথ ঘুরিয়া সেখানে উপস্থিত
একটা বাড়ীর দোতলায় পেরী থাকে। দরজায় আঘাত করিতেই পেরী ভিতর হইতে "এ
সাড়া দিল। মার্জরী তবুও বাহিরেই দাঁড়াইয়া রহিল। পেরী অবিবাহিত। একেবারে
ঘরের ভিতর যাইতে তাহার সংকোচ বোধ হইতেছিল। অবিবাহিত লোকের বাড়ীতে
ভদ্রমহিলার এমনভাবে আসাই অন্যায়; নিতান্ত প্রাণের দায়েই সে আজ আসিয়াছে।
ঢুকিতে তাহার পা আর চলিল না। পেরী কিছুক্ষণ পরে বাহিরে আসিয়া আশ্চর্য্যান্বিত
বলিল "ওঃ তুমি।" পেরীও বিব্রত হইল; সে মার্জরীকে সত্য সত্যই ভালবাসিত
অসহায় অবস্থা সে বুঝিল। স্নেহের সহিত তাহার কর নিপীড়ন করিয়া সে বারান্দার
কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন প্রস্পেক্ট পাহাড়ের অপর পারে রবি ডুবিয়াছে, কিন্তু

এখনও আলোর ঘটা করিয়া রহিয়াছে। রেলিংএ ভর দিয়া, বাষ্পাকুল নয়নে মার্জরী
বলিষ্ঠ অথচ স্নেহ-কোমল বন্ধুর নিকট সকল কথা ব্যক্ত করিল। পেরী
গিল।

পেরী যে বাড়ীতে বাস করে তাহার নিম্নের তলায় কে থাকে, তাহা মার্জরী জানিত না।
তলার প্রবেশ পথ স্বতন্ত্র, সুতরাং পেরীও সে সম্বন্ধে কোনও খবর রাখিত কি না, সন্দেহ।
জন মহিলা নীচের তলা অধিকার করিয়া আছে, এই পর্য্যন্তই সে জানিত। দোতলার নীচের
একটুখানি ফাঁকা যায়গা; তাহাতে গোটা কতক ফুলের টব সাজানো আছে। তাহারা উভয়ে সেই
দিকেই চাহিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। হঠাৎ তাহারা চমকিয়া উঠিল। দেখিল, একজন ইংরেজ
মহিলার সহিত খাস্তগীর সেই ফুলবাগানে আসিয়া দাঁড়াইল। মার্জরী রেলিংএর থেকে দূরে সরিয়া
দাঁড়াইল। খাস্তগীর উপরের দিকে চাহিলেই সে মার্জরী ও পেরীকে দেখিতে পাইত। সন্ধ্যার
অন্ধকার তখন ঘনাইয়া আসিয়াছে। মার্জরী দেখিল মিস্ প্যাজেটের নিকট বিদায় লইয়া খাস্তগীর
চলিয়া গেল। মিস্ প্যাজেট তাহার ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। ভাবিল, এও মন্দের ভালো।

আর অপেক্ষা না করিয়া সে পেরীর নিকট বিদায় লইল। পেরীও কোট ও টুপী লইয়া
মিস্ প্যাজেটের সঙ্গে আলাপ করিতে গেল।

খাস্তগীর ক্রমেই মিস্ প্যাজেটের সঙ্গ-লাভের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। মিস্ প্যাজেট্
যে তাঁহাকে সেরূপ ভাবে চাহে, এমনটা তাহার ভাবভঙ্গীতে প্রকাশ পায় না। খাস্তগীর নূতন
নূতন উপহারে তাহাকে পূজা করিতে লাগিলেন। নিভৃতে তাহাকে পাইবার জন্য উন্মত্ত হইয়া
উঠিলেন। অবশেষে তিনি ম্যালের উপর একটি ছোট হোটেল আবিষ্কার করিয়া তাহাকে সেখানে
ডিনারের নিমন্ত্রণ করিয়া বসিলেন। ডিনারের পর, বায়োস্কোপে গিয়া উভয়ে কাছাকাছি বসিয়া
সেই আধ আলো আধ আঁধারে যতদূর সম্ভব তাঁহার প্রেম নিবেদন করিবেন, স্থির করিলেন।

পেরী সপ্তাহের জন্য শিমলায় আসিয়াছিল। মার্জরীর জন্য বাধ্য হইয়া তাহাকে আরও
সপ্তাহ থাকিয়া যাইতে হইল। প্রতিদিন সে কেণ্টাকী গ্রোভে আসে এবং সহানুভূতির দ্বারা
মার্জরীর মনের দুঃখ লাঘব করিয়া দিবার চেষ্টা করে।

যেদিন মিস্ প্যাজেট্‌কে খাস্তগীর নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, সে দিন তিনি অফিস হইতে সন্ধ্যার
কিছু পূর্ব্বে বাড়ীতে আসিয়া দেখিলেন, পেরী পিয়ানো বাজাইতেছে, আর মার্জরী দেশী শাড়ী ও
সেমিজ পরিয়া হাত নাচাইয়া বাইজির ঢঙ্গে নৃত্য অভ্যাস করিতেছে। খাস্তগীর তাহা দেখিয়া হাসিয়া
আকুল হইলেন। সাহেব বাজাইতেছে পিয়ানোয় ইংরাজি গৎ, আর নিখুঁত মেম সাহেব মার্জরী শাড়ী
পরিয়া তাহার সঙ্গে নাচিতেছে ও গাহিতেছে বিলাতী গান। তিনি কৌতুক দেখিতে লাগিলেন।

হঠাৎ মার্জরীর তাল ভঙ্গ হইল। পিয়ানো বেসুরো হইয়া গেল। পেরী মাথা চুলকাইতে
লাগিল। খাস্তগীর তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল :—

"ওঃ কি চমৎকার। এবার যখন ডিনার দেবো, তখন তোমাকেও নিম
হবে পেরী। এই পরীর নাচ, সাহেবদের দেখাতে হবে। ওঃ কি মজাই হবে।"

মার্জরীর মুখখানি একটু মলিন হইল। সে বলিল:—"উঃ পরী ত কত?
কোথায়ও থাকে তবে মেম সাহেবদের মধ্যেই আছে, কি বল পেরী?"

খাস্তগীর দৃঢ়তার সহিত বলিল,—"এ কথা আমি স্বীকার করি না। একথা আ
স্বীকার করব না। আমাদের জাতের মধ্যেও সুন্দরী আছে এবং সেরূপ একজ
করবার সৌভাগ্য আমার ঘটেছে, কি বল পেরী?"

পেরী উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল না, সে কেবল বলিল: "এই দেশী পোষাক আপনা
বেশ মানায় দেখেছেন, মিষ্টার খাস্তগীর। এমনটি আমাদের পোষাকে কখনও মানায় কি?"

সে কথার জবাব না দিয়া, খাস্তগীর ঊর্দ্ধশ্বাসে সে ঘর হইতে ছুটিয়া গেলেন।
যে অভিসারে বিলম্ব হইয়া যাইতেছে। মার্জরী মলিন মুখেও একটু হাসিল।

(৫)

সে দিন বায়োস্কোপে বড় ভিড় হইয়াছিল। রাত্রি ৯৷৷০ টার সময় খাস্তগীর
থিয়েটারে মিস্ প্যাজেটকে লইয়া প্রবেশ করিলেন। দ্বিতলে ড্রেস সারকেলে আগে হইতে এ
বক্স্ নির্দ্দিষ্ট ছিল। তাঁহারা ওভারকোট চেয়ারের পশ্চাতে রাখিয়া উভয়ে পাশা
উপবেশন করিলেন। একখানি ব্যঙ্গ নাটিকার রঙ্গচিত্র প্রদর্শিত হইতেছিল। নূতন কো
শিমলায় গিয়া গেইটি রঙ্গমঞ্চে এই নূতন অভিনয় দেখাইতেছে। সেই জন্যই এত ভিড় হইয়া
কোথায়ও আর স্থান খালি নাই।

খাস্তগীরের মন অভিনয়ের দিকে ছিল না। কিন্তু মিস্ প্যাজেট্ একান্ত অভিনিবেশ সহ
প্লে দেখিতেছেন। আর মাঝে মাঝে অস্ফুটস্বরে বাহবা দিতেছেন। সুতরাং খাস্তগীর তাঁ
মনের কথা ব্যক্ত করিবার অবসর পাইতেছিলেন না। মাঝে মাঝে তাঁহার কম্পিত কর
প্যাজেটের হস্তের অনুসন্ধান করিতেছিল।

একবার হঠাৎ বায়োস্কোপের আলো নিভিয়া গেল এবং প্রায় তিন মিনিটের পূর্বে
জ্বলিল না। খাস্তগীর বুঝিলেন, এই তাঁহার সুযোগ। তাঁহার বক্ষস্থল দুরু দুরু করিতেছি
ক্রমত শুষ্কতা প্রাপ্ত হইতেছিল, যে মাঝে মাঝে জিহ্বার দ্বারায় তাহা ভিজাইয়া লওয়া আ
হইল। ইহাতে যে কিছু সময়ের অপচয় হইল, তাহাতে তিনি অধীর হইয়া উঠি
কারণ প্রতি মুহূর্ত্তেই আলো জ্বলিয়া উঠার সম্ভাবনা ছিল। তিনি দুই হাজার টাকা বেতনের এ
প্রধান অফিসার; তাঁহার এত ভয়ই বা কিসের? এইরূপে মনকে সাহস দিয়া তিনি হঠাৎ দু
পড়িয়া যেমন মিস্ প্যাজেটের বদনে একটি নিবিড় চুম্বন দিবেন, অমনি আলো জ্বলিয়া উঠি
ভয়েও বিস্ময়ে খাস্তগীর দেখিলেন, মিস্ প্যাজেটের স্থলে ওড়নায় আবৃত মার্জরী বসিয়া
অর্দ্ধপথে চুম্বন স্থগিত হইল।

মার্জরী হঠাৎ উঠিয়া পড়িল এবং খাস্তগীরও বিনা বাক্যব্যয়ে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলি
নিম্নতলে আলোর সুইচ্ বোর্ডের নিকটে পেরী দাঁড়াইয়া হাসিতেছিল।

শ্রীখগেন্দ্র নাথ

প্রতিষেধ

(১)

আকাশের চন্দ্রমার মত,
থাক' সখি! থাক' দেবি! দূরে,
মোর তরে এসোনা এখানে—
প্রাণহীন প্রীতিহীন পুরে।

(২)

এ দেশ যে নিরমম দেশ
কূট স্বার্থ অপদার্থ ভরা,
হেথা জাগে ছলনা বিদ্বেষ
অকারণে পরপীড়া করা।—

(৩)

তুমি চির সরলা সুমতি,
এরা ক'বে "শুধু ভাণ ভাব"
ও মমতা মধুরতা নিয়ে,
করিবে যে নিঠুর হিসাব!

(৪)

তাই সাধি—এসোনা এখানে
রহ সুখ স্বরগে তোমার,
মরে' যাই পুড়ে যাই আমি,
তাহে ক্ষোভ কি আছে আমার?

(৫)

জানি আমি সর্ব্ব দুঃখাতীত
তোমারি ও চারু চন্দ্রানন,
তবু আমি চাহিনা দেখিতে—
এই মাত্র করিও স্মরণ।

(৬)

জানি তুমি চির স্নেহময়ী,
এ জীবনে বাসন্তী সুষমা,
আঁধারে চাঁদের হাসি মম,
অপরাধে মূর্ত্তিমতী ক্ষমা।

(৭)

মরুভূমে সুধাবিন্দু তুমি,
হতাশে যে আলোময়ী আশা—
তুমি যে কি মনে মনে জানি,
বলিতে আসে না কিছু ভাষা!—

(৮)

—তবু বলি এসোনা এখানে,
থাক' অই নীলাম্বরে দূরে,
তোমার ও সুখময়ী স্মৃতি—
তাই থাক্ মোর বুক পূরে!

(৯)

পা'র যদি, গভীর নিশীথে
নীরবে দু'ফোঁটা অশ্রু দিও,
এ দীনের মরম বেদনা
অলক্ষিতে ভাসাইয়া নিও।

শ্রীমানকুমারী বসু

সম্পাদক ও লেখক

লেখক—ঠিক করে বলুন কি লিখতে হবে।

সম্পাদক—গল্প।

লে—প্রত্নতত্ত্ব চলবে না ?

স—আমি চাই গল্প আর তুমি যোগাতে চাও প্রত্নতত্ত্ব ?

লে—প্রত্নতত্ত্বও ত একরকম গল্প।

স—কি রকম ?

লে—ঐতিহাসিক উপন্যাস।

স—দেখ ঐতিহাসিক উপন্যাসের নামে বেনামী করে প্রত্নতত্ত্ব চালাতে পারবে না। এ
হচ্ছে একটা Science.

লে—প্রত্নতত্ত্বের নামে বেনামী করে ঐতিহাসিক উপন্যাস ত দেদার চলছে।

স—তোমার প্রত্নতত্ত্ব লেখবার দিকে এতটা ঝোঁক কেন ?

লে—ও জিনিষ লেখা অতি সহজ বলে।

স—কিন্তু পড়া যে তেমনি কঠিন।

লে—লেখকে পাঠকে এ বিরোধ চিরদিনই আছে ও চিরদিনই থাক্‌বে।

স—তুমি যে হেঁয়ালিতে কথা কইতে সুরু কর্‌লে।

লে—সত্যকে অস্বীকার কর্‌লেই তা হেঁয়ালি হয়ে দাঁড়ায়। সত্য কথা কি এই নয় যে
পড়া যেমন সহজ লেখা তেমনি কঠিন।

স—গল্প লেখা যদি কঠিন হয় ত এত লোক এত গল্প লেখে কেন ?

লে—পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মের ফলে। কপালের লেখা কেউ কাটাতে পারে না,
লেখকও নয়।

স—আচ্ছা বুঝলুম যে, গল্প লেখা তোমার দ্বারা সম্ভব নয়। আর কি লিখতে পারো ?

লে—নাটক।

স—অর্থাৎ তোমার একটা লেখাতেই সমস্ত পূজোর কাগজ ভরাতে চাও, যাতে
কারও লেখার তাতে স্থান না হয়।

লে—গল্পই যে সুধু ছোট হয় তাই নয়, নাটকও ছোট হয়।

স—নাটক আর কত ছোট হবে ? পত্রাঙ্ককে খাপিয়ে বড় জোর এক অঙ্ক কর্‌তে
তা হবে পাঁচটি ছোটগল্পের ধাক্কা।

লে—এক অঙ্কে ত মহাশয় একটি মহানাটক হয়। ছোট নাটকের পক্ষে এক গর্ভাঙ্কই যথেষ্ট।

স—এ রকম একখিল্য নাটক কেউ কখন লিখেছে ?

লে—লিখেছে Benav[illegible]

স—সে আবার কে ?

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

লে—লোকটা জাতে Spanish, আর—তার চেহারা ঠিক Don Quixoteএর মত।

স—সে নাটক কেউ কখন পড়েছে ?

লে—পড়েছে কি পড়েনি তা এই থেকে অনুমান কর্‌তে পারেন যে সে ভদ্রলোক এবার Nobel Prize পেয়েছে।

স—অবাক্ কর্‌লে। এক গর্ভাঙ্কস্থ নাটক কিম্ভূত কিমাকার।

লে—আচ্ছা একটি ঘটনা শুনা দিচ্ছি। একটি ভদ্রলোক হাওড়া থেকে রেলে
যাচ্ছেন। তাঁর গাড়ীতে তিনি ছিলেন একা, আর টানছিলেন একটা বর্ম্মা চুরুট।
অন্ধকার আর গন্ধে ভরপুর। বাগেুল ষ্টেশনে দুটি স্ত্রীলোক গাড়ীতে ঢুকলেন
বয়েস ১৮ আর একটির বয়েস ৩৫। দেখলেই বোঝা যায় যে তারা মা ও মেয়ে।
মেয়ে কুমারী। আধাবয়সী স্ত্রীলোকটি গাড়ীতে ঢুকেই বকতে আরম্ভ করলেন। তিনি ভদ্রলো
জানালেন যে, তিনি তাঁর বর্ম্মা চুরুটটি নিঃসঙ্কোচে টেনে যেতে পারেন। তামাকের ধোঁয়া তাঁর
গেছে। মেয়েদের গাড়ী তিনি ছেড়ে এলেন এই জন্যে যে সেখানে ক'টি স্ত্রীলোক জুটেছে
কথাবার্ত্তা এত জঘন্য যে কোন ভদ্রমহিলা সে সব কথা, মুখ দিয়ে উচ্চারণ করা দূরে
কানেও শুনতে পারে না। তার পর তিনি সেই ভদ্রলোকটিকে বললেন যে "আপ
বোধহয় আমার কথা বিশ্বাস করছেন না, কিন্তু শুনলেই বুঝতে পারবেন যে কি
তাদের আলাপ।" তার পর তিনি তাঁর মেয়েকে জানলা দিয়ে মুখ বাড়াতে ও কানে হাত
আদেশ করে উক্ত ভদ্রলোকের কাছে সেই অভদ্রমহিলাদের কথোপকথন আদ্যোপান্ত
করলেন। তারপর মেয়ের প্রতি হুকুম হল যে সে তার কান থেকে হাত নামাতে পারে
গাড়ীর ভিতর পুনঃপ্রবেশ করাতে পারে।

রমণীর মুখ রেলের গাড়ীর মত সমানবেগে চলতে লাগল। আর বেচারা মেয়েটিকে
মুখ ঘন ঘন জানালা দিয়ে বার করে দিতে হল, কেননা মায়ের কথাবার্ত্তার অনেক অংশই
শ্রাব্য নয়। ভদ্রলোকটি মহা অসোয়াস্তি বোধ করতে লাগলেন, কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে
ভদ্রমহিলার দুটি একটি প্রশ্নের জবাব দিতে তিনি বাধ্য হলেন। মহিলাটি ক্রমে নিজের
পাড়লেন। তাঁর স্বামী গত হয়েছেন কিন্তু এক পয়সাও রেখে যাননি। ননদ পয়সা
স্ত্রীলোক। তিনিই অনুগ্রহ করে মা ও মেয়ের সংসার খরচ দেন। কিন্তু ননদের মেজাজ
কড়া তাঁর গলাও তেমনি চড়া। ভাজকে যা হুকুম করবেন তাই বিনাবাক্যে মানতে হবে
গ্রাঁসাচ্ছাদন বন্ধ। (দীর্ঘনিঃশ্বাস)। অল্প বয়েসে বিধবা হওয়া কি কষ্ট !!! আর তাঁর
অনেক মেয়ে আজও কুমারী রয়েছে।

স—বলেন কি, বাঙ্গালী স্ত্রীলোক পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়েসে কুমারী !

লে—মহাশয় ভুলে যাচ্ছেন, এ ঘটনা ঘটছে Spainয়ে। আমি শুধু Mad
তরজমা করেছি "হাওড়া"।

স—তার পর।

লে—তার পর রমণীটি উক্ত ভদ্রলোকটির রূপগুণের সুখ্যাতি আরম্ভ করলে। Sit
খুব dramatic হয়ে উঠল এমন সময় গাড়ী বর্দ্ধমানে এসে পৌঁছল। ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি
থেকে নেমে পড়লেন। তার পর গাড়ী ছাড়ল, কিন্তু ভদ্রলোকের আর দেখা নেই। মা ও

স্থির করলে যে ভদ্রলোক ভুলে তার জিনিষপত্র
ষ্টেশনে সেগুলি নামিয়ে দেওয়া তাঁদের কর্ত্তব্য। নইলে
এলাহাবাদ চলে গেলে
তার মালপত্রের টি
পারে না। গাড়ী কালুজংসনে দাঁড়ালে মহিলাদ্বয়
ভদ্রলোক আবার ফিরে আসেন কিনা দেখবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। এক মিনিট
গেলেই, গাড়ী আবার চলতে সুরু করল। তখন মা মেয়েতে ধরাধরি করে তাড়াতাড়ি উক্ত
ভদ্রলোকের ব্যাগ বিছানা, ছাতা লাঠি টুপি যা কিছু ছিল সব প্লাটফরমের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিলে।
তার পর মার সঙ্গে মেয়ের অনেক সুখদুঃখের কথা চলল। তারপর গাড়ী যখন আসানসোলে
এসে পৌঁছল তখন ওঃ হরি ! সেই ভদ্রলোক আবার দেখা দিলেন। তিনি গাড়ীতে ঢুকেই জিজ্ঞাসা
করলেন তাঁর মালপত্র সব কোথায়। মা উত্তর করলেন যে তাঁর ভালর জন্যই তিনি সেগুলি
সব কালুজংসনের প্ল্যাটফরমে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। এ কথা শুনে ভদ্রলোক
একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে উঠে বললেন যে "তোমার মত স্ত্রীলোককে ছিকল দিয়ে বেঁধে রাখতে
হয়, কেননা তুমি হদ্দ একটি পাগলা কুকুর।"

স—আর এই নাটক লেখার জন্য Nobel Prize ! আমি ত এ নাটকের মাথামুণ্ডু কিছুই
বুঝলুম না। তুমি এর গুণ কি বোঝ বলত।

লে—প্রথম নাটকটি ছোট।

স—তার আর সন্দেহ নেই, ওটি ট্যাঁকে গোঁজা যায়।

লে—তার পর এটি realistic অর্থাৎ এ রকম ঘটনা যে কোনও দিন, যে কোনও গাড়ীতে
ঘটতে পারে।

স—Europeয়ে হয়ত হতে পারে, কিন্তু এদেশে নয়।

লে—আরে মহাশয়, reality ত ইউরোপেই আছে, এ দেশে ত সবই ideality।

স—তার পর—

লে—তার পর দু মিনিটে situation কি রকম dramatic হয়ে উঠল !

স—কি হল, আমি ত বুঝতে পারলুম না।

লে—এটাও বুঝতে পারলেন না—যে রমণীটি ভদ্রলোককে গাকড়াবার চেষ্টায় ছিল—

স—মেয়ের জন্যে ?

লে—না, নিজের জন্যে। তাই বেগতিক দেখে ভদ্রলোক বর্দ্ধমানে নেমে পড়ল,
নিষ্কৃতি পাবার জন্য।

স—তবে এ নাটক হচ্ছে বিধবা-বিবাহের উপর ঠাট্টা ?

লে—অবশ্য তাই। স্প্যানিস লেখকদের অধিকাংশ নাটকেই বিধবা-বিবাহ নিয়ে
মজা করা আছে।

স—এ বিষয়ে দেখছি আমাদের সঙ্গে স্প্যানিসদের সম্পূর্ণ মনের মিল আছে।

লে—সম্পূর্ণ নয়। একটু তফাৎ আছে। আমরা যে ক্ষেত্রে রাগ করি সেখানে তারা আমরা যেমন পুরুষের তৃতীয় পক্ষের কথা শুনলে হাসি তেমনি স্ত্রীলোকের তৃতীয় কথা শুনলে হাসে। তাদের মতে, স্ত্রীলোকের প্রথম পক্ষ ট্রাজেডি, দ্বিতীয় পক্ষ কমেডি, পক্ষ প্রহসন।

স—সে দেশে স্ত্রীলোকের তৃতীয় পক্ষ হয় নাকি ?

লে—আকছার।

স—এ ত বড় মজার কথা !

লে—না, অতি দুঃখের কথা।

স—দুঃখের কথা কিসে হল ?

লে—এই কারণে যে স্ত্রীলোক তৃতীয় পক্ষ অঙ্গীকার করে, সখ করে নয়, পেটের দায়ে এ নাটকেও তার ইঙ্গিত আছে।

স—ননদের হাততোলা খাওয়া ও-স্ত্রীলোকটির পছন্দ হল না, তাই তিনি আবার নতুন স্বামীর ঘর করতে চান ?

লে—ও স্ত্রীলোকটির কেন—ননদের ভাত কোনও স্ত্রীলোকেরই হজম হয় না। যে হাততোলা খেতে হয় তার মুখনাড়াও খেতে হয়। আর স্ত্রীলোকমাত্রেই ননদের কাছে খাওয়ার চাইতে স্বামীর কাছে মার খাওয়া ঢের বেশী পছন্দ করবে।

স—এ নাটকের আর কি গুণ আছে ?

লে—চরিত্র অঙ্কন। Benavente দু-আঁচড়ে মার মেয়ের ও ভদ্রলোকটির চরিত্র চেহারা পুরো ফুটিয়ে তুলেছে। মেয়েটি কলের পুতুল। মা'টি রক্তমাংসের জীব। পুরুষ যথার্থ ভদ্রলোক অর্থাৎ গায়ে আঁচড়টি লাগ্‌তেই বীরপুরুষ হয়ে ওঠেন।

স—বাস্তবিক, অত রাগের ত কোনও কারণ দেখি নে। হয়েছিল কি ? ব্যাগ বিছানা প্লাটফরমে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। একটু ধূলো লাগা ছাড়া তাঁর মালপত্রের ত বেশী কিছু ক্ষতি হয় নি, এর জন্যে একটি ভদ্র মহিলাকে ক্ষেপা কুকুর বলে গাল দেওয়া আমরা ত এ রকম ব্যবহার কল্পনাতেও আনতে পারি নে। একেই বলে পাশ্চাত্য সভ্যতা।

লে—না মহাশয়, তাঁর মেজাজ বেগড়াবার যথেষ্ট কারণ ছিল। ঐ ব্যাগ টেনে ফে তাঁর সর্ব্বনাশ হয়ে গেছল।

স—কি হিসেবে ?

লে—ঐ ব্যাগের ভিতর বোতল ছিল। আর তার ভিতর ভাল মাল ছিল। প্লাটফরমে উপরে পড়ে বোতল ভেঙ্গে চুরমার, আর ব্যাগের ভিতরকার কাপড় চোপড় ভিজে সপ্‌সপে। ভদ্রলোক রাগে পাগল হয়ে গেছল।

স—ব্যাগে যে বোতল ছিল একথা তোমাকে কে বললে ?

লে—ঐ নাটকের সমস্ত কথোপকথনের ভিতর ঐ বোতল উহ্য আছে। থিয়েটার ত সমাজ-নৈতিক, রাজ-নৈতিক ... কোনও ঐতিহাসিক মিটিং নয় যে সেখানে লোক সব ... ও ফুটিয়ে বলবে—আর লম্বা লম্বা বক্তৃতা করবে ? নাটকে ... কথা সাটে নারতে হয়, আর ছোট নাটকে আসল কথা সবই উহ্য রেখে যেতে হয়।

স—আচ্ছা শেষটা দাঁড়াল কি ? ঐ বচকনা নাটকটি কোন্ জাতের ?

লে—একসঙ্গে Farce, Comedy এবং Tragedy।

স—কি রকম ?

লে—মেয়েটি যে ক্রমান্বয়ে গাড়ীর জানালা দিয়ে মুখ একবার করে বার করছে আবার ঢোকাচ্ছে, এটা হচ্ছে প্রহসন। মার কথোপকথন ও ভদ্রলোকের পলায়ন হচ্ছে comedy, আর শেষ কাণ্ডে পুরুষটির বীরত্ব হচ্ছে tragedy।

স—আর এই সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ের গুণে এর কপালে Nobel Prize জুটেছে।

লে—অবশ্য।

স—তাহলে পূজোর সংখ্যার কাগজের জন্য একটি নাটিকাই লিখে দেও।

লে—নাটক কেন গল্পই দিচ্ছি কিন্তু তা লিখতে হবে আপনাকে।

স—গল্প হবে তোমার অথচ তা লিখ্‌তে হবে আমাকে ?

লে—আপনাকে সুধু হাতে লিখতে হবে।

স—তুমি dictate করবে ?

লে—না, আমাদের এই কথাবার্ত্তা ছাপিয়ে দিন, তাহলেই তা খুব উঁচুদরের গল্প হবে।

স—তোমার সঙ্গে আমার এই বকাবকি ছাপার অক্ষরে উঠলেই গল্প হয়ে উঠবে ?

লে—মহাশয় এযুগে গল্পের আর কোনও ধরাবাঁধা চেহারা নেই। ইউরোপের বড় বড় লেখকদের যথা টলষ্টয় ইত্যাদির গল্প পড়ে দেখুন তার ভিতর গল্প নেই—আছে শুধু নানা রকম সমাজিক সমস্যা ও তার নভেলি মীমাংসা।

স—কিন্তু সে সব ত নভেল, ছোট গল্প নয়।

লে—স্বয়ং Anatole France, আমি যে রকম বলছি ঠিক সেই ধরণের ছোট গল্প লিখেছেন। সে গল্পের কাঠামও হচ্ছে ঐ সম্পাদক ও লেখকের কথোপকথন ; অথচ তার মধ্যে ঢুকিয়ে গেছে পুরো Socialism।

স—আর তাতে গল্প মোটেই নয়।

লে—কলকাতার মাছের ঝোলের যেমন সবই ঝোল, আর তার মধ্যে মাছ থাকে

BLOCKED INFORMATION.

এক টুকরো, ঝোলটার আঁশটে গন্ধ করবার জন্য,—তেমনি Anatole Franceএর লেখা এক টুকরো আঁশটে গল্প আছে!

স—কিন্তু আমাদের এ কথোপকথনে [illegible] গন্ধ চুলোয় যাক্, নাম নেই। আগাগোড়াই ত বলনি।

লে—কেন গল্প ত পুরো রয়েছে।

স—কি রকম।

লে—সেক্‌সপিয়রের নাটক ভেঙ্গে Lamb যেমন গল্প বানিয়াছে, আমিও [illegible] Benaventeর নাটক ভেঙ্গে গল্প বানিয়েছি।

স—Lamb's Tales ত ছোট ছেলেতে পড়ে। তোমার এ গল্প পড়্‌বে কে?

লে—আবালবৃদ্ধবনিতা।

স—এ আশা কিসের জন্য করছ?

লে—এ গল্প একাধারে Tragedy, Comedy, Farce বলে। এর যে অংশ প্রেম সে অংশ ছোট ছেলেদের চোখে লাগবে, ও দাঁত দিয়ে ঠিকরে বেরবে। যে অংশ Comedy সে অংশ বৃদ্ধদের মনে ঢুক্‌বে আর সেখানে রসসঞ্চার করবে, আর যে অংশ ট্রাজেডি সে মেয়েদের মনে লাগবে আর বুকে বাজবে।

স—তুমি বলতে চাও যে এ গল্প পড়ে পাঠিকারা আহ্লাদে আটখানা হবেন?

লে—কোনও পুরুষ কোনও অবলাকে হন্নে কুকুর বলে ছিকল দিয়ে বাঁধতে গেলে এ কথা শুনে দুনিয়াতে কোনও স্ত্রীলোকই আহ্লাদে আটখানা হবে না। এ গল্প পড়ে পাঠিকারা পাবেন, শুধু সমাজে স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধের চির tragedyর নূতন করে পরিচয়। tragedyর অভিনয় দেখে কিম্বা পড়ে লোকে যে জাতের আনন্দ অনুভব করে, [illegible] বুঝগজের পাঠিকারাও সেই রকমের আনন্দ অনুভব করবেন।

স—তাহলে এর একটা গূঢ়ার্থ আছে যা তুমি গল্পচ্ছলে প্রকাশ করতে চাও।

লে—গূঢ়ার্থ ত দূরে থাকুক এ গল্পের কোনই অর্থ নেই।

স—এতক্ষণে সত্য কথা বলেছ। তোমার এ গল্প হচ্ছে ষোলআনা nonsense।

লে—সেই জন্যই ত বলছি এটা এখনই ছাপিয়ে ফেলুন। গল্প হিসেবে পূজোর বাজারে ষোল আনা উপযুক্ত হবে।

শ্রীপ্রমথ [illegible]

অতিথি

গলির মোড়ের চায়ের [illegible] দিন সকালে যাহারা চা খাইতে আসে তাহারা সেই আড্ডা জুটিয়াছে, একদল চা পান শেষ করিয়া একখানি খবরের কাগজের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, আর একদল এত নিবিষ্টমনে চা খাইতেছে যে, একটি অপরিচিত আগন্তুক কখন যে দোকানের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা কেহ লক্ষ্য করে নাই।

আগন্তুকটি অবশ্য অতি ধীরে নিঃশব্দে দোকানে প্রবেশ করিয়াছে। তাহার মৃদু স্নিগ্ধস্বরে সকলে একটু চমকিয়া উঠিল,—মশাই, তিন নম্বর বাড়ীটা কোথায়, বলতে পারেন?

তিন নম্বর বাড়ী! পাড়ায় এই বাড়ীটি সবাইয়ের বিশেষরূপে পরিচিত। এই বাড়ীটির নাম হইতেই কেহ কাগজ হইতে মুখ না তুলিয়া মুচকাইয়া হাসিল, কেহ চা পান করিতে করিতে ঠোঁট কাঁপাইয়া হাসিল, কেহ চা'টুকু নিঃশেষ করিয়া মুখ বাঁকাইয়া হাসিল—কিন্তু যাহারা নব আগন্তুকের দিকে চাহিল, তাহারা কেহ হাসিল না, বিস্মিত বিমুগ্ধ নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। আগন্তুকটী একটু অগ্রসর হইয়া হাতের মোটা বাঁশের লাঠিতে ভর দিয়া চায়ের টেবিলের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার সাজসজ্জা, দাঁড়াইবার ভঙ্গী হঠাৎ দেখিলে হাসি পায় বটে, কিন্তু তাহার রহস্যময় শান্তোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিলে মুখ গম্ভীর হইয়া যায়। পরণে ময়ূরকণ্ঠী রংএর সিল্কের লুঙ্গি তাহার ওপর জরির কাজ করা লাল সাটিনের কাবুলী জামা, পায়ে হল্‌দে পেটেন্ট চামড়ার ঘুণ্টি দেওয়া জুতা; মাথার মাঝ দিয়া সিঁথির দুই পাশে বড় কালো কোঁকড়ান চুল [illegible] পড়িয়াছে, তাহার ওপর এক ঘন সবুজ সিল্কের রুমাল কায়দা করিয়া জড়ান। হঠাৎ দেখিলে বর্ম্মাবাসী বলিয়া বোধ হইতে পারে বটে, কিন্তু সুন্দর মুখটির দিকে চাহিলে, সে ভুল হয় না; সরু নাকটি খাঁড়ার মত উদ্যত হইয়া ওঠে নাই বটে, কিন্তু বেশ উঁচু, মুখ হইতে কি একটা রহস্যময় দীপ্তি বিচ্ছুরিত হইতেছে; সেই আগুনের আভার ওপর ভ্রমরের হুলের মত কালো ফুলের পাঁপড়ির মত কমনীয় ছোট দাড়ি ও গোঁফ ধোঁয়ার হাল্কা কুণ্ডলীর মত ঘিরিয়া। এরকম দাড়ি গোঁফ রাখিলে, ওরকম সাজ সজ্জা করিলে আর কাহাকেও অতি অদ্ভুত হাস্যকর দেখাইত, কিন্তু এই সাজেতেই যেন এই আগন্তুককে অতি সুন্দর দেখাইতেছে, আগুনের ফোয়ারার মত তাহার লম্বা ছিপ ছিপে চেয়ারা, তাহার কাঁচা সোণার মত দেহের রং, তাহার মায়াময় মুখখানি—সব সুন্দর দেখাইতেছে। সবচেয়ে সুন্দর তাহার চোখ-দুইটী, কখনও হীরার মত জ্বলিয়া ওঠে, কখনও নীলার মত স্নিগ্ধ হয়; শিশুর মত সরল, তরুণীর মত রহস্যময়, বৃদ্ধের মত উদাস এই জ্যোতির্ম্ময় চোখ দু'টি দিয়া যাহার দিকে চায় তাহাকে যেন বিদ্যুতের মতন স্পর্শ করে।

যে দাড়ি গোঁফকামান টাক-ওয়ালা প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি এই পাড়ার চায়ের আড্ডার দলপতি বা সভাপতি বলিয়া আপনাকে মনে করেন, তিনি কাগজে চোখ রাখিয়া জার্ম্মান-ফরাসী

রাজনীতি, সেয়ার মার্কেট ইত্যাদি সম্বন্ধে কি নতুন মত প্রকাশ করিবেন ভাবিতেছি... সবাই এমন স্তব্ধ হইয়া গেল দেখিয়া অবাক হইয়া তিনি মুখ তুলিয়া চাহিলেন।... ব্যঙ্গ করিতে সুনিপুণ বলিয়া তাঁহার নাম আছে, এই অব... দেখিয়া তিনি কি প... কথা বলিবেন, তাহা শুনিতে সবাই উদ্‌গ্রীব হইয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। আগন্তুক... মহাশয়ের দিকে নির্ম্মলোজ্জ্বল চোখে চাহিয়া বলিল, আমি তিন নম্বর বাড়ীটা খুঁজছি... মহাশয়ের মুখে একটু ব্যঙ্গহাসি খেলিয়া গেল, অন্য কেহ হইলে তিনি বলিতেন, আরে... নম্বরে যাবে! যেখানে নয়টা গলার কনসার্ট দিনরাত বাজছে, যেখানে—

কিন্তু আগন্তুকের উজ্জ্বল চোখ দুটি তাঁহার চোখের উপর আসিয়া পড়াতে তিনি এ... করিয়া অতি শান্তভদ্রভাবে বলিলেন, তিন নম্বর বাড়ী মশাই, এই গলি দিয়ে বরাবর যান, ... গলিটা যেখানে বেঁকেছে সেইখানেই দেখতে পাবেন, লাল রংএর বাড়ী, তবে লাল র... কালো হয়ে গেছে—

ধন্যবাদ, মশাই, নমস্কার বলিয়া আগন্তুকটি মাথা একটু নত করিয়া অতি মৃদু হাসি... তাহার সেই মৃদু হাসির দিকে সকলে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া তাকাইয়া রহিল—নিবিড় বনছায়ায় ঢাকা... রূপালি জলধারার মত তাহার কালো গোঁফের ফাঁক দিয়া সুন্দর হাসিটি নিমেষে ঝলসিয়া... একটু খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে দোকান হইতে বাহির হইয়া সে তিন নম্বরের দিকে চলিল। ... তাহার চলিয়া যাওয়ার ভঙ্গীটির দিকে চাহিয়া রহিল। নানা জনের মনে নানা প্রশ্ন, নানা পরি... জমা হইতে লাগিল, কিন্তু কেহ মুখ ফুটিয়া কিছু বলিয়া উঠিতে পারিল না।

লোকটা কি খোঁড়া, অমন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে কেন! পেছন থেকে দেখলে মনে হয়... বছর চল্লিশ বয়স, কিন্তু মুখ দেখলে ত চব্বিশের বেশী বলে মনে হয় না। মুখখানা কচি বটে, কি... চং ... বিস্ময় আছে, অত অল্প বয়স নয় লোকটার। বাপু তিন নম্বরে যাচ্ছে, সুবিধে করে... পারবে না ওই মিউ মিউ গলা নিয়ে, সেখানে ঢাক ঢোল নিয়ে যাও পাত্তা পাবে। তিন নম্... কেন যাচ্ছে? নিশ্চয়ই সেই বেহায়া মেয়েটার কাছে, সেও দেখি এম্নি রং চং এর সাজ ক... জমবে ভাল। চায়ের দোকানে ঢুকে লোকটা চা না খেয়ে চলে গেল! দাদা, ও ... এক কাপ চাও জুটবে না, বলে—।

নানা জনের মনে নানা কথা উঠিতে লাগিল বটে, কিন্তু সকলে নিঃশব্দে চা পান ক... লাগিল। দলপতি মহাশয়ও নীরব, তিনি কাগজ সরাইয়া ভাবিতেছিলেন, লোক... এম্নি দেখলে মনে হয় একটা সৌখীন সং, কিন্তু লোকটা বোধ হয় সাধারণ নয়, কি... বলিয়া উঠিলেন, ওহে আজকালকার ছোকরারা, তোমাদের ত দাড়ি গোঁফ না ... দেখত ওই ভদ্রলোকটি—দাড়িগোঁফ রেখে কি সুন্দর মুখখানা—কিন্তু কোথাও একটু ... ঈষৎ পরিহাসের হাসি হাসিলেন।

... সে হাসিতে বিশেষ যোগ দিল না। আগন্তুকটি সকলের মনে একটি ... রূপেই রহিল, তাহার সম্বন্ধে কিছুই আলোচনা হইল না। সেদিন চায়ের ... না, পরদিন ... বাজে তর্ক করিতে কাহারও ভাল লাগিল না, ... সকলে উঠিয়া চলিয়া গেল।

... বাড়ীর গলির কোণে যেমন বাঁকিয়ে গিয়াছে; এ বাড়ীর লোকগুলিও তেম... কেহ সরলভাবে ভাবে... সোজা কথা বলে না। বাড়ীর সামনের খাবারের দোকানে ... ময়রাওয়ালা যখন গরম গরম জিলিপি ভাজে সে তখন তিন নম্বর বাড়ীটির দিকে চাহিয়া হাসে। এ বাড়ীর লোকগুলির মনগুলি ঠিক এই রকম জিলিপির প্যাঁচ—তাদের মেজাজ এম্নি গরম হইয়াই আছে। পেঁচার মত সবসময় মুখ ভারি। বাড়ীটি যে চুপচাপ শান্তিতে থাকিবে, এ কাহারও সহ্য হয় ... গোলমাল চেঁচামেচি ঝগড়া লাগিয়াই আছে।

... কিনা কর্ত্তাটির বয়স বেশী নয়, কিন্তু বেশ পসার—বেশ রোজগার করেন। ... থায় একটু টাক পড়িয়াছে, কতকগুলি চুল পাকিয়াছে, গম্ভীর পাকা মুখ যেন নির্ম্মম আইনের মায়াময় ... চারের প্রতীক, টাকা রোজগার লইয়াই আছেন, আপন সংসারের কিছুই দেখেন না। কিন্তু ... হয়ত একদিন দেখিলেন, চাকর মস্তবড় ঝুড়িতে বাজার করিয়া ফিরিতেছে, নথি ফেলিয়া ... চাকরকে ডাকিয়া বাজারের তরকারি মাছ সব পরীক্ষা আরম্ভ সরু করিলেন, এত বাজার ... আর টাকা সাতভূতে মিলিয়া ওড়াইতেছে! ঠিক, কাল রাতে পাতে পাঁচ রকম তরকারি ... হইয়াছিল, দুই রকম রাঁধিলেই হইত। গিন্নির ডাক পড়িল, গিন্নির বিধবা বোনের ডাক পড়িল, জ্যেঠাইমার ডাক পড়িল, বাজারের হিসাবের খাতা আনা হইল, গায়ের... সকলে মিলিয়া কিরূপ ছিনিমিনি খেলিতেছে অগ্নিশর্ম্মা কর্ত্তা তাহা সকলকে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন, গলাবাজী হৈ চৈ পড়িয়া গেল।

গিন্নিটি কুঁড়ে, ঢিলে রকমের, এম্নি সাধাসিধে,-কিন্তু সংসারের ঘুরপাকে মাঝে মাঝে বড় ঘোরাল হইয়া ওঠেন। শরীর স্থূল বলিয়া নিজে খাটিতে পারেন না, ঝি চাকর বোন জেঠাই সবাইয়ের ওপর তম্বি করিয়া বেড়ান। তিনি অত্যন্ত পরিষ্কার বলিয়া তাঁহার প্রধান গর্ব্ব, নিজে দাঁড়াইয়া কাজ না দেখিলে কিছুই তাঁহার পছন্দ হয় না, তাই মোছা ঘর আবার মোছাইতে, মাজা কড়াই আবার মাজাইতে, ধোওয়া কাপড় জামা আবার ধোওয়াইতে ঝি চাকরের সঙ্গে ... বকাবকি তাঁহার লাগিয়াই আছে।

আর জেঠাইমা যখন তাঁর তীক্ষ্ণ তীব্র কণ্ঠ লইয়া যোগ দেন তখনই ঝগড়া ঠিক জমিয়া ওঠে, তিন নম্বরের চারিদিকের বাড়ীগুলির জানলা সব খুলিয়া যায়। তাঁহার গ্রামে সবচেয়ে কুঁদুলে বলিয়া তাঁহার যে খ্যাতি ছিল একথা তিনি প্রতিদিন পাড়ার লোকদের স্মরণ করাইয়া

দিতেন। বহু বৎসর পূর্ব্বে, কর্ত্তা যখন বালক, তিনি তাঁহার বৃদ্ধ রোগগ্রস্ত স্বামী [illegible] কলিকাতায় চিকিৎসা করিতে আসিয়াছিলেন। তিন নম্বর, তৃতীয় পক্ষে [illegible] সুখদুঃখের মায়াজাল কাটিয়া স্বামী শীঘ্রই খসিয়া পড়িলেন [illegible] জেঠাইমা রহিয়া গেলেন [illegible] আটকাইয়া আছেন!

তিন নম্বরে কেবল ঝগড়া মন কসাকসি নয়, হাসাহাসিও হয় কিন্তু সবাইকে [illegible] অন্তরালে, নিভৃতে দু'জনে। সে হাসি আনন্দের নয়,—প[illegible]সের, [illegible]। [illegible] ঠোঁট দুটি সবসময়ই পাণে রাঙা, তাহার গালদু'টি সবসময়ই রঙে [illegible], আর তাহার মুখে [illegible] পরিহাসের চাপা হাসি। এই সৌখীন যুবতী ভাইঝিটি [illegible] বছর পূর্ব্বে কোন [illegible] হইতে কর্ত্তাকে অতি করুণভাবে লেখে, তাহার রুগ্ন স্বামীকে কলিকাতায় গিয়া চিকি[illegible] করাইলে তাহার ভাল বৈধব্যযন্ত্রণা লেখা আছে। কলিকাতায় আসিলে চিকিৎসার ব্যবস্থা [illegible] দিতে পারেন, এইমর্ম্মে কর্ত্তার চিঠি পাইলে, ভাইঝিটি কেবল তাহার চিররুগ্ন স্বামীকে না [illegible] তাহার সুন্দর খাট, ড্রেসিং টেবিল, কাপড়ের দুই আলমারী, বইয়ের তিন আলমারী, কাপে[illegible] সব লইয়া এই তিন নম্বরে আসিয়া উঠিল। ঘর সাজান গোছান না থাকিলে তাহার স্বামী [illegible] বাড়িবে, সে ফিট্‌ফাট্ সাজিয়া না থাকিলে তাহার স্বামীর মন খারাপ হয়, এই বহ[illegible] না দেখিলে তাহার স্বামী বাঁচিতে পারেন না। স্বামিটি বয়সে যুবক কিন্তু চিররুগ্ন, এক [illegible] পর শরীর ভাঙ্গিয়া যায়, রোগা শরীরটিতে করুণ সুন্দর আভা মাখান; সে বিছানায় শুইয়া [illegible] পড়ে ইজি চেয়ারে শুইয়া কবিতা লেখে। কর্ত্তা দু'চার জায়গায় তাহার জন্য চাকরীর [illegible] করিয়াছিলেন কিন্তু ভাইঝিটি চাকরী করিতে দেয় নাই। তাহার স্বামীর বিশ্রামের [illegible] এ ভাঙা শরীরে আফিসের কাজ করিলে এক বছরও দেখিতে হইবে না। তাহার চিররুগ্ন [illegible] ভাইঝিটি বহুদিন পূর্ব্বে তাহার কাকার বাড়ী অতিথি রূপে উঠিয়াছিল, এখনও [illegible] অতিথি ভাবিয়াই আছে। সে সাজে, স্বামীর সঙ্গে গল্প করে, মুচকাইয়া হাসে, ভাল খাইতে [illegible] রাগ করে, সংসারের কোন কাজ করে না।

এ বাড়ীর শুধু একটি মেয়ের গলা পাড়ার কেহ কোনদিন শোনে নাই। [illegible] দূর সম্পর্কীয়া তরুণী বিধবা বোনটি এ সংসারের সকল কাজ করে, তাহার ওপর [illegible] বাক্যবাণ বর্ষিত হয় কিন্তু কেহ বাণ ফিরিয়া পায় না। তাহার প্রকৃতি অনেকটা [illegible] বলা যাইতে পারে, তাহাকে আঘাত কর, নিঃশব্দে সে আঘাত গ্রহণ করিবে; বাড়ীর আর [illegible] প্রতি কিন্তু একটু কথার ঢিল ছুঁড়িলেই তাহারা কাঁচের মত ঝন্ ঝন্ করিয়া ওঠে। সে [illegible] গিন্নি তাহাকে আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছেন, এই কথাটি গিন্নি প্রতিদিন অন্ততঃ একবার [illegible] স্মরণ করাইয়া দেন। নতমুখে নিঃশব্দে সে সংসারের সকল কাজ করিয়া যায়। আপনা[illegible] দগ্ধ করিয়া সে এ সংসারের সকল বিষ আপনার মধ্যে জীর্ণ করে, চারিদিকে কথা[illegible]

[illegible]য়া ছড়ায় না। এ বাড়ীতে প্রথম যখন সে আসিয়াছিল, সেই পূর্ণিমা চাঁদের মত টলটল [illegible]ই, এ বাড়ীর [illegible] আগুনে সে রূপ ঝলসিয়া গিয়াছে। সে ঝগড়া করে না বটে, কিন্তু [illegible] মাঝে সে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ [illegible], সে কথাগুলি অত্যন্ত কটু, [illegible] না সেগুলি সত্য। সে এখন শুচিবাইগ্রস্তা, কটুভাষিণী [illegible] বিধবা। তাহার বয়স? [illegible] বয়স কি! বয়সে সে ওই ভাইঝির ছোট হইতে পারে, কিন্তু সে জেঠাইমার [illegible]য়সী।

অন্ততঃ জেঠাইমা তাহাকে তাঁহার সমকক্ষ সমবয়সী বলিয়াই ভাবিতেন, তাই সকালে তাহার [illegible] ঝগড়াটা বেশ ভাল করিয়াই [illegible]। ঝগড়ার কারণটা সব সময়ে বলা শক্ত, [illegible] সময় অকারণে বা অতি তুচ্ছ কারণেই ঝগড়া ওঠে। সকালে ঝগড়াটা এইরূপ ভাবে [illegible] হইয়াছিল—

জেঠাইমা চালের হাঁড়িতে জল বসাইয়া আসিয়া বলিলেন—ওগো, চালটা কৈ দাও না, [illegible] যে জ্বলে ছাই হয়ে গেল,—গিন্নি এখন দেখতে পেলেই বলবে আময়দা কয়লা, কিনতে ত [illegible], খুব পোড়াও—

—ওই নাও না জেঠাইমা চালটা হাতায় মেপে, আমি ঝোলের কুটনো কুট্‌ছি।

—না বাপু আমি কেন ভাঁড়ারে হাত দিতে যাব?

—হাত দিলেই ত তুমি চোর হবে না—

—চোর! আমি চোর হলুম, ওরে—

তারপর জেঠাইমার গলাবাজী সুরু হইল। অনেকক্ষণ চেঁচাইয়া শ্রান্ত হইয়া তিনি [illegible] হইতে ভাতের হাঁড়ি নামাইয়া সকলকে জানাইয়া দিলেন, আজ তিনি রান্না করিবেন না। [illegible] ছুটিয়া আসিলেন, ভাইঝি হাতে একটি চায়ের পেয়ালা লইয়া রান্নাঘরে [illegible] আসিয়া দাঁড়াইল, অর্থাৎ সে ঝগড়া দেখিতে আসে নাই, চায়ের জন্য দুধ লইতে আসিয়াছে। তাহার দিকে [illegible] করিয়া জেঠাইমা বলিলেন,—আচ্ছা তুই বল মা, তুই বল—

সে মুখের হাসি চাপিয়া গম্ভীরভাবে বলিল—অত বানিয়ে বানিয়ে বলবেন না।

জেঠাইমা গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—বানিয়ে! আমি মিথ্যে কথা বলছি! আমি যদি মি—মি—মি—বলে থাকি আমার মাথা খাই—যে মিথ্যে কথা বলবে তার গ—গতরে আগুন লাগুক, চোখে আগুন লাগুক—ভ—ভ—ভ-গবান আছেন।

জেঠাইমার বেশী রাগ হইলে তিনি একটু তোত্‌লা হন এবং সব শেষে ভগবানের সুবিচার প্রার্থনা করেন।

গিন্নি বলিয়া উঠিলেন—ভগবান ত আছেন, কিন্তু জেঠাইমা কাল একাদশী আর আজ হাঁড়ি নামিয়ে যে যাচ্ছ! নিজে খাবেনা আর আমার ছোট বোনটাকেও খেতে দেবে না?

—ঘাট হয়েছে মা, আমার ঘাট হয়েছে, আমি বুড়ী নাকে কানে খৎ দিচ্ছি—যদি ... আমার মাধবরে তুই যদি আজ বেঁচে থাকতিস্ তবে কি তোর মা'র আজ এ দ... হোতরে বা...

—দেখ জেঠাই মা সকাল বেলায় যদি ... র—গেরস্থের বাড়ীর ... কোরো না—চেঁচামেচি ভাল লাগে না আমার—

ভাল ত লাগবেই না মা, এ সংসার কি আর ভাল জায়গা, বলিতে বলিতে ... হইয়া তাঁহার ঘরের দিকে চলিলেন। উঠানের কোন দরজার ... চোখ পড়াতে ... দাঁড়াইলেন,—কেরে হতভাগা মিন্‌সে বাড়ীর—

কিন্তু আগন্তুকের স্নিগ্ধোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া গেলেন।

আগন্তুকটি মাথার নীল রুমালটি খুলিয়া মুখ মুছিয়া বলিল—কি জেঠাই মা, চিনতে ...

বিস্মিত ব্যথিত কণ্ঠে জেঠাইমা বলিলেন,—পারি বৈ কি বাবা।

মৃদু হাসিয়া আগন্তুকটি বলিল—নম্বরটা দরজায় লেখা দেখছিলুম না, কিন্তু ... শুনে ঢুকে পড়লুম, কি তোমার গলা জেঠাইমা—সেই কত বছর আগে শুনেছি এখনও ঠিক ... আছে। কি বৌদি মনে আছে? গিন্নি ম্লান হাসিয়া বলিলেন—আছে বৈ কি ভাই। আগন্তুক ... চোখে চাহিয়া বলিতে লাগিল—দেখ বৌদি বেশ জমিয়েছ সকাল বেলাটা, ঠিক এম্নি সকাল ... একটা গোলমাল হৈ চৈ আমার মনে পড়ছে—উঠানের ওই কোণে মাছের একটা ... হয়েছে মাছ কুটতে ধুতে ঝিরা হৈ চৈ লাগিয়েছে, আর জেঠাইমা একটা লাল পাড় তসরের ... পরে ঝিদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গলাবাজি করছেন—সে তোমার বৌভাতের দিন—তুমি নতুন ... ঠিক ওই জায়গাটায় একটা লাল চেলি পরে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছ, বুকটা দুর দুর ... এম্নি হট্টগোলের মধ্যে ঘর করতে হবে—ঠিক এম্নি সুন্দর সকালবেলাটা—

... আনন্দদীপ্ত চক্ষে আগন্তুক একবার গিন্নির দিকে একবার জেঠাইমার দিকে চাহিয়া মধুর হাসিল। তাহার উপরের মাড়ীর সামনের দাঁতটা আধখানা ভাঙা, সেই ... মত ঝকঝকে সাদা দাঁতের ফাঁক দিয়া লাল ঠোঁটের তট ভাঙ্গিয়া কালো গোঁফের রেখার পাশ ... সে হাসি স্নিগ্ধ রূপালি জলধারার মত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। গিন্নির বিধবা বোন ... আড়াল হইতে বিমুগ্ধনেত্রে এই হাসিভরা মুখ দেখিতেছিল, তাহার চোখ জলে ভরিয়া ... এই আগন্তুকের চোখের চাওয়ায় জেঠাইমার বার্দ্ধক্যরেখাঙ্কিত মুখখানি নিমেষের জন্য ... পূর্ণপ্রস্ফুটিত পুষ্পের মত যুবতীর মুখ হইয়া গেল, নিমেষের জন্য গিন্নির রুক্ষ শীর্ণ মুখখানি ... মুখের মত কমনীয় সদ্য প্রস্ফুটিত পদ্মের মত সুন্দর হইয়া উঠিল। সুখস্মৃতির মায়াময় ... গিন্নি নিমেষের জন্য অনুভব করিলেন, তিনি সদ্যবিবাহিতা নববধূ, নববধূর প্রেমস্বপ্ন আশা ... তাঁহার মুখ একটু রাঙা হইয়া উঠিল। জেঠাইমার মনে হইল, তিনি কলহপ্রিয় কুটিলা স্বার্থ... প্রৌঢ়া বিধবা নন, তিনি মঙ্গলময়ী কল্যাণকর্ম্মরতা গৃহিণী। প্রভাতের আলো হইলে ...

... মেলিয়া ফুটিয়া ওঠে, তাহার পাশের ফোটাফুলগুলি আলোর স্পর্শে যেমন একটু ... রিয়া ওঠে তেম্নি তাঁহাদের ... শিহরিয়া কাঁপিয়া উঠিল। জেঠাইমা স্নিগ্ধস্বরে বলিলেন—... আমার এতও মনে থাকে!

—কাঁসরের মত তাঁহার গলা ... এ স্নিগ্ধসুর শুনিলে পাড়ার সবাই অবাক মানিত।

আগন্তুক হাসিয়া বলিল—মনে থাকে বলেই ত এলুম, কাল বিকেলেই আসছিলুম, মেসের ... পরিষ্কার করতে রাত হয়ে গেল।

এবার একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিল। গিন্নি হাসিমুখে অগ্রসর হইয়া আসিয়া স্বইচ্ছায় স্বচ্ছন্দচিত্তে বলিলেন,—মেসে তোমার থাকা হবে না ভাই, মেসে ওঠা তোমার কিছুতেই হবে না—আমি লোক পাঠিয়ে জিনিষপত্তর আনছি—

—না, বৌদি তোমাদের—

—কিছু অসুবিধে নয়, আমার অতিথি হয়েই না হয় রইলে; না, মেসে থাকা হবে না—

জেঠাইমা বলিলেন—সত্যিই ত আমরা এখানে আছি, আর তুই কোথায় পড়ে থাকবি!

আগন্তুক হাসিয়া বলিল—তোমারই হাঙ্গাম বাড়বে জেঠাইমা, জানত আমি নিরামিষ খাই।

—বাবা, তোমাকে রেঁধে আবার খাওয়াব এ আমার অনেক দিনের সাধ ছিল, ঈশ্বর আছেন, না, বৌমা, ওরে ছেড় না।

আগন্তুককে গিন্নি আপনার ঘরে লইয়া গেলেন। জেঠাইমা হাসিমুখে রান্নাঘরে ঢুকিয়া উনানের ওপর ভাতের হাড়ি বসাইলেন। ফুলের গন্ধ শুঁকিয়া যেমন পাঁক ঘাটিতে ইচ্ছা করে না তেম্নি সমস্ত সকাল কাহারও ঝগড়া করিতে ইচ্ছা করিল না।

সেদিন দু'পুরে ভাইঝির ঘরে একটি ছোট সভা বসিয়াছে। প্রতিদিনই স্বামী-স্ত্রীতে দুপুর সভা বসে, স্ত্রী ইজিচেয়ারে শুইয়া পান চিবাইতে চিবাইতে তিন নম্বরের সংসারের ও পাড়ার অন্য সব বাড়ীর রিপোর্ট দেয়—কাহার সহিত কাহার ঝগড়া কি জন্য হইল, কর্ত্তার মেজাজটা কিরূপ, জেঠাইমা ঝির হাতে লুকাইয়া তাঁহার দাদার বাড়ী কি পাঠাইয়াছেন, ওবাড়ীর নতুন বৌ কেমন দেখতে ইত্যাদি। স্বামী বিছানায় শুইয়া তাকিয়ায় ঠেসান দিয়া ইংরাজী ম্যাগাজিন বা নভেলের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে শোনে—আজ কিন্তু তাহাদের ঘরে গিন্নি আসিয়া বসিয়াছেন। কাকিমার হঠাৎ ঘরে পদার্পণ ভাইঝির ভাল ঠেকিতেছিল না, নিশ্চয় কোন মৎলব আছে, এ আগমনের সঙ্গে নতুন অতিথিটির কোন যোগ আছে। যোগ অবশ্য ছিল। সেই ত এই সংসারতাপক্লিষ্ট আনন্দহীন রুক্ষ কাকিমার মনকে নবযৌবনের হাস্যময়ী সেবিকা কাকীমার স্বপ্নময় মনের রংএ রাঙাইয়া দিয়াছে, আজ তাই রুগ্ন ভাইঝি-জামাইকে দেখিতে আসা কাকিমার কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইল।

ভাইঝি একটু পরিহাসের সুরে বলিল—যা বল কাকিমা, তোমায় এই নতুন [illegible] stylish চালিয়াৎ—

স্বামী নভেল হইতে মুখ তুলিয়া বাঁকা দৃষ্টি[illegible], অর্থাৎ, তোমার চেয়ে [illegible]

কাকিমা বলিলেন—হাঁ, [illegible]কালই ও একটু সৌখীন।

ব্যঙ্গ হাসিয়া ভাইঝি বলিল—ওকে সৌখীন বলে না, সং বলে—

স্বামী মুখ ঘুরাইয়া ব্যঙ্গদৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে চাহিলেন, অর্থাৎ সং [illegible] কেউ থাকে [illegible] দিনরাত সাজ, সাজ—

স্ত্রীও স্বামীর দিকে ব্যঙ্গদীপ্ত [illegible] বাঁকাই[illegible]লিল, অর্থাৎ, [illegible] নিজে রোজগার করে সাজাতে [illegible] সাজি আমার বাবার টাকায়, কাকার টাকায়।

—আচ্ছা কাকিমা, ও কি একটু খোঁড়া ?

—কিন্তু কি সুন্দর মুখখানা বল্‌ত, কি রং—

—কিন্তু আজকালকার ছেলে হয়ে কি বিচ্ছিরি দাড়ি রেখেছে, তবে চোখটা সুন্দর [illegible] উনি কাকার কি রকম ভাই ?

কিরকম দূর সম্পর্কের, অনেকদিন আগে আমাদের বাড়ী কয়েক বছর ছিল।

অতিথিটি নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল—বা বৌদি, আমি সমস্ত বাড়ী [illegible] খুঁজে বেড়াচ্ছি আর তুমি জামাইয়ের ঘরে বসে—আরে ও কে পালাচ্ছে !

ভাইঝির আর পালান হইল না, সে মুগ্ধনেত্রে এ মূর্ত্তিমান যৌবনের মত অতিথির দিকে [illegible] অতি[illegible]র সাজ বদল হইয়াছে, সে গেরুয়া রংএর কাবুলিওয়ালাদের মত পাজামা ও পাঞ্জাবী [illegible] পা[illegible] নাই, কি সুন্দর পা দুখানি।

গিন্নি বলিলেন—এই আমার ভাইঝি, আর ওই জামাই।

—এই তোমার জামাই—আপনাকে চিনি চিনি—আরে তুমি !—এর সঙ্গে পড়েছি যে।

জামাইবাবুর দুই হাত ধরিয়া অতিথিটি তাহাকে এক ঝাঁকুনি দিল।

—আরে তুমি ! কর কি, কর কি ভাই বুকে লাগবে—

—বুকে লাগবে ! বাপু তোমার সে বুকে রাখার গল্প ভুলে গেছ ? জান বৌদি [illegible] বেলায় ও কিরকম নাদুস নুদুস মোটা ছিল ! আমাদের ক্লাসে ওর চেয়ে আর একটি ছেলে [illegible] ছিল, ওকে বলা হত মোটা দি সেকেণ্ড, একদিন ওকে বলা হয়, দেখ্ মোটা দি সেকেণ্ড, [illegible] ফার্ষ্টকে যদি তোমার বুকে দু'মিনিট দাঁড় করিয়ে রেখে দিতে পার, একসের রসগোল্লা খাও [illegible] তা রাখ্‌লে—

স্ত্রী স্বামীর দিকে স্নিগ্ধ নয়নে তাকাইয়া বলিল—আর এক সের রসগোল্লা খেলে ?

—না, সেটা আমরা ভাগাভাগি করে খেলুম—কিহে মনে পড়ে ? বৌদি তোমা[illegible] বুঝি কাঁদ্‌ছে ?

—হাঁ ভাই আমি যাই।

—[illegible] যাচ্ছি, কাকিমা, তুমি বস।

একটু বিস্মিত নয়[illegible] দিকে চাহিয়া কাকিমা বলিলেন—না, মা, আমিই যাচ্ছি [illegible]রটা অবশ্য দু'জনের কাছেই বিস্ময়ের ; এ বাড়ীতে ছোটছেলে মেয়ে কাঁদিলে, তাহাদের [illegible] [illegible]ওয়াই দস্তুর, কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহারা চুপ করিবে। কাঁদিলে কেহই ছুটিয়া যায় না।

গিন্নি চলিয়া গেলে অতিথি তাহার বন্ধুর হাতখানি টানিয়া জড়াইয়া বলিল—কি অসুখ [illegible]মার ভাই ?

স্ত্রী স্বামীর দিকে উদ্‌গ্রীব হইয়া চাহিল, এই প্রশ্নটিকে সে ভয় করিত, এবার বুঝি স্বামী তাহার রোগের দীর্ঘ ইতিহাস বলিতে সুর করে—[illegible] কবে হইয়াছিল, কবে ম্যালেরিয়া ধরিয়াছিল, কখন হাঁপানির টান, কোথায় কখন অম্লশূল হয়, কোন ডাক্তার দেখিয়াছে, কি চিকিৎসা হইয়াছে, ইত্যাদি। অতিথিটির সুডৌল সুন্দর দৃঢ় হাতের পাশে স্বামীর শীর্ণ হাতটির দিকে সে চাহিয়া রহিল।

বন্ধুর উজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া স্বামী উত্তর দিল—অসুখ আর কি, [illegible] general weakness—

পিঠ চাপড়াইয়া অতিথি জয়ধ্বনির মত বলিয়া উঠিল—তাই বল, ওত কোথাও চেঞ্জে গেলেই সেরে যাবে—আমি তোমার মুখ দেখেই বুঝছি কোন অসুখ নেই—দেখ একটা কাজে লেগে যাও —ওঃ, কলেজে তোমায় কি খাটাতুম—এসিস্‌টাণ্ট সেক্রেটারী করে যত ফরমাজ—

স্নিগ্ধ উৎসুখ চক্ষে স্বামীর দিকে চাহিতে স্ত্রীর চোখ অতিথির চোখের উপর আসিয়া পড়িল, সেই চোখের ভেতর সে যেন তাহার তরুণ স্বাস্থ্যবান কর্ম্মরত স্বামীকে খুঁজি[illegible] কি সুন্দর স্বামীর ছবি ভাসিয়া উঠিল। সে বলিয়া উঠিল—আচ্ছা আপনি মুখ দেখে বুঝ[illegible] [illegible]লেন ওঁর অসুখ নেই—

—হাঁ, আমি মুখ দেখে বুঝতে পারছি, ওর কোন কাজে লাগা দরকার—

—আচ্ছা আমার মুখ দেখে কি বুঝছেন ?

অতিথিটি মৃদু হাসিয়া বলিল—দেখ বন্ধু তোমার স্ত্রীটি একটি রত্ন।

রত্ন ! ব্যঙ্গ ! ভ্রূকুটি করিয়া স্ত্রী অতিথির দিকে চাহিল, কিন্তু সরল, শান্ত চোখের দিকে চাহিয়া সে বুঝিল, অতিথি সত্যই পরিহাস করিতেছে না। ওই জ্বলজ্বল চোখের ভেতর সে তাহার ভিতরকার কোন গোপন সত্যিকার 'আমি'র সন্ধান পাইল, প্রতিক্ষণ আয়নায় তাহার সাজসজ্জার যে ছবি দেখে সে রূপ নয়, ওই চোখে যে ছবি ভাসিয়া উঠিতেছে সেই তাহার সত্যিকার রূপ।

পরিহাসের সুরে স্বামী বলিল—হাঁ, রত্নই বটে। কিন্তু অতিথির মুখের দিকে চাহিয়া সেও বিস্মিত হইল। অতিথি বলিতে লাগিল—দেখ কি সুন্দর তোমার ঘরখানি সাজান, এঠিক লক্ষ্মীর কল্যাণ হস্তের সৌন্দর্য্য-ভরা—আর তোমার কতদিন অসুখ করেছে—ও মায়ের মত সেবা করছে—

স্বামী যেন কোন দুঃস্বপ্নের ঘোর হইতে চমকিয়া জাগিয়া উঠিল, সত্যই সে স্ত্রীকে
বোঝে নাই, সে পরিহাস করিয়াছে, অবহেলা করিয়াছে, সে তাহার কল্যাণী লক্ষ্মী
মাতা। প্রেম ও কৃতজ্ঞতার সহিত স্বামী স্ত্রীর দিকে চাহিল। [illegible] হইল না।
সে লক্ষ্মী! সে মা! এই অতিথিটি পরিহাস করিতেছে [illegible] ভাবিয়া বলিতেছে।
ব্যথিত স্বরে বলিয়া উঠিল—আপনি কিছু জানেন না, আমি ভণ্ড, আমি সৌখীন, আমি
না। তাহার দুই চোখে জল টলটল করিতে লাগিল।

রহস্যময় মধুর হাসিয়া অতিথি দাঁড়াইয়া উঠিল—তুমি ভালবাস না? তাহার দিকে
অগ্রসর হইতে কোণের গোল টেবিলের উপর এক এলবাম চোখে পড়িল। এলবামটি লইয়া
বলিল—এখান আমিই বিয়ের সময় তুলেছিলুম দেখছ—এই দেখ তোমাদের দু'জনের
সময়ের ফটো—দেখ ওই নবযুবক মুখ আর তোমার মুখখানা, এখন আয়নায় দেখ—ভালবাস—
জান না তুমি তোমার স্বামীকে কত ভালবাস—

স্ত্রী দেখিল, সত্যই কোন মায়মন্ত্রে তাহার মুখ বদলাইয়া গেছে; স্বামীর প্রতি তীব্র
ঘৃণায় ভরা সংসারের প্রতি পরিহাসে ভরা মুখখানি তরুণীর প্রেমাগুনে রঙীণ, বেদনায়
হইয়া উঠিয়াছে।

এলবামখানি অতিথির হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া ব্যথিতা স্ত্রী সেই বরবেশী স্বামীর
উপর মুখ গুঁজিয়া পড়িল।

তাহার চিররুগ্ন স্বামীকে মৃত্যুর পথ হইতে সে যে সর্ব্বদা আগলাইয়া আছে সেকি কেবল
বসন্তশেষে জীর্ণ পাতার মত হঠাৎ তাহার স্বামী ঝরিয়া যাইবে, যৌবনের মত খসিয়া পড়িবে,
তাহার চিরগ্রীষ্মের জ্বালা, চিরবর্ষার অশ্রুজল—এই জন্য কি? না, না, সে তাহার স্বামী
ভালবাসে।

স্বামী প্রেমকরুণ নয়নে স্ত্রীর দিকে চাহিল, সত্যই সে তাহার রত্ন।

সন্ধ্যাবেলায় ছাদে জ্যোৎস্নালোকে অতিথিটি তাহার বেহালা লইয়া বাজাইতে বসিয়াছে
ছোট ছেলেটি ছুটিয়া আসিয়া বলিল—এখন বেহালা বাজিও না, বাবা ওই ঘরে, বাবা নীচে গেলে
বাড়ীর মধ্যে একমাত্র এই ছেলেটিই সরল স্বাধীন প্রাণে ভরপুর, কিন্তু তাহার
লীলার উচ্ছ্বাস বাড়ীর বাহিরে, স্কুলে, খেলার মাঠে, পাড়ার ছেলেদের আড্ডায় প্রকাশিত
বাড়ীতে সে চুপচাপ।

অতিথি হাসিয়া বলিল—বাজিয়েই দেখা যাক না কি হয়। ছেলেটি মুখ গম্ভীর
বসিল। বেহালা শুনিতে তাহার খুব ইচ্ছা হইতেছিল, কিন্তু একটু পরে আরম্ভ করিলে
শোনা যাইত। ছেলেটির কথা ফলিল। কর্ত্তা সম্মুখের ঘরে একতাড়া দলিল ও একগাদা

[illegible] বাঁটিতেছিলেন, বেহালার ঝঙ্কার কানে যাইতেই হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া হাজির হইলেন।
[illegible] গেল হইয়া এক উর্দ্দু গান বাজাইয়া যাইতে লাগিল। কর্ত্তা আসিয়া একটু
[illegible]য়া বেহালা বাজান শুনিয়া [illegible]ন—এই চাঁদের আলো, বেহালার মধুর ঝঙ্কার, পুরাণো
[illegible]ত গানের সুখের স্মৃতি—সব যেন মায়াজাল রচনা করিয়া তাঁহাকে মন্ত্রমুগ্ধ করিল। গানটি
[illegible] করিয়া অতিথি মৃদু হাসিয়া বলিল—বস, দাদা। দাদা মাদুরে বসিয়া বলিলেন—
বাজাচ্ছিস ত—আর সেই—সেই গানটা মনে আছে—

—তুমি এসব ভুলে গেছ দাদা? একটু বাজাবে? আচ্ছা আগ্রায় সেই বেহালা বাজান
পড়ে—তুমি তখন নতুন শিখেছ, সখ—বল্লে, পূর্ণিমার রাতে তাজমহলের পাশে বসে বেহালা
বাজাতে হবে—বেহালা সারিয়ে ঠিক করা হল, গানের সুর ঠিক করা হল—আর সন্ধ্যেয় খেয়ে
উঠতেই বিষ্টি নামল—তুমি মনের দুঃখে একটা কবিতাই লিখে ফেল্লে—আমার মনে আছে।

যৌবনের সেই স্বপ্নভরা আনন্দভরা দিনগুলি! আজ তাহার রুক্ষ রহস্যহীন মুখ দেখিলে
কে কি বলিবে এই লোক একদিন বেহালা বাজাইয়াছে, কবিতা লিখিয়াছে, তাহার কোন মকেল
এ কথা বিশ্বাস করিবে কি! চাঁদের আলো দাদার চোখে বড় করুণ বোধ হইল। যৌবনের
রস গন্ধ আনন্দ লইয়া মূর্ত্তিমান বসন্তের মত এই যে যুবক তাহার পাশে বসিয়া—তাহার দিকে
চিনি ক্ষুব্ধ ব্যথিত নয়নে চাহিলেন। জীবনতরী কখন বছরের পর বছর স্বপ্নময় যৌবনের
সৌন্দর্য্যপুষ্পময় প্রেমসঙ্গীতমুখর ঘাটগুলি পার হইয়া চলিয়া আসিয়াছে তাহা তিনি জানিতেও
পারেন নাই। বিগত যৌবনের স্মৃতি এ জ্যোৎস্না রাতে তাঁহাকে উন্মনা করিয়া তুলিল। ধীরে
ধীরে তিনি বলিলেন—আরও বাজাও ভাই, বেশ হাত তোমার, সেই সেই সুরটা মনে আছে—আমি
প্রায়ই বাজাতুম—

বাবা সত্যই বেহালা শুনিতে বসিলেন দেখিয়া ছোট ছেলে অবাক হইল। বাবা যখন
বেহালার সঙ্গে গুন গুন স্বরে গান আরম্ভ করিলেন, তখন সে মন খুলিয়া হাসিবার জন্য ঘর
চলিয়া গেল। সে রাতে বাবার আর আইন পড়া হইল না, মুদির দোকানের মাসিক হিসাব দেখার
কথা ছিল, তাহাও তিনি ভুলিয়া গেলেন।

রাত্রি গভীর হইয়াছে, তিন নম্বরের সবাই প্রায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। অন্য রাতে মাঝে মাঝে
ছোট খুকী কাঁদিয়া উঠিয়া জানায় রাত্রেও তিন নম্বর নীরব থাকে না। আজ কিন্তু সেও নীরব।
অতিথিটি বেহালা বাজান বন্ধ করিয়া ছাদের কোণে এক ইজিচেয়ারে দশমীর চাঁদের আলোয়
বসিয়াছিল, সম্মুখে পথের কদম গাছে জোৎস্না ঝিকিমিকি করিতেছে, কৃষ্ণচূড়া গাছটি রঙীণ স্বপ্নের
মত দাঁড়াইয়া। তাহার চিরশান্ত স্নিগ্ধ হাস্যোজ্জ্বল মুখখানি এখন কোন অজানা বেদনায় একটু
করুণ, একটু তৃষিত উদাস দৃষ্টিতে সম্মুখে চাহিয়া সে চমকিয়া উঠিল। শুভ্রস্বপ্নের মত কে তাহার

...ন আসিয়া দাঁড়াইল, সুন্দরী জ্যোৎস্না যেন মর্ত্ত্যভূমে মূর্ত্তি লইয়া তাহার সম্...
দাঁড়াইল। তাহার ব্যথিত মুখখানি জ্বলজ্বল করিয়া উঠিল। নিমেষের মধ্যে ভা...
পারিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া যুবক অতিথিটি বলিল—...খানে ?

তরুণী লজ্জায় রাঙা হইয়া বলিল—হাঁ, আমি এখানেই ত আছি।

—আমার সারাদিন মনে হয়েছে, তুমি যেন এবাড়ীতে আছ, সারাদিন মনটা ...
বসে তোমার কথাই ভাবছিলুম।

—আমার কথা !

—হাঁ, কেমন আছ ?

—ভালই আছি।

যুবকটি করুণ চোখে তরুণী বিধবার ব্যাকুল মুখখানি দেখিল, তাহার হাসির এ...
ছবি আঁকা আছে সেটি ত এমন কর্ম্মক্লান্ত শীর্ণ দুঃখভারনত নির্ব্বাক বহ্নিময় নহে। ...
বলিল—না, তুমি ত ভাল নেই আমি দেখতে পাচ্ছি, এ বাড়ীর মধ্যে সবাই ভাল আ...
তুমি নও।

মুখে অস্বাভাবিক দীপ্তির অবগুণ্ঠন টানিয়া তরুণী বলিল—ভাল নেই ? বেশ আছি...

যুবক ক্ষুব্ধস্বরে বলিল—না, তুমি ভাল নেই, তুমি স্বাভাবিক নেই, আমি ...
তোমার প্রাণ ছটফট করছে, লোহার ছোট খাঁচা পোরা বনের পাখীর মত সে ছট্‌ফট ...
কাঁদ... আপন ব্যথায় গুমরে মরে, আপনার পাখা দুটো ছিঁড়ে খসিয়া ফেলছে লোহা...
... উপর আছাড় খেয়ে খেয়ে—শেকলে আঘাত করে তার পা'কে পঙ্গু করছে—আ...
প... ছ—তোমার দেহের রং দেখেই বুঝছি—আপনার মধ্যে তুমি আপনাকে দগ্ধ করছ—

তরুণীর চোখ জলে ভরিয়া টল টল করিতে লাগিল, তাহার মুক বেদনা অস্ফুট ...
একটু প্রকাশ পাইল।

যুবকটি ব্যথিতকণ্ঠে বলিল—না, বাঁচবে না তুমি এম্নি করে, বাঁচবে না ! হায় ...
বসন্ত জ্যোৎস্নায় তোমার বুকে কালো পাথরের বিজন অন্ধকার কে চাপাল ! বেরিয়ে এ...
চলে এস—যাবে আমার সঙ্গে ?

ঝলমল মুখে তরুণী যুবকটির চোখে চাহিল। যুবকটি বলিল,—দেখ প্রথম ...
তোমাকে আমি খুঁজেছিলুম, আজও আবার তোমায় চাইছি—আসবে আমার সঙ্গে—তু...
আমার ঘর আর কেউ বাঁধতে পারবে না—বল—বল—

তরুণীর সমস্ত দেহ সেতারের তারের মত কাঁপিয়া উঠিল, সে যেন মূর্চ্ছিতা হইয়...
স্বপ্নের ঘোরে সে যেন বলিল—তুমি ! যাব ? কোথায় যাব !

তারাভরা আকাশের তলে মৃদু জ্যোৎস্না আলোয় সেই তরুণী ও যুবকের মনে...

...র মত পশাপাশি তাহারা যদি নিঃশব্দে সহজ আনন্দে জীবনপ্রদীপ জ্বালিয়া চলিয়া ...
পারিত ! তাহারা যদি চিরদিন এই জ্যোৎস্না আকাশের মত সংসারের পরম আদর ...
তর্কহীন কোন সৌন্দর্য্য... করিয়া ওই দুইটি শুভ্র লঘু মেঘখণ্ডের ...
...র মধুরভাবে ভাসিয়া যাইতে পারিত !

সংসারেই খুকী কাঁদিয়া উঠিল, একটা নিশাচর পাখী ডাকিয়া উড়িয়া গেল, রাস্তা দিয়া ...
... মোটর চলিয়া গেল, তাহাদের স্বপ্ন টুটিয়া গেল। জলভরা চোখে যুবকের দিকে চাহিয়া ...
... চলিয়া গেল।

... ছাদ পার হইয়া একবার সে ... ঘর পূর্ব্বের জানালার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। স্বামীর ...
... মাথা রাখিয়া স্ত্রী সুখস্বপ্ন দেখিতে দেখিতে আনন্দে ঘুমাইতেছে। একবার গিন্নির ঘরের ...
... কাছে একটু থামিল, মা তাঁর খুকীকে স্নেহবক্ষে জড়াইয়া আদর করিতেছেন। জেঠাইমার ...
... ঘরে উঁকি মারিল, প্রৌঢ়া বিধবা তাঁর শাস্ত্রগ্রন্থ ও হরিনামের মালার পাশে অঘোরে ঘুমাইতেছেন। ...
... নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিল না—বারান্দার এক কোণে শুইয়া পড়িল।

একদিন এ যুবকটি তাহাকে ভালবাসিয়াছিল, সেও ভালবাসিয়াছিল, তাহাদের বিবাহের ...
... হইয়াছিল, তারপর যুবকটির ভয়ঙ্কর অসুখ করিল অন্য জায়গায় তাহার বিবাহ হইয়া গেল। ...
সে... যুবক বাঁচিয়া আছে, সে যৌবন-বসন্তের মত তাহার প্রাণের দ্বারে আবার অতিথি হইয়া ...
আসিয়াছে, কিন্তু সে প্রেমিকা কিশোরী যে কবে মরিয়া গিয়াছে। হায় সে কি করিবে ? এক ...
জ্যোৎস্না রাতে এই যুবকের কণ্ঠে সে যে গান শুনিয়াছিল তাহার উচ্ছ্বসিত সুর তাহাকে ভাসাইয়া ...
দিল—আজি বসন্ত জাগ্রত তার দ্বারে !

ইহার পর সাত দিন কাটিয়া গেল। এই সাতদিনে তিন নম্বরের পরিবর্ত্তন দেখিয়া পাড়ার ...
লোকেরা অবাক্ হইল। তিন নম্বর ত চিরদিন এই রকম ছিল না। এই অতিথিটির কিশোর ...
বয়সে এই তিন নম্বরে বেহালা বাজিত, গান উঠিত, হাসি উঠিত, তরুণ-তরুণীর প্রেমলীলা হইত, ...
সেই জীবনআনন্দকল্লোলময় তিন নম্বরের বিগত দিন-গুলির স্বপ্নে আবার তিন নম্বর উতলা হইয়া ...
উঠিল ; এ অতিথি তাহার সুখস্মৃতি বহন করিয়া লইয়া আসিল। অতিথিটির প্রথম যৌবনের রঙীণ ...
চিত্তপটে দাদা, বৌদি, জেঠাইমা সবাইয়ের যে ছবিগুলি আঁকা আছে, তাহা হইতে আজিকার তিন ...
নম্বরের লোকগুলি অনেক বদলাইয়াছে, কিন্তু উল্লসিত যৌবনের আনন্দ উচ্ছ্বাসে এ অতিথি তাহা ...
স্বীকার করিল না। সংসারের এ পরিবর্ত্তন সে মানিল না। সে বলিল, তোমাদের সেই যৌবনের ...
সৌন্দর্য্য আনন্দ, উচ্ছ্বাস শুধু আমার স্মৃতিতে নয়, তোমাদের বর্ত্তমান জীবনেই লুকান রহিয়াছে, আমি ...
দেখিতে পাইতেছি। তিন নম্বরের লোকেরা অতিথির এ স্বপ্ন মানিয়া লইল। একটা লোক ...
যদি সত্যই বিশ্বাস করিয়া বলে, তুমি সৎ, তুমি সুন্দর, তাহার সম্মুখে কেহ সহজে হীন মন্দ কাজ

করিতে পারে না। লোকনিন্দার ভয়ে পরিচিত জনের বেদনার লজ্জায় সমাজের চো
সৎপথে থাকে। এই অতিথিটির মন খুসি রাখিবার জন্য
গেল। জেঠাইমার আর ঝগড়া করিতে
দেখিলেন তাঁহার
দিল—বেড়ালে।

বেড়ালে! অন্য সময় হইলে এই লইয়া তুমুল কাণ্ড
উঠিলেন।

গিন্নি হয়ত ঝিকে আর একটা
দাগ ওঠে নি, আবার
মাজা হয়েছে।
রাজী আছে।

অশান্ত মনগুলি শান্ত হইল, কলহমুখর মুখগুলিতে আনন্দের হাসি ফিরিয়া
কিন্তু সে তরুণী বিধবা নিঃশব্দে শান্তিতে এ সংসারে কাজ করিয়া যাইতেছিল সে
দিশাহারা হইয়া গেল। হায়, তুমি কেন এলে? কেন তোমার চোখের চাওয়া
বেদনা মথিত করিয়া তুলিলে, কেন এ অন্ধকারে বন্দিনীর দ্বারে রঙীণ পথের বাঁশি বাজা
যৌবন পথিক, তুমি কেন এলে?

পূর্ণিমার চাঁদ পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িয়াছে, আকাশে মেঘ ও জ্যোৎস্নার লুকোচুরি
মৃদু বাতাসে কদম গাছটি প্রতীক্ষমানা প্রিয়ার বুকের মত কাঁপিতেছে। বাড়ীখানি নিঝুম, সু
তরুণাটি উঠানের সামনে রকের কোণে বুকে মুখ গুঁজিয়া চুপ করিয়া ব
তাহার কালো চুলের ভার কালো যবনিকার মত মুখের সম্মুখে ঝুলিয়া পড়িয়া চাঁদে
হইতে ব্যথায় রাঙা মুখখানি ঢাকিয়াছে। সে ভাবিয়া ভাবিয়া দিশাহারা হইয়া
খুঁজিয়া পাইতেছে না।

সহসা এক মৃদু পায়ের শব্দে চমকিয়া উঠিল। চুলগুলি সরাইয়া মু
চাহিল না, বুঝিতে পারিল কে আসিয়াছে।

অতিথি বলিল—শোন, চাও!

আপনাকে আর সে দমন করিয়া রাখিতে পারিল না, চুল দোলাইয়া সে মু
চাহিল, যুবকের চোখের দিকে বিমুগ্ধ হইয়া চাহিল, চাঁদের আলোয় চোখ দুটি হীরার
করিতেছে, সাদা আলখাল্লা ঝলমল করিতেছে—নিবিড় অন্ধকারময় বিজন গিরিপ্রান্তর
পথহারা পথিক সহসা দূরে একটি আলোর শিখা দেখিলে যেমন জয়ধ্বনি করিয়া

তাহার তরুণ অন্তর জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল—কিন্তু নিমেষের জন্য—আবার সে কালো চুলে
মুখ চাপিয়া বুকে মাথা গুঁজিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া বলিল,—কেন তুমি এলে?
যাও, তুমি যাও!

বসন্তের শেষরাত্রির দক্ষিণ হাওয়া ফুলেদের কাণে কাণে যেমন চুপে চুপে বলে তেম্নি
অতিথি বলিল—আমি চলে যাচ্ছি, দরজাটা বন্ধ করে দাও।

আর একবার পার্শ্বের সম্মুখ হইতে চুলের বোঝা সরাইয়া তরুণী তৃষিত সজল নয়নে
পথিকের বিদায়করুণ মুখখানি দেখিল, তারপর চোখ বুজিয়া মাথা নত করিল।

অতিথি যখন ধীরে দরজা খুলিয়া জ্যোৎস্নাপ্লাবিত মায়াপথ দিয়া দক্ষিণ বাতাসে
সুদূরে কোথায় চলিয়া গেল, তরুণী শিহরিয়া উঠিল, চঞ্চলপদে দরজার কাছে গেল, আলোছায়াময়
আঁকা বাঁকা গলিটি তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। ওইত যৌবন-পথিক চলিয়াছে,
কত সৌন্দর্য্যের দেশে, কত ফুলের গানের দেশে যাইবে।

তরুণী দরজা পার হইল না, দরজা বন্ধও করিল না, চৌকাঠের ওপর মুখ গুঁজিয়া
লুটাইয়া পড়িল।

চাঁদ মেঘে ডুবিয়া গেল, জমাট অশ্রুর মত সাদা কাপড়ের ওপর এলানো কালো
চুলগুলি রাত্রির অন্ধকারের চেয়েও নিবিড় হইয়া আসিতে লাগিল।

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

বে-আইনী

দাসু ঘোষ পাড়াগাঁয়ের গোয়ালা। কয়টা গরু আর কয় ঘর খরিদ্দার লইয়া তার দিন বেশ চলিয়া যায়! থাকিবার মধ্যে আছে একটি মাত্র মেয়ে রাণু—মা-মরা মেয়ে! মেয়ের বয়স পাঁচ বৎসর। বাপের কোলে-পিঠে চড়িয়াই মেয়েটি মানুষ হইতেছিল।

শত কাজকর্ম্মের আড়ালে প্রাণ যখন শোকের ঘায়ে কাতর হইয়া পড়ে, এই মেয়েকে বুকে চাপিয়াই সে সান্ত্বনা পায়, আরাম পায়। বিকালে তাকে লইয়া শিবতলার মাঠে গিয়া বসে, মন্দিরের দ্বারে গিয়া ঠাকুর দেখায়, বনের ফুল ছিঁড়িয়া তার দুই হাতে গুঁজিয়া দেয়; নদীর ঘাটে গিয়া নৌকা গোণে—একখানা, দুইখানা—কতগুলা নৌকা ভাসিতেছে!

ঘাটের পাশে সেই শ্মশানঘাট,—বাব্‌লা ঝোপের মাঝে ঐ সে জায়গাটা, যেখানে নিজের হাতে চিতা জ্বালিয়া রাণুর মাকে একদিন তুলিয়া দিয়াছে, নিজের হাতে তার মুখে আগুন ধরাইয়া

দিয়াছে। ধূ-ধূ জ্বলিয়া চিতা গরিবের শেষ সম্বলটুকু পুড়াইয়া ছাই করিয়া দিয়াছে। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসে, তার প্রাণ শিহরিয়া ওঠে, মনে হয়, ঐ বুঝি চিতা এখনো আকাশের পানে চলে, একটা দুইটা তারা মিট্ মিট্ ক'রে ও বুঝি সে তারি চোখ মা'র। সমস্ত প্রাণটা তার আঁতরিয়া ওঠে, তাড়াতাড়ি সে মেয়েকে লইয়া বাড়ীর পানে এমনি করিয়াই দিন যায়। এমনি করিয়াই মেয়ে রাণু আট বৎসরে পড়িল। দল আসিয়া তখন দাসুকে বলিল,—এইবার মেয়েটির বিবাহ দাও।

দাসুর চোখ ছলছলিয়া উঠিল। বুকের পাঁজরা রাণু, বুকের রক্তে মানুষ-করা রাণু— দিয়া তাহাকে পরের ঘরে পাঠাইতে হইবে! এ শূন্য করিয়া সে কোথায়, কত দূরে, কোন্ অজানা ঘরে—দাসু এ ঘরে তখন থাকিবে কি করিয়া! শিহরিয়া ওঠে! সারাদিন কাজকর্ম্মের মাঝে রাণুকে চোখের আড় করিতে হয়—সেটুকু যেন প্রাণে কে পাথর চাপিয়া ধরে, তাই সে হাঁপাইয়া ঘরে আসে, রাণুকে বুকের মধ্যে লয়, প্রাণটা তবে শীতল হয়! সেই রাণু চলিয়া যাইবে? এই ঘর, অপরাহ্নের বেলা পড়িয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে ভরিয়া যাইবে, কে তখন বাবা বলিয়া তার গলা জড়াইয়া ধরিবে অমৃত সুরে সারা ঘরে সুরের স্রোত বহিতে থাকিবে! আঁধার ঘর আঁধার থাকিবে—কারো ডাকে সুর ফুটিবে না, কারো নয়নের দৃষ্টি হইতে আলোর ছিটা পড়িবে না। দাসু বাঁচিবে কি করিয়া?

জ্ঞাতি-কুটুম্ব বলিল,—মেয়ে আঁকড়ে থাকলে চলবে না তো! বিয়ের বয়স হয়েছে যে

উঠানের কোণে মাটির পুতুল সাজাইয়া রাণু সেখানে গিয়া খেলা করিতেছে শাড়ীর পুঁটলিটির মতই কুণ্ডলী পাকাইয়া বসিয়াছিল—মাথাটুকু শুধু দেখা যায়। তার পানে দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া দাসু শুধু একটা নিশ্বাস ফেলিল, তার মুখ দিয়া কোন শব্দ বাহির হইল

জ্ঞাতি-কুটুম্ব ছাড়িবার পাত্র নয়! তারা দাসুর পিছুনে সৎ পরামর্শ দিতে ত্রুটি রাখিল ও-পাড়ার নফর গোয়ালা শেষে পরামর্শের সঙ্গে পাত্রেরো সন্ধান আনিল—ছেলেটি ভারি ভাগ্‌নে হয়, থাকে কলিকাতায়। মস্ত গোয়াল তার বাপের, গোয়াল-ভরা গরু—ঘরে গাড়ী আছে—সেই গাড়ীতে করিয়া নিত্য সে কলিকাতার নতুন বাজারে দুধের জোগান দিতে এমন পাত্র হাতছাড়া করিলে বিশেষ রকমে পস্তাইতে হইবে শেষে।

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া মাথা নাড়িয়া দাসু ভাবিল, এ অন্ধ মায়া ভাল নয়। মেয়ে—এ যে পরের ঘরের জন্যই তৈরী, ইহাকে বুক দিয়াও রাখা যায় না তো রাখিবার নয়—ইহাকে বিলাইতেই হইবে! তবে আজ, নয়, কাল!

রতন ঘোষ বলিল,—তার চেয়ে এক কাজ কর বরং। ষষ্ঠীর ভাইপোটিকে জামাই চাই কি, তোমার ঘরে এনেই তাকে রাখতে পারো, মেয়েকেও দূরে পাঠাতে হবে না!

রতন দাসুর টাকা ধারে, কাজেই দরদ তার এতখানি! দাসু ভাবিল, তা হয় না; তাতে কাজের কাছে ইজ্জতের হানি আছে—ঘর-জামাই! সে কি মানুষ হইবে, বিশেষ মুর্খ গোয়ালার ঘরে!

দাসু মাথা নাড়িয়া বলিল, আমার এ বয়সে নতুন গিঁট দেওয়া—তার চেয়ে আসিয়ে দেওয়াই ভালো। প্রতিমাকে তিনদিন আদর করে ঘরে রেখে জলেই তো দেয় মানুষ—বুক ভেঙে গেলেও তাই দেওয়া ব্যবস্থা!—সেটা ঠিক! দাসু চুপ করিয়া রহিল।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

তখন আর রাণুর বিবাহে বাধা রহিল না।

নফর একটা দাঁও মারিল। বাপের এক মেয়ের সঙ্গে বিবাহের বন্দোবস্ত করিয়া ও-পক্ষ হইতে সে মোটা রকমেরই কমিশন আদায় করিল।

শ্রাবণের এক সজল নিশীথে দাসু তার বুকের পাঁজরা ভাঙ্গিয়া রাণুকে জন্মের মত পরের হাতে তুলিয়া দিল। মুখে-চোখে অশ্রু মাখিয়া চেলির কাপড় পরিয়া জগতে তার একটি মাত্র আপন জন, তার এই বুড়া বাপকে ছাড়িয়া কোন্ অজানা ঘরে রাণু চলিয়া গেল।

২

দাসুর আর এখানে দিন কাটে না ! গরু, গোয়াল, খরিদ্দার ভুলিয়া সব ছাড়িয়া দিয়া নিশিদিন কলিকাতায় পথে পথে ঘুরিয়া এক অজানা ঘরের আছাড় খাইয়া মরিতে লাগিল। হায়রে, কোন্ অজানা কোণে কি করিতেছে সে—একরত্তি মেয়ে ? মা-হারা, বাপ-জানা রাণু ! আব্দারের তার সীমা ছিল না,—সেখানে কার কাছে আব্দার করিতেছে—কেই বা আব্দার রাখে তার !.....যদি কেহ রূঢ় কথা বলে, যদি কেহ চোখ রাঙাইয়া ওঠে ! সে যে চোখ কোনো কালে জানে না ; রূঢ় কথার ধারও ধারে না। একটা কথার জবাব দিতে দেরী হইলে যে সে কাতর হইয়া পড়ে ! সেখানে অজানা লোকজনের মাঝে কে জানে, সে কেমন সময়ে কেই বা ডাকিয়া খাবার দেয় ! সে যে এখানে সন্ধ্যায় ঘুমাইয়া পড়িত, কত বুঝাইয়া ভুলাইয়া, কি আদর করিয়াই না তাকে খাওয়াইতে হইত ! সেখানেও তেমনি হয়তো পড়ে, যদি কারো মনে পড়ে, হয়তো ডাকে ! ডাকিয়া সাড়া না পাইলে হয়তো বিরক্ত হয়—দুটা ঝাঁজালো কথাও শুনায়, বেচারী তাতে আরো নির্জ্জীব হইয়া পড়ে ! হয়তো কতদিন অমনি জোটে না ! তারা তো জানে না, ও মেয়ে দাসুর কে,—ও মেয়ের দামটা কি ! তারা বাঙালীর ঘরের সর্ব্বসহা বৌ ও !

ভাবিয়া মন-মরা হইয়া দাসু অসুখে পড়িল। মাহিনার লোক নিখুঁত কাজের কথা বলিল—দুই-চারিজন আসিয়া বলিল, মেয়েকে আনাও ! দাসু গুম্ হইয়া রহিল, কথা বলিল না। শূন্য ঘরে রোগের ঘোরে মন তার কলিকাতার দ্বারে-দ্বারে ঘুরিয়া মরিল। পথে ঘাটে কোথাও ঠাঁই মিলিল না। অজানা ঘর—তায় অজানা কোণ—কোথায় ভিড়ে রাণু বসিয়া আছে ..!

জ্বরটা শেষে বিকারে দাঁড়াইল। বিকারের ঘোরে কতবার সে চমকাইয়া উঠিল ডাকিল,—রাণু, মা ! কিন্তু কোথায় রাণু ?

নফর একখানা চিঠি লিখিয়া দিল রাণুর শ্বশুর-বাড়ী, দাসুর অসুখ, রাণুকে পাঠাইয়া দিও।

সে চিঠির জবাব আসিল না—রাণু তো আসিলই না।

ভুগিয়া ভুগিয়া দাসু সারিয়া উঠিল। আবার সেই ঘর, সেই দাওয়া, সেই গোয়াল, সেই সব—শুধু রাণু নাই ! ইহার চেয়ে রোগে ভোগাও ছিল ভাল ! ঘোরে রাণুর দেখা মিলিত, তার সঙ্গে কত কথা হইত যে !

আরো ছয়মাস কাটিলে সে একদিন নফরকে ধরিল,—মেয়ের বিয়েই দিয়েছি—কি জন্মশোধ বিলিয়ে দিছি, দাদা ! একবার এখানে সে আসবে না ?

শিল্পী—শ্রীগগনেন্দ্র নাথ ঠাকুর।

টাইগার ফিল্ম

BLOCKED INFORMATION.
COLOUR PICTURE

নফর ভ্রূটা একটু কুঞ্চিত করিয়া বলিল,—তাদের বাড়ীর কি দস্তুর, জানো? হাজার হোক; পয়সাওলা লোক, বাড়ীর বৌকে তারা কোথাও পাঠায় না।

দাসু প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল—কিন্তু এ কি আর কোথাও? এ যে বাপের কাছে—বুড়ো বাপ—যার আর তিনকুলে কেউ নেই ঐ মেয়ে ছাড়া—

নফর এবার এ কথার জবাব দিতে পারিল না। দাসু আকাশের পানে তাকাইয়া রহিল। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে—একরাশ নক্ষত্র হীরার কুচির মতই আকাশের নীল পটে চিক্ চিক্ করিতেছে!

৩

দাসু ঠিক করিল, হোক অপমান—জামাই-বাড়ীতেই সে যাইবে। মেয়েকে দেখিতেই হইবে—নহিলে বুক্ যে ফাটিয়া যায়।

একদিন ভোরের বেলায় ষ্টেশনে গিয়া টিকিট কিনিয়া সে রেলে চড়িয়া বসিল এবং বেলা প্রায় দু'টার সময় কলিকাতায় নামিল।

এখানে ওখানে কত সন্ধান লইয়া, নানা পথ ঘুরিয়া এক গা ঘামিয়া শ্রান্ত দাসু আসিয়া জামাই-বাড়ী পৌঁছিল বৈকালে। যে রকম অভ্যর্থনা আশা করিয়াছিল, তা তো জুটিলই না, জামাই শ্বশুরকে দেখিয়া একটা প্রণামও করিল না; বেয়াই শুধু বলিল,—এই যে, এসো বেয়াই।

তার পর নানা কথার পরও যখন রাণুকে দেখার কথা কেহ পাড়িল না, তখন দাসু নিজেই অত্যন্ত কুণ্ঠিত স্বরে বলিল,—একবার রাণুকে দেখব।

বেয়াই বলিল,—তা দেখবে বৈ কি!

দাসুকে ভিতরে লইয়া যাওয়া হইল। দাসু প্রবেশ-পথে দেখিল রাণু, একটা মস্ত জলের ঘড়া কাঁকালে করিয়া কলতলা হইতে চলিয়াছে। হঠাৎ দাসুকে দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিল,—সঙ্গে সঙ্গে পা পিছলাইয়া কলসী-সমেত পড়িয়া গেল। ঘড়ার কানা লাগিয়া কপালটা কাটিয়া গেল। দাসু ছুটিয়া গিয়া তাকে ধরিল।

তারপরে দাসু মেয়েকে এক রকম কোলে করিয়াই ঘরের মধ্যে আসিল। মেয়ের পানে চাহিয়া তার প্রাণ শিহরিয়া উঠিল! এই তার সেই রাণু! এ যে একটা শীর্ণ কঙ্কাল! পরণে একখানা ময়লা চিরকুট—গায়ে একখানা গহনা নাই! এই কি সে বড় মানুষের ঘরের আদরের বৌ!

অনেকক্ষণ মেয়েকে দেখিয়া দেখিয়া দাসু ডাকিল,—রাণু, মা। রাণু সাড়া দিল,—বাবা! বাপের পানে মুখ তুলিয়া সাড়া দিয়াই সে মাথা নামাইল।

আশ্চর্য্য! এ কি রাণুর কণ্ঠস্বর! কোথায় সেই আদরে-ভরা হাল্‌কা হাওয়ায় নাচানো গানের সুর! রাণু হাওয়ার মতই চঞ্চল, সলীল—সে এমন গম্ভীর নয় তো! কে এ? দাসু ভাবিল, তবে কি তার রাণুর ভিতরটা সব কাড়িয়া শুধু তার জীর্ণ খোলস্‌টাকে সে এই পরের হাতে তুলিয়া দিয়াছে!

BLANK PAGE(S)

দাসু তাকে কোলে টানিয়া তার মুখে-চোখে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল,—বড্ড গেছে, ঠোঁটটা !...অমন কাজও করে ! অত বড় ঘড়া ছেলেমানুষ বইতে পারে ?...কেন, চাকর নেই ? বড় লোক তো এরা—

রাণু সে কথায় কাণ দিল না—বাপের পানে চাহিল। সে কি দৃষ্টি ! সে দৃষ্টিতে ছিন্নবাহির হইয়া পড়িল, তরুণ প্রাণের কি যে করুণ ইতিহাস, মর্ম্মবেদনার কি কাতর উচ্ছ্বাস !

দাসুর আর বুঝিতে বাকী রহিল না, রাণুকে সে কোথায় পাঠাইয়াছে। রাজার রাণী হইবে ভাবিয়া, সহরে বড়লোক কুটুম করিয়া তার যে কত বড় লাভ হইয়াছে, এক নিমেষে তা বুঝিয়া ফেলিল ! যদিই বা বুঝিতে গিয়া দুইটা প্রশ্ন করিত, তারও প্রয়োজন হইল না। বাহিরে টিপ্পনীর সুর শুনা গেল—বাপ-সোহাগী আদুরী মেয়ের সোহাগ হচ্ছে ! বাপ আমার ফাঁসি দেবে !

এ কথা শুনিয়া দাসু একেবারে কাঠ হইয়া গেল। মেয়ের পানে চাহিয়া চাহিয়া প্রচণ্ড রোষের একটা তীব্র বিদ্যুৎ-শিখা তার শান্ত প্রাণটাতে আগুনের হল্কা বহাইয়া দিল। মেয়েকে বুকে টানিয়া সে বলিল—আমার সঙ্গে যাবি মা ? মেয়ে ব্যাকুল নিবেদন-ভরা চাহনি বাপের প্রশ্নের জবাব দিল, মুখে কথা বাহির হইল না।

দাসু বলিল,—কালই তোকে নিয়ে যাব।

রাণু অত্যন্ত ভীত নয়নে চারিদিকে চাহিয়া কুণ্ঠিত স্বরে বলিল,—এরা পাঠাবে না।

দাসুর প্রাণ হুঙ্কার দিয়া উঠিল, না—পাঠাবে না ! আমি তো মেয়ে বেচিনি কসাই-বাড়ী।

রাণু ভয়ে এতটুকু হইয়া গেল। চম্‌কাইয়া বাপের মুখ চাপিয়া সে কহিল—চুপ, চুপ! ছোট্ট ইঙ্গিত ! কিন্তু দাসুর বুকে তা'ই একখানা প্রকাণ্ড শোকের ছবি আঁকিয়া তুলিল।

* * *

অনেক রাত্রি। বিছানায় পড়িয়া দাসু ছট্‌ফট্ করিতেছিল। রাণুর যে-মূর্ত্তি সে দেখিল, তা দেখিয়া প্রাণ যে স্থির থাকে না ! মেয়েটা তো এ দশায় থাকিলে বাঁচিবে না। ঐ এক মেয়ে, আর কেহ নাই তার ! ইহাদের কি ! একটা বৌ গেলে অমন পাঁচটা জুটে। কিন্তু তার যে ঐ এক, তার সব—গেলে আর পাইবার নয় !

অন্ধকার ঘর। হঠাৎ কার হাতের স্পর্শ গায়ে ঠেকিল ! সঙ্গে সঙ্গে অতি মৃদু কে ডাকিল,—বাবা—

——রাণু ?

—হ্যাঁ, চুপ।

তারপর মেয়ে কাঁদিয়া বলিল,—আমায় নিয়ে চল, এখনি। নাহলে.....

কথাটা শেষ হইল না। তবু দাসু বুঝিল, না হইলে কি হইবে ! কিন্তু কি করিয়া যাওয়া যায় ! ইহারা পাঠাইবে না। বেয়াইয়ের কাছে কথাও পাড়িয়াছিল, বেয়াই হাসিয়া বলিয়াছে, তাদের বাড়ীর বৌকে বাপের বাড়ী পাঠাইবার রেওয়াজ নাই !...তবে..... ?

রাণু বলিল,—আজ রাত্রেই চল বাবা, এখনি। নাহলে কাল ওঁরা পাঠাবেন না। তুমিও কাল চলে-যাবে, কুটুম-বাড়ী কাল তো আর থাকবে না।

ভোর না হইতেই মেয়ের হাত ধরিয়া বেচারা দাসু বাড়ীর বাহির হইল। একটু গিয়া একটা গাড়ীতে করিয়া ষ্টেশনে গেল। যখন ট্রেণ চলিল, রাণু একেবারে বাপের বুকে ঢলিয়া পড়িয়া ডাকিল—বাবা, আর আমায় সেখানে পাঠিয়ো না। আমি মরে যাব।...একটা বৌ শাশুড়ীর জ্বালায় গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে। তাই আমার সঙ্গে বিয়ে দেছে—কলকাতায় কেউ মেয়ে দিচ্ছিল না।

দাসু চমকিয়া উঠিল। বটে, তাই ! তাই নফরের অত অনুরোধ অত আগ্রহ ! রাগে মনটা দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। পাজী, বেইমান, বিশ্বাসঘাতক ! কিন্তু মিথ্যা এ রাগ। মেয়ের পানে সস্নেহ দৃষ্টিতে চাহিয়া দাসু বলিল,—না মা, আর সেখানে পাঠাব না। রাণু বলিল,—পাঠালেও আমি সেখানে যাব না। রাণু চোখের জল মুছিল।

৪

তবুও রাণুকে যাইতে হইল, তবে পুলিশের সঙ্গে।

রাণুর শ্বশুর ছেলেকে দিয়া আদালতে নালিশ করাইল, মেয়ের বাপ আসিয়া তার বাড়া হইতে তার স্ত্রীকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। সে রাণুর স্বামী, আইনতঃ সেই তার অভিভাবক। বাপের সঙ্গে সম্পর্ক কি ?

হাকিম আইনের চাকর। রাণুর নামে তখনি ওয়ারেণ্ট বাহির হইল, দাসুর নামেও বাদ গেল না। আসামী হইয়া দাসু আসিল কলিকাতার পুলিশ কোর্টে বিচারের জন্য।

* * *

এই সময় আমার সঙ্গে দাসুর দেখা। আমি দাসুর পক্ষে দাঁড়াইলাম। ব্যাপার শুনিয়া দাসুকে বলিলাম,—মামলা মিটাইয়া ফ্যালো, দাসু। আইন তোমায় সাজা দিবে।

দাসু অবাক ! মেয়ে অত্যাচারে জ্বলিতেছিল, পরের হাতে পরের ঘরে,—তার নিজের মেয়ে, ঐ এক মেয়ে, তার উপর মা-হারা সে। তাকে সে বাঁচাইতে চায় বলিয়া আইন তাকে সাজা দিবে !

আমি বুঝাইলাম, স্বামীই স্ত্রীর একমাত্র মালিক !

দাসু বলিল,—ঐ তো স্বামী ! তাছাড়া মেয়ে আমার একেবারে কচি, অত অত্যাচার তার সহিবে কেন ?

আমি বলিলাম,—তাই বলিয়া তুমি চুরি করিয়া সেখান হইতে মেয়েকে আনিতে পারো না।

দাসু বলিল,—চোখের সামনে দেখিব, মেয়েটাকে মারিয়া ফেলিবে ?

এ কথার উত্তর নাই। তখন আমার জুনিয়ারীর পালা। আইন তেমন মাথায় গাঁথা বসে নাই, মানুষের মনটাকেই আইনের চেয়ে বড় দেখি ! তবু পরামর্শ দিলাম,—আইন বড় বদ।

দাসু বলিল,—ঐ কসাইয়ের কাছে মাথা হেঁট করিব না। মেয়েকে উহারা দিবে না তো!

আমি বলিলাম,—আলাদা মামলা করিতে পারো, মেয়েও অত্যাচারের নালিশ করুক।...ত এ অপরাধ...তা ছাড়া অত্যাচারের সাক্ষী কে ? দাসু বলিল,—আমি।

আমি বলিলাম,—তুমি তো অপরাধী।

দাসু বলিল,—আইন, মেয়ে—সব চুলায় যাক্ !

মামলা চলিল। হাকিম ভালো, ব্যাপার বুঝিলেন। কিন্তু তাঁর হাত বাঁধা—কেতাব খুলি অনেকবার চোখে চশমা আঁটিলেন, চশমা খুলিলেন—শেষে রায় দিলেন। দাসুর কয়দিনের জে হইয়া গেল।

দাসু বলিল,—এ কি রকম হলো ? মেয়েকে বাঁচাতে গেছি বলে জেল !

বহু চেষ্টাতেও তাকে বুঝাইতে পারিলাম না, সে বে-আইনী কাজ করিয়াছে, এবং আগে, তারপর মানুষের স্নেহ, মায়া, মমতা !

শুনিয়া সে গম্ভীর মুখে জেলে গেল, মেয়ের নামও মুখে আনিল না।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপা

তৃপ্তি

আর খুঁজিনে সুখের ঝরা, ভোরের আলো সাঁঝের ছায়ায়।
উৎস গেছে খুলে বুকে তোমার হাসি তোমার মায়ায়।
তোমার আঁখির দৃষ্টি পড়ে, আর ডরিনে বর্ষা ঝড়ে ;
থাক্‌না শরৎ, যাক্ বসন্ত, চাইনে তৃপ্তি ফুলে, হাওয়ায়।
তোমার নামে প্রাণের পরে, বহে সমীর, পুষ্প ঝরে ;
তোমার প্রীতিই চাঁদ মাখানো শিশির জলে আমায় নাওয়ায়।

"পরকীয়া"

(১)

সেও এই রকমই শরৎকাল। দেবী-পক্ষ আরম্ভ হইয়াছে। আমি প্রয়াগে গুরুদেবের আশ্রমে তিন বৎসরান্তে তিন মাসের ছুটি লইয়া গিয়াছিলাম। আশ্রমটি একেবারে গঙ্গার উপরে। বর্ষা সে বারে দেরিতে হয়। গঙ্গা কূলে কূলে ছাপাইয়া উঠিয়াছে। আকাশ নির্ম্মল, জ্যোৎস্না না ফুটিলেও নক্ষত্রালোকে রাত্রি উজ্জ্বল হইয়া আছে।

আমাদের নিয়ম ছিল, সন্ধ্যা আরতির পর, আহারান্তে সকলে দশটা না বাজিতেই ঘুমাইয়া পড়িতাম। গুরুদেব জিতনিদ্র ; শয্যা পাতিয়া ঘুমাইতেন না। আসনে বসিয়াই সারারাত কাটাইতেন। তিনটা বাজিতে না বাজিতে আমরা সকলে উঠিয়া, মুখ হাত ধুইয়া, তাঁর নিকটে যাইয়া বসিতাম। কখনও কথাবার্ত্তা হইত, কখনও সঙ্গীত হইত, অধিকাংশ সময়ই নীরবে যে যার আসনে বসিয়া ইষ্টনাম জপ করিতেন।

আমি ঘরে ঢুকিবার সময় দেখিলাম আমার গুরুভাই—শা সাহেব আনমনে বাহিরে যাইতেছেন। ইঁহার প্রকৃত নাম কি জানিতাম না। ইনি জাতিতে মুসলমান। গুরুদেবের কৃপা পাইয়া, বহুদিন তাঁহারই নিকটে ছিলেন। আমরা তাঁহাকে শা সাহেব বলিয়াই ডাকিতাম। কেহ কেহ বা হরিদাসও বলিতেন। গুরুভাইদের মধ্যে গোঁড়া ব্রাহ্মণও দু' চার জন ছিলেন। তাঁরা শা সাহেবকে লইয়া খাওয়াদাওয়া করিতে রাজি ছিলেন না। এই জন্য প্রথম হইতেই গুরুদেব ইঁহাকে নিজের কাছে বসাইয়া খাওয়াইতেন। গুরুদেবের আসনের নিকটেই শা সাহেব দিন রাত শুইয়া, বসিয়া, কাটাইতেন। গুরুদেবের আশ্রমে ভোজনাগারে যে যার জাত রাখিয়া চলিতেন ; ভজনক্ষেত্রে কোনও জাতবর্ণের বিচার ছিল না। গুরুদেব কহিতেন সাধন-ধর্ম্মে—

লোকের মধ্যে লোকাচার,
সদ্‌গুরুর কাছে সদাচার—

ইহাই এই কথার সত্য অর্থ।

(২)

রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় শা সাহেব ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই গুরুদেব কহিলেন—" সে স্ত্রীলোকটিকে কোথায় রাখিয়া আসিলে ?"

শা সাহেব চমকিয়া উঠিলেন। মুখে কথা সরিল না। আমরা সকলে আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। শা সাহেবের ব্রত কি তবে ভঙ্গ হইয়াছে ? আমাদের সাধনে বেশি কিছু ধরা বাঁধা ছিল না। গুরুদেবের বিধি ছিল তিনটি—

(১) নিত্য তিন বেলা নাম জপ করিবে।

(২) প্রাতঃ-সন্ধ্যা অন্ততঃ পচিশ মিনিট করিয়া প্রাণায়াম করিবে।

(৩) সর্ব্বদা সাধু-সেবা করিবে।

সাধু কারা? এই প্রশ্ন তুলিয়া গুরুদেব কহিতেন যাদেরে দেখা মাত্র অন্তরে ভগবান্ আপনা হইতে জাগিয়া উঠে, তাঁরাই প্রকৃত সাধু। এখানে আর কোনও ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার নাই।

গুরুদেবের সাধনে নিষেধও ছিল তিনটি—

(১) পরস্ত্রীর মুখ দেখিবে না।

(২) সুরাপান করিবে না।

(৩) পরনিন্দা করিবে না।

এই নিষেধবাক্য মনে করিয়াই গুরুদেব যখন এই গভীর রাত্রে শা সাহেবের নিকট অপরিচিতা স্ত্রীলোকের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন আমরা শিহরিয়া উঠিলাম। শা সাহেবের মতন নিষ্ঠাবান সাধক আমাদের ভজনগোষ্ঠীতে আর কেউ ছিলেন না।

শা সাহেব কহিলেন—"প্রভো! আমি ব্রত ভঙ্গ করি নাই, তার মুখ দেখি নাই।"

গুরুদেব—"সে কথা জানি। তুমি ত গুরুর কৃপায় জিতেন্দ্রিয় পুরুষ, ইহা কি আর জানা নাই? কিন্তু সে বেচারিকে কোথায় ফেলিয়া আসিলে?"

শা সাহেব—"সে আপনার পথে আপনি চলিয়া গিয়াছে।"

গুরুদেব—"সব ঘটনাটা খুলিয়া বল। দেখছ না, এঁরা সকলে শুনবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া আছেন।"

শা সাহেব ধীরে ধীরে কহিতে লাগিলেন—

"প্রভো! আপনি সর্ব্বজ্ঞ—আপনার অগোচর ত কিছুই নাই। তবু আপনি যখন বল্লেন, তখন সব খুলেই বল্‌ছি। আমি ত আপনার পায়ের কাছেই বসেছিলাম। হঠাৎ প্রাণ বড় চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল। মনে হলো কে যেন ঘোর বিপদে পড়ে কাকে ডাক্‌ছে। আর ডাকে অস্থির হয়ে উঠ্‌লাম। আমার প্রাণের ভিতরেও কে যেন বার বার বল্‌তে লাগল—চল যাও, জল্‌দি যাও—নইলে স্ত্রীহত্যার পাতকী হবে। তাই আমি দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য যন্ত্রারূঢ়ের মতন ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। সোজা একেবারে গঙ্গার ঘাটে গেলাম। প্রবলতরঙ্গে কূল ছাপাইয়া ছুটিয়াছে। ঘাট নির্জ্জন, নিস্তব্ধ। কিন্তু সাম্‌নে কে যেন কাঁদ্‌ছে পড়িবার উপক্রম করিতেছে। একটা কলসীতে দড়ি বাঁধিয়া সেই দড়ি নিজের গলায় বাঁধিয়া আর বুক জলে নামিয়া সেই কলসীতে জল ভরিতেছে। দেখিয়া আমি লাফাইয়া পড়িয়া তার হাত ধরিলাম।" সে বলিল—তুমি কে?

আমি—তুমি কে? আত্মহত্যা কচ্ছ কেন? জাননা এ বড় পাপ?

সে—পাপের জ্বালা জুড়াইতেই মর্‌তে এসেছি। আমায় আট্‌কাইও না।

আমি—পাপের জ্বালাটা কোথায়? শরীরে না মনে?

সে—শরীর মন দুইই জ্বলে যাচ্ছে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল

আমি—ঐ জ্বালাই পাপের প্রায়শ্চিত্ত। মর্‌তে গিয়ে প্রায়শ্চিত্তের ব্যাঘাত দিচ্ছ—দেখ্‌ছ না?

সে—অত শত বুঝি না। আমায় মরতে দাও। মরা ভিন্ন আমার গত্যন্তর নাই।

আমি—মরলেই কি জ্বালা যাবে? পাপের জ্বালা ত স্মৃতির জ্বালা। মরলে কি পাপের কথা ভুলে যাবে? একথা তোমায় কে বল্লে?

সে—সে কি কথা ? সব ভুলব, সংসার আঁধার হবে, কাউকে দেখ্‌ব না, কারো কথা শুন
না—আর কেবল পাপের কথাই মনে থাক্‌বে ? এই কি সম্ভব ?

আমি—সাধু-শাস্ত্রে ত তাই বলেন। মরণে সব নষ্ট হয়, কিন্তু স্মৃতি নষ্ট হয় না। ঐ
পাপের স্মৃতিই মরণের পরেও মানুষকে পুড়াইয়া মারে। এখানে তবু পাপের প্রায়শ্চি
আছে। যে আত্মহত্যা করে, তার এই মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত নাই।

সে—তবে আমি যাই কোথায় ?

আমি—ঘরে ফিরে যাও।

সে—ঘর নাই।

আমি—আপনার জন যেখানে আছে, সেখানে ফিরিয়া যাও।

সে—আমার কেউ নাই। যারা আছে তারা মুখ দেখ্‌বে না। তাদের মুখ দেখাতে পার
না। কোথা যাব ? কোথা গেলে সব ভুল্‌ব ?

আমি—চল, আমি তোমাকে এমন জায়গায় রেখে আসি—যেখানে কেউ তোমাকে চিনে
যাদের কাছে থাক্‌লে, কেউ তোমার খোঁজখবর পাবে না। সে'ও মরার মতনই হবে। চল, ম
তোমাকে তাদের কাছে রেখে আসি।

এই কথা শুনে সে আমার সঙ্গে জল হতে উঠে চল্‌ল। আমি নিকটের মস্‌জিদের মৌ
কাছে তাহাকে লইয়া গেলাম। মৌলবী আমার বাল্যবন্ধু। তাঁকে সকল ঘটনা বল্‌লাম। শু
বল্‌লেন—বেশ। আমার এখানে আশ্রয় পাবে। তখন আমি সেই স্ত্রীলোকটিকে ডেকে বল্‌
মা তুমি এঁর কাছে থাক। ইনি তোমাকে নিজের মেয়ের মতন রাখ্‌বেন।

অতক্ষণ তার বাহ্যজ্ঞান ছিল না বল্লেই হয়। পুতুলের মতন আমার পেছনে পেছনে
মস্‌জিদের দাবায় মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়েছিল। আমার কথায় যেন তার বাহ্যজ্ঞান ফিরে
খানিকটা এদিক ওদিক চেয়ে, আমার বন্ধুটিকে দেখে—চম্‌কে উঠে বল্লে—"এ যে মুসলমান।"

আমি—ইনি আমার বন্ধু—তুমি নিরাপদে, আদরে মেয়ের মতন ইহাঁর কাছে থাক্‌বে।

সে—আমি যে বামুনের মেয়ে। মুসলমানের ঘরে থাকব কি করে ?

আমি—জলে ডুবে মরতে গিয়েছিলে, সে স্থান কি এর চাইতে ভাল ?

সে—সে যে গঙ্গা—পতিতপাবনী। গঙ্গায় ডুব্‌লে পাপ ধুয়ে যে'ত। আমার স
কুলাইল না। ভেবনা বুড়া, তোমার কথায় ফিরে এসেছি, প্রাণের মায়া ছাড়তে পারলাম
আর...। না আমি চল্লাম। জাত ধর্ম্ম খুয়াতে পারব না।

এই বলিয়া সে ফিরিয়া চলিল। আমার বন্ধুটি সহজেই চটিয়া যান। ইহার কথায়
হইয়া বলিলেন—'রোখ্‌—হারামজাদি। ইহাঁসে জানে নেই সেকেগী। এই বলিয়া
করিয়া, পথ আট্‌কাইয়া দাঁড়াইলেন'।

সে বলিল—যে মরতে যাচ্ছে, তুমি তাকে কি ভয় দেখাও ?

মৌলবী—মরতে পারবে না। ভাল ভাবে থাক্‌তে চাও—অন্দরে যাও। নইলে বান্দি
কুত্তির মতন বেঁধে রাখব।

সে তার কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে দেউড়ীর দরজার দিকে চল্‌ল। মৌলবী তখন তার হাত
ধর্‌তে গেলেন।

সে—খবরদার সাহেব। আমায় ছুঁইও না।

মৌলবী—খবরদার কাকে বল্‌ছ জান না—এই বলিয়া তাহাকে ধরিতে হাত বাড়াইলেন।
চক্ষের পলকে সে নারী তখন তীক্ষ্ণ ছুরি বাহির করিয়া বলিল—"সাহেব, স্ত্রীলোক যখন গভীর
নিশাকালে জলে ডুব্‌তে যায়—তখন সে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করেই বাহির হয়। তোমার
মতন দস্যু পথে ঘাটে থাক্‌তে পারে সে জানে। সাবধান—আর এক পা এগোবে তো এই ছুরিতে
প্রাণ হারাবে।"

মৌলবী থমকিয়া দাঁড়াইলেন। আমি এগিয়ে বলিলাম—ছেড়ে দিন। জোর জবরদস্তি
করে রাখা যাবে না। তখন তিনি—"কাফের, বান্দি, কুত্তি—জাহান্নামে যাবি—যা", এই বলিয়া
দরজা খুলিয়া, তাহাকে লাথি মারিয়া বাহির করিয়া দিলেন।

গুরুদেব—তার পর ?

শা সাহেব—তার পর তার কি হ'ল জানিনা। হয়ত সে আবার গঙ্গায় ডুব্‌তে গেছে।

গুরুদেব—শা সাহেব এখনও চিত্ত নির্ম্মল হয় নি যে। এখনও বুঝলে না আমরা যেখানের
যাত্রী সেখানে—

টুটে যায় সব ধন্ধা
যহা রাম রহিম এক বান্দা
কাফেরে মুসল্‌মানা।

আমাদের দিকে লক্ষ্য করে বল্লেন—এদের কেউ যদি কোনও মুসলমান স্ত্রীলোককে এ অবস্থায়
পেত, হিন্দুর ঠাকুর বাড়ীতে নিয়ে যেত না—মুসলমানের আশ্রয়েই রেখে আস্‌ত। শা সাহেব,
এখনও তুমি হিন্দু-মুসলমানে ভেদ কর ?

শা সাহেব—আপনি অন্তর্যামী। আমি যে মুসলমান একথা ভুল্‌তে পাচ্ছি না।

গুরুদেব—ভুলতে কে বলে ? আমি যে হিন্দু, তাই কি ভুলেছি, না ভুল্‌তে পারি, বা ভুল্‌তে
চাই ? তবে শ্রীগুরুর এই শিক্ষা—হিন্দু বলে আমি মুসলমানের চাইতে বড়—এ অভিমান কর্‌ব না।
যিনি জগতের মালিক, হিন্দু-মুসলমান সবাই তাঁরই সৃষ্টি। সবারই ভিতরে তিনি আছেন। আর
হিন্দু, হিন্দুর পথে, মুসলমান মুসলমানের পথে তাঁরই কাছে যাবে। তাঁকেই পাবে। তাঁর চরণে
সকলেই দাস হয়ে থাকবে। এইটি মনে করে রাখবার জন্যই ত আমাদের ভজন গোষ্ঠীতে
আমরা হরি নামও করি, আল্লা নামও করি।

পাশের ঘরে এক সাধক তখন গান ধরিয়াছেন—

"হরিসে লাগি রহরে ভাই।"

এই গান শেষ হইলেই গুরুদেব গুণ্ গুণ্ করিয়া গাহিতে লাগিলেন :—

"হর্‌দমে আল্লার নাম লইও।"

তখন শা সাহেবও তাঁর সঙ্গে গাহিতে লাগিলেন—

"দমে দমে লইওরে ভাই, দমে দমে লইও।"

আমরা তখন সকলে মিলিয়া এই হিন্দু সাধুর আশ্রমকে, পবিত্র আল্লা-নামে মুখরিত করিয়া তুলিলাম।

প্রভাতের আলো ফুটিতে ফুটিতে আর সকলে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। আমার মন কিন্তু সেই স্ত্রীলোকটির ভাবনায় একটু চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। সকলে চলিয়া গেলে গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম "এই অভাগিনীর শেষ দশা কি হইল ?"

গুরুদেব কহিলেন—"তাঁর জন্য কোনও ভাবনার কারণ নাই। অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী তাঁহাকে গঙ্গার ঘাট হইতে আবার ফিরাইয়া আনিয়া নিজের কাছে রাখিয়াছেন।"

অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী আমাদের সাধনেরই লোক। বয়স্থা ব্রাহ্মণ বিধবা। তাঁর একটি পুত্র ছিল। একই সঙ্গে ঠাকুর তাঁহার পতি পুত্র দুইকেই কাড়িয়া লইয়া যান। সেই সময় এই পতিবিয়োগবিধুরা ও পুত্রশোকাতুরা ব্রাহ্মণ কন্যা গুরুদেবের আশ্রয় লাভ করেন। আজ চল্লিশ বৎসরের কথা। দশপনেরো বছর হইতে ইনি এই আশ্রমেই আসিয়া করিতেছেন। আরও দুচারিজন গুরুভগিনীও তাঁর সঙ্গে থাকেন। আশ্রমের আয়ব্যবস্থা ইঁহাদের উপরেই ন্যস্ত ছিল। এই অসহায়া রমণী অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর স্থান পাইয়াছেন শুনিয়া আমার ভাবনা দূর হইল।

গুরুদেব কহিলেন—কথাটা যেন বাহির না হয়। মেয়েরা ইঁহার ইতিহাস কিছু জানেন না। যে স্ত্রীলোকটির কথা শা সাহেব কহিলেন, তিনি যে এই আশ্রমেই রহিয়া উঠিয়াছেন, তুমি ছাড়া আর কেহই একথা জানে না। তোমাকে আর একটা কথাও বলিয়া রাখি। ইঁহার পিতামাতা তোমাদের সাধনেরই লোক ছিলেন। সে সম্পর্কে ইনি আমার পরিবারভুক্ত বটে।

(৩)

দিন চার পাঁচ পরে আমি প্রথমে ইঁহাকে দেখিলাম। সেই দিন প্রাতে গুরুদেবের নিকটে ইঁহার দীক্ষা হয়। সেই সঙ্গে আরও দুই তিনটি মহিলা দীক্ষিত হইয়াছিলেন। গুরুদেবের আশ্রমে নিয়ম ছিল যে, কোনও নূতন লোক দীক্ষা লইতে আসিলে, যাঁহারা তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিলে, দীক্ষাকালে আমাদের ভজন গোষ্ঠীর একটা সঙ্গত হইত।

যাঁহাদিগকে বিশেষ ভাবে ডাকিতেন, তাঁরাই এই সঙ্গতে উপস্থিত থাকিতেন। এই দিনেও গুরুদেব আমাদের পাঁচ সাত জনকে দীক্ষাকালে উপস্থিত থাকিতে বলেন। দীক্ষার অনুষ্ঠানের মধ্যে কোনও কিছুর বাহুল্য ছিল না। দীক্ষার্থীরা স্নানান্তে নিজেদের সন্ধ্যাআহ্নিকাদি করিয়া গুরুদেবের নিকটে উপস্থিত হইতেন। প্রথমে দু'চারিটি ভজন হইত। তারপর গুরুদেব ইঁহাদিগকে তাঁহাদের ইষ্টনাম দান করিতেন এবং শক্তি সঞ্চার করিয়া, কি করিয়া প্রাণায়াম করিতে হয়, তাহা দেখাইয়া দিতেন। সেই সময়ে শিষ্যেরা সকলে প্রাণায়ামের সঙ্গে নিজ নিজ নাম জপ করিত। এই দিনও আমরা সকলে উপস্থিত হইলে এইরূপেই নূতন দীক্ষা-প্রার্থিনীদের দীক্ষা হইল।

নাম দিবার পূর্ব্বে গুরুদেব দীক্ষার্থিনীদের জনে জনের নাম করিয়া ভজন গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁহাদের পরিচয় করাইয়া দিলেন। তখন শুনিলাম ইঁহার নাম হৈমবতী।

নাম পাইয়াই হৈমবতী কাঁপিতে কাঁপিতে অজ্ঞান হইয়া গেলেন। একটি মহিলা ইঁহার অবস্থা দেখিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া তাঁহার মুখে জল ছিটাইতে গেলেন।

গুরুদেব ইঙ্গিত করিলেন, ইঁহাকে কেহ যেন স্পর্শ না করে। কহিলেন, শ্রীগুরুর নাম ইঁহার ভিতরে যে কাজ করিতে চাহে করুক, তাহার ব্যাঘাত জন্মাইও না। আমাদিগকে ভজন গাহিতে কহিলেন। আমরা দু'তিনটি ভজন গাহিলাম। কিন্তু হৈমবতীর বাহ্য চৈতন্য ফিরিয়া আসিল না। তখন গুরুদেব নিজে ভাবাবেশে গাহিতে লাগিলেন,

হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

আমরা সকলে মিলিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে এই নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলাম। এইরূপে প্রায় তিনচার ঘণ্টা কাটিয়া গেল। এদিন ভজনের যেমন জমাট হইয়াছিল, বহুদিন এমন জমাট দেখি নাই। যেমন হৈমবতীর, সেইরূপ গুরুদেবেরও বাহ্য লোপ পাইয়াছিল। গুরুদেব 'বোল্, বোল্,' বলিয়া চারিদিকে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ভক্তেরা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

বলিয়া প্রাণমন ঢালিয়া নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। আর হৈমবতী নিশ্চল, নিস্পন্দ হইয়া প্রায় মৃতের মতন সেখানে পড়িয়া রহিলেন। গুরুভাইদের দশা অনেক দেখিয়াছি। কিন্তু এমত দশা আর কখনও দেখি নাই। আমাদের কারও কারও প্রাণে ভয় হইল, বুঝি বা এই রমণী মহাপ্রয়াণ করিয়াছে। অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী একটু তুলা আনিয়া তাঁর নাসিকাগ্রে ধরিয়া শ্বাস বহিতেছে কি না দেখিতে লাগিলেন। হঠাৎ গুরুদেব বাহ্য লাভ করিয়া আমাদের আশ্বস্ত করিয়া কহিলেন,—তোমরা ভয় পেয়েছ কেন ? সাধকের

সমাধি কি কখনও দেখ নাই? নাম কর, উচ্চৈঃস্বরে নাম কর। সমাধি ভাঙ্গিবে, বাহ্যজ্ঞান আবার ফিরিয়া আসিবে। এই বলিয়া তিনি হৈমবতীর কাণের কাছে মুখ দিয়া, আমরা ধ্যানস্থ হইয়া,—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥—কহিতে লাগিলেন।

ক্রমে তাঁহার বাহ্য চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। হৈমবতী চোক খুলিয়া চাহিলেন কিন্তু দৃষ্টি আমাদের কাছে অর্থহীন বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে যখন পূর্ণ বাহ্য হইল, তখন অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া অবগুণ্ঠন টানিয়া সসঙ্কোচে উঠিয়া বসিলেন। তখনও দেহ ঈষৎ কম্পিত হইতেছে; স্বেদ জলে কাপড় ভিজিয়া অঙ্গে লাগিয়া গিয়াছে। গুরুদেব তখন কহিলেন, যাও মা, একটু সুস্থ হইয়া আহারাদি করগে।

(৪)

দীক্ষা শেষ হইয়া গেলে গুরুভাইরা এসে পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওই করিতে লাগিলে এই আগন্তুক রমণী কে, কোথা হইতে আসিয়াছেন, জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিলেন। শা সাহেবের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, শা সাহেব ইঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। গুরুদেবকে মনে মনে প্রণাম করিলাম। আমাদের কুতূহল দেখিয়া গুরুদেব কহিলেন,—যোগে নিকট অপরিচিত হইলেও, বহুদিন হইতেই আমি ইঁহাকে জানি। ইঁহার পিতামাতা উভয় তোমাদের সাধনের লোক ছিলেন। সে বহুদিনের কথা। শৈশবেই ইনি পিতৃমাতৃহীন হ তার পর মাতুলালয়ে চলিয়া যান। সেখান হইতেই ইঁহার বিবাহ হয়। তখন ইঁহার বয়স বৎসর মাত্র। দুই বৎসরের মধ্যে বৈধব্য ঘটে; এবং এতাবৎ কাল নিষ্ঠা সহকারে ব্রহ্মচর্য্য করিয়া আসিয়াছেন। আজ তোমরা যা দেখিলে তাহা এই দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্যেরই ফল। উপযুক্ত ক্ষেত্র না পাইলে নামের বীজ পড়িবামাত্রই অঙ্কুরিত হইয়া উঠে না।

গুরুদেবের কথা শুনিয়া আমরা বুঝিলাম, শুদ্ধ দেহ না হইলে অমন স্নিগ্ধ উজ্জ্বল ফুটিয়া উঠে না। আকুল তরঙ্গায়িত যৌবনের অমন শান্ত মূর্ত্তি, জন্মে কখনও দেখি নাই। আছে অথচ সঙ্কোচ নাই, কমনীয়তা আছে অথচ সে কমনীয়তার ভিতরেই যেন অলোক শক্তির প্রভাব ফুটিয়া উঠিতেছে। এরূপ দেখিয়া মানুষের মন চঞ্চল হইয়া উঠে না, কিন্তু প্রণত যেন নুয়াইয়া পড়ে। এ রূপ ভোগ করিবার জন্য আকাঙ্খা হয় না, কেবল পূজা করিবার যায়। অমন রূপ জন্মে আর কখনও দেখি নাই।

(৫)

আমাদের ভজন গোষ্ঠীতে সেবারে সেখানে একটি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ছিলেন। আমরা 'ব্রহ্মচারী' বলিয়াই ডাকিতাম। গুরুদেব কহিতেন, ব্রহ্মচর্য্যের ভিত্তি দুই, সত্য বীর্য্য ধারণ। এই ব্রহ্মচারীও অত্যন্ত সত্যবাদী এবং জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। মনের কথা

কখনও গোপন করিতেন না। এ বিষয়ে তিনি বালকের মতন ছিলেন। যখন যে খেয়াল মনে আসিত, তখনই তাহা মুখ ফুটিয়া কহিতেন, এবং কাজেও তাহা পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেন। হৈমবতীর দীক্ষার পরে আমাদের ব্রহ্মচারীর মধ্যে এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখিলাম। তাঁর নিত্যসিদ্ধ প্রসন্নতা যেন হঠাৎ কে চাপিয়া মারিয়া দিল! বালকের মত সরল প্রকৃতি যেন হঠাৎ বদলাইয়া গেল! ব্রহ্মচারীকে দেখিলাম আর কারও সঙ্গে বেশি কথাবার্ত্তা কহেন না, গুরুভাইদের সঙ্গে মিলিয়া আমোদ আহ্লাদ আর করেন না, অধিকাংশ সময় একেলা একেলা গঙ্গাতীরে ভ্রমণ করেন, আশ্রমেও একেলা চুপটি করিয়া বসিয়া থাকেন। দিন দুই তিন পরে একদিন প্রত্যূষে গুরুভাইরা সকলে স্নানাদি করিতে উঠিয়া গেলে, ব্রহ্মচারী গুরুদেবের নিকট আসিয়া বসিলেন। আমি তখনও এক কোণে বসিয়া ছিলাম। বোধ হয় আমাকে দেখিতে পান নাই। গুরুদেবকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া উঠিয়া কহিলেন,—আমায় আদেশ করুন, আমি বিবাহ করিব।

গুরুদেব কহিলেন,—তা বেশ। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের পরেই ত গার্হস্থ্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠা হয়।

ব্রহ্মচারী—আমি ভাবিয়াছিলাম, আমরণ ব্রহ্মচর্য্যই পালন করিব, কিন্তু সে শক্তি আমার নাই। আমার ব্রত ভঙ্গ হইয়াছে।

গুরুদেব হাসিয়া কহিলেন,—সে কি কথা? স্বভাবের বশে থাকাই যে ধর্ম্ম। যাহা স্বাভাবিক তাহা ত ধর্ম্ম নয়। লোকে ব্রহ্মচর্য্যের সত্য অর্থ বোঝে না। ব্রহ্মচর্য্য উপায় মাত্র, লক্ষ্য নহে। ব্রহ্মচর্য্যের উদ্দেশ্য শরীর মনকে বিশুদ্ধ করিয়া নিষ্কাম সংসার ধর্ম্ম প্রতিপালনে সাধককে সক্ষম করা। তোমার ব্রত ভঙ্গ হয় নাই। ব্রতের সফলতা লাভ করিবার জন্যই তোমার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছে। যতদিন ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করিতেছিলে, ততদিন তাই তোমার শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ছিল। এখন তোমার অন্য অবস্থা উপস্থিত। স্কুলের শিক্ষা শেষ করিয়া তুমি এখন সাধন রাজ্যে কালেজে প্রবেশ কর, এজন্য সঙ্কুচিত হইতেছ কেন? এ ত আনন্দের বিষয়।

ব্রহ্মচারী—তবে আপনি আমাকে বিবাহ করতে আদেশ কচ্ছেন?

গুরুদেব—আমি আশীর্ব্বাদ করি, তুমি সংসার করিয়া কৃতার্থ হও। বিবাহের কোনও সম্বন্ধ আসিয়াছে?

ব্রহ্মচারী—সম্বন্ধ আর কে আনিবে? আমার প্রাণই সে সম্বন্ধ করিতেছে। আমি হৈমবতীকে বিবাহ করিতে চাহি।

গুরুদেব—হৈমবতী বিধবা তুমি জান?

ব্রহ্মচারী—জানি। কিন্তু বিধবাবিবাহ শাস্ত্র নিষিদ্ধ নহে। আর আপনার এখানে ত কোনওই বাহিরের বন্ধন নাই। যাদের সমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলিত, তারাও ত আপনার আশ্রিত।

গুরুদেব—হৈমবতী কি বিবাহ করিতে চান?

ব্রহ্মচারী—জানি না। কিন্তু আমার প্রাণ যখন তাঁকে অমন করিয়া চাহিতেছে, তখন তাঁর প্রাণ আমায় টানিতেছে, ইহাই বিশ্বাস করি।

গুরুদেব—সে তোমায় দেখেছে ?

ব্রহ্মচারী—জানি না। না দেখে কি অনুরাগ হয় না ? নক্ষত্রে নক্ষত্রে আলোকের চিঠি দিয়া কথা হয়, প্রাণে প্রাণে কি নীরব পরিচয় হয় না ?

গুরুদেব—হয় না কে বল্লে ? হয়েছে কি না, তাই জানতে চাই।

ব্রহ্মচারী—তাকে আপনি ডেকে জিজ্ঞাসা করুন, তাহলেই জানা যাবে।

গুরুদেব—নিজেই তাহা জানিয়া লও না কেন ?

(৬)

দিন দুই পরে গুরুদেবের সঙ্গে বিন্ধ্যাচলে গেলাম। অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী, হৈমবতী এ ব্রহ্মচারীকেও গুরুদেব সঙ্গে লইলেন। আর সকলে প্রয়াগের আশ্রমেই রহিলেন।

একদিন অপরাহ্নে গুরুদেব একলা বসিয়া আছেন, এমন সময় হৈমবতী আসিয়া তাঁহার সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া কহিলেন—"আপনি অন্তর্য্যামী, সকল কথাই ত জানেন। আমি মহাপাতকে পড়িয়া আত্মহত্যা করিতে গিয়াছিলাম, এ আশ্রমের আর কেউ তাহা জানে না— আপনার অবিদিত নাই, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি, আমায় বলিয়া দিন।"

গুরুদেব কহিলেন—তুমি যাহাকে পাপ বলিতেছ, বস্তুতঃ তাহা ত পাপ নহে, অনাচার মা পাপ ভিতরকার কথা। অজ্ঞানে মানুষ যে অনাচার করে, তাহাতে তার দেহাদি দুষ্ট পারে, কিন্তু প্রাণ কলুষিত হয় না। তুমি লোভে পড়িয়া কিছু কর নাই। সজ্ঞানে কোনও পাপ স্পর্শ করে নাই। জ্ঞান হওয়া মাত্রই তোমার সমস্ত শরীর, সমস্ত মন, সমস্ত এই অনাচারের স্মৃতিতে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। সেই জ্বালাতেই তুমি আত্মহত্যা করিতে গিয়াছি লোকের চক্ষে তুমি অপরাধী ভাবিয়াই অত অধীর হইয়া পড়িয়াছিলে। নইলে তোমার কোনও পাপ স্পর্শ করে নাই। আমি তোমাকে প্রাণ খুলিয়া আশ্বস্ত করিতেছি, তোমা ভঙ্গ হয় নাই। নিষ্পাপ তুমি, তোমার দেহ, মন, প্রাণ সকলি শুদ্ধ রহিয়াছে। মিথ্যা পাপ ম করিয়া প্রাণের শান্তি নষ্ট করিও না।

হৈমবতী—শান্তি ত পাই না।

গুরুদেব—সংস্কার সহজে যায় না। অহর্নিশ নাম কর, আপনি শান্তি আসিবে।

হৈমবতী—ব্রহ্মচারী আমাকে বিবাহ করিতে চাহেন।

গুরুদেব—তোমার যদি ইচ্ছা হয়, তাতে আপত্তি কি ?

হৈমবতী একথার কোন উত্তর দিলেন না। তখন গুরুদেব কহিলেন—তুমি সংস্কারের দাস নও, আমি জানি। লোকভয়, সমাজভয়, তোমার নাই। তবে

কেন ? আমার সাধনেও এসকল বিষয়ে কোনও বাঁধাবাঁধি নাই। নিজের কাছে খাঁটি থাকিয়া সকলেই যাতে তাঁদের চিত্তের প্রসন্নতা নষ্ট না হয়, যাহাতে আত্মার প্রসাদ লাভ হয়, সেরূপ কাজ করিতে পারেন। দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্যে তোমার দেহ মন বিশুদ্ধ হইয়াছে। এরূপ শুদ্ধদেহে শুদ্ধ প্রাণে যে সংসারে প্রবেশ করে, তারই সংসার সার্থক হয়। তারই সংসার পথে পরমপুরুষার্থ লাভ হইয়া থাকে। তুমি আত্মসুখেচ্ছায় কোনও কাজ করিবে না জানি বলিয়াই, যদি ইচ্ছা হয়, বিবাহ করিয়া সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে পার, ইহা অসঙ্কোচে কহিতেছি।

হৈমবতী—আমার দেহ ত অপবিত্র হয়েছে। এ দেহ ত আমি কাহাকেও দান করিতে পারি না।

গুরুদেব—যাকে দান করিবে, সে যদি অপবিত্র মনে না করে, সে যদি তোমার অতীতকে ধুইয়া মুছিয়া, তোমার বর্ত্তমান শুদ্ধসত্ব দেহকেই অকৈতব প্রেমভরে বরণ করিয়া লয়, তাহাতে আপত্ত কি ?

হৈমবতী—তিনি আমাকে শুদ্ধ বলে ভাব্‌ছেন বলেই, তাতে আমার অপরাধ হবে না কি ? এ প্রবঞ্চনা ত করিতে পারি না।

গুরুদেব—সকল কথা তাঁকে খুলিয়া না বলিলে, প্রবঞ্চনা হবে বটে; কিন্তু বলিলে ত আর সে অপরাধ হবে না।

কিছুক্ষণ পরে গুরুদেব জিজ্ঞাসা করিলেন—সকলের গোড়ার কথা—তাঁহার প্রতি তোমার সত্য অনুরাগ হয়েছে কি ?

হৈমবতী উত্তর দিলেন না। গুরুদেব কহিলেন—"সত্য অনুরাগের লক্ষণ—প্রিয়জনের নাম শুনিবামাত্র দেহ মন প্রাণ পুলকিত হইয়া উঠে, তাঁহার দর্শনে কেবল চক্ষু নহে, কিন্তু সর্ব্বেন্দ্রিয় অপূর্ব্ব উল্লাসে ভরিয়া উঠে, তাঁহার প্রতি অঙ্গের জন্য, প্রেমিকের প্রতি অঙ্গ আকুল হইয়া, সর্ব্বাঙ্গ দিয়া তাঁহাকে পাইতে চাহে। সত্য অনুরাগ দেহ এবং মন সকলই অধিকার করে। এ অনুরাগ তোমার জন্মেছে কি ? যদি এ শুদ্ধ অনুরাগ জন্মিয়া থাকে, তবে বিবাহ কর, তাহাতে মঙ্গল হইবে।"

হৈমবতী কিছু কহিলেন না। কিন্তু তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ গুরুদেবের কথাতে পুলকে পূরিয়া উঠিল। এমন সময় ব্রহ্মচারী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া গুরুদেব কহিলেন—"ব্রহ্মচারী, হৈমবতী এবং তুমি এখন হইতে একসঙ্গে বসিয়া সাধনভজন করিবে। তোমার ইষ্টনামের সঙ্গে হৈমবতীর রূপ ধ্যান করিবে, আর, হৈমবতী, তুমিও তোমার ইষ্টনামের সঙ্গে ব্রহ্মচারীর রূপ ধ্যান করিবে। এইরূপে দেখিবে তোমরা উভয়ে একে অন্যের নিকটে ভগবদ্বিগ্রহরূপে ফুটিয়া উঠিবে। তোমরা এমন অবস্থা লাভ করিবে, যখন পরস্পরকে নিজ নিজ ইষ্টমূর্ত্তিরূপে প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে, তখন একে অন্যের সেবাতে তোমাদের নিজ নিজ ইষ্টদেবতার সেবা হইবে। ইহাই প্রেমের চরম অবস্থা, এইরূপেই নিষ্কাম কর্ম্মযোগ সাধন করিতে হয়। এই কর্ম্মযোগের মধ্য দিয়াই তোমরা ব্রজের শুদ্ধপ্রেম লাভ করিতে পারিবে।"

(৭)

আমার ছুটি ফুরাইয়া আসিল। গুরুদেবকে বিন্ধ্যাচলে রাখিয়াই আমাকে আমার কর্ম্মস্থলে চলিয়া যাইতে হইল। ইহার অল্পদিন পরেই শুনিলাম হৈমবতীর সঙ্গে ব্রহ্মচারীর বিবাহ হইয়াছে। গুরুদেবের উপদেশে ইঁহারা দু'জনে নাসিকে যাইয়া নর্ম্মদাতীরে একটি কুটির বাঁধিয়া ঘরকন্না করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বুঝিলাম কি জানি অন্য গুরুভাইরা ইঁহাদের প্রতি কটাক্ষ করেন, এইজন্যই গুরুদেব তাঁহাদের এই অজ্ঞাত বাসের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। নাসিকে বাঙ্গালী নাই। বিদেশীয়দের মাঝখানে এই নবদম্পতী নির্ব্বিঘ্নে আপনাদের ঘরকন্না ও সাধনভজন করিতে পারিবেন।

(৮)

তিন বৎসর পরে আবার পূজার ছুটিতে গুরুদেবের পাদপ্রান্তে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। একেদিন একলা পাইয়া ব্রহ্মচারী ও হৈমবতীর কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। গুরুদেব কহিলেন ব্রহ্মচারী আবার বিবাহ করিয়াছেন। শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। বলিলাম—"সে কি? ব্রহ্মচারীকে ত এমন নীচ প্রবৃত্তির লোক কল্পনা করি নাই!"

গুরুদেব কহিলেন—বিবাহ করিয়াছে বলিয়াই এরূপ ভাবিতেছ কেন?

আমি—এক স্ত্রী থাকৃতে কেবল কামপরবশ হইয়াই লোকে আবার বিবাহ করিতে পারে।

গুরুদেব—বিবাহ ব্রহ্মচারী করে নাই। হৈমবতীই তাহাকে আবার বিবাহ করাইয়াছেন।

আমি—এও ত অদ্ভুত কথা। হৈমবতীর কি সন্তানাদি হয় নাই?

গুরুদেব—হৈমবতীর একটি পুত্র সন্তান আছে।

আমি—তবে আবার বিবাহ কেন?

গুরুদেব অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। আমিও ভাবিতে লাগিলাম—এ হল গুরুদেব ইঁহাদেরে যে রাগমার্গের সাধনা দিয়াছিলেন, তার পরিণাম কি এই? কি ইঁহাদের ভিতরকার প্রকৃতিটা ধরিতে পারেন নাই? এই সকল প্রশ্ন মনের তোলপাড় হইতে লাগিল।

দিন তিন চার আমি এই সন্দেহে পড়িয়া অস্থির হইয়া রহিলাম। গুরুদেবের আমার পূর্ব্বকার অবিচলিত শ্রদ্ধা যেন টলিয়া উঠিল। এই সন্দেহে মনটা এতই হইল যে আর সেখানে থাকা অসম্ভব হইল। একদিন প্রত্যুষে আর সকলে স্নানাদি চলিয়া গেলে, গুরুদেবকে একেলা পাইয়া কহিলাম—"আমি আজই দেশে ফিরিয়া যাব। ছুটী ফুরাইবার বিলম্ব আছে। একবার হৈমবতী ও ব্রহ্মচারীকে যাইয়া দেখিয়া আসি না কেন? তারাও আপ্যায়িত হইবে, তুমিও দেখিয়া সুখী হইবে।

গুরুদেব—তোমার মন যখন চঞ্চল হইয়াছে, তখন যাওয়াই ভাল। তবে এসো।

আমি এ কথার হাঁ, না, কোনও উত্তর করিলাম না দেখিয়া গুরুদেব কহিলেন—"দেখ, আমরা ভগবান নই। অন্তর্য্যামী ভগবান কাকে কোন্ পথে লইয়া যান, তার মর্ম্ম কিছুই বুঝি না। ব্রহ্মচারীর পক্ষে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করা ধর্ম্ম-রক্ষার জন্য অত্যাবশ্যকীয় হইয়া পড়িয়াছিল, ইহা বুঝিয়াই আমি তাঁহাকে অনুমতি দিয়াছি। লোকে যাকে বিবাহ বলে—হৈমবতীর সঙ্গে ব্রহ্মচারীর সে বিবাহ হয় নাই। ইহারা কখনও স্বামী-স্ত্রীরূপে পরস্পরের সঙ্গে বাস করে নাই। হৈমবতী এই সর্ত্তেই ব্রহ্মচারীকে বিবাহ করেন। ব্রহ্মচারীও এই সর্ত্তেই হৈমবতীকে ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।"

আমি—এও তো একরূপ প্রবঞ্চনা নয় কি?

গুরুদেব—প্রবঞ্চনা কাকে?

আমি—সমাজকে।

গুরুদেব—বিধবা বিবাহ এখনও সমাজে প্রচলিত হয় নাই। বিধবা-বিবাহ করিয়া ব্রহ্মচারী সমাজের বাহিরে গিয়াছেন। সে সমাজে অপাঙ্‌ক্তেয় হইয়াছে। সমাজের বিধিনিষেধের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নাই। সুতরাং তাঁরা সমাজকে প্রতারিত করিতে পারেন না।

আমি—তবুও হৈমবতীর পুত্রকে ত লোকে ব্রহ্মচারীর পুত্র বলিয়াই জানিবে! এই কি প্রবঞ্চনা নহে?

গুরুদেব—লোকে দত্তক গ্রহণ করে ত। প্রাচীনেরা ক্ষেত্রজ পুত্রের দায়াধিকার মানিয়াছেন। আর সকলের চাইতে বড় কথা—এই গরিব বেচারা কি পাপ করেছে যে আমরণ পর্য্যন্ত সে সমাজে ঘৃণিত হইয়া থাকিবে? হৈমবতীর দেহ যদি অপবিত্র হইত, হৈমবতী যদি কামাতুরা হইয়া ব্রহ্মচর্য্য ভঙ্গ করিতেন, তাহা হইলেও অন্য কথা ছিল। হৈমবতীকে নিদ্রায় অচেতন পাইয়া এক ব্যক্তি তাঁহার ধর্ম্ম নষ্ট করে। সে ব্যক্তিও ঠিক কামাতুর ছিল না। সেও ভাবাবেশে নিদ্রিত অবস্থাতেই তোমরা যাকে ইংরাজিতে somnambulist'এর অবস্থা বল, সেই অবস্থায় নিদ্রাভিভূতা স্বপ্নাবিষ্টা হৈমবতীর সঙ্গে যুক্ত হয়। সজ্ঞান হইবা মাত্র উভয়েই অতিশয় অনুতপ্ত হইয়া পড়ে,—হৈমবতী আত্মহত্যা করিতে গিয়াছিল—ঠাকুরের ইচ্ছায় করিতে পারে নাই। সে ব্যক্তি সেই দিন হইতেই নিরুদ্দেশ—বাঁচিয়াছে কি মরিয়াছে কেউ জানে না। তার অগাধ বিষয়সম্পত্তি ফেলিয়া সে নিরুদ্দেশ হইয়াছে। হৈমবতীর পুত্র যে পাপে জন্মে নাই, ইহা ত মান্‌তেই হবে। তথাপি সমাজ ত অত শত বুঝত না। অত জানবেই বা কি করিয়া? অথচ হৈমবতী যদি বিবাহ না করিত, তাহা হইলে এই বেচারাকে কি দুর্ব্বিষহ জীবনভার বহন করিতে হইত! এসকল ভাবিয়াই হৈমবতী রাজি হন। এসকল জানিয়াই ব্রহ্মচারী তাঁহাকে ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করেন।

আমি—ব্রহ্মচারীর চরণে কোটি প্রণাম করি। পুরুষে এ মহত্ত্ব দেখি নাই।

গুরুদেব—ভুল বুঝিওনা। ব্রহ্মচারী পতিতোদ্ধারের জন্য বিবাহ করেন নাই। যাঁহাকে আপনার ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন, তাঁহার সকল কর্ম্মভার নিজে ভাগ করিয়া লইবার জন্যই বিবাহ করিয়াছেন। হৈমবতীর প্রতি তাঁর শুদ্ধ প্রেম জন্মিয়াছিল বলিয়াই তিনি হৈমবতীর সুখ ও শান্তি কামনায় তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছেন।

আমি—হৈমবতীর কথা কি ?

গুরুদেব—হৈমবতীও ব্রহ্মচারীর প্রতি শুদ্ধ অনুরাগিনী হইয়া তাঁহাকে পতিরূপে গ্রহণ করেন। কিন্তু স্ত্রীলোকের সংস্কার সহজে যায় না। হৈমবতী কিছুতেই তাঁর দেহ পরপুরুষ সংস্পর্শে অপবিত্র হইয়াছে, ইহা ভুলিতে পারেন নাই, তারই জন্য এই অপবিত্র দেহ পবিত্র পতি-সেবায় অর্পণ করিতে পারিলেন না। পতিকে আপনার আর যা-কিছু সকলই দিলেন—দেহটা অর্পণ করিলেন না। জন্মান্তরে শুদ্ধদেহে যাহাতে পতিসেবা করিতে পারে অহর্নিশ হৈমবতী এই কামনাই করিতেছেন।

আমি—আবার বিবাহ করাইলেন কেন ?

গুরুদেব—ব্রহ্মচারীকে আমরা ব্রহ্মচারী বলিয়া ডাকি বটে, কিন্তু ব্রহ্মচারী একেবারে জিতেন্দ্রিয় পুরুষ নহেন। এ অবস্থায় তাঁর দারান্তর পরিগ্রহ করা নিজের ধর্ম্ম এবং ব্রত রক্ষা—উভয়-কারণেই অতিশয় প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। হৈমবতীকে দেখিয়াছ। সপত্নী কোনও অংশে হৈমবতী অপেক্ষা খাটো নহেন। রূপে, কুলে, গুণে, সকল বিষয়েই হৈমবতীরই মতন। হৈমবতীই নিজে এই অলোকসামান্য রূপগুণবতী রমণীকে খুঁজিয়া অপনার সপত্নী করিয়াছেন। হৈমবতী নিজে প্রতিদিন সপত্নীকে সাজাইয়া, সপত্নীর পতি ভিতর দিয়া, আপনার দেহমনপ্রাণ দিয়া পতিসেবার সাধ মিটাইয়া থাকেন। হৈমবতী এখন "যুগল-সাধন" করিতেছেন। হৈমবতীর সাধনবলে তাঁহাদের নাসিকের আশ্রমে নূতন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই নব বৃন্দাবনে, নবযুগল উপাসনা দেখিয়া আইস ;কৃতকৃতার্থ হইবে।

আমার নাসিকে যাইতে হইল না। এখান হইতেই এই অপূর্ব্ব লীলা ধ্যান করিতে হইতে লাগিলাম।

শ্রীবিপিন চন্দ্র

সতী

(১)

সিবিলিয়ান সুধীন্দ্রকুমার স্ত্রীর সহিত সাক্ষাতাভিলাষে কলিকাতা হইতে বিকাল পাঁচটার ট্রেণে, ধুবড়ি গৌহাটি রেলওয়ের রাজারহাট ষ্টেশনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল।

সুধীন্দ্র বিলাতে "কোচার রেণের এস্‌টেব্‌লিস্‌মেণ্টে" বিখ্যাত অধ্যাপক ম্যাক্‌নিনের নিকট ল্যাটিন ও গ্রীক পড়িবার সময় নিজের জীবনটাকে এক নূতনতর আদর্শে গঠিত করিয়া ফেলিয়াছে বলিয়াই তাহার বিশ্বাস ছিল। একটা ছুটীর সময় ইটালী ভ্রমণেও সে গিয়াছিল। সেখান হইতে ফিরিয়া পাঠ্যাবস্থায় সে কত কুয়াসাচ্ছন্ন তুষারপাতশীতল রাত্রে গায়ের উপর দুইখানা কম্বল টানিয়া মনে মনে কল্পনা করিয়াছে যে, সে আর জন্মভূমি ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিবে না,—অপূর্ব্ব বৈচিত্রময়ী ইটালীতে তাহার ভবিষ্যৎজীবনকে সে তার অন্তরের সমুদয় সুকুমার ললিত কল্পনা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছিল,—ভিনাসের জীবন্ত প্রতিমা কোন ইন্দিবরাক্ষী ইটালিয়ান রূপসী তাহার সেখানকার দ্রাক্ষাকুঞ্জ-সুশোভিত সুরভি উদ্যান-ভবনে কুঞ্জ-লক্ষ্মীরূপে চির অধিষ্ঠিতা থাকিয়া তাহার এই কাব্য-চর্চ্চা সফল করিয়া তুলিবে ; সে যে এই ইউরোপ মহাদেশের প্রমোদ-কুঞ্জ ইটালীরই চির আত্মীয় ব্যতীত অন্য কোথাও কার কেহ, সে স্মৃতিটুকুও সে তাহার চারিপাশের কোন একটি কোণেও এতটুকু ফেলিয়া রাখিবেনা ; একেবারে তাহার কাব্যে তাহার সৌন্দর্য্যে বৈচিত্রে মিশিয়া একাকার হইয়া যাইবে। চিরপরাধীন, দরিদ্র ও অসভ্য দেশের মধ্যে আকর্ষণের বস্তু কি আছে যে সেখানে না ফিরিলে নয় ? কিন্তু যতই হৌক কেমন যে একটা ঘরের টান সেটা মাধ্যাকর্ষণের শক্তির চেয়ে কোন অংশেই বুঝি কম নয়। পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া সে ভারতবর্ষে চাকরী চাহিয়া বসিল, এবং আশাপূর্ণ হইবামাত্র পি, এণ্ড ও, কোংর "মিনার্ভা" জাহাজে চড়িয়া বসিতে বিলম্ব করিল না। পুরাতন গ্রীক সাহিত্যের এইটুকু স্মৃতি মাত্র ভারত প্রান্তাবধি তাহার সহগামী হইতে পাইয়াছিল, আর কিছুই না।

স্ত্রী পঙ্কজিনী স্বামীর আগমন সংবাদে প্রত্যহ আশা করিতেছিল হয় ত আজিকার ডাকে তাহার জাহাজের আগমন সংবাদ আসিবেই। কিন্তু পত্র আসিলেও তাহার মধ্যে আগমনী গান গীত হয় না! সখীরা সে পত্র ছিনাইয়া লইয়া পাঠ করিয়া হাসে, আবার তার মেজভাজ মেজবধূ সেদিন স্পষ্টই মুখের উপর ফট্ করিয়া বলিয়া বসিল, "ঠাকুরজামায়ের ভাই গতিকটা আমার কেমন যেন ভাল ঠেক্‌চে না! হয় ত বা সঙ্গে করে এক 'নেলি' 'সেসি', কি 'কিটি'কে এনেইচেন—তাই বা কে জান্‌চে বল ?" পঙ্কজের মনে স্বামী সম্বন্ধে এত বড় অবিশ্বাস কোন দিনই স্থান পায় নাই। স্বামীর ব্যবহার তাহার অত্যধিক আগ্রহের নিকট ঈষৎ অসঙ্গত ঠেকিলেও সে তাঁহার

সম্বন্ধে এমন একটা অপমানের কথা একেবারেই বরদাস্ত করিতে রাজী ছিল না। ধাঁ করিয়া তখনই ফিরিয়া জবাব দিল, "নামগুলো যে চব্বিশ ঘণ্টা শুনে শুনে একেবারে মুখস্থ করে ফেলেচ দেখচি ? তা "নেলি" "সেসি" সবারই কি ভাগ্যে জোটে ভাই ?"

মেজবধূর মুখখানা বেজায় রকম ভারি হইয়া উঠিল। কথাটার মধ্যে মস্তবড় একটা সত্যের খোঁচা ছিল, তাহা তাহার বা অপর কাহারও বুঝিতে বাকিও ছিল না। সেটা তাহার অবি সৌখীন, কলিকাতাবাসী স্বামী সম্বন্ধীয়। অন্ধকার মুখে উঠিয়া যাইবার সময় সে মৃদুস্বরে বলিয়া গেল, "ভাল বল্লেও মন্দ দাঁড়ায়। কোনজনা আর বিলাত থেকে সাধু সত্যপীর হয়ে ফিরে আসে বাপু! তাই একটু সাবধান করেই দিচ্ছিলুম। তা কাঙ্গালের কথা বাসি হলেই না মিষ্টি লাগে!"— পঙ্কজিনী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিল, "তুই নিজে সাবধানে থাকিস্ ভাই দেখিস্।"

এবারকার পত্রোত্তরে সে লিখিল, "কলিকাতার কাজ শেষ হইল কি ? কি এমন কা যে, তার শেষই হয় না ?"

উত্তর আসিল ;—"কাজ শেষ হইয়াছে। হুকুম আসিয়াছে সাত দিনের মধ্যেই ভাল যাইতে হইবে, আমি শনিবার তোমাদের ওখানের জন্য রওনা হইতেছি। পঙ্কজ! এ আমাদের দুঃখ রজনী পোহাইল বুঝি !"

এ চিঠিখানা-পঙ্কজিনী ইচ্ছা করিয়াই সখীর দলে প্রকাশ করিল।

বড় দিদি ভগিপতির আসার খবর শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁরে, তোকে সঙ্গে নিয়ে যাবে না কি ?"

লইয়া যাইবার সম্বন্ধে এখন পর্য্যন্ত কোন কথাবার্ত্তাই কোন পক্ষ হইতে উঠে নাই; এ চার বৎসর পরে সে সবে এই একটী মাস মাত্র হইল দেশে ফিরিয়াছে ; তাহার মধ্যে আর সব কর্ম্ম কাজে আটকাইয়া পড়িয়াছিল। সেই যা চৌদ্দ বৎসর বয়সে ঘোমটার ফাঁক তাহাদের দুজনের বার কয়েকের চারিচক্ষের মিলন। স্বল্প একটী বৎসরে ভাল করিয়া অ পরিচয়ও প্রায় কিছুই হয় নাই। চিঠি পত্রেই যা এই দীর্ঘ দিন ধরিয়া উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া গিয়াছিল। পঙ্কজিনীর স্বভাবে একে লজ্জা সরমের ভাগটা একটু কম, তাহার উপর সে এই চারিবৎসর ধরিয়া শিখিয়া আসিতেছে যে সে বিলাত-ফেরতের তাহাকে বাঙ্গালী ঘরের নববধূর মত সরম-সঙ্কুচিতা হইয়া থাকিলে চলিবে না। কাজেই অবস্থা হিসাবে তাহাকে সাধারণের চক্ষে কতকটা বেহায়ার মতই মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু আর উপায় কি ?

দিদির প্রশ্নের উত্তর সে কি দিত ঠিক বলা যায় না। কিন্তু যেমনই মেজবধূ তাহা লইয়া কহিয়া উঠিল, "তা আর ও কেমন করে জান্‌বে, ঠাকুর জামাই তাতো কই কিছু বোধ হয় নিয়ে এখন যাবেন না।" অমনই কোথা হইতে একটা বিরক্তি তাহার মনে

ভাসিয়া উঠিল ও সে ইহার প্রতিবাদ করিয়া তৎক্ষণাৎ বলিয়া ফেলিল, "তার আবার নূতন করে লিখবেনই বা কি ? একথা শুন্‌লে এসে বল্‌বেন না কি যে, তুমি তো আর খুকিটী নও, এ'ও কি আবার বলে দিতে হয় ? এ ত জানা কথাই।"

মেজবধূ এ কথার কোন উত্তর করিল না। পঙ্কজিনীর বয়স এই আঠার বৎসর তিন মাস মাত্র হইলেও তার বিশ্বাস ছিল তার বয়সটা খুব পাকিয়াছে।

বড় দিদি কহিলেন, "তা বটে, তবু একটু স্পষ্ট করে লেখাটা উচিত ছিল বই কি! যাহোক আমাদের একটু গুছিয়ে টুছিয়ে রাখ্‌তে হবে। যদিই এসে নিয়ে যেতে চায়, তখন চারিদিকে হাত্‌ড়ে বেড়াতে হবে আবার। ফেনি! তোর কাণের পার্শী মাকড়ি দু'টো খুলে রেখে দিয়ে সেই মুক্ত বসান ফুল দুটী পরিস্। এক হাত কাঁচের চুড়ি, শাঁখা ওসব শিত্‌লে রাখ ; ও-কি আর ওসব পছন্দ করবে ? সাহেব হয়ে আস্‌চে। অমন সং হয়ে বেড়াস্ নি যেন, দেখ্‌লে হয় ত চটে যাবে।"

বড়বধূ ও মেজবধূ উভয়েই ননন্দার দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিল। বড়বধূ কহিল, "ঠাকুরঝির যা নিষ্ঠাকাণ্ড! এইবার সে সব কোথায় ভেসে যায় তাই দেখি! পূজো আহ্নিকে বেলা দেড় প্রহর করে যে বড় কাটান, তখন যে আটটার মধ্যে চা বিস্কুট দিয়ে প্রাতর্ভোজন সেরে সাহেবের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে হাওয়া খেতে যেতে হবে।"

বাস্তবিকই হরপ্রসাদ বিশ্বাসের এই আদুরে আব্দারে ছোট মেয়েটির বাল্যাবধি শত খেয়ালের মধ্যে এও এক মহা খেয়াল—সে চিরদিনই অত্যন্ত নিষ্ঠাবতী। এটুকু সে তার মার কাছেই পাইয়াছিল, তদ্ভিন্ন তার বাবাও তাহাকে হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক ছোট বড় পুস্তক পড়িতে দিয়া হিন্দু-শাস্ত্রে একটু অধিকার জন্মাইয়া ছিলেন। মোটামুটি ছয় দর্শনেরই কিছু কিছু জ্ঞান তাহার ছিল। আচার বিচারে হিন্দুর ঘরের মেয়ের পক্ষে যেটুকু স্বাভাবিক, তাহা ব্যতীত সে যে এমন কিছু অত্যদ্ভুত কাণ্ড করিয়া থাকে তাহা অবশ্য নয়। কিন্তু হিন্দুয়ানী জিনিষটা আজিকালিকার দিনে ইংরাজী-শিক্ষিত মহলে এমনি ছোটলোকমী হইয়া পড়িয়াছে যে, তাঁহাদের তো কথাবার্ত্তাই নাই—তাঁহাদের গৃহিণীরা বিদ্যাশিক্ষিতা হইলে ত আর কথাই নাই,—অতি অল্প শিক্ষিতা,—অধিকাংশই সম্পূর্ণ অশিক্ষিতা—ভালোকেও এখন তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও কোন প্রকার, আনুষ্ঠানিক হিন্দুত্বের আচার-বিচার-জপ-তপ-পূজা-পরায়ণা দেখিলে তাহার বিপক্ষে তীব্র উপহাসের হাসি না হাসিয়া থাকিতে পারেন না। এই সব মহিলাগণের নিজের নিজের মনের মধ্যে একান্ত বিশ্বাস, তাহারা যেন অত্যন্তই আলোক প্রাপ্ত! পুরাতন চালের এতটুকু তাঁহাদের মধ্যে দেখা গেলে কি জানি কেবা কি মনে করে—সে! তাই তাদের গুরুজনের পায়ের তলায় মাথা নামাইতে, দেব দেবীর পূজা পার্ব্বণে (প্রকাশ্যে) যোগ দিতে, রান্না ঘরে প্রবেশ করিতে, ঠাকুর ঘরের (যদি বৃদ্ধাদের জন্য) চৌকাঠ মাড়াইতে এবং নিজের ছেলেপিলের "ঝক্কি" "ঝঞ্ঝাট" পোহাইতে একই প্রকারের আপত্তি।

নিজেরাও এসব করেন না, পরকেও করিতে দেখিলে মুখ টিপিয়া হাসেন। কোথাও প্রকাশ্যেই আপত্তি করেন। অথচ শিক্ষার মধ্যে দেখা যায় কেশ ও বেশের পারিপাট্য, পোষাকের কাট ছাঁট এবং গহনার ফ্যাসানে মহদনুকরণ শিক্ষাটাই যথেষ্ট পরিমাণে জন্মিয়া থাকে; বিদ্যা কিম্বা বুদ্ধির কোন প্রকার উৎকর্ষ প্রায়ই এঁদের মধ্যে দেখা যায় না। অবশ্য যেক্ষেত্রে তাহাও দেখা যায় সে-ক্ষেত্রেও ইহা হইতে বড় বেশী প্রভেদ নাই! বরং অহঙ্কারের আগুন দশগুণ তেজের সহিত জ্বলে, তবে তাঁদের উপরে একটা বিলাতি সভ্যতার অসরল আচ্ছাদন থাকায় তাঁরা কথঞ্চিৎ সহনীয়। কাজেই আধুনিক শিক্ষিত বড় মানুষের বাড়ীতে সকলকে ছাড়াইয়া বাড়ীর একটি মেয়ে যদি কতক সেকালে-চাল বজায় রাখে, তাহা সকলের চক্ষেই কিছু বিসদৃশ ঠেকিবে না ত কি হইবে? বিশেষতঃ সে মেয়েটি যদি আবার বিলাত ফেরতের স্ত্রী হয়!

পঙ্কজিনী ভ্রাতৃজায়াদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠার কিছু অনুগত ছিল। তাহার কতক কারণ, মধ্যমাপেক্ষা কিছু লোকময়ী ও ধীর স্বভাবা, আর অপর কারণ, বড় ভাই নরেন্দ্রনাথ সেজ ভাই অপেক্ষা ভাই বোনদের প্রতি স্নেহশীল ও কিছু সংযত এবং উদার চরিত্রের লোক। শিশু কনিষ্ঠা ভগ্নিটীকে সে বড় আদরের সহিতই পালন করিয়াছিল। সুধীন্দ্র বিলাত পলাইয়া ভবিষ্যৎ ভাবিয়া সে-ই পঙ্কজকে ইংরাজী লেখা পড়া শিখিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিল। বাজনা শিখাইবারও তাহার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু পঙ্কজ কোন মতেই ইহাতে সম্মতা হয় নাই বলিয়া সে সাধ তাঁহার অপূর্ণই রহিয়া যায়। তাই এখন বড়বধূর পরিহাসে সে মনের মধ্যে একটু হইয়া উঠিলেও সে ভাবটা চাপা দিয়া ফেলিয়া ঈষৎ হাসিয়া প্রকাশ্যে কহিল, "ঈস্! তাই করলুম তো! আমি যেমন আছি ঠিক এম্‌নিই থাকবো দেখ।"

মেজবধূ নারীর এ প্রতিজ্ঞার অসারতা সম্বন্ধে কিছু অধিকতর অভিজ্ঞা—তিনি তাহার ছেলেমানুষীপূর্ণ স্পর্দ্ধার কথা শুনিয়া হাসিয়া ফেলিয়া সবিদ্রূপে কহিলেন, "ওগো অতটা করোনা গো, করোনা।—যখন ঘাড়ে জোয়াল পড়বে তখন মেম সাজতে পথ পেলে হয়। আর ভাই তোমার ভাজেরা নয় যে ধম্‌কে চোখ রাঙ্গিয়ে দাবড়ী দিয়ে থামিয়ে রাখবে। যে তোমার মুগুর আস্‌চে! মাথার উপর ঘা'টী পড়লে তখন ল্যাজটী গুটিয়ে হবেরে দাদা!"

অন্যে বলিবে কি, এই সম্ভাবনাটার কথাই তাহার নিজেরও আজ কয় বৎসর ধরিয়া ভিতর আগুনের ফুলকীর মত ধুনিয়া ধুনিয়া উঠিতেছিল। বিশেষ যেদিন সুধীন্দ্র দেশে সেইদিনই আশা, হর্ষ, প্রতীক্ষার মাঝখানে এতটুকু—একটুখানি গোপন দুর্ভাবনা,—তারা বিষাদের সহিত, আতঙ্কের সহিতই জড়িত—তার মনের কোণে হুম্‌কি দিয়া যাইতেছে সে স্তব্ধ নীরব রাত্রে বিনিদ্র শয্যায় পড়িয়া মনে মনে ভাবিয়াছে, 'না জানি তিনি কি রূপ আমার সঙ্গে করিবেনই!'—কিন্তু এ চিন্তা লইয়া ভাবিয়া মরা তাহার স্বভাব নয়।

যে তাহার ভয় ভাবনা সমুদয়েরই সঙ্গে সঙ্গে একটা শেষ মীমাংসা করিয়া নিয়া থাকে, কোন বিষয়েরই সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিতে তাহার বিলম্ব ঘটে না। এ বিষয়েও সে তেমনিই নিজের মনের মধ্যে স্থির করিয়া ফেলিয়াছিল। তদ্ভিন্ন তার এই চার বৎসরের অসংখ্য প্রেমপত্রগুলিতে সে তার প্রেমময় স্বামীর যে ভালবাসার পরিচয় পাইয়াছে, তাহাতেও তাহার দ্বারায় সে নিজকে অত্যাচারিত হইবার কথা মনের কোণেও স্থানে দিতে পারেনা, তিনি অতটুকু তার জন্য সহিবেন, নিশ্চয় সহিবেন। অমন নিগূঢ়ার্থপূর্ণ অপমানের ভাবে ওই সম্বন্ধীয় কথাই ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বারে বারেই মেজবধূকে কহিতে শুনিয়া আবার তাহার ভয়ানক রাগ ধরিয়া গেল। ফস্ করিয়া সে সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া ফেলিল, "সবাইকে নিজের মতন মনে করোনা মেজ বউদি! কেউ বশ করতে জানে, কেউ বা বশ হতে জানে; সেটা নিজের শক্তির উপরেই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। যদি কেউ আমায় কেটে দু'খানা করে, তাহলেও এ স্বভাবের আর রদ বদল করতে পারচেন না। তা তিনি 'মুগুরই' হোন আর হাতুড়িই হোন, এ ইস্পাতও যে বড় কম শক্ত নয়, তা জান্‌তে কারু বাকি থাক্‌বে না।"

বড়দি' ইতিমধ্যে কোলের ছেলের কান্নার শব্দে উঠিয়া গিয়াছিলেন।

বড়বধূ এ কথা শুনিয়া ঈষৎ চকিত হইয়া কহিয়া উঠিলেন, "কি মিথ্যে মিথ্যে তর্ক করে মর্‌ছিস তোরা দু'টোতে। স্বামী এসে যা করাবেন,' তাই করবে, তা এতে আবার 'মুগুরের' কি কথা আছে লা মেজ বউ? আয়, ছোট ঠাকুরঝি, আয় ভাই গা ধুতে শীগ্‌গির করে চল। ওমা! বেলা সব পড়ে গেছে যে দেখছি একেবারেই! কখন কি হবে?"

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅনুরূপা দেবী

দেবত্র

দশম পরিচ্ছেদ

অরুন্ধতী ডাকিলেন "অরুণ!"

অরুণ নিবিষ্ট-মনে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আদেশমত শঙ্কর ভাষ্যের টীকার কয়েক স্থান হইতে কতকগুলা মীমাংসার সমাধান একটা কাগজে তুলিতেছিল। মৃত্যুঞ্জয় এইবারে সংসারের সর্ব্ব বিষয় হইতে দূরে সরিয়া দিনরাত্রি নিজের গ্রন্থ-সাগরের মধ্যেই ডুবিয়াছেন। অরুণকে মাত্র মাঝে মাঝে সহকারী করিয়া দুই একটী আদেশ দিতেন। আজও তাঁহারই কার্য্যে নিমগ্ন অরুণ অরুন্ধতীর এই আহ্বানে ত্রস্তে মুখ তুলিয়া তাঁহার প্রতি চাহিল। এই গত কয়েকমাস তাহাদের এই আশ্রয়-গৃহের মেরুদণ্ড ভাঙিয়া পড়ায় তাহারা যেন অরুন্ধতীর মুখের পানে চাহিতেই পারে নাই। তিনিও তাঁহার যথানির্দ্দিষ্ট সমস্ত কর্ম্মগুলি বরং অধিকতর দৃঢ়তার

সহিতই সম্পাদন করিয়া চলিতেছিলেন, কিন্তু নিজ হইতে ডাকিয়া কোন প্রসঙ্গ বুঝি সময়ে সঙ্গেও তুলিতেন না, আজ সহসা তাঁহার এই আহ্বানে তাই অরুণ উদ্‌গ্রীবভাবে তাঁহার পানে চাহিয়া উত্তর দিল "জেঠিমা ?"

"অরুণ, করুণার জন্য পাত্র খোঁজ, তার বিয়ের আর দেরী করা হবেনা।"

সহসা তাঁহার এই সংক্ষিপ্ত আদেশে অরুণ বিস্মিত কিংকর্ত্তব্যমূঢ়ভাবে উত্তর দিল "আমাকে বলছেন জেঠিমা ?"

"হাঁ অরু তোমাকেই বল্‌ছি। বাবা সংসার থেকে একেবারে দূরে চলে গিয়েছেন, বিষয় সঙ্গে তাঁর আর সম্বন্ধ নেই। তুমিই মাত্র এখন এ সংসারের হাত পা মাথা সব। সনৎ পড়া জগতের কিছুই জানেনা, এই আটমাস সেও সব ছেড়ে বাড়ীতে প'ড়ে থেকে কেমন হ'য়ে গিয়ে দেখছত' ! তুমিই তাকে আবার এ দুমাস কলকাতা পাঠাতে পেরেছ। তাকে এ-ভার উপযুক্তও সে নয়। তোমার এটা করতে হবে। আর সব কাজের আগে এখন এইটারই দরকার

কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া অরুণ বলিল, "করুণার বিয়ে কি এখন না দিলেই নয়, এই দু'মাস মাত্র এতবড়—" বলিতে বলিতে অরুণের কণ্ঠস্বর ক্রমে বুঁজিয়া গেল। একটু পরেই উত্তর দিলেন।

"না অরুণ, করুণা পনেরো বছরে পড়লো আমাদের সমাজে এতবড় মেয়ে অবিবাহিত কখনো থাকেনি করুণা আর মীরার যতটা বয়স হল!—কি মুস্কিলে যে পড়তে হবে এখন তাদের পাত্র পেতে তাও জানিনা।"

"তাই যদি মনে করেন জেঠিমা তাহ'লে ছোট বেলায়ই করুণার বিয়ে দিলেন না কেন ?"

"সবই তো জান' বাবা, পাছে মীরার কষ্ট মনে জাগে ব'লে ঠাকুরের কাছে এ একথা তুল্‌তেই পার্‌তাম না। তোমার জেঠামশায়েরও ইচ্ছা ছিল মীরা আর করু সময়েই বিয়ে হবে—তাদের একটু বড় ক'রে বিয়ে দেওয়ারই তাঁর মত ছিল। তারপর বছর তো—"

অরুন্ধতী থামিলেন। অরুণ ক্ষণেক ভাবিয়া বলিল "কিন্তু দাদামশায় তো কিছুই বলে জেঠিমা।"

"তিনি এই ক'মাস থেকে সবই কি ছাড়েন নি ? বিষয় আশয় সংসার সব তোমার ওপোর পড়েছে ; এ ভারও এখন তোমার অরুণ।"

"আমার যেন মনে হয় তিনি করুণার বিয়ে দেবার দরকার মনে করেন না। হয় জেঠিমা—" অর্দ্ধপথে অরুণকে যেন সঙ্কোচের সহিত থামিতে দেখিয়া মুখে বলিলেন—

"তোমারও কি মনে হয় অরুণ ?"

"মনে হয় জেঠিমা করুণার নাই বা বিয়ে হ'ল। আমাদের শাস্ত্রে এমন চিরকুমারী কন্যার কথা অনেক দেখ্‌তে পাওয়া যায় যাঁরা তপস্বিনীর আচারে চিরদিন ধর্ম্মচর্য্যা করে জীবন কাটিয়ে গেছেন। তাঁদের দিয়ে জগতেরও অনেক কাজ হয়। এ জীবনতো মন্দ নয় জেঠিমা ?"

জেঠিমা ক্ষণেক স্তব্ধ ভাবে অরুণের পানে চাহিয়া থাকিয়া শেষে মৃদুস্বরে বলিলেন—

"কোন' না কোন' ঘটনাক্রমেই তাদের সে রকম চিরকুমারী হ'য়ে থাক্‌তে হয়নি কি অরুণ ? আমাদের শাস্ত্রে কি এই সংস্কারকেই জীবনের একটা বড় কর্ত্তব্য বলে না ? দ্যাখো যাঁরা কুমার-ব্রহ্মচারী তাঁরা গুরুর কাছে বহুদিন ধ'রে শাস্ত্র ও ধর্ম্মচর্য্যায় কাটালেও শেষে গুরু তাঁদের আদেশ দেন্ যাও গৃহস্থ হওগে! অনেক চিন্তার পরই আমাদের ঋষিরা এ ব্যবস্থা করে গেছেন। ছেলেদেরই যখন এই অবস্থা তখন মেয়েদের কথা তো দূরেই থাক্। তাদের জন্য তো এই গৃহধর্ম্ম পালন করা ছাড়া অন্য পথই নেই, তোমাদের শাস্ত্রেই এই রকম বলে না কি ? ঠাকুরকে আমি কতদিন এই কথা ব্যাখ্যা করে বল্‌তে শুনেছি। আর আজ তিনিই তাঁর ঘরের মেয়েদের কথা ভাবছেন না,—এ দুঃখ—"

"দুঃখ নয় জেঠিমা এও ঘটনাক্রমেই ঘটে যাচ্চে আপনার ঘরের মেয়েদের ওপোরে ! নৈলে দাদামশায়ের মত লোক কি এতদিন চুপ ক'রে থাকেন ? মীরারই যখন এখনো বিয়ে হলনা তখন করুণার বিয়ের জন্য কেন ব্যস্ত হচ্চেন মা ? করুণার বিয়ের জন্য হাঙ্গাম তুল্‌লেই দাদামশায়ের মীরার জন্য কষ্ট আস্‌বে, সে আমি ত কিছুতেই পার্‌বনা জেঠিমা, আমাকে মাপ করবেন।" অরুণের অঙ্গনিবদ্ধ হস্তের পানে চাহিয়া চাহিয়া শেষে অরুন্ধতী বলিলেন—

"তবে কি এ সংসারে ছেলে মেয়েদেরও এই রকমই ভাগ্য হবে ? কেউ সংসারী হবেনা ? মীরার কি হবে জানি।—সনতের কথা শুনে সে যে সংসারী হবে এমন মনেও হয় না, দেশের দুঃখ, দেশের অভাব—দেশের কুশিক্ষা এই সব নিয়ে তার চোখের দৃষ্টি এতদূরে গিয়ে পড়্‌ছে দিন দিন, সে যে নিজের ঘরের পানে আর চাইতে পারবে সে বিশ্বাস আমার ক্রমেই কমে যাচ্চে। কেবল ভরসা ছিল তোমার আর করুর দিকে, যে তোমাদের বিয়ে দিয়ে—"

"মা," অরুণ শান্ত স্নিগ্ধ মুখে অরুন্ধতীর পানে চাহিল। "মীরা সনৎ যারা এই সংসারের সর্ব্বস্ব, তাদেরই বিষয়ে মনে এই ধারণা রেখে তোমাদের পায়ে ভেসে-আসা এই তোমার ছেলে মেয়ে দুটিকে দিয়ে তোমার এই সংসার ধরে রাখ্‌তে চাও ? এর চেয়ে দুঃখের কথা কি আর থাক্‌তে পারে ! আমাকে আর করুণাকে দিয়ে সংসার পাতাবে জেঠিমা তুমি ? যাদের অভিশপ্ত জীবন কালের আগুনে ছোটবেলা থেকেই ঝল্‌সে আছে, তোমাদের ছায়ায় এসে না পড়্‌লে তারা যে কোন্‌দিন ছাই হয়েই যেতো, তারাও কি সংসারে ঢোক্‌বার উপযুক্ত মা ? কি দরকার করুণার বিয়ের ? আমার তো মনে হয় কোন দরকার নেই। তোমার কাছে তোমার পায়েই

তার জীবনটা কেটে যাক্। আমাদের যদি তোমাদের ছায়া থেকে একটুও সরাও—না জানি আবারও আমাদের জন্য কি কোথায় অপেক্ষা ক'রে আছে।"

অরুন্ধতী বাক্‌নিষ্পত্তিশূন্য হইয়া অরুণের বিষাদ-মেঘাচ্ছন্ন মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন, ক্ষণিক পরে অরুণ যেন একটু সংযত হইয়া বলিল "সনতের বিষয় কেন আপনি অতখানি ভেবে নিচ্ছেন? তার পক্ষে ওগুলো যে সবই সঙ্গত! সে যে সমাজের মধ্যে থাকে, যে আদর্শ আর যে কাজ সে আশে পাশে দেখ্‌ছে তার সেই স্রোতে ভেসে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক যে মা! আর সে ভুল কথাও তো কিছু বলে না! নিজের ধারণায় সে নিজের জীবনেই ফোটাতে চায়; তার যে রক্তে জন্ম, এই তো তার উপযুক্ত মুখে মাত্র বড় বড় কথা বলে কাজে অন্য রকম করা সে তো তার ধাতু নয় তাই সে অস্থি মজ্জায় দেশের সেবক হয়ে উঠ্‌ছে। ঘরে এখন তো তার বেশী দৃষ্টি পড়ছে না তার দৃষ্টির সম্মুখে এখন সমস্ত পৃথিবী ভাস্‌ছে। তবে আমার মনে হয় এই দৃষ্টি যখন ঘরেও এসে পড়বে তখনি তার জীবন ও আদর্শ যথার্থ সার্থক হয়ে উঠ্‌বে।"

"কি জানি কোন্ পথে যাবে সে 'দেশ' 'দেশ' করে? এখনো যদি ছোট বৌ মীরাকে নিয়ে ঘরে ফিরে আস্‌তো তাও বুঝি খানিকটা রক্ষা হ'ত! কি তারা কর্‌বে ঠাকুর জানে কি করবেন ভেবে যেন আমি কূল পাই না অরুণ।"

"কেন অনর্থক অত ভাবেন! মীরার মা তিনি—মীরার যাতে মঙ্গল হয় তাই করবেন।"

"মঙ্গলকে দেখ্‌তে পাওয়া অত সহজ নয় বাবা! সে যাই হোক্ তোমরা ওরকম কথা মনে করিস্ নে। সনৎ মীরার পাশাপাশিই যে তোমরা দুটি আমাদের, তোমাদের জীবনের গতি সম্বন্ধেও যে আমার সমান ভাবনা।"

স্নিগ্ধ মুখে অরুণ বলিল "তা জানি জেঠিমা, কি কর্‌তে চান আমাদের জন্য আপনি?"

"একটি সুপাত্রে এখন করুকে বিয়ে দাও, পরের কথা পরে হবে। বিয়ে দিয়ে করে দিলেই কি তোমরা আমাদের পর হবে পাগল ছেলে! এ তোমার কি ধারণা?"

"সুপাত্র? আমি তো কাউকে চিনি না জেঠিমা, কোথায় পাত্র পাওয়া যায় জানি না। দাদা মশায়কে না বলে বরং সনৎকে এ ভারটা দিলে ভাল হয় জেঠিমা অনেককে জানে চেনে। অনেকই তার বন্ধুবান্ধব। তাকে বল্লে—"

"তাকে বল্লেও সে তার মীরার ইলার দৃষ্টান্ত দেখিয়ে বল্‌বে লেখাপড়া শেখা হবে বিয়ে দিয়ে! বিয়ে ভিন্ন কি জীবনের আর কোন কাজ নেই। এই রকম কর্‌বে সে।"

"তাহ'লে কি কর্‌ব জেঠিমা, আমি যে কারুকে জানি না! এ গ্রামে আমাদের স্বশ্রেণী যাঁরা আছে তাঁদের মধ্যে কারুকে কি পছন্দ করেন আপনি করু'র জন্যে?"

"না অরু, সেও আমি ভেবে দেখেছি। এ গ্রামে আমাদের স্বজাতি দুচার ঘর মাত্র তো আছে, তার মধ্যে একটিও সুপাত্র এ গ্রামে নেই।"

"তবে? দাদা মশায়কে বলা ছাড়া তাহলে উপায় নেই, কিন্তু আমার তাঁকে কি কর্ত্তব্য দেখিয়ে দেওয়া হবে না, এতে আপনি যদি কর্‌তেই হবে বলেন তাহ'লে আমায় এও করতেই হবে কিন্তু—"

"অরুণ—তোমারও এতে যতখানি সঙ্কোচ আমারও ততখানি, তাই নিজে আমি ঠাকুরকে বল্‌তে পার্‌ছি না তোমায় দিয়েই বলাতে চাই।"

"কেন জেঠিমা, আপনার বাধা কিসের? মীরার বিয়ের কথাও তো আপনি তাঁর কাছে তুল্‌তে পারেন। সংসারের কথায় তিনি এখন না থাকলেও আপনার কথা নিশ্চয় শুন্‌বেন।"

"এক বছর আগে একথা তুলে আমি যা তাঁর উত্তর পেয়েছি বাবা—সেই জন্য আর একথা তুলতে সাহস করি না। করুর বুঝি বিয়েই কপালে নেই, নৈলে এমন ঘট্‌ছে কেন!"

"কেন জেঠিমা, কি বলেন দাদা মশায়? তাঁরও কি ইচ্ছা মীরা আর করুকে অবিবাহিতা রাখা?"

অরুন্ধতী সেই শিশুতুল্য সরল বিংশবর্ষীয় যুবার অম্লানোজ্জ্বল মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া বলিলেন "না অরু, তাঁর ইচ্ছা সনতের সঙ্গে করুণার বিয়ে দেন্, আর মীরার—"

"সনতের সঙ্গে করুর?" অত্যুগ্র বিস্ময়ে অরুণ যেন চমকাইয়া উঠিল। "সেকি জেঠাই মা এও কি কখনো সম্ভব! করুর মত মেয়ের সঙ্গে সনতের বিয়ে? এও কি হতে পারে?"

বিষাদপূর্ণ কণ্ঠে অরুন্ধতী বলিলেন "অসম্ভবই বা কিসের অরু! লোকে তো এইই সম্ভব বলে মনে করে।"

"লোকের কথা ছেড়ে দেন জেঠিমা! আমাদের কথা তারাও ভুলে যেতে পারে আপনারাও পারেন কিন্তু আমরাও কি ভুল্‌তে পারি? আমরা কি জানি না কোথায় আমাদের স্থান! আপনি বলুন জেঠিমা, এই গ্রামেই ঐ যে নকড়ি চক্রবর্ত্তীর ছেলে—"

"থাম অরুণ, আমায় তোমরা ওকষ্ট দিও না আর ওকথাগুলো বলে। আমি যে জানি এ অসম্ভব, সনৎ বিয়ের নামে আগুন হয়ে ওঠে! হয়ত সহজে বিয়েই করবে না আর যদি কখনো করে সেও——" অরুন্ধতী নীরব হইলেন।

"এইই তো তার পক্ষে সঙ্গত জেঠিমা! তার যে আদর্শ বড্ড উঁচু, সে তো সাধারণ ছেলের মত হবে না। কিন্তু আমাদের জন্য আপনাদের সংসারে সামান্য মনান্তর বা মনোমালিন্যও

যেন না ঘটে দেখ্‌বেন! তাহ'লে আমাদের আত্মহত্যা করাই উচিত! আপনি বলুন আমি করুণাকে শীগ্‌গির যে পাত্র পাই তারই সঙ্গে—"

"অরুণ অরুণ বাবা, আমাদের জন্য তোমরাও যেন সেই আত্মহত্যাই করো না, অপাত্রে করুণাকে দিও না। তার চেয়ে তাকে আমার কোলে এমনি অবিবাহিতাই রেখে দাও, সেও ভাল। তুমিই তো তার অভিভাবক, তুমি যদি তাকে কুমারী রাখ্‌তে চাও তাই সে থাকুক, তবু অপাত্রে দিও না।"

অরুণ নত হইয়া তাহার উদারহৃদয়া পালয়িত্রী মাতার পদধূলি মস্তকে তুলিয়া লইল, তারপর গাঢ়স্বরে বলিল "মা তোমার এই স্নেহ যেন না ভুলি। তুচ্ছ আমার আর করুণার জীবন, তার জন্য আপনাদের কোন অশান্তি পেতে দিতে পারব না। করুণার জন্য পাত্র খুঁজ্‌তেই হবে।"

অরন্ধতী ব্যগ্র হইয়া বলিলেন "তোমায় ব্যস্ত হতে হবে না, আমিই আজ বাবাকে একবার বল্‌ব, তারপর সনৎকে বল্‌ব! সনৎ খুব সম্ভব ভাল পাত্রের সন্ধান দিতে পারবে। বাবাকে বল্‌তে লজ্জাও বোধ করছিলে প্রথমে তোমার বল্‌তে হবে না আমিই সনতেরও ছুটীর বেশী দেরী নেই, এতদিন গেল তো এই দুমাসও যাক্ অরুণ!"

"আচ্ছা জেঠিমা—তাই হোক্।"

* * *

শ্বশুরের নিকটে করুণার বিবাহের কথা তুলিতেই তিনি বলিলেন "মা—অরুণ সনৎ বড় হয়েছে সংসারের আর তোমাদের ভার এখন তাদেরই, তুমি তাদের দিয়ে করাও, আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে মা আমায় আর জড়িও না।"

একাদশ পরিচ্ছেদ

গ্রীষ্মাবকাশের আর দেরী নাই, অরুন্ধতী পথ চাহিয়াছিলেন। সেদিন তিনি সনতের এক পত্র পাইলেন। সে লিখিয়াছে "মা বাড়ী যেতে আর ইচ্ছা করে না, আবার তোমার কাছে দাদুর কাছে যাবার জন্যও মাঝে মাঝে প্রাণ কেমন করে! আমাদের সমিতিতে এবার কাজ, বাড়ী যাওয়া এখন আমার উচিত নয়—কিন্তু বোন্‌টি আর কাকিমার অনুরোধে যেতে মীরার আবদারেই কাকিমা এবারে বাড়ী যেতে রাজী হয়েছেন। মীরা আমাদের বড্ড অভিমান আর দুঃখ করছে মা, কেন আমরা বাবার কথা তাদের ভাল ক'রে তাহ'লে সে একবার তার জেঠামণিকে শেষ দেখা দেখতে পেতো। কাকিমাও আমরা তখন যেন কেমন হয়ে গিয়েছিলাম—কিছুই আমাদের মনে ছিল না—না মা!

আমাদের সঙ্গে যাবে, সে পাড়াগাঁ দেখ্‌তে সাধ করছে। তারও মা নেই, বড় মামার মেয়ে সে,—জানত? দাদুকে বল্‌বেন, মীরা তাঁর কাছে যাবে শীগ্‌গিরই। বাবার জন্য মীরা বড্ড কাঁদে মা।"

অরুন্ধতী নিঃশব্দে অশ্রু মুছিলেন। এতদিনে তার ছোট বৌ ঘরে ফির্‌তে রাজী হ'ল! পত্রখানি লইয়া গিয়া তিনি শ্বশুরের নিকটে পৌঁছাইয়া দিলেন।

"কার চিঠি?—সনতের? কবে বাড়ী আস্‌ছে সে?" বলিতে বলিতে পত্রখানা লইয়া তিনি মনে মনে পাঠ করিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার মুখ একেবারে মৃতের মত বিবর্ণ হইয়া উঠিল। কম্পিতহস্তে পত্রখানা একপাশে ঠেলিয়া দিয়া তিনি গভীর যন্ত্রণাপূর্ণস্বরে একবার "আঃ" বলিয়া নিজের ললাট টিপিয়া ধরিলেন। এক সঙ্গে তাঁহার সুনন্দ ও আনন্দ যেন সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। অর্ত্তকণ্ঠে তিনি বলিলেন "আর কেন, এখন আর কেন! বারণ করে দাও, সনৎকে লিখে দাও,—কেউ যেন আর না আসে।" অরুন্ধতী নিঃশব্দে রহিলেন।

কিছুক্ষণ পরে আবার মৃত্যুঞ্জয় গভীরস্বরে বলিলেন—"কি দরকার আর তাদের আমার? কি দেখ্‌তে চায় তারা? আমার আর তোমার এই অবস্থা?" সহসা তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "চন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর মেয়ে আর নাত্‌নির কি এতদিনে মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে—তাই আজ বেড়াতে আস্‌তে সাধ হয়েছে? সনৎকে লিখে দাও—আস্‌তে হবে না তাদের! তার যদি লজ্জা হয় সে নিজেও যেন এখন বাড়ী না আসে, তাদের সমিতির কাজে সে এখন থাক্! তুমি না পার আমিই লিখ্‌ছি।"

ক্ষিপ্র হস্তে মৃত্যুঞ্জয় একখানা কাগজ টানিয়া লইতেই অরুন্ধতী তাঁহার পায়ের নিকটে বসিয়া পড়িয়া রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিলেন, "বাবা!"

"না মা বারণ ক'রোনা আমায়; তাদের এ আসায় আমাদের কোন সান্ত্বনা নেই আর। আনন্দের সঙ্গে এবার আমার সবই গিয়েছে, তাদের দেখ্‌লে আমার যন্ত্রণা বাড়বে বৈ কম্‌বে না। সনৎ তাদের কথাটা কাটিয়ে দিয়ে দুদিন দেরী করে যেন আসে,—এই রকম লিখ্‌ব তাকে।"

অরন্ধতী নিঃশব্দে এইবার দুই হাতে তাঁহার পা দুইটিই স্পর্শ করিলেন। বড় বড় কয়েকটা ফোঁটা শ্বশুরের পায়ের উপরে পড়িয়া গেল। শ্বশুর কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিয়া শেষে গভীর নিঃশ্বাস মোচনের সঙ্গে বলিলেন, "আচ্ছা মা, তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক্।" তিনি তখন হাতের কাগজ কলম রাখিয়া দিয়া স্থির হইয়া বসিলেন।

অরন্ধতী কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "মীরাকে ছোটবৌকে বড্ড ভাল বাসতেন, তাদেরও খুব আঘাত লেগেছে বাবা।"

যন্ত্রণাবিদ্ধ বৃদ্ধ সিংহের মত গর্জ্জন করিয়া উঠিয়া মৃত্যুঞ্জয় বলিলেন, "তাদের আঘাত লেগেছে! তুমিও কি মা সনতের মত শিশু হ'লে? সে পাষাণদের ভেতরে কি প্রাণ আছে যে আঘাত লাগ্‌বে? আমার আনন্দ যে তাদের কোন অভাব জান্‌তে দেয়নি। আজ সে নেই,

তাই জগতের 'হাল্-চাল্' তাদের মাথায় এসেছে। বাপ ভাইয়ের আদর এবার হয়ত ফুরিয়েছে। বিয়ের উপযুক্ত মেয়ে, আজ তো আনন্দ নেই, তাই চন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর মেয়ের আজ শ্বশুর ঘর মনে পড়েছে। এ আসা মা তোমার জন্যও নয়, আমার জন্যও নয়—নিজেদের স্বার্থের জন্যই! ভাব্‌ছে এইবার তো আর আশা নেই, বুড়োকে এইবার একটু খুসী করার চেষ্টা দেখা যাক্, আজ সাত বছর পরে আস্‌ছেন তাঁরা।"

অরন্ধতী মাথা হেঁট করিয়া শ্বশুরের এই তীব্র গঞ্জনাভরা তিরস্কার নিজের মাথায়ই তুলিয়া লইতেছিলেন। শ্বশুর তাঁহার অন্তরের বহুকালসঞ্চিত বেদনা আজ অগ্নির আকারে উদ্গীরণ করিয়া হাঁপাইতেছেন দেখিয়া ব্যঞ্জনী হস্তে তাঁহাকে বাতাস করিতে করিতে তিনি ভয়ার্ত্ত বলিলেন, "আপনি যদি এত কষ্ট বোধ করেন, কাজ নেই তবে তাদের এসে,—বারণই করে দিই, সনৎকে, এবার তার বাড়ী এসেই কাজ নেই! আপনি—"

"বারণ করবে? না না, তাহলে যে তাদের আমাদের এ অবস্থাটা চোখে দেখবার আনন্দ লাভ হবে না। আসুক—আসুক—এসে দেখে যাক্! দুদিন আমোদ করে বেড়িয়ে যাক্। কিন্তু আমার সম্মুখে যেন তারা না আসে,—সাবধান করে দিও, বুঝেছ?"

বধূ নিঃশব্দে শ্বশুরকে বাতাস করিয়া প্রকৃতিস্থ করিতে চেষ্টা পাইতে লাগিলেন ও আজিকার এই আঘাতের জন্য নিজকেই দায়ী মনে করিলেন। সত্যই তাহাদের আসিতে করিয়া পাঠাইবেন কিনা তাহাও বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। যদি সরস্বতীকে তিনি তিরস্কার করেন! মীরাকে যদি অনাদর করেন! এতকাল পরে ঘরে আসিয়া তাঁহার হইতে এ আঘাত পাইলে সে যে তাহাদের বড়ই মর্ম্মচ্ছেদক হইবে। আবার মনে হইল সত্যই কি শ্বশুর এতখানি নির্দ্দয় আচরণ করিবেন? এত কালের সঞ্চিত অগ্নি তাঁহার যে তাহার প্রথম উৎক্ষেপটী সারিয়া লইল,—এ হয়ত ভালই হইল। আর হয়ত তাহাদের উপর কোন স্ফুলিঙ্গ বর্ষিত হইবে না। তাহাদের দেখিলে—মীরাকে নিকটে পাইলে—তিনি হয়ত এই শান্তিও পাইতে পারিবেন। এ আক্ষেপ তাঁহার সাময়িক মাত্র। ইহা স্থায়ী হইবে না।

তিনি ভাবনায় হাবুডুবু খাইতেছেন, গৃহকর্ত্তা আবার নিজ অভ্যাসমত শান্ত সমাহিত বেদান্তের মধ্যে ডুব দিয়াছেন তথাপি তাঁহাদের শোকমলিন নিরানন্দ গৃহে জীবনের একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। অরুণ ও করুণা সে সংসারের প্রত্যেক কার্য্যেই একটা নূতন অনুভব করিতে লাগিলেন। গুছাইয়া সাজাইয়া নুতনভাবে সুসংস্কৃত করিয়া বাড়ীর ঘরগুলি তাহারা যেন উজ্জ্বল করিয়া তুলিল। কোন ঘরে কাকিমা থাকিবেন—মীরা আর মীরার কোথায় থাকিবে—কোন ঘরে বসিবে—কোন ঘরে কি করিবে—করুণা ইহার নিত্য নূতন অরুণকে হায়রাণ করিয়া ফেলিল। এতদিন সনৎ যে যে সময় বাটী আসিত সেই সেই অরুণ এবং করুণার উৎসবের দিন ছিল, আজ মীরার আগমন সংবাদ সে উৎসবকেও

উঠিয়াছিল। অরুন্ধতীর চিন্তা ও বিষাদের মধ্যেও তাহাদের এই উত্তেজনার স্পর্শ মাঝে মাঝে তাঁহারও গায়ে লাগিতে লাগিল। মাঝে মাঝে তিনিও তাহাদের কার্য্যের অনুমোদন বা অনভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া মতামতের তর্কে খানিকক্ষণ অন্যমনা হইতেছিলেন। গ্রামস্থ লোকেরাও বলাবলি করিতে লাগিল, "এইবার ভট্টাচার্য্য মহাশয় আইবড় নাতি-নাতনিগুলার বিবাহ দিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন।" কেহবা বলিতেছিল "সনতের যে কালাশৌচ—এখনো ছয় মাস না কাটিলে তাহার পিতার 'সপিণ্ডকরণ' না হইলে তো বিবাহ হইবে না।" কোন স্মৃতি-শাস্ত্রাভিমানী ব্যবস্থা দিতেছিলেন, "আরে তোমরা শাস্ত্রের কিছুইত জান না, কেবল গোল কর। অপকর্ষ করিয়া আনন্দের সপিণ্ডন কার্য্যান্তে সনতের বিবাহ এবার দিতেই হইবে। কন্যার যে কন্যাকালের আর কিছুই অবশিষ্ট নাই।"

"এই ছাখনা ভায়া, আমরা যদি অত বড় বড় মেয়ে ঘরে রাখিতাম কোন দিন আমাদের জাতি যাইত। উনি কিনা সমাজপতি,—তাই যা করেন কারও উচ্চবাক্য নাই।" মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের স্বশ্রেণী নকড়ি চক্রবর্ত্তী এই বলিয়া একটা নিষ্ফল ফোঁস্ করিয়া উঠিলেন।

সেই শাস্ত্রজ্ঞ অমনি বলিয়া উঠিলেন, "আরে সেও তো শাস্ত্রেই আছে।"—

"ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরানাঞ্চ সাহসং।
তেজিয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্ব ভুজং যথা।

উনি যা করবেন তা'কি তুমি আমি করবার সাহস রাখি?"

বাধা দিয়া জনৈক সর্ব্ব-সমাজ-তত্ত্বজ্ঞ বলিলেন—"আর এখন সেদিন নেই ভাই, যে দুগ্ধপোষ্য ছেলে মেয়েগুলো ধরে যা'খুসি তাই করবে, এখন—"

"আরে রেখে দাও বাড়ুয্যে, তোমাদের রাঢ়ী বারেন্দ্রের কথা, আমাদের বৈদিকের ঘরে—"

"ভায়া, সব লাল হো যায়েগা। সব সমাজেরই এখন এক দশা। তোমাদের বৈদিকের আগে গণ পণ টাকা নেওয়া মেয়ের বিয়ের বাপের মুণ্ডুপাৎ ছিলনা, বল্লালের বল্লমে তোমরা বাঁধা যাওনি, তাই এতদিন তোমাদের ঘরের মেয়ের বিয়ের বিভীষিকা ছিলনা, কিন্তু এখন ডুবে ডুবে জল সবাই খেতে শিখেছেন, পণ বলে না নিয়ে বিয়ের খরচ বাঁ হাতে লুকিয়ে নিচ্চেন, মেয়ের গয়না বরের আব্‌দার আত্মীয়ের মুখে জানাচ্চেন, ফলে রাঢ়ি বারেন্দ্র বৈদিকের ঘর একই হয়ে দাঁড়াচ্চে।"

নকড়ি মহা চটিয়া উঠিয়া বলিল—"তাই যদি হয়, মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য কিসের অভাবে এতদিন নাতনির আর ঐ হরিশের মেয়েটার বিয়ে দেয় নি? একি সমাজকে অবহেলা দেখানো মাত্রই উদ্দেশ্য নয়?"

সেই সমাজতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিটি গম্ভীরমুখে তখন "শিক্ষার ধুয়া" বলিয়া সমাজে এখন একটা

যে অভিনব পদার্থ ঢুকিয়াছে—যাহার দৌরাত্ম্যে এখন ছেলে মেয়ের অভিভাবকেরা পর্য্যন্ত শিং ভাঙ্গিয়া বাছুরের দলে ঢুকিয়া' সমাজে মহা অশান্তি আনয়ন করিতেছে তাহার জ্বলন্তভাবে বর্ণনা আরম্ভ করিয়া দিলেন। আর গ্রামের মনীষিবৃন্দ পরমোৎসাহে তাহার অনুমোদন করিতে করিতে তখন আপাততঃ ভট্টাচার্য্য পরিবারকে বিস্মৃত হইলেন।

শীঘ্রই সেই অপেক্ষিত দিনটি উপস্থিত হইল। করুণার আনন্দোচ্ছলভাবে অরন্ধতীও মাঝে মাঝে অন্য সব কথা যেন ভুলিয়া যাইতেছিলেন, কেবল মনে হইতেছিল আজ মীরা আবার ফিরিয়া আসিতেছে! এ ঘরের সেই আনন্দের লতা মীরা! কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় যে সেদিন একেবারে নিজ কক্ষের বাহিরে আসিলেন না, দেখিয়া মাঝে মাঝে অরুন্ধতীর মুখ শুখাইয়া যাইতেছিল।

বেলা পড়িয়া আসিতেছে, সন্ধ্যায় তাহারা আসিয়া পৌঁছিবে! করুণা ঠাকুরঘরের সন্ধ্যারতি সমস্ত উদ্যোগ বেলা থাকিতেই গুছাইয়া রাখিয়া অরুন্ধতীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। "জেঠিমা এখনতো আজ বেলা যাচ্চেনা, আজ্‌কে দিনটা এত বড় হ'ল কেন?"

জেঠিমা একটু হাসিয়া তাহাকে নিকটে টানিয়া লইয়াই বলিলেন, "ও কি হাত এত ঠাণ্ডা কেরু তোর—জ্বর আস্‌বেনা ত? না কপাল তো গরম নয়—বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করু অসুখ কর্‌ছে নাকি?"

"না জেঠিমা—ও এমনি! হ্যাঁ জেঠিমা, আমি মীরার ইলা দিদিকে কি ব'লে ডাক তিনি কি আমার চেয়ে বড়?"

"জানিনা বাছা,—আগে আসুকই—তার পরে কি বলে ডাক্‌বি দেখা যাবে।"

মুখ নীচু করিয়া করুণা বলিল "সনৎদাদা যে বলে আমারই বয়সি, তবে—"

"তোর সনৎদাদাকেই জিজ্ঞাসা করিস্ কি ব'লে ডাক্‌বি, এখন চুপ্ কর, ঝ বল্‌ছে শুনি।"

"জেঠিমা—ঘরের দুধে আজ কি চল্‌বে? বেশী দুধের দরকার হবে নাকি?"

"আজ থাক্ বাপু—যা হবে তাতেই চল্‌বে, কাল তখন দেখা যাবে। পথে হ'তে পিলে ঘরে এসে না পৌঁছুলে অত ব্যবস্থা কর্‌তে নেই। ভালয় ভালয় আসুক আগে তারা।"

"আর ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই এসে পড়্‌বে! হারু ভজা আগিয়ে আন্‌তে গেছে যে।"

সন্ধ্যায় ঠাকুরঘরে প্রদীপ দিতে অতি অনিচ্ছায়ও করুণাকে যাইতে হইল। অরুন্ধতী শ্বশুরের নিকটে গিয়া কি বলিতেছিলেন। ঠাকুরঘরের ধূপ দীপ জ্বালিয়া দিয়া তুলসীতলায় প্রদীপ হাতে লইয়া করুণা যেই ঠাকুরঘরের সিঁড়িতে পা দিয়াছে আর অমনি দম্‌কা হাওয়ার মত করুণা বলে মনে হ'লনা? এত হতশ্রদ্ধা?" সনতের এই সপরিহাস সম্ভাষণে করুণা ঈষৎ হাসিয়া সুন্দর মুখ তাহাদের উঠানের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল! কি সুন্দর তাহাদের গতিভঙ্গী, একবার মীরার দিকে চাহিল—তার পরে সনতের পায়ের গোড়ায় একবার মাথাটিকে ঠেকাইয়া সুন্দর তাহাদের নূতন ধরণের বেশভূষা, করুণার হাতের প্রদীপের আলোকে সেই মুখরঞ্জনা আর একটি যে নবাগতা তরুণী সন্ধ্যাতারার মত অঙ্গনের এক পাশে দাঁড়াইয়াছিল তাহার দিকে অগ্রসর তাহদের বসনভূষণের ছটা এক সঙ্গেই যেন জ্বল্ জ্বল্ করিয়া উঠিল! একটি দীর্ঘাঙ্গী তরুণ হইতেই সনৎ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

দিকে কয়েকমুহূর্ত্ত চাহিয়াই বলিয়া উঠিল, "কে করুণা নাকি? হ্যাঁ নিশ্চয়ই সেই, ঠিক্ চিন্‌তে পেরেছি।"

পিছন হইতে সনৎ বলিয়া উঠিল, "করুণা কি রকম? বড় না তোর চেয়ে? খুব মনে আছেতো সব?"

"আমার চেয়ে বড়? যখন ছিল তখন ছিল, এখন ওকে কেউ বড় বলুক দেখি আমার চেয়ে। জেঠিমা কৈ দাদা—দাদু কই? এই সেই আমগাছটা না? এইখানে আমরা খেলা কর্‌তাম! আমার সব মনে ছিল—কিচ্ছুতো অচেনা লাগ্‌ছেনা! ওকি অমন ক'রে কাঠ হয়ে দাঁড়ায় আছিস্ কেন করুদি? কাকে দেখে অবাক হ'য়ে গেছিস্—ইলা দি'কে না আমাকে? নেমে আয় না" বলিতে বলিতে ক্ষিপ্রপদে মীরা করুণার নিকটস্থ হইবার জন্য সিঁড়ির উপর উঠিয়া পড়িল।

সঙ্গে সঙ্গে সনৎ লাফাইয়া উঠিয়া তাহাকে বাধা দিল, "এই মীরা—নাম্ নাম্—ওকে ছুসনে।"

অবাক্ বিস্মিতভাবে চাহিয়া গতি থামাইয়া মীরা বলিল "কেন গো—কি হল?"

পশ্চাৎ হইতে চাপাসুরে তাহার মাতা উত্তর দিল, "এ বাড়ীর এই দস্তুর বাছা, দেখ্‌বি ক্রমে আরও কত! করুণা ভাল আছিস্? তোর ভাইরা ভাল আছে?" মীরা অপ্রস্তুতভাবে ইলার পানে চাহিল।

করুণা এইবার সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়া প্রদীপটা লইয়া উঠানে নামিয়া পড়িল তার পরে সেটা একবার অঙ্গনে প্রবেশের দরজার সম্মুখে লইয়া গিয়া বাহিরের দিকে প্রদীপটা উঁচু করিয়া ধরিয়া শেষে আবার ফিরিয়া তুলসীতলায়ই রাখিয়া দিল। সেখানে একটা প্রণাম করিয়া কম্পিত-পদে সরস্বতীর নিকটে আসিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় লইল। মৃদুকণ্ঠে বলিল "দাদা ভালই আছেন, কাকিমা।"

সরস্বতী নিজের ভ্রম সংশোধন করিয়া লইলেন, "ঠিক্ ঠিক্ তোর ছোট ভাইটাও যে নেই। কু আর তোর বাবার কথাই মনে ছিল—ছোটটার কথা ভুলে গিয়েছিলাম! এমনও কপাল! ভাল আছিস্ ত?"

মৃদুস্বরে করুণা বলিল "হ্যাঁ"।

"বাঃ তুই বেশ্‌তো করু, তোর দিদিদেরও প্রণাম কর্‌লিনে? আমায় না হয় না কর্‌লি—আমিতো নতুন নই, আর এই যে তোর বড় বড় দিদিরা সব এদেরও দেখে তোর প্রণামের যুগ্যি

তরণী ত্রস্তভাবে একটু সরিয়া গিয়া মধুরকণ্ঠে করুণাকে বলিল, "আমায় প্রণাম করো ভাই, আমি তোমারই বয়সী।"

তার পরে করুণার পানে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "তোমায় ছোঁব কি এখন ভাই?"

এমন মধুর কণ্ঠ এমন রূপ করুণা আর কখনো দেখে নাই! তাই সে অবাক হইয়া কেব চাহিয়াছিল। ইলার এই প্রশ্নে সে অগ্রসর হইয়া তাহার নিকটে যাইতেই ইলাও সাগ্রহে আসি তাহার হাত ধরিল।

"মা কই—করুণা? তিনি কি এখনো টের পান্‌নি যে আমরা এসেছি?" সরস্বতী স্নে খেদপূর্ণ মৃদুস্বরে সনৎকে বলিলেন, "বেরুতে পাচ্চেন না বোধ হয়, চল্ আমরাই তাঁর ঘ যাই সনৎ।"

শুভ্র রুক্ষ বিধবার বেশে অরুন্ধতী আসিয়া যখন সরস্বতীর নিকটে দাঁড়াইলেন, তখন সন্ন নিঃশব্দে মুখ ঢাকিয়া তাঁহার পায়ের নিকটে বসিয়া পড়িল। মীরারও সাত বছরের স্মৃতির য যে লালপাড় কাপড়পরা সিন্দুর শঙ্খধারিণী জেঠিমা ছিল—আজ তাঁহার সঙ্গে ইঁহার কোন ম না মেলায় সেও স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অরুন্ধতী সরস্বতীর হাত ধরিয়া তুলিয়া কেবল বলিলেন, "ঘরে চল"—তারপরে নিকটে দণ্ডায়মানা অবাঙ্‌মুখী মীরাকে দুই বাহুর টানিয়া লইলেন।

সঙ্গে সঙ্গে জ্যেষ্ঠতাতকে মনে পড়িয়া মীরার দুই চক্ষে অশ্রু ভরিয়া উঠিল। বাড়ী আনন্দে তাহার এতক্ষণ সে কথাটা মনে ছিল না। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে সকলের কাটিয়া অরুন্ধতী আর একটি তরুণীকে অতি সঙ্কুচিতভাবে নিঃশব্দে তাঁহার পায়ের ধূলা লইতে তাহার হাত ধরিয়া সরস্বতীর পানে চাহিয়া বলিলেন, "এইটি ইলা না ছোটবৌ?" মৃ আশীর্ব্বাদের ভাবে তাহার মস্তকের ও মুখের পার্শ্বে একটু হাত বুলাইয়া দিলেন। ইলা তাঁহার পায়ের গোড়ায় মাথা নামাইয়া করুণার নিকটে সরিয়া দাঁড়াইল।

মীরা এতক্ষণে ভগ্নকণ্ঠে বলিল "জেঠিমা দাদু কই?"

"চল মা তাঁর কাছে যাই!"

তারপরে একটু ইতস্ততঃ করিয়া অরুন্ধতী মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "তিনি বসেছেন মীরা, তোমার এই জামা জুতো রাস্তার কাপড় ছেড়ে নাও আগে!"

মীরা অবোধের মত বলিয়া উঠিল, "সে যে বড্ড দেরী হবে, এখন এমনি যাইনা কি দোষ?"

"না মা তিনি গুরু লোক, তাঁর কাছে এই রকম করেই যেতে হয়।"

মীরা অপ্রস্তুত ও একটু ক্ষুণ্ণভাবে জেঠিমার আদেশ পালন করিবার জন্য জুতা খুলিতে ইলার পায়ের দিকে চাহিয়া দেখিল সে ইহার আগেই কখন্ সে কার্য্য সমাধা করিয়া রাখিয়াছে।

(ক্রমশঃ

শ্রীনিরুপমা

দুনিয়ার খবর

তিব্বতে মেক্-গোবের্ণ—এ দেশে মুসলমানদের অধিকার পাকা হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের সঙ্গে, বিশেষভাবে বঙ্গের সঙ্গে, তিব্বতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তিব্বতের সঙ্গে পূর্ণবিচ্ছেদ ঘটিয়াছে ইংরেজের আমলে। ইংরেজরাজ্যের লোক তিব্বতে ঢুকিলেই দেশের অনিষ্ট হইবে, ইহাই তিব্বতীয়ের ধারণা। বৌদ্ধধর্ম্মের পোষাক পরিয়াও সম্প্রতি যখন ইংরেজেরা তিব্বতে যাইতে পারিলেন না, তখন মেক্-গোবের্ণ তিব্বতের লোক সাজিয়া ছদ্মবেশে সিকিমের পথে তিব্বতে গিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণনায় জানা যায় যে, সিকিমের আদিম অধিবাসী লেপ্‌চারা দুর্ব্বল, ভীরু ও অকর্ম্মণ্য হইয়া ক্ষয় পাইতেছে। আর এখন সিকিমের লোক বলিলে তিব্বতের লোককেই বুঝায়। সিকিমের তিব্বতীয়েরাও নাকি বিলাসের ফলে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছে, আর নেপালীরা সিকিম ছাইয়া ফেলিয়াছে। যাহাতে সিকিম একেবারে নেপালীদের দেশ না হইতে পারে, তাহার জন্য ইংরেজ সরকার বিধান করিয়াছেন যে, নেপালীরা সিকিম ভূমির অধিকারী হইতে পারিবে না। সেকালে হয়ত লেপ্‌চাদের নাম ছিল কিন্নর। খাঁটি তিব্বতীয়েরা ছিল যক্ষ। আর হিমালয়ের নানা শ্রেণীর মিশ্র শিকারীর জাতির লোকেরা ছিল কিরাত। পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্কশূন্য হইয়া ইহারা সকলেই উৎসন্ন যাইতেছে—পাহাড়ী হইয়াও কর্ম্মঠ থাকিতে পারিতেছে না। মেক্-গোবের্ণ বলেন যে ভারতের অতি নীচ শ্রেণীর লোকেরাও পাহাড়ীয়াদের অপেক্ষা বুদ্ধিমান্।

স্পেনের কথা—য়ুরোপের মধ্যে এখন স্পেন ও পোর্ত্তুগাল সভ্যতার নীচের ধাপে পড়িয়াছে। কাহাকেও জ্ঞানহীন বলিয়া তিরস্কার করিতে হইলে ইংরেজীতে তাহাকে intellectual Portuguese বলে। য়ুরোপে মহাযুদ্ধের সময়ে উহাদের নাম উঠে নাই বলিলেই হয়। যাহারা গভীর শান্তিতে আছে, তাহাদের শান্তির অর্থ প্রায় মৃত্যু। মাঝে মাঝে এ দেশে একটু আধটু বিদ্রোহ দেখা দিয়াছে। কিন্তু তাহাতে জাতীয় জাগরণ সূচিত হয় নাই। এবারে সৈন্যদলের জোরে ডি-রিভেরা রাজমন্ত্রী হইলেন ও পুরাতন শাসনসমিতি বরখাস্ত হইল। ইহাতে প্রজাসাধারণের একটা শৃঙ্খলাবদ্ধ উদ্যোগ দেখা যায় না। এরূপ পরিবর্ত্তন বিনা রক্তপাতে ঘটিলেও ইহা অরাজকতার অথবা দুর্ব্বল শাসনের নামান্তর মাত্র। ইতালীতে ফাসিষ্টিদের অভ্যুদয়ও প্রায় এই শ্রেণীর। স্পেন ও পোর্ত্তুগাল মরিতেছে কাথলিক ধর্ম্মের গোঁড়া মতের চাপে।

ইতালীয়দের উৎপাত—দুর্ব্বল গ্রীককে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিয়াও ইতালীর দুরাকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হয় নাই। ফিউমে ঠিক্ দখল না করিলেও ইতালীয়েরা সেখানে যেরূপ কর্ত্তৃত্ব চালাইবার উদ্যোগ করিতেছে, তাহাতে য়ুগো-স্লাবিয়ার লোকেরা যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। য়ুগো-স্লাবিয়ার গবর্ণমেণ্ট আইন মানাইয়া দাবাইয়া রাখিতে পারিবেন না। যুদ্ধ হয়ত বাধিবে না, কিন্তু ইতালীকে ন্যায় এবং অন্যায় তিরোহিত করিবার পক্ষে কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। য়ুগো-স্লাবিয়ার গবর্ণমেণ্টও নিষ্পাপ নহেন। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে বুল্‌গেরিয়াকে পদানত করার। সকলেই হিংসা-বিদ্বেষ লইয়া চলিতেছে—শান্তি নাই।

ছিটে ফোঁটা

পরের ভাবনা

পরের ভাবনা ভেবেই গেলাম! পরেরা কি চতুর
শুষে নিয়ে আমার টাকা কল্লে আমায় ফতুর।
মাসটা গেল পরের চিন্তায়—আজকে হচ্ছে পয়লা;
পালাই বাবা, আস্‌ছে ধেয়ে ময়রা, মুদি, গয়লা।

পূজার আয়োজন

স্তোত্র প'ড়ে চেঁচিয়ে কেঁদে, কাহিল করে ফেল্‌ব তোমায় পূজায়;
আস্‌বে তুমি মন্ত্রে ভেসে, স্রোতের ধারে মাছে যেমন উজায়।
দাম্ভভক্তির নৈবিদ্দির উপহারে ধরব পুণ্যবলে,—
অন্ধকারে ঘুমিয়ে মানুষ, যেমন ধারা ইঁদুর ধরে কলে।
সারিয়ে নেব যত ব্যামো, টাকাকড়ি নেব অনেক দানে;
তাহার পরে চাইব মুক্তি, যদিও না জানি তাহার মানে।

বিয়ের উদ্যোগ

(অঙ্কের শাটে শব্দ পড়ার শিক্ষা।)

পাত্র না হয় হলই লা-১, গুণ নাই কি কনের-ও ?
এত টাকা ৫০ ? সীমা নাই কি ১৫ ?
২-এ নেবে আমার সিন্দুক ? দেবে নাক রেহাই সে ?
আমায় কিনা ৮-কে ফাঁদে হবে আমার বেয়াই সে ?
আস্‌-৩ গুটিয়ে কথা কইলে এম্‌নি জোরে সে,
মনে মনে কল্লাম বি-৪ মারবে আমায় ধরে সে।
৮০ বলে পালিয়ে এলাম, মনে হল ভয় গো;
কি জানি কি করবে ১০-আ, এ সম্বন্ধ ৯-গো।
৫১-বর্ত্তী মোর ভাই কাকা যাঁহারা—
অন্যের ৭-এ বন্দোবস্ত কত্তে বলেন তাঁহারা।
গায়ের ৫-ড়া সেরে গেলে লাগ্‌ব আবার চেষ্টাতে;
এ-১২ কি ঘটক বেটা গোল বাধাবে শেষ্টাতে ?

বর্ণে বর্ণে সুধা ঝরে

(কীর্ত্তনের সুরে)

[প্রতি বর্ণের দোকান থেকে কেবল একটি একটি জিনিস তুলে সাজান গেল। কোন কোন বর্ণের দোকানে কিছুই মেলে নাই।]

কচুরি, খাজা ও গজা ও ঘিওর চম্‌চম্‌ ছানাবড়া গো।
আখর— (ও যার বর্ণে বর্ণে সুধা ঝরে।)
"জ" এর জিলিপি "ঝ" এ ঝুরিভাজা,
"ড"-এ ডালমুট আছে তাজা তাজা
তিলুয়া যা হোক্‌, দরবেশ বেশ দরে অতিশয় চড়া গো।
নিম্‌কির সাথে পান্‌তুয়া খাও,
ফুলুরির বড়া পাবে যত চাও;
বঁদের বাহার বলিব কি আর, মন হরে মনোহরা গো।
যে রসগোল্লা রসায় ওষ্ঠ,
লেডিকেনি লাল ললিত লোষ্ট্র,
বালি-হীন বটে—নাম বালুসাই, সিঙ্গাড়া আলুতে গড়া গো।
ষট্‌পদ সম সবে মোরা ধাই,
সন্দেশ, আরও সন্দেশ চাই,
হালুয়া ও ক্ষীর মোহনে কবির ফুরাল রসাল ছড়া গো।
(টীকা)
অ-কারে অমৃতি—জিলিপি বিশেষ,
"আবার খাব" সে অভেদে সন্দেশ,
স্বরের বর্গে কোন বর্ণের; দোকানে চড়েনি কড়া গো।

শোভা

হাকিম শোভে চাপ্‌রাশিতে, পুলিশ শোভে পাগ্‌ড়িতে;
ডাক্তার শোভে ষ্টেথস্‌কোপে, গুরু শোভে শাগ্‌রিতে;
উকীল শোভে নজির দিয়ে সোজা অর্থ ঘুলিয়ে;
পুরুৎ শোভে চণ্ডীপাঠে মুণ্ডটি খুব দুলিয়ে।
পুরুষেরা নানা ঠাটে শোভে বটে অবনী,—
নারী শোভে শিশু কোলে,—স্নেহময়ী জননী।

IMPERIAL LIBRARY CALCUTTA 1938

কার্ত্তিকে

অকৃতজ্ঞতার অপবাদ—কেনিয়া উপনিবেশে ভারতবাসীর কোন সুবিধা ত হইলই না, উল্টা আমরা দেশশুদ্ধ সকলে অকৃতজ্ঞ নাম পাইলাম। ইংলণ্ডের একখানি পত্রিকায় ও আফ্রিকার একখানি পত্রিকায় আমাদিগকে এইজন্য অকৃতজ্ঞ বলা হইয়াছে যে আমাদের জন্য ইংরেজেরা যাহা করিয়াছেন, তেমন কেহ করে না, তবুও আমরা ইংরেজের কাছে কৃতজ্ঞতা না দেখাইয়া তাহাদিগকে নিন্দা করি। যে সকল উপকার পাইয়াও আমরা অকৃতজ্ঞ, তাহার সংক্ষিপ্ত তালিকা এই :—

(১) এদেশ অধিকার করিয়া ইংরেজ সরকার আমাদিগকে মরণ হইতে বাঁচাইয়াছেন;
(২) রেল, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি করিয়া সুবিধা ও সভ্যতা বাড়াইয়াছেন।
(৩) ক্রমাগতই দেশের লোকের রাজনৈতিক অধিকার বাড়াইয়া ধীরে ধীরে সকলকে সভ্যদের সমকক্ষ করিতেছেন।

সব কয়েকটি কথা তর্কচ্ছলে মানিয়া লইয়াই ঐ উক্তির অসারতা দেখাইতেছি।

(১) মনে কর, একটি সধবা যুবতী স্ত্রী ও আর একটি পুরুষ দৈবাৎ জলে ডুবিয়া মরিতেছিল, আর জনবুল তাহাদের উদ্ধার করিলেন। উদ্ধার করিবার পরেই বুল বাহাদুর রমণীটির প্রতি তাঁহার প্রেম জ্ঞাপন করিলেন ও তাহার সঙ্গ চাহিলেন। আর পুরুষটিকে জনবুল তাঁহার দাস হইতে বলিলেন। এ অবস্থায় ঐ স্ত্রী ও পুরুষ কি বলিতে পারে না যে প্রস্তাবিত দুরবস্থার চেয়ে তাহাদের পক্ষে মরণই ভাল ছিল। উপকার পাইলেই যে উপকৃত ব্যক্তি তাহার মনুষ্যত্ব লাভে দাবী ছাড়িবে তাহার ধর্ম্ম ও মাথা বেচিবে, এবং হিতকারীর অন্যায় কার্য্য অন্যায় বলিবে না, ইহা ন্যায় ও ধর্ম্মসঙ্গত নহে। যত বড় হইলেও একটা ভাল কাজ কেহ করিয়াছে বলিয়া সে মন্দ অন্যায় কাজ করিতে অধিকারী নয়।

(২) একচ্ছত্র রাজত্বের জন্য ও রাজত্বের সুপ্রতিষ্ঠার জন্য রেল টেলিগ্রাফের প্রয়োজন হইয়াছিল; সে রেলে ও টেলিগ্রাফে আমাদের সুবিধা বাড়িয়াছে। কিন্তু মুখ্যভাবে আমাদের সুবিধার জন্য উহা স্থাপিত হয় নাই। এ দেশের লোকেরা যে যে স্থানে রেল টেলিগ্রাফ না তাহা পায় না; ইংরেজদের বাণিজ্যের ও শাসনের সুবিধার জন্য যেখানে উহা চাই, সেখানে উহা বসে। এমন কি, দুই চারিজন নিম্ন শ্রেণীর ফিরিঙ্গীদের জন্যও তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে দিবে সুবিধা করা হয়। কিন্তু উচ্চতর শ্রেণীর দেশী আরোহীদের দিকে কেহ তাকায় না। কেবল সুবিধার জন্য যাহা সৃষ্ট হয়, তাহাতে এ দেশের লোকেদের কিছু সুবিধা না হইয়াই যায়। ইহাই কি আসল কথা নয়?

(৩) অস্বীকৃত হইতে পারিবে না যে দেশ শাসনের যথার্থ কর্তৃত্বটুকু নিজের মুঠায় করিয়া রাখিয়া এ দেশে লোককে অল্প কিঞ্চিৎ ক্ষমতা দেওয়ার নামই শাসনে অধিকার ভাদ্রমাসের সম্পাদকীয় মন্তব্যে দেখাইয়াছি যে আংশিক ভাবে কোন কাজের ক্ষমতা কেহ সে কাজ ভাল করিয়া করিতে পারে না। আংশিক ভাবে কোন কাজে করার অর্থ এই যে যাহার হাতে পূর্ণ ক্ষমতা আছে, তাহার ভাঁবেদারিতে ও কাজের অনুসারে কাজ করিতে হয়। ছোট কাজের কর্ত্তা প্রকৃতপক্ষে বড় কাজের কর্ত্তার চাকর; এ কেহ নিজের কাজে উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিতে পারে না, ও মনের মত করিয়া কাজ চালা কৃতিত্ব দেখাইতে পারে না; ছোট কাজের কর্ত্তা যে বড় কাজ করিবার উপযোগী, তাহার প্রমাণ হয় না। কাজেই উপযোগিতা দেখিয়া যে অধিকার বাড়াইবার প্রস্তাব হয়, সে প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত না করার পক্ষে অনেক ছল পাওয়া যায়। এ অবস্থায় ইহা নিশ্চিত যে অধিকার শনৈঃ চলিয়া আসিতেছে, তাহা আমাদের ভাগ্যে কেবল শনৈশ্চর হইয়া দাঁড়াইবে।

লর্ড মর্লের মৃত্যু—ভারতের শাসন-সংস্কারে লর্ড মর্লে প্রথম হাত দিয়াছিলেন এ দেশের অর্দ্ধ শিক্ষিতেরাও ইঁহার নামের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। তিনি ব্যবস্থাপক যে সংস্কারটুকু করিয়াছিলেন, তাহা যৎসামান্য, কিন্তু তাহাতেই গবর্ণর জেনেরল মিণ্টোর বিলাতে ও এদেশে অনেক ইংরেজ উত্যক্ত হইয়াছিলেন। এই সুধী, চিন্তাশীল ব্যক্তি পার্লামেণ্টের ইতিহাসে রক্ষিত না হউক, সাহিত্যের ইতিহাসে স্থায়ী হইবে। ইঁহার বয়স ৮৫ বৎসর হইয়াছিল। যখন ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ইনি পার্লামেণ্টে প্রবেশ করেন

সে সময়কার সাহিত্য-রথী মেথু আর্নল্ড শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন। আর্নল্ডের মত ছিল যে যাঁহারা যথার্থ ক্ষমতাশালী ও চিন্তাশীল, তাঁহাদের পক্ষে পার্লামেণ্ট প্রবেশ অতি অন্যায়। কারণ উহাতে মানুষকে একটা দলের সঙ্গে যুক্ত হইতে হয়, আর দলবিশেষের সঙ্গে যুক্ত হইলেই স্বাধীন নিরপেক্ষ বিচার-শক্তি নষ্ট হয়। চিন্তাশীলেরা সকল দলাদলির বাহিরে থাকিয়া পার্লামেণ্টের সকল শ্রেণীর কর্ম্মীদিগকে সুবুদ্ধি দিয়া চালাইবেন, ইহাই ছিল আর্নল্ডের মত। যথার্থই লর্ড মর্লে পার্লামেণ্ট প্রবেশের পর কোন স্থায়ী সাহিত্যিক কাজ করেন নাই। ইউরোপের মহাসমরে ইংলণ্ড যখন যোগ দিল, লর্ড মর্লে তখন ব্যথিত হইয়া পার্লামেণ্ট ছাড়িলেন। যাহাই হউক, লর্ড মর্লের নাম তাঁহার সাহিত্যিক কীর্ত্তিতে ও ঐতিহাসিক গবেষণায় চিরদিন স্মৃত হইবে।

জার্ম্মাণির সর্ব্বনাশ—ইংরেজ রাজমন্ত্রী বল্ডউইন জার্ম্মাণিকে রক্ষা করিবার সংকল্পে Poincareএর সঙ্গে যখন দেখা করিতে যান, তখন লোকের আশা ছিল যে জার্ম্মাণির মুক্তির একটা উপায় হইবে, কিন্তু কিছুই হইল না মনে হইতেছে। Ruhr(রূড়) দখল করিয়া ফরাসীরা অনেক টাকা পাইয়াছে, কাজেই তাহারা Ruhr(রূড়)এর লোভ ছাড়িতে পারে না। Poincare জিদ্ ধরিয়া বলিয়াছেন যে জার্ম্মাণেরা কোন বাধা না দিয়া ফরাসীদের হাতে Ruhr(রূড়) সমর্পণ করিলে কিছু দিন পরে Ruhr(রূড়) ফিরাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। জার্ম্মাণ চান্সেলর ষ্ট্রেস্‌ম্যান বলিয়াছিলেন যে ফরাসীরা Ruhr(রূড়) দখল করিয়া সে দেশের যত লোককে কারারুদ্ধ করিয়াছেন, তাহাদিগকে যদি খালাস দেওয়া হয়, তবে তিনি ফরাসীদের প্রস্তাবে সম্মত হইবেন। কিন্তু ফরাসীরা অতটুকু অনুগ্রহ দেখাইতেও অপ্রস্তুত। অনন্যগতি হইয়া ষ্ট্রেস্‌ম্যান ফরাসীদের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইবার মত কথা বলিয়াছেন। ইহার ফলে জার্ম্মাণিতে আগুন জ্বলিয়াছে। জার্ম্মাণেরা ক্ষেপিয়া উঠিয়া শাসাইয়াছে যে ষ্ট্রেস্‌ম্যানকে ও তাঁহার দলের লোককে তাহারা হত্যা করিবে এবং সামরিক উদ্যোগ করিয়া জার্ম্মাণিতে নূতন শাসনের ব্যবস্থা করিবে। বুদ্ধিমানেরা সকলেই আঁটিতেছেন যে ইহার ফলে জার্ম্মাণিতে ভীষণ অরাজকতা উপস্থিত হইবে ও জার্ম্মাণ জাতির ধ্বংস হইবে। বড়ই দুঃখের কথা যে কোন প্রকার চেষ্টাতেই ফরাসীদিগকে তাহাদের পৈশাচিক প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত করা গেল না।

আগামী ব্যবস্থাপক সভা—নূতন সংস্কারের ব্যবস্থাপক সভার দ্বিতীয় কিস্তির জন্য নবেম্বর মাসেই সদস্য-নির্ব্বাচন হইবে। দায়িত্ব বুঝিয়া কাজ করিবার সময় আসিয়াছে। কে কি ধর্ম্ম মানেন অথবা জাতিতে কি, এ সকল দিকে একেবারে দৃষ্টি না দিয়া যাহাতে দেশের লোকে সৎসাহসী কাজের লোকদিগকে নির্ব্বাচিত করেন, তাহার জন্য বিশেষ উদ্যোগ হওয়া উচিত। ব্যবস্থাপক সভায় ধর্ম্মমতের বা জাতিতত্ত্বের সমালোচনা হইবে না; সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে দেশের সকলের পক্ষে যাহা হিতকর, তাহা যাঁহার বুঝিবার শক্তি আছে, এবং তাহা বুঝিয়া যাঁহার কাজ করিবার ক্ষমতা আছে, তিনিই সদস্য হইবার উপযোগী। যাঁহারা আপনাদের পদমর্য্যাদা বাড়াইবার জন্য লুব্ধ, অথবা মিনিষ্টারী যোগাড় করিয়া টাকা রোজগারের জন্য লোলুপ, তাঁহাদিগকে কি দেশের লোকের চিনিতে বাকী আছে? বিশ্ব বিদ্যালয় শাসনের জন্যই যে দুইখানি সরকারী বিল হইয়াছিল তাহা যে অহিতকর ও অকর্ম্মণ্য, তাহা ইত সরকারের তরফের লোকেরা বুঝিয়াছেন বলিয়া Englishman পত্রের মন্তব্যে জানা গিয়াছে। যাঁহারা সেই বিল খাড়া করিয়াছিলেন, তাঁহারা যে স্বদেশ হিতৈষী নহেন, তাহা সকল শ্রেণীর জ্ঞানীদের বিচারে স্থির হইয়াছে।

সেকাল-একালের প্রাজুএট্—"আগেকার" বি, এ, এম্, এ, পাশ করা লোকেরা ভাল লেখাপড়া শিখিত, আর একালে শেখে না,—এই হইল বিশ্ব বিদ্যালয়ের নামে একটা সাধারণ অভিযোগ। কথাটা সত্য, না হায় রে—সেকালের মোহ? কোম্পানির

আমলের হিন্দুকলেজে ভদ্র ঘরের অল্প সংখ্যক ছাত্র শিক্ষকদের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে থাকি ইংরেজী সাহিত্যটা ভাল শিখিতেন, তাহার প্রমাণ পাই। তাহার পর যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে বি, এ, এম্, এ, পরীক্ষা প্রবর্ত্তিত হইল, তখনও রব উঠিয়াছিল যে, নূতনেরা ভাল লেখাপড়া শেখেনা; সে দিনের লোকে তামাসা করিয়া বলিত,——B. A. = bad. M. A. = mad. ইউরোপীয়েরাও চাকুরী দিবার সময় Scholar বাবুদিগকে উপহাস করিয়া বিমুখ করিতেন; মুচিরাম গুড়ের দরখাস্ত প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। সা আশুতোষের এক বয়সের লোকেরা জানেন, যে তাঁহারা বাল্যে ইংরেজী বই ধরিবার সময় রো সাহেবের বইয়ে Baboo English কথাটি বেজায় ঠাট্টায় প্রচলিত হইয়াছিল। এখনকা বুড়া গ্রাজুয়েটেরা কলেজ ছাড়িবার বয়সে কতখানি কৃতিত্ব হাঁসিল করিয়াছিলেন,—দুই সহজ ইংরেজী লিখিতে পারিতেন কি না, তাহা ভুলিয়া গিয়া আপনাদিগকে কুড়ি বাই বৎসরের যুবকদের সঙ্গে তুলনা করেন। এই মন্তব্য লেখক নিজে জানেন, যে ১৮৮৯—৯ অব্দে একজন রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ স্কলার, একটি সরকারী রিপোর্টে এমন ইংরেজী লিখিয়াছিলে যে আপিষের কেরাণীরাও লজ্জিত হইয়াছিল। বিদ্যা যে অনেক ঘষিয়া মাজিয়া পরে হ তাহা আমরা ভুলিয়া যাই। সকল যুগেই ভাল লেখাপড়া শেখে অল্প সংখ্যক ছাত্রেরা একালের শিক্ষায়, নানা বিষয়ের শিক্ষা অধিক হইতেছে কি না, জ্ঞানের কৌতূহল অধি বাড়িতেছে কি না, নূতন আবিষ্কারের ক্ষমতা জন্মিতেছে কি না, তাহার পরিচয় পাইবার নি আসে নাই। যাঁহারা বুড়ায় যুবায় তুলনা করিয়া দৈনিকে পত্র লিখিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে ন করিতেছেন, তাঁহারা তরুণ বয়সের ইংরেজী লেখা চিঠি ও ডায়েরীর প্রত্নতত্ত্ব করিলে সুখী হইব।

নিবেদন

আমরা আন্তরিক দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, প্রস্তাবিত লেখকগণের মধ্যে শ্রীশরৎ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় দ্বয়ের লেখা এই সংখ্যায় দিতে পারা গে শরৎ বাবু কংগ্রেস উপলক্ষে দিল্লী গিয়াছেন, আজও ফেরেন নাই;—মণি বাবুরও নানা লেখা ঘটিয়া উঠে নাই। আশাকরি পাঠকগণ আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটী মা করিবেন। তবে শ্রীপ্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের নাম পূর্ব্বে প্রস্তাবিত না থাকিলেও আমরা সংখ্যায় তাঁহার একটী উপভোগ্য লেখা বাহির করিলাম।

পূজার সংখ্যা সুন্দর ও সৌষ্ঠবসম্পন্ন করিতে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। ইহা উৎকৃষ্ট কাগজ ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং অধিকাংশ লেখকের প্রতিকৃতি দেওয়া হইয়াছে, ইহা কলেবরও যথেষ্ট বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। এইজন্য কেবল এই সংখ্যার নগদ মূল্য মাত্র দুই আনা করিয়া নয় আনা করা হইল।

Printed and published by Jyotish Chandra Ghosh at the Cotton Press, 57, Harrison Road, Calcutta.

KONNAGAR PUBLIC LIBRARY Estd. 1858

ওমার খৈয়াম

শিল্পী—শ্রীঅর্দ্ধেন্দু কুমার গঙ্গোপাধ্যায়।] [কলিকাতা রিভিউর সৌজন্যে

INDIAN ART SCHOOL

COLOUR PICTURE

KONNAGAR PUBLIC LIBRARY
Estd. 1858

বঙ্গবাণী

"আবার তোরা মানুষ হ"

দ্বিতীয় বর্ষ ১৩২৯-'৩০ | অগ্রহায়ণ | দ্বিতীয়ার্দ্ধ ৪র্থ সংখ্যা

প্রাচীন ভারতে রসায়ন-শাস্ত্র-চর্চ্চা

বর্ত্তমান যুগে রসায়ন শাস্ত্র সকল বিজ্ঞানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত। আমি রাসায়নিক বলিয়াই আমার প্রিয় শাস্ত্র রসায়নকে সর্ব্বাপেক্ষা বড় বলিতেছি তাহা নহে। এই রসায়ন শাস্ত্র হইতে মানবজাতির কত অসুবিধা দূর হইয়াছে, কত সমৃদ্ধি ও স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা ভাবিয়া দেখিলেই আমার কথার সততা উপলব্ধি হইবে। শান্তির সময় রসায়ন যেরূপ জাতীয় উন্নতির সহায়তা করে—যুদ্ধের সময় সেইরূপ ইহার প্রয়োজনীয়তা যে কত বেশী তাহা বিগত মহাযুদ্ধের সময় যথেষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে। গোলাগুলি, বারুদ, বিষাক্ত বাষ্প, বিস্ফোটক প্রভৃতি যুদ্ধের অত্যাবশ্যকীয় সরঞ্জামগুলি রসায়নপ্রসূত। আবার নিত্য প্রয়োজনীয় ধাতু, নানাবিধ রং, জমির সার, কাচদ্রব্য, ঔষধ, সংস্কৃত চর্ম্ম, সাবান, চিনি, রবার, প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য হইতে আরম্ভ করিয়া সুগন্ধি, প্রসাধন-দ্রব্য ও অন্যান্য বহুমূল্য প্রস্তর প্রভৃতি বিলাসিতার উপকরণসমূহ সমস্তই নব্য রসায়নের সাহায্যে প্রস্তুত। অন্যপক্ষে কাঁচা মাল (raw materials) ও অকেজো পদার্থ (waste product) হইতে আবশ্যকীয় বস্তুর উদ্ধার সাধন করিতে রসায়ন অদ্বিতীয়। নব্য রসায়নী বিদ্যার সাহায্যে চিকিৎসা-শাস্ত্রের আজ এত উন্নতি! শত বৎসর পূর্ব্বে অস্ত্রোপচার করিতে হইলে, হস্ত-পদ-বদ্ধ রোগীকে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত এবং অনেক সময় অস্ত্রোপচারের

DOUBLE COLOUR PAGE

সাফল্যের সহিত রোগীর জীবনও শেষ হইয়া যাইত। এখন ক্লোরোফর্ম (Chloroform) প্রভৃতি নিদ্রাকর্ষক (hypnotic) ঔষধ আবিষ্কার হওয়ায় মানুষের যে কত কষ্টের লাঘব হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত।

আমাদের দেশে, এই ভারতবর্ষে এক সময়ে রসায়ন বিজ্ঞানের সমধিক উন্নতি হইয়াছিল। কেহ কেহ মনে করেন ভূবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি অন্যান্য বিজ্ঞানের সহিত রসায়ন বিজ্ঞানও পাশ্চাত্য দেশ হইতে ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছে। পর্য্যবেক্ষণ (observation) ও পরীক্ষার (experiment) উপর ভিত্তি করিয়া এই বিজ্ঞানই আমাদের দেশে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল একথা অনেকে স্বীকার করিতে চাহেন না। তবে অবিশ্বাসের কোন কারণ নাই; কেননা আমাদের অতীত ইতিহাস অনেক কথাই ভুলিয়া গিয়াছি। ৮০ বৎসর পূর্ব্বে জগদ্বিখ্যাত ঢাকাই মস্‌লিন্ কোন্ জাতীয় সূতা হইতে কি প্রকারে তৈয়ারী হইত তাহা এখন কেহ বলিতে পারে না। উড়িষ্যার স্থাপত্যশিল্পের উৎকর্ষের কথা ৩ শত বৎসরের মধ্যেই এতদূর বিস্মৃত হইয়াছি যে, এই জাতির ভাষাকে উপহাসের অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিতে দ্বিধা বোধ করি না। অদূরবর্ত্তী শিল্পকলার আর একটি নিদর্শন তাজমহল। ইহার সৌন্দর্য্য ও নির্ম্মাণ-কৌশল দেখিয়া ইংরাজ ইহা ইটালী দেশীয় শিল্পীর কীর্ত্তি বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে এই সব শিল্পের লোপ হইয়াছে বলিয়া কি ইহাদের তৎকালীন অস্তিত্বে সন্দিহান হইতে হইবে?

পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে যে রসায়ন শাস্ত্র ও অন্যান্য বিজ্ঞান-চর্চ্চা হইত, তাহা ৬ষ্ঠ শতাব্দীর (খৃঃ পূঃ ৬০০), বিক্রমশীলা ও নালন্দা প্রভৃতি প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবরণ হইতে কিছু কিছু জানিতে পারা যায়। চীনদেশের ইতিহাস ও বিখ্যাত চীন পরিব্রাজক হিয়েনসাং লিখিত ভারতের আভ্যন্তরিক অবস্থার বিবরণ হইতে আমরা এ বিষয়ে অনেক তথ্য অবগত হই। কিন্তু এই বিষয় দু'এক খানি পুস্তক ব্যতীত এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন উল্লেখ নাই। বৌদ্ধযুগের পর হিন্দু পুনরুত্থানের সময় বিদ্বেষবশতঃ অনেক মূল্যবান ঐতিহাসিক গ্রন্থাদি নষ্ট হইয়াছে। আবার গ্রন্থ অসাবধানতাবশতঃ অথবা বাংলা ও অন্যান্য সমুদ্রতীরবর্ত্তী প্রদেশের জল হাওয়ার দোষে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে—কাজেই এ সম্বন্ধে বেশী কিছু জানিবার উপায় নাই।

২৫ বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু রসায়নের ইতিহাস * লিখিবার উদ্দেশ্যে সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরিয়া অনেকগুলি পুঁথি ও পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই। এই কয়েকখানি গ্রন্থ হইতেই প্রাচীন ভারতে রসায়ন চর্চ্চার অনেক কথাই জানা যায়। "রসেন্দ্র চিন্তামণি" একখানি প্রাচীন সম্ভবতঃ উহা ১২০০ খৃষ্টাব্দে কি তাহারও পূর্ব্বে রচিত। ইহার প্রথম অধ্যায়েই আছে—

* History of Hindu Chemistry ১৯০২ সালে প্রথম ছাপা হয়।

"অশ্রৌষং বহুবিদুষাং মুখাদপশ্যং শাস্ত্রেষু স্থিতমকৃতং ন তল্লিখামি।
যৎকর্ম্ম ব্যরচয়মগ্রতো গুরূণাং প্রৌঢ়ানাং তদিহ বদামি বীতশঙ্কঃ ॥ ৪ ॥"

"যাহা বহু পণ্ডিতের মুখে শুনিয়াছি এবং শাস্ত্রে দেখিয়াছি, কিন্তু কার্য্য দ্বারা সম্পন্ন করি নাই, তাহা না লিখিয়া, বৃদ্ধ বৈদ্যের সম্মুখে শুনিয়া যেগুলি কার্য্যদ্বারা সম্পন্ন করিয়াছি, আমি নিঃশঙ্কচিত্তে সেইগুলিই এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিতেছি ॥"

আবার,—

"অধ্যাপয়ন্তি যদি দর্শয়িতুং ক্ষমন্তে
সূত্রেন্দ্র কর্ম্মগুরবো গুরবস্ত এব।
শিষ্যাস্ত এব রচয়ন্তি গুরোঃ পুরো যে
শেষাঃ পুনস্তদুভয়াভিনয়ং ভজন্তে" ॥ ৫ ॥

"যে সকল গুরু রসকর্ম্ম অধ্যপনা করাইয়া তাহা কার্য্যে দেখাইতে সমর্থ হয়েন তাঁহারাই প্রকৃত গুরু; যে সকল শিষ্য অধ্যয়ন করিয়া, গুরুসমক্ষে সেই সমস্ত সম্পন্ন করিতে পারেন, তাঁহারাই প্রশংসনীয় শিষ্য। তদ্ভিন্ন উভয়বিধ গুরুশিষ্যই অভিনেতা মাত্র ॥ ৫ ॥"

ইহা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তৎকালে রসায়নশাস্ত্র পরীক্ষার (Experiment) উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং শিষ্যবর্গকেও যত্ন সহকারে ব্যবহারিক রসায়ন শিক্ষা দেওয়া হইত। "রসার্ণব" নামক গ্রন্থটী ৫।৬ খানি ভিন্ন ভিন্ন পুঁথি হইতে সঙ্কলিত করা হইয়াছে। বিভিন্ন ধাতু অগ্নিতে কিরূপ বিভিন্ন বর্ণের শিখা সৃষ্টি করে, বিশুদ্ধ ধাতুর গুণ কি, কি উপায়ে ধাতুর বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করা যাইতে পারে, ইত্যাদি ইহাতে বিশদভাবে লিপিবদ্ধ আছে। খৃষ্টীয় দশ শতাব্দীতে ধাতু সম্বন্ধে এত বিশিষ্ট জ্ঞান যে ভারতে ছিল তাহা দেখিয়া "Nature" * পত্রিকার জনৈক সমালোচক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গিয়াছিলেন। ব্যবহারিক রসায়ন শিক্ষা করিবার জন্য রসশালা (Chemical Laboratory) ছিল। "রসরত্ন সমুচ্চয়" নামক গ্রন্থে রসশালা নির্ম্মাণ করিবার বিবরণ আছে। রসশালায় কি কি যন্ত্রাদি ও রাসায়নিক দ্রব্যাদির আবশ্যক হয় তাহারও উল্লেখ আছে। আমরা বর্ত্তমানে যে সমস্ত যন্ত্র ও পাত্রাদি ব্যবহার করি তাহার অধিকাংশই তৎকালে ব্যবহৃত হইত যথা, সন্দংশ (Forceps), মুচি (Crucible) কাচকুপী (Glass retorts) ইত্যাদি।

এখন রসায়নীবিদ্যার উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু বলিব। কি মিশরে, কি ভারতে, কি মধ্য-ইউরোপে, দুইটী জিনিষ তৈয়ারী করিবার ফলে রাসায়নিক গবেষণার সৃষ্টি হয়। (ক) Elixir of Life বা "অমৃত", অর্থাৎ যাহা সেবনে জরা-ব্যাধি বিমুক্ত হইয়া চির-যৌবন লাভ করা যাইতে পারে। (খ) Philosopher's Stone বা "স্পর্শমণি" অর্থাৎ যাহার স্পর্শে লৌহ প্রভৃতি হীন ধাতু স্বর্ণে পরিণত হয়। এই উভয়বিধ উদ্দেশ্য লইয়া শত শত বৎসর গবেষণা হইয়াছে; উদ্দেশ্য

* Nature, 1903, xlviii. 51.

সফল হয় নাই বটে কিন্তু এইরূপে অনেক নূতন নূতন মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং তাহাদের গুণ ও উপকারিতা জানা গিয়াছে। বস্তুতঃ "রসায়ন" শব্দের অর্থ ঊষর। রসায়নের ইংরাজী প্রতিশব্দ Chemistry, "কিমিয়া" শব্দ হইতে উৎপন্ন। যে পদার্থ বা হীন ধাতুকে মূল্যবান ধাতুতে রূপান্তরিত করা যায় আরবদেশে তাহাকে "কিমিয়া" নামে অভিহিত করা হইত। "রসার্ণবে" "অমৃত" বা Elixir of Life সম্বন্ধে অনেক কথা লেখা আছে। এমন সমস্ত ঔষধের বিবরণ আছে যাহার প্রয়োগে মৃতব্যক্তি বাঁচিয়া উঠে, এমন কি মৃত্তিকা পর্য্যন্ত স্বর্ণে পরিণত হয়। "স্বর্ণতন্ত্রে" হীন ধাতুকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করিবার বিবরণ আছে। সাধারণতঃ উত্তাপ সহযোগে ধাতুর বাহ্যিক ও রাসায়নিক গুণ পরিবর্ত্তন করিবার ও অন্য ধাতুতে রূপান্তরিত করিবার চেষ্টা হইত এবং অনেক সময় পারদ, গন্ধক, স্বর্ণ প্রভৃতির রাসায়নিক সংযোগে "অমৃত" আবিষ্কারের চেষ্টা হইত—ফলে এখনও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে, লৌহভস্ম, মকরধ্বজ প্রভৃতির ব্যবহার দেখিতে পাই। জগতে কেহ কোন দিন Elixir of Life বা Philosopher's Stone আবিষ্কার করিতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু ঐ দুইটী পদার্থ আবিষ্কারের বিভিন্নমুখী চেষ্টাই নব্য রসায়ন শাস্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে। "ভাবপ্রকাশে" (খৃঃ অঃ) তুতিয়ার (Sulphate of Copper) প্রস্তুত প্রণালী ও তাহার গুণ লিপিবদ্ধ আছে। সমসাময়িক ইউরোপে এই পদার্থ টী তখনও আবিষ্কৃত হইয়াছে কিনা সন্দেহ।

পরমাণু লইয়াই জড়জগৎ। নব্য রসায়নী বিদ্যা পরমাণুবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। পরমাণুবাদ আমাদের দেশের অতি প্রাচীন কল্পনা। বৈশেষিক দর্শনে কণাদ † পরমাণুবাদ বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

কণাদের পরমাণুবাদ আজও বিজ্ঞান সমাজে আদৃত হইয়া থাকে। জড় পদার্থ সম্বন্ধে সূক্ষ্ম ধারণা অন্য কোন দেশে তৎকালে ছিল না। কণাদ মতে—জড়পদার্থ পরমাণু-সংগঠিত—পরমাণু পরস্পরের মধ্যে শূন্য স্থান এবং একের প্রতি অন্যের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে—পরমাণু সকল নিত্য (eternal) ইত্যাদি। কিন্তু দুঃখের বিষয় তৎকালে পরবর্ত্তী সময়ে নির্দ্দিষ্ট-অনুপাত-বিধি বা Law of Definite Proportion সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান ছিল না। কতভাগ পারদ ও কতভাগ গন্ধক মকরধ্বজে বর্ত্তমান তাহা কেহই জানিত না;—ফলে, মকরধ্বজ তৈয়ারী করিতে অনেক বেশী গন্ধক দেওয়া হইত; কেননা, বৈদ্যদিগের ছিল যে গন্ধকের আধিক্যের সহিত মকরধ্বজের গুণ বৃদ্ধি পায়। পালবংশের রাজা

* তুথংতু তাম্রোপধাতু কিঞ্চিৎ তাম্রেন তদ্ভবতি (vide History of Hindu Chemistry 2nd. Ed. p. 172).

† ঈশ্বর চিন্তা ত্যাগ করিয়া জড়পদার্থের স্বরূপ নির্ণয়ে ব্যস্ত থাকিতেন বলিয়া, বৈদান্তিকেরা পরিপোষকগণকে "কণাদ" (কনান্ অত্তি ইতি) বা কণভুক্ বলিয়া বিদ্রূপ করিতেন।

রাজবৈদ্য চক্রপাণি, "শুল্বৌ তুল্যৌ রসগন্ধৌ" বা সমভাগ পারদ ও গন্ধক লইয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু আমরা জানি যে ২৫ ভাগ ওজনের পারা ও ৪ ভাগ গন্ধকের সংযোগে মকরধ্বজ তৈয়ারী হয় সুতরাং গন্ধকের ভাগ ঐ অনুপাতে বেশী হইলে অগ্নিতপ্ত করিয়া ঊর্দ্ধপাতিত (Sublimed) করিবার সময় অতিরিক্ত গন্ধক বাষ্পাকারে চলিয়া যায়, এবং মকরধ্বজ উজ্জ্বল দানার আকারে পাত্রের গলদেশে জমা হয়। সেইরূপ ২ ভাগ জলজান ও ১ ভাগ অম্লজানের রাসায়নিক সংযোগে জল উৎপন্ন হয়। এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম দেখা যায় না।

এই যে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ মূল পদার্থ (Element) হইতে যৌগিক পদার্থের (Compound) উৎপত্তি, ইহাকেই নির্দ্দিষ্ট অনুপাত বিধি (Law of Definite Proportion) কহে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে John Dalton তাহার "New System of Chemical Philosophy" পুস্তকে যৌগিক পদার্থে পরমাণু পরস্পরের পরিমাণজ্ঞাপক সম্বন্ধ (Quantitative Relations) স্থির করিয়া, পুরাতন প্রচলিত পরমাণুবাদের ভিত্তি সুদৃঢ় ও রসায়ন-জগতে নূতন নিয়ম (Law of Definite Proportion, Law of Multiple Proportion) প্রবর্ত্তিত করেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি চিরযৌবন-লাভের প্রচেষ্টার উপরই পরীক্ষামূলক রসায়নের ভিত্তি। বস্তুতঃ তৎকালে রসায়নশাস্ত্র বৈদ্যদিগের নূতন ঔষধ আবিষ্কারে ও তাহাদের প্রস্তুত কার্য্যে সহায়তা করিত মাত্র। সেইজন্য শুশ্রুত প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে আমরা রসায়ন বিষয়ে অনেক তথ্য দেখিতে পাই। দ্রব্যগুণ সম্বন্ধে অতি বিশদ বিবরণ চরকে আছে। এমন কি গোমাংসের গুণের পর্য্যন্ত উল্লেখ আছে। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে তৎকালে গোমাংস অস্পৃশ্য বা অখাদ্য ছিল না। উত্তররামচরিতে ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে গোমাংস ভক্ষণের উল্লেখ আছে। আবার তখন অতিথির অন্য একনাম ছিল, গোঘ্ন অর্থাৎ যস্মৈ গৌহন্যতে। কালক্রমে এই সমস্ত প্রথার লোপ হইয়াছে; (যেমন বাঙালীর গোঁফ ও দৃষ্টিশক্তির লোপ হইতেছে)।

শুশ্রুতে ক্ষার-কর্ম্ম বিষয়ে একটী অধ্যায় আছে। উহাতে ক্ষারের প্রকারভেদ,—যথা সর্জিকাক্ষার এবং স্থূলজ উদ্ভিদ্ হইতেই বা কি প্রকার ক্ষার পাওয়া যায় অর্থাৎ যবক্ষার;—এই ক্ষার হইতে চূণদ্বারা (Milk of Lime) কি উপায়ে তীক্ষ্ণ-ক্ষার (Caustic Alkali) তৈয়ারী করিতে হয় তাহার এত সুন্দর ও বিজ্ঞানসঙ্গত বিবরণ আছে যে, আধুনিক ক্ষারকর্ম্ম পদ্ধতির সহিত ইহার কোন প্রভেদ দেখা যায় না। ক্ষার প্রস্তুতের এতদূর বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী যে আমাদের দেশে ছিল ইহা বিখ্যাত ফরাসী রাসায়নিক, M. Berthelot পর্য্যন্ত বিশ্বাসই করিতে পারেন নাই। Berthelot আমার "হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস"-এ বিবৃত ক্ষার প্রস্তুত করণের বিধি পাঠ করিয়া এই সিদ্ধান্ত করেন যে ইহা ইউরোপ হইতে এদেশে আসিয়াছে। কিন্তু শুশ্রুত যে কত প্রাচীন তাহা তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই যদিও আমার "ইতিহাসে" ইহার কালনির্ণয় আলোচনা করা হইয়াছে। যে

সময়ের কথা বলিতেছি তখনও "ফিরঙ্গ"-রোগ *-বিনা পয়সায় ইউরোপের নিকট হইতে আমরা উপহার পাই নাই। কাজেই, পৌর্ব্বাপর্য্য বিবেচনা করিয়া দেখিলে Berthelotএর ধারণার ভ্রান্তি সম্বন্ধে কোন সন্দেহই থাকে না।

তৎকালে রসকর্ম্ম (Chemical Processes) সকল কেবলমাত্র নির্ব্বাচিত শিষ্যবর্গকে শিক্ষা দেওয়া হইত। নাগার্জ্জুন রচিত "রসরত্নাকর" নামক একখানি অতি প্রাচীন পুঁথির কিয়দংশ আমি অতিকষ্টে কাশ্মীর রাজ পুস্তকাগার হইতে সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই। রসশাস্ত্র চর্চ্চা করিতে হইলে ও তাহাতে পারদর্শিতা লাভ করিতে হইলে কত অসাধ্য সাধনার প্রয়োজন তাহা ইহা হইতে উদ্ধৃত শ্লোকটীর দ্বারা প্রতিপন্ন হইবে। এখনও আমরা বলি "A chemist is the most patient of all animals, the ass being not excepted." (কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ রসায়ন শিক্ষার জন্য আজকাল মাত্র পল্লবগ্রাহী 'অনার্স' হইলেই চলে)। নাগার্জ্জুন এ বলিতেছেন,—

"দ্বাদশানি চ বর্ষানি মহাক্লেশঃ কৃতোময়া
যদি তুষ্টাসি মে দেবি সর্ব্বদা ভক্তিবৎসলে !
দুর্লভং ত্রিষু লোকেষু রসবন্ধং দদস্বমে।

গ্রন্থকার দ্বাদশ বৎসর রসায়নী বিদ্যা চর্চ্চা করিবার পরও বলিতেছেন তিনি রসায়নের কিছু শিখিতে পারেন নাই। আমিও প্রায় ৩৫।৩৬ বৎসর যাবৎ রসায়নশাস্ত্র চর্চ্চাই করিতেছি। ইহার মধ্যে আবার অধিকাংশ সময়ই পারদ সম্ভূত যৌগিক পদার্থের গবেষণা করিয়াছি এবং করিতেছি। কিন্তু আজও তাহার প্রথম অধ্যায় শেষ হইল না। নিউটনের কথায় বলিতে গেলে এখনও ভূমিতে উপলখণ্ড সংগ্রহ করিতেছি মাত্র।"

রসায়নশাস্ত্র অতি দ্রুতবেগে উন্নতির পথে ধাবিত হইতেছে। ইহা এখন বিস্তৃত দিন দিন নানা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িতেছে যথা—Inorganic chemistry, Organic chemistry, Physical chemistry, Bio-chemistry, Agricultural chemistry, Analytical chemistry, Radio-chemistry, Chemistry of dyes, ইত্যাদি। একজনের পক্ষে রসায়নের সমস্ত বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞানলাভ করা অসম্ভব। এক এক এক বিষয় লইয়া আজীবন সাধনা করিতেছেন। প্রত্যহই এত নূতন নূতন গবেষণা হইতে যে একজন রাসায়নিকের পক্ষে সমস্ত বিষয়ের খবর রাখা সুকঠিন। এই সমস্ত গবেষণা প্রায় সভ্যদেশের রাসায়নিক বা বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সূচীপত্রে প্রায় গবেষণারত রাসায়নিকের নাম পাওয়া যায়; বিগত মহাযুদ্ধের সময় আমেরিকার যুক্ত

* আকবরের সমসাময়িক "ভাবপ্রকাশ" নামক চিকিৎসাগ্রন্থে এই রোগের উল্লেখ দেখা যায়।

প্রেসিডেণ্ট উইলসনের আহ্বানে প্রায় ১৫০০০ রাসায়নিক যুদ্ধের সাহায্যার্থে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। জাপানেও বিজ্ঞানের খুব দ্রুত উন্নতি হইতেছে। অনুসন্ধিৎসা ও অধ্যবসায়ের বলে জাপানীরা শীঘ্রই বিজ্ঞানে পাশ্চাত্যদেশের সমকক্ষ হইবে, এমন কি হইয়াছে, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আর আমাদের দেশে কয়জন বিজ্ঞান সেবায় বা গবেষণা কার্য্যে রত আছেন? দারিদ্র্যই গবেষণার অন্তরায় একথা ত বলা চলে না; ইংলণ্ড বা জাপানের সাধারণ অধ্যাপকেরা আমাদের দেশের অধ্যাপক অপেক্ষা অনেক কম বেতন পান কিন্তু বেতনের অনুপাতে ত তাঁহাদের গবেষণাস্পৃহা কমিয়া যায় না।

এক সময়ে ভারতের কলা, সাহিত্য, দর্শন ও সভ্যতা জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল। অঙ্কশাস্ত্রে লিখিবার প্রণালী দেখিয়া Max Müller বলিয়াছিলেন "হিন্দুরা কেবলমাত্র এই সংখ্যা প্রণালী সকলকে জানাইলে, সমগ্র জগৎ ভারতবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিত"—কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, হিন্দুদিগের নিকট শিক্ষা করিয়া এই মহান্ আবিষ্কারের কৃতিত্বের অধিকারী হইয়াছে আরবেরা। ইউরোপে আধুনিক সংখ্যা লিখিবার প্রণালী "Arabian Notation" নামে পরিচিত। আমাদের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শিল্প বিজ্ঞান লোপ পাইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপ ও আমেরিকার নিকট হইতে আমাদিগকে গবেষণার পদ্ধতি, শিল্প ও বাণিজ্য এবং অন্যান্য বিজ্ঞান- সম্মত প্রণালী শিখিতে হইবে। ইহাতে জাতির মর্য্যাদার লাঘব হয় না। একশ্রেণীর লোক আছেন যাঁহারা প্রাচীন ভারতের সত্য ও তথ্য, বেদ ও বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া নিজেদের অজ্ঞতা চাপা দিয়া থাকেন; এবং অতীত ইতিহাসের সত্যাসত্যের উপর রং ফলাইয়া নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেন। ফলে দেশের ও সমাজের উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। আজকাল 'উন্নতিই' প্রত্যেক জাতির "বীজমন্ত্র"; বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, রণকৌশলে, ব্যবসায়, কূটনীতিতে সর্ব্বত্রই প্রত্যেক সভ্যজাতি দিন দিন উন্নতি করিতেছে। জাপান পোর্ট আর্থার জয় করিবার সময় যে সমস্ত নূতন ধরণের বিস্ফোটক ব্যবহার করিয়াছিল তাহা দেখিয়া পাশ্চাত্য জগতের বিজ্ঞানসমাজ স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। বিজ্ঞান সেবার ফলে জাপান আজ জগতের মধ্যে একটী শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া পরিগণিত। বৎসর বৎসর অসংখ্য জাপানীছাত্র ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে বিজ্ঞানের নূতন নূতন তথ্য শিখিয়া আসিয়া দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছেন। আর আমাদের দেশের ছাত্রেরা লণ্ডনের ডি, এস্‌সি, হইলেও চাকুরীর লোভ পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীন জীবিকার পক্ষপাতী নহেন। অবশ্য ইহাও স্বীকার্য্য যে আমাদের বিদেশী কর্ত্তারা আমাদিগকে এ বিষয়ে সুবিধা দিতে উদাসীন ও নারাজ।

ভারতবর্ষে ৩৩ কোটী লোকের বাস, কিন্তু শুধু সংখ্যার দিক দিয়া কোন জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ হয় না! এমারসন্ বলিয়াছেন—সংখ্যার দিক দিয়া ধরিলে জগতে কীট পতঙ্গেরাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইত। এই ৩৩ কোটী নরনারীর মধ্যে মাত্র ৩০ জন গবেষণারত রাসায়নিকও নাই! আর

জাপানের লোকসংখ্যা ৪½ কোটী—কিন্তু জগতের জ্ঞান ভাণ্ডারে তাহারা এত ঐশ্বর্য্য দান করিয়াছে যে, জগতের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ জাতির তুলনায় তাহাদের বিজ্ঞান-সেবা প্রশংসনীয়। আর ঐ জাপানের প্রতিবেশী চীন, অপর্য্যাপ্ত খনিজ ঐশ্বর্য্য ও ৪৫ কোটী নরনারী লইয়া জাতীয় জীবনের পুরাণ স্মৃতি ধরিয়া আফিমের নেশায় বিভোর। তাহাদের সংখ্যা সব দেশের চেয়ে বেশী, অথচ চীনজাপান যুদ্ধে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এমন ভীষণ পরাজয় হইল যে, চীনের রাজনীতিবিশারদ Li Hung Chang অপমানজনক সন্ধি করা ছাড়া আর কোন উপায় দেখিলেন না।

তাই বলিতেছিলাম, পুরাতন সভ্যতা ও দর্শনবিজ্ঞানের স্মৃতি লইয়া থাকিলে কোনও আমরা বড় হইতে পারিব না। এখন পুরাতন ছাড়িয়া নূতনের সন্ধানে যাইতে হইবে। শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখিতে হইলে নব্য বিজ্ঞানানুশীলনে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। *

শ্রী[illegible]

পাপ-সমর্পণ

(১)

"মোরে দাও সব পাপ জগাই মাধাই,"
কহিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ, করুণ সুন্দর।
নতনেত্র, কাঁপে বক্ষ, স্তব্ধ দু'টী ভাই ;
নয়নের বারিধারা ঝরে দর দর।

(২)

বীণা কি বাজিল স্বর্গে ?—সুধা কি ক্ষরিল ?—
বহিল কি চন্দনের ধারা সুশীতল ?
অপূর্ব্ব আশার বাণী প্রাণে প্রবেশিল,
জুড়াইতে সর্ব্ব তাপ,—তীব্র শোকানল।

(৩)

শান্ত সন্ধ্যা, বহে গঙ্গা মৃদু কলকলে,
চন্দ্রালোকে দীর্ঘধারা মুকুতার মালা।
ছায়ালোকে বনরাজি মৌন মন্ত্রবলে,
কুটীরে কুটীরে দূরে সন্ধ্যাদীপ জ্বালা।

(৪)

নীলাকাশে পূর্ণচন্দ্র,—পূর্ণচন্দ্র জলে,
কাঞ্চনজঙ্ঘার শিরে পূর্ণ চন্দ্রোদয়,—
রূপের শেখর 'গোরা',—নয়ন কমলে
শান্তশুভ্র দিব্য জ্যোতিঃ কি মহিমময়

(৫)

বরবক্ষে বিলম্বিত শুভ্র উপবীত,
কণ্ঠে বিলম্বিত পুষ্প তুলসীর মালা,
চাঁচর চিকুরভার কুসুমে গ্রথিত,
অতুল সুন্দরমূর্ত্তি প্রেমমধু ঢালা।

(৬)

তটতলে দাঁড়াইয়া বৈষ্ণব মণ্ডলী,
চন্দ্রালোকে চিত্রার্পিত,—ভাবে ভরা
রঙ্গে গঙ্গা চলিতেছে উছলি' উছলি',
তরঙ্গ পরশে স্নিগ্ধ পুলিন-পাষাণ।

* বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ। শ্রীমান্ প্রফুল্লকুমার বসু এ
(Palit Research Scholar)কর্ত্তৃক বিবৃত।

(৭)

"মোরে দাও সব পাপ, জগাই মাধাই,"
কহিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ,—মধুমাখা স্বর।
নিশ্চল পাষাণমূর্ত্তি—যেন সংজ্ঞা নাই,
স্বপনে শুনিল বাণী, ব্যথিত কাতর।

(৮)

[illegible]দারুণ দাহ,—ব্যাকুল বিহ্বল,
[illegible]ড়াইয়া দুইজন অবনতশিরে,
[illegible]ড়হর, ম্লানমুখ, নয়নের জল
[illegible]তেছে বিন্দু বিন্দু জাহ্নবীর নীরে।

(৯)

প্রয়াণ কাঁদিছে দুঃখে, অনুতাপে লাজে,
টুটিতেছে একে একে দেহের বন্ধন,
শিরায় শিরায় বহ্নি,—বহ্নি হৃদি মাঝে
ভাঙ্গিয়া পড়িছে যেন ভারাক্রান্ত মন।

(১০)

কণ্ঠাগতপ্রাণ,—শোক সংবরি যতনে,
কহিল মাধাই মৃদু গদগদ ভাষে,
"তোমারে এ পাপরাশি অর্পিব কেমনে,
মৃত্যু দাও, হে দয়াল পদানত দাসে।

(১১)

"অশুচি, অজ্ঞান, পাপী, কামনা-কিঙ্কর,
কামকুণ্ডক্লেদে ক্লান্ত—চণ্ডালের হেয়,
পরদার ধনহারী—পাষণ্ড, পামর,
পাপরাশি, পাদপদ্মে অদেয়, অদেয়।

(১২)

"হে বৈকুণ্ঠ, হে সুন্দর, পতিত পাবন,
শিখি নাই তব পূজা, চিনিনি তোমারে,
কৃপায় চিনালে যদি কমল চরণ
পাপ দিয়া করিব কি চরণ-বন্দন ?

(১৩)

"তার চেয়ে পুড়ে মরি নরকের অনলে,
ভস্ম করি' জন্ম জন্ম সঞ্চিত পাতক,
সহি শত বজ্রাঘাত দগ্ধ বক্ষঃস্থলে
দিব না তোমারে, দেব, এ মহানরক।

(১৪)

জগায়ের কণ্ঠ-হতে তীব্র শোকধ্বনি,
অন্তরের আর্ত্তিভরা আকুল ক্রন্দন,
উঠিল উচ্ছ্বাসভরে, হৃদয় অমনি
বিদীর্ণ হইল তাপে,—স্ফুরিল বচন :—

(১৫)

"যা কিছু মধুর আছে মানুষের মনে,
শ্রদ্ধাপ্রীতি, প্রেমভক্তি—সুদুর্লভধন,
তাই দিয়া সেবে ভক্ত পরম যতনে
পাপ হলাহল দিব—একথা কেমন ?

(১৬)

"ব্রহ্মহত্যা-গৃহদাহ, পরবিত্তগ্রাস,
কুটিল কামের ভোগ—ক্রূর হিংসাভরা,
প্রবঞ্চনা, ব্যাভিচারে উৎকট উল্লাস,
সুরাপান, কামিনীরে পাপ বক্ষে ধরা ;—

(১৭)

"ক্ষুধামত্ত, তৃষাতপ্ত শ্মশানকুক্কুর,
অস্থিমাংস চিবাইয়া তৃপ্ত নহে মন,
ফিরে ফিরে, আসে যায়,—তবু লোভাতুর,
মাংসরিক্ত অস্থিখণ্ড করে সে চর্ব্বণ।

(১৮)

"কামিনীর সঙ্গসুখে লালসাজর্জ্জর
পঙ্কিল হৃদয়ে লুব্ধ কুক্কুরের মত,
ক্ষয় করি পরমায়ু,—আমি নিরন্তর
কুপথে এনেছি টেনে রমণীরে কত।

KONNAGAR PUBLIC LIBRARY Estd. 1858

(১৯)

"ফাটিতেছে ব্রহ্মরন্ধ্র,—পুড়িতেছে প্রাণ,
সর্ব্বাঙ্গে নরক শিখা,—যাতনার দাহ,—
এ পাপ কেমনে দিব, পাপি-পরিত্রাণ,
কুটিল কুণ্ঠিতপ্রাণে না হয় উৎসাহ।"

(২০)

স্নেহভরা স্থিরহাসি,—প্রসাদ সুমুখে,
"ভয় নাই ভয় নাই জগাই মাধাই,"
কহিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ ; আনত সম্মুখে
কম্পিত কাতর তনু স্তব্ধ দু'টী ভাই।

(২১)

"লহ, লহ, গঙ্গাজল অঞ্জলি ভরিয়া,
পাপ সহ গঙ্গোদক ঢালি দেহ হাতে,
কৃষ্ণের পরম জ্ঞান প্রাণে জাগাইয়া
এসেছি রাধার প্রেম করুণা বিলাতে।"

(২২)

যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকা চলিল কৌশলে,
দিলা দোঁহে করপদ্মে গঙ্গোদক ঢালি,
কনক বরণ জ্যোতিঃ নিবে গেল পলে
পাপ ঘোর কালিমায় বরতনু কালি।

(২৩)

রাহুগ্রস্ত শশী যেন, মেঘ অন্তরালে
লুপ্ত মধ্যাহ্নের সূর্য্য,—মহা অমানিশি
নিমেষে হইল ব্যাপ্ত ;—পুনঃ ইন্দ্রজালে
ঘুচি' গেল তমঃঘোর—হাসে দশদিশি।

(২৪)

"দীননাথ, দয়াময়!" আর্ত্ত কো
ফাটি' গেল উর্দ্ধলোকে ব্রহ্মাণ্ড
মূর্চ্ছিত দোঁহার দেহ পড়ে গ
লুকাতে চাহিল তাহে সে পু

(২৫)

প্রেমে প্রসারিত আহা চারি ব
দু'টী পতিতেরে স্নেহে তুলি নি
সুপ্রসন্ন গৌরাঙ্গের নয়ন অম্বুজ,
কি অপূর্ব্ব বিভা খেলে নিত্যানন্দ মু

(২৬)

মৃদঙ্গে মধুরধ্বনি—বাজে করতাল,
শিহরে অম্বরতল হরিনাম রোলে,
হাসে প্রেম ক্ষমা মূর্ত্তি সুন্দর বিশা
সুধাধারা বহে নাম হিল্লোলে হিল্লো

শ্রীমুনীন্দ্র

ট্রাজেডির কথা

১

মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং—উপনিষদের দেবতার মত ট্রাজেডিও তাহার আনন্দ
তুলিয়াছে মৃত্যুর অভিসিঞ্চনে। মৃত্যুর রসেই ট্রাজেডির পাক। সুখ যেখানে দুঃখে
মিলন যেখানে আশু বিয়োগে পরিণত হইতেছে, প্রতিষ্ঠা যেখানে বিসর্জ্জনেরই
চলিয়াছে, সেখানেই ট্রাজেডির মাধুর্য্য দেখা দিয়াছে। ট্রাজেডির মাধুর্য্য এত মধুর,
এত তীব্র, এত উগ্র ; এত তীব্র, এত উগ্র, কারণ অমৃতকে এখানে মৃত্যুর ভাণ্ডে

হইতেছে। সকল আয়োজনের পুরোভাগে একটা সব-শেষের দাঁড়ি যেন কোথা হইতে টানিয়া দেওয়া হইয়াছে, ইহারই উপর প্রতিহত হইয়া যেন সে আয়োজনের রস উদ্বেল উচ্ছল ফেনিল হইয়া ফিরিয়া দেখা দিয়াছে। ক্ষণিকার, কণিকার বন্ধনীর মধ্যে পুড়িয়া গিয়াছে, তাই সে রস এমন নিবিড়, ঘন, চঞ্চল ঘোলা হইয়া উঠিয়াছে। ফুটনোন্মুখ ফুলের কুঁড়িটির এত মাধুর্য্য কোথায়? আশু পূর্ণবিকাশের সার্থকতা অব্যবহিত পরেই শুকাইয়া ঝরিয়া পড়ার নিরর্থকতার মধ্যে হারাইয়া যাইতেছে। অন্তরাত্মায় এই হারাইয়া ফেলিবার পূর্ব্বানুভূতি বর্ত্তমান আনন্দকে দৃঢ় আলিঙ্গনে [illegible] করিতেছে, তাহাকে এমন নিবিড় করিয়া তুলিতেছে। বিচ্ছেদের কালো পরিসীমার মধ্যে [illegible]র তৃপ্তি এমন গাঢ় উজ্জ্বল প্রখর হইয়া দেখা দিয়াছে। অমৃত আছে, কিন্তু তাহা দেখা [illegible]মৃত্যুর ফাঁকে ফাঁকে, তাই সে অমৃতে এত মাদকতা, তাই সে মৃত্যুও অমৃতেরই তুল্য।

[illegible] এই যে জগৎ—মৃত্যুই যেখানে অমৃতের ভিয়ান দিতেছে—তাহা হইতেছে প্রাণময় জগৎ, [illegible] নাম কামলোক। প্রাণাত্মক জগৎ হইতেছে প্রাণশক্তির লীলাক্ষেত্র—ভোগের, [illegible]নার, কামনার যত শক্তি তাহারাই এখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এই কামলোকের ধর্ম্মই হইতেছে, [illegible]র মধ্য দিয়া তৃপ্তি, অতৃপ্তির মধ্যেই তীব্রানন্দ। কোন প্রাণী সম্বন্ধে কথিত আছে যে সন্তানকে জন্ম দিয়া সে নিজেও প্রাণত্যাগে করে—সন্তানকে আপন গর্ভে ধারণ করিবার, তাহাকে আপন শরীর হইতে সৃষ্টি করিয়া দিবার যে উগ্র আনন্দ তাহার মূল্য হইতেছে জীবন দান, মৃত্যু। শারীরিক যন্ত্রণার মধ্যেও আছে একটা উৎকট আনন্দ, পীড়া বা কষ্টভোগের মধ্যেই লুকান আছে একটা বিপরীত ভোগ। এ যেন সেই জন্তুর মত, যাহার অদ্ভুত টান এক রকম কণ্টকাকীর্ণ লতার উপরে, একবার তাহা চিবাইতে আরম্ভ করিলে, সে লতার রসে জিহ্বা একবার লালায়িত হইয়া উঠিলে আর তাহাকে সে ছাড়িতে পারে না, জিহ্বা মুখ কাটিয়া ছিঁড়িয়া যাইতেছে, ঝর ঝর রক্ত পড়িতেছে, তবুও কি এক নেশার ভরে, অপরিসীম আনন্দে অনবরত চিবাইতে থাকিবেই। সকল রকম দুঃখই একটা সুখের বিকৃতি উল্টা দিক—সে দুঃখের মাত্রা যত বেশী, তাহার মধ্যে সুখেরও লেশ তত নিবিড়। প্রাণাবেগের স্রোত চলিয়াছে যেন পাকের পর পাক দিয়া, আবর্ত্তের গণ্ডী কাটিয়া কাটিয়া, তাই প্রত্যেক পাক প্রত্যেক গণ্ডীর মধ্যে একটা ভোগানন্দ অত্যুগ্র টানের জলে উচ্ছ্বসিত ফেনায়িত হইয়া উঠিতেছে। এই অত্যুগ্র টানেরই অন্য নাম বেদনা এবং এই বেদনাই আনন্দের একটা বিশেষরূপ তৈয়ার করিয়া ধরিতেছে।

কামনার বুভুক্ষার, অর্থই শেষ বা মৃত্যু—অশনায়া হি মৃত্যুঃ। কামনার, বুভুক্ষার জগতের [illegible] ধ্বংশক্তি তাহাই মৃত্যু! মৃত্যুই সে জগতের গতিতে তাল রাখিতেছে, পদে পদে যতি টানিয়া [illegible]তেছে। বিচ্ছেদ ছাড়া সেখানে মিলন নাই। মৃত্যুর যে পরমাণু সংগ্রহ তাহারই অন্য নাম কামনা। [illegible]মানন্দের গড়নের মধ্যেই তাই রহিয়াছে বিয়োগের, ধ্বংসের বীজ। কামী প্রাণ—প্রাণশক্তি মূর্ত্ত [illegible]য়া উঠিয়াছে যাহার মধ্যে, সেই অতিমানুষের ধর্ম্ম নীট্‌শ (Nietzsche) নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন

তাই সঙ্কুল বিপদের মধ্যে থাকিয়া জীবন যাত্রা—to live dangerously. তাহা যদি
মৃত্যু যদি না থাকিত, জীবনে যদি ছেদ না থাকিত, সেই একটানা আনন্দ কি তবে নীরস
পড়িত না ? যেখানে হারাইয়া ফেলিবার আশঙ্কা নাই, সেখানে আঁকড়িয়া ধরিবার তাগিদ
সুতরাং সেখানকার উপভোগে তীব্রতা নাই, বৈচিত্র নাই। যে জলে তুফান নাই, ঢেউ
ভাঁটাও নাই, উঠা নামা নাই—এ সকলের সম্ভাবনাও নাই, সেখানে কোন প্রাণের বিলাস বাঁধ
উঠিতে পারে ? ফলতঃ, এই কামলোক হইতেছে রাক্ষসের, অসুরের জগৎ। রাক্ষসের অসুরের বল
পরিণাম একটা দারুণ, বীভৎস মৃত্যু। কিন্তু এই মৃত্যুর উপরই প্রতিষ্ঠিত তাহার জী

এই কামলোকের, এই মৃত্যুর জগতের চিত্র দিতেছে ট্রাজেডি। সাধা
কামলোকের, এই মৃত্যুর জগতেরই অধিবাসী, 'অশনা'র সত্যই মানুষের প্রাণের
যুগে দেশে দেশে মানুষের প্রতিনিধি হইয়া কবি-শিল্পী ট্রাজেডি রচনা করিয়াছে,
মানুষ চিরদিন আস্বাদন করিয়া চলিয়াছে একটা অপরূপ আনন্দ। মানুষের
কামলোকের সহিত এতখানি জড়িত মিলিত, এই কামলোকের সত্যই তাহার জী
অন্তরঙ্গ কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছে, তাই ট্রাজেডিরই মধ্যে সে দেখিতে পায় যেন
প্রতিধ্বনি, তাহার নিগূঢ়তম রহস্যের মূর্ত্ত প্রতিকৃতি। ট্রাজেডি তাহার এত অন্তরের ধন
সে বস্তু এমন প্রাণকাড়া, মনকাড়া, এমন সুন্দর। তাই সকলের ভাবের প্রতিকৃতি
কবি বলিতেছেন—Our sweetest songs are those that tell of saddest thou

ইংলণ্ডের কবি শেক্সপীয়রের ট্রাজেডিতে এই কামলোক, এই প্রাণাত্মিকা প্রকৃতি
ফুটিয়া উঠিয়াছে। শেক্সপীয়রের এক একটি মানুষ যেন মৌলিক—আদি ও আদিম, প্র
বিগ্রহ। আর যে জগৎ হইতে এই সকল মানুষকে শেক্সপীয়র তুলিয়া আনিয়া দাঁড়
তাহাও মনে হয় যেন ঐ রকমই একটা ঘোর প্রাকৃত প্রকৃতির দেশ—উপনিষদ যাহাকে
"অন্ধং তমঃ", সেই রকমই একটা তামস-রাজ্য। 'রাজা লিয়র', 'মাকবেথ', 'ওথেলো',
'হামলেট' পর্য্যন্ত, কোনটিই আধুনিক সমাজের, সভ্যজগতের, শিক্ষিত দীক্ষিত মানুষের
কোন তামস যুগের, কোন পুরাতন জগতের কোণে কোণে কোথায় ছিল যে একটা
তাহাই হইতেছে এই সকল নাট্যের রঙ্গভূমি। এই রকম পটের আশ্রয় শেক্সপীয়র
করিয়া বাছিয়া বাছিয়া গ্রহণ করিয়াছেন কামলোকের—মৃত্যুর জগতে সত্যকে ফলাইবার
উদ্দেশ্যে। লিয়র, মাকবেথ, ওথেলো, হামলেট প্রত্যেকেই এক একটা তামসশক্তির
হাতের ক্রীড়নক। আর এই ঘন তমোরাশির অভ্যন্তরে যে আলোরেখা নিহিত,
ফাঁকে ফাঁকে যে অমৃতের ধারা প্রবাহিত তাহারই প্রতীক যেন ঐ করুণ-মধুর
(ফ্লেয়ান্স ?), ডেস্‌ডিমোনা, ওফেলিয়া।

ট্রাজেডির আর একরূপ আমরা দেখি গ্রীক সাহিত্যে। ইংরেজ জাতি—বিশেষতঃ রাণী
এলিজাবেথের সময়ের ইংরাজ জাতি, যে নিছক প্রাণশক্তির প্রতিমূর্ত্তি তাহা বলিলে অত্যুক্তি
হইবে না। বাহিরের জীবনে একটা বিপুল কর্ম্মৈষণা, ভোগৈষণা এ যুগে জাতিটিকে যেন
পাইয়া বসিয়াছিল। তাহারই ফলে কত লোক সমুদ্র পাড়ি দিল, দেশ দেশান্তরে ছুটিয়া চলিল,
কত রোমান্স সৃষ্টি করিল। এই তীব্র জীবনীশক্তির যে রস-লীলা সাহিত্যে তাহাই ফুটিয়া
উঠিয়াছে শেক্সপীয়রের ট্রাজেডিতে। প্রাণশক্তির, কামলোকের যে লীলা তাহা মানুষের আদি ও
অকৃত্রিম প্রকৃতির লীলা—শেক্সপীয়র তাহারই সত্য ও সৌন্দর্য্য চিত্রিত করিয়া ধরিয়াছেন। কিন্তু
তাঁর প্রকৃতি ছিল ভিন্ন রকমের। একটা সুদৃঢ় চিন্তাশক্তি, একটা মার্জ্জিত বুদ্ধি গ্রীকের চিত্তকে
গড়িয়া তুলিয়াছিল, তাহার প্রাণশক্তির মধ্যে একটা সংযম ও প্রসাদগুণ আনিয়া দিয়াছিল।
সে-সাতিন শিক্ষা দীক্ষায় পরিপুষ্ট ফরাসীর কাছে তাই শেক্সপীয়র অতিমাত্র উগ্র ও ঝাঁঝাল
বোধ হয়।—ভলতেয়ার (Voltaire) তাই barbarous Shakespeare, অসভ্য সেক্সপীয়র
বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। গ্রীক ট্রাজেডিতে প্রাকৃত মানুষের নগ্ন প্রকৃতির অবাধ উত্তাল খেলা
দেখিয়া দেখান হয় নাই—তাহার সাথে মিশাইয়া দেওয়া হইয়াছে মানুষের উচ্চতর প্রকৃতির একটা
সুর, আদর্শপ্রিয়তার একটা রেশ। এস্‌কিল'এর প্রমাথী অথবা সফোকলা'র আন্তিগোণীতে
ট্রাজেডি ফুটিয়া উঠিয়াছে কামনার সহিত কামনার সংঘর্ষে নয়, কিন্তু আদর্শের সহিত কামনার
সংঘর্ষে—অর্থাৎ প্রাণাবেগের সহিত প্রাণাবেগের সংঘাতে নয় কিন্তু প্রাণাবেগের সহিত মনোবেগের
সংঘাতে। এমনকি ইউরিপিদ'এর মিদিয়া যতই বিপুল প্রাণাবেগের উচ্ছ্বাসে—ঈর্ষা, পাশব
নিষ্ঠুরতায় ভরপূর থাকুক না কেন, তবুও তাহারই মধ্যে লুক্কায়িত আছে একটা অপরূপ মাতৃ-
স্নেহের ধারা (সে মাতৃস্নেহ প্রকট যদিও একটা ক্রূরতার, বীভৎসতার রূপে)। বাহ্য ঘটনার
দিক দিয়া যাহাই হউক না কেন, গ্রীক ট্রাজেডির ভঙ্গীর মধ্যে পাই অন্ততঃ চিন্তাশক্তির,
বুদ্ধিবৃত্তির, শীলতার, প্রসাদগুণের পিছন টান। কিন্তু তবুও মার্জ্জিত মনন, উন্নতমস্তিষ্ক মোটের উপরে
কখনও মানুষের কামধর্ম্মকে পরিবর্ত্তন করিতে পারে না; বড় জোর তাহাকে দেখায় একটা
নূতন ক্ষেত্রে বা ভঙ্গীতে, তাহার সাথে যোগ করিয়া দেয় মানুষের উপরের স্তরের একটা প্রতিধ্বনি,
একটা ক্ষীণ রশ্মি। আর ইহাতে ট্রাজেডির স্বরূপ কিছু বদলায় না, রূপ বা ভেল যদিই বা কিছু
বদলায়। মনের টান সব এখানে প্রাণের বুভুক্ষারই কেবল খোরাক জোগায়। যমরাজা এখানে এক
পা রাখিয়াছেন প্রাণের জগতে, আর এক পা রাখিয়াছেন মনের জগতে, এবং উভয় জগৎই নিজের
কবলে গ্রাস করিয়াছেন। গ্রীক ট্রাজেডি তাই কম ট্রাজিক নয়—কামলোকের মৃত্যুর জগতের
যে লক্ষণ আমরা পূর্ব্বে দিয়াছি তাহা কিছু তীব্রভাবে এখানে দেখা দেয় নাই। মার্জ্জিত মনের
এমন শক্তি নাই যে প্রাণশক্তির অব্যর্থ পরিণামকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে।

ইহা সম্ভব কেবল তখনই যখন মানুষ আরও উপরে উঠিয়া যায় এমন একটা স্থিতি, অন্তরাত্মার

এমন একটা স্বভাব, যেখানে অন্তরের, খণ্ডের দৃষ্টি ও অনুভূতি নাই, আছে সমগ্রের শান্তনিবিড় দৃষ্টি ও অনুভূতি। সীমা সেখানে সসীম হইয়া আর দেখা দেয় না বিশ্বে হয় একটা পূর্ণতারই অঙ্গীভূত হইয়া। আর সেখানে শাশ্বতকে কাটিয়া না, শাশ্বতেরই মধ্যে তাহা যায় মিলিয়া মিশিয়া। বর্ত্তমানের অনুভূতি সেখানে একান্ত বর্ত্তমানে আবদ্ধ থাকে না, তাহা থাকে তিনকাল—এমন কি হয়ত কালাতিরিক্ত কিছুকে ব্যাপ্ত তাই বাসনা প্রাণের টানা স্রোতের মধ্যে গণ্ডী টানিয়া টানিয়া দুঃখের বেদনার ঘূর্ণিপাক করে না, করিলেও ইহাদিগকে কাটাইয়া অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়। কামনা শুধু পর্য্যবসিত হয় না। ট্রাজেডির অনুভূতি তাই আর ফলিয়া উঠিতে পারে না।

প্রাচীন ভারত অন্তরাত্মায় এই রকম একটা ব্রাহ্মীস্থিতি পাইয়াছিল। তাহার প্রাণময় কোষেই একান্ত আবদ্ধ ছিল না—এমনকি মনকেও সে অতিক্রম করিয়া তাহার সত্তার স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠা ছিল আর একটা সমুচ্চ লোকে। ভারতের ঋষি সত্যকে অধিগত করিয়াছিলেন, তাহাই ভারতীয় শিক্ষা-দীক্ষার মূলে, তাঁহাদের ছিল বিশিষ্ট কবি-দৃষ্টি তাহারই ছাপ, তাহারই রেশ বরাবর চলিয়া আসিয়াছে পরবর্ত্তী সকল সৃষ্টির মধ্যে। ঋষিরা—আদি কবিরা—তাঁহাদের সেই সমুচ্চলোকের সমুচ্চধর্ম্মের প্রাণমনকে—অজ্ঞানের কামনার খেলাকে একটা পূর্ণতর অভিজ্ঞতার মধ্যে তুলিয়া ধরিয়াছিল মৃত্যুকে দিয়া অমৃতের দুয়ারেই গিয়া পৌঁছিয়াছিলেন—মৃত্যুং তীর্ত্বা অমৃতং অশ্নুতে। ধাতের জন্যই নিছক ট্রাজেডি ভারতে জন্মগ্রহণ করে নাই। কামলোকের বুভুক্ষার ভারতের অন্তরাত্মা পাইয়াছিল চিন্ময় লোকের আনন্দ। বুভুক্ষার প্রয়াস হইতেছে এই আনন্দকে ক্ষুদ্রের ক্ষণিকের মধ্যে ভরিয়া বাঁধিয়া রাখা। তাই সে আনন্দ ঘোলা হইয়া উঠে এবং এই ঘোলা কটু আনন্দই ট্রাজেডির রস।

পাশ্চাত্যের এক মহামনীষী (আরিস্ততল) অবশ্য বলিতেছেন যে ট্রাজেডির ফল যে তাহার রসভোগে কামনার আবেগ বিশুদ্ধ হইয়া উঠে। একটা বিপুল দুঃখের শ্রোতার হৃদয়ে জাগাইয়া ধরে সহানুভূতি, করুণা, নিবিড় উদার এক সরসতা। মনের কল্পনায় আমাদের কামনার তৃপ্তি ঘটাইয়া বাস্তব কামনার বেগকে সংযত ও শীলবান তোলে। কিন্তু এরূপ করিলেও, ট্রাজেডি যে হৃদয়ে একটা বেদনার, একটা শেষ রেশ রাখিয়া যায় তাও কামলোকেরই কথা। অন্তরাত্মা কি মৃত্যুর মধ্যে অমৃতত্বের খোঁজ মৃত্যুর ওপারে বিশুদ্ধ অমৃতত্বের খোঁজ দেয় না? ট্রাজেডি হইতেছে মানসলোকে ভোগ, কিন্তু অমৃতের লোকে অমৃতের ভোগ আর এক জিনিষ।

ট্রাজেডির আছে একটা সত্য, একটা সৌন্দর্য্য, একটা আনন্দই। শেক্সপীয়র পূর্ণস্বরূপ দেখাইয়াছেন, সোফোকলাও ইহাকেই তাঁহার জগতের প্রতিষ্ঠা করিয়া

ইহাকে একান্ত করিয়া ধরিতে পারে নাই। ভারতের প্রাণশক্তি একটা আধ্যাত্মিক আনন্দে বিকৃত ছিল, তাই ট্রেজেডি সেখানে "কমেদিয়া"রই" (Comœdia) বিচ্ছেদ মিলনেরই একটা ইতিমধ্যেকার অঙ্গরূপে গৃহীত হইয়াছিল। ভারতের কাব্যে করুণ রস যাহা হইয়াছিল পরিণামে হাসির মাধুর্য্য ফুটাইয়া তুলিবার জন্য। কারণ ভারত সত্য সত্যই বুঝিয়াছিল যে—

তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে
যতদূরে আমি যাই
কোথাও দুঃখ কোথাও মৃত্যু
কোথাও বিচ্ছেদ নাই।

ইউরোপীয় কবির কবিত্বের উৎস Saddests thoughts of sweet melancholy হইতে পারে, কারণ ইউরোপের কবি প্রাণময় স্তরের দ্রষ্টা ও ভোক্তা। ভারতীয় কবির কবিত্বের উৎস হইতেছে, বৈদিক ঋষির কথায় 'সুনৃত' অর্থাৎ হ্লাদকর সত্য। ফলতঃ বৈদিক ঋষি, উপনিষদের ঋষি অন্তরাত্মায় যে পূর্ণ আনন্দ ও হাস্য লইয়া অপরূপ কবিতা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার তুলনা কোথাও মিলে না। প্রাণময় স্তরের হাসি হইতেছে কান্নারই ভেল, রকমফের। তাই কান্নার সঙ্গীত এত মধুর এত তীব্র, কারণ মানুষের অন্তরের পুরুষ স্বভাবতই এই প্রাণময় স্তরের অধিবাসী। কিন্তু আমাদের ঋষি কবিরা এমন একটা স্তরে উঠিয়া গিয়াছিলেন, তাহাকে এমন জীবন্তভাবে অনুভব করিয়াছিলেন ও প্রাণের ভোগকে পর্য্যন্ত সেই রঙে রঙাইতে পারিয়াছিলেন যে সেখানে বিশুদ্ধ আনন্দ, হর্ষই চরম সত্যবোধের, সুতরাং পরম কবিত্বের সুর দিয়া দিয়াছে—

যত্রানন্দাশ্চ মোদাশ্চ মুদঃ প্রমুদ আসতে।
কামস্য যত্রাপ্তাঃ কামাস্তত্র মামমৃতং কৃধী—

—যেখানে রহিয়াছে সকল আনন্দ, সকল মোদ আমোদ প্রমোদ—যেখানে সকল কামনার কামনা পরিতৃপ্ত সেইখানে লইয়া গিয়া আমাকে অমৃতময় করিয়া ধর।

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

শেষ

সমীরণের পরেই বহে দমকা হাওয়া,
হাসির মেলার পরেই আসে কাঁদিয়ে যাওয়া।

KONNAGAR PUBL... Estd. 18...

গোষ্ঠ-বিহার

আজু [illegible] মাহা অদভুত খেলন
পক্ষ কয়ল দোন' ভাই,
দুহুঁ দল খেলব যো দল জীতব
চঢ়ব কান্ধপর যাই।
রে মধুমঙ্গল! দাম! সুদামক!
রহ রহ পক্ষ হমারি।
কর ধরি রাম বোলায়ত নিজদলে
পদযুগ বেঢ়ি মুরারি॥
হরি! হরি! কি কহব ইহ অপরূপ!
গোপশিশুক পদ ধরয়ি মিনতি করু
সো জগ মণ্ডল ভূপ।ধ্রু।
পরিহরি রাম বচন নিরবন্ধন
হরি দলে বিহরে সুদাম।
দাম পুন ও-দল যাই পরবেশল
কর নহি তেজল রাম।
বিবিধ জাতি বহু কেলি সুপণ্ডিত
নন্দ নন্দন বনমালী।
অদভুত চাতুরী করই পহুঁ বিহরই
সব শিশু দেই করতালি।
শীতল পবন মন্দ তনু পরশন
চৌদিশ কুসুম সুগন্ধ।
সবহুঁ সখাগণ সহিত সুখে ফিরত
ব্রজ-কুল-জলনিধি-চন্দ॥
ক্ষণে দ্রুত ধাবন ক্ষণে উল্লম্ফন
বহুবিধ ভঙ্গী-বিলাস।
আয়ত কমল পলাশ দৃগঞ্চলে
বিলসত মধুরিম হাস॥
ও তনু তরুণ তমাল তরুজীতল
শ্যামল স্নিগধ সুঠাম।
চিরতরে ডুবল অকূল রূপসাগরে
কৃষ্ণদাসী মন-প্রাণ॥

শ্রীসুশীলায়ন

ভুতের কাহিনী

এক

বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, কিন্তু ভাগ্য-দুর্ব্বিপাকে এই বয়সেই দাঁতগুলি সব পড়িয়া গিয়াছিল বলিয়া সকলেই তাহাকে 'ফোক্‌লা হরি' বলিয়া ডাকিত। একাধিক্রমে উনিশ বৎসর ধরিয়া লোহার কারখানায় কেরানীগিরি করিয়া, অফিস মাষ্টারের লাথিজুতা খাইয়া, তোষামোদি করিয়া, তাহার [illegible]টা হইয়া গিয়াছিল অ-মানুষিক। যখন-তখন যার-তার নামে নালিশ করিয়া ফোক্‌লা [illegible] একদিকে যেমন সাহেবের প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল, অন্যদিকে সহকর্ম্মী বন্ধুগণ তেম্‌নি ঘৃণায় [illegible]য়ে তাহার পাশ ঘেঁসিত না। তবে, একটা ছোক্‌রা ছিল, যাহাকে বাধ্য হইয়া সর্ব্বক্ষণ তাহার [illegible]াকিতে হইত। সে তাহারই শ্যালক,—পরেশ। নিতান্ত নিরীহ গো-বেচারী। বয়স [illegible] কি আঠারো,—শরীরে অপরিমিত ক্ষমতা, কিন্তু নিরক্ষর। নিরক্ষর হইলেও, পিতৃদত্ত [illegible] চল্লিশেক জমির উৎপন্ন ফসল হইতে তাহার একটা পেট বেশ ভাল করিয়াই চলিতে পারিত, [illegible] আর নাই চলুক্, একদা হরিহর বলিল,—চল্ পরেশ আমার সঙ্গে, কারখানায় একটা চাক্‌রী বাক্‌রি কর্‌বি চল্। এমন ভাবে বসে' থাক্‌লে আর চল্‌বে না।.....তুই ত বিধবা মেয়ে ন'স্ যে ঘরে বসে' ভাত মার্‌বি।.....

দিদির যখন বিবাহ হয়, পরেশ তখন নিতান্ত ছেলে মানুষ। এবং সেই অবধি হরিহর তাহার উপর অভিভাবকত্ব করিতেছে। কাজেই কথাটার কোনরূপ প্রতিবাদ না করিয়া একটা নূতন জীবনের মোহে, নূতন দেশ দেখিবার আশায়, পরেশ তাহার সহিত কারখানায় আসিল।

এত বড় লোহার কারখানা, এত সব কল-কব্জা, এত বড় অফিস, এত বাবু, এত সাহেব-মেম্ সে জীবনে কোনদিন দেখে নাই, তাই এ নূতন স্থানে আসিয়া প্রথমে দিনকতক সে নির্ব্বাক বিস্ময়ে এই-সব দেখিতে লাগিল। কিন্তু বসিয়া বসিয়া অনর্থক 'মেসের' ভাত ধ্বংস করিয়া এ-সব দেখাইবার জন্য হরিহর তাহাকে আনে নাই। তিন দিনের দিন, ঢালাই-খানার বড় মিস্ত্রির নিকট পরেশ চাক্‌রীতে নিযুক্ত হইল।.....'ফার্‌নেস্' হইতে অগ্নি শিখার মত তপ্ত কাঞ্চন বর্ণের গলিত লৌহ গড়াইয়া আসিত; মিস্ত্রির আদেশমত কুলি মজুরেরা বড় বড় কটাহে তাহা ধরিয়া লইয়া, বালির ছাঁচে ঢালিয়া দিত। পরেশকে সেই সব কুলি মজুরদের সঙ্গে খাটিতে হইত। কর্ম্মশেষে প্রতিদিন দশ আনা 'হাজিরা' মিলিত।

প্রত্যেকটি কাজে নিয়ম শৃঙ্খলা বজায় রাখিয়া ধীরে সুস্থিরে কাজ করা প্রথমতঃ এই উচ্ছৃঙ্খল পল্লী-যুবকের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব হইয়াই উঠিয়াছিল, ক্রমে মিস্ত্রি ও সাহেবের মার খাইয়া কাজটা তাহার করায়ত্ত হইয়া উঠিল।

.....সেদিন শীতের সন্ধ্যা! গায়ে গরম কাপড় জড়াইয়া ফোক্‌লা হরি কাঁপিতে কাঁপিতে

অফিস হইতে 'মেসে' ফিরিয়া [illegible], পরেশ তালাবন্ধ দরজার বাহিরে [illegible] কাঁপিতেছে। অগ্নিজ্বালাময় কা[illegible]খানার মধ্যে কাজ করিত বলিয়া দিনের বেলা [illegible] কাপড়ের প্রয়োজন হইত না। [illegible] সর্ব্বাঙ্গে কালি মাখা। হাত-পা পরিষ্কার করিবার নিমিত্ত কারখানা হইতে যে সাবানের [illegible] পাইত, তাহাও আবার হরিহরের জামা-কাপড় পরিষ্কার করিতেই ফুরাইয়া যাইত। [illegible] সরকারী কলের জলে পরেশের অঙ্গের মলিনত্ব ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছিল।

পরেশ এত সকালে চলিয়া আসিয়াছে দেখিয়া হরিহর উত্তেজিতকণ্ঠে কহিল, আগেই চলে' এসেছিস্ ?

—কাল রাতের বেলা খেটেছিলুম।

হরিহর তালা খুলিবার জন্য অগ্রসর হইতেই পরেশ সসম্ভ্রমে উঠিয়া [illegible] দাঁড়াইল।—কাল রেতে খেটেছিলি ত' আজ কি বটে শুয়ার ?

ধীরে ধীরে পরেশ বলিল, গা'টা কেমন কর্‌ছে।

মুখবিকৃতি করিয়া হরিহর কহিল, এঃ, বলে কি না গা'টা কেমন কর্‌ছে! [illegible] তাই কালী হয়ে গেল হতভাগার !.....দে, কত পেয়েচিস্ দে। বলিয়া হরিহর হাত [illegible]

ট্যাঁক্ হইতে দিনের রোজগার একটি আধুলি বাহির করিয়া হরিহরের হাতে দি[illegible] বলিল, আট আনা।

আধুলিটা পকেটে ফেলিয়া দিয়া ঘরের ভিতর তক্তাপোষের উপর বসি[illegible] নে, তামাক সাজ্।

পরেশ তামাক সাজিতে বসিলে হরিহর কহিল, 'ওভার্-টাইমে' খাট্‌তে যাবি ত' ক'টা বাজ্‌লো এখন ?

—আজ আর যাব না মনে করেছি। বলিয়া হুঁকাটা তাহার হাতের নিকট ধরিয়া দি[illegible]

হরিহর হুঁকাটা হাতে লইয়া, টানিতে টানিতে বলিল, যাবি না ?.....তবে হ[illegible] খোরাক্ বন্ধ.....খাবি কি ?.....দাঁড়া, ঠাকুরকে বলে' দি !.....ঠাকুর ! অ ঠাকুর !....

ঠাকুরের সাড়া শব্দ না পাইয়া হরিহর বলিল, ডাক্ ঠাকুরকে।

পরেশের আহারের নিমিত্ত ঠাকুরের নিকট 'পেট্-ঠিকা' বন্দোবস্ত হইয়াছি[illegible] ছয়টার পর রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত পরেশ উপরি খাটিয়া যাহা রোজগার করিত' তাহা [illegible] সাতটি টাকা ঠাকুর পাইত। তাহার পরিবর্ত্তে ঠিক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে ভাত, ডা[illegible] পরেশকে দেওয়া হইত,—একবারের বেশী চাহিলে পাইবার হুকুম ছিল না। তাহাতে [illegible] আর নাই ভরুক একবেলা না খাইলে ছয়টি পয়সা ফের ত।

[illegible] তস্করকারী কুটিতেছিল। লোকটা পরেশের [illegible] দেখিয়া তাহাকে একটু স্নেহ করিত।

[illegible], ডাক্‌ছে তোমাকে।

—কে ?

পরেশ কাতরকণ্ঠে কহিল, জামাই-বাবু।

—কেন রে ?

নিজের আহার বন্ধ করিবার জন্য সে যে নিজেই তাহাকে ডাকিতে আসিয়াছে, এ কথাটা [illegible] মুখ দিয়া বাহির হইল না। এরূপ ঘটনা প্রায় নিত্য নৈমিত্তিক। কাজেই পরেশের [illegible] ক্রতারাক্রান্ত চোখ-মুখের দিকে নজর পড়িতেই ঠাকুর সমস্তই বুঝিল। বলিল, আজও [illegible]?.....তোর ভাব্‌না নাই পরেশ, আমি খেতে দিব তোকে, চল্।

ঠাকুর উঠিয়া হরিহরের নিকট গিয়া বলিল, কি বল্‌ছিলেন হরিবাবু ?

হরিহর অন্যমনস্ক হইয়াছিল, বলিল না কিছু বলি নাই। যাও।

ঠাকুর চলিয়া গেলে, পরেশকে ইসারা করিয়া হরিহর বলিল, শোন্!

[illegible]প্রতার সহিত পকেট হইতে তাহারই রোজ গারের আধুলিটি বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিল, যা, তোকে করিমগঞ্জে যেতে হবে একবার। গাঁজা ফুরিয়ে গেছে,—একদম্ নেই। যা, যা, দৌড়ে যা,—আর থামিস্ না।...এই শীতের রাত, না পেলে সব্বনাশ হবে।

করিমগঞ্জ সেখান হইতে দুই ক্রোশের কম নয়। এই প্রচণ্ড শীতের অন্ধকার রাত্রে উন্মুক্ত মাঠের উপর দিয়া একটা শতচ্ছিন্ন গেঞ্জি গায়ে, কেমন করিয়া যাইবে, আর আসিবেই বা কেমন করিয়া ?.....কিন্তু সে ভাবনা ভাবিবার অবসর ছিল না।

বাহিরে বিরাট অন্ধকার তাল পাকাইয়া উঠিতেছিল। পরেশ ঘরের কোণ হইতে হ্যারিকেন্ লণ্ঠনটা তুলিয়া লইতে যাইবে, এমন সময় হরিহর চীৎকার করিয়া উঠিল, বাঃ, লণ্ঠন নিয়ে যাবি, আর আমি অন্ধকারে জুপু বুড়ীর মতন বসে' থাক্‌ব বুঝি ?...ভূতের আবার জনম্ মাস্! লণ্ঠন দরকার নাই, এম্‌নি যা। সোজা রাস্তা।...যা, যা, শীগ্‌গির যা বাপু!

পরেশ কাঁপিতে কাঁপিতে বাহির হইয়া গেল।.....

দুই

ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে পরেশ করিমগঞ্জ হইতে ফিরিয়া দেখিল, মেসের বাবুরা সকলে খাইতে বসিয়াছে। একমাত্র হরিহর বাকি। পরেশের আগমন প্রতীক্ষায় সে উদ্‌গ্রীব হইয়া সর্ব্বাঙ্গে কাপড় জড়াইয়া বিছানার একপাশে চুপ্‌টি করিয়া বসিয়াছিল।

পরেশ ঘরে ঢুকিতেই আগ্রহাতিশয্যে বিছানা হইতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পরেশের হাত হইতে গাঁজার পোঁট্‌লাটা লইয়া বলিল, দেখি, বেটারা তোকে বোকা ঠাউরে' ফাঁকি দিয়েছে, না ঠিক্ ঠিক ওজন করেছে। বলিয়া হরিহর অত্যন্ত মনযোগের সহিত বস্তুটা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে, কতকটা [illegible] বামহস্তে রাখিয়া বাকীটুকু অতি যত্ন সহকারে
হরিহর বলিল, ছাখ্ ত' পরেশ, ওই পুরাণা জুতো জোড়াটার ভিতর একটা
আছে। দে ত'।

পরেশ কলিকাটি আনিয়া তাহার হাতে দিল। গাঁজাটা কিয়ৎক্ষণ উভয় হস্তে মর্দন
হরিহর কলিকায় চড়াইল। টিকা ধরাইয়া তাহাতে আগুন দিয়া বলিল, দরজাটা বন্ধ
বাইরে দাঁড়া।

দরজা বন্ধ করিয়া পরেশ বাহিরে চলিয়া গেলে, হরিহর তাহার উভয় হস্ত
করিয়া এক অদ্ভুত কৌশলে ছোট কলিকাটি ধরিয়া, প্রাণপণে কয়েকদম টানিয়া, পুনঃ
লুকাইয়া রাখিল। ডাকিল পরেশ! ঠাকুরকে আমার ভাত দিতে বল্ ত' এবার।

কিয়ৎক্ষণ পরে, পরেশ আসিয়া জানাইল, ঠাকুর ভাত দিয়েছে, আপনি যান।

হরিহরের বেশ নেশা জমিয়াছিল। খড়ম্ জোড়াটা পায়ে দিতে দিতে বলিল,
যে বাবা, চিরদিনের অভ্যেস্,—একটান্ না টান্‌লে কি আর খিদে' পায়!

থালা অভাবে পরেশকে সকলের শেষে খাইতে হইত। হরিহর চলিয়া
শূন্য ঘরটায় একাকী বসিয়া বসিয়া পরেশ নিজ দুরদৃষ্টের কথা ভাবিতে লাগিল।

পরেশের খাওয়া শেষ হইতে না হইতে হরিহর ডাকিল, পরেশ, অ পরেশ!...
পর্‌শাটা এখনও করছে কী? তার কি ভাত খাওয়া আজ আর শেষ হবে না, না কি?

—এই যে, হয়ে গেছে। বলিয়া, পরেশ যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতার সহিত আহারাদি শে
তাহার কাছে গিয়া বলিল, কি জন্যে ডাক্‌ছিলেন?

হরিহর বলিল, আমি ভুলে' গিয়েছিলাম,—কাল ত' শনিবার? বাড়ী যেতে
কাপড়-চোপড়্ গুলো ময়লার একশেষ। কল্‌তলায় বসে' বসে' একটুখানি পরিষ্কা
দিতে পার্‌বি না?

অপরিষ্কার তিন খানা কাপড় ও খান্‌দুএক্ জামা হাতে লইয়া পরেশ কলতলার দি
গেল।.....কেন পারিবে না! সবই যখন পারিতেছে, তখন একটুখানির জন্য আর বল্‌
তাহার ইচ্ছা হইল না।

পরেশ কলতলায় বসিয়া কাপড় জামায় সাবান দিতে দিতে দেখিল, মেসের
একে-একে সকলেই বন্ধ করিল। আলো নিবিল। সম্মুখের ঘরে জনকয়েক অফিসে
আহারাদির পর হাসি তামাসা গল্প গুজব এবং চীৎকার করিতেছিল, তাহারাও চুপ করি
একে বিছানায় শুইয়া পড়িল। বামুন-ঠাকুর ও ঝি, লণ্ঠন হাতে লইয়া বাহির
যাইবার সময় ঠাকুর বলিল, সদর দরজাটা বন্ধ করিস্ পরেশ,.....আ, তুই শালার
রাত দুপুরে কাপড় কেচে' মর্‌ছিস্।

[illegible] কনকনে বাতাস পরেশের অঙ্গে তীক্ষ্ণ [illegible] বিঁধিতেছিল। ঠাণ্ডাজলে তাহার হাত
[illegible]ই যত আড়ষ্ট হইয়া পড়িতেছিল, সে তত বেশী [illegible] সঞ্চয় করিয়া প্রাণপণে খদ্দরের
[illegible] কাচিতে আরম্ভ করিল। ইস্! কাপড়টা [illegible]খড়্ মোটা! তাহাকে কষ্ট দিবার
জন্যই বুঝি এ কাপড় কেনা হইয়াছে! পরেশ শুনিয়াছিল, বিলাতি সাহেবদের অত্যাচার হইতে
পরিত্রাণ পাইবার জন্যই নাকি এ-সব জিনিসের আমদানি হইয়াছে। মোটা খদ্দরের কাপড় পরিয়া
তাহাদিগকে যে কিরূপে জব্দ করা যাইবে, সে সবের ইতিহাস তাহাকে কেহ ভাল করিয়া বুঝাইয়া
[illegible]। না বুঝাক্। সে সব বড় বড় বাহিরের খবর রাখিতে সে তত বেশী উৎসুক ছিল না,
তবে একথাটা তাহার অনুক্ষণ মনে হইত, যে, পৃথিবীতে কি এমন কোন ব্যক্তি নাই, যে তাহার
একান্ত আত্মীয়ের অত্যাচার নিবারণ করিয়া দিতে পারে!.....দূরে প্রকাণ্ড চিম্‌নিগুলা হইতে
[illegible]ভ ধূম নির্গত হইতেছিল। পরেশ একবার আকাশের দিকে চাহিল। মাথার উপরের
[illegible] তারায় তারায় ভরাট্ হইয়া আছে!.....এই দুরন্ত শীতের দিনে সে যদি আজ এই
[illegible]-শীতল জলের সঙ্গে প্রাণপণে লড়াই না করিয়া কারখানায় যাইত, তাহা হইলেও বা রক্ষা
[illegible]। সেখানে জলের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই,—চারিদিকে শুধু আগুন ও বিদ্যুতের খেলা! এখন
যাহারা সেখানে খাটিতেছে তাহারা হয়ত' গরমে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া উঠিতেছে। গলিত লৌহের
অগ্নি-উত্তাপ ভেদ করিয়া সেখানে শীত প্রবেশ করিতে পারে না।.....না, না,—সে কাহাকেও
কিছু না জানাইয়া একদিন পলাইয়া যাইবে। কোন দূরদেশে বরং মাটি কাটিয়া খাইবে সেও ভালো,
তবু আর এ নির্ম্মম অত্যাচার সহ্য হয় না। এরূপ হিতৈষী আত্মীয়-স্বজন থাকার চেয়ে না
থাকাই ভালো!.....

তিন

সোমবার প্রাতে হরিহর বাড়ী হইতে ফিরিয়া দেখিল, পরেশ শয্যাগত। কারণ
জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, তাহার রক্তআমাশয় হইয়াছে।

হরিহর বলিল, কিছু খাস্‌নে, উপোস্ দে দিন্ কতক্। আপ্‌নিই সেরে যাবে।

কিন্তু, সারিয়া যাওয়া দূরে থাকুক্, রোগটা ক্রমশই বাড়িয়া চলিতে লাগিল। পাঁচ ছয়
দিন পরে হরিহর বলিল, যা পরেশ, তুই বাড়ী যা। এমুন করে' তোর থাকা চল্‌বে না।
তোর পেছনে একটা লোক আমি আর রাখ্‌তে পার্‌ব না বাপু!

পরেশের শরীরটা এই কয়দিনেই এত বেশী দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে বিছানা ছাড়িয়া
একটু উঠিয়া গেলেই তাহার মাথা ঘুরিতেছিল। সেদিন সন্ধ্যার ট্রেণে হরিহর তাহাকে একখানা
টিকিট কিনিয়া দিয়া ট্রেণে চড়াইয়া দিল। বলিল, ঘরে গিয়ে চুরি-টুরি করে' কিছু খাস্‌নে যেন
পরেশ! একদম্ উপোস্ দিবি, বুঝ্‌লি?

হাঁ, না, কিছু না বলিয়া, পরেশ শুধু ঘাড় নাড়িয়া কি একটা উত্তর দিল, বুঝা গেল না।

গাড়ীটা যখন ষ্টেশনের প... ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া সশব্দে তাহাদেরই... ছুটিতেছিল, তখন পরেশ যে কি... আকাঙ্খা লইয়া, সেই অসংখ্য যাত্রীর মাঝে, ... ঘেঁসিয়া চুপ্‌টি করিয়া বসিয়াছিল, তাহা একমাত্র সেই জানে!

অতিকষ্টে পথ হাঁটিয়া কঙ্কালসার পরেশ যখন বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল, তখন রাত্রি প্রভাত হইয়াছে!

দিদি ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল, তুই হতভাগা এমন অসুখ নিয়ে এখানে কি জন্যে এলি? সেখানে ডাক্তার ছিল, কব্‌রেজ্‌ ছিল,—বাবু কত যত্ন করতো—!

পরেশের বড় রাগ হইল, ক্ষীণ-কণ্ঠে বলিল, বেশ করলাম, তোর কি?

.....পর সপ্তাহে হরিহর বাড়ী আসিয়া দেখিল, পরেশের ব্যারাম তখনও ... অধিকন্তু হাত-পা গুলা ফুলিয়া উঠিয়াছে!

যাইবার সময় স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিল, ভাইকে ভালোবেসে, ভাল-মন্দ কিছু খাওয়া... মর্‌বে তাহ'লে।

সে বলিল,—আ ম'লো যা, ভাল-মন্দ খাওয়াবার সময়টি বেশ। বলে, নিজের ... নিয়েই চব্বিশঘণ্টা অস্থির।.....দুটো মুড়ি খেতে দি, তাও আবার রাগ করে' কোনদিন খা, কোনদিন খায় না।.....ওকে একবার ডাক্তার দেখালে হতো না? হ্যাঁগা?.....

—ধ্যেৎ! ডাক্তার না আরোকিছু! সামান্য অসুখ, তার জন্যে আবার দশ-বিশ্‌ টাকা ভা... বলিয়া, হরিহর পুনরায় কর্ম্মস্থানে চলিয়া গেল।

* * *

তিন চার দিন পরে, একদা অপরাহ্নে, দেশ হইতে হরিহরের জ্যেষ্ঠ পুত্র কমল, হঠা... পিতার মেসে গিয়া উপস্থিত হইল!

রাত্রে ছেলেকে লইয়া হরিহর খাইতে বসিয়াছিল। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিল, এটি কে হরিবাবু...

—আমার ছেলে হে!.....বেশ ভাল করে' মাছ-টাছ দাও ওকে। বরং কিছু বেশী লাগে... আমি দিব না-হয়।

বেশ। বলিয়া ঠাকুর ফিরিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আজ... পরেশ যে অসুখ নিয়ে বাড়ী গিয়েছিল, কেমন আছে?

হরিহর বলিল, শুন্‌ছি ত' কাল রাত্রে সে হয়ে গেছে। আ-র বাঁচে,—যে খাবার ধুম!.... আবার একথা কখনও শুনেছ ঠাকুর, ওই রোগা মানুষটাকে পোড়াতে দশ মন কয়লা আর একগাড়ী কাঠ খরচ হয়? যারা শ্মশানে গিয়েছিল, তারা শুন্‌ছি আজ সকালে ফিরেছে!.....উঃ! ওটা কি আর ছাই মানুষ ছিল্‌ হে? একটা ভূত—ভূত! কোথাকার ভূত এসে' জন্মেছিল আর-কি!

শ্রীশৈলজা মুখোপাধ্যায়

বন্দী-জীবন

দ্বিতীয় খণ্ড—পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বর্ম্মার কথা

ভারতবাসীর চেষ্টায় ব্রহ্মদেশে যে সকল বিপ্লব প্রচেষ্টা হইয়াছিল তাহারও বহু পূর্ব্ব ... স্বাধীনতা-প্রয়াসী বর্ম্মিরাও বহুবার বিপ্লবের আয়োজন করিয়াছিলেন। আণ্ডামানেও ... রাজনৈতিক অপরাধে দণ্ডিত বহু বর্ম্মি ছিলেন। যুদ্ধাবসানের পরই তাঁহাদের প্রায় ... ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তবে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট এই সকল বিপ্লব চেষ্টাকে ভয়ের ... দেখেন নাই। বোধহয় তাহার কারণ এই যে, এই সব বিপ্লবান্দোলন এক সর্ব্বব্যাপক জাতীয় ... প্রাণের কূল-প্রসূত ছিল না বলিয়া ইহা তেমন শক্তিশালী হইতে পারে নাই। কিন্তু ভারতীয় ... চেষ্টায় এই ব্রহ্মদেশেও অতি নিবিড়ভাবেই বিপ্লবায়োজন হইয়াছিল। Rowlatt Report এ আছে "Burma has not been altogether free from criminal conspiracy connected with the Indian Revolutionary movement. It has been the scene of determined efforts to stir up mutiny among the military forces and to over-throw the British Govt." কেমন করিয়া এই determined efforts হইয়াছিল তাহারই একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে দিতেছি।

গত তুর্কো-ইতালিয়ান যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষীয় মুসলমানেরা এক মেডিকাল মিশান অর্থাৎ যুদ্ধে আহতদিগের সেবার জন্য একটি দল তুর্কিতে পাঠান। এই দলে ফয়জাবাদ সন্নিকটস্থ ... নবরপুর নিবাসী আলিআহমদ সাদিকি নামক এক তরুণ যুবকও ছিলেন। স্বীয় অভিভাবকগণকে ... জানাইয়াই ইনি এই দলে প্রবেশ করেন ও ভারতের উপকূল পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে বাড়ির ... লোকদিগকে মাত্র এক পত্রে জানাইয়া যান যে তিনি ভারতীয় মেডিকাল মিশনে যোগ দিয়া ... তুর্কি যাইতেছেন!

তুর্কিতে কার্য্যোপলক্ষে ইঁহাকে আনওয়ার পাশার সহিত প্রায় চারিমাসকাল সমর ... প্রাঙ্গণেই থাকিতে হয়। সেই সময় ইনি আনওয়ার পাশার জীবনের অনেক রহস্যপূর্ণ ... কাহিনী শুনিয়াছিলেন। তুর্কো-ইতালিয়ান ও তুর্কো-গ্রীক যুদ্ধের সময় ইংরাজের কূট রাজনীতির ... কাহিনী তুর্কিরা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন; সেই ইংরাজ কূট নীতির কথা, ... তুর্কির ভাগ্যনিয়ন্তা সেই ইয়ংটার্ক দলের কথা, কেমন করিয়া এই ইয়ংটার্কদল তুর্কিতেই ... সর্ব্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করিল, এবং কেমন করিয়া এই ইয়ংটার্কদল মৃতপ্রায় তুর্কি-সমাজে

BLOCKED INFORMATION.

নব চেতনার সঞ্চার করিয়া বিপ্লবের পথে আবদুলহামিদের মত প্রবল, দুর্দ্ধ
সুলতানকেও পদচ্যুত করিয়া তুর্কিতে নবীন নিয়মতন্ত্র রাজ্যপ্রণালীর প্রবর্ত্তন করিল,
কথা, দিনের পর দিন, আলিআহ
হইয়াই শুনিতে থাকিতেন। মসলেম জগতের কত মর্ম্মকথা, কত বীরত্বের কাহিনী, ক
মনুষ্যোচিত অভিব্যক্তির কথা শুনিতে শুনিতে তাঁহার হৃদয় মন কেমন যেন এক অপূর্ব্ব
আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত, মসলেম জগতের গৌরবময় উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ চিত্র কেমন যে
তাঁহাকে অধীর করিয়া তুলিত। তুর্কির এক সর্ব্বপ্রধান ইয়ুরোপপ্রসিদ্ধ সেনাপ
প্রসিদ্ধ দেশনায়ক, যিনি তুর্কির ভাগ্য পরিবর্ত্তনের প্রধান অবলম্বন ছিলেন, য
ভারতের এক নগণ্য তরুণ যুবকের সহিত, অসঙ্কোচে প্রাণ খুলিয়া আলাপ করি
তখন একদিকে যেমন তাঁহার প্রশস্ত উন্নত বুক ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠি
আবার তেমনি সেই একই মুহূর্ত্তে তাঁহার মন ভারতের সেই হীনতা ও দীন
যাত্রার প্রতিদিনকার অপমানের কথা স্মরণ করিয়া যেন অজ্ঞাতসারেই ঘোর
হইয়া উঠিত ও তাঁহার ধমনীর রক্ত নাচিয়া নাচিয়া দুর্নিবার বেগে তাঁহাকে বি
টানিয়া আনিতে থাকিত।

পরে আলিআহমদ প্রভৃতি জন কয়েক ভারতবাসী তুরস্ক দেশ পরিদর্শন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তুর্কির বিভিন্ন স্থানের রাজপ্রতিনিধিরা মহা সমারোহ করিয়া রাজ সম্মানের সহিত তাঁহাদিগকে নিজেদের সমগ্র দেশ দেখাইয়াছিলেন। এইরূপে দেশভ্রমণকালে যখন নগরে নগরে তুরস্কের নরনারী সমবেত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনি করিয়া তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিতেন, যখন রাজপথের দুই পার্শ্বের বাতায়নপথ হইতে সুন্দরীমণ্ডলীর উৎসুক দৃষ্টি তাঁহাদের হস্তনিঃসৃত পুষ্পভার তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গে ঝরিয়া পড়িত তখন সেই ভারতবর্ষ তুরস্কদেশকে ভারতবর্ষ অপেক্ষাও শত গুণে অধিকতর আপনার বলিয়া স্বীকার করি লইতেন। স্বদেশে তাঁহারা ইংরাজের নিকট যেরূপ ব্যবহার পাইতেন তাহার সহিত এই তুর্কিদে ব্যবহারের কথা তাঁহারা তুলনা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। এইরূপেই আলিআহ বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিত হন। এইরূপেই আরও অনেক ভারতবর্ষীয় মুসলমানদের মত আলিআহ ইয়ংটার্ক দলভুক্ত হইয়া গেলেন।

এই তুর্কো-ইতালিয়ান যুদ্ধের সময়েই পাঞ্জাবের আর একটি যুবক, আবুসাইয়াদ, ে হইতে ঈজীপ্ট যান ও পরে ঈজীপ্ট হইতে তুর্কি আসিয়াছিলেন। এই আবুসাইয়াদের অনুরো ও প্রস্তাব মত ইয়ংটার্ক দলের এক অন্যতম সভ্য, ত্যফিকবেকে ১৯১৩ সালে রেঙ্গুনে প হয়। রেঙ্গুনের এক মুসলমান ব্যবসায়ী আহমদ মুল্লাদাউদকে ত্যফিকবে তুর্কির কনসাল করিয়া যান। বিগত যুদ্ধের সময় এই মুল্লাদাউদই তুর্কির কনসালরূপেই রেঙ্গুনে ছিলেন।

ন যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলে অর্থাৎ ইয়ুরোপীয় যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর আলিআহমদ গমন করেন এবং অল্প কিছুদিন গৃহে থাকিয়া নিজের স্ত্রীর অলঙ্কারাদি বিক্রয় সামান্য কিছু অর্থ লইয়া রেঙ্গুনে ব্যবসা করিবার জন্য চলিয়া আসেন। এদিকে কনষ্টান্টিনোপল হইতে ফারমআলি নামক আর এক ভারতবর্ষীয় মুসলমানকে তুর্কিরা ১৯১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে ইয়ংটার্ক দলের প্রতিনিধি স্বরূপ রেঙ্গুনে প্রেরণ করেন। রহমতআলি ও আলিআহমদ সাদিকি, এই দুই জন রেঙ্গুনে আসিয়া মিলিত হন ও এই লইয়া তুর্কির অধিনায়কত্বে বর্ম্মায় বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিয়া দেন। অল্প মধ্যেই ইঁহারা স্থানীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের নিকট হইতে ১৫ হাজার টাকা চাঁদা র্ধ হন। এই চাঁদা তোলা সম্বন্ধে একটি কথা এখানে না বলিয়া থাকিতে যে, বাঙ্গলার সম্পন্ন ব্যক্তিরা বিপ্লববাদীদের মোটেই অর্থ সাহায্য করিতেন না, তাই রাজনৈতিক ডাকাতির প্রাদুর্ভাব অনিবার্য্য হইয়াছিল।

এদিকে যেমন এই প্যান ইসলামিক দলের মুসলমানেরা বিপ্লবায়োজন করিতেছিলেন, দেশকে আবার তেমনি আমেরিকার "গদর" দলও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। খেমচাঁদ দামজি নামক জনৈক গুজরাতি কোন এক সময় রেঙ্গুন হইতে আমেরিকা যান ও আমেরিকায় আসিয়াই তত্রস্থ "গদর" দলের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়েন। প্রথম প্রথম এই দামজির সাহায্যে বর্ম্মায় কেবলমাত্র "গদর" পত্রিকা প্রেরণ করা হইয়াছিল; যুদ্ধের সময় এই পত্রিকা গুজরাতি, হিন্দি ও উর্দ্দু এই তিন ভাষাতেই ছাপা হইত। ইয়ুরোপীয় যুদ্ধের ফলে বর্ম্মায় মুসলমান সম্প্রদায় কিছু উত্তেজিত হইয়া পড়েন, এবং এই "গদর" পত্রিকার প্রভাবে, সেই উত্তেজনার স্রোত বর্দ্ধিত আকার ধারণ করে। এই সময়েই বোম্বাইতে বেলুচি পল্টনের কতক সৈনিক নিজেদের ইংরাজ অফিসারকে হত্যা করিয়া ফেলে, তাই এই সেনাদলকে আর ইয়ুরোপে না পাঠাইয়া রেঙ্গুনে আটক করিয়া রাখা হয়। রেঙ্গুনের মুসলমানেরা "গদর" পত্রিকাদির সাহায্যে এই সেনাদলে বিপ্লববার্ত্তা প্রচার করিতে থাকেন; ফলে ১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাস নাগাদ এই সেনা প্রকাশ্যে বিপ্লব আরম্ভ করিবার জন্য প্রস্তুত হয়, কিন্তু সেনানায়কেরা এই সংবাদের আভাস মাত্র পাইতেই কঠোরভাবে এই সেনাদলকে শাস্তি দেন। কতক শত বেলুচিদিগকে ভারতের বিভিন্ন জেলে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

এই সময় সিঙ্গাপুরে দুইটি ভারতীয় রেজিমেণ্ট ছিল; তাহার একটির সহিত বর্ম্মার মুসলমান বিপ্লব দলের যোগাযোগ হয়। সিঙ্গাপুরের কাশিম মনসুর নামক জনৈক গুজরাতি মুসলমান, রেঙ্গুনে তাঁহার পুত্রকে এক পত্র লেখেন, তাহাতে তুর্কির যে কনসাল রেঙ্গুনে ছিলেন তাঁহার নামেও এক পত্র থাকে। সেই পত্রে লেখা ছিল যে সিঙ্গাপুরের এক সেনাদল বিদ্রোহ করিয়া তুর্কির সহিত যোগ দিতে প্রস্তুত, এই সময় তুর্কির একটি যুদ্ধজাহাজ সিঙ্গাপুরে আসা

আবশ্যক। এই পত্রটি ইংরাজের হস্তগত হওয়ায় সিঙ্গাপুরের সেই রেজিমেণ্টকে [illegible] করা হয়।

ইতিমধ্যে আমেরিকার "[illegible] দলের লোকেরাও সিঙ্গাপুরে আসিয়া [illegible] ইঁহারা একদিকে যেমন সেই সিঙ্গাপুরের অন্য সেনাদলের মধ্যে প্রচার আরম্ভ করিয়া [illegible] অন্যদিকে তেমনি আবার বর্ম্মায়ও নিজেদের লোক পাঠান। ১৯১৫ সালের প্রারম্ভেই সোহনলাল পাঠক ও হসন খাঁ নামক গদর দলের দুই ব্যক্তি ব্যঙ্কক হইতে রেঙ্গুনে আসিয়া নিজেদের কেন্দ্র স্থাপন করেন। এখানে একটি কথা লক্ষ্য করিবার আছে যে "গদর" দলে মুসল[illegible] লওয়া হইত কিন্তু মুসলমান বিপ্লব দলে হিন্দুদের স্থান ছিল না।

সিঙ্গাপুরের সেনাদলের মধ্যে প্রচারের ফলে এবার কিন্তু সত্য সত্যই [illegible] হইয়া যায়। যদিও এই সিঙ্গাপুরের বিপ্লবায়োজনের সহিত পাঞ্জাবের বিপ্লবায়োজ[illegible] যোগাযোগ ছিল না, কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে ২১শে ফেব্রুয়ারী (১৯১৫) সিঙ্গাপুরে বিপ্লব আরম্ভ হয় পাঞ্জাবেও ঠিক এই ২১শে ফেব্রুয়ারীই বিপ্লব আ[illegible] দিন স্থির ছিল। এই ২১শে ফেব্রুয়ারী সিঙ্গাপুরের সৈনিকেরা বহুদিনের সংস্কার[illegible] প্রকাশ্যেই ইংরাজের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। এক সপ্তাহের জন্য সিঙ্গাপুর ভারতীয় সেনার হস্তগত হইল; কিন্তু সিঙ্গাপুর ভারতবর্ষের মধ্যে অবস্থিত না থাকায় সেই বিপ্লবাগ্নি দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িতে পারিল না, এবং এক সপ্তাহের পরে রুশ, জাপান ও ইংরাজরণতরী আসিয়া সিঙ্গাপুর ছাইয়া ফেলিল। এই এক সপ্তাহ কাল বিপ্লবিরা স্থানীয় ইংরাজ সেনা দলের সহিত কৃতিত্বের সহিতই যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এবং ইংরাজ সেনাকে সে যুদ্ধে পরাভবও স্বীকার করিতে হইয়াছিল। কিন্তু রুশ, ইংরাজ ও জাপান রণতরীগুলি আসিয়া পড়ায় দুই একদিনের যুদ্ধের পর অবশেষে বাধ্য হইয়াই বিপ্লবিদিগকে পলাইতে হয়। বিপ্লবিরা বনেজঙ্গলে গিয়া আশ্রয় লইলেন; যাঁহারা পলাইতে পারিলেন না তাঁহারা তখনই ইংরাজের হস্তে বন্দী হইলেন। সিঙ্গাপুর হইতে পলাইয়া একেবারে নিষ্কৃতি পাইবারও উপায় ছিল না, তাই কিছু দিনের মধ্যে প্রায় সব বিপ্লবিই ধরা পড়িয়া যায়।—ইংরাজ সংবাদপত্রাদিতে প্রকাশ হইল সিঙ্গাপুরে এক দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। সিঙ্গাপুরে বিপ্লব-প্রচেষ্টার অবসান হইল বটে কিন্তু ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট এবং ভারতীয় বিপ্লবদল উভয়ই ইহা নিঃসংশয়িতরূপে বুঝিতে পারিলেন যে বিপ্লবিদের পক্ষে দেশী সিপাহীদিগকে হাত করা তেমন কিছু শক্ত কথা নহে।

সিঙ্গাপুরের দুর্ঘটনার পর "গদর" দলের দুই একজন অবশিষ্ট লোক বর্ম্মায় চলিয়া আসিলেন এবং পূর্ণ উদ্যমে পুনরায় তাঁহারা দেশী সেনাদলের মধ্যে বিপ্লব বার্ত্তা প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। একদিকে যেমন বর্ম্মার সেনাবারিকে বিপ্লবপ্রচার চলিতে লাগিল অন্যদিকে তেমনি বর্ম্মার সীমান্তে শ্যায়ামেও জার্ম্মাণদের সাহায্যে বিপ্লবায়োজন হইতে থাকিল।

Estd. 1858 LIBRARY

[illegible]য়াম প্রদেশে জার্ম্মান ইঞ্জিনিয়ারদের অধীনে এক রেলওয়ে লাইন তৈয়ারী হইতেছিল। [illegible] অধিকাংশ মিস্ত্রি ও মজুরই পাঞ্জাবী ছিলেন। এই রেলওয়ে লাইনের দিক [illegible] আয়োজন চলিতে লাগিল। আমেরিকা, চীন প্রভৃতি দেশ হইতে প্রত্যাগত শিখ ও পাঞ্জাবীরা এই শ্যায়াম সীমান্তে একত্রিত হইতে লাগিলেন।

শিবদয়াল কপুর নামক জনৈক শিখ আমেরিকা হইতে প্রত্যাগমনকালে শ্যাঙহাই আসেন; শ্যাঙ্হাইর একটি জার্ম্মান ইঁহারই মার্ফত বহু টাকা ব্যঙ্ককের জার্ম্মান কনসালের নিকট পাঠান। [illegible] কিছু অংশ বর্ম্মাপ্রবেশকারী শিখদিগের পিছনে ব্যয়িত হয় ও বাকি টাকা ব্যঙ্ককের [illegible] উকিলের মার্ফত বাঙ্গলাদেশের বিপ্লবিদের নিকট পাঠান হয়। এই বাঙ্গালী [illegible]কি এই সকল বিপ্লবায়োজনের কথা শেষে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রকাশ [illegible] যে বিপ্লবায়োজন যুদ্ধ বাধিবার বহুপূর্ব্ব হইতেই করা উচিত ছিল, যখন সেই [illegible] যুদ্ধের সময়েই নিতান্তই তাড়াহুড়ায় সম্পন্ন হইতেছিল, তখন এইরূপ অপদার্থ [illegible] কাজে লাগান আবশ্যক হইয়া পড়ে। জানিনা কাহার সুপারিশে এই বাঙ্গালী [illegible] কাজে লাগান হইয়াছিল।—সে যাহাহউক এইরূপে বিদেশের বিপ্লবায়োজন পণ্ড হইল। কিন্তু বর্ম্মায় কর্ম্মীরা আর একবার বিপ্লবের শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিলেন।

সোহনলাল পাঠক ও নারায়ণ সিং এই দুই জনা আর একবার বর্ম্মায় বিভিন্ন স্থানের সেনানিবাসে গিয়া সিপাহিদের মধ্যে বিপ্লব মন্ত্র প্রচার করিতে লাগিলেন। সোহনলাল বর্ম্মার এক গোলন্দাজ সিপাহিদলের মধ্যে ইংরাজ-বিদ্বেষ ছড়াইতে লাগিলেন; ইংরাজের তরফে থাকিয়া প্রাণ বলি দিবার যে কোন সার্থকতা নাই এই কথাই তাঁহাদিগকে বুঝাইতে লাগিলেন। যদি প্রাণ দিতেই হয় ত ইংরাজের তরফে থাকিয়া স্বদেশ ও স্বধর্ম্মের জন্যই প্রাণপাত করায় গৌরব যে কত মহান্ তাহাই সিপাহিদিগকে বুঝাইতে লাগিলেন। সিপাহিদের দ্বারা তাঁহার কোন অনিষ্ট হইল না বটে কিন্তু সিপাহিদের এক জমাদার একদিন সোহনলালকে ধরিয়া ফেলিল। সে দিন সেস্থানে সেই জমাদার ও সোহনলাল ব্যতিরেকে আর কেহ ছিল না। সোহনলালের জামার পকেটে তখন দুই তিনটি রিভলভার ও প্রচুর গুলি ছিল, কিন্তু কি জানি সোহনলাল সে মুহূর্ত্তে কোন্ স্বপ্নের ঘোরে ছিলেন, তাই সেদিন রিভলভারের সাহায্যে তিনি সেই প্রাণঘাতী জমাদারের হস্ত হইতে মুক্তি পাইবার কোন চেষ্টাই করিলেন না। সেই দিন ঐরূপ অবস্থায় সোহনলালের মুখ দিয়া কেবল এইরূপ শব্দই বাহির হইয়াছিল "আরে ভাই! তুই আমায় ধরাইয়া দিবি? তুই কি ভুলিয়া যাইতেছিস যে আমি তোর ভাই? [illegible] হইয়া ভাইকে ধরাইয়া দিবি? ভাইকে ধরাইয়া দিতে তোর কি একটুও মায়া হইতেছে না? আরে, তুই কেমন ধারা ভাই, ভাই হইয়া ভাইকে ধরাইয়া দিতেছিস?" জমাদার সোহনলালকে কিন্তু টানিয়াই লইয়া চলিল; সোহনলাল খুব বলিষ্ঠ ছিলেন না সত্য, কিন্তু

একথাও সত্য যে কোনও একজন ব্যক্তি আর একজনাকে অন্যের সাহায্য [illegible] সম্পূর্ণ কাবু করিতে কিছুতেই সমর্থ নহে, তা সে যতই বলবান ব্যক্তি হউক না কেন [illegible] কথা, সোহনলাল সেই স্বার্থান্ধ জমাদারের উপর এতটুকুও শারীরিক বল প্রয়োগ [illegible] এইরূপে ইংরাজের কবলে পড়ার অর্থ তাঁহার নিকট খুবই সুস্পষ্ট ছিল; ইচ্ছা করিলে তিনি এই প্রাণলোলুপ জমাদারের হস্ত হইতে রিভলভারের সাহায্যে এক মুহূর্ত্তেই নিষ্কৃতি পাইতে পারিতেন। কিন্তু জানি না ভগবান তাঁহার মনকে সে মুহূর্ত্তে কোন দিব্যলোকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, —তিনি যেন সেদিন একেবারেই এ সংসারের ছিলেন না।

সোহনলাল জেলে আবদ্ধ হইলেন বটে কিন্তু তিনি জেলের কোন নিয়ম পা[illegible] না। জেল কর্ত্তৃপক্ষগণ জেল পরিদর্শনে আসিলে আর সকল কয়েদী যেরূপে আইনতঃ [illegible] সম্মান প্রদর্শন করিত সোহনলাল সেরূপ করিতেন না। তিনি বলিতেন "আমি ইংরা[illegible] যখন অন্যায় জুলুম বলিয়া মনে করি তখন ইংরাজের জেলের নিয়মই বা পালন ক[illegible] হিসাবে?" জেল সুপারিনটেণ্ডেণ্ট অথবা জেলার তাঁহাদের সম্মুখে আসিলে তিনি [illegible] মত সম্মানার্থ উঠিয়া দাঁড়াইতেন না; তাই যখন বর্ম্মায় লাট সাহেব সোহনলালের [illegible] অব্যবহিত পরেই জেল পরিদর্শন করিতে আসেন তখন জেলার সাহেব নিতান্ত সঙ্কুচিতভাবেই সোহনলালকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যেন তিনি অন্ততঃ লাট সাহেবকে সম্মান প্রদর্শন করেন; তিনি কিন্তু ইহাতে সম্মত হন নাই। সোহনলাল এইরূপ নির্ভীক হইলেও এবং স্বীয় আত্মমর্য্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিলেও মানুষের সহিত ব্যবহারের বেলায় তিনি কোনরূপ অভদ্রতা প্রকাশ করিতেন না। তাঁহার সহিত কেহ কথা কহিতে আসিলে তিনি ভদ্রভাবেই যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিয়াই তাঁহাদের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেন। তাঁহার সহিত কেহ দাঁড়াইয়া কথা বলিলে, তিনিও দাঁড়াইয়াই কথা বলিতেন। তাই লাট সাহেব সোহনের নিকট আসিবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই জেলার সোহনের নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়া কথা বলিতে থাকেন। এইজন্য লাট সাহেব আসিলে নূতন করিয়া আর তাঁহাকে দাঁড়াইতে হইল না; এইরূপে জেলার নিজের ও লাট সাহেবের মর্য্যাদা সে যাত্রা রক্ষা করিলেন।

লাট সাহেব প্রায় ঘণ্টা দুই সোহনলালের সহিত আলাপ করেন। লাট সাহেব সোহনলালকে ক্ষমাভিক্ষা করিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছিলেন; লাট সাহেব বলেন যে তিনি একবার মাত্র ক্ষমাভিক্ষা করিলেই তাঁহার প্রাণদণ্ড রহিত করা হইবে। সোহনলাল লাট সাহেবকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া বলেন যে, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অন্যায় জোর জুলুম যাহাকিছু সব ইংরাজের দিক হইতে হইতেছে; ইংরাজ কেবল গায়ের জোরেই এদেশ দখল করিয়াছেন ও গায়ের জোরেই এদেশ শাসন করিতেছেন, তাই ক্ষমাভিক্ষা প্রকৃতপক্ষে লাট সাহেবেরই করা উচিত,—এই কথাই সোহনলাল লাট সাহেবকে বিধিমতে বুঝাইবার চেষ্টা করেন।

[illegible] হইবার দিন যখন সোহনকে [illegible] কাষ্ঠের নীচে তক্তার উপর দাঁড় করান হইল [illegible] এক ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে আর একবার জানাইলেন যে এখনও যদি তিনি মাত্র মুখের কথায় ক্ষমা ভিক্ষা করেন ত অবিলম্বে তাঁহার প্রাণ দণ্ড রহিত হইয়া যাইবে। এই ইংরাজ রাজপুরুষটি সোহনকে বলিলেন যে তাঁহার নিকট আদেশ পত্র আসিয়াছে যে শেষবার আরও একবার সোহনকে ক্ষমা ভিক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ করা হয়। জীবন মরণের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান সোহনলালের মুখের দিকে জেলের কর্ত্তৃপক্ষগণ ও ইংরাজ রাজপুরুষেরা অবাক হইয়া তাকাইয়া [illegible] সোহনলাল মৃদু-মৃদু হাস্য করিতে লাগিলেন ও অনায়াসে বলিলেন "ক্ষমা ভিক্ষা করিতে [illegible] আমাদের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করুক, আমি কোন্ সুবাদে তোমাদের নিকট ক্ষমা [illegible] যাইব?" ইংরাজ রাজপুরুষটি সোহনকে পুনরায় বহু অনুরোধ করিলেন, নানারূপে [illegible] যে বৃথা প্রাণ দিয়া কোন লাভ নাই; অবশেষে সোহন একটু ভাবিয়া বলিলেন [illegible] আমায় একেবারে ছাড়িয়া দাও এবং আমি যদি যথাইচ্ছা চলিয়া যাইতে পারি ত ক্ষমা [illegible] করিতে প্রস্তুত আছি।" তখন ইংরাজ রাজপুরুষটি দুঃখিত হইয়া বলিলেন, সেরূপ কোন [illegible] হাতে নাই; সোহনলালও বলিলেন, "তবে আর মুহূর্ত্তমাত্র কাল বিলম্ব না করিয়া [illegible] কর্ত্তব্য সম্পাদন কর, আমায়ও নিজের কর্ত্তব্য করিতে দাও।"

সোহনলালের ফাঁসি হইয়া গেল।

বর্ম্মার মুসলমান বিপ্লববাদীরা পুনরায় বকরিদের সময় বিপ্লবের আয়োজন করিয়াছিলেন। কিন্তু আয়োজন সম্পন্ন করিতে না পারায় বিপ্লবের দিন ২৫শে ডিসেম্বর পিছাইয়া দেওয়া হয়। বর্ম্মার এক মিলিটারি পুলিসের ব্যরাকে রিভলভার, ডিনামাইট ইত্যাদি বহু জিনিষ হঠাৎ আবিষ্কৃত হইল ও তাহার পর বর্ম্মার সকল সন্দেহজনক ব্যক্তিকেই defence of India act অনুযায়ী আটক করিয়া ফেলা হইল। বর্ম্মায় আর কোন উপদ্রব হইল না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশচীন্দ্রনাথ সান্যাল

আশা

কেন এত ভাবনা রে ভাই? দুঃখ তোমার থাক্‌বে না।
গড়িয়ে পড়ুক অশ্রু যতই, একটি দাগও লাগ্‌বে না।
জাগ্‌ছে ব্যথা মাথা তুলে, বাঁধন ভেঙ্গে বুকের কূলে?
ব্যথার-ব্যথী তোমায় ছুঁলে আর সে ফিরে জাগ্‌বেনা।

লূতার লালচ

(সংস্কৃত রুচিরা ছন্দে)

১

মাকড়সা এক টাঙায়েছে জাল ঘরের কোণায়,
ল্যাজের লালার কারিগরি তার বড়ই শোভন !
শিকার ধরার পেতে আছে ফাঁদ ক্ষুধার জ্বালায়,
ফাঁদের উপর বসে আছে ঠায় মড়ার মতন।

২

যাবেন কোথায় মশা মহাশয় ? কোথায় সে বল ?
হঠাৎ কেমন উড়ে পড়িলেন ফাঁসের ভিতর !
চরণ ছোঁড়েন, উড়িতে চাহেন, চেঁচান্ কেবল !
যেমন কপাল অতি চালাকের, হলেন কাতর।

৩

এদিক মাকড় কাছে এসে গায় ঠোকর বসায়,
মশক তখন ভয়ে পুনরায় নাড়েন পালক ;
লূতার লালার সূতা পায়ে তাঁর বিষম জড়ায়,
মশার বিপদ, আজি লূতিকার বেজায় পুছক।

৪

দু'দশ পলক চলে মশকের একক লড়াই,
আনায়্-মাঝার ফুটানিটা আজ মিছাই ফুটান্ !
শ্রীহুল বিঁধান্ দেহে সকলের মশক মশাই,
এখন বুঝুন ঠ্যালা মাকড়ের ! উচিত বিধান !

৫

লসৎ লূতায় মশা খেয়ে তার জুড়ায় হৃদয়,
জগৎ নিয়ম—ক্ষুধা করে নাশ পরের শরীর!
মারার আদেশ লভে বলবান্, সবল নিদয় ;
অবল অধম কেহ কিছু নয় ? নিদেশ বিধির!

৬

তা নয়—জীবন যত ছোট হোক্, সহায় শ্মশান,
কারুর পরাণ কভু হেয় নয়, ধরার ভূষণ !
জগৎপিতার ওড়ে নিশিদিন ন্যায়ের নিশান,
পীড়ন করার আছে প্রতিফল, শাসন ভীষণ !

৭

কিসের বিষাদ ? করো বিভুগান সবার সহিত !
সদয় যে র'ন্ তাঁরে তোরা, হায়, চিনিস্ কোথায় !
সবাই তাঁহার কাজে লেগে থাক্, তিনিই সুহৃৎ।
তাঁহার আশিস্ ঝরে নিশিদিন সবার মাথায়।

৮

জাগাও ! মাতাও ! ছুটে চলো সব রাতের পথিক।
ঘুচাও আঁধার ! করো শুধু কাজ ! বাঁচাও জীবন।
পরাৎপরের কৃপা লভে যার সাহস অধিক,
সমর্থদের শুধু হবে জয়, সফল সাধন।

৯

মশার মতন নেতা এ-দেশের, চালাক্ বেজায়।
বচনবাগীশ ! বেশী কথা ক'ন্ ! ওড়েন বাহার।
কাঁটাল ভাঙেন শিরে অপরের কাজের বেলায়।
মরণ ঘনাক্—তবু উদাসীন ! জীবন আঁধার।

১০

মাকড়্সা ঠিক ব্যবসায়ী বীর, খাটায় জীবন,
ভবিষ্যতের আশে ভরা বুক, সে জাল বিছায় ;
আসুক তুফান, ছিঁড়ে যাবে যাক্ সাহস ভীষণ,
ধানাই-পানাই ছেড়ে করে কাজ, আনায়্-ধানায়।

১১

এদের মতন কেজো জাতি সব জগৎ চালায়,
মিলন্-সূতায় বেঁধে রাখে রথ জগন্নাথের ;—
অলস ভারত মোড়ামুড়ি দ্যায়্ আফিম্-নেশায়।
কেবল স্বপন করে দরশন প্রাচীন ভূতের।

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতের বহির্বাণিজ্য

খবরের কাগজ যাঁরা নাড়াচাড়া করেন তাঁরাই Imperial Preference নামক একটা কথার সঙ্গে সম্প্রতি অল্প-বিস্তর পরিচিত আছেন। বর্ত্তমান ব্যস্ততার যুগে বিশেষজ্ঞগণ ব্যতীত অন্যদের পক্ষে কোন্ সূত্রে যে ব্যাপারটা লোক-লোচনের গোচরীভূত হইয়াছে তাহা ভুলিয়া যাওয়াই সম্ভবপর। তাই সে কথাটা স্মরণ করাইয়া দেওয়া উচিত মনে করি।

বিলাতে Lloyd George সাহেব প্রধান মন্ত্রীত্ব পদ গ্রহণ করিয়া তাঁহার [illegible] যে ফর্দ্দ দেন তাহার মধ্যে Imperial Preference Policy প্রবর্ত্তনের চেষ্টা অ[illegible] Government তদনুসারে ভারত সরকারের মত চাহিয়া পাঠান। ভারত সরক[illegible] কয়েকজন বিশেষজ্ঞের কমিটি গঠিত করিয়া এ সম্বন্ধের তদন্তের ভার দেন। [illegible] মধ্যেই প্রকাশ করেন যে তাঁহারা এ বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে[illegible] কেন না তাহা সবিশেষ গবেষণা-ও সময়-সাপেক্ষ। তাঁহারা এমনি করিয়া শ্যাম ও [illegible] রাখিয়া নিজেদের বিষয় বুদ্ধির পরিচয় দিলেন বটে, কিন্তু কু-লোকে সন্দেহ করিতে ইতস্ততঃ [illegible] যে তাঁহাদের যতখানি জ্ঞান আছে সে অনুযায়ী সাহস থাকিলে তাঁহারা স্পষ্টতঃ প্রতিকূল মত প্রকাশ করিতেন। সে কাজটা করিল সে বৎসরকার Industrial Conference. তাঁহারা বিস্তর গবেষণা না করিয়াও বুঝিলেন যে Imperial Preference Policy প্রবর্ত্তনের দ্বারা ভারতের ইষ্ট বই অনিষ্ট হইবে না।

ব্যাপারটা ওখানেই এখনকার মত থামিয়া আছে—কিন্তু একেবারে শেষ হইয়া যায় নাই অনেকেই সন্দেহ করেন যে উহা অচির-কালের মধ্যেই আবার আলোচনার বিষয় হইয়া উঠিবে। আজকার (১৭-৮-২৩) তারিখের খবরের কাগজে Reuter-এর টেলিগ্রামে পড়িয়া থাকিবে "Referring to the Imperial Economic Conference, general Smuts thought that the Dominion's products should have preference over their outside competitors." ইহাই আমাদের অদ্যকার আলোচ্য ব্যাপার।

বলা বাহুল্য মাত্র এ বিষয়টার সঙ্গে এ দেশের ইন্টারেষ্টের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। সুতরাং এ সম্বন্ধে আলোচনা দ্বারা লোকমত গঠিত হওয়া সমীচীন। তাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

Imperial Preference Policy জিনিষটা কি সম্যক বুঝিতে হইলে ধন-বিজ্ঞানের গোড়ার ২।১টা কথা পরিষ্কার করা দরকার। তাহা সংক্ষেপতঃ সাধিতে চেষ্টা করিব; কি[illegible] আলোচনাটাও শ্রবণপ্রীতিকর হইবে এমন ভরসা দিতে পারিতেছিনা। সুতরাং পূর্ব্ব হইতে আপনাদের ধৈর্য্য ভিক্ষা করিতেছি।

সমাজে বাস করিতে গেলে দৈনন্দিন জীবন যাপনোপযোগী যে সব জিনিস অত্যাবশ্যক

চেষ্টায় তাহার শতাংশের একাংশও অন্যের সাহায্য ব্যতীত সংগ্রহ বা তৈরী করিতে পারে একটা সাধারণ মোটা কথা। ছোট বড় আবশ্যকীয় অনাবশ্যকীয় যত সব অসংখ্য দ্রব্য জীবন [illegible] আমাদের কাছে অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে তাহাদের কতটুকু আমরা অন্যের সাহায্যে নিরপেক্ষ হইয়া শুধু নিজ চেষ্টায় সংগ্রহ করিতে পারি? অথচ তাহাদের বাদও দিতে পারি না, কাজেই অন্যের সাহায্য আমাদের চাই-ই। এ অবস্থায় যাহা সম্ভবপর মানুষ তাহাই করিল—প্রত্যেকে স্ব স্ব পারদর্শিতানুযায়ী এক বা ততোধিক দ্রব্য উৎপন্ন করিয়া তদ্‌পরিবর্ত্তে অন্যের নিকট হইতে নিজ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহের বন্দোবস্ত করিয়া লইল। এই বন্দোবস্তানুযায়ী দ্রব্য [illegible] শ্রম-বিভাগ ও পরস্পরের আদান প্রদানের বোঝাপড়া বর্ত্তমান বৈষয়িক জগতের [illegible] কথা।

এমন সময়ের কথা কল্পনা করা কঠিন নয় যখন মানুষকে তাহার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির [illegible] পরিবারস্থ ব্যক্তিদের সাহায্যের উপর নির্ভর করা ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। কালক্রমে শ্রম-বিভাগের ক্ষেত্র পরিবারের গণ্ডী, সমাজের ও গ্রামের গণ্ডী, এবং ক্রমে দেশের গণ্ডী পার হইয়া তাহা এখন জগদ্ব্যাপী হইয়াছে। মানুষের অভাব পূরণোপযোগী দ্রব্য সরবরাহের জন্য সমগ্র পৃথিবী এখন উন্মুখ। ফলে শ্রম-বিভাগ এখন অনেকটা পরিমাণে ভৌগোলিক হইয়া পড়িয়াছে—অর্থাৎ প্রত্যেক দেশ ও জাতি তাহাদের সুযোগ ও সুবিধানুযায়ী কতিপয় সংখ্যক মাত্র প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপাদন করে ও পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদানের দ্বারা সমস্ত অভাব পূরণ করে।

যদি প্রত্যেক দেশ বা জাতি যে সব জিনিস উৎপাদনে তাহাদের বিশিষ্ট পারদর্শিতা আছে শুধু তাহারই উৎপাদনে সমস্ত সময় ব্যয় করে—তাহা হইলে সবাই আদান প্রদান দ্বারা সুলভ মূল্যে সকল দ্রব্য পাইতে পারে। এ মতের যাঁরা পোষকতা করেন তাঁদের বিবেচনায় বাণিজ্য-ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টের নিরপেক্ষ থাকা উচিত, তাহা হইলে অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে দ্রব্য-উৎপাদন কার্য্য দক্ষতম ব্যক্তিগণের হাতে থাকায় সমস্ত জিনিস সস্তায় বিকাইবে। ইহারই নাম অবাধ বাণিজ্যনীতি (Free Trade)।

ইহার বিরুদ্ধবাদীরা বলেন এ মত অভ্রান্ত হইতে পারে—কিন্তু একটা দ্রব্য উৎপাদনে কোন্ বিশিষ্ট দেশ দক্ষতম তাহা চিনিবার ও জানিবার উপায় কি? বর্ত্তমানে কোনও দেশ কোনও দ্রব্য উৎপাদনে দক্ষতম বলিয়াই ত নিঃসংশয়ে একথা বলা চলে না যে শিক্ষা ও সুযোগ পাইলে আর কেহ ইহা অপেক্ষা দক্ষতর হইতে পারিবে না। শিশু ও বয়স্কের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে না—তবু সেই শিশুকেই প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র হইতে দূরে রাখিয়া বর্দ্ধিত ও পূর্ণকায় হইবার অবকাশ ও সুযোগ দিলে তবেই সে লড়াইয়ে সমকক্ষ হইবার স্পর্দ্ধা রাখিবে। বাণিজ্যক্ষেত্রেও তেমনি [illegible] তারতম্যতার স্থান আছে। শিশু-শিল্পকে, লোক চক্ষুর অন্তরালে শত্রুর আক্রমণ হইতে [illegible] করিয়া পূর্ণকায় হইবার অবকাশ ও সুযোগ দিলে তবে প্রতিযোগিতার সময় আসিবে, পূর্ব্বে

নহে। কাজেই অবাধ বাণি[illegible]নীতি সকলের পক্ষে তুল্যরূপে প্রয়োজ্য নয় [illegible] এ মতকে সংরক্ষণনীতি (Policy of Protection) বলা চলে।

এই সংরক্ষণ কার্য্য দুই [illegible] প্রতিযোগী দ্রব্যের দেশে প্রবেশের সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা প্রচার। উপায়টা যেমনি সহজ তেমনি স্পষ্ট, কিন্তু রূঢ়। তোমার জিনিস আমার দেশে প্রবেশ করিতে দিব না, সাম্য মৈত্রীর যুগে এ কথাটা সভ্যতাভিমানী জাতির মুখে তেমন মানায় না। কাজেই হৃদ্যতার হাসি হাসিয়া শত্রুকেও বলিতে হয় "তোমার জিনিস আমার দেশে চিরকাল আসুক এই ত আমি চাই,"—কিন্তু প্রকৃতই যখন তাহা চাই না তখন অগত্যা ঘরে ফিরিয়া সেই জিনিসের বিদেশে[illegible] উপর অতি উচ্চহারে ট্যাক্স বা শুল্ক বসান ভিন্ন আর উপায় থাকে না। এই আমদানী (Import duty) সংরক্ষণ-নীতি-পন্থীদের প্রধান অস্ত্র। যে দ্রব্যের সংরক্ষণ দরকার আমদানীর উপর এমন হারে শুল্ক বসান যাহাতে উহার দাম চড়িয়া উহা আর দেশে সঙ্গে প্রতিযোগিতা না করিতে পারে।

আমদানী শুল্ক মাত্রেরই উদ্দেশ্য সংরক্ষণ হইতে হইবে এমন কোন কথা নাই—[illegible] অর্থাগমের উপায়স্বরূপও ব্যবহার করা চলে। আমদানী শুল্ক সত্ত্বেও যখন দ্রব্যের আমদানী হয় তখন বুঝিতে হইবে সংরক্ষণের কার্য্য চলিতেছে না, শুধু গভর্ণমেণ্টের অর্থাগম হইতেছে। অপর পক্ষে আমদানী শুল্কের প্রবর্ত্তনের ফলে যখন দ্রব্যের আমদানী বন্ধ হইয়া যায়, তখন সংরক্ষণ কার্য্য পুরা দমে চলে, কিন্তু রাজকোষ পূর্ণ হইবার অবকাশ পায় না। ফলে আমদানী শুল্ক দ্বারা যুগপৎ সংরক্ষণ ও রাজকোষ পূরণ কার্য্য এ দুইই চলে না—দুই পাখী মারিতে ঢিলই এক্ষেত্রে পর্য্যাপ্ত নয়।

অবাধ বাণিজ্যপন্থী ও সংরক্ষণবাদীদের মতের লড়াই বহুদিন থেকে চলে আসছে—লড়াই এখনো থামেনি; কিন্তু লড়াইয়ের সে তীব্রতা আর নাই, উভয়পক্ষই এখন অল্পাধিক ভ্রান্ত যুক্তির প্রাবল্য অবাধ বাণিজ্যেরই পক্ষে—কিন্তু কার্য্যতঃ জয়লাভ হয়েছে সংরক্ষণবাদীরই। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ইংলণ্ড ব্যতীত আর সমস্ত সভ্য ও উন্নত দেশই একে একে সংরক্ষণ নীতির অনুসরণ করে। যাদের উপর ইংলণ্ডের দাবী দাওয়া খাটে সেই সব আত্মজা [illegible] কন্যকাগণও মাতৃভূমির দিকে ফিরিয়া চাহিল না—Australia, New Zealand প্রভৃতি উপনিবেশগুলি পূর্ণতেজে সংরক্ষণনীতি গ্রহণ করিল। Canada স্নেহবশতঃ কিছুদিন সংরক্ষণনীতি গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করিয়াছিল। কোন কোন বিশেষজ্ঞেরা বলেন সেই মন স্থির করার বিলম্বের ফলেই উক্ত দেশ বাণিজ্যব্যাপারে এখনও নগণ্য, অথচ তুল্যাবস্থিত তাহার প্রতিবেশী America এমন অবস্থায় উপনীত হইয়াছে যেখান হইতে ধরাকে সরা জ্ঞান অমার্জ্জনীয় অপরাধ নয়।

বাহুল্যমাত্র, ভারতবর্ষের ভাগ্য-বিধাতাদের নির্দ্দেশ ও ইচ্ছানুযায়ী ইংলণ্ডের মত অবাধ বাণিজ্যনীতি অনুসৃত হইল। বাণিজ্য-ব্যাপারে অত্যুন্নত ইংলণ্ড ও তেমনি [illegible] ভারতের [illegible] তুল্য ব্যবস্থা একটু বিচিত্র ঠেকে।

যাহা, যখন এক এক করিয়া সমস্ত সভ্যদেশই ইংলণ্ডের দ্রব্যসমূহকে বিতাড়িত করিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিল, তখন ইংলণ্ডের সংরক্ষণ-বাদীরা মাথা তুলিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী অবাধ বাণিজ্য-পন্থীদের সঙ্গে পারিয়া উঠিলেন না বটে, কিন্তু দিন দিন তাঁহাদের দলপুষ্টি হইতে লাগিল। বুয়র যুদ্ধ তাহাদের কার্য্য অনেকটা অগ্রসর করিয়া দিল। যুদ্ধ অবসানে সমগ্র British সাম্রাজ্যকে দৃঢ় সূত্রে বাঁধিবার একটা ইচ্ছা সকলের মনে জাগ্রত হইল। এই উপায়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জন্য অন্য দেশের সাহায্য-নিরপেক্ষ হইতে পারা যুদ্ধ সময়ে যে কতটুকু আবশ্যকীয় ও সুবিধাজনক তাহা সহজেই সকলের হৃদয়ঙ্গম হইল।

[illegible] বুঝিয়া Mr. J. Chamberlain অবাধ বাণিজ্য নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা [illegible]— মামুলী চ'লে নহে, একটু অভিনব পন্থায়। ইংলণ্ডের জনসাধারণ অবাধ বাণিজ্য নীতি [illegible]—করিয়াই বাণিজ্যের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে—তাহারা সহজে সে নীতি পরিত্যাগ করিতে রাজী হইবে না এ কথা Mr. Chamberlain বুঝিলেন। তাই অবাধ বাণিজ্য নীতির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে না গিয়া তিনি একটু নূতন চাল চালিলেন। তিনি বলিলেন অবাধবাণিজ্য নীতিই যে প্রকৃষ্ট পন্থা তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই—কিন্তু সে অবাধ বাণিজ্য চলিতে পারে শুধু তাদেরই সঙ্গে যারা নিজেরাও সেই নীতি-পন্থী, যারা সংরক্ষণনীতি বাদী তাহাদের সঙ্গে নহে। তাই তিনি প্রস্তাব করিলেন যে সমগ্র British সাম্রাজ্যের ভিতর আপনা আপনির মধ্যে অবাধ-বাণিজ্য পূর্ণমাত্রায় থাকুক, কিন্তু বাহিরের অন্য দেশের সঙ্গে সংরক্ষণ নীতি সতেজে চালাইতে হইবে। ইহাতে ইংলণ্ড ও উপনিবেশগুলির কাহারও কোনই ক্ষতি হইবে না—অথচ পৃথিবীব্যাপী সুবিশাল British সাম্রাজ্য মনে জ্ঞানে এক হইয়া সম্মিলিত শক্তিতে শক্তিবান হইয়া উঠিবে এবং যে কোন জাতির বিরুদ্ধে সকল সময় দণ্ডায়মান হইবার স্পর্দ্ধা রাখিবে। সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেশ সমূহের পরস্পরের মধ্যে অনুগ্রহ ব্যবহার ও বিদেশীয়দের প্রতি নিগ্রহাচরণ—এ প্রস্তাবই আমাদের অদ্যকার আলোচ্য Imperial Preference Policy.

ইংলণ্ডে এই অভিনব প্রস্তাব নিয়া মহা আন্দোলন হয় এবং অনেকেই ইহার সাপক্ষে [illegible]য়া পড়েন। কিন্তু উপনিবেশগুলির মত না হইলে ত আর এ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না, কাজেই তাহাদের মত চাহিয়া পাঠান হইল। অনুরোধ উপরোধে নাকি ঢেঁকিও গেলা যায়, কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে স্নেহময়ী মাতৃভূমির এ আগ্রহ প্রস্তাবে এক কানাডা ব্যতীত [illegible] উপনিবেশ-কন্যকাই সায় দিল না, এমন কি ভারতবর্ষও না। Chamberlainএর [illegible] বিস্মৃতিগর্ভে ডুবিয়া গেল।

কিছুদিন হইল প্রস্তাবটা আবার জাগাইয়া তোলা হইয়াছে। Brit
প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জন্য অন্য দেশের সম্পূর্ণ সাহায্য-নিরপেক্ষ হইতে না পারিলে
কালে যে কি সঙ্কট হইতে পারে যে
সুতরাং সাম্রাজ্যকে যাহাতে আর পরমুখাপেক্ষী না হইতে হয় সেরূপ ব্যবস্থা করিবার
দেখা দিয়াছে। ইংলণ্ডের তখনকার প্রধান মন্ত্রী Mr. Lloyd George পার্লামেণ্ট
প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে তাঁহার গভর্ণমেণ্ট Preferential Polic
চেষ্টা করিবেন। বিলাতের বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টও এই মতের পরিপোষক।
British Government হইতে এ সম্বন্ধে ভারত গভর্ণমেণ্টের উপর হুকুম
এবং তাহার ফলে হয়ত বা প্রস্তাবটা গৃহীতও হইয়া যাইতে পারে। এ
অমূলক, বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না। সুতরাং এ বিষয়ে
আবশ্যকতা আছে।

Lloyd George সাহেব পূর্ব্বাবধি রীতিমত অবাধ-বাণিজ্য নীতির
ছিলেন। তাঁহার আকস্মিক মত পরিবর্ত্তনের কারণ সম্বন্ধে কুলোকে কুকথা
নয়। শত্রুপক্ষ বলে তিনি মনে মনে এখনও অবাধ-বাণিজ্যপন্থীই আছেন। কিন্তু তাঁহার
মন্ত্রীত্ব পদের খাতিরেই তিনি Preferential Policyর সমর্থন করেন।

এ সকল কথা সত্য কি মিথ্যা সে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন; প্রস্তাবটার সঙ্গে আমাদের
যোগ; Mr. Lloyd Georgeএর মনস্তত্ত্বালোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক, বিশেষতঃ যখন আমাদের
নিজেদের চরকা তৈলাভাবে কার্য্যানুপযোগী। সুতরাং এখন বিচার্য্য—Preferential Polic
প্রবর্ত্তনে আমাদের ইষ্টানিষ্ট কি এবং কতটুকু? এ সম্বন্ধে মতভেদ অনিবার্য্য, সবাই নিজ নিজ
গঠন করিবেন ইহাই আশা করা সঙ্গত। মোটামুটী রকম ইঙ্গিত দিয়াই আমি আজ আপনা
রেহাই দিব।

আমাদের দেশে অবাধ-বাণিজ্য-নীতি অনুসৃত হইতেছে সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি।
বিদেশ হইতে এদেশে আমদানী দ্রব্যের কতকাংশের উপর গড়পড়্তা শতকরা ৫৲ টাকা
শুল্ক আদায় করা হয়। এ শুল্ক বসানোর উদ্দেশ্য কর আদায়, সংরক্ষণ নয়—কেন না শুল্কের
হার এত কম যে বিদেশী দ্রব্য শুল্ক-সত্ত্বেও অনায়াসে এদেশে প্রবেশ করিতে পারে;
পর এমন সব জিনিসের উপর শুল্ক বসান আছে যে জিনিস এদেশে আদৌ উৎপন্ন হইতে
না, কাজেই সংরক্ষণ এ জাতীয় শুল্কের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। অপরদিকে বিদেশে
মাল-সমূহের মধ্যে কেবল বর্ম্মা চাউলের রপ্তানির উপর যৎসামান্য (টাকায় ৵০ আনা
শুল্ক বসান আছে; কিছুদিন হইল অর্থের প্রয়োজন হেতু চা ও পাটের রপ্তানির উপর
সম্প্রতি চামড়ার রপ্তানির উপর শুল্ক বসান হইয়াছে। চামড়ার শুল্ক সম্বন্ধে একটু

যে চামড়া ইংলণ্ডে বা সাম্রাজ্যভুক্ত কোন উপনিবেশে চালান যাইবে তাহার শুল্ক রেহাই
হইবে, শুধু বিদেশীয়দের রপ্তানি মালের উপর শুল্ক আদায় করা হইবে—এ ব্যবস্থা
ইংলণ্ড ও উপনিবেশ সমূহের বেলা বিদেশীয়দের হইতে ভিন্ন ব্যবস্থা Preferential
Policy অনুযায়ী এ কথা বলাই বাহুল্য। এ অভিনব ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন দেখিয়াই বিজ্ঞেরা
সন্দেহ করেন যে পূর্ণমাত্রায় Preferential Policy প্রবর্ত্তন হইতেও বেশী বিলম্ব হইবে না।

মোটের উপর একথা বলা চলে যে ইংলণ্ড, উপনিবেশ সমূহ ও বিদেশীয়েরা নামমাত্র
শুল্ক দিয়া এদেশে যথেচ্ছ পরিমাণে মাল আমদানী করিতে পারে এবং এদেশ হইতে মাল
রপ্তানি করিতে পারে অর্থাৎ এদেশের বাণিজ্য-দ্বারা সকলের জন্যই সমভাবে উন্মুক্ত, শুধু সময়ে
সময়ে বায়বান Customs কর্ম্মচারীদিগকে যৎকিঞ্চিৎ বক্‌সিস-শুল্ক দিলেই হইল। এখন
যদি Preferential Policyর প্রবর্ত্তন করিলে ইংলণ্ড ও উপনিবেশগুলির অবস্থা পূর্ব্ববৎই
থাকিবে—কেবল বিদেশীয়দের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হইবে। তাদের আমদানী মাল উচ্চ
শুল্ক না দিয়া এদেশে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারিবে না, এবং এদেশ হইতে তারা যে
মাল রপ্তানি করিবে তাহার উপরও উচ্চহারে রপ্তানি শুল্ক তাহাদিগকে দিতে হইবে। আমাদের
বহির্বাণিজ্যের উপর এ নব ব্যবস্থার ফলাফল কি তাহাই এখন বিবেচ্য।

আমাদের বহির্বাণিজ্যের অর্থাৎ আমদানী রপ্তানির মাল তালিকার পরীক্ষা করিলে দেখা
যায় যে যত মাল আমরা বিদেশ হইতে আমদানী করি তার (মূল্য হিসাবে) প্রায় শতকরা
৪৪ অংশ আসে ইংলণ্ড হইতে, ৭ অংশ আসে উপনিবেশ সমূহ হইতে এবং বাকী অংশ আসে
পৃথিবীর অন্যান্য দেশ সমূহ হইতে অর্থাৎ আমদানী মালের ৳ অংশ একা ইংলণ্ড সরবরাহ করে
এবং বাকী ৳ অংশ উপনিবেশ সমূহ ও বিদেশীয়েরা সরবরাহ করে। কাজেই আমদানী মাল
সম্বন্ধে একথা বলা চলে যে উপনিবেশ সমূহ ও বিদেশীয়দের সহিত আমাদের যে কারবার তাহা
অতি সামান্য, এমন কি অকিঞ্চিৎকর; আমদানী মালের জন্য ইংলণ্ডের উপরই আমরা মোটের
উপর নির্ভরশীল।

Preferential Policyর প্রবর্ত্তন হইলে ইংলণ্ড ও উপনিবেশ সমূহ হইতে আমদানী
মালের কোন ব্যতিক্রম হইবে না—তাদের মাল এখনও যেমন আসিতেছে তখনও তেমনিই
আসিতে পারিবে; কেবল বিদেশীয়েরা যে সামান্য মাল এদেশে প্রেরণ করে তার উপর
উচ্চ হারে শুল্ক বসিবে, এবং ফলে সে সব দ্রব্যের দাম চড়িয়া যাইবে।

দাম চড়ার দরুণ ইংলণ্ড ও উপনিবেশস্থ ও এ দেশীয় প্রতিযোগী ব্যবসায়ীদের সুবিধা
হওয়া সম্ভবপর; কিন্তু একটু পরীক্ষা করিলেই দেখা যায় যে যে সব মাল বিদেশীয়েরা এদেশে
আমদানী করে তার অতি সামান্য অংশই এদেশে উৎপন্ন হইবার যোগ্য। কাজেই বিদেশীয়দের
আমদানী মালের মূল্য চড়িয়া গেলেও ভারতীয় ব্যবসায়ীদের তেমন সুবিধা হইবার কথা নয় কিন্তু

বিশেষ সুবিধা হইতে পারে ইংলণ্ডের ও উপনিবেশ-সমূহের যদি তারা সুযোগ পাইয়া
বাজার হইতে তাড়াইতে পারে। ইংলণ্ডের ও উপনিবেশদের যে সুবিধা হইবে
দিতে হইবে আমাদের—ক্ষতিগ্রস্ত
আমরা বিদেশীয়দের কাছ হইতে অপেক্ষাকৃত কম দামে কিনি সেই দ্রব্যই তখন অপেক্ষাকৃত
দামে কিনিতে হইবে ইংলণ্ড ও উপনিবেশসমূহ হইতে।

কথাটাকে আর একটু স্পষ্টভাবে বুঝিবার চেষ্টা করি। যে মাল এখন বিদেশীয়েরা
এদেশে প্রেরণ করে সে মাল ইংলণ্ড ও উপনিবেশ সমূহ প্রেরণ করিতে পারে না কেন? পারে
না—তারা বিদেশীয়দের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সমকক্ষ নয় বলিয়া, অর্থাৎ বিদেশীয়েরা
সব মাল বিক্রী করিতে পারে, তাদের সে দামে দিবার সামর্থ্য নাই। বিদেশীয়দের
তাদের হাত হইতে সে সব মাল পাইবার আনন্দ পাইতে হইলে দক্ষিণাটা বেশী দিতে হইবে।

আর একটা কথা দেখিবার আছে। বিশেষজ্ঞেরা বিবেচনা করেন যে সব মাল
এখন এদেশে পাঠায় তাহার অনেক মালই ইংলণ্ডে উৎপন্ন হইবার অনুপযোগী। মানে
বিদেশী আমদানী বাণিজ্য লোপ পাইলে তাহা বিশেষ করিয়াই উপনিবেশসমূহের হাতে
এরূপ অনুমিত হয়।

আমদানী-বাণিজ্য সম্বন্ধে মোটের উপর ব্যাপারটা তাহা হইলে এই দাঁড়াইল—Preferential
Policy প্রবর্ত্তনের ফলে ইংলণ্ডের বিশেষ লাভ হইবার সম্ভাবনা সামান্য; লাভ হইবে উপনিবেশ
সমূহের, আর ক্ষতি হইবে বিদেশীয়দের ও আমাদের। বিদেশীয়দের কথা তারা নিজেরা ভাবিবে
কিন্তু আমাদের কথা কি? উপনিবেশ সমূহের সুখ-সুবিধার্থ আমাদের ক্ষতি স্বীকারের
ও আবশ্যকতা আছে কি? অবশ্যই নিজেদের নাক কাটিয়া বিদেশীয়দের যাত্রা ভঙ্গ করার
পাইবার মত প্রবৃত্তি ও ইচ্ছা আমাদের থাকেত সে কথা আলাদা।

এইত গেল আমদানী বাণিজ্যের কথা। এখন রপ্তানির দিকটা একবার দেখা যাক।

রপ্তানি মালের শতকরা ২৫ অংশ যায় ইংলণ্ডে, প্রায় ১০ অংশ যায় উপনিবেশসমূহে ও বাকী
যায় বিদেশে। অর্থাৎ রপ্তানী মালের মোটের উপর ½ অংশ ইংলণ্ড নেয়, ⅖ অংশ নেয় ইংলণ্ডের
উপনিবেশগুলি মিলিয়া, বাকী ⅖ অংশ বিদেশে যায়। Preferential Policy প্রবর্ত্তিত হইলে
এই ⅖ অংশের উপর রপ্তানী শুল্ক বসিবে ও বাকী ⅗ অংশ শুল্ক দিবার দায় হইতে রক্ষা পাইবে।

রপ্তানী মালের প্রায় সমস্তই খাদ্য শস্য (food stuffs), উপকরণ শস্য (non-food stuffs)
ও কাঁচা মাল (raw materials)। এ সমস্ত জিনিসের জন্য ইংলণ্ড ও বিদেশীয়েরা আমাদের
উপর প্রায় সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল—অর্থাৎ এ সব জিনিস আমাদের একরূপ একচেটিয়া। একচেটিয়া
একচেটিয়া বলার মানে এই যে পরিমিত মাত্রায় ইহাদের উপর শুল্ক বসাইলে ইহাদের রপ্তানী
বন্ধ হইবে না বটে, কিন্তু উচ্চহারে শুল্ক বসাইয়া দাম অযথা বাড়াইয়া দিলে শিল্পীরা এইসব মাল

মালামাল দিয়া কাজ চালাইবার পথ খুঁজিবে এবং ফলে এ সব মালের রপ্তানী হ্রাস,
লোপ পাওয়াও অসম্ভব নয়।

দেখা যাইতেছে রপ্তানী মালের উপর পরিমিত মাত্রায় শুল্ক বসাইয়া আর কিছু
পরিমাণ রাজকোষে অর্থাগম হইতে পারে। চা, পাট ও চামড়ার উপর শুল্ক প্রবর্ত্তনের অভিজ্ঞতা
এ কথার সায় দেয়। কিন্তু ইহার জন্য Preferential Policyর আবশ্যকতা নাই ত। নির্ব্বিচারে
সব রপ্তানি মালের উপর শুল্ক বসাইয়া আমরা লাভবান হইতে পারি। ইংলণ্ড ও উপনিবেশ
সমূহে যে ⅖ অংশ মাল রপ্তানী হয়, সে অংশের শুল্ক হইতে আমরা বঞ্চিত হই কেন? কোন্
সদুদ্দেশ্যে? ভারতবাসীদের প্রতি উপনিবেশীয়দের স্নেহের প্রাচুর্য্যতা যে তাহাদের
স্বার্থে আঘাত ঘটায় না সে কথা ত কাহারওই অবিদিত নাই। তাহাদের মিত্রত্ব তবে এমনি
কি জিনিষ যার জন্য অর্থ ক্ষতিকেও আমরা অবহেলার উপেক্ষা করিতে পারি?

আমাদের রপ্তানী মালের জন্য বিদেশীয়েরা যেমন আমাদের উপর নির্ভরশীল সেই সব মাল বিক্রীর
জন্য তারা তুল্যরূপে তাহাদের মুখাপেক্ষী। তাহারা সে সব মাল ক্রয় না করিলে তাদের
অর্থ মুখ দেখার আনন্দ সুনিশ্চিত। সুতরাং তাহাদের দেশ হইতে আমদানী মালের উপর শুল্ক
বসাইয়া তাহাদের চটাইয়া দেওয়া খুব বুদ্ধিমানের কাজ না ও হইতে পারে।

একৃত কথা এই যে ব্যবসা ও বাণিজ্য ব্যাপারে আমাদের প্রবল ও প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী
বিদেশীয়েরা নয়, ইংলণ্ড; আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি ও বিশ্বাসানুযায়ী আমরা সংরক্ষণনীতি চাই
বিদেশীদের বিরুদ্ধে তেমন নয়, যেমন ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে। Preferential Policyর প্রবর্ত্তন দ্বারা
আমাদের সে আশা বর্ত্তমানে ত পূর্ণ হইবেই না—ভবিষ্যতের আশা ও ক্ষীণ হইয়া উঠিবে। তাই
Preferential Policyকে সাদরে বরণ করিয়া লওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়।

১৯০৩ সনে India Govt. এ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে Preferential
Policyর প্রবর্ত্তন দ্বারা এ দেশের ইষ্ট হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, কিন্তু অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা
যথেষ্ট—সে সিদ্ধান্ত ২০ বৎসর পরে আজও তুল্যরূপে খাটে। ব্যবসা বাণিজ্যে ক্ষেত্রে তখনো
যেখানে ছিলাম এখনো প্রায় তাই আছি—অবস্থার উল্লেখযোগ্য কোনই তারতম্য হয় নাই।
কত কি না হইতে পারিত? কত সুযোগই না অনাদৃত হইয়া চলিয়া গেছে! স্বদেশীর যুগের
কথা নাই বা তুলিলাম, কিন্তু এই ইউরোপীয় মহাসমর যে সুযোগ উপস্থিত করিয়াছিল তেমন
সুযোগ কদাচিৎ কখনো আসে। যখন ইউরোপীয় ও এমেরিকার প্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পীদের কল-
কারখানাদি মানুষ মারিবার অস্ত্র তৈরী করিতে নিযুক্ত ছিল, সে সুযোগেও যাহারা কিছু করিতে
পারে নাই, তখনও যাহারা অতীত গৌরবের স্বপ্নে বিভোর ছিল—বর্ত্তমানে তাহাদের অন্নবস্ত্র
জুটিবে না—ইহাইত স্বাভাবিক।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

যুঁইফুল

(১)

যুঁইফুল—যুঁইফুল! যুঁইফুল দেখেছ ত? ছোট ছোট সাদা কোমল ফুলগুলি, কচি কচি সাতটী পাপড়ি, তারই অন্তরকোষে একটী মনোমদ অপূর্ব্ব গন্ধ,—ঠিক যেন স্বর্গের একটী ক্ষুদ্র ও অস্পষ্ট আভাস! দেখেছ যুঁইফুল? ঐ ফুলের সঙ্গে আমার জীবনের অনেক কাহিনী জড়ানো মাখানো আছে। আমার কাহিনীটা পড়বার আগে মন দিয়ে একবার যুঁইফুলের গন্ধ উপভোগ করে নিও। সেই সব ভোলানো পাগল-করা সুধাগন্ধ,—কোমল অথচ তীব্র—প্রাণ জ্বলে' জ্বলে' পুড়ে ছাই হয়ে যায়, হৃদয় যেন কোন্ সুদূরের দেশে গিয়ে হারিয়ে যায়।

ছেলেবেলায় যে সময় সবাই লেখাপড়া করে থাকে, স্কুলকলেজে যায়, আমার সে সময় বাঁশী বাজিয়ে আর গান গেয়েই কেটে গিয়েছিল। বাবার অনেক টাকা ছিল, গাঁয়ের [illegible] জমীদার, তাঁর হুকুমে যে বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খেত—এ কথা ভিন্-গাঁয়ের লোকেও স্বীকার করতো। মা আমার খুব কোমলস্বভাবা ছিলেন, তিনি কোন বিষয়েরই সাতে-পাঁচে থাকতে পারতেন না। আমি বাবার একমাত্র সন্তান কিনা, তাই যা-খুসী-তাই করবার চূড়ান্ত সুযোগ পেয়েছিলুম। গান, ফুল, বাগান, বাঁশী, কবিতা—এ সবই ছোট বেলা থেকে আমার একান্ত সঙ্গী হয়ে গিছল। একটী বিদ্যার জন্য ছেলেবেলা থেকেই প্রাণপণ করেছিলুম,—তাহা সঙ্গীত। দিনরাত ঐ সাধনায় মন মজিয়ে সর্ব্বস্ব দিয়ে আমি একটী সুর, একটী তান, একটী মীড় শেখবার জন্য যে কি না করতে পারতুম, তা এখনো ঠিক করে বলতে পারিনে।

আমার যখন বাইশ বছর বয়েস, তখন গায়ক বলে' আমার একটা খুব নাম বেরিয়ে গেছে। যাদুকরের হাতের খেলার মত বড় বড় রাগ-রাগিনী তখন আমার কমনীয় কণ্ঠে খেলে যেত। সে স-লীল অবিশ্রান্ত সঙ্গীত শুনে অনেক ওস্তাদ ও গুণী আমার কাছে হার মেনে যেতেন। আমার এ কাজে একমাত্র উৎসাহ-দাতা ছিলেন আমার বাবা, যাঁকে আমি ঠিক দেহী দেবতার মত দেখতুম। প্রতিবৎসর পূজার সময় আমাদের বাড়ীতে একটা উৎসব চলতো প্রায় একমাস ধরে। সেই উৎসবে দেশবিদেশের গায়ক সমবেত হতো। দিল্লী, লক্ষ্ণৌ,—অনেক দূরবর্ত্তী স্থান থেকে সুবিখ্যাত গায়ক ও গায়িকারা নিমন্ত্রিত হয়ে আসতেন। সেবার পূজার সময় উৎসবের ধারাটি কিছু বেশীদিন ধরে' গড়িয়েছিল। আমার মনের ফুলবনে তখন বসন্তের হাওয়া সবে-মাত্র ছুঁয়ে গেছে, জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলা যেন একটা বাইরের নাড়া পেয়ে নবীন ভরসায় নূতন তেজে উগ্র হয়ে উঠেছে।

এমন সময় বিজয়ার দিন সন্ধ্যার সময় বাড়ীময় একটা আনন্দের কলরোল বয়ে গেল—কাশীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠা গায়িকা মুন্নাবাই আমাদের বাড়ী নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছে।

গানের দরবারের শ্রেষ্ঠ আসনটী এ পর্য্যন্ত আমারই জন্য নির্ব্বাচিত করা থাকত। সেজন্য আমার স্পর্দ্ধাটা যে কিছু পরিমাণে বাড়েনি, এ কথা বলতে পারি না। বিসর্জ্জনের সানাই-এ তখন সাহানার মিঠে আওয়াজ বাজচে। বিদ্যুতের আলোকে, ফুলের গন্ধে, সুসজ্জ লোকের ভিড়ে আমাদের দ্বিতলের হলঘর মশ্‌গুল্। অনেক বড় বড় জমীদার সেদিন বাবার অতিথি হয়ে এসেছেন। ত্রিতলের ভিড় কাটিয়ে যখন 'নাচ ঘরের' দুয়ারের সম্মুখে তরঙ্গায়িত গোলাপী সিল্ আবরণীটার কাছে এসে দাঁড়ালুম, তখন দেখি বাবা আমাকেই খুঁজচেন। গানের পাল্লায় গান ঠুকে ঠুকে-আমার শক্তি ও সাহস অসম্ভবরূপে বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেদিন যে আমার কি হলো.....

প্রকাণ্ড হলটী পুরু কাশ্মিরী কার্পেটে মোড়া, তার উপর সিল্কের একটী উচ্চ শয্যা। স্বর্গের অপ্সরীর মত একটী ছোট্ট মেয়ে সেইখানে বসে আছে—তার বয়েস চোদ্দ কি পনেরো। গায়ে তার অলঙ্কার বাহুল্য নেই, কিন্তু সেই বেণারসী শাড়ী খানির রংটী—এখন আমি সেটা ঠিক মনে করতে পারছিনা,—না-সবুজ, না-ফিকে-গোলাপী, না-আসুমানি, না-চাঁপাফুলী! হরিণীর মত তার ব্যগ্র চঞ্চল চোখ দুটীর কোমল চাউনিটি যেন আষাঢ়ের কালো-মেঘের কোলে বিদ্যুৎ-বিলাস! বড় বড় বাবুরা সবাই তার চারিদিকে আসর জমিয়ে বসেছেন—শুধু তার একটী কথা শোনবার জন্য, তাকে একটু প্রীতি দেবার জন্য। সে কিন্তু কারও দিকেই ফিরে চাইচে না, সে যেন বাঙ্গালী জমীদার বাবুদের এই উৎসব ও আমোদ প্রমোদ দেখে মনে মনে একটু কৌতুক অনুভব করছে,—আর মাঝে মাঝে তার দৃষ্টি চলে যাচ্ছে অনেক দূরে—উৎসব প্রমোদ বিলাস ছাড়িয়ে কোন্ এক রৌদ্রোজ্জ্বল মাঠের পারে, যেখানে রাখালেরা গরু চরায় আর পাহাড়ের কোলে শালগাছের ছায়ায় বসে' বাঁশী বাজিয়ে বাজিয়ে জগতে স্বর্গরচনা করে, পারিজাত ফোটায়, মন্দাকিনীর অমল ধারা বইয়ে দেয়।

(২)

'ওহে অমল তোমাকেই যে খুঁজচি, এ ভদ্রলোকটী তোমার মল্লার আর বেহাগ শোনবার জন্য কাশী থেকে এসেছেন। ইনি নিজের মেয়েটীকেও এনেছেন, এঁর নাম শুনেছ বোধ হয়—মুন্নাবাই।'

পিতা ও কন্যা উভয়েই জোড়-করে সহাস্যমুখে আমায় অভিবাদন জানালেন। তখন বাইরের সব ভিড়টা, হলঘরের মুক্ত দ্বারগুলার ভিতর দিয়ে জোয়ারের জলের মত ভিতরে ঢুকে পড়ছে, অথচ কারো মুখে কোনো কথা নেই। আমি প্রত্যভিবাদন জানিয়ে বিস্ময়ে, সম্ভ্রমে, আনন্দে একেবারে যেন মুহ্যমান হয়ে পড়লুম। আশাতীত কোনও বিপদ ঘটলে লোকে যেমন নিরুপায় অসহায়ভাবে চারিদিকে চেয়ে থাকে, অথচ কোনও দিকে কিছু কূল কিনারা পায় না, এ যেন ঠিক সেই রকম। তার পিতার সাদর আহ্বানে মেয়েটীর সমুখেই আমাকে বসতে হলো। সে সসম্ভ্রমে অনেকখানি যায়গা আমায় ছেড়ে দিয়ে আমার দিকে ফিরে বসলো। বাবার গর্ব্ব

ছিল শুধু আমি দেশবিজয়ী গায়ক বলে নয়, আমি নাকি খুব সুপুরুষও ছিলাম। কিন্তু যে সৌন্দর্য্য জয় করতে জানেনা, কেবল নিজেই বুক ফুলিয়ে চলে, তার আবার মূল্য কি? এতদিন যে কথাটা বুঝিনি, আজ বুঝলুম। এর পূর্ব্বে ত অনেক নারী-মহলে ললাটে জয়-টীকা লাভ করে এসেছি, কিন্তু কই, এমন ত কোথাও হয়নি!.....

আমার উপর যখন গান গাইবার অজস্র অনুরোধ চলেছে, তখন আমি সুবোধ ছেলেটীর মত মুখ নীচু করে' বসে আছি। আমি মুন্নার বাবাকেই গাইতে অনুরোধ করলুম। কিন্তু তিনি আমায় বল্লেন, 'আপ্ জেরা গায়িয়ে, বাবুসাহ্ব্। আপ্‌কো গানা শুন্‌নেকে লিয়ে হাম্‌লোক বহুৎ দূর্‌সে আয় হ্যাঁয়!'

কি. গাইবো ছাই! সম্মুখে একটা স্বর্ণজড়িত ফুলদানে অজস্র গোলাপ ফুল ছিল—রক্ত শ্বেত ও হরিদ্রাবর্ণের। একটী রক্ত গোলাপ তুলে নিয়ে আনমনে তার বিকচ পাপড়িগুলি নির্ম্ম ভাবে নখাঘাতে ছিঁড়তে লাগলুম। কি গান গাইবো?

'এক্‌ঠো দেশ্ গায়িয়ে, বাবু সাহ্ব্।'

অনুরোধ যখন মানুষে আর কোনোমতে এড়াতে পারেনা, তখন সে হাল ছেড়ে দিয়ে যা করে বসে। আমারও সেই দশা হলো—আমি তানপুরায় সুর দিয়ে আস্তে আস্তে গলা তুলে গাইলুম—

'বাদররে, ঘুমকে ঘুমকে ঘন ঘোর আওয়ে।
বিজুরী চমকে জিয়া ডর্ পাওয়ে
বাদর রে'—

কার্ত্তিকের প্রথমে সেদিন সন্ধ্যায় বেশ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, আমার সুর ব্যাকুল আবেগে অন্তরার পথে ছুটে চললো পাগল হাওয়ার মত—

'নিশু আঁধি আয়ি কারি
বিজুরী চমকে
মুঝে সন্ দে পিয়া পরতো হ্যয়—
এ সখি, যাও লায়ো মানায়ে
বাদর রে'—

গানের সঙ্গে হারমোনিয়মে সুর দিচ্ছিল মুন্না নিজে। 'এ সখি, যাও লায়ো মানায়ে' বলতে বলতেই মুন্নার মুখের দিকে চেয়ে দেখি যে সেই সুন্দর নবকিসলয়-প্রতিম মুখখানি উজ্জ্বল হাস্যে ভরে উঠেছে। আমার আর আস্থায়ীতে ভাল করে ফিরে যাওয়া হলো না, সুর কেটে গেল, মীড়গুলো সব গুলিয়ে গেল। আমি আর একবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু পারলুমনা। মুন্নার পিতার মুখ কিন্তু বেশ সুপ্রসন্ন বলে' মনে হলোনা। তিনি আমার গান শুনে বিশেষ প্রীত হননি বুঝলুম।

সকলেই অনুরোধ করে বসলো যে এবার মুন্নার গান হবে। এই ছোট্ট তন্বঙ্গী মেয়েটী যে কঠোর-সাধ্য সুরে কি গান গাইবে তা আমি বুঝেই উঠতে পারলুম না। আমি তাকেও একটী দেশমল্লার গাইতে অনুরোধ করলুম। সে বেশ সপ্রতিভভাবে গলা সেধে নিয়ে দক্ষিণ হস্তে বৃহৎ তান-পুরাটী তুলে নিলে। কোন দিকে চাইলেনা, সেই বিচিত্র জন-মণ্ডলীর ব্যগ্র উদ্বেগ তাকে একটুও ব্যস্ত করতে পারলেনা, সে পর্দ্দায় পর্দ্দায় গলা উঁচু করে' নিপুণ কাওয়ালের মতই আরম্ভ করলে—

'চমকানি লাগে বরষে বাদরোয়া' ইত্যাদি—

ধীরে ধীরে পর্দ্দা ছুটে চললো ঐ 'বাদরোয়া' কথাটার উপর। আমার মুগ্ধমনের উপর একটা চঞ্চল শিহরণ বয়ে গেল। আমি হার মেনে উচ্চকণ্ঠে বললুম,—'অতি চমৎকার!' মুন্না গান শেষ করে'. আবার একটু হাসলে। তার পিতার মুখ তখন গৌরবে উজ্জ্বল। সকল শ্রোতাই এর শ্রেষ্ঠত্ব এক বাক্যে স্বীকার করলে, আমার বাবাও বাদ দিলেন না। তখন আমার মনের উপর যেন একটা নিবিড় কুহেলিকা ঘনিয়ে এল, সেই আলো-গান-উৎসব-বিলাস-বর্ণ-গন্ধ সব আমার চোখের কাছে কালো হয়ে এলো, আমার মাথার ভিতর ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগলো, আমি যেন ঐ মল্লারের আস্থায়ীর মতই ধীরে ধীরে কোথাও মিলিয়ে যেতে লাগলুম। .....মুহূর্ত্তের মধ্যেই সভার মাঝখানে আমি জ্ঞানহীন হয়ে পড়ে গেলুম। সভায় যে একটা হাহাকার ধ্বনি উঠলো—মনে আছে সেটা ঠিক একটা কলগুঞ্জনের মত আমার কাণের কাছে সুরের মত ভেসে এলো।.. .....

এতদিন নারীর নিঃস্বার্থ সেবার নিদর্শন আমার চোখে পড়েনি। কিছুক্ষণ পরেই আমার চৈতন্য ফিরে এলে দেখি, মুন্না সযত্নে আমার মাথাটী তার কোলে তুলে নিয়েছে, আর তার মূল্যবান্ বসনাঞ্চল বরফের জলে ভিজিয়ে আমার মাথায় ও কপালে নিষেক করছে। বাবা ব্যগ্র উদ্বেগে জিজ্ঞাসা করলেন—'কেমন আছ, বাবা?' মুন্নারও মুখে চোখে একটা ব্যাকুল উদ্বেগ। তখনো নিষ্ঠুর পরাজয়ের বেদনা আমার মাথার ভিতর ঝিম্ ঝিম্ করছে—যেন মল্লারে বাজচে—

'ঝিল্লি ঝনকত ধরণী দমকত ঝলকত বাদর পাপিয়া না বোলে রে'—

মনে পড়ে যেন মোগলদের দরবারে চলে গেছি স্বপ্নের পথ দিয়ে। সম্রাট্ শাহান্ শাহ্ বহুমূল্য অম্বুরী তামাক সেবন করছেন—স্বর্ণহীরকজড়িত গড়গড়ার নল দিয়ে। বিচিত্র সিংহাসনের চারিদিকে যেন কত সভাসদ বসিয়া। এমন সময় যেন প্রধান বন্দী এসে আশীষ-জ্ঞাপক দক্ষিণ হস্তটী উচ্চ করে' ধ্রুপদের ধীরলম্বিতচ্ছন্দে একটি স্বরচিত প্রশস্তি-গাথা গান করছেন। সব যেন স্তম্ভিত, স্থির ও প্রশান্ত হয়ে গেছে। দিল্লীর বাদশাহ্ মেহেদীর-পাতায়-রাঙা করপল্লবে যেন নিজের গলার হীরার মালা খুলে গায়কের কণ্ঠে পরিয়ে দিলেন। অথবা মনে পড়ে—আমি যেন কোন্ মোগল অন্তঃপুরের গোপন নিকেতনে সাদরে আহুত হয়ে চলে গেছি;

আমার সম্মুখে বাঁয়া তবলায় সঙ্গৎ দিচ্ছে যেন অতিবৃদ্ধ পুরুষ একজন—পারস্যের ওস্তাদ,—সে যেন চিরজীবন গান গেয়ে গেয়ে গানের মীড়ের অন্তরে ঢুকে গেছে কমলদলের কোমলকোষে মধুমত্ত ভ্রমরের মত। তাহারি চারিদিকে বসে আছে—টানা টানা চোখ আর বাঁকা বাঁকা ভুরু তুলে মোগল বাদশার অন্তঃপুরিকাগণ। নিটোল আঙ্গুরের মত গালে আপেল ফলের গোলাপ-রাগ, সুডৌল পরিপুষ্ট বাহুযুগে একটা অনবদ্য স্বাস্থ্য-সমৃদ্ধি, আর দৃঢ়পিনদ্ধ বক্ষোবাসে নদীর ঢেউ, গানের ছন্দ ও নৃত্যের উচ্চাবচ গতিটীকে যেন বন্দী করে ফেলেছে। তারা কেউ গাইছে হিন্দোল, কেউ কজরী, কেউ ভীম পলাশী, কেউ বা গজল, কেউ বা ঠুংরি। ওস্তাদের উন্নাস-ভাস্বর মুখখানি সেই নূতন সুরের নিবিড় মোহে আরক্ত হয়ে উঠেছে সন্ধ্যার আকাশের মত, অথচ তার চোখের দৃষ্টি চলে গেছে সেই মর্ম্মর বাতায়ন ভেদ করে' ঘাটমাঠ পার হয়ে অনেক দূরে—অনেক দূরে। সেই শ্রেষ্ঠা সুন্দরীদের মাঝখানে বসে আছে প্রেমে আনন্দে লজ্জায়—আমারই যেন একজন মুগ্ধা প্রণয়িনী!.....

কোন্ সুলতান নিজামুদ্দীনের দরবারে যেন আমার আহ্বান এসেছে,—সেখানে যেন পট্টাম্বর পরে' আমার চিরসাথী তানপুরাটী বুকে ধরে' গিয়ে পৌঁছেচি। মর্ম্মর আবরণীর আড়ালে শত নারীর চক্ষু ও কর্ণ যেন আমার আলাপের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। আমি যেন দরবারী কানাড়ায় বাদশাহের প্রশস্তি-গান করছি—আমার দক্ষিণ হস্তটী যেন গানের মীড় মূর্চ্ছনা ও তানগুলি দেখিয়ে যাচ্ছে বাতাসের মাঝে, গানের ঢেউ এঁকে এঁকে। আমার গানের তালে তালে কা'রা যেন সম্ ফেলে যাচ্ছে কোলের উপর, যেন তারা আমারই সুরের রসে মজে উঠেছে!.....

এমন সময় মুন্না ডাকলে—বাবু সাহ্‌ব্!—

আমার আবেশময় তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল.....আমি উঠে বসলুম। তখনো কাণে বাজছে—'বরষে বাদরোয়া—আ—আ—আ—আ—আ!' —সেই ছন্দ-দোদুল গলে-যাওয়া মল্লারের তান।

(৩)

চৈত্রের শেষে কাশী আসা হলো মা ও বাবাকে সঙ্গে নিয়ে। তখন আমার গানের আসর খুব জমে উঠেছে।

বাবার একজন হিন্দুস্থানী বন্ধুর বাড়ীতে গানের মজলিশে একদিন আমাদের নিমন্ত্রণ হলো।

সেদিন চৈত্র পূর্ণিমা। পশ্চিমা গাইয়ে-রা প্রকৃতির সঙ্গে যেন তালে তালে পা ফেলে চলে। প্রকৃতির যা-কিছু সৌন্দর্য্য আছে, সবই তারা যেন বাঁশীর তানে, গানের সুরে, নাচের ঢং-এ ফুটিয়ে তুলে নিতে চায়। সেই জন্য তাদের ধ্রুপদ, খেয়াল বা টপ্পা আমার এত ভাল লাগতো। সেখানে গিয়ে দেখি—একজন ওস্তাদ পঞ্চম গুলিতে বেশ রং লাগিয়ে গৌড়সারং গাইছে। তারপর এলো মুন্নাবাই তার বাপের সঙ্গে। অনেক দিন পরে দেখা—কিন্তু সেই সুন্দরী তন্বঙ্গীর রূপ পূর্ণতর মতই কিশোর-সৌকুমার্য্যে ভরা। গানের যৌবন যাদের মনের ফুলে রং ধরিয়েছে, সে রং কখনো

মনে বিকশিত হয় না,—বার্দ্ধক্যেও সেই তরুণ সুকুমার ভাবটী তাদের অন্তরদেশ মজিয়ে রাখে। সে আমাকে দেখেই একটু হাসলে—ছোট্ট একটু হাসি—যেন হাল্কা মেঘের মাঝে তৃতীয়ার চাঁদ হারিয়ে-যাওয়া। নিটোল ব্রেস্‌লেট্-পরা হাত দুখানি তুলে সে আমায় একটী ক্ষুদ্র অভিবাদন জানিয়ে আসরের মাঝে এসে বসলো। সকলে সসম্ভ্রমে এই ঘরানা-গাইয়ে-দের জন্য আসন ছেড়ে দিলে। তার মনে এমনি একটী সহজ সংযম ও অটুট দৃঢ়তা ছিল যে, দেখলেই মনে হত মেয়েটী বজ্র ছাঁচে গড়া। অথচ তার কিশোর-সুকুমার ওষ্ঠাধরপুটে ও চক্ষের কোমল চাউনিতে যেন জগতের একটা চিরন্তন দুঃখ লুকানো রয়েছে বলে' মনে হলো।

গৌড়সারং গানের সময় সে তার সুদূর উদাস দৃষ্টিতে মাঝে মাঝে আমার দিকে ফিরে ফিরে চাইতেছিল, আবার লজ্জাহত হয়ে হাতের আঙ্গুলে তার ওড়নার প্রান্তভাগটী জড়াচ্ছিল।

আমার পালা এলে আমি রবীন্দ্রনাথের সেই দুঃখের ব্যথাভরা গানটী ধীরে ধীরে আরম্ভ করলুম,—

'আমার সকল দুখের প্রদীপ জ্বেলে দিবস গেলে করবো নিবেদন—
আমার ব্যথার পূজা হয়নি সমাপন।'

অশেষ আগ্রহে মুন্না সরে' এসে আমার সেই গুমরে-কাঁদা চিরবিরহের গানটী শুনতে লাগলো। তারপর যখন গাইলুম—

'অনেক দিনের অনেক কথা—
ব্যাকুলতা
বাঁধা বেদন ডোরে,
তারা মনের মাঝে উঠেছে আজ ভরে।'

তখন দেখি, সবুজ সিল্কের রুমালখানি সে চোখে চাপা দিলে, যেন অন্ধকারের নিবিড়তায় আমার দুঃখের নিবেদনটী তার প্রাণের ভিতর সে ভাল করে অনুভব করতে চায়। সকলের আগে সে আনন্দসূচক ধ্বনি দ্বারা জানালে যে গানের বাণী তার প্রাণের বেদীটী ছুঁয়ে যেতে পেরেছে।

সে গাইলে বাগেশ্রী—

'যাতে থী যমুনাঘাট দইয়া রে,
দেখে আয়ি মোহনমূরত চন্দ্রমাসে অধিক সোহাগ রে'—

ওগো দইয়া, যমুনার ঘাটে গিয়ে দেখে এসো, সেখানে কি মোহনমূর্ত্তি চাঁদের শোভাকে হারিয়ে দিয়ে দশদিক আলো করে' বসে আছে!—অতি চমৎকার লাগলো। মুন্নার বাবা পরদিন তাদের বাড়ী আমায় নিমন্ত্রণ করলেন। অনেক রাত্রে সভাভঙ্গ হলো, কিন্তু এই গানটী গেয়েই সেদিন চলে গিছলো।

মুন্না সামান্য মুসলমান গৃহস্থের কন্যা। সহায়-সম্পত্তি সবই ছিল তাদের সঙ্গীত। তার

পিতা একজন বড় মুসলমান কাওয়ালের কাছে গান শিখেছিলেন। লোকটী এমনি ভাবে-ভোলা যে মুসলমান সমাজের সকল অনুশাসন এড়িয়ে এখনো মেয়ের বিয়ের কোনই চেষ্টা করেননি। গানই তাঁর পরম ও চরম লক্ষ্য। উর্দ্দু এঁদের জাতভাষা হলেও এঁরা বাঙ্গালাদেশের এত ভক্ত, যে বাঙ্গালাভাষাটীও একটু শিখে ফেলেছেন,—তাঁদের বাড়ীতে সেদিন নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়ে ইহা লক্ষ্য করলুম। সংপ্রতি দেদার বক্স্ নামে একটী যুবক-গায়ক মুন্নার পাণি-প্রার্থী হ'য়ে তাদের বাড়ীতে অতিথি রয়েছেন দেখলুম। আজ দেদার বক্সের গান শুনলুম—ঠিক যেন বাঁশীর মত গলা। লোকটী পাতলা ছিপ্ ছিপে, শৌরী মিঞার টপ্পার একজন মস্ত বড় সাধক। এতদিন গানের দিক দিয়ে এদের দেখে এসেছিলুম, আজ নির্জ্জনে এদের বাড়ী গিয়ে জানলুম যে বাপ ও মেয়েতে একটা ক্ষুদ্র কলহ হয়ে গেছে। বাপের ইচ্ছা যে দেদার বক্সের সঙ্গে মুন্নার বিয়ে হয়, আর মুন্নার ইচ্ছা—চিরকুমারী থাকে। মুন্নার পিতা এই সব সাংসারিক কথার উল্লেখ করে পারিবারিক অশান্তির বিষয় বল্‌ছিলেন। সেদিন মনটা কেমন হয়ে গেল—আমি গান না গেয়েই তাড়াতাড়ি ফিরে এলুম।

পরদিন—তারপর দিন—তারপর দিন। এমনি করে' তাদের বাড়ীতে আমার একটা অবাধ গতায়াতের জাল বোনা চলতে লাগলো। আমি তখনো বুঝতে পারিনি যে আর একজন বহু পূর্ব্বেই সেই জালে ধরা পড়ে গেছে।

মাস তিনেক পরে হঠাৎ একদিন গিয়ে শুনলুম, দেদার 'দেওয়ানা' অর্থাৎ পাগল হ'য়ে গেছে। লোকটার নাকি আগেই ছিট্ ছিল। তার বাপ তাকে দেশে নিয়ে গেছে,—মুন্নার পিতা মনটী একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে।

সেদিন অপরাহ্ণে তানপুরাসহযোগে মুন্না গান সাধছিল। আমাকে দেখেই সে উঠে গেল। পরক্ষণেই আমার জন্য পান এনে ফরাসের উপর রেখে বললে—'মেরে ওয়ালিদ্ আজ লাহোর গয়া হ্যাঁয়'—আমার বাবা আজ লাহোর গেছেন।

আমি বিদায় লইবার জন্য ব্যস্ত হলুম দেখে সে বললে, 'ন্যহি, ন্যহি, বইঠিয়ে। আপ্‌কা গানা শুন্‌তে হামার দিল্ ফিদা হো গেয়া। একঠো গায়িয়ে।'

সেই সুন্দর লাজমিশ্রিত হাসি!

'আইয়ে, হামরা ত এখানে গাই না, হামাদের কোঠীকো পাশ যে বাগিচা হ্যাঁয়, উঁহা হামারা গাই। আয়িয়ে'—ভাঙ্গা উর্দ্দু ও বাঙ্গালার এই অদ্ভুত ভাষাটী আমার বড় ভাল লাগলো।

তার মুখে চোখে সহসা একটা রক্তরাগ ফুটে উঠলো, সে যেন বুঝতেই পারছে না যে সে কি চায়।—সে যেন বড় ভয়সাহারা ও ত্রস্ত হয়ে পড়লো। কি-জানি-কেন আমার সব গুলিয়ে গেল।—বাড়ীর পিছুনে একটী ক্ষুদ্র উদ্যান, কূপের কাছটীতে অনেক যূঁইফুলের যত্নরোপিত গাছ আষাঢ়ের ধারাধৌত যূথিকার মধুর গন্ধে সমস্ত স্থানটী ভরপুর হয়ে আছে। সে একটা

গার্পেট পেতে আমায় বসতে আহ্বান করলে—তানপুরাটী আমার হাতে তুলে দিয়ে সচকিত হয়ে দূরে বসে রইলো। এই গান-পাগলা মেয়েটী আমার গানে এমন কি নূতন সৌন্দর্য্য পেলে যে একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেল? আমি ভৈরবীতে ধরলুম—

'রসিলী তোরী আঁখিয়ারে জিয়ালালচায়'—

দু'একটী ফুটন্ত জুঁই গানের সুরে বুঝি মুগ্ধ হয়েই তারার মত খসে পড়তে লাগলো, তখন আকাশের তারাগুলিও স্বর্গের নন্দন-বন ছেড়ে মর্ত্তের দিকে তৃষাহত আশাভরা চোখে চেয়ে দেখছে।.....

'বাবুসাহ্‌ব্, আপ্‌কো কভি ঈশক্‌কো তজুরবা হুয়া?' আপনি কখনো প্রেমে পড়েছেন?—সহসা এই প্রশ্নের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। অথচ এই মেয়েটীকে আমার ভারি ভাল লাগতো। কিন্তু সে যে মুসলমানী, আর আমি কুলীন ব্রাহ্মণ! আমার ভৈরবীতে বুঝি ঐ কথাটীই লুকানো ছিল—তাই সে আমায় ঐ কঠিন প্রশ্ন করলে। আমার লজ্জাসংশয় সব দূর করে দিয়ে একটী আধফুটন্ত যূঁই-এর কলি তুলে নিয়ে সে বললে—

'মেরা দিল্ নেহায়েৎ বেচ্যায়েন্ হো গেয়া হ্যাঁয়।—কেঁও, বাবুসাহ্‌ব্? বঙ্গলা মুলুক মুঝে বহুৎ পেয়ারা মালুম হোতা হ্যায়—ইহাঁকা আস্‌মান্, ইহাঁকী হাওয়া, ইহাঁকী হারিয়ালি—' সে আনন্দে বিহ্বল হয়ে বাঙ্গালা দেশের আকাশ বাতাস, সবুজবর্ণ স্নিগ্ধতা ও গাছপালার অজস্র প্রশংসা করতে লাগলো।

'আপ্‌কা রোজ্ কেঁও নহি আতে হ্যাঁয়? আপ্‌কে গানে প্যার্ মেরা দিল্ ফিদা হো গেয়া'—আপনার গানে যে আমি বন্দী হয়ে আছি!

আমি বল্লুম, 'দেখুন, আপনার গানও আমার বড় ভাল লাগে। আর আপনাকে আমার আরও ভালো লাগে।'

সে শিশুর মত হেসে উঠলো। সে কৌতুকের সহিত প্রশ্ন করলে—'কায়্‌সে, বাবুসাহ্‌ব্?—মুঝে?'

'এই আপনার হাসি, আপনার রূপ, আপনার সুন্দর ব্যবহার—'

'আপ্‌কা রোজ কেঁও নহি আতে হ্যাঁয়? ব্যগয়ের্ ওয়ালিদ্‌সাহেবকে সাথ্ ম'য় কাঁহি নঁহি গয়ী হু। আপ্ জিস্ রোজ্ নেহী আতে হ্যাঁয়, উস্ রোজ্ আপ্‌কে পাশ্‌মে নেহী যা শক্‌তি হুঁ,—ফের আপ্‌সে মিল্‌নে কি বড়ী হোয়াহিশ্ রহ্‌তী হুয়্।'

'আপনার বিয়ের কি হলো?'

'আপ্ আয়্‌সে ন্য ফরমাইয়ে। ম'য় সাদী ন্যহী করুঙ্গী।'

'মাপ করবেন, যদি আপনার মনে কষ্ট দিয়ে থাকি।'

তার পদ্মের পাপড়ির মত কোমল চোখের পাতায় কিসের একটা অবসাদ—মোহ কে এলো,—সে চোখ দুটী নত করে' কার্পেটের চারুশিল্পে অঙ্গুলি সঞ্চালন করতে লাগলো।

আমি সেদিন বিদায় নিলাম।

(৪)

আর একটী দিন—শুধু একটী দিনের কথা।

গয়ায় একটী বিখ্যাত এস্রাজ-বাজিয়ের বাড়ীতে আমার গান গাইবার নিমন্ত্রণ এসেছে। সেদিনও আষাঢ়ের বর্ষণ-মুখর সন্ধ্যা। তাঁদের বাড়ীর বৈঠকখানাটী যূঁইফুলের গন্ধে পাগল হয়ে আছে। যূঁইফুলের গন্ধ আমার প্রথমযৌবনের গজল-গান। ঐ গন্ধের জোয়ারে আমার গানের সকল চেষ্টা ভেসে যায়। সমস্ত সভা তখন গুল্‌জার। সকলে আমার প্রতীক্ষায় ব্যগ্র ও উদ্গ্রীব হয়ে আছে। আমি তখন কঙ্করির মিঠে সুরে ধরেছি—

'বরখা লাগা মোরে শুঁইয়া সইয়াঁ নহিঁ আয়ে হাঁ'—

গমকে গমকে সুর চললো—ইমন কল্যাণের পঞ্চমে, আড়ানার পঞ্চমে, মুলতানের পঞ্চমে। সভায় তখন অন্যান্য অনেক গায়ক ও গায়িকার সমাগম হয়েছে। আমার গাহিবার আর বিরাম নেই। গান গাইতে গাইতে আমি যেন উদ্দাম, উচ্ছৃঙ্খল, বাঁধভাঙ্গা নদের মত ঘূর্ণাবর্ত্ত সৃষ্টি করতে লাগলুম। সেই তুফানে সমগ্র শ্রোতার দল আত্মহারা হয়ে গেল। মল্লারে যখন ধরেছি—

'আজ বিরজ শ্যাম ঘটাঘন ঘেরে'—

তখন শ্রোতার ভিড়ের মাঝখানে হঠাৎ একটা হাহাকার-ধ্বনি পড়ে গেল। আমার গান বন্ধ হয়ে গেল, তানপুরার খরজে হাত জড়িয়ে গেল, সভার সব ভিড় সরিয়ে দেওয়ার পর দেখি—অদূরে একটী সুন্দরী গায়িকার মূর্চ্ছা হয়েছে। একে—একে! এ যে মুন্নাবাই! যূঁইফুলের হাসিটী স্বর্গের সোহাগের মত কপোলে ও ওষ্ঠতটে মিশিয়ে আছে। সব ভিড় সরিয়ে দেওয়া হলো, তার বাপের কোলে মাথাটী রেখে অলস-শিথিল বাহু-দুটী এলিয়ে দিয়ে সে যেন ঘুমন্ত শিশুটীর মত ঘুমিয়ে পড়েছে, জুঁইফুলের গন্ধের জোয়ার নিষ্ঠুর উপহাসের মত ঘরের আনাচে পুলকের মাঝখানে যেন ঠিকরে এসে পড়েছে। গৃহস্বামী মহাশয় হঠাৎ এই নিদারুণ ঘটনায় শশব্যস্ত হয়ে পড়লেন। শ্রোতার ভিড়টা ক্রমশঃ বিদাঘের নদীর মত ক্ষীণ ও শুষ্ক হয়ে গেল।

মুন্নার বাবা জানালে যে গত একবৎসর যাবৎ তাঁর কন্যার এইরূপ মূর্চ্ছার ব্যাধি হয়েছে। গান গাইলে বা গানের মজলিশে গেলেই তার ঘন ঘন মূর্চ্ছা হয়। সেজন্য তিনি তাকে কোনও যায়গায় নিয়ে যান না। বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য সংপ্রতি তাঁরা গয়ায় এসেছেন। আজ সে কোন অনুশাসন বা নিষেধ মানে নি—শীতের পর যেমন বসন্ত অব্যর্থ ভাবেই আসে, সে তেমনি এই সভায় এসে পড়েছে,—কারণ এ সভার প্রধান গায়ক আমি।.....যূঁইফুলের গন্ধ তখন অসহ্য হয়ে উঠলো।.....

দুইদিন পরে মুন্নার বৃদ্ধ পিতা আমার বাসায় এসে ভগ্নমনে জানালেন যে তাঁর কন্যার জীবনের আর কোনও আশা নেই। সে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। ইহাই তার শেষ কামনা।

.....মাথার দিকের কাচের জানালা দিয়ে অপসৃতমেঘ আকাশের শেষ রক্তচ্ছটাটী সন্ধ্যার ভিজে বাতাসে ঘরের ভিতর এসে পড়েছে, দূরদেশের চিরপ্রতীক্ষিত রঙ্গীণ চিঠির মত। ম্রিয়মান রোগিনী তখনো রোগের ঘোরে অবসন্ন হয়ে আছে। স্নেহাতুর পিতা কন্যার শুভ্র ললাটে হাতটী বুলিয়ে কোমলস্বরে ডাকলেন—'মুন্নিমা!'

মুন্না ধীরে ধীরে চোখের পল্লব বিকসিত করলে। তার পাংশুমুখে একটুখানি হাসি। সে ঘরেও যূঁইফুলের গন্ধ। কি করুণ গন্ধ সে! তার বাবা একবার বাহিরে গেলেন, সেই অবকাশে মুন্না অতিকষ্টে আমার দিকে চেয়ে বললে 'বাবুসাহ্‌ব্, আপ্ মুঝে ভুল্ নাহী যায়িয়ে গা?'

আমি তার সুকুমার হাতখানি তুলে নিলুম। 'মুন্না, আজ তোমায় শেষ কথাটী বলবো। মনে মনে তোমায় বরণ করে রেখেছি, আমার মনের মাঝখানে,—যেখানে আছে শুধু ইমন্ আর পূরবী। সেই অচল আসনে তুমি আমার দেবতা।'

আনন্দের আতিশয্যে মুন্না আবার চোখদুটী মুদিত করলে—একেবারে চিরদিনের মত। যূঁইফুলের গাছে তখন বসন্তের চমক লেগেছে। মুন্নার বাবা পাগলের মত ছুটে এসে বললেন—'মেরে আঁখোকি রোশ্‌নি, মেরে জান্, মেরে জান্,—'

যূঁইফুলের উচ্ছ্বাসভরা গন্ধ পাগল হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলো ঘরের চারিদিকে, মনের আশেপাশে, হৃদয়ের মাঝখানে।

শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়

বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম

ওগুস্ত-কোঁতের বিশ্বমানবতার ধর্ম্ম

(Emile Boutroux.)

কতকগুলা ঠিক্‌ঠাক্ রকমের সংজ্ঞা ও কতকগুলা দুর্লঙ্ঘ্য বিভেদ-সীমা নির্দ্দেশের দ্বারা, তার ভিতর কতকগুলা আইডিয়া গুছিয়া তোলা এবং সূক্ষ্মতাত্ত্বিক বিষয় সম্বন্ধে একটা তর্ক থামানো যেমন নির্ঝঞ্ঝাট্ ও সুবিধাজনক এমন আর কিছুই নহে। যেন জল-বায়ু-প্রবেশরোধী দুইটা পর্দ্দা দিয়া দুইটা কামরা পৃথক করা হইয়াছে—এইরূপভাবে, বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম যথাক্রমে হৃদ্‌বৃত্তি ও

বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যে আবদ্ধ থাকায় উহাদের মধ্যে ঝগড়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না। প্রত্যেকেই অপরের স্বাধীনতার দাবী মানিয়া চলিবে এবং নিজেও স্বাধীনতা ভোগ করিবে, ইহা হইলেই যথেষ্ট হইত। এইরূপে, তাত্ত্বিক জগতে, বিজ্ঞান ও ধর্ম্মসংক্রান্ত সমস্যার সমাধান হইয়াছিল। কিন্তু বাস্তব জগতে অন্যরূপ।

ফলতঃ কি বিজ্ঞান, কি ধর্ম্ম উহাদের স্বকীয় রাজ্যসীমা যতই কেন বিস্তৃত হোক্ না —কেহই নিজের যোগ্যতা ও কার্য্যকে সীমাবদ্ধ করিতে রাজি ছিল না।

যদিও তখন এই বীজমন্ত্রটির খুব সম্মান ছিল,—"যাহা সিজারের তাহা সিজারকে দেও, যাহা ঈশ্বরের তাহা ঈশ্বরকে দেও।" এই কথার তাৎপর্য্য অনুসারে, মানুষের মধ্যেও, ধর্ম্মবৃত্তিগুলির সহিত বৈজ্ঞানিক বৃত্তিসমূহের কিছুই সমসাধারণতা নাই; শুধু তাহাই নহে, এমনকি পদার্থসমূহের মধ্যেও দুইটি জগৎ বিদ্যমান,—মনোজগৎ ও জড়জগৎ, আধ্যাত্মিক রাজ্য, ও সাংসারিক রাজ্য;—ইহারা পরস্পরের কার্য্যে কিছুমাত্র হস্তক্ষেপ করে না। এক্ষণে, এই আনুমানিক সিদ্ধান্তটি সম্ভবতঃ একটা সুবিধাজনক আপোষ-নিষ্পত্তি মাত্র। ইহাতে বাস্তবতা প্রদর্শিত হয় নাই—বরং ইহা বাস্তবতার বিপরীত। এক্ষণে, মানুষের ভিতর হৃদয় ও বুদ্ধির মধ্যে একটা পার্থক্য-রেখা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু প্রকৃতির ভিতর শরীর ও মনের মধ্যে সেরূপ কোন পার্থক্য-রেখা আছে কি? এই জন্যই যে-ধর্ম্ম স্বাধীন বলিয়া পরিঘোষিত সেই ধর্ম্ম স্বরাজ্যবিস্তারের জন্য এতই তৃষিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, স্বকীয় অন্তরস্থ দেবমন্দিরটি তাহার নিকট সঙ্কীর্ণ বলিয়া মনে হইল, এবং সে দৃশ্য-জগৎকে জয় করিতে সচেষ্ট হইল। পক্ষান্তরে, বিজ্ঞান-প্রতিদিন নব নব রাজ্যজয়ে বলীয়ান হওয়ায় এবং অন্তরের মধ্যে স্বকীয় উদ্দেশ্য ও প্রণালী উত্তমরূপে আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠায় একেবারে ঘোষণা করিয়া দিল যে, এখন হইতে সমস্ত বাহ্য জগৎ সর্ব্বাংশে তাহার গবেষণার জন্য উন্মুক্ত হইবে।—কেবল এই গবেষণায় প্রবৃত্ত হইতে হইলে, শৃঙ্খলা পূর্ব্বক অগ্রসর হইতে হইবে; দেকার্ত্তের উপদেশ অনুসারে, সরল হইতে জটিলে, সহজ হইতে কঠিনে, যাহা আমাদের অব্যবহিত জ্ঞানের বিষয়, তাহা হইতে ব্যবহিত জ্ঞানে পৌঁছিতে হইবে।

তখন হইতেই বিচার-ক্ষেত্রে যে সংগ্রাম এমন নিপুণভাবে একপাশে সরাইয়া রাখা হইয়াছিল তাহা ব্যবহারক্ষেত্রে অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল। ধর্ম্ম যদি শরীর মন উভয়ের উপর আধিপত্য করিতে চাহে এবং বিজ্ঞানও যদি মন ও শরীর উভয়ের উপর প্রভুত্ব করিতে চাহে, তাহা হইলে কাজেকাজেই উহারা পরস্পরের সহিত সংঘর্ষে আসিবে। এখন কথা হইতেছে, কি করিয়া উহাদের পার্থক্যের জটিল গ্রন্থি পরস্পর হইতে উন্মোচন রাখা যাইতে পারে, ইহা জানা আবশ্যক।

অবশ্য অনেকেই এইরূপ মনে করিতে ক্ষান্ত হইবেন না যে, সবচেয়ে সহজ কথা—পরস্পরের সহিত বোঝাপড়া করিয়া একটা রফা নিষ্পত্তির দ্বারা শান্তি স্থাপন করা হয়।

তাঁহারা ভাবেন তাঁহারা নিজে কৌতূহল-হীন নরম বালিসে মাথা রাখিয়া বেশ আরামে নিদ্রা যাইবেন, চতুর্দ্দিকের কোলাহল তাঁহাদিগকে যেন জাগাইয়া না দেয়। এরকম লোকও অনেক আছে যাহারা জিজ্ঞাসা করিবে—যেহেতু সেণ্টটমাস, দেকার্ত্ত, মালব্রাঁশ, লাইব্‌নিজ্ ইহাঁরা বুদ্ধিতে বৃহস্পতিতুল্য ব্যক্তি অতএব ইঁহাদের যুক্তিতর্ক লোকে কেন না মানিয়া লইবে; ইঁহাদের তর্ক বিচার দ্বারা, ক্লাসিক রফানিষ্পত্তির পর্য্যাপ্ত প্রতিপত্তি বিনষ্ট হইয়া উন্নতির পথ কি উন্মুক্ত হয় নাই? কিন্তু, যুগযুগান্তরব্যাপী চিরন্তনতার হিসাবে,—মানবীয় জ্ঞান অমুক অমুক ব্যক্তি বিশেষের মানসিক চিন্তার সহিত একীভূত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না,—সেই ব্যক্তি-বিশেষের বিদ্যাবুদ্ধি ও পাণ্ডিত্য যতই অসামান্য হোক্ না কেন। এই মানবীয় জ্ঞান একটা সমষ্টিগত ব্যাপার মাত্র। বহু অভিজ্ঞতা হইতে আনীত বিভিন্ন তত্ত্ব এই জ্ঞানে আসিয়া মিলিত হয়। এই জ্ঞান,—একটা ঐক্য, একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে প্রয়াস পায়, তা সে একটার উপযোগী করিয়া আর একটা গ্রহণ করিয়াই হউক, কোনটাকে বাদ দিয়াই হউক, অথবা অপরের লাভ করিয়া দিয়াই হউক। এই জন্যই বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম যদি পরস্পরের সংঘর্ষে আসে, তাহা হইলে কাজেকাজেই, শীঘ্র কি বিলম্বে, এই মানবীয় জ্ঞান সমষ্টি উভয়ের মধ্যে তুলনা করিয়া দেখিবে—এই কথা জানিবার জন্যই তুলনা করিবে যে কাহাকেও পরিবর্জ্জন না করিয়াও, কোন প্রকারে উভয়কে একত্র রাখা যাইতে পারে কিনা, কিংবা একটিকে বজায় রাখিবার জন্য অপরটিকে পরিত্যাগ করা আবশ্যক হইবে কিনা।

এই বিচার-আলোচনা হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, পূর্ব্বে বড় বড় মনীষী অমুক অমুক যে যাহা অবলম্বন করিয়াছিলেন, মানবীয় জ্ঞান তাহার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইতে পারে; কিন্তু শুধু অনুপ্রাণিত হইতে পারে মাত্র,—একেবারে নিছক্ ঐ সকল মতকে প্রত্যানয়ন করিতে পারে না; কেন না, বড় বড় বিপ্লবপ্রসূত ঘটনার মধ্যে কোন একটা নূতন উপাদান থাকা অসম্ভব নহে—তত্ত্বসমূহ কোন একটা নূতন দিক দিয়া নূতনভাবে প্রদর্শিত হওয়া অসম্ভব নহে। ১৯ শতাব্দীর দ্বিতীয় ত্রিভাগ হইতে এই সকল বিষয় লইয়া যে সকল মনীষী ব্যাপৃত ছিলেন তাঁহাদের নিকট ইহাই প্রতিভাত হইয়াছিল যে, বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের মধ্যে একটা সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। ইঁহাদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ইঁহাদের বিচার আলোচনার মধ্যে হয় একটা অধিবিদ্যাভৌতিক প্রবণতা, নয় একটা আধ্যাত্মিক প্রবণতা লক্ষিত হয়। প্রথমোক্ত মনীষীদিগের উদ্দেশে ওগুস্তকোঁৎ অধিষ্ঠিত।

(১)

বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে ওগুস্ত-কোঁতের মতবাদ।

দর্শনের ভিতর দিয়া, সুশৃঙ্খলার সহিত, বিজ্ঞান হইতে ধর্ম্মে যাত্রা করা—ইহাই ওগুস্ত-কোঁতের দার্শনিক পদ্ধতি। যে প্রণালী অনুসরণ করিয়া এই যাত্রা সুসম্পন্ন হয় এবং সিদ্ধান্ত-

গুলির তাৎপর্য্য ও মূল্য নির্দ্ধারিত হয়, সেই প্রণালীকে "পজিটিভ্" বা ধ্রুববাস্তব এই নামে ভি
অভিহিত করিয়াছেন। এবং খোদ্ দর্শন পদ্ধতিটার বিশেষতঃ ঐ পদ্ধতির ধর্ম্মসংক্রান্ত চূড়ান্ত
নাম দিয়াছেন "পজিটিভিজ্ম" বা ধ্রুববাস্তববাদ। এই নামের তাৎপর্য্য এই :—(১) কৌতের উদ্দে
মানব অন্তঃকরণের বাস্তব অভাব সমূহ মোচন করা ;—এবং কেবল তাহাই—তাহা ছাড়া আর কিছু
নহে ; (২) এই অভাব মোচনের উপায় স্বরূপ উহারই সমান কতকগুলা বাস্তব জ্ঞান ছাড়া আর
কোন উপায় তিনি গ্রাহ্য করেন না ; অর্থাৎ তথ্যসমূহের সহিত যাহার একটা আপেক্ষিক সম্বন্ধ
আছে, যাহা একদিকে যেমন সত্য তেমনি মানব-মনের অধিগম্য—এইরূপ কতকগুলি জ্ঞান
আমাদের বাস্তব অভাব মোচনের উপযোগী করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। প্রয়োজনীয়তা ও
বাস্তবতা :—"ধ্রুববাস্তব" এই বাক্যের ভিতর যাহা কিছু বক্তব্য কথা আছে, প্রথমোক্ত দুই শব্দে
দ্বারা সমস্তই নিঃশেষে পরিব্যক্ত হয়।

তা ছাড়া এই দুই পরিচায়ক লক্ষণ হইতে আর একটি লক্ষণ সমুৎপন্ন হয়। ইহা
অঙ্গাঙ্গী রকমের লক্ষণ। কারণ, মানবীয় জ্ঞান ও হৃদয়ের বৃত্তিসমূহ যতক্ষণ না একটা ধ্রুব
নিয়মের বশবর্ত্তী হয় ততক্ষণ উহারা একটা বিশিষ্ট আকারে সমগ্রভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে
না ; তখনই উহারা একটা নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতিরূপে গড়িয়া উঠিবে যখন উহাদিগকে এমন
পরিসমাপ্তিতে আনা হইবে যাহা যুগপৎ ও অবিসম্বাদিতরূপে নিঃসংশয়।

* * *

ধ্রুব বাস্তবের ধারণার ভিতর যে দুই উপাদান অত্যাবশ্যক,—অর্থাৎ বাস্তব ও প্রয়োজনীয়-
সেই দুই উপাদানের প্রথমটি বিজ্ঞানের মধ্যেই দেখা যায়, আর কোথাও দেখা যায় না। পরাবিদ্যা
তত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব—ইহারাও পদার্থতত্ত্ব সমন্ধে আমাদিগকে জ্ঞানদান করিবার দাবী করে, কিন্তু
ইহাদের গঠনবিন্যাস বিভ্রম-উৎপাদক। ফলতঃ এখনো পর্য্যন্ত সমস্ত মানবীয় বিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক
আকারে উপস্থাপিত হয় নাই। গণিত, জ্যোতিষ্, ভৌতিকবিদ্যা ও রসায়নকে যদি প্রকৃত
বিজ্ঞান বলিয়া ধরা হয়—জীবনতত্ত্ব এখনো দার্শনিক ভাষা হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইতে প্রায় আরম্ভ
হয় নাই। যে সকল ব্যাপার বিশেষরূপে মানবসংক্রান্ত সেই সকল ব্যাপারের অনুশীলন, সেইগুলি
সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিকদিগের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, বৈজ্ঞানিক ধারণা যাহার
নিকট একান্তই অপরিচিত।

অতএব এক্ষণে বৈজ্ঞানিক ধারণাটি যে কি তাহাই সর্ব্বপ্রথমে নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক
এবং কেমন করিয়া এই ধারণাকে মানবীয় জ্ঞানের সমস্ত শাখার প্রতি প্রয়োগ করা যাইতে পারে
তাহাও দেখা আবশ্যক।

এইক্ষেত্রে কোঁৎ যে প্রণালী অনুসরণ করিয়াছেন তাহা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য
আসমানি ধরণের একটা মূলতত্ত্ব গোড়ায় ফাঁদিয়া বসিয়া তাহা হইতে তিনি কতকগুলা তর্কশাস্ত্রের

বাহির করেন নাই ; পরন্তু স্থূলতত্ত্ব হইতে সূলতত্ত্বে তিনি ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়াছেন।
জ্যোতিষশাস্ত্র হইতে, অধ্যাত্মতত্ত্ব হইতে যাত্রা আরম্ভ করেন নাই, পরন্তু যাহা এক্ষণে সর্ব্বতোভাবে
সেই প্রকৃত বিজ্ঞান গণিত হইতে যাত্রা আরম্ভ করিয়াছেন।

যে সকল লক্ষণ থাকায় গণিত একটা বিজ্ঞান হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সেই সকল লক্ষণগুলি
তিনি সর্ব্বপ্রথমে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তাহার পর, এই সকল লক্ষণ জ্ঞানের
অন্য শাখার উপর না চাপাইয়া,—আসল জিনিসটা পরিবর্ত্তন না করিয়া, সুবিধামত একটু
পরিবর্ত্তন করিয়া, তিনি বিভিন্ন জ্ঞাতব্য বিষয়ে প্রয়োগ করিয়াছেন। উপযোগী করিয়া
লইবার জন্য তিনি সামান্যীকরণ (generalisation) ও প্রসারণ (extension) বলিয়া
দুইটি ক্রিয়া করিয়াছেন। এই একই মানসিক রূপ আমাদের সকল জ্ঞানের মধ্যেই mutatis mutandis
(আবশ্যক পরিবর্ত্তন করিয়া) পাওয়া যাইবে এবং বিজ্ঞান যুগপৎ এক ও বিভিন্ন হইবে। এখন দেখা
যাইতেছে যে, গণিতের মডেলের অনুসারে, ধ্রুববাস্তবসংক্রান্ত নিয়মের গবেষণা হইতে অর্থাৎ জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহের
মধ্যে ধ্রুব ও ধ্রুব সম্বন্ধ নির্দ্ধারণ করা হইতেই গণিত স্বকীয় বৈজ্ঞানিক আকার প্রাপ্ত
হইয়াছে। অতএব এই উদ্দেশ্যটি সুবিধামত নির্দ্ধারিত হইলে, ইহাকে জ্ঞানের বিভিন্ন শ্রেণীতে
লইয়া যাইতে পারে। এই নির্দ্ধারণের কাজ এইরূপে সংসাধিত হয়, যথা :—(১) কোন
বিষয়ের মধ্য হইতে এমন একটা দিক্ খুঁজিয়া বাহির করা যাহাকে বৈজ্ঞানিক নিয়মের
বশে আনা যাইতে পারে। (২) এই সকল নিয়মগুলাকেও এমনভাবে গ্রহণ করিতে হইবে
যে জ্ঞাতব্য বিষয়ের প্রকৃতির সহিত উহা বেশ খাপ্ খায়।

এই সকল মূলসূত্র অনুসারে কোঁৎ বিজ্ঞানের প্রত্যেক শ্রেণীর একটা নির্দ্দিষ্ট আকার
নিরূপণ করিয়াছেন এবং ইহা একটা নূতন বিজ্ঞানের মতবাদে পর্য্যবসিত হইয়াছে। তাহার
নাম সমাজ-বিজ্ঞান। নিরিন্দ্রিয় জড় জগতের সহিত ভৌতিক বিজ্ঞান ও রসায়নশাস্ত্রের যে
সম্বন্ধ, নৈতিক ও সামাজিক ব্যাপারাদির সহিত সমাজ-বিজ্ঞানের সেই সম্বন্ধ।

যে সকল বিজ্ঞান এখনই বিদ্যমান, সেই সকল বিজ্ঞান সম্বন্ধে তিনি কতকগুলি সংক্ষিপ্ত
দৃষ্টি নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—যাহার একটা গুরুতর দার্শনিক তাৎপর্য্য আছে।

পর্য্যবেক্ষণের অতীত অপ্রত্যক্ষ কারণ-পদার্থের সহিত যাহার সাদৃশ্য আছে, বহুকাল যাবৎ
ভৌতিক বিদ্যা যাহার নিকট হইতে একটা খামখেয়ালি ব্যাখ্যা চাহিয়া আসিয়াছে,—ভৌতিক
বিজ্ঞানকে সেই সমস্ত ত্যাগ করিতে হইবে।

প্রকৃত বিজ্ঞানপদবাচ্য হইতে হইলে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষ ব্যাপারের যে প্রত্যক্ষ-গোচর
দিক তাহাই ভৌতিক বিজ্ঞানের জন্য নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক।

ভৌতিক-রাসায়নিক বিজ্ঞানের সহিত তুলনা করিলে—জীবন-বিজ্ঞান সম্বন্ধে একটা মস্ত
পার্থক্য লক্ষিত হয়। জীবন-বিজ্ঞান যে সকল নিয়মের অনুশীলন করে, সে সমস্ত—ঐন্দ্রিয়িক

ক্রিয়া ও ইন্দ্রিয়াদির পারস্পরিক সম্বন্ধের নিয়ম। এই সকল নিয়ম আবিষ্কার করিতে ইহা নিশ্চিত যে, জীবনী শক্তির স্বতঃপ্রবৃত্ত ক্রিয়া নামক দার্শনিক অনুমান-সিদ্ধান্তটাকে সরাইয়া, সাধারণ ভৌতিক নিয়মে যে সকল ব্যাপার ঘটিয়া থাকে—একটু আধটু বা সেই সকল নিয়মেরই আলোচনা করা উচিত।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রন

ভারতীয় পর্য্যটক

(১)

বিদেশীরা কয়েক বৎসর ধরিয়া যুবক-ভারতের এক নয়া [illegible] ভারতবাসীকে বিদেশীরা "ঘর-কুনো" অথবা কূপমণ্ডুক বলিয়া জানিত। তাহা[illegible] যে, "গৃহে চ মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্ব্বতং ব্রজেৎ ?"—এই সূত্র ভারতসন্তানের ম[illegible] আজকাল বিদেশীদের এই মত ক্রমশঃ লুপ্ত হইতেছে। কারণ বিদেশে ভারত[illegible] এখন নানা কর্ম্মক্ষেত্রে দেখা যায়। বিদেশ-ভ্রমণ ভারতবাসীর এক নতুন লক্ষণ।

পূর্ব্বে ভারতবাসীরা "বিদেশ" বলিলে প্রধানতঃ ইয়োরোপকেই বুঝিত। [illegible] এশিয়া এবং আফ্রিকার দেশগুলা ভারতসন্তানের চিন্তার বহির্ভূত থাকিত। আবার ইয়োরো[illegible] শব্দেও আমরা একমাত্র ইংল্যাণ্ডকেই বুঝিতাম।

এইরূপ সঙ্কীর্ণতা ভারতবাসীর চিত্ত হইতে এক্ষণে দূরীভূত হইয়াছে। ভারতীয় পর্য্যটক আজকাল জাপানে তুরস্কে মরক্কোয় ভ্রমণ করিতেছেন। নরওয়ে, সুইডেন, রুশিয়া, স্পেন, [illegible] ভারতবাসীর পর্য্যটন তালিকায় ঠাঁই পাইতেছে। উত্তর আমেরিকার ত কথাই নাই, ব্রেজি[illegible] চিলি, আর্জেণ্টিনা ইত্যাদি জনপদেও ভারতীয় নরনারীর মোসাফিরি চলিতেছে।

আর এক কথা। এতদিন ভারতের যাঁহারা বিদেশে আসিতেন তাঁহারা প্রধানতঃ লেখা[illegible] শিখিবার জন্য আসিতেন। সাহিত্যই হউক, আইনই হউক, চিকিৎসাই হউক, ইঞ্জিনিয়ারি[illegible] হউক,—কোনো না কোনো বিদ্যালাভের উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীরা বিদেশগামী হইতেন। বিদে[illegible] ইস্কুল কলেজের আবহাওয়াই তাঁহাদের প্রবাস-জীবনের বিশেষত্ব ছিল।

আজকাল পরীক্ষায় পাশ করা এবং ডিগ্রিলাভ করাই ভারতীয় প্রবাসীদিগের এক[illegible] উদ্দেশ্য নয়। "দেশ দেখা," ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করা নানা শ্রে[illegible] অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের সংস্পর্শে আসা অথবা বিদেশে ভারতবাসীর জন্য কর্ম্মক্ষেত্র ঢুঁড়িয়া বা[illegible] করা—এই সব আজকালকার পর্য্যটকদের অনেকেরই লক্ষ্য।

[illegible] নয়া নয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য বহু ভারতসন্তান আজকাল বিদেশে বেড়াইতে [illegible]তেছে। যুবক ভারতের জীবন এই উপায়ে প্রসারে বাড়িয়া যাইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার [illegible]লীতে এবং চিন্তাপ্রণালীতেও গভীরতা সৃষ্টি হইতেছে। ভারতবাসীর নিত্য-নৈমিত্তিক [illegible] তাহার ফলে বৃহত্তর এবং গভীরতর হইয়া উঠিতেছে।

(২)

[illegible] দুই বৎসরে এক জার্ম্মাণিতেই অন্ততঃ এক হাজার ভারতীয় নরনারী যাওয়া আসা [illegible] মধ্যে আসল [illegible] অধিকাংশই পর্য্যটক [illegible] খাঁটি ছাত্রছাত্রী তাঁহাদেরও অনেকেই প্রধানতঃ জার্ম্মাণি দেখিবার জন্যই [illegible]

[illegible] অনেকেই জার্ম্মাণির নানা জেলায় বেড়াইয়া গিয়াছেন। শিল্পকারখানা দেখিয়াছেন বহু [illegible]। কেহ কেহ অনুসন্ধান বা খোঁজখবর মাত্র করিয়াছেন। কিন্তু ফ্যাক্টরিতে ভর্ত্তি হইয়া কাজ শিখিতেছেন অনেকে। আর বাণিজ্য সম্বন্ধ পাতাইয়াছেনও বিস্তর ব্যাপারী।

জার্ম্মাণরা দেখিতেছে এক নতুন দৃশ্য। লড়াইয়ের পূর্ব্বে জার্ম্মাণরাই ভারতবর্ষে হাজির হইয়া ভারতবাসীর সঙ্গে কারবার খুলিত। আজকাল ভারতসন্তান স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া জার্ম্মাণির নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে নিজ নিজ মতলব হাঁসিল করিয়া বেড়াইতেছে। সকলেই বুঝিতেছে, ভারতবর্ষ সত্যসত্যই জাগিয়াছে।

(৩)

জার্ম্মাণির বড় বড় হাঁসপাতালে ভারতীয় চিকিৎসকের দেখিবার শুনিবার অনেক জিনিষ আছে। সেই দিকে ভারতবাসীর নজর পড়িয়াছেও।

বোম্বাই গ্রাণ্ট কলেজের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক মারাঠা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নাদ্‌গির বার্লিনে এবং অন্যান্য নগরে অনুসন্ধান করিতে আসিয়াছিলেন। ইনি অস্থিবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ। এই বিদ্যাবিষয়ক নানা প্রকার যন্ত্র পাতি খরিদ করাও ইঁহার জার্ম্মাণি ভ্রমণের এক উদ্দেশ্য ছিল। পাঞ্জাবের ডাক্তার শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র ভাল্লাও এই উদ্দেশ্যে জার্ম্মাণি আসিয়াছিলেন।

শিশুপালন, শিশু চিকিৎসা, জনসাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষা, ইত্যাদি বিষয়ক লোকহিতকর কাজের জন্য ইয়োরোপের সকল দেশেই বহুবিধ প্রতিষ্ঠান আছে। বড়োদার ডাক্তার শ্রীযুক্ত [illegible] মেহতা এবং জিবরাজ মেহতা ফ্রান্সে এবং জার্ম্মাণিতে এই সকল প্রতিষ্ঠান দেখিয়াছেন। [illegible], ছাপা, পুস্তিকা, পত্রিকা ইত্যাদি নানাবিধ দ্রব্য সংগ্রহ ইঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। ইঁহারা দুই জনেই গুজরাতী।

কলিকাতার ডাক্তার শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র নাথ ঘোষ এবং অমূল্য চরণ উকিল প্যাস্টুর ইন্‌ষ্টিটিউটে ব্যাক্‌টিরিওলজিবিদ্যার অনুসন্ধান চালাইয়াছেন। পরে সেই লাইনেই আরও বেশী কাজ করিবার জন্য একজন বার্লিনের কক ইন্‌ষ্টিটিউটের এবং অপর জন ফির্খোভ্‌ হাঁসপাতালের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। ইঁহারা জার্ম্মাণিতে 'সিরাম' ইত্যাদি তৈয়ারি করিবার কল খরিদ করিতে প্রয়াসী। এই উদ্দেশ্যে জার্ম্মাণির নানা কেন্দ্রে ঔষধ প্রস্তুত করিবার [illegible] পরিদর্শনও ইঁহাদের জার্ম্মাণিপ্রবাসের অন্তর্গত।

(৪)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ ইং[illegible] হইয়াছিলেন শিল্প কারখানার পরিচালনা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিবার জন্য। [illegible] বিদ্যায় পণ্ডিত, আলোকবিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ। বিলাতী বৈজ্ঞানিকপত্রে [illegible] ফল একাধিক ছাপা হইয়াছে।

ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের কলকারখানা এবং শিল্প-বিকাশের অবস্থা [illegible] ইংল্যাণ্ডে, ফ্রান্সে এবং জার্ম্মাণিতে বৎসর দেড় দুই কাটাইয়া ঘোষ মহাশয় নানাতম ব্যাপার গুলার ধরণধারণ বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন। লোহালক্কড়, ধাতুর খনি, কাঁচের কাজ ইত্যাদি বিভিন্ন দিকেই ইঁহার দৃষ্টি ছিল।

শ্রীযুক্ত বাণেশ্বর দাস ফলিত রসায়নের নানা বিভাগে ওস্তাদ। যুক্ত রাষ্ট্রের এডিসন কোম্পানী ইত্যাদি নামজাদা কোম্পানীর অধীনে ইনি কয়েক বৎসর ধরিয়া প্রধান রাসায়নিকের কাজ করিয়াছেন। জার্ম্মাণির হাম্বুর্গ, ব্রেমেন, ল্যিবেক ইত্যাদি সহরের অনেক রসায়নবটী ফ্যাকটরিতে মাল অর্ডার দেওয়া এবং মাল প্রস্তুত করিবার প্রণালী তদারক করা আজকাল ইঁহার প্রধান কাজ।

গোআলিয়র হইতে আসিয়াছিলেন শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র মজুমদার। ইনি এই রাজ্যের পটারি কারখানার ডিরেক্টার। স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম যুগে ইনি জাপানে যাইয়া "চীনে বার্ণ" তৈয়ারী করিতে শিখিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই বিদ্যায় নয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য জার্ম্মণির ফ্যাকটারিতে কিছুকাল কাটাইয়া দেশে ফিরিয়াছেন।

ইঁহাদের কেহই ডিগ্রি পাইবার জন্য চেষ্টা করেন নাই। এই ধরণের বহু ভারতবাসী জার্ম্মাণির নানা কেন্দ্রে নানা কাজে লিপ্ত আছেন। যুক্তপ্রদেশের ও বিহার অঞ্চলের লোক কেহ হয় একজনও নাই। মান্দ্রাজ ও দক্ষিণভারতের লোক দুএক জন আসিতে সুরু করিয়াছেন।

(৫)

মহারাষ্ট্রপ্রদেশের আউঁধ-ষ্টেট নবীন ভারতের এক অতি উন্নত এবং বর্দ্ধিষ্ঠ রাজ্য। রাজ্যের আয় মাত্র সাড়ে তিন লাখ টাকা এবং লোকসংখ্যা মাত্র সত্তর হাজার। কিন্তু

শিক্ষার বিস্তার সাধন করিয়া [illegible] নরপতি ভারতবর্ষে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন। ভারতবর্ষে বোধ হয় আউঁধ [illegible] কথা বেশী জানা নাই। আউঁধ রাজ্য সাতারার সন্নিকটে।

এই ষ্টেটের শিক্ষা ও শিল্পবিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত ইনামদার ইরোরোপে প্রচলিত নিম্ন [illegible] ব্যবস্থা পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। ডেন্‌মার্কের ঘুটলাণ্ড বাসে [illegible] ইনামদার বিশেষ উপকৃত হইয়াছেন। কিষাণ ও কারিগরদের পুত্রকন্যাদের শিক্ষার ভার [illegible] ষ্টেটের উপর রহিয়াছে। ডেন্‌মার্কের শিক্ষাসচিব শ্রীযুক্ত আপেল এই প্রতিষ্ঠানের [illegible]

ইংলণ্ড, জার্ম্মাণির নানা পল্লী এবং নগর দেখাও ইনামদারের উদ্দেশ্য ছিল। বড় বড় [illegible] বিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীর সংস্পর্শে আসা ইহার মতলব ছিল না। "লোকশিক্ষা" [illegible] কুটীরশিল্প এবং পল্লী-কৃষির ব্যবস্থা ইত্যাদি বুঝিবার দিকেই তাঁহার ঝোঁক ছিল বেশী।

আউঁধরাজ সরকারী সাহায্যদান করিয়া কাচের এবং লোহার কারখানা কায়েম করিয়াছেন। [illegible] চিত্রাঙ্কন বিদ্যার নানা গ্রন্থ ষ্টেট লাইব্রেরির জন্য খরিদ করা হইয়াছে। পুরাণো ভারতের সুকুমার শিল্প এইখানে সযত্নে রক্ষিত হইতেছে।

প্রতিবৎসর আউঁধে পশু-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তড়িতের আলো গোটানগরে [illegible] হইয়াছে। ফ্যাক্টরী-মহাল্লাটাকে একটা নব্য স্বাস্থ্যকর সহরে পরিণত করিয়া ষ্টেট আধুনিকতার এক নয়া পরিচয় দিতেছে।

রাজার নাম শ্রীযুক্ত ভবন রাও। ইনি নিজে গায়ক। প্রতিবৎসর ইনি কীর্ত্তনমেলায় জনগণের সঙ্গে একতান গাহিয়া থাকেন। চিত্রশিল্পেও ইহার হাত আছে। রামায়ণ বর্ণিত দৃশ্যাবলীর ছবি আঁকিয়া ইনি রাজবাড়ীর মন্দির অলঙ্কৃত করিয়াছেন।

পুণা সহরে "ভাণ্ডারকার ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ্চ ইন্‌ষ্টিটিউট" নামে এক পরিষৎ আছে। এই পরিষদের ধন ভাণ্ডারে আউঁধরাজ অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। ভারতে এবং ইউরোপেও আজকাল প্রচারিত যে, মহাভারতের এক নয়া সুবিচারিত সংস্করণ প্রকাশ করিবার জন্য এই পরিষৎ খাটিতেছেন। সেই প্রয়াসে ভবন রাও অগ্রণী।

কি নয়া জ্ঞান বিজ্ঞান, কি আধুনিক শিক্ষা, কি পুরাণো শিল্প-সাহিত্য সকল দিকেই আউঁধ ষ্টেট এক সঙ্গে দৃষ্টি দিয়াছে। গ্যেটের আমলে হ্বাইমার ষ্টেট যেরূপ জীবন কেন্দ্র ছিল, আজ বোম্বাই অঞ্চলে আউঁধ সেইরূপ।

(৬)

জার্ম্মাণি হইতে অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য ভারতীয় মহিলারাও এদেশে আসিয়াছেন। বিলাতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটির সময়ে অনেক ছাত্রী জার্ম্মাণিতে কাটাইয়া যান। কেহ কেহ

BLOCKED INFORMATION.

পরীক্ষায় ডিগ্রি পাইবার পর জার্ম্মাণিতে কিছুকাল [illegible] করিয়াছেন। পার্শী, বাঙ্গা[illegible] মরাঠা—প্রধানতঃ এই তিনজাতীয় বিদুষীকে জার্ম্মাণসমাজে [illegible]।

বিরার প্রদেশের শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী দ্বারকা বাই ভালচন্দ্র বার্লিনে শিশু[illegible] প্রণালী দেখিয়াছেন। "য়ুগেণ্ডহাইম্" (যৌবন ভবন) নামক প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা[illegible] পরিবারদের সন্তানের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যই প্রধানভাবে কর্ত্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করে। [illegible] আগাগোড়া প্রায় সরকারী খরচেই চালানো হয়।

পেষ্টালট্‌সি-ফ্রোবেল হাউস নামক পাঠশালায় ছয় বৎসরের [illegible] শিশুদের [illegible] আছে। [illegible] গার্ডেন [illegible] শিক্ষয়িত্রী তৈয়ারী করাও এই প্রতিষ্ঠানের উ[illegible] এই সকল প্রতিষ্ঠান ভারতের পক্ষে প্রয়োজনীয় অনেক কথা উপলব্ধি করিয়াছেন।

জার্ম্মাণির পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থা বুঝিবার সুযোগ [illegible]ছেন ইন্দোরের শ্রীমতী ইন্দিরা ভাগবৎ। বার্লিন, লাইপসিগ, ন্যির্ণবার্গ, মিউনিক, হ্বিয়েন[illegible]লোন ইত্যাদি নানা সহরে ইনি ভ্রমণ করিয়াছেন। "দেশ দেখাই" ইঁহার উদ্দেশ্য ছিল। কোন কোন সহরে জার্ম্মাণ পরিবারে বসবাস করিয়া ইনি জার্ম্মাণ নরনারীর আভ্যন্তরিক কথা অনেক বুঝিতে পারিয়াছে। ওরারোমার্গাণ্ড নামক পল্লীতে যীশু-লীলা বিষয়ক সঙ্গীত-নাট্য দেখিয়া ইন্দিরা খৃষ্টান সমাজে ভক্তিধারাও স্পর্শ করিয়াছেন।

(৭)

ভারতের উচ্চশিক্ষায় থিয়েটার এবং নাট্যকলা একদম বাদ পড়ে। কাজেই বিদেশে আসিয়া কোন ভারত সন্তান রঙ্গালয়ের শিল্প বুঝিতে চেষ্টা করে না।

কিন্তু কলিকাতার শ্রীযুক্ত সহিদ সুহৃয়ার্দ্দি অক্‌সফোর্ডে ডিগ্রি পাইবার পর রুশিয়া মস্কো নগরে থিয়েটার পরিচালনার বিদ্যায় হাতে খড়ি দিয়াছেন। ষ্টানিস্‌লারসক নামক প্রসিদ্ধ রুশ ওস্তাদ ইঁহার গুরু ছিলেন। এক্ষণে তাঁহার সহকারী-ম্যানেজার (রেজিস্ট্রার) রূপে সুহৃয়ার্দ্দি বুল্‌গেরিয়া, চেকো শ্লোভাকিয়া, জার্ম্মাণি, নরওয়ে, সুইডেন ইত্যাদি দেশে থিয়েটার দেখাইয়া বেড়াইতেছেন। যুবক ভারতের পক্ষে এ এক নতুন জীবন। রুশ, ফরাসী [illegible] জার্ম্মাণ ভাষায় সুহৃয়ার্দ্দি সুপণ্ডিত।

শ্রীযুত দিলীপকুমার রায় আসিয়াছিলেন সঙ্গীত শিক্ষা করিতে। পিয়ানো বাজ[illegible] এবং গলা-সাধা—এই দুই দিকে ইনি জার্ম্মাণি এবং ইটালীতে কিছু কিছু শিক্ষালাভ করিয়াছেন। বিলাতী কেম্ব্রিজের ইনি গ্রাজুয়েট। ফরাসী ভাষায়ও ইঁহার দখল আছে।

রুশ জাতীয় নরনারীর জীবন, সাহিত্য ও শিল্প সম্বন্ধে দিলীপকুমার অনুরাগী [illegible] দেশে ফিরিয়াছেন। সাম্য, মৈত্রী, আন্তর্জ্জাতিকতা ইত্যাদি আদর্শের চিন্তাধারা পশ্চিমা মুল্লুক

[illegible] কোন দলে আজকাল [illegible] দেখা যায়। সেই ধারাটা ইঁহার প্রাণস্পর্শ করিয়াছে। রোমারোলা, বার্ট্রণ্ডরাসেল ইত্যাদি [illegible]ক এই অভিনব জগতের অগ্রদূত।

ইয়োরোপীয় [illegible]রী-জীবন সম্বন্ধে ভারত সন্তানের জ্ঞান নেহাৎ কম ছিল। দিলীপকুমার [illegible] নজর দিয়াছেন। অধিকন্তু ইহুদি স্ত্রীপুরুষকেও ইনি বন্ধুরূপে চিনিয়াছেন। এই ধরণের বহুপ্রকার বিভিন্ন অভিজ্ঞতার ফলে যুবক ভারতের চিন্তামণ্ডল বহুত্বের [illegible]গ্রসর হইতেছে।

(৮)

[illegible] নগরে জাতীয় [illegible] শ্রীযুক্ত স্যার আশুতোষ [illegible] অভ্যর্থনা হইয়াছিল। জার্ম্মাণ সমাজের নানা মহলে [illegible] চৌধুরী-সম্বর্দ্ধনার [illegible] শিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা জার্ম্মাণিতে প্রচারিত হইয়াছে।

[illegible]ত্রে বিদেশী মেসোফিরদের ছবি বড় একটা দেখা যায় না। কিন্তু [illegible] মহাশয়ের ছবি ছাপা হইয়াছে একাধিক বার। তাহা ছাড়া বহু কাগজেই ইঁহার পর্য্যটন কাহিনী বিবৃত হইয়াছে।

"কাইজার হ্বিল্‌হেল্‌ম ইন্‌ষ্টিটিউটের" জগৎ প্রসিদ্ধ রাসায়নিক শ্রীযুক্ত হাবার বলিয়াছেন—ভারতবর্ষের কোন কথা জার্ম্মানিতে জানিবার উপায় নাই। তাহার ব্যবস্থা করা ভারতবাসীর কর্ত্তব্য।" "বাইখস্ ফার্ব্বাণ্ড ডার ড্যয়চেন ইণ্ডুষ্ট্রি" নামক ফ্যকটরি সঙ্ঘের কর্ত্তারা চৌধুরীর সঙ্গে ভারতীয় কৃষি ও শিল্পের উন্নতি বিধান সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন। বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার এবং বৈজ্ঞানিক ও পণ্ডিতের সঙ্গেও ইঁহার আলাপ পরিচয় হইয়াছে। বার্লিনের শিক্ষাসচিব ইঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া টেক্‌নিক্যাল বিভাগের নামজাদা লোক জনের সঙ্গে পরিচিত করিয়া দিয়াছেন।

লাইপৎসিগ এবং বার্লিনের বিপুল শিল্প-সঙ্ঘের মালিক ও পরিচালকগণ ভারতীয় ছাত্রগণের জন্য সুযোগ কায়েম করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ফ্রাঙ্কফোর্টের রাসায়নিক কারখানায় এবং রাইন জনপদের লোহালক্করের কারখানায় ও চৌধুরী মহাশয় শিল্পশিক্ষার্থীদের পথ খুঁজিয়া পাইয়াছেন! জার্ম্মাণরা ভারতসন্তানকেও বৈজ্ঞানিক শিক্ষার সাহায্য করিতে প্রস্তুত। এই অভিজ্ঞতা লাভ ইঁহার পক্ষে অশেষ উৎসাহের কারণ হইয়াছে।

ইনি বহুবার বিলাতে যাওয়া আসা করিয়াছেন। জার্ম্মাণিতে এই প্রথম। বিলাত ছাড়াও যে বিদেশ আছে, আর সেই সকল বিদেশেও যে বিজ্ঞান শিল্প সাহিত্যের বিকাশ হইয়া থাকে, এই জ্ঞান প্রবীণ ভারতবাসীদের একপ্রকার ছিল না বলিলেই চলে। চৌধুরী মহাশয় "বৃদ্ধ বয়সে" এই জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া বোধ হয় এক নব-জীবন লাভ করিয়া থাকিবেন। প্রবীণ জননায়কগণের এইরূপ নব জীবন লাভ যুবক ভারতের জীবন স্পন্দনেরই অন্যতম লক্ষণ।

(৯)

[illegible] মারাঠা যুবক মাধবরাও [illegible] বিলাতের " [illegible] আমার স্কুল " [illegible] বিদ্যালয়ে মাষ্টারি করিয়াছেন। ইংরেজ ছাত্রদিগকে ইনি পড়াইতেন [illegible] অষ্ট্রিয়ার গ্যেটে স্বরূপ নাট্যকার গ্রিণপাৎসার সম্বন্ধে যাধব একজন বিশেষজ্ঞ।

ইনি বিলাতী বয়স্কাউট আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত স্কাউট মাষ্টার। পঁচিশ [illegible] ইংরেজ স্কাউটদের দলপতিরূপে ইনি [illegible] নানা অঞ্চলে ফরাসী এবং [illegible] মার্কিন স্কাউটদের সংস্পর্শে আসিয়াছেন। কেম্ব্রিজের দু'একজন গ্রাজুয়েট ইঁহার [illegible] তালিম করিয়াছে। যুবক [illegible] বটনা।

যাধব জার্ম্মানীর বড় বড় শিক্ষা ও শিল্প-কেন্দ্রে মোসাফিরি করিয়াছে [illegible] সঙ্গে জার্ম্মানদের সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন বিষয়ক আদান প্রদান কা[illegible] [illegible]বার জন্য ইনি উচ্চপদস্থ জার্ম্মাণ পণ্ডিতগণের সঙ্গে মোলাকাৎ করিয়াছেন। ইঁহার [illegible]নে বোধ হয় পুনা এই উদ্দেশ্যে এক কর্ম্ম-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

সতী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(২)

সুধীন্দ্রকুমার বাল্যে পিতৃহীন, বিধবা মাতা ও এক অর্দ্ধনির্লিপ্ত খুল্লতাতের দ্বারায় সে প্রতিপালি[illegible] এবং মাতারই সবিশেষ তত্ত্বাবধানে শিক্ষাদীক্ষায়ও তাহাকে বঞ্চিত হইতে হয় নাই। পড়া শোনায় [illegible] বলিয়া বড়লোকের মেয়ে পঙ্কজিনীকে পত্নী লাভ এবং 'ষ্টেট কলারশিপ' লইয়া বিলাত যাত্রার আ[illegible] দুইটাই তাহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল। যদি এই সম্ভাবনাটা পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে—অর্থাৎ মাকে ছা[illegible] কলিকাতার মেসে বাসা লইয়া থাকার আগে ঘটিত, তাহা হইলে কি হইত ঠিক করিয়া বলা যায় [illegible] কিন্তু এখন অবস্থা যথেষ্ট পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। এখন মায়ের আঁচল ধরিয়া বসিয়া থাকা[illegible] চরম সুখবোধ ঘুচিয়াছিল, ভবিষ্যৎ স্বাচ্ছন্দ্যের মোহিনী কুহক কোন বিরহ বিচ্ছেদের বেদনা[illegible] বড় করিয়া রাখিতে পারিল না। কাকার অর্দ্ধ সম্মতিতে এবং মায়ের সম্পূর্ণ অমতে সে এক[illegible] কলিকাতা হইতে বোম্বে দিয়া "ভ্যালেট" নামক বিলাতি জাহাজে উঠিয়া পড়িল এবং দিনে[illegible] দিন ভারত মহাসাগর তাহার এবং তাহার দেশের মধ্যে সুদূর একটা ব্যবধানের সৃষ্টি করিতে থা[illegible] শ্বশুর তার বিলাতের বাকি খরচাদি দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন এবং মৃত্যুকালেও সে ব্য[illegible] পাকা করিয়া যাইতে তাঁর ভুল হয় নাই।

[illegible]ন্দ্র বিলাতে থাকিতেই [illegible] একম[illegible] [illegible]বিচ্ছেদবিধুর জী[illegible] [illegible]ছিল। দেশে ফিরিয়া [illegible]র সহিত সাক্ষাৎ করিতে [illegible] [illegible] বাকার দায়ে ভাল করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে [illegible] [illegible]তে কেদারা না থাকায় বসিবার বিশেষ অসুবিধা হওয়ার জন্য [illegible] [illegible] হয়। কাকা খাইয়া গেল না বলিয়া দুঃখিত হইলেন; কাকীমা [illegible] [illegible] তোমার না থাক, ওর শরীরে আক্কেলতো একটা আছে, সদ্য সদ্য সেই যা-তাগুলো [illegible] আমার বাসন কোসনগুলো লোকসান করে দেয় কোন হিসেবে বল! আমি যার [illegible] [illegible] করেই [illegible]

[illegible] শালাদের কল্যাণে, শাশুড়ী শ্যালিকাদের এ রকম জটিল [illegible] সমস্যায় পড়িতে [illegible] তবে [illegible]বেই মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন সুধীন্দ্রের শাশুড়ী। দীর্ঘকাল [illegible] জামাই [illegible], কোথায় [illegible] কাছে বসিয়া ভাল মন্দ সামগ্রী নিজে হাতে প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইবে [illegible] তা' না জামাই কোথায় বাহিরের মহলে কাহার রান্না, কি খাইয়া আসিল, সেটা চক্ষে দেখাও গেল না। [illegible] ও-সকল দেখার প্রবৃত্তিও ত নাই। ছেলেরা তো বারমাসই পরের বেহদ্দ হইয়া বাড়ীতে বাস করিতেছে। তাদের রাঁধুনী বামুনের নোংরা হাতের রান্না ডালভাত খাইলে বা মার রান্না শাকপাত খাইলে হজম হয় না। জামাইটী আসিল তো সেও সেই দলেই ভিড়িয়া গেল। কেবল বড় জামাই [illegible] নারায়ণ নিজের নামের মহিমাটা এ পর্য্যন্ত বজায় রাখিয়াছে বটে! বড় চাকরি—তা সেও করে; কিন্তু হিন্দুর ছেলের কুলাচারটুকু একেবারেই ছাড়িয়া দেয় নাই।

আহারাদির পর বড়দিদি ও বধূরা বিলাতের গল্প শুনিবার জন্য ধরিয়া বসিলে দুএকটা কথা পাড়িয়াই সে হঠাৎ 'ভূস্বর্গ' লণ্ডনের শতমুখী প্রশংসার প্রস্রবণ রুদ্ধ করিয়া দিয়া বলিয়া উঠিল, "কই পঙ্কজকে দেখচিনে যে?"

বধূদ্বয় এই কথায় সামলাইতে না পারিয়া একেবারে বধূজন-বিগর্হিত উচ্চ হাসি হাসিয়া [illegible] লুটাইয়া পড়িলেন। বড়দিদি বয়সে নাকি অনেকখানিই বড়, তাঁর পক্ষে নেহাৎ ও-রকমটা [illegible] দেখাইবে না বলিয়াও বটে, আর তাঁহার প্রকৃতিও ইহাদের চেয়ে কিছু গম্ভীর ভাবের ছিল [illegible]য়াও বটে, মনের হাসিটা বাহিরে অধিক মাত্রায় তিনি প্রকাশ না করিয়া ফেলিয়া সহাস্যমুখেই [illegible] করিলেন, "কেমন করে আর দেখ্‌বে বল? আমাদের সাম্‌নে তো আর সে তোমায় দেখা দিতে আসতে পারে না। আমরা আগে বিদায় হই দাঁড়াও, তবে তো তাকে দেখ্‌তে পাবে। [illegible] বড় বউ, মেঝুনী! আয়,—আমরা যাই।"

বড় ও মেজ বধূদ্বয় তখনও হাস্যস্রোত রুদ্ধ করিতে পারগ না হওয়ায় বড়দিদির অনুজ্ঞা [illegible] সমর্থা হইলেন না। সমতালে তখনও দুজনকার হাসিই চলিতেছিল।

এতবড় একটা হাস্যরসের অবতারণা কোথা হইতে হইল সুধীন্দ্র সেটা বেশ ভাল করিয়া

...তে না পারিয়া ...তত্বটা ... হইয়া ... । সুহাসিনীর ...
...নেও মৃদু হাসিয়া কহিল, "কে ...দের সাক্ষাতে ...
...ম, কেন ... লেখি ? কোন অকর্ম্ম দুষ্কর্ম্ম করতে ত আর যাচ্চেনা যে, ত...
...র মতন গোপনে যেতে হবে।"

দিদি কহিলেন—"তা না হোক, তবু ছেলেমানুষ একটা লজ্জা সরম বলে ...
...সভামধ্যখানে ইংরেজ-বিবিদের মতন বরের পাশে দাঁড়ায় কি করে তাই বল ত ?"

সুধীন্দ্র কহিল, "বাঃ এতকাল পরে স্বামী ফিরে এলো, দেখবার জন্য, স্ত্রীর...
ব্যাকুলতাও নেই ? এমনই ...

তার এই ...তিযোগপূর্ণ কথাটার ধরণে বড় বোন সুহাসিনী একটু খত...
শালাজ দু...কারই তরল হাস্যস্রোত প্রশমিত হইয়া আসিল। সুহাসি... প্রতি...
হাতের চুড়ির ডায়মণ্ড খুঁটিতে খুঁটিতে ঈষৎ নিম্নস্বরে কহিলেন, "...বার কে...
এখন ছেলেমানুষটী আছে ; আবার অনেক দিন দেখাশুনাও নেই কিনা ; পাঁচজনো সাক্ষাতে...
লজ্জা-লজ্জা করে। তা ও-কিছু আর বরাবর থাকবে না। যাই আমি তাকে ডেকে দিইগে।"

সুহাসিনী উঠিয়া যাইবার সময় বধূদেরও ডাকিয়া গেলেন। মেঝ বউ বড় মনমো...
সে ডাকে কাণ না দিয়াই বড় জায়ের দিকে চাহিয়া হাসিয়া কহিল, "বড়দি'তো বেচারীকে জোর ক...
আশ্বাস দিয়ে গেলেন যে, 'বরাবর এ রকমটা থাকবে না' ; কিন্তু তিনি তো এদিকে প্রতিজ্ঞা ক...
বসে আছেন যে, এখন যেমন আছেন ঠিক এম্‌নিটীই থাকবেন। তাঁকে না কি কারুর ...
করতে সাধ্য নেই।"

বড় বউ চোখের ইঙ্গিতে তাহাকে থামিতে বলিয়া গম্ভীর দার্শনিকভাবে উত্তর করিল, "...
সময় হলে সবই হয়ে যাবে হে দাদা ; কত মনে করা যায়, কতই ভাঙ্গতে হয়,—ওর কি কিছু ...
আছে ? অবস্থা, কাল যেপথে নিয়ে যাবে, সেই পথেই আমরা যেতে বাধ্য !"

সুধীন্দ্র ইহা শুনিয়া অবিশ্বাসের সহিত মস্তকান্দোলনপূর্ব্বক কহিল, "না বৌঠান্...
আমি আপনার সঙ্গে এক মত হতে পারলেম না, মানুষ সংসার সমুদ্রে জীবনহীন জড় নৌকা...
নয়, যে তরঙ্গ তাকে যেদিকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে সেই দিকেই তার গতি। মানুষ তার ভাগ্য...
কর্ণধার, সে দিক্ স্থির করে সেই পথেই তার হাল ফিরাবে। যদি সেটা স্রোতের বি...
দিকও হয়, তবু প্রাণপণে সেই গন্তব্য পথকেই মনে রেখে তার সমস্ত বাধা কাটাতে হবে, ...
মুখে ভেসে গেলে চল্‌বে না।"

বড় বধূ কহিলেন, "আচ্ছা ভাই এর পর তখন দুজনে মিলে তার বোঝা পড়া করো, ...
দুদিন 'স্রোতের মুখেই ভেসে যাও'। কথায় বলে 'সবুরে মেওয়া ফলে', সেটা মনে রেখো।"

...নেহ দৃ... ...। কা... ...ড়লে
...বল পাড়ার লোকের কান ... বিশেষতঃ
...না হয় সে সময় প্রতিবেশিবর্গ কানে একটু তুলো গুঁজে রাখবেন, যাতে শব্দটা ...ণের
...এবং—" বলিতে বলিতে সুধীন্দ্র দ্বারের শব্দে চাহিয়া দেখিল মুখে ঘোমটা ঢাকা একটি ...
...ধীরপদে গৃহে প্রবেশ করিতেছে ; ঠিক চিনিতে না পারিলেও আন্দাজীতে সে বুঝিল, ...
...ব্রীড়াবতী নবীনাই পঙ্কজিনী—তাহারই স্ত্রী ! চকিতের মত একবার তুষাররাজ্যের ...
...পর বিসরাগুলা তাহার চোখের ... মুখে ফুটিয়া ভাসিয়া ছিল, কিন্তু স্বল্পমাত্র পরেই ...
...দের ... কার মাঝখানে অপর কেহ বর্ত্তমান রহিল না, এবং সে তাহার কাছে ভাকিবার ...
...পঙ্কজিনী ... মুখের বস্ত্রাবরণ নিজেই সরাইয়া দিয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া নিজেই ...
...ড়াইল... সেই ধূসর, পিঙ্গলনেত্রা, বিদ্যুৎলেখা মূর্ত্তি সকল তাহার মনের মধ্যে ...
তাহাদের উৎপত্তিক্ষেত্রেই বিদ্যুৎবৎ লুকাইয়া পড়িল। কেবলে বঙ্গরমণী নগণ্যা ! এইতো *ইটালিয়ান ভাস্কর্য্যের* আদর্শ তাহারই সম্মুখে ! এই কুৎসিৎ ঘোমটাখানা ও লজ্জাজড়িত ভাবটুকু ...লেই এমূর্ত্তি স্বয়ং মিনার্ভা বা ভিনাসের সহিতও উপমিত হইতে পারে। নিজের স্ত্রীকে এ...যে ভাল লাগিতে পারে, এ যেন তার কল্পনায়ও ছিল না।

নূতন করিয়া প্রথম পরিচয়ের ঈষৎ সঙ্কোচ ও উচ্ছ্বাস প্রশমিত হইয়া আসিলে পঙ্কজিনী জিজ্ঞাসা করিল,—"দুচার দিন এখানে থাকচোতো ?"

সুধীন্দ্র তাহাকে বাহুবেষ্টিত করিয়া তাহার মুখের দিকে উৎফুল্লনেত্রে চাহিয়াছিল। সে এই ...টায় ঈষৎ চকিত হইয়া উঠিল, একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াই কহিল,—"থাকতেতো সাধ খুবই যায় পঙ্কজ ! ...সময় পাচ্চি কই ? আরতো পাঁচটি দিনের মধ্যে ভাগলপুর পৌঁছে কাজ আরম্ভ করতে হবে। ...—না হোক পরশু ভোরের ট্রেণে এখান থেকে বেরুনো চাই !" তার পর সে বিষণ্ণ ভাবটা ...য়া দিয়া সহাস্যে কহিয়া উঠিল, "তোমার নামটা কিন্তু সার্থক রাখা হয়েছিল পঙ্কজ !"

পঙ্কজিনী স্বামীর এই আকস্মিক স্তুতিগানে আকণ্ঠরঞ্জিত হইয়া তাহারই বাহু মধ্যে মুখটা ...য়া ফেলিল, ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "ছাই নাম ! যেম্‌নি কটমটে তেম্‌নি প্রকাণ্ড !"—মুখখানা ...ধরিয়া সুধীন্দ্র হাসিয়া কহিল, "সত্যি বল্‌চি, তোমার নাকের ঐ নাকছাবিটা, কাণের ...ড় ও হাতের বিচিত্র চুড়িগুলি খুলে ফেল্লেই তোমায় বোম্বের পার্শী মেয়েদের চেয়ে কোন ...খারাপ দেখায় না।"

পঙ্কজিনী এ কথাগুলা যেন শুনিতেই পায় নাই, এম্‌নিই ভাবখানা করিয়া তাহা উড়াইয়া ...। তার পর সে বলিল, "কিন্তু এত শীঘ্র তুমি যখন চলে যাবে, আজই ওঁদের বলা দরকার ...। আমায় পাঠাবার জন্য ওঁদের আবার একটু উদ্যোগ করতেও ত হবে।"

"তোমাকে ? আমি [illegible] নিয়ে যাব।"

সুধীন্দ্র একটু কুণ্ঠার সহিত কথাটা বলিয়া স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিল। চোখের দিকে স্থিরনেত্রে চাহিয়াছিল,—সে তেম্‌নি স্থিরচোখে চাহিয়াই জিজ্ঞাসা করিল,

জিজ্ঞাসার ধরণে সুধীন্দ্র যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। সে এ [illegible] করিয়া উত্তর করিল,—"তোমার কষ্ট হবে। সেখানে কোন বন্দোবস্ত ঠিক করা নাই। [illegible] বাসাটাসা গুছিয়ে নিই ; তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে বসে তখন তোমায় [illegible]"

সুধীন্দ্র ভাবিয়াছিল, এ যুক্তির পর আর অপর পক্ষ হইতে কোন তর্ক উঠিবে না। কিন্তু তাহার হিসাবে কিছু ভুল ছিল, সেইটুকুই ভাঙ্গিয়া দিবার জন্যই [illegible] অকাট্য যুক্তি পূর্ণ দৃঢ়স্বরে কহিয়া উঠিল, "আমার কষ্ট ! তোমার [illegible] আমারই বা তাতে কষ্ট হবে কেন ? তোমার জন্য তোমার কিছুমাত্র ভাবতে হবে না। বন্দোবস্ত আমি নিজেই করে নিতে পারবো। এখানে সব্বাই জানে তুমি আমায় নিয়ে [illegible] এসেছ, না নিয়ে যদি চলে যাও, তাতে লোকে কি মনে করবে ?"

সুধীন্দ্র একথা শুনিয়া কতকটা আশ্চর্য্য বোধ করিল, এবং যে কথাটা তাহার মুখে আসিয়াছিল সেই কথাটাই সে বলিয়া ফেলিয়া বিরক্তি ও বিস্ময় প্রকাশ করিল। কহিল, "লোকে কি এইটুকু বিবেচনা না করেই 'কিছু মনে' করে থাকে ? যে লোকটা এই সম্প্রতি মাত্র দেশে ফিরে এসেছে, এখনও একটা জায়গায় সে স্থির হয়ে বসতেও পারেনি, কেমন করে এর মধ্যেই এত একটা প্রকাণ্ড দায়িত্ব সে তার ঘাড়ে চাপাতে পারে ?"

"ওঃ সেই 'দায়িত্ব ঘাড়ে চাপানো ?' ভয়েই তাহলে আমায় নিয়ে যেতে চাচ্ছো নেই।" সুধীন্দ্র ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া উত্তর করিল, "অবশ্য তা [illegible] তবু একটু অসুবিধা আছে বই কি ! দু'মাসে আর ক্ষতি কি ?"

"না ক্ষতি আর কি ! এই যে বিলাত থেকে এসেই তুমি এতদিন আমাদের কাছে না, তাতেই কি কেউ কিছু কম বলেচে নাকি ? এবার যদি আমায় না নিয়ে ফিরে যাও-[illegible] ত আর লোকের কাছে মুখ দেখাতেই পারবো না।"

এতদিন পরে ফিরিয়া অর্দ্ধ পরিচিতা স্ত্রীর মুখে এমন ধরণের স্পষ্ট স্পষ্ট [illegible] যে সম্ভব এ কথাটা, হাজারও সাহেবীয়ানার দিকে ঝোঁক দিয়া চলিলেও বাঙ্গালীর ছেলে [illegible] একবারের জন্যও মনে হয় নাই। তাই তাহার এই সুস্পষ্ট জবাব শুনিয়া সে ক্ষণকাল [illegible] হইয়া থাকিয়া পরে ঈষৎ ঝোঁক দিয়া কহিল,—

"যে সব লোক সামান্য কারণে এতবড় সব অন্যায় অন্যায় কথা রটায়, তাদের [illegible]

[illegible] লোকের ভয়ে [illegible] হিংসা করে বলে !"

কথাটা কতকটা উত্তেজনার সহিতই বলিয়া গেল, "না জেনেশুনে যারা [illegible] তাদের আমি মানুষ বলে গ্রাহ্যও করিনে।"

[illegible] বলিয়াছে ? ইহা না জানিয়া শুনিয়াই সুধীন্দ্র যদিও একটু [illegible] দিয়া দিল, কিন্তু দেখিতে গেলে ইহাতে পঙ্কজের পক্ষেও একটু রাগ [illegible] এ নালিশ আনিয়াছিল। কিন্তু হইলে কি হয়, হঠাৎ এই- তাহার মনটাকে একান্তভাবেই উত্তপ্ত করিয়া তুলিল। সে তীব্র অভিমানে "সাধারণের সঙ্গে অসঙ্গত কোন কিছু দেখলেই লোকে [illegible] কথা বলে [illegible] তো ঢাকবে না। ইচ্ছা না হয় নিয়ে নাই যাবে, তার জন্য আর [illegible] তোমার মা কোনদের "অমানুষ" বলে গালটা দিয়ে আর কাজ নাই।"

সুধীন্দ্র এ কথায় নিরতিশয় অপ্রতিভ হইয়া কহিয়া উঠিল, "বাঃ আমি কি তাদের কিছু বলেছি ? যাওয়াটা ঠিক করে না নিয়ে গেলে সেখানে দুজনকেই অসুবিধায় পড়তে হবে তাই বলছিলাম। এতে কে কি মনে করতে পারে ?"

"নাই যদি পারে সে ভালইতো ! আমি যেতে চাইনে।" এই প্রথম সাক্ষাতে কিশোরী পত্নীর সলজ্জ সুন্দর আত্মনিবেদনের যে ছবি বঙ্গ যুবকের চির হৃদয়নিহিত,—দীপ্তনেত্রা স্পষ্টবাদিনী যুবতী পত্নীর এই প্রথম সম্ভাষণে অকস্মাৎ তাহাই সুধীন্দ্রের নবআদর্শের স্থলে ফুটিয়া উঠিল। এরেই সে নাকি মিন্‌মিনে প্যান্‌পেনে ঘোমটাটানা বঙ্গবধূ ভাবিয়াছিল !

সুধীন্দ্র স্ত্রীর কতকটা জিদের পরিচয় পাইয়া কেমন যেন একটু বিপন্ন বোধ করিতেছিল, [illegible]র ইচ্ছার বিরুদ্ধেও এই পুনঃ পুনঃ দৃঢ়তায় সে ঈষৎ বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া বলিল,—"তুমি না বুঝে রাগ করচো, কিন্তু একটুখানি ভেবে দেখ্‌লে রাগ করবার এতে কিছুই ছিল না।"

পঙ্কজিনী একটি বার অবিশ্বাসে ভরা চোক তুলিয়াই মুখ নত করিল। সে চিরদিন নিজের [illegible] ধরিয়াই সকলের সঙ্গে লড়িয়া আসিয়াছে সবাই তাহার কথার বাধ্য। আর আজ, যাহার [illegible]র স্ত্রীলোকের সকল দাবী, সকল আব্দার চলে—একমাত্র সেই পরম নির্ভরের চরম আশ্রয়স্থল স্বামীর নিকট হইতেই তাহার এই প্রথম অনুরোধই ব্যর্থ হইতে চলিল। তাহার এই উনিশ বৎসর বয়সের মধ্যে এই সর্ব্ব প্রথম সে স্বামীর গৃহে যাইবার অবসর পাইয়াছে ; কোথায় তিনি [illegible] হইতে তাহাকে এতদিনকার বিচ্ছেদের অবসানে মিলনের ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষায় পরিপূর্ণচিত্ত হইয়া আপনা হইতে নিজের কাছে দুজনের সমুদয় দুঃখ সুখ সুবিধা অসুবিধায় মেশান সংসারের [illegible]খানটিতে বরণ করিয়া লইবেন, তা'না করিয়া সে সমস্ত লাজ লজ্জার মাথা খাইয়া যখন [illegible] হইতে তাঁহার কাছে যাইতে চাহিল—এ বিষয়ে নিজেই নিজের ইচ্ছা জ্ঞাপন এবং অবশেষে

লোকলজ্জার ভয় প্রদর্শন [illegible] মনাত জানা[illegible]
বড় করি[illegible] নিজের মতটাকে উচ্চে তুলিয়া রাখিলেন।
হইয়া সে সরিয়া বসিয়া সবেগে কহিল, "কে রাগ করচে? আমি [illegible]
কাউকে আমি অসুবিধায় ফেলতে চাইনে।" বলিতে বলিতে [illegible]
উঠিল। সে তাড়াতাড়ি পালঙ্ক হইতে নামিয়া পাশ ফিরিয়া [illegible]
লাগিল। সেটা খুলিবার তখন কিছুমাত্র প্রয়োজন কেহই বোধ করে [illegible]

সুধীন্দ্র ইহা লক্ষ্য করিয়াছিল। সে তাহাকে হঠাৎ এই [illegible]
লজ্জিত হইয়া কিয়ৎক্ষণ [illegible] করিয়া বসিয়া রহিল। তারপর আস্তে আস্তে না[illegible]
আসিয়া অপ্রসন্ন[illegible] বলিল, "আচ্ছা তবে না হয় চলো,—রাগ করো না।"
চাপিয়া [illegible]মুখে কি একটা তামাসা করিতে গেল।

পঙ্কজিনী এতক্ষণ মুখ ফিরাইয়া ছিল, এইবার স্বামীর সহজ লঘু [illegible] সে [illegible]
[illegible] এবং তীব্রস্বরে কহিয়া উঠিল, "আমি কি পথের কুকুর? যে তু'করে
অমনিই ছুটে যাব? তোমার দয়ার জন্য তোমায় অনেক ধন্যবাদ! কিন্তু আমি যাবো না।"

অপমানে আরক্ত হইয়া সুধীন্দ্রও তখনই তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া সক্রোধে কহিল, "[illegible]
শুধু শুধু আমার পরে' অন্যায় করচো পঙ্কজ! এমন কিছু অন্যায় আমি করিনি।"

(৩)

ভাগলপুরে নাথনগরের দিক ঘেঁসিয়া সহরের কিঞ্চিৎ বাহিরে একখানি হাল ফ্যাশ[illegible]
বাংলো বাড়ীতে নূতন সিবিলিয়ান সুধীন্দ্রনাথ সস্ত্রীক আসিয়া উঠিল। সুধীন্দ্র এখানে প্রায় [illegible]
মাস হইল শিক্ষানবিসীরূপে কাজে ভর্ত্তি হইয়াছে। প্রথম সে একাই আসিয়াছিল, এ কয়মাস [illegible]
ছিল। পূজার ছুটিতে স্ত্রীকে 'রাজারহাট' হইতে আনিতে গিয়া একলা ফিরিয়া আসিবার [illegible]
ঘটিয়াছিল, কিন্তু তা ঘটে নাই। কারণ তাহার স্ত্রী পঙ্কজিনী সেবারও "এখন আমি [illegible]
পারিব না, শরীর ভাল নাই" বলিয়া তাহার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়া তাহাকে ফিরাইয়া
চাহিয়াছিল। সেবার সে তাহার না আসিবার জিদ ছাড়াইতে না পারিয়া শ্যালিকা [illegible]
কাছে 'গোহাই' মানিতে গেল। বলিল "দিদি, ও' তো কিছুতে এবার যেতে রাজী [illegible]
কি করি?"

দিদি একটু তামাসা করিয়া বলিলেন, "আহাহা, তবে তো বড় মুস্কিলেরই কথা গা! [illegible]
পরে ফিরে এসে আবার কি না ছাড়াছাড়ি। তা দেখ সুধীন, একটা কাজ কর নাহয়
তুমিও ওকে এবারটা না হয় চোক কান বুজে এখানেই রেখে গিয়ে ঘরকন্নাটা পেতে
যাও। এই তিনমাস বাদে পূজোর সময় এসে নিয়ে যেও তখন। মাত্র এই তিনটে মা[illegible]
নয়, ও দেখতে দেখতেই কেটে যাবে। এর মধ্যে আমরাও ঘরবসতের জোগাড়টা [illegible]

[illegible] কিছু সাজিয়ে [illegible] পাড়াতে [illegible]
[illegible] কি যে করা উচিত ঠিক মত বুঝিয়া উঠিতে না পারিয়া আবার স্ত্রীকে
[illegible]লোনা পঙ্কজ! কেন অমত করচো?"

[illegible]নী তখনও শান্ত না হইয়া সেই ভাবেই উত্তর দিল,—"এবারে আমি আর যাবো না।"

ছুটিতে শ্বশুরালয় গিয়াই সর্ব্ব প্রথম সে স্ত্রীকে লইয়া যাইবার খবরটা সর্ব্বসাধারণে
[illegible]টুও বিলম্ব [illegible] না। স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্রে বলিয়া ফেলিল, "একলা
[illegible] তুমি এবার যাচ্চো তো?"

[illegible] শুনিয়া উত্তর দিল, "সেই জন্যই আমায় নিয়ে যাবে?"

[illegible] বড় একটা খোঁচা রহিয়াছে, সেটুকু সুধীন্দ্রের গায়েও বিঁধিল, [illegible] কিসের
[illegible] তাহা [illegible] বোধগম্য হয় নাই, তাই বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কি জন্য?"
[illegible] একা থাকা যায় না বলে।"

সুধীন্দ্রের মনের মধ্যে স্ত্রীকে বিরক্তি বোধ যথেষ্টই ছিল, কিন্তু সে ভাবটাকে চাপা দিয়া
[illegible] ভান করিয়া উত্তর দিল "একা থাকতে কষ্ট না হলে কি কেউ স্বাধীনতা বিসর্জ্জন
দিয়ে, তোমাদের মতন দুর্জ্জয় জানোয়ারকে কাঁধে চাপাতে ভরসা করে? স্বার্থ একটা
থাকা চাই বইকি সকল কাজেই।"

পঙ্কজিনী জবাব দিল, "আমার যখন তোমার সঙ্গে যাবার কোন স্বার্থ আপাত-
দৃষ্টিতে দেখতে পাওয়া যাচ্চে না, তখন নাইবা আমি গেলাম!"

সুধীন্দ্র কিছু চটিয়া বলিল, "সব কাজই কি স্বার্থ দেখে করতে হয়, না হয় নিঃস্বার্থ
[illegible]পকারের হিসাবে একটা আধটা কাজও করেই ফেল্লে!

পঙ্কজিনী কহিল, "এই না তুমি বল্লে স্বার্থ ভিন্ন কোন কাজ করা যায় না।"

সুধীন্দ্র মনে মনে কহিল "আচ্ছা দাঁড়াও তুমি!"

যাইহোক পরিশেষে পঙ্কজিনীকে তার পতিগৃহে আসিতে হইল। আসিবার কালে
[illegible] বিদায় সজ্জা পরিয়া সে মা, দিদি ও বৌ দিদিদের মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া দীর্ঘ ঘোমটায়
মুখ ঢাকিয়া জরির তাবিজপাড় চাঁদেরআলো শাড়ীর উপর একখানা মোটা কাশী সিল্কের
[illegible] ঢাকা দিয়া দেখা দিল, তখন সেই দিকে চাহিতেই সুধীন্দ্রের মুখখানা বিষম গম্ভীর
হইয়া উঠিল।

"দিদি শুনুন—" বলিয়া সে একটুখানি অগ্রসর হইল এবং সুহাসিনী নিকটে
[illegible], তাঁহাকে বলিল "এ কি রকম কাপড়ের পুঁটুলী পাকিয়ে দিয়েছেন? একে আমি
[illegible] করে নিয়ে যাব? ফার্ষ্ট ক্লাসে যেতে হবে, সাহেব, মেম তাতে কেউ থাকতে

[illegible]ন। তা' পরে ষ্টেশনে [illegible] কেউ কেউ হয়ত দৈবাৎ উপস্থি[illegible] ফেলে ভাল একটা শাড়ী পরে নিতে, আর পা খালি রাখা কিছুতেই হবে [illegible]

সুহাসিনী বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন যে, "গাড়িতে উঠিয়া চাদরখানা খুল[illegible] চলিবে, শাড়ী যা আছে ওই থাক এবং জুতা সে পরিবে না, এবং জুতা [illegible] সুধীন্দ্র ইহার একটা সর্ত্তেও রাজী হইল না। সে বলিল, ট্রেণের এখনও [illegible] আছে, সাইকেল লইয়া সরকার বা সুহাসিনীর পুত্র দিবানাথ পঙ্কজের পায়ে[illegible] লইয়া দৌড়িয়া যাক্—[illegible] পৌঁছিয়া দি[illegible] বদল করা না হয় তাহা হইলে অন্ততঃ আঁচল হইতে চাবির রিংটা খুলি[illegible] ঘুরাইয়া [illegible] হোক, ঘোমটা ও চাদর কিছুতেই চলিবে না।"

সুহাসিনী পঙ্কজকে ডাকিয়া আনিয়া সব কথাই বলিল এবং [illegible] সুধী[illegible] [illegible] করিয়াও দিল। কিন্তু পঙ্কজিনী নিজের ভূষার এতটুকু পরিবর্ত্তন মঞ্জুর করিল না। সে দৃঢ়স্বরে কহিল "জুতো পরা আমার অভ্যা[illegible] জুতো পরলে চলতে পারবো না; আর পথে ঘাটে ভদ্র গৃহস্থের মেয়ের গায়ের গড়ন দে[illegible] বেড়াবার জিনিস নয়; আমি এম্‌নি করেই যাবো।"

সুধীন্দ্র বলিল "তোমায় এমন জুজুবুড়ী সাজিয়ে আমি নিয়ে যেতে পারবো না, আমার মাথা কাটা যাবে। চাদরটা খুলে ও জুতো পায়ে দিয়ে তোমায় যেতেই হবে।"

পঙ্কজ দরজার হাতলটা ধরিয়া থাকিয়া সহজস্বরেই জবাব দিল, "তাহলে আমি যাবই [illegible]

সুধীন্দ্র ইহার পর প্রকাশ্যে আর কিছু না বলিলেও মনে মনে সক্রোধে বলিয়া [illegible] "আচ্ছা, থাক তুমি এবারটা, সব শোধ তুলে নোব।"

গাড়ীতে উঠিবার সময় মেজবৌ অগ্রসর হইয়া প্রথমতঃ নিজের আঁচলে ননদের অ[illegible] পা মুছিয়া লইতে লইতে অনুচ্চস্বরে বলিয়া ফেলিল, "এইবারের মতন যা, পা মোছাবা[illegible] বারে আবার জুতো মোছাতে হবে; তখন আবার এসব নোংরা প্রথা বলে পা সরায়েই বা [illegible]

পঙ্কজিনী তাহার মুখে একবার তীব্র কটাক্ষে চাহিয়া দেখিল।

নূতন সংসারে আসিয়া পঙ্কজিনীর সমুদয় কল্পনা-কুসুমগুলি যেন নিদাঘ রৌদ্রতা[illegible] উঠিবার উপক্রম করিল। সে এতদিন ধরিয়া নিজের যে সংসার চিত্রখানি কল্পনার [illegible] চিত্রিত করিয়া রাখিয়াছিল, বাস্তবের সহিত তাহার যেন কোন খানেই সে সংযোগ দে[illegible] না। এখানে পা দিয়াই প্রথমতঃ সে মা ডাকের পরিবর্ত্তে 'মেমসাব্' এই সম্বোধনে নিজ[illegible] হইতে শুনিয়া হাসিবে কি কাঁদিবে তাহারই ঠিকানা করিতে পারিল না। সে শ্রী[illegible] দাসী চৌদ্দ পুরুষেত বটেই, আরও কত পুরুষে তা জানা নাই—চিরকেলে জাতিতে [illegible]

[illegible] —সে হঠাৎ 'মেম[illegible] [illegible]খে? তার কি তুষারের মত [illegible] [illegible]হেব হন এবং তার স্ত্রী হন তখন 'মেম সাহেব',—এপ্রথা [illegible] দিনে [illegible]াড়াইয়াছে তা হয়ত সে জানিত, তথাপি সেটাকে মানিয়া না লইয়া সে তার জন্ম [illegible]াকে সক্রোধে ধমক্ দিয়া কহিল,—"দূর্ আমি কেন মেম সাহেব হ'তে [illegible] [illegible]াইজী।" তারপর ঘাগরাপরা, কুর্ত্তিআঁটা, ৮টি পায়ে মূর্ত্তিখানার আপাদমস্তকে দৃষ্টি [illegible] আর কিছু [illegible] বলিয়াই সুধীন্দ্রের উদ্দেশ্যে ছুটিয়া আসিল।

[illegible] যে মাগীটাকে রেখেছ [illegible] জাতের মেয়ে নয় ত?"

[illegible]র হ্যাট বারান্দার র‍্যাকে ঝুলাইয়া রাখিয়া সেই [illegible]ই দাঁড়াইয়া একটা [illegible]ই দিকেই চোখ রাখিয়া সে উত্তর করিল, "উঁহু, ছোট [illegible] হতে যাবে? [illegible]ছু নেই।"

পঙ্কজিনী দৃষ্টি বিস্ফারিত করিয়া বলিয়া উঠিল—"কি? তাহলেই ত ও ছোট জাত হলো।"

সুধীন্দ্র ধীরভাবে উত্তর দিল—"ছোট কি বড় তা জানিনে; দোসাদের ঘরে জন্মে খৃষ্টান মিন্সারীদের মুসলমান[illegible] দ্বারায় পালিত হয়ে সাহেবদের ঘরে চাকরাণী গিরি করায় যা হয় ও তাই; তবে ও অনেকেগুলি বড় সাহেবের মেমের কাছে কাজ করেছে, সার্টিফিকেটও পেয়েছে তাতে; ও তোমার [illegible] তাই ওকে বিস্তর মাইনে দিয়ে আনিয়েছি।"

আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিয়া পঙ্কজিনী কহিলেন, "আমি ওর ছায়া মাড়াব, মনে করেছ? দাও ওকে এই মুহূর্ত্তেই বাড়ীর বা'র করে, না হলে আমি তোমার বাড়ীই ঢুকবো না।"

সুধীন্দ্র ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল "ওকে তাড়ালে চল্‌বে কি করে? ওরকম লোক নাকি একটা হঠাৎ মেলে? কত খোঁজ খবর করে মিষ্টার সিনার সুপারিশে তবে ওকে আরা থেকে আনাতে হয়েছে। মাস খানিকের উপর এম্‌নিই বসিয়ে রেখে মাইনে দিচ্চি। ওকে ছাড়ান চলে না। আর ও গেলেও যে আসবে সেইবা কোন্ ভট্টপল্লী-নিবাসিনী হবে? আয়া ওই রকমই হয়ে থাকে।"

পঙ্কজিনীর সর্ব্ব শরীর একটা অকথ্য ঘৃণার শিহরণে শিহরিয়া উঠিল, সে নিজকে একান্ত পরাজিত, অবমানিত বোধ করিয়া ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া থাকিবার পর সহসা একটা যেন নূতন বলে সবল হইয়া উঠিল এবং একান্ত দৃঢ় ও অবিচলকণ্ঠে কহিল, "আমার মোটেই আয়ার দরকার নেই, আমি হিন্দুর মেয়ে, আমি হিন্দুর মেয়ের মতন থাকবো, তোমার ওই জাত-হারানো আয়া প্রভৃতিকে দয়া করে বিদায় করো, আমি ঘরে ঢুকি। নাহ'লে এই খানেই বসে রাত কাটাতে হয়।"

সুধীন্দ্রের অধরে চুরোটিকার অন্তরালে একটুখানি প্রতিশোধপূর্ণ শ্লেষের হাসি খেলিয়া গেল। কিন্তু গলার স্বরে তাহার গাম্ভীর্য্য ব্যতীত আর কিছুই প্রকাশ পাইল না।

"বলেছিত, ও মিষ্টার সিনহা... তাড়াও

পঙ্কজিনীর পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া ক্রোধের তড়িৎ এক... গেল। সে নিজের পথশ্রান্ত ক্লান্ত দেহে এ অপমানের জ্বালাকে দ্বিগুণিত বোধ ... উচ্চকণ্ঠে প্রত্যুত্তর করিল, "তাহলে আমাকে ঘরে ঢুকতে না দেওয়াই তোমার... জেনে শুনেই তাহলে এসব ব্যবস্থা করে রেখে গেছ? বেশ, ও তাহলে থাক, ... পৌঁছে দিয়ে এস। তুমি হিন্দু বাড়ী থেকে হিন্দু মতেই আমায় বিয়ে করেছিলে... আমায় অহিন্দুত্বের কোন আ...

মীমাংসাটা অবশ্য কষ্টে এমনই করিয়া হইল যে, আয়াকে বিদায় দেওয়া... মুহূর্ত্তে ... বাহির করাও ত আর সত্যই সম্ভব বা সঙ্গত নহে। ... না আসিয়া নিজের নির্দ্দিষ্ট ঘরে আজকের মত থাকিবে, আগত কল্য ... পরামর্শ করিয়া আর... করা যাইবে। পঙ্কজিনী প্রসন্নচিত্তে ঘরে ঢুকিয়া ... রাতটুকু কাটাইল।

(৪)

জীবনের এই প্রথম প্রভাত কি মধুর কি উজ্জ্বল! আজই যথার্থভাবে এই যাত্রাপথের তোরণ দ্বারে প্রথম মিলন। তাদের সম্মুখে আশা ... শ্যামলবিটপী ছায়ায় শীতল ও সুশোভন যাত্রাপথ। এপথে অনন্যসঙ্গী একাত্ম দুজনে ... প্রেমে পরস্পরের পথ-ক্লেশকে প্রশমিত করিয়া একলক্ষ্যে অগ্রসর হইবে, তবে এই দীর্ঘ ... পথের শ্রম পরস্পরকে শ্রান্ত ও পথহারা করিতে পারিবে না। কিন্তু এ পথের পরস্পরের ... ব্যতীত একা চলায় যতই ক্লান্তি ততই পথ হারাইবার ভয়। হয়ত কোন দিনই গন্তব্যস্থানে ... ঘটিয়া উঠিবে না।

শরতের মেঘশূন্য রৌদ্রোজ্জ্বল প্রভাতের আলো সুবর্ণরশ্মি বিকীর্ণ করিয়া ... দিবসের সূচনা করিয়াছিল। আকাশের সুদূর প্রান্তটী অবধি তেমনি উজ্জ্বল ও গাঢ়... অনুরঞ্জিত হইয়া যেন সুপ্রসন্না প্রকৃতির পরিতৃপ্তির মতই সুন্দরতর হইয়া উঠিয়াছে। ... বাংলোখানার চারিদিকে কিছুদূর পর্য্যন্ত বর্ষাজল-নিসিক্ত সুকোমল তৃণাস্তীর্ণ সবুজ ... শেষপ্রান্ত ঘনবিন্যস্ত ফরগেট-মি-নট্‌এর বেড়া দিয়া ঘেরা। সেই বেড়ার উপর ... মধ্যে মধ্যে নীলের পুষ্প ও জরদ রংয়ের ফুলের গুচ্ছ সেই সুন্দর প্রাকৃতিক শোভার মধ্যে ... একটুখানি স্থান করিয়া লইতে ভুল করে নাই। ইহার একপাশ দিয়া সরকারী রাস্তা ও ... রেলপথ—সাদা, কাল দুইটা প্রকাণ্ড অজগরের মতই স্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছে। উত্তরের...

...দিয়াপে সেই ... ...ব্যাপ্ত ক্রোধ ...

...'এককাষ্ঠ' টেবিলে দুই জনের মতই সব জিনিস দেওয়া হইয়াছিল। তার দীর্ঘ ... গুম্ফধারী পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স্ক 'বয়' চায়না চাঙ্গানীতে গরম জল ঢালিয়া সেটা ... টের তুলাভরা ঢাকনীর তলায় হুঙ্কারপূর্ব্বক একটু থতমত খাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। চা'টা ... ক, না দিবে তার কোন আদেশ পাইতেছিল না।

... এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিয়া গুরুগম্ভীরমুখে 'বয়'কে আজ্ঞা করিলেন, "মেমসাবকো

"বয়" ... মিনিট পরে প্রায় হতভম্বভাবে গুটি গুটি আসিয়া সাহেবের অনেকটা দূরে ... সুধীন্দ্র ... দেখিল, তখন কিছু বলিল না, পরে মিনিট চারেক অপেক্ষা করিবার ... করিল, "কেয়া হুয়া?"

"বয়" ভয়স্তম্ভিতভাবে কহিয়া গেল—"হুজুর! মেমসাব্ কহিল্ হুন্ আভি আনে নেহি সেকেগে হুঁ—"

সুধীন্দ্র ভুরু কুঁচকাইয়া সবিরক্তকণ্ঠে উহাকে হুকুম দিল, "আচ্ছা তোম্ চা বানা দেও—"

তারপর আবার কি ভাবিয়া সেই অর্দ্ধ-শীতল চা'কে সুশীতল হইবার অবকাশ দান করিয়া ... উদ্দেশে উঠিয়া গেল।

বেডরুমের পাশে দুইখানি ছোট ছোট ঘর, তার একখানি মেমসাহেবের ড্রেসিংরুম ও ... খানি তাঁর বাথরুমের বন্দোবস্তে ধরা হইয়াছিল। সুধীন্দ্র স্ত্রীর অনুসন্ধানে আসিয়া দেখিল, সেই ড্রেসিংরুমের সাজসজ্জাকে শয়ন গৃহে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া সেই খালি ঘর খানাকে একটা মাত্র ... মালির সাহায্যে পঙ্কজিনী বেশ করিয়া গোময় মৃত্তিকা লিপ্ত করিয়াছে, এবার সেটা ধৌত ... হইবে। সুধীন্দ্র অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া আসিয়াছিল; কিন্তু পঙ্কজিনীর পরিশ্রমে ঈষৎ ক্লান্ত ও ... রক্ত মুখের নূতন শোভায় তার সে বিরক্তির ঝাঁজ অনেকখানিই যেন এক মুহূর্ত্তের মধ্যে ... করিয়া লইল। অপেক্ষাকৃত সংযতকণ্ঠে সে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—

"কই ডেকে পাঠালুম আসা হল না যে বড়? চা'টা যে জুড়িয়ে জল হয়ে গেল, এস এস—"

পঙ্কজ ঘটির জলটা মালির ঝাঁটার মুখে ঢালিয়া দিয়া চকচকে চোক তুলিয়া মৃদু হাসিয়া ... করিল "চা'তো আমি খাইনে।"

সুধীন্দ্র সেকথায় কর্ণপাত না করিয়াই ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিল, "নাও, ঘটি ফেলে চলে ... চা'টা ওদিকে জুড়িয়ে জল হয়ে যাচ্ছে।"

পঙ্কজ মাটির ঘড়া হইতে আর একঘটি জল গড়াইতে গড়াইতে পুনশ্চ ওই কথাই বলিয়া ... "বল্লামতো আমি চা খাইনে, তুমি খেয়ে নাও গে।"

সুধীন্দ্র এবার একটু [illegible] উঠিল—
এমন মন্দ [illegible] এখনতো তোমার চা খাওয়া অভ্যাস
শীঘ্র করাই ভাল।"

পঙ্কজিনী জল গড়ান বন্ধ করিয়া প্রশ্ন করিল, "চা খাওয়া অভ্যাস করতে হবে [illegible]
সুধীন্দ্র কহিল [illegible] তা হবে বৈকি, তুমি একজন সিভিলিয়ানের স্ত্রী,—সেটা মনে রে[illegible]
পঙ্কজিনীর ঠোঁটের আগায় একফোঁটা তাক্ত বিদ্রূপের হাসি ঝল্‌মল [illegible]
কণ্ঠস্বরেও সেটুকু গোপন চেষ্টা না করিয়া সে কহিল—"তব [illegible] লাটসা[illegible]
এই যা রক্ষা।"

সুধীন্দ্র বেশ একটু গরম হইয়া বলিল—"লাটসাহেব আমি একদিন [illegible]
তার প্রমাণ কি?"

বাস্তবিকই প্রমাণ কিছুই ছিল না, এবং চলিত শাস্ত্রেই আছে [illegible] চরিত্র [illegible]
ভাগ্যের কথা দেবেরও অবিদিত।' অতএব যাহা "দেবা ন জানন্তি" তাহা মনুষ্য হইয়া
জানার জন্য কাহাকেও দোষী করা যায় না এবং সে অজ্ঞতা পঙ্কজিনী নীরবেই স্বীকার [illegible]
লইল। তারপর অন্যদিক দিয়া বিষয়টাকে মিটাইতে চেষ্টা করিয়া কিছু নম্রস্বরে কহিল, "[illegible]
এখনো মুখধোয়া কাপড় কাচা কিছুই হয়নি। তুমি চা খেয়ে নাও গে যাও লক্ষ্মীটি!"

পঙ্কজিনীর অ-লড় অবস্থা এবং ঘরের মধ্যের গোবর জলের বহর দেখিয়া সে [illegible]
সুধীন্দ্রেরও ভরসা কিছু কম পড়িতেছিলে, এবং ইতিমধ্যে চা'য়ের দুরবস্থা তো যেমন হইয়া
তাহা হইয়াছে, সেই ঠাণ্ডা চা খাওয়াইয়া এই চা-বিতৃষ্ণ-চিত্তকে ঠাণ্ডার চেয়ে [illegible]
বেশী করা সম্ভব বোধে অগত্যাই তাহাকে রণে ভঙ্গ দিতে হইল। তবে যাত্রাকালে যাহা
গেল, তাহার অর্থ এই যে, আজিকার মত সে তাহার এই অসঙ্গত নিয়ম ভঙ্গকে মা[illegible]
কিন্তু এমন আর কোন দিন যেন না হয়, আর বেলা ঠিক দশটা পাঁঠ মিনিটের সময়
তাহার সঙ্গে ডিনার খাইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে, সেবার আর এরকম অসভ্য ডাকাডাকি [illegible]
করাইয়া যেন ভৃত্য মহলে সমালোচ্য না হয়।

মৌনকে যদি সর্ব্ববাদিসম্মতি ক্রমেই সম্মতি লক্ষণ বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়,
স্বীকার করা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে যে পঙ্কজিনী স্বামীর আদেশ পালনে মৌনাবলম্বন [illegible]
লক্ষণ জানাইয়াছিল।

(ক্রম[illegible]

শ্রীমতী অ[illegible]

[illegible]াই"-দৃশ্যা[illegible]

("কালকাতা রিভিউ"-র সৌজন্যে)

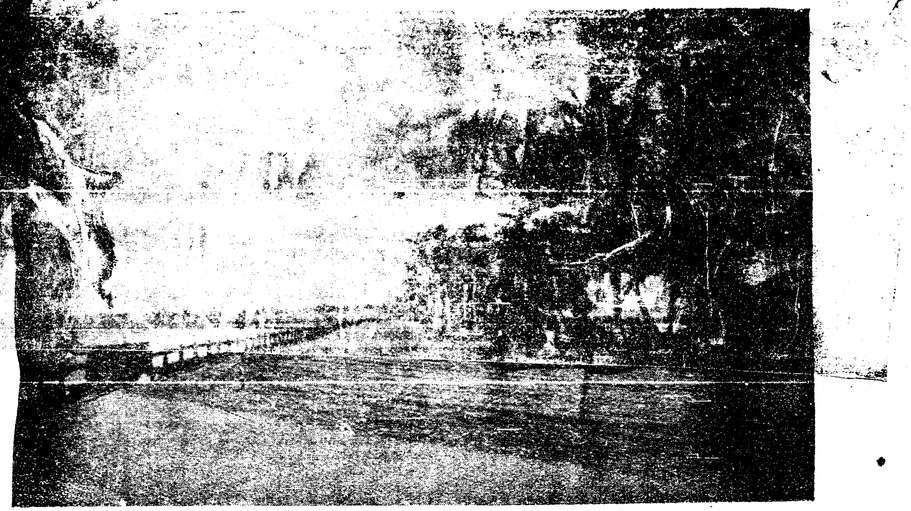

হর্ণবি রোড্

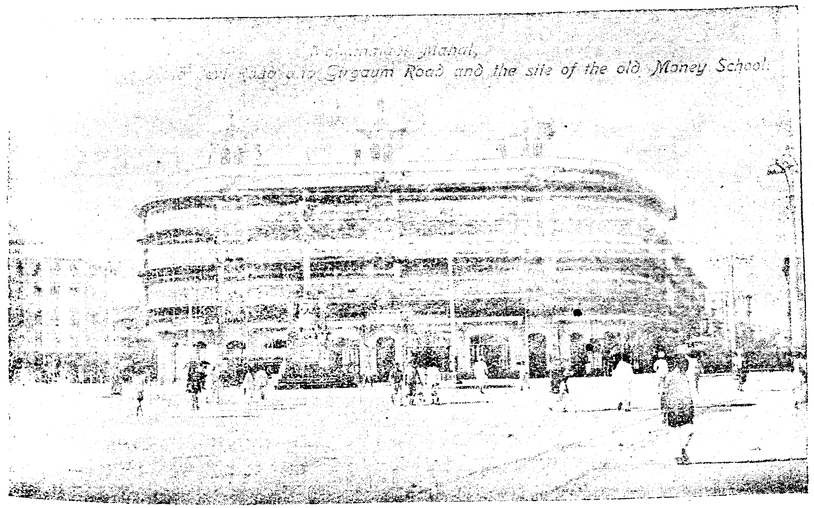

মহম্মদী মহল

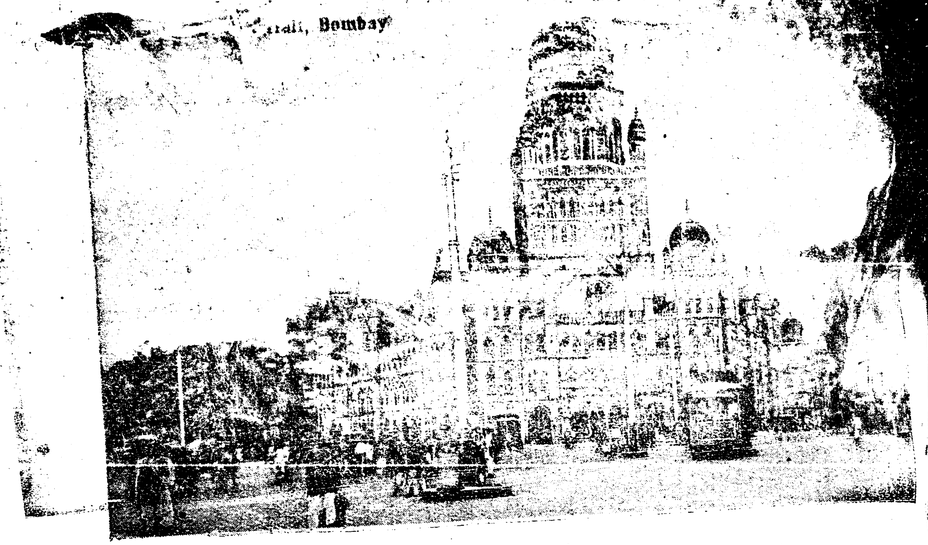

মিউনিসিপ্যালিটি ভবন

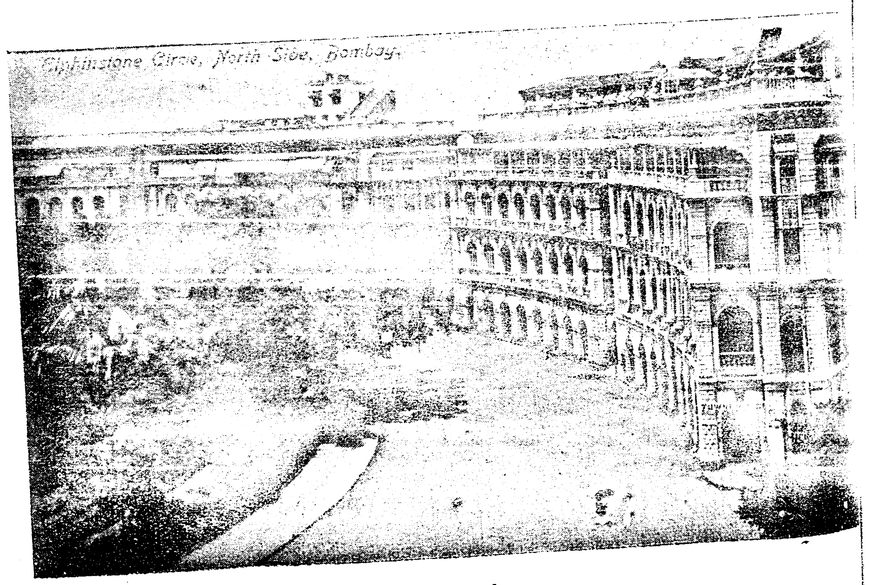

এলফিন্‌ষ্টোন্ চক্র

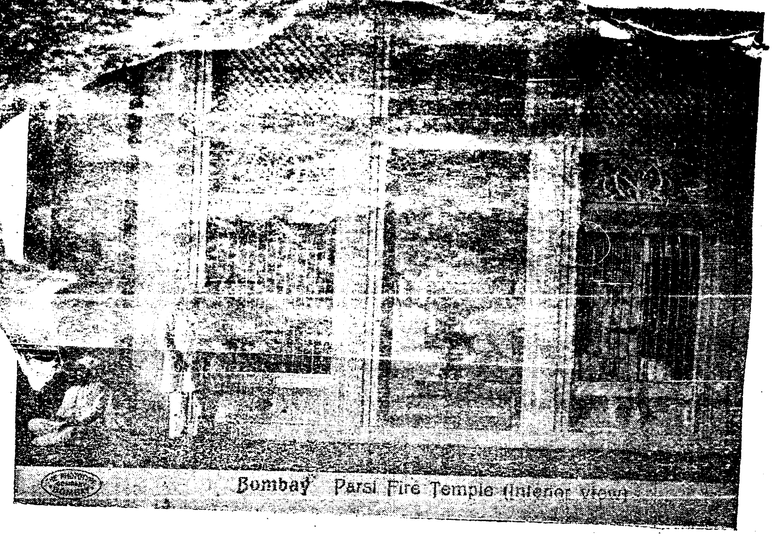

পার্শী অগ্নি-মন্দির

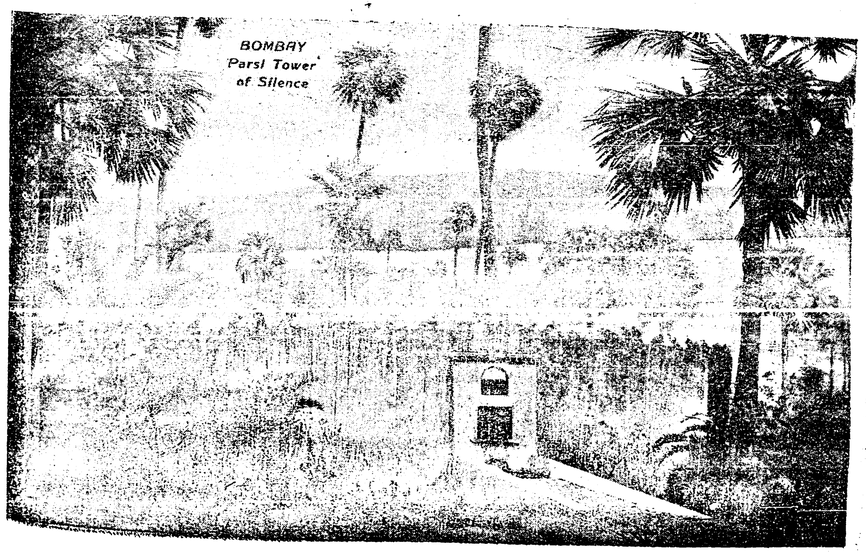

পার্শীদিগের সমাধি স্থান

নীরব-নিবাস

ইউনিভার্সিটি ঘটিকা-স্তম্ভ

কেনেডি—সমুদ্র-দৃশ্য

বুদ্ধগয়ার পথে

আজ চলেছি সকালবেলা বুদ্ধগয়ার শুদ্ধ পথে
মন রে আমার, শান্ত থেকো, ক্রুদ্ধ নহে কোন মতে,
বাম দিকেতে ফল্গু রোগা বইছে ধীরে ঝিরি ঝিরি—
শিয়রে তার বিরাট-বপু পাহারা দেয় বিন্ধ্যগিরি ;
কোন্ সে গিরি ফল্গু-জনক—কার স্নেহে সে বক্ষ ভরে ?
নিদয় তাহার এ কি পিতা !—নেই কি স্নেহ ফল্গু তরে ?
কাতর চলে করুণ সুরে ফল্গু চলে বিষাদিনী—
বালির তটের বুক মেলে সে ভাব্‌ছে উদাস—কি না জানি!
বট-অশথে আমের গাছে বুদ্ধগয়ার পথটী ঢাকা—
এ কি মোহন, এ কি শীতল, এ কি আঁচল স্নেহমাখা !
কোন্ বেদনা কাহার প্রভাব আজ্‌কে এরা বক্ষে রাখে !—
যতই চলি ততই ভুলি কার সে করুণ অনুরাগে।
এই শীতলে এই ছায়াতে ঢাকা যেন কাহার বাণী—
এ বাণী কি সেই মানুষের, সে নর-দেবের ?—বেদন মানি'
দুঃখ মানি' দৈন্য মানি' চিত্ত যাহার জিন্‌ল সবে,
আত্মবলের শিখায় যাহার পুড়্‌ল যত শঙ্কা ভবে।
ফল্গুনদীর এই জলে কি পথশ্রমে কাতর হিয়া
সে রাজতনয় করল পরশ, হর্‌ল তৃষা এ জল পিয়া ?

যতই চলি চক্ষে আমার উঠ্‌ছে ভেসে সেই সে কথা—
সেই সে শুদ্ধোদনের তনয় ঘর ছেড়ে যায়,—নিজনতা
নিজনতা কোথায় মিলে ?—কোথায় মিলে একটী কোণে
সবার আড়ে একটু সে ঠাঁই গুহায় কিবা গহন বনে—
যেথায় বসে' বুঝ্‌তে পারে জগৎ-জোড়া দুখের ব্যথা,
জগৎজন-বেদন-পেষণ, দুষ্ট শোকের কঠোরতা,
মৃত্যু-দানবেরি দলন, অত্যাচারের নির্দ্দয়তা,
ছোট'র পরে বড়র পেষণ, অহঙ্কারের প্রমত্ততা,
মানব-প্রাণ-দলন শত দুঃখ পীড়া দৈন্য কি বা
যেই খানেতে চিত্ত মাঝে জম্‌বে গভীর রাত্রি দিবা

জমবে [illegible] যাবে—কেন [illegible]
কেমন করে' জিন্‌বে মানুষ এই বেদনে [illegible]
কোথায় সে কোণ কোন্ গহনে কোথায় সে কোন্ গিরি [illegible]
বস্‌বে যুবক রাজার তনয় চিত্ত বেঁধে বিলাস ভুলে';—
কোথায় পাব, কোথা সে ঠাঁই ?—এই বেদনে যাচ্ছে যেন
শুদ্ধোদনের শুদ্ধ তনয় বৎসহারা হরিণ হেন।

আজকে বুদ্ধ গয়ার পথে আড়াই হাজার বর্ষকথা
মনের মাঝে উঠ্‌ছে ভেসে—ভাব্‌ছি এই সে নিজনতা
এইখানে ত ব্যাকুল বুকে এল ব্যাকুল যুবক ঋষি
বন খুঁজেছে নদীর তটে পাহাড় মুলে দিশি দিশি ;
এই পথে সে গিছ্‌ল না কি ?—আছে সে পথ আজো বেঁচে ?
এই বনে কি হাওয়ার সনে নিশাস তারি কেঁদে যেচে
খুঁজেছিল নীরব ভেদি' দুঃখত্রাণের গূঢ় বাণী,
বিপুল ধরায় বিপুল ব্যথা বুঝ্‌তে মাটি একটুখানি।
কে আজ মোরে বল্‌তে পারে—পারে কি ঐ নিবাক্ গিরি ?
সেই যুবকের বেদন-ব্যথা রাখে কি ঐ ফল্গু ঘিরি ?
আছে কি গাছ পরশ-পাওয়া ফল দিল যে সেই যুবারে,
এই মাটি তার চরণ-পরশ লুকায় কি ও ধূলার ভারে ?
বইছে হাওয়া, ফল্গু বহে,—কে রেখেছে তাহায় মনে ?—
পশু কি সেই ভালবাসায় বাঁধ্‌ল যারে সেই সে জনে ?

চল্‌ছি ধীরে মনটা যেন কিসের্ ঝোঁকে পড়্‌ছে নুঁয়ে
সেই সে মহান্ বিরাট প্রাণের আভাস মোরে যাচ্ছে ছুঁয়ে,
যাচ্ছে ছুঁয়ে যাচ্ছে চুমে !—উথ্‌লে ওঠে নুইয়ে পড়ে
পরাণ আমার চিত্ত আমার কোন্ প্রীতিতে ভক্তিভরে!
অজে জেনেছি আজ পেয়েছি পথের মাঝে সেই পুরুষে,
আজ বুঝেছি বেদন তাহার কর্‌তে ছেদন সব কলুষে !
গাছের ছাওয়া নদীর গাওয়া বিন্ধ্য গিরির মৌন চাওয়া
সব মিলে আজ চিত্ত মাঝে বইয়ে দিল দূরের হাওয়া—

[illegible] কথা। [illegible] মাভৈঃ
[illegible] চিত্ত-জাগা ;—কোথায় ব্যথা দুঃখ বা [illegible]
চল্‌ছি আমি চল্‌ছি আমি বুদ্ধ গয়ার শুদ্ধ পথে
শুদ্ধ পথে শুদ্ধ বনে, বুদ্ধ দেবের প্রেমের রথে
ডাক এসেছে ডাক এসেছে, বইবে যেন আমায় তাহা
কোন্ সে লোক !—কী সে আলো !—কী সে পরম জ্যোতি আহা।
চিত্ত জাগে, চিত্ত দোলে চিত্ত ভাসে আলোর স্রোতে—
দুঃখ-ব্যথার অতীত আলো মুক্ত জগৎ-কলুষ হাতে।—
এতটুকু নেইক গ্লানি. নেইক তাতে আবিলতা,
মন ভরেছে প্রাণ ধুয়েছে সেই আলোরি অমলতা !
বুদ্ধ পরম ! বুদ্ধ গুরু ! সর্ব্বদুখের কারণ-জ্ঞাতা,
দুঃখ সয়ে দুঃখজেতা ! বেদন-নত-জনের ত্রাতা !
আজ পেয়েছি অভয়-বাণী, পথ সে কোথায় বল মোরে—
কেমন করে' জিন্‌ব ব্যথা জড়িয়ে থেকে ব্যথার ডোরে ?
শক্তি সে দাও, দাও সে আশা, দাও পরম বুদ্ধি তব
বুদ্ধ গয়ার ক্ষুদ্র কোণে জাগ্‌ল যাহা অভিনব !

আজ চলেছি ধীরি ধীরি ফল্গু বহে বিন্ধ্য চাহে
বুদ্ধ-গয়ার পথ-খানিতে লুটিয়ে থাকি শীতল ছায়ে,
লুটিয়ে থাকি মিশিয়ে থাকি যুগ যুগান্ত আঁক্‌ড়ে থাকি,
সেই যুবকের দুঃখ নাশের ব্যাকুল বেদন বক্ষে রাখি।
ফল্গু চলুক বিন্ধ্য দেখুক সেই অতীতের সাক্ষী যারা,
এই পথে মোর ক্ষুদ্র পরাণ সেই পরাণে—হউক হারা,
হউক হারা হউক সারা, পার হয়ে যাক্ সকল ক্লেশে—
এ পথ মোরে যাক্ নিয়ে যাক্ সেই মহানের মানস-দেশে।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

[illegible]পানের সামাজি[illegible]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মেয়েকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাইবার সময় তাহার সঙ্গে তিনি চারি বৎসরের [illegible] কাপড়-চোপড় ও পোষাক পরিচ্ছদ পাঠাইতে হয়। এদেশে অলঙ্কারের ন্যায় আ[illegible] এই পোষাক পরিচ্ছদই কন্যার প্রধান যৌতুক বলিয়াই গণ্য হয়। এদেশ অপেক্ষা[illegible] যে পোষাক-পরিচ্ছদের অনেক বৈচিত্র্য ও বাহুল্য দেখা যায়, তাহা আমার এক[illegible] আমি বলিয়া আসিয়াছি। নিত্যকারের 'আট-পহুরে' কাপড়, উৎসব বা [illegible] ভাল দামী পোষাক, বিবাহ প্রভৃতি শুভকর্ম্মের পবিত্র ক্ষৌম বসন এবং মৃত্যু[illegible] বিষাদদ্যোতক শুভ্র বস্ত্র প্রভৃতি নানা শ্রেণীর ও নানা ধরণের পোষাক-পরিচ্ছদ সঙ্গে [illegible] কন্যাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠান হয়। পাত্রীপক্ষের অবস্থা ভাল হইলে এই সব পোষাক-পরিচ্ছদ [illegible] সাত-আটটী বড় বড় আলমারী ভরাইয়া দিতে হয়। মধ্যবিত্তদেরও তিন-চার আলমারী না [illegible] মান থাকে না।' সঙ্গে সঙ্গে আয়না, চিরুণী, গন্ধতৈল প্রভৃতি নানা প্রসাধন সামগ্রী[illegible] দিতে হয়; ইহা ছাড়াও গৃহস্থালীর বিবিধ উপকরণ তো আছেই। আমাদের দেশের [illegible] এই সব উপঢৌকন-দ্রব্যের নাম "জিসানডৌগু"; "জিসান" অর্থে লইয়া যাওয়া এবং "[illegible] বলিতে জিনিসপত্র বুঝায়, অর্থাৎ প্রথম শ্বশুরবাড়ী যাইবার সময় মেয়ে যে সব জিনিষপত্র [illegible] লইয়া যায়।

এই সমস্ত আনুষঙ্গিক বন্দোবস্ত ঠিক হইবার পর বিবাহ হইয়া থাকে। কিন্তু এ[illegible] যেমন পাত্র সদলবলে বিবাহ করিতে পাত্রীর বাড়ী গমন করেন, আমাদের দেশে ঠিক [illegible] বিপরীত; সেখানে পাত্রীই সদলবলে পাত্রের বাড়ী গমন করেন। নির্দ্দিষ্ট শুভদিন [illegible] হইলে পাত্রীর পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজন পাত্রীকে বিবাহসাজে সজ্জিত করিয়া ঘটক সঙ্গে [illegible] বরের বাড়ী গমন করেন। সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি চাকর-বাকর একধরণের কাপড়[illegible] (uniform dress) পরিয়া উপরিলিখিত "জিসানডৌগি" অর্থাৎ উপহার দ্রব্যগুলি লই[illegible] কাজেই পাত্রীপক্ষের এই সদলবল যাত্রা বেশ একটী বৃহৎ ও সুন্দর শোভাযাত্রা হইয়া [illegible] কিন্তু তাই বলিয়া আপনারা কেহ যেন মনে করিবেন না যে, ইহা ঠিক এদেশের শোভাযাত্রা [illegible] বাজনা বাজাইয়া কলরব কোলাহলের সঙ্গে অগ্রসর হয়, বরং ইহার ঠিক বিপরীত। [illegible] বিবাহকে যদিও একটী শুভ আনন্দজনক অনুষ্ঠান বলিয়া মনে করা হয়, তবুও ইহার এ[illegible] ব্যাপার ছাড়া আর সকল অংশই খুব গম্ভীরভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে। কাজেই [illegible] এই শোভাযাত্রাও খুব গাম্ভীর্য্যের সঙ্গেই গমন করে—কোন হৈ চৈ করা একেবারেই [illegible] ইহার একটী প্রধান কারণ এই যে, বিবাহের মধ্যে যে একটী পবিত্র ভাব আছে, তাহা[illegible]

[illegible] কোলাহলের মা[illegible] ফেলিতে [illegible] না, আর পাত্রীর এই পাত্রের [illegible] ব্যাপারটী তাহার জন্ম গৃহের দিক্ দিয়া আমরা মৃত্যুরই সমান বলিয়া মনে করি; [illegible] দিনই এখানে এই কন্যা মূর্ত্তিতে ফিরিয়া আসিবে না। আজ বিবাহ দ্বারা [illegible] এই কন্যা-লীলার অবসান হইবে। সে আজ কল্যাণময়ী বধূর মূর্ত্তিতে স্বামীগৃহে লীলায় নবজন্ম গ্রহণ করিবে। এই জন্যই মৃত্যুদিনে যে শুভ্র বস্ত্রখণ্ড শবশরীরের মস্তকাবরণ [illegible] তাহা দ্বারাই কন্যার মস্তক আবৃত থাকে।

[illegible]ভাযাত্রা ধীরে ধীরে বিবাহবাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলে সকলে যথানির্দ্দিষ্ট স্থানে [illegible]বেশন [illegible] পরে শুভ লগ্ন উপস্থিত হইলে বিবাহের জন্য বর ও কন্যাকে নির্দ্দিষ্ট কক্ষে লইয়া যাওয়া হ[illegible] এই লইয়া যাওয়ার কাজটী ঘটকই সস্ত্রীক করিয়া থাকেন; অর্থাৎ ঘটকের স্ত্রী কন্যাকে এবং ঘটক বরকে লইয়া বিবাহ সভায় উপস্থিত হন। সঙ্গে সঙ্গে পাত্র ও পাত্রীর পিতামাতা এবং তাহাদের দুই একজন নিকট জ্ঞাতি সেই কক্ষে গিয়া যথানিয়মে উপবেশন করেন। তখন জাপানের সামাজিক প্রথা অনুসারে ঘটকই সস্ত্রীক বিবাহের অনুষ্ঠান আরম্ভ করেন।

এদেশে দেখিতে পাই, বিবাহের অনুষ্ঠান প্রণালীর প্রধান জিনিষ সম্প্রদান ও অগ্নিহোম। এ দুইটী বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া করিতে হয়, কিন্তু জাপানের অনুষ্ঠান প্রণালীর মধ্যে এধরণের কিছুই নাই। ইতিপূর্ব্বে আমি বলিয়া আসিয়াছি যে, আমাদের দেশে বিবাহের সহিত ধর্ম্মের কোনই সম্পর্ক দেখা যায় না। কাজেই ধর্ম্মমূলক পূজানুষ্ঠান বা মন্ত্রপাঠ কিছুই সেখানে হয় না। একমাত্র "শাকে"-পানই আমাদের দেশে বিবাহ অনুষ্ঠানের প্রধান জিনিষ। এই "শাকে" সম্বন্ধে অনেক কথা আমার একটী পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমি একবার বলিয়া আসিয়াছি; তবুও এখানে প্রসঙ্গতঃ দুই একটী কথা বলিয়া রাখা দরকার। শাকে চাউল হইতে প্রস্তুত একরকম সুরাবিশেষ। এই সুরা বিবাহ প্রভৃতি পবিত্র অনুষ্ঠানে ব্যবহার করা হয়। ইহার তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে, এদেশে সোমপানের ন্যায় আমাদের দেশে এই শাকে-পানকেই অতি প্রাচীন কাল হইতেই বিশেষ পবিত্রতাজনক বলিয়া মনে করা হয়।

প্রথম হইতেই বিবাহ সভায় পাত্র পাত্রীর সম্মুখে দুইখানি "সাম্ব" আনিয়া রাখা হয়। এই 'সাম্ব'গুলি কাঠের তৈয়ারী ছোট ছোট টুলের মত দেখিতে হইলেও এদেশের তাম্রনির্ম্মিত পূজার "টাটের" সহিত ইহাদের অনেকখানি ভাবগত সাম্য আছে। পূজা প্রভৃতি পবিত্র কার্য্যে নিবেদিত দ্রব্যগুলি সাজাইয়া দিবার জন্যই প্রধানতঃ ইহাদের ব্যবহার হইয়া থাকে।

পাত্রপাত্রীর সম্মুখে স্থাপিত পূর্ব্বোক্ত সাম্ব দুইটীর একটীতে শাকে পূর্ণ একটা "চোষী" এবং অন্যটীতে কয়েকটা "শাকাজুকি" সাজান থাকে! "চোষী" বলিতে কেট্‌লীর আকারে লোহার তৈয়ারী একরকমের পাত্র বুঝায়। কোন পবিত্র অনুষ্ঠানে শাকে রাখিবার জন্যই ইহাদের ব্যবহার হইয়া থাকে। এই 'চোষীর' উপরে নানা রকমের শুভ চিহ্ন সকল অঙ্কিত থাকে।

"শাকাজুকি" বলিতে শাকেপা[illegible]য়। এজন্য [illegible] তৈয়ারী এ[illegible] নানা রকমের শুভ চিহ্ন আঁকিতে থাকে। এই সকল শুভচিহ্ন দ্বারা নব দম্পতীর দীর্ঘ [illegible] করা হয়। ছোট বড় ও মাঝারী আকারের তিনটী "শাকাজুকি" "সান্থে"র উপ[illegible] থাকে। এই সাজানোরও আবার একটা ক্রম দেখা যায়। প্রথমে বড় তাহার এবং সকলের উপর ছোটটী রাখিতে হয়। ঘটক প্রথমে উপরের ছোট "শাকাজুকিটী" হাতে দেন; তখন তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ ঘটকপত্নী "চোখী" হইতে "শাকে" ঢালিয়া পূর্ণ করেন। এই শাকে ঢালারও একটু বিশেষত্ব আছে। একেবারেই খানিকটা পুরাইয়া দিলে চলিবে না;—অল্পে অল্পে একটু একটু করিয়া ঢালিয়া ঠিক তিন[illegible] করিতে হইবে। তখন বর সেই শাকে-পূর্ণ পাত্রটী মুখে ধরিয়া এক চুমুকে[illegible] করেন। বরের সেই উচ্ছিষ্ট পাত্রটী না ধুইয়াই তাহাতে পুনরায় আগের নিয়মে শাকে ঢাল[illegible] হয়। এবারে কন্যাকে তাহা পান করিতে হয়। পরে যথাক্রমে পাত্র ও পাত্রীর মাতা পিতাকে এই নিয়মে শাকে পান করিতে হয়। এখানেই ছোট 'শাকাজুকির' কাজ শেষ হইল; তাহার 'সান্থের' একধারে ফেলিয়া রাখিয়া এবার মাঝারী শাকাজুকিটী তুলিয়া লইতে হয় এবং পূর্ব্বে বিপরীতে কন্যা হইতে আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে বর ও তাহাদের মাতাপিতাকে যথানিয়মে শা[illegible] পান করিতে হয়। শেষে বড় 'শাকাজুকিটী' লইয়া প্রথম বারের মত পুনরায় বর হইতে আর[illegible] করিয়া যথাক্রমে কন্যা ও তাহাদের পিতামাতার পান করা হইলে এই 'শাকের' অনুষ্ঠানটী সমাপ্ত হয়। ইহার নাম "সান্ সান্ কুদা" অর্থাৎ 'তিন তিরিখ্যে নয়ের' অনুষ্ঠান। ভাবটী হইতেছে এই যে, বর ও কন্যা এবং তাহাদের পিতামাতা প্রত্যেকেই তিন-তিন পাত্র শা[illegible] পান করিয়াছিল ও প্রত্যেকটী পাত্র তিন-তিন বার পূর্ণ হইয়াছিল বলিয়া তাঁহাদের প্রত্যেকে[illegible] প্রকারান্তরে নয়বারই শাকে পান করা হইয়াছে। পবিত্র কর্ম্মের অঙ্গরূপে এই শাকে [illegible] অল্প পরিমাণে পান করিতে হয় যে, ইহাকে এক হিসাবে 'নামতঃ পান' বলিলেও অন্যায় হয় [illegible] কাজেই এই শাকেপানের ফলে কাহারো কোনরূপ ভাবান্তর ঘটিতে বা নেশা হইতে দেখা যায় না।

এই শাকে পান ব্যাপার শেষ হইলে পাত্র ও পাত্রীর বিবাহ সভায় উপস্থিত জ্ঞাতিগ[illegible] ঘটক মিলিতভাবে একটী নির্দ্দিষ্ট বিবাহ মঙ্গল-গান করেন। এইখানেই বিবাহের প্রা[illegible] অনুষ্ঠানটী সমাপ্ত হয়। কিন্তু পূর্ব্বে একবার বলিয়া আসিয়াছি যে, আজকাল ধীরে ধী[illegible] বিবাহের সহিত ধর্ম্মের সম্পর্ক ঘটায় অনেক ক্ষেত্রে পুরোহিতেরও আবশ্যক হইতেছে। যে বিবা[illegible] পুরোহিতের দরকার থাকে সেগুলি প্রায়ই মন্দিরে গিয়া করা হয় এবং সেখানে এই বিবাহ যখ[illegible] পর পুরোহিত দণ্ডায়মান হইয়া গম্ভীরকণ্ঠে চিরদিনের এই পরিণয় বন্ধনের পবিত্রতা স[illegible] জন্য বর ও কন্যাকে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লন। পরে ধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া দাম্পত্যজী[illegible] প্রয়োজন ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দিয়া বিবাহের এই ধর্ম্মমূলক অনুষ্ঠানটুকু শেষ করেন।

[illegible] সব অনু[illegible] [illegible] শেষ হইয়া যায়। তখন বর ও [illegible] একটী বৃহত্তর কক্ষে উভয় পক্ষের মাতাপিতা ও জ্ঞাতিবন্ধু এবং অন্যান্য [illegible] আরম্ভ করেন। বিবাহের এই ভোজ একটী বৃহত্তর ভোজ। এই সব [illegible] কক্ষের মাঝখানটী খালি রাখিয়া তাহার তিনধারে সারি বাঁধিয়া বসা হয় এবং [illegible] ধরিয়া ভোজন ব্যাপার চলিতে থাকে। ভোজে বসিয়া প্রত্যেকেই অল্পস্বল্প [illegible] নাট্যকলা কিম্বা রঙ্গরসের অভিনয়ে পরস্পরের আনন্দ ও কৌতুক জন্মাইয়া [illegible] একটু একটু করিয়া সানন্দে ভোজন করেন। এই সুদীর্ঘ ভোজনে পাত্রী বার [illegible] তিন করিয়া নূতন নূতন পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। [illegible] একরূপ শেষ হইল। [illegible] পক্ষের অবস্থা ভাল হইলে তাঁহারা বিবাহের পরও দুই তিনদিন ধরিয়া জ্ঞাতিবন্ধু, নিকট প্রতিবাসী বা গ্রামবাসীকে ভোজ দিয়া থাকেন। অবশ্য বিবাহের এই সব ভোজের ব্যয় একমাত্র পাত্র পক্ষকেই বহন করিতে হয়—কন্যা পক্ষের ইহাতে কোনও অংশ বা দায়িত্ব নাই। তবে এখানে একটা কথা বলিয়া রাখা দরকার যে কন্যাপক্ষ যখন বরের বাড়ী বিবাহ করিতে আসিয়া উপস্থিত হন, তখন তাঁহাদিগকে বরের জ্ঞাতিবন্ধু ও নিকট প্রতিবাসী এবং সম্ভব হইলে গ্রামবাসীদেরও প্রত্যেককে এক একখানি করিয়া নূতন বস্ত্র উপহার দিতে হয়। কখন কখন এই বস্ত্রের পরিবর্ত্তে টাকা দেওয়াও হইয়া থাকে। টাকা বা কাপড় যাহাই কেন দেওয়া হউক না—আমাদের দেশে কিছুই অনাচ্ছাদিতভাবে দিবার নিয়ম নাই। বেশ করিয়া কাগজ দিয়া মুড়িয়া উপরে শুভচিহ্ন আঁকিয়া দেওয়া হয়। এইরূপই আমাদের দেশের প্রথা।

নববধূ বিবাহের পর এক সপ্তাহ স্বামিগৃহে থাকিয়া উৎসবান্তে পুনরায় পিতৃগৃহে ফিরিয়া যায়; এই সময় শ্বশুরবাড়ীর দুই-তিনজন লোকও তাহার সঙ্গে গিয়া থাকে। এখানে এই নববধূর একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল। এদেশে যেমন সিঁথীতে সিঁদুর পরাই নববিবাহিতার একটী প্রধান চিহ্ন, আমাদের দেশেও তেমনি একরকমের বিশিষ্ট খোঁপা বাঁধাকেই নববিবাহিতার প্রধান চিহ্ন বলিয়া মনে করা হয়। পূর্ব্বকালে দাঁতে মিশী মাখিয়া একটু বিশিষ্ট প্রক্রিয়ায় তাহাদিগকে চিরদিনের মত একেবারে কালো করিয়া ফেলাও নববিবাহিতার একটী প্রধান চিহ্ন বলিয়া গণ্য ছিল, কিন্তু আজকাল নূতন সভ্যতার আলোকে প্রাচীন কালের এই অদ্ভুত খেয়াল একেবারেই পরিত্যক্ত হইয়াছে।

নববধূ প্রায় এক সপ্তাহ পিতৃভবনে আনন্দে কাটাইয়া আবার শ্বশুর-বাড়ী ফিরিয়া যায়। কিছুদিন সেখানে থাকিয়া আবার স্বামীকে সঙ্গে লইয়াই দ্বিতীয়বার পিতৃগৃহে গমন করে। এই প্রথাটীকে আমাদের দেশের ভাষায় "মুকোরি" বলে; 'মুকোরি' অর্থে শ্বশুর বাড়ী বরের প্রথম আগমন বুঝায়। এই উপলক্ষে সেখানে একটী উৎসবের আয়োজন হয়। সেই উৎসবে

ঘটক ও পরস্পরের আত্মীয়স্বজন পুনরায় [illegible] সঙ্গে সঙ্গে
বৃহৎ আনন্দভোজের অনুষ্ঠান [illegible] পাত্রপক্ষ এই আনন্দ-ভোজে সমবেত
আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, জ্ঞাতি ও প্রতিবাসীদিগকে এক একখানি নূতন বস্ত্র উপহার
একটী কথা বলিতে ভুল [illegible] যে দিন বিবাহ হয়, তাহার দুই দিনের
মাতাপিতার পরিচয় পত্র সহ [illegible] তাহাদের নাম ধাম ও বয়স পাঠাইয়া দিয়া মিউনি
রেজেষ্ট্রী করিয়া রাখিতে হয়। [illegible] এইরূপই আমাদের দেশের আইন। সেই দিন হ
ডাকনামের পরিবর্ত্তন না হইলেও তাহার গোত্র নামটী বরের গোত্রনামের [illegible] এক হইয়া

যে বিবাহের অনুষ্ঠান প্রণালীর কথা আমি এতক্ষণ ধরিয়া [illegible] এদেশেরই
ইহা ছাড়াও আর এক রকমের বিবাহ দেখা যায়। [illegible] ইহা কতকটা এ

জাপানে যদি কোন পরিবারে একটী মাত্র কন্যা ছাড়া যাহার দ্বারা বংশধারা রক্ষা পাইতে
পারে এমন কোন পুত্রসন্তান না থাকে, তবে সেই কন্যাকে লইয়া গিয়া কোন উপযুক্ত বরের
হাতে সম্প্রদান করিয়া আসা হয় না; এরূপস্থলে বাহির হইতে কোন যোগ্য লোকের ছেলেকে
পছন্দ করিয়া বাড়ী আনিয়া সেই একমাত্র কন্যার সহিত বিবাহ দেওয়া হয়; এই বিবাহ
বিবাহকে "মুকোতোরি" বিবাহ বলে। 'মুকো' অর্থে বর, আর 'তোরি' বলিতে
বুঝায়; অর্থাৎ যে বিবাহে বরকেই কন্যার বাড়ী লইয়া আসা হয়। এই নামটী পাত্রীপক্ষ
দেওয়া নাম। পাত্র পক্ষের দিক্ দিয়া ইহার নাম হইয়াছে "মুকোইরি"; অর্থাৎ বর নিজে
পাত্রীর বাড়ী গিয়া যে বিবাহ করিয়া থাকে। এই বিবাহের অনুষ্ঠান প্রণালীর কোন
নাই—সবই পূর্ব্বের মত; কেবল পাত্রপক্ষকেই পাত্রীর গৃহে "ইউইনো" লইয়া ও বিবাহ
করিয়া যাইতে হয়—এইটুকই বিশেষ। এই বিবাহে বরই মেয়ের বাড়ীর লোক হইয়া
এবং শ্বশুরের সম্পত্তির ন্যায্য অধিকারী বলিয়া আইনতঃ গণ্য হয়।

এপর্য্যন্ত হয়তো এদেশের ঘরজামাই-বিবাহের সঙ্গে ইহার অনেকখানি সৌসাদৃশ্য
যাইবে। কিন্তু আমাদের দেশের এই বিবাহের বিশেষত্বটুকু এই যে, যেমন অন্য বিবাহে
গোত্র-নামের সহিত কন্যার গোত্র-নাম এক হইয়া যায়, তেমনি এই বিবাহে ঠিক্ ইহার বিপরীত
কন্যার গোত্র-নামের সহিত বরের গোত্র-নাম এক হইয়া যায়। নিজের বংশানুক্রমিক গোত্র
ত্যাগ করায় সমাজ ও আইনের দৃষ্টিতে আজ হইতে তাহাকে পিতৃপিতামহের সহিত সর্ব্বপ্রকার
বিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে করা হয়। এইজন্য যে ছেলের সহিত এই 'মুকোইরি' বিবাহ হয়,
মাতাপিতার দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ইত্যাদি পুত্র হইতে পারে, কিন্তু কখনই জ্যেষ্ঠ পুত্র
চলিবে না। কারণ, আমাদের দেশে কেবল এই জ্যেষ্ঠ পুত্রকেই মাতাপিতার যথার্থ
বলিয়া মনে করা হয়; কাজেই তাহার পক্ষে অন্যের বংশধারার সহিত নিজেকে
দেওয়া একান্ত অসম্ভব। ইহাই "মুকোইরি" বিবাহের বিশেষত্ব।

প্রসঙ্গক্রমে বিধবাবিবাহের কথা একটু উল্লেখ করিয়া আমি এই প্রবন্ধের উপসংহার
। এদেশে হিন্দুসমাজের মধ্যে আজকাল বিধবাবিবাহের চলন দেখা যায় না। প্রাচীন
পানেও সাধারণতঃ বিধবাবিবাহ হইত না। স্বামীর মৃত্যু ঘটিলে তাঁহার বিধবা স্ত্রী মাথার
ফেলিয়া সব রকম বিলাসিতা ছাড়িয়া সংযত ও পবিত্রভাবে জীবন যাপন করিতেন;
জকাল স্বামীর মৃত্যুর পর যদি স্ত্রীর যৌবন থাকে তবে তিনি পুনরায় বিবাহ করিয়া
াতে সমাজ বা আইনের কোন বাধা ঘটে না। অবশ্য আইনের বাধা না থাকিলেও
হইয়া বিধবা হন, তাঁহারা আর বিবাহ করেন না। কিন্তু পত্নী বিয়োগ ঘটিলে
বয়সেরই পুরুষেরা সুযোগ পাইলে পুনরায় বিবাহ করিতে ছাড়ে না।

আগামীবারে জাপানী মহিলাদের গৃহস্থালীর কথা শুনাইবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীআর, কিমুরা

একখানি পুরাতন পুস্তক

ছেলেবেলায় ৺পিতৃদেবের পুস্তকালয়ে একখানি পুরাতন পুস্তক দেখিয়াছিলাম—বাঙ্গালা
ক্ষরে ছাপান, বোধ করি যখন এ দেশে মুদ্রাযন্ত্র প্রথম আনা হয় তখনকার হইবে। বইখানির
নাম "সমস্যা সংগ্রহ" কি "সমস্যাপূরণ" ঠিক মনে পড়িতেছে না। পুস্তকের উদ্দেশ্য চলিত
সমস্যাগুলির মূল অনুসন্ধান। গল্পের আকারে লেখা। তখন আমার বয়স সবে ১০ কি ১১ বৎসর।
ও বয়সে লেখকের নাম জানার কৌতূহল অন্তরে জন্মায় না, গল্পগুলি ভাল লাগিল, তাহাই
ড়িতে লাগিলাম। ১২ বৎসর বয়সে গ্রাম ছাড়িয়া সহরে আসিতে হইল। তারপর শিক্ষার
নুরোধে এ সহর হইতে ও সহর করিতে লাগিলাম পুস্তকখানির কোনও সম্বাদ লইতে পারিলাম
না। অতঃপর গৃহদাহে সর্ব্বস্ব গেল, সঙ্গে সঙ্গে পুস্তকখানিও ভস্মীভূত হইল। এখন মনে করিতেছি
বইখানি আবার পাইলে ভাল হইত, সমস্যা সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারিতাম, তা ছাড়া
বঙ্গবাণীর বাল্যকালের মূর্ত্তিরও অনেকটা আভাস পাইতাম। "বঙ্গবাণীর" পাঠকগণের কেহ
যদি এ পুস্তকের সন্ধান জানেন তবে আমার অনুরোধ তিনি পুস্তকখানি মুদ্রিত করুন।

এক্ষণে ঐ পুস্তকের যে দুই একটি সমস্যা আমার মনে আছে তাহার বিবরণ "বঙ্গবাণীর" পাঠকগণকে উপহার দিব।

সর্ব্বাগ্রে সমস্যা কথাটা বুঝান দরকার। সমস্যা শব্দের প্রকৃত অর্থ "সংক্ষেপে বলা।" এ হইল যৌগিক অর্থ। ব্যবহার অন্য অর্থে। কোনও শ্লোকের অংশ বিশেষের আবৃত্তি করিয়া সমস্ত শ্লোকটি ও তৎসংক্রান্ত যদি কোনও ইতিহাস থাকিয়া থাকে তাহাও মনে করাইয়া দেওয়ার

নাম সমস্যা। ইহাই সমস্যা শব্দের রূঢ় অর্থ। একটা দৃষ্টান্ত দিয়া কথাটা আরও
চেষ্টা করা যাউক।

"শতচন্দ্রং নভস্তলম্" একটি প্রসিদ্ধ সমস্যা। যখন কেহ বিপন্ন হইয়া, কি
করিতে না পারিয়া, হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া থাকে তখন তাহাকে কোনও বন্ধু বলিতে
ভায়া, তোমার যে দেখিতেছি "শতচন্দ্রং নভস্তলম্"! "শতচন্দ্রং নভস্তলম্" কথা
"আকাশে একশত চাঁদ রহিয়াছে।" এটির উচ্চারণ মাত্র—

"দামোদরকরাঘাতবিহ্বলীকৃতচেতসা।
দৃষ্টং চানূরমল্লেন শতচন্দ্রং নভস্তলম্॥"

এই শ্লোক মনে পড়ে। এ শ্লোকের ইতিহাস ও মনে হয়। সে এই—শ্রীকৃষ্ণ
গৃহে প্রবেশ করিলে কংসের প্রসিদ্ধ পালোয়ান চানূর শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করে। দামোদর
চানূরকে এমন একখানি চড় কষাইয়া দিলেন যে চানূরের মাথা ঘুরিয়া গেল, সে হতবুদ্ধি হইয়া
বিকৃতমস্তিষ্কে আকাশে শত শত চাঁদ রহিয়াছে বলিয়া মনে করিতে লাগিল। এই ঘটনার
অবলম্বনে কোনও ভাবুক উপরের লেখা শ্লোকটি রচনা করিলেন। তদবধি এই শ্লোক
শেষ চরণ একটি প্রসিদ্ধ সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা হইতে পাঠক হয়তো বুঝিতে পারিবেন
যে ইংরাজী allusion ও সংস্কৃত সমস্যা কতকটা একই পদার্থ।

পূর্ব্বোক্ত পুস্তকের একটি সমস্যা "অদ্য যুদ্ধং ত্বয়া ময়া"। গল্পটি এই—একটা পশু
মুখে মাটি খুঁড়িয়া কচু খাইতে খাইতে চলিয়াছে, ডান বাঁ দেখিতেছে না। যাইতে যাইতে হঠাৎ
দেখিল সম্মুখে একটা বিকটাকার সিংহ বসিয়া আছে। তখন আর পলাইবার সময় নাই। অগত্যা
কি করি, দেখি সাহসে যদি কিছু হয়। বলিল—

"সপ্ত সিংহা জিতাঃ পূর্ব্বং পঞ্চ ব্যাঘ্রাস্ত্রয়ো গজাঃ।
পশ্যন্তু দেবতাঃ সর্ব্বা অদ্য যুদ্ধং ত্বয়া ময়া॥"

["এ পর্য্যন্ত ৭টি সিংহ, ৫টি বাঘ ও ৩টি হাতী মারিয়াছি। এস আজ তোমাতে আমাতে
যুদ্ধ হউক, ঐ দেখ দেবতারা সব তামাসা দেখিতে আসিয়াছেন"]।

শুনিয়া সিংহ হাসিল, বলিল—

"গচ্ছ শূকর ভদ্রং তে ব্রূহি সিংহো জিতো ময়া।
পশ্যন্তি দেবতাঃ সর্ব্বাঃ সিংহ শূকরয়োর্ব্বলম্॥"

["ভাই শূকর ভালয় ভালয় বাড়ী যাও। ইচ্ছা হয় বলিও যে তুমি সিংহ মারিয়াছ।
দেবতারা জানেন সিংহের বল কতটা শূকরেরই বা কতটা"।]

দুর্ব্বল যখন প্রবলের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে যায়, তখন লোকে তাহাকে উপহাস
বলে "ঐ দেখ 'অদ্য যুদ্ধং ত্বয়া ময়া' হইতেছে"।

সমস্যা "ললাট লেখা[illegible]" এর গল্পটি এই—

[illegible] রাজা বিক্রমাদিত্যের সভায় এক ব্রাহ্মণ তাঁহার মৃত পুত্রটিকে আনিয়া রাজার
উপস্থিত করিল। দেখিয়া রাজা উদ্বিগ্ন হইলেন, ব্রাহ্মণকে বলিলেন—"আপনি নিশ্চিন্ত
[illegible] এর একটা ব্যবস্থা করিতেছি। আমার শাসনে দোষ নাই, তবে রাজ্যে অকালমৃত্যু
[illegible]" ব্রাহ্মণ রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেলেন। রাজা ব্রাহ্মণ বালককে তৈলে
[illegible] একটা ভাণ্ডে রাখিয়া দিলেন। সেই মুহূর্ত্ত হইতে রাজার মনে অশান্তির আধিপত্য চলিল,
[illegible] রাত্রিতে নিদ্রা হইল না। শেষ রাত্রিতে সামান্য তন্দ্রার মত আসিল, তৎক্ষণাৎ স্বপ্নে
[illegible] ও দেবতা তাঁহাকে বলিতেছেন—"মহারাজ ভাবিবেন না, 'লব্ধব্যমর্থম্' এই
[illegible] হইতে শ্লোক পূর্ণ করুন। যে মুহূর্ত্তে অভিমত শ্লোকটি উচ্চারিত হইবে সেই মুহূর্ত্তেই
ব্রাহ্মণ বালক বাঁচিয়া উঠিবে"। তখনই রাজার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য
সমাপ্ত করিয়া সভা আহ্বান করিলেন তাঁহার সভায় এতগুলি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রহিয়াছেন এ শ্লোক
পূরণ তুচ্ছ কথা।

কালিদাস প্রভৃতি সকলেই চেষ্টা করিলেন, নানা প্রকারে শ্লোক পূর্ণ করা হইল, তথাপি
ব্রাহ্মণ শিশু পুনর্জীবিত হইল না। তখন রাজা বুঝিলেন "অভিমত" শ্লোক হয় নাই; শুধু
বিদ্যার সাহায্যে এ শ্লোক পূর্ণ হইবে না, দৈবের সাহায্যও চাই। পরদিন মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ
করিয়া রাজ্যের ভার মন্ত্রীর হস্তে দিলেন, স্বয়ং উন্মত্তের বেষ ধারণ করিলেন ও শিশুসহ তৈলভাণ্ড
মাথায় করিয়া নগরের বাহির হইয়া গেলেন।

অতঃপর স্থানে স্থানে পথিকেরা দেখিতে লাগিল একটা পাগল পথ চলিতেছে আর থাকিয়া
থাকিয়া "লব্ধব্যমর্থম্" বলিয়া চীৎকার করিতেছে। কিন্তু কেহই কোনও শ্লোক রচনা করিয়া
[illegible]র দেওয়ার চেষ্টা করিল না।

এইরূপে বিক্রমাদিত্য নিজ রাজ্যের সীমা ছাড়াইয়া গেলেন। তাঁহার সেই "লব্ধব্যমর্থম্"
[illegible]নিয়া চীৎকার অনবরত চলিতেছে। কিন্তু কেহই প্রত্যুত্তর দিতেছে না। কোনও সামন্ত
রাজার অধিকারে যাইয়া একস্থানে দেখিলেন বৃহৎ একখানি চতুষ্পাঠী রহিয়াছে। রাজা পরম
পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার কৌতূহল হইল। চতুষ্পাঠীর গৃহে প্রবেশ করিয়া বসিলেন; দেখিলেন
কতকগুলি ছাত্র পাঠ অভ্যাস করিতেছে, কিন্তু সকলের মধ্যে চারিটি কন্যাই পটু; ইহারা যেমন
সুন্দরী তেমনই বুদ্ধিমতী। বালকেরা এই চারি বালিকার সহিত তুলনায় দাঁড়াইতেই
পারিতেছে না। আরও দেখিলেন অধ্যাপকটি একটি দিগ্‌গজ পণ্ডিত। রাজার কৌতূহল
বাড়িয়া গেল, তিনি প্রত্যহ সেখানে যাইতে লাগিলেন, আশা এমন বিদ্যার স্থানে যদি কখনও
কেহ তাঁহার শ্লোকটি পূর্ণ করিয়া ফেলে। বলা বাহুল্য "লব্ধব্যমর্থম্" এ চীৎকার তাঁহার চলিতেই ছিল,
ছাত্রেরা পাগল অতি নিরীহ বলিয়া কিছু বলিতেছেনা।

পূর্ব্বোক্ত বালিকা চারিটি একটি সেখানকার রাজার, একটি প্রধান অমা
কোষাধ্যক্ষের, একটি নগরপালের। তাহাদের পরস্পর প্রগাঢ় প্রণয় ছিল। কন্যা
বিক্রমাদিত্যের গুণ শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল, সকলে মিলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে বিবা
হইলে বিক্রমাদিত্যকেই করিবে। কন্যাদের বয়স হইল, কিন্তু বিক্রমাদিত্য প্রার্থনা
দেখিয়া রাজকন্যা ভাবিল বুঝি সামন্ত রাজার কন্যা বলিয়া বিক্রমাদিত্য অবজ্ঞা করিলেন।

একদিন অধ্যাপনার শেষে সকলে চলিয়া গেলে পর চারি কন্যা একত্র হইয়া
দুর্ভাগ্যের কথার অনেক আলোচনা করিল ও পরিশেষে সকলে স্থির করিল—"বি
আশা ছাড়িয়া দাও, চল আজ রাত্রিতে শ্মশানস্থ মহাদেবের মন্দিরে যাইয়া
পাই তাহাকেই মাল্য দিয়া আসি। আমরা যেমন হতভাগিনী ইহাই আমাদের
পারিতোষিক"।

কথা গুলি বিক্রমাদিত্যের সম্মুখেই হইল, পাগল বলিয়া মেয়েরা তাঁহাকে মানুষের
গণ্য করে নাই, অসঙ্কোচে মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছে। বলা বাহুল্য সন্ধ্যা হইতে না
বিক্রমাদিত্য শিবালয়ে যাইয়া বসিয়া রহিলেন।

প্রথম প্রহরে রাজকন্যা আসিয়া যেমন শিবের সাক্ষাতে প্রণত হইলেন অমনি
"লব্ধব্যমর্থম্" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। রাজকন্যা প্রতিজ্ঞার অন্যথা করিলেন না,
গলায়ই মাল্য দিয়া নিজের অদৃষ্ট ভাবিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "লভতে
ও গৃহে ফিরিয়া গেলেন। রাজা দেখিলন কন্যার কথায় "লব্ধব্যমর্থং লভতে মনুষ্যঃ" এই
শ্লোকপাদ হইতেছে, তাঁহার আশা হইল।

দ্বিতীয় প্রহরে অমাত্যকন্যা আসিয়া মাল্য দিয়া বলিয়া গেলেন "দৈবোঽপি তং ব
ন শক্তঃ"। [এইরূপ পাঠই পুস্তকখানিতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয়। কিন্তু দৈব শব্দ ক্লী
দৈবম্ হওয়া উচিত, তাহাতে ছন্দঃ থাকে না। অতএব হয় "দেবোঽপি তং বারয়িতুং ন শ
নয় "দৈবঞ্চ তং বারয়িতুং ন শক্তম্" এইরূপ করিতে হয়। আমার বিবেচনায় "দেবোঽ
বারয়িতুং ন শক্তঃ" ইহাই প্রকৃতপাঠ]।

তৃতীয় প্রহরে কোষাধ্যকের কন্যা শ্লোকের তৃতীয় চরণ দিয়া গেলেন "অতো ন শো
ন বিস্ময়ো মে"! চতুর্থ প্রহরে নগরপালের কন্যা হইতে পাওয়া গেল "ললাটলেখা
প্রয়াতি"। রাজা দেখিলেন সম্পূর্ণ অচিন্তিতভাবে দৈবই যেন শ্লোক পূর্ণ করিলেন।
মহাহর্ষে কন্যার সম্মুখেই আবৃত্তি করিলেন—

"লব্ধব্যমর্থং লভতে মনুষ্যো
দেবোঽপি তং বারয়িতুং ন শক্তঃ।
অতো ন শোচামি ন বিস্ময়ো মে
ললাটলেখা ন পুনঃ প্রয়াতি॥"

যাহা ঘটিবার মানুষের তাহা ঘটিবে, দেবতারাও তাহা বন্ধ করিতে পারিবেন না। তাহাতে আমি দুঃখ করি না, আমার বিস্মিত হওয়ারও কিছু নাই। বিধিলিপি খণ্ডিত নহে"]।

মুহূর্ত্তেই তৈলভাণ্ড হইতে ব্রাহ্মণ বালক কাঁদিয়া উঠিল। কোনও কথা আর গোপনে রহিল না। সামন্তরাজ ছুটিয়া আসিয়া মহারাজ বিক্রমাদিত্যের পদানত হইয়া তাঁহাকে গৃহে লইয়া গেলেন। যথাকালে কন্যাদান প্রভৃতি হইয়া গেল। রাজাও ব্রাহ্মণবালক ও চারিকন্যা সহ রাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন। তদবধি "ললাটলেখা ন পুনঃ প্রয়াতি" এই সমস্যা চলিয়া আসিতেছে।

এই উদাহরণ দুইটি দিয়া যদি পাঠকগণকে গ্রন্থের উপযোগিতা বুঝাইতে পারিয়া থাকি, শ্রম সফল মনে করিব।

শ্রীসারদারঞ্জন রায়

বর্ত্তমান বাঙ্গালার অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাসের এক অধ্যায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ভারতবর্ষীয় বিপ্লবিকদের মন static অবস্থায় আবদ্ধ, সেইজন্য দেশের সমাজটীকেও সেইপ্রকার অচল (static) অবস্থায় রাখিতে চাহে। মনের ভিতরে কোন প্রকার পরিবর্ত্তন বা ক্রম-বিকাশ বা বিপ্লব আনিতে ভারতবাসী চাহে না; বিপ্লবিকেরাও তাহার ব্যতিক্রম নহেন। আমাদের সমাজে "পরিবর্ত্তনশীল শক্তি" নাই, তাই আমাদের মনেতেও তাহা নাই। ফলে আমাদের চিন্তা ও সমাজ স্থানুবৎ থাকিয়া যাইতেছে। যাহারা মনে ও চিন্তায় বিপ্লব মানে নাই, তাহারা বহির্জগতে বিপ্লব কিপ্রকারে আনিবে? যে নিজের মনকে অগ্রে মুক্ত করিবে, সে বাহিরেও তাহা উপলব্ধি করিবে। কিন্তু এ সত্য আমাদের বিপ্লব-পন্থীদের প্রতি প্রয়োগ করা কি চলে? ভারতীয় বিপ্লবিকেরা কি নিজেদের মনকে স্বাধীন করিয়াছেন যে তাহারা জনসাধারণকে স্বাধীনতার বার্ত্তা ঘোষণা করিবেন? আমি এপর্য্যন্ত খুব অল্প সংখ্যক ভারতীয় বিপ্লবিক দেখিয়াছি, যাহাদের ইউরোপে "বিপ্লবিক" বলিলে যাহা বুঝায়, সেই পদবাচ্য করা যায়। আমাদের বিপ্লববাদ মানে ইংরাজকে দেশ থেকে বিদায় করা। বিপ্লবাদের প্রধান বুলি—"ইংরাজ তাড়াও!" দেশে ও বিদেশে এই কলমার ব্যতিক্রম হইলেই মহাপাপ! ফলে হইয়াছে ওই যে "যত ছিল নেড়াবুনো, সব হইল কীর্ত্তনীয়া।" এক্ষণে অনেক আকাট মূর্খ প্রতারক

বাহির হইয়াছে, যাহারা লোকের কাছে এই কলঙ্ক আবৃত্তি করিয়া নিজেদের স্বদে
চূড়ান্ত পরিচয় দেয়, ও তা যদি বিদেশস্থ হয় তবে এই কলঙ্ক পড়িয়া তাহাদের
শুদ্ধতার পরিচয় দিয়া সাধারণে কাছে খ্যাতি পাইবার চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

যখন বিপ্লববাদের ইহাই একমাত্র কলঙ্ক, তখন অন্য প্রকারের দর্শন শাস্ত্রই বা কে
আসিবে? আমি কোন ব্যক্তি বিপক্ষে কোন অভিযোগ আনিতেছি না, বিশেষতঃ
স্বদেশ-প্রেমিকেরা স্বাধীনতাবাদের জন্য স্বার্থত্যাগ ও আত্মজীবন দান করিয়াছেন
প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ। আমার প্রণম্য। এই স্থলে আমি বলিতে চাই যে আমাদের
দুর্ব্বলতা আমাদের বিপ্লববাদেও প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। আমাদের জাতির প্রধান
আমরা কিছু বিশিষ্ট (concrete) ভাবিতে পারি না বা ভুলিয়া গিয়াছি; সবই absurract
ভাসা-ভাসা ভাবি, ফলে সর্ব্বত্রই কাজের বেলায় গোলে হরিবোল দিই এবং আমাদের মন
স্থানুবৎ, অপরিবর্ত্তনীয় ও কুসংস্কারপূর্ণ। আমাদের বিপ্লববাদও তাহাই, কেবল বিদেশ
এই যে বলি, "ইংরাজ তাড়াও"। ব্রাহ্মণ, শূদ্রকে ঘৃণার চক্ষে দেখিবে; হিন্দু, অহিন্দু
ঘৃণা করিবে; জমীদার, প্রজার রক্ত শোষণ করিবে; স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার ও অবি
পূর্ব্ববৎ থাকিবে বা চলিবে; শ্রেণী ও বর্ণ বিভাগ পূর্ব্বের ন্যায় থাকিবে; ব্রাহ্মণ্য-গোঁড়ামি
থাকিবে, অথচ স্বজাতীয়তার নামে সকলে একীভূত হইয়া ইংরেজ তাড়াইবে ইহাই
বিপ্লবিক দর্শনশাস্ত্র! আসল কথা, পরবর্ত্তী সময়ে বঙ্গে বিপ্লববাদ ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রকারান্তর
হইয়াছিল। অথচ যখন মুসলমানেরা ধর্ম্মের নামে বিপ্লববাদ প্রচার করেন, তখন আমরা
Pan-Islamism এর ভয়ে চীৎকার করি!

এই মানসিক অবস্থার গুটিকতক কারণ আমি দেখিতে পাই। ১ম কারণ,—আমাদের
জাতীয় মনস্তত্ত্বের অনুযায়ী, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ২য় কারণ,—আমাদের নেতাদের মধ্যে
অনেকেই হিন্দু-ধর্ম্মাশ্রয়ী ছিলেন এবং রাজনীতি ও সমাজনীতিকে সেই ধর্ম্মেরই চক্ষু দিয়া
দেখিতেন। বঙ্গের বিপ্লবপন্থার আশা ও ভরসার স্থল অরবিন্দ ঘোষ মহাশয়। দ্বিতীয়
ঘোষ মহাশয় বরোদা হইতে আসিবার সময় ধর্ম্ম-দীক্ষা গ্রহণ করিয়া আসিয়াছিলেন এবং
যতদূর তাঁহাকে বুঝিয়াছিলাম, তিনি বিপ্লববাদকে ধর্ম্মের চক্ষেই দেখিতেন। আর
নেতৃস্থানীয় ছিলেন, সকলেই নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। জন কতক যাঁহারা
সমাজের ছায়ায় ছিলেন, তাঁহারা নিজেদের বিশেষত্ব রাখিতে পারেন নি বা প্রকট
পারেন নি। যে সব ব্রাহ্ম যুবক আমাদের দলে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের বেশীর
ন্যাশান্যালিসিমের বন্যায় ভাসিয়া গিয়া "হিন্দু' ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। ৩য় কারণ,—আ
সমাজ ও অর্থনীতিবিজ্ঞান বিষয়ে বিপ্লবিকেরা বড়ই অজ্ঞ ছিল। ইংরেজী বই প
ইউরোপীয় আমদানি "স্বদেশ-প্রেমিকতা" সকলে শিখিয়াছিল। দরকার হইলে ধর্ম্মের

ধার্য্য উদ্ধার করাই, ভারতীয় রাজনীতি। রাজনীতি বা বিপ্লববাদ যে
নীতি বিজ্ঞানের ভিত্তির উপর স্থাপিত করিতে হইবে, এ খবর কয়জন জানিতেন
? ৪র্থ কারণ,—বিপ্লবিকদের মন অতি বদ্ধ অবস্থায় ছিল বা এখনও আছে। আমর
স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু সেই সঙ্গেই সামাজিক অর্থনীতিক, ধর্ম্ম
ার ও চিন্তার স্বাধীনতাও যে বিশেষ প্রয়োজন তাহা কয়জন তখন বুঝিয়াছিলেন ও এখনও
? সব বিপ্লবিকই ম্যাট্‌সিনি আবৃত্তি করেন; কিন্তু ম্যাটসিনি বলিয়াছেন যে, লোকের
স্বাধীন করা চাই তবে বহির্জগতে সে স্বাধীনতা উপলব্ধি করিবে; একথার মর্ম্ম
কয়জনে বুঝিয়াছিলেন? বিপ্লবিকদের মনটা অগ্রে পূর্ব্ব সংস্কার হইতে মুক্ত করা চাই তবে
সে বাহিরে স্বাধীনতার বার্ত্তা প্রচার করিবে। আমরা ইংরাজের বিপক্ষে স্বাধীনতা সমর করিব
অথচ তথাকথিত নীচ জাতিকে সাম্য দিব না, স্ত্রীলোককে মুক্ত করিব না, অহিন্দুর সঙ্গে
সাম্য ও মৈত্রীর ভাব দেখাইব না, পৌরহিত্যের অত্যাচার হইতে মনকে মুক্ত করিব না,
কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইব না! অর্থাৎ বিপ্লবিকেরা বরাবর ভাবের ঘরে চুরি করিয়াছে। মুখে
বলি চাই স্বাধীনতা, মার ইংরাজ, অথচ গোলামির শত বন্ধনে নিজেকে ও স্বজাতিকে বদ্ধ
করিয়া রাখিতে চাই—ইহার চেয়ে ভাবের সঙ্গে জুয়াচুরি আর কি হইতে পারে? এই জন্যই
বিপ্লববাদ কোন নিজস্ব দর্শনশাস্ত্র সৃষ্টি করিতে পারে নাই এবং শেষে সব ধূঁয়ায়
পরিণত হইয়াছিল।

ভাবের ঘরে চুরি করা আমাদের জাতীয় দোষ। যাহা সত্য বলিয়া বুঝি তাহা প্রকাশ্যে
সিদ্ধি করিতে চাহি না। সত্যের জন্য আমরা নির্য্যাতন সহ্য করিতে পারি না, অর্থাৎ আমরা
রাঠা' জাতি নহি। আমি এখানে সমষ্টিগতভাবে কথা কহিতেছি না। আমাদের সমাজে বা
দেশ, ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজনীতি ক্ষেত্রে অনেক ব্যক্তিই মারাঠার সুহৃদ হইয়াছেন, তাহাদের কথা
বলিতেছি না। কিন্তু আমরা যাহা সত্য ও ভাল বলিয়া বুঝিব তাহা প্রকাশ্যে সমষ্টিগতভাবে প্রয়োগ
করি কি না তাহা ইতিহাসই সাক্ষ্য দিতেছে। আমাদের চক্ষের উপর জাপান পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল,
পারস্য ও তুর্কি ওলট পালট হইয়া গেল; আর আমরা—প্রকৃতি দেবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকারী, কবিতার
শান্তি-নিকেতন, ঋষি তপস্বীর তপোবন, দার্শনিকের আদিভুবন ভারতবর্ষ—তাহার অধিবাসী আমরা—
সেই তিমিরে সেই তিমিরে। অপরিবর্ত্তনীয় চীন এত শীঘ্র বদলাইয়া যাইতেছে যে পাশ্চাত্য দেশ
সমূহে একবার রব উঠিয়াছিল যে চীনকে থামাও! আর তুর্কি—দুইবার তুর্কির দেশে গিয়া
দেখিয়াছি ভারতবর্ষীয় মুসলমান ও তুর্কির মুসলমানদের চাল চলন মানসিক চিন্তা ও সামাজিক
অনুষ্ঠান সমূহের মধ্যে কত প্রভেদ! তুর্কি নিত্য কতই বদলাইতেছে যদিও তাহারা সরিয়াৎ কানুন
মানে। এইসব দেশে মানসিক চিন্তার পরিবর্ত্তন বা বিপ্লব হইতেছে বলিয়া সমাজে ও রাজনীতিক্ষেত্রে
পরিবর্ত্তন হইতেছে।

মনে ঝড় না বহিলে বাহিরে তাহা প্রকট করিবার চেষ্টা হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ এ
একটি ঘটনার উল্লেখ করিব যাহা পরলোকগতা ভগ্নী নিবেদিতার নিকট হইতে শুনিয়াছি
পরলোকগত রুষীয় আনার্কিষ্ট—বিপ্লবিক নেতা—কুরোপাট্‌কিন তাঁহাকে এই ঘটনাটি
করিয়াছিলেন। একবার কুরোপাট্‌কিন তাঁহার ১৭ বর্ষীয়া বালিকা শিষ্যাকে বলিয়া
[তোমার সম্মুখে যে গির্জ্জা দেখিতেছ তাহাকে বোমা দিয়া উড়াইতে হইবে, বোমা তোমা
দিতেছি ; তুমি এ কার্য্য করিতে পারিবে ? ইহাতে তোমার কিন্তু জীবন বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা আ
বালিকাটি এই কথার অগ্রে বেহুঁস হইয়াছিল, এই আদেশ শুনিবামাত্র লাফাইয়া উঠিয়া
বোমা আমায় দাও, আমি যাইতেছি। তখন কুরোপাট্‌কিন বলিলেন আমি তোমাকে কেবল
পরীক্ষা করিতেছিলাম, তোমায় এ কার্য্য করিতে হইবে না। এই কার্য্য শুনিয়া বালিকা
চক্ষুজলে ভাসিয়া বলিল যে, ইহা কি পরীক্ষা বা ছলনার কার্য্য ? ইহা যে আমার ধর্ম্ম, ঐ গির্জ্জা
হইতেছে পৌরোহিত্য অত্যাচারের স্তম্ভ, আমার ধর্ম্ম হইতেছে উহার ধ্বংসসাধন করা। সর্ব্বপ্রকার
অত্যাচার ও exploitation এর কবল হইতে মানবকে মুক্তকরা আনার্কিষ্টদের অভিপ্রায়, সেইজন্য
তাহাদের কাছে পুলিশ ও রাজপুরুষ যে প্রকার রাজনীতিক অত্যাচারের প্রতিনিধি, ঠিক
সেইরূপ পৌরোহিত্যের অত্যাচারের চিহ্নস্বরূপ। সেইজন্যই মানবের মুক্তি-অভিলাষী বালিকা
এই গির্জ্জা উড়াইয়া দিবার জন্য প্রাণদান করিতে প্রস্তুত ছিল।

এই প্রকার মানসিক ঝড় কি আমাদের বৈপ্লবিকদের মনে বহিয়াছে ? আমরা কি মানব
সার্ব্বজনীন মুক্তি ইচ্ছা করি ? আমরা কি সকলকে স্বাধীনতা দিতে চাই ? যাঁহারা বিপ্লবিক বলি
পরিচয় দেন তাঁহারা একথার জবাব দিন। এই রুষীয় বালিকার সঙ্গে একটি বাঙ্গালী মুবক
তুলনা করিব। আমি প্রাতঃস্মরণীয় সুহৃদ প্রফুল্ল চাকীর কথা বলিতেছি। প্রফুল্ল ১৭ বৎসর
বালক ছিল, জাতিতে অব্রাহ্মণ বংশীয় ছিল। তাহাকে আমরা যাহা শিখাইয়াছিলাম
সে শিখিয়াছিল। আমরা তাহাকে যাহা করিতে বলিয়াছিলাম তাহাই সে করিয়াছি
তাহাকে ফুলার সাহেবকে মারিবার জন্য রঙ্গপুর হইতে আনান হইয়াছিল। আমি তাহাকে মাটি
আত্মজীবনী কিয়দংশ পড়াইয়াছিলাম ও বাঙ্গিয়েরা ভ্রাতাদ্বয়ের আত্মত্যাগের কথা তাহাকে শুনা
ছিলাম। সেও সেই প্রকারে আত্মত্যাগ করিয়াছিল। সেও বিপ্লববাদকে ধর্ম্ম বলিয়া
করিয়াছিল। সে অত্যাচারী রাজপুরুষের প্রাণদণ্ড করা ও তাহার জন্য আত্মজীবন
তাহার ধর্ম্মের সাধনা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। সে সাধনাতে সে কৃতকার্য্যও হইয়াছিল।
সে বঙ্গের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। তাহার মনে একটা ঝড় বহিয়াছিল।
বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল যে ভারতের রাজনীতিক মুক্তির জন্য আত্মত্যাগের প্রয়োজন।
সাধনা করিয়াছিল। এই উভয় স্থলেই এক মনস্তত্বের বিকাশ দেখিতেছি। এই উভ
কার্য্য এক, কিন্তু কারণ ও আদর্শ বিভিন্ন। প্রফুল্ল চাকীকে যদি বলা হইত যে সে যেমন

...তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছে, সেই প্রকার যেন পৌরোহিত্য অত্যাচার, সামাজিক ও অর্থনীতিক ...তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে,—কারণ বিভিন্ন প্রকারের অধীনতার মূল সূত্র এক, কেবল আকার ...ন মাত্র,—একটির বিপক্ষ হইতে হইলে আর একটির বিপক্ষে যাইতে হইবে,—তাহা ...ল কি প্রফুল্ল বা পরবর্ত্তী সুহৃদেরা এক কথায় এই যুক্তি মানিয়া লইতেন ও নিজেদের ...রবানী করিতেন ? এইস্থলে আদর্শের প্রভেদ ছিল। মুক্তির মন্ত্র পূর্ণভাবে দেওয়া হয় নাই ও ...ও দেওয়া হয় না বলিয়াই ভারতের এত জটিল সমস্যা। এই আদর্শের প্রভেদ বলিয়াই ...আজ মুক্ত এবং সমগ্র মানব জাতিকে এই মুক্তি-দান-প্রয়াসী। তাই আজ রুষের ...র্শে জগৎ টলটলায়মান হইয়াছে। আর ভারত ? সবই নিভিয়া গিয়াছে। সুহৃদেরা ...লমাত্র ঐতিহাসিক হইয়া রহিল। জাতি, সমাজ ও ধর্ম্মভেদের সমস্যা মিটাইবার জন্য নেতারা ...তকেশ হইতেছেন এবং ক্ষীণস্বরে পরাজিত ব্যক্তির ক্রন্দনধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতেছে "আমরা বিদেশী আমলাদলের বিপক্ষে ঝগড়া করিতেছি।"

বুদ্ধদেব ভারতে এক নূতন যুগ আনিয়াছিলেন। তিনি ভারতবাসীকে সামাজিক, পৌরোহিত্য ও মানসিক অধীনতা হইতে মুক্ত হইবার বাণী ঘোষণা করেন। সমগ্র এসিয়াখণ্ড এই মুক্তির বাণী শ্রবণ করিয়াছিল। ইহা ভারতের প্রাচীনকালের বিশেষ দান। বর্ত্তমান যুগে আমরা জগতকে কি দান করিতেছি ? কেহ কেহ বলেন যে আমরা বর্ত্তমান যুগে জগতকে স্বাধীনতার জন্য অসহযোগ আন্দোলন পন্থা দান করিতেছি। কিন্তু এ পন্থা কি ভারতের নিজস্ব উদ্ভব ? ইহা যতই হিন্দু ধর্ম্মের আচারে অভিষিক্ত হউক না কেন, ইহা কি বিদেশ হইতে আমদানি নয় ? আর ভারতীয় বিপ্লবপন্থীরা যদি একটা নূতন দর্শনের আদর্শে মাতিয়া ভারতে মুক্তির বাণী ঘোষণা করিতেন বা করেন তাহা হইলে জগতের রাজনীতিক বা বিপ্লবিক ইতিহাসে ভারতের জন্য আজ অতি উচ্চ স্থান নির্দ্দিষ্ট হইত। তাহা হইলে ভারতে এক অগ্নির প্রবাহ বহিত যাহা ভারত ছাড়িয়া বাহিরেও পৌঁছিত।

ইতিহাসে যাহা ঘটে তাহা অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য্য ঘটনা। যাহা ঘটিয়াছে তাহা ইতিহাসে ঘটিতই। ভারতের রাজনীতিক ক্রম-বিকাশের ইতিহাসে ইহা এক পর্য্যায় মাত্র। তখন ভারতীয় রাজনীতিক নেতাদের আদর্শ ক্ষুদ্র ছিল, বিপ্লবিক নেতাদের আদর্শও বিশেষ বড় ছিল না। আসল কথা এই যে বিগত ৪০ বৎসর ধরিয়া ভারতীয় মধ্যম শ্রেণীর সহিত ইংরেজ মধ্যম শ্রেণীর বিবাদ চলিতেছে। উভয় দলই সার্ব্বজনীন স্বাধীনতা প্রয়াসী নন। বিদেশী মধ্যম শ্রেণী (বুরজোয়া শ্রেণী) ভারত শাসন করিতেছেন, আমাদের দেশী মধ্যম শ্রেণী তাহাদের হাত হইতে শাসন যন্ত্রটা কাড়িয়া লইতে চান। এই জন্যই আজ রব উঠিয়াছে যে আমরা বিদেশী বুরজোয়ার মনের প্রতিনিধি আমলাদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছি। কিন্তু ইংলণ্ড ও ভারতের সমস্যার বহু তফাৎ। ভারতের সমস্যা সমূহের মূলে রাজনীতিক নেতারা যাইতেছে না, বিপ্লবিক নেতারাও

যাইতেছে না বা এখনও যান নাই। মুক্তি বা স্বাধীনতা কাহাকে দিব, কেন দিব ও কি প্রকা দিব ইহা কেহ তলাইয়া দেখেন না। আমাদের বৈপ্লবিকেরা দেখিতেন না এবং এখনও দে না। বঙ্গের বিপ্লব পন্থার দুর্ভাগ্য যে সে একদিকে যেমন শাসন বিভাগ হইতে নির্য্যাতন ভে করিতেন, তেমনি অন্যদিকে কংগ্রেসওয়ালার নিকট "পারিয়া"-রূপে গণ্য হইতেন এবং এই অবস্থার মহৌষধিরূপে কোন প্রখর চিন্তাশীল ব্যক্তির উদয় হয় নাই যিনি একটা নূতন দর্শনানুধা আদর্শ দিয়া সব পন্থার উপর বিপ্লবপন্থাকে বড় করিয়া তুলিবেন। যখন বাঙ্গালার বিপ্লব পন্থ আশাস্থল অরবিন্দ ঘোষ মহাশয় পণ্ডিচারিতে ধর্ম্ম সাধনে নিমগ্ন হইলেন, তখন যুবকের দল অ কি করিবে? তাহারা চিন্তাশীল নেতার অভাবে পুরাতন গৎ গাহিতেছেন, একটা নূতন চিন্তা স্রো বঙ্গে এই জন্য বাহির হইতে পারে নাই। বঙ্গে একটা নূতন চিন্তা স্রোত বহিতে পারে না বলিয়াই একটী কিছু অভিনব আদর্শের সৃষ্টি হইতে পারে নাই।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দ

বেলা

যায় নি রে তোর বেলা।
ডরিস্‌নে তুই আঁধার দেখে, ভাঙ্গিসনে তোর খেলা
মিছাই বলিস্—ঘরে যাবি; সে যে রে তোর ভুলের দাবী;
চল্‌বেনারে গায়ের ধূলা ঝেড়ে মুছে ফেলা।

নিবিয়ে দিয়ে আলোর ধাঁধা, ছিঁড়ে ফেলে দৃষ্টি-বাধা
আস্‌ছে ছেয়ে স্নিগ্ধ আঁধার, করিস্‌নে তায় হেলা।
ডুবুডুবু সাঁঝের রাগে, ছায়া লাগে দাগেদাগে।
জাগে,—উহার পারে জাগে, নিঝুম রাতের মেলা।
আছে বেলা, থাক্‌বে বেলা, খেলারে তুই খেলা।

পুস্তক-পরিচয়

চিরকুমারঃ—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স প্রকাশিত আট-আনা সংস্করণ গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত—শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায় এম্-এ প্রণীত—২১৭ পৃষ্ঠা।—মাসিক সাহিত্যের পাঠকগণের নিকট সুপরিচিত। কিন্তু যতদূর আগ্রহে আমরা তাঁহার এই প্রথম প্রকাশিত উপন্যাসখানি পড়িতে ছিলাম ততদূর তৃপ্তিলাভ করিতে পারি নাই। চিরকুমার হিরণ্ময়কে তিনি ঠিক মানুষ করিয়া গড়িতে নাই—তাহার চরিত্র ফোটো-ফোটো হইয়াছে, কিন্তু ফুটিতে পারে নাই। বরং তাহার মাতার সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছে। জমীদার যদুনাথ—যাহার প্রতাপে "কুড়ি পঁচিশটা গ্রামের মধ্যে কেহই মহাশয়ের নিকট মুখ তুলিয়া কথা কহিতে সাহস পায় না," "কুলটাকে আশ্রয় দিবার জন্য যিনি হিরণ্ময়কে বিষম তিরস্কার করিয়াছিলেন,"—সেই জমীদার যদুনাথ যে কি বলিয়া সেই কুলটা শিউলিকে নিজ পরিবারভুক্ত করিয়া লইলেন এবং প্রিয়তমা দৌহিত্রীর সহচারিণী করিয়া দিলেন তাহা কিছুতেই বুঝা গেল না। গ্রন্থকার লিখিতেছেন, "নিজ গোপন অভিপ্রায় সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়াছেন ভাবিয়া তিনি মনে মনে হাসিলেন।" কিন্তু এই 'গোপন অভিপ্রায়' যে কি তাহার আভাস মাত্রও তিনি দেন নাই। যদুনাথ যে ভ্রষ্টচরিত্র, তাহার উল্লেখ বা নিদর্শনও কোথাও নাই। সুতরাং গোপন অভিপ্রায়টী যদুনাথের না হইয়া লেখকের বলিয়া অনুমিত হয়;—তাঁহার আখ্যান বস্তুর ভবিষ্যৎ পরিপুষ্টিকল্পে শেফালির সহিত সুধার সখীত্ব তাঁহার আবশ্যক সেই জন্যই বোধ হয় তিনি এইরূপ অবতারণা করিয়াছেন।

নবগোপাল সম্বন্ধেও গ্রন্থকার সুব্যবস্থা করেন নাই। নবগোপাল বোস—যদুনাথের নায়েব—তাহারই দুশ্চরিত্র ও মাতাল পুত্র ধনঞ্জয়ের প্ররোচনায় শিউলি কুপথগামিনী—এই শিউলি ও তাহার সদ্য প্রসূত জারজ সন্তানকে আশ্রয় দিয়া হিরণ্ময় সমাজে স্থগিত হইয়া রহিল, অথচ অপূর্ব্ব যখন শিউলির পুত্রোৎপত্তি ও তাহার মৃত্যুর কথা না বলিয়া বলিল, "শিউলি এখন গর্ভাবস্থায় আছে। আপনি রাজা বাবুকে বলে তাকে হাত করে ফেলুন। নইলে সে প্রসব হ'লে নিশ্চয়ই ভরণ-পোষণের জন্য আপনার নামে নকদ্দমা আন্‌বে।"—তখন নবগোপাল যে সে কথা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিল, তাহা বলা সুকঠিন বটে! এইরূপ অসামঞ্জস্যের নিদর্শন আরও আছে। লালাসাহেবের পরিচয়ে যদুনাথ বলিতেছেন, "আমরা ত সবাই এক পিতার সন্তান ছিলুম, আজ না হয় ভিন্ন হয়ে পড়েছি।" (১২২ পৃঃ)। অথচ দৌহিত্রী সুধাকে যদুনাথ বলিতেছেন, "ও দূর সম্পর্কে তোর খুড়তুতো ভাই হয়।" মাতুলবংশে খুড়তুতো-ভাইয়ের জন্মগ্রহণ—নূতনত্ব বটে!

গ্রন্থকারের লিখিবার ক্ষমতা আছে—বর্ণনাভঙ্গী আছে—ভাষায় লালিত্য-সম্পদ আছে—রচনা পদ্ধতিও প্রশংসনীয়; কিন্তু এইরূপ খুঁটিনাটি বিষয়গুলিও যে উপন্যাসে অগ্রাহ্য নহে, তাহাও স্মরণ রাখা আবশ্যক।

* * *

ন্যায়রত্নের নিয়তিঃ—শ্রীজীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত—২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে শ্রীবিদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত—২৮২ পৃষ্ঠা—মূল্য দেড়টাকা।—এই উপন্যাসখানি স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তি মহাশয়ের সম্পাদিত 'সাহিত্যে' ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থের ভূমিকায়

শ্রীদীনেন্দ্র কুমার রায় মহাশয় লিখিয়াছেন, "গ্রন্থকার মহাশয় প্রাচীন। সুতরাং তিনি যে নব্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ কলাবিৎ উপন্যাস লেখকগণের প্রবর্ত্তিত কলার অনুসরণে মনস্তত্ত্বের মনোরম বিশ্লেষণ দ্বারা 'আ নামে উচ্ছৃঙ্খলতা * * * অঙ্কিত করিবেন, ইহা তাঁহার নিকট আশা করিতে পারি নাই। * * * যদি উ নিপুণ তুলিকায় অঙ্কিত এই কলকৌশলবিহীন অথচ সরল, সুন্দর, মহত্ত্ব-গৌরব-মণ্ডিত মানবচরিত্রের চিত্র বঙ্গীয় পাঠক সমাজে উপেক্ষিত হয়, তাহা হইলে গ্রন্থকার ও পাঠক এই উভয়ের মধ্যে কাহার দু অধিক নিঃসন্দেহে তাহা নিরূপণ করা কঠিন। * * * "ন্যায়রত্নের নিয়তি" প্রকৃত অহিংস অসহযোগের উ দৃষ্টান্ত, এবং ন্যায়রত্নের সংগ্রামক্ষত জীবন এই কঠোর সাধনায় উৎসর্গীকৃত।"—আমরাও ইহার স অনুমোদন করি।

* * *

বাসন্তিকাঃ—প্রথমখণ্ড ১৩২৯—শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এ, ডি-এল্ সম্পাদিত—মূল্য ১ সম্পাদক ঢাকা জগন্নাথ হলের সাহিত্য সভার সভাপতিত্ব করিতে গিয়া ছাত্রদের মধ্যে লিখিবার শক্তি দেখিতে প এবং তাহাদের রচনাগুলি কেন্দ্র করিয়া হলের সংসৃষ্ট অধ্যাপকদের দু'তিনটী রচনা যোগ করিয়া দিয়া 'বাসন্তিক সাহিত্যের আসরে উপস্থিত করিয়াছেন। এই বার্ষিক পত্রিকার উপস্বত্ব হলের সেবা-সঙ্ঘের দ্বারা "পল্লী-সমা প্রবন্ধে উক্ত কাজিরবাগ গ্রামের উন্নতি-কার্য্যে ব্যয়িত হইবে। এই পুস্তকে তিনখানি ত্রিবর্ণ দু'টী ছোটগল্প, চারিটী কবিতা ও সাতটী প্রবন্ধ আছে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সর্ব্ব শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় নিজ নিজ রচনায় ইহার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছেন। ইহার প্রত্যেক লেখাই মূল্যবা এবং উপভোগ্য—ইহাতে আবর্জ্জনার সংস্পর্শ নাই বলিলেই চলে। আমরা বর্ষে বর্ষে এই সহযোগিনীর সা পাইলে প্রকৃতই আনন্দ লাভ করিব।

* * *

প্রেম না প্রবঞ্চনা—শ্রীঅসিতারঞ্জন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপা এণ্ড সন্স, মূল্য ১।০, প্রচলিত প্রথামত সিল্ক বাঁধান;—যাঁহারা ঘটনাবহুল আখ্যায়িকা পাঠ করিতে চান, তাঁহা এই পুস্তকখানি ভাল লাগিবে।

দুঃখে সুখ

সুখের ভরা বহিয়া এনে দুখের ঘরে রাখি।
দুঃখ আছে বসিয়ে কাছে, সুখেরে তবু ডাকি।
শৈলে, বনে, গগন-পটে, সাগর-তলে তটিনী-তটে,
সুষমা হেরি কুসুম যবে ফুটিয়া হাসে শাখী
শ্বাসের ঝড়ে ভগ্ন ঘরে সে শোভা নিয়ে থাকি।

দূর-যাত্রী

আমি দূরের পথিক ভাই,
হেথা দাঁড়াতে পারিনা তাই,
আমি চিরদিন শুধু পথ চলি আর
আনমনে গান গাই।
কে থমকি' পথে ফিরাল আনন, কে র'ল রুধিয়া দ্বার,
কে চাহিয়া রহে ছল ছল আঁখি অনিমেষ অনিবার,
মোর দেখিতে সময় নাই
আমি দূরের পথিক ভাই!
মোর নাহিক আপন পর,
চির প্রবাসীর কোথা ঘর?
আমি ছুটে চলে যাই বরষার নদী,
নিদাঘ-সাঁঝের ঝড়!
কোথা কলকল তটের কাঁদন, বনানীর হাসোচ্ছ্বাস,
ফিরে চাহিবার নাহি যে সময়, মিটাইতে অভিলাষ!
নাহি বুঝিবার অবসর
হেথা কে মোর আপন পর।
চির মুসাফির দরবেশ
মোর চলার হলনা শেষ,
শুধু পথে ফিরি' ফিরি' অবশ চরণ,
ধূলায় মলিন বেশ।
দু'পাশে ভুবন বাহু পসারিয়া বাঁধিয়া রাখিতে চায়
শিশুর কাকলী, প্রেয়সীর প্রেম, জননীর মমতায়
তবু খুঁজি কারে দেশ দেশ,
চির মুসাফির দরবেশ!
আমি দূরের পথিক ভাই,
শুধু একেলা চলিয়া যাই,
হেথা নিখিলের সুখ দুখের মেলায়
আমার নাহিক ঠাঁই।
বোঝাতে বুঝিতে হল না সময়, দূর হতে হনু দূর,
যে গান গাহিতে চেয়েছিনু সে যে রল ভরপূর!
একা পথে পথে গাহি তাই,
আমি দূরের পথিক ভাই।

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ

হেবজ্র

আমাদের বঙ্গদেশে তান্ত্রিক প্রথা বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। যে সময় মত প্রবল ছিল সে সময় বৌদ্ধ তান্ত্রিক মতের প্রাধান্যও কিছু কম ছিল না। তিব্বত দেশের যি-দাম (Yi-dam) বা দেব সংরক্ষক শ্রেণীর যে সকল সুপরিচিত মূর্ত্তি আমরা প্রভৃতি স্থানে দেখিতে পাই, বাংলার হেবজ্র তাহারই অনুরূপ। শুধু মূর্ত্তি ব

পাশ্চাত্যগণের দৃষ্টিতে চীন ও তিব্বতের ধর্ম্মবিষয়ক চিত্রগুলিও অনেক স্থলেই অশ্লীল দেখা যায়—যে কেবল যি-দাম নহে, বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বমূর্ত্তিগুলিও প্রায়শঃ স্ব স্ব শক্তির আলিঙ্গনে আবদ্ধ রাখিয়াছে ("tenant enlacees leur Caktis")। নেপালেও এইরূপ ধর্ম

ষ্ট ("pieuse obscenite") চিত্রাদি দৃষ্ট হইয়া থাকে। অধ্যাপক ফুসে বলিয়াছেন— চিত্র-ও মূর্ত্তি-নিচয় ভারতীয় মূল হইতে উদ্ভূত ও তান্ত্রিক সাধনার সহিত সম্পর্কযুক্ত le sur l'Iconographie bouddhique de l'Inde Chap 11, pp. 65,66 e 2). সমগ্র ভারতবর্ষের হিন্দু তান্ত্রিক প্রভাবের সহিত বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার সম্পর্ক, উভয়

র প্রগাঢ় জ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিত ব্যক্তি ব্যতীত অপর কাহারও দ্বারা নির্ণীত হওয়া সম্ভব র। তবে দেখা যায় যে মঞ্জু ঘোষ প্রভৃতি বৌদ্ধ দেবতাও শাক্ত তন্ত্রশাস্ত্রে স্থান পাইয়াছেন। দার সহিত বৌদ্ধ মহাযান প্রভৃতি মতের যে বিশেষ সম্পর্ক ছিল সে কথা অনেকেই স্বীকার করেন। যে ষোড়শভুজবিশিষ্ট মূর্ত্তির প্রতিকৃতি এই সংখ্যায় প্রদত্ত হইল

তাহা বহরমপুর খাগড়া আচার্য্যপাড়ার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নামে নিত্য পূজিত হয়। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কোনও পূর্ব্বপুরুষ রাণীভবাণীর ছিলেন। একদিন রাণীভবাণীর তৎকালীন বাসস্থান বরনগরে ভাগীরথীতে অবস্থায় দ্বার-পণ্ডিত মহাশয় যেন শুনিতে পাইলেন যে, কে যেন তাঁহাকে বলিতে মূর্ত্তি রহিল" "দুর্গা মূর্ত্তি গ্রহণ কর।" তিনি নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলেন যে

সন্নিকটে একটি ক্ষুদ্রমূর্ত্তি রাখিয়া একজন সন্ন্যাসী চলিয়া গেল। কথিত আছে রাণীভবাণী আদেশক্রমে এই মূর্ত্তিটি কাশীর পণ্ডিতদিগকে দেখান হয় কিন্তু কেহই উহা চিনিতে পারেন নাই তখন বৌদ্ধ শাস্ত্রের আলোচনা ছিল না। সুতরাং এ বৌদ্ধ মূর্ত্তি চিনিতে না পারায় তাঁহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। এই মূর্ত্তির আটটি মস্তক; দুই পাশে তিন তিনটি করিয়া ছয়টি মুখ সমুখে

ও মস্তকের উপরিভাগে মুকুটে ঢাকা আর একটি মুখ রহিয়াছে। বক্ষ্যমান আলোকচিত্রে দেখান হইয়াছে তাহার মুখের ডৌল সম্পূর্ণ বাঙ্গলা ছাঁচের তাই মনে হয় ইহা সহজেই বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। বস্তুতঃ ইহা পুরুষ মূর্ত্তি, স্ত্রীমূর্ত্তি নহে। ইহার ষোলটি হাত টি পা; হেবজ্র-তন্ত্রে হেবজ্রের যে বর্ণনা আছে তাহার সহিত ঠিক ঠাক মিলিয়া যায়। জা, ষোড়শভূজা নহেন এবং তাঁহার বক্ষেও অপর কোন মূর্ত্তি এরূপভাবে আলিঙ্গনবদ্ধ

অবস্থায় থাকিতে দেখা যায় না। ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই শক্তি মূর্ত্তিটিকে দুর্গার ক্রোড়স্থিত নারায়ণ বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। মূর্ত্তিটি উচ্চে প্রায় ছয় ইঞ্চি, পিত্তল নির্ম্মিত বলিয়াই বোধ হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন উহা পিত্তল নহে, অষ্টধাতু। আর নেপাল-তিব্বতীয় ই-নাম শ্রেণীর যে মূর্ত্তিটি শক্তির সহিত যাব-যুম (yab-yum) বা যুক্ত অবস্থায় পরিকল্পিত তাহার ত্রিক মুর্শিদাবাদের কালেক্টার শ্রীযুক্ত ডব্লিউ, এস, এডি (Mr. W. S. Adia) মহাশয়। এই দুই মূর্ত্তিতেই তেমন অসাধারণ কিছু নাই তবে হেবজ্র মূর্ত্তির বিশেষত্ব এই যে ইহা সম্পূর্ণ বাঙ্গলা ছাঁচের। বাঙ্গলায় মূর্ত্তি নির্ম্মাণের যে বিশিষ্ট প্রণালী ছিল এবং এখনও দশভূজা

প্রভৃতি মূর্ত্তি নির্ম্মাণকালে কুমারদিগের যে প্রকার মুখের ডৌল দিতে দেখা যায় তাহা যে
নহে, প্রাচীন, তাহা আশা করি এই হেবজ্র মূর্ত্তি দৃষ্টেই সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাইবে। মহামহো
শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বাঙ্গলার বৌদ্ধধর্ম্মের অদ্যাপিসংরক্ষিত নিদর্শনাদিসম্বন্ধে
শ্রমস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার "বেণের মেয়ে" নামক মনোমদ আখ্যায়িকায়
এক শ্রেণীর বৌদ্ধগণের উপাস্য এই হেবজ্র মূর্ত্তিরও উল্লেখ আছে। এক সময় যে সকল
মূর্ত্তি সুপরিচিত ছিল এখন কালবশে তাহা সম্পূর্ণ অপরিচিত। বাস্তবিকই আমরা
জাতি। কলিকাতা আর্ট গেলারীতে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর হেবজ্র মূর্ত্তি রক্ষিত
কৌতূহলী পাঠক সেই সকল মূর্ত্তির সহিত এই মূর্ত্তির চিত্র তুলনা করিয়া দেখিতে পারেন।
সম্পাদক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে এই মূর্ত্তিপরিচয় সম্বন্ধে
সাহায্য করিয়াছেন, সেই জন্য তাঁহার নিকট আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীগুরুদাস সরকার

শোক সংবাদ

বরিশালের প্রসিদ্ধ দেশহিতৈষী অশ্বিনীকুমার দত্ত গত ২১শে কার্ত্তিক, বুধবার দেওয়ালীর দিন অপরাহ্ণ
৩ ঘটিকার সময় ৬৮ বৎসর বয়সে জীবনলীলা শেষ করিয়াছেন। সেদিনকার সন্ধ্যায় দেওয়ালীর উৎসবে সারা দেশ
আলোকে সাজিয়াছিল; দেশময় যে উৎসবের প্রতীক্ষায় অশ্বিনী কুমার জীবন কাটাইলেন, সে উৎসবের দিন বহু
অশ্বিনীকুমার সুলেখক ছিলেন, তাঁহার "ভক্তি-যোগ" বঙ্গ-সাহিত্যের একখানি শ্রেষ্ঠ পুস্তক। কিন্তু স্বদেশ
প্রেরণায়, তিনি সাহিত্যরচনায় মন দিতে পারেন নাই। বরিশালে কলেজ স্কুল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশের
লোকের অনেক উপকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার জীবনের মাহাত্ম্যের দৃষ্টান্তে তিনি যে নবজীবনের উদ্বোধন
করিয়াছেন, এবং অনেককে কর্ম্মের পথে টানিয়া আনিয়াছেন, তাহাই তাঁহার শ্রেষ্ঠতর ও অলোচ্য কীর্ত্তি।
হিতৈষণার দায়ে তাঁহাকে সরকারের হাতে কিছুদিন বন্দীগৃহে নজরবন্দী থাকিতে হইয়াছিল। বহু পরিশ্রমে
অনেক দিন হইতেই তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল, এবং চিকিৎসার জন্য মৃত্যুকালে কলিকাতায় ভবানীপুরে
করিতেছিলেন। অশ্বিনীকুমার সকলের প্রাণে প্রাণে অমর হইয়া থাকুন।

স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্ত

বাপ পিতামো'র ভিটে

এযে——বাপ পিতামো'র ভিটে
সব চেয়ে মোর ইহাই খাঁটি সব চেয়ে এ মিঠে।
এই ত আমার কাশীগয়া প্রয়াগ বৃন্দাবন
বাপ পিতামো'র পুণ্যে গড়া তীর্থ নিকেতন।
এই ত আমার তক্ষশালা অজন্তা সারনাথ
হেথায় অতুল প্রত্নধনের মিলিবে সাক্ষাৎ।
হেথায় আমি রাজা, হেথা উন্নত মোর মাথা
এই আঙ্গিনার ধূলায় আমার গৌরবাসন পাতা।
সকল ঠাঁয়ে হারায়ে যাই লোকজনতার মাঝে
এই খানে মোর স্বতন্ত্রতা সগৌরবে রাজে।
অতীত্ সনে বর্ত্তমানের হেথায় আমার যোগ,
জন্মে জন্মে পাপ পুণ্যের হেথায় ফল ভোগ।
বাপ পিতামোর ভিটে—
সব হতে এ পরম প্রিয়, সবহতে এ মিঠে।

(২)

এযে——সাত পুরুষের ভিটে—
তাদের স্মৃতি জড়িত এর প্রত্যেক ইটে ইটে।
পিতামহের পিতামহ টোপর মাথায় দিয়ে
এই আঙ্গিনায় ফিরে এলেন করে এলেন বিয়ে।
এই আঙ্গিনায় পিতামহ দিলেন হামাগুড়ি
তাঁদের চরণ চিহ্ন আঁকা এই ভিটেটি জুড়ি।
তাঁহার পিতার সূতিকাগার কোণটিতে ঐ ছিল,
পিতামহী তুলসী তলায় চির বিদায় নিল।
মাতৃশোকে ধূলায় পড়ে কেঁদেছিলাম হোথা
ঈশান কোণের আমগাছটি ঠাকুর মায়ের পোঁতা।
ঠাকুর ঘরের সাম্‌নে মাটী তীর্থে পরিণত
সাত পুরুষের ললাট ছোঁয়া প্রণামে বিক্ষত।
বাপ পিতামোর ভিটে—
সব চেয়ে এ পবিত্র যে সব চেয়ে এ মিঠে।

(৩)

এযে——বাপ্ পিতামোর ভিটে—
ইহার সাথে মোর জীবনের বাঁধন গীঁঠে গীঁঠে।
হেথায় রচা নান্দীমুখের শতেক বসুধরা
কুশণ্ডিকার ভস্ম কত এই ধূলিতেই হারা।
কত হাসি অশ্রু কত বিদায় আবাহন
হাহাকার ও হুলুধ্বনি হেথায় নিমগন।
ভক্তিমতী সতীকুল-জননীদের আঁকা
আল্‌পনারি শিল্পকলার মালিন্য এর ঢাকা।
অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা ও গভীর অনুরাগে
মোদের বংশ ইতিহাস এ—মাটীর তলে জাগে।
এ বংশের এ পান্থশালা, স্বর্গত আত্মারা
আনাগোনা করেন হেথা পাই যেন তার সাড়া।
বাপ পিতামোর ভিটে
পিতৃগণের স্মৃতির সুধায় বড়ই এযে মিঠে।

(৪)

এযে——বাপপিতামোর ভিটে
পিতৃ ঋণের বোঝা বহি—হেথায় ঘাড়ে পিঠে।
আমার তরে হেথায় হলো কত আয়োজনই
তিনশো বছর আগেও আমার বাজ্‌ল আগমনী।
অলক্ষ্যে সব রক্ষা কবচ, আমায় ঘিরে রাখে
ছাড়্‌তে গেলে অনেক বাহুই পিছন হতে ডাকে।
রোগের জ্বালায় পঙ্গু যখন দৈন্যে ম্রিয়মাণ,
হারাই স্নেহ, বয়না দেহ, দেয় না কেহ স্থান।
সই যদি ক্ষোভ ক্ষয় পরাজয় লাঞ্ছনা লাজ ক্ষতি
ইহার এ বুক ছাড়া আমার নেইক কোন' গতি।
খাই বা নাখাই নির্ব্বিবাদে এইখানে রই পড়ি'
নারায়ণের শ্রীমন্দিরে দেই গো গড়াগড়ি।
বাপ পিতামোর ভিটে—
শেষেও যেন মুদি নয়ন এ তীর্থেরই পীঠে।

শ্রীকালিদাস রায়

DOUBLE COLOUR PAGE

বাপ পিতামো'র ভিটে

এযে——বাপ পিতামো'র ভিটে
সব চেয়ে মোর ইহাই খাঁটি সব চেয়ে এ মিঠে।
এই ত আমার কাশীগয়া প্রয়াগ বৃন্দাবন
বাপ পিতামো'র পুণ্যে গড়া তীর্থ নিকেতন।
এই ত আমার তক্ষশালা অজন্তা সারনাথ
হেথায় অতুল প্রত্নধনের মিলিবে সাক্ষাৎ।
হেথায় আমি রাজা, হেথা উন্নত মোর মাথা
এই আঙ্গিনার ধূলায় আমার গৌরবাসন পাতা।
সকল ঠাঁয়ে হারায়ে যাই লোকজনতার মাঝে
এই খানে মোর স্বতন্ত্রতা সগৌরবে রাজে।
অতীত্ সনে বর্ত্তমানের হেথায় আমার যোগ,
জন্মে জন্মে পাপ পুণ্যের হেথায় ফল ভোগ।
বাপ পিতামোর ভিটে—
সব হতে এ পরম প্রিয়, সবহতে এ মিঠে।

(২)

এযে——সাত পুরুষের ভিটে—
তাদের স্মৃতি জড়িত এর প্রত্যেক ইটে ইটে।
পিতামহের পিতামহ টোপর মাথায় দিয়ে
এই আঙ্গিনায় ফিরে এলেন করে এলেন বিয়ে।
এই আঙ্গিনায় পিতামহ দিলেন হামাগুড়ি
তাঁদের চরণ চিহ্ন আঁকা এই ভিটেটি জুড়ি।
তাঁহার পিতার সূতিকাগার কোণটিতে ঐ ছিল,
পিতামহী তুলসী তলায় চির বিদায় নিল।
মাতৃশোকে ধূলায় পড়ে কেঁদেছিলাম হোথা
ঈশানঁ কোণের আমগাছটি ঠাকুর মায়ের পোঁতা।
ঠাকুর ঘরের সাম্নে মাটী তীর্থে পরিণত
সাত পুরুষের ললাট ছোঁয়া প্রণামে বিক্ষত।
বাপ পিতামোর ভিটে—
সব চেয়ে এ পবিত্র যে সব চেয়ে এ মিঠে।

(৩)

এযে——বাপ্ পিতামোর ভিটে—
ইহার সাথে মোর জীবনের বাঁধন গাঁঠে গাঁঠে।
হেথায় রচা নান্দীমুখের শতেক বসুধরা
কুশণ্ডিকার ভস্ম কত এই ধূলিতেই হারা।
কত হাসি অশ্রু কত বিদায় আবাহন
হাহাকার ও হুলুধ্বনি হেথায় নিমগন।
ভক্তিমতী সতীকুল-জননীদের আঁকা
আল্পনারি শিল্পকলার মালিন্য এর ঢাকা।
অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা ও গভীর অনুরাগে
মোদের বংশ ইতিহাস এ—মাটীর তলে জাগে।
এ বংশের এ পান্থশালা, স্বর্গত আত্মারা
আনাগোনা করেন হেথা পাই যেন তার সাড়া।
বাপ পিতামোর ভিটে
পিতৃগণের স্মৃতির সুধায় বড়ই এযে মিঠে।

(৪)

এযে——বাপপিতামোর ভিটে
পিতৃ ঋণের বোঝা বহি—হেথায় ঘাড়ে পিঠে।
আমার তরে হেথায় হলো কত আয়োজনই
তিনশো বছর আগেও আমার বাজ্‌ল আগমনী।
অলক্ষ্যে সব রক্ষা কবচ, আমায় ঘিরে রাখে
ছাড়্‌তে গেলে অনেক বাহুই পিছন হতে ডাকে।
রোগের জ্বালায় পঙ্গু যখন দৈন্যে ম্রিয়মাণ,
হারাই স্নেহ, বয়না দেহ, দেয় না কেহ স্থান।
সেই যদি ক্ষোভ ক্ষয় পরাজয় লাঞ্ছনা লাজ ক্ষতি
ইহার এ বুক ছাড়া আমার নেইক কোন' গতি।
খাই বা নাখাই নির্ব্বিবাদে এইখানে রই পড়ি'
নারায়ণের শ্রীমন্দিরে দেই গো গড়াগড়ি।
বাপ পিতামোর ভিটে—
শেষেও যেন মুদি নয়ন এ তীর্থেরই পীঠে।

শ্রীকালিদাস রায়

DOUBLE COLOUR PAGE

পথের দাবী *

(১২)

কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াই অপূর্ব্ব সৌজন্য প্রকাশ করিয়া কহিল, আপনার এই অসুস্থ দুর্ব্বল শরীর নিয়ে আর পথ হেঁটে কাজ নেই। এই ত সোজা রাস্তা বড় রাস্তায় গিয়ে পড়েচে,—আমি অনায়াসে যেতে পারবো।

ডাক্তার চলিতে চলিতেই একটু হাসিয়া বলিলেন, অনায়াসে এলেই কি অনায়াসে যে পারা যায় অপূর্ব্ব বাবু? তখন, সন্ধ্যাবেলা যে পথটা সোজাই ছিল, এখন, এতরাত্রে জেরবার পাঠান আর বেকার কাফ্রিতে মিলে হয়ত তাকে রীতিমত বাঁকিয়ে রেখেচে। চলুন, দাঁড়াবেন না।

অপূর্ব্ব ইঙ্গিতটা বুঝিতে পারিয়াও জিজ্ঞাসা করিল, কি করে এরা? মারামারি?

তাহার সঙ্গী পুনশ্চ হাসিয়া বলিলেন, করে বই কি! মদের খর্‌চাটা তারা পরের ঘাড় চাপাবার কাজে ও অনুষ্ঠানটুকু বোধ করি ঠিক বাদ দিয়ে উঠ্‌তে পারে না। এই যেমন ঘড়িটা আপনার। অপরের পকেটে চালান যাবার সময়ে আপত্তি হবারই সম্ভাবনা। তার ব্যাপারটাও অত্যন্ত স্বাভাবিক। ঠিক না?

অপূর্ব্ব সভয়ে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, ঠিক বটে, কিন্তু এ যে আমার বাবার ঘড়ি!

ডাক্তার বলিলেন, এই তো তারা বুঝ্‌তে চায় না! কিন্তু, আজ না বুঝ্‌লে চল্‌বেনা।

অর্থাৎ?

অর্থাৎ, আজ এর বদলে কারুই মদ খাবার সুবিধে হবে না।

অপূর্ব্ব ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া সন্দিগ্ধকণ্ঠে কহিল, বরঞ্চ চলুন, আর কোন পথ দিয়ে যাওয়া যাক্।

ডাক্তার তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। অনেকটা মেয়েমত স্নিগ্ধ সকৌতুক হাসি। কহিলেন, ঘুরে? এই দুপুর রাতে? না না, তার আবশ্যক চলুন—এই বলিয়া সেই শীর্ণ হাতখানি দিয়া অপূর্ব্বর ডান হাতটি টানিয়া লইয়া একটা চাপ অপূর্ব্বর অনেক দিনের অনেক জিম্‌নাষ্টিক, অনেক ক্রিকেট-হকি-খেলা হাতের ভিতরের পর্য্যন্ত যেন মড় মড় করিয়া উঠিল।

অপূর্ব্ব হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল, চলুন, বুঝেচি। এই বলিয়া সে নিজেও একটু চেষ্টা করিয়া কহিল, কাকাবাবু সে দিন আপনার কথাতেই রহস্য করে আমাকে বলেছিলেন, কি বাবাজী মহাপুরুষের সম্বর্দ্ধনায় এত লোকজনের আয়োজন করতে হয়? আমাদের গুরু

* সর্ব্ব স্বত্ব সংরক্ষিত।

না আছে, কৃপা করলে তিনি পাঁচ-সাত-দশজন পুলিশের ভবলীলা শুধু চড় মেরেই সাঙ্গ করে দে পারেন! কাকাবাবুর মুখের ভঙ্গীতে সেদিন আমরা খুব হেসেছিলাম, কিন্তু এখন মনে হচ্চে হাসা ঠিক সঙ্গত হয়নি—আপনি পারলেও বা পারতে পারেন।

ডাক্তারের মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল, কহিলেন, কাকাবাবুর ওটা অতিশয়োক্তি। কিন্তু রাজা কে কে?

অপূর্ব্ব কহিল, আমি এবং তাঁরই দু'চারজন কর্ম্মচারী।

ওঃ—এঁরা! এই বলিয়া তিনি একটা নিঃশ্বাস ফেলিলেন। অপূর্ব্ব ইহার অর্থ বুঝিল; কিছুক্ষণ অবধি কোন কথা যেন তাহার মুখে আসিল না। সোজা পথটা আজ সোজাই কারণ, যে জন্যই হৌক, পথিকের টাকাকড়ি কাড়িয়া লইবার আজ কেহ তথায় উপস্থিত নাই। নির্জ্জন গলিটা নিঃশব্দে পার হইয়া তাহারা বড় রাস্তার কাছাকাছি পৌঁছিলে অপূর্ব্ব হঠাৎ বলিয়া উঠিল, এবার বোধ হয় আমি নির্ভয়ে যেতে পারবো। ধন্যবাদ।

প্রত্যুত্তরে ডাক্তার স্বল্পালোকিত সম্মুখের প্রশস্ত রাজপথের বহুদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, পারবেন বোধ হয়।

অপূর্ব্ব নমস্কার করিয়া বিদায় গ্রহণ করিতে গিয়া ভিতরের কৌতূহল কোন মতেই আর সম্বরণ করিতে পারিল না, বলিয়া ফেলিল, আচ্ছা, সব্য—

না না, সব্য নয়, সব্য নয়,—ডাক্তারবাবু।

অপূর্ব্ব ঈষৎ লজ্জিত হইয়া কহিল, আচ্ছা ডাক্তার বাবু, আমাদের সৌভাগ্য যে পথে কেউ নেই না, কিন্তু ধরুন তারা দলে বেশি থাক্‌লেও কি সত্য সত্যই কোন ভয় ছিল না?

ডাক্তার কহিলেন, দলে তারা দু'দশজনের বেশি কোন দিনই থাকে না।

অপূর্ব্ব বলিল, দু'দশ জন! অর্থাৎ, দু'জন থাক্‌লেও ভয় ছিল না, দশজন থাকলেও না?

ডাক্তার মুচকিয়া হাসিয়া বলিলেন, না।

বড় রাস্তার মোড়ের উপর আসিয়া অপূর্ব্ব জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, বাস্তবিকই কি আপনার নিশানের লক্ষ্য কিছুতেই ভুল হয় না?

ডাক্তার তেম্‌নি সহাস্যে ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিলেন, না। কিন্তু কেন বলুন ত? আমার কাছে ত পিস্তল নেই।

অপূর্ব্ব বলিল, ওটা না নিয়েই বেরিয়েছিলেন,—আশ্চর্য্য! অন্ধকার গভীর রাত্রি ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, সে জনহীন দীর্ঘ পথের প্রতি চাহিয়া কহিল, পথে না আছে লোক, না আছে একটা আলো; আলো ত না থাকার মধ্যেই—

—আচ্ছা ডাক্তারবাবু, আমার বাসাটা প্রায় ক্রোশখানেক হবে, না?

ডাক্তার বলিলেন, তা হবে বই কি।

অপূর্ব্ব কহিল, আচ্ছা, নমস্কার, আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম। এই বলিয়া সে উদ্যত হইয়া কহিল, আচ্ছা, এমন ত হতে পারে সে ব্যাটারা আজ আর কোন দাঁড়িয়ে আছে ?

ডাক্তার সায় দিয়া কহিলেন, বিচিত্র নয়।

অপূর্ব্ব কহিল, নয়ই ত! আছেই!—আচ্ছা, নমস্কার! কিন্তু মজা দেখেছেন, আসল দরকার সেখানে পুলিশের ছায়াটি পর্য্যন্ত দেখ্‌বার যো নেই। এই হ'ল তাঁদের জ্ঞান! আর এর জন্যেই আমরা ট্যাক্স জুগিয়ে মরি! সমস্ত বন্ধ করে দেওয়া উচিত, কি বলেন?

তাতে আর সন্দেহ কি! বলিয়া ডাক্তার খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। সে মেয়েলি কোমল সুমিষ্ট হাসি। কহিলেন, চলুন, কথা কইতে কইতে আর খানিকটে সঙ্গে এগিয়ে যাই।

অপূর্ব্ব লজ্জায় একেবারে ম্লান হইয়া গেল। এক মুহূর্ত্ত মাটির দিকে চাহিয়া আস্তে বলিল, আমি বড্ড ভীতু লোক ডাক্তারবাবু, আমার কিচ্ছু সাহস নেই। আর যে অনায়াসে যেতে পারতো, এত রাত্রে আপনাকে কষ্ট দিত না।

তাহার এই বিনয়-নম্র, নিরভিমান সত্য কথায় ডাক্তার নিজের হাসির জন্য নিজে লজ্জা পাইলেন, সস্নেহে তাহার কাঁধের উপর একটা হাত রাখিয়া কহিলেন, সঙ্গে যাবার আমি এসেচি অপূর্ব্ববাবু, নইলে প্রেসিডেণ্ট আমাকে এ জিনিসটা হাতে গুঁজে দিলে এই বলিয়া তিনি বাঁ হাতের মোটা কালো লাঠিটা দেখাইলেন।

অপূর্ব্ব চকিত হইয়া কহিল, সুমিত্রা? তিনি কি আপনাকেও আদেশ করতে পারেন!

ডাক্তার হাসিলেন, বলিলেন, পারেন বই কি।

অপূর্ব্ব বলিল, কিন্তু তিনি ত অন্য লোক ও সঙ্গে দিতে পার্‌তেন?

ডাক্তার কহিলেন, তার মানে সবাইকে দলবেঁধে পাঠানো। তার চেয়ে এই ব্যবস্থা হয়েছে অপূর্ব্ববাবু।

চলিতে চলিতে কথা হইতেছিল। ডাক্তার কহিলেন, সুমিত্রা আমাদের দলে তাঁকে সকল দিক চেয়ে দেখে কাজ করতে হয়। যেখানে ছুরি-ছোরা খুন-জখম আছে সেখানে যাকে তাকে ত পাঠানো যায় না। আমি উপস্থিত না থাকলে আজ ও থাকতে হোতো,—তিনি কোনমতেই আসতে দিতেন না।

এই অন্ধকার জনহীন পথে ছুরি-ছোরার কথায় অপূর্ব্বর সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া গেল। আস্তে কহিল, কিন্তু এই পথেই যে আপনাকে একাকী ফিরতে হবে!

ডাক্তার বলিলেন তা'হবে।

অপূর্ব্ব আর প্রশ্ন করিল না। তাহাদের নিভৃত আলাপের গুঞ্জন শব্দ পাছে

তাহাকেও আকৃষ্ট করিয়া আনে এ খেয়াল তাহার মনের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। সে তাহার চক্ষু কর্ণ ও মনকে একই কালে রাস্তার দক্ষিণে বামে ও সম্মুখে একান্ত নিবিষ্ট করিয়া নিঃশব্দ দ্রুতপদে পথ চলিতে লাগিল। মিনিট পোনর এই ভাবে চলিয়া সহরের প্রথম পুলিশ ষ্টেশনটা বামহাতে রাখিয়া লোকালয়ে প্রবেশ করিয়া অপূর্ব্ব আবার কথা কহিল, বলিল, ডাক্তারবাবু, আমার বাসা ত বেশী দূরে নয়, আজ রাত্রিটা ওখানে থাক্‌লে ক্ষতি কি?

ডাক্তার তাহার মনের কথা অনুমান করিয়া সহাস্যে কহিলেন, ক্ষতি ত অনেক জিনিসেই হয় অপূর্ব্ববাবু, কিন্তু বিনা প্রয়োজনেও কোন কাজ করা আমাদের বারণ। শুধু কেবল প্রয়োজন আছে বলেই আমাকে ফিরে যেতে হবে।

আপনারা কি অপ্রয়োজনে জগতে কিছুই করেন না?

করা বারণ। আমি তা'হলে বিদায় হই অপূর্ব্ব বাবু?

অপূর্ব্ব কটাক্ষে পশ্চাতের সমস্ত অন্ধকার পথটার প্রতি চাহিয়া এই লোকটিকে একাকী ফিরিয়া যাইতে কল্পনা করিয়া, আর একবার কণ্টকিত হইয়া উঠিল। কহিল, ডাক্তারবাবু, মানুষের মর্য্যাদা রক্ষা করাও কি আপনাদের বারণ?

ডাক্তার আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিলেন, হঠাৎ এ কথা কেন?

অপূর্ব্ব ক্ষুণ্ণ-অভিমানের সুরে বলিল, তা ছাড়া আর কি বলুন? আমি ভীতু লোক, লাবদ্ধ গুণ্ডাদের মধ্যে দিয়ে একলা যেতে পারিনে;—আমাকে নিরাপদে পৌঁছে দিয়ে সেই বিপদের ভেতর দিয়ে আপনি যদি আজ একাকী ফিরে যান্, আর কি আমি মুখ দেখাতে পারবো?

ডাক্তার চক্ষের নিমিষে তাহার দুই হাত সস্নেহে ধরিয়া ফেলিয়া কহিলেন, আচ্ছা চলুন আজ রাত্রির মত আপনার বাসাতে গিয়েই অতিথি হইগে। কিন্তু এ সব হাঙ্গামা কি সহজে মিটে আছে ভাই?

কথাটা অপূর্ব্ব ঠিক বুঝিল না, কিন্তু কয়েক পদ অগ্রসর হইতেই হাতের মধ্যে কেমনতর এক প্রকার টান অনুভব করিয়া ফিরিয়া চাহিয়াই কহিল, আপনার জুতোয় বোধকরি লাগ্‌ছে ডাক্তার বাবু, আপনি খোঁড়াচ্চেন।

ডাক্তার মৃদু হাসিয়া বলিলেন, ও কিছু না। লোকালয়ে আমার পা দুটো কেমন আপনিই গুঁড়িয়ে চলে। গিরীশ মহাপাত্রের চলন মনে পড়ে?

অপূর্ব্ব থমকিয়া দাঁড়াইল। কহিল, আপনাকে যেতে হবে না ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার তেম্‌নি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, কিন্তু আপনার মর্য্যাদা?

অপূর্ব্ব বলিল, আপনার কাছে আবার মর্য্যাদা কি? পায়ের ধূলোর যোগ্যও ত নই। আপনি বাড়া পৃথিবীতে কি আর কারও এতবড় সাহস আছে!

এই ডাক্তার ব্যক্তিটির জীবন-ইতিহাসের সহিত অপূর্ব্বর প্রত্যক্ষ পরিচয় কিছুই ছিল না।

থাকিলে সে এই অত্যন্ত ক্ষুদ্র ব্যাপার লইয়া এতখানি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতে লজ্জায় মরিয়া যা
সমুদ্রের কাছে গোষ্পদের ন্যায় এই পংটুকুতে একাকী হাঁটা এই লোকটির কাছে কি! পুলি
লোকে যাহাকে সব্যসাচী বলিয়া জানে, দশ-বারোজন দুর্ব্বৃত্তে মিলিয়া তাহার পথরো
কি করিয়া?

ডাক্তার মুখ ফিরাইয়া হাসি গোপন করিয়া শেষে ভাল মানুষটির মত কহিলেন, আচ্ছা,
চেয়ে চলুন না কেন দুজনেই আবার একসঙ্গে ফিরে যাই? আমাকে একলা যদি বা কেউ আ
করতে সাহস করে আপনি কাছে থাক্‌লে ত সে সম্ভাবনা থাক্‌বে না!

অপূর্ব্ব অনিশ্চিতকণ্ঠে বলিল, আবার ফিরে যাবো?

ডাক্তার বলিলেন, দোষ কি? আমার একলা যাবার বিপদের শঙ্কাও থাক্‌বে না।

থাক্‌বো কোথায়?

আমার কাছে।

অফিস হইতে ফিরিয়া আজ অপূর্ব্বর খাওয়া হয় নাই, তাহার অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ হইতে
একটু লজ্জিত হইয়া কহিল, দেখুন, আমার কিন্তু এখনো খাওয়া হয়নি,—আচ্ছা, তা না হয় আ

ডাক্তার হাসিমুখে বলিলেন, চলুন না, ভাগ্য পরীক্ষা কোরে আজ দেখাই যাক্। কিন্তু
কথা, তেওয়ারী বেচারা বড় চিন্তিত হয়ে থাক্‌বে।

তেওয়ারীর উল্লেখে অপূর্ব্বর মনের মধ্যে হঠাৎ একটা হিংস্র প্রতিশোধের বাসনা প্রবল
উঠিল, রাগ করিয়া বলিল, মরুকগে ব্যাটা ভেবে,—চলুন যাই। এই বলিয়া সে একরকম
করিয়াই তাঁহাকে বাধা দিয়া সেই আলো-আঁধারের জনশূন্য পথে উভয়ে হাঁটিতে হাঁটিতে
ফিরিয়া চলিল। এবার কিন্তু ভয়ের কথা তাহার মনেই হইল না। পুলিশ থানা পার
সহসা এক সময়ে সে প্রশ্ন করিয়া বসিল, আচ্ছা ডাক্তারবাবু আপনি কি এ্যানার্কিষ্ট?

ডাক্তার অন্ধকারে তাহার মুখের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আ
কাকাবাবু কি বলেন?

অপূর্ব্ব কহিল, তিনি বলেন সব্যসাচী একজন ভয়ানক এ্যানার্কিষ্ট।

আমিই যে সব্যসাচী এ সম্বন্ধে আপনার কোন সন্দেহ নেই?

না।

এ্যানার্কিষ্ট বল্‌তে আপনি কি বুঝেন?

অপূর্ব্ব এ প্রশ্নের হঠাৎ জবাব দিতে পারিল না। একটু ভাবিয়া কহিল, অর্থাৎ
রাজদ্রোহী,—যিনি রাজার শত্রু।

ডাক্তার বলিলেন, আমাদের রাজা এদেশে থাকেন না, থাকেন বিলাতে। লোকে বলে

রাজলোক। আমি তাঁকে কখনো চোখে দেখিনি, তিনিও আমার কখনো লেশমাত্র ক্ষতি করেননি। তাঁর প্রতি বৈরীভাব আস্‌বে আমার কোথা থেকে অপূর্ব্ববাবু?

অপূর্ব্ব কহিল, যাদের আসে, তাদেরইবা কি কোরে আসে বলুন? তাদেরও ত তিনি কোন অনিষ্ট করেননি!

ডাক্তার সবেগে মাথা নাড়িয়া কহিলেন তাই, আপনি যা বল্‌ছেন এদেশে তা নেই, একেবারে মিছে কথা!

তাঁহার কণ্ঠস্বরের প্রবলতায় ও অস্বীকার করিবার তীব্রতায় অপূর্ব্ব চমকিয়া গেল। অবিশ্বাস করিবার সাহস তাহার হইল না। অথচ, দেশে কিছু যে একটা আছেই, ছেলেবেলা তাহারও গায়ে যে ইহার আঁচ লাগিয়া গেছে, এবং ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বাবা না থাকিলে কোথাকার জল যে কোথায় গিয়া গড়াইতে পারিত ইহা সে বড় বয়সে পদে পদে অনুভব করিয়াছে। একটু ভাবিয়া কহিল, রাজা না হোন্ রাজ-কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে যে একটা ষড়যন্ত্র ছিল এ কথা তো মিথ্যা নয় ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার অনেকক্ষণ কোন উত্তর দিলেন না, তারপরে ধীরে ধীরে বলিলেন, কর্ম্মচারীরা রাজার ভৃত্য, মাইনে পায় হুকুম পালন করে। একজন যায় আর একজন আসে। এটা সহজ এবং মোটা কথা। কিন্তু এই সহজকে জটিল এবং মোটাকে নিরর্থক সূক্ষ্ম করে মানুষে যখন দেখতে চায়, তখনই তার সবচেয়ে বড় ভুল হয়। সেই জন্যে তাদের আঘাত করাকেই রাজশক্তির মূলে আঘাত করা ব'লে আত্মবঞ্চনা করে। এতবড় মারাত্মক ব্যর্থতা আর নেই।

অপূর্ব্ব একটু চুপ করিয়া কহিল, কিন্তু এই ব্যর্থ কাজ করবার লোক কি ভারতবর্ষে নেই?

ডাক্তার শান্তভাবে কহিলেন, হয়ত থাক্‌তেও পারে।

কিন্তু অপূর্ব্ব সহসা আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা ডাক্তার বাবু, এঁরা সব আজকাল কোথায় থাকেন এবং কি করেন? তাহার ঔৎসুক্য ও ব্যগ্রতায় ডাক্তার শুধু মুচকিয়া হাসিলেন।

অপূর্ব্ব কহিলেন, হাসিলেন যে?

ডাক্তার তেম্‌নি হাসিমুখে বলিলেন, আপনার সেই কাকা বাবুটি উপস্থিত থাক্‌লে কিন্তু বুঝ্‌তেন। আপনার বিশ্বাস আমি একজন এ্যানার্কিষ্টদের পাণ্ডা। তার মুখ থেকে কি এর জবাব আশা করতে আছে অপূর্ব্ব বাবু?

নিজের বুদ্ধিহীনতার এই সুস্পষ্ট ইঙ্গিতে অপূর্ব্ব অপ্রতিভ হইল, মনে মনে একটু রাগও করিল, কহিল, আশা করা সম্পূর্ণই অনুচিত হোতো আজ যদি না আমাকে দলভুক্ত করে নিতেন। মেম্বরদের এটুকু জানবার অধিকার আছে এ বোধ করি আপনি অস্বীকার করেন না। এ তো ছেলেখেলা নয়, ভীষণ দায়িত্ব আছে যে!

আছেই ত। বলিয়া ডাক্তার বাবু হাসিলেন। এই সুমিষ্ট হাসি ও নিরাতঙ্ক সহজ উক্তি

ঠিক ব্যঙ্গোক্তির মতই অপূর্ব্বের কানে বাজিল। বিদ্রোহীদলের বাঁধানো খাতায় যাহা লেখা হইল তাহার প্রশ্নের এই উত্তর? এর বেশী জানিবার তাহার প্রয়োজন নাই। মনে ভীত ও ক্রুদ্ধ হইয়া এই লোকটিকে আজ সে ভুল বুঝিল, কিন্তু এই ভুল সংশোধন কর্ত্তি কালে বহুবারই তাহাকে দেখিতে হইয়াছে কোন অবস্থায় কোন কারণেই ইঁহার মুখে হাসি এবং গলার স্বর উত্তেজনায় চঞ্চল হইয়া উঠে না।

নিঃশব্দ গাম্ভীর্য্যে ডাক্তারের এই সামান্য সংক্ষিপ্ত জবাবটাকে সে প্রতিঘাত করিতে নিরুত্তরে পথ চলিতে লাগিল, কিন্তু অধিকক্ষণ থাকিতে পারিল না, ওই ছোট্ট কথাটুকুর তীক্ষ্ণতা তীরের ফলাটুকুর মতই যেন তাহার বুকে বিঁধিতে লাগিল। তিক্তকণ্ঠে কহিল, খাতায় তাড়াতাড়ি নাম লিখে নিলেই ত হয় না, তার ফলাফল বুঝিয়েও দিতে হয়।

কিন্তু সে কি তাঁরা দেন নি?

অপূর্ব্ব কহিল, কিছুই না। পথের-দাবী না পথের-দাবী! দাবীর বহর যে এত, তা জান্‌তো? আর আপনিও ত ছিলেন, নাম লেখবার পূর্ব্বে আপনারও ত জানা উচিত ছি আমার যথার্থ মতামত কি!

ডাক্তার একটু লজ্জিত হইয়া বলিলেন, মেয়েরা একটা ব্যাপার করেছেন তাঁরাই কাকে মেম্বর করবেন এবং কাকে করবেন না। আমি হঠাৎ জুটে গেছি মাত্র। বাস্তবি আমি এদের সভার বিশেষ কিছু জানি নে অপূর্ব্ব বাবু!

অপূর্ব্ব বুঝিল ইহাও পরিহাস। উৎকণ্ঠায় ও আশঙ্কায় সমস্ত জিনিসটাই তাহার বিশ্রী লাগিতেছিল, আপনাকে সে আর সম্বরণ করিতে পারিল না, জ্বলিয়া উঠিয়া কহিল, ছলনা করচেন ডাক্তার বাবু, সুমিত্রাকেই প্রেসিডেন্ট করুন, আর যাকেই যা করুন, দল আপ এবং আপনিই এর সব, তাতে লেশমাত্র সন্দেহ নেই। পুলিশের চোখে ধূলো দিতে পারবেন আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারবেন না এ আপনি নিশ্চয় জান্‌বেন।

তাহার কথা শুনিয়া এইবার এই শীর্ণদেহ রহস্যপ্রিয় লোকটি অকৃত্রিম বিস্ময়ে দুই বিস্ফারিত করিয়া তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিলেন, আমার দল মানে এ্যানার্কিষ্টের দল আপনি মিথ্যে শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন অপূর্ব্ব বাবু, আপনার আগাগোড়া ভুল হয়েছে। তাদের জীবন-মৃত্যুর খেলা, তারা আপনার মত ভীতু লোককে দলে নেবে কেন? তারা কি পাগল!

অপূর্ব্ব লজ্জায় এতটুকু হইয়া গেল, কিন্তু তাহার বুকের উপর হইতে গুরুভার পা নাবিয়া গেল। ডাক্তার কহিলেন, পথের-দাবী নাম দিয়ে সুমিত্রা এই ছোট্ট দলটির এ করেচেন। জীবন-যাত্রায় মানুষের পথ চল্‌বার অধিকার যে কত বড় এবং কত পবিত্র এ সত্যটাই মানুষে যেন ভুলে গেছে। আপনারা, অর্থাৎ দলের সভ্য যাঁরা, তাঁরা নিজেদের জীবন দিয়ে এই কথাটাই মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিতে চান। সুমিত্রা অনুরোধ করলেন

যতদিন এখানে আছি তাঁর দলটিকে যেন গড়ে দিয়ে যাই। আমি রাজী হয়েছি,—এ ছাড়া দলের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই। আপনারা হলেন সমাজ-সংস্কারক, কিন্তু আমার সংস্কার করে বেড়াবার সময়ও নেই ধৈর্য্যও নেই। হয়ত, কিছুদিন আছি, হয়ত কালই যেতে পারি; সারাজীবনে আর কখনো দেখাও না হতে পারে। বেঁচে আছি কি নেই খবরও হয়ত আপনাদের কানে পৌঁছবে না।

কথাগুলি শান্ত, ধীর,—উচ্ছ্বাস বা আবেগের বাষ্পও নাই। এই ব্যক্তি যেই হোক, সন্ন্যাসাচীর যে বিবরণ অপূর্ব্ব কাকাবাবুর মুখে শুনিয়াছে, সেই সব দপ্ করিয়া মনে পড়িয়া বুকের কোথায় যেন খোঁচার মত বিঁধিল। কিন্তু তখনি মনে হইল সে তো পাষাণ,—তার জন্য আবার বেদনাবোধ কি? ক্ষণকাল পরে জিজ্ঞাসা করিল, ডাক্তার বাবু, সুমিত্রা কে? আপনি তাঁকে জান্‌লেন কি করে?

প্রত্যুত্তরে ডাক্তার শুধু একটুখানি হাসিলেন। উত্তর না পাইয়া অপূর্ব্ব নিজেই বুঝিল এরূপ কৌতূহল সঙ্গত হয় নাই। এই অল্প কালের মধ্যেই সে এই রহস্যময় বিচিত্র সমাজের গঠনের বিশিষ্টতা লক্ষ্য করিতেছিল, তাই সে ভারতীর সম্বন্ধেও তাহার প্রবল কৌতূহলও সংবরণ করিয়া মৌন হইয়া রহিল।

মিনিট পাঁচ ছয় এইভাবে নিঃশব্দে কাটিলে ডাক্তার প্রথমে কথা কহিলেন, বলিলেন, আপনার কল্যাণেই বোধ হয় রাস্তা আজ একেবারে নিরাপদ। এমন প্রায় ঘটে না, কিন্তু কি ভাব্‌চেন বলুন ত?

অপূর্ব্ব বলিল, ভাব্‌চি ত অনেক কিছু, কিন্তু সে যাক্! আচ্ছা, আপনি বল্‌লেন মানুষের নির্ব্বিঘ্নে পথ চলবার অধিকার। এই যেমন আমরা আজ নির্ব্বিঘ্নে পথ চল্‌চি,—এম্‌নি?

ডাক্তার সহাস্যে কহিলেন, এম্‌নিই কিছু একটা হবে বোধ হয়।

অপূর্ব্ব কহিল, ওই যে মেয়েটী স্বামী পরিত্যাগ করে পথের দাবীর সভ্য হতে এসেছেন তাও ঠিক বুঝ্‌লাম না।

ডাক্তার কহিলেন, আমিও যে ঠিক বুঝেচি তা' বল্‌তে পারিনে। ওসব ব্যাপার সুমিত্রাই ভাল।

অপূর্ব্ব প্রশ্ন করিল, তাঁর বোধ হয় স্বামী নেই?

ডাক্তার চুপ করিয়া রহিলেন। অপূর্ব্বকে লজ্জা ও ক্ষোভের সহিত পুনরায় স্মরণ করিতে হইল তাহার অহেতুক ঔৎসুক্যের তিনি জবাব দিবেন না। এবং এই কথা অলক্ষ্যে যাচাই করিতে সে সঙ্গীর মুখের দিকে কটাক্ষে চাহিয়া কিন্তু একেবারে বিস্মিত হইয়া গেল। তাহার মনে হইল, এই আশ্চর্য্য মানুষটির অপরিজ্ঞাত জীবনের একটা নিভৃত দিক্ যেন সে হঠাৎ দেখিতে পাইল। সে ঠিক কি তাহা বলা কঠিন, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত যাহা কিছু সে জানিয়াছে

তাহার অতীত। যেন কোন বহুদূরাঞ্চলে তাঁহার চিন্তা সরিয়া গেছে, কাছাকাছি কোথা নাই। অনতিদূরবর্ত্তী ল্যাম্পপোষ্ট হইতে কিছুক্ষণ হইতেই একটা ক্ষীণ আলোক ইঁহার উপরে পড়িয়াছিল, পাশ দিয়া যাইবার সময় অপূর্ব্ব স্পষ্ট দেখিতে পাইল এই ভদ্রলোকটির চোখের উপরে একটা ঝাপ্‌সা জাল ভাসিয়া বেড়াইতেছে—এই মুহূর্ত্তের জন্য সমস্ত ভুলিয়া মনে মনে কি একটা খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন!

অপূর্ব্ব দ্বিতীয় প্রশ্ন করে নাই, নীরবে পথ চলিতেছিল, কিন্তু মিনিট দু'য়ের বেশি অকস্মাৎ, অকারণেই হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, দেখুন অপূর্ব্ববাবু, আপনাকে আমি সত্যই মেয়েদের এই সব প্রণয়-ঘটিত মান অভিমানের ব্যাপার আমি কিছুই বুঝিনে। বোঝবার করতে গেলেও নিরর্থক ভারি সময় নষ্ট হয়। কোথায় পাই এত সময়?

অপূর্ব্বর প্রশ্নের ইহা উত্তর নয়, সে চুপ করিয়া রহিল। ডাক্তার কহিলেন, ভারি এঁদের বাদ দিয়ে কাজও চলেনা, নিলেও গণ্ডগোল বাধে।

এ মন্তব্যও অসম্বন্ধ। অপূর্ব্ব নিরুত্তরেই রহিল।

কি হোল? কথা কননা যে বড়?

অপূর্ব্ব কহিল, কি বোল্‌ব বলুন।

ডাক্তার কহিলেন, যা ইচ্ছে। দেখুন অপূর্ব্ববাবু, এই ভারতীটি বড় ভাল মেয়ে। বুদ্ধিমতী, তেম্‌নি কর্ম্মঠ এবং তেম্‌নি ভদ্র।

ইহাও বাজে। কিন্তু প্রত্যুত্তরে এ প্রশ্ন সে ইচ্ছা করিয়াই করিলনা যে, আপনি কতদিন হইতে জানিলেন এবং কি করিয়া জানিলেন। শুধু বলিল, হাঁ। কিন্তু শ্রোতা এদিকে কিছুমাত্র খেয়াল থাকিত ত অপূর্ব্বর মুখ হইতে এই এক অক্ষরের জবাবে অত্যন্ত হইয়া যাইতেন। কিন্তু তিনি যে বিমনা হইয়াই আলাপ করিতেছিলেন অপূর্ব্বকে তাহা নূতন করিয়া বুঝিতে হইলনা। বক্তা বোধ করি তাঁহার শেষ কথারই সূত্র ধরিয়া কহিলেন, আপনাদের প্রসঙ্গেই কথা কইতে তিনি আপনার সম্বন্ধে বল্‌ছিলেন, আপনি নাকি ভয়ানক একেবারে গোঁড়া। ভারতী বল্‌ছিলেন, এতবড় ভয়ঙ্কর হিঁদু বামুনেরও তিনি জাত মেরে দিতে

অপূর্ব্ব বলিল, তা' হবে। এই একান্ত অন্যমনস্ক লোকটির সহিত তর্ক করিতে ইচ্ছাই হইল না। বড় রাস্তা প্রায় শেষ হইয়া আসিল, গলির মোড়ে সাম্‌না-সামনি দুইটা সম্মুখেই দেখা দিল, আর মিনিট দশেকের মধ্যেই গন্তব্য স্থানে পৌঁছানো যাইবে সময়ে ডাক্তার তাঁহার ঘুমন্ত মনটাকে যেন অকস্মাৎ ঝাড়া দিয়া একেবারে সজাগ করিয়া কহিলেন, অপূর্ব্ব বাবু!

অপূর্ব্ব তাঁহার কণ্ঠস্বরের তীক্ষ্ণতায় নিজেও সচেতন হইয়া উঠিল, কহিল, বলুন।

ডাক্তার বলিলেন, এদেশে আমি থাকা পর্য্যন্ত কাজ নেই, কিন্তু চলে গেলে আপনি নি

তাকে সাহায্য করবেন। এমন মানুষ আপনি পৃথিবী ঘুরে বেড়ালেও কখনো পাবেন না। এ পথের দাবী যেন অনাদরে অবহেলায় না মারা পড়ে। এতবড় একটা আইডিয়া কি কেবল দু'টি মেয়ে মানুষেই সার্থক করে তুল্‌তে পার্‌বে! আপনার একনিষ্ঠ সেবার আজ প্রয়োজন।

এই ব্যক্তির ধারণায় সে যে সত্যই এতবড় লোক অপূর্ব্ব তাহা প্রত্যয় করিল না। কহিল, এতবড় একটা আইডিয়াকে তবে আপনিই বা ফেলে যেতে চাচ্চেন কেন?

ডাক্তার মৃদু হাসিয়া কহিলেন, অপূর্ব্ববাবু, যেখানে ফেলে যাওয়াই মঙ্গল, সেখানে আঁকড়ে থাকাই অকল্যাণ। আমার সাহায্যে আপনাদের কাজ নেই,—আপনারা নিজেরাই এটা গড়ে তুলুন, হয়ত বা এর ভেতর দিয়েই দেশের সব চেয়ে বড় কাজ হবে।

অপূর্ব্ব কহিল, নবতারার ব্যাপারটা ত আমি বিশ্বাস করতে পারিনে ডাক্তার বাবু!

ডাক্তার বলিলেন, কিন্তু সুমিত্রাকে বিশ্বাস কর্‌বেন। বিশ্বাসের এতবড় উঁচু জায়গা আর কোথাও পাবেন না, অপূর্ব্ব বাবু। একটুখানি থামিয়া কহিলেন, আপনাকে ত আমি পূর্ব্বেই বলেচি, মেয়েদের ব্যাপার আমি বুঝতে পারিনে; কিন্তু সুমিত্রা যখন বলেন, জীবন-যাত্রার পথের পথ চলবার বাধাবন্ধহীন স্বাধীন অধিকার, তখন এ দাবীকে ত কোন যুক্তি দিয়েই ঠেকিয়ে রাখতে পারিনে। শুধুত মনোহরের নয়, বহুলোকের নির্দ্দিষ্ট পথে চলায় নবতারার জীবনটা নির্ব্বিঘ্ন হতো, এ আমি বুঝি, এবং যে পথটা সে নিজে বেছে নিলে সে পথটাও নিরাপদ নয়, কিন্তু নিজে বিপদের মাঝখানে ডুবে থেকে আমিই বা তাকে বিচার করবো কি দিয়ে বলুন? সুমিত্রা বলেন, এ জীবনটা নির্ব্বিঘ্নে কাটাতে পারাটাই কি মানুষের চরম কল্যাণ? মানুষের চিন্তাই তার কর্ম্মকে নিয়ন্ত্রিত করে, কিন্তু পরের নির্দ্ধারিত চিন্তা দিয়ে যখন কাজ তার নিজের স্বাধীন চিন্তার মুখ চেপে ধরে তখন তার চেয়ে বড় আত্মহত্যা মানুষের ত আর হতেই পারেনা! এর কথার ত কোন জবাব আমি খুঁজে পাইনে অপূর্ব্ব বাবু!

অপূর্ব্ব বলিল, কিন্তু সবাই যদি নিজের চিন্তার মত——

ডাক্তার বাধা দিয়া কহিলেন, অর্থাৎ সবাই যদি নিজের খেয়াল মত কাজ করতে চায়? বলিয়াই একটু মুচকিয়া হাসিয়া কহিলেন, তা'হলে কি কাণ্ড হয় আপনি সুমিত্রাকে একবার জিজ্ঞাসা করবেন।

অপূর্ব্ব তাহার প্রশ্নের ভুলটা বুঝিতে পারিয়া সলজ্জে সংশোধন করিতে যাইতেছিল, কিন্তু সময় হইল না। ডাক্তার পুনশ্চ বাধা দিয়া কহিলেন, কিন্তু তর্ক আর চলবেনা অপূর্ব্ব বাবু, আমরা এসে পড়েচি। আর একদিন না হয় এ আলোচনার শেষ করা যাবে।

অপূর্ব্ব সুমুখে চাহিয়া দেখিল, সেই লাল রঙের বিদ্যালয় গৃহ, এবং তাহার দ্বিতলে ভারতীর ঘর হইতে তখনও আলো দেখা যাইতেছে।

ডাক্তার ডাকিলেন, ভারতী!

ভারতী জানালায় মুখ বাহির করিয়া ব্যগ্রস্বরে কহিল, বিজয়ের সঙ্গে আপনার দে হয়েছে ডাক্তার বাবু? আপনাকে সে ডাক্‌তে গিয়েছে।

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, তোমাদের প্রেসিডেণ্টের আদেশ ত? কিন্তু কোন হুজুগে এত রাত্রে ও পথে কাউকে পাঠাতে পারবেনা। কিন্তু কাকে ফিরিয়ে এনেছি দেখেচ?

ভারতী ঠাওর করিয়া দেখিয়া অন্ধকারেও অপূর্ব্বকে চিনিতে পারিল। কহিল, আ করেন নি। আপনি কিন্তু শীঘ্র যান, নরহরি মদ খেয়ে তার হৈমর মাথায় কুড়ুল মেরে বাঁচে কি না সন্দেহ। সুমিত্রা দিদি সেখানেই গেছেন।

ডাক্তার কহিলেন, ভালই ত করেচে। মরে ত সে মরুক না! কিন্তু আমার অতিথি?

ভারতী বলিল, মেয়েদের প্রতি আপনার অসীম অনুগ্রহ। এটা কিন্তু হৈম না হয়ে হলে আপনি এতক্ষণ ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়তেন।

ডাক্তার কহিলেন, না হয় ঊর্দ্ধশ্বাসেই দৌড়চ্চি। কিন্তু অতিথি?

আমি যাচ্চি, বলিয়া, ভারতী আলো হাতে পরক্ষণেই নিচে আসিয়া দ্বার খুলিয়া দাঁড়া কহিল, বাস্তবিক আর দেরি করবেন না ডাক্তার বাবু যান্। কিন্তু, খৃষ্টানের আতিথ্য কি স্বীকার করবেন?

ডাক্তার মনে মনে একটু বিপদগ্রস্ত হইয়া কহিলেন, এঁকে ফেলে আমি যাই কি ভারতী? হাঁসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করনি কেন?

ভারতী রাগ করিয়া কহিল, যা করতে হয় করুন গে ডাক্তার বাবু, আপনার পায়ে আর দেরী করবেন না। আমার অনেক অভ্যাস আছে, ওঁকে আমি সাম্‌লাতে পারবো—আ দয়া করে একটু শীঘ্র যান্।

অপূর্ব্ব এতক্ষণ চুপ করিয়াই ছিল। কিন্তু, তাহার জন্য একটা লোক মারা ইহা ত কোন মতেই হইতে পারে না। সে কি একটা বলিতে গেল, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই দ্রুতবেগে অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপা

শিল্পির ক্রিয়াকাণ্ড

"পৃথক পৃথক ক্রিয়াভির্হি কলাভেদস্তু জায়তে"—(শুক্রাচার্য্য)। ক্রিয়ার ভেদে হল নানারূপ লা। কুমোর কাঠামোটায় যখন মাটি চাপিয়ে ক্রিয়া করে গেল, তখন হ'ল ঠাকুর গড়া, আবার স যখন চাকের উপরে মাটি চাপিয়ে গড়তে চল্লো তখন সে ক্রিয়ার ফলে হ'ল হাঁড়িকুড়ি; ধুনুরী াঁতের যন্ত্রে ঘা দিয়ে তুলো ধুনে চল্লো, সেই লোকই আবার আর একটা তাঁতের যন্ত্রে অন্য ক্রিয়া য় সুরের সৃষ্টি করলে! কামারের হাতুড়ি লোহাকে পিটে ঠিক করে দিলে ভাস্করের হাতুড়ি ৌর ক্রিয়া থেকে বার হয়ে এল অষ্টধাতুর এবং পাথরের দেবতা, মানুষ, হাতি, ঘোড়া, মন্দির, ঠ ইত্যাদির নানা সাজ সরঞ্জাম। ছবি লেখা হাতুড়ি চালানোর ফলে হয় না, কলম চালানো তুলি চালানোর ক্রিয়া জানা হ'ল তো ছবি হ'ল, আবার তুলি বুলিয়ে পাথর কাটা চল্লো না, সারিঙ্গী াজিয়ে তুলো ধোনা গেল না—যদিও কেউ কেউ সুর ধোনে বটে! ছবিটা লেখা,—তাই অন্য লেখার থে তার মিল লেখনীর দিকে। ছবি আঁকা দেখ তুলি দিয়েও চল্লো কলম দিয়েও হল, জাপানে ারা কবিতা লিখলে, রসিদ লিখলে এবং ছবিও লিখলে একই তুলিতে! এটা দেখছি যে কতক শিল্পকর্ম্ম বড় একটা যন্ত্রের খুঁটিনাটি অপেক্ষা না করেই সহজে সুনিষ্পন্ন হয়ে যায় আর কতক শিল্পকর্ম্ম যান্ত্রিকভাবে নিষ্পন্নই হতে চায়! শিল্পে যে উচ্চ নীচ ভেদ হয়েছে তা যান্ত্রিক ক্রিয়ার বাহুল্য ও তার অভাব নিয়ে। কুমোর তাঁতি এরা অনেকখানি যন্ত্রের ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে কায করে যায়—না করে তার উপায় নেই—কিন্তু পুতুল গড়বার বেলায় কুমোরের যে শুধু হাতেই নানান খেলেনা গড়ে চলে। ক্রিয়া যেখানে যন্ত্রের দ্বারায় না হলে হয়ই না সেখানে কর্ম্মটা কলে যেন জলের মতো নিষ্পন্ন হয়ে গেলেও তার যান্ত্রিকতা একেবারে সুস্পষ্ট বিদ্যমান থাকে, এর ঠিক উল্টো হয় উচ্চ অঙ্গের শিল্পে, ক্রিয়ার যান্ত্রিকতা সেখানে যেটুকু বা থাকে সেটা আন্তরিকতায় ঢাকা পড়ে যায়।

ক্রিয়ার বা Techniqueর কৃত্রিমতা ও অকৃত্রিমতা ভেদ নিয়ে কতক শিল্প পড়লো fine artsর কোঠায়, কতক শিল্প রইলো craftsর কোঠায়। মনের আনন্দে গলা ছেড়ে যখন গান গাওয়া, তখন সেটা Gramophoneএ কালোয়াতি গাওনার থেকে অনেকখানি বড় জিনিষ, আবার যখন গাইয়ে এক এক সময় নিজের গলাটাকে যন্ত্রের সঙ্গে এমন মিশিয়ে ফেল্লে যে নিজেই একটা Gramophone হয়ে উঠলো সে তখন artist রইলো না—technitian হল মাত্র। ক্রিয়া বা Techniqueকে ছাপিয়ে চলা হল সুন্দর চলা; অকৃত্রিমভাবের সব art বড় কম art নয়। নর্ত্তন ক্রিয়ার মধ্যে, অভিনয়ের মধ্যে, সচরাচর চলা বলার থেকে কোন বিষয়ে তফাৎ না করলে ভাল নাচ—ভাল অভিনয় হয় না, কিন্তু এই দুই কলারই মূলমন্ত্র

হ'ল অকৃত্রিমতা অর্থাৎ ক্রিয়ার যান্ত্রিকতা লুকিয়ে-চলা বলা। সব কর্ম্মের সঙ্গেই তার নিগূঢ়
প্রক্রিয়া রয়েছে। মনের মধ্যে যা রয়েছে নানা ক্রিয়া ধরে সেটা যতক্ষণ প্রকাশ না হচ্ছে তত
সে মনেই আছে বাইরে নেই। ব্যাকরণের অভিধানের নানা ক্রিয়া কর্ম্ম বিশেষ্য বিশেষণ
মাসিক পত্রে মস্ত একটা সমালোচনা বা প্রবন্ধ বার হল, তবেই জানলেন অমুক লোকটা অমুক
উপর চটেছে বা খুসি আছে, কি এ-লোকটা এই ভাবছে ও-লোকটা তাই ভাবছে।

ছবিতেও রং রেখার কতকগুলো ক্রিয়া ধরে তবে চিত্রকরের মনের কথা বার হয়ে এল
রেখার একরকম ক্রিয়া করা গেল—ছবিটা হল Landscape, অন্য প্রক্রিয়ায় হল—Portrait,
এক রকমে রং রেখার ক্রিয়া করলেম—সেটা হল – Caricature,—এক ক্রিয়ায় ছবি দেখে
কাঁদানো গেল, অন্য রকমে লোককে হাসানো গেল। তবে এটা দেখেছি artist যা করলে
উপর তার প্রতিক্রিয়া হলই না, কিম্বা উল্টো হল—যেখানে হাসা উচিত সেখানে হয়তো দর্শক
প্রদর্শকের ক্রিয়ার অপকর্ষ কিম্বা দর্শকের বুদ্ধির অভাবও এর কারণ হতে পারে। বিদ্যুৎ
করলে একটা মরা মাছও দেখেছি চম্‌কে উঠলো, কিন্তু এক টুকরো পাথর সে সাড়াই দিবে
সুতরাং পাত্রভেদে দর্শক শ্রোতা ও ভোক্তার উপরে কলাসমূহের প্রতিক্রিয়া এক এক
হয়ে থাকে, এখানে যে ক্রিয়া করছে তার কোন হাত নেই, তার দেখবার বিষয় হচ্ছে যে
করলে, তার উপযুক্ত ক্রিয়া সে আচরণ করলে কিনা, কর্ম্মের সুসম্পন্নতার দিকে চেয়েই
ক্রিয়া করে চলা, কর্ম্মটা কার ভাল লাগবে কি মন্দ লাগবে এ লক্ষ্য রেখে চলা যারা হুজুগে
করছে তাদেরই পক্ষে অত্যাবশ্যক ; কিন্তু ভিতরের তাগিদে যে মানুষ কর্ম্ম করছে তার লক্ষ্য
নয়—কর্ম্মের সুচারুতার দিকেই তার দৃষ্টি। অন্য কর্ম্মের কথা থাক, শিল্পকর্ম্মের যে নানা
তা কর্ম্মভেদে শিল্পিকে অভ্যাসের দ্বারা এবং পরীক্ষার পর পরীক্ষার দ্বারা দিনের পর দিন
দখল করতে হল। এসব জিনিষ হাতে কলমে করে শিখতে হল। শিল্পশাস্ত্র, ছন্দশাস্ত্র
সব নানা পুঁথি পড়ে গেলেই কেউ কারিগরিতে পাকা হল না, করার অভ্যাসই কারিগরকে
করে তুল্লে! পড়ার অভ্যাস শাস্ত্রপাঠে নিপুণ করে,—করার অভ্যাস কর্ম্মে দক্ষতা দেয়,—এটা
সত্যি কথা। যে কাযে যে যখন মজবুদ হতে চেয়েছে সে সেই কাযের নানা ক্রিয়া নিয়ে নাড়া
এমন কি খেলা করতে করতেও কর্ম্ম সম্পাদনে পাকা হয়েছে। শিল্পশাস্ত্র পড়ে শাস্ত্রী এবং
শাস্ত্রও না পড়ে লোকে শিল্পি হয়ে উঠলো এমন ঘটনা মানুষের ইতিহাসে বিরল নয়।
সৃষ্টি পুঁথির অক্ষর সৃষ্টি হবার পূর্ব্বে গুহাবাসী মানুষ যে সব ছবি লিখলে এখনকার অনেকে
করে হরিণ, মহিষ, বাঘ এসব আঁকতে একেবারেই পারে না বলতে চাইনে, শুধু এইটুকু
বিষয় হয় যে প্রাচীনতম যুগের মানুষের হাতে শিল্পশাস্ত্র ছিলনা, অথচ তারা ভারে ভারে
শিল্পসামগ্রী রেখে গেল পরবর্ত্তিকালের পণ্ডিতদের শিল্পশাস্ত্র লেখার কার্য্যের সুবিধার জন্য!
নিরক্ষর বর্ব্বরদের মূর্ত্তিশিল্প ভূষণশিল্প অতি আশ্চর্য্য ও মনোহর বলে এখন ইউরোপে

বড় শিল্পির কাছে। কিন্তু সেই সব বর্ব্বর জাতির মধ্যে থেকে লিখিত শিল্পশাস্ত্র একখানিও
ওয়া যায়নি তারা শিল্পক্রিয়া করে চলেছে মাত্র। মানুষের এই ক্রিয়াশীল নিরক্ষর অবস্থায় গড়া
নিষের থেকে পরবর্ত্তী কালের ভাষাবিদ্ কলাবিদ্ তারা বসে বসে আদিম শিল্পের একটা শাস্ত্র
ন করলে অলিখিতকে লিখিত-মধ্যে ধরলে এই ভাবেই সবকালে সবদেশে শিল্পশাস্ত্র দেখা
য়েছে। এখন আমাদের হাতে মূর্ত্তি-লক্ষণ, চিত্র-লক্ষণ, বাস্তুশাস্ত্র এমনি নানা পুঁথি যা পড়ছে
সেই সব শাস্ত্রের অনেকখানি অংশ যা গড়া হয়ে গেছে, যা আঁকা হয়ে যা লেখা হয়ে গেছে, গাওয়া
য়ে গেছে শাস্ত্র ছাড়া অবস্থায় মানুষের দ্বারা তারই লিখিত হিসেব শিল্পকর্ম্ম এল নানা ক্রিয়া ধরে,
লেখা হল সেই ক্রিয়ার লক্ষণাদি ধরে। ধর্ম্মপ্রচার পূজা ইত্যাদি সুবিধার জন্য শাস্ত্রের
নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা মতো ক্রিয়া করে মানুষ সে যুগে প্রতিমা তাদের বাহন তাদের স্থাপন করতে
যেমনটি গড়ছে সেটা অনেক পরের কথা, তার অনেক আগে মানুষ হাত তৈরি করেছে পাথর কেটে
গড়া লাইন টেনে আঁকার প্রক্রিয়ায়। শিল্পব্রত আচরণ করতে অনেক পাকা হয়ে উঠেছে মানুষ
যখন তখন দেখি তার হাতের কৌশল পায়ের কৌশল এমন কি তার শিল্প বুদ্ধিও স্বইচ্ছায় বা
অনিচ্ছায় সে লাগিয়েছে—শাস্ত্র মতো ধর্ম্মবিশেষের নয় তো রাজা-বাদশার তাঁবেদারিতে;
ধর্ম্মপ্রচারের ইতিহাস দেখায়—আমাদের মূর্ত্তিশিল্প কেমন করে এক ধর্ম্মের থেকে আর এক ধর্ম্মের
সম্পর্কে এসে রূপ বদলে নিচ্ছে এবং আস্তে আস্তে ধর্ম্মপ্রচারের পথ ধরে বিদেশের দিকে অগ্রসর
হচ্ছে এবং সেখানকার মূর্ত্তিশিল্পের সঙ্গে বোঝাপড়া অদল বদল ক্রিয়া ধরে নতুন নতুন সমস্ত
রূপের সৃজন করছে। বৌদ্ধদেব ত্রয়স্ত্রিংশ লোকের অধিবাসীরা হিন্দুদের তেত্রিশকোটীতে
এসে পরিণত হল, কিভাবে নানা লৌকিক দেবদেবী এসে ঢুকে পড়লো দেশবিদেশ থেকে ভারতীয়
দেব সভায়—সে এক বিচিত্র মহাভারতের বিচিত্র ইতিহাস। আবার দিক-বিজয়ের দিক দিয়ে
নানা দেশে লোক শিল্প সমস্তের যাতায়াত ও শিল্পক্রিয়া প্রক্রিয়ার আদান প্রদান, তারও ইতিহাস
বড় ছোটখাটো নয়! আমাদের শিল্প ব্যাপারে এই আমদানি রপ্তানির খাতা পুরো লেখা হয়নি
এখনো। শিল্পশাস্ত্র বলে যে সব পুঁথি রয়েছে আমাদের তার মধ্যে থেকে একটু একটু আভাস
পাই মূর্ত্তিশিল্পকে কেমন করে এক ধর্ম্ম থেকে জোর করে আর এক ধর্ম্মের দাসত্বের কাযে লাগানো
হচ্ছে—"সলক্ষণং মর্ত্ত্যবিস্বম্ নহি শ্রেয়স্করম্ সদা"—শিল্পশাস্ত্রের একথা থেকে বেশ বোঝা যায়—
সুলক্ষণযুক্ত বুদ্ধমূর্ত্তিকে চিরকালের মতো চেপে দিতে চেষ্টা হচ্ছে এবং অন্য দেবতার ধ্যান বুদ্ধের
ঘাড়ে উড়িয়ে লেখা হচ্ছে। এইভাবে ধর্ম্মের ঘাত প্রতিঘাত বিজিত ও বিজেতার ঘাত প্রতিঘাত
দেশ বিদেশের সংমিশ্রণে ভারতশিল্পের ক্রিয়া প্রক্রিয়া যেভাবে হয়ে চলেছে তার ইতিহাস
মূলের উপরে ছাপ রেখে গেছে আপনার।

ক্রিয়া ধরেই মানুষ বড় হয়েছে—নতুন নতুন সত্য আবিষ্কার করেছে এবং
চলেছে এখনো, সেই সব পরীক্ষার হিসেব পুঁথির আকারে সময়ে সময়ে

ধরে রাখতে চেয়ে লিখিয়ে তাঁরা লিখলেন পুঁথি. যেগুলো সংগ্রহ মাত্র Encyclop
বা Catalogue—সুতরাং পুঁথি যে লেখা হয়ে চুকেছে এমন কথা বলা যায় না, অবশ্য
কথা যা এখনকার তা আজ থেকে শত শত বৎসরের পুরোনো পুঁথিতে থাকতে পারে না,
ধরণের লেখাকে শিল্পশাস্ত্র কি আর কোন শাস্ত্র বলে নাম দেওয়াই ভুল। Encyclopedia
Gospel বলে ধরার মতো কায। সব জাতেরই মধ্যে ধর্ম্মশাস্ত্র এবং সেই সব ধর্ম্মশাস্ত্রে
নিত্য ক্রিয়া-পদ্ধতি রয়েছে; কিন্তু সেই সব ক্রিয়া যথালিখিত পালন করে কেউ ইন্দ্রত্ব
পেলে, কি কারু জন্যে সেণ্ট-পিটার স্বর্গের চাবি সহজে খুলে দিলে বা হুরীরা বেহেস্তের দ্বারে
করলে কিনা এটা পরীক্ষা করে প্রমাণ করার উপায় নেই; কিন্তু শিল্প সঙ্গীত ইত্যাদি নানা
ক্রিয়াপদ্ধতি হাতে কলমে পরীক্ষা করে ফলাফল জানবার উপায় আছে,—তাতে করে দেখা যায়
মানুষের অনেক অসম্পূর্ণ পরীক্ষার হিসেবে এই সব তথাকথিত শিল্পশাস্ত্রের অনেক অংশ
এবং সেভাবে ক্রিয়া করে চলে মানুষ—যে ফল পাওয়া উচিত তা পায় না। আবার দেখি যে
পরীক্ষা রং রেখা সুরসার ছন্দোবন্ধ ইত্যাদি নিয়ে মানুষ অনেককাল আগে সম্পূর্ণ করে
তারও সমস্ত প্রক্রিয়ার হিসেব নানা শাস্ত্রে ধরা রয়েছে, যথাযথভাবে সেই সব ক্রিয়া পালন
চলে পুরোপুরি ফলও পাচ্ছে তখনকার মতো এখনকার কর্ম্মীরাও।

যে সব ক্রিয়া সুপরীক্ষিত না হয়েই শাস্ত্রের পুঁথিগুলোতে ধরা গেছে তার বিষয়ে
মেঘমল্লার গেয়ে জল আগুনের ক্রিয়া দৃষ্টান্তস্বরূপে ধরা যেতে পারে। কতকগুলো ক্রিয়া
বৃষ্টি আনা যেতে পারে এই বিশ্বাসে খুব আদিম যুগে মানুষ পরীক্ষা সুরু করলে,—ধারা
থাকলো—সাত তারা আঁকা জলের কলসী ফুটো করে করে আকাশ ফুটো করার রূপক ধরে
ক্রিয়া—এই ভাবে পরীক্ষা চল্লো কত কাল এবং মেয়েদের মধ্যে এখনো চলছে!
সুরু হল নতুন পরীক্ষা, যজ্ঞ ক্রিয়ার দ্বারা ইন্দ্রকে খুসি করে জল আদায় এবং মেঘমল্লার
বাদল আনা। এই সব পরীক্ষার ক্রিয়া-কাণ্ডের হিসেব ভালমন্দ নির্ব্বিশেষে শাস্ত্রের মধ্যে
একটা সময়ে ধরা হয়ে গেল এবং সেই শাস্ত্রনির্দ্দেশমত মানুষ ক্রিয়া করে চল্লো, পরীক্ষা
সফলতার দিকেও গেল না, অথচ শাস্ত্রেও এই এই ক্রিয়াতে জল হল না বা মেঘ এলনা
লেখা রইলো না; কতক মানুষ অসম্পূর্ণ প্রাচীন প্রথা ধরে ক্রিয়া করে চল্লো, কিন্তু সত্যি
কাযের মানুষ যারা তারা ক্রিয়া করেই চল্লো জল মেঘ আনার জন্যে সঙ্গীত শাস্ত্র যজন ক্রি
মেয়েলী শাস্ত্রের অলিখিত ও লিখিত ক্রিয়ার থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন রাস্তা ধরে। অমজান,
নিয়ে নতুন নতুন পরীক্ষা থেকে ক্রিয়া সুরু হয়ে এই অল্পদিন হল সেই আদিম যুগের
ফুটো করে জল বর্ষানোর যে চিন্তা, তারা সঙ্গে গিয়ে মিল্লো। ক্রিয়াবান মানুষ নতুন
দ্বারা বালুকণাকে তড়িৎ সঞ্চারে শক্তিমান করে সত্যিই আকাশ ফুটো করে বৃষ্টি বর্ষা
পুরাণ যুগের পরীক্ষা আর আজকের যুগের পরীক্ষার মধ্যে মানুষের ভাবনা ও কামনার

স্পষ্ট হলেও দেখছি পুরাণো প্রক্রিয়াটা ব্যর্থ হয়েছে এবং নতুন ক্রিয়া তার নতুনত্ব নিয়ে
তবেই সার্থকতা পেতে চলেছে। ক্রিয়াবান অতি প্রাচীন এবং ক্রিয়াবান অত্যন্ত নবীন—দুয়ের
ক্রিয়ার উপকরণ প্রকরণ, এমন কি ধ্যানটাও, একদিকে মিল্লো একদিকে মিল্লোও না।
খাবার দীপক গেয়ে গেয়ে বহুকাল ধরে গলা চিরেও কালোয়াৎ তার শাস্ত্রের বচনের সত্যতা
প্রমাণ করতে পারেনি, কিন্তু গান বাজনার দিক দিয়েও গেল না, অথচ কারিগর মানুষ তারা নতুন
ক্রিয়া নতুন পন্থা ধরে তারে ও বিনা তারে আগুন জ্বালিয়ে চলেছে আমাদের চোখের সামনে, শাস্ত্রমতো
ক্রিয়া সঙ্গীত প্রকরণ ইত্যাদির দরকারই বোধ করছে না তারা এবং ওই সব শাস্ত্রমতো
ক্রিয়া হলো না বলে তাদের ক্রিয়া যে ব্যর্থ হচ্ছে তাও নয়। ক্রিয়াবান মানুষের শিল্প নানা
ক্রিয়া ধরে যেমন যেমন এগিয়ে চলেছে তারি অনুসরণ করে শিল্পশাস্ত্রকার তেমনি তেমনি হিসেবের
খাতা লিখে চলেছে। পণ্ডিত শিল্পশাস্ত্র লিখে পড়িয়ে চল্লেন, শিল্পি তারি উপদেশ অনুসারে যখন
পড়তে ও লিখতে আরম্ভ করেছে সে কালটা আজ থেকে খুব দূরে নয়; কিন্তু এই টোলের পড়া
বিদ্যে থেকে অনেক দূরে সেই কালটা যখন নানা অনুপদিষ্ট উপায় ও ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ক্রিয়ারান
তারা সম্পূর্ণ করে তুলছেন কাজ, কিম্বা অসমাপ্ত অবস্থায় ফেলে রেখে নতুন পরীক্ষায় অগ্রসর
হচ্ছেন। ক্রিয়া থেকে নানা কলার উৎপত্তি হয়ে চলেছে যখন সেই সময়ে ক্রিয়ার সার্থকতার উপরে
মানুষের জীবন যাত্রার অনেকখানি নির্ভর করতো। কর্ষণ ক্রিয়া, হনন ক্রিয়া থেকে হাঁড়িকুড়ি
অস্ত্র শস্ত্র কাপড় চোপড় সমস্তই করে তুলতে হতো কাযে হাত পাকিয়ে, করে শিখতো, পড়ে শিখতো
না; দেখে শিখতো, ঠেকে শিখতো নিজেরা! পরের দেখা পরের শোনা নিয়ে কাযের মনুষ্য
হয়ে উঠা, কিম্বা পড়ে পাশ করা এখন হয়েছে। তখন ক্রিয়া করে কাযের মানুষ হতো, বই
মুখস্থো করে নয়; কাযেই তখন শাস্ত্র ছিল না। এখন পড়ার যুগে পুঁথির দরকার হয়ে পড়লো;
নানা কাজের নানা manual বা ক্রিয়া পদ্ধতির পরে পরে রচনা হতে থাকলো।

শিল্পের ইতিহাসে আদি কথা শিল্প ক্রিয়ার দ্বারা মানুষ শিল্পের নানা দিকের নানা সন্ধান
করে চলেছে ভাঙ্‌তে গড়তে, মধ্য যুগের কথা নানা শাস্ত্রে নানা কথার সঙ্গে শিল্পের কথাও মানুষ
লিখতে পারছে লিখে লিখে সংগ্রহ করছে এবং খুব আধুনিক কথা হচ্ছে যখন রাজাদের সভায়
রসজ্ঞ এবং কবি ও শিল্পি দুজনেই এসে পড়েছে এবং বিশেষ বিশেষ কলার উন্নতির বা অবনতির
বিচার হচ্ছে লোকমতের গতি বশে। শিল্পির অভিমতের উপরে এই সময় শাস্ত্রমত
কতকটা প্রাধান্য লাভ করে এই ভাল এই মন্দ এমনি একটা করে গণ্ডি দিলে এবং শিল্পের ক্রম-
বিকাশ বিচিত্র গতি বন্ধ হয়ে জড়তা উপস্থিত হল শিল্পের ধারায়—এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ সব
দেশের সব শিল্পের মধ্যে কিছু কিছু বর্ত্তমান আছে। যে মূর্ত্তি গড়বে সে একই ছাঁদে একই
ভঙ্গীতে মূর্ত্তি গড়ে চল্লো, পুরুষানুক্রমে একই জিনিষে বুদ্ধিবৃত্তি চালিত হতে হতে শিল্পিরা এ
বিষয়ে একটা অত্যাশ্চর্য্য দক্ষতা পেলে এক এক কলায়। কিন্তু এ ভাবেতো জগৎ চলে না—

স্থিরতা সেখানে নাই, যাদের জন্যে বহুকাল ধরে শিল্পি হাত পাকালে কাযে, তারা কোথায় চ
গেল, তার জায়গায় হঠাৎ নবাব শাস্ত্রঘাঁটা রসিক এবং পুঁথি ধরে ব্যবস্থা এল দেশে, তখন কল্পি
গণেশ বন্দনা এবং রাজ প্রশস্তি এই দুই জাঁতিকলের মধ্যে পেষা হয়ে শুক্‌নো ছাতু হয়ে গে
এমন যে, মানুষের কাজে এল না—সরস্বতী পোকার পেট ভরাবার কাজেই লাগলো;
ছবি মূর্ত্তি এরাও রইলো নোড়ানুড়ি চুণ সুরকীর কায করে দেবায়তন রাজ প্রাসাদ এমনি সব বড় ব
কারাগারের প্রকাণ্ড প্রাকার খাড়া করে তুলতে এবং রসের শতমুখি ধারার ক্রিয়া ও ক্রীড়ার মু
ভীষণ শক্ত বাঁধ বাঁধতে। এই নিরেট বাঁধ যদি কোন গতিকে ভাঙলো তো রস আবার ঘু
নয়তো নিষ্ক্রিয় শিল্প কুণ্ডের জলের মতো কিছুদিন থাকলো এবং অবশেষে একদিন শুকিয়ে গে
কেবল বাঁধগুলো পড়ে রইলো একফোঁটা রসের শোচনীয় অবসানের সাক্ষী দিয়ে।

দেশের বিদেশের কলাবিদ্যাসমূহের এমন এক একটা সঙ্কটাপন্ন অবস্থার দেখা পাওয়া যাচ্ছে—যখন কারিগর বেঁচে আছে কিন্তু art কোথাও নাই দেশে। Artর দিক দিয়ে অমূল্য ক্ষেত্রে খরার দিনের মধ্যে দিয়ে চলা কোন জাতিই এড়াতে পারেনি। এই রসহীনতার যু ক্রিয়া করে চলার শ্রান্তি সব জাতির সব আর্টিষ্টদের কাযের উপরে সুস্পষ্ট ছাপ রেখে গে দেখতে পাই, আরো দেখি যখন আর্ট বর্ত্তমান নেই, জাতির মধ্যে তখনই জাগছে তার প্রাণে যা তার জন্যে বেদনা এবং যা আসার সম্ভব ভবিষ্যতে তার জন্যে বিষম তৃষ্ণা! যারা ক্রিয়াবান ভূত ভবিষ্যত এবং বর্ত্তমান তিনের মধ্যে দিয়ে ক্রিয়া করে চলে, যারা কিন্তু কিছু করতেও চায় তারা হয় ভূত নয় ভবিষ্যৎ এমনি একটা কিছুতে গ্রস্ত হয়ে নতুন এল নতুন এল, পুরোনো কেউ জায়গা আটকে বসলো না কিন্তু নতুনকে বড় হবার অগ্রসর করে দিলে—এইটেই হল স্বভাবের নিয়ম, এ যেন কত কালের আসবাব আবর্জ্জনার পুরোনো বাড়িতে নতুন ছেলেরা জন্ম নিয়ে ক্রীড়া সুরু করে দিলে। সে কালের খেলানা এ ছেলের খেলাবার কাজে এল—ছেলে ভাঙ্‌লে অনেক জিনিষ কিন্তু এই ভাঙ্গা চোরার মধ্যে ক্রিয়া ও ক্রীড়া সুরু হয়ে গেল। পুরোনোর কোলে নতুনের লীলা এটা প্রাচীন গম্ভীর না পছন্দের ব্যাপার, কেননা একালটাকেও সেকাল হিসেবে না দেখতে পেলে তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ব্যাঘাত ঘটে, চারিদিকের বাঁধা দস্তুরের মধ্যে ওলট পালট অশান্তি এনে অসোয়াস্তির সীমা থাকে না, এইজন্যে নতুনের ক্রিয়ার সঙ্গে পুরাতনের ক্রিয়ার কোন একটা সংঘাত বাধে এবং হঠাৎ যদি সেকালে মূল্যবান অথচ একালে একেবারেই অকেজো কিছু জিনিষ নতুন মানুষ, খেলার মুখে ভেঙ্গে চুরমার করে দেয় তবে পুরাতনের কাছে সে গালাগালি খেয়ে মরে। কিন্তু ক্রিয়া এবং ক্রীড়া দুয়েরই একটা লক্ষণ হল নড়াচড়া ও সে ভেঙ্গে গড়ে—ঠিক যে ভাবে গতিহীন সোজা দাঁড়িকে গতি দেয় artist—ভঙ্গি বা ভ নতুন জাতির জীবন তার সমস্ত ক্রিয়াপ্রবণতা ও ক্রীড়াশীলতা এই ভাবে নিয়োগ করে

ছেলে ক্রিয়াশীল ক্রীড়াশীল করে তুলতে। যারা এত বড় যে শাস্ত্রের নিষেধ বিধির উপরে চলে গেছে এবং যারা এত ছোট যে শাস্ত্রের বাইরে পড়ে গেছে—এদের দুজনের জন্যেই শাস্ত্র নয়, যারা মাঝারি রকম মানুষ কেবল তাদেরই জন্যে শাস্ত্র। এই শাস্ত্র ধরে গড়ে চলে তারা ভাল জিনিষের অনুকরণ করে ক্রমে হয় তো পাকা হয়ে উঠবে—এইজন্যেই শিল্পের আইনবাঁধা ক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে মানুষ, ভবিষ্যতের ক্রমবিকাশের পথে কাঁটার বেড়া হিসেবে শাস্ত্র গড়া হয় নি। ধর্ম্মশাস্ত্র, শিল্পশাস্ত্র, সঙ্গীত, অলঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্র কারো কাঁটারোপণ কাজ নয়, চলার পথ নিষ্কণ্টক ও সহজ করে দিতেই শিল্পশাস্ত্রের সৃষ্টি! যে কিছু জানে না তাকে জানার পথে অগ্রসর করে দেওয়াই শাস্ত্রের কর্ম্ম। শাস্ত্রের একটা মানে যদিও শাসনে রাখা বোঝায়, তবু শাসনের প্রয়োগ স্থান কাল পাত্র ভেদে রকম রকম না হলে মানুষ শাসনের বিরুদ্ধ আচরণ করবেই—শাস্ত্রকারেরা এ কথা যে ভাবেননি তা নয়, অন্য শাস্ত্রের ফাঁকি কোথায় কি তা আমি জানিনে, শিল্পশাস্ত্রের শাসনে অনেক খানি ফাঁক আছে—"লেখ্যালেপ্যা সৈকতী চ মৃন্ময়ী পৈষ্টিকি তথা, এতাষাং লক্ষণাভাবে ন কৈশ্চিৎ দোষ ঈরিতঃ।"

প্রাচীন শিল্পশাস্ত্রের শাসন এখন যদি মানতে হয় তো যেমনটি লেখা আছে তেমনি ভাবেই এখনকার গাইয়ে বাজিয়ে কাব্যকার চিত্রকার সবাইকে ক্রিয়া করে চলে যেতে হয় প্রাচীন পথে, নতুন কিছু করার উপায় নেই। বর্ত্তমানকে উজান বইয়ে অতীতের দিকে নিয়ে অতীতের মধ্যে কি ছিল তা জেনে চলা হল শিল্পির শিক্ষার একটা দিক, তার পরে হল বর্ত্তমানে চারিদিকে দেশে বিদেশে কোথায় কি রয়েছে জেনে নেওয়া বা যাকে বলি পরখ করে গ্রহণ করে চলা, তারপরে হল ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে ক্রিয়া করে চলা নিজের প্রথামতো, আসল কথা চলা নিজেই চালানো চাই না হলেই মুস্কিল। ঠিক যে ভাবে প্রপৌত্র তার প্রপিতামহের কতক এবং ভবিষ্যৎ বংশাবলীর খানিক জড়িয়ে নিয়ে চলে এইভাবে চলা হল শিল্পই বল আর যে কাজই তার স্বাভাবিক গতি। এক কালের নতুন সে খানিকটা ক্রিয়া চক্র চালিয়ে থামলো আর নতুন সেখান থেকে ক্রিয়া সুরু করলে এবং অন্য নতুনের হাতে কায দিয়ে ক্ষান্ত হল, ভাবে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের মধ্যে ক্রিয়া-প্রবাহ চল্লো অবিচ্ছিন্নভাবে। গঙ্গার ধারায় কোথাও চড়া পড়লো না তবেই ধারা মরতে পেলে না কোথাও দুর্গম হল না আবিল হল না এক সময়ে দেবমূর্ত্তির একটা বাজার সৃষ্টি হয়েছিল এদেশে তার প্রধান উদ্দেশ্য প্রচার শিল্প কর্ম্মের প্রসার ছিল গৌণ সুতরাং সেই কাজের উপযোগী মূর্ত্তির মান প্রমাণ দিয়ে শাস্ত্র বাঁধা হয়েছিল এবং ভারতবর্ষের মূর্ত্তি শিল্প ধ্যান যোগের সম্পূর্ণ সিদ্ধির ধরে একটা যে ছাপ পেলে সেটা সাময়িক ছাপ এবং বাঁধা দস্তুরের ক্রিয়ার ছাপ। চীন এক সময়ে মানুষের পা এইভাবে কড়া হুকুমে খুব ছোট করে তার স্বাভাবিক বাড় নষ্ট দেওয়া হয়েছিল। চীনের সৌন্দর্য্য শাস্ত্রে এবং আমাদের এখনকার তথা কথিত বিপশ্চিতাম্

মতনের মধ্যে তয়ঙ্কর রকমের একটা মিল রয়েছে জীবন্ত জিনিষকে স্বাভাবিক বাড় থেকে
করে শাসনের বলে একটা কৃত্রিম রূপ দেওয়া, কিন্তু চীনের শাসন ও সেকালে শিল্পশাস্ত্রের শা
এই দুয়ের মধ্যে নিয়মের চাপের কসনের ইতর বিশেষ হওয়ার দরুণ আমাদের মূর্ত্তি শিল্প এ
সুন্দর ছাঁদ পেলে চীনের পদপল্লব বেঁকে চুরে একটা বীভৎস রূপ ধরলে। শাস্ত্রের নিয়ম মে
স্বভাবের নিয়ম ধরে বাঁধা সেখানে সে অনেকখানি বিস্তার দিলে শিল্পের গতিবিধিকে অব্যাহত
চলতে কিন্তু স্বভাবকে অতিক্রম করে যেখানে কঠোর নিয়ম গড়া হল সেখানে কৃত্রিমের এ
কদর্য্যতাই গড়ে উঠলো। দেবমূর্ত্তির ব্যবসা খুলতে যখন নানা আইনে শিল্পিদের বাঁধ
পরাণো হয়েছিল ভারতবর্ষের মূর্ত্তিশিল্প তখন একদিকে যেমন এক বিষয়ে প্রাচুর্য্যলাভ ক
অন্য দিকে তেমনিই খোঁড়া হয়ে রইলো, কেবল ঠাকুর গড়তেই পাকা হল মানুষ এবং তাও
দাঁড়ালো গিয়ে পুথির লেখা মাপযোপে ঠিকঠাক কলেকোঁদা ঠাকুরে—যার মধ্যে দেবচক্ষু
সবই থাকলো অমরত্বটুকু ছাড়া, পাথরের কাযে পরলোকের অবিচিত্র ছায়াই পড়লো ইহলো
বিচিত্রতা নয় এবং আমাদের দেশে সব পাথরগুলো অবস্তু হয়ে উঠলো একটাও বস্তু রইলে
শিল্পের হিসেবে এটা একেবারেই ভাল নয়, এই দুর্দ্দৈব শিল্পে আসবেই কড়া আইন হলে এ
শাস্ত্রকারেরা দেখে ছিলেন, তাই তাঁরা শিল্পসম্বন্ধে আইনের বজ্র আঁটুনির মাঝে নানান ফ
রেখে গেলেন যার গুণে শিল্পের বাঁধা গতি সব বাঁধা জিনিষের দুর্গতির থেকে
গেল। ভারতবর্ষের বাইরে নানা ধর্ম্ম নানাকালে শাস্ত্রীয় মূর্ত্তি সমস্তের রচনা পদ্ধতি
শিল্পি ও শিল্পকে বেঁধেছে অনেক স্থানে। এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে
শিল্প একটা দেবমূর্ত্তির বৈরূপ্যমাত্র হয়ে উঠেছে, আমাদের মূর্ত্তিশিল্প যে এ দুর্গতি
বেঁচে গেছে তার একটা কারণ শিল্প রচনারও ভার একদল নিরক্ষর artistর হাতে ছিল,
ক্রিয়াবান এবং জোর করে তাদের শাস্ত্র গেলানো হয় নি। এদেশে এখনো পাকা
পাবে কিন্তু তাদের মধ্যে শিল্পশাস্ত্রজ্ঞানে একেবারে পাকা এমন লোক একজনও আছে
সন্দেহ, শিল্পশাস্ত্রের শাসন কি তারা অনেকেই জানে না অথচ দিব্বি গড়ে চলেছে পুরুষ
সঞ্চিত এবং অর্জ্জিত শিল্প-জ্ঞান নিয়ে নানা বস্তু! এদেশে শিল্পশাস্ত্র যা পাওয়া যাচ্ছে
রাজারাজড়ার পুস্তকাগারে নয়তো পণ্ডিতদের ঘরে, শাস্ত্রে অপণ্ডিত কিন্তু শিল্প
সম্পূর্ণ পারগ শিল্পিদের ঘর থেকে বার হচ্ছে প্রাচীন মূর্ত্তি, পুরোনো ছবি এমনি কত
সামগ্রী শাস্ত্রের পুঁথি কচিৎ পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং শাস্ত্র যে খুব একটা বড় জায়গা
শিল্পিদের ঘরে তা বোধ হয় না, শুধু সিন্দূরচন্দনে পূজা পেয়েছিল। শোনা শাস্ত্র
এবং বংশানুক্রমে ক্রিয়া করে দখল করা কলাবিদ্যা অনেকখানি, এই নিয়ে ভারত বি
উঠেছে এটা দুঃখের কারণ নয় সুখেরই বিষয় বলতে হয়। শাস্ত্রের চাপ ভয়ঙ্কর যে
তা থেকে বেঁচে গেছে এদেশের শিল্পিরা কাজের দিক দিয়ে শুধু তারা নিরক্ষর

এখন আমরা, যারা পড়েশুনে পাকা হয়ে শিল্প, ক্রিয়া করতে চলেছি সেকাল যদি হঠাৎ একালে
ফিরে আসে তবে শাস্ত্রের চাপন আমাদের উপরে অনিবার্য্য, কিন্তু এক বিষয়ে আমরা নির্ভয়,—স্বভাবের
নিয়মে সেকাল একালের ত্রিসীমানায় আসতে পারে না, এলেও সজীব একালের পৃথিবীতে
গত জীবন সেকালটা যদি ভূতের উপদ্রব বাধায় তো একাল সেটা সইতে নারাজ হবেই একদিন।
সেকালের সঙ্গে একালের শিল্পের যোগ শিল্পশাস্ত্র পড়াশুনার দিক দিয়ে সেরূপটা হওয়া স্বাভাবিক
তাই হবে এইটেই আমার ধারণা। বৌদ্ধ যুগে এবং তারপরেও দেখা যায় ধর্ম্মে শ্রদ্ধাবান শিল্প
শাস্ত্রে পণ্ডিত এবং শিল্প ক্রিয়াতেও নিপুণ ধর্ম্ম-যাজকগণ ভারতবর্ষের বাইরে
নানা ম্লেচ্ছ জাতির মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার সেই সঙ্গে শিল্পপ্রচারও করে চলেছেন, ধর্ম্মের
অনুশাসন তাঁরা স্থানে স্থানে কঠিনভাবে প্রয়োগ করছেন সেই সব অনুষ্ঠাতৃগণের
উপরে কিন্তু শিল্পশাস্ত্রের নিয়মগুলো ঢিলে করে দিচ্ছেন, দেশে দেশে শিল্পের দেশীয়তার সঙ্গে
শাস্ত্রমতো বিশুদ্ধ শিল্পের মিশ্রণ ঘটাচ্ছেন—কোন বাধা দিচ্ছেন না সে পথে! সে কালের তাঁরা পণ্ডিত
ছিলেন শাস্ত্রে ও শিল্পে কাযেই কালে কালে দেশে দেশে একই শিল্পের পুনরাবৃত্তি যে একেবারেই
দোষ, বিচিত্রতাই যে শিল্পের মূল কথা সেটা তাঁরা ভালরকমই জানতেন। একালের ইউরোপীয়
শিল্পের নিয়ম ও লক্ষণাদির সঙ্গে আমাদের art studentদের যখন মিলন হল তখন নিজের
শিল্পের জ্ঞান ছিলই না তাদের মধ্যে, সুতরাং ইউরোপের শিল্প imposed হতে চল্লো এদেশে,
মিলন সার্থক হল না, শোভন হল না! তেমনি সে কালের শিল্পশাস্ত্রের বিধিব্যবস্থা যদি একালে
imposed হয় তবে সে কাযটা অশোভনতা এবং কৃত্রিমতারই সৃষ্টি করবে। এরূপ imposition
বিরুদ্ধে আমাদের রাজনৈতিক এবং সামাজিক দিকটায় অনেক যুদ্ধ চলেছে চলছে সুতরাং শিল্পেও সে
কালে একালে সে স্বাভাবিক যোগ না ঘটিয়ে imposition ঘটালে বিপত্তির সম্ভাবনা সব দিকেই দেখতে
পাচ্ছি। প্রাচীন ভারত-শিল্প শিল্পশাস্ত্র সমস্তই আমাদের এবং সেটা খুব বড় বলে যতই মনে
করি না, সিন্ধবাদের বুড়োর মতো কেবল তাকেই ঘাড়ে করে বইতে নতুন ভারতে আমরা সবাই
এলেম—কবি, শিল্পি, গায়ক, বাদক এমনকি পণ্ডিতেরাও—এটা ভাবাই স্বাভাবিক অবস্থার কাজ নয়।
সেকাল একালের মধ্যে মিলে নবীনতার সৃজন করবে গাছের পুরোনো বীচটা নতুন জীবনী
রসে মিলে নতুন বীজের মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করে যে ভাবে সেইভাবে সেকাল এগিয়ে
চলবে একালের ক্রিয়ার ছন্দ ধরে ভবিষ্যৎ কালের সফলতার দিকে, এ না হলেই বিপদ, গাছটা
তার পুরোনো বীজের খোলার মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়লো কিম্বা পুরোনো বীজ আপনাকে
গাছের ছাঁদে মেলাতে না চেয়ে গাছের ঘাড় মটকে মাটির মধ্যে টেনে নিয়ে চল্লো
দুজনেই আপনার মৃত্যু ডেকে আনলে! শিল্পের গতি কালে কালে নতুন নতুন শিল্পির
মতি ধরে চলেছে, কোনো এক কালের বা এক শাস্ত্রের মত ধরে চলে নি চলতে
পারেওনা। শিল্প শাস্ত্রমতো গড়ে সে কালে তারা ভাল গড়েছে সুতরাং আমরা একালেও

সেই প্রাচীন মত ধরে গড়লে ভালই গড়বো এই কথাই স্থির জেনে যদিই বা ক্রিয়া করে চলি তবে সে কালের অনুকরণের কায ছাড়া কিছু বেশী গড়বো বলে মনে তো হয় না! আমাদের একালের তথাকথিত কালোয়াৎ তারা এটা প্রমাণ করছে। একালের শিক্ষা সমস্যায় সে কালের টোলের পণ্ডিতের ব্যবস্থার কতকটা স্থান আছে সত্যি কিন্তু টোলের শিক্ষা ব্যবস্থা ও কায চালানোর ধারাকে একালের শিক্ষা সমস্যার সবখানি মেটাতে দিলে টোলও বিপদে পড়বে বিশ্ববিদ্যালয়ও বিপদে পড়বে। আজ আমরা ঠিক শাস্ত্রমতো যদি কেউ মূর্ত্তি গড়া শিখতে চাই তবে কিছু কাল আমাদের মূর্ত্তি গড়া থেকে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হবে; কেননা শাস্ত্রে লিখছে—রাজা গেছে পণ্ডিতের কাছে মূর্ত্তি গড়বার উপদেশ নিতে। রাজা বল্লেন—মূর্ত্তি গড়ার উপদেশ করুন! পণ্ডিত বল্লেন—চিত্র সূত্র থেকে ছবি আঁকার সম্বন্ধে আগে জান তো বুঝবে চিত্র কল্লে মূর্ত্তি গড়ার উপদেশ যা আছে! রাজা চিত্র সূত্রই আগে জানতে চাইলেন। পণ্ডিত তখন গম্ভীর হয়ে বল্লেন নৃত্য সূত্র না জানলে চিত্র সূত্র জানাই হবে না। রাজা নিরুপায় নৃত্য সূত্রই মঞ্জুর করলেন। পণ্ডিত আরো গম্ভীর হয়ে বল্লেন বাদনসূত্র না জানলে নৃত্য সূত্রের সেইটা ধরাই যাবে না। রাজা বল্লেন—তবে বাদনই চলুক, তখন পণ্ডিত গায়নের কথা তুল্লেন। ঠিকঠাক শাস্ত্রমতো মূর্ত্তিগড়া শিখতে হলে গান থেকে আরম্ভ করে বাজনা, নাচ, ছবি আঁকা ও শেষ মূর্ত্তি গড়াতে গিয়ে তারপর পাকা হতে হবে কাযে! আমাদের দেশে যেমন শিল্প শাস্ত্রকার তেমনি ইয়োরোপেও Silruvius একখানা বস্তুশাস্ত্র লিখেছেন বহুদিন আগে, দেউলী হতে হলে মানুষটাকে কি কি বিষয়ে হওয়া পাকা চাই তার তালিকা দিলেন—a knowledge of letters, of drawing, of Geometry, of Arithmetic, of Optic বেশ কথা, of History, of Natural and Moral Philosophy, of Jurisprudence, of Medicine, of Astrology, of Music and so on—এর পরে যে সত্যিই কিছু গড়তে আঁক্‌তে এক কথায় করতে চায় সে কি বলবেনা—Every thing is worth knowing ; learn the art and lay it aside.

রসায়ন শাস্ত্রে জল গ্যাস এসব তৈরির প্রক্রিয়া বিষয়ে পরীক্ষার দায় সুনিশ্চিত হয়ে তবে পুঁথির মধ্যে মানুষ প্রক্রিয়া হিসেবটা ধরলে বই পড়ে সেই ক্রিয়া কর ঠিক ঠাক ফল নিশ্চয় পাবে। কিন্তু শিল্প-শাস্ত্রের নির্দ্দেশ ও মান পরিমাণ মতো মূর্ত্তি গড়লে পাথর দেবতাই হবে যে তা নয়, আট দশ হাত মনুষ্যেতর ব্যাপারও হতে পারে। ছন্দ শাস্ত্র মতো ঠিক ঠাক ছন্দ বাঁধা জিনিষ সব সময়ে কবিতা হয় না, ঠিক ঠাক সা-র-গ-ম দোরস্ত জিনিষ সব সময়ে সঙ্গীতও হয় না এর প্রমাণ হাতে হাতে পাই। ইতিহাস পুরাণ রূপক ইত্যাদির দিক দিয়া লাট কর্জ্জনের মতো আমাদের দেব মূর্ত্তির সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই আমাদের দেবতা অথচ তার কাছে ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বর সবাই মনুষ্যতর বীভৎস কিছু। শিল্প শাস্ত্রেব নিছক আইনে বলে মূর্ত্তিগুলোর মধ্যে দেবতা যে আসে নি আইনের পিছনে যাকে বলে mythology, symbolism মুদ্রারূপক ইত্যাদি এমনি সব

জিনিষের শক্তি অনেকখানি কাজ করে, তবে শাস্ত্রবিধি মতো কাটা পাথরকে এ দেবতা সে দেবতা বলে প্রতিপন্ন করছে এটা ঠিক! মর্ত্ত্যভূমির অনেকখানি জড়িয়ে আছে বলেই এই সব মূর্ত্তি আমাদের কাছে সুন্দর ঠেকে, আর্টে নিছক দেবতা হতে পারেনা—নরদেব পর্য্যন্ত আর্টের গতি এইটে আমার ধারণা। অবশ্য লাট কর্জ্জনের মতো—রূপক ইত্যাদির জ্ঞান ও সেই সঙ্গে রস-জ্ঞানেরও যার অভাব তার কথা স্বতন্ত্র কিন্তু ইজিপ্তের রাজাদের মূর্ত্তি, রাজার নাম, রাজার ইতিহাস এ সবের অপেক্ষা না রেখে স্বাধীন ভাবেই রসিকের কাছে আপনার নরদেবত্ব প্রমাণ করছে! এবং বুদ্ধমূর্ত্তি নটরাজ মূর্ত্তি কপিল মূর্ত্তি এমনি অসংখ্য মূর্ত্তি এদেশে রয়েছে যা নিজের মহিমা নিজের রূপ দিয়ে পুরাণের রূপক ছেড়েও প্রচার করছে, সেই সব মূর্ত্তি হচ্ছে শিল্পির কাছে অলিখিত যে শিল্পশাস্ত্র তার বিধিনিয়ম ও প্রক্রিয়ার ফল, হাজার বছর ধরে শিল্প শাস্ত্র মতো গড়ে চল্লেও এ জিনিষ পাওয়া শক্ত—কেবল তারাই পেয়েছে যারা বনের মধ্যে বনের আকাশে আকাশের এবং নিজের মনের মধ্যের মানস দেবতাকে ক্রিয়ার দ্বারায় বশ করতে শিখেছে—অনেক সাধনা অনেক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে। বাঁধা ধরা যোগশাস্ত্র পড়িয়ে যোগী সৃষ্টি করা যায় না, বাঁধা ধরা ছন্দ নিয়ে সুর নিয়ে কবিতাকে সুরকে ধরে আনা যায় না—তা যদি হতো তো ভাবনা ছিল না, যে কবিতা ছিল কলিদাসের আমলে ছন্দ শাস্ত্র মতো তারি পুরাবৃত্তি চলতো, সাহিত্য সেবার দরকারই হতনা আজকের মানুষের শাস্ত্রের তথাকথিত রাসায়নিক প্রক্রিয়া ধরে ছবি হতো কবিতা হতো গান হতো প্রস্তুত ঠিক কালিদাসের মতো তানসেনের মতো দেবী-চিত্র লেখার মতো কিন্তু সৌভাগ্য যে এটা ঘটা সম্ভব হল না, শিল্পির intention বা ধ্যান তারি অনুপাতে ক্রিয়া চল্লো, কর্ম্মের ভাবভঙ্গী মান পরিমাণ সব সেই intention ও তার ক্রিয়া বশে এমন হল কি তেমন হল—জিনিষটা দেবতার ছাঁদ পেলে বা মানুষের ছাঁদ পেলে, নবতাল হল কি দশতাল হল! দেবতা হলেই নবতাল, নর হলেই অষ্টতাল ইত্যাদি শাস্ত্রের বাঁধা যে নিয়ম intention ও তার ক্রিয়ার বশে কায করে শিল্পি মাত্রেই ভাঙ্‌লে বদলালে প্রাচীন ভারত শিল্পের ইতিহাস থেকেও এটা সপ্রমাণ করা শক্ত নয় একালে তো এটা নিত্য ঘটনায় দাঁড়ায়েছে। নিছক শিল্প ক্রিয়া থেকেই ঠিক ঠাক ছন্দ সুর ছাঁদ-বাঁধ সমস্তই বেরিয়েছিল একদিন একথা যদি অস্বীকার করি তবে শাস্ত্রকেও অস্বীকার করা হয়, কেননা শাস্ত্রেই বলেছেন—ব্রহ্মা অদ্ভুত সমস্ত যা তার দেবতা তাঁর থেকে সুর এসেছে, ছন্দ এসেছে, সৃষ্টি এসেছে—তিনি কোন বাঁধা শাস্ত্র দেখে সৃষ্টি ক্রিয়া করে চলেন নি। সুরূপ কুরূপ যে নিয়মে শিল্পি গড়ে—কিম্বা সুভাব কুভাব, দেবভাব মানুষভাব রাক্ষসভাব আসে কাযে তাঁর প্রক্রিয়া ও হিসেব সম্পূর্ণভাবে শিল্পির নিজস্ব জিনিষ—শাস্ত্রের মধ্যে তার হিসেব ধরা নেই। মূর্ত্তির আধ্যাত্মিকতা শাস্ত্রে লেখা আপযোগ নিয়ে ধরা যায় না, শিল্পির আত্মায় তার ব্যক্ত করার হিসেবের পুঁথিটা লুকোনো আছে—সেই পুঁথি অনুসারে শিল্পি ক্রিয়া করে চলে নানা কাণ্ড বাধিয়ে যায়—যার হিসেব শুধু ক্রিয়াবানদের কাছেই ধরা পড়ে।

———

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অগ্রহায়ণে

ইউরোপে যুদ্ধের আতঙ্ক—ভারতবর্ষের ভাগ্যের সূতাগাছি ইউরোপের সঙ্গে ও ইউরোপীয় প্রভাবের সকল দেশের সঙ্গে বাঁধা পড়িয়াছে। এ বাঁধন সখ্যের নয়, দায়ের। ইউরোপের ভাল-মন্দে আমাদের ভাগ্য নিয়মিত হয়; তাই কেবল সংবাদ জানিবার কৌতূহল ইউরোপের অবস্থার আলোচনা নহে। মহা সমরের ফলে এ দেশে যাহা ঘটিয়াছে তাহা রোধ পাইবার নয়; কাজেই ইউরোপের ভবিষ্যতের আতঙ্কের কথা বিশেষভাবে আলোচ্য।

মেসোপোটেমিয়ার যুদ্ধে যে ইংরেজ বীর তুর্কীদের হাতে বন্দী হইয়াছিলেন, সেই চার্লস টাউনসেণ্ড ভবিষ্যতের অশান্তির যে আশঙ্কার কথা লিখিয়াছেন, তাহা সাগ্রহে ইউরোপে আলোচিত হইতেছে। টাউনসেণ্ড বলেন যে, ইংরেজেরাই সকল দেশের মুসলমানদের শ্রেষ্ঠ অকৃত্রিম বন্ধু; কিন্তু রুশিয়ার বিপ্লবকারী বলশেবিকেরা মুসলমান ধর্ম্মের পাকা শত্রু হইলেও তাহারা নানা ছলনায় পারস্যে ও আফগানিস্থানে আপনাদের মতের প্রভাব বাড়াইতেছে এবং ইংরেজের মুসলমান রাজ্যের ছদ্ম শত্রু বলিয়া বুঝাইতেছে। পারসীকেরা ও আফগানেরা নাকি ঘোরে সে কথায় বিশ্বাস করিতেছে ও গোপনে নূতন বিপ্লবের ষড়যন্ত্র করিতেছে। আফগানিস্থানে পথে ভারতেও নাকি এই প্রভাব বাড়িবার সুবিধা পাইবে। ইহার দমন না হইলে নাকি অচি বিষম বিপ্লব ঘটিবে।

অনেকবার বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, সারা পৃথিবীতে শান্তি রক্ষা করাই ইংরেজের স্বার্থ; পৃথিবীর সর্ব্বত্র যাহাদের রাজ্য আছে ও বাণিজ্য চলে, তাহারা নিশ্চয়ই যুদ্ধ অশান্তির বিরোধী; স্থির বুদ্ধিতে শান্তি চায় ইংরেজেরা ও শান্তি চায় মার্কিণেরা; অন্যত্র কিন্তু নানা গোপ বিপ্লব ধোঁয়াইতেছে। এটা কেবল বলশেবিকের উত্তেজনায় নয়, অন্য অনেক কারণ আছে।

জাতি-বিদ্বেষ ও যুদ্ধ থামাইবার জন্য যে লীগ গড়িয়াছে, সে যে কেবল সাক্ষী-গোপ তাহা অনেকবার দেখাইয়াছি। ইতালীর কর্ত্তা মুসোলিনি গোড়ায় অতি অসংযত ভাষায় ফরাসীদে দুঃস্থ জার্ম্মাণির রক্তশোষণে উত্তেজিত করিয়াছিলেন; কিন্তু এখন তিনি ফরাসীর বর্ব্বর অত্যাচারে বিরোধী হইয়াছেন। ফরাসীরা লীগের শাসন অমান্য করিতেছে; ইতালীও আপনার রো লীগকে তুচ্ছ করিয়া গ্রীসের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিল। যাহাদের গায়ে বল আ তাহারাই যদি স্বেচ্ছায় দুর্ব্বলকে পীড়ন করিতে পারে, তবে লীগের ক্ষমতায় অথবা কাহা চেষ্টায় যে অরাজকতা নিবারিত হইতে পারে না এবং নানা রকমের জাতি-বিদ্বেষের ফ ইউরোপে যে আবার আগুন জ্বলিবার সম্ভাবনা,—ইহাই মার্কিণেরা ও অন্য দেশের কয়ের রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ বলিতেছেন। জর্ম্মাণির ধ্বংসে যে ইউরোপের সর্ব্বনাশ ও ফরাসীদেরও অ

অনিবার্য্য, তাহাও কোন কোন রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ বুঝাইতেছেন। মানুষের রক্তের স্বাদে বাঘ যেমন ক্ষেপিয়া যায়, ফরাসীরা তেমনই রুরের সম্পদ পাইয়া ক্ষেপিয়াছে; কাহারও কথা শুনিতেছে না। জর্ম্মাণিকে রক্ষা করিবার জন্য ইংরেজেরা পঞ্চায়েৎ বসাইয়া নিরপেক্ষ মার্কিণ সরকারকে আহ্বান করিলেন, কিন্তু ফরাসী রাষ্ট্র-মন্ত্রী বলিতেছেন যে পঞ্চায়েৎ সভায় যদি কেবল এইটুকু স্থির হয়, যে আপাতক জর্ম্মাণি ফরাসীকে কত টাকা দিতে পারে, তবেই তিনি পঞ্চায়েতি মানিবেন। ইহার অর্থ এই, ফরসীরা যে রুর দখল করিয়াছে তাহা করিবেই এবং যত টাকা দাবী করিয়াছে তাহা বজায় রাখিবেই, কেবল এখন জর্ম্মাণির দুর্দ্দশার হিসাবে টাকা উসুল করা হইবে অল্প পরিমাণে। মার্কিণেরা এমন অসার পঞ্চায়েতি করিতে আসিবে না; তবে মনে হইতেছে মার্কিণেরা ফরাসীদের উপর চটিয়া যাইতেছে মনে করিয়া হয়ত বা ফরাসীরা একটু ভয়ে ভয়ে পথে আসিতে পারে। হয়ত ভালই, নহিলে জর্ম্মণি উচ্ছন্ন যাইবে, ইউরোপে বিপ্লব ঘটিবে এবং ফ্রান্সের ভাগ্যে হইবে লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

বিচ্ছিন্ন ও নিরস্ত্র জার্ম্মণিতে বিপ্লব ঘটিলেই মৃত্যু; তবুও দুয়েকটি সংবাদের ইঙ্গিতে মনে হয় যে মরণ কামনায় জর্ম্মাণেরা বিপ্লব ঘটাইবে। নির্ব্বাসিত ক্রাউনপ্রিন্স নিজের ভূ-সম্পত্তি দেখিবার নামে দেশে ফিরিয়াছেন; কি হইবে কে জানে।

* * *

ভারতের পদবা—আমরা রাজ সরকারকে প্রত্ন-তত্ত্বের ও ধর্ম্ম-তত্ত্বের বচন আওড়াইয়া বুঝাইলাম যে আমরা বর্ব্বর নই, এবং বিশ্ব-সভায় সকলের সঙ্গে সমান আসন পাইতে পারি! সরকার 'তথাস্তু' বলিয়া আমাদের কয়েক জন প্রতিনিধিকে মধুর বচনে আদর করিয়া ইম্পিরিয়ল সভায় বসাইলেন ও নানা কথা বকিতে দিলেন। প্রতিনিধিরা খুসী হইলেন, কিন্তু ভারতের ভাগ্য ফিরিল না। কেনিয়ায় ভারতীয়ের অধিকার-প্রসঙ্গে বুয়র বীর স্মট্‌স্ সকলকে বুঝাইয়া দিলেন যে দক্ষিণ আফ্রিকায় কালা জাতির লোকদিগকে দূরে রাখিয়া সাদাদের উন্নতির কল্পে যে সকল উপনিবেশ বসিয়াছে, সেখানে ইউরোপীয় ছাড়া অন্য কেহ রাষ্ট্রীয় অধিকার পাইলে উপনিবেশ বসাইবার উদ্দেশ্য বিফল হইবে; যাহারা উপনিবেশ বসায় নাই তাহারা কেহ উড়িয়া আসিয়া দেশ জুড়িয়া বসিতে পারিবে না। ইউরোপের সকল পত্রেই স্মট্‌সের উক্তির প্রশংসা হইতেছে। নিজের দেশে যাহারা খর্ব্ব, তাহারা বিদেশে উদ্বাহু হইয়া কি ফল পাইবে? গায়ে আঁচড় না লাগা পর্য্যন্ত যাঁহারা আমাদিগকে মধুর বাক্য বলেন, তাঁহারা যে আমাদের গন্ধ সহিতে পারেন না, তাহা আমরা ভুলিয়া যাই কেন?

* * *

ফিরিঙ্গীর জন্য নূতন দেশ—ফিরিঙ্গীদের প্রতি ইংরেজদের কৃপাদৃষ্টি আছে, কিন্তু কোন ক্রমেই উহাদিগকে আপনাদের সমাজে মিশাইতে পারেন না। অন্যদিকে আবার ফিরিঙ্গীরা

আপনাদিগকে ভারতীয় লোক বলিতে চায় না। যাহারা এদেশেরও নয়, বিদেশেরও নয়, তাহাদের এক গতি করিবার জন্য রাজ সরকার স্থির করিয়াছেন যে, আন্দামান হইতে কয়েদখানা তুলিয়া ঐ দ্বীপপুঞ্জ ঝাড়িয়া মুছিয়া ফিরিঙ্গীদের উপনিবেশ করিয়া দিবেন। এই দ্বীপপুঞ্জ দীর্ঘে দুইশত মাইল বিস্তৃ প্রস্থে কোন স্থানেই ৩২ মাইলের অধিক নয়; কিন্তু ফিরিঙ্গী উপনিবেশের পক্ষে উহাই যথেষ্ট। সেখানকার যে আদিম অধিবাসীদিগকে দ্রাবিড়েরা হনুমান (অনুমান) অর্থাৎ হনুমান বংশ বলিত ছিল, তাহারা এখন সংখ্যায় অধিক নয়, এবং নানা কারণে দুর্ব্বল ও নিরীহ হইয়াছে। ইহারা উপনিবিষ্টদের অনেক কাজে লাগিবে, এবং তাহা ছাড়া সমস্ত দ্বীপপুঞ্জের মালিক হইবেন ফিরিঙ্গীরা। একটুখানি স্বরাজ পাইয়া বাড়িয়া উঠিলে, ফিরিঙ্গীরা অবাধে অস্ত্র ব্যবহারের অধিকার পাইবে,—তাহা কি অন্যকে উপেক্ষা করিয়া উহাদিগকে দেওয়া চলে না! সিঙ্গাপুর ও হংকংয়ে মাঝামাঝি ইংরেজদের একটা ছোটখাট সহায়ও জুটিবে।

* * *

লোক হিতকর অনুষ্ঠান—দেশের শুভ দিন আসিতেছে। যে অসার রাজনৈতিক কোলাহলে আত্মসংহার ঘটে, তাহা ছাড়িয়া অনেকে এদেশের নানা স্থানে খাঁটি উন্নতির কাজে হাত দিয়াছেন। যাহাতে দেশের অস্বাস্থ্যকর অবস্থা দূর হয়, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার হয় ও আত্ম-সম্মান বাড়ে, যাহাতে আত্ম নির্ভর ও লোক সেবার প্রবৃত্তি জাগে, তাহার জন্য অনেক স্থানে অনেক সাধু উদ্যোগ হইতেছে। এ বিষয়ে আমরা যে লিখিত বিবরণ পাইয়াছি তাহা মুদ্রিত করা অসম্ভব। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিময়মনসিং জেলার মহিরাম কোল গ্রামের সমিতির যেরূপ দীর্ঘ বিবরণ দিয়াছেন, অন্য স্থানেরও ঐরূপ অনেক বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। দেখিতে পাইতেছি দেশের সর্ব্বত্রই এ গ্রামে যুবকদের উৎসাহে স্থানীয় লোকেরা আপনাদের উন্নতি সাধনের জন্য উদ্যোগী হইতেছে। অনেক সময় উৎসাহ ও উদ্যোগ এইজন্য পণ্ড হইয়া যায় যে, কর্ম্মীরা কাজ করিবার মত শিক্ষা না পাইয়াই কাজে লাগেন। বোলপুরের বিশ্বভারতীর সুপ্রসিদ্ধ নেতার নির্দ্দেশে সেখানকার যুবকেরা যে ভাবে লোকসেবা পদ্ধতি শিখিতেছেন, তাহা সকলেরই অনুকরণীয়। হিতসাধনের জন্য কোন কাজটি কিরূপভাবে করিতে হয়, বোলপুরের যুবকেরা তাহা বিশেষভাবে শিখিয়া লইয়া কাজে লাগিতেছেন। কেবল সাধু ইচ্ছা লইয়াই কেহ কর্ম্মে সফলতা লাভ করিতে পারে না; কেবল রাত্রি জাগিয়া রুগ্নের ঘরে বসিয়া থাকিলেই কেহ রোগীর সেবা করিতে পারেন না, অথবা খাঁটি উপায় না জানিয়া কেহ গ্রামের মেলেরিয়া তাড়াইতে পারে না।

কো-অপারেটিভ সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও সুপরিচালিত "ভাণ্ডার" পত্রে নানা হিতকর অনুষ্ঠানের অনেক সংবাদ মুদ্রিত হয়। এই পত্রে দেখিলাম যে চাকুলিয়ার

ঘোলা নামক গ্রামে এমনভাবে স্বাস্থ্য-বিধান হইয়াছে, যাহাতে সে গ্রামে আর মেলেরিয়া দেখা দিতে পারে নাই; অথচ উহার চারিপাশের অনেক গ্রামে মেলেরিয়া রহিয়াছে। এখানে অভিজ্ঞদের নির্দ্দেশে কাজ হইয়াছে বলিয়াই ফল ভাল হইয়াছে।

মেলেরিয়ার উৎপাত অপেক্ষাও যে কালাজ্বরের উৎপাত অধিকতর ভীষণ, তাহা এখন সুনিশ্চিত। এই কালাজ্বরের প্রতীকারের জন্য অনেক স্থানে ইন্‌জেক্‌শন দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, ও তাহার ফলও ভাল হইয়াছে শুনিতে পাই। এ বিষয়ে সকলেই যদি অনুসন্ধান করেন এবং ঐ পদ্ধতি সুফলপ্রদ মনে হয়, তবে গ্রামে গ্রামে ইন্‌জেক্‌শনের ব্যবস্থা করা উচিত।

* * *

বাণিজ্য-নীতি—ব্যবসা বাণিজ্য চালাইবার নীতি সম্বন্ধে,—অর্থাৎ দেশের ধন সম্পদ বাড়াইবার উপায় সম্বন্ধে ইউরোপে অনেক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে এবং অর্থনীতি শাস্ত্রকে একটা পাকা বিজ্ঞানের আসন দেওয়া হইয়াছে! স্বীকার করি যে সকল দেশের ও সমাজের পক্ষে যাহা সত্য এবং পালনীয়, এমন অনেক তথ্য এই অর্থনীতি শাস্ত্রে ব্যাখ্যাত ও নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, অর্থনীতি শাস্ত্রের সকল গুলি বুলিকেই খাঁটি সত্য বলা চলে না,—অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম বলা চলে না; দেশ কাল ভেদে নিয়মগুলির পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন। ইংরেজের অর্থনীতিতে এই সূত্রটি খাঁটি সত্যের মত আদৃত হইতেছিল যে সকল দেশেই অবাধ স্বাধীন বাণিজ্য চলা উচিত; অর্থাৎ যে কোন জাতি যে কোন দেশে গিয়া অবাধে ও ন্যায্য দরে জিনিস কিনিতে ও বেচিতে পারিবে, এবং কোন কড়া শুল্কের নিয়মে সে বাণিজ্য শাসিত হইবে না। অন্য দেশের কাঁচা মাল না পাইলে ইংরেজদের চলিত না, তাই এই অবাধ বাণিজ্য সেখানে আদৃত ছিল। এখন অবস্থার পরিবর্ত্তনে বিলাতের পার্লেমেণ্ট স্থির করিতেছেন যে ইংলণ্ড দেশের উৎপন্ন পদার্থ ইংলণ্ডে অনেক পরিমাণে রাখিবার প্রয়োজন; তাই স্বাধীন বাণিজ্যের পরিবর্ত্তে রক্ষানীতি চালাইবার প্রস্তাব উঠিয়াছে। ইংরেজদের অধিকাংশের মত এখন এই প্রস্তাবের অনুকূলে।

দরিদ্র ও পরমুখাপেক্ষী ভারতবর্ষের বেলায় যে রক্ষানীতির বিশেষ প্রয়োজন আছে তাহা দেশের লোকে বলিয়া বলিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছেন, কিন্তু ইংরেজনীতিজ্ঞেরা স্বাধীন বাণিজ্যের নীতিকে অভ্রান্ত নীতি বলিয়া বুঝাইয়া আমাদের দেশের কাঁচা মালের রপ্তানীকে নিয়মিত করিতে ছাড়ার নাই। এখন যদি রক্ষানীতি চলে তবে ভারতবর্ষে চলিবেনা কেন? ইহার উত্তরে নিশ্চয়ই ইংরেজজাতি এই নীচ স্বার্থের কথা বলিবেন না যে, ভারতবর্ষ যখন ইংলণ্ডের খাস খামার, ইংলণ্ডের প্রয়োজনের মাল সংগ্রহের সময় 'সংগ্রহ-নীতি' ছাড়া ভারতবর্ষে অন্য কোন নীতি চলিতে পারে না। আমরা আশা করি যে ১৯২৪-এর নূতন পার্লেমেণ্টে রাজমন্ত্রীর নূতন

প্রস্তাবিত নীতি গৃহীত হইবার সময়ে ভারতবর্ষের আমদানী রপ্তানীর নীতিও পরিবর্ত্তিত হইবে। বিদেশের যে সকল পদার্থে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন নাই, এবং কেবল সস্তায় পাই বলিয়া কিনিয়া থাকি, তাহা যেন এদেশে কেহ বেচিতে আসিলে চড়া শুল্ক দেয়, এবং এদেশের খাদ্য-সামগ্রী যেন, যে-কেহ অবাধে যত খুসী লইয়া যাইতে না পারে।

* * *

বিশ্ব-ভারতী—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব-ভারতীর সম্পাদক শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ মহাশয়ের নিকট হইতে প্রকাশের জন্য আমরা নিম্নলিখিত আবেদনটি প্রাপ্ত হইয়াছি। বিশ্ব ভারতীর নারী-বিভাগের ব্যবস্থার বিষয় পাঠ করিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। আশা করি বিশ্ব-ভারতীর এই নূতন উদ্যম সাফল্য-মণ্ডিত হইবে।

"শান্তি-নিকেতন আশ্রমে বিশ্ব-ভারতীর অন্তর্গত নারী-বিভাগ হইতে স্ত্রীলোকদের শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আপাততঃ এখানে অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত, চিত্র-কলা, বস্ত্র-বয়ন এবং বই বাঁধানো প্রভৃতি হাতের কাজ শিক্ষা দেওয়া চলিতেছে। সেই সঙ্গে স্বাস্থ্য-তত্ত্ব, রোগী-পরিচর্য্যা, শাক্-শব্জি ফুল ফলের বাগান তৈয়ারী, বিজ্ঞানবিদ্যা, গৃহকর্ম্ম প্রণালী প্রভৃতি বিষয়ে ছাত্রীরা পারদর্শিতা লাভ করে ইহা আমাদের ইচ্ছা। নানা কারণে পুরুষ ছাত্রদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঁধা নিয়মে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সঙ্কীর্ণ পথে বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে হয়। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের নারীদের পক্ষে এ সম্বন্ধে তত বাধ্যতা নাই। এইজন্য বুদ্ধি, চরিত্র ও কর্ম্মপটুতার সর্ব্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ সাধনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উদারভাবে তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে বাধা অপেক্ষাকৃত অল্প। এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া, ভরসা করি নারী-শিক্ষায় আগ্রহবান ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে যথোচিত আনুকূল্য পাইয়া দেশ বিদেশ হইতে উপযুক্তা শিক্ষয়িত্রী সংগ্রহ করিয়া এখানে উচ্চ আদর্শের নারী শিক্ষা গড়িয়া তুলিতে কৃতকার্য্য হইব। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দেশের বিত্তোৎসাহী বদান্য ব্যক্তিদের নিকট হইতে এককালীন বা মাসিক বা বার্ষিক দান প্রার্থনা করিতেছি; আশা করি, আমাদের আবেদন নিষ্ফল হইবে না।"

* * *

স্বর্গীয় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়—যখন এই ফর্ম্মা ছাপা হইতেছে তখন আমরা এই দুঃসংবাদ পাইয়া ব্যথিত হইলাম যে, অদ্য (২৯শে কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার) অপরাহ্ণ সাড়ে [illegible] সময় বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসেবী ও সংবাদপত্রসেবীদিগের অন্যতম, "বঙ্গবাণী"-র লব্ধপ্রতিষ্ঠ [illegible] পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন।

Printed and published by Jyotish Chandra Ghosh at the Cotton Press, 57, Harrison Road. Calcutta.

COLOUR PICTURE

বঙ্গবাণী

ললিতার লিপিলিখন

শিল্পী—শ্রীমহাবীর প্রসাদ বসু।

INDIAN ART SCHOOL

DOUBLE COLOUR PAGE

বঙ্গবাণী

"আবার তোরা মানুষ হ"

দ্বিতীয় বর্ষ
১৩২৯-'৩০

পৌষ

দ্বিতীয়ার্দ্ধ
৫ম সংখ্যা

স্বর্গীয় অশ্বিনী কুমার দত্ত

অশ্বিনীকুমারের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার নবযুগের ইতিহাসে একটা বিশিষ্ট চরিত্রাভিনয় শেষ হইল। অশ্বিনীকুমারের অলৌকিক প্রতিভা ছিল, এমন বলা যায় না। তিনি আধুনিক বাংলার চিন্তা বা ভাবের অভিব্যক্তিতে কোনও নূতন ধারার সৃষ্টি করিয়াছেন, কিম্বা তাহাতে অনন্য-সাধারণ শক্তিসঞ্চার করিয়াছেন, তাঁহাকে যতই ভালবাসি ও শ্রদ্ধা করি না কেন, তাঁহার পক্ষে এ দাবীও করিতে পারি না। মোটের উপরে এ সকল বিষয়ে অশ্বিনীকুমার একালের আর দশজন ইংরাজীশিক্ষিত লোকের মতনই ছিলেন। অথচ তাঁহার আড়ম্বরশূন্য জীবনে ও চরিত্রে এমন একটা-কিছু ছিল, যাহা তাঁহার সমসাময়িক ইংরাজীনবীশ বাঙ্গালাদিগের মধ্যে দেখা যায় নাই। আর এই একটা কিছুর উপরেই বাংলার নবযুগের ইতিহাসে অশ্বিনীকুমারের বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

এই একটা-কিছু অশ্বিনীবাবুর কর্ম্মযোগ। এই যুগে বাংলাদেশে অনেক কর্ম্মীই জন্মিয়াছেন। কেহ বা ধর্ম্মসংস্কারে, কেহ বা সমাজসংস্কারব্রতে, কেহবা রাষ্ট্রীয় স্বত্ব-স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠাকল্পে আপনাদিগের জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। ইঁহাদের কর্ম্মের দ্বারাই আধুনিক বাংলার সামাজিক জীবন গত ৫০।৬০ বৎসরের মধ্যে নানাদিকে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ইহাঁদিগকে যেই শ্রদ্ধাভক্তি করি না কেন, দু'একজন ছাড়া, ইহাঁদের কাহাকেই সত্য কর্ম্মযোগের পথিক বলিতে পারি না। এই সাধনা যে ভাবে অশ্বিনীকুমারের চরিত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, আর কাহারও মধ্যে সেইভাবে প্রকাশিত হয় নাই।

(২)

আমাদের দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতেই কর্ম্মযোগের দুইটি ধারা প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে, এক জ্ঞানের ধারা, আর এক ভক্তির ধারা। জ্ঞানপথের কর্ম্মযোগের কথা মহানির্ব্বাণতন্ত্রের পরিচিত শ্লোকেতে দেখিতে পাই।

ব্রহ্মনিষ্ঠঃ গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ
যৎ যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।

ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ সর্ব্বদা তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলন করিবেন, এবং জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে যাইয়া যখন যে কর্ম্ম করিবেন, তৎসমুদয় পরব্রহ্মে সমর্পণ করিবেন। সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদৃষ্টি এই কর্ম্মযোগের ভিত্তি।—এই কর্ম্মযোগ জ্ঞানপ্রধান। ইহা ব্রহ্মজ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত, ব্রহ্মজ্ঞানের সঙ্গে অনুস্যূত।—"সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্মময়ং জগৎ"—ইহাই ব্রহ্মানুভূতির শেষ কথা।

স্থাবরজঙ্গম দেখে, দেখে না তার মূর্ত্তি,
যাঁহা নেত্র পড়ে হয় ইষ্টদেবস্ফূর্ত্তি।

ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে সাধকের এই অবস্থাই হয়। তখন সাধক আপনাকে বিশ্বময় দর্শন করেন। বেদে বামদেব ঋষি এই সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদৃষ্টি বা আত্মদৃষ্টি লাভ করিয়াই কহিয়াছিলেন, আমি সূর্য্য, আমি মনু হইয়াছিলাম। এই জ্ঞান লাভ হইলে সাধকের চক্ষে জগৎ ও তাঁর সকলই ব্রহ্মময় হইয়া উঠে। তখন তাঁহার

সর্ব্বজীবে হয় ব্রহ্ম ভাবোদয়
চিদানন্দ জেগে উঠে।

এই চিদানন্দ রসে তাঁহার অন্তর্বাহ্য রসায়িত হইয়া সাধকের চিত্ত সমতালাভ করে। এই সমতাই ব্রহ্মজ্ঞানসাধনের শেষ কথা। কর্ম্ম—এ পথে সিদ্ধির সহায় মাত্র। এ পথে সাধক কর্ম্মের দ্বারা দেহশুদ্ধি এবং চিত্তশুদ্ধি লাভ করেন। প্রথমে বিবিধ ক্রিয়ার দ্বারা ধাতুর প্রসন্নতা লাভ করিতে হয়। এই অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই উপনিষদ কহিয়াছেন যে সাধক "ধাতুপ্রসাদাৎ" আত্মার মহিমা দর্শন করেন—

ধাতুপ্রসাদাৎ মহিমানমাত্মানম্

আমাদের শরীরের উপাদানগুলি যদি সমতালাভ না করে, তাহা হইলে স্নায়ুমণ্ডল স্থৈর্য্য লাভ করিতে পারে না। স্নায়ুমণ্ডলের স্থৈর্য্যলাভ ব্যতীত ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যের নিবৃত্তি হয় না। ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য নিবৃত্ত না হইলে, চিত্ত স্থির হইতে পারে না, বিষয় বাসনা বিক্ষিপ্ত হইয়া চারিদিকে ছুটিয়া বেড়ায়। চিত্ত স্থির না হইলে ধ্যানের শক্তি জন্মে না। ধ্যানের শক্তি না জন্মিলে অন্তরের মধ্যে যে নিত্যবস্তু নিয়ত প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন, তাঁহার সন্ধান পাওয়া যায় না। এই নিত্যবস্তুই ব্রহ্মবস্তু। এই ব্রহ্মের জ্ঞানলাভ করিতে হইলে, এইজন্যই, সকলের আগে দেহশুদ্ধির প্রয়োজন।

দেহ শুদ্ধ হইলে ধাতুর প্রসন্নতালাভ হয়। ধাতুর প্রসন্নতালাভ হইলে চিত্তের সমতালাভ করা সহজ হইয়া উঠে। ধাতুর প্রসন্নতা লাভ হইলে পরে অর্থাৎ ভূত শুদ্ধিলাভ হইলে, স্বাধ্যায় অথবা মুশাস্ত্রের অধ্যয়ন, ইষ্টনাম জপ, সাধুসঙ্গ প্রভৃতির দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ করিতে হয়। এইরূপে দেহশুদ্ধি এবং চিত্তশুদ্ধিলাভ হইলে পরে সাধকের ব্রহ্মজ্ঞান-অনুশীলনের যোগ্যতা জন্মে। তখন ব্রহ্মপ্রতিপাদক বেদান্তাদি শাস্ত্রের অনুশীলনের দ্বারা সাধকের সত্য ব্রহ্মজ্ঞানলাভ হয়। এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধক তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ হইয়া

যৎ যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।

যাহা যাহা কর্ম্ম করেন, তাহাই ব্রহ্মেতে অর্পণ করেন। ইহাই জ্ঞানপথের কর্ম্মযোগ। এই কর্ম্মযোগ শান্ত-উপাসনার অন্তর্গত। ইহাও নিষ্কাম কর্ম্মই বটে। তবে এই কর্ম্মযোগে নিষ্ঠা আছে, কিন্তু উচ্ছ্বাস থাকিতে পারে না। এ পথে সাধক কতকটা যেন যন্ত্রারূঢ়ের মতন কর্ম্ম করিয়া যান। এ অবস্থা লাভ করিলে কর্ম্ম করিলেও পুণ্য হয় না, না করিলেও প্রত্যবায় হয় না। কারণ এই অবস্থালাভ হইলে সাধক পাপপুণ্যের অতীত হইয়া যান।

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীনাং।
তদাপুণ্যে পাপে বিধূয় নিরঞ্জনং শান্তমুপৈতি।

দ্রষ্টা যখন রুক্মবর্ণ ঈশ্বরকেই একমাত্র কর্ত্তা বলিয়া প্রত্যক্ষ করেন, তখন পাপপুণ্যের অতীত হইয়া নিরঞ্জন শান্তিলাভ করেন। ইহাই শান্ত-উপাসনার সিদ্ধি। ইহাই জ্ঞানপথে কর্ম্মযোগের শেষ কথা।

(৩)

অশ্বিনীকুমার যে কর্ম্মযোগের পথের পথিক ছিলেন, তাহা এই জ্ঞানপথের যোগ নহে। অশ্বিনীকুমারের কর্ম্মযোগ তাঁহার ভক্তিসাধনের অন্তর্গত ছিল। আর তাঁহার ভক্তিও মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত অনর্পিতচরী ভক্তিপন্থার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই অনর্পিতচরী ভক্তি ব্রহ্মজ্ঞানের বিরোধী নহে; কিন্তু গুরুশাস্ত্রমুখে শুনিয়াছি, সত্য ব্রহ্মজ্ঞান সাধন না হইলে মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত এই অনর্পিতচরী ভক্তিসাধনের অধিকারই জন্মে না। ভগবল্লীলার অনুশীলন মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত ভক্তিপন্থার পুচ্ছ-প্রতিষ্ঠা। ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যতীত কেহ এই রাগানুগা ভক্তির পথে প্রবেশ করিবার অধিকার পান না। রস এই রাগানুগা ভক্তির প্রাণস্বরূপ। ভগবানের রসলীলাই রাগানুগা ভক্তির উপজীব্য। নিকৃষ্ট লোকেরা এই রসলীলার একটা অপকৃষ্ট অর্থ করিয়া লইয়া থাকে। রসের সঙ্গে ইন্দ্রিয়লালসাবিবর্জ্জিত ইন্দ্রিয়ানুভূতির একটা অতি নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। এই সূক্ষ্ম সম্বন্ধটি ধরিতে না পারিলে আমাদের প্রাচীন সাধনাতে যাহাকে রস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সে বস্তু যে কি, ইহা কিছুতেই বুঝিতে পারা যায় না। এই রসতত্ত্বের আলোচনাতে প্রবৃত্ত হইয়া, শ্রীগৌরাঙ্গই, বাংলার বৈষ্ণব পন্থার রসশাস্ত্র "উজ্জ্বলনীলমণি" সর্ব্বপ্রথমেই কহিয়াছেন—

নির্ব্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথমবিকারঃ

চিত্তের নির্ব্বিকার অবস্থাপ্রাপ্তি হইলে পরে তাহাতে যে প্রথম বিকার সঞ্চার হয়, তাহাকে ভাব বা রস কহে। নির্ব্বিকার চিত্তের লক্ষণ এই যে ইন্দ্রিয়ের ভোগের বিষয় বিদ্যমানেও তখন ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় না। তখন ভোগ্যবিষয়ের সাক্ষাৎকারেও এই ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য নিবন্ধন চিত্তের সমতা নষ্ট হয় না। তখন এই ইন্দ্রিয়বিকারশূন্য চিত্তে প্রথম যে চিদানন্দ-তরঙ্গ উঠিতে আরম্ভ করে, তাহারই নাম ভাব বা রস। এই চিদানন্দ-তরঙ্গ বা বিকারকে সাত্ত্বিকী বিকার কহিয়াছেন। এই সাত্ত্বিকী বিকারের সঙ্গে ইন্দ্রিয়-বিকারের বাহ্য লক্ষণের সাদৃশ্য আছে। ইন্দ্রিয়-বিকারেও স্বেদ, কল্প, পুলকাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে; কিন্তু ইহার সঙ্গে ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য বিদ্যমান রহে। সাত্ত্বিকী বিকারেও স্বেদ, কল্প, পুলকাদি প্রকট হয়; কিন্তু তাহার সঙ্গে কোনও প্রকারের ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য মিশিয়া থাকে না। কথাটা বুঝান কঠিন। যাঁহাদের এ বস্তুর আদৌ কোনও অভিজ্ঞতা নাই, তাঁহাদিগকে এই ইন্দ্রিয়বিকারবিরহিত স্নায়বীয় বিকারের ও অপূর্ব্ব দৈহিক উল্লাসের কথা বুঝান অসম্ভব। ভাগ্যবানে কখনও কখনও বয়োবৃদ্ধির এবং অভিজ্ঞতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই রসবস্তু যে কি তাহার ইঙ্গিত পাইয়া থাকেন। পুত্র-কন্যা বড় হইয়া উঠিলে তাহাদের দাম্পত্যলীলা দেখিয়া পিতা-মাতার অন্তরে যে অপূর্ব্ব আনন্দ জন্মিয়া থাকে, তাহার দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে নির্ব্বিকার চিত্তের সাত্ত্বিকী বিকারের আভাস পাওয়া যাইতে পারে। ইংরাজীতে এই সম্ভোগকে "ভাইকেরিয়াস্"—(Vicarious) বিশেষণ দেওয়া হইয়া থাকে। ইংরাজীতে যে সত্যকে "ভাইকেরিয়াস" (Vicarious) বলা হয়, আমাদিগের সাধনায় তাহাকেই সত্যজ্ঞান পরকীয়া রস কহিতে পারা যায়। এই পরকীয়া রস সর্ব্বপ্রকারের ইন্দ্রিয় সম্পর্ক-বিবর্জ্জিত, এমন কি, ইন্দ্রিয়সম্পর্কের কল্পনাস্পর্শেও এই রস নষ্ট হইয়া যায়। এই যে নির্ব্বিকার চিত্তের চিদ্বিকার, ইহাই মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত আনর্পিতচরী ভক্তিপন্থার প্রাণ। এই কথাটা না বুঝিলে বাংলার ভক্তিপন্থার মর্ম্ম বুঝা অসম্ভব।

(৪)

এই ভক্তিপন্থা ব্রহ্মজ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত। এই জন্যই রাগানুগা ভক্তির প্রথম সোপান শান্তভাব বা শান্তি রস। সর্ব্বভূতে আত্মদৃষ্টি বা ব্রহ্মদৃষ্টিলাভ হইলেই কেবল এই শান্ত ভাবের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। শান্ত সাধনা সাধকের চিত্তপটকে একরঙ্গা করিয়া দেয়। কোনও চিত্রপটে বিচিত্র ছবি আঁকিতে হইলেই সেই পটখানিকে যেমন একরঙ্গা করা আবশ্যক হয়, সেইরূপ সাধকের চিত্তপটে বিচিত্র রসলীলা ফুটাইতে হইলে সেই চিত্তকে অগে সমভাবাপন্ন করা আবশ্যক। চিত্তের এই অবস্থাকেই "উজ্জ্বলনীলমণি" নির্ব্বিকারাত্মকাবস্থা কহিয়াছেন। চিত্তের সমতাকে লক্ষ্য করিয়াই

নির্ব্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথম বিকারঃ

ভাবের বা রসের এই সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আর কহিয়াছি যে ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতিরেকে অর্থাৎ সর্ব্বভূতে আত্মদৃষ্টি বা ব্রহ্মদৃষ্টি লাভ না হইলে চিত্তের এই সমতা লাভ হয় না। প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যতীত ভগবল্লীলারস অনুশীলনের অধিকারী কেহ হইতে পারে না, এই জন্যই গুরুশাস্ত্রমুখে এই কথাই শুনিয়াছি।

(৫)

মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত অনর্পিতচরী ভক্তিপথে যে কর্ম্মযোগের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে তাহা এই লীলাতত্ত্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে আবদ্ধ। এই রসমার্গে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর এই চারিটি রস ফুটিয়া উঠিয়াছে। পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি পুত্রাদির যে ভক্তি, তাহা যখন রসের পর্য্যায়ে যাইয়া উঠে, তখনই দাস্য রসের প্রকাশ হয়। সাধারণ প্রভুভক্তি বা গুরুভক্তিকে দাস্য রস কহা যায় না। পিতা-মাতা প্রভৃতি গুরুজনের আজ্ঞাপালন করিলেই কিম্বা প্রাণপণে তাঁহাদের সেবা করিলেও এই গুরুভক্তি দাস্যরস হয় না। নিঃশেষে আত্মবিলোপ রসের প্রথম লক্ষণ। পিতার ইচ্ছার সঙ্গে পুত্রের ইচ্ছা যখন নিশ্চিহ্ন হইয়া মিশিয়া যায়, পিতা যাহা চাহেন তাহার অতিরিক্ত কোনও কামনা যখন পুত্রের থাকে না তখনই পিতৃভক্তি দাস্যরসের সোপানে অধিরোহণ করে। ঈশা চরিত্র ও খৃষ্ট প্রবর্ত্তিত ভক্তি পন্থা এই দাস্য রসের উপরেই গড়িয়া উঠিয়াছে। মাতৃভক্তি এবং গুরুভক্তি সম্বন্ধেও এই কথাই সত্য। আর পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনেতে দেববুদ্ধি বা ব্রহ্মবুদ্ধি লাভ না হইলে মানুষ কখনওই তাঁহাদের সঙ্গে এই গভীর একাত্মতা লাভ করিতে পারে না। পিতামাতা, গুরুজন সম্বন্ধে সামান্য মানুষ বুদ্ধি লোপ না পাইলে দাস্যরস আস্বাদনে অধিকার জন্মে না। এই জন্যই ব্রহ্মজ্ঞান অথবা সর্ব্বভূতে আত্মজ্ঞান রাগানুগা ভক্তিমার্গের পূর্ব্ববৃত্তসাধন।

(৬)

ভূত-শুদ্ধি এবং চিত্তশুদ্ধি ব্যতিরেকে যেমন সত্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভ অসাধ্য, সেইরূপ সত্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ব্যতিরেকে মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত অনর্পিতচরী রাগানুগা ভক্তিসাধন অসাধ্য। আর এই ভক্তিপথ ব্যতিরেকে ভাগবতী লীলামার্গে কর্ম্মযোগের অনুশীলনও অসাধ্য। ভক্তিপথে যে কর্ম্মযোগের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহাকে এই ভাগবতী লীলাপথ আশ্রয় করিতেই হয়। এই পথের প্রবর্ত্তক দেহশুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধি। আজি কালি আমরা যাহাকে ইংরাজীতে ethical life বলি, অর্থাৎ যে সাধনের দ্বারা চরিত্রের বিশুদ্ধতা লাভ হয়, ইন্দ্রিয় লালসাদি সংযত হইয়া যায়, তাহাই আমাদের প্রাচীন সাধনার দেহশুদ্ধি এবং চিত্তশুদ্ধির উপায়। সত্যরক্ষা এবং ব্রহ্মচর্য্য বা শুক্রধারণ এই দেহশুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধির মূল প্রতিষ্ঠা। সত্যরক্ষা এবং শুক্রধারণের উপরেই আমরা আজি কালি যাহাকে বিশুদ্ধচরিত্র বলি তাহারও প্রতিষ্ঠা হয়। এইজন্যই বিশুদ্ধ চরিত্রলাভ এবং ভূতশুদ্ধি এবং চিত্তশুদ্ধি একই কথা। এখানে প্রাচীন এবং আধুনিক সাধনপথ পরস্পরের সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছে।

নির্ব্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথমবিকারঃ

চিত্তের নির্ব্বিকার অবস্থাপ্রাপ্তি হইলে পরে তাহাতে যে প্রথম বিকার সঞ্চার হয়, তাহাকে ভাব বা রস কহে। নির্ব্বিকার চিত্তের লক্ষণ এই যে ইন্দ্রিয়ের ভোগের বিষয় বিদ্যমানেও তাহা ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় না। তখন ভোগ্যবিষয়ের সাক্ষাৎকারেও এই ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য নিবন্ধন চিত্তের সমতা নষ্ট হয় না। তখন এই ইন্দ্রিয়বিকারশূন্য চিত্তে প্রথম যে চিদানন্দ-তরঙ্গ উঠিয়া আরম্ভ করে, তাহারই নাম ভাব বা রস। এই চিদানন্দ-তরঙ্গ বা বিকারকে সাত্ত্বিকা বিকার কহিয়াছেন। এই সাত্ত্বিকী বিকারের সঙ্গে ইন্দ্রিয়-বিকারের বাহ্য লক্ষণের সাদৃশ্য থাকে। ইন্দ্রিয়-বিকারেও স্বেদ, কম্প, পুলকাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে ; কিন্তু ইহার সঙ্গে ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য বিদ্যমান রহে। সাত্ত্বিকী বিকারেও স্বেদ, কম্প, পুলকাদি প্রকট হয় ; কিন্তু তাহার সঙ্গে কোনও প্রকারের ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য মিশিয়া থাকে না। কথাটা বুঝান কঠিন। যাঁহাদের এ বস্তুর আস্বাদের কোনও অভিজ্ঞতা নাই, তাঁহাদিগকে এই ইন্দ্রিয়বিকারবিরহিত স্নায়বীয় বিকারের ও অপূর্ব্ব রোমাঞ্চ উল্লাসের কথা বুঝান অসম্ভব। ভাগ্যবানে কখনও কখনও বয়োবৃদ্ধির এবং অভিজ্ঞতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই রসবস্তু যে কি তাহার ইঙ্গিত পাইয়া থাকেন। পুত্র-কন্যা বড় হইয়া উঠিলে তাহাদের দাম্পত্যলীলা দেখিয়া পিতা-মাতার অন্তরে যে অপূর্ব্ব আনন্দ জন্মিয়া থাকে, তাহার দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে নির্ব্বিকার চিত্তের সাত্ত্বিকী বিকারের আভাস পাওয়া যাইতে পারে। ইংরাজীতে এই সম্ভোগকে "ভাইকেরিয়াস্"—(Vicarious) বিশেষণ দেওয়া হইয়া থাকে। ইংরাজীতে যে সত্যকে "ভাইকেরিয়াস" (Vicarious) বলা হয়, আমাদিগের সাধনায় তাহাকেই সত্যকে পরকীয়া রস কহিতে পারা যায়। এই পরকীয়া রস সর্ব্বপ্রকারের ইন্দ্রিয় সম্পর্ক-বিবর্জ্জিত, এমন কি, ইন্দ্রিয়সম্পর্কের কল্পনাস্পর্শেও এই রস নষ্ট হইয়া যায়। এই যে নির্ব্বিকার চিত্তের চিদ্বিকার, ইহাই মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত আনর্পিতচরী ভক্তিপন্থার প্রাণ। এই কথাটা না বুঝিলে বাগ্ভক্তিপন্থার মর্ম্ম বুঝা অসম্ভব।

(৪)

এই ভক্তিপন্থা ব্রহ্মজ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত। এই জন্যই রাগানুগা ভক্তির প্রথম স্তরে শান্তভাব বা শান্তি রস। সর্ব্বভূতে আত্মদৃষ্টি বা ব্রহ্মদৃষ্টিলাভ হইলেই কেবল এই শান্ত ভাবের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। শান্ত সাধনা সাধকের চিত্তপটকে একরঙ্গা করিয়া দেয়। কোনও চিত্রকর বিচিত্র ছবি আঁকিতে হইলেই সেই পটখানিকে যেমন একরঙ্গা করা আবশ্যক হয়, সেইরূপ সাধকের চিত্তপটে বিচিত্র রসলীলা ফুটাইতে হইলে সেই চিত্তকে অগে সমভাবাপন্ন করা আবশ্যক। চিত্তের এই অবস্থাকেই "উজ্জ্বলনীলমণি" নির্ব্বিকারাত্মকাবস্থা কহিয়াছেন। চিত্তের এই সমতাকে লক্ষ্য করিয়াই

নির্ব্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথম বিকারঃ

ভাবের বা রসের এই সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আর কহিয়াছি যে ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতিরেকে অর্থাৎ সর্ব্বভূতে আত্মদৃষ্টি বা ব্রহ্মদৃষ্টি লাভ না হইলে চিত্তের এই সমতা লাভ হয় না। প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যতীত ভগবল্লীলারস অনুশীলনের অধিকারী কেহ হইতে পারে না, এই জন্যই গুরুশাস্ত্রমুখে এই কথাই শুনিয়াছি।

(৫)

মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত অনর্পিতচরী ভক্তিপথে যে কর্ম্মযোগের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে তাহা এই লীলাতত্ত্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে আবদ্ধ। এই রসমার্গে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর এই চারিটি রস ফুটিয়া উঠিয়াছে। পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি পুত্রাদির যে ভক্তি, তাহা যখন রসের পর্য্যায়ে যাইয়া উঠে, তখনই দাস্য রসের প্রকাশ হয়। সাধারণ প্রভুভক্তি বা গুরুভক্তিকে দাস্য রস কহা যায় না। পিতা-মাতা প্রভৃতি গুরুজনের আজ্ঞাপালন করিলেই কিম্বা প্রাণপণে তাঁহাদের সেবা করিলেও এই গুরুভক্তি দাস্যরস হয় না। নিঃশেষে আত্মবিলোপ রসের প্রথম লক্ষণ। পিতার ইচ্ছার সঙ্গে পুত্রের ইচ্ছা যখন নিশ্চিহ্ন হইয়া মিশিয়া যায়, পিতা যাহা চাহেন তাহার অতিরিক্ত কোনও কামনা যখন পুত্রের থাকে না তখনই পিতৃভক্তি দাস্যরসের সোপানে অধিরোহণ করে। ঈশা চরিত্র ও খৃষ্ট প্রবর্ত্তিত ভক্তি পন্থা এই দাস্য রসের উপরেই গড়িয়া উঠিয়াছে। মাতৃভক্তি এবং গুরুভক্তি সম্বন্ধেও এই কথাই সত্য। আর পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনেতে দেববুদ্ধি বা ব্রহ্মবুদ্ধি লাভ না হইলে মানুষ কখনওই তাঁহাদের সঙ্গে এই গভীর একাত্মতা লাভ করিতে পারে না। পিতামাতা, গুরুজন সম্বন্ধে সামান্য মানুষ বুদ্ধি লোপ না পাইলে দাস্যরস আস্বাদনে অধিকার জন্মে না। এই জন্যই ব্রহ্মজ্ঞান অথবা সর্ব্বভূতে আত্মজ্ঞান রাগানুগা ভক্তিমার্গের পূর্ব্ববৃত্তসাধন।

(৬)

ভূত-শুদ্ধি এবং চিত্তশুদ্ধি ব্যতিরেকে যেমন সত্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভ অসাধ্য, সেইরূপ সত্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ব্যতিরেকে মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত অনর্পিতচরী রাগানুগা ভক্তিসাধন অসাধ্য। আর এই ভক্তিপথ ব্যতিরেকে ভাগবতী লীলামার্গে কর্ম্মযোগের অনুশীলনও অসাধ্য। ভক্তিপথে যে কর্ম্মযোগের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহাকে এই ভাগবতী লীলাপথ আশ্রয় করিতেই হয়। এই পথের প্রবর্ত্তক দেহশুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধি। আজি কালি আমরা যাহাকে ইংরাজীতে ethical life বলি, অর্থাৎ যে সাধনের দ্বারা চরিত্রের বিশুদ্ধতা লাভ হয়, ইন্দ্রিয় লালসাদি সংযত হইয়া যায়, তাহাই আমাদের প্রাচীন সাধনার দেহশুদ্ধি এবং চিত্তশুদ্ধির উপায়। সত্যরক্ষা এবং ব্রহ্মচর্য্য বা শুক্রধারণ এই দেহশুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধির মূল প্রতিষ্ঠা। সত্যরক্ষা এবং শুক্রধারণের উপরেই আমরা আজি কালি যাহাকে বিশুদ্ধচরিত্র বলি তাহারও প্রতিষ্ঠা হয়। এইজন্যই বিশুদ্ধ চরিত্রলাভ এবং ভূতশুদ্ধি এবং চিত্তশুদ্ধি একই কথা। এখানে প্রাচীন এবং আধুনিক সাধনপথ পরস্পরের সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছে।

এই কর্ম্মযোগের পথের সাধক ব্রহ্মজ্ঞান। এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে মানুষে মনুষ্য-বুদ্ধি থাকে না। তখনই সাধক

অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ মানুষীং তনুমাশ্রিতম্
পরমভাবমজানন্তো মমভূতো মহেশ্বর :—

ভূত মহেশ্বর যে আমি, আমার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ যে কি ইহা ধরিতে না পারিয়া অজ্ঞানিগণ আমার মানুষীরূপকে অবজ্ঞা করে—ভগবদ্গীতার এই মহাবাক্যের মর্ম্ম বুঝিতে পারে। এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলেই কেবল

কৃষ্ণের যতেক লীলা সর্ব্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাহার স্বরূপ

মহাপ্রভুর ভক্তি সিদ্ধান্তের এই মূল তত্ত্বের প্রকৃত মর্ম্ম যে কি ইহা প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয়। এই জন্যই এই ব্রহ্মজ্ঞানের উপরে চিরদিন আমাদের দেশে ভক্তিপন্থায় সত্য কর্ম্মযোগের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। অশ্বিনীকুমারের কর্ম্মযোগ এই পথেই গড়িয়া উঠিয়াছিল। এইজন্যই অশ্বিনীকুমারের কর্ম্মজীবনে প্রাচীন সাধনার সঙ্গে আধুনিক আদর্শের একটা অপূর্ব্ব সমন্বয় চেষ্টা দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। প্রাচীন ভক্তিযোগ এবং কর্ম্মযোগের চাবীকাটি দিয়াই অশ্বিনীকুমারের চরিত্রের এবং জীবনের মণিকৌটার দ্বার উদ্ঘাটন করিতে হয়।

(৭)

কিন্তু অশ্বিনীকুমার কেবল প্রাচীন পন্থারই অনুসরণ করিয়াছিলেন, এমন কথাও বলা যায় না। তিনি যে যুগে জন্মিয়াছিলেন, বাল্যে এবং যৌবনে যে শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, যে আবেষ্টন এবং আবেষ্টনের ভিতর দিয়া তাঁহার জীবন ও চরিত্র গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে তাঁহার পক্ষে অবিচারিত ভাবে প্রাচীনের অনুবর্ত্তন সম্ভব ছিল না। যুগ-প্রভাবকে অগ্রাহ্য করিয়া অশ্বিনীকুমার গতানুগতিক পন্থা আশ্রয় করেন নাই। প্রথম যৌবনে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র এবং তদানীন্তন ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে অশ্বিনীকুমারের অত্যন্ত ঘনিষ্ট যোগ ছিল। সেকালের ব্রাহ্ম সমাজের শিক্ষা-দীক্ষার উপরেই অশ্বিনীকুমারের চরিত্রের বনিয়াদ গড়িয়া উঠে। এককালে অশ্বিনীকুমারের বন্ধুরা ভাবিয়াছিলেন যে তিনি ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শকে সর্ব্বতোভাবে বরণ করিয়া লইবেন, এবং ব্রাহ্মসম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া যাইবেন। তাঁহাদের এই আশা বা আশঙ্কা ফলিয়া উঠে নাই। অশ্বিনীকুমার পিতার আদেশে হিন্দুসমাজে হিন্দু-পদ্ধতি অনুসারে দার পরিগ্রহ করেন। কিন্তু ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ভুক্ত না হইলেও অশ্বিনীকুমার কোনওদিন প্রথম যৌবনের ব্রাহ্মসমাজের আদর্শকে বর্জ্জন করেন নাই। সেকালের ব্রাহ্ম চরিত্রের দুইটি প্রধান লক্ষণ ছিল ; এক,—সত্যনিষ্ঠা, আর এক,—ইন্দ্রিয়সংযম। এই দুই বিষয়ে অশ্বিনীকুমার চিরদিন খাঁটি ছিলেন। ফলতঃ প্রাচীন ব্রহ্মজ্ঞানলাভের আমরা যে দেহশুদ্ধি এবং চিত্তশুদ্ধির কথা শুনিতে পাই, আধুনিক ব্রাহ্ম সমাজে এই ইন্দ্রিয়-সংযম

বীর্য্যধারণ এবং সত্যনিষ্ঠার দ্বারা সেই সাধনই লাভ হইত। ফলতঃ প্রাচীন সাধনাতেও ব্রহ্মচর্য্য বা বীর্য্যধারণের দ্বারাই দেহশুদ্ধি লাভ হইত। সাধককে শুক্রধারণক্ষম করিবার জন্যই ব্রহ্মচর্য্যের যাবতীয় আচারবিচারের খুঁটিনাটির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

বর্জ্জয়েন্মধুমাংসঞ্চ গন্ধং মাল্যং রসান্ স্ত্রিয়ঃ
যানি দ্রব্যানি সুক্তানি সর্ব্বপ্রাণিহিংসনঞ্চ—

মদ্য, মাংস, সুগন্ধ দ্রব্য, পুষ্পমালাদি, রসাল খাদ্য, স্ত্রীসংসর্গ, যে সকল খাদ্য দ্রব্য পূর্ব্বদিন পাক হইয়া পরদিন পর্য্যন্ত রাখা হইয়াছে ; আর সকল প্রাণীর হিংসা বর্জ্জন করিবে—এই সকল প্রাচীন ব্রহ্মচর্য্যের বিধান ব্রহ্মচারীকে সংযতেন্দ্রিয় করিয়া তাঁহার ধাতুর প্রসন্নতা সাধন করিবার জন্যই বিহিত হইয়াছিল। পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পূর্ব্বে নূতন ইংরাজী শিখিয়া আমরা যতটা সরাসরি-ভাবে এ সকল আচারবিচারের ব্যবস্থাকে কুসংস্কারমাত্র বলিয়া বর্জ্জন করিয়াছিলাম, আজ সেভাবে বর্জ্জন করা সম্ভব নহে। সংযতেন্দ্রিয় হওয়া কতটা পরিমাণে যে আমাদের স্নায়ুমণ্ডলের স্বাস্থ্য, শক্তি এবং স্থৈর্য্যের উপরে নির্ভর করে, আধুনিক শরীর-বিজ্ঞান এবং মনস্তত্ত্বও ইহা ক্রমে ক্রমে ধরিতে পারিতেছে। খাদ্যাখাদ্যবিচারের উপরে দেহশুদ্ধি নির্ভর করে। আর দেহকে সাধনের অনুকূল করিবার জন্য এ সকল বিচার অগ্রাহ্য করা যায় না। ইহা আজিকালিকার যুক্তিবাদও অস্বীকার করিতে পারে না। এই দেহশুদ্ধির সঙ্গে চিত্তশুদ্ধিও অতিশয় ঘনিষ্টভাবে জড়াইয়া আছে। অশুদ্ধ দেহে অর্থাৎ যে দেহ সংযমসাধনের অনুকূল নহে, তাহার দ্বারা চিত্তশুদ্ধি বা চিত্তের সমতালাভ করা, অর্থাৎ বিষয়বাসনার গতিবেগ সংযত করা সম্ভব হয় না। এ সকল কথা এখন সকলেই স্বল্পবিস্তর স্বীকার করিতেছেন। এইরূপে আমাদের দেশের প্রাচীন সাধনে দেহশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতির প্রয়োজন আধুনিকেরাও আর অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে কোনও না কোনও আকারে এই সকল সাধন অবলম্বন করিতেই হইবে।

(৮)

ফলতঃ পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পূর্ব্বে আমাদের ব্রাহ্মসমাজেও এই সকল প্রাচীন পরিভাষা ব্যবহৃত না হইলেও বহুল পরিমাণে দেহশুদ্ধি এবং চিত্তশুদ্ধির মূল সাধন অবলম্বিত হইয়াছিল। অশ্বিনীকুমার যখন ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে মিশিতে আরম্ভ করেন, তখন ব্রাহ্ম সাধারণের মধ্যে বহুল পরিমাণে ব্রহ্মচর্য্যের নিয়মাদি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র প্রথম যৌবনে একদিকে খৃষ্টীয় ধর্ম্মনীতির এবং অন্যদিকে পুরুষানুক্রমাগত বৈষ্ণব সংস্কারের প্রভাবে বাল্যের বৈরাগ্য সাধন করিয়াছিলেন। অতি অল্প বয়স হইতেই নিরামিষাশী হইয়া "সর্ব্বপ্রাণি-হিংসনঞ্চ" বর্জ্জন করিয়াছিলেন। মদ্যপান সেকালের ইংরাজীশিক্ষিতদিগের মধ্যে বহুল প্রচলিত ছিলেও কেশবচন্দ্র কখনও তাহা স্পর্শ করেন নাই। প্রথম যৌবনে গন্ধমাল্যাদি ভোগবিলাসও

বিষবৎ বর্জ্জন করিয়া চলিতেন। কেশবচন্দ্রের প্রভাবে সেকালের ব্রহ্মসমাজেও এই সকল সংস্কার অবলম্বিত হইয়াছিল। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ব্রাহ্ম যুবকেরা অনেকেই মনুকে অন্যান্য বিষয়ে সঙ্কীর্ণ কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলিয়া বর্জ্জন করিলেও মনুপ্রোক্ত ব্রহ্মচর্য্যের বিধানগুলি আগ্রহের ধর্ম্মসাধনের অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অশ্বিনীকুমার যখন ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবে আসিয়া পড়েন, তখন ব্রাহ্মেরা সর্ব্বতোভাবে দেহশুদ্ধি এবং চিত্তশুদ্ধির জন্য একদিকে মনুর ব্রহ্মচর্য্যের বিধানগুলি কার্য্যতঃ মানিয়া চলিতে এবং অন্যদিকে কায়মনোবাক্যে সত্যরক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করিতেন। এই সত্যনিষ্ঠা ও ব্রহ্ম আমরণ তাঁহার জীবনে, আচরণে এবং চরিত্রে অবলম্বিত হইয়াছিল। ইহারই উপরে তাঁহা কর্ম্মযোগের প্রতিষ্ঠা হয়। এই ব্রহ্মচর্য্য ও সত্যরক্ষার দ্বারা সমদমাদি সাধনসম্পত্তির অধিকারী হইয়া অশ্বিনীকুমার সত্য ব্রহ্মজ্ঞানসাধনে অধিকার লাভ করেন। যদিও প্রথমযৌবনে অশ্বিনীকুমার বেদান্তাদি ব্রহ্মপ্রতিপাদক শাস্ত্রের অনুশীলন করিয়াছিলেন বলিয়া জানা নাই, তথাপি ব্রাহ্মসমাজে আচার্য্যদিগের উপদেশাদিতে অনেক পরিমাণে অজ্ঞাতসারে তিনি বেদান্ত-বিদ্যার অনুশীলন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের সিদ্ধান্ত ও মতবাদ যদিও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বাধীনে শঙ্করবেদান্তের সিদ্ধান্তকে বর্জ্জন করিয়াছিল, তথাপি কোনও কোনও দিক দিয়া দেখিলে উপনিষদের ব্রহ্মবিদ্যার উপরেই গড়িয়া উঠিয়াছিল। মহর্ষির ব্রাহ্মধর্ম্ম উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞানকে আশ্রয় করিয়াছিল। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মধর্ম্মও উপনিষদকে বর্জ্জন করে নাই, তাহারই সঙ্গে খৃষ্টিয়ান একেশ্বরবাদকে মিলাইয়া লইয়াছিল। মহর্ষি এবং কেশবচন্দ্র উভয়ে নিজেদের ধর্ম্মতত্ত্বে এবং ব্রহ্মজ্ঞানসাধনে আমাদিগের প্রাচীন ব্রহ্মতত্ত্ব এবং পরমাত্মতত্ত্বকে মিলাইয়া লইয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র শেষ জীবনে ইহার সঙ্গে ভগবদ্-তত্ত্বকেও মিলাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এইরূপে সেকালের ব্রাহ্মসমাজে সত্যই ব্রহ্মজ্ঞানসাধনের একটা চেষ্টা হইয়াছিল। আর ব্রাহ্ম সমাজের এই ব্রহ্মজ্ঞানের উপরেই অশ্বিনীকুমারের ধর্ম্মজীবন গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই ব্রহ্মজ্ঞানের উপরেই প্রথমে তাঁহার ভক্তিযোগের, এবং এই ভক্তিযোগের উপরে ক্রমে তাঁহার কর্ম্মযোগের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। এইরূপেই অশ্বিনীকুমারের জীবনের কর্ম্মপথে জ্ঞান এবং ভক্তিযোগের মিলন হইয়াছিল।

অশ্বিনীকুমারের অন্তর্জীবনের অভিব্যক্তির ইতিহাসে প্রথমে ব্রাহ্মসমাজের আদর্শে চরিত্র গঠনের চেষ্টা দেখিতে পাই। ইহারই সঙ্গে সঙ্গে যুক্তি ও বিচারের সাহায্যে অন্তর্নিহিত আস্তিক্যবুদ্ধির উপরে ব্রহ্মজ্ঞান-সাধনের প্রয়াসও প্রত্যক্ষ করি। ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মজ্ঞান বা ঈশ্বরজ্ঞান কেবল শুষ্ক-জ্ঞান ছিল না। মহর্ষির ব্রহ্মজ্ঞানের সঙ্গে মহম্মদীয় সাধকদিগের সখ্যভক্তি নিগূঢ়ভাবে মিশ্রিত ছিল। কেশবচন্দ্রের ব্রহ্মজ্ঞানের সঙ্গে প্রথমে খৃষ্টিয়ান সাধকদিগের দাস্যভক্তি, এবং পরে আংশিকভাবে আমাদিগের বৈষ্ণব সাধনার রাগানুগা ভক্তির ছায়াও

গিয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজের সাধনভজন আশ্রয় করিয়া প্রথম যৌবনে অশ্বিনীকুমার এই ভক্তিমিশ্রিত জ্ঞানোপস্থার অনুসরণ করিয়াছিলেন। এইখানেই তাঁহার অন্তর্জীবনের এবং ধর্ম্মজীবনের বিকাশ থামিয়া যায় নাই। ক্রমে সদ্‌গুরুর আশ্রয়লাভ করিয়া তিনি এই জ্ঞান এবং ভক্তির পথে আরও বহুদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। সদ্‌গুরু লাভের পরে অশ্বিনীকুমারের অন্তর্জীবন নূতন ভাবে গড়িয়া উঠে, এবং উত্তরোত্তর পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

আধুনিক যুক্তিবাদ গুরুকরণকে কুসংস্কার বলিয়া বর্জ্জন করিতে চাহিয়াছে। ইহাতে যুক্তিবাদের কোনওই দোষও নাই, কারণ সচরাচর যে ভাবে এ দেশের লোকেরা গুরু করিয়া থাকেন, তাহাতে ভক্তিসাধনে গুরুর সত্য স্থান যে কি, ইহার কোনওই সন্ধান পাওয়া যায় না। অনেক সময় এই গুরুকরণ এবং গুরুশক্তি একটা অতিপ্রাকৃত ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার এবং বস্তু বলিয়াই মনে হয়। এই গুরুকরণের যে কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে, ইহা ধরা অসম্ভব হয়। এই গুরুকরণের দার্শনিক তত্ত্বটাও বুঝা যায় না। এই জন্য যাঁহারা এ সকল বিষয়ে বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করিতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষে এই গুরুবাদের যুক্তিযুক্ততা স্বীকার করা কঠিন হইয়া উঠে। কিন্তু আমাদের দেশের ভক্তিসাধনে, বিশেষতঃ মহাপ্রভুপ্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব-ভক্তিপন্থাতে সদ্‌গুরুর যে স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা নিতান্ত যুক্তি ও বিজ্ঞানবিরুদ্ধ নহে। ইহার একটা বোধগম্য দার্শনিক ভিত্তির প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাই। ভাগবত পরমতত্ত্ব ভগবানকেই একমাত্র গুরুরূপে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আধুনিক যুক্তিবাদ যাহাকে মানুষ-গুরু বলিয়া বর্জ্জন করিতে চাহে, ভাগবতের গুরু এই জাতীয় নহেন। ভাগবতসিদ্ধান্তে গুরুকে মানুষ জ্ঞান করা অপরাধ বলিয়াছেন। মর্ত্ত্যবুদ্ধিতে গুরুকে অবজ্ঞা করিবে না; স্বয়ং ভগবানকেই গুরু বলিয়া জানিবে—ইহাই ভাগবতের অনুশাসন। ইহার অর্থ এই নহে যে গুরুতে ভগবদ্-অধিষ্ঠান আরোপ করিয়া গুরুর ভজনা করিবে। এইরূপ আরোপকে আমাদের শাস্ত্রে অধ্যাস কহিয়াছেন। "অন্যত্রদৃষ্টঃ পরত্রাভাসঃ"—ভগবান ভাষ্যকার অধ্যাসের এই সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ, একস্থানে যাহা দেখা গিয়াছে, অন্যত্র যেখানে তাহা তখন বিদ্যমান নাই, সেখানে তাহার আরোপ করার নামই অধ্যাস। জঙ্গলে সাপ দেখা গিয়াছে; ঘরের পৈঠায় সত্য সাপ নাই, এক গাছা দড়ি পড়িয়া আছে; এই দড়িতে সর্পজ্ঞান আরোপ-করাই অধ্যাস। যে মানুষের মধ্যে ভগবানের স্বরূপ প্রত্যক্ষ নহে, তাঁহাতে ভগবত্ত্ব আরোপ করিলে ইহা অধ্যাস হয়। যে গুরুতে ভগবানের প্রকাশ ফুটিয়া উঠে নাই; অর্থাৎ, যাঁহাকে দেখিবামাত্র সাধকের অন্তর্নিহিত নিত্যসিদ্ধ ভগবদ্ভাব জাগিয়া না উঠে, তাঁহার মধ্যে ভগবান আছেন, এইরূপ কল্পনা করিলে ইহা অধ্যাস হয়। সদ্‌গুরুতত্ত্ব বুঝিতে হইলে সকলের আগে এই কথাটা বুঝিতে হইবে। সদ্‌গুরু তিনি যাঁহার মধ্যে ভগবান স্বয়ংপ্রকাশ করিয়া প্রকট হয়েন; যাঁহাকে দেখিলে "ইঁহার মধ্যে ভগবান আছেন", চক্ষু বুজিয়া এই কল্পনা করিতে হয় না, কিন্তু স্বতঃই অন্তরে ভগবদ্বুদ্ধি জাগিয়া উঠে, কেবল তিনিই

বিষবৎ বর্জ্জন করিয়া চলিতেন। কেশবচন্দ্রের প্রভাবে সেকালের ব্রহ্মসমাজেও এই সকল মত অবলম্বিত হইয়াছিল। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ব্রাহ্ম যুবকেরা অনেকেই যজ্ঞোপবীতকে অনাবশ্যক সঙ্কীর্ণ কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলিয়া বর্জ্জন করিলেও মনুপ্রোক্ত ব্রহ্মচর্য্যের বিধানগুলি আগ্রহের ধর্ম্মসাধনের অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অশ্বিনীকুমার যখন ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবে আসিয়া পড়েন, তখন ব্রাহ্মেরা সর্ব্বতোভাবে দেহশুদ্ধি এবং চিত্তশুদ্ধির জন্য একদিকে মনুর ব্রহ্মচর্য্যের বিধানগুলি কার্য্যতঃ মানিয়া চলিতেন এবং অন্যদিকে কায়মনোবাক্যে সত্যরক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করিতেন। এই সত্যনিষ্ঠা ও ব্রহ্ম আমরণ তাঁহার জীবনে, আচরণে এবং চরিত্রে অবলম্বিত হইয়াছিল। ইহারই উপরে কর্ম্মযোগের প্রতিষ্ঠা হয়। এই ব্রহ্মচর্য্য ও সত্যরক্ষার দ্বারা সমদমাদি সাধনসম্পত্তির অধিকারী হইয়া অশ্বিনীকুমার সত্য ব্রহ্মজ্ঞানসাধনে অধিকার লাভ করেন। যদিও প্রথমযৌবনে অশ্বিনীকুমার বেদান্তাদি ব্রহ্মপ্রতিপাদক শাস্ত্রের অনুশীলন করিয়াছিলেন বলিয়া জানা নাই, তথাপি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যদিগের উপদেশাদিতে অনেক পরিমাণে অজ্ঞাতসারে তিনি বেদান্ত-বিদ্যার অনুশীলন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের সিদ্ধান্ত ও মতবাদ যদিও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে শঙ্করবেদান্তের সিদ্ধান্তকে বর্জ্জন করিয়াছিল, তথাপি কোনও কোনও দিক দিয়া দেখিতে গেলে উপনিষদের ব্রহ্মবিদ্যার উপরেই গড়িয়া উঠিয়াছিল। মহর্ষির ব্রাহ্মধর্ম্ম উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞানের আশ্রয় করিয়াছিল। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মধর্ম্মও উপনিষদকে বর্জ্জন করে নাই, তাহারই সঙ্গে খৃষ্টিয়ান একেশ্বরবাদকে মিলাইয়া লইয়াছিল। মহর্ষি এবং কেশবচন্দ্র উভয়ে নিজেদের ধর্ম্মতত্ত্বে এবং ব্রহ্মজ্ঞানসাধনে আমাদিগের প্রাচীন ব্রহ্মতত্ত্ব এবং পরমাত্মতত্ত্বকে মিলাইয়া লইয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র শেষ জীবনে ইহার সঙ্গে ভগবদ্-তত্ত্বকেও মিলাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এইরূপে সেকালের ব্রাহ্মসমাজে সত্যই ব্রহ্মজ্ঞানসাধনের একটা চেষ্টা হইয়াছিল। আর ব্রাহ্মসমাজের এই ব্রহ্মজ্ঞানের উপরেই অশ্বিনীকুমারের ধর্ম্মজীবন গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই ব্রহ্মজ্ঞানের উপরেই প্রথমে তাঁহার ভক্তিযোগের, এবং এই ভক্তিযোগের উপরে ক্রমে তাঁহার কর্ম্মযোগের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। এইরূপেই অশ্বিনীকুমারের জীবনের কর্ম্মপথে জ্ঞান এবং ভক্তির মিলন হইয়াছিল।

অশ্বিনীকুমারের অন্তর্জীবনের অভিব্যক্তির ইতিহাসে প্রথমে ব্রাহ্মসমাজের আদর্শে চরিত্র গঠনের চেষ্টা দেখিতে পাই। ইহারই সঙ্গে সঙ্গে যুক্তি ও বিচারের সাহায্যে অন্তর্নিহিত আস্তিক্যবুদ্ধির উপরে ব্রহ্মজ্ঞান-সাধনের প্রয়াসও প্রত্যক্ষ করি। ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মজ্ঞান বা ঈশ্বরজ্ঞান কেবল শুষ্ক-জ্ঞান ছিল না। মহর্ষির ব্রহ্মজ্ঞানের সঙ্গে মহস্মদীয় সাধকের সখ্যভক্তি নিগূঢ়ভাবে মিশ্রিত ছিল। কেশবচন্দ্রের ব্রহ্মজ্ঞানের সঙ্গে প্রথমে খৃষ্টিয়ান সাধকের দাস্যভক্তি, এবং পরে আংশিকভাবে আমাদিগের বৈষ্ণব সাধনার রাগানুগা ভক্তির ছায়াও

গিয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজের সাধনভজন আশ্রয় করিয়া প্রথম যৌবনে অশ্বিনীকুমার এই জ্ঞানমিশ্রিত ভক্তিপন্থার অনুসরণ করিয়াছিলেন। এইখানেই তাঁহার অন্তর্জীবনের এবং ধর্ম্মজীবনের বিকাশ থামিয়া যায় নাই। ক্রমে সদ্‌গুরুর আশ্রয়লাভ করিয়া তিনি এই জ্ঞান এবং ভক্তির পথে আরও বহুদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। সদ্‌গুরু লাভের পরে অশ্বিনীকুমারের অন্তর্জীবন নূতন ভাবে গড়িয়া উঠে, এবং উত্তরোত্তর পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

আধুনিক যুক্তিবাদ গুরুকরণকে কুসংস্কার বলিয়া বর্জ্জন করিতে চাহিয়াছে। ইহাতে যুক্তি-বাদের কোনওই দোষও নাই, কারণ সচরাচর যে ভাবে এ দেশের লোকেরা গুরু করিয়া থাকেন, তাহাতে ভক্তিসাধনে গুরুর সত্য স্থান যে কি, ইহার কোনওই সন্ধান পাওয়া যায় না। অনেক সময় এই গুরুকরণ এবং গুরুশক্তি একটা অতিপ্রাকৃত ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার এবং বস্তু বলিয়াই মনে হয়। এই গুরুকরণের যে কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে, ইহা ধরা অসম্ভব হয়। এই গুরুকরণের দার্শনিক তত্ত্বটাও বুঝা যায় না। এই জন্য যাঁহারা এ সকল বিষয়ে বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করিতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষে এই গুরুবাদের যুক্তিযুক্ততা স্বীকার করা কঠিন হইয়া উঠে। কিন্তু আমাদের দেশের ভক্তিসাধনে, বিশেষতঃ মহাপ্রভুপ্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব-ভক্তিপন্থাতে সদ্‌গুরুর যে স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা নিতান্ত যুক্তি ও বিজ্ঞানবিরুদ্ধ নহে। ইহার একটা বোধগম্য দার্শনিক ভিত্তির প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাই। ভাগবত পরমতত্ত্ব ভগবানকেই একমাত্র গুরুরূপে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আধুনিক যুক্তিবাদ যাহাকে মানুষ-গুরু বলিয়া বর্জ্জন করিতে চাহে, ভাগবতের গুরু এই জাতীয় নহেন। ভাগবতসিদ্ধান্তে গুরুকে মানুষ জ্ঞান করা অপরাধ বলিয়াছেন। মর্ত্ত্যবুদ্ধিতে গুরুকে অবজ্ঞা করিবে না; স্বয়ং ভগবানকেই গুরু বলিয়া জানিবে—ইহাই ভাগবতের অনুশাসন। ইহার অর্থ এই নহে যে গুরুতে ভগবদ্-অধিষ্ঠান আরোপ করিয়া গুরুর ভজনা করিবে। এইরূপ আরোপকে আমাদের শাস্ত্রে অধ্যাস কহিয়াছেন। "অন্যত্রদৃষ্টঃ পরত্রাভাসঃ"—ভগবান ভাষ্যকার অধ্যাসের এই সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ, একস্থানে যাহা দেখা গিয়াছে, অন্যত্র যেখানে তাহা তখন বিদ্যমান নাই, সেখানে তাহার আরোপ করার নামই অধ্যাস। জঙ্গলে সাপ দেখা গিয়াছে; ঘরের পৈঠায় সত্য সাপ নাই, এক গাছা দড়ি পড়িয়া আছে; এই দড়িতে সর্পজ্ঞান আরোপ করাই অধ্যাস। যে মানুষের মধ্যে ভগবানের স্বরূপ প্রত্যক্ষ নহে, তাঁহাতে ভগবত্ত্ব আরোপ করিলে ইহা অধ্যাস হয়। যে গুরুতে ভগবানের প্রকাশ ফুটিয়া উঠে নাই; অর্থাৎ, যাঁহাকে দেখিবামাত্র সাধকের অন্তর্নিহিত নিত্যসিদ্ধ ভগবদ্ভাব জাগিয়া উঠে না উঠে, তাঁহার মধ্যে ভগবান আছেন, এইরূপ কল্পনা করিলে ইহা অধ্যাস হয়। সদ্‌গুরুতত্ত্ব বুঝিতে হইলে সকলের আগে এই কথাটা বুঝিতে হইবে। সদ্‌গুরু তিনি যাঁহার মধ্যে ভগবান স্বপ্রকাশ করিয়া প্রকট হয়েন; যাঁহাকে দেখিলে "ইঁহার মধ্যে ভগবান আছেন", চক্ষু দিয়া এই কল্পনা করিতে হয় না, কিন্তু স্বতঃই অন্তরে ভগবদ্বুদ্ধি জাগিয়া উঠে, কেবল তিনিই

সদ্‌গুরু হইতে পারেন। যেখানে গুরুতে ভগবদ্-সত্তা আরোপ করিতে হয়, সেই
আর শালগ্রাম শিলাতে কিম্বা অন্য কোনও প্রতীকে কোনও প্রভেদ থাকে না। সাধক
মনুষ্যবুদ্ধিতে অবজ্ঞা করিবে না; ভাগবতের এই অনুশাসনের অর্থ এ নহে যে, সাধক জোর
এই মনুষ্যবুদ্ধিকে চাপিয়া রাখিবেন, কিন্তু এই মনুষ্যবুদ্ধি আপনা হইতে জাগিবে না।

ভাগবত একমাত্র পরমতত্ত্ব ভগবানকেই [illegible] প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ভগবানের
গুরুশক্তির দ্বিবিধ প্রকাশ হয়। [illegible] সাধকের অন্তরে অন্তর্যামীরূপে; অপর বাহিরে
মহাপুরুষরূপে। যে সাধক সাধন বলে ভগবদ্‌কৃপায় আপনার অন্তর্নিহিত ভাগবতী শক্তি
জাগাইয়া সেই শক্তির নিকটে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করিয়া শ্রীভগবানের সঙ্গে এক
ভাগবতী তনু লাভ করেন, তাঁহার সকল চেষ্টা, সকল কর্ম্ম, সকল ভাব ভগবদ্‌প্রেরণায়
অনুষ্ঠিত এবং স্ফুরিত হয়, তাঁহার নিজের বলিতে কিছুই থাকে না, সেই সাধকই আপনার মধ্যে
ভগবানকে প্রকট করিয়া তুলেন। তাঁহার মধ্যে ভগবানের সত্তা আরোপ করিতে হয় না, প্রত্যক্ষ
প্রত্যক্ষ করা যায়। এই সিদ্ধি যাঁর লাভ হইয়াছে, তিনিই কেবল সদ্‌গুরুপদবাচ্য হয়েন।
সদ্‌গুরুসাক্ষাৎকার যাঁর ভাগ্যে ঘটিয়াছে, কেবল তিনিই আমাদের সাধনার ভক্তিপন্থায় যে
তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারেন। এই সদ্‌গুরুতত্ত্ব আমাদের
মূল প্রকৃতির উপরে প্রতিষ্ঠিত। আমাদের জ্ঞানের দুই অঙ্গ, এক অন্তরঙ্গ, অপর বহিরঙ্গ।
আমাদের অন্তরে বস্তুজ্ঞানলাভের জন্য কতকগুলি জ্ঞানের ছাঁচ আছে, এরূপ বলিতে পারা
এই অন্তরের জ্ঞানের ছাঁচগুলিকেই আমাদের প্রচলিত প্রবাদবাক্যে "ভাণ্ড" করিয়া
"যাহা নাই ভাণ্ডে, তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে"—এখানে ভাণ্ড শব্দের ইহাই প্রকৃত অর্থ। এই ভাণ্ড
ইংরাজী দর্শনে intuition কহে। ইহাকেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মতত্ত্বে আত্মপ্রত্যয়
কহিয়াছেন। আমাদের অন্তরের ভাণ্ড বা জ্ঞানের ছাঁচগুলি বা intuition or আত্ম-প্রত্যয়
বস্তুর বহিঃসাক্ষাৎকার ব্যতীত সচেতন বা কার্য্যক্ষম হয় না। বাহিরের বস্তুসাক্ষাৎকারেই
ভিতরের এই জ্ঞানের ছাঁচগুলি পরিপূর্ণ হইয়া একদিকে নিজেদের প্রকৃতি এবং আকার,
অন্যদিকে বাহিরের বস্তুজ্ঞান প্রকাশ করিয়া থাকে। সুতরাং "যাহা নাই ভাণ্ডে তাহা
ব্রহ্মাণ্ডে" ইহাতে সত্যের এক দেশ মাত্র প্রকাশিত করে। এই কথাটা যেমন সত্য, "
দেখি না ব্রহ্মাণ্ডে তাহা জাগে না ভাণ্ডে", এই কথাটাও সেইরূপই সত্য। কেবল ভাণ্ডে
জ্ঞানলাভ হয় না, কেবল ব্রহ্মাণ্ডের দ্বারাও হয় না। ভাণ্ড এবং ব্রহ্মাণ্ড উভয়ের যোগে
জ্ঞান সম্ভব হয়। আত্মপ্রত্যয় এবং বস্তু সাক্ষাৎকার উভয়ই জ্ঞানলাভের জন্য সমান প্রয়োজনীয়।

ব্রহ্মজ্ঞান বা ভগবদ্-জ্ঞান সম্বন্ধেও এই কথাই সত্য। অন্তর্নিহিত নিত্যসিদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান বা
ভগবদ্-জ্ঞান বাহিরে ব্রহ্মসত্তার বা ভগবদ্-সত্তার প্রকাশ ব্যতিরেকে কখনও জন্মে না,
পারে না। যতক্ষণ না বাহিরে ব্রহ্মপ্রকাশ বা ভগবদ্-প্রকাশ হইয়াছে, ততক্ষণ

ব্রহ্মজ্ঞান বা ভগবদ্-জ্ঞানলাভ অসম্ভব। আর আমাদের জ্ঞানের এই মূল প্রকৃতির উপরেই আমাদের ভক্তিপন্থা। সত্য সদ্‌গুরুতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। অশ্বিনীকুমারের জ্ঞান, ভক্তি এবং কর্ম্মযোগসাধনে এই জন্যই সদ্‌গুরুলাভ একটা বিশেষ ঘটনা।

অশ্বিনীকুমারের পরম সৌভাগ্য পূজ্যপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কে সদ্‌গুরুরূপে পাইয়াছিলেন। গোস্বামী মহাশয় এই যুগের মানুষ ছিলেন। বর্ত্তমান যুগে চিন্তা এবং সাধনার সঙ্গে গোস্বামী মহাশয় আমাদের দেশের সনাতন সাধনার একটা অপূর্ব্ব সমন্বয় করিয়া এই সমন্বয়ের উপরেই নিজের ধর্ম্মজীবনকে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। এই অপূর্ব্ব সমন্বয়ের উপরেই তাঁহার অলোকসামান্য সিদ্ধির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। গোস্বামী মহাশয়ের শিক্ষাদীক্ষা এবং গুরুশক্তি-প্রভাবেই অশ্বিনীকুমারের ধর্ম্মজীবন এবং কর্ম্মজীবন গড়িয়া উঠিয়াছিল। অশ্বিনীকুমারকে বুঝিতে হইলে তাঁহার গুরুকে ভাল করিয়া জানা প্রয়োজন।

গোস্বামী মহাশয়ও অশ্বিনীকুমারের মতন ব্রাহ্মসমাজেরই লোক ছিলেন। বর্ত্তমান যুগে ব্রাহ্মসমাজের সাধনপথেও যে সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদৃষ্টিলাভ এবং এই ব্রহ্মজ্ঞানের উপরে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুপ্রবর্ত্তিত অনর্পিতচরী ভক্তিপথে সিদ্ধিলাভ সম্ভব, গোস্বামী মহাশয়ের জীবনে এবং চরিত্রে এই কথাটাই প্রমাণ হইয়াছে। সর্ব্বসংস্কারবর্জ্জিত না হইতে পারিলে সত্য ব্রহ্মজ্ঞানলাভের অধিকার জন্মে না। পুরুষানুক্রমাগত সংস্কার এবং গতানুগতিক ধর্ম্মের অনুসরণ মানুষকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে দেয় না। এ পথে মানুষ কলের পুতুলের মতন নির্দ্দিষ্ট আচার-বিচার মানিয়া চলে। এ সকল আচারবিচার প্রতিপালনে তাহার ধর্ম্মজিজ্ঞাসা বা ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় হয় না। প্রচলিতে সন্দেহ উপস্থিত না হইলে জিজ্ঞাসা জাগে না। জিজ্ঞাসা না জাগিলে বিচারের প্রেরণা জাগে না। বিচার ব্যতিরেকে কোনও সত্যই সাধকের অনুভবে প্রতিষ্ঠিত হয় না। অনুভবে যাহা প্রতিষ্ঠিত হয় না তাহা অপরোক্ষ জ্ঞান নহে। এই জন্যই আমাদের প্রাচীনেরা "অনুভূতি-পর্য্যন্তং জ্ঞানং" জ্ঞানের এই সংজ্ঞা দিয়া গিয়াছেন। সংস্কার মাত্রেই তাহা ভালই হউক, আর মন্দই হউক, মানুষের জ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখে। সংস্কার যত বদ্ধমূল হয় ততই তাহা প্রকৃত জ্ঞানলাভের অন্তরায় হইয়া থাকে। সংস্কারবদ্ধ গতানুগতিক ধর্ম্মে নিষ্ঠা দ্বারা কিয়ৎপরিমাণে দেহশুদ্ধি এবং চিত্তশুদ্ধিলাভ হইলেও অপরোক্ষ জ্ঞানলাভ সম্ভব হয় না। এই জন্যই জ্ঞানসাধনে প্রথম কথা সর্ব্বসংস্কারবর্জ্জন। সর্ব্বসংস্কার বর্জ্জন করিয়া মনোদর্পণ নির্ম্মল হইলেই তাহার উপরে সত্যের স্বরূপ প্রতিভাত হয়। ইহাই সাধনপথে সংস্কারবর্জ্জনের প্রয়োজন।

গোস্বামী মহাশয় শ্রীমন্ অদ্বৈত আচার্য্যের বংশে পরমভাগবত বৈষ্ণবকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও পৈতৃক সংস্কারে আবদ্ধ হন নাই। প্রথম যৌবনে পৈতৃক ব্যবসায় করিতে করিতেই তাঁহার ধর্ম্মজিজ্ঞাসার উদয় হয়। নিজে অসিদ্ধ থাকিয়া অপরকে সাধনপথে পরিচালিত করা অসাধ্য বুঝিয়াই গোস্বামী মহাশয় পৈতৃক গুরুগিরি ব্যবসায় পরিত্যাগ করেন। বেদান্ত পড়িয়া

প্রচলিত দেবোপাসনায় তাঁহার অনাস্থা জন্মে। ক্রমে শঙ্করবেদান্ত সিদ্ধান্তে অতৃপ্ত হইয়া [illegible] ব্রহ্মজ্ঞান মুক্তি দেয় না, দিতে পারে না, ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া গোস্বামী মহাশয় ক্রমে ব্রাহ্ম[illegible] প্রতি আকৃষ্ট হয়েন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রাণস্পর্শী উপদেশে [illegible]শ্বরভক্তির উচ্ছ্বাসে [illegible] চিত্তকে ব্রাহ্মসমাজের সাধনপথে প্রবর্ত্তিত করে। [illegible]ষ্ঠাসহকারে এই নূতন সাধন [illegible] করিয়া গোস্বামী মহাশয় ক্রমে শমদমাদি [illegible]প্তিলাভে প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানসাধনে অধিকারী [illegible] তাঁহার সত্যনিষ্ঠা তাঁহাকে আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের [illegible] ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে লইয়া যায়। কেশবচন্দ্রের ভাব ও ভক্তিপ্রবণ উপাসনাদি ক্রমে [illegible] গোস্বামী মহাশয়ের অন্তরে বিশুদ্ধা বৈধী ভক্তি প্রতিষ্ঠা করে। এখানেই তাঁহার অধ্যাত্ম-জীবনের বিকাশ থামিয়া যায় নাই। তাঁহার সত্যনিষ্ঠা এবং ধর্ম্মপিপাসা তাঁহাকে চারিদিকে সত্য [illegible] ভগবানের অন্বেষণে ছুটাইয়া লইয়া যায়। ক্রমে তিনি ব্রাহ্মসমাজের সাধনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের নামযপ এবং রাজযোগ সাধন করিতে আরম্ভ করেন। প্রাণায়ামাদি [illegible] এই নূতন ভক্তিযোগ সাধনের দ্বারা তাঁহার পরিপূর্ণ দেহশুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধি লাভ হইলে গুরু[illegible] সঞ্চারে ব্রহ্মদর্শন বা অপরোক্ষ ব্রহ্মানুভূতি লাভ হয়। তখন তাঁহার জীবনে ও চরিত্রে—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ
ক্ষিয়ন্তে চাহস্যকর্ম্মাণি তস্মিন্‌দৃষ্টে পরাবরে।

এই শ্রুতি বাক্য ফলিয়া উঠে। তখন হইতে তাঁহার সকল আত্ম-সুখকামনা নিঃশেষে [illegible] হইয়া যায়। ব্রহ্মসাক্ষাৎকারলাভে তাঁহার চিত্তের যাবতীয় সংশয় নিঃশেষে দূরীভূত [illegible] কর্ম্মফললাভের লালসা হইতে যে কর্ম্মবন্ধনের সৃষ্টি হইয়া থাকে, সে কর্ম্ম নিশ্চিহ্ন হইয়া [illegible] প্রাপ্ত হয়। তখন হইতে গোস্বামী মহাশয় সর্ব্বভূতে আত্মদৃষ্টি বা ব্রহ্মদৃষ্টি লাভ [illegible] অন্তরে বাহিরে সম্পূর্ণ দ্বন্দ্বাতীত হইয়া সত্য ভক্তির বনিয়াদ শান্তভাবেতে অচ্যুত প্রতি[illegible] লাভ করেন। এই অবস্থা লাভ হইলে পরে তাঁহার চক্ষে আর জীব, জীব রহিল না, শিব[illegible] ফুটিয়া উঠিল। মানুষ, মানুষ রহিল না, ব্রহ্মপ্রকাশরূপে ফুটিয়া উঠিল। তখন গো[illegible] মহাশয়ের মধ্যে

স্থাবর জঙ্গম দেখে দেখে না তার মূর্ত্তি
যাঁহা নেত্র পড়ে হয় ইষ্টদেবস্ফূর্ত্তি—

এই তত্ত্বটা প্রকাশিত ও স্বপ্রমাণ হইল। নরের মধ্যে নারায়ণ প্রকট [illegible] উঠিলেন। এই যে অদ্বৈত ব্রহ্মসিদ্ধি, ইহারই উপরে গোস্বামী মহাশয়ের জীবনে ও [illegible] মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত অনর্পিতচরী রাগানুগা ভক্তির মূর্ত্তি গড়িয়া উঠিতে লাগিল। এই ভক্তি[illegible] তিনি আমাদিগের প্রাচীন মহাজনসিদ্ধান্ত প্রত্যক্ষ করিয়া মহাজন পন্থা অনুসরণে ভগবল্লীলার [illegible] ও অনুবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করেন। এইরূপেই গোস্বামী মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের [illegible]

[illegible] ক্রমে অ[illegible] ব্রাহ্মানুভূতি লাভ করিয়া এই ব্রহ্মজ্ঞানের উপরেই ভাগবতী লীলতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত রাগানুগা ভক্তিসাধনে অলোকসামান্য সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। এই [illegible]লেই ভাগবতী তনু পাইয়া গোস্বামী মহাশয় সত্য সদ্‌গুরুর আসন লাভ করেন।

গোস্বামী মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের সাধনকে এবং সিদ্ধান্তকে বর্জ্জন করিয়া তাহার বিপরীত কোনও সাধন বা সিদ্ধান্ত অবলম্বন করেন নাই; কিন্তু স্বাভাবিক ক্রমবিকাশের পথে এই সাধনকে ক্রমে অতিক্রম করিয়া ইহারই পরপর স্বাভাবিক বিকাশসোপানে আরোহণ করিয়া শেষে চরম সিদ্ধিলাভ করেন। এই কথাটা না বুঝিলে গোস্বামী মহাশয়ের সাধনসূত্র এবং সিদ্ধির স্বরূপ [illegible] যাইবে না। আর এইটি না বুঝিলে গোস্বামী মহাশয় কিরূপে বিশেষভাবে আমাদের এই যুগের যুগের মানুষ হইয়াছিলেন, এই সত্যটাও যাইবে না।

অশ্বিনীকুমারও ব্রাহ্মসমাজের সাধনপথে চলিয়াই ক্রমে তাঁহার ভক্তিযোগ এবং কর্ম্মযোগের পথে প্রবেশ করেন। ব্রাহ্মসমাজের সাধনের দ্বারা অনেকটা দেহশুদ্ধি এবং চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়াই তিনি গোস্বামী মহাশয়ের আশ্রয় লাভ করেন। গোস্বামী মহাশয়ের সাধনে প্রতিপ্রাকৃত অথবা ব্রাহ্মসমাজের সাধনের বিরোধী কোনও কিছু ছিল না। গোস্বামী মহাশয় আমাদের দেশের প্রাচীন সদ্‌গুরুদিগের পন্থা অবলম্বনে ভিন্ন ভিন্ন দীক্ষার্থীদিগকে তাঁহাদের ভিতরের প্রকৃতি অনুযায়ী ইষ্টনাম দান করিতেন। ব্রাহ্মসমাজের লোকদিগকে তিনি ব্রহ্মনামই দিতেন। আমার বোধহয় অশ্বিনীকুমারকেও এই ব্রহ্মনামই দিয়াছিলেন। এই নাম যপ গোস্বামী মহাশয়ের সাধনের মুখ্য কথা ছিল। নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে নামযপ করিবে—তাঁহার এই উপদেশ ছিল। তিনি প্রত্যেক সাধককে তাঁহার ইষ্টমন্ত্র দিবার সময়ে নামের অর্থটি বুঝাইয়া দিতেন; এবং এই অর্থকে ধ্যান করিয়া নামযশ করিতে হইবে ইহা বলিয়া দিতেন। ক্লীং হ্রীং প্রভৃতি বৈদিক বা তান্ত্রিক বীজের সঙ্গে গোস্বামী মহাশয়ের প্রদত্ত ইষ্টমন্ত্রের কোনও যোগ ছিল না। একমাত্র ব্রহ্ম-প্রতিপাদক ওঁকারের অথবা প্রণবের সঙ্গে তাঁহার প্রদত্ত ইষ্টমন্ত্র যুক্ত থাকিত। এই ওঁ সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় যাহা হইতে সেই পরমতত্ত্বকে নির্দ্দেশ করে, এই কথাটা বিশদরূপে বুঝাইয়া দিতেন। সুতরাং যে যে নামই জপ করুক না কেন, যপ করিবার সময় তাহাকে পরমব্রহ্মের বা পরম-তত্ত্বের ধ্যান করিতে হইত। গোস্বামী মহাশয়ের সাধনে নিষেধ ছিল মদ্যপান, পরদার বা ব্যভিচার, পরনিন্দা এবং মিথ্যা আচরণ। আর নিষেধ ছিল মাংস, ডিম্ এবং উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ। এ ছাড়া আর কোনও বাঁধাবাঁধি ছিল না। তাঁহার সাধনের বিধি ছিল ভূতশুদ্ধির জন্য প্রাণায়াম, সাধুভক্তি এবং সাধুসঙ্গ, আর নিয়মিতরূপে নামযপ। এই বিধিনিষেধের বাহিরে শিষ্যেরা স্বাধীন-ভাবে যদৃচ্ছা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন। এই জন্য নিরাকার উপাসনা বা সাকার উপাসনা, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন বা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বর্জ্জন, এ সকল বিষয়ে গোস্বামী মহাশয়ের সাধনের লোকেরা সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। সনাতন হিন্দু, জ্ঞানপন্থীই হউন বা কর্ম্মপন্থীই

BLOCKED INFORMATION.

হউন, বৌদ্ধ ও জৈন মতাবলম্বী, আধুনিক আর্য্যসমাজী বা ব্রাহ্ম, এমন কি মুসলমান খৃষ্টান সকলেই এই সাধন গ্রহণ করিতে পারিতেন। কোনও বিশিষ্ট সিদ্ধান্ত বা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের গোস্বামী মহাশয়ের সাধনের কোনও বিরোধ ছিল না। এই দিক দিয়া দেখিলে মহাশয়ের সাধন সত্যই অসম্প্রদায়িক বা সার্ব্বজনীন, একথা বলা যাইতে পারে।

অশ্বিনীকুমার এই সাধন অবলম্বন করিয়া গুরুশক্তিপ্রভাবে এবং গুরুকৃপায় ভক্তিযোগ ও কর্ম্মযোগের পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহার ভক্তিযোগ এবং উভয়ই সত্য ব্রহ্মজ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই ব্রহ্মজ্ঞান প্রথমে বিচার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জ্ঞানের দুই পথ। এক ব্যতিরেকী, অপর অন্বয়ী। যা দেখিতেছি শুনিতেছি, অনুমান উপমানাদির দ্বারা যাহার প্রতিষ্ঠা করিতেছি, তাহা কিছু নহে, এই ভাবেই ব্যতিরেকী ব্রহ্মজ্ঞানসাধন করিতে হয়। এইরূপে যখন জড়ের ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের উপরে অতীন্দ্রিয়ের অধ্যাস, এবং ব্রহ্মবস্তু বা তত্ত্ববস্তু অবাঙ্‌মনসোগোচর প্রতীতি জন্মে, এক কথায় যখন ব্রহ্মতত্ত্ব নিরাকার নির্ব্বিশেষ তত্ত্ব এই ছয় বিশ্বাস জন্মে, তখন নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। কিন্তু জ্ঞানপথে ইহাই শেষ কথা নহে। এই নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞান পরিপূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান নহে। এই নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা বিশ্বসমস্যার নিঃশেষ মীমাংসা হয় না। এই নিরাকার-ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা প্রাণেরও তৃপ্তি হয় না। এই নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞানের উপরে ভক্তি গড়িয়া উঠিতে পারে না। এই জন্যই এই ব্যতিরেকী উপাসনার দ্বারা চিত্ত নির্ব্বিকার এবং নির্ম্মল হইলে পরে সাধকের অন্বয়ী উপাসনার অধিকার জন্মে। তখন সাধক যে শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধময় বিশ্বকে ব্রহ্ম নহে বলিয়া পরমার্থ সম্পর্কশূন্য করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহাকেই আবার পরমতত্ত্বের অধিষ্ঠানের দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া তুলেন। যে পথে ইন্দ্রিয়াতীত-ব্রহ্মসত্তার দ্বারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্ব আচ্ছন্ন এবং পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, তাহাই অন্বয়ী উপাসনার পথ। এই পথে ইন্দ্রিয়াতীত-ব্রহ্মতত্ত্বকে ভাবাঙ্গসাধনের আশ্রয়ে বিশ্বময় প্রত্যক্ষ করা যায়; এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের মধ্যেই সাধক ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ করিতে পারেন। এই অবস্থায় সাধকের নিকটে অশব্দের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, রস অরসের দ্বারা রসায়িত হয়, গন্ধ অগন্ধকে আস্বাদিত করে। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা গ্রহণ করা অসম্ভব তাহাই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের মধ্যে আপনাকে ফুটাইয়া তুলে। অরূপও তখন ভাব-ও-রূপ ধারণ করিয়া থাকেন। এই প্রত্যক্ষ রূপের ভিতরেই সে চক্ষু বাহ্য হারাইয়া অরূপের সাক্ষাৎকার লাভ করে। এই অবস্থাতেই রাগানুগা ভক্তির সূচনা হয়।

আমি যখন প্রথমে একটু ঘনিষ্ঠভাবে অশ্বিনীকুমারের পরিচয় পাই, সে আজ প্রায় চব্বিশ বৎসরের কথা, তখন তিনি এই অবস্থাতে প্রবেশ করিতেছিলেন। প্রথম যৌবনের ব্রাহ্মসমাজী সাধনভিত্তির উপরে অশ্বিনীকুমারের অন্তর্জীবনে তখন এই ভাবাঙ্গগঠনের সূত্রপাত হইয়াছে। সে সময় তিনি প্রায় প্রতিদিনই সন্ধ্যার পরে দুই চারি জন অতিশয় অন্তরঙ্গ সতীর্থের

সঙ্গে মিলিত হইয়া থাকিতেন। শোনা যায় যে কখনও কখনও এমনিভাবে বিভোর হইয়া যে, জড় এবং উদ্ভিদকেও আনন্দমূর্তি জ্ঞানে আলিঙ্গন করিতে ছুটিয়া যাইতেন। এ অবস্থার বর্ণনা করা কঠিন। একদিকে ইহা নিতান্ত কাল্পনিক; আর এক দিকে ইহাকে একান্ত সত্যও বলা যায় না। সচ্চিদানন্দ পুরুষের অপরোক্ষ অনুভূতির পূর্ব্বে কোনও কোনও ভাগ্যবান সাধকের এইরূপ ভাবোন্মত্ততা জন্মিয়া থাকে। ভাগ্য যাঁহারা তাঁহাদের এই ভাবাঙ্গ রাজ্যেই সাধন এবং ভক্তির বিকাশ আপাততঃ শেষ হইয়া যায়। বস্তুসাক্ষাৎ তাঁহাদের ঘটে না, এ জীবনে ঘটে না, পরজন্মে সে সিদ্ধিলাভের জমিটা প্রস্তুত হইয়া থাকে মাত্র। কিন্তু ভগবদ্ প্রত্যক্ষলাভ না হইলেও এই ভাবাঙ্গসম্পদলাভ ছোট কথা নয়। এই ভাবাঙ্গ-সম্পদ যার লাভ হইয়াছে, ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভ না হইলেও এই ভাবাঙ্গের উদারে ভগবৎস্বরূপের আভাস পাইয়া সাধককে জ্ঞান, ভক্তি এবং কর্ম্মযোগের পথে বহুদূর পর্য্যন্ত লইয়া যায়। এই মহাভাগ্য অশ্বিনীকুমারেরও লাভ হইয়াছিল।

এই জন্য অশ্বিনীকুমার যে ভক্তিযোগ এবং কর্ম্মযোগের কথা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা কেবল শোনা বা পড়া কথা নহে, তাহার মধ্যে অশ্বিনীকুমারের নিজের জীবনের এবং সাধনের অনেক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লুকাইয়া আছে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল

ব্যাকুল

এই ক্ষুদ্র জীবনের মাঝে
কত ভাঙ্গা কত গড়া চলিয়াছে নিতি
প্রভাতে ও সাঁঝে;
কত প্রেম কত স্নেহ প্রীতি
মিলায় অসীমে শুধু রেখে যায় অশ্রুমাখা স্মৃতি।
নিশিদিন সাধিয়া কাঁদিয়া,
যা' কিছু রাখিতে চাই বক্ষোমাঝে একান্তে বাঁধিয়া,
কোন এক উদাসীর ঘরছাড়া টানে
অনির্দ্দেশ পথের সন্ধানে
চ'লে যায় মোর সব মরমের উপকূলে আঘাত দাগিয়া।
তাদেরি লাগিয়া,

KONNAGAR PUBLIC LIBRARY
Estd. 1853

তাহাদেরি হাসিগান ভালবাসা স্মৃতি
শুধু ঝুরে মরি ;
পলে পলে ক্ষয় হয় দিন,
নিভে যায় নয়নের আলো,
ঘিরে আসে অন্ধকার নেমে আসে যবনিকা কালো
একলা শেষে খেয়াঘাটে বসি',
তবু লজ্জাহীন
ব্যর্থ-ব্যথা ডেকে মরে আয় আয় অন্তরের ধন !
আছাড়িয়া কেঁদে মরে বুক ভরা আর্ত্ত-আকিঞ্চন
বিরাম বিহীন ;
বৃথা হাহাকার,
বিগত যা' ফেরে না সে আর।
যত ভুল করি
প্রাণপণে তাহাকেই আঁকড়িয়া ধরি
তারি পাছে ছুটে ছুটে মরি,
দূর হ'তে দূরান্তরে স'রে যায় মায়া মরীচিকা,
নিভে যায় আলেয়ার শিখা।
জীবনেরে ক'রে দাও বাধাবন্ধহীন
জীবন দেবতা ওগো !
একি রাত্রিদিন
একটি নিমেষ মাঝে মৃত্যু শতবার,
বহিতে এ পারি না যে আর,
যত কিছু ভালোমন্দ আলো অন্ধকার
ধুয়ে মুছে দাও সব, ক'রে দাও সব একাকার ;
দ্বারে এসে ফিরে যাক, ব্যর্থ হ'য়ে আনন্দ আঘাত,
পলে পলে মৃত্যু হ'তে মুক্তি দাও মুক্ত কর নাথ !

শ্রীঅমিয়া দে

"অন্নং বহু কুর্ব্বীত"

অনেক পুরুষ কাটিয়ে এলে পাশা দাবা খেলে,
দুই ধারে, নদীর পাড়ে, ছিপ ফেলে ফেলে ;
দেবত্ব ও ব্রহ্মত্বের উপস্বত্ব খেয়ে
ঢেঁকুর তোলো ভাঙা ঢেঁকুরে, কথায় কথায় নেয়ে,
রবার বেলা তামাক টেনে দুপুর বেলা ঘুমে
সন্ধ্যাবেলা খোল করতাল ঢোল-তবলার ধুমে।
ঘাটে দেহ রাস পূর্ণিমা আর নন্দোৎসবে মেতে
পূজোর দিনে রঙ্ মেখে, সঙ্ সেজে গাজন রেতে।
দোলের আসরে আর রাম যাত্রার দলে
ঘোড়ার কৌতুকে আর বৈঠকে বটতলে।
আট বছরে গৌরীবালার পাণিপীড়ন করে'
গণ্ডা গণ্ডা বিয়ের পেশায় কৌলিন্যের জোরে।
বিধবারে পীড়ন করে, শূদ্রে মেরে লাথি
গর্হিত পুরুত বন্ধ করে' দিয়ে শাসন পাঁতি।
তোজ পচিয়ে দলবেঁধে আর ঠেকিয়ে রেখে জেতে
অনেক পুরুষ গেল কেটে অগাধ আলস্যেতে।
লোকের মাথায় পা ঠেকিয়ে আবার কেহ কেহ
কয়লে চর্ব্বচুষ্য খেয়ে নাদুশ নাদুশ দেহ।
পঞ্জিকা আর নিত্যকর্ম্ম পদ্ধতি সার করি,
ব্যবস্থাতে গৃহস্থদের লুটলে টাকা কড়ি।
দেব দেবীদের দোহাই দিয়ে ব্রতপূজার নামে,
নৈবিদ্যির ফল সন্দেশ লুটলে ডা'নে বামে।
তোজ ফলারের ঢেকুর তুলে হাত বুলিয়ে পেটে,
নিরুদ্বেগে গেল তোমার অনেক পুরুষ কেটে।

আজ তোমাদের ভাত জোটে না, করছ হাহাকার,
বিচিত্র কি ? ঠিক হয়েছে এই প্রতিফল তার।
আজকে তোমার কেটে গেছে অহিফেনের নেশা
ঘর কোথা ? চল্‌চে না আর বসে খাওয়ার পেশা।
দিনকাল আজ বদ্‌লে গেছে, আইনও আজ কড়া
ক্ষেতে তেমন ফল ফলেনা সব জিনিষই চড়া।
লোকও আজি সেরনা বেজায়, ভক্ত নহে অত
কথায় কথায় করে না আজ মাথা তাদের নত।
বুঝে চলে সবে বচন না আর শোনে
তোমাদের না পশ্চাতের মালিক বলে গণে'।
ছোট লোকের বাড় বেড়েছে আর না বেগার দেয়,
দিন মজুরী গণ্ডা কড়া হিসেব করে নেয়।
জোর জুলুমের দিন গিয়েছে গুটাও কলা...
আজকে শ্রমের দাম বেড়েছে ভুটবে না আর ভাই।

বহুকালই সাতপুরুষের করছ বিয়ে ভোগ
পঙ্গু তোমায় করেছে আজ সাতপুরুষের রোগ।
সাত পুরুষের বংশ কুলে আসছ ভেবে বড়
সাত পুরুষের পাপের আজি প্রায়শ্চিত্ত কর'।
সাত পুরুষের স্বপ্ন টুটে আজ জাগরণ হলো
এক পুরুষের চেষ্টাতে আজ কদ্দূর হবে বলো ?
এই দুনিয়ায় কপালে খায়, কপাল যার না ঘামে
লুকিয়ে রবে নাম্‌বেনা যে জীবন সংগ্রামে,
রান্নাঘরে ধন্না দেবে বাড়া ভাতের লোভে
পরের পিণ্ডে পেট ভরাতে দুবেলা পেট ধোবে,
অন্নে বহু করবে নাক একটু খেটে খুটে
বিশ্ব হতে অন্ন তাদের গিয়েছে আজ উঠে।
অন্নপূর্ণার অন্নসত্রে দুয়ার আজি খোলা
যে যার পারে পেট ভরাচ্ছে ভর্‌ছে ঝুলি ঝোলা।
কাঁদছ বৃথা আজ তোমাদের ভোগ্য তা'ত নয়
জেন' অলস, আজ জগতে যোগ্যতমের জয়।
তোমরা যখন নাক ডাকালে মর্‌ল যারা খাটি'
তোমরা যখন খেল্‌লে পাশা খুড়্‌ল তারা মাটি,
তারা এখন আগিয়ে গেল তোমরা র'লে পিছে,
তাদের এখন ভাগ্য দেখে হিংসে কর মিছে।

শ্রীকালিদাস রায়

বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম

ওগুস্ত—কোঁতের বিশ্বমানবতার ধর্ম

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

যে সকল বিজ্ঞান এখনই [illegible]ান, সেই সকল বিজ্ঞান সম্বন্ধে তিনি কতকগুলি সূত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—যাহার একটা গুরুতর দার্শনিক তাৎপর্য্য আছে।

পর্য্যবেক্ষণের অতীত অপ্রত্যক্ষ কারণ-পদার্থের সহিত যাহার সাদৃশ্য আছে, [illegible] ভৌতিক বিদ্যা যাহার নিকট হইতে একটা খামখেয়ালি ব্যাখ্যা চাহিয়া আসিয়াছে, বিজ্ঞানকে সেই সমস্ত ত্যাগ করিতে হইবে।

প্রকৃত বিজ্ঞানপদবাচ্য হইতে হইলে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষ ব্যাপারের যে [illegible] নিয়ম তাহাই ভৌতিক বিজ্ঞানের জন্য নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক।

ভৌতিক-রাসায়নিক বিজ্ঞানের সহিত তুলনা করিলে—জীবন-বিজ্ঞান সম্বন্ধে একটা পার্থক্য লক্ষিত হয়। জীবন-বিজ্ঞান যে সকল নিয়মের অনুশীলন করে, সে সমস্ত—ঐন্দ্রিয় ক্রিয়া ও ইন্দ্রিয়াদির পারস্পরিক সম্বন্ধের নিয়ম। এই সকল নিয়ম আবিষ্কার করিতে হইলে ইহা নিশ্চিত যে, জীবনী শক্তির স্বতঃপ্রবৃত্ত ক্রিয়া নামক দার্শনিক অনুমান-সিদ্ধান্তটাকে একপাশে সরাইয়া, সাধারণ ভৌতিক নিয়মে যে সকল ব্যাপার ঘটিয়া থাকে—একটু আধটু বদল করিয়া সেই সকল নিয়মেই আলোচনা করা উচিত।

কিন্তু পক্ষান্তরে, জীবন-বিজ্ঞান, নিরিন্দ্রিয় জড়বিজ্ঞানাদির অধীন হইয়া না পড়ে, সেদিকে একটু সতর্ক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। নিরিন্দ্রিয় জড়-বিজ্ঞানে, মন ব্যষ্টি হইতে সমষ্টিতে যাত্রা [illegible] এখন দেখা যায়,—জীবন্ত প্রাণীসম্বন্ধে ইহার উল্টাটাই ঘটে। এক্ষেত্রে, অংশ অপেক্ষা সমগ্রে বেশী আয়ত্ত করা যায়,—বেশী করিয়া জানা যায়। যেমন বিশ্বপ্রকৃতির (idea) ধারণাটা [illegible] (positive) ধ্রুববাস্তব হইতে পারে না; কারণ, পর্য্যবেক্ষণের যত রকম উপায় আমাদের [illegible] আছে, বিশ্বপ্রকৃতি চিরকালই সে সমস্তকে অতিক্রম করে;—তেমনি ইহার বিপরীতে, [illegible] বিজ্ঞানক্ষেত্রে, ছোটখাটো সূক্ষ্মাংশগুলিই আমাদের অনধিগম্য হইয়া রহিয়াছে। উহাদের ধারণা অপেক্ষা জীবজন্তুর ধারণাটা অধিকতর স্পষ্ট এবং জীবজন্তুর ধারণা অপেক্ষা মানুষের ধারণাটা আরও স্পষ্টতর। তাই, একমাত্র যাহা আমাদের পক্ষে অব্যবহিত, সমস্ত [illegible] বিজ্ঞানক্ষেত্রে—সেই মানবসংক্রান্ত ধারণাই অবশ্যম্ভাবী প্রস্থান অর্থাৎ যাত্রারম্ভের স্থান। যেমন ভৌতিকবিজ্ঞানগুলি অংশ হইতে সমগ্রে যাত্রা করে, তেমনি ভৌতিকবিজ্ঞানের [illegible] পর্য্যবেক্ষণসিদ্ধ বিজ্ঞান হইতে গেলে, ধ্রুববিজ্ঞান হইতে গেলে—সমষ্টি হইতে ব্যষ্টিতে [illegible]

[illegible] করা উচিত। যদি জীবন-বিজ্ঞানের বিশেষ অবস্থার উপযোগী করিয়া, এই [illegible] প্রণালীকে একটু বদল করিতে হয়, তাহা হইলে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে, সৈদ্ধিক সামাজিক ব্যাপারে [illegible] প্রয়োগ করিতে হইলে, এখানে আরও একটু বেশী বদল করা [illegible] হইবে। এই সকল বদল [illegible] সত্ত্বেও, এই প্রণালী যদি সত্যসত্যই সামাজিক ও মানবীয় [illegible] বিশৃঙ্খলা ও বাহ্যপ্রতীয়মান স্বতঃপ্রবৃত্তি [illegible] হইতে প্রাকৃতিক নিয়মের ধারণার অনুরূপ [illegible] বাহির করিতে পারে, তাহা হইলে, এই [illegible] ধ্রুববাস্তব প্রণালীরই সামিল থাকিবে।

এবং প্রথমতঃ, যেহেতু জনসমাজ একটা ভাবসমষ্টি অথবা একটা স্বার্থসমষ্টিমাত্র নহে—জীবন্তদেহও [illegible]—অতএব জীবনবিজ্ঞানের মতো, সমাজ-বিজ্ঞানক্ষেত্রেও এই প্রণালীতে সেই [illegible] রকম [illegible] আধটু বদল করিতে হইবে এবং উহা সমষ্টি হইতে ব্যষ্টির দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইবে। [illegible] বিজ্ঞানক্ষেত্রে, এই সমষ্টিটার আর বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব থাকিবে না; পরন্তু এস্থলে, এই সমষ্টি [illegible] অঙ্গমাত্র অথবা একটা অংশ মাত্র হইবে:—এই সমষ্টিটাই জনসমাজ এবং সর্ব্বাগ্রে বিশ্বমানব। [illegible] মত মানবীয় ব্যাপার-অনুশীলনের প্রথম কথা হইতেছে—একত্র তথ্য সংগ্রহ করা।

ইহাই সব নহে। সকল বিজ্ঞানেই যে-একটা পার্থক্য রাখা আবশ্যক নিকৃষ্টতর বিজ্ঞানাদিতে সেই পার্থক্যের একটা গৌণ সম্বন্ধ আছে মাত্র। কিন্তু এই ক্ষেত্রে এই পার্থক্যটা একটা প্রধান জিনিস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা অচল-স্থিতিক static ও সচল-স্থিতিক dynamic ভেদ। অচল-স্থিতিক পার্থক্যটা অস্তিত্বের নিয়মাদির সহিত সামাজিক ভাবসমষ্টি বা সামাজিক-সংগঠনের [illegible] সম্বন্ধ সকল অনুশীলন করিয়া থাকে এবং অনুশীলন করিয়া একটা শৃঙ্খলার মতবাদ দাঁড় করায়। পক্ষান্তরে সচল-স্থিতিক পার্থক্য মানবীয় ব্যাপারের যাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট অংশ সেই ক্রমোন্নতির [illegible] নিয়মে সমাজ-বিজ্ঞানকে পরিণত করে।

সমষ্টি হইতে ব্যষ্টিতে অগ্রসর হইয়া, সমাজের সচল-স্থিতিক ভেদটা সর্ব্বপ্রথমে মানবমণ্ডলীর সাধারণ ক্রমোন্নতি নির্দ্ধারণ করিবে। এই দৃষ্টিতে, সচলস্থিতিক আলোচনা, [illegible] পর্য্যবেক্ষণের কার্য্যে একটা উপযুক্ত প্রণালী প্রয়োগ করিবে:—সে প্রণালী হইতেছে—সাধারণ [illegible] ইতিহাসের অনুশীলন, এই অনুশীলনের উদ্দেশ্য, সমস্ত মানবীয় তথ্য একত্র সংগ্রহ করা;—কেবল সেই তথ্যগুলা যাহা বাহির হইতে দেখা যায়; তথ্যশব্দের প্রকৃত অর্থ অনুসারে, যাহা কেবলই তথ্য, তথ্য ছাড়া আর কিছুই নহে। এবং এই সকল তথ্যের বিচার-আলোচনা হইতে, [illegible] বিশেষ বিশেষ যুগের যাহা সাধারণ লক্ষণ তাহাই বাহির হইয়া পড়িবে। তথাপি, সাধারণ [illegible] ইতিহাসের অনুশীলন, সমাজ-বিজ্ঞান স্থাপনের পক্ষে যথেষ্ট হইবে না! কিন্তু মানবপ্রকৃতির [illegible] প্রবণতা ও সহজ-জাত চিরস্থায়ী প্রবণতাসংক্রান্ত জ্ঞানের সহিত সম্মিলিত হইলে, এই [illegible] বিশ্লেষণ হইতে কতকগুলি সচলস্থিতিক dynamic নিয়ম পাওয়া যাইবে।

কোঁৎ এই বিষয়ে শুধু মতবাদীর হিসাবে বিচার করেন নাই। তিনি যাহাকে নিয়ম বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, সেই তিন অবস্থার নিয়ম তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন মনে করেন। মানবীয় ক্রমোন্নতির মূলনিয়ম—এই তিন অবস্থার অন্তর্ভাবী পারম্পর্য বিদ্যমান; ইহা হইতে তিনি ab actu ad posse (প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান হইতে ভাবী সম্ভাব্যতা) করিয়াছেন।

এইরূপে বৈজ্ঞানিক ধারণা যেমন একদিকে মূলতত্ত্ব নির্দ্ধারিত হইয়াছে—যাহা কিছু আমাদের অধিগম্য, যাহা কিছু আমাদের জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে, সেই বিভিন্ন জ্ঞাতব্য বিষয়ের সহিত উহাকে উপযোগী করিয়া লওয়া হইয়াছে।

* * *

কিন্তু ধ্রুববাস্তববাদ প্রয়োজনীয়ে উপনীত হইবার জন্যই বাস্তবের অনুসন্ধান করিতে বলে। যে সকল বাস্তবজ্ঞান, বিজ্ঞানগুলাকে পরিপুষ্ট করে, সেই সমস্ত বাস্তব জ্ঞান, প্রকৃত ধ্রুববাস্তবজ্ঞান কিরূপে সমুত্থিত হইতে পারে?

এইখানেই দর্শনের কাজ আরম্ভ হয়। যাহাতে করিয়া বাস্তবের তত্ত্বানুসন্ধান "প্রয়োজনীয়ে"র তত্ত্বানুসন্ধানের সহিত একীভূত হয় এই উদ্দেশে, দর্শনকে "প্রয়োজনীয়ের" সংজ্ঞানিরূপণ করিয়া উহাকে বিজ্ঞানের দিকে পরিচালিত করা আবশ্যক হইবে। কারণ, "প্রয়োজনীয়" আপনা হইতে এই আবশ্যকীয় নিয়ম-শাসন নিজের উপর চাপাইতে পারিবে না।

বিশ্বমানব সাধারণভাবে যে লক্ষ্য অনুসরণ করে তাহা কি?—না, ধারণা করুন, বাসনাদির সমবায়, সামঞ্জস্য ও একতা।

কোঁৎ মনে করেন, এই সামঞ্জস্য যাহা এযাবৎকাল চর্চ্চের আধিপত্যকালে মূর্ত্তি ছিল তাহা ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের দ্বারা উচ্ছিন্ন হওয়ায়, বর্ত্তমানযুগে যে লক্ষ্য অনুসরণ করা হইবে তাহা এই:—অটল ও সুনির্দ্দিষ্ট একটা সমন্বয়ের নূতন প্রণালী স্থাপন। আমাদের হইবে যদি আমরা মনে করি, রাষ্ট্রনৈতিক ও ধর্ম্মসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানাদির দ্বারা উহা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে। অবশ্য, কতকগুলি প্রতিষ্ঠান থাকা দরকার কিন্তু সেই প্রতিষ্ঠানের একটা মূল-ভিত্তি থাকা চাই। এবং যে লক্ষ্য অনুসরণ করিতে হইবে সেই সম্বন্ধে একটা ধারণা, নিছক্ ব্যবহারিক ধরণের ধারণা,—এই মূল-ভিত্তির পক্ষে যথেষ্ট শুধু ব্যবহারই যথেষ্ট নহে। কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে তাহার আরম্ভিক ব্যতীত, গোড়ার একটা উদ্যোগ ব্যতীত, শুধু লক্ষ্য অনুসরণে তাড়াতাড়ি ধাবিত হইলে, লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে হইবে। "আর্টের ভিতর দিয়া আর্ট"—এটা একটা আকাশকুসুম, "জন্য মতবাদ"—এটা একটা ফাঁকা-গর্ব্ব।

এই জন্যই দর্শনের মধ্যবর্ত্তিতা আবশ্যক। যদি ব্যবহারিক দিক্‌টাই যথেষ্ট হইত

রাষ্ট্রনৈতিক বিভাগের হস্তে সমস্ত সামাজিক পুনঃসংস্কারের ভার দেওয়া যাইতে পারিত। বিজ্ঞান স্বতঃই এক-মিলন-কেন্দ্রাভিমুখী হইত তাহা হইলে সমাজ-শাসনের কাজ সেই দিকেই দেওয়া যাইতে পারিত। কিন্তু যেহেতু এই দুই অনুমান-সিদ্ধান্তই মিথ্যা, অতএব জ্ঞান কাজে উপনীত হইবার যে পথ—সেই পথের নিয়ম নির্দ্ধারণ করিবার জন্য একটা বিশেষ রকমের গবেষণা প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। এই গবেষণা দর্শনের কাজ। মহামানবের মনোরাজ্যে কোঁৎ, পুরাকালীন জ্ঞানসম্পদের যে যুক্তি-লক্ষণ—সেই তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক সমন্বয়কে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবেন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। ইহাই কোঁতের প্রধান মতবাদ।

কোঁতের মতে, দর্শন যে কথাটা এস্থলে উপস্থিত করিয়াছে তাহা এই:—নীতি ও বুদ্ধিবৃত্তির মানবীয় ভাব ও কার্য্যসমূহ এক-মিলন-কেন্দ্রাভিমুখী হইবে,—ইহা আশা করা বৃথা—যতক্ষণ মনের ভিতর, চিন্তাধারার ভিতর—গোড়ায় একটা যুক্তির নিয়মানুগত একটা সমবায় স্থাপন করা না যায়। বুদ্ধির একতাই নৈতিক একতার নিয়ামকহেতু (condition)। অতএব সর্ব্বপ্রথমে, "প্রয়োজনীয়" কি?—না বুদ্ধিগত একতার উপলব্ধি। এই দর্শনের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

প্রাকৃতিক নিয়মের ধ্রুববাস্তব ধারণা (idea) অনুসারে সংগঠিত সমস্ত বিজ্ঞানেই যে একটা বিশেষ সমজাতীয়তা আছে, তাহাতে করিয়া বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রেই সেই সকল বিজ্ঞান একীভূত হইবে—এইরূপ মনে হইতে পারে। কিন্তু ইহা একটা বিষম বিভ্রম। প্রণালী কতকটা সদৃশ হইলেও, আমাদের মতে, উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিজ্ঞানগুলা পরস্পর হইতে পৃথক। তাদাত্ম্যতা বা একরূপতার কথা ছাড়িয়া দিয়া, শুধু উহাদের প্রণালীগত সাদৃশ্যেতেই যে সন্তুষ্ট থাকিতে হইয়াছে—জড়জগতের বহু বৈচিত্র্যই তাহার কারণ। মানবীর মনের আকাঙ্ক্ষা এক হইলেও এই বিজ্ঞানগুলা উপলব্ধির হিসাবে, বহু ও বিচিত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিজ্ঞান নামধেও কোনও জিনিস নাই—কোনও জিনিস্ থাকিতেও পারে না। আছে বিজ্ঞানসমূহ। "ধ্রুববাস্তব দর্শনের ব্যাখ্যানে" যে ছয় বিজ্ঞানের উল্লেখ আছে, তাহা ছাড়া আর কোন বিজ্ঞান নাই।

অতএব মহামানবের বুদ্ধিগত একতা বিধানের কাজ বৈজ্ঞানিকদিগের দ্বারা অসম্ভব। বৈজ্ঞানিক বলিয়াই, এই উচ্চ লক্ষ্যের বিরুদ্ধ প্রবণতা থাকাই তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। বিশেষীকরণের দিকে তাঁহাদের ঝোঁক্; বাস্তবকে তাঁহারা খণ্ডখণ্ড করিয়া দেখেন; তাঁহারা পরস্পরকে চেনেন না—পরস্পরকে অবজ্ঞা করেন। আরও বেশী—তাঁহাদের নিজের অনুশীলনের বিষয়টাকেই যেমন তাঁহারা বিজ্ঞানের চরমোৎকর্ষ বলিয়া মনে করেন সেইরূপ তাঁহারা প্রত্যেকেই যে প্রণালী অনুসরণ করেন, সেই প্রণালী আর সকল বিজ্ঞানের উপর চাপাইতে চাহেন। এইরূপে, গণিত-মাত্রীরা,—ব্যষ্টি হইতে সমষ্টিতে যাত্রা করিয়া যাঁহারা নিজরাজ্যে সফলতা লাভ করিয়াছেন তাঁহারা এই সফলতায় মাতিয়া উঠিয়া তাঁহাদের এই জড়জাগতিক দৃষ্টি জীবন-বিজ্ঞান ও

সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও আনয়ন করিতে চাহেন।—অথচ এই দুই বিজ্ঞান গণিতশা
সমষ্টি হইতে ব্যষ্টিতে যাত্রা করিয়া থাকে। গাণিতিকদিগের বে-বুদ্ধি যুগপৎ অবা
সংকীর্ণ, আততায়ী ও স্বেচ্ছাচারী, সেই বুদ্ধি মহামানবতার পক্ষে
মারাত্মক ব্যাধি।

ইহা ছাড়া আর একটা কথা এই—বিজ্ঞানের বিজ্ঞানঅনুশীলনের দিকে বৈজ্ঞান
একটা প্রবণতা আছে। বিশেষ কে কাজে না আসিলেও স্বকীয় আবিষ্কারের নে
তাঁহারা আনন্দে আত্মহারা হইয়া যান। তাঁহারা নিতান্ত সামান্য কতকগুলা বিষয়ে
রকমের যাথার্থ্য অন্বেষণ করেন এবং নিজ বিদ্যার নৈপুণ্য ফলাইবার জন্য, অথচ
সমস্যা উপস্থাপিত করেন।

এই সকল কারণে, বিজ্ঞান—বরং বলা উচিত বিজ্ঞানসমূহ—আপনারাই আ
শালীবদ্ধভাবে গড়িয়া তুলিতে পারে না; বাহিরের একটা চিন্তাধারার ছাঁ
প্রণালীবদ্ধ করিতে হইবে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ চা

শুচি

(১)

হাবড়া ষ্টেশন। একখানা পশ্চিমের এক্সপ্রেস ছাড়তে আর মিনিট পনর দেরি আ
প্লাটফর্মে যেমন আলো তেমনি লোকের ভিড়। সবাই চায় রাত্রের জন্য একটু শোবার জায়
কিন্তু কারুর পক্ষেই তা সম্ভবপর হচ্ছে না।

কেবল, ফার্ষ্ট ক্লাশ গাড়ীর সাম্‌নে জন কয়েক সায়েব লম্বা পা ফাঁক ক'রে দাঁড়িয়ে এ
মেম সায়েবের সঙ্গে কথা কইচে! মেম সায়েব এমনি কাতর ভাবে মিঠে আওয়াজ দিচ্ছেন যাতে
হয় তাঁর দাঁতে শূল বেদনা উঠেচে!

তৃতীয় শ্রেণীর খাঁচা-গেটের ফোকরের সাম্‌নে একজন বেঁটে বাবু, লোকের টিকিট দে
আর একজন লম্বা সায়েব, কুলির মাথার মাল ধরচেন।

এমন সময় একটি যুবক একখানা মোটা বই হাতে করে এসে সায়েবকে একটা লম্বা সে
করতেই সায়েব মনে মনে খুসী হয়ে বল্লেন, টুইমি কি চাহিটেছে?

যুবকটি কিন্তু ইংরিজিতে কথার উত্তর দিল। My a distant relative going this
your honour, want to give him this—বলে মোটা বই খানা দুহাতে ক'রে তুলে ধরে
—যেন কর্ণের সূর্য্যার্ঘ্য দেবার ভঙ্গি!

এ যুগে এমন একটা যুবককে কে না দয়া দেখায়? সায়েব তার পিঠে হাত দিয়ে
—যাও গাড়ী ছুট্ গা!

যুবক ত্রস্তে সেলাম ক'রতে করতে খাঁচা পার হয়ে—প্লাটফর্মে এসে একটা ছুট দিল।

প্রাণপণে এদিক ওদিক ছুটে প্রায় হতাশ হয়ে পড়ে ঘড়ির দিকে চাইতেই—একটা
গর্জ্জন করে উঠল; সঙ্গে সঙ্গে একখানা দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে একজন বাবু মুখ
এক-রাশ ধোঁয়া ছাড়তেই—যুবক চেঁচিয়ে উঠে বল্‌লে—বসু বাবু আপনি এখেনে—উঃ আর
ছুটোছুটি ক'রে হায়রাণ হয়ে গেছি!

বসু বাবু ভারি গলায় একটু রস করেই বল্লেন,—কেনহে কি চাও—ব্যাপার কি?

যুবক একটু তাড়াতাড়ি কথা কয়, সে বল্লে, শুন্‌লুম আপনি মোতিহারি যাচ্ছেন, দাদা এই
কথা লিখেছেন, বেলা ৪ টের সময় বসুমতী আপিসে গিয়ে কিনে নিয়ে এখেনে আস্‌চি—
বসু বাবু বল্লেন, বাহাদুর ছোকরা, শ্যামপুকুর থেকে শেয়ালদা, শেয়ালদা থেকে হাও
—গায়ে হেঁটেই ত'?

একটু শ্লাঘার হাসির সঙ্গে যুবক বল্লে, হুঁ।

ওটা কি? মহাভারত নাকি?

না, পুরোহিত দর্পণ।

আচ্ছা দেও, মাথায় দিয়ে আপাততঃ শোয়াও চল্‌বে বেশ! যাত্রা শুভ!

গাড়ী ছেড়ে গেল।

(২)

বঙ্কু চক্রবর্ত্তীর জীবনের ইতিহাসটা নেহাৎ এক-ঘেয়ে নয়; এই ফাঁকে সেটা বলে নেওয়া
যাক্।

বঙ্কু চক্রবর্ত্তীর বিদ্যারম্ভ হয় তালপাতের পাত্তাড়ি বগলে ক'রে তার মেসোর পাঠশালে।
বিধবার ছেলে, সেইখেনেই বিদ্যা শেষ হয়ে যাবার কথা; কিন্তু মা সরস্বতীর কৃপা কটাক্ষে সে
মাত্র-বৃত্তিতে জলপানি পেয়ে কাটোয়ার টোলে গিয়ে কাব্য ব্যাকরণ আর ন্যায় পড়ে,—লম্বা টিকি
রেখে পণ্ডিত-মূর্খ হয়ে বেরিয়ে এলো।

কিন্তু টিকি তার সইল না। বরযাত্রী সভায় কূট তর্কে জিতে সে সে-রাত্রে টিকিটি হারায়।

তারপর, সে অনেক কথা—সংক্ষেপে, কল্‌কাতায় এসে—অসাধারণ ধৈর্য্য বলে প্রবেশিকা
এবং সংস্কৃতে এম-এ পাশ করে—মুরুব্বি ধরে একটা কলেজের অধ্যাপক হয়; কিন্তু তাতে
কি হই? তাই ওকালতি পাশ করে—সে এখন হাইকোর্টের উকিল। পশারও ক্রমে জমে
উচ্চে। তার পরিচয় মোতিহারিতে মামলা করতে যাওয়া।

অতএব বঙ্কু চক্রবর্ত্তী পুরুষ-সিংহ!

(৩)

মধুপুরের আগেই এসে গাড়ীখানা দাঁড়িয়ে গেল, তখনো রাত [illegible]ছে। [illegible] করলে লাইন ক্লীয়ার পায়নি! যারা ঘুমিয়েছিল তারা জেগে উঠল, [illegible] শুয়েছিল তারা উঠে [illegible] যারা কোনরকমে বসেছিল তাদের দাঁড়াতে হলো; যারা [illegible]য়েছিল তারা কোণ-ঠেসা হয়ে [illegible] রইল। মোট কথা, গাড়ীর মধ্যে হঠাৎ [illegible] সজীবতার পূর্ব্ব লক্ষণ প্রকাশ হলো।

ঘণ্টা খানেক পরে [illegible] দোর খুলে নীচে নেমে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

গুজব বিদ্যুতের তারের অপেক্ষায় বসে থাকে না; কল্পনার ডানাগুলো তার বড় [illegible] বাহন। [illegible] গেল, যে কিছু আগেই পঞ্জাব মেলকে একদল ডাকাত, লাইন খুলে নিয়ে চূর্ণ [illegible] ভীষণ লুটপাট করেছে—সেই দল লাঠি সোঁটা নিয়ে ক্রমেই অগ্রসর হয়ে আস্‌চে।

মেয়ে গাড়ীতে নাকি কান্না ক্রমে অট্ট-রোলে পরিণত হলো। পুরুষ গাড়ীর [illegible] হঠাৎ খুব তৃষ্ণা পেয়ে গেল; কিন্তু সে বিজনে পানি-পাঁড়ে কোথায়!

মাঠের মধ্যে ঝিঁ-ঝিঁর ডাক কমে এসে দোয়েল শ্যামার শিসের কন্‌সার্ট সুরু হয়ে গেল।

বঙ্কু চক্রবর্ত্তী তখন ঘুম ভাঙ্গতে উঠে পড়েও—পাশের বাবুটিকে জিজ্ঞেস করলে,—এ [illegible] ইষ্টিশান্ মশাই?

বাবুটির রাত্রে একটুও ঘুম হয়নি—মুখটি শুক্‌নো—বল্লেন—এটা মধুপুরের আগে [illegible] প্রান্তর—গাড়ীর কি গোল হওয়াতে অনেকক্ষণ থেমে আছে।

গাড়ীর গোল! ব্যাটাদের চারিদিকেই গোল—কিছু খবর জানেন?

বাবুটি মাথা নেড়ে বল্লেন—না।

বঙ্কু চক্রবর্ত্তী একটা মোটা সিগার ধরিয়ে ততোধিক মোটা গলায় ধর্‌লে:—

অয়ি সুখময়ী ঊষে
কে তোমারে নিরমিল!

(৪)

অবশেষে গাড়ীখানা পেছু হ'টে যখন আগের ষ্টেশনে লাগলো, তখন বেশ বেলা [illegible] যদিও কেউ পরিষ্কার ক'রে বল্লেনা, তবুও সবাই যেন মনে মনে জেনে গেল যে সেদিনে [illegible] সেখানে থাক্‌তে হবে।

বঙ্কু চক্রবর্ত্তী নেবে পড়ে ষ্টেশন মাষ্টারকে পাক্‌ড়াও করে সঠিক সংবাদ নিয়ে [illegible] আদালতের হুজুরকে তার করে দিলে—মকদ্দমা মুলতুবি কর—গাড়ীর গোলে এখানে ডিটেন [illegible]

[illegible]ই একটু চা-টা পাওয়া যাবে না?

হাইকোর্টের উকিল—যদি এক পেয়ালা চা দিয়ে বাধ্য করা যায় ত' মন্দ কি!

ইষ্টিশানের কাঁচা পয়সার [illegible] চা বঙ্কু চক্রবর্ত্তীর মন্দ লাগ্‌লো না। গাড়ীতে ফিরে [illegible] সেই [illegible]মুখ বাবুটি ধ্যানে নিমগ্ন।

মশাইএর কি [illegible] পত্নী বিয়োগ ঘটেছে? বাবুটি চমক ভেঙ্গে উঠে বল্লেন,—না; আমার [illegible] হয়নি।

বঙ্কু চক্রবর্ত্তী একগাল হেসে বল্লে, তাহলে [illegible] পৃথিবীর মধ্যে তুমি একটি সুখী জীব—[illegible] অবস্থা হিংসে করবার মত।

বাবুটি ম্লান হাসি হাস্‌লেন—সে হাসির গভীর ব্যঞ্জনা হৃদয়ঙ্গম করবার ধৈর্য্য বঙ্কু চক্রবর্ত্তীর [illegible]

[illegible] নামটি কি ভাই?

[illegible] রায়;

বামুন?

হাঁ।

নমস্কার। কি করা হয়?

প্রফেসার।

কোথাকার?

মীরাট।

কিসের? ম্যাথেম্যাটীক্‌স্?

না, সায়েন্স।

কত মাইনে পাও?

আড়াই শ'।

আশ্চর্য্য! মা-বাপ নেই বুঝি?

রামরঞ্জন মাথা নাড়িয়ে জানালে—না।

তাই, বলে বঙ্কুচক্রবর্ত্তী একটা স্বস্তির হাঁপ ছেড়ে—সিগার ধরিয়ে নিয়ে বল্লে, একটু [illegible]কৃত্যের চেষ্টা দেখা যাক।

(৫)

বঙ্কু চক্রবর্ত্তী যে একটু মজার ধরণের লোক—মুখে এক পেটে এক, ঢাক্-ঢাক্ গুড় গুড় নয়, [illegible] রামরঞ্জন মনে মনে খুসীই ছিল; কিন্তু তার মনের উপর চিন্তার এমন একটা ভারি চাপ [illegible] যাতে বাইরে তা প্রকাশ পাবার অবসর ঘটছিল না।

বঙ্কুর শেষ কথা গুলো নিয়ে সে মনে মনে আলোচনা করছিল—লোকটা উকিল কিনা—

KOMAGAR PUBLIC LIBRARY Estd. 1858

বড় সহজে মানুষকে বিশ্বাস করতে চায় না। আমি যে আড়াইশ' টাকা মাইনে ... পক্ষে বিশ্বাসযোগ্য ব্যাপার নয়। হতে পারে, দুনিয়ায় লোকেরা এমনি করে মিথ্যা বলে ...

কিন্তু মা বাপ নেই—সে অনুমান ও কেমন ক'রে করে। যেন মানুষের চরিত্র ... দিকটা দেখে ফেলবার তীক্ষ্ণতা ওর আছে। কিন্তু সেটা ... দিতে চায় না। লোকটা ... বুদ্ধিমান তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ... দিকটায় যেন কতকটা কাট-খোট্টা গোছের ...

যাই হোক, লোকটা ... মন্দ নয়। চৌকস—বিপদ আপদ মুস্‌ড়ে ... সেগুলোকে ছাড়িয়ে উঠ্‌বার শক্তি, যেন ওর প্রকৃতিগত।

রামরঞ্জন কখন অজ্ঞাতসারে নিজের চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেল। তাইত আজ ... বৃথায় যাবে আর হাতে রইল মাত্র পাঁচদিন! মনে করেছিলাম কল্‌কাতায় লোকের ... তাও হলো না! এখন উপায় কি? এই সামান্য বিয়েতে শুধু পুরুৎকে পাঁচ ... যায়? উঃ লোকগুলো কি নির্লজ্জ!

তারপর ঊর্ম্মিলার সেই স্নিগ্ধ-করুণ মুখখানি মনে পড়ল। চোখ দুটি জলে ভরেই আ... যে জীবনে কোন দোষ করলে না, সমাজ তাকে মার্জ্জনা ত করবেই না—কি কঠোর বিধান! ভাবতে পারা যায় না! রামরঞ্জন গাড়ীর জান্‌লার কাঠের উপর মাথা দিয়ে একটু ঘুমিয়ে পড়ল।

সেই তন্দ্রার মধ্যে একটী ছোট্ট স্বপ্ন। ঊর্ম্মিলা যে কথা কিছুতেই বল্‌তে পারে না— কথাই যেন আজ বলে গেল,—কেন ভাবচ ভাই, আমি ত' তোমারি।

বঙ্কু চক্রবর্ত্তীর গলা পরিষ্কার করার গুরু গর্জ্জনে রামরঞ্জনের তন্দ্রা এবং স্বপ্ন নি... উধাও হয়ে গেল।

ভায়া, এমন নিশ্চেষ্ট হয়ে দিন কাটালে আজ ভাগ্যে যে হরি-মটর হবে—এতো ... তোমার কুটুম্বু বাড়ী নয়।

রামরঞ্জন অপ্রস্তুত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বল্লে—তবে চলুন।

বঙ্কু চক্রবর্ত্তীর অট্ট হাস্যে গাড়ীর সার্সি খড়খড়ি পর্য্যন্ত কেঁপে গেল—তুমি বাবা, এ... সেই আমেরিকান প্রফেসার!

(৬)

দোকান-ঘরে সপাক আলু-ভাজা আর খিঁচুড়ি খেয়ে বঙ্কু চক্রবর্ত্তী তৃপ্তির ঢেকুর ... তুলতে রামরঞ্জনকে ডেকে বল্‌লে চল এবার ঐ নিম তলাটায় একটা বিছানা পেতে গড়িয়ে ... যাক্—রাত্রে তোমার মুছ্‌লমে ঘুম হয়নি তা' আমি জানি, তোমাকে একটু ঘুম পা... হচ্চে। একদিকে তোমার দুর্ব্বিসহ চিন্তা—তার উপর আহার নিদ্রা নেই—শরীর বইবে কেন ...

রামরঞ্জনের চোখে জল এসে গেল, বঙ্কু চক্রবর্ত্তীর দৃষ্টিতে তা' এড়োয় নি; কিন্তু অন্য ... চেয়ে সেটাকে সাম্‌লে নেবার সে অবসর দিলে।

... বিশ্রামের ব্যবস্থা বাস্তবিকই সুন্দর হলো। ঝির ঝির করে হাওয়া বইচে। ... বঙ্কু চক্রবর্ত্তী চিৎ হয়ে শুয়ে কথা কইতে কইতে সজোরে নাক ডাকাতে আরম্ভ ক'রে দিলে ... রামরঞ্জন গাছের ডা... জোড়া ঘুঘুর কাতর শব্দ শুনে আরো যেন চঞ্চল হয়ে উ... ... বসে, একবার শোয়—কিছুতেই ... স্বস্তি নেই।

অবশেষে সে উঠে গিয়ে ষ্টেশনে খবর নি... ...ড়ী কখন ছাড়বে! ইষ্টিশান মাষ্টার ... কাজ যে রকম জোরে চল্‌চে—আশা করা যায় ঘণ্টা ... মধ্যে লাইন সাফ হবে— ... গাড়ীই আগে আস্‌বে। রাত দশটা বারোটা নাগাদ এখানা ছাড়তেও ...র।

রামরঞ্জন ফিরে এসে পায়চারি করতে লাগ্‌লো—তাইত এই দীর্ঘ ... কাটে ...

নিদ্রান্তে বঙ্কু চক্রবর্ত্তী গাত্রোত্থান ক'রে সলজ্জভাবে বল্লে, তাইতো দাদা, আমি নি... —আর তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে। এঃ আমার কাজটা মোটেই ভাল হয় নি।

রাম একটু হাস্‌বার চেষ্টা ক'রে বল্লে, কেন বলুন ত?

কেন? কেন?—সব কেনর কি উত্তর হয়। ভারি অন্যায় ক'রেছি দাদা, তুমি আমার অমার্জ্জনীয় অপরাধ যদি মার্জ্জনা কর ত' সে কেবল নিজগুণে।

রামরঞ্জনের মুখে শুভ্র নির্ম্মল হাসি ফুটে উঠ্‌তেই—বঙ্কু চক্রবর্ত্তী একটা উল্লাসের ধ্বনি ... উঠে বল্লে—সাবাস্ ভাই, এইত চাই! অমন করে চেপে থাক্‌লে যে দম ফেটে ... যাবে।

সে উঠে গিয়ে রামকে জড়িয়ে ধরে বল্লে দাদা—আমাকে তোমার মনের দুঃখু খুলে বল্‌তে ... আমি সকাল থেকে বুঝতে পারচি কি একটা চাপা ব্যথায় তোমার বুক ফেটে যাচ্ছে। ... বসো এইখেনে—আমি নাছোড়-বন্দা—আমাকে না বলে তোমার পার নেই।

রামরঞ্জন মাথা নীচু ক'রে কিছুক্ষণ ভাবতে লাগ্‌লো।

বঙ্কু চক্রবর্ত্তী বল্লে, আচ্ছা তোমাকে দশ মিনিটের সময় দিচ্চি—ইত্যবসরে আমি একটা ... ধরিয়ে নি।

তীব্র সিগারের গন্ধে রামের মাথা ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগ্‌লো—সে কি বল্‌বে তা একটুও ... এলো না। বঙ্কু যখন খুব পীড়াপীড়ি করে ধরলে—তখন রাম প্রায় কাঁদ কাঁদ হয়ে বল্লে, ... কি যে আমি বলবো তা নিজেই বুঝতে পারচিনে।

বঙ্কু চক্রবর্ত্তী বল্লে তার ভাবনা কি—তুমি কথার জবাব দিয়ে যাও, আমি তোমায় বেশ ... দিচ্চি—একটু হেসে, রামের পিঠ ঠুকে বল্লে—আমি যে একজন উকিল, ভায়া!

এমন সময় চারিদিকে হাল্লা উঠ্‌ল—গাড়ী এখুনি ছাড়বে। অগত্যা দুই বন্ধুতে পাত্তাড়ি ... গাড়ীর দিকে দৌড়ল। কিন্তু সেটা পরিষ্কার মিথ্যে গুজব।

(৭)

এমন সব কথা আছে যা দিনের আলোতে অসঙ্কোচে বলা যায় না ; রাত্রের ... কিন্তু সে গুলো অতি স্বচ্ছন্দে হুড়হুড় করে বার হয়ে আসে !

রামরঞ্জনের ঠিক তাই হলো। রাত নটার ...—তারা আবার যখন খাওয়া ... সেরে নিমতলায় এসে বসলো—তখন যাত্রীদের ... অনেকেই ঘুমিয়ে পড়া... সেখানটা বেশ স্তব্ধ ... চক্রবর্ত্তী লম্বা হয়ে শুয়ে রাম... পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বল্লে, বলে যাও ত' ভাই।

রামরঞ্জন ... গুঞ্জনে করুণ কাহিনীটি বলে যেতে লাগ্‌লো :—

পাঁচ ...র আগে—আমি সে দিন কাশী থেকে ক'লকাতায় ফির্‌চি—লুপ লাইন ... আমার এক পিসে কাজ করতেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করে যাবার ইচ্ছাতে ঘুরে যাচ্ছি ... সাহেব... ...টা শেষ রাত্রে সাহেবগঞ্জে পৌঁছায়।

আমি তখন এম এ পরীক্ষা সবে পাশ করেছি। ইণ্টারের গাড়ী খানার সঙ্গেই ... তাতে একটি বছর দশ বারোর মেয়ে ঘুমুচ্ছিল—সঙ্গে আর কেউ ছিল না। পাশের ... একজন আত্মীয় ছিলেন তিনিও খুব গভীর নিদ্রা দিচ্ছিলেন।

অনেকেই তাঁকে বল্লে, মশায় মেয়েটি একেবারে একলা পড়ে গেছে—এগাড়ীতে ... আসুন। কি কারণে জানিনে, তিনি কিছুতেই রাজি হলেন না। বল্লেন, না, ও বেশ ঘুমুচ্ছে ... আমি ত' জেগেই আছি। লোকে সে কথা শুনে হাস্‌লে।

গাড়ীতে একজন বৃদ্ধ ছিলেন, তিনি চুপি চুপি বল্লেন—বিনে টিকিটে যাচ্ছে—বুঝতে পার ...

আমরা সব জলের মত বুঝে গেলাম। মোকামা ছাড়ার পর আমরা সকলেই ... আধটু ঘুমিয়ে পড়তে লাগ্‌লুম। রাত বারোটার সময় কিউলে এসে গাড়ী দাঁড়াতে গাড়ী ... জন্যে আমরা যে যার নেমে পড়ে জিনিষ পত্র নিয়ে লুপের গাড়ীতে চলেছি—এমন সময় ... গাড়ী থেকে এক ভীষণ চীৎকার—ওগো তোমরা এস—কি সর্ব্বনাশ! গিয়ে দেখি, মে... মুখ কাপড় দিয়ে বাঁধা—সংজ্ঞা নেই—রক্তে ভাস্‌চে।

বৃদ্ধ হাউ হাউ ক'রে কাঁদতে লাগলো। লোকে ত' আর বল্‌তে কিছুই বাকি ... না। বেটার যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।

পুলিশ এসে উপস্থিত। দারোগা সায়েব বল্লেন,—কিউলে থাক্‌তে হবে। বৃদ্ধের ... বুদ্ধি তখন আর ছিল না। আমি একা—মনে করলাম থেকে যাই—যদি দুনিয়ার ... উপকারও করতে পারি।

ষ্টেশন মাষ্টার সায়েব—তাঁকে গিয়ে আমি বল্লাম যে, অবিলম্বে এই মেয়েটিকে হাঁসপাতাল ... নিয়ে যাওয়া উচিত—আমি বলি এই অবস্থায় আপনি জামালপুরে পাঠিয়ে দিন।

সায়েব বুড়ো-আঙ্গুল কামড়াতে কামড়াতে—দারোগাকে বল্লেন—এই বাবুর কথা যুক্তি ...

মেয়েটিকে আমরা গাড়ীতে তুলে নিয়ে জামালপুর রওনা হলাম।

ধরারা ষ্টেশনে আত্মীয়টি নেমে গেল ; মেয়েটির বাপ এম্বলার কোম্পানির ঠিকেদার। ... হলো সকালে তাঁরা এসে আমাদের জামালপুরে ধরবেন।

পুলিশের পরামর্শে আমরা সকলে গিয়ে মুঙ্গেরে নামলাম। মেয়ে হাঁসপাতাল সেখেনেই ... ভাল।

মেয়েটির জ্ঞান হয়েচে—কিন্তু এমন লজ্জা-পীড়িত যে আমাদের দিকে তাকাতেও ... না।

মুঙ্গেরে সমস্ত দিন অপেক্ষা করে আমরা হায়রাণ হয়ে গেলাম। বাপের দেখা নেই।

বঙ্কু চক্রবর্ত্তী উত্তেজিত হয়ে উঠে বসে বল্লে, অ্যাঁ বলো কি ? এলো না ?

হাঁ, তিন দিন পরে—বলে রামরঞ্জন চুপ করে রইল।

তারপর ? তারপর ?

সে বড় দুঃখের কথা দাদা।

বেটা জানোয়ার নাকি ?

এই মেয়েটির নাম ঊর্ম্মিলা ; বাপের নাম রমাকান্ত চাটুয্যে। দ্বিতীয় পক্ষের সংসারে ঊর্ম্মিলা কণ্টক ছিল। তিনি বল্লেন, ও মেয়েকে ঘরে নিলে জাত যাবে।

হারামজাদা নিলে না ? বল কি হে ?

রামরঞ্জন চুপ করে রইল।

বঙ্কু চক্রবর্ত্তী উঠে পড়ে—পায়চারি করতে লাগ্‌লো।

কিছুক্ষণ পরে বঙ্কু ফিরে এসে বল্লে মেয়েটি এখন কোথায় ?

সম্প্রতি বাপের কাছেই।

এতদিন ছিল কোথায় ?

বোর্ডিংএ ; এবার ম্যাট্রিক পাশ করেছে।

অন্ধকারে তারার আলোতে বঙ্কু চক্রবর্ত্তীর চোক দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌লো—বুঝেচি—তুমি তার ভার নিয়েছ, পড়িয়েছ— সাবাস ! ভাই, সাবাস !

(৮)

চাপা গলায় বঙ্কু জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা রামরঞ্জন, তুমি কি ঊর্ম্মিলাকে বিয়ে করতে চাও ?

রামরঞ্জন মাথাটা একটু নীচু করে বল্লে, আশা করি আমি যা বল্‌বো—তা আপনি ... করবেন— ...ন, সমাজ ত...

বঙ্কু তাড়াতাড়ি দেয় না। সোনাগাঁ নিশ্চয়ই—তুমি আমাকে অযথা মিথ্যা কথা বোলতেই ... কেন ? কিছুত' নয় আসে ? বৈ

রামরঞ্জন বল্লে,—একদিন এমন ছিল, যখন বিয়ের কথা আমার মনেই আসেনি এখন মনে করচি—উর্ম্মিলাকে বিয়ে করা দরকার হয়ে পড়েচে।

আরো একটু খুলে বল্‌তে হবে তোমাকে রাম,—আমি ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারচি নে।

উর্ম্মিলাকে নিয়ে গিয়ে যখন বোর্ডিংএ দিয়েছিলুম—তখন আমার মনে বিশ্বাস ছিল তার আর বিয়ে হতে পারে না। সে সকলের পরিত্যাজ্য!

বন্ধু বল্লে, তবুও কেন তুমি তাকে আশ্রয় দিয়েছিলে?

আমি মনে করেছিলাম, বড় আঘাতের সঙ্গে যার জীবন আরম্ভ হলো—হয়ত সে পৃথিবীকে একটা বড় কাজে আস্‌বে।

রামরঞ্জনের গাম্ভীর্য্য দেখে বন্ধু হেসে ফেল্লে; ঐ বুঝি তোমার একটা ধারণা?

রামরঞ্জন বুঝতে পারলে যে, যে কথাটা সে বল্‌তে গিয়েছিল ভাষায় তা' মোটেই প্রকাশ পায় নি; মনে মনে একটু লজ্জিত হয়ে চুপ ক'রে রইল।

বন্ধু বল্লে—আচ্ছা তাই ধরে নিলাম—তুমি মনে করেছিলে যে উর্ম্মিলা লেখা-পড়া শিখে সমাজের কাজেও লাগ্‌তে পারে—আর সে দিক দিয়ে হয়ত সমাজের একটা খুব বড় লাভ হতে পারে। তাই না?

রাম সংক্ষেপে উত্তর দিলে,—হুঁ।

তারপর এই বর্ত্তমান অবস্থায় এসে কি ক'রে দাঁড়ালে?

রামরঞ্জন বল্লে, আমি হয়ত ঠিক করে বল্‌তে পারবো না; কিন্তু ইদানীং আমি বুঝতে পেরেছি যে সে আমাকে ভাল বেসেচে।

বন্ধু বল্লে,—সেটা মোটেই আশ্চর্য্য নয়। তোমার ব্যবহারগুলি যে মস্ত-হৃদয়ের পরিচয় দেয়। মেয়েদের ঐ একটা দোষ আছে—তারা বীরকে ভালবাসে—মহৎকে ভালবাসে। ঐ দুটো রাস্তা দিয়ে সবচেয়ে শীঘ্র তাদের মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায়। ও আমি বুঝেছি—ও তুমি আমাকে বোঝাতে পারবে না;—আমি জান্‌তে চাচ্চি তোমার তরফের কথা—উর্ম্মিলাকে বিয়ে করতে তোমার কোন আর আপত্তি নেই?

না, বলে রামরঞ্জন মাথা নীচু করলে।

এক সময় ত' ছিল।

বোধ হয়।

সেটা কি করে চলে গেল, তাই আমি জান্‌তে চাই।

বোধ হয় তার মনের পরিচয় পাওয়ার পর।

মন আর দেহ ত' এক নয় ভায়া।

দেহটা কি বাড়?

নাঃ, তা' কি কেউ বল্‌তে পারে?

তবে আপত্তি কি?

আপত্তি কে করচে?

সমাজ!

সমাজ মানুষের মনের বিচার করে না। বিচার করা দূরে থাক—সন্দেহ করতে তার দ্বিধা নেই! সীতাকে সন্দেহ ক'রে বল্লে অগ্নি পরীক্ষা দিতে হবে! তুমি অগ্নি ত তার কাছে কিছুই না।

কি উত্তর করবে রাম তা বুঝতে পারলে না।

শুচি-বেয়ে মেয়ে দেখনি? যারা দিন-রাত জলে পড়ে থেকেও মনে করে ময়লা কিছুতেই যাচ্চে না।

রাম একটু হাস্‌লে।

সমাজের বায়ুরোগ হয়; এটা সমাজের শুচিবায়ু বলা যেতে পারে।

রামরঞ্জন এবারেও হাস্‌লে।

কিন্তু ভায়া, সমাজ অতি প্রবল। তুমি যদি তার মতলবের বিরুদ্ধে গেছ ত' তোমাকে শাস্তি দেবেই। তার জন্যে কতখানি প্রস্তুত আছ?

আমাকে আর কি শাস্তি দেবে সমাজ?

বন্ধু চক্রবর্ত্তী হেসে বল্লে নন্‌-কো-অপারেশন; অমোঘ এবং অব্যর্থ উপায়।

রামরঞ্জন একটু উত্তেজিত হয়ে বল্লে, হাঁ, প্রস্তুত আছি।

বন্ধু তার মাথায় হাত দিয়ে বল্লে, বস্‌ গরম হয়ো না; নিজের কেস্‌ খারাপ করে রেখে, ভাই!

রামরঞ্জন একটু লজ্জিত হয়ে পড়ল।

(৯)

বন্ধু চক্রবর্ত্তী হঠাৎ খুব গম্ভীর হয়ে বল্লে, রাম তোমাকে আর একটি প্রশ্ন করব—কিছু মনে ক'রো না, ক্ষমা ক'রো।

রামরঞ্জন বল্লে,—বেশ তো।

আচ্ছা, উর্ম্মিলা দেখ্‌তে কেমন?

মন্দ না।

ভয় নেই, আমি অপহরণ করব না—মনের কথা খুলে বল।

রাম হেসে বল্লে, সমাজ তা' হলে আপনাকে শাস্তি দেবে।

নাগো তা' দেয় না। সোনাগাছিতে কত বামুনের ছেলে—মদ খেয়ে নিত্য দেহি পদ-পল্লব মুদারম্‌ তাতে কার যায় আসে? বৈধ-তে সমাজ চটে—অবৈধতে সে চোক বুজে থাকে।

ছোকরা ডাক্তারদের জিজ্ঞেস কর গে—তারা বলে দেবে সমাজের বজ্র আঁটন কাকে কোথায়! যাগ্‌গে—ও ছাই-পাঁশকথা। তুমি আমায় ঠিক ক'রে বল—উর্ম্মিলা মেয়ে কেমন?

ঐত' বলেছি।

রূপসী?

বোধ হয়।

তার রূপের দিক দিয়ে তোমার তার উপর কোন আকর্ষণ আছে?

রামরঞ্জন একটু বিরক্ত হয়ে বল্লে, যান্, আপনি বেজায় ফাজিল।

...দা, এ বিষয়টা কি, তাও ত' বুঝতে হবে—মূকং করোতি বাচালং—আর আমার পেশাই হলো বাচালতা! নারীর রূপ যৌবনের কথা মনে হলে আমার যেন বাগ্মিতায় ছন্দ উঠে,.....তুমি চোট্‌চ?—তবে খুলে বলি শোন—শাস্ত্রে আছে, শুভস্য শীঘ্রং, অশুভস্য কাল হরণম্—আমি বলি—আরো কিছু কাল হরণ করলে হয় না?

তাও হয়।

বঙ্কু মাথা নেড়ে বল্লে, উঁহুঁ—ও করলে চলবে না—চেপে কথা কইলে সব মাটি হয়ে যাবে;—অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চল্‌বে না। প্রাণ খুলে কথা কও ভাই।

রাম একটু যেন অপ্রস্তুত হলো!

কিছুক্ষণ পরে রাম বল্লে, আর একটা কথা আছে।

বঙ্কু আগ্রহভরে উঠে বল্লে, কিহে—কি?

আমি এই সেপ্টেম্বরে জার্ম্মাণি যাবো মনে করেচি।

বঙ্কু দুই দাঁতের মধ্যে চেপে কি একটা বল্লে যা' কেউ বুঝতে পারলে না।

রাম একটু অপ্রতিভ হয়ে—চুপ করে রইল।

বঙ্কু তখন বল্লে, বুঝেচি—তাই যাবার আগে শুভ কর্ম্ম সেরে নিয়ে যেতে চাও? মন্দ নয়, তবু দেশে ফের্‌বার একটা ক্ষীণ আশাও থাক্‌বে।

রাম একটু হাস্‌লে।

আচ্ছা এসো—অবস্থাটা দাঁড়াচ্চে কি একটু বিবেচনা ক'রে দেখা যাক। মনে কর উর্ম্মিলাকে বিয়ে ক'রে চলে গেলে; সে থাকে কোথায়?

কেন, বোর্ডিংএ—যেমন ছিল তেমনি, লেখা-পড়াও করবে।

বেশ। যদি বিয়ে না ক'রে যাও?—তাহলেও সে বোর্ডিংএ থাক্‌বে—লেখা-পড়া করবে এত' বেশ বোঝা গেল।

রাম সম্মতি-সূচক মাথা নাড়লে।

নাঃ এইখানেই এর শেষ নয়;—আরো দিক আছে—সেটা অপ্রিয় হলেও আলোচনা করা উচিত।

রাম অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

বঙ্কু চোখ বুজে মাথা নেড়ে বল্লে, আছে ভায়া—আরও কথা আছে।—এই মনে কর, তুমি একটি ফরাসী মেয়ের প্রেমে পড়ে তাকে বিয়ে ক'রে ব'সলে। তখন উপায়?

রাম বল্লে, আমি দুহাজার টাকা তার জন্যে ব্যাঙ্কে জমা রেখে যাব।

অতি উত্তম কথা। এ টাকা বিয়ে হলেও রাখচ—না হলেও রাখচ ত?

রাম ঘাড় নাড়লে।

তবে এখন বল, বিয়ে করার এত কি তাড়াতাড়ি—জরুরি?

রাম নির্ব্বাক হয়ে রইল।

এমন সময় অন্ধকারের মধ্যে একজন উচ্চ চীৎকার ক'রে বল্লে, পেসেঞ্জার লোককে ভিতর বঙ্কুবিহারী চকরভতি কোন্ হ্যায়।

বঙ্কু ভারি গলায় হুকুম করে বল্লে, এই, তার হ্যায়? ইধার লে আও।

হাঁ হুজুর।

দেশলাই জ্বেলে তার পড়া হলো—মামলা সাতদিনের জন্য মুলতুবি দেওয়া গেল।

তবে আর কি, কল্‌কাতায় ফেরা যাক্—বাবা, বাঁচা গেল।

রামরঞ্জন তার পা দুখানার উপর ঝুঁকে পড়ে বল্লে—দাদা আমার উপায় কি হবে?

(১০)

এসো দিদি আমার, বলে বঙ্কু চক্রবর্ত্তী মাথায় হাত দিয়ে উর্ম্মিলাকে আশীর্ব্বাদ ক'রে পাশের চেয়ারখানা দেখিয়ে দিয়ে বল্লে, ঐখানে বোস।

না—থাক, বলে উর্ম্মিলা লজ্জায় হাস্‌লে।

বারাণ্ডায় রামরঞ্জন ছিল।

বঙ্কু রামকে ডেকে বল্লে, ওহে ভায়া, এই দেখ—শিক্ষার ত্রুটি। আমাদের মিস্ চ্যাটার্জ্জি ঘরে বস্‌তে চাচ্চেন না।

উর্ম্মিলা একটা কোপ-কটাক্ষ করে বল্লে,—আপনি আমার নাম ধরে ডাক্‌বেন।

হবে হবে—বঙ্কু বল্লে,—আলাপ পরিচয় হোক্—তারপর সে সব আপনি আসবে।

না আপনি আমার নাম ধরে ডাকুন।

বঙ্কু একটু বক্র হাসি হেসে বল্লে, দেখুন মিস্ চ্যাটার্জ্জি——

উঁ—তাহলে আমি চলে যাবো।

বঙ্কু দৃকপাত না ক'রে বল্লে, অলঙ্কার শাস্ত্রে—ওই বিনা প্রয়োজনে নাম নেবার

ছোক্‌রা ডাক্তারদের জিজ্ঞেস কর গে—তারা বলে দেবে সমাজের বজ্র আঁটন ফস্‌কা গেরো কোথায়! যাগ্‌গে—ও ছাই-পাঁশকথা। তুমি আমায় ঠিক ক'রে বল—উর্ম্মিলা দেখতে কেমন?

ঐত' বলেছি।

রূপসী?

বোধ হয়।

তার রূপের দিক দিয়ে তোমার তার উপর কোন আকর্ষণ আছে?

রামরঞ্জন একটু বিরক্ত হয়ে বল্লে, যান্, আপনি বেজায় ফাজিল।

বন্ধু, এ বিষয়টা কি, তাও ত' বুঝতে হবে—মুকং করোতি বাচালং—আর আমাদের পেশাই হলো বাচালতা! নারীর রূপ যৌবনের কথা মনে হলে আমার যেন বাগ্মিতার ভার কেটে উঠে,.....তুমি চোট্‌চ?—তবে খুলে বলি শোন—শাস্ত্রে আছে, শুভস্য শীঘ্রং, অশুভস্য কাল হরণম্—আমি বল্লাম—আরো কিছু কাল হরণ করলে হয় না?

তাও হয়।

বন্ধু মাথা নেড়ে বল্লে, উঁহুঁ—ও করলে চলবে না—চেপে কথা কইলে সব মাটি হয়ে যাবে;—অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চল্‌বে না। প্রাণ খুলে কথা কও ভাই।

রাম একটু যেন অপ্রস্তুত হলো!

কিছুক্ষণ পরে রাম বল্লে, আর একটা কথা আছে।

বন্ধু আগ্রহভরে উঠে বল্লে, কিহে—কি?

আমি এই সেপ্টেম্বরে জার্ম্মাণি যাবো মনে করেচি।

বন্ধু দুই দাঁতের মধ্যে চেপে কি একটা বল্লে যা' কেউ বুঝতে পারলে না।

রাম একটু অপ্রতিভ হয়ে—চুপ করে রইল।

বন্ধু তখন বল্লে, বুঝেচি—তাই যাবার আগে শুভ কর্ম্ম সেরে নিয়ে যেতে চাও? মন্দ নয়, তবু দেশে ফের্‌বার একটা ক্ষীণ আশাও থাক্‌বে।

রাম একটু হাস্‌লে।

আচ্ছা এসো—অবস্থাটা দাঁড়াচ্চে কি একটু বিবেচনা ক'রে দেখা যাক। মনে কর তুমি উর্ম্মিলাকে বিয়ে ক'রে চলে গেলে; সে থাকে কোথায়?

কেন, বোর্ডিংএ—যেমন ছিল তেমনি, লেখা-পড়াও করবে।

বেশ। যদি বিয়ে না ক'রে যাও?—তাহলেও সে বোর্ডিংএ থাক্‌বে—লেখা-পড়া করবে এত' বেশ বোঝা গেল।

রাম সম্মতি-সূচক মাথা নাড়লে।

নাঃ এইখানেই এর শেষ নয়;—আরো দিক আছে—সেটা অপ্রিয় হলেও আলোচনা করা উচিত।

রাম অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

বন্ধু চোখ বুজে মাথা নেড়ে বল্লে, আছে ভায়া—আরও কথা আছে।—এই মনে কর, তুমি একটি ফরাসী মেয়ের প্রেমে পড়ে তাকে বিয়ে ক'রে ব'সলে। তখন উপায়?

রাম বল্লে, আমি দুহাজার টাকা তার জন্যে ব্যাঙ্কে জমা রেখে যাব।

অতি উত্তম কথা। এ টাকা বিয়ে হলেও রাখচ—না হলেও রাখচ ত?

রাম ঘাড় নাড়লে।

তবে এখন বল, বিয়ে করার এত কি তাড়াতাড়ি—জরুরি?

রাম নির্ব্বাক হয়ে রইল।

এমন সময় অন্ধকারের মধ্যে একজন উচ্চ চীৎকার ক'রে বল্লে, পেসেঞ্জার লোককে ত[illegible]

বন্ধুবিহারী চকরভতি কোন্ হ্যায়।

বন্ধু ভারি গলায় হুকুম করে বল্লে, এই, তার হ্যায়? ইধার লে আও।

হাঁ হুজুর।

দেশলাই জ্বেলে তার পড়া হলো—মামলা সাতদিনের জন্য মুলতুবি দেওয়া গেল।

তবে আর কি, কল্‌কাতায় ফেরা যাক্—বাবা, বাঁচা গেল।

রামরঞ্জন তার পা দুখানার উপর ঝুঁকে পড়ে বল্লে—দাদা আমার উপায় কি হবে?

(১০)

এসো দিদি আমার, বলে বন্ধু চক্রবর্ত্তী মাথায় হাত দিয়ে উর্ম্মিলাকে আশীর্ব্বাদ ক'রে [illegible] চেয়ারখানা দেখিয়ে দিয়ে বল্লে, ঐখানে বোস।

না—থাক, বলে উর্ম্মিলা লজ্জায় হাস্‌লে।

বারাণ্ডায় রামরঞ্জন ছিল।

বন্ধু রামকে ডেকে বল্লে, ওহে ভায়া, এই দেখ—শিক্ষার ত্রুটি। আমাদের মিস্ চ্যাটার্জ্জি [illegible] বস্‌তে চাচ্চেন না।

উর্ম্মিলা একটা কোপ-কটাক্ষ করে বল্লে,—আপনি আমার নাম ধরে ডাক্‌বেন।

হবে হবে—বন্ধু বল্লে,—আলাপ পরিচয় হোক্—তারপর সে সব আপনি আসবে।

না আপনি আমার নাম ধরে ডাকুন।

বন্ধু একটু বক্র হাসি হেসে বল্লে, দেখুন মিস্ চ্যাটার্জ্জি——

উঁ—তাহলে আমি চলে যাবো।

বন্ধু দৃকপাত না ক'রে বল্লে, অলঙ্কার শাস্ত্রে—ওই বিনা প্রয়োজনে নাম নেবার

কথা আছে বটে—সে ভার আপাততঃ আমাদের প্রিয় বন্ধু রামচন্দ্রের—কি বলে, রামরঞ্জনের, উপর থাকুক!

উর্ম্মিলা বেঁকা হয়ে রাগ ভরে দাঁড়িয়ে রইল।

বঙ্কু বল্লে, এই যদি একজন ইংরেজ মহিলা হতেন—বুঝেছ কিনা ভায়া;—তিনি সটান্ 'থ্যাঙ্কু' করে চেয়ার টেনে নিয়ে ব'সতেন। তাঁরা জানেন যে একজন অতিথির প্রথম অনুরোধ এড়ানে প্রকাণ্ড একটা অপরাধ হয়।

উর্ম্মিলা বিনা বাক্যে চেয়ারে বসল।

রাম দূরে থেকে তাই দেখে মনে মনে বলে—আচ্ছা লোক বটে, স্নেক-চারমার।

বঙ্কু দুষ্টুমির হাসি হেসে বল্লে, শ্রীমতী উর্ম্মিলা দেবীর সঙ্গে পরিচিত হবার এবং আলাপ করবার এই সুযোগকে আমি সৌভাগ্য জ্ঞান করে আনন্দিত হচ্চি।

উর্ম্মিলা মাথা অবনত করে বসে রইল।

বঙ্কু স্নেহ-স্নিগ্ধ স্বরে বল্লে, উর্ম্মিলা, আমাকে ক্ষমা কর—আমি তোমাকে বোধ হয় বিরক্ত করেছি।

উর্ম্মিলা জল ভরা দুটো চোখে বঙ্কুর মুখের দিকে চাইতেই—বঙ্কুর সমস্ত মন করুণায় ভরে উঠ্‌ল। সেই চাহনির ভিতর একটা গভীর মিনতি ছিল—যা' পাথরের কঠিনতাকেও নিমেষে গলিয়ে দিতে পারে।

বঙ্কু বল্লে, তোমার লেখা-পড়ার কথা আমি সব শুনেচি, দিদি; কিন্তু ও সবে আমার মন ভেজে না। পেটুক বামুন, তোমার হাতের রান্না খেতে চাই। দেখ, আমি শুক্ত বড় ভালবাসি—সেটা হওয়া চাই।

উর্ম্মিলা বড় দুটো চোখ দিয়ে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে চেয়ে বল্লে, আপনি আমার হাতের রান্না খাবেন?

খাব না? তবে পৃথিবীর ছাই-পাঁশ খাবো কি?

উর্ম্মিলা ধীরে ধীরে উঠে চলে গেল।

বঙ্কু আর কিছুতেই চোখের জল সাম্‌লাতে পারে না!

বেশ করে চোখ দুটো কোঁচায় মুছে নিয়ে—বাইরে এসে দেখ্‌লে, রাম উদাস দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চেয়ে কি ভাবচে। বঙ্কু তাকে—বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বল্লে, রাম, এ উর্ম্মি নয়, এ সত্যিকারের সীতা—দুঃখ পেতেই কি এরা জন্মায়!

রামরঞ্জনের চক্ষে অশ্রু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌ল। তার গলা যেন চেপে আস্‌ছিল।

বঙ্কু বল্লে, সে রাম সীতা ত্যাগ করেছিল—তুমি তার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কর—তুমি সীতাকে মাথার ভূষণ কর—আর এই বঙ্কু চক্রবর্ত্তী তোমার পাশে অটল অচল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ঠিক যেমনি করে লক্ষ্মণ দাঁড়িয়েছিল।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

বাঙ্গালা নাটকে ভাবের মিলন।

মানুষের ভাব-প্রণালী ব্যক্তিগত হিসাবে যতই বিভিন্ন হউক না কেন, তাহাদের চিন্তাস্রোতের যতই বৈশিষ্ট্য থাকুক না কেন, সেই স্রোতের মধ্য দিয়া এমন সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ উঠে, যাহা বৈশিষ্ট্যের ভিতর হইতেও যেন একটা সাদৃশ্য সূচিত করে। গৌতম বুদ্ধ ও যিশুখ্রীষ্ট বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন সময়ের লোক; খ্রীষ্টের উপর বুদ্ধের ভাবালোক কখনও যে পতিত হইয়াছিল এ কথা ইতিহাস সাক্ষ্য করিয়া আজও পর্য্যন্ত কেহ বলিতে পারেন নাই; তত্রাচ বাইব্‌ল্ ও ত্রিপিটকের অনেক স্থলে একই ভাবের সমাবেশ উপলব্ধি করিয়া বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। মনুষ্য-জগতের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে, প্রমাণ Machiavelli ও চাণক্য, কালিদাস ও Shakespeare ইত্যাদি। এই সকল কবি ও মনীষিগণের ভাব ও প্রবৃত্তির যে সাম্য ও ঐক্য দেখা যায় তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া যদি বলি যে পূর্ব্বগামীর অনুকরণ স্পৃহা হইতেই এইরূপ ঘটিয়াছে, তাহা হইলে সত্যের অপলাপ করা হয়। বরং বলিব যে মানবজাতির মনোবৃত্তিগুলি, কি দেশে কি বিদেশে, একই প্রণালীতে ধাবিত হইয়া অনেক সময়ে এক সার্ব্বজনীন ভাব-সাগরে মিলিয়া মিশিয়া যায়। কবি যখন কবিতা লিখেন, নাট্যকার যখন নাটক-রচনায় বিশ্বজগতের অনুরূপ সৃষ্টি করিতে উদ্যত হন, তখন তাঁহাদের রচনাবৈশিষ্ট্যের ভিতর দিয়াও এই অজ্ঞাত প্রভাব অনেক সময় স্বতঃই ফুটিয়া উঠে। বঙ্কিমচন্দ্র "দুর্গেশনন্দিনী" লিখিয়া গিয়াছেন। বিদেশী ঔপন্যাসিক তাঁহার বহুপূর্ব্বে "Ivanhoe" রচনা করিয়া গিয়াছেন। 'রোয়েনা' ও 'Rebecca' চরিত্র দুইটির মধ্যে অনুরূপ ভাব পরিলক্ষিত হইলেও, ইংরাজী সাহিত্যে পরম পণ্ডিত "দুর্গেশনন্দিনী"-প্রণেতা নজির রাখিয়া গিয়াছেন যে ঐ উপন্যাস রচনার সময় তিনি "Ivanhoe" কি, তাহা জানিতেন না। সুতরাং এ স্থলে "অনুকরণ" কথাটা বড় বেখাপ্পা হইয়া পড়ে। রবীন্দ্রনাথের রচনাতেও এই রূপ ভাবের মিলন যে নাই এ কথা বলা যায় না—"প্রতি অঙ্গ কাঁদে মোর প্রতি অঙ্গ তরে"র ন্যায় ভাবটি যে Shelleyতে আছে এবং জ্ঞানদাসেও আছে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। আরও উদাহরণ আছে, কিন্তু উদ্দেশ্য যখন নাটকীয় কথার আলোচনা, তখন কাব্য বা উপন্যাসের বিষয় আর নাই বা বলিলাম।

মধুসূদন দত্তের নাটকগুলির গঠন দেখিলেই হৃদয়ঙ্গম হয় যে তখনকার নাটক-রচনা-প্রণালী হইতে তাঁহার পদ্ধতি কত বিভিন্ন। ১৮৫৯ খ্রীঃ যখন তাঁহার "শর্ম্মিষ্ঠা" পাইকপাড়ার বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে প্রথম অভিনীত হয়, সেই সময় হইতেই "কুলীনকুল সর্ব্বস্ব" ও "পদ্মাবতী" প্রভৃতি নাটকের মর্য্যাদা হ্রাস পাইতে আরম্ভ করে। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, মাত্র এক অভিনব ভাব ও রসের সৃষ্টি। মধুসূদনের সমস্ত রচনায়,—কি কাব্যে, কি নাটকে

কি প্রহসনে, কতকটা বিদেশীয়-সামগ্রীর সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার নব-আবিষ্কৃত অমিত্রাক্ষর ছন্দ নাটকে ব্যবহৃত হইয়া এক নূতন যুগের প্রবর্ত্তন করে। এই অমিত্রাক্ষর ছন্দটি অপরদেশীয় প্রথার অনুরূপ। আর একটি উদাহরণ, "পদ্মাবতী"; এই নাটক খানিতে Greek Mythologyর 'Apple of Discord' নামক আখ্যানটিকে বাঙ্গালায় ঢালিয়া সাজা হইয়াছে। মধুসূদনের উপর বিদেশীয় প্রভাব প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হইলেও তাঁহার ভাষা ইংরাজী-নবীশ নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ভাষার ন্যায় নহে। "ঐ স্ফটিকে গঠিত দীর্ঘনিশ্বাস," "কি ব'লছ নারী," "পূতিগন্ধময় ভাগাড়" প্রভৃতি ভাষা মধুসূদনে পাওয়া যায় না।

দীনবন্ধুর রচনায় নাটকীয় সৌন্দর্য্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছিল। মধুসূদন যে প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহার কাঠাম মাত্র লইয়া সমস্ত প্রসাধন-কার্য্য তিনি দেশীয় উপাদানে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার নাটকের ভাষা, চরিত্র-সৃষ্টি ও রচনা ভঙ্গী সমস্তই দেশীয়;— তবে ঘটনা-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া বিদেশী-গ্রন্থ-বর্ণিত চরিত্রের একটু আধটু ছায়া গ্রহণ যে না করিয়াছেন এমন বলা যায় না, যথা "নবীন তপস্বিনী"র 'জলধর,' 'মল্লিকা,' 'মালতী'। এই তিনটি চরিত্র-সংশ্লিষ্ট ঘটনা Shakespeare এর "Merry Wives of Windsor"এ 'Falstaff', 'Mrs. Page' ও 'Mrs. Ford' ঘটিত ব্যাপারের উজ্জ্বল অনুকৃতি মাত্র। 'Falstaff' এর কৌতুকোদ্দীপক অবস্থা ও জলধরের 'হোদল কুঁৎকুঁতে'র চিত্র সমানভাবেই হাস্য রসের উদ্রেক করে; তবে দীনবন্ধুর কৃতিত্ব এই যে তাঁহার চরিত্র কয়টিকে তিনি ভাবে ও ভাষায় অবিকল দেশীয় করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন। "নবীন তপস্বিনী" ছাড়া দীনবন্ধুর আর কোনও গ্রন্থে অনুকৃতি-চেষ্টা বড় একটা লক্ষিত হয় না।

এই প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্র-রচিত একটি নাটকের উল্লেখ করিতে পারা যায়—নাটকটি "প্রফুল্ল"। "প্রফুল্লর" 'উমাসুন্দরীর' শেষ অংশটি পাগলিনী চিত্র। 'উমাসুন্দরী'র প্রলাপোক্তি পাঠে "নীলদর্পণে"র 'সাবিত্রী'র কথা মনে হয়। পাগল অবস্থায় উভয়েরই যেন বধূভাব ঘটিয়াছে। হিন্দুসংসারে কুলবধুর ন্যায় উভয়েই যেন "লজ্জা সরমের" দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিতেছেন। আবার বধূভাবাবিষ্ট হইয়া যে সম্পূর্ণরূপে আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন তাহাও নহে। যে মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণায় উভয়ে পাগল হইয়াছেন, তাহাও বিস্মৃত হন নাই। উদাহরণস্বরূপ সুরিধামত "নীলদর্পণ" ও "প্রফুল্ল" হইতে কয়েকছত্র উদ্ধৃত করিলাম :—

"উমাসুন্দরী—হাঁ মা, তোদের পায়ে পড়ি মা, আমি শ্বশুরবাড়ী যাব না মা, আমায় শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে
না মা, আমি বাবা এলে যাব, আমি বাবাকে দেখে যাব..... বাপ্‌রে! সুরেশ রে!
বাবা, তোমায় ধরে রেখেছে বাবা? তাই আসতে পারছ না বাবা?.....কেরে রূপ? ঠা
এদিকে আসছেন না কি? রান্না-ঘরে যাই, রান্না-ঘরে যাই।" (প্রফুল্ল—৩য় অঙ্ক, ৪র্থ গর্ভাঙ্ক)

"সাবিত্রী—(সৌরিন্ধ্রীর প্রতি) দাই বৌ, ছেলে একবার আমার কোলে দাও.....চুমো খাই.....

শ্বশুর বলেছিলেন, বৌমার ছেলে হলে "নবীন মাধব" নাম রাখব (৫ম অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক).....কি? নবীন আমার নেই, নবীন আমার নেই?.....বুক ফেটে গেল,—হো, হো, মা!" (নীলদর্পণ—৫ম অঙ্ক, ৪র্থ গর্ভাঙ্ক)

কিন্তু একথা স্বীকার করিতেই হইবে, পাগলিনী চিত্র হিসাবে 'উমাসুন্দরী' 'সাবিত্রী' হইতে কিঞ্চিৎ অধিক পরিস্ফুট। 'সাবিত্রী'তে যাহা অঙ্কুর, 'উমাসুন্দরী'তে তাহার পূর্ণ বিকাশ।

'প্রফুল্লে'র ৩য় অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্কে—যেখানে 'কাঙ্গালীচরণ' 'পীতাম্বরের' সহিত সাধুভাষায় বাক্যালাপ করিতেছে, সেখানে 'কাঙ্গালীচরণে'র কষ্টকল্পিত বাক্যযোজনা যেমন বিপরীত অর্থবোধক তেমনি হাস্যরসাত্মক। Shakespeareএর 'Merchant of Venice' নামক নাটকে এই ভাবের অবতারণা আছে (২য় অঙ্ক, ২য় দৃশ্য)।—Launcelot Gobbo বহুকাল পরে তাহার পিতার সাক্ষাৎ পাইয়া কৌতুক-বাসনায় আত্মগোপন করিতে চেষ্টা করিতেছে এবং অভ্যস্ত ভাষার পরিবর্ত্তে শিক্ষিত ভদ্রব্যক্তির ভাষা উচ্চারণ করিতে গিয়া অর্থ-বিকৃতি ঘটাইতেছে। ফলে, না হাসিয়া থাকা যায় না।—

'কাঙ্গালীচরণ—আপনাকে আমি যেদিন অবধি প্রদর্শন (দর্শন?) করেছি, সেইদিন অবধি আপনার প্রতি মন আড়ষ্ট (আকৃষ্ট?) হয়েছে, আপনি অতি সজ্জন ও প্রকাণ্ড (?) অজ্ঞ (বিজ্ঞ?)। .....আপনার বন্ধুত্ব যাজনা (যাচ্ঞা?) করি, আপনার সৌহার্দ্দ্য জন্য আমি একান্ত সুললিত (লালায়িত?), আপনি ভদ্রলোক এবং বিশিষ্ট ধৃষ্ট (বিশেষ শিষ্ট?)। .....আমার নিতান্ত ইচ্ছা যে রাজলক্ষ্মী আপনার ঘরে বিচলা (অচলা?) হন।" (প্রফুল্ল—৩য় অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক)

"*Launcelot Gobbo*—This is my true begotten (?) father: I will try confusions (? conclusions) with him.....but turn down indirectly (? directly) to the Jew's house .....but I pray you, *ergo* (?), old man *ergo* (?) I beseech you.....I am Launcelot, your boy that was (?), you son that is (?), your child that shall be (?)." (Act. II. sc. ii)

স্বীকার করিতে হইবে যে কাঙ্গালীচরণের ভাষা 'Launcelot'এর কথাবার্ত্তার অনুরূপ; গিরিশচন্দ্র বাঙ্গালা ভাষাটাকে এমনই খেলাইয়াছেন যে কাঙ্গালীচরণের হাস্যোদ্দীপক বুলি মৌলিক রচনা বলিয়া বোধ হয়। এমনভাবে পরস্বকে নিজস্ব করিতে বাঙ্গালার আর কোন নাট্যকার পারেন নাই। এইখানেই গিরিশচন্দ্রের কৃতিত্ব।

"বলিদান" নাটকে 'দুলালচাঁদ' চরিত্র কতকটা "লীলাবতী"র 'নদেরচাঁদের' ন্যায়। দীনবন্ধুর 'নদেরচাঁদ' যেরূপ 'আদুরে' ও বর্ব্বর, গিরিশচন্দ্রের 'দুলালচাঁদ'ও তদ্রূপ। 'নদেরচাঁদ' লজ্জার মাথা খাইয়া তাহার মামা ভোলানাথের সম্মুখে নিম্নলিখিত ছত্রটি আওড়াইতে কুণ্ঠিত হয় নাই :—

"মদের মজাটি গাঁজা কাটি কচ্ কচ্;
মামীর পীরিতে মামা হাঁ কচ্ পাঁকচ॥"

'দুলালচাঁদ'ও তাহার পিতার সাক্ষাতে এইরূপ বাক্য উচ্চারণ করিতে দ্বিধাবোধ করে নাই:—তাহার মুখেও শুনিতে পাই;—"বাবা, বাবা! বিরহ যন্ত্রণা, বিরহ যন্ত্রণা।.....বিন্দী বাম্নীর কথা ত' শুনেছি বাবা, তুমি রাতারাতিই নোপাট করেছিলে বাবা।"

এইতো গেল গিরিশচন্দ্রের কথা। এখন অমৃতলাল সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া বক্তব্য শেষ করিব। অমৃতলালের "বাবু" নামক প্রহসনখানি 'স্বদেশোদ্ধার', 'নারী-স্বাধীনতা' প্রভৃতি বাঙ্গালীর কতকগুলিবিসদৃশ 'হুজুগের' প্রতি ইঙ্গিত করিয়া লিখিত হয়। এই রচনার সহিত একটি পূর্ব্ববর্ত্তী বাঙ্গালা প্রহসনের সাদৃশ্য দেখা যায়। প্রহসনখানির নাম "মেয়ে মনস্টার মিটিং"; ইহা তিন অঙ্কে বিভক্ত। ইহার আলোচ্য বিষয়, 'নারী স্বাধীনতা,' 'নারী-স্বয়ম্বর' ইত্যাদি। এই প্রহসনের শেষ গর্ভাঙ্কের সহিত অমৃতলালের 'বাবু'র শেষ গর্ভাঙ্কের ঘটনামূলক বিশেষ সাদৃশ্য আছে। 'বাবু' প্রহসনে সমাজ-সংস্কারকেরা সস্ত্রীক ইডেন গার্ডেনে বেড়াইতে আসিয়া 'সেলার'-বেশী 'ফটিকচাঁদে'র হস্তে যেরূপ নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছিলেন, পূর্ব্বোক্ত প্রহসনখানিরও 'প্যাট্রিওটগণ' গোরা সৈন্যগণের হস্তে সেইরূপ লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। বাহুল্যভয়ে 'বাবু' হইতে পুনরাবৃত্তি করিলাম না, কিন্তু "মেয়ে মনস্টার মিটিং" হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল, কারণ পুস্তকখানির সহিত হয় ত অনেকের পরিচয় নাই।

"(জেম্‌স্, ফ্রেডেরিক এবং পীটার সৈন্যগণের অকস্মাৎ প্রবেশ)

জেম্‌স্—What is the matter? my dear—
Something cheering seems to take place here?

উন্নতবাবু—Cheering indeed, as ninety against twenty—
A meeting for the Hindu female liberty.

জেম্‌স্—A meeting for the Hindu female liberty?
A nice thing indeed amidst poverty.

ফ্রেডে—(মহোৎচাঁদ, স্বর্ণ প্রভৃতিকে দেখিয়া) Who sit there
Both males and females together?

পীটা—These seem to be the Hindu Heroes.
Met to unveil their wives' veiled nose.

ফ্রেডে—Nose alone won't do—
If eyes and head be set to full liberty,
Hindu ladies are sure to be the objects of curiosity.

পীটা—Curiosity, nicety, and charity too.

উন্নতবাবু—This is offensive—this is offensive.

জেম্‌স্—Nothing offensive—nothing offensive.

উন্নতবাবু—(আস্ফালন করিতে করিতে)
Go hence, ye foreigners.
Why come here, ye vain intruders?

জেম্‌স্—To dance, to sing and to feast—
With our rising cousins of the East.
(সৌদামিনীর বাম হস্ত ধরিয়া নৃত্য গীত)
"Take, Oh, take those lips away,
That so sweetly were forsworn,
And those eyes, the break of day,
Lights that do mislead the morn;
But my kisses bring again,
Seals of love, but seal'd in vain."

(চুম্বন)

সৌদামিনী—সাহেব আমার হাত ছেড়ে দাও; আমি হিঁদু। তুমি আমায় ছুঁয়ো না, তুমি ছুঁলে আমার কুলে কলঙ্ক হবে।

উন্নতবাবু—(জেম্‌সের হাত ধরিয়া)—She is my wife—my married wife. Leave her, leave her.

জেম্‌স্—(উন্নতকে ৪।৫ হাত দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া)
O! thou nigger of butter and wax make,
Darest come my hand to shake!
If Jupiter himself with his thunder-bolt in hand,
Comes to fight us, we will dare him withstand.
(হঠাৎ তরবারি খুলিয়া)
Look, look, here is my sword.
Come, please, stain it with your blood.
(ফ্রেডেরিক ও পীটার তরবারি খুলিয়া)
Strike him, strike the devil right and left,
We both better strike the rest.
(আহূত সমুদয় ভয়ে দৌড়িয়া প্রস্থান করিতে লাগিলেন, মীরার, সোম, পেট্রিয়ট, এডুকেশন, অমৃত এবং উন্নত বাবুরাও সৌদামিনীকে রাখিয়া প্রস্থান করিলেন)
(সৌদামিনীকে সশঙ্কিত দেখিয়া ঈষৎ হাস্য বদনে)
Ha lo! here is the sweet prize
Won by mere accident and words.
It is not sweet, but bitter,

That which is not won by the swords.

(ফ্রেডেরিক এবং পীটারের প্রতি)

So let us leave it off, at its fate.

(সৌদামিনীর প্রতি)

O ! pretty poor lady ! we good-by,
Pray you—go, go forward—
Wait upon, and guard your husband,
A treacherous, bloody coward.

(সকলের স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান)"

অমৃতলালের আর একখানি প্রহসন আছে—নাম "রাজাবাহাদুর।" ইহাতে 'ব্লকম্যান ফিশ্' নামে একটা দুর্দ্দশাপন্ন সাহেবের চরিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। স্পষ্ট বুঝা যায়, 'ফিশের' কথাবার্ত্তা "The Taming of the Shrew"র 'Sly' নামক চরিত্রের ইংরাজী কথা হইতে সঙ্কলিত। নিম্নে উদ্ধৃত অংশ পাঠে বুঝা যাইবে অমৃতলাল 'Sly' চরিত্রের নিকট (অর্থাৎ Shakespeareএর নিকট) কি অংশে ঋণী।

1. ["The Taming of the Shrew"—Induction, scene i.]

Host.—.....You rogue !

Sly.—Y'are a baggage : The Slys are no rogues, look in the chronicles we came with Richard Conqueror. Therefore, *paucas.*

pallabris.....

Host.—You will not pay for the glasses you have burst ?

Sly.—No, not a denier. Go by, Saint Jeronimy,—go to thy cold bed and warm thee.

Host.—I know my remedy; I must go fetch the third borough.

2. [The "Rājābāhādur," sc. iii.]

"শুঁড়ী—কি সাহেব, মদ খেলে, গেলাস ভাঙ্‌লে, দাম দেবে না ? এখন মাত্‌লামী করে উড়িয়ে দিচ্ছো, ঐ রোগ শালাদের রোগ।

ফিশ্—Rogue ! you lie, you thief. Don't call me names. Rogue indeed ! The Fishes are no rogues, I tell you ; look in the book of the Peerage, the Chronicles, came in with Richard the Conqueror, therefore let every man be in his humour.

শুঁড়ী—বেড়ি গুড্, ইউ নো গিভ্ মনি ?

ফিশ্—No, not a dirty pice.

শুঁড়ী—আই গো ব্রিং পুলিশ।"

আবার—

1. ["The Taming of the Shrew," Induction, sc. ii.]

Sly—For God's sake, a pot of small ale
... ...
... ...
3. Serv.—What raiment will your honour wear to day ? ...
Sly—I am Christophero Sly; call not me honour nor lordship : I ne'er drank sack in my life ... ... What, would you make me mad ? Am not I Christopher Sly, Old Sly's son of Burton-heath ; by birth a pedler, by education a card-maker, by transmutation a bear-heard, and now by profession a tinker ? Ask Marian Hacket, the fat ale-wife of Wincot, if she know me not : if she say I am not fourteen-pence on the score for sheer ale, score me up for the lyingest knave in Christendom ...
... ...
Lord—Thou art a lord, and nothing but a lord...
... ...
Sly—Am I a lord ? and have I such a lady ? ...
Or do I dream ? or have I dream'd till now ?
I do not sleep : I see, I hear, I speak ;
I smell sweet savours, and I feel soft things :—
Upon my life, I am a lord indeed ;
And not a tinker, nor Christophero Sly.—
Well, bring our lady hither to our sight ;
And once again, a pot o' the smallest ale."

2. ["Rājābāhādur," sc. iii.]

...—For God's sake, a pot of small ale.....
...—My lord ! My lord ! Get up your Honor, you will drink Champagne.
...—Go to—I am Blockman Fish—call not me your Honor or Lordship, I never drank champagne since I left the plantation.
... ...
...—My lord—my lord ! don't forget you are a lord.
... ...
...—What, would you make me mad ! Am not I Blockman Fish ! Old mother Fish's son of Dover ?—By birth a Cobbler, by education a Grocer, then by profession a Planter, an Honorary Magistrate by recommendation, a Debtor by dissipation, next a Rover by occupation, and at present a beggar by brandy bottle's benediction. Go and ask Gaburdawn Shaw—the fat wine merchant of Radhabazar, if he knew me not ! If he says I am not fourteen annas on the score for Old Tom, score me for the lying best knave in Christendom.

কালা—ও মাষ্টার ফিশ্, ছি ছি you forget all I teach you. You are a lord, lord, lord.

ফিশ্—Am I a lord? Then where is my lady! or do I dream, or have I dreamt till now! I do not sleep—I see, I hear, I speak, I smell sweet savour sent up from the Municipal drain, and I feel soft things, these fine dust and horse droppings; 'pon my life, I am a lord indeed! My Lord Landless and not Blockman Fish. Well bring our castle hither, and once again a pot of the smallest ale."

বলা বাহুল্য, রসরাজ অমৃতলাল Shakespeare হইতে শুধু ভাব বা কাব্যকৌশল আহরণ করেন নাই—একেবারে ভাষা পর্য্যন্ত আত্মসাৎ করিয়াছেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের অনুকরণ সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া পাঠককে "মানসী" পত্রিকায় (১০ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩১৬ সাল) প্রকাশিত পরলোকগত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের "কাব্যে অপহরণ" শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়িতে বলি।

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মিত্র

বন্দী

খোল দ্বার, খোল দ্বার
ওগো চিরবন্দী!
তাণ্ডব-কলরোলে
জাগে যুগ-সন্ধি!

মরমের ব্যথাভার
গুমরিছে অনিবার;
ভাষা বাহিরিতে তার
নাহি পায় ফন্দি!
খোল খোল বাতায়ন
মুক্তি-আনন্দে!
ভরে যাক প্রাণ, মন
রূপ, রস গন্ধে!
প্রভাতের আলোধারা,
দিক প্রাণে নব সাড়া;
মুখরিত হোক কারা
নব নব ছন্দে!
কত যুগ কত যুগ
বন্ধনে সিন্ধু;—
দূরে যাক সরে যাক
মেঘ হ'তে ইন্দু!
মৃত্যু-চপল কোলে,
রক্তের নদী দোলে;
মুক্তির কলরোলে
হ'বে নব সৃষ্টি!

মানসের পিয়ালায়,
সঞ্চিতসুধাপ্রায়;
নিঃশেষ হ'ল হায়—
নাহি একবিন্দু!
কল্লোলে ভেসে আসে
উন্মাদ নৃত্য!
যুগ যুগ নিপীড়িত
উন্মুখ চিত্ত!
ভেসে আসে জাগরণী,
ঝটিকার আগমনী
বুক-চাপা জয়ধ্বনি
মুখ ভরি' নিত্য!
ঐ আসে কালোমেঘ
ঝমঝম বৃষ্টি;
রুদ্র প্রভঞ্জন
একি শুভদৃষ্টি!

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপা

সতী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৪)

সেই গঙ্গাজল-ধৌত ঘর খানিতে একাধারে পঙ্কজিনীর পূজার উপকরণ, তার ভাণ্ডারের দ্রব্যাদি সমস্তই রক্ষিত হইল। মালি খুব ভাল জলাচরণীয় জাতি। সে এই সাহেবগৃহবাসিনী মাইজীর অবিকারে আবিষ্কৃত হইয়া হঠাৎ একটা গণ্যমান্য ব্যক্তিত্বে উন্নীত হইয়াছে দেখিয়া উক্তা মাইজীটার প্রতি কয়েক মুহূর্ত্ত মধ্যেই সে বেশ একটুখানি আকর্ষণ অনুভব করিয়া বসিল। সে তার জন্য যমুনিয়া দিয়ে দু কলসী জল বহিয়া আনিল, পড়সী গোয়ালার ঘর হইতে এক টুকরী গোবর আনিল, তার দ্বার বাসন মাজিয়া দিল, তার স্নানের ও ঘর ধোয়ার জল কূয়া হইতে তুলিয়া দিয়া শেষে তার চুলের ঝাঁটা নির্ব্বন্ধ সহকারে চাহিয়া লইয়া ঘর ধুইয়া দিতেও বাকি রাখিল না। বেলা দশটা নিবার উপক্রম করিতেছে, প্রভাতের সেই নীলবর্ণ আকাশে সোনার জলের একটা সূক্ষ্ম প্রলেপের ন সমুজ্জ্বল রৌদ্রের আভা ঝিলিক দিয়া উঠিতেছে, রেল লাইনের পার্শ্বে একটা সুবৃহৎ নিমগাছের পের মধ্যে বসিয়া একটা অজানিত পাখী এক প্রকার অশ্রুতপূর্ব্ব ধ্বনি প্রচার করিতেছে, পঞ্চান্ন মিনিটের ডাউন প্যাসেঞ্জার দুড় দুড় শব্দ করিয়া ষ্টেশনাভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে। জিনী সদ্যস্নানসিক্ত দীর্ঘ কেশপ্রান্তে একটী গ্রন্থি বাঁধিয়া দিয়া পূজা গৃহের দ্বারে দাঁড়াইয়া ার প্রকৃতির এই আনন্দময় উজ্জ্বলতর রূপ সন্দর্শন করিল; তারপর ধীর অচঞ্চল গতিতে গিয়া র আস্তীর্ণ পূজার আসনে বসিয়া সম্মুখস্থ গঙ্গাজলপূর্ণ পঞ্চপাত্র টানিয়া পূজা করিতে ম্ভ করিল।

ইহার কয়েক মুহূর্ত্ত মাত্র পরে তাহার সাহেব-স্বামীর কণ্ঠ উচ্চে আহ্বান করিল "বয়!"—এক মুহূর্ত্ত পরেই সেই কণ্ঠ হইতে হুকুম বাহির হইল—

"তুরন্ত ম্যয় গোসলখানাসে আতেহেঁ, বাবুর্চ্চিকো খানা লে আনে বোলো।"

পঙ্কজিনী প্রাণপণে নিজের চিত্ত উপাস্যের প্রতি নিবিষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়া যুক্তকরে করিতে লাগিল :—

"ধ্যায়েৎ নিত্যং মহেশং, রজতগিরিনিভং, চারুচন্দ্রাবতংসং রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং—"

াহারী হইতে বাড়ী ফিরিয়া সুধীন্দ্র পঙ্কজিনীর কোনই খোঁজ খবর লইল না। আফিসের র সাহায্যে পরিবর্ত্তন করিয়া সে ড্রইং রুমেতেই একখানা ইজি চেয়ারে আসিয়া শুইয়া

চুক্ষণ পরে 'বয়' আসিয়া সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিল, চা কে প্রস্তুত করিবে—অথবা—

নিরতিশয় বিরক্তির সহিত উদ্ধতকণ্ঠে সুধীন্দ্র হুকুম করিল, শীঘ্র এক কাপ্ চা তাহাকে তৈরি করিয়া দেওয়া হোক।

চা তৈরি হইয়া আসিলে সেইখানেই টিপয়ের উপর তাহা দিতে বলিয়া বিমর্ষমুখে ও অমর্ষপুরিত চিত্তে অর্দ্ধোত্থিতভাবে সেইখানে থাকিয়াই তাহা ঔষধের মতই অস্বচ্ছন্দমনে সেবন করিতে লাগিল। তাহারও কল্পনারচিত সুখ-নন্দনে দৈত্যের উপদ্রব ঘটিয়াছিল।

"ব—ই! সাব্ কোঠিপর হ্যায়।" পর্দ্দার বাহিরে খুট খুট জুতার শব্দের সহিত এই কয়টী কথা মিহিসুরে উচ্চারিত হওয়া মাত্রে সুধীন্দ্রের বুকটা যেন ঝড়ে পড়া দরজার মত ধড়াস্ করিয়া উঠিল। রক্তরঞ্জিতমুখে সে বয়ের পরিবর্ত্তে নিজেই জবাব দিবার সঙ্গে সঙ্গে উত্থিত হইল—

"ইয়েস্ মিসেস সিনা! কম ইন্ প্লীজ (হাঁ মিসেস সিংহ, অনুগ্রহপূর্ব্বক ভিতরে আসুন)।"

—বলিতে বলিতে দরজার দিকে অগ্রসর হইয়া গেল, এবং তার সেখানে পৌঁছিবার পূর্ব্বে এক হাস্যবদনা সুসজ্জিতা যুবতী দুই হাতে পর্দ্দা ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিয়াই আশ্চর্য্যস্বরে কহিয়া উঠিল—"ও-মাই! আপনি একাটী বসে বসে ঘরের কোন্‌টীতে চা 'সিপ্' করচেন, আর মিসেস্ সরকার কোথায়?"

লজ্জায় কপোল কণ্ঠ অনুরঞ্জিত করিয়া সুধীন্দ্র নিজের মান রক্ষার খাতিরে ত্রস্ত হইয়া কহিল "তাঁর শরীরটা তেমন ভাল নেই।"

"হোয়াট এ পিটি! এসেই তাঁর অসুখ করলো! তিনি বুঝি ভারী রুগ্ন? সেবারও শরীর খারাপের জন্য এলেন না—।"

সুধীন্দ্র নিজের ফাঁদে নিজে জড়াইয়া গিয়া নিরুত্তরে রহিল। মিসেস সিনা কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কি বুঝিল বলা যায় না, হাসিতে হাসিতে ভুরু বাঁকাইয়া মাথা দোলাইয়া আব্দারের সহিত কহিল—"তা বলে এমন অসুখ করেনি বো[illegible] যাতে একবারটী আমাকে দর্শন দান করতে অপারগ হ'ন? বলুন না বয়কে তাঁকে একবার খবর দিতে।"

সুধীন্দ্র প্রমাদ গণিল, বয়ের দ্বারা খবর পাঠাইয়া কি যে উত্তর শুনিতে হইবে তাহার কোনই স্থিরতা নাই; সে এক মুহূর্ত্তকাল বিপন্নবৎ নির্ব্বাক থাকিয়া পরে উত্তর করিল "আচ্ছা আমি দেখে আস্‌ছি, যদি একটু সুস্থ হয়ে থাকেন, আসতে বল্‌বো।"

ড্রইং রুমের ডানহাতি পঙ্কজিনীর শয়ন গৃহ; সে ঘরে তাহাকে দেখিতে পাওয়া গেল সুধীন্দ্রের মনটা বিপত্তির আশঙ্কায় সহসা তিক্ততর হইয়া উঠিল। হয়ত মধ্যাহ্ন ভোজনের সময়ের মত এখনও পঙ্কজিনী তার পূজার ঘরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিয়া গিয়াছে। মিসেস সিনাকে সে না হয় মিথ্যা করিয়াই বলিল যে তার শরীর বিশেষ অসুস্থ এবং সেজন্য সে শয্যাগত হইয়া আসিতে পারিবে না। কিন্তু একথা শুনিবার পরও যদি মিসেস সিনা স্বয়ং তাহাকে দেখিতে আসিবার প্রস্তাব করিয়া বসেন এবং তাহা করাই সম্ভব তখন সে তাঁহাকে ঠেকাইয়া রাখি

বলিয়া? ভাল গ্রহেও পড়া গিয়াছে! এমন বিপদে পড়িবে জানিলে সে তার স্ত্রীকে আদৌ না হয় এখানে আনিতই না।

এদিক ওদিক দেখিতে দেখিতে, দেখিতে পাইল বাথরুমের রুদ্ধ দ্বার খুলিয়া এক সুবেশা সুন্দরী বাহির হইয়া আসিতেছে, সে দেখিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল যে, সে তাহারই স্ত্রী পঙ্কজিনী।

"তোমায় একজন দেখতে এসেছেন, শীঘ্র করে জুতোটা পায়ে দিয়ে নিয়ে এস দেখি, শাঁখাটা আর কতকগুলি চুড়ি খুলে রেখে দিলে ভাল হতো, এক হাত গহনা পরার ওঁরা ভারি নিন্দা করেন।"

পঙ্কজিনী স্বামীর মুখে স্থির দৃষ্টি তুলিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "যখন তখন কি হাত থেকে সধবা মেয়েদের গহনা খুলে রাখতে আছে নাকি? কে এসেছেন?"

সুধীন্দ্র কহিল "আমার একটি বন্ধু এসেছেন। তাঁর সঙ্গে বেশ সংযতভাবে ভদ্রভাবে কথা-বার্ত্তা কইবে, যেন কোন রকমে তোমায় তিনি অসভ্য মনে করতে না পারেন।"

পঙ্কজিনীর প্রফুল্লমুখ মুহূর্ত্তে গম্ভীর হইয়া আসিল, বলিল—"তোমার বন্ধু!—পুরুষ মানুষ! শুধু শুধু আমি হঠাৎ একজন পুরুষের কাছে গিয়ে উপস্থিত হতে যাব কেন? আমি যাবো না।"

সুধীন্দ্র বিরক্ত হইয়া কহিল "মিসেস সিনা, পুরুষ মানুষ নন, তাঁর সাক্ষাতে বার হলে তোমার লজ্জাশীলতার কোনই হানি হবে না। আর যদিই ওঁর সঙ্গে মিষ্টার সিনা আস্‌তেন, তা হলেও কি তোমায় তাঁর সাম্‌নে বার হতে হবে না মনে করচো? তাঁর স্ত্রী যখন আমার সাম্‌নে বার হতে এসেছেন তখনতো তোমাকেও মিষ্টার সিনার সাক্ষাতে বেরুতেই হবে। তোমার ওসব কুণোমীগুলো ছাড় দেখি।—"

পঙ্কজিনী ঈষৎ একটুখানি হাসিয়া অগ্রসর হইল, প্রতিবাদ করিল না। তাহা দেখিয়া সুধীন্দ্র ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বলিল—"কই স্লিপারটা পায়ে দিলে না যে? এই! শোন শোন—"

ততক্ষণে গজগামিনী পঙ্কজিনী ত্বরিত মরালগমনে ড্রইং রুমের দ্বার-সান্নিধ্য লাভ করিয়াছিল, সেইখান হইতে উত্তর দিল, "জুতো পায়ে দিয়ে আমি যে চল্‌তে পারিনে, আমার কি জুতো অভ্যাস আছে?" কথাটা খুব সম্ভব মিসেস সিনার কর্ণেও প্রবেশ লাভ করিয়াছিল।

সুধীন্দ্র রাগে গুম হইয়া ফিরিয়া আসিল।

মিসেস সিনার সহিত আলাপ হইতে পঙ্কজিনীর অধিকক্ষণ সময় খরচ হইল না। দুপাঁচ মিনিটের মধ্যেই তাহারা পরস্পরের ধাতুর সহিত পরিচিত হইয়া উঠিল। কথায় কথায় মিসেস সিনা পঙ্কজিনীকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, "আচ্ছা আপনি হিন্দু মেয়েদের পর্দ্দা প্রথাটাকে ঘৃণা করেন, না? মেয়েদের পক্ষে কি অত্যন্ত অবমাননাজনক নয়?"

পঙ্কজিনী মিসেস সিনার প্রশ্নের উত্তর এড়াইয়া গিয়া কহিল—"বাঙ্গালী হিন্দু-সমাজে কি একটা পর্দ্দা প্রথা কোথাও আছে বলে আপনি মনে করেন? আমার ত সেরকম [illegible]।"

মিসেস সিনা কহিলেন—"সে কি বল্‌ছেন? আমি এখানের অনেক হিঁদু বাড়ীতে মেয়েদের গাড়ি বন্ধ করে বার হতে দেখেছি! এমনকি অধিকাংশ মেয়েরা স্বামীর বিশেষ বন্ধুর সাক্ষাতেও কখনও বার হন না; এগুলো অসঙ্গত নয়?"

সুধীন্দ্র আগ্‌ বাড়াইয়া বলিয়া উঠিল—"অত্যন্ত অন্যায়।"

পঙ্কজিনী স্বামীর মুখের দিকে কৌতুকদৃষ্টি বারেক নিক্ষেপ করিয়াই মিসেস্ সিনার দিকে চাহিয়া বলিল, "আমার এটাকে খুবই অবমাননাজনক বা অন্যায় ব্যাপার বলে মনে হয় না। গাড়ী মুদে যাবার নিয়মটা এসব দেশে মুসলমান প্রাধান্যের শেষ চিহ্ন এখনও পর্য্যন্ত কতকটা থেকে গেছে মাত্র। বাঙ্গালার বাঙ্গালীদের মধ্যে প্রায় সেটা আর দেখা যায় না। পল্লীগ্রামে তো কস্মিনকালে ছিলই না। আর স্বামীর বন্ধুর সাক্ষাতে বার না হলে যে নিন্দনীয় কিছু আছে সে সম্বন্ধেও আমার বিশ্বাস অন্যরকম। অল্পবয়সী নিঃসম্পর্ক স্ত্রী পুরুষে খুব বেশী মেলামেশা সঙ্গত নয় বলেই তাঁরা মনে করে থাকেন।"

সুধীন্দ্র কি বলিতে গেল, মিসেস সিনা তাহাতে বাধা দিয়া বলিল, "তাহলেই হিঁদুরা যে স্ত্রীলোকদের ঘৃণ্য সন্দেহের চক্ষে দেখে থাকে তাইত প্রমাণ হচ্চে!"

সুধীন্দ্র কহিল "একশ'বার।"

পঙ্কজিনী কহিল "সিকিবারও নয়। বরং হিন্দুসমাজ যে সাধারণ পুরুষদের সংযমকে কতকটা সন্দেহ করে থাকেন এ থেকে তারই প্রমাণ পাওয়া যায়। মেয়েদের পবিত্রতাটা তাঁদের কাছে এতই সম্মানের বস্তু যে, সেটাকে তাঁরা কোন মতে কোন সন্দেহজনক বস্তুর সংস্পর্শে আস্‌তে দিতেই প্রস্তুত নহেন।"

মিসেস সিনা ও সুধীন্দ্র এক সঙ্গেই বলিয়া উঠিলেন "পুরুষ মাত্রেই কি অসংযত?"

পঙ্কজ কহিল "মোটে না। কিন্তু কে অসংযত, আর কে নয় সেটা যাচাই করতে তো সময় লাগে। তা'ভিন্ন তাঁরা দেব ও দেবী প্রকৃতির নারী পুরুষ ভিন্ন নর-প্রকৃতির মেয়ে পুরুষদের পক্ষে প্রলোভনের থেকে দূরে দূরে থাকাই সঙ্গত মনে করেন। মনে করুন, একজনের স্ত্রী কুৎসিত অশিক্ষিতা এমন কি অসভ্য—তাঁর হয়ত সুন্দরী শিক্ষিতা ও সুসভ্যা বন্ধু পত্নীর সহিত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতার ফল খুব ভাল নাও থাকতে পারে। সর্ব্বদা নিজের স্ত্রীর সঙ্গে তুলনাত আসবেই এবং অন্তর মনটাকেও এই তুলনাটা কিছু কলুষিত করবে। এটাত সহজেই মনে হবে যে আমার স্ত্রী ঐরকম হ'তো! নারীর পক্ষেও ঠিক এই একই যুক্তি খাটে।"

সুধীন্দ্র তীক্ষ্ণনেত্রে স্ত্রীর ঔদাস্যপূর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। মিসেস সিনা আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন "মনে মনে কেউ যদি কারুকে অ্যাড্‌মায়ার করে সেটাও আপনার মতে মহাপাপ?"

পঙ্কজ উহাদের দুজনকারই মুখে যুগপৎ চাহিয়া দেখিয়া গম্ভীরস্বরে উত্তর করিল—

"পাপের চেয়ে মানস পাপ কোন অংশেই ছোট নয়; তবে সেটা দণ্ডবিধি আইনের মধ্যে আসে না এই যা—"

সুধীন্দ্র পঙ্কজিনীর মুখে এ ধরণের সহজ সরল অথচ সূক্ষ্ম ও সতেজ যুক্তি শুনিয়া কিছু যেন বিস্ময় বোধ করিল। এতটাই যে সে চিন্তা করিতে সমর্থ তার আট গাছা চুড়ি পরা ও নাকের নাকছাবিতে তার সে বিশ্বাস জন্মে নাই? বিশেষতঃ যে মেয়ে খানসামাদত্ত চা ও বাবুর্চ্চির রান্না মুরগী মটন খাইতে রাজী নয়।

সে নীরব হইয়া রহিল; কিন্তু মিসেস সিনা কহিলেন—

"তাহলে আপনার মতে মেয়ে পুরুষের মধ্যে মেলামেশা সঙ্গত নয় এবং তা করতে গেলেই হয় পিনাল কোডের ধারার মধ্যে, না হয় ধর্ম্মশাস্ত্রের নিষেধ বিধির ভিতরে তাদের জড়িয়ে পড়তে হবে!" তাঁহার কণ্ঠস্বরে সুপ্রচুর বিরক্তিপূর্ণ বাক্য মিশ্রিত ছিল।

পঙ্কজ সহজভাবেই উত্তর করিল—"নিঃসম্পর্ক স্ত্রী পুরুষের মধ্যে অবাধ মেলামেশাটা হিন্দু বিচারসাপেক্ষ ও ওটা হঠকারীভাবে শুধু ফ্যাসানের খাতিরে করা অনুচিত বই কি; ওর ফলে হয়ত শতকরা একটা ক্রিমিনাল কেস আসাও সম্ভব এবং পাঁচ পারসেণ্ট নীতিশাস্ত্রবিরোধী ব্যাপার ঘটতেও পারে। সমাজের পক্ষে ওটা যেন ডেন্‌জার সিগ্‌নাল।"

মিসেস সিনা তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে ঘৃণাপূর্ণ হাসি হাসিল। পঙ্কজ তাহা লক্ষ্য করিয়া একটু জোরের সহিত কহিল—

"হিন্দু সমাজে তাই বলে মেয়েদের কৌটার মধ্যে ভরে রাখা হয় না, তাঁরা মাঠ দিয়ে যেতে একা জল আন্‌তে যান; প্রতিবেশী আবালবৃদ্ধ সবার সঙ্গেই তাঁদের দাদা মামা মেসো পিসে সম্পর্ক পাতান, গ্রামের মেয়েরা কারুর সাম্‌নেই মুখ ঢাকেন না। বউদের দেবর স্থানীয়েরা—তা' সে জাতের ছেলেই হোক, সকলেই তাদের কাছে পান চাইতে গুরুজনের সাক্ষাতে বসে পান কইতে অধিকারী। তবে অজ্ঞাতচরিত্র স্বামীর বন্ধুদের নিয়ে সেজেগুজে বসে প্রতি কথায় হাস্য পরিহাস করা তাঁরা একটু অসঙ্গত অন্যায় বোধ করে থাকেন হতে পারে তাঁরা মূর্খ অশিক্ষিত তাই এরকম মনে করেন; কিন্তু এই কম বয়সের স্ত্রী পুরুষে মেলামেশার ফল ইউরোপে যে খুবই ভাল হচ্চে না, তা তাঁদের অসংখ্য বিবাহ-বিচ্ছেদ থেকে কি প্রমাণ হয় না? তাঁদের সোসাইটী নভেলগুলো সব কি বল্‌ছে? আপনাকে কি বলতে বলি? তোমাকেও আর এক কাপ্‌ দিতে বল্‌বো নাকি? তোমার তো চা'য়ে অরুচি নেই।"

প্রসঙ্গ বদল হওয়াতে সুধীন্দ্র সন্তুষ্ট হইল। মিসেস সিনার গম্ভীর মুখ তাহাকে লজ্জায় ফেলিয়াছিল, কিন্তু তথাপি উহারই মধ্যে পঙ্কজিনীর যে এ সকল বিষয়ে চিন্তা করিবার শক্তি বা পড়াশুনাও কিছু নাই তাও মনে হয় না,—এই টুকুর প্রমাণ পাইয়া অপ্রসন্নতার মধ্যেও

ঈষৎ একটু প্রসন্নভাবও তাহার মনে জাগিতেছিল। আবার এই সকল ভ্রান্ত ও নেহাৎ অসত্য মতামতগুলি সমস্ত ভুলাইতে, উহাকে আলোকে আনয়ন করিতে, তাহাকে অধিকতরই বেগ পাইতে হইবে বলিয়া একটা ভয়ও তার সঙ্গে সঙ্গে অমিশ্রিত ছিল না।

মিসেস সিনা আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন "এ কি! আপনি চা খাবেন না?"

পঙ্কজ মৃদু হাসিয়া উত্তর করিল "আমি যে চা' খাইনে।"

"মোটে না?" প্রশ্নকর্ত্রীর কণ্ঠে প্রচুরতর বিস্ময় ধ্বনিত হইল।

"মোটে না।"

"হাউ ষ্ট্রেঞ্জ!" বলিয়া মিসেস সিনা পুনশ্চ কহিলেন "তা আমাদের খাতিরে একদিন না হয় খেলেনই? এই বয় মেমসাব্ কাওয়াস্তে—"

বাধা দিয়া পঙ্কজ কহিয়া উঠিল—"না না, মাপ করবেন; চা আমি খাবো না—বিশেষ ওর হাতে।"

সুধীন্দ্রের মুখ লজ্জা অপমান ও বিরক্তিতে অরুণবর্ণ হইয়া উঠিল। মিসেস সিনা যেন অন্তরে দারুণ আহত হইয়াছেন এমনই মুখ করিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

(৫)

মানুষে গড়ে ও দেবতায় ভাঙ্গেন এই যে প্রবচনটা ইংরাজীতে আছে—অনেক স্থলে সেটাকে বেশ চৌচাপটে ঘটিতে দেখা যায়। সুধীন্দ্রও নিজের মনে অনেকখানি গড়িয়াছিল যাহা তাহার দেবতা ভাঙ্গিতে বসিয়াছেন। আয়াকে না ছাড়াইয়া চলিল না, বাবুর্চ্চির রা দুবেলার একবেলাও পঙ্কজিনী স্পর্শ করিল না, অধিকন্তু মালীর রান্নাতেও রাজী না হইয়া নি রাঁধিয়া খাইল। মিসেস সিনার সাক্ষাতে ওই কু-তর্কতো করিলই, তদ্ভিন্ন চা খাইতে,—বয়ের খাইতে—অস্বীকার করিয়া তাহার মাথা যতদূর পারিল হেঁট করিয়া দিয়া তবে সে ছাড়িল। আ ইহাতেও যথেষ্ট সন্তোষ তাহার হয় নাই, আরও একটা কীর্ত্তির কথা বলিতেছি শুন।

প্রায় এক প্রহর রাত্রে মিসেস সিনা বিদায় লইলেন, রাত্রি দশটার ট্রেনে মিষ্টার বাড়ী ফিরিবেন। ইতিমধ্যে পঙ্কজিনীর জন্য ক্রীত নূতন অর্গানটা তাঁর হস্তস্পর্শে পবিত্র হইয়া তাঁর গান শুনিয়া পঙ্কজ মুগ্ধ হইল, একদিন সে তাঁর বড় দাদার অনুরোধ রক্ষা করে নাই, হঠাৎ ইহার স্বর-সম্মোহিত হইয়া আচমকা বলিয়া বসিল "ভাই, আমায় শেখাবেন?"

সুচারু মৃদু হাসিয়া উত্তর দিল—"আনন্দের সহিত; কিন্তু কাল তাহলে আপনাকে বাড়ী যেতে হবে।"

পঙ্কজ কহিল "তার আর কি! তা যাব। কখন যাব বলুন।"

সুচারু বলিল "এই আমি যে সময় এসেছিলুম, মিঃ সরকার অফিস থেকে ফিরে ওখানে গিয়েই চা'টা খাবেন এখন দুজনে।"

পঙ্কজ মুখ ভার করিয়া বলিল "আমিতো চা' খাইনা তখন বল্লুম।"

সুচারু কহিল "ওঃ, হ্যাঁ, তা বটে! তা' আচ্ছা বয় না দিয়ে আমি যদি নিজে করে দিই—তাহলে তো আর খেতে দোষ নেই?"

পঙ্কজ একটু ইতস্ততঃ করিয়া কুণ্ঠিতভাবে জবাব দিল—"তাও একটু আছে; বাসনগুলো ও সব বয় বাবুর্চ্চির তৈরী জিনিসের ছোঁয়াছুঁইরই মধ্যের?"

"তাতেও দোষ হয় নাকি?"—সুচারুর স্বরে বোধ হইল সে যেন আকাশ হইতেই বা পতিত হইয়াছে।

পঙ্কজ বলিল "তা হয় বই কি! চিনা মাটির পাত্র মাটির জিনিসেরই মত, তাতে মুসলমানের ছোঁয়া হিন্দুর অখাদ্য জিনিস রাখলে, হিন্দুর ব্যবহার্য্য থাকবে কি করে? আমরা স্পর্শ দোষ মানি যে।"

"আপনি আপনার দেশের লোককে যদি এতটাই ঘৃণা করেন তাহলে অপর জাতিদের কাছে শ্রদ্ধা চাইবেন কিসের দাবীতে?"

পঙ্কজ বলিল "আমার দেশের লোককে আমি মোটেই ঘৃণা করিনে, অর্থাৎ যাঁরা দোসাতের যতের জল খান তাঁরা তাদের যতটা ঘৃণা করেন তার চাইতে এক পাইও বেশী করিনে। যাঁরা ঘরের হাতে খান, তাঁরা সেই ব্যক্তি বিশেষটীকে ভিন্ন তার নগ্ন, দরিদ্র অসভ্য আত্মীয়দের নিজের পাশে সহ্য করতে পারেন কি? তার জাতির দরিদ্রের ঘরে গিয়ে তাদের সিদ্ধ পক্ক শুয়ারের মাংসের অংশ নিতে পারেন কি? তাদের কলেরার সেবা করতে সম্মত হন কি? ইংরেজ প্রভৃতিরা অনাচরণীয় জাতির খানসামা না পেয়ে অনাচরণীয়কে নিজের পরিচর্য্যায় শিখিয়ে নিতে বাধ্য হন; এ দেখে তাঁদের বাড়ীরই বরখাস্ত করা জনকতক অনাচরণীয়ের হাতের কাটলেট তৈরি খেয়ে কেউ মনে করে থাকেন যে তাঁরা জাতিভেদ উঠিয়েই দিয়েছেন, সেটা তাঁদের একান্ত ভুল। নীচ জাতিকে নিজের সঙ্গে সমান আসন দেন্‌নি, মাত্র ফ্যাসানের খাতিরে তাদের হাতে ঘর করাতে হয় তার আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সচেষ্ট হ'তে হয়। গীতায় ভগবান বলেছেন—

'শুনীচৈব স্বপাকেচ পণ্ডিতা সমদর্শিনঃ'—বাবুর্চ্চির হাতে খাওয়া পণ্ডিতরা কি তাই দেখেন? প্রকৃত-হিন্দু তাই দেখে থাকেন। তাঁদের কারু কারুকে অন্ততঃ রোগীর সেবা দেখেছি; কিন্তু হাতে তাঁরা নিজের মেয়েরও খান্‌না তাই সেটা ঠিক ঘৃণা বলা যায়।"

সুচারু কহিয়া উঠিল "কোথায়? তারা—"

পঙ্কজ বাধা দিল,—"আপনি ক'জন প্রকৃত হিন্দুকে জানেন বলুন ত? বিশেষ তাঁরা

এ সকল কার্য্য ঢাক পিটিয়ে করে বেড়ান না। যদি শিখতে হয় তো সেই ভাবেই উদারতা শিখতে হয়, বাবুর্চ্চি, আয়া নিয়েই ত সারা সংসার নয়, বাকীদের গতি কি ?"

এম্‌নি করিয়া সুধীন্দ্রের আশাস্বপ্নকে ব্যর্থ করিতে বসিয়া মিসেস সিনাকে বিস্মিত চকিত ও উত্তেজিত করিয়া দিয়া পঙ্কজিনীর সান্ধ্য মজলিস ভঙ্গ হইল।

মিসেস সিনা বিদায় লইলে স্ত্রীর দিকে ফিরিয়া সুধীন্দ্র দৃঢ়স্বরে কহিয়া উঠিল "ওবেলাতো ফাঁকি দিলে, এবেলা আর ছাড়ছিনে, এবেলা তোমায় আমার সঙ্গে টেবিলে খেতেই হবে।"

পঙ্কজ বলিল "আমার যে এখনও আহ্নিক হয়নি।"

সুধীন্দ্র রাগিয়া বলিল "ড্যাম্ ইওর আহ্নিক! কত ছুতোই যে তোমার আছে। কিন্তু পঙ্কজিনী যখন ঈষৎ একটুখানি মৃদুহাস্যে তার সেই পুরুষের পৌরুষকে একান্ত উপেক্ষা করিয়া দিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল, তখন তার পিছনে পিছনে গিয়া তাহাকে হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া ডাইনীং টেবিলের সম্মুখে বসাইয়া দিতে এবং কাঁটা চামচ তার হাতে গুঁজিয়া দিয়া তাহার অবস্থার প্রতিশোধ দিবার মত দুঃসাহস সুধীন্দ্রের মনে জাগিলেও সেকার্য্যে তাহার ইন্দ্রিয়গ্রাম তাহার কোনই সাহায্য করিল না। একটুখানি পরেই তাদের শয়নগৃহের পার্শ্বের সেই ছোট কুটুরীটার দরজা সবেগে রুদ্ধ হইয়া যাওয়ার শব্দ পাওয়া গেল, তখন হতাশার ক্রোধে সুধীন্দ্রের সর্ব্বশরীর ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল ও নিজের অক্ষমতায় নিজের উপর তাহার যেন একটা ঘৃণাবোধ হইতে লাগিল। ইউরোপে যে একদিন সঙ্কোচ করে নাই, নিজের ঘরে তার এ দ্বিধা কিসের জন্য ? অবাধ্য স্ত্রীকে বাধ্য করিবার শক্তি বা সাহস হয় না!

খাওয়াটাও সেদিন ভাল করিয়া হইল না, কিন্তু উদরের খালি অংশটা অন্য এক উপায়ে শীঘ্রই ভরিয়া উঠিল। বাহিরের বারান্দায় হৈমন্তিক হিমে অনেকক্ষণ অবধি সিগার টানিতে টানিতে পাইচারি করিয়া বেড়াইয়া উত্তপ্ত মস্তিষ্ক অপেক্ষাকৃত শীতল হইলে একবার মনে করিল "দূর হোক ছাই, ঘরে শুইয়া আমার কাজ নাই, বারান্দায় এই ইজি চেয়ারটাতেই পড়িয়া থাকি। কে আবার ভিখারীর মতন এখন মহারাণীর দ্বারে দরবার করিতে যায়! কিন্তু মশকের অত্যাচারে সে আত্মসম্মান বজায় রাখা কঠিন হইয়া উঠিলে উঠিয়া অগত্যাই শেষে মহারাণীর দ্বারস্থ হইল—বাড়ীতে দ্বিতীয় বিছানা বা মশারি ছিল না।

"কি ? তোমার ঘরে ঢুকতে পারি ? না আমি গেলে তোমার ঘর অপবিত্র হয়ে যাবে ?"

ভিতর হইতে অতি মিষ্ট মধুর সম্ভাষণে উত্তর আসিল "তোমার পায়ের ধুলো আমার পাবে কোথা ? তুমি এলে ঘর তো ঘর, আমিও সেই সঙ্গে পবিত্র হয়ে যাব যে!"

পঙ্কজিনী ছুটিয়া আসিয়া স্বামীর গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল, সুধীন্দ্র অভিমানে তাহার দিকে করিয়া চাহিয়াও দেখিল না, তা'দেখিয়া সে মুখ টিপিয়া একটু হাসিল।

সুধীন্দ্র কহিল "অত আর ঠাট্টা করতে হবেনা, তোমার কাছে আমার যা দর তা আজ সারাদিনেই প্রমাণ হয়ে গেছে, আজকের মতন একটা পাশে পড়ে থাকতে দাও, কাল তখন নিজের যা হয় একটা বন্দোবস্ত করে নেওয়া যাবে। নেহাৎ মশার উপদ্রব না হলে বাইরেই কোথাও পড়ে থাকতেম।" সে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া একটুখানি অগ্রসর হইল।

পঙ্কজিনী তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া মশারী তুলিয়া ধরিল, তারপর সেটা ফেলিয়া একটুখানি সলজ্জভাবে হাসিল ও যেন সকল দ্বিধা সরাইয়া দিয়া স্নিগ্ধ মধুরস্বরে কহিল, "হ্যাঁ, তাই তোমায় থাকতে দিলুম তো। আমায় একাকী ফেলে বাইরে পড়ে থাকবে বৈ কি! আর আমি সারাদিন ধরে তোমার অবাধ্যতা করে যে পাপ সঞ্চয় করেছি তোমার পদসেবা করে তার একটুখানিও খণ্ডন করতে পারবো না বুঝি ? ভারী মজা তো!"

সুধীন্দ্র চকিত হইয়া এতক্ষণকার নত দৃষ্টি তুলিয়া স্ত্রীর দিকে চাহিল। কি আশ্চর্য্য! এই মেয়েটীর কি দুইটা মূর্ত্তি আছে নাকি ? এত আর সে নয়, সেই দৃঢ় অনমিত আত্মপ্রতিষ্ঠ স্বাধীয়সী নারীর কঠিন মূর্ত্তি এখন তো আর তার মধ্যে দেখা যায় না ; ষোড়শী সুন্দরী প্রেমময়ী ও আত্মসমর্পণোন্মুখী পতিপ্রাণা পত্নীর এ মূর্ত্তি যে!

সুধীন্দ্রের অন্তরের মধ্যে অভিমানে ও আগ্রহে একটা তুমুল সংগ্রাম চলিতে লাগিল। ইত্যবসরে সে দেখিল শুধু পঙ্কজিনীর অন্তররূপেরই নয়, ইতিমধ্যে তার বাহ্যরূপেরও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। তার নাকে সে নাক ছবিটা নাই, কাণে শুধু দুটি লাল চুণি, হাতে এক হাত শাঁখা, রুলি ও বোম্বাই বেঁকি চুড়ির রাশির বদল হইয়া সুগোল মণিবন্ধন দুটী দুগাছি অমৃতি বলায় নিজেদের গঠন সৌকুমার্য্য প্রকাশ করিবার অবকাশ পাইয়াছে। পরণের সাড়ীটাও যথেষ্ট সৌখীন। এই সাদাসিদা পোষাকে তাকে অধিকতর সুন্দরী দেখাইতেছে। একেত তার রূপ অসাধারণ!

বিস্মিত হইয়া সুধীন্দ্র স্ত্রীর হাস্যোৎফুল্ল মুখের দিকে চাহিয়া রহিল ; তারপর নিজের মনে একটা কিছু গড়িয়া লইয়া পূর্ব্ববৎ ঔদাস্যপূর্ণ অভিমানের মধ্য হইতেই জবাব দিল "আমার মত পার্থিবের পদসেবা করলে তোমার কি আর স্বর্গের আসন অটল থাকবে। থাক্ থাক্ আমার জন্য ব্যস্ত হতে হবে না, তুমি নিজের কথাই ভাবো।"

"তাইতো ভাব্‌চি। নিজের ছেড়ে কি কেউ পরের কথা ভাবে ?" এই বলিয়া স্বামীর মুখের দিকে প্রশান্ত দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া সহাস্যমুখে পঙ্কজিনী স্বামীর কাছে আসিয়া ভূমে হাটু গাড়িয়া বসিল, যোড় হাতে বলিল "আমায় ক্ষমা কর"—বলিয়া তার জুতার তলায় হাত দিয়া সে মাথায় ঠেকাইল। শরীরে মনে একেবারে গলিয়া গিয়া সুধীন্দ্র স্ত্রীকে হাত ধরিয়া তুলিয়া বুকের মধ্যে টানিয়া লইল। "এত যদি ভাল তুমি তবে কেন আমায় দুঃখ দিচ্ছিলে ? মিসেস সিনার কাছে কি অপূর্ব্ব বেশভূষা করেই গেলে বলত ? এইত বেশ ভদ্র হতে পেরেছ। কত ভাল দেখাচ্চে।"

স্বামীর বক্ষে মুখ রাখিয়া পঙ্কজিনী মৃদুকণ্ঠে কহিল, "তুমি আমায় যে বেশে দেখতে চাও সে শুধু তোমার দৃষ্টির জন্যই রেখে দেবো, কিন্তু সবাইকার জন্য আমার আসল যে মূর্ত্তি সেইটা বার করা থাকবে না কেন? আমি যখন হিন্দু তখন আর সকল বিষয়ে সকল সময়েই আমি তাই থাকবো, শুধু নিজের সমাজ ধর্ম্ম বজায় রেখে যে টুকু তোমায় দিতে আমার সাধ্যে কুলুবে আমি দেবার চেষ্টা প্রাণপণেই করবো—যদি তুমি তাতে খুসী হও—একি! তোমার মুখে এ কিসের গন্ধ! মদ খেয়েছ? তুমি মদ খাও?"—স্বামীর বাহুবন্ধন হইতে সে নিজকে সজোরে মুক্ত করিয়া লইল।

সুধীন্দ্র মুহূর্ত্তে মরিয়া হইয়া উঠিল, সে স্পষ্টস্বরেই কহিল "খেয়েছি, তাতে হয়েছে কি? সাহেবেরা খান, অনেক বিলাত-ফেরতই তো খায়, কে না খাচ্চে? শুধু আমি খেলে দোষ হয়?"

দুঃখে ক্রোধে পঙ্কজিনীর দুই চক্ষু হইতে তখন অগ্নিকণা ঠিকরিয়া পড়িতেছিল। তাহার সমস্ত মুখ উত্তপ্ত লৌহের মত আরক্ত ও কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল; সে দৃপ্ত স্বরে কহিল,—

"মদ খেয়ে এসে তুমি আমায় ছুঁলে কি বলে?"

সুধীন্দ্র ঘোর বিরক্তিপূর্ণ তাচ্ছিল্যের ভাবে এই কঠিন প্রশ্নের উত্তরে অনায়াসে জবাব করিল, "তুমি আমার স্ত্রী বলে।"

পঙ্কজিনী ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিল, তাহার কণ্ঠ দিয়া সহজে কথা বাহির হইতেছিল না, জোর করিয়া কহিল—

"হিন্দুর স্ত্রী অর্থে সেবাদাসী বা বিলাসের সখী নয়; নিজেদের মর্য্যাদা নিজেরাই নষ্ট হতে দিই বলেই তোমরা আমাদের অত লঘু ভাবে দেখতে ভরসা কর, আমি মাতালের হাতে নিজকে দিই না, তুমি এই ঘরে এই বিছানায় শুয়ে ঘুমোও। আমার এখানে জায়গা নেই।—"

ঝড়ের মত বেগে সে ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল এবং সুধীন্দ্র স্তম্ভিত ও মৃতচেতনবৎ সেই প্রদীপ্ত অগ্নিশিখারূপিনী তেজস্বিনী মূর্ত্তির অন্তর্দ্ধান পথে আলোক-আকৃষ্ট পতঙ্গের মতই চাহিয়া স্তব্ধনেত্রে ও বদ্ধপদে দাঁড়াইয়া রহিল। ইহাকে বাধা দিবার অনুকরণ করিবার এতটুকু দুঃসাহসই তাহার হইল না। সে যে তাহারই বিবাহিতা স্ত্রী, লোকতঃ ও আইনতঃ সে যে তাহার ওই নারী দেহের একরু প্রভু সে কথাও তার একটীবারের জন্যও যেন মনে পড়িল না। তার কেবল মাত্র মনে হইল ওই সুন্দরী তরুণী যেন একটা আগ্নেয়গিরির উজ্জ্বল শৃঙ্গ, আকস্মিক একটা ভীষণ অগ্ন্যুৎপাত করিয়া দিয়া সে যেন ভস্ম হইয়া কোথায় মিলাইয়া গেল।

(৬)

রাত্রি যে কি ভাবে কাটিয়াছে তাহা যাহারা সে রাত্রি যাপন করিয়াছিল, তাহারাই জানি পঙ্কজিনী যে মুহূর্ত্তে স্বামীর মুখে মদের গন্ধ পাইয়াছিল সেই মুহূর্ত্তেই তাহার সমস্ত জীবনটাকে যেন সে একান্ত অসহ্য ও নিজকে সে ভার বহনে একেবারেই অশক্ত বলিয়া মনে করিয়াছি তাহার স্বামীর উপরে তাহার কিছুমাত্র অধিকার নাই। তিনি আচারে ব্যবহারে অন্তরে

সম্পূর্ণরূপেই তাহা হইতে বিভিন্ন। আর এই স্বামীর ঘরই তাহাকে আজীবন করিতে হইবে? ইঁহাকে শ্রদ্ধা করিতে, ভাল বাসিতে, পূজা করিতে না পারিলে সে অপরাধিনী বলিয়া গণ্য হইবে? স্বামীই স্ত্রীলোকের একমাত্র গতি, মুক্তি আশা আনন্দ ও আশ্রয় সকলই, ইহা সত্য! কিন্তু স্ত্রীও তো স্বামীর শুধুই বিলাসের পুত্তলিকা নহে, ঘর সাজাইবার সৌখিন সামগ্রী নয়। হিন্দুর বিবাহ সস্ত্রীক ধর্ম্মাচরণেরই জন্য—স্ত্রী তাঁদের সহধর্ম্মিণী। কিন্তু স্বামীগৃহে আসিয়া মুহূর্ত্ত হইতে যে যে ঘটনাগুলি ঘটিয়া গেল এর মধ্যে স্বামীর কোন ধর্ম্মাচরণের সে সহায্যকারিণী কি হইতে পারিত? তাঁর কোন কার্য্যটীর সে সহায়তা না করায় তাকে সহধর্ম্মিণী বঞ্চিতা হইতে হইয়াছে সে কথা বুঝিতে পারা কঠিন! পঙ্কজিনীর অপমানাহত অন্তর ভেদ করিয়া একটা অগ্নিতপ্ত দীর্ঘশ্বাস উত্থিত হইল। অনেকে হয়ত আমায় স্বামীর অনুচিতাচারিণী বলিয়া ধিক্কার দিবে, বলিবে, স্বামীর ধর্ম্মই তোমার ধর্ম্ম, স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আচার নিষ্ঠাকেই তুমি বড় করিতে চাহিয়া পাতিব্রত্যধর্ম্মের বিরোধী কার্য্য করিতেছ; কিন্তু আমার বিশ্বাস পতিব্রতা স্ত্রীর কর্ত্তব্য সহধর্ম্মিণীর সহিত সম্পূর্ণই এক। স্বামীকে অন্যায় হইতে ফিরাইতে চেষ্টা করাই যে কর্ত্তব্য,—স্বামীর সহিত সহ-অধর্ম্মিণী হওয়া নয়। হিন্দুর মেয়ের সমাজ-ধর্ম্ম পালনই তার পক্ষে স্বধর্ম্ম। গীতায় পড়িয়াছি "শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ" আমার ধর্ম্ম, আচার, সমাজ-ধর্ম্ম আমি কেন ছাড়িব? আমার স্বামীকেও না ছাড়ার জন্য, ফিরে আনার জন্য চেষ্টা না করিয়া কেন তাঁর ওই ভুলের সঙ্গে, অন্যায়ের সঙ্গে, নিজে শুদ্ধ যোগ দিব? সে হিন্দুর মেয়ের, হিন্দুর স্ত্রীর—ধর্ম্ম নয়। কখনও না; এই অসঙ্গত বাধ্যতার জন্যই লঘুচিত্ত পুরুষরা স্ত্রীর যথার্থ মর্য্যাদা রক্ষা করতে পারে না। কেন, আমাদের মধ্যে কি আত্মসম্ভ্রম বলিয়া কোন বস্তু নাই। যে সংস্কারের মধ্যে আমি এতদিন বর্দ্ধিত হইয়াছি—যাহা আমার পিতৃ পিতামহের ছিল তার কি কোন মর্য্যাদাই নাই? পুরুষের পক্ষে যে ধর্ম্ম ত্যাগকে অতি গুরুতর পাপের পর্য্যায়ে ফেলা হইয়াছে, নারীর পক্ষে সেই পৈত্রিক ধর্ম্ম, শ্বশুরের ধর্ম্মকে ত্যাগ করায় পাপ নাই? অবশ্যই আমার দেশাচার সমাজ ধর্ম্ম আমি নিজের লাভের মূল্যে বিসর্জ্জন দিতে পারি না। একটা পিতৃঋণ বলিয়া ঋণ আছে, তাহা কেহ স্বীকার করুক, অথবা নাই করুক—সে নিজে তার অন্তরের অন্তরে অনুভব করিয়া থাকে এবং সকল সামাজিক নর বা নারীই তার সমাজকে করিতে বাধ্য।

তারপর এইবার আর একটা অধিকতর অপমানের আঘাতের স্মৃতি উদিত হইয়া তাহার মধ্যে যেন লৌহ-শেল বিদ্ধ করিতে লাগিল। তাহার চক্ষু শুষ্ক হইয়া জ্বলিতে লাগিল। যার স্বামী স্বেচ্ছাচারের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া বৈদেশিক সভ্যতার অনুকরণে কোন কিছুই বঞ্চিত করেন নাই! তিনি মদ খান! পঙ্কজিনীকে অবশেষে মাতাল স্বামীর অলিঙ্গনে আত্মসমর্পণ করিতে হইল! তার কোন মর্য্যাদাই কি অক্ষুণ্ণ থাকিতে পাইবে? মাতালের

নিকট আবার মান মর্য্যাদা কি ? মাত্রা একটু অধিকতর হইলে তাদের দ্বারা কি না ঘটিতে পারে ? ছি ছি এই ঘৃণিত লাঞ্ছিত জীবন বহন করার চেয়ে যে না করাই ভাল !

মা বাপের চিরআদরিণী মেয়ে, বড়দা বৌদির আদরের বোন, সে আজ এই দূর প্রবাসে, তার সম্পূর্ণ অপরিচিত স্বামীর হস্তে কত নির্ম্মম লাঞ্ছনায় না জানি লাঞ্ছিত, অপমানিত হইবে ! কাল যদি তিনি জোর করিয়া তাহাকে নিজের প্রবৃত্তির পথে টানিয়া লইয়া আসেন, সে কি করিতে পারে ? সহজ মানুষের প্রতি কতকটা জোর চলে, কিন্তু মাতালকে কিসের ভরসা ?

অনেকখানি বেলা হইলে চাকরদের সাড়া বেশ সুস্পষ্টরূপে পাওয়া গেলে তারপর সে তার স্নানাগারের রুদ্ধ কপাট খুলিয়া বাহির হইয়া আসিল। আজিকার এই খর রৌদ্র-মণ্ডিত সমুজ্জ্বল প্রভাতালোক যেন তাহার চক্ষে একান্ত নিষ্প্রভ বলিয়া মনে হইতেছিল ; চারিদিকে সুপ্রদৃশ্যাবলী সমস্তই যেন কুহেলী-বেষ্টিত অস্পষ্ট ও ধূমায়মান, তার সমস্ত জীবনব্যাপী সারা ভবিষ্যৎটাই যে ইহার মধ্যে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে।

এই যে দিবসোদয় হইল,—এই অর্থ-সঙ্গতিহীন, নিরুদ্দেশ্য জীবন লইয়া এর মাঝখানে তার আজ স্থান যে কোথায়, পথ যে কোন্‌খানে তার কোন হিসাব নিকাসই যে সে করিয়া উঠিতে পারিতেছে না ; অথচ শুধু এই একটা বিষয়েরই সিদ্ধান্ত একেবারে অপরিবর্ত্তিত ও অলঙ্ঘ্য বিধাতার হইয়া গিয়াছে যে, সে মাতালের স্ত্রী হইয়া নিজেকে কোনমতে খর্ব্ব করিবেনা।

বাহিরের জগতে পা দিয়াই তার ভয় হইতেছিল পাছে এই প্রত্যূষেই সর্ব্বপ্রথমে যে জন সে তার জীবন হইতেই সর্ব্বপ্রযত্নে পরিহার করিয়া চলিতে ইচ্ছুক হইয়াছে তাহারই সহিত সাক্ষাৎ ঘটিয়া যায় ! এতক্ষণে নিশ্চয় তার ঘুম ভাঙ্গিয়াছে এবং ঘুম ভাঙ্গার পর সুধীন্দ্র যে বিছানায় পড়িয়া থাকেন, ইহা স্থির নিশ্চয় থাকাতে চোরের মত পা টিপিয়া টিপিয়া পঙ্কজিনী দালান ঘুরিয়া সেই দিকের দরজা দিয়া শয়ন গৃহে প্রবেশ করিল। সেদিকের দোরটা যে খোলা ছিল তা মনে পড়িয়া গেল। কিন্তু তার সে হিসাবে একটুখানি ভুল ছিল ; তাই ঘরে ঢুকিতেই সামনি চোখে চোখে মিলন ঘটিয়া গেল,—যার সঙ্গে তাহার আদৌ আর দেখা না হয় এই কামনা তার অভিমানাহত ব্যথিত অন্তর একান্তভাবেই করিতেছিল।

এক মুহূর্ত্তের দৃষ্টিতেই পঙ্কজিনী বুঝিয়া লইল, সুধীন্দ্র সারারাত্রিই এইভাবে জাগিয়া ঘরের মধ্যে পাইচারি করিয়াই কাটাইয়া দিয়াছে। বিছানার মশারিটা পর্য্যন্ত খোলা হয় তার পোষাক পর্য্যন্ত খোলা হয় নাই, চোখ দুইটা তার যেন জবা ফুলের মতন রাঙ্গা দেখাই গভীর স্নেহমথিত করুণায় পঙ্কজিনীর সারা চিত্ত একটা মুহূর্ত্তের মধ্যে যেন দ্রবীভূত হইয়া চাহিল। নিজেকে তার কঠোর স্বরে তিরস্কার করিয়া বলিতে ইচ্ছা করিল,—একি করি "সোণা ফেলিয়া আঁচলে গেরো" বাঁধিতে চাস্ ! দেখ দেখি তোর অনাদরে কি দশা কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই তার মনে পড়িল মাতালদের নাকি চোখ রাঙ্গা হয়। অমনি সক

রুভূমি নিক্ষিপ্ত জলবিন্দুর মতই লুপ্ত হইয়া গেল, সেও মুহূর্ত্তেই বিমুখী হইয়া ফিরিবার জন্য মুখ ফিরাইল।

সুধীন্দ্রের শুষ্ক ম্লান মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল, সে যে সারারাত্রি জাগিয়া অনেক অনুতাপের ভাষাও আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছিল এই সুস্পষ্ট অবহেলায় সে সবকে বিস্মৃত হইয়া গেল।

সে যে নিজেদের মধ্যে একটা মিটমাটের আশা মনে লইয়া এই ঘরের মধ্যেই এতক্ষণ পর্য্যন্ত নিজেকে আবদ্ধ রাখিয়াছিল সে কথা তার মনে পড়িল না ; উহাকে বাহির হইয়া যাইতে দেখিয়া সেও তাড়াতাড়ি আর একটা দরজা দিয়া বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

(৭)

স্বামীগৃহে বাস যে তার কপালে নাই সে কথাটা বেশ স্পষ্টভাবেই জানা গিয়াছে ; কিন্তু কোন হইতে কেমন করিয়া বা কাহার সহিত যে সে চলিয়া যাইবে তার কোন ঠিকানাই বারোদিন ধরিয়া ভাবিয়াও পঙ্কজিনী করিয়া উঠিতে পারে নাই। তারপর যাইতেও তো এক মায়ের কাছে যাইবার স্থান ; কিন্তু সেখানে মেজ বধূর ব্যবহার মনে করিতেই তার সারা চিত্ত একেবারেই বিতৃষ্ণ হইয়া উঠিল যে, সেখানে ফিরিবার কল্পনা তাহাকে কে যেন হাজারটা কোড়ার ঘা মারিতে লাগিল। অথচ স্বামীগৃহ ত্যাগ করিলেই বা মায়ের কোল ভিন্ন তার স্বতন্ত্র কোন স্থান আছে এবং থাকিলেও তাহা গ্রহণযোগ্য নহে। মেজ বধূর সেই "নেলি কিটির বিদ্রূপটা" মনে পড়িয়া যাইতেই পঙ্কজিনীর উত্তেজিত চিত্ত দ্বিগুণিত বেগে জ্বলিয়া উঠিল। তাই বা বিচিত্র কি ? পাঁচবৎসর বিলাতে বসিয়া তার স্বামী কি করিয়াছেন সে খবর জানে কে ? আর কিছুই অসম্ভব নহে। যে মদ ধরিয়াছে সে পারে কি ?

পঙ্কজিনীর চোক দিয়া এইবার তার গভীর দুঃখ অশ্রুর আকারে পরিণত হইয়া অবিরল বর্ষিত হইতে লাগিল। এই মদ্যপায়ী আচারভ্রষ্ট হয়ত পরনারীরত স্বামীকেই সে কি নিষ্ঠার সহিত আত্মসমর্পণ করিয়াছে, ইহারই গৃহে আসিবার জন্য প্রথম দর্শনেই কতনা জানাইয়াছে ; না আসিতে পাইয়া দুঃখে অভিমানে আত্মহারা হইয়া গিয়াছে—সে তার স্বামী ও এই গৃহের জন্য ! কালওতো নিজেদের মধ্যের সহস্র মনের অমিলকে তুচ্ছ করিয়া সে ওই স্বামীরই পাদ পূজা করিতে দ্বিধা বোধ করে নাই। তাঁহার অনিচ্ছুক আলিঙ্গনে যে সরমের মাথা খাইয়া জোর করিয়াই সঁপিয়া দিয়াছিল,—তখন কি জানিত যে সেখানে কি ভয়ানক কাল সর্প বসতি করিয়াছিল !

মধ্যাহ্ন অপরাহ্ণে ঢলিয়া পড়িতেছে ; আর সামান্য সময়ের মধ্যেই এ গৃহের গৃহস্বামী গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন ; তিনি আজ তাহার উপরে কোনপ্রকার দাবী দাওয়া করেন নাই। সেই অতর্কিত সাক্ষাতের পর আর তাদের এক বারের জন্যও দেখা হয় নাই, সে

খাইল কি মরিল, রহিল কি গেল, তার কোন খোঁজই নাই। এর পরও কাহারও বাড়ীতে কেহ মাটি কামড়াইয়া কি পড়িয়া থাকে? যার এতটুকু আত্মমর্য্যাদা আছে সে পারে না।

বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া অনেক সম্ভব অসম্ভব কল্পনাই সে করিয়া দেখিল, কোনটাই বেশ মনোমত হইল না। টেলিগ্রাম করিয়া বড়দাকে আনাইয়া যাইতে গেলেও অন্ততঃ চারপাঁচ দিন অপেক্ষা করিতে হইবে, তারপর তিনি আসিলেও হয়ত তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে সম্মত হইবেন না। স্বামীগৃহ ত্যাগে উদ্যতা স্ত্রীকে কোন্ আত্মীয় প্রশ্রয় দিয়া থাকে?

তবে এখন তার উপায় কি?

টিক্ টিক্ টিক্ শব্দ শুনিয়া পঙ্কজিনী চাহিয়া দেখিল দেওয়ালের গায়ে একটা টিক্‌টিকি একটা আরসুলার পশ্চাতে তাড়া করিতেছে। সে নিজের ভাবনা ভুলিয়া উৎকণ্ঠিত আগ্রহে সেই দিকেই চাহিয়া রহিল; দেখিল টিক্‌টিকিটা আরসুলাটাকে ধরে ধরে—এমনই হইবামাত্র হঠাৎ ফর্‌ফর্ শব্দ করিয়া আরসুলাটা উড়িয়া আসিয়া ধপ্ করিয়া ঘরের মেজেতে পড়িল এবং খর্ খর্ করিয়া দ্রুত চলিয়া মেজের ম্যাটিংএর মধ্যে সে অন্তর্দ্ধান করিয়া আততায়ীর হাত এড়াইল। পঙ্কজিনী একটা প্রতপ্ত নিঃশ্বাস মোচন করিয়া মনে মনে বলিল, আমিও যদি মানুষ না হয়ে ওদের মতন সামান্য একটা কীট পতঙ্গ হতুম, এম্‌নি করেই কারু দেওয়ালে, ফাটলে কাটিয়ে দিতে পারতুম; কিন্তু তা' না হয়ে মানুষ হয়ে আর আমার কি সুখ হলো? মানুষ হয়ে নিজের মনুষ্যত্বই যদি বজায় না রাখতে পারলাম, তবে শুধু এই মনুষ্যের আকারটাকে বহন করে বেড়ান শুধু পৃথিবীর বুকের ভার বৃদ্ধি করা বইতো আর কিছুই নয়!

ডাকের চিঠি বয় আনিয়া দিল। তার বাপের বাড়ীর দুখানা পত্র, অপরখানা বিলাতি ডাকের খাম। নিজের দুখানা পাঠ করিবার পর হঠাৎ তার চিন্তাক্লিষ্ট নিরুদ্দম চিত্তেও একটা দুঃসহ কৌতূহল দেখা দিল, এই এসেন্স-সুবাসিত বিলাতি চিঠি কার লেখা? বিবেক বলিল, যার লেখাই হোক, পরের পত্র খুলিয়া দেখিতে তোমার কি অধিকার? থাক, খুলিও না, যার জিনিস সে আসিলে প্রবৃত্তি হয় জিজ্ঞাসা করিতে পার, এখন বরং বয়কে ডাকিয়া ফেরৎ দাও।

কিন্তু সৎ প্রবৃত্তির উপদেশ মানুষ অপরের নিকট ত নহেই, নিজের কাছেও সহজে শুনিতে চাহে না। ঐ পত্রখানার অপেক্ষা সেই এসেন্সের সৌরভটুকুই যেন তাহার সন্দেহকলুষিত চিত্তকে সহজে আকৃষ্ট করিতে লাগিল। খামখানা সে জল দিয়া খুলিয়া ফেলিল।

আরব্য উপন্যাসের গল্পে আছে ধীবর বদ্ধমুখ কলসীর মুখাবরণ উন্মোচন করামাত্র ভিতর হইতে ধূমাকারে বহির্গত হইয়া একটা প্রকাণ্ডাকারের দৈত্য উহাকে বধোদ্যত হইল

পঙ্কজিনীর ভাগ্যেও এই বিলাতি ডাকের পত্রখানা প্রায় সেইরকম দৈত্যমূর্ত্তিতেই আবির্ভূত হইয়া দাঁড়াইল। পত্রখানা ইংরাজীতে নারীহস্ত-লিখিত, যে হোটেলে সুধীন্দ্র দেশে ফিরিবার পূর্ব্বাবধি বাস করিয়া আসিয়াছে সেই হোটেলেরই ল্যাণ্ডলেডির লেখা বলিয়া জানা গেল। উহাতে দুএকটা শুষ্ক রসিকতাও আছে, সে কিছুই না। ইংরাজ সমাজে পরপুরুষের সহিত যে কোন মেয়েরই হাস্য পরিহাস দুষ্য নহে, পরন্তু মেয়েদের ফ্লার্টিং যে একটা বিশিষ্ট গুণ সে খবরটা সে জানিত। কিন্তু উহাতেই নিহিত আর একটা সংবাদ উহাকে বজ্র-স্তম্ভিত করিল। সেই পত্রে লিখিত আছে—"যাহাহউক মিস ভ্যারেন্‌সের ব্যাপারটায় যে এত সহজে তুমি উদ্ধার পাইয়াছ তার জন্য তোমার ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও। তোমাদের মেয়েটী মারা যাওয়াতেই এই মাত্র একশত পাউণ্ড লইয়াই সে তোমাকে ছাড়ান দিল। এখন সম্পূর্ণ শান্ত হইয়া অ্যাডেলী ভিনিসে ফিরিয়া গিয়াছে। তার টাকার রসিদ এই সঙ্গে পাঠাইলাম। যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিও।" ইত্যাদি——

পত্রমধ্যে অপর কোন অপরিচিত ভাষায় লেখা একখানা রসিদও ছিল।

খোলা চিঠি ফিরিয়া খামে ভরিবার কথাও আর পঙ্কজিনীর মনে পড়িল না। তার তখন কেবলমাত্র এই কথাটুকুই মনে পড়িতেছিল যে, তার জীবনের সব তারগুলা একেবারে একসঙ্গেই খান খান হইয়া খসিয়া পড়িয়া গিয়াছে। কোন আশা, কোন একটুখানি আলোকের সূক্ষ্ম রেখাও সে যেন এই গভীর নৈরাশ্যের গাঢ় অন্ধকারের ভিতর দিয়া আর হাতড়াইয়াও খুঁজিয়া পাইল না। এ আচার অনাচারের সমস্যা নয়; ক্রমে ক্রমেই রহস্যদ্বার তার চক্ষের সম্মুখে উন্মুক্ত হইতে লাগিল, তাহার যে আর কোনপ্রকারই সমাধান নাই। তার স্বামী যে একজন পানদোষাসক্ত চরিত্রহীন ইহাতে আর সন্দেহ করিবার কোন জায়গা দেখা যায় না। তথাপি একবার খামের উপরকার ঠিকানাটা ভাল করিয়া পড়িয়া লইল, যদি কোন ভুল থাকে। না কোন ভুলই নাই! এ পত্রের অধিকারী বাস্তবিকই মিষ্টার সুধীন্দ্রকুমার সরকার।

ওই পত্র লিখিত মিস্ ভ্যারেণস্—অ্যাডেলী ভ্যারেণস্—তার স্বামীর শুধুই প্রেমপাত্রী নহে, তাহার সন্তানেরও জননী হইয়াছিল! সম্ভবতঃ পঙ্কজিনী যদি মাঝখানে বাধা হইয়া না উঠিত তাহা হইলে সেই আজ তাঁর ঘরের ঘরনী হইয়া বসিত। উঃ আর ঐ লোকই বিলাতে প্রতি মেলে কতই না প্রণয় নিবেদনে অর্ঘ্য সাজাইয়া তাহাকে আদরমাখা দীর্ঘ পত্রাবলী লিখিয়াছে। তাহার স্মৃতি তাহার চিন্তাই যে উহার একমাত্র জপমালা ইহা জানাইতে কিছুমাত্র ভুলে নাই। অথচ ভিতরে ভিতরে তখন মিস্ অ্যাডেলীলীলাও চলিতেছিল। আর যাহাকে সে প্রাণ ঢালিয়া পূজা করিয়াছে, কাছে পাইবামাত্র অকুণ্ঠিত বিশ্বাসে নারীর যা প্রেম প্রীতি সর্ব্বস্ব তাঁহার চাহিবার পূর্ব্বেই সঁপিয়া দিয়াছিল! লজ্জায় ক্ষোভে

তাহার বিবর্ণ পাণ্ডুমুখ কুঙ্কুম তুল্য লোহিতাভ হইয়া গেল। এই লোকেরই পায়ের ধূলা সে মাথায় ধরিয়া ইহারই বক্ষলীন হইতে—এই গত রাত্রেও কোন দ্বিধা করে নাই। তবে তার ফলও বড় হাতে হাতেই ফলিয়া গিয়াছিল।

পঙ্কজিনীর সমস্ত শরীরে যেন আগুন ধরিয়া উঠিল, সে খাট হইতে ধড় মড়িয়া নামিয়া পড়িয়া ঘরের মধ্যে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। এই ভাল, এই ভাল—এখন পর্য্যন্ত সে তার কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারে নাই। মুখ ফিরাইতে গিয়াও ফিরিয়া দাঁড়াইতেছিল। কঠিন হইতে গিয়াও সহানুভূতি ও ভালবাসায় গলিয়া পড়িয়া বিবেক বুদ্ধি বলিতেছিল, "স্বামীকে ছাড়িয়া কোথায় যাইবে? ওঁকে ভাল করিবার চেষ্টা করনা, ত্যাগ করায় বাহাদুরী কি?" কিন্তু এখন? এখনও কি তার বিবেক ওই কথা আর তাঁহাকে বলিতে পারিবে? এই অবিশ্বাসী স্বামীর প্রতি একবিন্দু শ্রদ্ধা আর কি তার বাকি রহিল? না, কখন না, এবার জন্মের মত সব শেষ।

অনেকক্ষণ পরে একটুখানি শান্ত হইয়া এক তাড়া ইংলিসম্যান লইয়া আসিয়া তার বিজ্ঞাপন-স্তম্ভে মনোনিবেশ করিল। আপাততঃ কোন স্কুলে যদি সে শিক্ষয়িত্রী হইতে পারে তাহারই জন্য চেষ্টা করিবে। মেজবধূর আশীর্ব্বাদ হাতে হাতে ফলাইয়া সেখানে সে আর ফিরিতে পারিবে না।

বাঁকিপুর বালিকা বিদ্যালয়ে একটী শিক্ষয়িত্রীর পদ খালি আছে। স্কুল-বোর্ডিংএ থাকিবার স্থানও হইতে পারে।

পঙ্কজিনী ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিয়া ডাকিল "খুবলাল?"

খুবলাল চারিটী ফলমূল সাজাইয়া তার ঘরের বাহিরে বারান্দার একধারে চুপটী করিয়া বসিয়াছিল, কাছে আসিয়া পায়ের কাছে সেগুলি ধরিয়া দিয়া বলিল, "জিউ খারাব হ্যায় তো ফল খানেসে কুছ বিগ্‌ড়তানেই হোগা।"

পঙ্কজিনী ব্যগ্র কণ্ঠে কহিল "আচ্ছা আমি খাব এখন, তুমি খুব শীঘ্র একখানা গাড়ী নিয়ে এস দেখি। ষ্টেশনে যেতে হবে।"

গাড়ী আসিলে নিজের সকলের ছোট ট্রাঙ্কে সাধারণ কতকগুলি জামা কাপড় ও সঞ্চিত অর্থগুলি লইয়া সে গাড়িতে চড়িয়া বসিল, মালিকে মিনতি করিয়া বলিল, "আমায় তুমি বাঁকিপুরে পৌঁছে দিয়ে আসবে খুবলাল?"

মালি বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল—"সাহেব যাবেন না?"

পঙ্কজিনী বলিল,—"সাহেবের ছুটী কোথা? তুমি না গেলে আমি একাই যাব!"

মালি যাইতে সম্মত হইল। এমন কি পঙ্কজিনীর নির্ব্বন্ধাতিশয়ে শেষে সেখানে সে যতদিন থাকিবে তার সঙ্গে থাকিতেও সম্মত হইল। এখানে তার আপন বলিতে কেহ ছিল না এবং দুই দিনের মধ্যেই মাইজীকে সে বড়ই শ্রদ্ধা করিয়া বসিয়াছিল।

(৮)

৫টার প্যাসেঞ্জার ট্রেনের থার্ডক্লাশ ফিমেল কম্পার্টমেণ্টে চাপিয়া বসিয়া পঙ্কজিনী অধীর ও স্পন্দিত বক্ষে ষ্টেশন-প্লাটফরমের দিকে চাহিয়াছিল; ট্রেন ছাড়িতে যতই বিলম্ব ঘটিতেছিল ততই তাহার চিত্ত শঙ্কায় অধীর হইয়া উঠিতেছিল যে, হয়ত এখনই সে ওই প্লাটফরমের উপরে তার স্বামীর মুখ দেখিতে পাইবে। তারপর এই সহস্র লোকের মাঝখানে যে দৃশ্য উপস্থিত হইবে, তাহার সম্ভাবনার কথা ভাবিতেই তাহার হৃদয়ের রক্ত জমাট বাধিয়া গেল।

গাড়ি ছাড়িয়া দিল। পলাতকার অনুসরণ করিতে কাহাকেও দেখিতে পাওয়া গেল না। কোন ক্রুদ্ধ অপমানিত কঠোর কণ্ঠ এই জনসমাজের মাঝখানে আসিয়া অকথ্য কঠিন তিরস্কারে তাহাকে সকলের কৌতূহল দৃষ্টির দ্রষ্টব্য বস্তু করিয়া তুলিল না, কোন কঠিন নির্ম্মমহস্ত সেই সহানুভূতিশূন্য দর্শকগণের মধ্য দিয়া তাহার হাতধরিয়া টানিয়া নামাইল না। একফোঁটা অশ্রুজল একটা বিকৃত কলহ বা উদ্ধত বাক্য বিনিময় কিছুই ঘটিলনা, অতি সহজে একেবারে নির্ব্বিঘ্নেই সে দেখিতে দেখিতে নাথ নগর ষ্টেশন পার হইয়া গেল। কিন্তু পঙ্কজিনীর মনে হইল কতবড় একটা সংগ্রামের অবসানে কি শ্রান্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন দেহ মন লইয়া সে যেন কোন গুহা গহ্বারে নিজের অবশিষ্ট প্রাণটুকুকে বাঁচাইবার আশায় পালাইয়া যাইতেছে। তার মনে হইল, এই দুইটা মাত্র দিন পূর্ব্বে যে পঙ্কজিনী তার স্বামীর সহিত রাজার হাট হইতে আসিয়াছিল সে আজ কোথায়? সেই প্রাণময়ী আশানন্দে উৎফুল্লচিত্ত নারীর একি শবদেহ?

যে পঙ্কজিনী নবজীবনের নূতন ঊষা সমাগমে নব রবিকর সম্পাতে সদা প্রস্ফুটিতা, পতিপ্রেমে বিহ্বল, বহুদিন পরে প্রিয় সমাগমে আনন্দবিহ্বল, সমস্ত বিশ্বসাম্রাজ্য যার কাছে আনন্দের বিন্দুমাত্র,—আজ তার সমস্ত জীবন শ্মশান সদৃশ শূন্য, সমস্ত পৃথিবীও ততোধিক। যেন মধ্যাহ্নের আকস্মাৎ ঘন মেঘাবৃত ও বৈশাখী পূর্ণিমার অতি উজ্জ্বল সুখরাত্রি পৌষের হিম কুহেলিকা জালে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। বসন্তের সাজান বাগান আকস্মিক নিদাঘতাপে একি নিষ্করুণভাবে ঝরিয়া শুকাইয়া গেল; এর কি কোথাও আর কিছুই সে বাকি রাখিয়া দিল না! পঙ্কজিনীর মনে হইল যেন জাঁতার তলায় পড়িয়া দারুণ যন্ত্রণায় নিষ্পিষ্ট হইয়া যাইতে লাগিল। ট্রেণখানা যতই ছুটিয়া চলিল, নিদারুণ অপমানের ক্রোধ ও অভিমান যতই তরল হইয়া আসিতে লাগিল, তাদের আবরণের মধ্য দিয়া আর একটা তীক্ষ্ণ কণ্টকাঘাত মানসিকবৃত্তির আরও একটা যন্ত্রণা যেন তার মনের কাছে স্পষ্টতর হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহা প্রেম! কোনমতেই স্বীকার করা চলে না যে সেই চরিত্রহীন উচ্ছৃঙ্খল লোকটীকেই সে প্রাণ দিয়া বুঝি প্রাণের চেয়েও ভালবাসে! নিজের প্রতি রাগ করিল, প্রবৃত্তির প্রতি ঘৃণা বোধ করিল, কিন্তু বুকের মধ্যে দিয়া দিয়া সমস্ত অন্তরাত্মাই যে তার তারস্বরে কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল; সে কান্নাকে সে ভালমন্দ

কোন যুক্তি দিয়াই থামাইতে পারিল না। পঙ্কজিনীর মতের সহিত তাঁহার কোন অংশেই মিল নাই, কখনও হইবেও না, সে নৈষ্ঠিক হিন্দু, তিনি সমাজ ধর্ম্মের মূল ধরিয়াই তাহাকে কাটিয়া চলেন, এই খানেই তো একটা জীবনব্যাপী বিরোধ বর্ত্তমান রহিয়াছে সেটাকেও সে ধীরে ধীরে কতকটা সামঞ্জস্য করিয়া লইতে আশা করিয়াছিল; কিন্তু তারপর! বরং এই অবাধ্য হৃদয়ের মাঝখানে সে আমূল ছুরী বসাইয়া দিবে, তথাপি স্বেচ্ছাচারীর বিলাস সঙ্গিনী হইবে না—কখন না।

স্কুলে সে নিরাপদ আশ্রয় পাইল। নিজের হিন্দুত্বের পরিচয়ে একটী স্বতন্ত্র রান্নাঘর লাভ করিল, প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর সহিত একই গৃহে শয়নের বন্দোবস্ত, ইচ্ছা এবং চেষ্টা করিয়াই করিয়া লইল। প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর বয়স তার চেয়ে খুবই বেশী নয়, স্বভাবটী বড়ই মধুর। দুজনের মধ্যে স্বল্প দিনের মধ্যেই বেশ একটী নিবিড় প্রেমের বন্ধন সৃজিত হইয়া উঠিল। মাস কয়েকের মধ্যেই অল্পে অল্পে পঙ্কজিনী তাহার নিকট নিজের সমস্ত পরিচয় ও দুর্ভাগ্যের কাহিনী বিবৃত করিয়া ফেলিল। শুনিয়া ইন্দুপ্রভা কিন্তু তাহার সহিত একেবারেই সহানুভূতি দেখাইতে পারিল না। নব্য সমাজে বিলাতি ব্যভিচারটাকে যে কতকটা করুণ চক্ষেই দেখা হয় এবং মদ খাওয়াটাও একটা সভ্যতারই অঙ্গ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয় ইহা সে অনেকবার দেখিয়াছে। অবশ্য মাতাল হইলে একটু ভাবনার বিষয় বটে। আর আচার নিষ্ঠার জন্য স্বামী ত্যাগ—সে নিজে কুমারী হইলেও সে সম্বন্ধে তো কল্পনায়ও আসিতে পারেনা। পঙ্কজিনীর প্রগাঢ় বন্ধুত্বের মাঝখানে একটা ছেদ চিহ্ন পতিত হইল।

তবে কি পঙ্কজিনী তার নবজীবনে পুরাতন জীবনকে বিস্মৃত হইয়াছিল? সেকি কখন সম্ভব! বালুকার পদচিহ্ন বা জলের রেখা দুদিনেই মিলাইয়া যাইতে পারে, মৃত্তিকা বা পাষাণের গঠিত মূর্ত্তিকে মন্দির হইতে তুলিয়া ফেলা যায়, কিন্তু পাষাণ ফলকে যাহা খোদিত হইয়াছে তাকে আর মুছা যায় না। ধনী কন্যা পঙ্কজিনী যখন মায়ের কোল ছাড়িয়া নিজের উপার্জ্জনের উপর নির্ভর করিয়া আত্মগোপন করিতে আসিয়াছিল, নিজের দারুণ দুর্ভাগ্যের লজ্জাজ্বালাকে লোকলোচনের অন্তরালে একাকী ভোগ করিবে ভাবিয়াছিল, তখন এর আর একটা দিক সে ভাবিয়া দেখে নাই। একদিন সহসা একটা সংবাদ পত্রের বিজ্ঞাপন স্তম্ভের বড় বড় অক্ষরের উপর দৃষ্টি পড়িতেই সে বুঝিতে পারিল যে সে বিজ্ঞাপন তার বড়দা দিয়াছে। অগত্যা তাঁহাকে গোপন পত্রে নিজের অবস্থিতি সংবাদটা দিতে হইল, তিনি আসিয়া বিস্তর বুঝাইয়া তাহাকে সঙ্গে লইতে চাহিলেন, তাহার অনিচ্ছায় তাহাকে স্বামী গৃহে প্রেরণ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন; পঙ্কজিনী কঠিন হইয়া রহিল, বলিল, "দেখছেন ত আমি একটা ভাল কাজ নিয়েই আছি, যখন দরকার বোধ করবো আপনাকে জানাবো।" অগত্যাই তাঁহাকে ফিরিতে হইল।

(৯)

বাড়ী ফিরিতে সন্ধ্যা হইয়াছিল, বন্ধুগৃহে মাত্রাটাও কিছু অতিরিক্ত হইয়া গিয়াছে। বাড়ী ফিরিয়া স্ত্রীকে ডাকিয়া দিতে বয়কে হুকুম দিয়া আরও এক গ্লাস খাইয়া লইল।

চক্ষুলজ্জার কোন খাতির না রাখিয়া উহাকে ভয় মৈত্রী দ্বারা বশীভূতা করিয়া ফেলিবে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াই সে বাড়ী ফিরিয়াছিল। মিষ্টার সিনা বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছেন "ম্যাজিষ্ট্রেট হয়ে লোক চালাবে কেমন করে, যদি না নিজের এক ফোঁটা একটা স্ত্রীকেই চালাতে পারলে?"

মিসেস্ সিনার তামাসা এর চেয়েও মাত্রা ছাড়াইয়াছিল। সুধীন্দ্র ভাবিল তাইতো! সামান্য একটা বাঙ্গালীর মেয়ে, তা'ও হিন্দু সংসারের—তাকেও আবার খাতির করিয়া চলিতে হইবে? সে আমার হুকুমে চলিবে না? দেখি তার দর্প কতখানি, কত তেজ।

বয়ের প্রমুখাৎ যতটুকু খবর পাওয়া গেল তাহাতে ব্যাপারটা বেশ পরিষ্কার হইল না, তখন কিছু বিস্মিত কিছু সন্দিগ্ধ ভাবে সে নিজের শয়নগৃহে প্রবেশ করিল, এই ঘরেই যে সে গাড়ি চড়িবার পূর্ব্বাবধি অবস্থিতি করিয়াছিল, সে খবরটা জেরা করিয়া বয়ের নিকট হইতে জানা গিয়াছে। আরও খবর পাইয়াছিল এর ঘণ্টা দুই পূর্ব্বে কয়েকখানা ডাকের চিঠি আসায় সে সেগুলা নির্ব্বিচারে উহার নিকটেই ধরিয়া দিয়াছিল এবং সেগুলার মধ্যে একখানা বিলাতি ডাকের পত্রও যে ছিল তাহা জানিয়াই সুধীন্দ্রের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল।

অনুসন্ধানে জানা গেল, তাহার সংশয় অমূলক নহে; পরন্তু নির্ম্মম সত্য। মিস্ অ্যাডেলী ক্যারেণস্ সম্বন্ধীয় সংবাদবাহী পত্র ও রসিদ ড্রেসিং টবিলের উপর খোলা পড়িয়া আছে, এবং তারও কিছুক্ষণ পরে ইংলিশম্যানের সেই বিজ্ঞাপনটা কাটা অবস্থায় দেখিতে পাইয়া আর একখানা কাগজ হইতে উক্ত বিজ্ঞাপনটী মিলাইয়া দেখিতেই সরল সত্য একেবারে দিবালোকের মতই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। অ্যাডেলী সম্বন্ধীয় সকল সংবাদ সে এই ল্যাণ্ডলেডীর পত্রে পাঠ করিয়া ঐ চাকরীটা লইতে কিপুরে ছুটিয়া গিয়াছে। প্রথমে লজ্জায় এবং অনুশোচনায় তারপর ক্রোধে এবং বিস্ময়ে নিজে যেন অভিভূতবৎ হইয়া রহিল। একটা তুচ্ছ হিন্দু ঘরের মেয়ের মধ্যে এত একগুঁয়েমী এত তেজ কোথায় লুকানো ছিল!

পঙ্কজিনীর পূর্ব্বাপর সমস্ত ব্যবহারটাকেই সে একবার নিজের মনের মধ্যে স্মরণ করিয়া লইল। আগাগোড়াই সে যেন দুর্জ্ঞেয় ও অজেয়। তার কোনখানেই জড়তা নাই, কোন অংশেই দ্বিধা নাই, ইটালীয়ানের চেয়েও সে যেন অধিকতর স্বাধীনা, অথচ হিন্দু সমাজের মেয়ে সে, হিন্দু পদ্ধতিতে পুরামাত্রায় আস্থাশীল।

গভীর বিস্ময়ের মধ্যে একটা অননুভূত শ্রদ্ধা ও কৌতূহল যেন তাহার কোপকে জয় করিয়া ফেলিতে চাহিতেছিল, কিন্তু ইহার পরদিন সিন্‌হা দম্পতির তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ-কষা সেই কোমল মনোবৃত্তি-টিকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করিয়া দিল।

সেদিন অপরাহ্নে বাড়ী ফিরিয়া নির্ম্মল স্নিগ্ধ সন্ধ্যাকাশে চিন্তিত নেত্র স্থাপন করিয়া অনেকবার কি করিবার পর স্ত্রীর উদ্দেশ্যে একখানা পত্র লিখিয়া ডাকে পাঠাইয়া দিল। শিরো-নামা কিপুর বালিকা বিদ্যালয়েরই ঠিকানা লিখিত হইল।

"পঙ্কজিনী!

তোমার ব্যবহারে বিস্মিত হইলাম। হিন্দু বলিয়া তুমি নিজেকে সর্ব্বদা প্রচার করিয়া থাক, অথচ এই হিন্দুধর্ম্ম-বিগর্হিত কার্য্য দ্বারা তাহারই তো বিপরীত প্রমাণ করিতেছ। কোন্ হিন্দু স্ত্রী স্বামীর অজ্ঞাতে তাহার ভৃত্য সহিত যথেচ্ছ স্থানে গমন করিয়া লোক সমাজে স্বামীর মাথা হেঁট করিয়া থাকে? ঐরূপ স্বেচ্ছাতান্ত্রিকতার হিন্দু সমাজের কোথায় প্রশ্রয় আছে? তুমি যদি আমার সম্বন্ধে কোন পূর্ব্ব সংবাদ অবগত হইয়া থাক, তাহার জন্য ঘরে থাকিয়াই কৈফিয়ৎ চাহিতে পারিতে। তা না করিয়া যখন অনায়াসে আমার ঘর ছাড়িয়া গিয়াছ তখন আমারও প্রতিজ্ঞা যে আর একালে কখন তোমার মুখ দেখিব না। তুমি মিস ভ্যারেন্‌স্ নও যে, স্ত্রী স্বামীর মতানুবর্ত্তী নহে, আদালতে দাঁড়াইলেও সে অধিকতর কিছুরই দাবী করিতে পারে না। বিশেষ তুমি আমার পাপের যে নজীর দেখাইতে চাহিবে তাহার কোন প্রমাণ তোমার হাতে নাই। আমি উহা স্বীকার করিব না। অতএব নিজের অবস্থা উত্তমরূপে চিন্তা করিয়া যাহা সমীচীন মনে হয় তাহাই করিও।"

ইতি—শ্রীসুধীন্দ্রকুমার সরকার

সুধীন্দ্রের একবার মনে হইল এই পত্রের সাদা অংশটায় একটা পুনশ্চ যোগ করিয়া লেখে যে, "এখনও তুমি ফিরিয়া আইস, যা হইবার হইয়াছে, সে সব পুরাতন পাপের স্মৃতি দুজনেই ভুলিয়া যাই, আমার মতানুবর্ত্তী হও, দুজনেরই মঙ্গল।" কিন্তু না, কি হইবে উহাকে ফিরাইয়া?

সুধীন্দ্রের মনে হইতে লাগিল এই শুচীবায়ুগ্রস্তা প্রেমহীনা নারীর সঙ্গে একগৃহে বাস তাহার পক্ষে কোন ক্রমেই আর যেন সম্ভব নহে। তার নিজের জীবনটাকেই অকস্মাৎ ব্যর্থ এই ঊনত্রিশ বর্ষ বয়সেই কি অসহ্য ভারগ্রস্ত ও দুঃসহ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। নিজের অবস্থার সঙ্গে তুলনা করিতে গিয়া মিষ্টার সিনাকে তার কত গুণ ভাগ্যবান বলিয়াই যে ঈর্ষা করিতে বাধ্য জন্মিতে লাগিল। তার সৌভাগ্যকে যদি জোর করিয়া ছিনাইয়া লওয়া চলিত, তার এমন মনে হইল যে সে তাহাতেও পশ্চাৎপদ হইত না; অথচ সুচারুর তুলনায় মিষ্টার সিনা কি কালো, মোটা, মাতাল, দুশ্চরিত্র এবং বয়সে সুচারুর পিতৃবয়স্ক—মাত্র একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ারীর মোটা মাহিনা ও পদের জোরে সে ওই নারীরত্ন লাভ করিতে পাইল বাল্যবিবাহের কুফলে সুধীন্দ্রের মত সুরূপ, সৌখীন, ও উচ্চ পদস্থের অদৃষ্টে ওই "সেমিটিক লিটীতে ও প্রেজুডিসে" মিলাইয়া গড়া অসভ্যা স্ত্রী জুটিল! আহা তার স্ত্রী যদি সুচারু হইত সুচারুর যে তার উপর একটা বন্ধুত্বের আকর্ষণ বিশেষভাবেই আছে তাহা নিঃসন্দেহ। থাকিয়া কি করিবে? সে বেচারীর মুখ চাহিতে আছে কে? সুচারু কি পঙ্কজের চেয়ে রূপসী? বোধ হয় না। অন্ততঃ তার স্বাধীন ও সতেজ ধরণের রুক্ষতাটা না থাকায় রূপ অনেকখানি আকর্ষণীয়। ইহাকে দেখিলে মনে হয় যেন একটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। এই

যায় কেন সে বিলাতেই চাকরী লইয়া রহিয়া গেল না! স্ত্রী তার এমন অপূর্ব্ব চীজ—এ জানিলে সে হয়ত অ্যাডেলীকেই—যাক্ গতস্য শোচনা নাস্তি!

ইহার পরদিন মিষ্টার সিনা টুরে বাহির হইয়াছেন; মিসেস্ সিনা সুধীন্দ্রের বাড়ী বেড়াইতে আসিল। সুধীন্দ্র বিদায়কালে তাঁহাকে মিনতি করিয়া বলিল, "দেখছেন তো আমার অবস্থা, আসবেন দয়া করে মধ্যে মধ্যে।"

সুচারু অকৃত্রিম সহানুভূতির সহিত করুণকণ্ঠে উত্তর দিল "সে আপনাকে বল্‌তে হবে না। বাস্তবিকই আপনার জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত।"

ক্রমশঃ

শ্রীঅনুরূপা দেবী

GAR PUBLIC LIBRARY

রাষ্ট্রের উৎপত্তি

রাষ্ট্রোৎপত্তি সম্বন্ধে অনেকগুলি বিভিন্ন মত আছে তাহার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ বিবেচনাযোগ্য।—

১। **দৈববাদ**—(Theory of Divine origin) এই মতানুসারে রাষ্ট্র ভগবানের সৃষ্টি। তিনি স্বয়ং বা তাঁহার কোন প্রতিনিধি দ্বারা ইহার সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব ভগবানের প্রতিনিধি রাষ্ট্রপরিচালক এবং রাষ্ট্রগুরু। সমাজশৃঙ্খলাসাধন এবং দণ্ডপ্রদান উভয়ই তাঁহার কার্য্য। সমাজ ও ধর্ম্ম উভয় বিষয়েই প্রজাগণ তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইতে বাধ্য। তিনি নিজ কার্য্যের জন্য ভগবান ব্যতীত কাহারও কাছে হিসাব নিকাশ দিতে বাধ্য নহেন। তাহার প্রতিকূলতাচরণ অর্থাৎ রাজদ্রোহ কেবল রাষ্ট্রীয় অপরাধ নহে পরন্তু একটী গুরুতর ধর্ম্মাপরাধ। ইহার দণ্ড শুধু ইহকালে নহে, পরকালেও, ভীষণ শাস্তি। রাষ্ট্রোৎপত্তি সম্বন্ধে এটী প্রাচীন মত। পুরাতন সভ্যজাতি মাত্রেরই মধ্যে এই মত কোন না কোন আকারে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে দেখিতে পাই—"অষ্টাভিশ্চ সুরেন্দ্রানাম মাত্রাভিনির্ম্মিতো নৃপঃ"; "সর্ব্বদেবতাহ্যেষা নররূপেন সংস্থিতা"—ইত্যাদি

প্রাচীন মিসরের রাজগণ দেশের ধর্ম্মগুরু ও অসিরিস 'দেবের অবতার বলিয়া পূজিত এবং প্রাচীন চাল্ডীত্ত ও আসিরীয় রাজগণেরও সম্মান ঐরূপই ছিল। প্রাচীন ইহুদীদিগের পুরাতন বিধানে (Old Testament) দেখিতে পাই যে রাজা "ভগবানের অভিষিক্ত" (Lord's Anointed)। তিনি নিজ কার্য্যের জন্য কেবল ভগবানের নিকটই দায়ী এবং স্বয়ং ভগবান কর্ত্তৃকই নির্ব্বাচিত পদচ্যুত এমন কি নিহত পর্য্যন্ত হইতেছেন। প্রাচীন গ্রীস

ও রোমে রাষ্ট্রীয়ব্যাপারে জনসাধারণের মত প্রভাবশালী হইলেও এই মতেরও বিলক্ষণ প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সারা মধ্যযুগ ধরিয়া খৃষ্টীয় যাজকমণ্ডলী এই মত প্রচার করিয়া আসিয়াছেন। এমন কি ১৮১৫ সাল পর্য্যন্ত ইউরোপীয় রাজন্যমণ্ডলী এই মত চালাইবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। আজিও ইউরোপ আফ্রিকা ও এসিয়ার জনসাধারণের মধ্যে বহু ব্যক্তি রাজাকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকে। বর্ত্তমান গণতান্ত্রিক বৃটীশ সাম্রাজ্যে রাজার অস্তিত্ব অনেকটা জনসাধারণের এই বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু জগতে সর্ব্বত্র এই মতের আদর ক্রমশঃ কমিতেছে। ইংলণ্ডে প্রথম চার্লসের শিরশ্ছেদ, দ্বিতীয় জেম্‌সের বিতাড়ন, আমেরিকায় যুক্তরাজ্যের সংস্থাপন, ফরাসী বিপ্লবসমূহ, পারস্যবিপ্লব, তুর্কবিপ্লব, চীনবিপ্লব এবং বিগত মহাযুদ্ধের অবসানে রুশ, অষ্ট্রীয় এবং জার্ম্মান সম্রাটত্রয়ের যুগপৎ ভয়াবহ অধঃপতন ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিতেছে। রাষ্ট্র বিজ্ঞানবিৎ কোন পণ্ডিতই আজকাল এই মতাবলম্বী নহেন। কিন্তু এই পুরাতন মতটী একেবারে ভুল এবং নিষ্ফল বলিয়া ফেলিয়া দিলে চলিবে না। ইহার মধ্যে এইটুক সত্য আছে যে, মানুষের সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিবার প্রেরণা ভগবৎপ্রদত্ত। রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধাচরণের ইহকাল ও পরকালের ভয়াবহ শাস্তি দেখাইয়া প্রাচীনকালের উদ্দাম, উচ্ছৃঙ্খল, অসভ্য মানবকে সমাজবদ্ধ করিতে ইহা বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিল। কিন্তু উত্তরকালে মানবের রাষ্ট্রীয়জ্ঞান অধিকতর পরিস্ফুট হইলে ইহা অত্যাচারী রাজাদের পরিপোষক হইয়া জগতের অনিষ্টজনক হইয়া উঠে। তখন হইতেই ইহার অবনতি।

২। **বলবাদ**—(Theory of Force)—এই মতানুসারে বলবান কর্ত্তৃক দুর্ব্বলের পরাজয়ে রাষ্ট্রের উৎপত্তি। "জোর যার মুল্লুক তার"—"যার লাঠি তার মাটী" ইত্যাদি প্রচলিত প্রবচন ইহার রূপান্তর মাত্র। এই মতের মূলে যে কতকটা সত্য আছে তাহা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। ফলতঃ বল যে রাষ্ট্রপরিচালন ক্ষমতার মূল তাহা সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য। কিন্তু কেবলমাত্র শারীরিক বল যে রাষ্ট্রপরিচালনের পক্ষে যথেষ্ট নহে এবং এই ব্যাপারে নৈতিক ও মানসিক শক্তিও বিশেষ কার্য্যকরী তাহা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। কেবল শারীরিক অর্থাৎ পাশব বলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি এ কথা বিশ্বাস করিতেও আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। কারণ, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে, সমগ্র মানব সমাজ এক সময় পাশব বলের দাস ছিল। আবার নৈতিক শক্তি যে কি তাহা ঠিক করিয়া বুঝান বড় সহজ নহে এবং নৈতিক বল রাষ্ট্রমূলক বলের মধ্যে ধরিয়া লইলে, এই মতবাদ ঠিক কিরূপে রাষ্ট্রের উৎপত্তি তাহা বুঝাইতেও সক্ষম হয় না। অবশ্য ঐতিহাসিকযুগে আমরা দেখিতে পাই যে "বল" রাষ্ট্রবিশেষের গঠনে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে যেমন জার্ম্মান সাম্রাজ্য "লৌহ এবং রক্তের" (অর্থাৎ অস্ত্রবল ও বাহুবলের) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহা হইতে কিছুতেই বলা যায় না যে বল হইতেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি। অবশ্য মনে রাখা উচিত বল ব্যতীত রাষ্ট্রের অস্তিত্ব অসম্ভব। তবে ইহাতেও প্রমাণ হয় না

রাষ্ট্র বলমূলক, কারণ একটী উপাদান কোন দ্রব্যোৎপাদনে অত্যাবশ্যকীয় হইলেও সেইটী সেই দ্রব্যোৎপাদনের কারণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না; যেমন, রক্ত ব্যতীত মানবদেহের অস্তিত্ব অসম্ভব বলিয়াই রক্তকেই আমরা মানবজীবনের উৎপত্তির কারণ বলিতে পারি না। পাশব বলের পূজায় প্রণোদিত করে বলিয়াও এই মতবাদ পরিত্যজ্য।

৩। **চুক্তিবাদ**—(Contract Theory)—এই মতানুসারে রাষ্ট্র ও সমাজ চুক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। সামাজিক সুখের বিনিময়ে প্রকৃতিদত্ত অধিকারসমূহ পরিত্যাগ এই চুক্তির প্রধান অঙ্গ। অতএব এই মতানুসারে সমাজ ও রাষ্ট্রসৃষ্টির পূর্ব্বে মানবের এক প্রকার প্রাক্-সামাজিক ও প্রাক্-রাষ্ট্রিক অবস্থা মানিয়া লইতে হয়। এই অবস্থাকে প্রাকৃতিক অবস্থা (Sate of Nature) নাম দেওয়া হইয়া থাকে।

ইহার ইতিবৃত্ত—এই চুক্তিবাদ লইয়া যত লেখালিখি হইয়াছে রাষ্ট্রোৎপত্তি সম্বন্ধে আর আর মতবাদগুলি একত্রে লইয়াও তত হয় নাই। শাসক ও শাসিত দিগের মধ্যে চুক্তির কথা প্রাচীন ভারতবর্ষে একেবারে অজ্ঞাত ছিল না। "প্রকৃতি রঞ্জনাৎ রাজা" রাজন্ শব্দের এই ধাত্বর্থের মধ্যে আমরা ইহার স্পষ্ট ইঙ্গিত দেখিতে পাই। হিব্রুদিগের প্রাচীন বিধানে (Old Testament) দেখি ইস্রায়েলের শ্রেষ্ঠ বৃদ্ধগণ (Elders) হেব্রণে (Hebron) দায়ুদের নিকট আসিলে তিনি তাঁহাদের সহিত চুক্তি করিলেন এবং তাঁহারা তাঁহাকে ইস্রায়েলের রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। গ্রীকদিগের মধ্যে সোফিষ্টগণ প্রথমে এই মত প্রবর্ত্তন (Enunciate) করেন। প্লেটো এবং এরিষ্টটল্ খণ্ডনের নিমিত্ত এই মতের উল্লেখ করিয়াছেন। এপিকিউরিয়ানগণ কিন্তু ইহাকে রায়ের মূল বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। রোমক ব্যবহারাবিদ্‌গণ জনসাধারণ সমস্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উৎস স্বীকার করিয়া এই মতবাদ পরোক্ষভাবে মানিয়া লইয়াছিলেন। টিউটন জাতিসমূহের মধ্যে এইমত আরও স্পষ্টভাবে স্বীকৃত ছিল। কারণ রাজ্যাভিষেকের সময় তাঁহাদের রাজগণ দেশের আইন মানিয়া চলিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে বাধ্য হইতেন। ফিউড্যাল যুগে (Feudal Age) ভূমিসংক্রান্ত যাবতীয় প্রভু ভৃত্যস্বামী (Lord) এবং প্রজা (Vassal) এই দুইজনের মধ্যে চুক্তির উপর নির্ভর করিত। সেইজন্য তৎকালে রাজার অধিকার পর্য্যন্তও চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া বিবেচিত হইত। খৃঃ একাদশ শতাব্দীতে লটেনব্যাক্ নিবাসী ম্যান্‌গোল্ডের (Mangold of Lantanbach) হাতে এই মতটী সুস্পষ্ট আকার ধারণ করে। ন্যায়ানুসারে বিচার ও আইন অনুসারে শাসন করিতে রাজার এবং প্রজাদিগের তাঁহার আজ্ঞাপালনের প্রতিজ্ঞা দুইটি একটী চুক্তির অঙ্গ। এবং যে কোন পক্ষ এই চুক্তি ভঙ্গ করিলে তৎক্ষণাৎ অপর পক্ষ ইহার সর্ত্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করে। কিন্তু এই মতটী তিনি ঠিক সমাজ বা রাষ্ট্রোৎপত্তির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ না করিয়া সুপ্রচলিত রাষ্ট্রগঠনমূলক মূলসূত্রগুলির ব্যাখ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। স্বেচ্ছাতন্ত্রবাদ গণতন্ত্রবাদ এবং নিয়মতন্ত্রবাদ সকলগুলির স্বপক্ষে লাগাইতে পারা যাওয়ায় এই মতটী ক্রমশঃ

সর্ব্ববাদিসম্মত হইয়া পড়ে। এই মত ব্যাখ্যাতাদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়জন বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

১। ল্যাঙ্গে (Languet) ইহার লিখিত পুস্তকের নাম "ভিণ্ডিশিযে কণ্ট্রা টিরান্স্" (Vindiciae Contra Tyranuos or the Grounds and Rights against Tyrants খৃঃ ১৫৭৯) অর্থাৎ অত্যাচারীগণের বিরুদ্ধে যুক্তি এবং অধিকার।

২। স্কট ধর্ম্ম সংস্কারক জর্জ বুক্যানন্ (George Buchanan) ইহার গ্রন্থ "স্কট দিগের মধ্যে রাজক্ষমতা" (On the sovereign power among the Scots) খৃঃ ১৫৭৯।

৩। জর্ম্মান লেখক এল্থুসিয়াস্ (Althusias)—ইহার গ্রন্থ রাষ্ট্রনীতি (Systematic Politics). খৃঃ ১৬১০।

৪। জেসুইট্ দলভুক্ত স্পেনীয় মেরিয়ানা (Mariana)—ইহার গ্রন্থ "রাজতন্ত্র এবং রাজার শিক্ষা" (On kingship and the Education of a king) খৃঃ ১৫৯৯।

৫। পূর্ব্বোক্তের সমপন্থী সুয়ারেজ (Suarez)—ইহার গ্রন্থ,—বিধি ও বিধান কর্ত্তা ভগবানের বিষয় আলোচনা (A Treatise on Law and God Legislator)।

৬। ওলন্দাজ ব্যবহারবিৎ হিউগো গ্রোটিয়াস্, (Hugo Grotius)—ইহার গ্রন্থ "যুদ্ধ ও শান্তির বিধান" (Laws of War and Peace) খৃঃ ১৬২৫।

৭। ইংরেজ "হুকার" (Hooker)—ইহার গ্রন্থ "ধর্ম্মরাষ্ট্র" (Ecclesiastical Polity খৃঃ ১৫৯৪)।

৮। মহাকবি মিল্টন (Milton)—ইহার গ্রন্থ "রাজা ও শাসকগণের স্বত্ব" (Tenure of Kings and Magistrates) খৃঃ ১৬৪০।

৯। হব্স্ (Hobbs)—ইহার গ্রন্থ "মহানক্র" (Leviathan) খৃঃ ১৬৫১।

১০। লক্ (Locke) –ইহার গ্রন্থ "রাষ্ট্র শাসন সম্বন্ধীয় দুইটী আলোচনা" (Two Treatises of Civil Government) খৃঃ ১৬৯০।

১১। বিখ্যাত ফরাসী লেখক রুসো (Russeau)—ইহার গ্রন্থ "সামাজিক চুক্তি" (Le contrat social Social Contract)।

রুসোর হস্তে এই মতবাদ চরম বিকাশ লাভ করে। তৎ প্রচলিত মতই আমেরিকান ও ফরাসী বিপ্লবের মূল ভিত্তি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে এই মতের প্রভাব হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়। কারণ এই সময়ের মধ্যে প্রায় সমস্ত সভ্য দেশে প্রজাতন্ত্র সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ইহার কাজ শেষ হইয়া যায় এবং বিজ্ঞানের আলোচনার প্রসারের সঙ্গে "ঐতিহাসিক বাদের" (Theory of the History of Eolution) প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই মতবাদের দোষগুণ—চুক্তিবাদ বহুকাল হইতে নানাস্থানে স্বতঃসিদ্ধ

বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল বলিয়া এবং আমেরিকান ও ফরাসী বিপ্লবের ন্যায় দুইটী প্রকাণ্ড ঘটনার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট বলিয়া এই মতবাদের দোষগুণের একটু বিশদ আলোচনা আবশ্যক।

১। প্রথমে দোষ ধরিতে গেলে আমরা দেখি যে এই মতটী এত অস্পষ্ট যে ইহার ভাষ্যকারগণ যে কোন প্রকারে ইহার ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ। হব্স্ (Hobbes) ইহাকে স্বেচ্ছাতন্ত্রের, লক্ (Locke) ইহাকে নিয়মতন্ত্রের এবং রুসো (Rausseau) ইহাকে গণতন্ত্রের মূলভিত্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মানবের প্রাকৃতিক অবস্থা এবং আদিমচুক্তির সর্ত্ত সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ধারণা হইতেই এই বিভিন্ন ব্যাখ্যাগুলির উৎপত্তি। অবশ্য এই প্রাকৃতিক অবস্থা এবং আদিম চুক্তির সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে কোন কথা বলিবার কাহারও কোন ন্যায্য অধিকার নাই। সুতরাং এখানে স্বীয় প্রকৃতি ও কল্পনা শক্তি যাহাকে যে দিকে লইয়া গিয়াছে তিনি সেই দিকেই গিয়াছেন। হব্স্ (Hobbes) মানব চরিত্র অতি হীন বলিয়া বিশ্বাস করিতেন সেইজন্য তিনি মানবের প্রাকৃতিক অবস্থাকে নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধের অবস্থা বলিয়া কল্পনা করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার মতে "আদিম চুক্তির" পূর্ব্বে নিয়ম বা ন্যায় বলিয়া কিছুরই অস্তিত্ব ছিলনা। জোর যার মুল্লুক তারই ছিল। এই অবস্থার অবিশ্রান্ত মারামারি কাটাকাটি হইতে পরিত্রাণের জন্যই "আদিম চুক্তি"। এই চুক্তির সর্ত্তানুসারে প্রত্যেকে নিজ নিজ ইচ্ছামত আচরণের অধিকার চিরকালের জন্য ব্যক্তি বিশেষ বা ব্যক্তি সমষ্টি বিশেষের হস্তে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। এই চুক্তি স্বভাবতঃ চিরস্থায়ী, কারণ ইহা রদ করিতে হইলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রাকৃতিক অবস্থায় ফিরিয়া যাওয়া ব্যতীত আর অন্য উপায় নাই। অতএব হব্সের মতে রাজার যাহা ইচ্ছা করিবার ক্ষমতা আছে ও সেই ক্ষমতার প্রতিকূলে দাঁড়াইবার কাহারও অধিকার নাই। লকের মত কিন্তু অন্যরূপ, তাঁহার মতে মানবের প্রাকৃতিক অবস্থা অসুবিধাজনক হইলেও একেবারে অসহ্য ছিলনা। অত্যাচারী রাজার স্বেচ্ছাচার জনিত কষ্ট এই অবস্থার কষ্ট অপেক্ষা বহুগুণে অধিক। তাঁহার মতে মধ্যে মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ ঘটিলেও এই অবস্থা মোটামুটি শান্তিরই অবস্থা ছিল। কারণ মানুষের স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি তাহাদিগকে প্রাকৃতিক নিয়মগুলি দেখাইয়া দিত এবং সকলে মোটামুটি এই নিয়মগুলি মানিয়া চলিত। তবে অসুবিধা এই ছিল যে সকলে এই নিয়মগুলি মানিয়া চলিতেছে কিনা তাহা দেখিবার ও নিয়মলঙ্ঘনকারীদিগকে যথাযুক্ত শাস্তি দিবার মত নিরপেক্ষ কোন বিচারক বা দণ্ডদাতা ছিলনা, নিজেদের ঝগড়ার মীমাংসা নিজেদেরই করিয়া লইতে হইত এবং ইহাতে যে অনেক সময় দুর্ব্বলের উপর সবলের অত্যাচার অবাধে চলিত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। লকের মতে এই প্রাকৃতিক অবস্থা প্রাগ্-রাষ্ট্রিক হইলেও প্রাক্-সামাজিক ছিলনা। তখনও সমাজের সৃষ্টি ছিল এবং এই সমাজ আপনার অবস্থার উন্নতি কল্পে কোন এক প্রধান ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টির সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়া সুশাসনের বিনিময়ে তাঁহার বা তাঁহাদের আজ্ঞা পালন করিতে বাধ্য করিয়াছিল। অতএব লকের মতে রাজা প্রজা-পীড়ন করিলে তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার

অধিকার প্রজাগণের সর্ব্বদাই আছে। রুসো এই পথে আরও অনেকটা অগ্রসর। তাঁহার মতে প্রাকৃতিক অবস্থা অনেক বিষয়েই মানবের সর্ব্বাপেক্ষা সুখের অবস্থা ছিল। তখন সকলেই স্বাধীন, সকলেই স্বস্ব প্রধান এবং সকলেরই জীবন আনন্দময় ছিল। কাল ক্রমে প্রজাবৃদ্ধির ফলে মানুষ এই অবস্থা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। সেই জন্য সাধারণের ইচ্ছার নিকট প্রত্যেকের আত্মবলির দ্বারা সাধারণতন্ত্র গঠিত হয়। এই সাধারণের ইচ্ছা (General will) রাষ্ট্রের সর্ব্বপ্রধান প্রভুশক্তি (Sovereign)। রাজা বা শাসকবৃন্দ ইহার আজ্ঞাবহ যন্ত্রমাত্র। অতএব জনসাধারণ ইচ্ছা করিলে যে কোন সময়ে শাসন যন্ত্র পরিবর্ত্তন করিতে পারে। এইরূপে তিনি য়ুরোপে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন।

শ্রীপঞ্চানন সিংহ

বর্ত্তমান আফগানিস্থান

চা-কর সাহেবদের ইঙ্গিতে পরিচালিত আসামের লোকাল বোর্ডের অধীনে কাজ করা যখন অসম্ভব হইয়া উঠিল, তখন নেপাল সরকারের সহকারী ইঞ্জিনিয়ারপদের নিয়োগপত্র পাইলাম। সে আজ ৭ বৎসরের কথা। নিজে হিন্দু হইয়া স্বাধীন হিন্দুরাজার অধীনে কাজ করিতে বড়ই আগ্রহ হইল। আসাম ছাড়িয়া নেপাল চলিলাম; কিন্তু সেখানে হিন্দুত্বের যে তিক্ত আস্বাদ পাইয়াছি, তাহার স্মৃতি-সুখকর নয়। রাজকর্ম্মচারীদের "অহং" ও "সবজান্তা" ভাব, গুরুপুরোহিতদের অনুচিত প্রাধান্য, অন্য ধর্ম্মের প্রতি ঘৃণা, অন্যদেশ হইতে আনীত দ্রব্যে অতিরিক্ত আসক্তি এবং নেওয়ারদের (নেপালের আদিম নিবাসী) সহিত, রাজপুত ও পাহাড়িয়াদের (যাহারা এখন নেপাল শাসন করিতেছে) ব্যবহার, আমাকে এত ব্যাকুল করিয়া তুলিল, যে ৪ বৎসর পরই নেপাল ছাড়িতে হইল। ব্রিটিশভারত ছাড়িয়া "স্বাধীন" নেপালে যাইয়া, মনে করিয়াছিলাম, মুক্ত হাওয়ায় কিছুদিন কাটাইব, কিন্তু সে আবহাওয়া আমার সহ্য হইল না।

ফিরিয়া আসিয়া এখানে সেখানে টুক্‌টাক্ কাজ ও জনসেবা করিয়া ৯ মাস বেকার অবস্থায় ছিলাম। ৯ মাস পরে দিল্লী হইতে আফগান কনসল্ জেনারেলের একপত্র পাইলাম; আমাকে কাবুলে ইরিগেশন ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত করা হইয়াছে; আর সিমলায় কনসল জেনারলের সহিত দেখা করিতে হইবে। আফগানিস্থানের নবযৌবন আরম্ভ হইয়াছে; সেই দেশ এখন কি ভাবে লইয়া কিভাবে ছুটিয়াছে, তাহা দেখিবার জন্য বড়ই আগ্রহ হইল। খৃষ্টান রাজার অধীনে

করিয়া এবং খৃষ্টানদের সহিত মেলামেশা করিয়া, ঐ ধর্ম্মের কতকটা আস্বাদ পাইয়াছি। নেপাল যাইয়া স্বাধীন হিন্দুরাজ্য যে কি তাহাও বেশ বুঝিয়াছি, এইবার মুসলমান জগৎ দেখিবার জন্য উৎসুক হইলাম। সিমলায় গেলাম। সেখানে গিয়া ব্রিটিশ এন্‌ভয়ের কথা মনে পড়িল। ৩ ফটকে ৩ পাহারা পার হইয়া, তবে তাঁহার সহিত দেখা করিতে হয়। কনসল জেনরলের উইণ্ডার মেয়ার ভবনে হয়ত ৭ ফটক পার হইয়া দেখা করিতে হইবে। কিন্তু উইণ্ডার মেয়ারে যাইয়া দেখি ফটকে পাহারা নাই। সরাসর চলিয়া গেলাম। সিপাই, পাহারা কিছুই নাই, যেন একজন সাধারণ ভদ্রলোকের বাড়ী। কনসল্ জেনারেল যে ঘরে থাকেন তাহার সামনে যাইতেই একজন চাকর আসিয়া সেলাম করিয়া বলিল "কাহাকে চান"। আমি তাহাকে আমার কার্ডখানি কনসল্ জেনারেল সাহেবকে দিতে বলিলাম। সে চলিয়া গেলে এক মিনিট পর সেক্রেটারী সাহেব আসিয়া আমাকে বৈঠকখানার ঘরে লইয়া গেলেন। আমাকে বসিতে বলিয়া তিনি কনসল জেনারেল সাহেবকে খবর দিতে গেলেন। ৫ মিনিট পরে ফিরিয়া আসিয়া আমাকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। কন্‌সল জেনারেল সাহেবের সহিত দেখা হইল। ইনি ইংরাজী জানেন না। উঁহারা উভয়েই আফগান, এবং খুব ভদ্র ও অমায়িক। সেক্রেটারী সাহেব বেশ ইংরাজী জানেন। তিনিই দোভাষীর কাজ করিলেন। প্রায় আধঘণ্টা ধরিয়া অনেক কথাবার্ত্তার পর ঠিক হইল তিনি চিঠি ও ছাড়পত্র ঠিক করিয়া রাখিবেন এবং আমাকে পরদিন আসিয়া লইয়া যাইতে হইবে। আর একজন ইংরাজ ইঞ্জিনিয়ার আমার সহিত যাইবে, এইরূপ বলিলেন। পরদিন ইংরাজ ইঞ্জিনিয়ারের সহিত আলাপ হইল। ইঁহাকে মিষ্টার এম্ বলিব। ঘণ্টা দুই গল্প করার পর চিঠি ও ছাড়পত্র পাইলাম। দু' খানা চিঠির মধ্যে একখানা পেশয়ারে আফ্‌গান ট্রেড্ এজেণ্টের নামে ও অন্য খানা কাবুলে ফরেন মিনিষ্টারের নামে। মিষ্টার এম্ ফিরিয়া গেলেন এবং বলিয়া গেলেন যে ৪ দিন পর তিনি পেশয়ারে পৌঁছিবেন। সেখান হইতে দুজনে এক সঙ্গে কাবুল যাইব।

তাঁহার যেদিন পেশয়ারে পৌঁছিবার কথা, আমি তাহার পূর্ব্বের দিন পেশয়ারে পৌঁছিয়া এজেণ্টের সহিত দেখা করিলাম এবং কনসল জেনারেলের পত্রখানি দিলাম। তিনি সেকার ঠিক করিবার ভার লইলেন। পরদিন মিষ্টার এম্ আসিলেন ও তাহার পরদিন দুইজনে সাড়ে আটটায় মোটরে যাত্রা করিলাম। পেশয়ার হইতে ৬ মাইল দূরে খাইবার পাশের ফোর্ট আছে, এখানে ছাড়পত্র দেখাইতে হয়। সেখান হইতে পরে লণ্ডিকোটালে পৌঁছিলাম, কোটাল খাইবার পাসের অন্য মুখ। এখানেও ফোর্ট আছে এবং ছাড়পত্র দেখাইতে হয়। আমি পত্র লইয়া ব্যস্ত আছি ইতিমধ্যে মিষ্টার এম্ ফোর্টে ঢুকিয়া পড়িলেন। প্রায় ২ ঘণ্টা পরে তাঁহাকে বাহির করিলাম। এই ফোর্টে ঢুকিতে কেহ বাধা দিল না। কিছুদূরে লণ্ডিখানা, আর পর্য্যন্ত ইংরাজের সীমানা। ইহার পরে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, রাস্তার ধারে বড়

বড় অক্ষরে লেখা রহিয়াছে "আফগানসীমানায় প্রবেশ নিষেধ"। এইখানে আসিতেই মটরকার থামিল এবং পাহাড়ের উপর হইতে একজন আফগান অফিসার নামিয়া আসিয়া আমাদের ছাড়পত্র দেখিল এবং অন্যান্য কথা জিজ্ঞাসা করিল। মটরচালক সমস্ত কথার জবাব দিল, কারণ আমরা পারসী জানি না।

এখান হইতে একজন অফিসার আমাদের গাড়ীতে ডেক্কা পর্য্যন্ত গেল। ডেক্কাতে আফগান গভর্ণমেণ্টের ফোর্ট আছে এবং কাবুল হইতে এইখান পর্য্যন্ত টেলিফোন্ আছে। ডেক্কাতে আমাদের ছাড়পত্র লইল এবং জালালাবাদের গভর্ণরকে টেলিফোন্ করিয়া অন্য একখানা ছাড়পত্র দিল। বেলা ৪ টার সময় আমরা ডেক্কা ছাড়িলাম। জালালাবাদ ডেক্কা হইতে ৪০ মাইল, সেখানে যাইয়া রাত্রে থাকিতে হইবে। ৩২ মাইল আসিয়া দেখি আর একখানা মটরকার ৪ জন আফগান ভদ্রলোক সমেত রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম মটরগাড়ী খারাপ হইয়া গিয়াছে। তাহাদের বিপদ দেখিয়া তাহাদের গাড়ী আমাদের গাড়ীর সহিত বাঁধিয়া লইলাম। ৬ মাইল আসিয়া বালির মধ্যে কার আটকাইয়া গেল, রাস্তার উপর এত বালি যে কার যাইবার উপায় নাই। তখন রাত্রি হইয়াছে। সকলে নামিয়া কার ঠেলিতে আরম্ভ করিলাম। মিষ্টার এম্ সব চেয়ে বেশী ঠেলিয়াছিলেন, তখন তাঁহার খুব স্ফূর্ত্তি।

রাত্রি ৯টার সময় জালালাবাদ পৌঁছিলাম। খাইবার ও থাকিবার সব ঠিক্‌ঠাক্ ছিল। রাত্রি ১১টার সময় খানা পাইলাম, খাইয়া শুইয়া পড়িলাম। পরদিন সকালে ৮টার সময় রওনা হইবার বন্দোবস্ত করিতেছি, এমন সময় গভর্ণর সাহেব ডাকিয়া পাঠাইলেন। গভর্ণরের সহিত দেখা করিয়া বেলা ১১টা সময় ফিরিলাম। ৮টার সময় রওনা হইলে সেই দিনই কাবুলে পৌঁছিতে পারিতাম, কিন্তু ১১টার সময় বাহির হইয়া ৬০ মাইল দূরে জাগডালাক নামক স্থানে ৪ টার সময় পৌঁছিলাম।

ডেক্কা হইতে জালালাবাদ পর্য্যন্ত বেশি পাহাড় নাই; রাস্তার দুই ধারেই পতিত জমী, কিন্তু জলের অভাবে চাষ হয় না। জালালাবাদ হইতে জাগডালাক পর্য্যন্ত দুর্গম পাহাড়। জাগডালাকে ভাল বাঙ্গলা আছে, থাকিবার ও খাইবার বেশ সুবিধা ছিল। পরদিন সকালে ৮টার সময় রওনা হওয়া গেল। যে দুর্গম রাস্তা,—যেরূপভাবে কাবুলে পৌঁছিলাম, তাহাতে ড্রাইভারকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায় না।

৪টার সময় কাবুলে পৌঁছিলাম, তখন সমস্ত আফিস্ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কারণ এখানে সকাল ৭৷৷০টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত আফিস্ হয়। আমরা পররাষ্ট্র আফিসে গেলাম। সেখান হইতে একজন অফিসার আমাদিগকে অতিথিশালায় লইয়া গেলেন। অতিথিশালাটী বেশ সুন্দর রূপে সজ্জিত এবং বাগানে পরিবেষ্টিত। সেদিন রাত্রে কিছুই আহার হইল না। কারণ অতিথিশালার লোক আমাদের কথা বুঝিতে না পারায় এবং আমরা অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়ায় শুই

গড়িয়াছিলাম, উঠিয়া খাই নাই। পরদিন প্রাতে আমি ও মিষ্টার এম্ কোনওরূপে অতিথিশালার লোকদিগকে খাওয়ার জিনিষের কথা বুঝাইয়া দিয়া রুটী ও মাংস পাইলাম। পরদিন জুম্মা অর্থাৎ শুক্রবার, কাজেই মুসলমান রাজ্যে অফিস্ বন্ধ। একজন লোক আসিয়া আমাদিগকে কৃষি ও বাণিজ্য সচিবের নিকট লইয়া গেল। অন্যান্য কথার পর তিনি আমাদিগকে চীফ্ ইঞ্জিনিয়ারের সহিত দেখা করিতে বলিলেন। চীফ্ ইঞ্জিনিয়ারের তত্ত্বাবধানে, কাবুল হইতে ৩ মাইল দূরে নূতন রাজধানী তৈয়ার হইতেছে, তিনি সেইখানেই থাকেন। চীফ্ ইঞ্জিনিয়ার নিজে জারম্যান, বেশ ভদ্রলোক। তিনি বলিলেন আপনাদের দুজনকেই বোধ হয় জালালাবাদে যাইতে হইবে। শুনিয়া একটু আনন্দ হইল, কারণ যত দেশের দিকে থাকা যায় ততই ভাল। পরদিন শুনিলাম, আমীর সাহেব হুকুম দিয়াছেন আমাদের একজনকে জালালাবাদে এবং অন্যজনকে জাবালুছাং (Jabalusang) যাইতে হইবে। জাবালুছাং কাবুলের ৫০ মাইল উত্তরে, অর্থাৎ রাশিয়ার দিকে। মিষ্টার এম্ তাড়াতাড়ি বলিলেন তিনি জালালাবাদ যাইবেন; আমি মনে মনে একটু অসন্তুষ্ট হইলেও চীফ্ ইঞ্জিয়ারকে বলিলাম, "আমি আফগান্ গভর্ণমেণ্টের অধীনে কাজ করতে আসিয়াছি, দরকার হইলে আফগানিস্থানের যে কোন স্থানে যাইতে প্রস্তুত আছি।" চীফ্ ইঞ্জিনিয়ার একটু হাসিলেন। ইনি ইংরাজি জানেন, তবে তত ভাল নয়। ঠিক হইয়া গেল মিষ্টার এম্ জালালাবাদ যাইবেন ও আমি জাবালুছাং যাইব।

পরদিন বাণিজ্য সচিবের সহিত দেখা করিলাম। এইখানে কৃষি বিভাগের কর্ত্তার সহিত আলাপ হইল। ইঁনি ভারতবর্ষে ছিলেন, বেশ ইংরাজী জানেন; কথাবার্ত্তার বেশ সুবিধা হইল। তাহার পর ৩।৪ দিন কাজে যাইবার কোনও সংবাদ পাওয়া গেলনা। খোঁজ লইয়া জানিলাম, আমাদের আফিসে যাইবার কোন দরকার নাই; দরকার হইলে আমাদিগকে ডাকিয়া পাঠান হইবে। আমরা দুজনে কয়েকদিন বেশ খাইয়া, বেড়াইয়া ও গল্প করিয়া কাটাইলাম।

আট দিন পরে মিষ্টার এম্ জালালাবাদে চলিয়া গেলেন; কিন্তু আমার জাবালুছাং যাইবার কোনও খবর নাই। কৃষি বিভাগের কর্ত্তাকে তাগিদ দিয়া ১৪।১৫ দিন পরে জাবালুছাংএ রওনা হইলাম। তিনি আমার সহিত গিয়া এই স্থানের কমিশনার সাহেবের সহিত আমার আলাপ করিয়া দিয়া ৩।৪ দিন পর কাবুল ফিরিয়া গেলেন। সেই সময় হইতে জাবালুছাংএ আমার ক্ষেত্র হইয়াছে।

দিল্লী হইতে মিষ্টার এম্ প্রায় ৫০ বাক্স সিগারেট আনিয়াছিলেন এবং রাস্তায় যেখানে যাহার আলাপ হইয়াছিল, তাহাকেই সিগারেট দিয়াছিলেন। কিন্তু ডেক্কা পার হইবার পর, কেহই সিগারেট লয় নাই। কারণ তখন রমজান, দিনের বেলায় মুসলমানদের সিগারেট পর্য্যন্ত নিষেধ। ইঁহাদের এই বিশেষত্ব যে ধনী হইতে গরীব পর্য্যন্ত সকলেই সমানভাবে দেশের আচার পালন করেন। এই রোজার সময়ে জালালাবাদের গভর্ণরের সামনে মিষ্টার এম্ খাইয়া অপ্রস্তুত হইয়াছিলেন।

ভ্রাতৃভাব এইস্থানের মুসলমানদের মধ্যে এরূপভাবে বিকাশ লাভ করিয়াছে, যে, দেখিলে আনন্দ হয়। জাগদালাকে আমীর সাহেব নিজে যে খাট ও বিছানা ব্যবহার করেন আমাদের জন্যও সেই খাট ও বিছানার ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু আমরা নিজেদের বিছানাই ব্যবহার করিয়াছিলাম। মন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া যে কোন রাজকর্ম্মচারীর সহিত দেখা হউক না কেন, সকলেই করমর্দ্দন করিয়া বসিতে দিয়া আগন্তুকের শারীরিক ও মানসিক কুশল জিজ্ঞাসা করিবার পর কাজের কথা আরম্ভ করেন। কুশল জিজ্ঞাসা করিবার শিষ্টাচারের কায়দায় কিছু বাড়াবাড়ি আছে। রাস্তায় পরিচিত লোকের সহিত দেখা হইলে আদব কায়দায় মুগ্ধ হইতে হয়। ঘোড়ায় চড়িয়া গেলে রাস্তার লোকের "মান্দানাশি" (আপনি বোধ হয় বিশেষ ক্লান্ত হন নাই) বুলির চোটে অস্থির হইতে হয়। এবং কাহারও সহিত কথা বলিয়া বিদায় লইবার সময় "বমানে খোদা" (আপনাকে ঈশ্বরের যত্নে রাখিয়া বিদায় হইলাম) শুনিতেই হইবে। প্রত্যেক কথাতেই ভগবানের নাম স্মরণ করাইয়া দেয়। দেশকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে, লোকের মধ্যে হয় দেশভক্তি চাই, (যেমন পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে) আর না হয় ভগবানের নামে যাহাতে প্রেরণা আসে তাহা করিতে হয়। তুর্কী হইতে আফগানিস্থান পর্য্যন্ত সমস্ত মুসলমান প্রধান দেশে শেষোক্ত ভাবটি দেখা যায়। আমাদের হয়ত বা না আছে দেশভক্তি, না আছে ভগবানে বিশ্বাস। বেদান্তের "নেতি নেতি" পন্থা ধরিয়া সমস্ত হিন্দুজাতি কি "নেতির" উপর দাঁড়াইতে প্রয়াস পাইতেছে! কোন কিছুতেই একটা আস্থা নাই; এটা কিছু নয়, ওটা কিছু নয় সমস্তই যেন আমরা "নয় নয়"-এর উপর দিয়া চালাইতে চাই। ভগবানে বিশ্বাস, ওটা কিছু নয়; পূজা অর্চ্চনা, ওটা কিছু নয়; তাঁত চরকা, ওসব কিছু নয়; ছুঁতমার্গ পরিহারে, কিছু হইবে না; অর্থাৎ "সবই কিছু নয়" হইয়াছে আমাদের মূল মন্ত্র।

মুসলমানপ্রধান দেশের নেতাগণ নিজের দেশের মধ্যে শক্তি সঞ্চয়ের জন্য যেরূপ চেষ্টা করিতেছেন তাহাতে এ জাতি যে অচিরে আবার উঠিয়া দাঁড়াইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এসব দেশে বলসেবক দলেরও কোন ভয় নাই। কারণ এতটা ভ্রাতৃভাবের আদর্শ কোন দেশে বিকাশ লাভ করে নাই। কোরাণে দৃঢ় বিশ্বাসই ইহার কারণ। পংক্তিভোজন এবং নমাজ এ দুইটা জিনিষ যেন মুসলমান জাতটাকে তাজা রাখিয়াছে। নেপালে পশুপতিনাথের মন্দিরে নেপালের মহারাজকে যাইতে দেখিয়াছি, এখানেও জুম্মা মসজিদে আমীর সাহেবকেও যাইতে দেখিলাম। মন্দির হইতে সমস্ত যাত্রীকে জোর করিয়া বাহির করিয়া দিয়া মহারাজের দেবতাদর্শন আর এখানে সকলের সহিত, আমীর সাহেবের মসজিদে উপাসনা, দেখিবার ও ভাবিবার বিষয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ডেকা হইতে কাবুল পর্য্যন্ত দুইদিকে অনেক অনুর্ব্বর জমী পড়িয়া আছে। জালালাবাদ হইতে কাবুল পর্য্যন্ত যে সকল পাহাড় দেখিলাম তাহাতে গাছ নাই, কারণ এক একেবারেই বৃষ্টি নাই। চৈত্র ও বৈশাখ মাসে কেবল খুব অল্প বৃষ্টি হয়, নদীও খুব বেশী নাই,

আছে তাহাতে জল খুব কম। শীতের সময় পাহাড়ে বরফ জমিয়া থাকে, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে সেই বরফ যখন গলিয়া নদী দিয়া নামিয়া আসে তখন নদীতে জল দেখা যায়। এই সকল নদীর জল ঠিক ভাবে ব্যবহার করিবার জন্য আমীর সাহেব খুব চেষ্টা করিতেছেন। এই জলে যাহাতে অনুর্ব্বর জমীতে ফসল হয় তাহার বন্দোবস্ত চলিতেছে।

এখানে খুব তুঁত হয়। আষাঢ় ও শ্রাবণ দুইমাস লোক তুঁত খাইয়া কাটায়। আমাদের দেশে লোকে যেমন মুড়ি মুড়কি খায় এদেশে সেইরূপ তুঁত খায়। ভাদ্রমাস হইতে খরমুজা, তরমুজ, আঙ্গুর ও অন্যান্য ফল ওঠে। চৈত্রমাস পর্য্যন্ত ঐ সকল ফল মেলে; লোকে রুটীর সঙ্গে এই সকল ফল খাইতে পায় বলিয়া অন্য কোন জিনিষের অভাব অনুভব করে না। অনেককে আঙ্গুর দিয়া রুটী খাইতে দেখিয়াছি। এই স্থানের প্রধান খাদ্য রুটী ও মাংস। তুঁত ও অন্যান্য মেওয়া খুব বেশী পরিমাণে জন্মায়, কিন্তু গম ভাল রূপে না জন্মিলে লোকের চলে না। প্রায় সকল গৃহস্থেরই তুঁত ও আঙ্গুরের বাগান আছে। এদেশে তুলা খুব বেশী জন্মায়। নিজের ক্ষেতের তুলা অথবা কেনা তুলা চরকায় কাটিয়া সূতা করে এবং জোলার বাড়ী হইতে কাপড় বোনাইয়া আনে। মজুরিস্বরূপ গম কিম্বা অন্য শস্য দেয়। আমাদের দেশে যখন রেল হয় নাই তখন প্রায় এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে লোকে চরকায় সূতা কাটিয়া জোলার বাড়ী হইতে কাপড় বুনাইয়া আনিত। ঘরের কাপড়, ঘরের খাওয়া এবং বিলাসিতার আদর্শ সামনে না থাকাতে ইহারা নিজকে সুখী বলিয়াই মনে করে।

বিদেশী কাপড়ের আমদানি ও বিদেশে শস্য রপ্তানির ফলে আমাদের দেশে যেমন দুর্ভিক্ষ ও ছেঁড়া কাপড় পরা দেখিতে পাওয়া যায়, এদেশে তাহা নাই। যতই গরীব হউক না কেন কাহারও পরিধানে ছেঁড়া কাপড় বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। এবং কোন লোক না খাইয়া মরিয়াছে এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় না। তবে পয়সার দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে ইহাদিগকে গরীব বলিতে হয়, কারণ নগদ পয়সা বড় কাহারও ঘরে নাই। যাহার অবস্থা খুব ভাল অর্থাৎ উট, ঘোড়া, গাধা, খাদ্য দ্রব্য যথেষ্ট আছে, তাহার ঘরেও হয়ত নগদ ২।৩ হাজার টাকা নাই।

এ দেশের লোক অত্যন্ত অতিথি-সৎকার পরায়ণ। বিদেশী লোক দেখিলেই ডাকিয়া লইয়া যাইবে এবং ঘরে আর কিছু না থাকিলে চা ও রুটী খাইতে দিবে। ইহারা সবুজ চা ব্যবহার করে, আমাদের দেশের চা এখানে বড় চলে না। ইহারা দুধ না দিয়া শুধু চা পান করে। এই চা কে এরা "ময়মান" বলে। আমি যে গ্রামেই যাই "ময়মান" বলিয়া আদৃত হই।

কৃষি বিভাগের কর্ত্তার মুখে শুনিলাম, ইহারা যাহা খাইতে দেয়, তাহার অল্প কিছু না খাওয়া আচারবিরুদ্ধ। আমরা ইতিহাসে পড়িয়াছি এবং বালকদিগকে পড়ান হয় যে মোগল ও পাঠান রাজত্বে হিন্দুদের প্রতি খুব অত্যাচার হইয়াছিল; কিন্তু এখানে যে সকল হিন্দু আছে, তাহারা যে অবস্থাবিধার মধ্যে আছে এরূপ মনে হয় না। বিশেষতঃ এই স্থানের মুসলমানদের যে আদব-

কায়দা ও সভ্যতা দেখিতেছি, তাহাতে মনে হয় না যে তাহারা অন্য ধর্ম্মাবলম্বী লোকের উপর অত্যাচার করিতে পারে। এখানকার মুসলমানদের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া ভারতের মুসলমান ইতিহাস অভিরঞ্জিত মনে হয়। সৈনিক বিভাগে হিন্দু কর্ণেল আছে, এ বিষয়ে মুসলমান ও হিন্দুর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।

দেশে থাকিতে একটা ধারণা ছিল যে, মুসলমানদের সময় হইতে আমাদের দেশের মেয়েদের মধ্যে অবরোধ প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। একথা কত দূর সত্য জানি না। এদেশে মেয়েদের পর্দ্দা আছে সত্য, এবং "বোরখা" দিয়া সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া রাস্তায় বাহির হয় বটে, কিন্তু মেয়েরা সেই পর্দ্দা লইয়া গাছে চড়িয়া তুত পাড়িয়া খায়, ঘোড়ায় চড়িয়া একস্থান হইতে অন্যস্থানে যায় এবং দরকার হইলে বিচারকের সামনে নিজের মামলা লইয়া বাদানুবাদ করে। এদেশের মেয়েদের মুখ ঢাকা কিন্তু তাহারা সব কাজ করিতেছে। আমাদের দেশের মেয়েরা পর্দ্দা লইয়া অনেকটা অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। রেলে কিম্বা একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতে হইলে তাহারা যেন একটা লাগেজ বিশেষ হইয়া পড়ে এবং কথা বলিতে হইলে লজ্জায় মরিয়া যায়। গাছে কিম্বা ঘোড়ায় চড়িতে বলা আমার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু তাহারা যে মনুষ্য সমাজের অন্তর্ভূত এটা তাদের জ্ঞান থাকিবে না কেন?

এখানে চাকর বলিয়া কোন কথা নাই। নেপালে যাইতে হইলে রক্সুল ষ্টেশন হইতে কাটামুণ্ড পর্য্যন্ত ৬২ মাইল ডাণ্ডিতে যাইতে হয় এবং মোট লইয়া যাইবার জন্য কুলি আছে, তাহাদিগকে "ভারিয়া" বলে। আমি যখন প্রথম নেপাল যাই তখন আমার সঙ্গে কয়েকজন "ভারিয়া" ছিল। সন্ধ্যার সময় এক বিশ্রামকুটীরে (rest house) পৌঁছিলাম এবং ভারিয়াদিগের মধ্যে একজন তাহার মোট মাটীতে নামাইয়া দিয়া, একখানি চেয়ার লইয়া বসিয়া পড়িল। আমি তাহাকে নামিয়া বসিতে বলায় সে উঠিয়া দাঁড়াইল। আমি তাহাকে চেয়ারের মাহাত্ম্য বুঝাইয়া দিলে সে বলিল, "ভগবানের কাছে সব সমান"। কথাটা আমার মনে লাগিল। এখানে আসিয়া আবার সেই কথার প্রতিধ্বনি পাইতেছি। আজ কয়েক দিন এখানকার একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর সহিত কথা হইতেছিল। কথায় কথায় আমি বলিয়াছিলাম "আমরা সরকারী চাকর, আমরা নিজেদের কাজ সুচারুরূপে করিব"। তিনি বলিলেন "দেখুন, আফগানিস্থানে কেহ কাহারও চাকর নয়। আমরা সকলেই খোদার নফর, তাঁহারই কাজ করিবার জন্য সকলে খাটিতেছি এবং পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিতেছি। আমীর সাহেব হইতে নীচের সিপাহী পর্য্যন্ত সকলেই সহকর্ম্মী।" শুনিয়া মনে আনন্দ হইল, ভাবিলাম এসব ভাব ইঁহারা কো হইতে পাইলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম সকলের মূলে আছে "কোরাণ"। রাঁধে এবং চাকরের কাজ করে তাহার সঙ্গে মনিবের ব্যবহার দেখিলে আনন্দ হয়। এক বিছানায় মনিব ও চাকরের উপবেশন, এক হুঁকায় তামাক খাওয়া, এক সঙ্গে হাসি গল্প, মিষ্ট ব্যবহার

প্রভৃতি দেখিলে ভারতবাসীরা বুঝিতে পারিবে না যে একজন মনিব ও অন্য জন চাকর। যে যাহার কাজের বেলায় নিরূপিত কাজ করিয়া যাইতেছে, যেন সকলেই এক পরিবারভুক্ত; একজন অন্য জনের সম্মানার্হ এই মাত্র তফাৎ। সম্মান দেখাইবার বেলায় ঠিক কায়দা দেখা যায়। আমাদের দেশে চাকরের নিকট হইতে আমরা সম্মান আদায় করিতে ব্যস্ত, কিন্তু এদেশে তাহা নাই। হায়! হিন্দু—যাহাদের শাস্ত্রে তর্পণ করিবার সময় "আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত" জল দিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে,—সেই মহাপ্রাণ হিন্দুজাতি আজ ছুঁৎমার্গ অবলম্বন করিয়া অধঃপতিত। জগতের সমস্ত জাতি আজ নিজেদের দেশের মধ্যে ভ্রাতৃভাব জাগাইতে ব্যস্ত। কারণ তাহারা বুঝিয়াছে "তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈঃ বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ।" আর আমরা সেই রজ্জুকে শতধা বিভক্ত করিতে ব্যস্ত!

হিন্দু সমাজ আজ কাহারও সমাজ নয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, কাহারও প্রতি কাহারও সহানুভূতি নাই। নমঃশূদ্র ও অন্যান্য শাখা মনে করিতেছে যে তাহারা হিন্দুসমাজ-বৃক্ষের কেহ নহে, কারণ চারিবর্ণ তাহাদিগকে কুকুর বেড়ালের চেয়েও অধম জ্ঞান করিতেছে। ব্রাহ্মণ একদিন যে মস্তিষ্কের জোরে সমাজ বাঁধিয়াছিল, সে মস্তিষ্ক আজ সে হারাইয়াছে; যে মহাপ্রাণ দিয়া ব্রাহ্মণ সমাজভুক্ত লোককে ঠিক পথে চালাইয়াছিল সে শক্তি আজ কোথায়? জগতের সমস্ত ভোগ্য ত্যাগ করিয়া যে ব্রাহ্মণ ভোগীদের আরাধ্য হইয়াছিল, আজ সে নিজে ভোগী হইয়া, দল বাড়াইয়া, নিজের গৌরব নিজে নষ্ট করিয়াছে।

শ্রীনলিনীমোহন লাহিড়ী

যশ ও প্রেম

নেই কোন ফল ইতিহাসের পাতায় বেঁচে যশ নিয়ে,
যৌবনেরি দিনগুলি সব লেখা সোনার জল দিয়ে;
চাইনে যশের হীরের মুকুট—নই মনে যশ-ধন-কামী,
প্রিয়ার হাতের ফুলের মালা এদের চেয়ে ঢের দামী।

বুড়োর মাথায় ফুলের মুকুট পরালে কি খাপ খাবে?
শিশির ছিটে লাগলে মরা ফুল কি ফিরে প্রাণ পাবে?
পক্ক কেশের উপর থেকে দাও তা ফেলে টান মেরে,
নিছাঁক শুধু যশের তরে যশের মালা চায় কে রে?

ও খ্যাতি তোর প্রশংসাবাদ শুনেই শুধু গাল-ভরা
আনন্দ পাই ভাবিস যদি মস্ত সে তোর ভুল-করা,
আনন্দ পাই যখন উজল প্রিয়ার আমার দুচোখ গো
বলতে থাকে নেহাত আমি নইক প্রেমের অযোগ্য।

সেথাই তোরে বিশেষ করে খোঁজ করি আর পাই খুঁজে,
তোরে ঘেরা কিরণ সেরা হানে প্রিয়ার চক্ষু যে;
আমার গুণে মুগ্ধ হয়ে উজল যবে হয় আঁখি,
বুঝি মনে প্রেম ত ইহাই গৌরবেরো নেই বাকী।—(বাইরণ)

শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়

"মেবার-পতন"-এর গান *

[রচনা——————স্বর্গীয় মহাত্মা দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এম্-এ]

(অষ্টম গীত)

রাজকন্যা মানসী।

মিশ্র ললিত——————ঝাঁপ্‌তাল।

অলক্ষিতে মুখে তার খেলে আলো জ্যোছনার,
উজলি মধুর ধরা বিকাশি মাধুরী তার।
যবে সেই রহে পাশে, ধরণী কেমন হাসে;
চ'লে যায় অমনি সে হ'য়ে আসে অন্ধকার।
এ রহস্য গূঢ়তর;—যায় যদি শশিকর,
যায় না কুসুম-গন্ধ, যায় না-ক কুহু-স্বর;
বিহনে তাহার—সব থেমে যায়, গীতরব;
শুকায় সৌরভ; যায় সব সুধা বসুধার॥

[স্বরলিপি——————শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা]

স্থায়ী।

II (২´ সন্‌া	ঋন্‌সা | ৩ ঋা	-গা	মা | ০ মা	ঋগা | ১ মা	-গমা	-া I	
অ০	ল০০ ক্ষি	০	তে মু	খে০ তা	০০	র্	
I ২´ মা	দা | ৩ না	-র্সা	র্সা | ০ নঋা	নর্সা | ১ না	-দক্ষা	-মা I	
খে	লে আ	০	লো জ্যো	ছ০ না	০০	র্	
I ২´ ঋগা	ঋগা | ৩ ঋা	-মা	গা | ০ ঋা	মদা | ১ না	-র্সা	র্সা I	
উ০	জ০ লি	০	ম ধু	র০ ধ	০	রা	

* "মেবার-পতন"-এর গানের স্বরলিপি 'বঙ্গবাণী'র প্রতি সংখ্যায় ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইবে এবং নাটকান্তর্গত গানগুলি অভিনয়কালে যে সুরে ও তালে গীত হইয়া থাকে, অবিকল সেই সুরের ও তালের অনুসরণ করা হইবে।

I ২´ না	ঋর্না | ৩ মা	-ঋা	গা | ০ মা	গঋা | ১ গা	-ঋা	-সা) II	
বি	কা০ শি	০	মা ধু	রী০ তা	০	র্	
অন্তরা।							
II (২´ র্সনা	নদা | ৩ ঋা	মা	-া | ০ গমা	দা | ১ নর্সা	র্সা	-নর্সা I	
ষ০	বে০ সে	ই	০ র০	হে পা০	শে	০০	
I ২´ নর্সা	ঋর্সা | ৩ না	-র্সা	র্সনা | ০ নদা	ঋমা | ১ মগা	-মা	০ মা I	
ধ০	র ণী	০	কে০ ম০	ন০ হা০	০	সে	
I ২´ র্সনা	ঋর্সা | ৩ র্গা	-র্মা	-া | ০ র্গা	র্মা | ১ গর্ঋা	-নর্ঋা	র্সনদা I	
চ০	লে যা	০	য় অ	ম নি০	০০	সে০০	
I ২´ মা	না | ৩ দা	-ঋা	মা | ০ গমা	ঋমা | ১ গা	-ঋা	-নসা) II	
হ	য়ে আ	০	সে অন্‌	ধ০ কা	০	০র্	
সঞ্চারী।							
II (২´ মা	-গঋা | ৩ গা	-মা	মা | ০ ঋমা	গা | ১ ঋা	-গা	মা I	
এ	০র হ	০	স্ত গূ০	ঢ় ত	০	র	
I ২´ দক্ষা	-মা | ৩ না	-দা	মা | ০ গা	ঋগা | ১ ঋা	-সা	নসা I	
যা০	য় য	০	দি শ	শি০ ক	০	র০	
I ২´ নসা	-নদা | ৩ ঋা	-মা	মা | ০ গ্‌মা	দা | ১ না	-দনা	সা I	
যা০	০য় না	০	কু সু০	ম গ	০ন্‌	ধ	

	২´	৩		০	১			
I	ঋগা	-মা | মা	-নদা	ক্ষমা | গা	মগা | গা	-ঋা	সা]I
	যা০	য় না	০০	ক'০ কু	হু০ স্ব	০	র	
আভোগ।								
	২´	৩		০	১			
I	মা	দমা | দা	-মা	-দা | র্সা	-নর্সা | ঋা	-নর্সা	-া I
	বি	হ০ নে	০	০ তা	০০ হা	০০	র্ .	
	০২´	৩		০	১			
I	মা	র্সা | ঋা	-র্গা	র্মা | -া	ক্সা | র্গা	ঋা	র্সা I	
	স	ব থে	মে	ষা য়	গী ত	র	ব	
	২´	৩		০	১			
I	মা	ক্সমগা | মা	-দা	-মা | ক্সা	-গমা | দা	-মা	-দা I	
	শু	কা০০ য়	০	০ সৌ	০র ভ	০	০	
	২´	৩		০	১			
I	নঋা	-র্সা | না	দা	ক্সা | মা	গা | ঋা	গঋা	-সা]II II	
	যা০	য় স	ব	সু ধা	ব সু	ধা০	র্	

এ গানখানি প্রায়ই আজকাল কলিকাতার প্রধান তিনটী 'পাব্‌লিক্' নাট্যশালায় গাওয়া হয় মফঃস্বলের এক সখের থিয়েটার-পার্টী অভিনয়কালে যে সুরে ও তালে গাহিয়াছিলেন, এ স্থলে অবিকল সুরের ও তালেরই অনুসরণ করিয়া স্বরলিপি করা হইল।

লেখি

দেবত্র

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

গ্রামে বেশ একটু 'সোর্' পড়িয়া গিয়াছিল। আনন্দকুমারের মৃত্যুর পর যেমন করিয়া গ্রামের বয়োবৃদ্ধা বর্ষিয়সীগণ ছাড়াও পাড়ার ঝি বউ বালক বালিকার দল দঙ্গল বাঁধিয়া অকারণে কিছুদিন ধরিয়া ভট্টাচার্য্য বাড়ীতে রথ যাত্রার ভিড় বাধাইয়াছিল, এখন তদপেক্ষাও অধিকতর উৎসাহের সহিত ভোর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাহারা মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের নীরব গৃহের চারিদিকে একটু হাঙ্গামেরই সৃষ্টি করিয়া তুলিল। অরুন্ধতীকে কিছুদিন তাহাদের আদর আপ্যায়ন আসন সম্ভাষণের ব্যবস্থায় এমনি সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিতে হইল যে, মীরাদেরও যেন তিনি সে কয় দিন তেমন যত্ন করিবার অবকাশ পাইতে ছিলেন না।

মীরার মার এ ব্যাপার কতকটা জানাই ছিল, তাই তিনিও জায়ের সঙ্গে বর্ষীয়সীদের অভ্যর্থনা ও অন্যান্য সকলকে যথাসাধ্য সাদর সম্ভাষণ করিতেছিলেন। মীরা কিন্তু ক্রমে চটিয়া আগুন হইয়া উঠিতেছিল এবং তাহার রাগ দেখিয়া সনৎ হাসিয়া খুন হইতেছিল। সনৎ বলিতেছিল, 'আঃ, বড় ভুল হয়ে গেছে, এমন জান্‌লে কতকগুলো টিকিট্ ছাপিয়ে আন্‌তাম! সেগুলোর দু চার পয়সা করে দাম ধরলেও শ্রীমতী মীরা দেবীর গৃহাগমন উপলক্ষে আমাদের কিছু আয় হ'ত! কি বলিস্ করু? ভারি ভুল হ'য়ে গেছে,—না?" করুণা মীরার আরক্ত মুখের পানে চাহিয়া লজ্জিতভাবে একটু হাসিল মাত্র! মীরা উভয়ের পানে রাগেরভাবে চাহিয়া ঝঙ্কারের সহিত বলিল, 'কেন আমি কি রাম ছাগল না ভাল্লুক যে আমার নাকে দড়ি দিয়ে তোমাদের দেশে নাচাতে যাব? অমন ক'রে ফিঙের মতন যদি তোমাদের দেশের ছোট ছোট রূপী বাঁদর গুলো আমাদের দেখে আর লাগে তাহলে ভাল হবেনা দাদা—তা কিন্তু বলে দিচ্চি।"

মীরার রাগ দেখিয়া সনৎ আরও বেশী করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "ওমা মীরা কি কথা শোন' এসে! যারা ওদের দেখ্‌তে আস্‌ছে তাদের বল্‌ছে রূপী বাঁদর। নিজেকে বল্‌ছে, রাম ছাগল—ভাল্লুক। ভাল হবেনা—কি কর্‌বি তাদের শুনি?"

"আমি কি বড়দের ওকথা বলেছি নাকি? ঐ যে তোমাদের মান্যগণ্য হ'রে ন'রে পুঁটি-ভূতির তিন ভাগ গা খোলা, কারু বা একেবারেই তাঁতির সঙ্গে অসহযোগিত্ব, তাঁরা কি জন্য দলে দলে হাঁ ক'রে চেয়ে থাকেন? আমরা কি সং নাকি? বল্‌তো ভাই করুদি? বিরক্ত লাগেনা?"

করুণা মৃদুস্বরে বলিল, "এখানে যে বউ এলেও এমনি ক'রে সব দেখ্‌তে ছোটে—আর"—

মীরা এবারে প্রায় সপ্তমে স্বর তুলিয়া করুণার কথা সমাপ্ত হইতে না দিয়াই বলিয়া উঠিল, 'আমরা কি সেই বৌ এসেছি নাকি গ্রামেতে?"

তাহার চড়া গলার ধাক্কায় থতমত খাইয়া করুণাকে নীরব হইতে দেখিয়া ইলা মৃদু হাস্যের সহিত মীরার গায়ে হাত দিয়া বলিল, "অত রাগিস্ কেন সব তাতে? দেখ্‌তে আস্‌ছে তাতে কি! বড় মানুষ যাঁরা তাদের কাছে বরং একটু লজ্জা কর্‌ছে, সেও আমার পক্ষে, তোর তো কিছুই হবার কথা নয়। কিন্তু এই নিরীহ ছেলে মানুষের দল—যারা অবাক্‌ভাবে কেবল চুপ্‌ ক'রে দাঁড়িয়ে থাক্‌ছে তাদের ওপরও তোর রাগ?"

"না—রাগ হবেনা! মানুষকে আবার হাঁ'করে দেখ্‌বে কি? আমরা কি চতুর্ভুজ না ষট্‌পদ?"

মীরার রাগে ইলা ও সনতের হাসি দেখিয়া সাহস পাইয়া করুণা এইবার কথা কহিল, "ওরা তো এ রকম কখনো দেখেনি, তাই অমন ক'রে ছাখে। পাড়ার যে সব বৌ আসে—নতুন কেউ আসে—তারা কি দেখ্‌তে এমন? তাই দেখ্‌তেই যখন সবাই অত ভিড় করে, তখন—"

সনৎ আরও একটু বেশী হাসিয়া বলিল "পাড়ার যারা আসে তারা এমন নয়—এরা এমন—কেমন করুণা? খুব আশ্চর্য্যি রকম বুঝি—না?" করুণা নিঃশব্দে মাথা হেলাইয়া ঘাড় হেঁট করিল।

"কি রকম আশ্চর্য্য বলই না একটু শুনি।"

সনতের দুই তিন বারের প্রশ্নে অগত্যা করুণা শেষে মৃদুস্বরে বলিল "এমন তো আমি কখনো দেখিনি"।

সনৎ হাসিভরা মুখে মীরা ও ইলার পানে চাহিয়া রহস্য ভাবেই কি যেন বলিতে যাইতেছিল কিন্তু ইলার মুখের পানে চাহিয়া সহসা থামিয়া গেল। লজ্জার সঙ্গে আর একটা কিসের আভা পড়িয়া সে মুখ যেন সত্যই মানুষের মত বোধ হইতেছিল না! দেবতাকে কেহ দেখে নাই, কিন্তু শিল্পীর মানস দর্পণে দয়া স্নেহ মমতা প্রেম প্রভৃতি মনোবৃত্তির কল্পিত মূর্ত্তির মুখের আদর্শের যেমন ছায়া পড়ে এ মুখেও যেন তেমনি আভাস আসিতেছে। দেখিয়া তরুণ যুবক সনতের অন্তর সহসা যেন নির্ব্বাক হইয়া কেবল চাহিয়া রহিল। ইলাকে সে যেন আজ নিজ গৃহে আনিয়া নূতন করিয়াই দেখিল। মীরাও সচাঞ্চল্যে করুণার পীঠে একটা চড় বসাইয়া দিয়া বলিল "আহা, আমায় যেন নতুন দেখ্‌লেন উনি। বরং ইলাদি'কে—"

করুণা মুখ তুলিয়া মীরার পানে চাহিয়া বলিল "নতুন বলেই লাগে যে মীরা! আর ইলাদি'কে তো এতদিন ভেবেও একটুও আন্দাজ কর্‌তে পারি নি। তোমায় যা'হোক দেখা ছিল বলেই যেটুকু অবাক্ লাগেনা,—ইলাদি'কে কিন্তু ঐ পাড়ার ছেলে মেয়েগুলোর মতনই আমারও অমনি ক'রে চেয়ে চেয়ে কেবল দেখ্‌তে ইচ্ছে করে।"

এইবার মীরার হাসিবার পালা। সে কলকণ্ঠে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "কি চেয়ে চেয়ে দেখ্‌তে ইচ্ছে ক'রে রে জঙ্গ্‌লি? কাপড় চোপড় সাজ সজ্জাকে—না মানুষটাকে?—"

করুণা অম্লান বদনে ঘাড় নাড়িয়া বলিল—"সবই! ওঁর সবই সুন্দর।"

"বটে? ওঁর সবই সুন্দর? এতক্ষণ বুঝি ওঁকে এই স্তুতিবাদটা দেবার জন্যই আমায়ও দলে টেনে রাখা হ'য়েছিল, এইবার যথাস্থানে পৌঁছে আর আমি কেউ নই, না?" মীরার স্ফুরিত ওষ্ঠাধরে অভিমানের কলহ ঘনীভূত হইয়া উঠিল।

করুণা নিঃশব্দে মীরার একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া অতি মৃদুস্বরে প্রায় তাহার কানে কানেই যেন অতি আদরে ভরিয়া বলিল "তুমি তো আমার মীরা"।

"যাও, চাইনা তোমার ফাঁকা আদর"—বলিয়া মীরা কপট ক্রোধে করুণার হাত ঠেলিয়া দিয়াই দেখিল সম্মুখে মা ও জেঠিমা। জেঠিমা করুণার হাত ঠেলিয়া দেওয়া দেখিতে পাইয়াছেন দেখিয়া মীরা যেন একটু অপ্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল।

সনৎ বলিল, "জান মা, মীরা আমাদের দেশের লোকের ওপোর ভারি চটেছে।"

মা বাধা দিয়া বলিলেন, "চটার কথা পরে হবে। এ দেশটা বুঝি মীরারও নয়? আমাদের দেশ যে বল্‌লি?"

"বাব্বাঃ,—সে কথা তুমি একবার ব'লে দেখনা, মজা দেখিয়ে দেবে এখন।"

অরুন্ধতী মীরার পানে চাহিয়া সস্নেহে বলিলেন "চটেছিস্ না কি পাগ্‌লি? এরা সভ্য না হ'লেও, কথা কইতে না জানলেও এরাই তোর আপনার দেশের লোক,—নিজের ঘরের প্রতিবাসী, এটুকু যেন ভুলিসনে।"

মীরার অভিমান আবার ফুটিবার পথ পাইল,—"তাহোক! তাই বলে যা খুসি তাই বল্‌বে বুঝি?"

"বল্‌লেই বা! এই তো করুর এখনো আমরা বিয়ে দিই নি ব'লে ওর সাম্‌নেই কত কি বলে ওকে,—আমাদেরও ব'লে! করু তো তোর চেয়েও বড়। কি করব নানা বিপদে দিন কাটে উপায় নেই, লোকের কথা সইতেই হবে।"

সনৎ হাসিয়া বলিল "ও-ও এই সব কথা হয় বুঝি? তাই-ই মীরা এত রেগেছে।"

সরস্বতী বলিলেন "তা যাই বল দিদি, পাড়া গাঁয়ে বড় অনধিকার চর্চ্চা চলে। সহরে এই সব বালাই নেই। কেউ কারু কথার মধ্যে নেই, যার যা খুসী কর—যেমন ইচ্ছে চল! সব বাপ্‌কুচি চাল্।"

"হ্যাঁ, কিন্তু তাতে ভালমন্দ দুই-ই ঘটে ভাই!—যাক্ করুর ওপরও তারই ধাক্কা চল্‌ছে কি মা জননীর? ওটা বড্ড ভীতু ভাল মানুষ মেয়েরে, মীরা, ওকে—"

"নাগো বাপু, তোমার 'ভাল মানুষ' খুকি মেয়েকে কিছু বলিনি! আয় তো ইলুদি করুদি, এস একটু খেলার চেষ্টা করতে হবে! এমন বিরক্ত ধ'রে যাচ্ছে! আয়না করুদি,—বল্‌ছি!"

অরুন্ধতী হাসিয়া বলিলেন, "কে বল্‌বে যে ক'রু মীরার বড়। কি ভাগ্যি যে 'দিদি' বলিস্ বাছা।"

"তোমাদেরই ভয়ে! নৈলে ও কিসে বড়? দেখ্‌তে, না শুন্‌তে, না জোরে? নে ইলুদি যাবি, না, যাবিনা?"

তাহাদের বাধা দিয়া অরুন্ধতী বলিলেন "মীরা, বাবা এই সময়ে শুয়ে আছেন, যা তাঁর কাছে গিয়ে একটু বস্‌গে—গল্প করগে।"

মীরা আবার ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "যে তোমার বাবা। আজ ক'দিন এসেছি, ভাল করে কথাই কচ্চেন না আমার সঙ্গে! মুখ হেঁট করে থাকেন, যেন আমার মুখই দেখবেন না! কি গল্প কর্‌ব বাপু—হয়ত প্রথম দিনের মত কথাই কবেন না! বাবাঃ, কদ্দিন পরে এলাম, তা সেদিন একেবারে কথাই কইলেন না আমার সঙ্গে। বরং নিজের বৌমাটির সঙ্গে একটু 'না' 'হু' কর্‌লেন, প্রণাম কর্‌লে মার মাথায় হাতও দিলেন দেখ্‌লাম, কিন্তু আমার বেলায় কিচ্ছু না! আমি যাবনা তোমাদের বাবার কাছে;—তোমাদের বাবা তোমাদেরই থাকুন।"

অরুন্ধতী বেদনা-বিদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন "নারে পাগ্‌লি যা, তিনি যে তোর সঙ্গে কেন কথা কইতে পারেন না, তা কি বুঝতে পারিস্ নে? তুই কি ছোট বৌ কাছে গেলে তিনি যে কতটা অস্থির হয়ে পড়েন, কি করে তাঁর হাত পা কাঁপতে থাকে, তাকি দেখ্‌তে পাসনা? কিছু মনে পড়েনা কি তোর ছোট বেলার কথা? তুইযে ওঁর গলার হাড় ছিলি মীরা।"

"কেন মনে পড়বেনা? কিন্তু এখন কি তিনি তোমাদের দেশের কনে বৌ হয়েছেন যে, চোকবুঁজে মীরার কাঁধে হাত দিয়া—"

ইলা এইবার অসহিষ্ণুভাবে তাহাকে যেন একটু নাড়া দিয়াই মৃদুস্বরে বলিল, "কি বক্‌ছিস্ পাগলের মত মীরা! যা—না!"

সরস্বতীও বলিলেন, "হ্যাঁ যা মীরা, বড় হচ্চিস্ এখন, একটু বুদ্ধি ধর্‌তে শেখ, সব জায়গাতেই যা মনে আস্‌বে তাই ব'লে বকিস্ না।"

মীরা, একটু অপ্রস্তুত হইয়াও পূর্ব্ব সুর বজায় রাখিয়া জেঠিমার পানে চাহিয়া বলিল, "হুঁ উনি হয়ত বইয়ের মধ্যে মুখ গুঁজে প'ড়ে থাকবেন, আমি তখন একা কি কর্‌ব? করুণি চলুক আমার সঙ্গে তবে।"

জেঠিমা তখন সস্নেহে বলিলেন, "গিয়ে 'দাদু' ব'লে ডেকে কাছে বস্‌বি, জোর ক'রে কথা কওয়াবি। করু যাক্ না যাক্ তোর একা যেতে এত লজ্জাটা কিসের শুনি? কনে হয়ে যে তুইই এসেছিস্ বাছা—নৈলে নিজের 'দাদু'র কাছেও লজ্জা?"

সনৎ হাততালি দিয়া "খুব হয়েছে কেমন জব্দ" বলিয়া মীরার পানে চাহিয়া হাসিতেই মীরা ভাইয়ের সঙ্গে রীতিমত কলহেরই সূত্রপাত করিয়া বসিল, "কি আমার সাধু ব্যক্তি গো! বলে

দেব নাকি সবাইকে সাহসের কথা! 'বিশ্বম্ভর ঠাকুর্দ্দা ঠাকুর'—কে দাদুর নাম রেখেছে? তাঁর সুমুখে গিয়ে দাঁড়াতে হ'লে একটুপরে যেন শীত লেগে ওঠে কে বলে? অরুণ দাদাই নাকি তার—"

এইবার অসহিষ্ণু ভাবে ভগ্নীকে বাধা দিয়া সনৎ বলিয়া উঠিল "এইবার চুপ্‌কর্ হনুমানি, নিশ্চয় উল্টো পাল্টা ক'রে বলে ফেলবি। অরুণ-দাদার মত ধৈর্য্য আর গুরুজনকে মান্য দেবার ক্ষমতা আমার যে নেই, সে কথা মা কাকিমা বহুদিনই জানেন।"

"তবে আমারও নাহয় করু'দি'র মত সাহস নেই যে, একেবারে চুপ্‌ক'রে তাঁর পায়ের গোড়ায় বসে পড়ে দুই হাতে পা টেনে নেব, আমিই বা সেকথা বল্‌তে ডরাব কেন শুনি?"

মীরার এই অপূর্ব্ব বীরত্বের কথা শুনিয়া সকলেই হাসিয়া ফেলিল। জেঠিমা হাসিমুখেই আবার বলিলেন, "কিন্তু একদিন তাঁর বুকে বসে মাথার চুল টান্‌তে তোরই সাহস ছিল, বরং সনতের ছিলনা, তা মনে আছে? সেই ভয়টী সনৎ চিরদিনই রাখ্‌লে, ওঁকে কখনই বুঝলে না!" অরুন্ধতী অলক্ষ্যে যেন একটু নিঃশ্বাস ফেলিয়াই চুপ করিলেন।

"জেঠিমা"—বাহির হইতে অরুণের এই ডাকে সচকিত হইয়া সনৎ ডাকিল—"ওকি অরুণ দা ঘরে এসনা, তুমি অত দূরে দূরে থাক কেন বলত! নাঃ—তুমিও চিরদিনই এক সমান রইলে। দাদা মশায়টি ছাড়া আর কারু সঙ্গেই তোমার খাপ খেলেনা।"

জেঠিমা ডাকিলেন "ঘরে আয় অরুণ, কি বলবি বল।"

সরস্বতীও উচিত বোধে বড়জায়ের ডাকের সমর্থন করিলেন "এসনা বাছা, এরাতো তোমাদের বোনেরই মত! আমাদের সহরের ছেলেদের কিন্তু এ বিষয়ে খুব সহজ সপ্রতিভ ভাব! মেয়ে ছেলে হয়ে তুমি এদের লজ্জা কর্‌লে ওরাও যে তোমায় লজ্জা কর্‌বে। করুণার দাদা তুমি—এদেরও দাদা যে।"

সকলের যুগপৎ আহ্বানে অগত্যা অরুণ কোনরূপে গৃহ দ্বারের মধ্যে নিজেকে প্রবেশ করাইয়া এক পাশে দাঁড়াইল, এবং ডাকাডাকির ব্যাপারে সে যে কাজে আসিয়াছিল তাহার প্রায় সবই ভুলই হইয়া গেল।

মীরার কিন্তু এ সব আর ভাল লাগিল না। সে তাহাদের পূর্ব্বের কথার জের্ টানিয়া বলিল "দাদা তোমার অপবাদটা আমিই এবার মোচন করে দিচ্চি ত্যাখ। আমি গিয়েই কিন্তু তোর কাঁচা চুল যা আছে উপড়ে দেব—তা আগেই বলে রাখছি জেঠিমা! থাক'গো মামীমা তোমায় আর আমার সাহায্য দিতে যেতে হবে না।" বাল কলকণ্ঠের ঝঙ্কার দিয়া মীরা সেখান হইতে এইবার প্রস্থান করিল, তাহার নিবারণে করুণাও আর কোন চেষ্টা করিলনা; আর অরুণ আসার পরই এখনি উঠিয়া যাওয়াটা শোভন হইবেনা ভাবিয়া ইলা ও করুণার পার্শ্বে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।

অরুন্ধতী মীরার উদ্দেশ্যে সস্নেহে বলিলেন, "এখনো তেমনি 'কথাখি' আছে, দুষ্টুমি বরং আরও বেড়েছে! সকলেরই সমান আদর পেত কিনা এতদিন, ঠাকুর দাদার অভাব তো জানেনি।"

সরস্বতীর মুখটা একটু যেন আঁধার হইয়া আসিল। ঔদাস্য ভরা কণ্ঠে বলিলেন "হ্যাঁ—ঐ সব অকেজো আদরে মেয়ের স্বভাবটি এমনি হ'য়ে উঠেছে, কিন্তু এখন যে কে এ অভিমান রাখ্‌বে তার ঠিক্ নেই।"

অরুন্ধতী সরস্বতীর সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে বুঝিয়াছিলেন যে, সরস্বতী মৃত পিতার উপরে অনেকখানিই অনুযোগ নিজের মনের মধ্যে বহন করিতেছেন এবং ভ্রাতার উপরেও তাঁহার তেমন প্রসন্ন ভাব নাই। পিতা ভ্রাতা বিধবা কন্যা বা ভগিনীর তেমন স্বতন্ত্র কোন ব্যবস্থা করেন নাই বলিয়াই বোধ হয় সরস্বতীর এ মনোভঙ্গ হইয়াছে, অরুন্ধতী এইরূপ সন্দেহ করিয়াছিলেন। এইবার তাঁহার কথায় সে সন্দেহ দূরীভূত হইল। তিনি উত্তর দিলেন "কেন ও দুঃখ করিস্ ছোট বৌ! বাবা যতদিন আছেন সনৎ আর মীরার কিসের অভাব? ওরা ছাড়া তাঁরই বা আর কে আছে?"

সরস্বতী একথার কোন উত্তর না দিয়া একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "এইবার আমরা যাই দিদি, আর কতদিন থাক্‌ব।"

অরুন্ধতী অনেকখানি বিস্ময় ও বেদনার সঙ্গে জায়ের দিকে চাহিলে সে দৃষ্টির সম্মুখে মীরার মা চোখ নামাইতে বাধ্য হইলেন। গাঢ়স্বরে বলিলেন, "তোমায় আমি জানি দিদি, ভাসুরে আর তোমাতে যে প্রভেদ নেই—সনৎ মীরা যে তোমাদের একই—তা জানি। মীরার ভাগ্য বড় মন্দ তাই অমন জেঠাও যে হারালো।

"তবে আর কার অনাদরের ভয় কচ্চিস্ ছোটবৌ? বাবার? ওরে, এইই আমার সব চেয়ে দুঃখ। আমায় বরং যা খুসি মনে কর তোদের তাতে কিছু হবেনা, কিন্তু এই পাপটা আর করিস্‌না, মীরার তাতে মঙ্গল হবেনা, ছোটবৌ। ওকে তার দাদুর কোলে এখনো ফিরিয়ে দে।"

"কিন্তু দিদি ওকে তো এখানে রাখ্‌লে চল্‌বেনা, পড়া শোনা তো ছাড়াতে পারব না আস্‌ছে বারে পাশ দেবে মীরা, তা তো জানো? সনৎ কি তাঁর ঘরে ব'সে থাকে? তাকেও পড়তে দূরে পাঠাতে হয়। মীরাও দূরে থাক্‌লে যদি তাঁর কোলে থাকা নাহয় তাহলে আর কি কর্‌ব বল!"

"হাঁরে মীরা চোদ্দ বছরেরটী হ'য়েছে তা মনে আছে ত? তার কি বিয়ে দিবিনে? তার বিয়ে আর করুর বিয়ে যে এইবার দিতেই হবে, নৈলে সমাজে বাবা মুখ দেখাতে পারছেন না যে!"

খুড়িকে উত্তর দিতে না দিয়া সনৎ তাড়াতাড়ি মায়ের নিকটে সরিয়া গিয়া বলিল "তা বুঝি শোননি মা? মীরা তো বিয়ে কর্‌বেনা! ওদেরও ছোট্ট একটি সমিতি হয়েছে! মীরা, ইলা সেই সভার সভ্য। ওরা বড় হ'য়ে দেশের কাজ কর্‌বে—বিয়ে করবেনা, এই প্রতিজ্ঞা করেছে।"

এতক্ষণ ধরিয়া ইহাদের ঘরোয়া সুখদুঃখের কথার মধ্যে বসিয়া থাকিতে ইলার যথেষ্টই সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল, কিন্তু করুণকে যে ভাবে ইঁহারা অনুরোধ করিয়া সে ঘরে ডাকিয়া আনিলেন তাহাতে উঠিতেও কুণ্ঠা আসিতেছিল। এইবারে করুণা উঠিয়া দাঁড়াইতেই সেই সুযোগে ইলাও উঠিয়া পড়িল। তাহাদের উঠিতে দেখিয়া সনৎ বলিল, "এই যাঃ, এরা যে এখানে ছিল তা আমার খেয়ালেই আসেনি। এখনি মীরাকে নালিশ ক'রে দিয়ে আমার মুণ্ডুটি খাবে দেখ্‌ছি। চলতো করুণদাদা, আমরাও এইবার পালাই, নৈলে মীরি আমার দফা সার্‌বে।"

অরুন্ধতী বাধা দিয়া বলিলেন, "ছাখ সনৎ কাজের কথার সময় এরকম করে পালালে চল্‌বে না, বস্ বল্‌ছি। অরুণ বস্ বাবা। এখন তোমরা বড় হয়েছ—সংসারের ভাবনার অংশ না নিলে চল্‌বে কেন! আজ একথার একটু শেষ হয়ে যাক, যাতে আমি বাবাকেও শেষ কথা বল্‌তে পারি।"

"তবে ওদেরও বস্‌তে বল মা, 'যার বিয়ে তার মনে নেই পড়সীর ঘুম নেই' হ'তে পারেনা, করুণা পালাতে পাবে কেন? ওতো আর 'বঙ্গ বালিকা সমিতি'র সভ্য নয়?" সনতের এই কথায় চলিয়া যাইতে যাইতেও ইলা একবার তাহার পানে চাহিয়া অন্যের অলক্ষ্যে একটু যেন ভ্রুকুটি করিয়া গেল, কিন্তু করুণার পাণ্ডু মুখচ্ছবি একবারও উন্নমিত হইল না, সে একভাবেই নতমুখে চলিয়া যায় দেখিয়া সনৎ এবার লাফাইয়া উঠিয়া দ্বার রোধ করিল, বলিল, "বাঃ তবু পালানো হচ্চে? ছাখ মা, ছাখ।"

অরুন্ধতী গম্ভীর মুখে বলিলেন "কি করিস্ সনৎ, পথ ছাড়! কেন ওকে কষ্ট দিচ্চিস্?"

"কষ্ট দিচ্চি না—ও যদি বুঝ্‌তে পারে তো বুঝবে ওর ভবিষ্যতের অনেক কষ্ট কমাতেই বল্‌ছি, তাতেই তো থাক্‌তে বল্‌ছি ওকে মা, মীরাকেও ডাক্‌ছি এখন।"

"তুমি যা বল্‌বে তা বুঝেছি মণ্টু! করুণাকেও তোমাদের সেই বঙ্গবালিকা সমিতির সভ্য কর্‌তে চাচ্চ তো? যাতে ওরও বিয়ে না দেওয়া হয় সেই পরামর্শ দেবেত? যা বল্‌বি তা আমাকেই বাপু, ওর রাস্তা ছেড়ে দে।"

"বাঃ, তোমরাই বুঝি ওর ভবিষ্যতেরও হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা—তাই ওর কথা ওই শুন্‌বে না শুন্‌বে তোমরা?"

"হ্যাঁ, চোদ্দ পনের বছরের মেয়ে ওরা—ওদের ভবিষ্যতের ভাবনা—ওরা তোদের যা দেখি যতই সমিতি করুক এখনো ভেবে উঠ্‌তে পারবে না, সেটা আমরাই ভাব্‌বো। ঘাড় পাজী, মেয়েটা যে গেল!"

মাতাকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া সনৎ করুণার দিকে চাহিয়া দেখিল সত্যই সে 'বার' উপক্রমই হইয়া উঠিয়াছে বটে! পাশের দেওয়ালে ভর না দিলে বোধহয় সে কম্পিত ও ক্ষীণ তনুটি মাটিতেই পড়িয়া যাইত। ঈষৎ অপ্রস্তুত হইয়া ও যেন

একটু লজ্জা পাইয়া সনৎ দুয়ারের সম্মুখ হইতে সরিয়া দাঁড়াইল এবং নিস্পন্দ অরুণের পানে চাহিয়া বলিল, "অরুণদা তুমিও যে এদের দলভুক্ত হয়ে চিরদিন রহিলে এই বড় দুঃখ। করু'র মত তুমিও বোধ হয় খুব বিরক্ত হয়ে উঠেছ আমার উপরে—না ?—যে অনর্থক এটা এমন অনধিকার চর্চ্চা কেন করে !"

শ্বেতপাথরের মূর্ত্তির মত অরুণ এতক্ষণ মাত্র সনতের এইকথা শুনিতেছিল এবং তাহার কাণ্ড চাহিয়া দেখিতেছিল। এইবার যেন সচেতন হইয়া কেমন একরকম অর্দ্ধ উদাস অর্দ্ধ ক্ষোভের সুরে বলিয়া উঠিল, "না ভাই, অধিকার তোমার পুরাই আছে। কিন্তু ঐ যা বলেছ অনর্থক,—সবই অনর্থক।"

সনৎ তখন তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল "কিসে অনর্থক ? যা বলেছি যদি বুঝ্‌তে ইচ্ছা কর সবই সার্থক, আর যদি গতানুগতিকের গড্ডালিকা স্রোতে ভেসে যেতে চাও, এক একটা জীবনের দাম যদি কিছুমাত্র না বুঝে এই ভাবেই তাদের নষ্ট হতে দাও, তা'হলে অবশ্য অন্য কথা !"

"হ্যাঁ মণ্টু, ঠিক্ তাই—এ অন্য কথাই বটে !"

সনৎ আবার সতেজে অরুণের এই মৃদু সংক্ষিপ্ত উক্তির অর্থ না বুঝিয়া প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিল—সহসা মাতার ঈষৎ যেন বিরক্তিভরা আদেশের সুর শুনিয়া করুণার দিকে ফিরিয়া দেখিল সে দেওয়ালের গায়ে হেলান দিয়া তাহার সেই আনত পাংশু মুখ তুলিয়া একদৃষ্টে সনতের পানে চাহিয়া আছে। নিষ্প্রভ করুণ চক্ষু দুটি তাহার যেন কোথা হইতে একটা আলোকের আভা পাইয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, গণ্ডে অধরোষ্ঠে একটা লোহিত রাগ ধীরে ধীরে যেন জাগিয়া উঠিতেছে ! স্তব্ধভাবে সে সনতের পানে চাহিয়া তাহার কথাগুলি যেন সমস্ত দেহ মন দিয়া পান করিতেছিল দেখিয়া অরুন্ধতী বলিলেন "করু—তোমায় মীরা যে অনেকক্ষণ ডেকে গেছে, কি শুন্‌ছ তুমি ওদের কথা ? যাওনা !"

মুহূর্ত্তে যেন একটা দম্‌কা বাতাসে প্রদীপ নিভিয়া গিয়া সব আলো কোথায় লুপ্ত হইয়া গেল। করুণা একবার চমকিয়া উঠিয়া তখনি মুখ নীচু করিয়া নিঃশব্দে সে গৃহ ত্যাগ করিল কিন্তু সেই সময়ের সেই আলো নিভিবার দৃষ্টিটা সনতের সঙ্গে একবার বিনিময় হইয়াই নিভিল। মাতার এই বিরক্তিতেই কিম্বা কিসে যে সনৎ একটু ব্যথা পাইল তাহা স্পষ্ট সে বুঝিতে পারিল না। কিন্তু সেই আঘাতটুকুতেই মার কাজের প্রতিবাদ করিতে গিয়া সহসা তখনি যেন তাহার মুখে আর কথা জোগাইল না।

অরুন্ধতী জায়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ওর কথাতো কিছুকাল হতেই শুনে আস্‌ছি—এখন তোর মুখে শুনি ছোটবৌ এইবার, ব্যাপারটা কি ! ওদের কথা—সমিতির কথা—প্রতিজ্ঞার কথা বাদ্‌দে, কেবল তোর কথাটুকু মাত্র আমি শুন্‌তে চাই ! মীরার বিয়ে কি দিবিনে সত্যই ?"

সরস্বতী এতক্ষণ সনতের দ্বারা নিজের বক্তব্যটা প্রকাশ পাইবার এবং স্নেহময়ী জায়ের সহিত মতের অনৈক্যের অপ্রিয় ঘটনাটা পাশ কাটাইয়া ফেলিবার সুযোগ পাইয়া নীরবেই ছিলেন, এখন তাঁহার হাত হইতে নিস্তার না পাইয়া অগত্যা উত্তর দিতে বাধ্য হইলেন। কুণ্ঠিতস্বরে বলিলেন "বিয়ে দেবনা তাকি বল্‌তে পারি দিদি—তবে ভাল পাত্র হওয়া চাই। যতদিন তা না পাব ততদিন মেয়ে যত বড়ই হোক্ না কেন তাতে ডরাব না ! আর তাও বলি দিদি, মেয়েগুলো একটু লেখাপড়া শিখ্‌ছে, জ্ঞান বুদ্ধি হচ্চে,—এ ভাল না মন্দ ? বিয়েতো হবেই, যতটা লেখাপড়া কর্‌তে পারে তার আগে ক'রে নিক্ ! হোক্ না আর একটু বয়স—দু একটা পাশ দিক্ ! ইলা এইবারে ম্যাট্রিক্ দিয়েছে জান দিদি ? ও যেমন মেয়ে বোধ হয় জলপানিও পাবে। ক্লাশের মধ্যে বরাবর প্রথম থাকে। ওর সঙ্গেতেই মীরা এত শীগ্‌গির এতটা এগুতে পেরেছে। এখানেতো সাত ক্লাস পর্য্যন্ত——"

অরুন্ধতী জায়ের কথায় বাধা দিয়া অসহিষ্ণুভাবে বলিলেন "যাক্ এত লোকের সঙ্গে ছেলেদের আলাপ পরিচয়, জানা শোনা, এমন কোন স্বজাতি স্বশ্রেণীর ছেলে কি দেখনি যাকে মেয়ে দিতে পারা যায় ? কোন ছেলেকেই কি পছন্দ হয়নি ?"

"কই আর তা দেখেছি ! পরীক্ষাটা আস্‌ছে বার দেক্ দিদি মীরা, তার পরে বিয়ের কথা ! তুমি কেন ভাব্‌ছ, কলকাতায় এখন আমাদের শ্রেণীরও বড় বড় মেয়ে কত ঘরেই দেখলাম—এখন আর ওতে হাত যাবে না ! আর তা গেলেও আমি তা মান্‌ব না ! কেন মীরার জেঠামশায়ও তো এতে কোন অমত করেননি. আমার তো ঐ একটি বৈ মেয়ে নয় ! ওকে আমি পড়াব, পাশ দেওয়ার এ সাধ আমার চিরদিনের, তা তো জান ?"

"তা জানি—কিন্তু বাবার মুখও তো একটু চাইতে হবে ভাই ! তিনি মীরার বিয়ে দিতে রাজি হচ্ছেন না ব'লে করু'র পর্য্যন্ত বিয়ে দেন্‌নি ! গ্রামে সেজন্য কত বলে সকলে ওঁকে ! আর ওঁর মনে কষ্ট করাস্‌নে ভাই।"

"তা তোমরা করু'র বিয়ে দাওনা—তার জন্য বাধা কি ! সত্যি সত্যি করুতো মীরার সহোদর বোন্ নয় যে তাদের বিয়ে না দিলে ওর বিয়ে হবেনা ! আমরা যত দেরীই করি, না কেন, ওকে যত বড়ই করি না কেন, তাতে করুণার বিয়ের বাধা কি ! অরুণ তার জোগাড় করুক না।" বলিয়া সরস্বতী অরুণের দিকে ঈষৎ রূঢ়দৃষ্টিতে চাহিলেন। অরুণ অগত্যা মৃদুস্বরে কহিল, "হ্যাঁ তাই ঠিক্ করা যাচ্চে।"

সরস্বতী কৌতূহলী হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "ঠিক্ হচ্চে নাকি ? তাই বল দিদি ! তা'হলে কি যেতে পারি ! করুর বিয়েটা হ'য়ে যাক্—দেখেই না হয় যাব, কি বলিস্ সনৎ ? তা হ্যাঁ পাত্র কোথাকার ?"

"এই গ্রামেরই।"

"এই গ্রামের ? এই গ্রামে মেয়ে দেবার মত এমন পাত্র কে আছে। আছে নাকি কেউ?"

"করুণার মত মেয়েকে দেবার মত আছে বৈকি!"

মায়ের কণ্ঠস্বর এবং মুখের আকৃতি দেখিয়া সনৎও কৌতূহলী হইয়া উঠিল। বিস্মিতও হইতেছিল! এ গ্রামে কন্যাদানের মত পাত্র কে কোথায় এমন আছে? বলিল "কোন্ পাত্র কার সঙ্গে তোমরা করু'র বিয়ে ঠিক্ কর্‌ছ শুনি?

মা উত্তর দিলেন "নকড়ি ভট্‌চাযের ছেলে অবিনাশ—তারই সঙ্গে।"

"মা," অত্যুগ্র বিস্ময়ে সনৎ যেন চমকিয়া উঠিল! "তুমি বল কি! তোমরা কি বিয়ে বিয়ে ক'রে ক্ষেপেই গেছ একেবারে? নকড়ি ভট্‌চাযের ছেলে? সেই আধ্ পাগ্‌লা—খেড়ে গেঁজেল লোকটা? কে এ সম্বন্ধ কর্‌লো শুনি?"

"অরুণ—করুণার দাদা!"

"অরুণদা! মা বল্‌ছেন তাই এ প্রশ্নও তোমায় করছি, এ কি সত্যি?"

অরুণ একটু স্তব্ধভাবে অরুন্ধতীর মুখপানে চাহিয়াছিল! জেঠিমার সেদিনের কথাগুলা মনে পড়িয়া আজিকার কথার সঙ্গে তাহার সামঞ্জস্যও সে করিতে পারিতেছিল না, তথাপি—সনতের কথার উত্তরে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "হ্যাঁ—সত্যি।"

ক্রমশঃ

শ্রীনিরুপমা দেবী

সত্য

আঁধারের কুহেলিকা ছিন্ন করে দিয়ে
চাইব আমি সত্যসূর্য্য পানে!
সেই হবে মোর সকল প্রাণের চাওয়া।
দুঃখ-শোক-ব্যথা-ভয়-জয়ী প্রাণ নিয়ে
গাইব আমি আনন্দেরি গানে;—
সেই ত আমার মুক্তকণ্ঠে গাওয়া!

শ্রীসুনীতি দেবী

"নাসিক"-দৃশ্যাবলী

("কলিকাতা রিভিউ"-র সৌজন্যে)

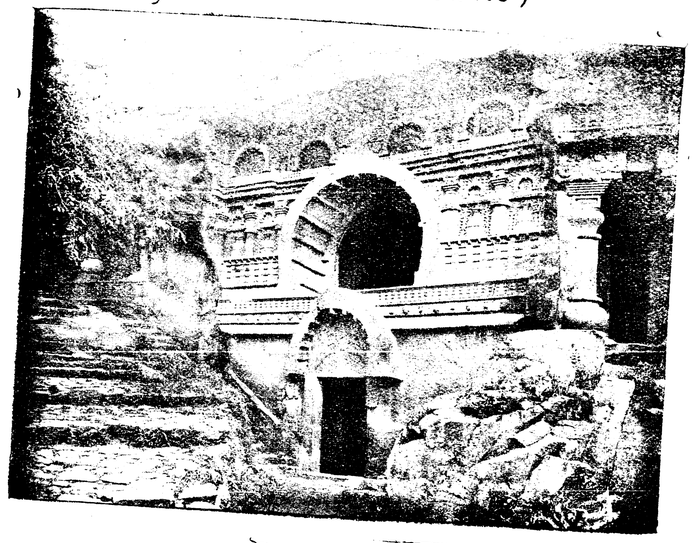

চৈত্যগুহার সম্মুখদৃশ্য

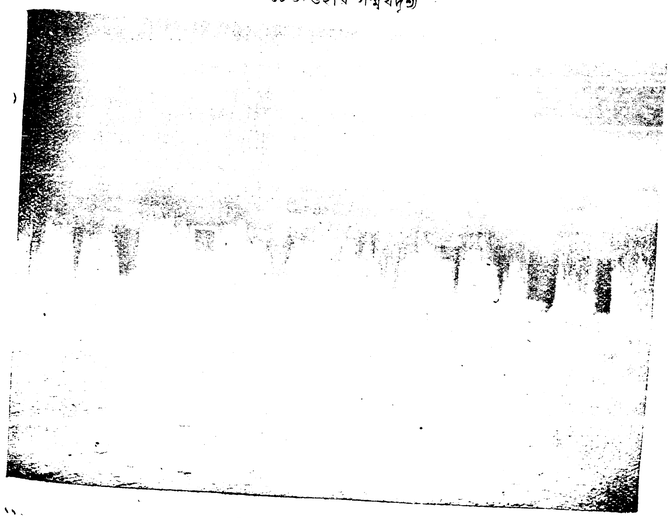

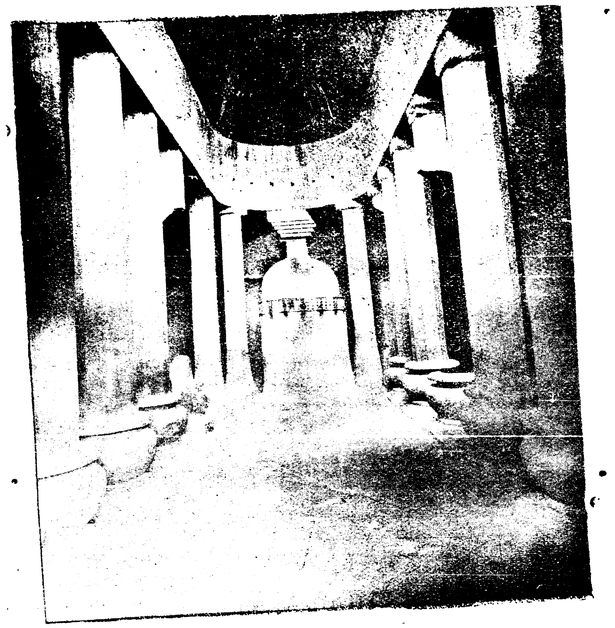

চৈত্যগুহার অভ্যন্তর

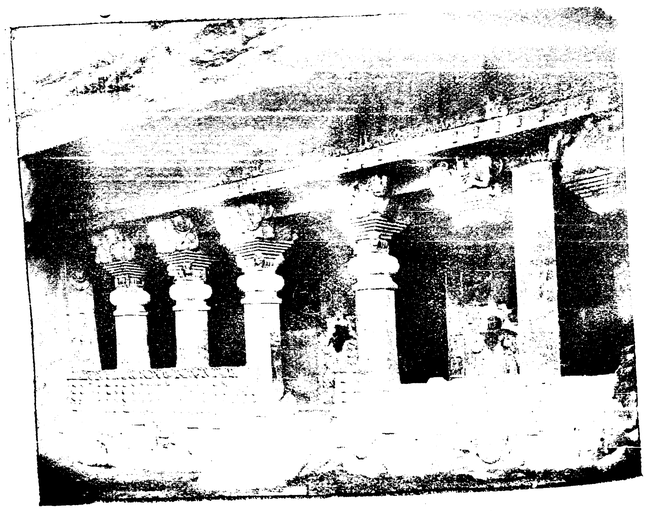

বুদ্ধ ও পরিচারকগণ

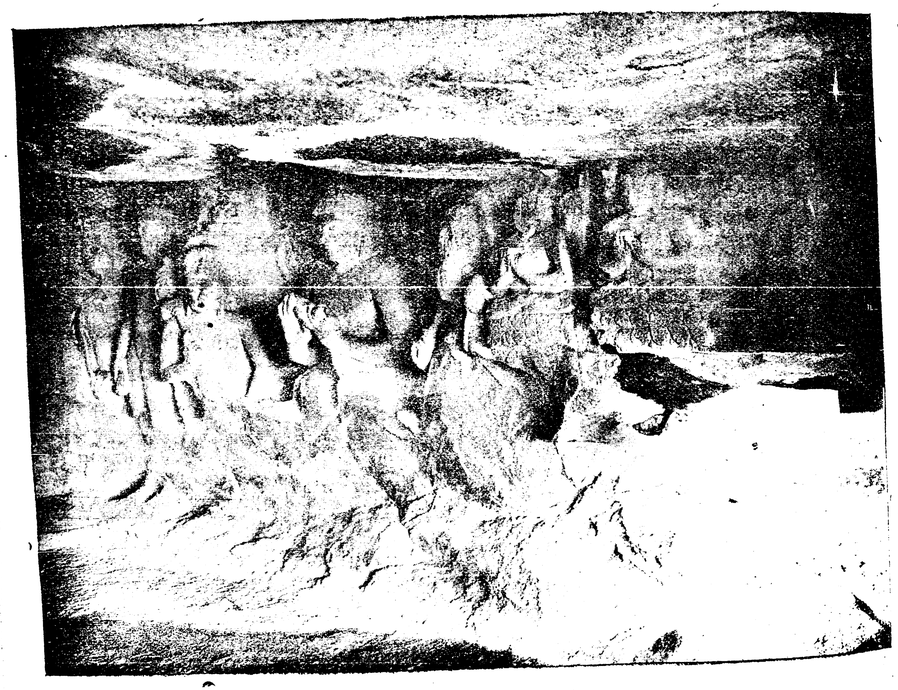

১৭নং গুহার অভ্যন্তর

বুড়ার নবযৌবন

অনেকে সংবাদ পাইয়াছেন যে সম্প্রতি এমন একটি উপায় বাহির হইয়াছে যাহাতে বুড়ার নব যৌবন ফিরাইয়া দেওয়া যাইতে পারিবে। কিন্তু প্রকৃত কথাটী কি তাহা এদেশের অনেকেই ভাল বুঝিতে পারিতেছেন না—কেবল কল্পনায় নানা কথা ভাবিয়া লইতেছেন।

বার্দ্ধক্যের জীর্ণ শীর্ণ শরীরে কি করিয়া যৌবনের শক্তি আবার কল্পনা করা যায়, তাহা বুঝিতে গেলে, কি করিয়া স্বাভাবিক কার্য্য প্রণালী চলিয়াছে, কি উপায়ে শিশুর শরীরে যৌবন দেখা দেয়, আবার যৌবনের শক্তি ও উদ্যম বার্দ্ধক্যে শুকাইয়া যায়, তাহা ভাল করিয়া বোঝা দরকার। নব যৌবন দিতে গেলে যে নিয়মে জীবশরীরে স্বাভাবিক উপায়ে যৌবন আসে ঠিক সেই নিয়ম অবলম্বন করিতে হইবে; কোন নূতন বা কৃত্রিম উপায় ধরিলে চলিবে না। জগতের কোন ব্যাপারই,—সে ছোট বা সামান্য হোক না কেন,—প্রকৃতির নিয়ম ব্যতীত অন্য কোন নিয়মে চলে না। বৈজ্ঞানিকেরা কেবল স্বাভাবিক নিয়ম ও কার্য্য প্রণালী ধরিয়াই নিজেদের অনুষ্ঠেয় কাজ করিতে পারেন। কথাগুলি বলার উদ্দেশ্য এই যে, শরীরের অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন করিতে গেলে তাহার উপায় শরীরের মধ্যেই খুঁজিতে হইবে,—বাহিরে তাহার সন্ধান মিলিবে না। শরীর-তত্ত্ব-বিদ্ পণ্ডিতেরা (Physiologists) শরীরের ক্রিয়াদির অনেক সন্ধান পাইয়াছেন। কিন্তু এখনও জানিবার বিষয় আছে অনেক।

প্রথম জ্ঞাতব্য বিষয় এই,—জীবের শরীর অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষের (cell) সমষ্টি, আর সেই কোষ গুলি এত ক্ষুদ্র যে, অণুবীক্ষণ দিয়া দেখিতে হয়। শরীরের প্রত্যেক অংশ হাড়, রক্ত, মাংস, মস্তিষ্ক, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমস্তই ঐ কোষেরই সমষ্টি। তবে শরীরের যন্ত্র (organs) গুলির প্রভেদে ও ক্রিয়ার (function) ভেদে কোষগুলি ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয়। একটু সূক্ষ্মভাবে দেখিতে গেলে এই কোষের মধ্যেই সারা শরীরের ক্রিয়ার খোঁজ লইতে হয়।

অ্যামিবা (amœba) নামে এমন ছোট জীব আছে যাহার সমগ্র শরীরটি একটি মাত্র কোষে গড়া এবং তাহাতে কোন জটিলতা নাই। তাহার খাওয়া দাওয়া, শ্বাস লওয়া, বাড়া, রক্ষা ও বংশ বৃদ্ধি করা প্রভৃতি সমস্তই ঐ একটি মাত্র কোষের মধ্যে চলিয়াছে। অ্যামিবা অপেক্ষা যাহারা উন্নত জীব, তাহাদের শরীর জটিল হইতে জটিলতর; উহাদের শরীর একাধিক কোষের যোগে গড়া। জীবেরা যত উন্নত ততই কোষের সংখ্যা অধিক; অঙ্গ প্রত্যঙ্গও অধিক। অ্যামিবার শরীরে এক কোষে যে কাজ হয়, তাহা অন্য জীবের শরীরে বহু কোষে হইয়া থাকে। এক কোষের কাজ যেন বহু কোষে ভাগ করিয়া লইয়াছে। উন্নত জীব অর্থই হইল এই যে তার শরীরে বহু কোষ আছে ও কোষগুলির ক্রিয়ার বিভাগ বাড়িয়াছে; যে জীব যত উন্নত তার শরীর তত জটিল ও তাহার অঙ্গাদিতে ক্রিয়ার বিভাগ অতি স্পষ্ট; নাকের কাজ কাণে

করে না, চোখের কাজ মুখে করে না। এখানে প্রত্যেক অঙ্গ, কেবল অঙ্গ কেন, প্রত্যেক কোষ নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট কাজ করিয়া সমস্ত শরীরটিকে চালাইতেছে। সকলগুলি অঙ্গ এমন ভাবে সম্বদ্ধ যে প্রতি অঙ্গের কাজে প্রতি অঙ্গের সাহায্যের প্রয়োজন হয়; এইরূপে সকল অঙ্গের এক জোটের কাজে শরীর চলিয়াছে। এক অঙ্গের বিকৃতিতে অন্য অঙ্গের ক্রিয়ার বাধা পড়ে। হাত পা ও পেটে ঝগড়া বাধিলে শরীর চলে না।

জীবেরা খায়, নিঃশ্বাস টানে, মল-মূত্র ত্যাগ করে, বংশ বাড়ায় ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সকল কাজের জন্য তাহাদের শরীরে নানা প্রকার যন্ত্র আছে। খাওয়ায় যে শরীরের পুষ্টি হয়, তাহার জন্য কাজ করে—মুখ, মুখের সহিত সংলগ্ন লালা নিঃসারণের গ্ল্যাণ্ড, (Salivary gland) খাদ্য যাইবার নালী, (ocsophagus) পাকস্থলী ও অন্ত্র। এই সকল যন্ত্রগুলির সঙ্গে কয়েকটি পরিপাক রস প্রস্তুত করিবার গ্ল্যাণ্ড আছে যথা—যকৃৎ (liver), Pancreas প্রভৃতি; শ্বাস লইবার জন্য আছে,—নাক, কণ্ঠনালী (Trachea) ও ফুস্‌ফুস্।

বাহ্য জগতের খবর লওয়ার জন্য আছে—চোখ, কাণ, নাক, জিভ ও ত্বক; এই সকল ইন্দ্রিয় স্নায়ুর বন্ধনে মস্তিষ্কের সঙ্গে আবদ্ধ হইয়া বাহিরের চেতনাকে জাগাইয়া তোলে; আবার অন্যদিকে মস্তিষ্ক হইতে অন্য স্নায়ু পথে যে সাড়া বহিয়া যায় তাহা শরীরের নানাস্থানে গিয়া পৌঁছায়।

শরীরের অনাবশ্যকীয় জিনিষগুলিকে বাহির করিয়া দিবার জন্য আছে মূত্রযন্ত্র (Kidney), মূত্রাশয় (Bladder) ও তাহার সংলগ্ন নালীগুলি।

শরীরের সর্ব্বত্র প্রত্যেক কোষের পুষ্টি ও ক্রিয়ার জন্য ও কোষগুলির পরিত্যক্ত পদার্থ বাহির করিয়া দিবার জন্য আছে—রক্ত ও রক্ত প্রবাহের নালীগুলি।

বংশ বৃদ্ধির জন্য স্ত্রী শরীরে আছে ovary ও গর্ভাশয়; পুরুষ শরীরে আছে মুস্ক।

উল্লিখিত যন্ত্রগুলির কথা অনেকদিন হইতেই জানা ছিল, কিন্তু শরীরের মধ্যে যে আরও কতকগুলি গ্ল্যাণ্ড বা রস প্রস্তুতকারী যন্ত্র আছে তাহাদের কথা বেশী দিন আগে লোকে ভাল জানিত না।

১৮৫৫ খৃঃ অঃ লণ্ডনের গাইস্ হাঁসপাতালের প্রধান অস্ত্র-চিকিৎসক (Surgeon) টমাস্ এডিসন (Thomas Addison) এক প্রকার রোগের বর্ণনায় বলিয়াছিলেন যে ঐ রোগে মৃত্যুর পর লোকটির শবচ্ছেদ করিয়া দেখা গেল যে, মূত্রযন্ত্রের (Kidney) উপরে সুপ্রারিনাল (Suprarenal) নামে যে গ্ল্যাণ্ড (Gland) টি আছে, তাহার সে দুটী বিকৃত। এ্যাডিসন্ তখন বুঝিতে পারেন নাই যে সেটা দৈবাৎ ঘটিয়াছিল না তাহার মরণের রোগে ঘটিয়াছিল। তবে তিনি বলিয়াছিলেন যে তাঁহার ধারণা এই যে সুপ্রারিনাল গ্ল্যাণ্ড হয় কোন দুর্লক্ষ্য নিয়মে প্লীহা (Spleen), থাইমাস্ (Thymus) ও থাইরয়েড (Thyroid) প্রভৃতি গ্ল্যাণ্ডএর সঙ্গে এক যোগে রক্তের পুষ্টি সাধন করে।

এক বৎসর পরে ফরাসী চিকিৎসক ও পণ্ডিত ব্রাউন-সিকারড্ (Browne-Sequard) গরুগোস, বিড়াল, কুকুর প্রভৃতি জন্তুর সুপ্রারিনাল অস্ত্র করিয়া বাহির করিয়া এ্যাডিসন এর বর্ণিত রোগের উৎপত্তি করান। এবং ইহাও দেখাইলেন যে এই রোগে রুগ্ন জন্তুর শরীরে যদি সুস্থ জন্তুর রক্ত প্রবেশ করান যায় তবে তাহার মৃত্যু পিছাইয়া দেওয়া যায়। কেবল যে এই গ্ল্যাণ্ডের অভাবে রোগ হয় তাহা নয়, ঐ গ্ল্যাণ্ডের রস রক্তে থাকিলে রোগের উপশমও হইতে পারে। এই বৎসরেই Frankfort-on-Main এ Maritz Schiff থাইরয়েড (Thyaoid) গ্ল্যাণ্ড কাটিয়া বাহির করিয়া দেখাইলেন যে তাহাতে শরীরের কার্য্যপ্রণালী বিকৃত হইয়াও ধনুষ্টঙ্কার ও তড়কা (Spasms, Convulsion) প্রভৃতি হইয়া মৃত্যু হয়, এবং ইহাও দেখাইলেন যে থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড থাইরয়েডহীন জন্তুর চামড়ার নীচে প্রোথিত করিলে, কিম্বা থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড সিদ্ধিয়া তাহার রস খাওয়াইলে কিম্বা থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডই খাওয়াইলে, এই বিকৃতি ও মৃত্যু নিবারণ করা যায়।

এডিসন ও ইঁহাদের অনেক আগে পণ্ডিতেরা নানারকম রোগের সঙ্গে এই সকল গ্ল্যাণ্ডের কথা বলিয়াছিলেন; কিন্তু যে ভাবে ইঁহারা ব্যাপারটী দেখিলেন, তাঁহারা সে ভাবে দেখেন নাই। প্রায় এই সময় হইতেই বৈজ্ঞানিকেরা এই সব গ্ল্যাণ্ডের কার্য্যপ্রণালী ও আবশ্যকতা জানিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এখনকার দিনে ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশে শারীরতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা প্রকৃতির এই আশ্চর্য্য লীলাক্ষেত্রের কথা জানিবার জন্য গবেষণাগারে ও রোগশয্যার পাশে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন। বিশ্বাস,—মানুষের অনেক রোগ জরা, শারীরিক এমন কি মানসিক বিকৃতি দূর করিবার উপায় ইহাতেই আবিষ্কৃত হইবে। এখন অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে আমাদের শরীরের মধ্যে যে গ্ল্যাণ্ডগুলি আছে সেগুলি যদি সুস্থ না থাকে, এবং তাহাদের রসের নির্য্যাসে শরীরকে পুষ্ট না করে, তবে নানারকম শারীরিক বিকৃতি লক্ষিত হয়, ও শরীরের ক্ষয় হয়। এই আভ্যন্তরীণ গ্ল্যাণ্ডগুলির (internaly secreting gland) কথা বুঝাইবার আগে, ইহাদের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

আমাদের শরীরে যে সকল গ্ল্যাণ্ড আছে সেগুলিতে রস জন্মে, আর সেই রস শরীরের প্রয়োজনে ঝরিতে থাকে, ও নূতন রস জন্মিতে থাকে। যকৃতের (liver) ভিতরে যে রস জন্মে, তা পিত্তনালী (bile-duct) দিয়া গন্তব্য পথে যায়; নালী আছে বলিয়া যকৃতাদি গ্ল্যাণ্ড "সনালী"। যে কতকগুলি গ্ল্যাণ্ড আছে, যাহাদের রস-নিঃসরণের নালী নাই। আমরা এই "নালীহীন" (duct-less) গ্ল্যাণ্ডের কথাই বলিব। এইগুলির রস নালী দিয়া না ঝরিয়া রক্তের সঙ্গে মিশিয়া শরীরের যে স্থানেই সঞ্চারিত হয়। রক্তের সঙ্গে রসের নির্য্যাস কি করিয়া মেলে তাহা বেশী বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। কারণ অঙ্গের সর্ব্বত্রই সঞ্চার হয় বলিয়া, এই রস রক্তে মিশিতে পারে।

নালীহীন গ্ল্যাণ্ডগুলি আয়তনে খুব ছোট, ও উহাদের রসের পরিমাণও অত্যন্ত অল্প। রস

অতি অল্প, কিন্তু সেই অল্প রস শরীরের উপর অতি অদ্ভুত কাজ করে, ও নানারকম শারীরিক পরিবর্ত্তন ঘটায়। নালীহীন গ্লাণ্ডের মধ্যে কতকগুলির কথা মোটামুটি ভাবে এইখানে বলিব।

গলায় দুটি থাইরয়েড গ্লাণ্ড আছে। এই গ্লাণ্ডের বিকৃতিতেই গলগণ্ড হয়। থাইরয়েড গ্লাণ্ডের সঙ্গে লগ্ন আরও চারিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্লাণ্ড আছে। যাহাদের নাম প্যারাথাইরয়েড গ্লাণ্ড (Para-thyroid-gland)। থাইরয়েড গ্লাণ্ড ও প্যারাথাইরয়েড গ্লাণ্ডের রসের ক্রিয়া স্বতন্ত্র।

মাথার খুলির মধ্যে নাকের পিছনের দিকে, ছোট হাড়ের কুঠারির মধ্যে মটরের আয়তনের পিটুইটারি (Pituitary) নামে গ্লাণ্ড আছে। এই গ্লাণ্ডটিকে পাতলা করিয়া কাটিয়া অনুবীক্ষণের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে ইহার মধ্যে তিনটি অংশ আছে,—একটি হইল সম্মুখের (anterior), আর একটি মাঝের (intermediate), আর একটী পিছনের (posterior)। এই তিনটি অংশেরই রসের ক্রিয়া বিভিন্ন।

মাথার খুলির মধ্যে আবার মস্তিষ্কের পিছন দিকে পিনিয়াল (Pineal) নামে আর একটি গ্লাণ্ড আছে। এটি আয়তনে পিটুইটারির অর্দ্ধেক। হৃৎযন্ত্রের একটু উপরে থাইমস (Thyms) গ্লাণ্ড আছে। এই গ্লাণ্ডটি শিশু অবস্থায় অপেক্ষাকৃত বড় থাকে, যৌবন বিকাশের সময় হইতে ধীরে ধীরে ছোট হইয়া যায়।

মূত্র যন্ত্র দুটির (Kidneys) উপর সুপ্রা-রিনাল নামে দুটি গ্লাণ্ড আছে। পাতলা করিয়া কাটিয়া অনুবীক্ষণের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে সুপ্রা-রিনালের দুইটি অংশ দেখা যায়। উহার বাহিরের দিকের অংশের নাম সুপ্রা-রিনাল-করটেক্স (Supra-renal-cortex) ও আবৃত ভাগের অংশের নাম মেডলা (Medulla)। এই দুই অংশের রসের ক্রিয়াও বিভিন্ন।

ওভারিতে (Ovary) কতকগুলি ডিম আছে, আর মুক্তে শুক্রাণু আছে। ডিম্বকোষের ও শুক্রাণুকোষের নাম করা হইল; ইহাদের সঙ্গেই অচ্ছেদ্যভাবে মিলিত আরও কতকগুলি পারিপার্শ্বিক কোষ আছে, যাহাদের রসের আভ্যন্তরীণ নির্য্যাসে ঐ কোষগুলির ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, ও শারীরিক এবং মানসিক নানাপ্রকার পরিবর্ত্তন সাধিত হয়।

আভ্যন্তরীণ রস প্রস্তুতকারী নালীহীন গ্লাণ্ডের কথা বলা হইল; আভ্যন্তরীণ রসের ক্রিয়ার কথা বলিবার আগে, তাহাদের সম্বন্ধে আরও দুই একটি কথা বলা আবশ্যক।

আভ্যন্তরীণ রস অনেকক্ষণ ধরিয়া ফুটাইলে তাহার কোন পরিবর্ত্তন হয় না। সেইজন্য নালীহীন গ্লাণ্ড জলের সঙ্গে মাড়িয়া বিশুদ্ধ (Sterilise) করা যায়। রস বিশুদ্ধ করা যায় বলিয়াই জীবের শরীরে অনুপ্রবিষ্ট (Inject) করা সম্ভব। এই রসগুলির মধ্যে কোন কোনটি মুহূর্ত্তের মধ্যে শরীরের উপর কাজ করে, আবার কোন কোনটির ক্রিয়ার ফল অনেক পরে দেখা

দেয়,—যেমন শরীরবৃদ্ধি ও তাহার পুষ্টি। রসের ক্রিয়ার তাড়নায় হয় শারীরিক কোষগুলির ক্রিয়া বাড়িয়া উঠে, নয় কমিয়া যায়। একটি জন্তুর শরীরের আভ্যন্তরীণ রসের ক্রিয়া যাহা, আর সব জন্তুর সেই রসের ক্রিয়া ঠিক্ সেইরূপই।

এই আভ্যন্তরীণ রস বাহিরের খাদ্য, আলো, বাতাসে সে পুষ্ট জীবের শরীরে থাকিয়া নানা উপায়ে তাহার সর্ব্বাঙ্গীণ পুষ্টি সাধন করিতেছে। শিশুর শরীরের কোষ ও অণ্ডগুলিকে শৈশব অবস্থায় রাখিয়া থাইমস গ্লাণ্ড তাহার বাড়িবার ও পুষ্ট করিবার উপায় করিয়া দিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে থাইরয়েড ও পিটিউটারি গ্লাণ্ডের রস ক্ষরিয়া আস্তে আস্তে শিশুর শরীরটিকে বাড়াইয়া ও শক্তি উৎপন্ন করাইয়া তাহাকে "বড়" করিয়া তুলিতেছে। ইহাদের বিকৃতিতে পনের বৎসর পরেও কেহ শিশুই রহিয়া গিয়াছে, তাহাও দেখা যায়। বাহিরের বিশুদ্ধ খাদ্য, বাতাস ও আলোর সঙ্গে ভিতরের নালীহীন গ্লাণ্ডগুলি মিলিয়া শিশুকে বাল্যের মধ্য দিয়া লইয়া, সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে পুষ্ট সবল করিয়া তুলিতেছে। এ পর্য্যন্ত বালক ও বালিকার মধ্যে শরীর ও মনের প্রভেদ কম। আশা ও আশঙ্কাহীন দিনগুলি খেলা, খাওয়া ও শিক্ষার মধ্য দিয়া কেবল বাড়াইয়া লইয়াই চলিয়াছে। কুঁড়িটি বেশ বড় হইয়াছে, এখন সে ফুটিবে। সম্মুখে যৌবন তাহাকে ফুটাইয়া তুলিয়া জীবন-সংগ্রামের পথে, জীবনের পূর্ণতা লাভের পথে চালাইয়া দিবে। আবশ্যক হইল মুক্তের পারিপার্শ্বিক কোষের ও রসের, আবশ্যক হইল ওভারির পারিপার্শ্বিক কোষের ও রসের, আবশ্যক হইল সুপ্রা-রিনালকরটেক্স ও পিনিয়াল গ্লাণ্ডের রসের। ইহারা সাড়া দিয়া উঠিল, বাড়িয়া উঠিল, নূতন করিয়া রস প্রস্তুত করিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে থাইরয়েড ও পিটুইটারি গ্লাণ্ডের কাজ বাড়িল। বালকের শক্তিতে (energy) ত আর যুবার চলে না। যে যাহার নিজের রসের ক্রিয়ার যৌবন ফুটাইয়া তুলিল। বালক হইল যুবা। তাহার গলার স্বর ভারি, মুখে গোঁফ দাড়ি, চোখে আর বালকের চাহনি নাই, তাহার মধ্যে আশা, উদ্যম, উচ্ছ্বাস ও উৎসাহের আলো জ্বলিতেছে। বালিকাও বয়ঃসন্ধিতে পূর্ণাঙ্গী যুবতী হইয়া, মাতার অবয়ব ও মাতার হৃদয় প্রাপ্ত হয়।

জীবন সংগ্রামের জন্যে নালীহীন গ্লাণ্ডগুলি আবশ্যক অনুপাতে কাজ করিয়া শরীরকে চালাইয়া লয়। যাহাদের কাজ কমিয়া যায় তাহারা আলস্যে ছোট হইয়া যায়। ক্রমে বয়সের সঙ্গে বয়ঃবিকাশের পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়া ইহারাও আস্তে আস্তে নিস্তেজ হইয়া পড়ে। যৌবনের উদ্যম শক্তি চলিয়া গিয়া, বার্দ্ধক্যের শিথিলতা আসিয়া পড়ে।

যে ভাবে মানুষ বাড়ে তাহার আভাস দিলাম; এ অবস্থায় কোন একটা "গ্লাণ্ড"-এর সংস্করণে শরীরের ক্রিয়া কতখানি পরিবর্ত্তিত হইতে পারে তাহা পরে বুঝাইব।

শ্রীবিজলীবিহারী সরকার

বর্ত্তমান বাঙ্গলার অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাসের এক অধ্যায়

এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে বঙ্গীয় গুপ্ত সমিতির কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে কিছু বর্ণনা করিতে চাই। সমিতি স্থাপনার আরম্ভ কালে একজন সভাপতি, দুইজন সহকারী সভাপতি ও একজন কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। অবশ্য ইঁহারা সকলেই ব্যারিষ্টার ও ধনাঢ্য শ্রেণীর লোক। ইঁহাদের নীচে ছাত্রদের লইয়া কার্য্য করিবার জন্য য...নিযুক্ত ছিলেন। যুবকদের ঘোড়া চড়া, প্রভৃতি শারীরিক ব্যায়াম শিক্ষা করাইবার জন্য অপার সার্কুলার রোডে এক ক্লাব স্থাপিত হয়। যে আত্মোন্নতি সমিতি ইহার অগ্রে সংস্থাপিত হইয়া কার্য্য করিতেছিল, সে সমিতিও ইহার সঙ্গে যোগদান করিয়াছিল। এই ঘটনা বোধ হয় ১৯০২ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হয়। প্রথম প্রবন্ধেই বলিয়াছি যে, বঙ্গে বৈপ্লবিক সমিতি স্থাপনের পূর্ব্ব সূচনায় দুইজন বৈদেশিকের প্রভাব বিস্তার ঘটিয়াছিল। তাঁহাদের একজন বোম্বাই প্রদেশ পর্য্যটনের কালে তৎস্থানে কোন বিশিষ্ট ভারতবাসীর সহিত পরিচিত হন। সেখানেও জনকতক মিলিয়া কার্য্য করিতেছিলেন। ইঁহারা নাকি মহারাষ্ট্র গুপ্ত সমিতির সভ্য। এই ভারতবাসী কলিকাতায় আসিয়া অগ্রে যে ভাসা ভাসা দলটি ছিল, তাহা দৃঢ়ভাবে সংগঠিত করেন। ইহারই ফলে মহারাষ্ট্রীয় ও বঙ্গীয় বৈপ্লবিক দলের সংযোগ স্থাপিত হয় ও উপরোক্ত কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটি গঠিত হয়। কার্য্যের প্রণালী এই প্রকার ছিল, সভাপতিকে সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের সংবাদ দিতে হইত। যিনি ক্লাবের অধিনায়ক হইয়া ছাত্রদের চালাইতেন তাঁহাকে কার্য্যের সংবাদ সভাপতিকে দিতে হইত এবং প্রত্যেক সভ্য স্বয়ং এক কেন্দ্র স্বরূপ হইয়া ছাত্রদের মধ্যে কার্য্য করিত ও কার্য্যের ফল তাহার উপরিস্থিত নেতাকে জানাইত। এক কেন্দ্র অপর কেন্দ্রের কার্য্যের সংবাদ জানিত না। উদ্দেশ্য ছিল একজন ধরা পড়িলে অন্য সব কর্ম্মীরা ও কেন্দ্র যেন ধরা না পড়ে ও বিচ্ছিন্ন হয়। কোন নূতন লোককে বৈপ্লবিক মতে আনয়ন করিতে পারিলে তাহাকে সমিতির মন্ত্র গ্রহণ করান হইত। এই দীক্ষা মন্ত্র মহারাষ্ট্র হইতে নাকি আনয়ন করা হইয়াছিল। দীক্ষায় সংস্কৃত ভাষা, হিন্দুশাস্ত্র, তরবারী ও প্রতিজ্ঞা বিশেষ উপকরণ ছিল। দীক্ষিত ব্যক্তি দীক্ষাদাতার নাম কাহাকেও ব্যক্ত করিলে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবে এই প্রতিজ্ঞা তাহাকে করিতে হইত। দীক্ষাতে আমার যতদূর মনে হয় "ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনের" চেষ্টার কথা বলা হইত। ইহাতে মহারাষ্ট্রীয় প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষিত হইত, কারণ ইহা স্বামী রামদাসের আদর্শ ছিল। জানিনা অহিন্দুর বেলা কি ব্যবস্থা হইত। তবে আসল কথা এই যে, গুপ্ত সমিতিতে অহিন্দু সভ্য ছিল না। আমি কেবল হিন্দু শাস্ত্রের নামে প্রতিজ্ঞা করিতে অস্বীকার করাতে আমার জন্য উদার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

সমিতির সভ্যদের জন্য সামরিক কড়া নিয়ম (discipline) আনিবার চেষ্টা সর্ব্বদা করা হইত। একজন অপরের বিষয়ে কুতূহল হওয়া বা প্রকাশ্য স্থলে তাহার সঙ্গে আলাপ করা নিষিদ্ধ ছিল। যে কোন বিপদ বা বিঘ্ন উপস্থিত হউক না কেন। প্রত্যেক ছাত্রকে তাহার দীক্ষাদাতা, এবং যিনি তাহার চালক হইতেন তাঁহার হুকুম মান্য করিতে হইত বাঙ্গালাকে নিয়মের (discipline) মধ্যে আনয়ন করা এক অসম্ভব অথবা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। বাঙ্গালী জাতি কথা-কুশল ও হুজুগে, তাহার মুখ বন্ধ করিয়া যন্ত্রের মতন কার্য্য করান—বিশেষতঃ যে কর্ম্মে নাম করিবার সুবিধা নাই সে কার্য্য করান—যে কি দুরূহ ব্যাপার তাহা যাঁহারা গুপ্তভাবে কার্য্য করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন! তথাপি প্রথমে এ বিষয়ে অনেকটা কৃতকার্য্য হওয়া গিয়াছিল। প্রত্যেক সভ্যকে প্রচারের কার্য্য করিতে হইত। কেহ হেদুয়ায়, কেহ গোলদীঘিতে, কেহ কলেজে ও হোষ্টেলে, কেহ বা বার লাইব্রেরিতে যে যেখানে পারিতেন অন্য লোককে স্বীয় মতে আনয়ন করিবার চেষ্টা করিতেন। হায়রে সেকাল! তৎকালে শিক্ষিত ব্যক্তিকে আমাদের জাতীয় জীবনের উন্নতির জন্য যে স্বাধীনতা প্রয়োজন তাহা বুঝাইবার জন্য কত অকাট্য তর্কের প্রস্তাবনার দরকার হইত ও কত গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হইত! তখনকার যুবকদের আদর্শ ছিল উকিল হওয়া, কংগ্রেসে গিয়া গলাবাজি করিয়া মক্কেল বৃদ্ধি করা ও বেশী বয়সে কাউন্সিলে গিয়া " মাননীয় " খেতাব পাওয়া।

বাপ্‌রে! ইংরাজের সঙ্গে মারামারি করা, স্বার্থ ও আত্মত্যাগ করা যে ভীষণ ব্যাপার, ! "স্বাধীনতা" যে ঘোর সাংঘাতিক কথা, পালাও সে স্থান হইতে যেখানে এই প্রাণঘাতক কথা উত্থাপিত হয়। ইহাই ছিল বেশীর ভাগ লোকের মনের ভাব। ইহা মনস্তত্ত্বের তথ্য যে, নপুংসক পুরুষ বা দুর্ব্বল চিত্ত ব্যক্তি তাহার চিরাভ্যস্ত সংস্কারের বিরুদ্ধে কোনও এক সত্য প্রকাশমান হইলে সে তাহার দৌর্ব্বল্য হেতু সে সত্য গ্রহণ করিতে অসমর্থ হয় ও নিজের দুর্ব্বলতাকে ঢাকিবার জন্য অসত্যের অবতারণা করিয়া সত্যকে ফাঁকি দিবার চেষ্টা করে। সাধারণ বাঙ্গালীর ইহাই মনস্তত্ত্ব। নিজের সাহসে কুলায় না, ইহা স্বীকার না করিয়া তখনকার বাঙ্গালীরা স্বাধীনতা প্রাপ্তির চেষ্টার বিপক্ষে সর্ব্বপ্রকার যুক্তির ফাঁদ পাতিতেন। তৎকালে শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে স্বাধীনতাবাদ প্রচার করা এক ভীষণ ব্যাপার ছিল। তৎকালের মুষ্টিমেয় বৈপ্লবিকদের প্রাণে দেশের উজান প্রবহমান করা যে কি কঠিন ব্যাপার ছিল তাহা ভুক্তভোগী ছাড়া কেহ অনুভব করিতে পারিবেন না। স্বদেশী আন্দোলনের বন্যা না আসিলে বিপ্লববাদের অবস্থা কি হইত তাহা কে নির্ণয় করা দুরূহ। বৈপ্লবিক প্রচারকের দলকে বিশ্ব বিদ্যালয়ের উচ্চ ডিগ্রি প্রাপ্ত লোকদের সে ক্রমাগত তর্ক যুদ্ধ করিতে হইত, সেইজন্য প্রচারকদের ভারতীয় রাজনীতি ও অর্থনীতিক তত্ত্বের বেশ ভাল করিয়া রাখিতে হইত।

ইহাত হইল চিন্তা ক্ষেত্রের কথা। কর্ম্মক্ষেত্রে বঙ্গের বিভিন্ন যায়গায় ব্যায়াম ভূমি স্থাপন করা ছাত্রদের আহ্বান করা হইত। সেস্থানে ব্যায়াম শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে, স্বদেশ প্রেমোদ্দীপক

কথার চর্চ্চা ও সঙ্গীত, যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণের পুস্তকাবলী ও দেউস্করের "দেশের কথা" পাঠ, স্বদেশী কাপড় ব্যবহার, শিবাজি, প্রতাপাদিত্য ও সীতারাম উৎসব, বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতের প্রচলন ইত্যাদির অনুষ্ঠান হইত। এইসব আখড়ায় স্থানীয় শিক্ষক বা যুবক উকিল বা অপেক্ষাকৃত বয়স্ক লোক চালক হইতেন। এইসব বৈপ্লবিক কেন্দ্রই বঙ্গ ভঙ্গের সময়ে স্বদেশী আন্দোলনকে অন্তরাল হইতে চালাইয়াছিল। কিন্তু তৎকালে এই সব কেন্দ্র স্থাপন করা বড় সহজ কার্য্য ছিল না। তৎকালে দেশের সেবা বা দশের সেবা একটা হাস্যোদ্দীপক দৃশ্য ছিল,—"ভারত উদ্ধার" একটা ঠাট্টার সামগ্রী ছিল। দেশের মাথার উপর উকিল, ব্যারিষ্টার ও "মাননীয়ের" দল নেতা সাজিয়া দেশটাকে অগ্রসর হইতে দিতেন না। কিন্তু একথা নিরপেক্ষ লোকদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, বঙ্গের ও ভারতের রাজনীতিক স্রোত ঘৃণিত ও নগণ্য তথাকথিত অশিক্ষিত ও অর্দ্ধ-শিক্ষিত মজুর (পাঞ্জাবে) ও ছাত্রের দল (বিশেষতঃ বঙ্গে) আত্মত্যাগের ফলে উলট্ পালট্ করিয়া দিয়াছে।

কর্ম্ম যতই শক্ত হউক বিপ্লবপন্থীরাও নাছড়বান্দা হইয়াছিলেন এবং নিজেদের কর্ম্মের প্রভাবে বঙ্গে ও তাহার বাহিরে কেন্দ্র স্থাপনা করিয়াছিলেন। বিপ্লবপন্থীদের প্রধান চেষ্টা ছিল ছাত্রবৃন্দ ও বাবুর দলকে বিপ্লবপন্থার অনুগামী করা ও সুবিধা হইলে রাজারাজড়ার দলকেও বিপ্লববাদী করা। কিন্তু এভাব কাহারও মাথায় তখন উদয় হয় নাই যে, কেবল মাত্র বাবুর দলকে ভজিয়ে স্বাধীনতা সমরের কি সুবিধা হইবে।

১৯০২—১৯১৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বৈপ্লবিক কর্ম্ম কেবল বাবুর দলকেই বিপ্লব করিবার চেষ্টায় নিয়োজিত করিয়াছিল, ফলে সমস্তই ভস্মে ঘৃতাহুতিতে পরিণিত হইয়াছে! আসল কথা, তখন আমরা কেহই বুঝি নাই "বিপ্লব" অর্থে কি বুঝায় (এখনও অতি অল্প লোকই এ কথার অর্থ বুঝেন)। বিপ্লব অর্থে কোন প্রকারে ইংরেজ তাড়ান নয় এ কথা খুব অল্প বিপ্লববাদীই আজ পর্য্যন্ত বুঝিয়াছেন। বিপ্লববাদীরা সকলেই বুরজোয়া বংশোদ্ভব। গরীব ও তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোকদের প্রতি ঘৃণা করা বুরজোয়া শ্রেণীর অস্থিমজ্জাগত স্বভাব। নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা কোন হিসাবের ভিতরেই আসে না। তাহাদের ডাকিলেই কুকুরের ন্যায় আসিবে ও বাবুদের কথায় ইংরেজ মারিবে, ইহাই আমাদের দেশের বুরজোয়া দর্শন শাস্ত্র। তৎপরে ইংরেজ তাড়াইলেই আমাদের উকিল, ব্যারিষ্টার ও ডাক্তারের দল এবং ছাত্রদের মধ্যে যাঁহারা উকিল ব্যারিষ্টার হইবার আশা রাখিতেন এইসব লোকেরাই ত রাজত্ব করিবেন, অতএব ছোটলোকদের জন্য কে মাথা ঘামায়! অর্থাৎ ভারতের রাজনীতি যেমন বুরজোয়া দলের মধ্যে নিবদ্ধ, বিপ্লববাদও সেই প্রকার, আজ পর্য্যন্ত বুরজোয়া দলের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। সেইজন্য নিজেদের শ্রেণীর স্বার্থের বাহিরে নিরীক্ষণ করিবার সময় বা ইচ্ছা কাহারও হয় নাই।

যে কারণে হউক চাষা, কুলি, মজুর, দোকানী, পশারি ইত্যাদি যাহাদের গণশ্রেণী বলা যায়

তাহাদের মধ্যে বিপ্লববাদ প্রচার করা আজ পর্য্যন্তও বঙ্গে বা ভারতে হয় নাই। ইহাই ভারতীয় বৈপ্লবিক সম্প্রদায় ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বৈপ্লবিক সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ। বৈদেশিক বৈপ্লবিক পন্থা গণশ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ অর্থাৎ শ্রমজীবীদের মধ্যেই আবদ্ধ। বিপ্লব অর্থে তাঁহারা বোঝেন এই যে, সমাজে এইপ্রকার পরিবর্ত্তন করিতে হইবে যে, যে জন্য সমাজ প্রপীড়িত হইতেছে তাহার মূল যেন দূরীভূত হয়। অর্থাৎ সমাজে মনুষ্যের সামাজিক আর্থনীতিক সামঞ্জস্য ও সাম্য সংস্থাপন করার নাম বিপ্লব।

কারণ এই সামঞ্জস্যের অভাবেই মানুষ অত্যাচারিত ও প্রপীড়িত হয়। অবশ্য ইতালীতে বিপ্লবের সময়ে এই প্রকার সাম্য স্থাপিত হয় নাই, ইহা সত্য কথা। কিন্তু এই সাম্যের অভাবেই ইতালীতে বিপ্লববাদ আজ পর্য্যন্তও শেষ হয় নাই; এবং ইহাও সত্য যে তথায় আজ পর্য্যন্তও ম্যাটসিনির মতবাদও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তাঁহার "ঈশ্বর ও জন সমূহ" মতবাদাবলম্বী সমাজ কার্ল মার্ক্স কল্পিত গণবাদ প্রতিষ্ঠিত সমাজ না হইলেও বুরজোয়া স্বার্থ প্রতিষ্ঠিত সমাজ নয়। ইতালীর বিপ্লব সামাজিক বিপ্লব না হইলেও ম্যাটসিনী শ্রমজীবীদের সঙ্গে বরাবর কার্য্য করিয়াছিলেন। তৎপরে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যে ইয়োরোপে বিপ্লবের ঢেউ বহিয়া গিয়াছিল তাহা বুরজোয়া ডিমোক্রেটদের দ্বারা পরিচালিত হওয়াতে সামাজিক বিপ্লব না হইলেও Feudalism-এর বিপক্ষে পরিচালিত হইয়াছিল। আর ফরাসী বিপ্লব সমাজের অর্দ্ধেক ওলট পালট করিয়াছিল ও বর্ত্তমানে রুসিয়া বিপ্লব সমাজকে সম্পূর্ণরূপে ওলট পালট করিয়া দিয়াছে। এ হিসাবে আমাদের বিপ্লববাদ কি নূতন আদর্শ ও চিন্তা স্রোত লোক সমাজে দিয়াছে? জমার হিসাবে দেখি কিছুই নয়! ভারতীয় বিপ্লবাদীরা সামাজিক বা অর্থনীতিক মতবাদ (world view) সাধারণে দিতে পারেন নাই; —সমস্ত কর্ম্মটা ভূয়ার উপর চলিয়াছিল বলিয়াই ধোঁয়ায় পরিণত হইল। তবে এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, স্থানে স্থানে বৈপ্লবিক যুবকেরা জন-সেবা কর্ম্মে (Social Service) যুবকদের নিয়োজিত করিতেন এবং যেস্থলে বৈপ্লবিক সমিতির শাখা সংস্থাপিত হইয়াছিল সেই স্থলে যুবকবৃন্দের মধ্যে নৈতিক আদর্শের উন্নতি হইয়াছিল।

১৯০২—৪ বা ৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কলিকাতাই গুপ্ত সমিতির প্রধান কেন্দ্র ছিল। সভ্যেরা বাহির মধ্যে প্রচার কর্ম্মের জন্য বাহির হইতেন। একবার জন কতক গেরুয়া পরিয়া বাহির হইয়াছিলেন। বিভিন্ন যায়গায় যাইয়া প্রচার করা, লোককে স্বমতে আনয়ন করা, তথায় কার্য্যের জন্য একটা ব্যায়ামাগার স্থাপন করা ও একটা গুপ্ত কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটি গঠন করা তাহাদের কর্ম্ম ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গের প্রত্যেক সহরে সমিতির শাখা স্থাপিত হয়। বিপ্লব সমিতির প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গে ছিল। পশ্চিম বঙ্গ বিষয়ে চিরকালই অনুর্ব্বরা। তৎপরে "যুগান্তর" কাগজ বাহির হওয়াতে ও নানা কারণে নানা প্রকারে আজগুবী গল্প বাহির হইয়াছিল। লোকে আমাদের দলকে রবিবাবুর

"স্বদেশী সমাজের" আন্দোলনকে ও চরমপন্থীর দলকে একদল ভাবিত ও সেই জন্য নানা প্রকার গল্পেরও সৃষ্টি হইয়াছিল। উদাহরণ স্বরূপে এখানে একটী গল্পের উল্লেখ করিতে চাই। একবার এক ভদ্র লোক আমাদের আফিসে আসিয়া নির্জ্জনে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে আমি যদি তাঁহাকে স্বজাতি বলিয়া বিশ্বাস করি তবে এই কথা তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে চান যে "ইহা সত্য কিনা যে বঙ্গব্যাপী একটা বৈপ্লবিক সমিতি আছে এবং তাহার ১৬ জন প্রচারক দিবারাত্র সমস্ত দেশ ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন ও সুবোধ মল্লিক সেই সমিতির কোষাধ্যক্ষ।" আবার অন্য দিকে অন্য কথাও শুনিয়াছি। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে আমার পরলোক গত শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু ব্যারিষ্টার চন্দ্রশেখর সেন মহাশয় কলিকাতায় আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়া বলিলেন, "দিনেন্দ্র রায় আমায় বলিলেন যে উপাধ্যায় ব্রহ্ম বান্ধব একটা জেসিউট্, এই ছোঁড়ারা তাঁহার তালে নাচিতেছে।" ইহার অর্থ কি তাহা লোকে সহজেই বুঝিতে পারেন। শ্রদ্ধেয় উপাধ্যায় মহাশয়কে আমি ভালরূপেই ঘনিষ্ঠভাবে জানিতাম, সেই জন্য এই কটাক্ষে ভ্রূক্ষেপ করি নাই এবং একথাও সত্য যে আমরা কখনও তাঁহার তালে নাচি নাই। শ্রদ্ধেয় উপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত নানা কারণে বহু অগ্রেই আমার সহিত আলাপ পরিচয় ছিল। তিনি অগ্রে বৈপ্লবিক ছিলেন না অথবা সেমত প্রকাশ করিতেন না। "সন্ধ্যা" পত্রিকা প্রকাশিত হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই আমরা এক বৈপ্লবিক পত্রিকা বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম, কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে নেতাদের আনুকূল্য অভাবে তাহা কর্ম্মে পরিণত হইতে পারে নাই। পরে আমাদের "যুগান্তর" কাগজ বাহির হইবার বহু পরে রাজনীতির চর্চ্চা উপলক্ষে আমার সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্টতা হয়, এবং শেষে তিনি বিপ্লবমতাবলম্বী হন। তাহার ফলে একবার "সন্ধ্যা" ছাপাখানা হইতে আমরা ইংরেজিতে "সোনার বাঙ্গলা" ম্যানিফেষ্টো গুপ্তভাবে ছাপাইয়া লইয়াছিলাম। তিনি এই বঙ্গব্যাপী গুপ্ত সমিতির সংবাদ জানিতেন না, সেই জন্যই একবার তিনি ও তাঁহার এক বাল্যকালের বিশ্বস্ত বন্ধু আমায় বলিয়াছিলেন যে, ভূপেন, তোমাকে ভিত্তিস্বরূপ করিয়া আমরা এক বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতি করিতে চাই। অবশ্য এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে তাহার আশেপাশে অনেক বৈপ্লবিক মতাব[illegible] যুবকও ছিল।

এই ঘটনাগুলি এ স্থলে উল্লেখ করিবার কারণ যে, তৎকালে সাধারণে কংগ্রেস বিরোধীদল সমূহকে একদল বলিয়া ধরিয়া লইতেন। কিন্তু যাঁহারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সব নিরীক্ষণ করিতেন তাঁহারা স্পষ্ট পার্থক্য দেখিতে পাইতেন। যথা,—উত্তর বঙ্গের কোন এক প্রধান ও বিখ্যাত উকিল (সেই জন্য এক বড় নেতা) কলিকাতায় কংগ্রেসের সময় আসিয়া পার্থক্য বুঝিয়া বলিয়াছিলেন, "যাহা দূর হইতে এক শিবির বলিয়া পরিলক্ষিত হয়, তাহা নিকটে পর্য্যবেক্ষণ করিলে বিভিন্ন তাঁবু বলিয়া বোঝা যায়"। ইহাতে অনেক সময় আমাদের কার্য্যের অসুবিধা হইত। কারণ, সাধারণের সম্মুখে খাড়া করিবার নামজাদা লোক কলিকাতায় আমাদের তখন ছিল না।

ব্যারিষ্টারের দলের যাঁহারা আমাদের সমিতির পাণ্ডাগিরি করিতেন, তাঁহারা কেহই তখন বিশেষ নামজাদা ছিলেন না এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ "রক্তহীন বিপ্লবের" সুর গাহিতেন, ও "গরম" দলের "পাণ্ডাগিরি" করিতেন। এস্থলে বৈপ্লবিক সমিতি ও চরমপন্থীর দলের সম্পর্ক বুঝাইতে চেষ্টা করিব। পুরাতন চরমপন্থীর দল বলিলে ইহা বুঝাইত যে কংগ্রেসের মডারেট দলের বা ভিক্ষাবাদীদলের বিপক্ষবাদী হইতে মায় উৎকট বৈপ্লবিক পর্য্যন্ত সকলেই চরমপন্থীদলের লোক ছিলেন। তৎকালে বৈপ্লবিক বলিলে কেবল ছোকরার দল বুঝাইত না, মফঃস্বলের বেশীরভাগই রাজনীতিক চরমপন্থী বা বৈপ্লবিক সমিতির সভ্য ছিলেন বা সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন। তখন চেষ্টা হইতেছিল যে (অবশ্য একথা বলিতে পারি না যে জ্ঞাতসারে হইতেছিল) চরমপন্থাবাদকে বিপ্লববাদের বাহিরের খোলস করিয়া কার্য্য করা। চরমপন্থীর দলের ভিতরে ভিতরে বিপ্লববাদীর দল organisation বাঁধিবার চেষ্টা করিতেন। জনসাধারণের সম্মুখে স্বাতন্ত্র্যতা বা স্বাধীনতার আদর্শ দিবার জন্য একটা প্রকাশ্যদলেরও দরকার। সেইজন্য বিপ্লবপন্থীরা চরমপন্থী দলের পুষ্টি সাধন করিতেন। কিন্তু একথা বলিতে পারি না যে অন্ততঃ বঙ্গে এ উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল। শুনিয়াছি অন্য প্রদেশে অনেক স্থলে রাজনীতিক চরমপন্থা বিপ্লবপন্থার বাহিরের আবরণস্বরূপ কার্য্য করিয়াছে, সেইজন্য বিপ্লববাদ তথায় তরুণবয়স্ক যুবকদের হস্তে ন্যস্ত হয় নাই এবং অন্যপক্ষে ইহাও সত্য যে সেই কারণে বিপ্লবপন্থা অন্যান্য প্রদেশে বিশেষভাবে প্রকট হইতে পারে নাই।

আমার বোধ হয় দুর্ভাগ্যক্রমে বঙ্গে এই দুই পন্থীরা একাঙ্গীভূত হইয়া কার্য্য না করার জন্য স্বাতন্ত্র্যমতবাদ আন্দোলনের ক্ষতি হইয়াছে। প্রথমতঃ বাঙ্গালায় চরমপন্থীদের নেতা হইলেন, কতক পেশাদার গলাবাজী-করা রাজনীতিক পুরুষ। যে প্রকার ভারতবাসীদের সংস্কার, তদনুযায়ী তাঁহারাও ভাবিতেন যে, হুজুগ করিয়া ও গলাবাজী করিয়াই তাঁহারা কার্য্যোদ্ধার করিবেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিপ্লবসমিতির সংবাদ রাখিতেন বটে কিন্তু তাহা নগণ্য বলিয়াই মনে করিতেন। তাঁহারা বোধ হয় মনে করিতেন যে তাঁহাদের গলাবাজীর জোরে ইংরাজ তাঁহাদের স্বরাজ (Autonomy) বা "হোমরুল" দিয়া দিবেন। মডারেটদের সঙ্গে ঝগড়া করা ছাড়া তাঁহাদের আর রাজনীতির দৌড় ছিল না। সম্ভবতঃ ভবিষ্যতেও কিছু হইত না। বিপ্লবপন্থীরা কেবল গোপনে কার্য্য করিয়া কত কি করিবেন? দেশব্যাপী কার্য্য করিবার জন্য কত টাকা দিবে? স্বাধীনতাবাদকে জনসাধারণের সম্মুখে ধরা তখন সম্ভবপর ছিল না। হয় ত কিছু সমভাবে দাঁড় করাইলে সাধারণে সাহস করিয়া সহানুভূতি দেখাইত কিন্তু দলবদ্ধ হইয়া কার্য্য করা এই পেশাদার নেতাদের অসম্ভব! কারণ সর্ব্ব কর্ম্মের নেতা এই উকিল ও পেশাদার বক্তার তাঁহাদের এই পরম সুযোগ অনুযায়ী ব্যবসা ব্যতীত আর কিছু বোঝেন না। তাঁহারা আজ কিছুও বুঝিতেছেন না যে, যে কোন জনসাধারণ সম্পর্কীয় কার্য্যের পশ্চাতে এক শৃঙ্খলিত জমাট [illegible] না থাকিলে তাহা সফল হইবার সম্ভাবনা নাই। ইঁহারা বক্তৃতাতেই দেশোদ্ধার করিতে চান।

এই কারণে বঙ্গে আজ পর্য্যন্ত যথার্থ জাতীয় নেতার উদ্ভব হয় নাই। এই জন্যই রাম্‌সে ম্যাকডোনাল্ড আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন যে "বাঙ্গালী যদি নেতৃত্ব করিতে জানিত তবে ভারতের রাজনীতিক ইতিহাস অল্প সময়েই পরিবর্ত্তিত হইত।" এই জন্যই বিপ্লববাদীরা চরমপন্থীদের নিকট হইতে সরিয়া যাইতে লাগিল ও পরে নিজেদের কার্য্য সম্পূর্ণরূপে পৃথকভাবে করিতে লাগিল। আমি যতদিন দেশে ছিলাম জানিতাম যে আমরা এই বক্তৃতাবাগীশদের শ্রদ্ধা করিতাম না। কারণ ইহাদের গলাবাজী ছাড়া কোন Constructive programme ছিল না। বরং অনেক সঙ্কটের সময় মডারেটদের নিকট হইতে আমরা সাহায্য পাইয়াছি। এই বিভিন্নতার বিষময় ফল এই হইল যে, চিন্তাশীল ও প্রধান খ্যাতনামা নেতার অভাবে বিপ্লববাদীরা জনসাধারণের হৃদয়ে নিজেদের গ্রথিত করিতে পারে নাই। তৎপরে নিজেদের দল হইতেও তাঁহারা এমন চিন্তাশীল ও খ্যাতনামা ব্যক্তির উদ্ভব করিতে পারেন নাই, যাঁহাকে বা যাঁহাদের দেশের সাধারণের সম্মুখে দাঁড় করাইলে তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারা যায়। এই জন্যই বিপ্লবপন্থীরা "আনার্কিষ্ট" নামে আখ্যাত হইতেন, ও তাঁহাদের কার্য্য গুপ্তভাবে নিবদ্ধ থাকিয়া সাধারণের বা জনসঙ্ঘের চিত্তের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। ফলে পরে গুপ্ত বিপ্লব সমিতি প্রকাশ্যে সাধারণের সহানুভূতি বা সাহায্য না পাওয়ায় এত ভিত্তিশূন্য হইয়াছিল যে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে অকৃতকার্য্যতার ফলে আকাশে বিলীন হইয়া গেল। এক কথায়, বঙ্গীয় বিপ্লববাদের প্রধান দুর্ভাগ্য যে ইহার মধ্যে সর্ব্বসাধারণের পরিচিত ও শ্রদ্ধাস্পদ নেতার উদ্ভব হয় নাই। অবশ্য এ স্থলে শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ মহাশয়ের কথা বলিতেছি না যিনি বহুদিন হইতে বঙ্গত্যাগী হইয়াছেন। ভারতের ন্যায় স্থিতিশীল দেশে বিপ্লববাদের ক্রমবিকাশ বৈপ্লবিক গতিতে হইয়াছিল এবং প্রথম হইতেই গভর্ণমেণ্ট ইহা ভাঙ্গিয়া দিতেছিল, সেই জন্য কিছু দর্শনশাস্ত্র বা চিন্তাশীল ব্যক্তির উদ্ভব হইবার সুযোগ পায় নাই। ইউরোপে বিপ্লববাদের উৎপত্তি অন্যভাবে হয়। তথায় প্রথমে কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি বৈপ্লবিক দর্শনশাস্ত্র প্রণয়ন করেন, পরে তাহার শিষ্যবৃন্দ তাহা কর্ম্মে পরিণত করিবার চেষ্টা করে, যথা, ফ্রান্সে এনসাইক্লোপেডিস্কের দল ও রুষো জার্ম্মানীতে কার্লমার্ক্স, রুষে বাকুনিন, ক্রুরোপাটকিন, প্লেখানফ্ ইত্যাদি। তবে ইটালিতে ম্যাটসিনি পূর্ব্বেকার বৈপ্লবিকদের কার্য্যের শেষ সময়ে আবির্ভাব হইয়াছিলেন ও নিজে একটি দর্শনশাস্ত্র সাধারণের সম্মুখে দিয়াছিলেন এবং তাহা তাঁহার শিষ্যেরা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। আর আমাদের সমস্তই বিদেশ হইতে আমদানী ছিল ও কল্পনাপ্রবণ বাঙ্গালীর হস্তে তাহা পড়িয়া তড়িৎগতিতে অন্য রাস্তা লইল। দেশের সামাজিক ও অর্থনীতিক অভাব ও অভিযোগের সঙ্গে ভারতীয় বিপ্লববাদের সম্পর্ক বড়ই কম ছিল। আমাদের "ন্যাশানালিসিম্"-ও বিদেশ হইতে আমদানী ও "টেররিস্ম"-ও বিদেশ হইতে আমদানী। সেই জন্যই জনসঙ্ঘ হইতে বিপ্লববাদ বরাবর বিভিন্ন ছিল।

ক্রমশঃ

শ্রীকুপেন্দ্রনাথ দত্ত

PUBLIC LIBRARY Estd. 1883

ইতালী ও ফ্রান্স

(১)

ইতালীর মিলান সহরের এক জার্ম্মাণ সংবাদদাতা বার্লিনের এক কাগজে লিখিয়াছেন যে ফরাসীরা ইতালীয় সমাজে আজকাল বিশেষ ক্ষমতাশালী নয়। অথচ ইতালীর নরনারীরা খোলাখুলি জার্ম্মাণির পাকা বন্ধুও নয়।

জার্ম্মাণির সঙ্গে ইতালী হয়ত কালে একটা সমঝোতা করিতে রাজি হইবে। কিন্তু ইতালীয়ানরা বলিতেছে :—"জার্ম্মাণি আজ কাল দেউলিয়া। ক্ষতিপূরণের মামলা মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত ইতালী জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্টকে বিশ্বাস করিতে অসমর্থ।"

এ দিকে আর এক কথা মনে রাখা আবশ্যক। লড়াইয়ের সময় ইতালীর ভিতরকার বহু জার্ম্মাণ সম্পত্তি ইতালীয় সরকার বাজেয়াপ্ত করিয়াছিল। সেইগুলির কিয়ৎ বিশ কোটি লিয়ার। সেই সব সম্পত্তি ইতালী এক্ষণে জার্ম্মাণদিগকে ফেরৎ দিতে বাধ্য। কিন্তু ইতালীর পক্ষে এত টাকা ফিরাইয়া দেওয়া মুখের কথা নয়। কাজেই ইতালীর সঙ্গে জার্ম্মাণির হামদর্দ্দি বড় শীঘ্র গজাইয়া উঠিবে বলিয়া বিশ্বাস হয় না।

(২)

"ড্যয়চে আল্‌গেমাইনে ৎসাইটুঙ" কাগজে ইতালী হইতে এক জার্ম্মাণ লেখক খবর পাঠাইয়াছেন। ইনি সিসিলির আগ্নেয় উৎপাত উপলক্ষ্যে বলিতেছেন :—"জগতের সকল দেশ হইতে সরকারী বে-সরকারী সকল প্রকার সাহায্য আসিয়াছে। কিন্তু জার্ম্মাণির রাইন-রুর অঞ্চলে যে ফরাসীরা উৎপাত সৃষ্টি করিয়াছে সে দিকে দুনিয়ার দৃষ্টি নাই কেন? মানুষের তৈয়ারি উপদ্রবের বিরুদ্ধে মানুষ কোনো কথা বলিতেছে না, এই দৃশ্য বিস্ময়জনক।"

মুসোলিনি সম্বন্ধে ইতালীবাসী জার্ম্মাণরা মোটের উপর সুমত প্রচার করিয়া থাকে। একজন লিখিয়াছেন :—"মুসোলিনির মতন করিৎকর্ম্মা লোক অতি বিরল। ইনি হরদম খাটিতে আছেন। আজ অমুক সহরে, কাল অমুক পল্লীতে, মুসোলিনি সর্ব্বত্রই নানা কাজে ব্যস্ত। গবর্ণমেণ্টের নানা বিভাগে সংস্কার বিধান করিয়া মুসোলিনি দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা আনিয়াছেন। এমন কি শত্রুরাও একথা স্বীকার করিতে বাধ্য।"

দুনিয়ার লোকের ধারণা,—মুসোলিনি ফ্রান্সের বন্ধু। জার্ম্মাণ সংবাদদাতা বলিতেছেন,—এ মত ভুল। মুসোলিনির মাথায় সর্ব্বদা একটা সমস্যা খেলিতেছে। কেমন করিয়া ফ্রান্সের লিয়ারকে দুনিয়ার টাকার বাজারে চড়ানো যায় ইহাই তাঁহার আসল এবং সর্ব্বপ্রধান কথা। কমসে কম লিয়ার যাহাতে একদামে স্থির হইয়া দাঁড়ায় এই চেষ্টায় মুসোলিনি নিজের শক্তি লাগাইয়া দিয়াছেন।"

মুসোলিনিকে ফ্রান্সের মিত্র এবং জার্ম্মাণির শত্রু বিবেচনা না করিয়া ইতালীর সেবক বিবেচনা করাই যুক্তিসঙ্গত। বস্তুতঃ ফ্রান্স এবং জার্ম্মাণি উভয় সম্বন্ধেই মুসোলিনি নিরপেক্ষ। জার্ম্মাণ মহলে এই ধরণের মত প্রচলিত হইতেছে।

(৩)

ইতিমধ্যে ইংল্যণ্ড এক চাল চালিয়াছেন। বিলাতের রাজা বাহাদুর ইতালীতে আসিয়া হাজির (মে ১৯২৩ খৃঃ)। রাষ্ট্র-মণ্ডলে মোসাফিরির দাম অনেক।

১৯০৭ সালে বিলাতের রাজা একবার ফ্রান্সে দেখা দিয়াছিলেন। সেই দেখা দেওয়াতেই অ্যাংগ্লো ফরাসী আঁতাঁত কায়েম হয়। অনেক দিনকার ঝগড়া শত্রুতা কামড়া কামড়ি সেই মোসাফিরিতে লোপ পায়। ফলতঃ ১৯১৪ সালের লড়াইয়ে ফরাসী এবং ইংরেজ "ভাই ভাই এক ঠাঁই" হইয়া জার্ম্মাণের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন।

সেই ধরণের একটা কিছু হাঁসিল করিবার জন্যই হিক্‌টর এমানুয়েলের সঙ্গে জর্জ্জ মোলাকাৎ করিয়াছেন। এমন কি রোমাণ ক্যাথলিক ধর্ম্মগুরু পোপ বাহাদুরের নিকট ইনি আলেকম সেলাম ঠুকিয়া গিঁয়াছেন।

পোপের সঙ্গে ইংরেজরাজের দেখা করার কোনো দরকার ছিল না। বিলাতের প্রটেষ্টাণ্ট প্রজারা ইহার বিরোধী ছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বিলাতী পররাষ্ট্র নীতির কৌটিল্যেরা সমঝিয়াছেন:—"কুছ পরো আ নাই। অধিকন্তু ন দোষায়।"

ভূমধ্যসাগরের মামলায় ইতালী এখন আর ইংল্যণ্ডকে গরম গরম কিছু শুনাইতে ঝুঁকিবে না। কথায় বলে "এলে গেলে কুটুম্ব"। ইতালীকে কুটুম্বরূপে পাইলে ইংল্যণ্ড ফ্রান্সকে দাবিয়ে রাখিতে পারিবে, তুর্কীকে জব্দ করিতে পারিবে, আর রুশিয়াকে রুখিতে পারিবে।

ভূমধ্যসাগর লইয়া ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলার ঝগড়া থাকা এশিয়ার পক্ষে মঙ্গল। বর্ত্তমান বিলাতী চালে এশিয়ার কিছু ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।

(৪)

ইতালীর বিলাতী পিরীতে ফ্রান্স বিশেষ বিব্রত। ফ্রান্স এখন দুনিয়াকে বিলাতের বিরুদ্ধে সাজাইতে চায়। কিন্তু ইতালীকে হাত করিলে ইংরেজ ফ্রান্সের কোমর ভাঙ্গিয়া দিবে।

দেখা যাউক, দুনিয়া কোথায় গিয়া ঠেকে। সম্প্রতি ঘটিয়াছে এই মাত্র যে, কেনিয়া উপনিবেশের এক টুক্‌রা ইংরেজ ইতালীকে দিতে রাজী হইয়াছেন। বিলাতের নিকট ইতালীর লড়াইয়ের সময়কার দেনাটাও অনেক পরিমাণে রফা করিবার কথা চলিতেছে।

অধিকন্তু পোপ বাহাদুর বিলাতী রাজাকে বলিয়াছেন:—"প্যলেষ্টাইন এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র আমার পুরোহিতেরা বিলাতী-বিদ্বেষ রুখিতে চেষ্টা করিবে।"

ইতালীতে ফরাসী ওস্তাদরা হারিতে চলিলেন। এদিকে আঙ্গোরার তুর্ককেও ইংরেজ হাত করিয়াছে। লোজানের দ্বিতীয় বৈঠকে যুবক তুর্ক বিলাতী মতেই সায় দিল।

তাহা ছাড়া তুরস্কের বাগদাদ রেলপথটাও ইংরেজ মহাজনদের তাঁবে আসিয়াছে। ফ্রান্স ইংরেজকে কোথায়ও হঠাইতে পারিতেছে না। ইংরেজের শত্রুরা এখন ফরাসীকে মুরুব্বি করিতে সচেষ্ট হইবে। ফ্রান্স যেখানে সেখানে ইংরাজের শত্রু ঢুঁড়িয়া বেড়াইতেছে।

(৫)

প্যারিসের "জুর্ণাল" কাগজে এক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। লেখক জাহাজের এঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যায় ওস্তাদ। লেখার সুরে শুনিতেছি এক আওয়াজ—"সাজো, সাজো, লড়াই আসিতেছে।"

ফরাসী এঞ্জিনিয়ার বলিতেছেন:—"কয়লার যুগ চলিয়া গিয়াছে। এখন হইতে জাহাজ চলিবে তেলের জোরে। যে জাতির তাঁবে যত তেল সে জাতির জোর তত বেশী।"

তুর্কীর নিকট মোসুল-তেল এই জন্যই এত দামী। মোসুল মুল্লুক ইংরেজের দখলে আসিবে কি তুর্কীর অধীনই থাকিবে এই কথা ফ্রান্সের পক্ষে বিশেষ চিন্তার কথা। মোসুল শেষ পর্য্যন্ত যদি ইংরেজের তাঁবেই যায় তাহা হইলে ফ্রান্সকে আর কোনো এক দিকে ইংরেজের দুশমনি করিতে ছুটিতে হইবে।

এই অবস্থায় ফ্রান্স সোহ্বিয়েট রুশের সঙ্গে দহরম-মহমর করিতেছেন। ফরাসী রাষ্ট্র বীর মস্কোয় আসিয়া হাজির। রুশনরনারীকে প্যারিসের লোকেরা মহা খাতির করিতেছে।

(৬)

রুশিয়াকে লইয়া মাতামাতি করিতে চায় আজকাল সকল জাতই। কাজেই রুশিয়াকে ইংল্যণ্ড হাত করিবে, কি জাপান হাত করিবে, কি জার্ম্মাণ হাত করিবে, কি ফ্রান্স হাত করিবে কেহই বলিতে পারে না।

কিন্তু ইতিমধ্যে তেলের দরদ সকল দেশেই খুব বেশী। ফরাসী গবর্মেণ্ট আগামী পাঁচ বৎসরের জন্য তেলের ব্যবস্থা করিতেছেন। ৩৪০,০০০ টন তেল যাহাতে উৎপন্ন হইতে পারে সেইরূপ খাদ খুঁদিবার জল্পন কল্পন চলিতেছে। মাডাগাস্কার দ্বীপে, ইন্দোচীনে, যেখানে সেখানে ফ্রান্সের একতিয়ার আছে সর্ব্বত্রই নয়া খাদ খুদিবার আয়োজন করা হইবে।

তেল বাহির করিলেই কার্য্য উদ্ধার হইল এরূপ ভাবা উচিত নয়। ফরাসী এঞ্জিনিয়ারের মতে তেল জাহাজে তেল চালান করা আর সম্ভব নয়,—একদিকে উড়ো জাহাজের বোমায় অপর দিকে আন্তর্জ্জালিক জাহাজের গুঁতোয় তেলের জাহাজ গুলাকে শত্রু পক্ষ ধ্বংস করিয়া ফেলিবে।

অতএব ফ্রান্সের পক্ষে এক নয়া ধরণের জাহাজ তৈয়ারি করিবার সময় আসিয়াছে। তেল রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ এক প্রকার আন্তর্জ্জালিক জাহাজ গড়া দরকার।

এতদিন সমস্যা ছিল,—কোথায় তেল পাওয়া যাইবে। কোন্ কোন্ দেশের সঙ্গে মিত্রতা রক্ষা করিলে তেলের জোগান বেশী থাকিবে, ইত্যাদি। এই সকল প্রশ্ন ছিল "তেলের রাষ্ট্রনীতি"র অন্তর্গত।

ফরাসী ওস্তাদ বলিতেছেন :—"এখন তেলের সমস্যায় আসিয়াছে রণ-নীতির যুগ। তেলের রাষ্ট্রনীতি হইতে এই সমস্যা সম্পূর্ণ আলাদা।"

বর্ত্তমান জগৎ বাড়িয়া চলিতেছে হুহু করিয়া। ভারতের ওস্তাদরা দুনিয়ার এইগতি সমজিতে পারিতেছেন কি ?

শ্রীবিনয়কুমার সরকার
জুলাই, ১৯২৩

পথের দাবী *

(১৩)

নীচেকার ঘরের দরজা জানালা ভারতী বন্ধ করিতে ব্যাপৃত রহিল, অপূর্ব্ব সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া তাহার ঘরে প্রবেশ করিল, এবং ভাল দেখিয়া একটা আরাম কেদারা বাছিয়া লইয়া হাত-পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িল। চোখ বুঝিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আঃ! সে যে কতখানি শ্রান্ত হইয়াছিল তাহা উপলব্ধি করিল।

মিনিট কয়েক পরে ভারতী উপরে আসিয়া হাতের আলোটা যখন তে-পায়ার উপরে রাখিতেছে অপূর্ব্ব তখন টের পাইল, কিন্তু সহসা তাহার এমন লজ্জা করিয়া উঠিল যে, এই ক্ষণকালের মধ্যে ঘুমাইয়া পড়ার ন্যায় একটা অত্যন্ত অসম্ভব ভান করার অপেক্ষা আর কোন সঙ্গত ছলনাই তাহার মনে আসিল না। অথচ, ইহা নূতন নহে। ইতিপূর্ব্বেও তাহারা একঘরে রাত্রিযাপন করিয়াছে, কিন্তু সরমের বাষ্পও তাহার অন্তরে উদয় হয় নাই। মনে মনে ইহারই কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া তাহার তেওয়ারীকে মনে পড়িল। সে তখন মরণাপন্ন, তাহার জ্ঞান ছিল না, সে যে না-থাকার মধ্যেই, তথাপি সেই উপলক্ষ্যটুকুকেই হেতু নির্দ্দেশ করিতে পাইয়া অপূর্ব্ব স্বস্তি বোধ করিল। ভারতী ঘরে ঢুকিয়া তাহার প্রতি একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করিয়া যে সকল হাতের কাজ তখন পর্য্যন্ত অসম্পূর্ণ ছিল করিতে লাগিল, তাহার কপট নিদ্রা ভাঙাইবার চেষ্টা করিল না, কিন্তু এই পুরাতন বাটীর সুপ্রাচীন দরজা জানালা বন্ধ করার কাজে যে পরিমাণ

* সর্ব্ব স্বত্ব সংরক্ষিত।

শব্দ-সাড়া উত্থিত হইতে লাগিল তাহা সত্যকার নিদ্রার পক্ষে যে একান্ত বিঘ্নকর তাহা নিজেই উপলব্ধি করিয়া অপূর্ব্ব উঠিয়া বসিল। চোখ রগড়াইয়া হাই তুলিয়া কহিল, উঃ—এই রাত্রে আবার ফিরে আস্‌তে হোলো!

ভারতী টানাটানি করিয়া একটা জানালা রুদ্ধ করিতেছিল, বলিল, যাবার সময় এ কথা বলে গেলেন না কেন? সরকার মশায়কে দিয়ে আপনার খাবারটা একেবারে আনিয়ে রেখে দিতাম।

কথা শুনিয়া অপূর্ব্বর ঘুম-ভাঙা গলার শব্দ একেবারে তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল, কহিল, তার মানে? ফিরে আসবার কথা আমি জানতাম না কি?

ভারতী লোহার ছিট্‌কিনিটা চাপিয়া বন্ধ করিয়া দিয়া সহজকণ্ঠে জবাব দিল, আমারই ভুল হয়েছে। খাবার কথাটা তখনি তাঁকে বলে পাঠানো উচিত ছিল। এত রাত্তিরে আর হাঙ্গামা পোয়াতে হোতোনা। এতক্ষণ কোথায় দুজনে বসে কাটালেন?

অপূর্ব্ব কহিল, তাঁকেই জিজ্ঞেসা করবেন। ক্রোশ তিনেক পথ হাঁটার নাম বসে কাটানো কি না, আমি ঠিক জানিনে।

ভারতীর জানালা বন্ধ করার কাজ তখনও সম্পূর্ণ হয় নাই, ছিটের পর্দ্দাটা টানিয়া দিতেছিল, সেই কাজেই নিযুক্ত থাকিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, ইস্, গোলকধাঁধার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন বলুন! হাঁটাই সার হল! এই বলিয়া সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া একটু হাসিয়া কহিল, সন্ধ্যা-আহ্নিক করার বালাই এখনো আছে না গেছে? থাকে ত কাপড় দিচ্চি ওগুলো সব ছেড়ে ফেলুন। এই বলিয়া সে অঞ্চলশুদ্ধ চাবির গোছা হাতে লইয়া একটা আলমারি খুলিতে খুলিতে কহিল, তেওয়ারী চোরা ভেবে সারা হয়ে যাবে! আজ ত দেখ্‌চি আফিস থেকে একবার বাসায় যাবারও সময় পান্‌নি।

অপূর্ব্ব রাগ চাপিয়া বলিল, অবশ্য আপনি এমন অনেক জিনিস দেখ্‌তে পান যা' আমি পাইনে তা' স্বীকার করচি, কিন্তু কাপড় বার করবার দরকার নেই। সন্ধ্যা-আহ্নিকের বালাই আমার যায়নি, এ জন্মে যাবেও তা মনে হয়না, কিন্তু আপনার দেওয়া কাপড়েও তার সুবিধে হবে না। থাক্, কষ্ট করবেন না।

ভারতী কহিল, দেখুন আগে কি দিই—

অপূর্ব্ব বলিল, আমি জানি তসর কিম্বা গরদ। কিন্তু আমার প্রয়োজন নেই,—আপনি কষ্ট করবেন না।

সন্ধ্যে করবেন না?

না।

শোবেন কি প'রে? অফিসের ওই কোট পেণ্টুলান শুদ্ধ না কি?

হাঁ।

খাবেন না ?

না।

সত্যি ?

অপূর্ব্বর কণ্ঠস্বরে বহুক্ষণ হইতেই তাহার সহজ সুর ছিল না, এবার সে স্পষ্টই রাগ করিয়া কহিল, আপনি কি তামাসা করচেন না কি ?

ভারতী মুখ তুলিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল, বলিল, তামাসা ত আপনিই করচেন। আপনার সাধ্য আছে না খেয়ে উপোস করে থাকেন ?

এই বলিয়া সে আলমারির মধ্যে হইতে একখানি সুন্দর গরদের শাড়ী বাহির করিয়া কহিল, একেবারে নির্ভাঁজ পবিত্র। আমিও কোন দিন পরিনি। ওই ছোট ঘরটায় গিয়ে কাপড় ছেড়ে আসুন, নীচে কল আছে, আমি আলো দেখাচ্চি হাত-মুখ ধুয়ে ওই খানেই মনে মনে সন্ধ্যা-আহ্নিক সেরে নিন। নিরুপায়ে এ ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে,—ভয়ঙ্কর অপরাধ কিছু হবে না।

হঠাৎ তাহার গলার শব্দ ও কথা বলার ভঙ্গী এমন বদলাইয়া গেল যে অপূর্ব্ব থতমত খাইয়া গেল, তাহার দপ করিয়া মনে পড়িল সেদিন ভোর বেলাতেও ঠিক যেন এমনি করিয়াই কথা কহিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল। অপূর্ব্ব হাত বাড়াইয়া আস্তে আস্তে বলিল, দিন্ না কাপড় আমি নিজেই আলো নিয়ে নীচে যাচ্চি। আমি কিন্তু যার-তার হাতে ভাত খেতে পারব না তা' বলে দিচ্চি।

ভারতী নরম হইয়া কহিল, সরকার মশায় যে ভাল বামুন। গরিব লোক, হোটেল করেছেন, কিন্তু অনাচারী নয়। নিজে রাঁধেন, সবাই তাঁর হাতে খায়,—কেউ আপত্তি করেনা—আমাদের ডাক্তারবাবুর খাবার পর্য্যন্ত তাঁর কাছ থেকেই আসে।

তথাপি অপূর্ব্বর কুণ্ঠা ঘুচিল না, বিরসমুখে কহিল, যা'-তা' খেতে আমার বড় ঘৃণা বোধ হয়।

ভারতী হাসিল, কহিল, যা'-তা' খেতে কি আমিই আপনাকে দিতে পারি ? আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তাঁকে দিয়ে সমস্ত গুছিয়ে আন্‌বো,—তাহ'লে ত আর আপত্তি হবেনা ? এই বলিয়া সে আবার একটু হাসিল।

অপূর্ব্ব আর প্রতিবাদ করিল না, আলো এবং কাপড় লইয়া নীচে চলিয়া গেল, কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া ভারতীর বুঝিতে বাকি রহিল না যে সে হোটেলের অন্ন আহার করিতে অত্যন্ত সঙ্কোচ ও বিঘ্ন অনুভব করিতেছে।

কিছুক্ষণ পরে অপূর্ব্ব যখন গরদের শাড়ী পরিয়া নীচের একটা কাঠের বেঞ্চে বসিয়া আহ্নিক নিযুক্ত, ভারতী দ্বার খুলিয়া একাকী অন্ধকারে বাহির হইয়া গেল, বলিয়া গেল, সরকার মশায়কে লইয়া ফিরিয়া আসিতে তাহার বিলম্ব হইবেনা, ততক্ষণ সে যেন নীচেই থাকে। বস্তুতঃ

ফিরিতে তাহার দেরি হইল না। সেই মাত্র অপূর্ব্বর আহ্নিক শেষ হইয়াছে, ভারতী আলো হাতে করিয়া অত্যন্ত সন্তর্পণে প্রবেশ করিল, সঙ্গে তাহার সরকার মশায়, হাতে তাঁহার খাবারের থালা একটা বড় পিতলের গামলা দিয়া ঢাকা, তাঁহার পিছনে আর একজন লোক জলের গ্লাস এবং আসন আনিয়াছে, সে ঘরের একটা কোণ ভারতীর নির্দ্দেশ মত জল ছিটাইয়া মুছিয়া লইয়া ঠাঁই করিয়া দিলে ব্রাহ্মণ অন্ন-পাত্র রক্ষা করিলেন। সকলে প্রস্থান করিলে ভারতী কবাট বন্ধ করিয়া দিয়া গলায় অঞ্চল দিয়া যুক্তকরে সবিনয়ে নিবেদন করিল, এ ম্লেচ্ছের অন্ন নয়, সমস্ত খরচ ডাক্তার বাবুর। আপনি অসঙ্কোচে আতিথ্য স্বীকার করুন।

কিন্তু তাহার এই সকৌতুক পরিহাসটুকু অপূর্ব্ব প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করিতে পারিল না। সে জাতি মানে, যে-সে লোকের ছোঁয়া খায় না, হোটেলে প্রস্তুত অন্ন ভক্ষণে কিছুতেই তাহার রুচি হয় না,—কিন্তু তাই বলিয়া দামের পয়সাটা আজ ম্লেচ্ছ দিল কি অধ্যাপক ব্রাহ্মণ দিলেন এত গোঁড়ামিও তাহার ছিল না। বড় ভাইয়েরা তাহার শুদ্ধচারিনী মাতাকে অনেক দুঃখ দিয়াছে, ভাল হৌক মন্দ হৌক সেই মায়ের আদেশ ও অন্তরের ইচ্ছাকে তাহার লঙ্ঘন করিতে অত্যন্ত ক্লেশ বোধ হয়। এ কথা ভারতী যে একেবারে জানেনা তাহাও নয়, অথচ, মুহূর্ত্ত-তখন তাহার এই আচার-নিষ্ঠাকেই লক্ষ্য করিয়া ব্যঙ্গ বিদ্রূপ সৃষ্টি করার চেষ্টায় মন তাহার উত্যক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু কোন জবাব না দিয়া সে আসনে আসিয়া বসিল, এবং মাছাদন খুলিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইল। ভারতী সাবধানে সর্ব্বপ্রকার স্পর্শ বাঁচাইয়া দূরে ভূমি মল বসিয়া ইহাই তদারক করিতে গিয়া মনে মনে কুণ্ঠিত ও অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। সে কোন বলিয়া হোটেলের রন্ধনশালায় প্রবেশ করিতে পারে নাই, এই গভীর রাত্রে, সকলের দ্বারান্তে যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাহাই যে কোনমতে সংগ্রহ করিয়া সরকার মশায় হাজির করিয়াছিলেন ভারতী তাহা ভাবিয়া দেখে নাই। ঘরে যথেষ্ট আলোক ছিলনা, তথাপি আবরণ নির্ম্মাণ করায় অন্ন-ব্যঞ্জনের যে মূর্ত্তি প্রকাশিত হইল তাহাতে মুখে আর তাহার কথা রহিল না। কতদিন সে তাহাদের উপরের ঘর হইতে মেঝের ছিদ্রপথে এই লোকটির খাওয়ার ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াছে, তেওয়ারীর ছোট খাটো সামান্য ক্রটিতে এই খুঁত্‌খুঁতে মানুষটির খাওয়া হইতে কতদিন ভারতী নিজের চোখে দেখিয়াছে, সেই যখন আজ নিঃশব্দ ম্লান মুখে এই ভোজনে প্রবৃত্ত হইল, তখন কিছুতেই সে আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। ব্যাকুল বলিয়া উঠিল, থাক্, থাক্, ও আর খেয়ে কাজ নেই,—এ আপনি খেতে পারবেন না।

অপূর্ব্ব বিস্মিত হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিল, বলিল, খেতে পারবনা ? কেন ?

ভারতী কেবলমাত্র মাথা নাড়িয়া জবাব দিল, না, পারবেন না।

অপূর্ব্বও প্রতিবাদ করিয়া তেম্‌নি মাথা নাড়িয়া কহিল, না, বেশ পারবো, এই বলিয়া সে খাইবার উদ্যোগ করিতেই ভারতী উঠিয়া একেবারে তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, কহিল,

আপনি পারলেও আমি পারব না। জোর করে খেয়ে অসুখ হলে এ বিদেশে আমাকেই ভুগে মরতে হবে। উঠুন।

অপূর্ব্ব উঠিয়া দাঁড়াইয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, কি খাবো তা'হলে? আজ আবার তলওয়ারকর পর্য্যন্ত আফিসে আসেন নি,—যা' পারি এই দুটি না হয় খেয়ে নি? কি বলেন? এই বলিয়া সে এমন করিয়া ভারতীর মুখের প্রতি চাহিল যে তাহার অপরিসীম ক্ষুধার কথা অপরের বুঝিতে আর লেশমাত্র বাকি রহিল না।

ভারতী ম্লানমুখে হাসিল; কিন্তু মাথা নাড়িয়া বলিল, এ ছাই-পাঁশ আমি মরে গেলেও ত আপনাকে খেতে দিতে পারব না অপূর্ব্ববাবু,—হাত ধুয়ে উপরে চলুন, আমি বরঞ্চ আর কোন ব্যবস্থা করচি।

অনুরোধ অথবা আদেশ মত অপূর্ব্ব শান্ত বালকের মত হাত ধুইয়া উপরে উঠিয়া আসিল। মিনিট দশেকের মধ্যেই পুনরায় সেই সরকার মশাই এবং তাঁহার হোটেলের সহযোগীটি আসিয়া দেখা দিলেন। এবার ভাতের বদলে একজনের হাতে মুড়ির পাত্র এবং দুধের বাটি, অপরের হাতে সামান্য কিছু ফল ও জলের ঘটি, আয়োজন দেখিয়া অপূর্ব্ব মনে মনে খুসি হইল। এইটুকু সময়ে এতখানি সুব্যবস্থা সে কল্পনাও করে নাই। তাহারা চলিয়া গেলে অপূর্ব্ব হৃষ্টচিত্তে আহারে মন দিল। দ্বারের বাহিরে সিঁড়ির কাছে দাঁড়াইয়া ভারতী দেখিতেছিল, অপূর্ব্ব কহিল, আপনি ঘরে এসে বসুন। কাঠের মেঝেতে দোষ ধরতে গেলে আর বর্ম্মায় বাস করা চলেনা!

ভারতী সেইখান হইতেই সহাস্যে কহিল, বলেন কি? আপনার মত যে একেবারে উদার হয়ে উঠ্‌ল!

অপূর্ব্ব কহিল, না, এতে সত্যই দোষ নেই। ডাক্তার বাবু বল্‌লেন, চলুন, ফিরে যাই, আমিও ফিরে এলাম। এখানে যে মাতালের কাণ্ডে খুনোখুনি ব্যাপার হয়ে আছে সে কে জান্‌তো!

জান্‌লে কি করতেন?

জান্‌লে? অর্থাৎ,—আমার জন্যে আপনাকে এত কষ্ট পেতে হবে জান্‌লে আমি কখ্‌খনো ফিরে আস্‌তে রাজী হোতাম না।

ভারতী কহিল, খুব সম্ভব বটে। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম আপনি নিজেই ইচ্ছে করে ফিরে এসেছেন।

অপূর্ব্বর মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। সে মুখের গ্রাস গিলিয়া লইয়া সজোরে প্রতিবাদ করিয়া বলিল, কখ্‌খনো না! নিশ্চয় না! কাল বরঞ্চ আপনি ডাক্তার বাবুকে জিজ্ঞাসা করে দেখ্‌বেন।

ভারতী শান্তভাবে কহিল, এত জিজ্ঞাসা-পড়ারই বা দরকার কি? আপনার কথাই কি আর বিশ্বাস করা যায় না!

তাহার কণ্ঠস্বরের কোমলতা সত্ত্বেও অপূর্ব্বর গা জ্বলিয়া গেল। সে ফিরিয়া আসিতেই ভারতী যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিল তাহা স্মরণ করিয়া উত্তাপের সহিত বলিল, আমার মিথ্যে কথা বলা অভ্যাস নয়,—আপনি বিশ্বাস না করতে পারেন।

ভারতী কহিল, আমিই বা বিশ্বাস না কোরব কেন?

অপূর্ব্ব বলিল, তা জানিনে। যার যেমন স্বভাব। এই বলিয়া সে মুখ নীচু করিয়া আহারে মন দিল।

ভারতী ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, আপনি মিথ্যে রাগ করচেন। ডাক্তারের কথায় না এসে নিজের ইচ্ছেয় ফিরে এলেই বা দোষ কি, তাই শুধু আমি আপনাকে বল্‌ছিলাম। এই যে তখন আপনি নিজে খুঁজে খুঁজে আমার এখানে এলেন তাতেই কি কোন দোষ হয়েছে!

অপূর্ব্ব খাবার হইতে মুখ তুলিল না, বলিল, বিকাল বেলা সম্বাদ নিতে আসা এবং দুপুর রাত্রে বিনা কারণে ফিরে আসা ঠিক এক নয়।

ভারতী তৎক্ষণাৎ কহিল, নয়ইত। তাইত আপনাকে জিজ্ঞেসা করছিলাম, একটু জানিয়ে গেলে ত এতখানি খাবার কষ্ট হোতো না। সমস্তই ত ঠিক করে রাখা যেতে পারতো।

অপূর্ব্ব নীরবে খাইতে লাগিল উত্তর দিল না। খাওয়া যখন প্রায় শেষ হইয়া আসিল, তখন হঠাৎ মুখ তুলিয়া দেখিল ভারতী স্নিগ্ধ সকৌতুক দৃষ্টে তাহার প্রতি নিঃশব্দে চাহিয়া আছে। কহিল, দেখুনত, খাবার কত কষ্টই হল!

অপূর্ব্ব গম্ভীর হইয়া বলিল, আজ আপনার কি যে হয়েছে জানিনে, খুব সোজা কথাও কিছুতে বুঝতে পারচেন না।

ভারতী বলিল, আর এমনও ত হতে পারে খুব সোজা নয় বলেই বুঝ্‌তে পারচিনে? বলিয়াই ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

এই হাসি দেখিয়া সে নিজেও হাসিল, তাহার সন্দেহ হইল, হয়ত ভারতী এতক্ষণ তাহাকে শুধু মিথ্যা জ্বালাতন করিতেছিল। এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মনে পড়িল এম্‌নি ধারা সব আট-ঘাটো ব্যাপার লইয়া এই খৃষ্টান মেয়েটি তাহাকে প্রথম হইতেই কেবল খোঁচা দিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে, অথচ, ইহা বিদ্বেষ নয়, কারণ, যে-কোন বিপদের মধ্যে এতবড় নিঃসংশয় নির্ভরের স্থলও যে এই বিদেশে তাহার অন্য কোথাও নাই এ সত্যও ঠিক স্বতঃসিদ্ধের মতই হৃদয় যেন চিরদিনের জন্য একেবারে স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

জলের গ্লাসটায় জল ফুরাইয়া ছিল, শূন্য পাত্রটা অপূর্ব্ব হাতে করিয়া তুলিতেই ভারতী কহিয়া উঠিল, ঐ যাঃ—

আর জল নেই নাকি?

আছে বই কি! এই বলিয়া ভারতী রাগ করিয়া কহিল, অত নেশা করলে কি আর

মানুষের কিছু মনে থাকে ? খাবার জলের ঘটিটা শিবু নীচের টুলটার ওপর ভুলে রেখে এসেচে,—আমারও পোড়া কপাল চেয়ে দেখিনি। এখন আর ত উপায় নেই, একেবারে আঁচিয়ে উঠেই খাবেন, কি বলেন ? কিন্তু রাগ করতে পাবেন না তা বলে রাখ্‌চি।

অপূর্ব্ব হাসিয়া কহিল, এতে আর রাগ করবার কি আছে ?

ভারতী আন্তরিক অনুতাপের সহিত বলিল, হয় বই কি। খাবার সময় তেষ্টার জল না পেলে ভারি একটা অতৃপ্তি বোধ হয়। মনে হয় যেন পেট ভরলো না। তাই বলে কিন্তু ফেলে রেখেও কিছু উঠলে চল্‌বে না। আচ্ছা, যাবো চট্ করে শিবুকে ডেকে আন্‌বো ?

অপূর্ব্ব তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া হাসিয়া কহিল, এর জন্যে এই অন্ধকারে যাবেন ডেকে আন্‌তে ? আমার কি কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই মনে করেন ?

তাহার খাওয়া শেষ হইয়াছিল, তথাপি সে জোর করিয়া আরও দুই চারি গ্রাস মুখে পুরিয়া অবশেষে যখন উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন, তাহার নিজেরই কেমন যেন ভারি লজ্জা করিতে লাগিল। কহিল, বাস্তবিক বল্‌চি আপনাকে আমার কিছুমাত্র অসুবিধে হয়নি। আমি আঁচিয়ে উঠেই জল খাবো—আপনি মিথ্যে দুঃখ করবেন না।

ভারতী হাসিয়া জবাব দিল, দুঃখ করতে যাবো ? কখ্‌খনো না। আমি জানি দুঃখ করবার আমার কিচ্ছু নেই। এই বলিয়া সে আলোটা তুলিয়া ধরিয়া আর এক দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, আমি আলো দেখাচ্চি, যান আপনি নীচে থেকে মুখ ধুয়ে আসুন। জলের ঘটিটা সুমুখেই আছে,—যেন ভুলে আস্‌বেন না।

অপূর্ব্ব নীচে চলিয়া গেল। খানিক পরে মুখ হাত ধুইয়া উপরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল তাহার ভুক্তাবশেষ সরাইয়া উচ্ছিষ্ট স্থানটা ভারতী ইতিমধ্যেই পরিষ্কার করিয়াছে; দুই একটা চৌকি প্রভৃতি স্থানান্তরিত করিয়া তাহার খাবার জায়গা করা হইয়াছিল, সে গুলা যথাস্থানে আনা হইয়াছে, এবং যে ইজি-চেয়ারটায় সে ইতিপূর্ব্বে বসিয়াছিল তাহারই এক পাশে ছোট টিপায়ার উপরে রেকাবিতে করিয়া সুপারি এলাচ প্রভৃতি মশলা রাখা হইয়াছে। ভারতীর হাত হইতে সে তোয়ালে লইয়া মুখ হাত মুছিয়া মশলা মুখে দিয়া আরাম কেদারায় বসিয়া পড়িল, এবং হেলান দিয়া তৃপ্তির গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, আঃ—এতক্ষণে দেহে যেন প্রাণ এল। কি ভয়ঙ্কর ক্ষিদেই না পেয়েছিল !

তাহার চোখের সুমুখ হইতে আলোটা সরাইয়া ভারতী একপাশে রাখিতেছিল, সেই আলোতে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া অপূর্ব্ব হঠাৎ উঠিয়া বসিয়া বলিল, আপনার খুব সর্দ্দি হয়েছে দেখচি যে!

ভারতী বাতিটা তাড়াতাড়ি রাখিয়া দিয়া কহিল, কই, না।

না কেন! গলা ভারি, চোখ ফুলো-ফুলো দিব্যি ঠাণ্ডা লেগেচে! এতক্ষণ খেয়ালই করিনি।

ভারতী জবাব দিল না। অপূর্ব্ব কহিল, ঠাণ্ডা লাগার অপরাধ কি। এই রাত্তিরে যা ছুটোছুটি করতে হল !

ভারতী ইহারও উত্তর দিল না। অপূর্ব্ব ক্ষুণ্ণকণ্ঠে বলিল, ফিরে এসে নিরর্থক আপনাকে কষ্ট দিলাম। কিন্তু কে জান্‌তো বলুন, ডাক্তার বাবু ডেকে এনে শেষে আপনাকে বোঝা টান্‌তে দিয়ে নিজে সরে পড়বেন ! ভুগ্‌তে হল আপনাকে।

ভারতী জানালার কাছে পিছন ফিরিয়া কি একটা করিতেছিল, কহিল, তাতো হোলই। কিন্তু ভগবান বোঝা টান্‌তে দিলে আর নালিশ করতে যাবো কার বিরুদ্ধে বলুন ?

অপূর্ব্ব আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, তার মানে ?

ভারতী তেম্‌নি কাজ করিতে করিতেই বলিল, মানে কি ছাই আমিই জানি ? কিন্তু দেখ্‌চি ত, বর্ষায় আপনি পা দেওয়া পর্য্যন্ত বোঝা টেনে বেড়াচ্চি শুধু আমিই। বাবার সঙ্গে করলেন ঝগড়া, দণ্ড দিলাম আমি। ঘর পাহারা দিতে রেখে গেলেন তেওয়ারীকে, তার সেবা করে এলুম আমি। ডেকে আন্‌লেন ডাক্তার বাবু, হাঙ্গামা পোহাতে হচ্চে আমাকে। ভয় হয়, যারা জীবনটা না শেষে আমাকেই, আপনার বোঝা বয়ে কাটাতে হয় ! কিন্তু রাত ত আর নেই, শোবেন কোথায় বলুন ত ?

অপূর্ব্ব বিস্মিত হইয়া বলিল, বাঃ, আমি তার জানি কি ?

ভারতী কহিল, হোটেলে ডাক্তার বাবুর ঘরে আপনার বিছানা করতে বলে এসেচি, তারা বোধহয় হয়েছে।

কে নিয়ে যাবে ? আমি ত চিনি নে।

আমিই নিয়ে যাচ্চি, চলুন, ডাকা-ডাকি করে তাদের তুলিগে।

চলুন, বলিয়া অপূর্ব্ব তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। একটু সঙ্কোচের সহিত কহিল, কিন্তু আপনার বালিশ এবং বিছানার চাদরটা আমি নিয়ে যাবো। অন্ততঃ, এ দুটো আমার চাই-ই, পরের বিছানায় আমি মরে গেলেও শুতে পারবো না। এই বলিয়া সে শয্যা হইতে তুলিতে যাইতেছিল, ভারতী বাধা দিল। এতক্ষণে তাহার মলিন গম্ভীর মুখ স্নিগ্ধ কোমল হাস্যে ভরিয়া গেল, কিন্তু সে তাহা গোপন করিতে মুখ ফিরাইয়া আস্তে আস্তে বলিল, এও তো পরের বিছানা অপূর্ব্ব বাবু, ঘৃণা বোধ না হওয়াই ত ভারি আশ্চর্য্য। কিন্তু তাই যদি হয়, আপনার টুলে শুতে যাবার প্রয়োজন কি, আপনি এই খাটেতেই শোন্। এ কথাটা সে ইচ্ছা করিয়াই বলে না যে মাত্র ঘণ্টা কয়েক পূর্ব্বেই তাহার দেওয়া অশুচি বস্ত্রে ভগবানের উপাসনা করিতেও বাধ হইয়াছিল।

অপূর্ব্ব অধিকতর সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল, বলিল, কিন্তু আপনি কোথায় শোবেন ? মেঝেতে কষ্ট হবে ?

ভারতী ঘাড় নাড়িয়া কহিল, একটুও না। আঙুল দিয়া দেখাইয়া কহিল, ওই ছোট ঘরটায় যাহোক্ একটা কিছু পেতে নিয়ে আমি স্বচ্ছন্দে শুতে পারবো। শুধু কাঠের মেঝের উপরে হাতে মাথা রেখে তেওয়ারীর পাশে কত রাত্রি কাটাতে হয়েচে সে তো আর আপনি দেখ্‌তে পান্ নি ?

অপূর্ব্ব একমাস পূর্ব্বের কথা স্মরণ করিয়া বলিল, একটা রাত্রি আমিও দেখ্‌তে পেয়েছি, একেবারে পাইনি তা নয়।

ভারতী হাসিমুখে বলিল, সে কথা আপনার মনে আছে ? বেশ, তেমনি ধারাই না হয় আর একটা রাত্রি দেখ্‌তে পাবেন।

অপূর্ব্ব ক্ষণকাল অধোমুখে নীরবে থাকিয়া বলিল, তেওয়ারীর তখন ভয়ানক অসুখ,—কিন্তু এখন লোকে কি মনে করবে ?

ভারতী জবাব দিল, কিছুই মনে করবে না। কারণ, পরের কথা নিয়ে নিরর্থক মনে করবার মত ছোট মন এখানে কারও নেই।

অপূর্ব্ব কহিল, নীচের বেঞ্চে বিছানা করেও ত আমি অনায়াসে শুতে পারি ?

ভারতী বলিল, আপনি পারলেও আমি তা দেব না। কারণ, তার দরকার নেই। আমি আপনার অস্পৃশ্য, আপনার দ্বারা আমার কোন ক্ষতি হতে পারে এ ভয় আমার নেই।

অপূর্ব্ব আবেগের সহিত কহিল, আমার দ্বারা কখনো আপনার লেশমাত্র অনিষ্ট হতে পারে এ ভয় আমারও নেই। কিন্তু আপনাকে অস্পৃশ্য বল্‌লে আমার সব চেয়ে বেশী দুঃখ হয়। অস্পৃশ্য কথার মধ্যে ঘৃণার ভাব আছে, কিন্তু আপনাকে ত আমি ঘৃণা করিনে। আমাদের জাত আলাদা, আপনার ছোঁয়া আমি খেতে পারি নে, কিন্তু তার হেতু কি ঘৃণা ? এত বড় মিছে কথা আর হতেই পারে না। বরঞ্চ এর জন্যে আপনিই আমাকে মনে মনে ঘৃণা করেন। সেদিন ভোর বেলায় যখন আমাকে অকূল সমুদ্রে ফেলে রেখে চলে আসেন, তখনকার মুখের চেহারা আমার আজও স্পষ্ট মনে আছে, সে আমি জীবনে ভুলব না !

ভারতী বলিল, আমার আর যাই কেননা ভুলুন, সে অপরাধ ভুল্‌বেন না !

কখনও না।

সে মুখে আমার কি ছিল ? ঘৃণা ?

নিশ্চয় !

ভারতী তাহার মুখের পানে চাহিয়া হাসিল, তারপরে ধীরে ধীরে বলিল, অর্থাৎ, মানুষের মন বোঝবার বুদ্ধি আপনার ভয়ানক সূক্ষ্ম,—আছে কি নেই ! কিন্তু আর কাজ নেই আপনি শোন্। আমার রাত জাগার অভ্যাস আছে, কিন্তু আপনি আর বেশী জেগে থাক্‌লে আমারই হয়ত বিপদের অবধি থাক্‌বে না। এই বলিয়া সে প্রত্যুত্তরের আর অবকাশ

দিয়া র‍্যাকের উপর হইতে গোটা দুই কম্বল পাড়িয়া লইয়া পাশের ছোট ঘরের ভিতরে গিয়া প্রবেশ করিল।

অনতিকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া মশারি ফেলিয়া চারিদিক ভাল করিয়া গুঁজিয়া দিয়া ভারতী চলিয়া গেল, কিন্তু অপূর্ব্বর নিমীলিত চোখের কোণে ঘুমের ছায়াপাতটুকুও হইল না। ঘরের এক কোণে আড়াল-করা আলোটা মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে, বাহিরে গভীর অন্ধকার, রাত্রি স্তব্ধ হইয়া আছে,—হয়ত, সে ছাড়া কোথাও কেহ জাগিয়া নাই, কখন যে ঘুম আসিবে তাহার কোন স্থিরতা নাই, তবুও এই জাগরণের মধ্যে নিদ্রাবিহীনতার বিন্দুমাত্র অস্বস্তিও সে অনুভব করিল না। তাহার সকল দেহ-মন যেন বর্ণে বর্ণে উপলব্ধি করিতে লাগিল এই ঘরে, এই শয্যায়, এই নীরব নিশীথে ঠিক এম্‌নি চুপ করিয়া শুইয়া থাকার মত সুন্দর মধুর বস্তু আর ত্রিভুবনে নাই। এমন একান্ত ভাবনা-হীন নিশ্চিন্ত বিশ্রামের আনন্দ সে যেন আর কখনও পায় নাই তাহার এম্‌নি মনে হইতে লাগিল।

সকাল বেলায় তাহার ঘুম ভাঙিল ভারতীর ডাকে। চোখ মেলিয়াই দেখিল সম্মুখে তাহার পায়ের কাছে দাঁড়াইয়া এই মেয়েটি, পূবের জানালা দিয়া প্রভাত সূর্য্যের রাঙা আলো তাহার স্নানসিক্ত ভিজা চুলের উপরে, তাহার পরণের সাদা গরদের রাঙা পাড়টুকুর উপরে, তাহার সুন্দর মুখখানির স্নিগ্ধ শ্যাম রঙের উপরে পড়িয়া একেবারে যেন অপরূপ হইয়া অপূর্ব্বর চোখে ঠেকিল।

ভারতী কহিল, উঠুন, আবার আফিসে যেতে হবে ত !

তা'তো হবেই, বলিয়া অপূর্ব্ব শয্যা ত্যাগ করিল। আপনার ত দেখ্‌চি স্নান পর্য্যন্ত সারা হয়ে গেছে।

ভারতী কহিল, আপনাকেও সমস্ত তাড়াতাড়ি সেরে নিতে হবে। কাল অতিথি সৎকারে যৎকিঞ্চিৎ ত্রুটি হয়েছে, আজ আমাদের প্রেসিডেণ্টের আদেশ আপনাকে ভাল করে না খাইয়ে কিছুতেই ছাড়া হবে না।

অপূর্ব্ব জিজ্ঞাসা করিল, কালকের সেই মেয়েটি বেঁচেছে ?

তাকে হাঁসপাতালে পাঠানো হয়েছে,—বাঁচ্‌বে বলেই আশা।

মেয়েটিকে অপূর্ব্ব চোখেও দেখে নাই, তথাপি তাহারই সুখবরে মন যেন তাহার পরম লাভ করা গণ্য করিল। আজ কাহারও কোন অকল্যাণ সে যেন সহিতেই পারিবে না তাহার এম্‌নি কি হইল।

সে স্নান আহ্নিক সারিয়া কাপড় পরিয়া প্রস্তুত হইয়া যখন উপরে আসিল তখন বেলা বারটা। ইতিমধ্যে ঠাঁই করিয়া সরকার মশায় খাবার রাখিয়া গেছেন, অপূর্ব্ব আসনে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কই, আপনাদের প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে ত দেখা হল না। তাঁর অতিথি সৎকারের এই রীতি ?

ভারতী বলিল, আপনার যাবার আগে দেখা হবে বই কি। তাঁর আপনার সঙ্গে বোধ করি একটু কাজও আছে।

অপূর্ব্ব কহিল, আর ডাক্তার বাবু? যিনি আমাকে ডেকে এনেছেন? এখনো বোধ হয় তিনি বিছানাতেই পড়ে? এই বলিয়া সে হাসিল।

ভারতী এ হাসিতে যোগ দিল না, কহিল, বিছানায় পড়বার তাঁর সময়ই হয়নি। এই ত হাঁসপাতাল থেকে ফিরে এলেন। শোওয়া না-শোওয়া কোনটার কোন মূল্যই তাঁর কাছে নেই।

অপূর্ব্ব আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিল, এতে তাঁর অসুখ করেনা?

ভারতী বলিল, কখনো দেখিনে ত। সুখ অসুখ দুই-ই বোধ হয় তাঁর কাছে হার মেনে পালিয়েছে। মানুষের সঙ্গেই তাঁর তুলনা হয় না।

অপূর্ব্বর কাল রাত্রের অনেক কথাই স্মরণ হইল, মুগ্ধকণ্ঠে কহিল, আপনারা সকলেই বোধ হয় তাঁকে অতিশয় ভক্তি করেন?

ভক্তি করি? ভক্তি ত অনেকেই অনেককে করে। বলিতে বলিতেই তাহার কণ্ঠস্বর অকস্মাৎ গাঢ় হইয়া উঠিল, কহিল, তিনি চলে গেলে মনে হয় পথের ধূলোয় পড়ে থাকি, তিনি বুকের ওপর দিয়ে হেঁটে যান। মনে হয়, তবুও আশ মেটে না অপূর্ব্ব বাবু। বলিয়াই সে মুখ ফিরাইয়া চট্ করিয়া চোখের কোণ দুটা মুছিয়া ফেলিল।

অপূর্ব্ব আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না, নতমুখে নিঃশব্দে আহার করিতে লাগিল। তাহার এই কথাটাই বার বার মনে হইতে লাগিল সুমিত্রা ও ভারতীর মত এতবড় শিক্ষিতা ও বুদ্ধিমতী নারী-হৃদয়ে যে-মানুষ এতখানি উচ্চে সিংহাসন গড়িয়াছে জানিনা ভগবান তাহাকে কোন্ ধাতু দিয়া তৈরি করিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন! কোন্ অসাধারণ কার্য্য তাহাকে দিয়া তিনি সম্পন্ন করাইয়া লইবেন।

দূরে দরজার কাছে ভারতী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, অপূর্ব্ব নিজেও বিশেষ কোন কথা কহিল না, অতঃপর খাওয়াটা তাহার এক প্রকার নিঃশব্দেই সমাধা হইল। অপ্রীতিকর কোন কিছুই ঘটে নাই, তথাপি যে প্রভাতটা আজ তাহার বড় মিষ্ট হইয়া সুরু হইয়াছিল, অকারণে কোথা হইতে যেন তাহার উপরে একটা ছায়া আসিয়া পড়িল।

আফিসের কাপড় পরিয়া প্রস্তুত হইয়া সে কহিল, চলুন, ডাক্তারবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করে যাই।

চলুন, তিনি আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

সরকার মহাশয়ের জরা-জীর্ণ হোটেল বাড়ীর একটা অত্যন্ত ভিতরের দিকের ঘরে ডাক্তারবাবুর বাসা। আলো নাই, বাতাস নাই, আশে-পাশে নোংরা জল জমিয়া একটা দুর্গন্ধ উঠিতেছে, অতিশয় পুরাতন তক্তার মেঝে, পা দিতে ভয় হয় পাছে সমস্ত ভাঙিয়া পড়ে, এমনি

একটা কদর্য্য বিশ্রী ঘরে ভারতী যখন তাহাকে পথ দেখাইয়া আনিল, তখন বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। ঘরে ঢুকিয়া অপূর্ব্ব ক্ষণকাল ত ভাল দেখিতেই পাইল না।

ডাক্তারবাবু অভ্যর্থনা করিয়া কহিলেন, আসুন অপূর্ব্ব বাবু।

উঃ—কি ভীষণ ঘরই আপনি আবিষ্কার করেছেন ডাক্তার বাবু!

কিন্তু কি রকম সস্তা বলুন ত! মাসে দশ আনা ভাড়া।

অপূর্ব্ব কহিল, বেশি, বেশি, ঢের বেশি। দশ পয়সা হওয়া উচিত।

ডাক্তার কহিলেন, আমরা দুঃখী লোকেরা সব কি রকম থাকি আপনাদের চোখে দেখা উচিত। অনেকের কাছে এই আবার রাজপ্রাসাদ।

অপূর্ব্ব কহিল, তা'হলে প্রাসাদ থেকে ভগবান যেন আমাকে চিরদিন বঞ্চিত রাখেন! বাপ্‌রে বাপ্!

ডাক্তার বলিলেন, শুন্‌লাম, কাল রাত্রে আপনার বড় কষ্ট হয়েছে অপূর্ব্ব বাবু, আমাকে ক্ষমা করতে হবে।

অপূর্ব্ব কহিল, ক্ষমা কোরব শুধু আপনি এ ঘর ছাড়লে। তার আগে নয়।

প্রত্যুত্তরে ডাক্তার শুধু একটু হাসিলেন, বলিলেন, আচ্ছা, তাই হবে।

এতক্ষণ অপূর্ব্ব নজর করে নাই, হঠাৎ ভয়ানক আশ্চর্য্য হইয়া দেখিতে পাইল দেয়ালের কাছে একটা মোড়ার উপরে বসিয়া সুমিত্রা। আপনি এখানে? আমাকে মাপ করবেন, আমি একেবারে দেখ্‌তে পাইনি।

সুমিত্রা কহিলেন, সে অপরাধ আপনার নয় অপূর্ব্ব বাবু, অন্ধকারের।

অপূর্ব্বর বিস্ময়ের সীমা রহিল না, তাঁহার গলা শুনিয়া। সে কণ্ঠস্বর যেমন করুণ, তেম্‌নি বিষণ্ণ। কি একটা ঘটিয়াছে বলিয়া যেন তাহার ভয় করিতে লাগিল। ভাল করিয়া ঠাহর করিয়া দেখিয়া আস্তে আস্তে কহিল, ডাক্তারবাবু, এ আপনার আজ কি রকম পোষাক? কোথাও কি বার হচ্চেন?

ডাক্তারের মাথায় পাগড়ী, গায়ে লম্বা কোট, পরণে ঢিলা পায় জামা, পায়ে রাওলপিণ্ডির নাগরা, একটা চাম্‌ড়ার ব্যাগে কি কতকগুলা বাণ্ডিল বাঁধা। কহিলেন, আমি ত এখন চল্‌তি অপূর্ব্ব বাবু, এঁরা সব রইলেন, আপনাকে দেখ্‌তে হবে। আপনাকে এর বেশি বলার আমি আবশ্যক মনে করিনে।

অপূর্ব্ব অবাক্ হইয়া কহিল, হঠাৎ চল্‌তি কি রকম? কোথায় চল্‌তি?

এই ডাক্তার লোকটির কণ্ঠস্বরে ত কোন পরিবর্ত্তন হয় না, তেমনি সহজ, শান্ত, স্বাভাবিক ভাবে বলিলেন, আমাদের অভিধানে কি 'হঠাৎ' শব্দ থাকে অপূর্ব্ব বাবু? চল্‌তি সম্প্রতি বিদেশের পথে আরও কিছু উত্তরে। কিছু সাঁচ্চা জরির মাল আছে, সিপাইদের কাছে বেশ দামে বিক্রি হয়। এই বলিয়া মুখ টিপিয়া হাসিলেন।

সুমিত্রা এতক্ষণ কথা কহে নাই, সহসা বলিয়া উঠিল, তাদের পেশোয়ার থেকে একেবারে ভামোয় সরিয়ে এনেচে, তুমি জানো তাদের ওপর এখন কি রকম কড়া নজর। তোমাকেও অনেকে চেনে, কখ্খনো ভেবোনা সকলের চোখেই তুমি ধূলো দিতে পারবে। এখন কিছুদিন কি না গেলেই নয়? শেষের দিকে তাহার গলাটা যেন অদ্ভুত শুনাইল।

ডাক্তার মৃদু হাসিয়া কহিলেন, তুমি ত জানো, না গেলেই নয়।

সুমিত্রা আর কথা কহিলেন না, কিন্তু অপূর্ব্ব সমস্ত ব্যাপারটা একেবারে চক্ষের পলকে বুঝিতে পারিল। তাহার চোখ ও দুই কান গরম হইয়া সর্ব্বাঙ্গ দিয়া যেন আগুন ছুটিতে লাগিল। কোনমতে জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল, ধরুন,যদি তারা কেউ চিন্তেই পারে? যদি ধরে ফেলে?

ডাক্তার কহিলেন, ধরে ফেল্লে বোধ হয় ফাঁসিই দেবে। কিন্তু দশটার ট্রেণের আর ত সময় নেই অপূর্ব্ব বাবু, আমি চোল্লাম। এই বলিয়া তিনি ষ্ট্র্যাপে বাঁধা মস্ত বোঝাটা অবলীলা-ক্রমে পিঠে ফেলিয়া চামড়ার ব্যাগটা হাতে তুলিয়া লইলেন।

ভারতী একটি কথাও কহে নাই, একটি কথাও কহিল না, শুধু পায়ের কাছে গড় হইয়া প্রণাম করিল। সুমিত্রাও প্রণাম করিল, কিন্তু সে পায়ের কাছে নয়, একেবারে পায়ের উপরে। হঠাৎ মনে হইল সে বুঝি আর উঠিবে না, এমনি করিয়া পড়িয়াই থাকিবে,—বোধ হয় মিনিট খানেক হইবে, যখন সে নীরবে উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন স্বল্পালোকিত সেই ক্ষুদ্র ঘরের মধ্যে তাহার আনত মুখের চেহারা দেখিতে পাওয়া গেল না।

ডাক্তার ঘরের বাহিরে আসিয়া অপূর্ব্বর হাতখানি গত রাত্রির মতো মুঠার মধ্যে টানিয়া লইয়া কহিলেন, চল্লাম অপূর্ব্ব বাবু,—আমি সব্যসাচী।

অপূর্ব্বর মুখের ভিতরটা শুকাইয়া মরুভূমি হইয়া গিয়াছিল, তাহার গলা দিয়া স্বর ফুটিল না, কিন্তু সে চক্ষের পলকে হাঁটু পাতিয়া তাঁহার পায়ের কাছে মেয়েদের মতই ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিল। ডাক্তার মাথায় তাহার হাত দিলেন, আর একটা হাত ভারতীর মাথায় দিয়া অস্ফুটে কি বলিলেন শোনা গেল না, তাহার পরে একটু দ্রুতপদেই বাহির হইয়া গেলেন।

অপূর্ব্ব উঠিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল ভারতীর পাশে সে একাকী দাঁড়াইয়া আছে, পিছনে সেই ভাঙ্গা ঘরের রুদ্ধ দ্বারের অন্তরালে কর্ত্তব্যকঠিন, অশেষ বুদ্ধিশালিনী, পথের দাবীর ভয়-লেশ-হীনা তেজস্বিনী সভানেত্রী কি যে করিতে লাগিলেন তাহার কিছুই জানা গেল না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

স্বর্গীয় পাঁচকড়ি বাবুর কথা

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মানব কোটি কোটি জীব জন্মিতেছে ও মরিতেছে নবজাত জীব মৃতের স্থান পূর্ণ করিতেছে—এইরূপ জন্মমরণ প্রবাহের পরিবর্ত্তন সংসারচক্রের স্বাভাবিক গতি। কেবল মানব বা জীব নহে,—জগতের সমস্ত বস্তুই এই উৎপত্তি ও বিনাশের নাগর-দোলায় দোল খাইতেছে। কেবল এক বস্তু যাহা জগতের অতীত, তিনিই কেবল এই দোলায় দোদুল্যমান নহেন, কেননা তিনিই যে এই নাগর-দোলার আশ্রয়স্তম্ভ, তিনি অচল, তিনি ধ্রুব, তিনি শাশ্বত। তাঁহাকে দোলাইতে পারে এমন শক্তি কাহারও নাই, তিনিই সকল শক্তির কেন্দ্র। তাঁহাকে কোটি কোটি প্রণাম করিয়া, সেই অবাঙ্মনস গোচরের কথা কেবল মনে রাখিয়া অন্য বস্তু সমূহের উৎপত্তি ও বিনাশের কথাই তুলিতেছি।

প্রতিদিন কেন প্রতিক্ষণেই এই উৎপত্তিবিনাশ। আমরা মানুষ, মানুষের উৎপত্তি বিনাশে আমাদের অধিক দৃষ্টি, আবার আমরা যাহাদের স্বজন তাহাদের উৎপত্তি বিনাশের প্রতি আমাদিগের অধিকতর দৃষ্টি। তা'হউক কিন্তু এই উৎপত্তি বিনাশ সাধারণ, ইহা গণনীয় নহে। গণনীয় উৎপত্তিবিনাশ বা জন্মমৃত্যু প্রকৃতই গণনীয়, অঙ্গুলি পর্ব্বে গণনা করা যায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সেই জন্মমৃত্যুই গণনীয় যাহা শ্লাঘ্য ও বরেণ্য। জাতকের ভবিষ্যৎ সৎকর্ম্মপ্রবাহ জাতকের জন্মকে শ্লাঘ্য ও বরেণ্য করিয়া তুলে, জন্মকালে তাহার সেই রূপ সাধারণের অজ্ঞাত থাকে। তাহারই মরণ শ্লাঘ্য ও বরেণ্য যাহার জন্য স্বজন, অস্বজন, শত্রু, মিত্র, পরিচিত, অপরিচিত সকলই ব্যথিত হইয়া থাকে।

বিচক্ষণ ব্যক্তি স্বজন বিয়োগে শোকার্ত্ত হন না, কেননা বিয়োগ একদিন অবশ্যম্ভাবী, আমি যাহাকরি বা স্বজন আমাকে ত্যাগকরুক ইহার একটা ত ঘটিবেই—যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহার জন্য দুঃখ কি, শোক কি?

আছে; দুঃখ বল, শোক বল, একটা কিছু আছে—বিচক্ষণের স্বজন বিয়োগে শোক হউক শ্লাঘ্য মরণে কিন্তু শোক বা দুঃখ একটা কিছু না হইয়া পারে না। কেননা ইহা স্বজনবিয়োগ নহে, একটা ভাবের বিচ্ছেদ—একটা দেশব্যাপী আলোকের অবসান। বিচক্ষণকেও সেই আলোক নির্ব্বাণ হইলে তমিস্রার অন্ধতমস ভবন ব্যাপ্ত করিলে দৃষ্টি শক্তি হারাইতে হয় বলিয়া দুঃখ শ্লাঘ্য মরণে হইয়া থাকে। কিন্তু সে দুঃখ সাত্ত্বিক।

দুঃখ আবার সাত্ত্বিক কি? যাহা রজোগণের পরিণাম তাহা কি সাত্ত্বিক হইতে পারে? ঋষি সাত্ত্বিক নহে, অন্য দুঃখ অপেক্ষা ইহাতে সত্ত্বগুণের মিশ্রণ অধিক আছে। কিরকম?—জগতে যে কিছু বস্তু প্রাকৃত তৎসমস্তই সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই তিন গুণের

সম্মিলনে উৎপন্ন; যে গুণ যাহাতে অধিক সেই গুণের নামেই তাহার পরিচয় হইয়া থাকে, দুঃখের পরিচয় রজোগুণে কেননা তাহার স্বরূপে রজোগুণের মাত্রা অধিক, তাই বলিয়া যে

স্বর্গীয় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

তাহাতে অন্য কোন গুণ নাই এমন ভাবিও না। মনে কর নিদ্রা—উহা তামসবৃত্তি, তথাপি ইহারও সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক এই তিন ভাগ। নিদ্রা সাধারণতঃ তামস হইলেও

যাহাতে সত্ত্বগুণের সম্মেলন অপর নিদ্রা অপেক্ষা অধিক, তাহাই সাত্ত্বিক নিদ্রা। অতি শ্রমের পরে গাঢ় নিদ্রা হইয়াছে, এক নিদ্রায় রাত্রি অবসান, প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়াই বুঝিলাম উত্তম সুনিদ্রা হইয়াছে, শরীরে কোন গ্লানি নাই, মন প্রফুল্ল, তখন বুঝিতে হইবে ঐ নিদ্রা সাত্ত্বিক। যদি মাঝে মাঝে নিদ্রা হইয়াছে কিন্তু সুনিদ্রা নহে, তাহার জন্য শারীরিক গ্লানি দূর হয় নাই, মন কেমন অপ্রফুল্ল সহজ কথায় 'খুঁতখুঁতে' তখন বুঝিবে ঐ নিদ্রা রাজস। যদি বুঝ সমস্ত রাত্রি গাঢ় নিদ্রা হইয়াছে বটে তথাপি উঠিতে ইচ্ছা নাই শরীর অবসন্ন মনও অবসন্ন,—তাহা হইলে তাহাকে তামস নিদ্রা স্থির করিবে।

শোক বা দুঃখেও সেই তিন ভাব আছে,—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। তামসিক শোকদুঃখে মানুষ অভিভূত হইলে কোন কার্য্যেই প্রবৃত্তি থাকে না, কোন জ্ঞানই তাহার অন্ধকারাবৃত হৃদয়ে আলোক দান করিতে পারে না। রাজসিক শোকদুঃখে মানুষ অস্থির হয়, অধিকতর ব্যাকুল হয়, মনের অবসাদ অপেক্ষা ব্যাকুলতা অধিক হয়, আমার কি হইল, আমার কি হইবে এই ভাবনাই সেই দুঃখে বিশেষভাবে হয়। যাহা সাত্ত্বিক দুঃখ বা সাত্ত্বিক শোক তাহাতে তেমন অস্থিরতা বা ব্যাকুলতা থাকে না কিন্তু দুঃখের তীব্র অনুভূতি থাকে, সেই দুঃখ 'আমি'র ক্ষুদ্র রেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে, তাহা দেশের অমঙ্গলের জন্য ব্যাপক ক্ষেত্রে বিস্তৃত। শ্লাঘ্য মরণে মৃতের গুণাবলী মনে বিশেষভাবে জাগিয়া উঠে, সেই গুণাবলী জাতি, সম্প্রদায়, দেশ বা প্রদেশের, ভাব বা ভাষার কি উপকার করিতেছিল তাহার আলোচনা মনে মনে হয়—সেই গুণাধিকারীর বিয়োগে সাধারণতঃ কিরূপ ক্ষতি হইল—তাহার ব্যাপক চিন্তায় মন ব্যাপৃত ও প্রতিভান্বিত থাকে; ইহাই সাত্ত্বিক শোকের প্রকৃতি।

বর্ত্তমান 'নায়ক' সম্পাদক বাঙ্গালীমাত্রের সুপরিচিত বাঙ্গলা সংবাদপত্রের সম্পাদকপ্রধান পাঁচকড়ি বাবুর মৃত্যু এই শ্লাঘ্য মরণ। তাঁহার স্থবির পিতামাতার শোকে তাঁহার শেষ শৈশবের অল্পবয়স্কা বনিতার অরুন্তুদ ব্যথায় সাত্ত্বিক ভাব এখন থাকিতে পারে না বটে, কিন্তু দেশে সেই সাত্ত্বিক শোকের প্রবাহ ছুটিয়াছে দেখিতে পাইতেছি। নতুবা শত্রু মিত্র নির্ব্বিশেষে তাঁহার জন্য মমতার বোধ হইত না। পাঁচকড়ি আমার বহুদিনের সুপরিচিত। 'বঙ্গবাসী'র এক সময়ে রক্ষাকর্ত্তা, বাঙ্গালা ভাষার অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যঙ্গসাহিত্যকেশরী স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আহ্বানে পাঁচকড়ি বাবু যেদিন বর্দ্ধমানে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের ভবনে উপস্থিত, সেদিন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কেও আমন্ত্রণ করেন। আমি গিয়া দেখিলাম একজন পঞ্চবিংশ বর্ষীয় গৌরবর্ণ যুবা বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন। আলাপ আপ্যায়ন হইল, ঘনিষ্ঠতা অল্প সময়ের মধ্যেই পাঁচকড়ি বাবু করিয়া লইলেন এবং আমাকে পৃথকভাবে গোপনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি শিক্ষকতা ত্যাগ করিয়া সংবাদপত্র সেবার পথে যাইব কি না? ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে আনিয়াছেন। আমি তাঁহার পত্র লইয়া যোগেন্দ্র বাবুর নিকট যাইব কিন্তু আমার ইহাতে কি উন্নতি হইবে?" পাঁচকড়ি

বাবু তখন শিক্ষকতা করিতেন। তাঁহার বাক্‌পটুতা বুদ্ধিমত্তা ও লোকসংগ্রহের সামর্থ্য দেখিয়া ও তাঁহার তৎকালিক প্রয়োজন বুঝিয়া আমি তাঁহাকে কিছুদিন সংবাদপত্র সেবার পরামর্শ দিয়াছিলাম, কিন্তু আইন পরীক্ষা দিয়া উকীল হইবার দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে বলিয়াছিলাম। অল্পদিন মধ্যেই "বঙ্গবাসী" সংবাদ পত্রের সংস্রবে পাঁচকড়ি বাবু যখন আসিলেন তখন তাঁহার কর্ম্মপটুতা, লিপিকৌশল ও বুদ্ধিমত্তা সকলকেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল।

সে সময় 'বঙ্গবাসী'র সর্ব্বস্ব স্বর্গীয় যোগেন্দ্র চন্দ্র বসু তাঁহাকে সর্ব্বগুণসম্পন্ন বলিয়া মনে করিতেন, যোগেন্দ্র চন্দ্র তাঁহাকে কি ইংরাজি কি বাঙ্গালা উভয় ভাষাতেই শ্রেষ্ঠ লেখক বলিয়া মনে করিতেন। বঙ্গসাহিত্যসিংহ অক্ষয়চন্দ্র সরকার আমার সমক্ষে ও পাঁচকড়ি বাবুর অসাক্ষাতে পাঁচকড়ি বাবুর ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। 'বঙ্গবাসী' কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত তদানীন্তন দৈনিক ইংরাজী সংবাদপত্র 'টেলিগ্রাফে'র সম্পাদক পাঁচকড়ি বাবু ছিলেন। তাঁহার লেখনী ও মেসিন প্রেসের ক্ষমতা সমান ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। দুটী বিরুদ্ধ ভাবের প্রবন্ধ যুক্তিযুক্ত করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে লিখিতে পাঁচকড়ি বাবুর যেরূপ দক্ষতা ছিল সেরূপ দক্ষতা অন্যত্র দুর্লভ। যখন তিনি 'বঙ্গবাসী'তে ছিলেন তখন তাঁহার লিখিত অনুবন্ধ প্রবন্ধ আমাকে অনেক সময়ে দেখাইয়াছেন। ক্রমে সে ঘনিষ্ঠতা দূর হইলেও তাঁহার লেখা আমাকে শুনাইতে তাঁহার সাধ ষোল আনা ছিল। সেইজন্য 'নায়ক' আমাকে পাঠাইতেন। আমিও তাঁহার রচনায় সুপ্রীত হইতাম। আমাকে গালি দিয়া লিখিলেও অনেক সময় রচনাকৌশলে প্রীতিলাভ করিতাম। কেবল আমিই যে প্রীতিলাভ করিতাম তাহা নহে, পাঠক মাত্রেই পাঁচকড়ি বাবুর লেখায় যে প্রীতি-লাভ করিতেন এ বিষয়ে সংশয় নাই।

জগতে সকল লোকেরই শত্রু মিত্র আছে বিশেষতঃ সংবাদপত্র সেবায় শত্রু মিত্র অধিক হইয়া থাকে, পাঁচকড়ি বাবুর পক্ষে এ নিয়ম অধিক মাত্রাতেই ফলিয়াছিল, জীবিতাবস্থায় যেরূপ ফলই হউক আজ তাঁহার মরণে সকলের মনেই একটা ব্যথা জাগিয়াছে, সকলেই বুঝিতেছে প্রত্যহ উপভোগ্য সাহিত্য রসাস্বাদ বর্ত্তমানে দুর্লভ হইল।

ইন্দ্রনাথ, অক্ষয়চন্দ্র, যোগেন্দ্রচন্দ্র ও ব্রহ্মবান্ধবে যে প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য ছিল—পাঁচকড়ি তাঁহাদের সহচর্য্যে সেই সমস্ত বৈশিষ্ট্যই নিজস্ব করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন। একে যে বৈশিষ্ট্য তাহা প্রগাঢ়তর হইতে পারে,—কিন্তু সকলের ভাব এক হৃদয়ে সম্যক্ আয়ত্ত করা অসাধারণ প্রতিভার লক্ষণ। ইন্দ্রনাথের রসিকতাপূর্ণ তীব্র ব্যঙ্গপটুতা ও প্রতিভাসমুজ্জ্বল বাগ্মিতা অক্ষয় চন্দ্রের সরস ভাষা ও ভাবগাম্ভীর্য্য যোগেন্দ্র চন্দ্রের বর্ণনপটুতা ও রচনা মাধুর্য্য, ব্রহ্মবান্ধবের প্রচলিত ভাষায় সরসভাবে বক্তব্যের বিন্যাস—ইহাই তাঁহাদের প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য। এই চতুর্ব্বিধ বৈশিষ্ট্যের বিশেষ পরিচয় পাঁচকড়ি বাবুর রচনাতে পাইয়াছি। সাধারণী, পূর্ব্বতন বঙ্গবাসী ও সন্ধ্যা যে মধুর ঝঙ্কারে দেশ মুগ্ধ করিত, পাঁচকড়ি বাবুর লেখনী-বীণায় সেই ঝঙ্কার ধ্বনিত

হইত, সেই বীণা আজ নীরব, বাঙ্গালা সংবাদপত্রের সেই মাধুরী যে কিরূপে রক্ষা হইবে তাহাই চিন্তার বিষয়। সেই অভাবেই দুঃখ। পাঁচকড়ির মরণে এই শোক সহৃদয় দেশবাসীর মনে জাগিয়া উঠিয়াছে; তাই বলি তাহার মৃত্যু শ্লাঘ্য তাহার মৃত্যু বরেণ্য।

যাও বাঙ্গালা সংবাদপত্রের কলকণ্ঠ কোকিল,—যাও সেইখানে যেখানে কেবলই নির্ম্মলতা,—আবিলতা একেবারেই নাই, যাও সেইখানে যেখানে কেবলই সরসতা বিরসতা একেবারেই নাই, যাও সেইখানে যেখাতে কেবলই উজ্জ্বলতা অন্ধকারের লেশ মাত্র নাই। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের এই অশীর্ব্বাদ।

তোমাকে বিদায় দিলাম বটে কিন্তু তোমার অনন্যাপত্য স্থবির পিতামাতার যে দুঃখ তাহা তাঁহাদের মরণই বিদায় দিবে; আর কেহ সে দুঃখ বিদায় দিতে পারিবে না। তাঁহারা জীবনে শোক পান নাই, একেবারেই ঘোরতর শোক—পুত্রশোক, যাঁদের শরীরে কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হয় নাই তাঁহার হৃদয়ে একেবারে শক্তিশেল পতন, যাঁহার চরণে ক্ষুদ্র যষ্টির আঘাতও হয় নাই তাঁহার মস্তকে বজ্রাঘাত। তবে আশা তঁহাদের ধর্ম্মবিশ্বাস আছে, যে ভাবের স্ফুলিঙ্গ এই শিক্ষা-বিকার সময়েও তোমার আচরণে দেখা যাইত তোমার পিতামাতার হৃদয়েও সেই শাস্ত্র বিশ্বাস পূর্ণ ধর্ম্মভাবের জ্বলন্ত মূর্ত্তি আছে—সে আলোকে শোকান্ধকার মন্দীভূত হইতে পারে। যাহা হইবার হইয়াছে, যাহা ঘটিবার ঘটিবে—কিন্তু মন মানে না, শাস্ত্রোপদেশ এ সময়ে যেন অকিঞ্চিৎকর। সুতরাং দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া এই আলোচনা সমাপ্ত করিলাম। ইতি

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন

শোক-সংবাদ

স্বর্গীয় সূর্য্যকুমার অগস্তি

গত ১৪ই অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, অপরাহ্ণ ৫টার সময়ে প্রসিদ্ধ ষ্টেটুটরি সিবিলিয়ান সূর্য্যকুমার অগস্তি মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। কোন গ্রন্থ লিখিয়া ইনি সাহিত্য-সমাজে খ্যাতি লাভ করেন নাই, কিন্তু ইনি নিজে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং অনেক ভাষার সাহিত্যে ইঁহার অধিকার ছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রদের ইতিহাসে ইঁহার নাম সুরক্ষিত আছে। প্রবেশিকা পরীক্ষা হইতে বি, এ পরীক্ষা পর্য্যন্ত ইনি ইঁহার সময়ের সকল পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন এবং ১৮৭৯ সনের এম. এ. পরীক্ষাতেও ইংরেজী দর্শন শাস্ত্রে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ইহার পরেই ১৮৮১ সনে দশ হাজার টাকার রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তি লাভ করেন তাহার পর বৎসর সে সময়কার ডেপুটিগিরির নূতন পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া উর্ত্তীর্ণ হয়েন। তিনি যখন ডেপুটিগিরি কর্ম্মে শিক্ষানবিশি করিতেছিলেন, তখন ইডেন

সাহেবের যত্নে প্রবর্ত্তিত ষ্টেটুটরি সিবিলসার্বিস পরীক্ষার সৃষ্টি হয় আর সে পরীক্ষাতেও তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। চাকুরী লইবার পর তিনি সিবিলিয়ানদের জন্য বিহিত সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পুরস্কার লাভ করেন ও কর্ম্মকালে ফরাসী, লাটিন ও

স্বর্গীয় সূর্য্যকুমার অগস্তি

পারস্য ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ছাত্র-জীবনে যে স্মৃতিশক্তির জন্য ইঁহার অসাধারণ খ্যাতি ছিল, বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত সে স্মৃতিশক্তি তাঁহার অটুট ছিল; গীতা প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ সম্পূর্ণ

কণ্ঠস্থ ছিল। ১৮৮২ হইতে ১৯১২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি সরকারী নানা বিভাগে নানা কাজ করিয়াছেন, এবং কর্ম্ম হইতে অবসর লইবার সময়ে ডিষ্ট্রীক্ট মেজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিতেছিলেন।

সরকারী চাকুরীর নিয়মের ফলেই হউক, অথবা আমাদের সামাজিক অবস্থার ফলেই হউক, যাঁহারা সরকারের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী, তাঁহারা জনসাধারণের নিকটে যথেষ্ট পরিচিত হইতে পারেন না। কিন্তু জনহিতকর কার্য্যে যে ইঁহার অনুরাগ ছিল ও জনসাধারণের সঙ্গে মিশিয়া কাজ করিতে যে তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন না তাহার অনেক পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। বঙ্গসাহিত্যের উন্নতির দিকে যে তাঁহার দৃষ্টি ছিল তাহার বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল মেদিনীপুরে সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশনের সময়ে; ঐ সম্মিলনীর অভ্যর্থনা সভার সভাপতিরূপে তিনি যে অভিভাষণ পড়িয়াছিলেন তাহা সুচিন্তিত বলিয়া আদৃত হইয়াছিল। ইঁহার নিবাস ও জন্মস্থান ছিল মেদিনীপুর জেলার গড়বেতায়।

দুনিয়ার খবর

ফিজির দিকে যে সকল ভারতবাসীরা আছে, তাহারা নিজেদের মধ্যে একটা সুশৃঙ্খলায় দল বাঁধিয়াছে ও সকল জাতি মিলিয়া এক হইয়াছে; সংবাদ এই যে, সেখানে হিন্দু মুসলমানেও প্রভেদ নাই। যাহারা নূতন করিয়া ফিজির দিকে যাইতে চায়, আগেকার অধিবাসীরা তাহাদিগকে সে দ্বীপে স্থায়ী হইবার পথে বাধা দিতেছে; কারণ নূতনেরা প্রভেদ মানিয়া চলিতে চায়।

বঙ্গদেশের শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর হর্ণেল হাহেব, হংকং বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস্‌চান্‌সেলর নিযুক্ত হইয়াছেন; আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি এ দেশের কাজ ছাড়িয়া যাইবেন।

ফিরিঙ্গীরা বসবাসের জন্য আণ্ডামান দ্বীপ পাইলেন; হয়ত বা আণ্ডামানের অভাব পূরাইবার জন্য বহুত সাগরে নূতন দ্বীপ মাথা তুলিয়াছে। এখনও সে দ্বীপ সাগরের জলের উপরে ৩০ ফিটের অধিক মাথা তোলে নাই; যাবজ্জীবন নির্ব্বাসনের অপরাধীরা এ দ্বীপে প্রেরিত হইবে না জানি, তবে এখানে গেলে তাহাদের সেটি কালাপানি ভোগ হইতে পারে।

মহীশূর রাজ্যে বিধান হইয়াছে, যে সেখানকার যে কোন প্রজা মালগুজারি বা টেক্স দেয়, তাহারা পুরুষ হউক বা স্ত্রী হউক, সকলেই রাষ্ট্র-শাসনের ব্যাপারে প্রজার প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে ভোট দিতে পারিবে। রাজলোকের নিকট হইতে মালগুজারি ও টেক্স নিতে যখন বাধা নাই, তখন তাহাদের টাকার সদ্ব্যবহারের ভারে তাহাদের ভোট থাকা উচিত, ইহাই হইয়াছে সেখানকার সিদ্ধান্ত।

হিমালয়ের উচ্চতম শিখরের সন্ধান নিতে গিয়া সন্ধানকারীরা হিমালয়ের অতি দুস্তর স্থানে তিব্বতীয়দের কয়েক উপনিবেশের আবিষ্কার করিয়াছেন। এখানে প্রায় অন্যের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য হইয়া অনেক লোক বাস করে, আর সেই লোকদের সকল রকমের শাসন বিধান করেন একজন বৌদ্ধ পুরোহিত। পুরোহিতদের মঠ আছে ছোট ছোট শৃঙ্গের উপর; লোকেরা প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেখানে গিয়া ধর্ম্ম-কথা শোনে। এত উচ্চ প্রদেশে আর কোথাও মানুষের বসতি নাই।

সিবিল সার্বিসের ইংরেজ চাকুরেদের আন্দোলনে যে কমিশন বসিয়াছে, তাহার সমক্ষে আমাদের দেশের তিন চারিজন পদস্থ ব্যক্তি তাঁহাদের এজাহারে বলিয়াছেন যে, পার্লামেণ্ট ও ষ্টেট সেক্রেটারির অধীনে না থাকিলে ভারত গবর্ণমেণ্টের কাজ চলিতে পারে না, এবং বহু সংখ্যায় ইংরেজ চাকুরে এদেশে কাজ না করিলে কোন কাজই ভাল হইতে পারে না। এই কয়েকজন ব্যক্তি আগামী ইংরেজী নববর্ষের দিন কি কি উপাধি পাইবেন, সে সংবাদ আমরা পাঠকদিগকে দিতে পারিব না। এই রকমের কয়েকজন পদস্থের বুদ্ধিতে যে আমরা অপদস্থ হইতেছি, তাহাই মনে করিয়া দিবার জন্য এ সংবাদ দেওয়া গেল।

* * *

আফ্রিকায় কংগ্রেস—পূর্ব্বআফ্রিকার ভারতবাসীরা মোম্বাসা বন্দরে কংগ্রেস করিবেনও উহার বৈঠক হইবে খৃষ্টমাসের ছুটিতে। এই প্রথম কংগ্রেসের সভায় শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুকে সভানেত্রী নির্ব্বাচন করিয়া নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে; তবে শ্রীমতী সরোজিনী জানুয়ারি মাসের পূর্ব্বে জাহাজ পাইবেন না; কাজেই কংগ্রেস বিলম্বে বসিবে।

* * *

নেপোলিয়নের হুঁকা—নেপোলিয়ন বোনাপার্ট টিপু সুলতানকে যে হুঁকা উপহার দিয়াছিলেন, সেটি কলিকাতার প্রদর্শনীতে আনা হইয়াছে। হুঁকার প্রথম চলনের সময় ফরাসীরা খুব সম্ভব বাঙ্গালা দেশে উহা দেখিয়াছিলেন; কারণ তখন হুঁকার ফরাসী নাম হইয়াছিল নারগিল (Nargil ও Nargile)। সত্য বটে, আমাদের নারকেল শব্দটি মাদ্রাজের পশ্চিম উপকূলের কেরল ভাষার নাল্‌কেল শব্দের রূপান্তর, কিন্তু সেই পশ্চিম উপকূলে তখন হুঁকায় তামাক খাওয়া চলিত হয় নাই; তাহার পর আবার নারকেল শব্দটি গোড়ায় সংস্কৃতে গৃহীত হইলেও ওড়িশায় ও ভারতের পশ্চিম প্রদেশে উহার নাম হইয়াছিল ও আছে—নড়িয়া।

* * *

ছিটে ফোঁটা

আত্ম-ত্যাগ— শ্রেণীর মশার শরীরে মানুষের রোগের বীজ জন্মে, সে মশাগুলি নেশায় বিভোর হইবার মত খাকে, আর যখন হুল ফুটাইয়া মানুষের রক্তে রোগের বীজ ঢালে, তখন অতি অসাবধানে থাবড়া মারিলে তাহারা মরে। এই মশারা জীবনের মায়া ছাড়িয়া— অতএব নিঃস্বার্থভাবে—আমাদের অপকার করে। কাজের ফল উপকার কি অপকার, তাহার বিচার যখন মাহাত্ম্যের বিচারে হয়,—অর্থাৎ মাহাত্ম্যের বিচার যখন নিঃস্বার্থ আত্ম-ত্যাগে, তখন এই মশারাই শ্রেষ্ঠ, মহাশয় ও মহাপুরুষ।

আমাদের সেকালের কবিরা না বুঝিয়া মশাকে খলের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন; অর্থাৎ মশারা আগে আসিয়া পায়ে পড়ে, তাহার পর কানের কাছে "গুণ" গান করে, আর পরে শরীরের রক্ত শোষে; অর্থাৎ সর্ব্বম্ খলস্য চরিতম্ মশকঃ করোতি। যাহাই হউক, ইহারা আত্ম-ত্যাগী, অতএব সাধু।

ভক্তের অভক্তি

বর্ণে কর্ণে কালাঠাকুর, বসিয়ে মোরে দাঁড়ে,—
—হাত বুলিয়ে ঘাড়ে,
পড়িয়ে যাচ্ছেন অবিরাম "পড় বাবা আত্মারাম";
বিদ্যা ত না বাড়ে।
তিনি আমার সত্তাটুকু আমসত্বের মত,
(যত্ন নিয়ে কত)
শুকিয়ে রাখ্‌বেন্ পরিপাটি—ছাড়িয়ে খোসা ফেলে আঁটি;
রইব কি অক্ষত ?
ঘুরিয়ে টেকোয়, পাকিয়ে মোরে সূতারূপে ঠাকুর,
কাজটি চালান মাকুর।
আমি টানা, অমি পোড়েন, খদ্দরে মোর স্বরাজ গড়েন;
ব্রহ্মা বলেন "আঁকুর"।
কালাগো, তোল না কানে, যতই ডাক্ ছাড়ি,
চেঁচিয়ে ছিঁড়ে নাড়ী।
দল পাকিয়ে তবু লোকে তোমার দোরে মাথা ঠোকে,
আমি কচ্ছি আড়ি।

পৌষে

শিক্ষা বিষয়ে ডিরেক্টরের রিপোর্ট—এক দিকে উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা অন্য দিকে লোকসাধারণের মধ্যে শিক্ষার গোড়াপত্তন হইলেই দেশের সকল রকমের উন্নতির আশা করা যায়; বঙ্গদেশে ১৯২২ সনের মার্চ মাস পর্য্যন্ত ৫ বৎসর ধরিয়া ঐ দুই দিকেই শিক্ষার ব্যবস্থার কিরূপে বাড়িয়াছে ও কমিয়াছে, সে বিষয়ে শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর একখানি বিস্তৃত পুথাঠ্য রিপোর্ট লিখিয়াছেন। ডিরেক্টর বলেন যে, শাসনসংস্কারের নূতন পদ্ধতিতে যখন দেশের লোকের হাতে শিক্ষাবিভাগের ভার দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছিল, তখন আশা ছিল, সকল দিকেই শিক্ষার প্রসার বাড়িবে; কিন্তু তাহা হয় নাই। না হইবার প্রধান কারণ প্রথম কারণ, দেশময় আড়ির আন্দোলন, আর দ্বিতীয় কারণ সরকারি তহবিলে টাকার নূতন গবর্ণমেণ্ট সুরু হইবার সময়েই রাজকোষে ঘাটতি ছিল ২ কোটী টাকারও অধিক,

আবার তাহার পরে ১৯২০-২১ সনে প্রত্যাশিত বার্ষিক প্রায় ১১ কোটী বার লক্ষ টাকা আয়ের স্থলে—আয় হইয়াছিল—৯ কোটী সাতাশী লক্ষ। এই সোয়া কোটী টাকার ঘাটতির প্রধান কারণ ছিল আড়ির আন্দোলনে ছাত্রদের লেখাপড়া ছাড়া।

ডিরেক্টর বলেন যে আড়ির আন্দোলনে আইন কলেজে, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ও এম্ এ-এম্-এস্-সি পড়িবার কলেজে বেশি গোল ঘটে নাই; খুব বেশি গোল ঘটিয়াছিল, হাই স্কুলগুলিতে ও বি এ পর্য্যন্ত পড়িবার কলেজগুলিতে। আন্দোলনের বেগের সময়ে কিছুদিন পর্য্যন্ত কলিকাতার কলেজগুলি ও মফঃস্বলের কয়েকটি কলেজ বন্ধ করা হইয়াছিল। কলেজের প্রথম বার্ষিক ও তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে শতকরা ৪২ জন ছাত্র কম পড়িয়াছিল ও পরে অনেক ছাত্রেরা যখন ফিরিল,—তখন দেখা গেল যে শতকরা ২৮ জন ছাত্র একেবারে কলেজ ছাড়িয়াছে। হাই স্কুলগুলির ছাত্র-সংখ্যা কমিয়াছিল শতকরা ২০।২১, কিন্তু সে বৎসরের প্রবেশিকা পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা তেমন কমে নাই। সরকারী স্কুল-কলেজ অপেক্ষা প্রাইবেট স্কুল-কলেজগুলিতেই অধিক ক্ষতি হইয়াছিল।

আড়ির আন্দোলনে ছাত্রেরা সহজে মাতিয়াছিল এই কারণে, যে অনেক দিন হইতেই কথা উঠিয়াছিল যে কলেজে শিক্ষা যে ভাবে চলিতেছে, তাহা সম্পূর্ণ উপযোগী নয়, আর সে শিক্ষা পাইবার পর রোজগারের পথ পরিষ্কার হয় না। ১৮৮২ অব্দে যে শিক্ষা-কমিশন বসিয়াছিল, তাহাতেও প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি বদ্‌লাইবার সুপারিশ ছিল, এবং হালে যে ইউনিভার্সিটি কমিশন বসিয়াছিল, তাহাতেও শিক্ষাবিভাগের সকল দিকের নানা প্রকার সংস্কারের প্রস্তাব ছিল। এই কারণেই আন্দোলনের সময় প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির উপর সহজে অভক্তি জন্মিতে পারিয়াছিল। শিক্ষা-সংস্কারের জন্য সেড্‌লার কমিশনে যে সেকল উপাদেয় সুপারিশ হইয়াছে, সেগুলি অনুসরণ করিয়া কাজ করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে টাকার অভাবে সম্ভব হয় নাই।

ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে এ কথা উল্লিখিত হইয়াছে যে গবর্ণমেণ্টের টাকা যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর সুবিধা হইয়াছে; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে, যে বিশ্ববিদ্যালয়ের তীব্র সমালোচনায় নানা লোকে নানা কথা কহিয়াছে, কিন্তু মোটের উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ ভালই হইয়াছে।

গত পাঁচ বৎসরে তিনটি আর্ট কলেজ বাড়িয়াছে, কিন্তু ছাত্রসংখ্যা অনেক কমিয়াছে। আর্টস্ কলেজগুলিতে ছাত্র হইত অধিক, কারণ বি. এ. পাশ না করিলে উকিল হওয়া বা সরকারি চাকরি পাওয়া অসম্ভব। এখন কিন্তু লোকে দেখিয়াছে যে চাকুরি মেলা কষ্ট, আর ওকালতির ক্ষেত্রে স্থান পাওয়া দায়। এটা যে হালেই লোকে বুঝিয়াছে, তাহা নয়; ১৮৮২ সনের কমিশনের রিপোর্টেও এ দুর্গতির কথা উল্লিখিত ছিল। সেড্‌লার কমিশনের সুপারিশ ধরিয়া কাজ করিলে ব্যবহারিক শিল্প শিখিবার ও অন্যান্য রকমের রোজগারের শিক্ষা পাইবার সুবিধা হইতে পারে,

কিন্তু সহসা নাকি পুরাতন ঠাট বদ্‌লাইয়া নূতন কিছু করা সহজ নয়, আর সুশিক্ষার নূতন বন্দোবস্ত করিতে গেলে যত টাকা চাই, তাহা গবর্ণমেণ্টের নাই।

পাঁচ বৎসর আগে হাই স্কুল ছিল ৬৯৮টি, আর ১৯২২ পর্য্যন্ত উহার সংখ্যা ১৮০টি বাড়িয়াছে; কিন্তু ছাত্রের সংখ্যা কমিয়া ২ লক্ষ ১৮ হাজারের স্থলে ১ লক্ষ ৯০ হাজার হইয়াছে। মিড্‌ল্ ইংরেজী স্কুল কিন্তু অনেক কমিয়া গিয়াছে; কাজেই ছাত্রসংখ্যাও ঢের কমিয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষায় ও মধ্যশিক্ষায় দেশের লোকে ইংরেজী শিক্ষা চায়; তাই খাঁটি ভারনাকিউলার বিদ্যালয় অনেক দিন হইতেই কমিয়া আসিতেছিল। অনেক স্থলে মধ্য-ইংরেজী স্কুলগুলি হাই-স্কুলে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে ছাত্রসংখ্যার হ্রাসের কারণ ধরা যায় না। মোটের উপর হাই স্কুলে ছাত্র কমিয়াছে সাড়ে সাতাশ হাজার এবং মধ্য ইংরেজী স্কুলে কমিয়াছে প্রায় বাহান্ন হাজার ছাত্র। এই ঘাটতির কারণ আড়ির আন্দোলন, কিন্তু তাহার সঙ্গে লোকের সাধারণ দারিদ্রও একটা কারণ বটে। শিক্ষা পাইবার খরচ এখন দেড়া বাড়িয়াছে,—কলেজে পড়িতে গেলে ৩০৲ টাকার এক পয়সা কমে চলে না।

কথা উঠিয়াছে বটে যে রোজগারের উপায়ের জন্য ব্যবহারিক শিল্প শিখিবার বিদ্যালয় বেশি হওয়া চাই, কিন্তু যে অল্প কয়েকটি ঐ শ্রেণীর টেক্‌নিকাল স্কুল আছে, তাহাতে ছাত্র হয় না ও সেগুলির উন্নতি নাই।

প্রাইমারি স্কুলগুলির উন্নতি নাই দেখিয়া ডিরেক্টর বিস্মিত হইয়াছেন, কারণ তিনি বলিয়াছেন যে দেশের লোকের পক্ষে শাসনের দায়িত্ব লইতে হইলে অথবা স্বরাজ আনিতে হইলে এই শিক্ষার প্রসার চাই, অথচ এদেশে উহা বাড়িতেছে না। বিস্ সাহেব যে নূতন ধরণের প্রাইমারি স্কুল বাড়াইবার চেষ্টা করিয়া তেমন কৃতকার্য্য হন নাই, তাহাও উল্লিখিত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত আমরা ডিরেক্টরের খাঁটি মন্তব্যই লিখিলাম। এবারে এই প্রসঙ্গে কেবল এইটুকু বলিব যে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে উপযোগী পদ্ধতিতে প্রাথমিক শিক্ষা বাড়াইবার চেষ্টা হয় নাই; বিস্ সাহেবের উদ্যোগ যে কার্য্যকরী হইতে পারে না, তাহা আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছিলাম। কথা উঠিয়াছে এই যে, কি করিলে লোকসাধারণকে শিক্ষার দিকে আকর্ষণ করা যায়, তাহা গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীরা না বুঝিয়াই বিলাতী আদর্শে অথবা খিচুড়ি আদর্শে কাজ চালাইতেছেন, দেশের লোকেরা স্থায়ী উন্নতির উপায় না ভাবিয়া চক্‌চকে আন্দোলনেই বেশি দিয়াছেন।

স্বরাজের গোড়া—আত্ম-সম্মান-বোধ না থাকিলে মানুষ নিজের পায়ে দাঁড়াইয়া খাঁটি কর্ত্তব্য কাজও করিতে পারে না,—স্বরাজ আনা ত দূরের কথা। যে আত্ম-সম্মান-বোধ জের গোড়ায়, তাহা এ দেশে ধীরে ধীরে বাড়িতেছে। উহা বাড়িতেছে দেখিয়াই রাজসরকার ই শাসন সংস্কারের উদ্যোগ করিতেছেন; যতদিন দরখাস্ত করিয়া আইনের ও ন্যায়ের

বিচারের দোহাই দিয়া অধিকারের দাবির নামে দেশের লোকে ভিক্ষা চাহিয়াছিল, ততদিন দাতার হাত গলিয়া এক ফোঁটাও কিছু পড়ে নাই।

সুখ-সুবিধার ঠাট বজায় রাখিবার স্বার্থে এক শ্রেণীর ধনীসম্প্রদায় আত্মসম্মান উপেক্ষা করিতেন জানা ছিল; সে সম্প্রদায়ের মধ্যেও সম্মান-বোধ ও সৎসাহস বাড়িতেছে। বোম্বাই অঞ্চলে কাঠিয়াবাড় প্রদেশের রাজকোট রাজ্যের অধিপতি ঠাকুর সাহেব, সে প্রদেশের ছোট ছোট রাজাদিগকে লইয়া একটা মন্ত্রণা-সভা গড়িবার উদ্যোগে অনেক রাজাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন; তিনি তাঁহার এই উদ্যোগের কথা বোম্বাইএর গবর্ণরকে যখন জানাইলেন, তখন পোলিটিকাল এজেণ্ট রাজাকে লিখিলেন, যে সেরূপ ভাবে সভা করিবার অনুকূলে রাজ-সরকারের অভিমতি নাই। রাজা তখন উত্তরে জানাইলেন, যে তিনি যখন একটা হিতকর কাজের জন্য অন্য রাজাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, তখন তিনি রাজ-সরকারের অন্যায় বাধা মানিয়া নিজে অপমানিত হইবেন না ও অন্য রাজাদিগকে অপমানিত হইতে দিবেন না। এই ডিসেম্বর মাসেই রাজার প্রস্তাবিত মন্ত্রণা-সভা বসিবে! সৎসাহস কেবল নিমন্ত্রণকারী রাজার একার নহে, যাঁহারা নিমন্ত্রিত হইয়া সভায় আসিতেছেন, তাঁহাদেরও সৎসাহস ও মহত্ত্ব আছে।

কাহারও তোয়াক্কা না রাখিয়া রুখিয়া চলিবার নাম আত্মসম্মান রক্ষা নয়; উহার নাম ঔদ্ধত্য। নির্ভীকভাবে স্থিরপ্রাণতায় কর্ত্তব্যপালনেই আত্মসম্মান-বোধের পরিচয়। দেশের আশার কথা যে, দেশের সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই ধীরে ধীরে প্রকৃত আত্মসম্মন বোধ বাড়িতেছে।

ভাবী ব্যবস্থাপক সভা—আগামী ব্যবস্থাপক সভাগুলির জন্য যাঁহারা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন ও হইতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে স্বরাজ-সাধনের দলের লোক অধিক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন দেখিয়া সরকারের পক্ষ হইতে নানা কথা উঠিতেছে। সরকারের ভয় যে হয়ত তাঁহাদের অভিপ্রেত বিধান চালাইতে গোল হইবে। ইহার মধ্যেই দেখা গিয়াছে, যে মাদ্রাজের গবর্ণর যাঁহাদিগকে মিনিষ্টার নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রতি দেশের লোকের আস্থা নাই বলিয়া নির্ব্বাচিত সভ্যেরা তাঁহাদিগকে তাড়াইবার উদ্যোগ করিয়াছেন। ইহার প্রতিবিধানের জন্য রাজ-সরকার ঠিক কি করিবেন জানা নাই; তবে স্বয়ং বড়লাট এই কথা বলিয়া শাসাইয়াছেন, যে যদি সদস্যেরা সভার কাজ ভণ্ডুল করিতে বসেন, তবে একেবারে তাঁহাদের দেওয়া "রিফর্ম" তুলিয়া দিবেন। সরকারের পক্ষের অনেক পত্রিকায় লিখিত হইতেছে, যে যদি ব্যবস্থাপক সভায় সরকারের অভিমত বিধানের উল্টাটি ধার্য্য হয়, তবে প্রথমে লাট বাহাদুরেরা "নেতি" চালাইবার ক্ষমতায় সদস্যদের বিধান রদ করিয়া দিবেন, পরে প্রয়োজন হইলে সভাই বাতিল করিয়া দিবেন। এ পন্থা ধরিলে শান্তি-জলের ছড়া পড়িবে, না আগুন জ্বলিবে?

দেশের লোকের মন না বুঝিয়া ও নির্ব্বাচিতদের মত না লইয়া মিনিষ্টার নিযুক্ত করা হয় কেন? যাহা কিছু সরকারের অভিপ্রেত, তাহাই চালাইবার সুবিধার জন্য যদি ঐ বিধান হয়, তবে

অধিকাম্ন-দানের কথা হয় মিথ্যা, ও সভ্য-নির্ব্বাচন করা দাঁড়ায় তামাসায়। বিনা দায়িত্ব বোধে সভার কাজ ভণ্ডুল করিবার জন্যই যদি সদস্যেরা লাগেন, তবে তাঁহাদের কাজ হইবে অতি গর্হিত; কিন্তু সরকারি প্রস্তাব না মানিলেই যদি দোষের হয়, তবে ভুয়া সভা না রাখিলেই ভাল।

নূতন সভাগুলি কি প্রণালীতে চালাইতে হইবে, তাহা স্থির করিবার জন্য প্রাদেশিক সকল ব্যবস্থাপক সভার প্রেসিডেণ্টেরা দিল্লীতে আহূত হইয়াছেন। নবজাত সভাগুলির ভবিষ্যৎ ভাগ্যের কোথায় কিরূপ কোষ্ঠী কাটা হইবে, কে জানে?

সুখের বিষয় আমাদের বাঙ্গলার গবর্ণর বিনা বিরোধে ব্যবস্থাপক সভার কাজ চালাইবার উদ্দেশ্যে স্বরাজসাধনের দলের নেতা শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাসকে বাড়ীতে ডাকিয়া অনেক কাজের কথা বিচার করিয়াছেন। গবর্ণর বাহাদুর দাস মহাশয়কে কোন একটি স্থান হইতে নির্ব্বাচিত হইয়া আসিয়া মিনিষ্টারি লইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। দাস মহাশয় নিজের দলের লোকের অভিমতি জানিয়া উত্তর দিবেন বলিয়াছিলেন, এবং ১৬ই ডিসেম্বর নিজের দলের লোকের সভা বসাইয়াছিলেন। সভার অভিমতি লইয়া তিনি এখন গবর্ণরকে জানাইয়াছেন যে, তিনি বা তাঁহাদের দলের লোকেরা কেহ মিনিষ্টারি লইতে পারেন না। কারণ এখনকার ব্যবস্থাপক সভা যেভাবে গড়া, তাঁহারা তাহা রক্ষা করিতে পারেন না; বরং উহা ভাঙ্গিয়া নূতন পন্থা চালাইতে চাহেন। আমরা এ সম্পর্কে এইটুকু বলিতে পারি যে, গবর্ণর বাহাদুর যে বিলাতী নীতি অনুসরণ করিয়া দেশের লোককে ডাকিয়া কাজ করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের মান বাড়িয়াছে।

কলিকাতা প্রদর্শনী—প্রদর্শনী বা এক্‌জিবিশন নামের মেলা বসে ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে। এখানে কৃতী শিল্পীদের শিল্পজাত সামগ্রীর বিস্তৃত বিজ্ঞাপন দিবার সুবিধা হয়, আর মানুষের সৃষ্টি-কুশলতায় কত কি হইতে পারে, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া সুচতুর ব্যবসায়ীরা এই ক্ষেত্রে বুঝিয়া লন যে কোন্ দেশে কোন্ জাতি কিরূপ সামগ্রী চায় আর সেই সামগ্রী তাহারা কত ব্যয়ে সংগ্রহ করে। স্বাধীন দেশের স্বাধীন বাণিজ্যে ইহাতে অনেক উপকার হয়। এইরূপ প্রদর্শনীতে এবং শ্রমশিল্প বিষয়ে সরকারি অনেক রিপোর্টে ভারতের শিল্পজাত পদার্থের বিবরণ পাইয়া ও লোকসাধারণের রুচি বুঝিয়া ইউরোপীয়েরা আমাদের প্রার্থিত সামগ্রীগুলি সস্তায় তৈরি করিয়া খুব সস্তা দরে আমাদিগকে দিয়াছেন, আর ইহারই ফলে আমাদের শিল্পীদের অন্ন মারা গিয়াছে। এদেশে আগে কয়েকটি পাকা রং তৈরি করিবার বিদ্যা জানা ছিল, আর সে সময়ে সে বিদ্যা ইউরোপে জানা ছিল না; ইউরোপীয়েরা আমাদের রং তৈরির হদিশটুকু ধরিয়া ফেলিয়া সে হদিশের উপর নূতন কৌশল চড়াইয়া নূতন পাকা রং সৃষ্টি করিলেন, এবং আমাদের হাটে বাজারে রং বেচিলেন। ফলে দাঁড়াইয়াছে যে, আমাদের শিল্পীরা রং তৈরির সুবিধা না পাইয়া দুই এক পুরুষের মধ্যেই আপনাদের হাতের দশ ভুলিয়া গিয়াছে, এবং এখন ইউরোপীয়েরা না দিলে,

DOUBLE COLOUR PAGE

বিচারের দোহাই দিয়া অধিকারের দাবির নামে দেশের লোকে ভিক্ষা চাহিয়াছিল, ততদিন দাতার হাত গলিয়া এক ফোঁটাও কিছু পড়ে নাই।

সুখ-সুবিধার ঠাট বজায় রাখিবার স্বার্থে এক শ্রেণীর ধনীসম্প্রদায় আত্মসম্মান উপেক্ষা করিতেন জানা ছিল; সে সম্প্রদায়ের মধ্যেও সম্মান-বোধ ও সৎসাহস বাড়িতেছে। বোম্বাই অঞ্চলে কাঠিয়াবাড় প্রদেশের রাজকোট রাজ্যের অধিপতি ঠাকুর সাহেব, সে প্রদেশের ছোট ছোট রাজাদিগকে লইয়া একটা মন্ত্রণা-সভা গড়িবার উদ্যোগে অনেক রাজাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন; তিনি তাঁহার এই উদ্যোগের কথা বোম্বাইএর গবর্ণরকে যখন জানাইলেন, তখন পোলিটিকাল এজেণ্ট রাজাকে লিখিলেন, যে সেরূপ ভাবে সভা করিবার অনুকূলে রাজ-সরকারের অভিমতি নাই। রাজা তখন উত্তরে জানাইলেন, যে তিনি যখন একটা হিতকর কাজের জন্য অন্য রাজাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, তখন তিনি রাজ-সরকারের অন্যায় বাধা মানিয়া নিজে অপমানিত হইবেন না ও অন্য রাজাদিগকে অপমানিত হইতে দিবেন না। এই ডিসেম্বর মাসেই রাজার প্রস্তাবিত মন্ত্রণা-সভা বসিবে! সৎসাহস কেবল নিমন্ত্রণকারী রাজার একার নহে, যাঁহারা নিমন্ত্রিত হইয়া সভায় আসিতেছেন, তাঁহাদেরও সৎসাহস ও মহত্ত্ব আছে।

কাহারও তোয়াক্কা না রাখিয়া রুখিয়া চলিবার নাম আত্মসম্মান রক্ষা নয়; উহার নাম ঔদ্ধত্য। নির্ভীকভাবে স্থিরপ্রাণতায় কর্ত্তব্যপালনেই আত্মসম্মান-বোধের পরিচয়। দেশের আশার কথা যে, দেশের সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই ধীরে ধীরে প্রকৃত আত্মসম্মন বোধ বাড়িতেছে।

ভাবী ব্যবস্থাপক সভা—আগামী ব্যবস্থাপক সভাগুলির জন্য যাঁহারা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন ও হইতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে স্বরাজ-সাধনের দলের লোক অধিক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন দেখিয়া সরকারের পক্ষ হইতে নানা কথা উঠিতেছে। সরকারের ভয় যে হয়ত তাঁহাদের অভিপ্রেত বিধান চালাইতে গোল হইবে। ইহার মধ্যেই দেখা গিয়াছে, যে মাদ্রাজের গবর্ণর যাঁহাদিগকে মিনিষ্টার নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রতি দেশের লোকের আস্থা নাই বলিয়া নির্ব্বাচিত সভ্যেরা তাঁহাদিগকে তাড়াইবার উদ্যোগ করিয়াছেন। ইহার প্রতিবিধানের জন্য রাজ-সরকার ঠিক কি করিবেন জানা নাই; তবে স্বয়ং বড়লাট এই কথা বলিয়া শাসাইয়াছেন, যে যদি সদস্যেরা সভার কাজ ভণ্ডুল করিতে বসেন, তবে একেবারে তাঁহাদের দেওয়া "রিফর্ম" তুলিয়া দিবেন। সরকারের পক্ষের অনেক পত্রিকায় লিখিত হইতেছে, যে যদি ব্যবস্থাপক সভায় সরকারের অভিমত বিধানের উল্টাটি ধার্য্য হয়, তবে প্রথমে লাট বাহাদুরেরা "নেতি" চালাইবার ক্ষমতায় সদস্যদের বিধান রদ করিয়া দিবেন, পরে প্রয়োজন হইলে সভাই বাতিল করিয়া দিবেন। এ পন্থা ধরিলে শান্তি-জলের ছড়া পড়িবে, না আগুন জ্বলিবে?

দেশের লোকের মন না বুঝিয়া ও নির্ব্বাচিতদের মত না লইয়া মিনিষ্টার নিযুক্ত করা হয় কেন? যাহা কিছু সরকারের অভিপ্রেত, তাহাই চালাইবার সুবিধার জন্য যদি ঐ বিধান হয়, তবে

অধিকার-দানের কথা হয় মিথ্যা, ও সভ্য-নির্ব্বাচন করা দাঁড়ায় তামাসায়। বিনা দায়িত্ব বোধে সভার কাজ ভণ্ডুল করিবার জন্যই যদি সদস্যেরা লাগেন, তবে তাঁহাদের কাজ হইবে অতি গর্হিত; কিন্তু সরকারি প্রস্তাব না মানিলেই যদি দোষের হয়, তবে ভুয়া সভা না রাখিলেই ভাল।

নূতন সভাগুলি কি প্রণালীতে চালাইতে হইবে, তাহা স্থির করিবার জন্য প্রাদেশিক সকল ব্যবস্থাপক সভার প্রেসিডেণ্টেরা দিল্লীতে আহূত হইয়াছেন। নবজাত সভাগুলির ভবিষ্যৎ ভাগ্যের কোথায় কিরূপ কোষ্ঠী কাটা হইবে, কে জানে?

সুখের বিষয় আমাদের বাঙ্গলার গবর্ণর বিনা বিরোধে ব্যবস্থাপক সভার কাজ চালাইবার উদ্দেশ্যে স্বরাজসাধনের দলের নেতা শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাসকে বাড়ীতে ডাকিয়া অনেক কাজের কথা বিচার করিয়াছেন। গবর্ণর বাহাদুর দাস মহাশয়কে কোন একটি স্থান হইতে নির্ব্বাচিত হইয়া আসিয়া মিনিষ্টারি লইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। দাস মহাশয় নিজের দলের লোকের অভিমতি জানিয়া উত্তর দিবেন বলিয়াছিলেন, এবং ১৬ই ডিসেম্বর নিজের দলের লোকের সভা বসাইয়াছিলেন। সভার অভিমতি লইয়া তিনি এখন গবর্ণরকে জানাইয়াছেন যে, তিনি বা তাঁহাদের দলের লোকেরা কেহ মিনিষ্টারি লইতে পারেন না। কারণ এখনকার ব্যবস্থাপক সভা যেভাবে গড়া, তাঁহারা তাহা রক্ষা করিতে পারেন না; বরং উহা ভাঙ্গিয়া নূতন পন্থা চালাইতে চাহেন। আমরা এ সম্পর্কে এইটুকু বলিতে পারি যে, গবর্ণর বাহাদুর যে বিলাতী নীতি অনুসরণ করিয়া দেশের লোককে ডাকিয়া কাজ করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের মান বাড়িয়াছে।

কলিকাতা প্রদর্শনী—প্রদর্শনী বা এক্‌জিবিশন নামের মেলা বসে ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে। এখানে কৃতী শিল্পীদের শিল্পজাত সামগ্রীর বিস্তৃত বিজ্ঞাপন দিবার সুবিধা হয়, আর মানুষের সৃষ্টি-কুশলতায় কত কি হইতে পারে, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া সুচতুর ব্যবসায়ীরা এই ক্ষেত্রে বুঝিয়া লন যে কোন্ দেশে কোন্ জাতি কিরূপ সামগ্রী চায় আর সেই সামগ্রী তাহারা কত ব্যয়ে সংগ্রহ করে। স্বাধীন দেশের স্বাধীন বাণিজ্যে ইহাতে অনেক উপকার হয়। এইরূপ প্রদর্শনীতে এবং শ্রমশিল্প বিষয়ে সরকারি অনেক রিপোর্টে ভারতের শিল্পজাত পদার্থের বিবরণ পাইয়া ও লোকসাধারণের রুচি বুঝিয়া ইউরোপীয়েরা আমাদের প্রার্থিত সামগ্রীগুলি সস্তায় তৈরি করিয়া খুব সস্তা দরে আমাদিগকে দিয়াছেন, আর ইহারই ফলে আমাদের শিল্পাদের অন্ন মারা গিয়াছে। এদেশে আগে কয়েকটি পাকা রং তৈরি করিবার বিদ্যা জানা ছিল, আর সে সময়ে সে বিদ্যা ইউরোপে জানা ছিল না; ইউরোপীয়েরা আমাদের রং তৈরির হদিশটুকু ধরিয়া ফেলিয়া সে হদিশের উপর নূতন কৌশল চড়াইয়া নূতন পাকা রং সৃষ্টি করিলেন, এবং আমাদের হাটে বাজারে রং বেচিলেন। ফলে দাঁড়াইয়াছে যে, আমাদের শিল্পীরা রং তৈরির সুবিধা না পাইয়া মাত্র এক পুরুষের মধ্যেই আপনাদের হাত দশ ভুলিয়া গিয়াছে, এবং এখন ইউরোপীয়েরা না দিলে,

DOUBLE COLOUR PAGE

আমরা আর পাকা রং পাই না। একটি দৃষ্টান্তে যাহা বলা গেল, সেইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত আছে। ১৮৮৩ সনে কলিকাতায় মহামেলা বসিবার সময়ে কবি হেমচন্দ্র তাঁহার "হায় কি হলো" কবিতায় লিখিয়াছিলেন—

দেশের শিল্প কারিগুরি শিখ্‌বে বিলাতীরা,
অন্নাভাবে দুদিন বাদে মর্‌বে এদেশীরা।
হাস্‌বে কত একজিবিশন দেশের ভাল করে;
খেতে অন্ন নাইক যাদের—একি তাদের তরে?

যাহাই হউক, বিলাতে মহা সমারোহে সারা বৃটিশ সম্রাজ্যের শিল্প-কৌশলের পরিচয়ে একজিবিশন বসিবে সেই টেম্‌স্ নদীর কূলে, আর এখানে একটা একজিবিশন বসিয়াছে গঙ্গার কূলে।

বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে—বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি-বিধানের জন্য সেড্‌লার কমিশনে যে সকল অতি দরকারি সুপারিশ ছিল, সেগুলি সরকারি তহবিলের টাকার অভাবে চালাইতে পারা যাইতেছে না বলিয়া অনেকবার সরকারি মন্তব্যে প্রকাশিত হইয়াছে। কিছুদিন পরে সেই সুপারিশগুলি বস্তাপচা পুরাতন সুপারিশ বলিয়া উপেক্ষিত না হইলে হয়। ভারতে যতগুলি বিশ্ববিদ্যালয় আছে, তাহাদের মধ্যে কিরূপে একটা সহযোগের সম্পর্ক সৃষ্টি করা যায়, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট করা যায়, তাহার জন্য বড়লাট বাহাদুর একটি বিচার সভা করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। এই প্রস্তাবিত সভায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন প্রতিনিধি থাকিবেন বলিয়া সরকারি মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে; কলিকাতার সেনেট সভায় এই সরকারি মন্তব্য আলোচিত হইয়া স্থির হইয়াছে যে, এরূপ গুরুতর বিষয়ের বিচারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাত জন প্রতিনিধি থাকা উচিত; সেনেট সভা গবর্ণমেণ্টকে যে সাতজন প্রতিনিধির নাম করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই শিক্ষা বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। আশা করি গবর্ণমেণ্ট, কলিকাতা সেনেটের এই প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন। ভবিষ্যতের উন্নতি সংকল্পে যে বিচার বৈঠক বসিবে তাহার ফল ভালই হইবে মনে করিতে পারি; কিন্তু উপস্থিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভাব পুরাইবার দিকে বিশেষ উদ্যোগ না দেখিয়া আমরা উদ্বিগ্ন আছি।

Printed and published by Jyotish Chandra Ghosh at the Cotton Press, 57, Harrison Road. Calcutta.

KONNAGAR PUBLIC LIBRARY Estd. 1853

বঙ্গবাণী

"আবার তোরা মানুষ হ"

২য় বর্ষ ১৩২৯-৩০ | মাঘ | দ্বিতীয়ার্দ্ধ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

প্রবাসী বাঙ্গালী

তীর্থরাজ প্রয়াগে প্রবাসী বঙ্গ-সন্তানগণের এই সম্মিলন কেবল যে প্রবাসী বাঙ্গালীর মিলন ও আদরের মধুর সম্মিলন, তাহা নহে, আমার মনে হয় ইহা সমগ্র বাঙ্গালী জাতির গৌরব ও গরিমার মহামহিমময় সুমধুর সম্মিলন।

কোন্ কারণে সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী বঙ্গভূমির সুকোমল অঙ্ক হইতে বিচ্যুত হইয়া উত্তর ভারতে চিরপ্রবাসী কতিপয় বাঙ্গালী জন্মভূমি জনক-জননী ও বুকভরা মধুর পুণ্য স্মৃতির প্রণোদনায় এই সহায়হীন শুষ্কপ্রকৃতি কঠোর দেশে বহু বাধা ব্যাপিয়া যাহা কিছু করিয়াছে, তাহা দেখিয়া শুনিয়া ও ভাবিয়া প্রত্যেক বাঙ্গালীই যে আনন্দ, গর্ব্ব ও শ্লাঘা অনুভব করিয়া থাকেন বা করিতে বাধ্য তাহা কে অস্বীকার করিবে?

এই বিষয়টী ভাল করিয়া তলাইয়া বুঝিতে হইলে কিছু ঐতিহাসিক আলোচনা আবশ্যক, আশা করি এস্থলে তাহা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক না হইতে পারে।

বঙ্গদেশের সহিত উত্তরপশ্চিম প্রদেশের এবং বিশেষতঃ প্রয়াগের বা পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতা ব্রহ্মর্ষিদেশের রাজনৈতিক সম্বন্ধ যে কত প্রাচীন তাহার বিস্তৃত আলোচনা করিবার ইহা ঠিক অবসর নহে এবং বোধ করি আমার ন্যায় অপ্রাত্নতত্ত্বিকের পক্ষে তাহা সম্ভবপরও নহে।

BLOCKED INFORMATION.

আমরা আর পাকা রং পাই না। একটি দৃষ্টান্তে যাহা বলা গেল, সেইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত আছে। ১৮৮৩ সনে কলিকাতায় মহামেলা বসিবার সময়ে কবি হেমচন্দ্র তাঁহার "হায় কি হলো" কবিতায় লিখিয়াছিলেন—

দেশের শিল্প কারিগুরি শিখ্‌বে বিলাতীরা,
অন্নাভাবে দুদিন বাদে মর্‌বে এদেশীরা।
হাস্‌বে কত একজিবিশন দেশের ভাল করে;
খেতে অন্ন নাইক যাদের—একি তাদের তরে?

যাহাই হউক, বিলাতে মহা সমারোহে সারা বৃটিশ সম্রাজ্যের শিল্প-কৌশলের পরিচয়ে একজিবিশন বসিবে সেই টেম্‌স্ নদীর কূলে, আর এখানে একটা একজিবিশন বসিয়াছে গঙ্গার কূলে।

বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে—বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি-বিধানের জন্য সেড্‌লার কমিশনে যে সকল অতি দরকারি সুপারিশ ছিল, সেগুলি সরকারি তহবিলের টাকার অভাবে চালাইতে পারা যাইতেছে না বলিয়া অনেকবার সরকারি মন্তব্যে প্রকাশিত হইয়াছে। কিছুদিন পরে সেই সুপারিশগুলি বস্তাপচা পুরাতন সুপারিশ বলিয়া উপেক্ষিত না হইলে হয়। ভারতে যতগুলি বিশ্ববিদ্যালয় আছে, তাহাদের মধ্যে কিরূপে একটা সহযোগের সম্পর্ক সৃষ্টি করা যায়, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট করা যায়, তাহার জন্য বড়লাট বাহাদুর একটি বিচার সভা করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। এই প্রস্তাবিত সভায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন প্রতিনিধি থাকিবেন বলিয়া সরকারি মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে; কলিকাতার সেনেট সভায় এই সরকারি মন্তব্য আলোচিত হইয়া স্থির হইয়াছে যে, এরূপ গুরুতর বিষয়ের বিচারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাত জন প্রতিনিধি থাকা উচিত; সেনেট সভা গবর্ণমেণ্টকে যে সাতজন প্রতিনিধির নাম করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই শিক্ষা বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। আশা করি গবর্ণমেণ্ট, কলিকাতা সেনেটের এই প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন। ভবিষ্যতের উন্নতি সংকল্পে যে বিচার বৈঠক বসিবে তাহার ফল ভালই হইবে মনে করিতে পারি; কিন্তু উপস্থিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভাব পুরাইবার দিকে বিশেষ উদ্যোগ না দেখিয়া আমরা উদ্বিগ্ন আছি।

Printed and published by Jyotish Chandra Ghosh at the Cotton Press, 57, Harrison Road. Calcutta.

KONNAGAR PUBLIC L—R
Estd. 1853

বঙ্গবাণী

"আবার তোরা মানুষ হ"

২য় বর্ষ ১৩২৯-৩০ | মাঘ | দ্বিতীয়ার্দ্ধ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

প্রবাসী বাঙ্গালী

তীর্থরাজ প্রয়াগে প্রবাসী বঙ্গ-সন্তানগণের এই সম্মিলন কেবল যে প্রবাসী বাঙ্গালীর ...বের ও আদরের মধুর সম্মিলন, তাহা নহে, আমার মনে হয় ইহা সমগ্র বাঙ্গালী জাতির গৌরব ও ...রের মহামহিমময় সুমধুর সম্মিলন।

...না কারণে সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী বঙ্গভূমির সুকোমল অঙ্ক ...চ্যুত হইয়া উত্তর ভারতে চিরপ্রবাসী কতিপয় বাঙ্গালী জন্মভূমি, জন্মক-জননী-জননী ...বুকভরা মধুর পুণ্য স্মৃতির প্রণোদনায় এই সহায়হীন শুষ্কপ্রকৃতি কঠোর দেশে বহু ...ব্যাপিয়া যাহা কিছু করিয়াছে, তাহা দেখিয়া শুনিয়া ও ভাবিয়া প্রত্যেক বাঙ্গালীই যে আনন্দ, ...ও শ্লাঘা অনুভব করিয়া থাকেন বা করিতে বাধ্য তাহা কে অস্বীকার করিবে?

এই বিষয়টী ভাল করিয়া তলাইয়া বুঝিতে হইলে একটু ঐতিহাসিক আলোচনা আবশ্যক, আশা করি এস্থলে তাহা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক না হইতে পারে।

বঙ্গদেশের সহিত উত্তরপশ্চিম প্রদেশের এবং বিশেষতঃ প্রয়াগের পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রসিদ্ধ ব্রহ্মর্ষিদেশের রাজনৈতিক সম্বন্ধ যে কত প্রাচীন তাহার বিস্তৃত আলোচনা করিবার ইহা ...অবসর নহে এবং বোধ করি আমার ন্যায় অপ্রাত্নতত্ত্বিকের পক্ষে তাহা সম্ভবপরও নহে।

BLOCKED INFORMATION.

ঐতিহাসিক তত্ত্বান্বেষী ব্যক্তি মাত্রেই বিদিত আছেন, এই প্রয়াগস্থ সুবিদিত দুর্গের মধ্যে একটী সমুন্নত শিলাস্তম্ভ আছে। ভারতের ঐতিহাসিক যুগের সর্ব্বপ্রধান সম্রাট্ নরপতিচক্রবর্ত্তী অশোক, খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ২৩২ অব্দে এই স্তম্ভটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তৎকালীন প্রয়াগ প্রদেশের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রাজধানী কৌশাম্বী বা কুশাবতী নগরে এই স্তম্ভটী মহারাজচক্রবর্ত্তী অশোক কর্ত্তৃক প্রথমে সংস্থাপিত হইয়াছিল। কৌশাম্বীপ্রদেশের শাসনাধিকৃত কর্ম্মচারীগণকে লক্ষ্য করিয়া ছয়টী উপদেশ বা আদেশ ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অর্দ্ধ মাগধী বা তৎকালিক এই অঞ্চলের প্রচলিত জনসাধারণের ভাষায় এই ছয়টী উপদেশ বা আদেশবাণী বিরচিত হইয়াছে। ঐতিহাসিকগণ অনুমান করিয়া থাকেন যে, মৌর্য্য সাম্রাজ্যের অবনতির পর এই স্তম্ভটী উৎপাটিত হইয়া একবার ভূমিতে নিপাতিত হয় তৎপরে মগধের গুপ্তবংশীয় সম্রাট সমুদ্র গুপ্তের সময় ইহা ভূমি হইতে উত্তোলিত হইয়া পুনঃ সংস্থাপিত হয়, ভারতে মুসলমান বিজেতৃগণের আক্রমণের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত ইহা মাথা তুলিয়া কৌশাম্বীতে দণ্ডায়মান ছিল, অনেকে অনুমান করেন আলাউদ্দীন খিলিজির সময় ইহা পুনর্ব্বার ভূশায়িত হয়, মুসলমান পাতসাহ ফিরোজ সাহের সময় সম্ভবতঃ ইহা কৌশাম্বী হইতে প্রয়াগে আনীত হয়, এবং তাহার কিয়ৎকাল পরে মোগল পাতসাহ জাহাঙ্গীর ইহাকে দুর্গের মধ্যে লইয়া যাইয়া ইহাকে পুনঃসংস্থাপিত করেন। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ সেনাপতি জেনারেল কীড্, কি জানি কি খেয়ালের বশে, ইহাকে আবার উৎপাটিত করিয়া ভূশায়িত করেন, পরে আবার কোম্পানী বাহাদুরেরই ইচ্ছানুসারে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহা ভূমি হইতে উত্তোলিত হইয়া পুনঃ সংস্থাপিত হয় এবং সেই অবস্থায় এই পর্য্যন্ত ইহা সেই একই স্থানে সন্নিবেশিত রহিয়াছে।

দুই হাজার বর্ষের অধিক কাল ব্যাপিয়া সমুন্নত শীর্ষে দণ্ডায়মান অশোক নরপতির অনামান্য কীর্ত্তিসূচক ঐ নীরব নিস্পন্দ কঠোর পাষাণময় স্তম্ভ! আমার মনে হয় বাঙ্গালীর সহিত উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ঐতিহাসিক যুগের পুরাতন সম্বন্ধের পরিচয় দিতে ইহার ন্যায় প্রাচীন সাক্ষী বোধ হয় আর কেহই নাই। অগণিত সঙ্ঘারাম বিহার স্তূপ ও হিন্দু দেবমন্দির নিচয়ে বিভূষিত, দুর্ব্বিষহ বৈদেশিক পারতন্ত্র্যের সর্ব্বোন্নতি পরিপন্থী ভাবের অনাস্বাদনে উৎফুল্লপ্রাণ হৃষ্টপুষ্ট প্রফুল্ল সহস্র সহস্র নর নারীর উৎসবময় কোলাহলে নিত্য মুখরিত কৌশাম্বীর অঙ্কে দাঁড়াইয়া এই অশোক স্তম্ভই দিগ্বিজয়ী গৌড়েশ্বর গোপাল ও ধর্ম্মপালের নেতৃত্বে পরিচালিত বঙ্গসেনার দুর্দ্ধর্ষ বাহুবলে এই ব্রহ্মর্ষি দেশের প্রতাপগৌরবমণ্ডিত গুপ্ত সাম্রাজ্যকে ধূলিকণায় পরিণত হইতে দেখিয়াছিল। কে বলিতে পারে এই কীর্ত্তিস্তম্ভের সমুন্নত শীর্ষের উপরিভাগে গৌরবমণ্ডিত বঙ্গীয় সেনার বিজয় বৈজয়ন্তী বায়ুভরে আন্দোলিত হইয়া অব্যক্ত মধুর কলকাকলীতে সেইদিন বাঙ্গলার সহিত ভারতের সেই অভিনব সম্বন্ধের বিরাট ঘোষণা করে নাই?

বাঙ্গলার জাতীয় জীবনের নবজাগরণের এই মনোহর স্বপ্ন কাহিনী কিন্তু প্রতিষ্ঠান পূর্ব্বে

প্রবল পরাক্রা[illegible] সম্রাট হর্ষদেবের নবাভ্যুদয়ের প্রখর কিরণচ্ছটায় অচির কালের মধ্যে বিলীন হইলেও তাহার পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে প্রীতির ও সমাদরের পুষ্পাঞ্জলি বিকীর্ণ করিতে স্বদেশপ্রেমিক কোন বাঙ্গালীই যে কোন সময়ে বিস্মৃত হইবেনা, তাহা স্থির ও ধ্রুব সত্য।

তাহার পর বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত এদেশে বাঙ্গালীর কোনপ্রকার কার্য্যকুশলতার পরিচয় বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না, কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে বাঙ্গালীর সহিত এদেশের সম্বন্ধ যে উত্তরোত্তর ঘনিষ্ঠ হইয়া আসিতেছে তাহার যথেষ্ট নিদর্শন বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যে প্রচুর-ভাবে পাওয়া যায়।

জাতীয় সাহিত্যের উৎকর্ষই যদি জাতীয় জীবনের উন্নতির অভ্রান্ত প্রমাণ হয়, তাহা হইলে বলিতে [illegible] বিগত চারিশত বৎসরের কিছু পূর্ব্ব হইতেই বাঙ্গলার জাতীয় জীবনের উন্নতির প্রবাহ [illegible]বার অক্ষুণ্ণভাবে বহিতে আরম্ভ করে। কলিযুগ পাবনাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবের আবির্ভাবে যে [illegible]জনীন প্রেমভক্তির অমৃতময়ী বন্যা নদীয়া ডুবাইয়া শান্তিপুর ভাসাইয়া উত্তর পশ্চিম ও [illegible]ত্যাকে প্লাবিত করিয়া উত্তাল তরঙ্গে সুদূর দক্ষিণ আলোড়িত করিতে করিতে রামেশ্বরের [illegible]পাল দিয়া দক্ষিণ সাগরে যাইয়া মিশিয়াছিল, সেই প্রেমভক্তি বা অচিন্ত্য ভেদাভেদ সিদ্ধান্তের [illegible]র্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান আচার্য্য শ্রীরূপ গোস্বামী এই তীর্থরাজ প্রয়াগেই ত্রিবেণী সঙ্গমতটে [illegible]বিন্দুমাধবের পুণ্যমন্দির প্রাঙ্গণে শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারই [illegible]ই প্রেমভক্তির দীক্ষা শিক্ষা লাভ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে গমন পূর্ব্বক গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের [illegible]বিত অমূল্য গ্রন্থরাজি বিরচন করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সহিত শ্রীরূপের সমাগম [illegible]াগধামে কিভাবে সঙ্ঘটিত হইয়াছিল তাহা বাঙ্গলার ভক্ত কবিকুলের অগ্রণী কৃষ্ণদাস [illegible] গোস্বামী চৈতন্যচরিতামৃতে এমনি সুন্দর ও সরলভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমি তাহার কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিবার প্রলোভনকে কিছুতেই অতিক্রম করিতে পারিলাম না—

"অনুপম মল্লিক তাঁর নাম শ্রীবল্লভ।
রূপ গোঁসাঞির ছোট ভাই পরম বৈষ্ণব॥
তাঁহা লঞা শ্রীরূপ প্রয়াগে আইলা।
মহাপ্রভু তাঁহা শুনি আনন্দিত হৈলা॥
প্রভু চলিয়াছেন বেণী মাধব দরশনে।
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে প্রভুর মিলনে॥
কেহ কান্দে কেহো হাসে কেহো নাচে গায়।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি কেহো গড়াগড়ি যায়॥
গঙ্গা যমুনা প্রয়াগ নারিল ডুবাইতে।
বন্যা ডুবাইল কৃষ্ণ প্রেমের বন্যাতে॥
[illegible] দেখি [illegible] রহিলা নির্জ্জনে।
প্রভুর আবেশ হইল [illegible]॥
[illegible]আবেশে নাচে প্র[illegible] করি।
[illegible] বল[illegible]
উর্দ্ধবাহু করি বোলে বোল হরিহরি॥
প্রভুর মহিমা দেখি লোকে চমৎকার।
প্রয়াগে প্রভুর লীলা নারি বর্ণিবার॥
দাক্ষিণাত্য বিপ্রসনে আছে পরিচয়।
সেই বিপ্র নিমন্ত্রিয়া নিল নিজালয়॥
বিপ্রগৃহে আসি প্রভু নিভৃতে বসিলা।
শ্রীরূপ বল্লভ দোঁহে আসিয়া মিলিলা॥
দুই গুচ্ছ তৃণ দোঁহে দশনে ধরিয়া।
প্রভু দেখি দূরে পড়ে দণ্ডবৎ হৈয়া॥
নানা শ্লোক পড়ি উঠে পড়ে বারবার।
প্রভু দেখি প্রেমাবেশ হইল দোঁহার॥
শ্রীরূপ দেখি প্রভুর প্রসন্ন হইল মন।
উঠ উঠ রূপ আইস বলিলা বচন॥"

এই ভাবে উপাস্যের সহিত ভক্তের মধুর মিলনের শুভ [illegible] বাঙ্গলার বৈষ্ণব সাহিত্যের ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই সুবিদিত ইহার ফলে শ্রীরূপ গোস্বামীর বৃন্দাবনে গমন ও তথায় অচিন্ত্য ভেদাভেদ সিদ্ধান্তের অমূল্য গ্রন্থরাশি প্রণয়ন।

এককথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, দ্বৈতাদ্বৈত বিরোধের অপূর্ব্ব সমন্বয় বলিয়া যে অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ সমগ্র সভ্যজগতে আজ বঙ্গমনীষার অসাধারণ গৌরব কীর্ত্তি উদ্‌ঘোষিত করিতেছে, তাহার মূলভূত গ্রন্থনিচয় সুদূর প্রবাসে শ্রীবৃন্দাবনে প্রবাসী বাঙ্গালী শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীসনাতন গোস্বামী ও তদীয় যোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র বল্লভ তনয় শ্রীজীব গোস্বামী কর্ত্তৃক বিরচিত ও প্রচারিত হইয়াছিল—এই কয় জন গোস্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াই শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রবাসে বৃন্দাবনে বসিয়াই বাঙ্গলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্তিকাব্য শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত রচনা [illegible] ছিলেন প্রেমভক্তিবাদের আদি ও অদ্বিতীয় কবি চরিতামৃতকার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব প্রবর্ত্তিত দুর্নিবার প্রে ভক্তিবন্যার যে অপূর্ব্ব চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, আশাকরি তাহার কিঞ্চিৎ রসাস্বাদ এস্থলে আপনাদিগের অপ্রীতিকর হইবেনা—

"এই পঞ্চতত্ত্ব মিলি পৃথিবী অছিলা।
পূর্ব্ব প্রেমভাণ্ডারের মুদ্রা উঘাড়িলা॥
পাঁচে মিলি লুটে প্রেম করে আস্বাদন।
যত যত পিয়ে তৃষ্ণা বাড়ে অনুক্ষণ॥
পুনঃপুন পিঞা পিঞা হয় মহামত্ত।
নাচে কান্দে হাসে গায় হৈছে মদমত্ত॥
পাত্রাপাত্র নাহি বিচার নাহি স্থানাস্থান।
যেই যাহাঁ পায় তাহাঁ করে প্রেমদান॥
লুটিয়া খাইয়া দিয়া ভাণ্ডার উজাড়ে।
আশ্চর্য্য ভাণ্ডার প্রেম শতগুণ বাড়ে॥
উথলিল প্রেম বন্যা চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রী বৃদ্ধ বালক যুবা সভারে ডুবায়॥
সজ্জন দুর্জ্জন পঙ্গু জড় অন্ধগণ।
প্রেম বন্যায় ডুবাইল জগতের জন॥"

কৃষ্ণদাস কবিরাজের সময় হইতে বাঙ্গলার অনেক প্রসিদ্ধ কবিই এই বিশ্বমানব গীতিকাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন কিন্তু প্রবাসী বাঙ্গালী বৈরাগীর বিশ্বজনীন প্রেমের এই প্রাণস্পর্শিনী কবিতার পার্শ্বে দাঁড়াইবার অধিকার কোন বাঙ্গালী প্রেমিক এ পর্য্যন্ত লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে কি না—তাহা বিচার করিবার ভার আমি আপনাদের উপর বিন্যস্ত করিয়া প্রসঙ্গান্তরের অবতারণ করিতে অগ্রসর হইতেছি।

সাহিত্যের দিক দিয়া—প্রবাসী বাঙ্গালীর অলৌকিক প্রতিভা এই উত্তর পশ্চিম প্রা কি কি মহাবিস্ময়কর কার্য্য করিয়াছে তাহার সমগ্র পরিচয় দিতে গেলে হয় ত আপনাদের ধৈর্য্যচ্যু সম্ভাবনা, সেই কারণে এবিষয়ে এস্থলে আর কিছু বলিব না।

ভারতে ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভ কাল হইতে আরম্ভ করিয়া এদেশে প্রবাসী বা যাহা করিয়াছে তাহা ভাবিলে এমন কোন্ বাঙ্গালী আছেন যাঁহার হৃদয় গরবে ও গৌরবে ও বিস্ময়ে আপ্লুত না হইয়া থাকিতে পারে?

[illegible] দাতা ও ভক্ত বাঙ্গালীর কীর্ত্তি জ্যোৎস্নায় উত্তর ভারতের দিঙ্মণ্ডল প্রায় দেড় শত বৎসর হইতে আজি পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে কিরূপ আলোকিত ও মাধুরীময় হইয়াছে তাহার পরিচয় সম্পূর্ণরূপে দিবার বা শুনিবার অবসর এক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে। শুধু কি কেবল বাঙ্গালী পুরুষ ধুরন্ধরগণের কীর্ত্তি কলাপে উত্তর ভারতের নির্ম্মল দিঙ্মণ্ডল আলোকিত, তাহা নহে পুণ্যশ্লোকা স্মরণীয়চরিতা বঙ্গমহিলাগণের মহনীয় চরিত্রসম্পদ ও অসাধারণ দান-শৌণ্ডতার অমল কীর্ত্তি কাহিনী আকল্পকাল ব্যাপিয়া যে উত্তর ভারতে গৌরবের সহিত পরিগীত হইবে তাহা আপনাদের মধ্যে বোধ করি কাহারও অবিদিত নাই।

এই প্রাতঃস্মরণীয়া মহিলাগণের মধ্যে অর্দ্ধ বঙ্গেশ্বরী রাণী ভবানীর নাম সর্ব্বপ্রথমেই উল্লেখ[illegible]

কাশী পরিক্রমা নামক খণ্ডকাব্যে প্রবাসী রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল লিখিয়াছেন—

ঘড়ি খানা নবৎখানা পথের উপর।
রসাল দুন্দুভি সানাই বাজিছে সুন্দর॥
ছত্রবাটী গত দ্বিধা দুর্গোৎসব হয়।
এ সর্ব্ব যোগানে আরো বাটী পাঁচ ছয়
কোন খানে ভাণ্ডার, রন্ধন কোন খানে,
কোন খানে ভোগ সজ্জা করেন গোপনে।
কোন খানে ভোজন করেন দণ্ডীগণ।
কোন খানে অতিথি সেবন অগণন।
কি কহিব রাণীর মহিমা অনুপাম।
কাশী ক্ষেত্রে খ্যাত অন্নপূর্ণা যাঁর নাম।
আর এক কীর্ত্তি দুর্গার মন্দির।
এক শত এক চূড়া গণনাতে স্থির।
পাষাণের খোদ গারি কি কহিব সীমা।
পঞ্চাশ হাজার ব্যয়ে যাহার গরিমা।

প্রতি বৎসর রাণী ভবানী একলক্ষ আশী হাজার টাকা কাশীতে দরিদ্রদিগের মধ্যে বিতরণ [illegible]তেন, বারাণসীর অধ্যাপকমণ্ডলী ও ছাত্রদিগের আহারের জন্য স্বতন্ত্র দান ও মাসিক বৃত্তি [illegible]ত আরও পঁচিশ হাজার টাকা তিনি ব্যয় করিতেন, যাহাতে পুরুষানুক্রমে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের [illegible]পোষণ নির্ব্বাহিত হয়, তজ্জন্য উক্ত অর্থ প্রতি বৎসর গভর্ণমেণ্ট ট্রেজারীতে জমা হইত। [illegible]ভূম, রাজসাহী, দিনাজপুর, রংপুর, মুর্শিদাবাদ, যশোহর-ঢাকা প্রভৃতি জিলায় প্রায় [illegible] লক্ষ বিঘা জমি দেবোত্তর ও লাখ রাজ করিয়া চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে তিনি বিতরণ করিয়া যান। [illegible]শীর নানা স্থানে শিবলিঙ্গ স্থাপন, বিশ্বেশ্বর, দণ্ডপাণি, দুর্গা, তারা ও রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি ও

পাষাণময় বৃহৎ মন্দির সমূহ প্রতিষ্ঠা করেন। ধর্ম্মার্থ যাঁহারা কা[illegible] আজীবন ভরণপোষণের ব্যয় ব্যতীত বৈধ ক্রিয়া ও শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পাদনার্থ সমস্ত ব্যয় তিনি অকাতরে বহন করিতেন। ইহা ছাড়া তিনি ৩৬৫ খানি বাটী নির্ম্মাণ করাইয়া তি[illegible] পঁয়ষট্টিজন ব্রাহ্মণকে কাশী বাসের সৌকার্য্যার্থ দান করিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে তৎকালীন [illegible] প্রতিগ্রহ প্রতিনিবৃত্ত হওয়া প্রযুক্ত বাঙ্গালী কাশীবাসী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কেহই ঐ বাটী গ্রহণ করেন নাই,—ইহাতে সেই সময় কাশীপ্রবাসী ব্রাহ্মণগণের ত্যাগশীলতা ও ধর্ম্ম জীবনের যে আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা অসাধারণ বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। রাণীর তহবিল হইতে প্রতিদিন অন্নপূর্ণা মন্দিরে ২৫ [illegible] করিয়া চাউল দরিদ্রগণের মধ্যে বিতরিত হইত, প্রত্যহ ১০৮ জন দণ্ডী ও সধবাকে মধ্যাহ্নে ভোজন করাইয়া এক টাকা করিয়া দক্ষিণা দেওয়া হইত, [illegible] উপর প্রত্যহ পাঁচ হাজার লোককে ভোজন করাইয়া পরে রাণী ভোজন করিতেন। রাণী [illegible] এই বিরাট দান কাহিনী এখনও কাশীতে প্রবাদ পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে।* পুটিয়ার মহারাণী পুণ্যশ্লোকা শরৎসুন্দরী, ময়মনসিংহের পুণ্যচরিতা বিদ্যাময়ী দেবী, ভাগীরথী দেবী, বামাসুন্দরী দেবী প্রভৃতি অগণিত সতী সাধ্বী দানশীলা বঙ্গ মহিলার দানশৌণ্ডতার অখণ্ডিত কীর্ত্তি পতাকায় কাশীধাম চিরদিনের জন্য বিমণ্ডিত হইয়া রহিয়াছে। হরিমোহন সেন কান্তি[illegible] মুখোপাধ্যায় সংসারচন্দ্র সেনের জয়পুর রাজমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠানের কথা বাঙ্গালী কখনও ভুলিতে পারিবে না। কাশ্মীরের রাজমন্ত্রী নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় টিহরিতের রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীগণের নাম কিরূপ গৌরবের সহিত এখনও তত্তৎ প্রদেশে পরিগীত হইয়া থাকে তাহা অভিজ্ঞ বাঙ্গালী মাত্রেই অবগত আছেন। জ্ঞানী ভক্ত কর্ম্মী প্রবাসী বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মধ্যে জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, রাখা[illegible] দাস ন্যায়রত্ন, কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি প্রমুখ মহামহোপাধ্যায় ঋষিকল্প পণ্ডিতগণের কীর্ত্তি চন্দ্রিকা[illegible] এদেশ এখনও সমুদ্ভাসিত। মহামহোপাধ্যায় আদিত্যবাস ভট্টাচার্য্য মহাশয় অগাধ পাণ্ডিত্য সত্যনি[illegible] স্বদেশ বাৎসল্য ও অলৌকিক ত্যাগশীলতার যে পবিত্র ও সমুজ্জ্বল আদর্শ রাখিয়া অল্পদিন হই[illegible] অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন তাহাতে শুধু প্রয়াগ প্রবাসী বাঙ্গালী কেন সমগ্র বাঙ্গালী জাতি গৌরব অনুভব করিয়া থাকে। আর কত নাম করিব? গত দেড় শত বৎসর মধ্যে এই উত্তর ভারতে স্বপ্রবাসী বাঙ্গালী যাহা করিয়াছে তাহার জন্য বাঙ্গালী যাহা করিয়াছে—তাহার জন্য বাঙ্গালীর মনীষা এদেশে কেন সমগ্র ভারতে প্রশংসিত ও আদৃত ও সম্মানিত হইয়াছে ও চিরদিন থাকিবে ইহা কে অস্বীকার করিবে?

কিন্তু ইহা ত আজ অতীতের কথায় পরিণত হইতে চলিল। বর্ত্তমান ও অদূরবর্ত্তী ভবিষ্যতের উত্তর পশ্চিম প্রবাসী বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের কল্পনাময় চিত্রের সহিত এই গৌরবোজ্জ্বল অতীতের

* শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস প্রণীত 'বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী' হইতে সংগৃহীত।

[illegible] যে আশঙ্কা অবসাদ ও ভীতি বিহ্বলতার আবেশে হৃদয় কম্পিত হইয়া [illegible] একটু আলোচনা না করিয়া এই অভিভাষণ শেষ করিতে পারি কৈ?

[illegible]র কুটিল গতিতে বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তনে উত্তর ভারতে প্রবাসী বাঙ্গালীর [illegible] ও আধ্যাত্মিক জীবন যে ক্রমশই সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়িতেছে তাহা অস্বীকার করিবার যো [illegible] যে দেশের অধিবাসীগণ কিছুকাল পূর্ব্বে গণ্য মান্য বদান্য বিদ্বান অতিথির শ্রদ্ধাস্পদ আসনে [illegible]য়া শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া আমাদের পিতৃপিতামহদিগকে পূজা করিত, আজ সেই উত্তর [illegible] প্রদেশে আমরা তাহাদিগের নিকট সে সম্মান ও আদর পাইতেছিনা,—প্রত্যুত একামিষ [illegible] বৈর[illegible] [illegible]য়া সেই সম্মান ও আদরের স্থান অধিকার করিয়াছে। বঙ্গের সহিত সম্বন্ধ বিপ্রকৃষ্ট [illegible] আমরা বাঙ্গালা, সুতরাং আমাদের জন্মভূমি এদেশ হইলেও এদেশের অন্যান্য অধিবাসীগণ [illegible]দিগকে এতদ্দেশবাসীর জন্ম নিবন্ধন ন্যায্য অধিকার দিতে নিতান্ত নারাজ বলিতে বড়ই দুঃখ [illegible] লজ্জা বোধহয়। আমরা এদেশে 'ন ঘরকা ন ঘাট্‌কার' অবস্থায় পড়িয়া একটা কিম্ভূত কিমাকার [illegible]র্ত্তনের স্রোতে ভাসিয়া চলিতেছি,—এই পরিবর্ত্তনের পরিণতি যে কোথায় তাহা বিধাতা [illegible]ই জানেন। বড়ই দুর্ভাগ্যের কথা এই যে, বর্ত্তমান সময়ে এদেশের লোক, বিশেষতঃ [illegible]থিত এদেশবাসী শিক্ষিত লোক চাহেন না যে বাঙ্গালী এদেশে তাহার ন্যায্যপ্রাপ্য অধিকারলাভ [illegible] সুখে স্বছন্দে বসবাস করিতে পায় ইহা অতিরঞ্জিত কথা নহে, একটা উদাহরণ দেখিলেই [illegible]নারা ইহা বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। এই ধরুন্ না কেন এখনকার শিক্ষাবিভাগ,—[illegible]ool final Examinationএর বিধাতৃ পুরুষগণ দয়া করিয়া যদিও বাঙ্গলাভাষাকে পরীক্ষণীয় [illegible]র মধ্যে স্থান দিয়াছেন কিন্তু বাঙ্গালী ছাত্রদিগের পক্ষে বাঙ্গলা ভাষায় ইতিহাস প্রভৃতির [illegible]ত্তর লিখিবার অধিকার দেওয়া হয় নাই, অথচ হিন্দী বা উর্দ্দু ভাষায় লিখিবার অধিকার [illegible] অসঙ্কোচে দিয়াছেন—ইহা এদেশী বাঙ্গালী ছাত্রদিগের পক্ষে বিশেষতঃ ছাত্রী দিগের পক্ষে [illegible] অনর্থক ক্লেশকর ও অসুবিধাজনক হইয়াছে তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই অবগত। এদেশে [illegible] সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে কিন্তু ব্যবস্থাপক সমিতিতে বাঙ্গালীর দুঃখ ও অভিযোগের [illegible]নাইবার কোন ব্যবস্থা নাই।

রাজকীয় চাকরি বিভাগে বাঙ্গালীর প্রবেশদ্বার ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে। বাণিজ্যে [illegible] সকলের পশ্চাতে পড়িয়াছে, স্বদেশে ফিরিয়া জীবিকা অর্জ্জনের পথও রুদ্ধপ্রায়, এই নানা প্রকারের অসুবিধা ভোগ করিয়াও আমাদিগকে বাধ্য হইয়া এই দেশেই থাকিতে —এইরূপ অবস্থায় আমাদের এখন কি কর্ত্তব্য তাহা নিরূপণ করার ভার আমাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ গ্রহণ করিতে হইবে, অবসাদ ভরে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া 'যা হবার হোক' বলিয়া বসিয়া চলিবেনা—

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ—
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ।

এই সংঘবদ্ধ বা একতা সম্পাদনের প্রধান উপকরণ, পরস্পর পরস্পরকে ভাল করিয়া জানা, পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসা—এই আমাদিগের বার্ষিক সম্মিলন তাহারই প্রধান উপায়, ইহা মনে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত রাখিয়া আমরা যদি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারি তাহা হইলে আশা হয় আমাদের কামনা পূর্ণ হইবে।

সাহিত্যই জাতীয় জীবনের সুদৃঢ় ও সুপ্রশস্ত ভিত্তি—জননী বঙ্গভূমিতে বিরাট ভাবের বন্যা বহিয়াছে, সেই বন্যার প্রবাহে যে বিরাট বিশ্ববিস্ময়কর বাঙ্গলা সাহিত্য সাগর ক্রমেই উদ্বেলভাব ধারণ করিতেছে, সেই মহাসাগরে মিলিত হইবার জন্য উত্তর ভারত প্রবাসী বাঙ্গালীর ভাব ভাগীরথী সৃষ্টি করিতে হইবে। উত্তরভারতীয় বঙ্গসাহিত্য সম্মিলন ভগীরথের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া মঙ্গল শঙ্খ ধ্বনি করিবার জন্য ত্রিবেণী সঙ্গমে অবগাহন করিয়াছে—এই শঙ্খের গম্ভীর ধ্বনিতে প্রবাসী বাঙ্গালীর হৃদয়ে সাড়া পড়ে তবে তাহাই আমাদিগের নব জাতীয় জীবনের জাগরণ হইবে। প্রবাসে বাঙ্গালীর এই নব জাগরণ যেন কেবল পুরুষের জাগরণেই পরিণত না হয় জাতীয় সাহিত্যের দ্বারা জাতীয় জীবন সংস্থাপন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে কুলললনাগণের শিক্ষা ও চরিত্র গঠন একান্ত আবশ্যক। প্রবাসী বাঙ্গালী কবিই একথা আমাদিগকে প্রথমে শিখাইয়াছেন; প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে তিনিই প্রথমে গাহিয়াছেন—

না জাগিলে আর ভারত ললনা—
এ ভারত আর জাগেনা জাগেনা।

আমার মনে হয় আমাদের এই সাহিত্য সম্মিলনের—এই উত্তর ভারতের রাজধানী এলাহাবাদে বাঙ্গালী মহিলাদিগের জন্য একটী সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন উচ্চবিদ্যালয় বা কালেজ স্থাপনই সর্ব্বপ্রথম কার্য্য হওয়া উচিত। কেবল বৎসরান্তে মিলিত সুচিন্তিত কয়েকটী প্রবন্ধ পাঠ বা শ্রবণ করিলেই আমরা কৃতকৃত্য হইতে পারিব তাহা নহে, নূতন করিয়া সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া জাতীয় জীবন করিবার প্রধান উপকরণ হইতেছে জাতীয় শিক্ষার প্রসার ও উন্নতি; সেই শিক্ষার প্রসার মধ্যে যত অধিক পরিমাণে হইবে তত শীঘ্র আমরা সর্ব্ববিধ উন্নতির দিকে অধিক বেগে অগ্রসর হইতে পারিব,—ইহাই হইল ভারতের সাধনার মূল মন্ত্র, ইহা ভুলিয়াছি বলিয়াই আজ আমরা এই হীন দশায় উপনীত হইয়াছি। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্মৃতিকার মহর্ষি মনু বলিয়াছেন—

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ

—এই মনুবচনে 'অতিযত্নতঃ' এই পদটী প্রতি নিপুণ ভাবে লক্ষ্য করা উচিত।

আমার বক্তব্য শেষ হইয়া আসিয়াছে। শেষের কথা আমার এই যে এত পারিপার্শ্বিকের মধ্যে পড়িয়া জীবন সংগ্রামে বিজয়শ্রী লাভ করা দুরূহ ব্যাপার হইলেও আমাদিগের ভারত প্রবাসী বাঙ্গালী দিগের ভবিষ্যৎ যে শুভ ও গৌরবোজ্জ্বলিত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যে জাতির মধ্যে রাজারামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র

ন্যায় ধর্ম্মবীর, আচার্য্য জগদীশ ও প্রফুল্ল চন্দ্রের ন্যায় বৈজ্ঞানিক, রামমোহন বিদ্যাসাগর মধুসূদন হেমচন্দ্র দীনবন্ধু বঙ্কিমচন্দ্র নবীনচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মত কবি, কৃষ্ণদাস সুরেন্দ্রনাথ অশ্বিনীকুমার অরবিন্দ ও চিত্তরঞ্জনের ন্যায় রাজনৈতিক মহাপুরুষগণ, দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর তারকনাথ ও রাসবিহারীর ন্যায় দানবীর, আর রমেশচন্দ্র গুরুদাস ও আশুতোষ সরস্বতীর ন্যায় নৈতিক কর্ম্মবীর এক শতাব্দীর ন্যায় অল্পপরিমাণ কালের মধ্যে আবির্ভূত হইতে পারেন, সেই জাতির সন্তান কার্য্যবশতঃ প্রবাসী হইলেও—ভবিষ্যতে বঙ্গে ও বাহিরে এক বৃহত্তর বাঙ্গালী জাতির উত্তর জাতীয় জীবনের প্রধানতম উপকরণের মধ্যে পরিগণিত হইবেনা—একথা বিশ্বাস করিতে মন কিছুতেই অগ্রসর হইতে পারেনা।

প্রবাসী বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ বর্ণন করিতে যাইয়া একজন পক্ষপাতরহিত ধার্ম্মিক ইংরাজ ধর্ম্মযাজক প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছেন তাহারই কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া আমার এই অভিভাষণ শেষ করিতেছি—

পাদরী শেরিং বলিয়াছেন—

"The Bengali has a glorious future before him, a future in which, if we mistake not, he will conspicuously shine as the leader of public opinion, and intellectual and social progress among all the varied nationalities of the Indian Empire."*

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ

জীবন-সন্ধ্যা

ঝরা কুসুমের সুষমার মালা
কে গাঁথিবি তোরা আয়!
পশ্চিম্ গগনে ধীরে ধীরে ওই
বেলা যায় বুঝি যায়।
সারা বিভাবরী জেগে জেগে একা
প্রভাতে পড়েছি ঝরিয়া
উষার আলোকে কবরী এলায়ে
তরু তল আছি ভরিয়া

কত না দিবসে মোদের শাখায়
কোকিল কুহরি উঠিত।
কত রজনীর জ্যোছনা আলোকে
হৃদয় মোদের ফুটিত
মধু সমীরণ ধীরে ধীরে এসে
মোদের দুয়ারে ঘুরেছে
পিপাসীত কত চটুল মধুপ
চরণেতে মাথা নুয়েছে।

মোদের বুকের শেষ পরিমল
পাঁপড়ি বিদারি উঠেগো,
এতটুকু এই জীবনের শেষে
ছুটি আজ ছুটি ছুটিগো।

শ্রীসরলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

* উত্তরভারত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণ।

সতী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(১০)

দিবারাত্রি মাস বর্ষ অতীত হইয়া চলিয়া গেল! প্রচণ্ড পশ্চিমা শীতের বাতাসে হাড়ের মধ্যে তুষার ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া দিয়া শীত বিদায় লইলে, পত্রাবরণা, পুষ্পাভরণা ঋতুরাজ বসন্তের অভ্যুদয় হইল। অগ্নিকণাবর্ষণকারী নিদাঘের দীর্ঘদিনও বিগত হইয়া ভেকরবনন্দিত কবিজন-বন্দিত বর্ষা ঋতুর আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়া গেল। শরৎকালের সুনীল আকাশে [illegible]দা ও রাঙ্গা মেঘের লুকোচুরি খেলা ধরণীর স্মিতমুখে ছায়ালোকের অপূর্ব্ব নর্ত্তন সমাপন ক[illegible] ম্লানমূর্ত্তি হেমন্তের অভ্যুদয়কাল উপস্থিত করিল। পঙ্কজিনীর অজ্ঞাতবাসের বর্ষ শেষ হ[illegible] দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ হইল।

ইতিমধ্যে পঙ্কজিনীর মা মেয়েকে কোনমতেই নিজের কাছে ফিরাইতে না পারিয়া নি[illegible] বাঁকিপুরে আসিয়া বাসা ভাড়া করিয়াছিলেন। স্কুলবোর্ডিং ত্যাগ করিয়া পঙ্কজিনী মায়ের কাছে আসিয়াছে; কিন্তু সে কোনমতেই তার স্কুলের চাকরী ছাড়িতে সম্মত হয় নাই; অনুরুদ্ধ হই[illegible] উত্তর করিয়াছে, "আমার সময় কাটাবার পক্ষে এর চেয়ে আর কি ভাল কাজ করবার আছে?"

মাস খানেক পূর্ব্বে পঙ্কজিনীর মাতৃবিয়োগ ঘটিলে আবার একবার দেশে ফিরিবার [illegible] পীড়ন আরম্ভ হইয়াছিল। সেদিন এই লইয়া বড়দার সঙ্গে অনেক তর্কাতর্কি হইয়া গি[illegible] অবশেষে এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে পঙ্কজিনী মাতৃত্যক্ত যে সম্পত্তিটা সম্প্রতি লাভ করিয়াছে [illegible] বিনিময়ে তার দাদা তাহাকে কাশীধামে একটী হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের পত্তন করিয়া দিবেন [illegible] তাহার কর্ত্রীরূপে সে তাদের বিধবা মাসীমার অভিভাবকত্বে সেই খানেই বরাবরের জন্য [illegible] করিবে। বড়দা ও বউদিদি সুবিধামত কখন আসিয়া তাহার অতিথি হইবেন। পঙ্কজিনী[illegible] হইল এর চেয়ে আর কিছু সুবন্দোবস্ত তার জীবনের পক্ষে হইতেই পারে না। দেশের ও [illegible] জন্য সে সর্ব্বতোভাবেই নিজের জীবন উৎসর্গ করিবে।

সমুদয় ব্যবস্থাই স্থির হইয়া গিয়াছিল, কথা আছে বাঁকিপুরের বাসা উঠাইয়া দিয়া কয়েক জন্য সে স্কুল বোর্ডিংএই আশ্রয় লইবে। চিরবিদায়ের পূর্ব্বে একবার শেষ কালের জন্য করিয়া অসময়ে আশ্রয়কে প্রাণ দিয়া সে উপভোগ করিয়া লইতে চাহিতেছিল। [illegible] ছয়েক মেয়ে মাত্র। তাদের সে কিছু কিছু উপহার দিল। শিক্ষয়িত্রীদেরও বঞ্চিত [illegible] ইন্দ্রপ্রভার গল[illegible] ধরিয়া তাহার কণ্ঠে একটী মুক্তাখচিত 'মনে রেখ' লেখা লকেটযুক্ত [illegible] দিল, মূল্যবা[illegible] সেফ্‌টীপিন পরাইয়া দিল। পরদিন ভোরের ট্রেণে সে কাশী যাত্রা [illegible] সঙ্গে যাইবে তার খুবলাল মালী ও তার মায়ের বিশ্বাসী বাপের বাড়ীর পুরাতন সরকার [illegible]

[illegible]কল কাজই এক প্রকার সারা হইয়াছে; শুধু এখন এই একটা দিন কাটাইয়া [illegible] সমস্ত সংসারের সহিত দে[illegible] পাওনা চুকাইয়া ফেলিয়া নিজেকে ঠেলিয়া দিলেই হয়। পঙ্কজিনীর উন্মুখ ও আগ্রহীচিত্ত একান্ত উৎসাহের সহিত তার সেই লোকাতীত [illegible]শ্রয়ের কথাই শয়নে, স্বপ্নে, উঠিতে বসিতে, খাইতে শুইতে, স্মরণ করিতেছিল। এতদিন [illegible] বন্ধনকে কাটাইয়া আসিয়াও সে যেন ভিতর হইতে সেই দিকেই একটা গভীরতর [illegible]র্ষণ অনুভব করিয়া আসিয়াছে; মনকে কঠোরতার সহস্র উপদেশ দিয়াও সে তাহাকে সম্পূর্ণ [illegible] করিতে না পারায় তাহাকে সতত তীব্র তিরস্কারে সর্ব্বদাই নিপীড়িত করিতে চাহিয়াছে; [illegible]করি এ[illegible] সে ওই পুণ্যভূমির বৈরাগ্যবহুল বায়ু ও মৃত্তিকার স্পর্শে নিজের মনের ওই দৈন্য [illegible] ফেলিতে পারিবে। অবিশ্বাসীর প্রতি এ আকর্ষণ শুধুই চিত্তদৌর্ব্বল্যের [illegible]য় মাত্র।

কিন্তু আজ সকল কার্য্য সমাধা করিয়া পরিচিত সবার সহিত দেনা পাওনা মিটাইতে গিয়া [illegible]তই মনে হইতে লাগিল, আর কোথাও, আর কাহারও সহিত আরও একস্থানে কি তার পাওনা [illegible] কোন হিসাব নিকাশ করিবার ছিল না, আজও কি তার কোন একটা পাই পয়সারও নিকাশ [illegible] করিতে বাকি নাই? সত্যই কি সেখানের সকল হিসাব নিকাশই এ জন্মের মত [illegible]ভবিষ্যতেরই মত শেষ হইয়া গিয়াছে! এ প্রশ্নের কোন উত্তর কোন সমাধানই নাই;—না পরের [illegible], না নিজের মনের কাছে। শুধু তো আজই নয়, এই বর্ষাতীত কাল ধরিয়া যখনই এতটুকু [illegible] এতটুকু অসবর পাইয়াছে এই চিন্তাই ত দুরন্ত রাক্ষসের মতই তাহার মন গ্রাস করিতে [illegible]সিয়াছে, কিন্তু এর কোন জবাবই সে তাহাকে দিতে পারে নাই। "আছে" বলিবার মত [illegible] অথবা আশা তাহার আদৌ নাই; অথচ "নাই" বলিবার মতওতো কই মনের জোর সে [illegible]তেছিল না।

[illegible]ই দীর্ঘদিনে সুধীন্দ্র তাহার একটা খবর পর্য্যন্ত লয় নাই। এই কথাটা মনে হইলেই [illegible]র সহসা ভারী হইয়া উঠে কেন ইহাও তার পক্ষে বুঝিতে পারা সুকঠিন; অথচ সেও যে [illegible] অপরাধেই অপরাধী সে কথাও তার মনের কাছে অবিদিত নহে এবং নিজের কৃতকর্ম্মের [illegible]নুতপ্তও নয়।

[illegible]জ হঠাৎ এই বিদায়ের পালা সাঙ্গ করার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হইল, আরও একটা [illegible] সে এই সঙ্গে একটা বিদায় সম্ভাষণ জানাইতে পারিত! একবার মনে হইল, এ [illegible] একবার—আর একটী বারইমাত্র—সেই বিশ্বাসঘাতক চরিত্রহীনের সাক্ষাৎ সে [illegible];—সাম্‌না সাম্‌নি দাঁড়াইয়া নয়,—গোপনে—অতি সঙ্গোপনে দূর হইতে নিজকে [illegible] সেই সুন্দর অতি সুন্দর নিজের বক্ষপটে অঙ্কিত সেই তরুণ মুখখানার উপর [illegible]চোখ রাখিয়া তেমনি নিঃশব্দে ফিরিয়া আসিতে পারিত,—হয়ত এ পৃথিবীর সকল কার্য্যই

সর আক্রান্তমাই মিটিয়া যাইত! বাকি থাকিত শুধু আরব্ধ কর্ত্তব্যের পালনে উৎসর্গিত জীবন দিন সেই এক চিন্তা ও একই কর্ত্তব্য অনুষ্ঠানে কাটাইয়া যাওয়া—কিন্তু ছিঃ, এতই কি লোভ! ছি হইতে সেই অবিশ্বাসীর মুখ দেখিয়া? কি আছে তাহাতে?

পঙ্কজিনীর মা কতকগুলি ঠাকুরদের গহনা সেকরা বাড়ী গড়িতে দেন, এ পর্য্যন্ত তাহা আদায় করা হয় নাই, সেদিন সেকথা মনে পড়িয়া যাইতে পঙ্কজিনী বিষ্ণুচরণকে দিয়া তাগাদা পাঠাইল এবং বিষ্ণুচরণও সেগুলি সেইখান হইতে আদায় করিয়া আনিয়া সেইমাত্র তার হাতে দিয়া গেল। ট্রাঙ্ক খুলিয়া কাগজে মোড়া গহনা কয়টী রাখিতে গিয়া হঠাৎ পঙ্কজিনীর দৃষ্টি সংবাদ পত্রের সেই ছিন্ন অংশটুকুর উপর পতিত হইল এবং উহারই মধ্যস্থ কোন একটী সংবাদ চোখে পড়িয়া যাইতেই সে সহসা তাড়িৎস্পৃষ্টের মতই শিহরিয়া উঠিল। তখন স্পন্দিত বক্ষে কাগজখানি খুলিয়া লইয়া সে এই ছিন্ন সংবাদটুকুর অংশ বিশেষমাত্র পাঠ করিল—

"আই, সি, এসের বিপত্তি:—মিঃ * * * * অ্যাসিস্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট। গত ২২শে রাত্রির সময় তাঁহার বাংলো * * বাড়ী * * উঠে। সে রাত্রে তাঁহার ভৃত্যগণ মহরম পর্ব্বে যোগদান করিতে ছুটি লইয়া চলিয়া গিয়াছিল একটী হিন্দু চাপরাশী ব্যতীত * * * যখন সমস্ত চালার উপর বিস্তৃত হইয়া গিয়াছে তখন প্রভু ভৃত্যের নিদ্রা ভঙ্গ হয়; কিন্তু আশ্চর্য্যের * * * * পারা যায় যে * * * শয়ন কক্ষের সকল * * বাহির হইতে রুদ্ধ। ভৃত্যের অবস্থাও তদনু *"—ইহার পর কাগজের লেখা খানিকটা ছিঁড়িয়া গিয়াছিল পরে এইটুকু পাওয়া যায়,—"* * অবস্থা একান্তই শোচনীয়।"

এ কি সংবাদ, কাহার সম্বন্ধীয় এ সংবাদ, ইহার কিছুই ভাবিয়া দেখিবার পর্য্যন্ত অবসর না লইয়াই পঙ্কজিনীর সমস্ত মনটা যেন এই রহস্যময় অর্দ্ধপ্রচ্ছন্ন ভীষণ সংবাদের ভীষণ সম্পূর্ণরূপেই ডুবিয়া গেল, আচ্ছন্ন ও অভিভূত হইয়া পড়িল। যেটুকু সে পড়িল তার ম হইতে মাত্র এইটুকুই বুঝিতে পারা যায় যে কোন একজন আই, সি, এস, এর কি বিপত্তি ঘটিয়াছে তা ঘটিলই বা! আই, সি, এস্ এ ভারতবর্ষে কত জনই তো আছে। উক্ত আই, সি, এদেশী অথবা বিদেশী তারও তো কোন প্রমাণ সে ওই ছিন্নপত্র মধ্য হইতে উদ্ধার করিতে পারে নাই! মাত্র আই, সি, এস্ এবং জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্ এই দুইটী শব্দ হইতেই তার সম্বন্ধে চিত্তে এত বড় একটা আতঙ্কের সৃষ্টি কোথা হইতে হইয়া বসিল, যে তার বুকের নিশ্বাস যেন আর কোন ক্রমে বাহির হইতে পারিতেছে না! তার হাতপায়ের তলা অসাড় হইয়া আসিতেছে, তার মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে! তবে নাকি তার সকল দেনা পাওনা মিটিয়া গিয়াছে? শেষ হইয়াছে? এর বুঝি শেষ নাই! পঙ্কজিনী অনেকক্ষণ আড়ষ্ট অভিভূত হইয়া মনে মনে বহুবার তোলাপাড়া করিয়া দেখিল, তারপর উঠিয়া সে বিষ্ণুচরণকে ডাকাইয়া বলিল "চরণ কাকা! একবার ভাগলপুরে যাব যে, যাবেন?"

বিষ্ণুচরণ কিছু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কবে যাবে মা?"

পঙ্কজিনী অবনত হইয়া বলিল—"আজই, যদি গাড়ি থাকে তবে এক্ষণি।"

বিষ্ণুচরণ কিছু ইতস্ততঃ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তা হলে কাশী যাওয়া—"

—"সে এখন বন্ধ থাক কাকা! ওখানে আমার ভারী দরকার—আপনি গাড়ি আনান, বাড়ী বন্ধ করান, দোরে চাবি দিন, খুবলালও সঙ্গে যাবে।"

পঙ্কজিনী তাড়াতাড়ি একখানা চাদর আনিতে ছুটিয়া গেল।

(১১)

লুপমেল সাধারণতঃ রাত্রি আড়াইটায় পৌঁছে, সেদিন কপালক্রমে তার ভাগলপুর পৌঁছাইতে ভোর ৪টে বাজিয়া গেল। গায়ে গরম কাপড়ের অপ্রচুরতায় প্রথম শীতের শেষ রাত্রে একান্ত পড়ারই কথা। কিন্তু দুর্ব্বিষহ উত্তেজনায় পঙ্কজের গায়ের জামা ঘামে ভিজিয়া গেল। সেই মাস তারিখের সম্বন্ধবিহীন অজ্ঞাত নামা সংবাদপত্রের সংবাদ যে ঘটনার আভাস দিয়াছে, তাহা যে কি ও কতদূরই হইতে পারে, তা যেন কল্পনাতেও সহ্য করা যায় না!

খুবলালের সাহায্য না থাকিলে স্থান নির্দ্দেশ কঠিন হইত; কারণ পঙ্কজিনীর ঐ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রই অভিজ্ঞতা ছিল না। ভাড়াটে গাড়িখানা সেই অর্দ্ধস্ফুট নক্ষত্রালোকে ধূসর কোয়াসাচ্ছন্ন অস্পষ্টপ্রায় দৃশ্যপটের মধ্য দিয়া ষ্টেশনের বিপরীত দিকের পথ ধরিল ও ক্রমশই অগ্রসর অতিক্রম পূর্ব্বক একটা বাঁকের মুখে আসিয়া থামিল গাড়োয়ানকে, সেইরূপই বলা হইয়াছিল। পঙ্কজিনী খুবলালকে বলিয়াছিল, কুঠি হইতে অন্ততঃ আধপোয়া পথ দূরে সে গাড়ি হইতে নামিয়া সেইটুকু পদব্রজে যাইবে।

গাড়ি এবং তার মধ্যে চরণ কাকাকে রাখিয়া শুধু খুবলালকে লইয়া পঙ্কজিনী তার বৎসরাতীতকাল পূর্ব্বে পরিত্যক্ত স্বামীগৃহের অভিমুখে যাত্রা করিল। পথ যতই অতিক্রান্ত হইয়া যাইতে লাগিল, চিন্তা ততই বহুমুখী হইয়া আসিতে লাগিল। কতবারই তার মনে হইল, কাজ নাই, এখনও না হয় ফিরিয়া যাই। কি জানি কি হইতে কি হইবে! যদি আমার আশঙ্কাই হয়,—(তাই হোক), যদি কোনক্রমেই উনি আমার আসা জানিতে পারেন,—যদি হঠাৎ কিছু ঘটিয়া যায়,—তবে না জানি কি ঘটিতে কি ঘটে? হয়ত মনে করিবেন আমি এত দিন পরে তাঁহার দ্বারে আশ্রয় খুঁজিতে আসিয়াছি! হয়ত সেই গৃহে তাঁর পশ্চাতে আর কাহাকে বিবাহ। কাজ কি!—না, ফিরিয়া যাওয়াই সঙ্গত। আবার মনে হইল এত দূর আসিয়া একবার দেখা না? সেও কি কখন হয়?—সে অগ্রসর হইল।

—আচ্ছা আর এককাজ করিলেও তো হইত! ষ্টেশনে নামিয়াই খুবলাল বা কাকার দ্বারা স্থানীয় লোকেদের নিকট হইতে এবাড়ীর সংবাদ তো লওয়া যাইতেও পারিত! এখনও তাঁরা আছেন অথবা আর কোথাও বদলী করিয়াছে তারইবা স্থিরতা কি! কি আশ্চর্য্য, এমন কথাও কি একবার মনে পড়িল না!—

এ যুক্তি সঙ্গতই বটে, কিন্তু তথাপি সে গতি রুদ্ধ না করিয়া [illegible] থাকিল? সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হইল—এত দূর আসিয়া হঠাৎ যদি এখন শুনিতে প[illegible] যে যেব্যক্তিকে মাত্র একবার আড়াল হইতে দেখার বেশী তার সম্বন্ধে আর কোন কিছুই করিবার নাই, সেই লোকই এদেশ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে! তার চেয়ে আর একটু পরেই চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হইবে, সেই ভাল।

এই যে সেই বাড়ীর দক্ষিণের সেই লাল ছোট বাংলোখান দেখা দিয়াছে; একজন ফিরিঙ্গী পরিবারের গৃহ। সামনে সেই বাহার করা ইটের বেড়ের মধ্যে ঋতু-পুষ্পের চারাগাছগুলি, ভোরের অল্পালোকে একটু একটু দেখা যাইতেছে। নীচু পাঁচিলের মাঝখানে কাঠের ছোট ফটক—এক পাশে কালো কাঠের উপর সাদা বড় অক্ষরে লেখা সাইনবোর্ড—সেই রকমই আঁটা আছে। প্রথম আসার দিন সে এই লেখা দেখিয়াছিল, পড়িয়াছিল। তার বুকের মধ্যে অশা[illegible] দ্রুততালে নাচিয়া উঠিল। এইবার—এইবার—সে তার হেলায় হারাণো আপন গৃহের দ্বারের কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। একদিন সে ইহাকে প্রবল ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করিয়া গিয়াছিল, আজ হয়ত তার সম্মুখে এর সকল দ্বার রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে! এইবার আর একটা সংশয় জাগিল, এই শীতের ভোরে অবশ্যই গৃহবাসী রুদ্ধদ্বার নিদ্রামগ্ন, সে তাঁহাকে একবার দেখিবে কিরূপে? সকাল হইলে তো তাঁদের মধ্যে অন্তরাল রাখিয়া গোপনে দেখার কোনই সম্ভাবনা নাই!

অনেক ভাবিয়াও যখন এর কোন মীমাংসা সে করিয়া উঠিতে পারিল না, তখন আর একবার রুদ্ধ গতিকে অতি সাবধানে মুক্ত করিয়া দিয়া সে অতি ধীরে ধীরে যেন আপনাকে সেই অর্দ্ধস্ফুট উষালোকে মিশাইয়া দিয়া সতর্কভাবে অগ্রসর হইতে লাগিল। মনটা তার যেন বিলাপ করিয়া কহিল, "না হয় বাড়ীখানাই দেখে ফিরে যাও। যা ফেলে গেছ, তা' আর দেখবার অধিকার তোমার কোথায়?" কিন্তু একি! কোথায় সেই বাড়ী! তার সে পরিচ্ছন্ন গৃহ, সুপ্রশস্ত, সুসজ্জিত সুন্দর রমণীয় গৃহ—সে কেথায়? কই কোনখানে ত তার কোন অস্তিত্ব দেখা যায় না! তবে কি কোন ভুল হইয়াছে? খুবলাল কি পথ ভুলিয়াছে? নিশ্চয় তাই। কিন্তু পাশের এই সাইনবোর্ডওয়ালা বাড়ীটা! তা হয়ত এ অন্য সাইনবোর্ড; না হয় ইহারা সেখান হইতে অন্যত্র উঠিয়া আসিয়াছে।

"খুবলাল!"

"মাই জি!"

"কোথায় [illegible]নলি রে? এ রাস্তা বোধহয় নয়! চ'ল্ আবার ফিরে চল্, সব মিথ্যে হ'ল!"

খুবলালের কোন সাড়া না পাইয়া পঙ্কজিনী পিছনে ফিরিয়া তাহার অন্বেষণ করিল, দে[illegible] পাইল না। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই তাহার সামান্য দূর হইতে একটা সভীত বিস্মিত [illegible] আহ্বানে অকস্মাৎ শরীর মনের সেই অবস্থায় সে প্রবলভাবে চমকিত হইয়া উঠিল, এক[illegible] মধ্যেই তাহার মনে হইয়া গিয়াছিল যে নিশ্চয় খুবলালকে সাপে কামড়াইয়াছে!

"মাইজি! [illegible] ?—ই কেয়া. হায়? কোঠি একদম জল গয়া! মেরা সাহেবকো কেয়া হুয়া!"

সেই হৈমন্তিক কোয়াসার স্থূল ও ধূসর জাল ও শীতের উষার ছায়াময় অন্ধকারের আবরণ ভেদ করিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিতেই পঙ্কজিনীর ভয়ার্ত্ত ও বিপর্য্যস্ত দৃষ্টির সম্মুখে তার পূর্ব্বতন নিবাস গৃহের পরিবর্ত্তে একটা বিরাট ভস্মস্তূপ নিজের ভীষণ অস্তিত্ব প্রচার করিয়া ধরিল। ঠিক ওই খানেই তার সেই কত আশার এবং প্রবল হতাশার অভিনয় বর্ষপূর্ব্বে অভিনীত হইয়া গিয়াছিল, ঠিক ওই খানকেই লক্ষ্য করিয়া আজ আবার এতদিন পরে সে চোরের মতই লুকাইয়া নিজের স্বেচ্ছাত্যক্ত স্বাধীন অধিকারে কুণ্ঠিত পদে অগ্রসর হইতেছিল, আর সে ভয় সন্দেহের কোনই প্রয়োজন [illegible] নির্জ্জন লোক, জনহীন ভস্মস্তূপের কাছে আর কুণ্ঠাই বা কি আর সংশয়ই বা কোথায়?

মুহূর্ত্ত পূর্ব্বের সেই ধীর মন্থর সতর্ক পদক্ষেপ সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া গিয়া পঙ্কজিনী দ্রুত, অস্থির উন্মত্তগতিতে প্রাণপণ বেগে ছুটিয়া সম্মুখের বৃক্ষলতাহীন জঙ্গলময় উদ্যান পথ অতিক্রম করিয়া সেই শ্মশান ভূমির সম্মুখে উপনীত হইল। সংবাদ পত্রের সে সংবাদে তবে ইহাই লিখিত ছিল; সে আর কাহারও কথা নয় সে তবে তাঁহারই কথা!—যিনি এই গৃহে বাস করিয়া গভীর রাত্রে অগ্নিবেষ্টিত হইয়াছিলেন এবং সকল * * বাহির হইতে রুদ্ধ!—এই সংবাদের পর যাঁর সম্বন্ধে কোন সংবাদই আর জানিতে পারা যায় নাই—সেই নির্ঘাত সংবাদ ইঁহারই!

পঙ্কজিনীর মূর্চ্ছা হইল না, কান্না আসিল না, কিছুই হইল না,—সে যে রহিল বা গেল, তাও সে কিছুক্ষণ অনুভব করিতে পারিল না। একটুখানি সংযত হইবার পর সর্ব্ব প্রথম এই কথাই মনে হইল যে কার পাপে? হে ভগবান! এই যে ভয়াবহ কাণ্ডটা ঘটিয়া গিয়াছে এর জন্য [illegible]দের দুজনের মধ্যে দায়ী কে? সে শুনিয়াছে যে গৃহে নারী অবমানিত হইয়া অশ্রুপাত করেন, [illegible]হ ভস্ম হইয়া যায়! একি তাই? সর্ব্বশরীর অননুভূত আতঙ্কে শিহরিয়া রোমাঞ্চিত হইয়া [illegible]। অথবা তারই ক্ষমাহীন অহঙ্কারে স্বামীর প্রতি অবহেলার এ প্রায়শ্চিত্ত!

গৃহের এই অবস্থা! গৃহের অধিবাসীদের যে পরিণাম কি ঘটিয়াছে—সে সম্বন্ধে এই গৃহ ও [illegible]বাদপত্র এতদুভয়ের দ্বারাই প্রায় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। বিশেষতঃ যখন ইহার [illegible]ক পরেই রাত্রি প্রভাত হইল, তখন দিবালোকে, সেই বিশাল ভস্মস্তূপের ভয়াবহ মূর্ত্তি [illegible]রিয়া আর দর্শকের মনের মধ্যে কোন সংশয়ের যেন স্থান রাখা সম্ভব হইল না। যে গৃহের [illegible]বস্থা সেই গৃহের রুদ্ধদ্বার গৃহবাসী কি আর আত্মরক্ষায় সমর্থ হইয়াছে? সম্ভবই নয়! [illegible]লার আর পুড়িতে কিছুই বাকি নাই! নেহাৎ ইটের গাঁথনিগুলা ভস্ম হইবার নয়; তাই [illegible] বজ্রাগ্নি-দগ্ধ ভস্ম-দীর্ঘ তাল বৃক্ষের মতই কয়লার পাহাড়ের মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া আছে। তার [illegible]কোথাও একটা কাঠের জানালা বা একখানা জানলার চিহ্নও নাই। ছাদের অস্তিত্বের মধ্যে [illegible]ভাঙ্গা খোলাররাশি সেই শূন্য গৃহের বিরাট জঠর মধ্যে ও চারিপার্শ্বে বিক্ষিপ্ত [illegible]

পঙ্কজিনী অচল অভিভূত হইয়া গিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে[illegible] দেখিতে লাগিল। এই গৃহ একদিন কত সুন্দর সৌখিন ও বহুমূল্য আসবাবে সাজাইয়া তার স্বামী তাহাকে এখানে অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন ; সে তাহা গ্রহণ করিতে পারে নাই। তার আজ মনে হইল, আজ কোন্ অদৃশ্য দেশ হইতে কোন্ অদৃশ্য দর্শক প্রতিশোধপূর্ণ ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া যেন কি এক অশ্রুত ভাষায় তাহার কানের কাছে জিজ্ঞাসা করিতেছে, "এবার তোমার মনোমত হইয়াছে কি ?" —পঙ্কজিনী শিহরিয়া চক্ষু মুদিল।

এই অগ্নিকাণ্ড নিতান্ত দুদিনের ঘটনা নয়। এর গায়ের উপর শুধুই আজ শীতের শিশিরই অশ্রুবিন্দু বর্ষণ করে নাই, বর্ষার প্রবল অশ্রু জলধারাও এর প্রচণ্ড তাপদাহ জুড়াইয়া বহিয়া গিয়াছে—তাহারও প্রকট চিহ্ন ইহার দগ্ধ শরীরে দেখিতে পাওয়া যায়। তবে নিশ্চয়—[illegible] তিনি নাই—নতুবা কি এতদিনে এতবড় বিপদেরও পর তাঁর পঙ্কজিনীকে একটীবারও মনে পড়িত না ? —অথবা কেনই বা মনে পড়িবে ? তাঁর এ বিপদের সংবাদে সে যে এতবড় অজ্ঞ ছিল তা'ইবা তিনি জানিবেন কিরূপে ? ইহাও তো মনে করিতে পারেন যে, যে স্ত্রী এই দুর্ব্বিপাকের সংবাদেও একটা তত্ত্ব লয় না.....! হায় একথা মনে করিবার জন্যও যদি বাঁচিয়া থাকিতেন !

(১২)

খুবলাল গিয়া বিষ্ণুচরণকে সকল সংবাদ জানাইয়া ডাকিয়া আনিয়াছিল। তাহারা দুজনে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া দেখিতেছিল ; আর সাম্‌নের লম্বা দালানের আচ্ছাদনহীন আব্রুশূন্য অপরিচ্ছন্ন ভূমিতলে বসিয়া বসিয়া পঙ্কজিনী আকাশ পাতাল ভাবিতেছিল। সে যে এখন কি করিবে, তার যেন কোন ঠিকানাই সে পাইতেছিল না, বুক তার ধূ ধূ করিয়া পুড়িতেছিল, তাহাতে একবিন্দু জল ঢালিবার শক্তি বা সাহস তাহার নাই। কোন্ অধিকারে সে এই অনাদৃতের জন্য কাঁদিবে ? তার মনে হইল, সে কি ইচ্ছা করিলে সেদিন ক্ষমা করিতে পারিত না ? কত মেয়েতেই তো এ সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকে, তারা কেমন করিয়া পারে ? বোধহয় স্বামীকে তারা ভালবাসে তাই পারে। সে কি তবে বাসিতনা ? কিন্তু এ প্রশ্নের সে উত্তর নিজের কাছে নিজেই খুঁজিয়া পাইল না। বাসিত বৈকি ; বাসে বই কি, এমনই খাপছাড়া এলোমেলো জবাবগুলো [illegible] হইতেই জড় হইল ; হয়ত এর মধ্যে কিছু আত্ম প্রতারণাও থাকিতে পারে। যথার্থ [illegible] নাকি আবার প্রেমাস্পদকে ক্ষমা করিতে পারা যায় না।

বেলা বাড়িতে লাগিল ; আটটা বাজিয়া গেল, শীতের শিশিরে সূর্য্য কিরণ এতক্ষণ হীরার জ্যোতি বিচ্ছুরিত করিতেছিল ; গাছের পাতারা মোতির মালা খুলিয়া হীরক হারে নিজেদের [illegible] করিতেছিল। [illegible]পাড়া বাড়ীর চারিদিকে অযত্নবর্দ্ধিত ঘাস ও আগাছার মধ্যে মধ্যে পূর্ব্বদিনের এক আধটা বড় গোলাপ, খস্‌খস্ বা গাঁদা দোপাটীও তাদের নিরালা জীবনের অনাহত রূপের রাশি খুলিয়া দিয়াছিল। রাস্তার ধারের সেই প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছটার অর্দ্ধেক পাতা [illegible]

গিয়া ঝরিতে [illegible] বাকিগুলা ঘন সবুজের উপর সূর্য্যালোকের সোনার গুঁড়া মাখিয়া ময়ূরকণ্ঠীর মত ঝিলিক মারিতেছিল। চারিদিক সৌম্য, শান্ত, সুন্দর এবং সমুজ্জ্বল কিন্তু তার মাঝখানে আজ একি নিদারুণ মর্ম্মজ্বালা ! একি অসহনীয় স্মৃতির দাহ !

রাজপথে লোক চলিতেছিল ; দুইজন ভদ্রলোক বোধকরি হাওয়া খাইয়া নাথনগরের দিক হইতে ফিরিতেছিলেন। বিষ্ণুচরণ ও খুবলাল—বিশেষতঃ পঙ্কজিনীকে—অমনভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তাঁহারা একটু বিস্মিতদৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে যাইতেছিলেন ; বিষ্ণুচরণ তাড়াতাড়ি রাস্তার ধারে আসিয়া তাঁদের আহ্বান করিল, "মশাই ! শুনুন।"—তারপর তাঁরা দাঁড়াইয়া পড়িলে জিজ্ঞাসা করিল, "এ বাড়ীতে যিনি থাক্‌তেন তাঁর কি হয়েছে জানেন কি ?"

ভদ্রলোকেরা প্রায় সমস্বরেই বলিয়া উঠিলেন,—"জানি বৈকি ! তিনি পুড়ে গেছেন—"

উহাদের কথা কহিতে দেখিয়া পঙ্কজিনী উঠিয়া বাহিরে আসিল, উচ্চকণ্ঠে ডাকিল "চরণকাকা ওঁদের এখানে একবার আসতে বলুন।"

লোক দুটি বলিবার অপেক্ষা না করিয়াই নিজ হইতে বাগানের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন, একজন বিষ্ণুচরণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"উনি আপনারা তাঁর কেউ হন নাকি ?"

বিষ্ণুচরণ কহিল,—"আত্মীয়।"

তিনি কহিলেন, "তাঁর স্ত্রী শুনেছি একটা চাকর নিয়ে পালিয়ে গেছলেন, আহা বেচারী বড় দুঃখী ছিল।"

কথাটা নৈকট্য বশতঃ পঙ্কজিনীর কর্ণগোচর হইল। তার পাংশুমুখ মুহূর্ত্তে আরক্ত ও কঠিন হইয়া উঠিল। প্রথমটা অকথ্য ঘৃণায় সে আর তাহাদের দিকে চাহিয়া দেখিতে বা কোনই প্রশ্ন করিতে সমর্থ হইল না ; তারপর নিজকে একটু সামলাইয়া লইয়া বিষ্ণুচরণের দিকে চাহিয়া বলিল, "জিজ্ঞাসা করুন তো—মিঃ সরকার যিনি এ বাড়ীতে থাক্‌তেন তাঁর—"

নিজেকে কঠিন করিয়া লইয়া দুর্ভাষীদের মুখ হইতে সকল প্রকার মন্দ কথাই সে শুনিবে [illegible] প্রস্তুত হইয়া এই প্রশ্ন অত সহজভাবে তুলিতেছিল ; কিন্তু শেষ করার সময় দেখিল তার কণ্ঠ [illegible] জিহ্বা সে শব্দ ও স্বরকে বহির্গত করিতে সায় দিল না এবং তার মনকেও সে যত কঠিন [illegible] জানে বুঝি ঠিক সে তেমন নয়।

কিন্তু উত্তর প্রশ্নের শেষের অপেক্ষা করিয়াছিল না। উত্তর সে তৎক্ষণাৎই পাইল,—

"তিনি ত সেই আগুন লাগার রাত্রেই যতদূর জখম হতে হয় তা হয়েছেন এবং—"

পঙ্কজিনীর এই দুর্ম্মুখ দূতের প্রতি সকল বিতৃষ্ণা একই ক্ষণে কোথায় ভাসিয়া গেল, সে [illegible] আগ্রহে তাদের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল,—"বেঁচে ছিলেন কি ? বেঁচে আছেন কি ? কোথায় [illegible] বল্‌তে পারেন কি ?"

তার সেই সঘনস্পন্দিত আগ্রহকম্পিত ব্যাকুল কণ্ঠের অস্বাভাবিক স্বরে শ্রোতাদ্বয় ঈষৎ

বিস্ময়ানুভব করিলেও ভদ্রতার খাতিরে উহা নিরোধপূর্ব্বক তাহার প্র[illegible] প্রদান করিল—
"হাঁ বেচে ছিলেন ; বেঁচে হয় ত আজও আছেন, তবে সে রকম বেঁচে [illegible] থাকাই ভাল ছিল !"

পঙ্কজিনীর প্রাণটা যেন তার গলার কাছে ঠেলিয়া আসিয়াছে বলিয়াই তার অনুভব হইল। সেই প্রাণেরই একটা ফাটান অংশ ঠিক্‌রাইয়া পড়ার মতই তার সঘন কম্পিত শুষ্ক ওষ্ঠাধরের মধ্য দিয়া বহির্গত হইল,—"বেচে না থাকাই ভাল ছিল ?"

"আজ্ঞে তাছাড়া আর কি বলি ? সেই আগুন লাগার রাত্রে কে যেন শত্রুতা করে তাঁকে আর তাঁর চাকরকে বাহির থেকে খিল বন্ধ করে দিয়ে যায়! বিস্তর টানাটানি করে দোর খুল্‌তে না পেরে তিনি পাগলের মতন ছুটে বেড়িয়েছেন। তারপর যখন ভয়ানক রকম আগুন জ্বলেছে বাহির থেকে লোকজন এসে চাকরটার আর্ত্তনাদ শুন্‌তে পেয়েছে তখনই না দোর [illegible] হয়। তখন দেখা গেল, আগুনে ততটা ক্ষতি না হলেও, উপর থেকে আধপোড়া একটা কড়ি পড়ে ওঁর মাথা প্রায় ফেটে যাবার যোগাড় হয়েছে, তিনি অজ্ঞান হয়ে মাটীতে পড়ে আছেন।"

পঙ্কজিনী অতিকষ্টে শ্বাস লইয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "তারপর ?"

"তারপর ওঁকে ত তখনই হাঁসপাতালে নিয়ে যায়। পাঁচ ছ' দিন তো এই যায় ত এই যায় হয়ে কাট্‌লো। তারপর ক্রমে ক্রমে বাঁচবার আশা হলো। ডাক্তার সাহেব, কালেক্‌টার সাহেব, কমিশনার সাহেব সবাই তদারক করেছেন। বলেন কি, একটা সিবিলিয়ান! বিলিতি পাশ, প্রাণটার দাম কত ? একি আমাদের তোমাদের প্রাণ যে থাকে থাক্ যায় যায় !—"

অধৈর্য্যের সহিত পঙ্কজিনী পুনঃ প্রশ্ন করিল "তারপর ?"

"তারপর ক্রমে জানা গেল মাথার আঘাতের ঘা শুখালেও তার ভিতরের দোষ যাবার নয়। চোখের দৃষ্টি গেছে, পিঠের শিরদাঁড়ার জোর নেই, জিভের শক্তিও নিতান্ত কম। এই কাঁচা বয়েসে, অচল, পঙ্গু হয়ে ওঁকে বরাবরের জন্যে থাক্‌তে হবে। তার উপর একটী পায়ে অপারেশন করতে হয়েছিল, সেটী যেন 'মরা' হয়ে গেছে, লাঠি ধরে চলতে হয়।—একি আর বেঁচে থাকা ?"

পঙ্কজিনীর যেন মনে হইল ডুবিতে গিয়াও সে যেন ভাসিয়া উঠিয়াছে! এরচেয়ে কৃতী, কর্ম্মী, যুবাবয়সী পুরুষের দুর্দ্দশার আর সত্যই কি বাকী থাকিতে পারে ? কিন্তু তার সে কথা আর মনেও হইল না। তার এইকথা মনে হইল—সে আছে। আর তার আজ হয়ত পঙ্ক[illegible] সবার চাইতেও বেশী দরকার। তখন দেশের কাজ, নিজের উন্নতি ও শান্তি সকলই ভুলিয়া সে উৎসাহপ্রজ্জ্বলিত মুখে সংবাদদাতাগণকে জিজ্ঞাসা করিল—

"তিনি এখন কোথায় আছেন, বল্‌তে পারেন ?"

"আজ্ঞে [illegible]; তা ঠিক জানি নে। তবে সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে একদিন কার মুখথেকে যেন [illegible]নেছিলাম যে তিনি সেরে উঠেছেন, এইবার বাড়ী যাবেন। হবে এত দিনে দেশে টেশে গেছেন [illegible] তা আপনারা কোথা থেকে আসচেন ? তাঁর কে হ'ন ?"

এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়া পঙ্কজিনী নিজের এখনকার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিল। বিষ্ণুচরণ জিজ্ঞাসা করিল "[illegible]াই! কে এমন তাঁর শত্রু ছিল যে অমন নৃশংসভাবে পুড়াইয়া মারতে গেল ? জামাই বাবু কার কি এমন করেছিলেন ?"

তখন ইঁহারা নিজেদের সন্দেহকে নিশ্চিত করিয়া লইলেন ও উত্তর দিলেন—

"পাপ, মশাই! অনাচার! সতী স্ত্রীকে তাড়িয়ে দিয়ে—যাক্ মশাই! আমাদের সে সব আলোচনায় আর দরকার কি ? যার কর্ম্ম তিনিই করেন ; তবে সংসারে ভালমন্দ দুইয়েরই তো ফলাফল আছে। কর্ম্মটা খারাপ করলে তার একটা ফল নেই ?—"

[illegible]জিনী এই 'দ্বৈত' বাদীর প্রতি একটা বিরক্ত কটাক্ষ করিয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইল। বিষ্ণুচরণ একটু ইতস্ততঃ করিয়া কিছু নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তা কোন্ লোক এ কাজ করলে কিছু জানা গেল ? তার কোন শাস্তি হলো ?"

বক্তা কহিল "কিছু না মশাই! জানা স্পষ্ট কিছুই যায়নি এবং শাস্তিও তার কিছুমাত্র হয় নি। তবে সবাই একজনকে সন্দেহ করে থাকে ; লোকটা ঘোর মাতাল, ভিতরে নাকি নারীঘটিত কোন গোলযোগেরও কানাঘুসা শুনা যায়।"

আগন্তুকদ্বয়ের নিকট আর একটী মাত্র প্রয়োজনীয় সংবাদ জানিতে পারা গেল, এই ভয়াবহ ও শোচনীয় কাণ্ডের অভিনয় ঘটনার কাল ২২শে জুন তারিখ। সংবাদপত্রে এই ২২শের উল্লেখই সে দেখিয়াছিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য সে না হয় সংবাদপত্রের কোন সংবাদই রাখে নাই ; কিন্তু [illegible] তো অনেক লোক ছিল, তার বড়দা'ও কি সত্য সত্যই এ সংবাদে এত দিন ধরিয়া অজ্ঞ ছিলেন [illegible] তাহার নিকট ইহা গোপন রাখিয়াছিলেন মাত্র !

(১৩)

হাঁসপাতালে এবং কালেক্‌টরীতে সংবাদ লইয়া জানা গেল যে গত সেপ্টেম্বর মাসের [illegible] সুধীন্দ্রনাথ হাঁসপাতাল ত্যাগ করিবার পর এখানের একজন হিন্দু ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট [illegible] নিজের বাড়ী লইয়া যান। সেখানের যত্ন ও শুশ্রূষায় একটু সুস্থ হইলে প্রায় মাসখানেক [illegible]র খুড়া আসিয়া তাঁহাকে দেশে লইয়া গিয়াছেন। পঙ্কজিনীর মন এইবার আবার [illegible] হইয়া আসিতে লাগিল। দেশে গিয়াছেন, খুড়াখুড়ির যত্ন সেবার মধ্যে বাস করিতেছেন। [illegible] আর সেখানে তাহাকে কিসের প্রয়োজন ? তবে আর কি করিতে সেখা[illegible] সে অনর্থক গিয়া [illegible] হয় ? যদি সকলের মধ্যেই তিনি তাহাকে বিদায় করিয়া দেন, যদি বলে[illegible] আমার তোমায় [illegible] আবশ্যকই নাই তুমি যেখানে ছিলে যাও,—তবে সে লজ্জা সে ঢা[illegible] দিবে কেমন [illegible]—কি দিয়া ? তার দুই পা চাপিয়া ধরিয়া তার দুরন্ত অভিমানী মন [illegible]লবেগে তাহাকে [illegible]তদিকে পশ্চিমাভিমুখে আকর্ষণ করিতে লাগিল ; কিন্তু তথাপি জোর করিয়া সে তার সমস্ত

কুযুক্তিকেই খণ্ডন পূর্ব্বক পূর্ব্বদিকগামী ট্রেণেরই টিকেট কিনিবার জন্য বিষ্ণুচরণকে আদেশ দিল ও যথাকালে তাহাতেই চাপিয়া বসিল।

খুলনা জেলার অন্তর্গত একখানি সামান্য গণ্ডগ্রাম নাম তার.....সেইখানে বিবাহের সময় সে মাত্র দিন চারেকের জন্য এবং শ্বাশুড়ীর মৃত্যুতে কয়েক দিন—এই দুইটীবার গিয়াছিল; বিষ্ণুচরণও ঐ দুইবারেই তাহার সঙ্গী ছিল। পথ চিনিয়া যাইতে তাই কাহারও কোন বাধা পড়িল না। কিন্তু বাহিরের রাস্তা যতই সুগম বোধ হইতেছিল, ভিতরকার দ্বিধা ততই যেন প্রবলতর বোধ হইতে লাগিল। অবশেষে খুলনা যতই নিকটতর হইয়া আসিল, প্রতি ষ্টেশনে প্রত্যেকবারই পঙ্কজিনীর মনে হইতেছিল, এইবার সে নিশ্চয়ই ট্রেণ হইতে বুঝি নামিয়া দাঁড়াইবে, আর বুঝি তাহাকে ধরিয়া রাখা যায় না। নিজের সেই অসহায় আত্মসমর্পণের নিদারুণ লজ্জা,—জ্বালা, যে স্মৃতি এই বর্ষাধিক কাল ধরিয়া তাহার নারী মর্য্যাদাকে সর্ব্বক্ষণই অমর্য্যাদার আঘাত করিয়া গিয়াছে—সে স্মৃতি আবার এই বিদ্রোহপরায়ণ চিত্তকে যেন জয় করিতে বসিল। সেই ঐকান্তিকতা পূর্ণ, অনুরাগে ভরা পূজার বিনিময়ে সে কি ভীষণ অভিশম্পাতই তার দেবতার নিকট হইতে ফিরাইয়া পাইয়াছিল! আর সেই পত্র—যার জন্য তার এই সারা জীবনটাই ব্যর্থতার আঘাতে চূর্ণিত হইয়া গিয়াছিল! আবার সে কিসের জন্য সেখানে চলিয়াছে? জীবনের দেনা পাওনা যে নিঃশেষে চুক্তি হইয়াই গিয়াছে, —এম্‌নি করিয়া হইয়াছে যে তাহার ঠিকানা জানা থাকা সত্ত্বেও তিনি একটী বারেরও জন্য তাহাকে কত বড় দুর্ভাগ্যে দিনেও স্মরণ করিতে ভুলিয়াছেন। কোন্ ভরসায় সে চলিয়াছে? মন কলরবে তার মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার সকলে মিলিয়া তাহাকে এই সকল ও আরও কতই প্রবলতর যুক্তি দেখাইয়া দেখাইয়া বলিতে লাগিল, "প্রাণে বাঁচিয়া আছেন, জানা রহিল, চুকিয়া গেল, আর কেন, এখনও নিজের পথে ফিরিয়া যা; সে পথই কি ত্যক্ত হইবার মত তুচ্ছ? এ সংসারে কত অভাব—এ দেশের নারী উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে নিজ মর্য্যাদাজ্ঞান হারাইতে বসিয়াছে, কোথাও ভুল শিক্ষার দোষে তাদের এই আত্ম জ্ঞানটা মন্দ পথে, আত্মপ্রতারণায় পরিণত হইয়া পড়িতেছে, তাদের জনকতককেও যদি সে নিজদের সম্মান রক্ষার উপযোগী নারীত্বের সমুচ্চ দিতে পারে তবে কি তার জীবন সফল হইতে পারিত না?

—কিন্তু বোধ হয় তা' নয়; বোধ হয় তার নারীমর্য্যাদা, তার আত্মসম্মান, তার জীবনের সফলতা সবই তার সর্ব্বান্তর্য্যামী চিত্তবৃত্তি আজ এই পথেই নিজের পাথেয় খুঁজিয়া পাইতেছে, তাই সে কাহার কোন প্রলোভন ও নিষেধ কোন কিছুতেই দৃক্‌পাত করিতে প্রস্তুত নয়। তার যে তাকে এমন করিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। সে ভাবিতে লাগিল:—সে দিন সে নিজে নারীমর্য্যাদাকে সব কিছুরই উপরে ধরিয়া তাহারই রক্ষাকল্পে নিজের সমস্ত জীবনের সুখ-সাধ ভোগবিলাসের গৌরব সম্মানে সকলপ্রকার প্রার্থিত সৌভাগ্যেই স্বেচ্ছায় জলাঞ্জলী দিয়া আসিয়াছিল।

প্রেমহীন মন্থপ স্বামীর বিলাসের সখী হইবে না বলিয়া সে তাঁহাকেও সে অধর্ম্মাচরণ হইতে নিবৃত্ত রাখিয়াছিল। এর মধ্যে ত তার আর কোন স্বার্থ ও সুখ ছিল না। তবে আজ সে তাঁর দুঃদৈন্য ও দুর্ভাগ্যের দিনে কিসের জন্য তাঁহাকে ছাড়িয়া দূরে থাকিবে? তা' যদি থাকিতেই পারে তবে আর সে নারী নয়, আর্য্য মহিলা নয়, হিন্দু মহিলা নয়; সতী নয়। পতির সুখের দিনে তিনি গর্ব্বভরে উপযুক্ত সম্মান রক্ষা করেন নাই, সেই অভিমানে সতী কি তাঁর দুঃসময়ে তাহার জন্য নিজকে উৎসর্গিত করিবেন না? না, না, এর চেয়ে বড় ব্রত, বড় গুরু, বৃহদনুষ্ঠান পঙ্কজিনীর আরতো কিছুই নাই। তবে নিতান্তই যদি তাকে তাঁর প্রয়োজন না থাকে, ফিরিয়া আসিয়া আরক কার্য্য সমাধা করিবার আয়োজন করিবে। সেও এই হিন্দু নারীরই আর এক রূপ—যার সন্তান জন্মে নাই, সে পরের সন্তানের মঙ্গলের পথ প্রস্তুত করিতে আত্মোৎসর্গ করিয়া দিবে।

(১৪)

বাংলাদেশের ক্ষুদ্রপল্লী যেমন হয়.....ঠিক সেই একইপ্রকারের। সেই সনাতন বর্ষা-জলধারাপুষ্ট—ইদানীং পানীফল পানায় ভরা গাঢ় সবুজ বর্ণের অসংখ্য ডোবা, উহারই মধ্যে একটা একটু বড় আকারের পুষ্করিণী। ডোবার চারিধারে ব্যাঘ্র ভল্লুকের ক্রীড়াক্ষেত্র রূপ গভীর জঙ্গল। পুষ্করিণীর চারিপাশে ইট দিয়া বাঁধান চাতাল, বাঁধাঘাট এবং স্থানে স্থানে একটা অর্দ্ধভগ্ন শিবমন্দির। অদূর অতীতে একদিন যে এদেশে মানুষ ছিল, মানুষের মনে শ্রদ্ধা ছিল, তাদের ভিতর প্রয়োজনীয়তা বোধ ছিল, স্বধর্ম্মে শ্রদ্ধা ছিল এবং ইদানীং এ সবেরই অভাব ঘটিয়াছে,—ওই সকল চিহ্ন দ্বারা এই সকল কথাই বিশেষভাবে প্রমাণ করিয়া দিতেছে। এ দেশে যথেষ্ট ম্যালেরিয়া জ্বরের উৎপাত, এ বৎসর অতিবৃষ্টির জন্য শীতের প্রারম্ভেও এখন তার প্রতাপ কিছুমাত্র খর্ব্ব হয় নাই। ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়াগ্রস্তগণ প্রায় একই সময়ে তাদের পক্ষে প্রয়োজনীয়তায় প্রায় বারমেসে লেপের তলায় প্রবেশ করিয়া জ্বরের কম্প আসিবার প্রতীক্ষা করিয়া থাকে; তারপর আবার প্রায় একই সঙ্গে উঠিয়া গৃহকর্ম্ম বা বাহিরের কাজে [illegible] তা মন বড় দিবার মত অবস্থায় থাকে না। ওই ওখানে জ্বরগ্রস্ত কচি ছেলেটা [illegible] কাঁদিতেছে, পালাজ্বরে জর্জ্জরিতা বউমার ইচ্ছা শাশুড়ী ওটাকে তোলেন, শাশুড়ীর দেহের হাড় কয়খানা কোন মতে জ্বলন্ত উনানে ভাতের হাঁড়ী চাপাইতেই খসিয়া পড়িতে চাহিতেছিল, তাঁর সেই ব্যাধিগ্রস্ত কাঁদুনে ছেলে ভুলাইবার সামর্থ্য কোথায়? বাড়ীর বাবু বাহিরের রোয়াকে বসিয়া যন্ত্রণাবিকৃত রক্তহীন চক্ষে প্রায় জনশূন্য পথের পানে চাহিয়া আছেন; পায়ের, বুক পিঠের সকলমাংস তাঁর উদরটীর উপরেই জড় হওয়ায় দেহের বাকী অংশগুলি যেন কঙ্কালের আকার ধারণ করিয়াছিল; তাঁহারও ছেলের কান্না কানে গেলেও তাহা মনের ভিতর দিয়া মরমে পশিতেছিল না।

পঙ্কজিনী গ্রামের দুর্দ্দশা দেখিয়া যৎপরোনাস্তি ভীত ও বিস্মিত হইল। চারিদিকেই এই বাড়ীর বাবুটীর আকারেরই হাতপা কাঠী ও পেট মোটা নরমূর্ত্তি তাদের নিরুদ্যম, পাণ্ডু মুখ যতই চোখে পড়িতে থাকিল, তার মনকে ততই যেন করুণায় ও দুঃখে একেবারে গলাইয়া তুলিতে লাগিল। আহা একি জীবনরে! একি দুঃখের জীবন! এর কি আর কোনই প্রতিকার নাই? এই জলা জঙ্গলে সমাকীর্ণ দেশের আবর্জ্জনা দূর করিয়া একে যমরাজার খাসমহল হইতে উদ্ধার করিতে পারা কি একেবারেই অসম্ভব? কিন্তু একা নারী সে—তার শক্তিতে এ অসাধ্যসাধন কখন সম্ভবে! তার গুরুভারাতুর বক্ষ উদ্বেলিত করিয়া আকুলতাভরা দীর্ঘশ্বাস উত্থিত হইল। তার নিরাশাকাতর অন্তর হইতে প্রতিধ্বনিত হইল, যদি তার স্বামী বিলাতি ব্যসনে বিলাতি অশনে অভ্যস্থ না হইয়া, বিলাতি স্বদেশ হিতৈষণা, স্বদেশের ত্যাগ, স্বদেশ ও সমাজের জন্য নিজের ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণরূপে বিলোপ সাধন করিতে শিক্ষা করিয়া আসিতেন!—যদি তারা দুজনে তাঁর কর্ম্মাবসরে গ্রামে গ্রামে ফিরিয়া এই অসীম অভাবের এতটুকুও মোচনচেষ্টা করিতে পারিত!—দুজনেরই এদেশে জন্মের ঋণ কথঞ্চিৎ পরিশোধ হইতে পারিত, জীবন সার্থক হইত, সব হইত! এমন শোচনীয় পরিণাম তাঁর তো হইতই না, তারও এই ছন্নছাড়া অবস্থা দাঁড়াইত না। নারীর করিবার জিনিস অনেক আছে, কিন্তু তার জন্য যে উপযুক্ত নরের সহায়তা তার চাই। সে অনন্যসহায় যাহা পারে, অন্য-সহায়ে তদপেক্ষা শতগুণ শক্তিশালিনী হয়। বিশেষ একজন সিবিলীয়ানের পক্ষে এসব কার্য্যের সুযোগ কতই অধিক। এই শক্তি তিনি হেলায়, বৃথায় হারাইলেন!

শ্বশুরবাড়ী যতই নিকট হইয়া আসিল, পঙ্কজিনীর মন ততই নানা চিন্তায় কখন সঙ্কুচিত কখন প্রসারিত হইতেছিল। যদি তিনি ক্ষমা না করেন? ক্ষমা? না ক্ষমা সে চাহিবে না। কিসের ক্ষমা? দোষ সে একটুও করে নাই। ভুল করিয়াছিল কি? তাও না। চরিত্রহীনের সংশ্রব ত্যাগ সে দিনে তার কর্ত্তব্য ছিল; তাই সে গিয়াছিল, আজও আর্ত্তস্বামীর সেবার ভার গ্রহণ করা তার কর্ত্তব্য বলিয়াই ফিরিয়া আসিয়াছে। ইহাই হিন্দু স্ত্রীর ধর্ম্ম। হিন্দু স্ত্রীর পতিত্যাগ হয় না। তিনি তাঁর কল্যাণকামনাতেই তাহা হইতে বিমুখ হইতে পারেন মাত্র। আবার তাঁর প্রয়োজনকালে নিজের কল্যাণেভরা পূতচিত্ত তাঁহার কাছে সমর্পণ করিয়া দেন। সেও তাহাই করিতে আসিয়াছে। ভুল তার সে দিনেও হয় নাই—আজও না।

সুধীরের পৈত্রিক গৃহে সুধীন্দ্রের খুড়া হরিদাস বাবু বরাবরই বাস করিয়া আসিয়াছেন। সেখানে সুধীন্দ্রকে স্থান দিলে হয়ত ইহাতে তারও একটা অধিকার সাব্যস্ত হইতে পারে, তার বিলাত ফের ভাইপোকে বাড়ীতে রাখিলে পল্লীগ্রামে কোন বিভ্রাটে পড়িয়া যাওয়াও অসম্ভব নয়, কেথবা সুধীন্দ্রের খুড়ি তাঁর এই বিলাত ফেরৎ অন্ধ ভাইপোর সেবার ভার লওয়া হয় সুবিধা বোধ করেন নাই এই কয়টার একটা অথবা সবকয়টায় মিলাইয়া তাঁহারা সুধীন্দ্রকে তাঁদের

স্থান না দিয়া তাঁদের বাড়ীর কিছু দূরে খান তিনেক ঘরওয়ালা যে একটুখানি পাড়ো বাড়ী ছিল, তাহাতেই আশ্রয় লইয়াছিলেন। মাস কাবারে তার পেন্‌সনের টাকা আসিয়া ব্যাঙ্কে তহবিলেই জমা হইত এবং তাহা হইতে অত্যন্ত সন্তর্পণে হিসাব মত তিন চার কিছু কিছু সুধীন্দ্রের ভৃত্যের হাতে পড়িত। গরীবন্ শুধু তাহার ভৃত্য নয়; কারপরদাজ, পাচক ভৃত্য সঙ্গী সহচর একাধারে সকলই। তার বউ আসিয়া উহাকে রাঁধিয়া দিয়া যাইত এবং তার মধ্য হইতে সার অংশ যর্ত্ত নিজের ঘরে লইয়া যাইতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ অনুভবও করিত না; কাকার শ্রাদ্ধার দান যাহা পাওয়া যাইত, তার উপর এই দুই স্বামীস্ত্রীর লুণ্ঠনের মধ্য দিয়া তারজন্য অবশিষ্ট এতই কম থাকিত যে তারই উপর নিতান্ত অন্ধ ও খঞ্জ না হইলে কাহারও সাধ্য ছিল না। এই অশ্রদ্ধা ও অত্যাচারের আশ্রয়ে এই বয়সে এমন করিয়া পড়িয়া থাকিতে থাকিতে কতবারই যে সে মৃত্যুকে আহ্বান করিয়াছে, কতবারই তার পঙ্কজিনীকে মনে পড়িয়াছে, আবার পরক্ষণেই এই কথা বলিয়া মনকে স্থির করিয়া, লইয়াছে যে, সে একেই ত তাকে কত ভাল চোকে দেখিত, এখন করে তাই সে তার সেবা যত্ন করিত নাকি! গিয়াছে ভাল করিয়াছে। কিন্তু অনেক সময়ই ঠিক এই অভিমানকে মনে ঠাঁই দিতে পারিত না। অসহায় উৎপীড়িত অন্ধ কতবারই নিদারুণ ব্যথায় অধীর হইয়া মনে মনে বলিয়াছে "তোমার কাছে বিশ্বাস রাখিতে পারি নাই; রূপের মোহে ভুলিয়াছিলাম, দেখ তাই আজ দেখার শক্তি আমার শেষ হইয়া গিয়াছে!"

(১৫)

চারিদিকে ঘনসন্নিবিষ্ট জঙ্গলের মধ্যভাগে অতি ক্ষুদ্র, অতি পুরাতন, বহুদিনের অসংস্কৃত জানিতে কোন জীবিত লোক যে বাস করিতেছিল, এমন কোন চিহ্ন সহসা পাওয়াই যায় না। সেই ভাঙ্গা দেওয়ালের ফাটলে বসিয়া কয়েকটা পায়রা তাদের ফুলান গালে একটা ঘন করিতেছিল বটে; আর একটা কোন্ অদৃশ্য পাখী পত্রবহুল আম্রশাখায় লুক্কায়িত যেন ব্যঙ্গস্বরে কাহার উদ্দেশ্যে উপহাসের সহিত বলিতেছিল—চোক গেল—চোক গেল!

পঙ্কজিনীর বুকের মধ্যে একটা ঝড়ের উন্মত্ত হাওয়া যেন তুফান তুলিয়া দিয়া বহিয়া গেল। এই অসংস্কৃত, অসংস্কৃত, অপরিচ্ছন্ন ভগ্নগৃহে দারুণ দৈন্যদুর্গতির মধ্যে কি অসহায় কি পরিত্যক্ত ভাবে তার স্বামীকে ভোগ করিতে হইতেছে! কেন সে এতদিন তাঁরে খোঁজ খবর করে নাই।

আকাশে একটু একটু মেঘ জমিয়া এখন বেশ ঘোর হইয়া আসিয়াছিল; টিপ টিপ করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, বাড়ীর মধ্যে ঢুকিতে সে একটু ইতস্ততঃ করিয়া সাম্‌নে ভাঙ্গা বেড়া কলকাসন্দা, কচু ও কুকুরসোঁয়া গাছে ভরা স্থানটুকুতে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছে—খুট করিয়া ঘরের দরজায় একটু শব্দ হইল। ফিরিয়া দাঁড়াইতেই যে দৃশ্যটা তার চোখে পড়িল, সংশয়শঙ্কিত অভিমানপীড়িত চিত্তকে তীক্ষ্ণ দ্রংষ্ট্রা দিয়া নির্ম্মমভাবেই দংশন করিতে

লাগিল এবং বুকের মধ্যে তার সে যেন একটা বোমা দাগিয়া [illegible]ল—এম্‌নিভাবেই সে চম্‌কাইয়া দুহাতে নিজের বুকটা টিপিয়া ধরিল। সেই অতি সাবধানী মৃদুত[illegible] পদ শব্দ এক ক্ষীণমূর্ত্তি দীনবেশী খঞ্জের, এক হাতে তার একটা মোটা লাঠি, অপর হস্ত তার সম্মুখের দিকে প্রসারিত, চলন তার সন্দেহাকুল, মুখে তার কি করুণ ক্লান্ত অবসাদ!

অন্ধ আসিয়া দ্বার প্রান্তে দাঁড়াইল; একটুক্ষণ সেইভাবে স্থির হইয়া থাকিয়া সাম্‌নের দিকে সুস্থ পদটী বাড়াইল, হাত দিয়া স্থান নির্দ্দেশ করিয়া লইয়া তারপর হাতে বৃষ্টিবিন্দুর স্পর্শ হইতেই তার সেই কাতর ম্লান মুখে কি আকুল বিভীষিকাই যেন ফুটিয়া উঠিল! মনে হইল দুর্ল্লঙ্ঘ্য গিরি লঙ্ঘনের পরক্ষণেই সেখানে যে দাঁড়াইবার তিলার্দ্ধ পরিমিতও স্থান নাই—ইহাই জানা গিয়াছে। একটা সুগভীর দীর্ঘ শ্বাসে পুঞ্জীভূত আগ্রহ ব্যাকুল বাসনাকে [illegible] করি[illegible] অভাগা অতি কষ্টে গতি ফিরাইল।

বৃষ্টির ক্ষীণ বিন্দু কয়টা তারই মধ্যে থামিয়া গিয়াছিল, পঙ্কজিনী নিজের পাষাণে পরিণ[illegible] অচল নারীর মন কোন মতে সংযত করিয়া লইয়া দ্রুতপদে আসিয়া অন্ধের সম্মুখে দাঁড়াইল। তাহার সঘনে স্পন্দিত হৃদয়াবেগে কম্পিত রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠকে কোনমতে মুক্ত করিয়া লইয়া যথাসাধ্য সংযত কণ্ঠে কহিল—"বাইরে একটু বেড়াবে কি? আমি হাত ধরে নিয়ে যাব?

"কে?" অন্ধ সুধীন্দ্র এম্‌নি ভীষণভাবে চমকিয়া বিভোর স্বরে ঐ প্রশ্ন করিল যে পঙ্কজিনীর পা হইতে মাথা অবধি যেন সেই অসহায় প্রশ্নের একান্ত শোচনীয়তার আঘাতে কাঁপিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে নির্ব্বাক হইয়া কেবল তাহার সেই ঘনশ্বাসকম্পিত একান্ত বিচলিত মুখের দিকেই চাহিয়া রহিল এবং তাহার সারা চিত্ত আলোড়িত করিয়া সুপ্ত প্রেম বন্যাপুষ্ট সলিলরাশি মতই প্রবলবেগে জাগ্রত হইয়া তাহার ব্যথিত চিত্ত বেলার উপর মুহুর্মুহুঃ করুণার আঘা[illegible] করিতে লাগিল।

কাতর কণ্ঠে সুধীন্দ্র পুনশ্চ কহিল,—"কথা কইলে কে? অমন সুরে কথা যে আমি [illegible] কারু মুখথেকেই এই সাত মাস শুনিনি! কে' তুমি গা এই অভাগা অন্ধের কাছে আজ এলে?"

গভীর বেদনার বাষ্পকে সবলে দমন চেষ্টা করিয়া পঙ্কজিনী স্বামীর আর একটু কাছে দাঁড়াইল; তাঁর হাতখানি সযত্নে নিজের হাতের মধ্যে ধরিয়া লইয়া করুণা সুশীতল [illegible] কহিল, "বৃষ্টি থেমে গেছে, মনে হ'ল, তুমি বাইরে একটু বেড়াতে চাও, বেড়াবে কি? [illegible] নিয়ে যাব?"

এবার সুধীন্দ্র কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া কি ভাবিল, তারপর একটা গভীরতর [illegible] পূর্ব্বক ধীরে ধীরে কহিল—যেন আত্মগতই।—"গলা শুনে যার কথা মনে হয়, [illegible] আসা ত কখনই সম্ভব নয়; তবে আর কে হবে? তুমি পঙ্কজ কি নও? কিন্তু সে যে আমা[illegible] করে, সেত আস্‌বে না।"

"আমিই ত তোমার পঙ্ক[illegible], গলা শুনে চিন্‌তে পারচো না? আমি তোমার পাশে থাক্‌বো বলে এসেছি; এবার আর এক[illegible]নের জন্য তোমায় ছেড়ে যাবনা দেখ।"—এই বলিয়া পঙ্কজিনী স্বামীর শীর্ণ মলিন মুখে গভীর প্রেমে চুম্বন করিল।

সুধীন্দ্রের দুচোক দিয়া তার বহুদিনের বহু বেদনার সঞ্চিত অশ্রুজল বিন্দু বিন্দু—তারপর ধারাকারে—বহিয়া পড়িতে লাগিল, পঙ্কজের চক্ষুও তা দেখিয়া আর শুষ্ক রহিল না।

পঙ্কজ কহিল—"আমায় কেন ডাকনি?"

কুণ্ঠিতকণ্ঠে সুধীন্দ্র কহিল,—"ডাক্‌লে কি তুমি আস্‌তে?"

পঙ্কজ কহিল—"এই ত এলুম, খবর পাবামাত্রেই খোঁজ করে করে আস্‌ছি।"

"[illegible]হলে আমায় মাপ করেছ? দেখ আমার কি ভীষণ প্রায়শ্চিত্ত।"

পঙ্কজ স্বামীর হাত হইতে লাঠীগাছা কাড়িয়া লইয়া তাঁর হাতটী নিজের বাহুমূলে স্থাপন [illegible]ল, অন্য হাতটী নিজের হস্তে ধারণ করিয়া তাহাকে বাহিরের সেই মুক্তভূমিতে আনিতে আনিতে স্নেহস্বরে কহিল,—"আমার গায়ে কি মানুষের চামড়া নেই?"

তারপর বলিল,—"আমি ভাগলপুরে শুনে এসেছি তোমার একটী চোখ চিকিৎসা করালে [illegible]ল হ'তে পারবে, কালই আমি তোমায় নিয়ে কল্‌কাতা যাব; তোমার চোখটী সেরে যাবে [illegible]শ্চয়, তারপর যেখানে তোমার থাক্‌তে ভাল লাগবে, সেইখানেই আমরা দু'জনে থাক্‌বো।"

"তুমি আমার জন্য এত ক'রবে পঙ্কজ?"

পঙ্কজিনী নিরুত্তরে তাহাকে সাম্‌নের পৈঠা দুইটি নামিতে সাহায্য করিল। সুধীন্দ্র বাহিরে [illegible]নিয়া বলিল—"আঃ! একটু হাঁপ নিতে পারলুম!—পঙ্কজ! চোক হয়ত আমার আর ভাল [illegible]বনা। আমি এ জন্মে আর কখন তোমার মুখ দেখবোনা বলেছিলুম কিনা, তাই হয়ত ভগবান [illegible]মায় এই দণ্ড দিয়ে সেসুখে বঞ্চিত করলেন! যেন জীবনে শুধু আর একটীবার তোমায় দেখতে [illegible] কায়মনে শুধু এই চেয়েছিলুম, দেখ সে সাধও মিট্‌লো!"

পঙ্কজিনী কতকগুলি ইট কুড়াইয়া আনিয়া স্বামীর বসিবার জন্য একটী আসন তৈরি [illegible]তেছিল, সে তাঁর হাত ধরিয়া তার উপর বসাইয়া দিয়া নিজে তার পাশে ঘাসের উপর [illegible]য়া তাহার ললাটে মস্তকে সযত্নে হাত বুলাইতে বুলাইতে সপ্রেম স্বরে উত্তর করিল—

"চোখ তোমার নিশ্চয় ভাল হবে; ভাল হ'তেই হবে। যতদিন না হয় ততদিন তুমি [illegible] চোখ দিয়েই সব দেখতে পাবে। আমি সকল সময় কাছে থেকে তোমার সকল কাজ করে [illegible]খন প্রকৃতির মধ্যে কি পরিবর্ত্তন হচ্ছে বলে দেব,—তোমায় পড়ে শোনাব, কোন অসুবিধাই [illegible] দেবো না।"

সুধীন্দ্র একটু দ্বিধার সহিত কহিল "কিন্তু চিকিৎসার জন্য ত টাকা চাই! [illegible]মার ত কিছুই [illegible] আমার যা ছিল সব পুড়ে গেছে, মায় তোমার গহনাগুলো শুদ্ধ,—এখন [illegible]ড়শো টাকা

প্রেনসন যা পাই সে কাকার হাতে পড়ে—আমার ত কিছুই নেই [illegible] দিয়ে চিকিৎসা হবে, হ'লে হয়ত ভাল চোখটা সেরে যায়।"

বাধা দিয়া পঙ্কজিনী কহিয়া উঠিল,—"সে সব আমি ঠিক ক'রে নোব, তার জন্য কিছু ভেবো না, তাছাড়া আমার মাও কিছু দিয়ে গেছেন, টাকা আমার হাতে আছে।"

সুধীন্দ্র সহসা গভীর আবেগে তার সেই বলহীন ক্ষীণ হস্তে স্ত্রীর হাত ধরিয়া তাহাকে বাহুবেষ্টিত করিল—"আবার আমার বাঁচতে সাধ হচ্চে পঙ্কজ! তোমার জন্যে আবার আমার বেঁচে উঠতে ইচ্ছা করছে। তোমার প্রতি যে অন্যায় করেছি বেঁচে থেকে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে ইচ্ছা করছে। আমি এখন দিন রাত বসে বসে তোমার কথাই ভাবি, তুমি সেদিন যে সব কথা তার—তার—মিসেস সিনার কাছে বলেছিলে সেই সব কথা এখন আমার ভারি সত্যি [illegible] মনে হয়! কিন্তু পঙ্কজ! আমার মত আধমরা অন্ধকে নিয়ে তুমি কি হাঁপিয়ে পড়বে না! কেমন ক'রে এ দুর্ব্বহ জীবন সহ্য করতে পেরে উঠবে তুমি? আমিত পারতুম না!"

পঙ্কজিনী গভীর আবেগে ও আদরে স্বামীকে চুম্বন করিয়া নিজে হাসিয়া তাহাকে একটুখানি হাসাইতে চাহিয়া জবাব করিল "কেমন করে পারি দেখইনা—না পারিত তখন আমায় তুমি "দুয়ো" দিও।"

সুধীন্দ্রও তখন মৃদু হাসিয়া তাহার কোমল সরস অধরে নিজের রসহীন শুষ্ক অধর গভীর কৃতজ্ঞতার সহিত স্পর্শ করাইয়া বহুদিন পরে আনন্দ উদ্বেলিত কণ্ঠে কহিয়া উঠিল—

"তুমি যখন এই দৈন্যের মধ্যে এই ভীষণ মূর্ত্তির পাশে দাঁড়িয়ে ভয় না পেয়ে হাস্‌তে পেরেছ —তখন তুমি নিশ্চয়ই পারবে। পঙ্কজ তুমি যে হিন্দুর মেয়ে, তুমি যে সতী। কিন্তু এমন ক'রে রিক্ত না হ'লে হয়ত তোমায় আমি কোনদিনই চিনতে পারতাম না। হয়ত ভগবান যা' করেন যতবড় দুর্দ্দৈবই সে হোক তার ফল একেবারেই মন্দ হ'তে পারে না। এস উঁকে প্রণাম করি।"

সম্পূর্ণ

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

শিল্পের ক্রিয়া প্রক্রিয়ার ভাল মন্দ

কথা বলা আর কথা শোনা, ভাত রাঁধা আর ভাত খাওয়া, বাসা বাঁধা আর বাসাভাড়া নওয়া, গাড়ি চালানো এবং গাড়ি চড়া, ছবি দেখা ও ছবি লেখা—একদিকে রইলো সামগ্রীটার উপভোগ, আর এক দিকে রইলো ভোগ করবার বস্তুটির প্রস্তুত করণের নানা প্রকরণ। প্রকরণের সঙ্গে আর্টিষ্টের যোগ আর যা করা হল তার উপভোগের সঙ্গে যোগ হল দর্শকের শ্রোতার এক কথায় ভোক্তার। এ যেন একজন নানা উপায়ে উপচারে নৈবেদ্য সাজিয়ে ধরছে, আর একজন সেটা রসে [illegible] ভোগ করে চলেছে—মালী যেন ফুল ফুটিয়ে ধরছে বাগানের মালিকের সামনে! [illegible]কর মালা গেঁথেই চল্লো—পরের সঙ্গে অপরের মিলনের মালা; গাঁথনীর কৌশল ফুলের [illegible]শে ফুলকে ধরার প্রক্রিয়ার মধ্যে যে আনন্দ সেইটুকু পেলে মালাকর, আর যারা দুজনে সেই [illegible]লার একের পাশে আরেকে চিরকালের মতো ধরা পড়ে গেল তারা পেলে আরেক জিনিষ! [illegible] নিজের মালিনীকে পরানো চল্লোনা নিজের ঘরেও ধার রাখা চল্লোনা পরের জন্যেই যার [illegible]খানি এমন যে মালা সে মালা সুকৌশলে গেঁথে চলার কায নিয়ে মালাকর কেমন করে দিন [illegible]টায় যদি না গাঁথনী করে চলার মধ্যেই মালাকরের সকল আনন্দ লুকোনো থাকে? যারা [illegible]ষ্ট, প্রকরণের সফলতা লাভের তপস্যা তাদের করতেই হয়, কিন্তু এই তপস্যায় যদি কেবলি [illegible]র তপ থাকতো অথচ সঙ্গে সঙ্গে কার্য্য করার আনন্দ না থাকতো, তবে যেমন তেমন করেই [illegible] সারতে চাইতো সবাই, আর তাদের কাযগুলো কলে প্রস্তুত জিনিষের মতো কায দিতো [illegible] আনন্দ দিতো না। নিয়ম ও প্রকরণ এবং তার কঠোরতাই ফোটে নির্ম্মমভাবে কলের [illegible], আর মানুষের আর্টে অনিয়ন্ত্রিত আনন্দ ও মুক্তির স্বাদ এসে লাগে। আর্টের প্রকরণগুলোতে [illegible]দ না মিশলে আর্ট হতো ফটোগ্রাফের মতো অসম্পূর্ণ জিনিষ। "There is fascination [illegible]he technical side of art, without which artists would stop short so soon [illegible]e excitement he experienced on first tackling his subject has subsided, [illegible] picture galleries would be full of sketches."

[illegible]ষির বেলাতে যে কথা, কবির বেলাতেও ঐ কথা, গায়ক বাদক পাচক চালক নর্ত্তক [illegible]বেলাতেই এই একই কথা। হাত উঠছে পড়ছে ঠিক রংএ ঠিক রং মিলিয়ে তালে তালে, [illegible]একটা আনন্দ বোধ করে শরীর ও মন আর্টিষ্টের। নেচে যে আনন্দ [illegible]ধ করে না সে [illegible]ই পারে না ভাল করে। মন চল্লো দুলে শরীর চল্লো তালে তালে, শরীর [illegible]নের এই যে [illegible] মিলন এই হল আর্টের প্রকরণের চরম সাধনা। Sketch যেমন সম্পূর্ণ ছ[illegible] নয়, নিরানন্দ [illegible]ও তেমনি পরিপূর্ণ নয় অসম্পূর্ণ। Sketch যেখানে খসড়া মাত্র দিয়ে খ[illegible]স সেখানে [illegible]ত্যে শুধু তাড়া থাকে, একটা দৃশ্য কি একটা জিনিষ তাড়াতাড়ি কাগজে উঠি[illegible] কিম্বা বলে

দিয়ে খালাস। এই ভাবের Sketch গুলি স্কুলের ছেলের নোট বই যে কায দেয় ঠিক সেই কাযই দেয়, এই Sketch আর্টিষ্টের কাযে লাগে ব্যাপারটা শুধু মনে পড়িয়ে দিতে, ফটোগ্রাফও অনেক সময় এ কাযটা সহজে সম্পন্ন করে, কিন্তু যে Sketch করার মধ্যে আর্টিষ্টের আনন্দ ধরা থাকে তার ধরণ ধারণ স্বতন্ত্র, ছোট গল্পের মতো ছোট এবং সামান্য হলেও সেটা সম্পূর্ণ জিনিষ এবং সেটা লিখতে অনেকখানি art চাই। ছোট হলেই ছোট গল্প হয় না, একটুখানি টান দিয়ে অনেকখানি বলা বা বেশ করে কিছু ফলিয়ে বলার কৌশল শক্ত ব্যাপার, আর্টিষ্ট কেন সে শ্রম স্বীকার করতে চায়, তার একমাত্র কারণ বল্‌বার এই যে নানা কারিগরি তাতে আনন্দ আছে। ফস্ করে বলা হয়ে গেল, যেমন তেমন করে বলা হয়ে গেল এতে আর্টিষ্টের আনন্দ নেই। মৃগয়া করতে গিয়ে যদি মৃগ এসে আপনিই ধরা দিলে তো শিকারীর আনন্দ একটুও হল না, সঙ্গের সাধারণ লোক তারাই বিনা পরিশ্রমে পড়ে পাওয়া মৃগমাংস পেট ভরে খেয়ে আনন্দ করলে। শিকারী তেমন জিনিষ পরিবেশন করে সুখ পায় না যা বিনা ফাঁদে ধরা হল। সঙ্গীতের চিত্রের কাব্যের সব শিল্পেরই প্রকরণের দিকটায় খাটুনি আছে ভাব ও রসকে ফাঁদে ধরার ছাঁদে বাঁধার খাটুনি কিন্তু সেটি কলের মতো খাটুনি নয়, কলের কুলির মতো নিরানন্দ খাটুনি নয়। শিশু লালন পালনের মধ্যে দুঃখ ও খাটুনির দিক একটা আছে কিন্তু সেই খাটুনিতেই আনন্দ! যতনের খাটুনি অযতনের খাটুনি দুয়ের ফল তফাৎ, মায়ের খাটুনি আর ধাইয়ের খাটুনির মধ্যে ভারি প্রভেদ দেখা যায়। শিল্প সামগ্রীর গড়নের উপরে খাটা কিভাবে হল তার ছাপ পড়ে। যেখানে আর্টিষ্ট যতন দিয়ে গড়লে সেটি যতনের জিনিষ হয়ে প্রকাশ পেল, আর যেখানে সে যতন নিলে না গড়তে, শুধু খেটে খুটে কায উদ্ধার করলে সেখানে গড়নটাও বিশ্রী হয়ে রইল। সেদিন দেখলেম আমার নাতনীটি একটা গুটি থেকে প্রজাপতি ফোটানোর প্রথা প্রকরণ না জেনে একটা অসম্পূর্ণ ডানাভাঙ্গা প্রজাপতি টেনে এনেছে অসময়ে আলোতে, কাঁচা হাতের তাড়াতাড়ি লেখার মতো সেটা ভয়ঙ্কর বিশ্রী দেখতে হল। তার পরে সেদিন শান্তিনিকেতনে গিয়ে দেখলেম কত যত্নে কত পরিশ্রমে সৃষ্টি করা পাখির ডিম বিনা পাখিতে ফোটাবার কল—পক্ষি মাতার বুকের পরম অদ্ভুত ধীরতা, বুদ্ধি এবং অভিনিবেশ সহকারে দিনের পর দিন ধারণার মধ্যে নিয়ে কল গড়া হয়েছে, পাখি নিজে যে আনন্দ বোধ করে বাচ্ছা ফোটানোর কাযে সেই আনন্দ যতন দিয়ে গড়েছে মানুষ তার কল, শত শত পক্ষি-শিশুর উপরে ঢেলে দিয়েছে লোহার আপনার প্রকাণ্ড স্নেহ। এই কল গড়তে গড়বার প্রকরণে যদি কোথাও ভুল থাকতো শিল্পি আগুনে যেমন তেমন করে কলটা গড়ে ফেলতো তবে মায়ের মতো বাচ্ছা না ফুটিয়ে রাক্ষসীর মতো কলটা কেবলি ডিম খেতো একটিও বাচ্ছা ফিরিয়ে দিতো না মানুষকে, ফিরোতো ভাঙা আধ পোড়া অসম্পূর্ণ অবস্থায়! যা কিছু সৃষ্টি কর তার প্রক্রিয়ার মূলে এই না হলে কায ব্যর্থ হয়ে যায় সৃষ্টি অসম্পূর্ণ থাকে অশোভন হয় অচল রয়।

লাইন টানার প্রকরণ রং দেবার প্রকরণ ইত্যাদি ভাল না হলে নজরে ধরে না সামগ্রীটা যেমন, তেমনি সেই লাইন টানা রং দেওয়ার সময় হাত এবং মনের কোথাও একটু অযতন ঘটলে কায়া ঠিক মতো হয় না, মন থেকে মনে কাযটাও পৌঁছায় না। ভোঁতা তীর মচকানো ধনুক নিয়ে কে কবে লক্ষ্য ভেদ করেছে, অযতনে গাণ্ডীব টেনেও কেউ লড়াই জেতেনি। "Craft is only a means, but the artist who neglects it will never attain his end ..... such an artist would be like a horseman who forgets to give oats to his horse" (Rodin) যে ঘোড়ার যতন জানে তার হাতে দেখতে দেখতে ছেকড়া গাড়ির ঘোড়াও সুন্দর হয়ে উঠে, যে মালী গাছে যতন দেয় তার মরা গাছেও ফুল ফোটে। ঘরের যে যতন নেয় না লক্ষ্মীশ্রী তার ঘর থেকে পালায়।

ভাল করবার, ভাল লেখবার, ভাল আঁকবার, ভাল গড়বার প্রকরণ যে যতন দিয়ে ধরে সেই যথার্থ ভাল গড়ে, আর কলের মতো সে খালি নিখুঁত প্রক্রিয়া দখল করে চলে। সে চলে কে সেই ভাবে যে ভাবে কলের পুতুল নেচে চলে। এক দিকে শুকনো প্রকরণ, আর এক দিকে যতন মাখা প্রকরণ, শিল্পির technique এই দুটো দিক—নীরস দিক আর সরস দিক। নুড়ির খাগাগোড়া নীরস—যতই তার মধ্যে প্রবেশ কর, সে নুড়ি ছাড়া কিছু নয়। আর বাদাম—তার খোলার মধ্যে সাঁস লুকোনো রয়েছে। ছেলে যখন বাদাম ভাঙ্গতে আরম্ভ করে তখন তার মনে বাদাম ভাঙ্গার সঙ্গে বাদাম যে হস্তগত হতে চলেছে তার স্বাঁদ আর ভাঙ্গার আনন্দটুকু থাকে, তাই সে বাদাম ভাঙ্গার কঠিন প্রক্রিয়াতেও রস পায়। আক্ চিবোতে দাঁতের ব্যথা আছেই, তবু চিবোনোর সঙ্গে সঙ্গেই রস পেতে থাকে মানুষ, কাযে কাযেই দাঁত চিবিয়ে চলে আনন্দে। যারা গুড় পেটুকেই খায়, আর আটিষ্টকে পেতে হয় রস কায করে চলা থেকেই। যারা আর্ট করে মস্‌গুল অথচ আর্ট সৃষ্টি করে না তারা পেটুকের মতো প্রস্তুত গুড়টাই খেয়ে চলে, যারা আর্ট যারা সৃষ্টি করে তারা হয়তো অনেক সময় গুড় খেতেও পায় না। কিন্তু ঐ আক কলটা যত্নে ঘুরিয়েই স্ফূর্তি পায়—ঠিক ঘোরাবার। শাল যে বুন্‌ছে সে বুনেই আনন্দ পাচ্ছে। সুঁচ চালানোয় যতন আর আনন্দ, দিনের পর দিন চোখ ঠিকরে যাওয়া সূক্ষ্ম কারু-কার্য্য তাতেই আনন্দ! এই আনন্দ যদি না তার থাকে, যদি এ শাল সে পরতে পাবে না এই কেবল তার মনে জাগে, যদি শাল বোনার প্রকরণের মধ্যে কষ্টটাই তার বাজে আঙ্গুলে চোখে, তবে সে আর্টিষ্টের হাতের শাল ঘোড়ার গায়ের কম্বলের চেয়ে কদর্য্য না হয়ে যায় না।

ফরাসী দেশের প্রসিদ্ধ শিল্পি বোঁদাকে তাঁর ছাত্র প্রশ্ন করেছিল—"Can an artist get on without technique?" তাতে শিল্পগুরু উত্তর দিলেন "On the contrary, it is necessary to have consumate technique in order to hide what one knows..... The great difficulty and crown of art is to draw to paint to write with

ease and simplicity." (Rodin) এখানে কাযের সারল্য স্বতঃস্ফূর্ত্তির কথা বলা হল এবং এই দুই গুণ যাতে পৌঁছয় কাযে সেই consumate technique বা পরিপূর্ণ ভাবে প্রকরণের দখলের কথা বলা হল। প্রকরণের সার্থকতা তখনি যখন সেটা নিয়ে সহজ ভাবে আমরা কাজ করে যাই, সেখানে প্রকরণ কাযের শ্রান্তি ব্যক্ত করে না স্ফূর্ত্তিটাই দেখায়। কি রকম কসে ছন্দ বাঁধা হল, কত মাথা ঘামিয়ে গানের সুরটা এবং গানটা লেখায় ধরা হল,—এইটেই যে লেখায় রইলো বড় লেখা হলেও সেটা artistic হল না, কেননা তার মধ্যে লেখার প্রকরণের শুকনো দিকটাই রয়েছে, আর যেখানে যতন এসে আনন্দ এসে প্রকরণের কঠোরতা কর্কশতা মিটিয়ে দিয়ে ভাবের এবং লাবণ্যের প্রসন্নতা প্রকাশ করলে সেখানে ছোট হলেও সেটি হল আর্ট। প্রকরণে পূর্ণ অধিকার না হলে লেখায়, বলায়, চলায় কাযে কর্ম্মে স্বতঃস্ফূর্ত্তি গুণটি আসে না অথচ এই গুণটি সমস্ত বড় শিল্পের একটা বিশেষ লক্ষণ। এত সহজে কেমন করে আর্টিস্ট যা বলবার যা দেখবার তা প্রকাশ করে গেল, এইটেই প্রথম লক্ষ্য করে আমাদের মন বড় শিল্পির কাযে। শিল্পি কি কঠিন প্রক্রিয়ায় রচনা করেছে তা তো রচনায় রেখে দেয় না মুছে দিয়ে চলে যায় তার হিসাব, এবং এই কারণে ঠিক সেই কাযটি নকল করতে চাইলে আমরা ঠকে যাই ঠেকে যাই, হদিস পাইনে কি কি উপায়ে কোন পথ ধরে গিয়ে শিল্পি তার পরশমণি আবিষ্কার করে নিলে। সুতরাং বলতে হবে এক জনের technique সে অন্যের অধিকারে কিছুতেই আসতে পারে না, যে চেষ্টা করাই ভুল, কেন না, তাতে করে চেষ্টা কাযের উপরে আপনার সুস্পষ্ট ছাপ দিয়ে যায় এবং আর্টিষ্টের কাযে সেই ব্যর্থ চেষ্টার দুঃখটাই বর্ত্তমান থেকে কায যে দেখে তাকে পর্য্যন্ত পীড়া দিতে থাকে।

বাঁশী, বীণা এসব তৈরি করবার প্রকরণ যেমন স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র তেমনি এদের বাজানোর প্রকরণও আলাদা আলাদা ; বাঁশীর ফুটো ছেড়ে ছেড়ে সুর বার করতে হয়, বীণাতে তারে তারে ঘা দিয়ে ঘাটের পর ঘাট চেপে সুর ধরতে হয়। সাতটা সুর তার উপর এবং তার মাঝে মাঝে আঙুল খেলিয়ে বেড়ালে। এইতো বাজনার প্রকরণ সামান্য রয়েছে এবং যন্ত্রে আর কণ্ঠে রাগ রাগিণী ভাঁজবারও বাঁধা প্রকরণ আছে—আমাদের সে গুলো শিখলে সহজেই বাজি গাইয়ে দুইই হতে পারে মানুষ। নাচের বেলায়, ছবিমূর্ত্তি গড়ার বেলায় ঐ একই কথা। সুরের রঙ্গের অঙ্গভঙ্গীর কতকগুলো প্রকরণ বাঁধা হয়ে গেছে, বাঁধা রাস্তার মতো সে গুলো সাধারণের পক্ষে সাধারণ ভাবে চলাচলের বেশ কাজের পথ, কিন্তু এই বাঁধা রাস্তায় বাঁধা অবস্থাতেই যে চলে হাতের কাজ পায়ের কায গলার কায করে সে বাঁধন আর বাঁধনের বেদনাটা প্রকাশ করে চলা কাযে সেতো কখন আপনাকে প্রকরণিক ছাড়া আর্টিস্ট বলাতে পারলে না। প্রকরণের বাঁধন যে দরদ দিয়ে আনন্দ দিয়ে মুক্ত করলে সেই হল গুণী, নীরস প্রকরণিকের সঙ্গে তার তফাৎ হল এখানে, গুণী সে বাঁধনের কসন্ রসিয়ে তুল্লে লসন্ পোঁছে দিলে কসনে, নস্তকার সেখানে

মেখলার বেড় যেমন তেমনি Technique এর বাঁধন শোভা ধরলে আর্টিষ্টের গড়নটিকে ঘিরে ঘিরে। Technique এর এই যে সকল দিক যা নিয়ে মানুষের হাতের কাযে আর কলে কাটা কলে কোঁদা জিনিষে তফাৎ হচ্ছে কিছু করবার পূর্ব্বে—এটার বিষয় যদি আমরা না ভাবি তবে art জিনিষ আমাদের দ্বারা করা শক্ত হয়। হাতের কাগজ তাকে হাতের কাজে এমন করে ছেড়ে দিলেম যে সেটি মনের জিনিষ হয়ে রইলো, মুখের কথা সুরের বেদনায় এমন করে ভরে দিলেম যে তারা মন থেকে মনে চলাচলি করতে থাকলো, মন দুলিয়ে দিয়ে গেল প্রত্যেক পা ফেলা এই যখন হল তখন জানলেম নানা শিল্পের নানা প্রকরণে সিদ্ধি লাভ করলেন আর্টিষ্ট, গাছ গাছই রইলো ফুলও দিলে না ফলও দিলে না সে যেমন, আর্টের প্রকরণ গুলো আয়ত্তের মধ্যে এসে গেল অথচ তা দিয়ে কিছু ফলানো গেল না বা কোন কিছুকে ফুলের মতো ফুটিয়ে তোলা গেল না, কেবল প্রকরণেরই প্রতিষ্ঠা করে গেলেম কাযে এ হলে নিষ্ফলা গাছ প্রতিষ্ঠা করা হল।

প্রকরণের সফলতা তখনই যখন সে কিছুর জননী হল, না হলে সে সুন্দরী কিন্তু বন্ধ্যা। রসের জনয়িতা আর্ট, সেই আর্ট-সৃষ্টির প্রকরণ নীরস নিরানন্দভাবে গ্রহণ ও প্রয়োগ যে করলে তার সৃষ্টির প্রয়াস ব্যর্থ হল, নিজের কাযে সে প্রয়াসকেই প্রতিষ্ঠিত করলে, প্রসন্নতাকে নয়, এমন কায দেখে মন কোনদিন প্রসন্ন হয় না।

আর্ট ইস্কুল থেকে যে একেবারেই আর্টিষ্ট বার হয় না তার কারণ আমি দেখেছি—সেখানে ছকেগুলো খেটেই চলে বাঁধা নিয়মে, খেটে চলার আনন্দ বোধ করবার অবসর কেউ সেখানে পায় না, কলের মতো হাত হয়ে ওঠে পাকা ছবি মূর্ত্তি ইত্যাদি তৈরি করবার প্রকরণে কিন্তু মন থেকে যায় উপবাসী অপ্রসন্ন। বেশি দিন উপবাসে রাখলে পেটের ক্ষিদে মরে যায়, বত্রিশ পাটি দাঁত চিবোতে পাকা হয়ে উঠলো, কিন্তু ক্ষিদে মরে গেল এই দুর্ঘটনা ঘটছে আর্ট স্কুলের দুইশত পঞ্চানব্বই ছাত্রের, প্রকরণিক হয়ে সবাই বার হয়, ক্বচিৎ কেউ সেখান থেকে আসে আর্টিষ্ট হয়ে। মন নেই কায করে চলেছে হাত কলের মতো সে কায দেখে তারি মন খুসি হয় যে ফুলকে ফোটায়নি ফুটতে দেখেনি এবং যার বুকে রস ফোটেনি কোনদিন।

গড়া হয়ে গেলে হাতের কায তো আর্টিষ্টের হাতে থাকে না। অন্যে নিয়ে সেটা উপভোগ করে। আর্টিষ্ট যে জনয়িতা নিজের জনিত আর্ট ভোগ করা তার ধর্ম্ম নয় সৃষ্টি করার প্রকরণের মধ্যে যেটুকু আনন্দ সেইটুকুই আর্টিষ্টের প্রাপ্য ; কাযের আরম্ভ থেকে শেষ এইটুকুর মধ্যে তার যে আনন্দ নিঃশেষ করে পায় আর্টিষ্ট, সৃষ্টি করা শেষ যেমনি হল অমনি কাযটির সঙ্গে আর্টিষ্টের কলমে যোগ বিচ্ছিন্ন হল, আর্টিষ্ট এসে পড়ল দর্শকের জায়গায় সবার পাশে সেও দাঁড়িয়ে দেখলে আপনার কাযের দিকে, অন্যে সেটা নিয়ে গেল কি ফেলে গেল, দেখবার অপেক্ষা নেই, আর্টিষ্ট সে ফিরে গেল পুনরায় নতুন একটা কাযের প্রক্রিয়ার মধ্যে, এইতে হল আর্টিষ্টের কলের জীবন—সে শুধু বাঁচে তার কায করে চলার মধ্যে যে আনন্দ আছে নিয়ে,

আনন্দের সেই এক মুহূর্ত্ত তারি ছাপ পড়ে তার কাযে ক[illegible] সব দিক দিয়ে, তার সৃষ্টি ছন্দ পায় ছাঁচ পায় ঐ একবিন্দু আনন্দের কোলে। কলের [illegible]গরদোলায় ছেলেগুলো দুল্‌ছে আর মায়ের কোলে ছেলে দুল্‌ছে,—এ দুই তো দেখেছি কল সে দুলিয়ে আনন্দ পাচ্ছে না কাযেই সেটা কেঁচ্ কোঁচ্ শব্দ জানিয়েই চলেছে সেকথা আর মা যে দোলা দিচ্ছে দিনের পর দিন রাতের পর রাত তাতেও তো দুঃখ রয়েছে কিন্তু বেসুর কোথাও তো নেই। মা গাইছে, "আমার ছেলে আমার কোলে, গাছের পাখি গাছে দোলে" দোলাবার শ্রম সেখানে প্রতিমুহূর্ত্তে, সুরে ভরছে মিটিয়ে দিচ্ছে দুঃখ দোলা দেবার আনন্দ হিল্লোল! কলের দোলা সে তো পাত্র বাছে না তোমাকে আমাকে ছেলেকে বুড়োকে সমান ভাবে দুলিয়ে চলে ঝাঁকানি দিয়ে বেসুরে চেঁচিয়ে কিন্তু মায়ের কোলে ছেলের দোলা সে মায়ে মায়ে বিভিন্ন প্রকারের হলেও সবার মধ্যে সুর বাজে ব্যথা বাজেনা, কাজেই এ রকম দোলানো ক্রিয়ার মধ্যে আনন্দ আছে বলেই সেটাতে ছেলে এবং মা দুজনেই আনন্দ পায়। ছেলের ওজনে একখানা কাঠ কোন মায়ের হাতে দিয়ে তাকে দোলাতে বল—কিছুক্ষণ পরে মায়ের হাত ভেরে যাবে কেননা ছেলে দোলানোর প্রক্রিয়ায় যে আনন্দ কাঠ দোলানোতে সেটি নেই। ছোট মেয়ে কাঠের পুতুল দোলাচ্ছে সে জান্‌ছে কাঠের পুতুলকে ঠিক আপনার ছেলে বলেই, সেলেটখানা দোলাতে দাও সে শ্রান্ত হয়ে পড়বে। হাতুড়ি পেটানোর আনন্দ তখনই পাই যখন পিটে যে কাযটি করছি সেই কায সম্পূর্ণভাবে মন অধিকার করেছে আমার এবং হাতুড়ি পেটার প্রকরণ সম্পূর্ণভাবে অধিকারে এসেছে আমার, এ না হলে কাযে মন কিন্তু হাতে এল না সেটা, কিম্বা হাত পিটেই চল্লো কাযে বসলোনা মন, দুদিক দিয়েই কাযটা ব্যর্থ হয়ে গেল। নল রাজার হাতে রথ যেমন চলতো তার তো বর্ণনা পড়েছি এবং সেই ঘোড়া সেই রাশ সেই গাড়ি ছক্কর গাড়ির কোচ্‌ম্যানের হাতে কি ভাবে চলে তারও প্রমাণ আমাদের মধ্যে প্রায় সকলেরই সামনে ধরা আছে। যে গাড়ি হাঁকিয়ে আনন্দ পাচ্ছে এবং যে কোন রকমে সোয়ারি যথাস্থানে পৌঁছে দিয়ে কড়ায় গণ্ডায় ভা[illegible] চুকিয়ে পেয়েই আনন্দ পাচ্ছে এই দুয়ের রাশ টানার প্রক্রিয়ায় কতখানি তফাৎ তা বেশ বুঝি আমরা, একের স্ফূর্ত্তি রাশের মধ্যে দিয়ে ঘোড়াতে পৌঁছচ্ছে—ঘোড়া সুন্দর ভাবে ঘাড় বেঁকি[illegible] নেচে চলেছে, আর একের হাতের রাশে ত্বরা পৌঁছচ্ছে কিন্তু ঘোড়া তার একটুও পা[illegible] খুঁড়িয়ে চলেছে কিম্বা চাবুকের চোটে বিশ্রী রকম বেগে দৌড়চ্ছে ঝাঁকানি দিতে দিতে। যে প্রকরণ সম্পূর্ণ কায়দা [illegible] হলে কেউ আর্টিষ্ট হতে পারে না সেটি হচ্ছে আঁকার বা গড়বার বা বলবার কয়বার সামান্য প্রকরণ নয়, সেটি হচ্ছে আনন্দের সঙ্গে কর্ম্ম সাধনের অসামান্য প্রকরণ।

অনেকের বিশ্বাস যে মূর্ত্তি গড়বার ছবি লেখবার ইত্যাদি শাস্ত্রীয় প্রকরণ গুলো শিখিয়ে দিতে পারলেই [illegible]শে নানা দিক দিয়ে গানের আর্টিষ্ট ছবির আর্টিষ্ট মূর্ত্তিমান হয়ে এসে উপস্থিত হবে আমাদের মধ্যে শিল্পের মধ্যে। খেয়াল বলে সখ বলে জিনিষটাকে বাদ দিয়ে প্রাচীন শিল্পের [illegible] [illegible] পরিমাণ ইত্যাদি দিয়ে যুক্ত হওয়াকেই তারা ভাবে আর্ট পুনরায় [illegible] মধ্যে ধরে আমার পন্থা [illegible] এই ভাবে অধিগত যেটা হবে সেটা যে শিল্প হবে না গত শিল্পের [illegible]শূন্য ভান হবে মাত্র তা তারা বোঝেনা। শিল্প এবং তার নিয়ম প্রকরণ ইত্যাদির সঙ্গে শিল্পির [illegible] ও খেয়ালের কতখানি যোগ তা তারা কেমন করে বুঝবে যারা শিল্প করেনা শিল্প শাস্ত্রই পড়ে [illegible]—অভিধান ব্যাকরণ ভাষা পরিভাষা হিষ্ট্রী, জিয়োগ্রাফি ইত্যাদি যে ভাবে পড়ে ছাত্রেরা—তাই [illegible] ভাবে বুঝি ঐ রাস্তা ধরে চল্লেই ঠিক জায়গাতে পৌঁছে যাবে দেশের শিল্প এবং সেটা সঙ্করত্ব [illegible]রহার করে একবার বিশুদ্ধ অবস্থায় আমাদের ঠাকুর ঘরে এসে বসবে। সামান্য একটা কিছু [illegible] গড়তে চেষ্টা করেছে কিম্বা জগতের শিল্পের ইতিহাসে যার একটু মাত্র দখল জন্মেছে সেই [illegible] খেয়া[illegible] ও খেয়ালী এরাই হচ্ছে শিল্পের এবং নব নব প্রকরণের জন্মদাতা—শাস্ত্র নয় শাস্ত্রবাগীশও [illegible] যার সখ রইলো তার কাছে শিল্প শিল্প-প্রকরণ সব রইলো আর যার সখ রইলোনা তার [illegible]ছে শিল্প রইলো না শুধু প্রক্রিয়া শাস্ত্রের বচন ইত্যাদি রইলো। কাযেই দেশের শিল্পকে [illegible]লনের ভার খেয়ালীর হাতে দিলে তত ভয় নেই, ভয় বেশি খেয়াল যার নেই এমন প্রকরণিক ও [illegible]স্ত্রজ্ঞের হাতে খেয়া নৌকার হালখানা পড়লে।

খেয়ালীদের হাতে পড়ে ভারত শিল্পের নিয়ম প্রকরণাদির মধ্যে ওলট পালট ঘটে ভারত [illegible] ভারতীয় থাকবেনা বিজাতীয় রকম কিছু একটা হয়ে উঠবে এটা সাধারণের কেউ কেউ [illegible]ছেন এবং সেইজন্যে তাঁরা খেয়ালকে বাদ দিয়ে শাস্ত্র এবং তাঁর শিক্ষার সঙ্গে শিল্প শিক্ষার্থীদের [illegible] কি হয় দেখতে চাচ্চেন! যথা—"ভারত-শিল্প-পদ্ধতির নামে শিল্প সাঙ্কর্য্যের উদয় হইতেছে [illegible] তাহার কৌলিন্য রক্ষার জন্য চেষ্টা করা আবশ্যক...কিন্তু তাহাকে রক্ষা করিবার পথ [illegible] বন্ধুর" (অক্ষয় কুমার মৈত্র, ভারতবর্ষ, ১০ম বর্ষ ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা দেখ)

কৌলিন্যের পথ সত্যিই বন্ধুর বটে অল্পই প্রসার সে পথের ছোট পথ সেটা কৃত্রিম পথ [illegible]র রাখার কুণ্ড বা নালা সেটা, সেই পথে ভারত শিল্পকে নিতে চাওয়া মানে কি তা জানিনে! [illegible] মতো যে পথে কিছু চলার জো নেই সে পথ কখন কোন শিল্পের পথ হতে পারে না। কোন [illegible] জিনিষ উৎকৃষ্ট পথ উদার পথ ছাড়া বন্ধুর পথে চলেনি, সঙ্করতাকে ভয় করে। সঙ্করত্বের [illegible]র হিন্দু শাস্ত্রমত ভারত শিল্পের নিয়মে শিল্পিকে বদ্ধ করলে সঙ্করত্বের হাত থেকে বাঁচাতে [illegible] শিল্পকে কিন্তু বাঁধা প্রকরণের ভয়ঙ্করত্ব যখন শিল্পের সর্ব্বাঙ্গে জরা আর মৃত্যুর লক্ষণ গুলি [illegible]য়ে তুল্‌বে তখন শিবেরও অসাধ্য তাকে শুধরে রমণীয় করে তোলা। আর্ট বিষয়ে খেয়ালীর [illegible] যেতেই হবে নব যৌবন ভিক্ষা করে। এর প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত রয়েছে—আমাদের সঙ্গীত বিদ্যা [illegible] সার হয়ে যে দশা পেয়েছে এখন, তার সঙ্গে প্রাণের যোগ করে দেওয়া, তম্বুর ঋষিরও [illegible], যদি কেউ সে কায করতে পারে তো সে বিদেশের কোন খেয়ালী বা দেশেরই কোন [illegible] যার প্রাণে গানের সখ আছে এবং গানের ইতিহাস, শাস্ত্রমত কছরত শেখার সখের

চেয়ে গান গাইবার সখ যার বেশি। বিশ্বকর্ম্মা একজন খেয়ালী তাই বিশ্বের জিনিষ তিনি গড়ে তুলতে পারছেন এমন চমৎকার সুন্দর করে—চামচিকে থেকে আরম্ভ করে সুধাপের এবং তারও বাইরের যা কিছু তা। বিশ্বকর্ম্মা যদি শাস্ত্রের নিয়ম প্রকরণ মেনেই চলতেন তবে শুধু দেবমূর্ত্তির কারিগর বলেই বলাতে পারতেন, বিশ্বকর্ম্মা বলে তাঁকে কোন আর্টিষ্ট পূজা দিতো না। বিশ্বকর্ম্মা—হিন্দু শাস্ত্রের নির্দ্দেশ মতো বিশুদ্ধ গাছ বা তুলসী গাছেই যদি হাত পাকাতেনতবে কি ভয়ঙ্কর এক ঘেঁয়ে জগতই তিনি বানিয়ে তুলতেন এবং কবি ও রসিকদের তা'হলে কি উপায় হতো—একটা গাছ দেখলেই সব গাছ দেখার আনন্দ এক নিমেষে চুকে যেতো! একটা গাছ বারে বারে, একটি পাহাড় একটি নদী এক সমুদ্র বারে বারে পুনরাবৃত্তি হতে হতে চলতো আর তার মধ্যে একটি মাত্র মানুষ হয় পুরুষ নয় স্ত্রী হয় দেবতা নয় দেবী থাকতো এবং বর্ণসঙ্করতা আনার ভয়েই বিশ্বকর্ম্মা আলো ছায়ার মেশা মেশি সঙ্করত্ব দিয়া দুই সন্ধ্যার রমণীয় ছবি ফোটাতে পারতেন না, হয় থাকতো চোখ ঠিকরোনো আগুনের তেজ নয় থাকতো ভীষণ অন্ধকার বিশ্ব-ছবিটির উপরে লেপা।

শিল্প পদ্ধতির ও প্রকরণের সঙ্করত্ব বাঁচাতে গিয়ে শিল্পে যে ভয়ঙ্করত্বটি এসে পড়বে সেটা ঠেকাবার পরামর্শ শাস্ত্রকরেরা দিতে ভোলেননি—শিল্পির হাত সব সময়ে শুদ্ধ—এই কথা শাস্ত্র বলেছেন। শিল্পি দেবতাই গড়ুক বানরই গড়ুক বা দেবতাতে বানরে পাখিতে মানুষে মিলিয়ে খিচুড়িই প্রস্তুত করুক সে যদি শিল্পি হয়, যদি তার প্রকরণের সঙ্গে তার মনের আনন্দ ভাবের বিশুদ্ধি এসব জুড়ে দিয়ে থাকে সে, তবে সে বিশুদ্ধ জিনিষই দিয়ে গেল। পণ্ডিতের ব্যবস্থা মতো গোবর গঙ্গাজলে হাত ধুয়ে শাস্ত্রের মন্ত্র পড়ে ধ্যান করে গড়লেই বিশুদ্ধি আসে না শিল্পির হাতে, তার অন্তরের পূত-ধারা তারি স্রোত যখন তার হাতের কায ধুয়ে দেয় তখনই হয় সেটি বিশুদ্ধ ভারত বা আর কোন বিশুদ্ধ শিল্প। হিন্দু শিল্পশাস্ত্রমতে গড়া হলেই বিশুদ্ধ ভারত শিল্প হবে একথা বলা চলতো যদি ভারতবর্ষ কেবল হিন্দুরই হতো, ভারতশিল্পে গ্রীস মোগল চীন নেপাল কত কি নিয়ে ভারতশিল্প হয়েছে তা কে জানে। সুতরাং ভারতবর্ষের যেমন একটি মাত্র ধর্ম্ম নেই তেমনি ভারত শিল্পে কৌলিন্য বলে পদার্থ একেবারেই নেই। কেন না ভারতবর্ষ যেমন প্রকাণ্ড বিস্তার নিয়েছে সেই রকম তার আর্টও বিস্তার পেয়েছে শাস্ত্রগত পদ্ধতি ছেড়েই। কোন দেশে কোন শিল্পের কৌলিন্য শাস্ত্রের বচনের উপরে ভর দিয়ে নেই, কেন না কৃত্রিম জিনিষ তো নিত্য নয় তাই কৃত্রিম কৌলিন্যও তার নেই—সে বহতা নদীর মতো সেকাল একাল সব কাল সব দেশ সব মানুষ সব মন সব সমাজের মধ্যে দিয়ে বহে চলেছে! গঙ্গা ধারাকে যারা খুব ছোট করে দেখে তারাই কাশীর গঙ্গাকে কৌলিন্যে মণ্ডিত করে তুলতে যায় পুরাণের প্রমাণ বলে, তারাই চায় শিল্প বাঁধা প্রকরণের মধ্যে থেকে পুষ্কর তীর্থের কুণ্ডের জলের মতো বিশুদ্ধ এবং সবুজ হয়ে বর্ত্তমান থাক চিরকাল! সে সবুজ যে কচি পাতার সজীব সবুজ নয়, দূষিত জলের বিবাক্ত সবুজ সেটা ভুলে যায় তারা।

আমাদের শিল্পশাস্ত্রমতো যেমন হতে হয় হিন্দু ভারতশিল্প বা মোগল রাজপুত মারাঠা বাঙ্গালী কিম্বা বঙ্গবঙ্গ হবে কিম্বা ...র কিছু হবে তা আমি জ্যোতির্ব্বেত্তা নয় যে ঠিক করে বলে দেবো এবং কোন রকটা হলে ভাল হয় তাও আমার আজকের বলবার কথা নয়, বিষয় হচ্ছে প্রকরণের ব্যাপার নিয়ে যার আর্টের সেন্সাল নেই সে নিজের আর্ট বা অন্যের আর্টের প্রকরণ দখল করাতে যে শ্রম আছে তা নিতেই চায় না। প্রথম চাই খেয়াল বা সখ তার পর লোক নিজে বা শাস্ত্র ঘেঁটে নানা প্রকরণের দখল এবং সব শেষে নিজের মনোমত করে প্রস্তুত করা সামগ্রী হস্ত। এখানেও পুঁথি পড়ে চলার চেয়ে, হাতে হাতে কারিগরের কাছে এবং নিজে নিজে কায করতে করতে যে প্রকরণে জ্ঞান জন্মায় সেটা মূল্যবান। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র দেশী রংএর যে ...খানা দিয়েছেন এই রকম আরো অনেকগুলো বই হলে ক্রমে সেগুলি হয়তো বর্ণশাস্ত্র হয়ে ...বে এবং সেই সব রং প্রস্তুতের প্রকরণ পাচ্ছেন তিনি কতক পুঁথি থেকে কতক বর্ণিকদের ...ছ থেকে! এখন আমাদের কাযে সেটা লাগছে, পরেও কাযে লাগবে কিন্তু এই বই শাস্ত্র হয়ে ...বার পর আজ থেকে একশত বছর পরের শিল্পি দেখবে হয় তো কোথাও নতুন বর্ণ বিধান ...থা সে হয়তো নিজেই একটা নতুন বর্ণ আবিষ্কার করবে; সে সময় তাকে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের ...খিত বর্ণ শাস্ত্রের নিয়মের মধ্যেই থাকতে হবে, না হলে তার জাতঃপাত একথা কেউ কি বলবে, তাকে বর্ণ শাস্ত্রে বর্ণসঙ্করত্ব ঢোকাচ্ছে বলে দোষ দেবে? শাস্ত্রকে এভাবে প্রকরণের অর্জ্জনের ...ঘাতজনক করে তুলে কি ফল তা আর্টিষ্ট আবিষ্কর্ত্তা এবং যাঁরা আচার্য্য এবং শাস্ত্রকার তাঁরা ...বেন, শুধু বুঝবে না তারা যারা শিল্পের একটা অদ্ভুত কৌলিন্য প্রত্যাশা করছে—কাঁচের ...তলে ভরা ডিস্‌টিল ওয়াটারের চেয়ে স্বচ্ছ সেই কৌলিন্য হলেও সেটা কতটা বড় জিনিষ ...বলতে পারিনে, কিন্তু সেটা বোতলের মধ্যে যাদুঘরের মরা টিকটিকির মতো বিশ্বের হাওয়ার ...থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে থাকবে চিরকাল আপনার এতটুকু কৌলিন্যে ডুবে এটা যেন দেখতে পাচ্ছি।

প্রকরণ চারিদিক থেকে যখন অর্জ্জন করে আর্টিষ্ট তখন বাচ বিচার নেই, শুধু সেই ...করণ প্রয়োগের সময় কোনটা কিসে খাটাবো তার বিচার। ভূদৃশ্য আঁকার প্রকরণ দেশীয় ...ং শাস্ত্রীয় যে শিল্প তাতে নেই, এ প্রকরণ বিলাত থেকে আনতে হবেই, মানুষের চেহারা ...খানেও এই অর্জ্জন করা চাই আঁকার প্রকরণ। খালি দেবতা এঁকে ভারত শিল্পের আভিজাত্য ...য় রেখে চল্লে মানুষ গরু গাছপালা এমন কি পৃথিবীটাই বাদ পড়ে যায়। ভারত শিল্পের ...শেষত্বই এই এবং ভারতবর্ষেরও বিশেষত্ব সেই কি সামাজিক কি শিল্প কি উচ্চতর জ্ঞান-...জ্ঞান সবার প্রথা প্রকরণ অর্জ্জনের বেলায় সে অকুলীন—একটুও ভয় পায়নি, ভারত শিল্প ...ন্য স্পর্শে আসতে, মোগলের স্পর্শে আসতে, অসভ্য পার্ব্বত্য জাতির শিল্পের স্পর্শে এমন কি ...আদিম শিল্পেরও স্পর্শে আসতে। সবদিক দিয়ে সে অর্জ্জন করছে শিল্প প্রকরণ ...ক ব্যবস্থা জীবন যাত্রার পদ্ধতি। হিন্দু ভারতবর্ষের চেয়ে যে বড় ভারতবর্ষ, হিন্দু

শিল্পের চেয়ে যে বড় ভারত শিল্প তাই গড়ে তোলার প্রকরণের অর্জ্জনের যে আনন্দ শান্তি ভারতবর্ষ এবং ভারত শিল্পের মূল যুক্ত হয়েছে বলেই গ্রীস চলে গেল, ইজীপ্ত চলে গেল, চীন তার চিরাগত প্রথা প্রকরণের পাঁচিলে বদ্ধ হয়ে মৃতপ্রায় হয়ে রইল যখন তখনো ভারতবর্ষ ভারত শিল্প ইত্যাদি তৈলকটাহে দশরথের মৃতদেহ যে ভাবে ছিল সে ভাবে রইলো না সে নতুন থেকে নতুন অর্জ্জনের মধ্যে দিয়ে চলে বলে বেঁচে রইলো। যুগ যুগান্তরের অর্জ্জন প্রথা প্রকরণ তাকে চেপে মারতে পারলে না সে আনন্দের সঙ্গে ভাঙতে লাগলো গড়তে লাগলো সৃষ্টির জিনিষ ভারত সভ্যতার প্রকৃতির এই বড় দিক, এই দিক দিয়ে ভারত শিল্পের মর্য্যাদা ও মহিমা। যেখানে সখ মিটলো লোকের নতুন নতুন দেখবার নতুন নতুন অর্জ্জন করে আনবার সেই খানেই মরলো দেশের আর্ট ও আর্টের নানা প্রকরণ। আবার নতুনে সখ যেখানে নতুনের জন্যে একটা বিপরীত উন্মাদনাতে পরিণত হল সেখানেও মরলো শিল্প।—এই দুই দিক বুঝে যে খেয়ালি চলে সেই consumate technique লাভ করে, এবং আর্টের খোঁজে চলতে পারে সাহসে বুক বেঁধে, না হলে খানিক চলে সে ভয়ে মরে—হয় সে পালিয়ে আসে চিরকেলে ঘরটায় নয় গিয়ে আশ্রয় নেয় পরের দ্বারে অধম ভিক্ষুর মতো। আর্টিষ্ট হতে পারা যায় না হলে তার মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞান অর্জ্জনটাই, একমাত্র উপায় নয় অনেকগুলো অর্জ্জন চাই অনেক দিক দিয়ে তবেই হয় আর্টিষ্ট এটা স্পষ্টই বলা হয়েছে অলঙ্কার শাস্ত্রে—শক্তিনিপুণতা লোকশাস্ত্রে কাব্যাদবেক্ষণাৎ, কাব্যজ্ঞ শিক্ষয়া অভ্যাস, ইতি হেতু সমুদ্ভবে। প্রথম চাই শক্তি আর্ট সাধন করবার তারপর নিপুণতা বা প্রকরণাদির উপর সম্পূর্ণ দখল, তারপর শাস্ত্র কাব্য ইত্যাদির অবেক্ষণ নানা শিল্পের জিনিষের সঙ্গে সাক্ষাৎ ভাবে পরিচয় তারপর গুরুর রীতিমত শিক্ষা লাভ এবং অভ্যাস।

শাস্ত্রের মধ্যে নানা উপদেশ লিপিবদ্ধ হল কালে কালে সেটা পড়ে নিয়ে শাস্ত্র জ্ঞান গেলেন, কিন্তু আকাশে বাতাসে যে সব শিল্পের নানা প্রকরণ রং দেবার প্রকরণ আলো ছায়া রহস্য ভেদ করার প্রকরণ লেখা হচ্ছে দিন রাত সে গুলে তো পড়া চাই। শিল্পির সঙ্গে শিল্পশাস্ত্রের যোগটার চেয়ে বেশি যোগ অলিখিত এবং নতুন নতুন করে লিখিত ভাগবিচ্ছে সঙ্গে কেবলি শাস্ত্রের মর্ম্ম নয় এই বিশ্বের মর্ম্ম স্থানে কি সব লুকোনো আছে তারি মর্ম্ম জা প্রকরণ হচ্ছে আর্টের প্রকরণ, নিজের সৃষ্টির সঙ্গে এবং স্রষ্টার সৃষ্টির সঙ্গে যাতে যুক্ত হয় যায় সেই অভ্যাসের প্রকরণ জানা—শাস্ত্রমতো পুতুল কাটার অভ্যাসটা শুধু নয়—এই হল consumate technique লাভের প্রকরণ। আর্টিষ্টের চলা আনন্দে চলা হাতুড়ি পিটে কলম চালিয়ে সোনা গালিয়ে হীরে কেটে সুর ভেঁজে তাল ঠুকে, শাস্ত্রের অঙ্কুশ খেতে খেতে ইস্কুলের ছেলের মতো চলা নয়,—আর্টের প্রকরণ নিরঙ্কুশ প্রকরণ, আর্টের পন্থা নিরঙ্কুশ পন্থা, এই জন্যে বলা হয়েছে "কবয়ঃ নিরঙ্কুশাঃ"।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকু

KONNAGAR PUB Estd. 85

মৃতের ডায়েরী

আজ একটা কাহিনী বলিব।

বহুদিন পূর্ব্বের একটা ঘটনা মনে পড়ে। তখন আমি রাণীগঞ্জ ইস্কুলে পড়ি। একদিন শুনিলাম, ষ্টেশনের কাছে একটা সাঁওতালের মেয়ে রাত্রের মেল্-ট্রেণে কাটা গিয়াছে। তৎক্ষণাৎ তাহাকে দেখিতে ছুটিলাম। বহু লোকজনের ভিড় সরাইয়া আমরা কয়েকজন বন্ধু সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, মেয়েটার বয়স বেশী হইবে না। বোধ করি সতের-আঠারোর বেশী নয়। কোমরের মাঝামাঝি কাটিয়া প্রায় দু'খণ্ড হইয়া গেছে। পুলিশে টানাটানি করিয়া তাহাকে লইয়া গেল। এই পর্য্যন্ত। তাহার পর কি হইল, সে সংবাদ লইবার প্রয়োজন আমাদের হয় নাই।

আজ অনেকদিনের পর, আমার এক বন্ধুর বাড়ীতে হাতে-লেখা একখানা ডায়েরী-খাতা পাইলাম। বন্ধু সেটিকে তাহার বইএর আলমারির একপাশে ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন। অন্যমনস্কের মত ডায়েরীর মাঝের কয়েকটা পাতা উল্টাইয়া পড়িতেই দেখিলাম, ট্রেণ, খুন, সাঁওতালের মেয়ে এইরকম কয়েকটা কথা রহিয়াছে। অনুমানে বুঝিলাম, এ সেই ট্রেণে-কাটা সাঁওতালের মেয়েটির কথা হইবে বা। সমস্ত ডায়েরীখানা পড়িবার কৌতূহল জাগিয়া উঠিল।

বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এটা আমায় একবার পড়্‌তে দেবে?

তিনি বলিলেন, ও আমার এক দূর-সম্পর্কের দাদার ডায়েরী। গত বৎসর তিনি মারা গেছেন।—হাঁ, তুমি পড়্‌তে পার। অতি সুন্দর!

কথায়-কথায় তাঁহারই কথা উঠিল। নাম,—শশাঙ্কশেখর চট্টোপাধ্যায়। বাড়ী, মুর্শিদাবাদের কাছে কি-একটা গ্রামে। গ্রামের নামটা অবশ্য আজ আমার ঠিক স্মরণ হইতেছে না।

বন্ধু বলিলেন, দাদাটি আমার সারা জীবনের মধ্যে বিয়ে-থা করলেন না। কয়লা-কুঠিতে চাকরী কোরতে গিয়ে বেঘোরে প্রাণটা হারালেন।

—কি রকম শুনি!

—এমন কিছুই নয়। আমাদের দেশে নাকি এক স্কুল-ইন্সপেক্টরের স্বর্ণলতা বলে' একটি মেয়ে ছিল। সেই সোণার লতা যে তাকে কি বাঁধনে বেঁধেছিল জানি না। দাদার বাপ্-মা কেউ কোথাও ছিলেন না, তাই ইন্স্‌পেক্টর্ তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলেন না।

—তাই বুঝি শশাঙ্কবাবু বিবাগী হয়ে সংসার ত্যাগ কোরলেন?

—একরকম তাই। কোনদিন সংসারের কাছে নিজেকে ধরা দিলেন না। সহকারের তরুণ লতা যে গভীর দাগ কেটেছিল, সে দাগ মুছে' গেল না। গাছের বুক বেয়ে যে-লতাটি দিন বেড়ে উঠ্‌ছিল, মালী এসে' সে লতার বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে' দুজনকে বিচ্ছিন্ন করে দিলে।

সতেজ লতাটি অন্য তরু আশ্রয় করে' নির্জ্জীবের মত বেঁচে থাক্‌লো বটে, কিন্তু লতাহীন তরুর বুক বেয়ে যে খুন্ ঝর্‌তে সুরু হলো, সে নিস্রাব যেন আর বন্ধ হলো না।.....

আর কিছু শুনিবার প্রয়োজন ছিল না। ডায়েরীখানি হাতে লইয়া আমি বাহির হইয়া পড়িলাম।

আজ নিশীথ রাত্রে আমার নির্জ্জন গৃহে বসিয়া সেই অদ্ভুত ব্যক্তিটির জীবনের কাহিনী পড়িতেছি। তিনি ত' সংসার-সংগ্রামে বিজেতার জয়-মাল্য পরিয়া সরিয়া পড়িয়াছেন। আজ তিনি কোথায় কোন্ অনির্দ্দেশ্য পরপারে রহিয়াছেন জানি না। যেখানেই থাকুন, বেদনার পূজারী সেই শশাঙ্ক শেখরের চরণোদ্দেশে কোটি কোটি নমস্কার করিয়া আজ তাঁহার স্বহস্তলিখিত জীবন-নাট্যের কয়েকটি দৃশ্য আপনাদের গোচর করিয়া দিলাম। যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকি, সে অপরাধের শাস্তি হাসিমুখে বরণ করিয়া লইব।

* * *

রাণীগঞ্জ

২৫শে অগ্রহায়ণ—

হা শীত এখানে মন্দ পড়ে নাই। সুদূর পশ্চিমের খনি হইতে রাণীগঞ্জের কাছাকাছি একটা কয়লাকুঠির বড়বাবু হইয়া আসিয়াছি। কোম্পানীর দেওয়া 'কোয়ার্টারে' থাকিতে ইচ্ছা করি না। সেখানকার অর্দ্ধশিক্ষিত মন্তপ এবং হীনচরিত্র যুবকদের সংসর্গ আমার ভাল লাগে না। যতদিন পর্য্যন্ত সে কদর্য্য মলিনতা হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নিরাপদ রাখিতে পারি,—মন্দ কি?

রাণীগঞ্জ সহরের একপ্রান্তে রেল্‌ওয়ে ষ্টেশনের ধারে একখানি ছোট-খাটো বাসা ভাড়া করিয়াছি। কুঠি হইতে সহরে আসিবার কঙ্করময় অপ্রশস্ত রাস্তার ধারেই এ বাড়ী,—সুমুখের জানালা খুলিলে নিকটেই রেলের লাইন্ দেখা যায়, তাহারই এক পার্শ্বে পুষ্পে লতায় সজ্জিত একটি সাহেবের বাংলো এবং অনতিদূরে সুবিস্তৃত ধানের ক্ষেত! কর্ম্মস্থল এবং সহরের মাঝামাঝি এই স্থানটি আমার মন্দ লাগিল না।

নিজে 'ইকমিক্ কুকারে' রান্না করিয়া খাই—পাচকের প্রয়োজন হয় না। আমারই মত গৃহহীন অবিবাহিত একটা কাহারের ছোক্‌রা—বন্‌শী, বহুদিন যাবৎ আমার সঙ্গেই আছে, আমার অনাড়ম্বর গৃহের অন্যান্য যাবতীয় কাজকর্ম্ম বন্‌শীর দ্বারাই চলে।

২৮শে অগ্রহায়ণ,—

রাত্রির ঘোর তখনও কাটে নাই! শয্যাত্যাগ করিলাম। শয়নকক্ষের সমস্ত দরজা জানালা খুলিয়া দিয়া মুক্ত বাতায়নপথে বাহিরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কিছুক্ষণ মৌন হইয়া রহিলাম। প্রত্যহ ঠিক এই সময়ে পশ্চিমযাত্রী একখানা প্যাসেঞ্জার ট্রেণ আমার বাড়ীর পাশ দিয়া সশব্দে পার হইয়া যায়, পরক্ষণেই আবার পূর্ব্বের মত চারিদিক নিস্তব্ধ-গম্ভীর হইয়া পড়ে।

আজিও ঠিক তাই! বন্‌শীকে ডাকিয়া উঠাইলাম। সে কূপ হইতে জল তুলিয়া দিয়া ষ্টোভ্ জ্বালিয়া 'চা' করিতে বসিল। ঈষদুষ্ণ কূপের জলে স্নানাহ্নিক সারিয়া পুনরায় আমার শয়নকক্ষে ফিরিয়া গিয়া জানালার ধারে একটা চৌকি টানিয়া লইয়া বসিলাম। তখনও সেই শীত-প্রভাতে নির্ব্বাত নিষ্কম্প প্রকৃতি আমার মুখের পানে যেন তেম্‌নি স্তব্ধ-গম্ভীরভাবে তাকাইয়া আছে! বাহিরে গাঢ় শ্যাম শস্যক্ষেত্রের উপর কুজ্ঝটিকার ধূসর আস্তরণ ভেদ করিয়া বেশাদূর দৃষ্টি চলিতেছিল না। অদূরে ধূম্রাচ্ছন্ন ঘন-গুল্ম-দুর্গম বনখণ্ডের মধ্যে দিয়া কয়লাকুঠির দু'একটা উন্নতশীর্ষ চিম্‌নির অর্দ্ধেকখানা দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল। বাংলোর সম্মুখে নানাবর্ণের পুষ্পমঞ্জরী-পরিশোভিত লতাবিতান, মনে হইতেছিল, কে যেন ধূসর মস্‌লিনের ওড়্‌না দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছে।

প্রাতরাশ সমাপন করিয়া কুঠির উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িলাম। তখন লাইনের ধারে এবং শিশির-সিক্ত ধানের ক্ষেতের আলি-রাস্তায় নগ্নগাত্র দরিদ্র শ্রমজীবিদলের চলাচল সুরু হইয়াছে। শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে কেহ-বা গান ধরিয়াছে, কেহ-বা অনাগত দিবসের পরিশ্রমের বিনিময়ে অকিঞ্চিৎকর উপার্জ্জনের চিন্তায় বিবর্ণ-ম্লান মুখে পথ চলিতেছে!

এইবার নবোন্মেষিত অরুণালোকে পরিস্ফুট হইয়া ধরিত্রী জাগ্রত মুখরিত হইয়া উঠিল। সর্ষশীর্ষ শস্যক্ষেত্রে, পথিপার্শ্বস্থ শ্যামল দুর্ব্বাদলে, শিশিরস্নাত বৃক্ষ-লতায়, পুষ্পে-পত্রে, রক্তাভ রশ্মি বিচিত্রবর্ণে উজ্জ্বল হইয়া ঝল্ মল্ করিতেছে।

এই শান্ত সুন্দর নির্ম্মল প্রভাতে গোলামখানার পথে চলিতে চলিতে মনে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করিতেছিলাম। মনে হইতেছিল, যাহাদের মাথার উপরে এমন নির্ম্মেঘ নির্ম্মুক্ত স্বচ্ছ উদার নীলাকাশ,—অসীম বিস্তৃত এই আলোকোজ্জ্বল শ্যামা প্রকৃতি যাহাদের বেষ্টন করিয়া আছে,—সর্ব্বপাপঘ্ন মহাদ্যুতি এই অমলিন ভাস্কর যাহাদের সর্ব্বকর্ম্মের সাক্ষ্য, তাহাদের মনে কত আবিলতার কলুষ জমে কেমন করিয়া? সত্য-সুন্দরের বুকে এমন নিষ্ঠুরভাবে পদাঘাত করিবার শক্তি তাহারা পায় কোথায়?.....

.....মধ্যাহ্নে 'আফিস' হইতে বাসায় ফিরিতেছিলাম। বন্‌শী হয়ত এতক্ষণ আমার জন্য রোঁয়া করিতেছে।...আমার সম্মুখে রেল-লাইনের নিকট দুই সাঁওতাল-দম্পতি পার হইয়া যাইতেছিল। তাহাদের কথাগুলা শুনিতে পাইতেছিলাম কিন্তু বুঝিবার ক্ষমতা ছিল না। মেয়েটি একবার আমার দিকে দৃষ্টি হানিয়া যুবককে কি-যেন বলিল। যুবক ঈষৎ হাসিল মাত্র। মেয়েটি নুইয়া পড়িয়া পথের ধারের ঝোপ হইতে একটা লাল ফুল তুলিয়া যুবকের কোঁকড়ানো লম্বা চুলে ঠিক গুঁজিয়া দিল। যুবক হাত দিয়া মাথার চুল গুলা একবার ঝাড়িয়া দিতেই ফুলটি নীচে পড়িয়া গেল। মেয়েটি এবার একগোছা লম্বা ঘাস ছিঁড়িয়া তাহার মাথায় গুঁজিয়া দিয়া খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।.....

তাহারা চলিয়া গেল। আমি আবার পশ্চাৎ ফিরিয়া এই অনার্য্য দম্পতিকে প্রাণ ভরিয়া

দেখিয়া লইলাম। তাহাদের নিবিড় কালো চুলের ফাঁকে ফাঁকে সূর্য্যরশ্মি ঠিক্‌রাইয়া পড়িতেছিল।...

বাসায় ফিরিয়া দেখিলাম, বন্‌শী রন্ধনের সরঞ্জাম সমস্ত প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। 'কুকারে' আগুন দিয়া চুপ করিয়া বসিলাম। সাহেবের বাংলোর দিকে দৃষ্টি পড়িল। বাগানের কয়েকটা মরসুমি ফুলের গাছ, পুষ্পসম্ভারে এবং বর্ণ-বৈচিত্র্যে অপূর্ব্ব শ্রী-মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। আজ এই রৌদ্র-ঝলসিতা ধরিত্রীর মাঝে, নিতান্ত অসময়ে বোধকরি পথ ভুলিয়া বসন্ত আসিয়াছে! গৈরিকে গোলাপীর আমেজ,—মন্দ কি? হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলাম,—তুই কখনও কাউকে ভালোবেসেছিস্ বন্‌শী?

ঈষৎ হাসিয়া সপ্রতিভ হইয়া বন্‌শী বলিল, না, বাবুজি!

বহুদিন পরে, আজ আবার আমার মনে হইল এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আমিই শুধু নিঃসহায়, নিঃসঙ্গ, নির্লিপ্ত,—সুদূর!

২রা পৌষ,—

* * * কোন কাজ ছিল না,—আজ দুপুরে একটু সকাল-সকাল আফিস হইতে বাসায় ফিলিলাম। সদর দরজার চৌকাঠ পার হইয়া দেখিলাম, উঠানের উপর রৌদ্রের দিকে পিছন ফিরিয়া বন্‌শী ছুরি দিয়া আমার তরকারী কুটিয়া রাখিতেছে এবং তাহার পার্শ্বেই একপিঠ কালো চুল এলাইয়া চওড়া পেড়ে একখানা সাড়ী পরিয়া একজন স্ত্রীলোক বসিয়া আছে। আমার জুতার শব্দে উভয়েই চমকিয়া মুখ ফিরাইল। মেয়েটিকে দেখিয়াই চিনিলাম, সাঁওতালের মেয়ে। বয়স আন্দাজ সতের আঠারোর বেশী হইবে না। সাঁওতাল পুরুষরমণীর অঙ্গসৌষ্ঠবে এমন একটা নিজস্ব রূপ আছে যাহা দেখিলেই সহজে তাহাদিগকে চিনিতে পারা যায়,—কিন্তু বুঝিলাম না, হঠাৎ আজ আমার এ বাসায় তাহার আবির্ভাব হইল কেন, এবং বন্‌শীর সহিত তাহার এত ঘনিষ্ঠতাই বা হইল কেমন করিয়া! কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া আমি ঘরে প্রবেশ করিলাম। একবার ভাবিলাম, বন্‌শীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করি, আবার ভাবিলাম, প্রয়োজন নাই।

কাপড় জামা ছাড়িয়া বসিলাম। অন্যদিনের মত আজিও বন্‌শী আমার 'কুকার' এবং রন্ধনের অন্যান্য সরঞ্জাম ঘরের মেজের উপর নামাইয়া রাখিতে লাগিল। মুখে কিছু না বলিলেও তাহার ভাব-গতিক দেখিয়া মনে হইতেছিল, সে যেন ভাবিতেছে, বাবু মনে কি করিলেন কে জানে!

জিজ্ঞাসা করিতেই সে যেন হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিল। বলিলাম, মেয়েটা কে রে?

বন্‌শী তাড়াতাড়ি হাতের ইসারা করিয়া তাহাকে ডাকিল. এই দলিয়া, ইধার্ আয়।

আমি বলিলাম, না রে ওকে ডাকিনি; কে তাই জিজ্ঞেস্ করছিলুম।

বন্‌শী বলিল, উ আপ্‌নাসে বলুক্ কেনে। আমার কাছে রোজ একবার কোরে আসে। আমি বল্‌ছি, বাবুর এখানে চাক্‌রী মিল্‌বে না,—তবু শোনে না।

দেখিলাম দরজার পার্শ্বে দলিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে! হরিণের মত দুটি নিবিড় কালো চোখে নির্ভীক চাহনি, সর্ব্বাঙ্গে যৌবন-শ্রী।

জিজ্ঞাসা করিলাম, তোর বাপ্-মা, ভাই, বোন, কোথায় থাকে?

দলিয়া একবার আমার পানে তাকাইয়া বলিল, উ-সব কেউ নাই। মরে' গেছে।

—থাক্‌তিস্ কোথায়?

—হোউ খাঁড়্‌শুলিতে ছিলম্ এদ্দিন্।

—কি কাজ করতিস্?

—বাসন মাজ্‌থম্।

—ছেড়ে' দিলি কেন?

—অত সব জানি না বাবু, তুঁই কাজ দিবি ত' দে।

—কয়লা-খাদে কাজ করবি?

ঈষৎ হাসিয়া দলিয়া বলিল, তাহলে তুর্ লেহর্ করব কিস্‌কে?

—কেন, খাদে ত' তোদের সবাই কাজ করে।

হেঁটমুখে দলিয়া উত্তর দিল, খাদের বাবুরা বড় বজ্জাৎ।

এখানে হবে না। তুই আর-কোথাও ছাখ্—বলিয়া আমি 'কুকারে' বাটিগুলা সাজাইতে বসিলাম।

দলিয়া সকরুণ দৃষ্টিতে একবার বন্‌শীর দিকে তাকাইল। বন্‌শী ওকালতি করিতে ছাড়িল না। নিজে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আমায় বুঝাইয়া বলিল যে, সে যখন বলিতেছে, তাহার কেহ কোথাও নাই তখন তাহাকে এখানে রাখা উচিত, কিন্তু আমাদের যখন দরকার নাই.....

আমি বলিলাম, আমার এমন কি কাজ বন্‌শী, যে আবার একটা ঝি রাখ্‌তে হবে?

বন্‌শী চুপ করিয়া রহিল। দলিয়া কোনও কথা না বলিয়া ধীরে-ধীরে বাহির হইয়া গেল।

* * * * *

আমি মুখ নীচু করিয়া তরকারীতে মস্‌লা মাখাইতেছিলাম। বলিলাম,—না তুই কি বলিস্ বন্‌শী?

কোনও উত্তর না পাইয়া তাকাইয়া দেখি, সেও কখন বাহির হইয়া গেছে।

হঠাৎ কি জানি কেন, ভয়ানক রাগ চাপিল। জোরে হাঁকিলাম, বন্‌শী!

সে সত্রস্তে আসিয়া দাঁড়াইতেই বলিয়া উঠিলাম, কোথায় গিয়েছিলি হারামজাদা।—আগুন দিয়েছিস্?

—এই যে আনি,—বলিয়া সে ছুটিল। জানালার ফাঁকে তাকাইয়া দেখিলাম, আঁগুন-সমেত লোহার উনানটা লইয়া ফিরিবার সময় বন্‌শী বার-বার সদর দরজার দিকে চোরা দৃষ্টি হানিতেছে। মেয়েটা বোধ করি তখনও দাঁড়াইয়াছিল। একবার হোঁচট্ খাইয়া আসন্ন পতন হইতে বন্‌শী নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইল।

আমার হাসি পাইতেছিল, কিন্তু হাসিতে পারিলাম না। হাসিতে গিয়া কোথায় যেন ব্যথা বাজিতেছিল। * * * *

৩রা পৌষ,—

* * * আজও দলিয়াকে দেখিয়াছি। অন্যদিন ফিরিতে প্রায় রাত্রি হইয়া যায়। আজ শনিবার শীতকালের বেলা তখন শেষ হইয়া আসিয়াছে। দূরে,—রেল-লাইনের উপরে এবং ধানের ক্ষেতে সন্ধ্যার মায়া ঘনাইতেছিল! আমার বাসা হইতে বাহির হইল কিনা জানি না, তবে দলিয়াকে এই রাস্তায় চলিয়া যাইতে দেখিলাম। * * *

৪ঠা পৌষ—

আজ রবিবার। আমার অফিস ছুটি। * * * বেলা তখন প্রায় দশটা। ভাবিতেছিলাম, দিনটা এমন নির্ব্বান্ধব অবস্থায় কেমন করিয়া কাটিবে? এমন সময় দেখিলাম, বাহিরে কুঠি হইতে সহরে যাইবার রাস্তাটার ধারে, আমার বাসার দরজার ঠিক সম্মুখে একটা ফুল গাছের তলায় দলিয়া কি যেন খুঁজিতেছে। সেদিন আমার ঘরে দলিয়াকে ঠিক যেরকমটি দেখিয়াছিলাম, আজ ইহাকে দেখিয়া মনে হইতেছিল, এ যেন সম্পূর্ণ এক স্বতন্ত্র রমণী। চুলগুলা উস্কো খুস্কো হইয়া গেছে, মুখের চেহারা, পরিধেয় বস্ত্র সমস্তই যেন বিবর্ণ মলিন! বেচারার উপর বড় দয়া হইল। ডাকিলাম, দলিয়া!

সে একবার মুখ তুলিয়া আমার দিকে চাহিল, পরক্ষণেই আবার অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া নিজের কাজে মন দিল।

বন্‌শী এইমাত্র বাজার হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। বলিলাম, ওরে বন্‌শী, তোর দলিয়া এসেছে।

বন্‌শী তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া আমার দরজার বাহিরে দাঁড়াইল। আবার বলিলাম, বন্‌শী, দলিয়াকে ডেকে নিয়ে আয়—বল্, চাক্‌রী দিব।

সে তখনও তেম্‌নিভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। আমার মুখ দিয়া যে এরূপ আজ্ঞা বাহির হইতে পারে তাহা সে বিশ্বাস করিল না।

বলিলাম, যা বন্‌শী', আমি কি তোর সঙ্গে তামাসা করছি?

এতক্ষণে বন্‌শী সাহ্লাদে বাহির হইয়া গেল এবং পরক্ষণেই দলিয়াকে লইয়া ফিরিয়া আসিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কি রে দলিয়া চাক্‌রী পেয়েছিস্?

মাথা নাড়িয়া দলিয়া জানাইল, উঁ-হুঁ।

—কাল পরশু কোথায় ছিলি?

—ইস্টাশনে।

—মোট বইছিলি বুঝি?

—না।

—কি খেয়েছিস্?

—কিছুই না।

'কুকারে' তিনজনের খাওয়া চলে না। বন্‌শীকে বলিলাম, বাজার থেকে চাল, ডাল এনে তোরা বাপু আলাদা রান্না করে' খা। আমি আর হাজার জনের রাঁধতে পারবো না।

বলিতে-না-বলিতে 'বেশ বাবু' বলিয়া বন্‌শী বাজারে ছুটিল। দলিয়াও চলিয়া যাইতেছিল। আমি বলিলাম, যাস্ না দলিয়া, আজ থেকে তুই আমার কাছেই থাক্।

সে একবার আমার মুখের পানে তাকাইয়া আবার মুখ নত করিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, তুই বিয়ে করেছিস্ দলিয়া?

—না।

—করবি না?

—না।

—বন্‌শীর সঙ্গে তোর এত ভাব হলো কেমন করে?

এইবার একটুখানি লজ্জিতা হইয়া দলিয়া কহিল, ধেৎ, জানি না ত!···বলিয়া সে চলিয়া যাইতেছিল, আমি বলিলাম, ততক্ষণ উঠোনের ওই কয়লা দিয়ে রান্নাঘরের উনোন্‌টা ধরিয়ে রাখ্।

দলিয়া কয়লা ভাঙ্গিতে বসিল।

* * * *

২রা মাঘ,—

* * প্রায় একমাস হইতে চলিল, দলিয়া ও বন্‌শী আমার ঘরেই আছে। আজ দেখিলাম, দলিয়া বন্‌শীর উপর রাগ করিয়া কিছুই খায় নাই। বন্‌শী নাকি কাল কয়েকটা সঙ্গী জুটাইয়া 'তাড়ি' খাইয়াছিল এবং সেই কু-অভ্যাস পরিত্যাগ করাইবার জন্যই দলিয়া তাহার অস্ত্র ধারণ করিয়াছে। বন্‌শী অনেক সাধাসাধি করিল, 'তাড়ি' আর সে জীবনে কোনও দিন স্পর্শ করিবে না বলিয়া নাকে-কাণে হাত দিয়া প্রতিজ্ঞা করিল, কিন্তু তথাপি দলিয়া তাহার 'গোঁ' ধরিয়া

বসিয়া রহিল। আমি আড়াল হইতে প্রাণ ভরিয়া তাহাদের মান-ভঞ্জন দেখিলাম। আমার বড় ভাল লাগিতেছিল। ব্যাপার যে কতদূর গড়াইয়াছে, তাহা জানি। ইহা আমি পূর্ব্বাহ্নেই জানিতাম। এবং দলিয়াকে আমার বাসায় বন্‌শীর পাশে ঠাঁই না দিলে মেয়েটার শেষ পরিণাম যে কি হইত তাহাও ভাবিয়াছিলাম। * * ইহাদের দিয়াই আমি নিজের অন্তরের অতৃপ্ত ক্ষুধা মিটাইয়া লইতে চাই। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তাহারা সুখী হোক্।

৩রা মাঘ,—

* * আজ মনে-মনে ভাবিয়া ঠিক করিয়াছি, হিন্দুমতে ইহাদের দুজনের বিবাহ দিয়া, একটা ধর্ম্মের বাঁধনে ইহাদিগকে চিরজন্মের জন্য বাঁধিয়া দিব। * * আমার কেহ কোথাও নাই। আমার যথাসর্ব্বস্ব দিয়া তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের সংস্থান করিয়া দিতে পারিলেও আমার অসীম তৃপ্তি। আমি যে তাহাদের মনিব, এ কথা আমি সময়-সময় ভুলিয়া যাই।...তাহারা দুটিতে আমার চোখের সম্মুখে তাহাদের সুখের সংসার গড়িয়া তুলুক্,—আমি দেখিতে দেখিতে মরিয়া যাই!

৪ঠা মাঘ,—

* * এ বিবাহে তাহাদের উভয়েরই মত হইয়াছে। আগামী পরশু তারিখে, আমি নিজে যজ্ঞাগ্নি সমক্ষে তাহাদের পুরোহিতের কার্য্য করিব। তাহারা যে জন্ম-জন্মান্তরের সাথী, সেকথা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিব। * * *

৫ই মাঘ,—

* * সীতারামপুর ষ্টেশনের কাছে কি একটা কয়লার খনিতে বন্‌শীর এক দূর সম্পর্কের মাসী থাকে। বন্‌শী বলিল, আজ যদি সকালের ট্রেণে গিয়া বৈকালে তাহাকে লইয়া আসে, তাহা হইলে বিবাহের অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য সে সমস্ত ঠিক করিয়া দিবে।

বলিলাম, সাঁওতালের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে সে যদি তোর না দিতে চায়?

ঈষৎ হাসিয়া বন্‌শী আমাকে বুঝাইয়া দিল যে তাহার মাসী এবং মেসো দেশ হইতে আসিয়া মুসলমান হইয়াছে। সেজন্য কোনও চিন্তা নাই এবং তাহারা যখন গরীব মানুষ, তখন দু'দশটাকা হাতে দিলেই আর-কিছু গোলমাল থাকিবে না।

তাহাকে কুড়িটি টাকা দিয়া বলিয়া দিলাম, যদি না আস্‌তে চায় তাহ'লে না হয় না আস্‌বে। তুই চলে' আসিস্ যেন।

বন্‌শী ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া বাহির হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে দলিয়া ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া আমার নিকট দাঁড়াইল। বলিল, উ বল্লেক্, সীতারামপুরের হাটে ভাল সাড়ী পাওয়া যায় বাবু!.....

তাহার হাতে আরও দশটি টাকা দিয়া বলিলাম, দুজোড়া আন্‌তে বলে দে।

সে খুসী হইয়া বন্‌শীর হাতে তাহার সাড়ীর দাম দিতে চলিয়া গেল।

বেলা সাড়ে ন'টার সময় সীতারামপুর যাইবার পশ্চিমের ট্রেণ খানা পার হইয়া গেল। জানালার নিকট সরিয়া আসিয়া দেখিলাম, দলিয়া লাইনের ধারে একদৃষ্টে বন্‌শীর দিকে তাকাইয়া আছে!.....

বৈকালে বন্‌শীর ফিরিবার দুইখানা ট্রেণ চলিয়া গেল, কিন্তু বন্‌শী আসিল না দেখিয়া দলিয়া ও আমি ভাবিতে লাগিলাম।

দলিয়া এ বেলা নিজেই রান্না করিয়াছিল। বন্‌শীর জন্য একখালা ভাত ঢাকা দিয়া সমস্ত শীতের রাত্রিটা সে উৎকর্ণ হইয়া জাগিয়াই কাটাইল। পূর্ব্ব এবং পশ্চিমযাত্রী যতগুলো ট্রেণ সশব্দে আমার বাড়ীর পাশ দিয়া পার হইয়া গেল, ততবারই দলিয়ার দরজা খোলার শব্দ পাইলাম। * *

৬ই মাঘ,—

অতি প্রত্যূষে আজ দলিয়া নিজেই আমার স্নানের জল তুলিয়া দিল। চা খাইয়া আজিও প্রতিদিনের মত অফিসে যাইবার জন্য বাহির হইতেছি, দেখিলাম, দরজার চৌকাঠের উপর বসিয়া দলিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কান্না সুরু করিয়াছে। তাহাকে বুঝাইয়া বলিলাম, সে নিশ্চয়ই আস্‌বে,—তুই কাঁদিস্ না।

চোখ মুছিয়া আমার পানে একবার তাকাইয়া দলিয়া বলিল, আমার মন হচ্ছে, সে বেইমান্ আর আস্‌বেক্ নাই বাবু!

শীঘ্র ফিরিয়া আসিব বলিয়া বাজারের একটি টাকা তাহার হাতে দিয়া আমি চলিয়া গেলাম।

দুপুরে অফিস হইতে ফিরিবার পথে দেখিলাম, লাইনের ধারে পাগলিনীর মত আলুলায়িত-কেশা দলিয়া কাণ পাতিয়া দূরে ট্রেণের শব্দ শুনিতেছে।

একটা ধমক্ দিয়া বলিলাম, রৌদ্রে বসে' এ কি হচ্ছে দলিয়া, বাড়ী চল্।

দলিয়া মাথার চুলগুলা একবার দোলাইয়া কহিল, এইবারে যে গাড়ীটা আস্‌বেক্, তাথেই আস্‌ছে উ। ত্যাখ্ কেনে।

এ উন্মাদিনীকে আর কি বলিয়া বুঝাইব? বিষণ্ণবদনে বাসায় ফিরিয়া দেখিলাম, বাজার হইতে আমার জন্য সে সমস্তই আনিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু তাহার নিজের জন্য উনান্‌টা পর্য্যন্ত ধরায় নাই।

দিনের ট্রেণে বন্‌শী ফিরিল না। রাত্রেও তাহার দেখা নাই। দলিয়ার এক দণ্ডের জন্য বিশ্রাম নাই। সমস্তদিন অস্নাত অভুক্ত অবস্থায় ছট্‌ফট্ করিতেছে। অনেক করিয়াও তাহাকে কিছু খাওয়াইতে পারিলাম না।

প্রত্যূষে উঠিয়া দেখি, সদর দরজা খুলিয়া দলিয়া কোন্ সময় বাহির হইয়া গেছে।

ভাবিলাম, সে নিশ্চয় লাইনের ধারে বসিয়া আছে। জল তুলিয়া দিবে বলিয়া তাহাকে ডাকিতে গেলাম।

লাইনের উপর লোকজনের বিরাট জনতা দেখিয়া আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। দেখিলাম, দুই খণ্ডে বিভক্ত দলিয়ার রক্তাক্ত শবদেহ ঘিরিয়া লোক জমা হইয়াছে। তাহার সেই যৌবন-দীপ্ত, শান্ত, সুকুমার মুখের পানে তাকাইতে পারিতেছিলাম না। তাহার সেই মৃত্যুমলিন অপলক দুটি চক্ষের অনিমেষ চাহনি এখনও যেন আশা-আকাঙ্ক্ষায় অথির-চঞ্চল হইয়া ফুটিয়া রহিয়াছে,—প্রণয়ীর আগমন-প্রতীক্ষায় উদ্বিগ্ন-কাতর মুখখানির উপর তখনও পর্য্যন্ত এতটুকু নিরুদ্বেগের চিহ্ন নাই।

৭ই মাঘ,—

দলিয়ার মৃতদেহ 'মর্গে' লইয়া গেল। আমাকে লইয়া টানাটানি হইবে জানি, কাজেই তৎক্ষণাৎ থানায় গিয়া ইন্স্‌পেক্টর বাবুকে সমস্ত পরিচয় দিয়া বলিলাম, ডাক্তারবাবুকে দয়া করিয়া নিষেধ করিয়া দিন, ও অভাগীর অতৃপ্ত বুকের উপর ছুরি যেন আর না চালানো হয়। * *

অনেক কষ্টে দলিয়ার শবদেহ দাহন করিবার অনুমতি পাইলাম।

কুঠির লোকজন লইয়া দামোদরের শ্মশানে যখন তাহাকে শেষ করিয়া দিয়া বাসায় ফিরিলাম, রাত্রি তখন প্রায় নয়টা।

সমস্ত দিন একপ্রকার অনাহারে কাটিয়াছে! রাত্রিটাও কাটিবে!

সহরের এই নিরালা প্রান্তে আমার ক্ষুদ্র বাসার অপ্রশস্ত প্রাঙ্গণটুকুর মধ্যে পৃথিবীর সমস্ত অন্ধকার যেন জমাট্ বাঁধিয়াছে! প্রণয়ীযুগলের হাসি-গানে, মিলন-বিরহে, আনন্দে-নিরানন্দে যেখানে আমি মাসাবধিকাল মায়া-স্বর্গ রচনা করিয়াছিলাম, আজ এই নীরব নিস্তব্ধ বিভীষিকাময়ী শীতরাত্রে হঠাৎ সে স্বর্গলোক শ্মশানে পরিণত হইল, কেন?.. সামান্য একটা হরিণীর আকর্ষণে ভরতকে আবার সংসারের সহস্রপাকে বাঁধিয়া দিবার কি প্রয়োজন ছিল তোর দলিয়া?...

৮ই মাঘ,—

গত রাত্রে সেই যে লেপ মুড়ি দিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িয়াছিলাম, মনে করিয়াছিলাম, তাহাদের কথা আর ভাবিব না, কিন্তু রাত্রে যে অদ্ভুত ঘটনাটা ঘটিয়া গেল, আজ এই স্পষ্ট দিবালোকে সে কথা ভাবিতে গিয়া বৃহৎ একটা দুঃস্বপ্নের মত আমার এই ব্যথিত অন্তঃকরণে অত্যন্ত তীব্র একটা পীড়া অনুভব করিতেছি।

মধ্যরাত্রে স্পষ্ট দিবালোকের মত আমি যেন সত্য জাগ্রত মূর্ত্তিতে দলিয়াকে আমার এই বাড়ীর সুমুখে কাজে-অকাজে, কারণে-অকারণে, বার বার হাঁটা হাঁটি করিতে দেখিলাম। এই পত্রহীন শীর্ণ কুল গাছটার তলায় বসিয়া উদাস-কাতর দৃষ্টিতে সে যেন একবার আমার মুখের পানে চাহিল, পরক্ষণেই মুখ ফিরাইয়া লইল।

কিয়ৎক্ষণ পরে আমার রুদ্ধ দরজায় সজোরে করাঘাত করিয়া নারীকণ্ঠে কে যেন আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, বন্‌শী! বন্‌শী!

ডাক শুনিয়া আমি ঘুমের ঘোরে কখন যে শয্যাত্যাগ করিয়াছি, খালি গায়ে কখন্ যে বাহিরে আসিয়া দরজা খুলিয়া দিয়াছি, জানি না। মাঘ মাসের মধ্য রাত্রের শীতের বাতাস হিল্ হিল্ করিয়া যখন আমার গায়ে আসিয়া লাগিল, তখন বোধ করি চেতনা ফিরিয়া পাইলাম। অন্ধকারে মুখোমুখি হইয়া আমি বাহিরের রাস্তায় দাঁড়াইয়া আছি। দূরে রেল-লাইনের একটা সিগনালের বাতি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।—কোথায় বা সে দলিয়া, আর কোথায় বা সে বন্‌শী! সে অভাগিনীকে যে আমি নিজের হাতে শেষ করিয়া দিয়া আসিয়াছি, আর যে-বেইমান্ এই দেবীর সত্য-সুন্দর পূজার অর্ঘ্য পদাঘাতে পায়ে দলিয়া তাহাকে খুন্ করিয়া পলাইয়া গেল, সে আবার ফিরিবে কিসের জন্য?.....

হঠাৎ একটা দম্‌কা শীতল বাতাস অট্টহাস্যে হা হা করিয়া ছুটিয়া গেল। আমার সর্ব্বাঙ্গে যেন অতি সূক্ষ্ম সূচ্যগ্রভাগ বিঁধিয়া দিয়া গাছের পাতায় পাতায় করতালি দিতে সুরু করিল। আমার সর্ব্বশরীরের রক্ত স্রোত চিন্ চিন্ করিয়া নিমিষেই যেন হিম-শীতল আড়ষ্ট হইয়া গেল। বুকের শিরা উপশিরাগুলা দপ্ দপ্ করিতে লাগিল। থপ্ করিয়া সেই খানেই বসিয়া পড়িলাম। * * * * তাহার পর কোন্ সময় সেখান হইতে উঠিয়া বিছানায় আসিয়া শুইয়াছিলাম, মনে নাই।

* * * আজ স্থির করিলাম, এখানের চাক্‌রীতে চিরজীবনের মত ইস্তফা দিয়া অন্যত্রে চলিয়া যাইব।

শ্রীশৈলজা মুখোপাধ্যায়

প্রাচীন যুগের করস্থাপন প্রণালী

রাজ্যপরিচালনা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে অর্থের প্রয়োজন। প্রাচীনযুগে রাজা বা শাসকগণ সাধারণতঃ দুই উপায়ে অর্থসংগ্রহ করিতেন; রাজা প্রায়ই ভূস্বামী হইতেন, ভূমির খাজনা (rent) হিসাবে যাহা পাওয়া যাইত তাহার সাহায্যে রাজ্যের অধিকাংশ ব্যয় নির্ব্বাহ হইত, আবশ্যক বুঝিলে রাজা বা শাসকবর্গ কর (tax) স্থাপন করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না। অনেক ক্ষেত্রে প্রজা স্বেচ্ছায় রাজচরণে উপহারস্বরূপ করপ্রদান করিত। সময়বিশেষে বলপ্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে করদানে বাধ্য করা হইত।

বহুস্থলে পুরোহিত সম্প্রদায় বস্তুতঃ রাজ্যশাসন করিতেন এবং রাজা তাঁহাদের হস্তে ক্রীড়নকমাত্র ছিলেন। আয় সুদৃঢ় ও সুনিশ্চিত করিবার জন্য তাঁহারা করপ্রদান ধর্ম্মসাধনের অঙ্গ—

লোকের মনে এইরূপ বিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়াছিলেন। যাহারা করদানে ইতস্ততঃ করিত, তাহারা শুধু জাতির বা সমাজের নহে—ধর্ম্ম এবং ঈশ্বরের চক্ষেও অপরাধী বলিয়া পরিগণিত হইত।

প্রাচীনকালে মানুষের জন্মগত অধিকার পরিস্ফুট হইয়া ওঠে নাই। ফরাসীবিপ্লবে যে প্রকৃতিগত অধিকারের (Natural rights) দাবী ঘোষিত হয়, সুদূর অতীতে সেরূপ কোনও আন্দোলন দৃষ্টিগোচর হয় নাই, মানব তখন গোষ্ঠী ও সমাজের সম্পূর্ণ অধীন ছিল। পুরাকালের করস্থাপন প্রণালী অনুসন্ধান করিলে এই ধারণা সুস্পষ্ট হইয়া ওঠে। ডিউটারোনমি চতুর্দ্দশ অধ্যায় (২৮, ২৯) এবং ষড়বিংশতি অধ্যায় (১২)-এ আদেশ আছে—তিনবৎসরকাল ধরিয়া কোনও লোক যাহা উপার্জ্জন করিত, তাহার লভ্যাংশ পরবৎসরে তাহাকে যাজক, অনাথ শিশু বিধবা স্ত্রী এবং অতিথি অভ্যাগতের ভরণপোষণের জন্য ব্যয় করিতে হইত।

পুরোহিত সম্প্রদায় অনেক সময়ে ধনসম্পত্তিশালী হইতেন না, সুতরাং তাঁহারা করভার হইতে অব্যাহতি পাইতেন; এতদ্বারা তাঁহারা যে রাজশাসনের বাহিরে ও ঊর্দ্ধে অবস্থিত তাহাও সূচিত হইত। নিঃস্ব প্রজার স্কন্ধেকরস্থাপন সময়ে সময়ে অনুচিত বলিয়া বিবেচিত হইত।

এজ্‌রা সপ্তম পরিচ্ছেদ (২৪) অধ্যয়নে জানা যায় যে যাজক, চারণ, ভারবাহক ও ভৃত্যপ্রভৃতির উপরে করস্থাপন আইনের চক্ষে অসঙ্গত বলিয়া পরিগণিত হইত। এই ধরণের নিয়ম প্রাচীন ভারতেও প্রচলিত ছিল। আপস্তম্ভে পণ্ডিত ব্রাহ্মণ স্ত্রীলোক এবং বালক ইত্যাদিকে করদান হইতে নিস্তার দেওয়া হইয়াছে। বশিষ্ঠে এবং গৌতমের ধর্ম্মসূত্রে শ্রমজীবীদের মাসান্তে এক দিবসের পরিশ্রম করস্বরূপ দিতে হইবে এইরূপ ব্যবস্থা আছে। ব্যবসায়ীদের আয়ের বিংশ ভাগ এবং কৃষকদের আয়ের দশম, অষ্টম অথবা ষষ্ঠ অংশ কর প্রদান করিতে হইত। কৃষিপ্রধান দেশে ইহাই রাজস্বের প্রধান উৎস ছিল।

মনুসংহিতায় করগ্রাহী রাজাকে সংযত ও স্বল্পসন্তুষ্ট হইতে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। রাজস্বের বিনিময়ে রাজা প্রজাবর্গকে যথোচিত রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন এরূপ উপদেশও মনুতে পাওয়া যায়।

হেরোডোটাসের মতে প্রাচীন ঈজিপ্টের রাজস্ব সাধারণতঃ ভূমির খাজনা হইতেই সংগৃহীত হইত। কোনও ব্যক্তি যাহাতে সাধ্যের অতিরিক্ত করভারে প্রপীড়িত না হয়, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিবার জন্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইত (হেরোডোটাস্, দ্বিতীয় অধ্যায়, ১০৯)। ইহা হইতে পুরাকালে 'ক্ষমতা অনুযায়ী করপ্রদান' নীতির (faculty theory) অস্তিত্ব দৃষ্টিগোচর হয়; প্লেটো Laws নামক গ্রন্থে সম্পত্তির মূল্যনির্দ্ধারণ এবং বাৎসরিক আয়নির্দ্দেশের উপযোগিতা দেখাইয়াছেন। উহাদের উপরে ধনকর বা আয়কর স্থাপিত হইলে জনসাধারণ অন্যায়ভাবে প্রপীড়িত হইবে না—ইহাই তাঁহার অভিমত। লিভি বিশ্ববিখ্যাত ইতিহাসে প্রাচীন রোমের (খৃষ্ট জন্মের প্রায় পাঁচশতবৎসর আগে) অবস্থা আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে সাধারণ প্রজার নিকট হইতে

কোনরূপ কর আদায় করা হইত না। ধনশালী ও করপ্রদানে সমর্থ পুরুষ রাজ্যের ব্যয়ভার বহন করিতেন; দরিদ্রব্যক্তিগণ নিজ নিজ সন্তানদের সুশিক্ষিত ও উপযুক্ত করিতে বাধ্য হইত এবং ইহাই তাহাদের পক্ষে ব্যয়সাধ্য বলিয়া মনে করা হইত।

অনেকের বিশ্বাস, প্রাচীনযুগে ধনী ও দরিদ্র সকলকে সমভাবে রাজকোষে অর্থপ্রেরণ করিতে হইত। ইহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। অর্থশালী ব্যক্তিগণ সামর্থ্য অনুযায়ী অধিক করপ্রদান করিতেন এবং মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র সম্প্রদায়ের করভার অপেক্ষাকৃত লঘু ছিল। অধিকাংশ স্থলে নিয়ম ছিল, যে প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁহার আয় বা সম্পত্তির একটী বিশেষ ভাগ রাজহস্তে ন্যস্ত করিবেন (Proportional tax)। যাঁহার বাৎসরিক আয় দুই হাজার মুদ্রা ছিল, তিনি শতকরা পঞ্চমুদ্রা হিসাবে, একশতমুদ্রা করপ্রদান করিতেন; যাঁহার বাৎসরিক আয় দুই শত মুদ্রা, তিনি পূর্ব্বনিয়মে দশমুদ্রা প্রদানে নিষ্কৃতিলাভ করিতেন। করগ্রহণে এইরূপে ন্যায়ের (Justice) মর্য্যাদা রক্ষিত হইত। যে সকল রাষ্ট্রে ধনবিজ্ঞান অধিক অগ্রসর হইয়াছিল তাহাদের নিয়ম আরও উন্নত ও আধুনিক ছিল। দরিদ্র প্রজা যে হারে করপ্রদান করিত, ধনী প্রজা তদপেক্ষা অধিক ও ক্রমবর্দ্ধনশীল হারে কর প্রদান করিত (Progressive taxation)। এইরূপে রাজ্যের অভ্যন্তরে ধনসাম্যের দিকে লক্ষ্য রাখা হইত। রোমের বিখ্যাত পণ্ডিত জাষ্টিনিয়ানের গ্রন্থে এই সকল সমস্যা আলোচিত হইয়াছে (৫২৯ খৃঃ অঃ)।

এই প্রসঙ্গে সুদূর অতীত চীনের করপ্রথা কিরূপ ছিল তাহার অবতারণা অন্যান্তর হইবে না। কুঙ্গ ইঙ্গ তার (৫৭৪-৬৪৮ খৃঃ অঃ) পুস্তকে করস্থাপন সম্বন্ধে নানাবিধ কৌতূহলোদ্দীপক জ্ঞাতব্য তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। ইহাতে বিত্তশালী ব্যক্তিগণের উপরে রাষ্ট্রের অধিকাংশ ব্যয় নিক্ষেপ করিতে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। নিঃস্ব প্রজার অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া করস্থাপন করা যুক্তিসঙ্গত—এইরূপ আভাষ এই পুস্তকে পাওয়া যায়। কন্‌ফুসিয়াসের বিখ্যাত শিষ্য চেঙ্গ্ হুয়ানের মতে (১২৭-২০০ খৃঃ অঃ) দরিদ্র প্রজার দেয় অপেক্ষা উচ্চহারে ধনী প্রজার করপ্রদান করা কর্ত্তব্য। এই উপায়ে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে অবস্থার বৈষম্য কিঞ্চিৎ পরিমাণে লোপ পাইবে।

এই সকল বিবরণ ও প্রামাণিক গ্রন্থ অধ্যয়নে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে প্রাচীনযুগে নানা-প্রকার উন্নত ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে করস্থাপন করা হইত; এই সকল নীতি ও প্রণালী মধ্যযুগে ও পরবর্ত্তী কালে বহুল পরিমাণে লুপ্ত হইয়াছিল। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে তাহারা মার্জ্জিত হইয়া পুনরায় আত্মপ্রকাশ করিতেছে। ভারতবর্ষ, চীন, গ্রীস ও রোম অঞ্চলে যে সকল করস্থাপন প্রথা প্রচলিত ছিল তাহাদের একাংশ আধুনিক প্রথা অপেক্ষা কোনও প্রকারে ন্যূন নহে।

এই প্রবন্ধের কলেবর দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে; বারান্তরে প্রাচীন ভারতবর্ষে করনির্দ্ধারণনীতি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। *

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার

* প্রবন্ধের জন্য লেখক নিম্নলিখিত পুস্তকের বিশেষভাবে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন :—

1. Jones—Taxation, yesterday and tomorrow.
2. Bastable—Public finance.
3. Plehn—Public finance.

লোকের মনে এইরূপ বিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়াছিলেন। যাহারা করদানে ইতস্ততঃ করিত, তাহারা শুধু জাতির বা সমাজের নহে—ধর্ম্ম এবং ঈশ্বরের চক্ষেও অপরাধী বলিয়া পরিগণিত হইত।

প্রাচীনকালে মানুষের জন্মগত অধিকার পরিস্ফুট হইয়া ওঠে নাই। ফরাসীবিপ্লবে যে প্রকৃতিগত অধিকারের (Natural rights) দাবী ঘোষিত হয়, সুদূর অতীতে সেরূপ কোনও আন্দোলন দৃষ্টিগোচর হয় নাই, মানব তখন গোষ্ঠী ও সমাজের সম্পূর্ণ অধীন ছিল। পুরাকালের করস্থাপন প্রণালী অনুসন্ধান করিলে এই ধারণা সুস্পষ্ট হইয়া ওঠে। ডিউটারোনমি চতুর্দ্দশ অধ্যায় (২৮, ২৯) এবং ষড়বিংশতি অধ্যায় (১২)-এ আদেশ আছে—তিনবৎসরকাল ধরিয়া কোনও লোক যাহা উপার্জ্জন করিত, তাহার লভ্যাংশ পরবৎসরে তাহাকে যাজক, অনাথ শিশু বিধবা স্ত্রী এবং অতিথি অভ্যাগতের ভরণপোষণের জন্য ব্যয় করিতে হইত।

পুরোহিত সম্প্রদায় অনেক সময়ে ধনসম্পত্তিশালী হইতেন না, সুতরাং তাঁহারা করভার হইতে অব্যাহতি পাইতেন; এতদ্বারা তাঁহারা যে রাজশাসনের বাহিরে ও ঊর্দ্ধে অবস্থিত তাহাও সূচিত হইত। নিঃস্ব প্রজার স্কন্ধে করস্থাপন সময়ে সময়ে অনুচিত বলিয়া বিবেচিত হইত।

এজরা সপ্তম পরিচ্ছেদ (২৪) অধ্যয়নে জানা যায় যে যাজক, চারণ, ভারবাহক ও ভৃত্যপ্রভৃতির উপরে করস্থাপন আইনের চক্ষে অসঙ্গত বলিয়া পরিগণিত হইত। এই ধরণের নিয়ম প্রাচীন ভারতেও প্রচলিত ছিল। আপস্তম্ভে পণ্ডিত ব্রাহ্মণ স্ত্রীলোক এবং বালক ইত্যাদিকে করদান হইতে নিস্তার দেওয়া হইয়াছে। বশিষ্ঠে এবং গৌতমের ধর্ম্মসূত্রে শ্রমজীবীদের মাসান্তে এক দিবসের পরিশ্রম করস্বরূপ দিতে হইবে এইরূপ ব্যবস্থা আছে। ব্যবসায়ীদের আয়ের বিংশ ভাগ এবং কৃষকদের আয়ের দশম, অষ্টম অথবা ষষ্ঠ অংশ কর প্রদান করিতে হইত। কৃষিপ্রধান দেশে ইহাই রাজস্বের প্রধান উৎস ছিল।

মনুসংহিতায় করগ্রাহী রাজাকে সংযত ও স্বল্পসন্তুষ্ট হইতে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। রাজস্বের বিনিময়ে রাজা প্রজাবর্গকে যথোচিত রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন এরূপ উপদেশও মনুতে পাওয়া যায়।

হেরোডোটাসের মতে প্রাচীন ঈজিপ্টের রাজস্ব সাধারণতঃ ভূমির খাজনা হইতেই সংগৃহীত হইত। কোনও ব্যক্তি যাহাতে সাধ্যের অতিরিক্ত করভারে প্রপীড়িত না হয়, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিবার জন্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইত (হেরোডোটাস্, দ্বিতীয় অধ্যায়, ১০৯)। ইহা হইতে পুরাকালে 'ক্ষমতা অনুযায়ী করপ্রদান' নীতির (faculty theory) অস্তিত্ব দৃষ্টিগোচর হয়; প্লেটো Laws নামক গ্রন্থে সম্পত্তির মূল্যনির্দ্ধারণ এবং বাৎসরিক আয়নির্দ্দেশের উপযোগিতা দেখাইয়াছেন। উহাদের উপরে ধনকর বা আয়কর স্থাপিত হইলে জনসাধারণ অন্যায়ভাবে প্রপীড়িত হইবে না—ইহাই তাঁহার অভিমত। লিভি বিশ্ববিখ্যাত ইতিহাসে প্রাচীন রোমের (খৃষ্ট জন্মের প্রায় পাঁচশতবৎসর আগে) অবস্থা আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে সাধারণ প্রজার নিকট হইতে

কোনরূপ কর আদায় করা হইত না। ধনশালী ও করপ্রদানে সমর্থ পুরুষ রাজ্যের ব্যয়ভার বহন করিতেন; দরিদ্রব্যক্তিগণ নিজ নিজ সন্তানদের সুশিক্ষিত ও উপযুক্ত করিতে বাধ্য হইত এবং ইহাই তাহাদের পক্ষে ব্যয়সাধ্য বলিয়া মনে করা হইত।

অনেকের বিশ্বাস, প্রাচীনযুগে ধনী ও দরিদ্র সকলকে সমভাবে রাজকোষে অর্থপ্রেরণ করিতে হইত। ইহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। অর্থশালী ব্যক্তিগণ সামর্থ্য অনুযায়ী অধিক করপ্রদান করিতেন এবং মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র সম্প্রদায়ের করভার অপেক্ষাকৃত লঘু ছিল। অধিকাংশ স্থলে নিয়ম ছিল, যে প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁহার আয় বা সম্পত্তির একটী বিশেষ ভাগ রাজহস্তে ন্যস্ত করিবেন (Proportional tax)। যাঁহার বাৎসরিক আয় দুই হাজার মুদ্রা ছিল, তিনি শতকরা পঞ্চমুদ্রা হিসাবে, একশতমুদ্রা করপ্রদান করিতেন; যাঁহার বাৎসরিক আয় দুই শত মুদ্রা, তিনি পূর্ব্বনিয়মে দশমুদ্রা প্রদানে নিষ্কৃতিলাভ করিতেন। করগ্রহণে এইরূপে ন্যায়ের (Justice) মর্য্যাদা রক্ষিত হইত। যে সকল রাষ্ট্রে ধনবিজ্ঞান অধিক অগ্রসর হইয়াছিল তাহাদের নিয়ম আরও উন্নত ও আধুনিক ছিল। দরিদ্র প্রজা যে হারে করপ্রদান করিত, ধনী প্রজা তদপেক্ষা অধিক ও ক্রমবর্দ্ধনশীল হারে কর প্রদান করিত (Progressive taxation)। এইরূপে রাজ্যের অভ্যন্তরে ধনসাম্যের দিকে লক্ষ্য রাখা হইত। রোমের বিখ্যাত পণ্ডিত জাষ্টিনিয়ানের গ্রন্থে এই সকল সমস্যা আলোচিত হইয়াছে (৫২৯ খৃঃ অঃ)।

এই প্রসঙ্গে সুদূর অতীত চীনের করপ্রথা কিরূপ ছিল তাহার অবতারণা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কুঙ্গ ইঙ্গ তার (৫৭৪-৬৪৮ খৃঃ অঃ) পুস্তকে করস্থাপন সম্বন্ধে নানাবিধ কৌতূহলোদ্দীপক জ্ঞাতব্য তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। ইহাতে বিত্তশালী ব্যক্তিগণের উপরে রাষ্ট্রের অধিকাংশ ব্যয় নিক্ষেপ করিতে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। নিঃস্ব প্রজার অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া করস্থাপন করা যুক্তিসঙ্গত—এইরূপ আভাষ এই পুস্তকে পাওয়া যায়। কন্‌ফুসিয়াসের বিখ্যাত শিষ্য চেঙ্গ্ হুয়ানের মতে (১২৭-২০০ খৃঃ অঃ) দরিদ্র প্রজার দেয় অপেক্ষা উচ্চহারে ধনী প্রজার করপ্রদান করা কর্ত্তব্য। এই উপায়ে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে অবস্থার বৈষম্য কিঞ্চিৎ পরিমাণে লোপ পাইবে।

এই সকল বিবরণ ও প্রামাণিক গ্রন্থ অধ্যয়নে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে প্রাচীনযুগে নানা-প্রকার উন্নত ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে করস্থাপন করা হইত; এই সকল নীতি ও প্রণালী মধ্যযুগে ও পরবর্ত্তী কালে বহুল পরিমাণে লুপ্ত হইয়াছিল। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে তাহারা মার্জ্জিত হইয়া পুনরায় আত্মপ্রকাশ করিতেছে। ভারতবর্ষ, চীন, গ্রীস ও রোম অঞ্চলে যে সকল করস্থাপন প্রথা প্রচলিত ছিল তাহাদের একাংশ আধুনিক প্রথা অপেক্ষা কোনও প্রকারে ন্যূন নহে।

এই প্রবন্ধের কলেবর দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে; বারান্তরে প্রাচীন ভারতবর্ষে করনির্দ্ধারণনীতি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। *

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার

* প্রবন্ধের জন্য লেখক নিম্নলিখিত পুস্তকের বিশেষভাবে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন :—

1. Jones—Taxation, yesterday and tomorrow.
2. Bastable—Public finance.
3. Plehn—Public finance.

বন্দী-জীবন*

দ্বিতীয় খণ্ড—ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পরিণাম

বিপ্লবিদের সকল চেষ্টাই বারে বারে ব্যর্থ হইল, এবং তাহার ফলে স্বদেশে ও বিদেশে, বিভিন্ন রাজশক্তির নিষ্পেষণে তাঁহাদিগের লাঞ্ছনার আর অবধি রহিল না। স্বদেশের ত কথাই নাই, বিদেশেও ইঁহারা দেশ হইতে দেশান্তরে তাড়িত হইতে থাকিলেন। আর স্বদেশে "ভারত-রক্ষা আইনের" বলে সন্দেহমাত্রেই যুবকদিগকে দলে দলে জেলে অথবা গ্রামে আবদ্ধ করা হইল। যাঁহাদের বিরুদ্ধে এতটুকুও প্রমাণ পাওয়া গেল, তাঁহাদিগকে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের হাত হইতে কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হইল। কেহ ফাঁসিকাষ্ঠে জীবন দিলেন, কেহবা দ্বীপান্তরিত হইলেন। পুলিশের উৎপাত অথবা জেলের কঠোরতা সহ্য করিতে না পারিয়া কত যুবক আত্মহত্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন; এই সকল করুণ কাহিনী কত তরুণ যুবকদিগের মায়েদের প্রাণ মনকে নিষ্ঠুরভাবে বিচূর্ণ করিয়াছিল। বিপ্লবদল প্রায় ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। বিপ্লবিদের নেতারা হয় জেলে আবদ্ধ হইলেন, অথবা ফাঁসিকাষ্ঠে জীবন বিসর্জ্জন দিলেন। বিপ্লবদল যখন এইরূপে ছত্রভঙ্গ হইয়া দেশের চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল তখন নানা স্থানে পুলিশদের সহিত এইসব বিপ্লবদলের যে সকল সংঘর্ষ হয় বিপ্লবযুগের ইতিহাসে তাহা স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

পাঞ্জাবের বিপ্লবান্দোলনের গভীরতা ও ব্যাপকতা যখন প্রকাশ হইয়া পড়িল তখন গভর্ণমেণ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, এই বিপ্লবদলকে আর কিছুতেই অবহেলা করা চলে না। ভারতের প্রবীণ, বিজ্ঞ এবং রাজনীতিবিশারদ নেতারা একথা চিরকালই বলিয়া আসিয়াছিলেন যে, ভারতের এই বিপ্লবপ্রয়াস নিতান্তই ছেলেমানুষি,—কিন্তু ইংরাজগভর্ণমেণ্ট একথা বেশ ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিলেন যে, এই বিপ্লবিরা যদি কিছুদিনও নির্ব্বিঘ্নে নিজেদের মৎলব মত কাজ করিবার অবসর ও সুযোগ পায় ত ভারতের অবস্থার সত্যই এক অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন হইবে। ভারতীয় বিপ্লববাদীদের দ্বারা যে কত খানি কি সম্ভব হইতে পারে তা' ইংরাজ-গভর্ণমেণ্ট যতটা কল্পনা করিতেন, ভারতের রাজনীতিবিশারদ নেতারা ততটা কোন দিনই করেন নাই। আণ্ডামান যাইবার পূর্ব্বে কয়েকটি উচ্চপদস্থ ইংরাজ পুরুষদিগের সহিত আমার এই বিষয় অনেকক্ষণ ধরিয়া আলাপ হইয়াছিল। তাঁহাদের কথাবার্ত্তা হইতে আমি বুঝিয়াছিলাম যে, গভর্ণমেণ্ট ভারতের বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্যে একমাত্র এই বিপ্লবান্দোলনকেই গ্রাহ্যের মধ্যে আনিতেন, তাই এই গভর্ণমেণ্টের যত কিছু বিষ এই বিপ্লবিদেরই উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা হইত। তাই

* সর্ব্ব স্বত্ব সংরক্ষিত।

পাঞ্জাবের বিপ্লবান্দোলন প্রকাশ হইয়া পড়িবার পরই ভারত-গভর্ণমেণ্ট ভারতের মঙ্গলের জন্য "ভারত-রক্ষা আইন"এর মত অতি কঠোর শাসনপ্রণালীর প্রবর্ত্তন করেন।

ইতিহাসে যাহা চিরদিন হইয়া আসিয়াছে ভারতের বেলাতেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। যখন কোনও পরাধীন জাতি জাগিতে আরম্ভ করে তখন সেই জাগরণকে ব্যর্থ করিবার জন্যই সকল দেশেই এইরূপ কঠোর শাসন-নীতির প্রবর্ত্তন হইয়া থাকে। কিন্তু জাতি যখন সত্যই জাগে তখন জগতের কোনও কঠোর নীতিই সেই জাগরণকে ব্যর্থ করিতে পারে না, বরং ঐরূপ কঠোর দমন-নীতির দ্বারা জাতির শক্তি পরীক্ষা হয় মাত্র। জাতি যদি সত্যই প্রাণবন্ত হয় ত' এই সকল কঠোরতা জাগরণের প্রতিবন্ধক না হইয়া সহায়ক স্বরূপই হইয়া পড়ে। তাই জাগরণের দিনে রাজকোপকে প্রকৃতপক্ষে কোপ না বলিয়া ভগবানেরই অনুগ্রহ বলিয়াই মনে করা উচিত। ভারতের বিপ্লবিরাও সত্যই কোন দিন এই সকল দমন নীতির জন্য ইংরাজকে দায়ী করেন নাই, বরং তাঁহারা এইরূপই মনে করিতেন যে, এই সকল কঠোরতার মধ্য দিয়াই ভগবান জাতিকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। তাঁহারা জানিতেন যে, পরাধীন জাতির স্বাধীনতা প্রয়াস এই সকল কঠোরতার মধ্য দিয়াই সার্থক হইয়াছে। এই সকল দমন নীতিই যে এক প্রকার milestones, কোন্ পরাধান জাতি স্বাধীনতা লাভের পথে কতখানি অগ্রসর হইয়াছে এই সকল দমন নীতিই যে তাহার পরিচায়ক, একথা ভারতীর বিপ্লববাদীরা বিশ্বাস করিতেন। এই বিশ্বাসভরেই তাঁহারা অশেষ দুঃখ লাঞ্ছনা অম্লানবদনে সহ্য করিতে পারিয়াছিলেন, প্রাণ বলিদানেই যে জাতির মধ্যে প্রাণের সঞ্চার হয় এই বিশ্বাসেই তাঁহারা প্রাণ বলি দিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন নাই।

Defence of India Actএর পত্তনের পর হইতে summary trials আরম্ভ হইয়া গেল। বারে বারে পাঞ্জাবে তিনটি ষড়যন্ত্র-মামলার বিচার হইল। প্রত্যেক মামলাতেই ৬০।৭০ জন করিয়া আসামী। এই সকল বিচারের ফলে পাঞ্জাবে এক দফায় ২৮ জনার ফাঁসি হইল, মিরাট পল্টনে ১১ জনার ফাঁসি হইল; সপ্তম রাজপুত সেনার মধ্যেও জন কয়েকের সম্ভবত দিল্লীতে ফাঁসি হইল। যাঁহাদের ফাঁসি হইল না তাঁহাদের প্রায় সকলকেই দ্বীপান্তরে যাইতে হইল। এইরূপ অবস্থার পরও পাঞ্জাবের অবশিষ্ট বিপ্লবিদের মধ্যে আবার বিপ্লবায়োজন চলিতে লাগিল। কয়েকটি আকালী দল এই সকল বন্দী বিপ্লবিদিগকে জেলমুক্ত করিবার জন্য মৎলব আঁটিতে লাগিলেন। আবার একদল শিখ অস্ত্র সংগ্রহের দিকে মন দিলেন। তখনকার দিনে বড় বড় রেলের ষ্টেশনে ও বড় বড় পুলের নীচে সশস্ত্র সিপাহির পাহারা থাকিত। একবার বিপ্লবিদের একটি ক্ষুদ্রদল, বোধহয় মাত্র ৭।৮ জনায় মিলিত হইয়া, অমৃতসরের পুলের সিপাহিদিগকে অতর্কিতে আক্রমণ করিলেন। সেখানে ১৫ জন সিপাহি, ১৫টি ম্যাগাজিন রাইফেল ও প্রায় ৭৫০ টোটা ছিল। এই ৭।৮ জন পিস্তলধারী বিপ্লবিরা ৭৫০ টোটা সমেত

১৫টি রাইফেলই ছিনাইয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু সে সময় দলের সেরূপ কোন বিধিব্যবস্থা না থাকায় অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই বন্দুকগুলি সমেত ৫ জনা বিপ্লবি ধরা পড়িয়া গেলেন। এই ৫ জনারই ফাঁসি হইল। ইহার পূর্ব্বেই ২৮ জনার ফাঁসি হইয়াছিল। ইঁহাদের ফাঁসির পরেও আবার কয়েকটি শিখ স্কুল-মাষ্টার মিলিত হইয়া এই বিপ্লবদলের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; সম্ভবত তাহার জের আজিও চলিতেছে। ডাঃ মথুরা সিং প্রমুখ কয়েক জনা বিপ্লবি ভারত ত্যাগ করিবার পর আফগানিস্থানের ভিতর দিয়া পারস্যে এবং মেসোপোটেমিয়ার ভারতীয় সেনাদলের মধ্যে বিপ্লববার্ত্তা প্রচার করিতে থাকেন। একবার ঘটনাক্রমে ডাঃ মথুরা সিং, ভারত ও আফগানিস্থানের সীমান্ত প্রদেশে ধরা পড়িয়া গেলেন। তাঁহারও ফাঁসি হইল। যাঁহারা এইরূপে ফাঁসি ও দ্বীপান্তর হইতে অব্যাহতি পাইলেন তাঁহাদের অনেককেই internment ভোগ করিতে হইল। সেই যুগে বাঙ্গলা ও পাঞ্জাবের মত এত internment আর কোনও দেশে হয় নাই; এবং দ্বীপান্তর ও ফাঁসি সেবার পাঞ্জাবেই আর সকল দেশের অপেক্ষা অনেক বেশী হইয়াছিল।

যুক্ত প্রদেশেও (U. P.) বারাণসী ষড়যন্ত্রমামলার মৈনপুরিকে কেন্দ্র করিয়া প্রায় বৎসরখানেকের মধ্যেই আবার একটি ক্ষুদ্র বিপ্লবদল গড়িয়া উঠে। এই বিপ্লবদলও প্রায় বৎসর দু'য়েকের মধ্যেই প্রকাশ হইয়া পড়ে। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলিয়া রাখিতে চাই যে, রুশিয়াতে প্রায় কোন বিপ্লবিই দুই মাসের অধিক কাল অপ্রকাশিতভাবে কাজ করিতে পারেন নাই। দুই মাসের মধ্যেই হয় তিনি রাজদ্বারে দণ্ডিত হইয়াছেন, নতুবা তাঁহাকে দেশ ছাড়িয়া বিদেশের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে; আর ভারতবর্ষে এ পর্য্যন্ত প্রায় দেখা গিয়াছে যে, এখানকার বিপ্লবিদের কার্য্যকলাপ ও তাঁহাদের পরিচয় দুই বৎসরের অধিক কাল গোপন থাকিতে পারে নাই।

বাঙ্গালাতে সে সময় ফাঁসি ও দ্বীপান্তর অপেক্ষা internmentই অধিক হইয়াছিল। এই internmentএর ফলে বাঙ্গালার বিপ্লব দল অনেকটা ভাঙ্গিয়া যায়; তখন এই বিপ্লবদল বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হইয়া দেশময় ছড়াইয়া পড়ে। সে সময় যদি বিপ্লবিদের হাতে উপযুক্ত পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র থাকিত ত' তাঁহারা সরকারের রাজ্য চালান ব্যাপার অসম্ভব করিয়া তুলিতে পারিতেন।

তখনও রাসবিহারী কাশীতেই ছিলেন। একদিন কেন্দ্র হইতে সংবাদ আসিল যে বাঙ্গলার প্রসিদ্ধ বিপ্লবনেতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে অজ্ঞাত বাসে থাকিতে হইবে, এবং তিনি কাশীতে আসিয়া থাকিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা পরামর্শ করিয়া দেখিলাম তাঁহাকে কাশীতে নিরাপদে রাখা তেমন শক্ত কথা নহে; কিন্তু আমরা ইহাও দেখিলাম কাশীর বাহিরে তাঁহার দলের ভুল ত্রুটির দরুণ কাশীতেও বিপদ আসিতে পারে। যে দলের প্রত্যেক বিধিব্যবস্থা নিজেদের আয়ত্তাধীনে আছে তাহার ভুল ত্রুটির জন্য দায়িত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে, এবং সে অবস্থায়

ভুলত্রুটি ধরা ও তাহা সংশোধন করাও নিজেদের সাধ্যের ভিতর। কিন্তু যে দলের বিধি ব্যবস্থার উপর নিজেদের কোন হাত নাই তাহার ভুল ত্রুটি ধরিবার সুযোগ কোথায়? বাঙ্গলার অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল যতীনবাবুর নেতৃত্বাধীনে সম্মিলিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তিনি পূর্ব্ব বাঙ্গালার অনুশীলন সমিতির সহিত কিংবা চন্দননগর অথবা রাসবিহারীদের সহিত সম্মিলিত হন নাই অথবা হইবার চেষ্টাও করেন নাই; রাসবিহারী জাপান যাইবার পূর্ব্বে ইঁহাদের সহিত দেখা করিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু যে কারণেই হউক তাঁহাদের সহিত দেখা করা ঘটিয়া উঠে নাই। সে যাহা হউক, যখন যতীন বাবুর কাশী আসার কথা ওঠে তখন আমরা সকলদিক ভাবিয়া দেখিয়া তাঁহাকে কাশীতে রাখিবার ভার লইতে স্বীকৃত হই, কিন্তু শেষে কি জানি কেন তিনি নিজেই কাশী না আসাই স্থির করেন।

সে সময়ও যতীনবাবু কলিকাতা ত্যাগ করিয়া যান নাই। একদিন তিনি তাঁহাদের পাথুরিয়া-ঘাটার একটি বাসাতে আসিয়াছিলেন। সেখানে আরও কতকগুলি ফেরারী বিপ্লবি ছিলেন। তখন সেই ঘরে ঘটনাক্রমে অল্পদিনের পরিচিত একজন লোক আসিয়া উপস্থিত হয়। এই লোকটিকে তাঁহারা গুপ্তচর বলিয়া সন্দেহ করিতেন, তাই ভাল করিয়া অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া দেখিবার পূর্ব্বেই বিপ্লবীদের মধ্যে একজন এই অল্পদিনের পরিচিত লোকটিকে দেখিবামাত্র তাহাকে গুলি করিয়া বসিলেন। যতীনবাবুকে সুবিধা পাইলে গভর্ণমেণ্ট নিশ্চয়ই ধরিয়া ফেলিত। যতীনবাবুকে বাঁচাইবার জন্যই সম্ভবত ঐ যুবকটি ঐরূপভাবে গুলি করিয়া বসেন। একথা সত্য যে যতীনবাবু গুলি করেন নাই, কিন্তু এই ব্যক্তি dying declarationএ যতীনবাবুর নামেই গুলি করার অভিযোগ লাগাইয়া দেয়। এইরূপেই যতীনবাবুর নামে ফাঁসীর পরওয়ানা ঝুলিতে থাকে। যখন সেই ব্যক্তিকে গুলিই করা হইল তখন আবার তাহাকে dying declaration দিবার সুযোগ দেওয়া কেন যে হইয়াছিল তাহা বলিতে পারিনা।

অগত্যা বাধ্য হইয়া যতীনবাবুকে স্থানান্তরে যাইতে হইল। যতীনবাবুর জন্য একটি নিরাপদ স্থান ঠিক হইল; সেখানে যাইবার সময় যতীন্দ্রনাথ তাঁহার সাথিদের বলিয়া বসিলেন, "যে পর্য্যন্ত আমি ভাল করে না বুঝব যে তোমরা আর সবাইকার জন্যও এইরূপ নিরাপদ স্থান ঠিক করে রেখেছ, যেরূপ আমার জন্য করা হয়েছে, সে পর্য্যন্ত আমি তোমাদের এ বন্দোবস্ত মানতে পারব না; আমরা সব নাম-কাটা সেপাই, প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুর আদেশ শুনিবার প্রতীক্ষায় আছি; সেইজন্যে সবাই একসঙ্গে থাকতে চাই, তাহলে একটা effective struggle করা যেতে পারবে, which will create a moral impression."

পরিশেষে তাঁর ইচ্ছানুরূপই ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাই তাঁহারা পাঁচজনা বালেশ্বরের সন্নিকটে একটি আড্ডা গাড়িয়া বসিলেন। এদিকে বিপ্লবান্দোলনও বন্ধ ছিল না। সেই বালেশ্বরে থাকিয়াও যতীনবাবু বিপ্লবকার্য্যের পরিচালনা করিতেছিলেন। যদি বিপ্লবিরা সেথায় পলাইয়া

পুনরায় বিপ্লবকার্য্যে মনোযোগ না দিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া কেবলমাত্র আত্মগোপনেই মন দিতেন তাহা হইলে বোধ হয় কোন বিপ্লবিই ধরা পড়িতেন না। বিপ্লবিরা আত্মগোপন করিয়াও সমানেই বিপ্লব কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন বলিয়াই তাঁহারা বারে বারে বিপদে পড়িয়াছিলেন। কিন্তু কেবল প্রাণ বাঁচানইত বিপ্লবিদের উদ্দেশ্য ছিলনা। জীবন যদি জীবনের কাজেই না লাগিল ত' জীবন লইয়া কি হইবে, এই ছিল বিপ্লবিদের ধারণা। ওদিকে পূর্ব্ব পরিচ্ছদে উল্লিখিত সেই ব্যাঙ্ককের উকিলটি যখন বিপ্লবায়োজনের সকল সংবাদ সরকারের নিকট প্রকাশ করিয়া দিল, তখন সেই সূত্রে কলিকাতায় আবার কিছু ধরপাকড় হইল। এই সূত্রেই আবার যতীন্দ্রনাথের আড্ডার সংবাদও পুলিশ পাইয়া গেল। যতীন্দ্রনাথও জানিতে পারিলেন যে, পুলিশ তাঁহাদের খোঁজ পাইয়াছে। তিনি ইচ্ছা করিলেই তখনই পলাইতে পারিতেন; কিন্তু তুচ্ছ প্রাণের ভয়ে যতীন্দ্রনাথ পলাইতে জানিতেন না। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যদি তাঁহাকে স্থানান্তরে যাইতে হয় তবুও তিনি নিজেদের সঙ্গীদিগকে ফেলিয়া পলাইতে নারাজ। তিনি তাঁহার সহচরদের জীবন ও নিজের জীবনে প্রভেদ দেখিতেন না। তাই ঠিক হইল সকলে এক সঙ্গেই যাইবেন। কিন্তু তাঁহার সহচরদের মধ্যে দুইজন তখন ১২ মাইল দূরে গভীর জঙ্গলে ছিলেন। তাঁহাদিগকে কিছুতেই ফেলিয়া যাওয়া হইবে না। যতীন্দ্রনাথ তাঁহার অপর দুইটি সঙ্গীকে লইয়া অন্ধকার রাত্রে পাহাড়ের পথে জঙ্গলের মধ্য দিয়া তাঁহার সঙ্গীদিগকে আনিতে ছুটিলেন। অপরিচিত রাস্তায় ১২ মাইল পথ হাঁটিয়া পুনরায় ১২ মাইল পথ আসিয়া অন্যস্থানে যাওয়া অসম্ভব ছিল। তবুও যতীন্দ্রনাথের হৃদয় অসম্ভব বলিয়া স্থির থাকিতে পারে নাই। অসাধ্যসাধনই তাঁহার জীবনের ব্রত—সেদিনও সেই অসাধ্যসাধনেই তিনি অগ্রসর হইলেন। ফিরিতে রাত্র অবসান হইয়া গেল। তখন বনের ধারে ধারে গ্রামের উপকণ্ঠে নদীর তীরে তীরে চৌকী বসিয়া গিয়াছে। কিন্তু এত আয়োজন সত্ত্বেও তিনি লোকালয়ে ঢুকিয়া বালেশ্বরের দিকে ছুটিয়া চলিলেন। তাঁহার সহিত চিত্তপ্রিয়, মনোরঞ্জন, নীরেন্দ্র ও জ্যোতিষ এই চারিটি যুবক ছিলেন। তখন সকাল হইয়া গিয়াছে; গ্রামের লোকদিগকে পুলিশ বুঝাইয়াছে যে, এক ভীষণ ডাকাতের দল তাহাদের দেশে লুকাইয়া আছে, ইহাদিগকে ধরিতে অথবা ধরাইয়া দিতে পারিলে যথেষ্ট পুরস্কার দেওয়া হইবে। গত দুইদিন যতীন্দ্রনাথের আহার নিদ্রা কিছুই হয় নাই। দিবা দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে তাঁহাদিগকে তখনও গ্রাম, নদ, নদী পার হইয়া চলিতে হইতেছে। পথে এক নদী পার হইবার সময় মাঝিকে বলা হইল যে সমস্ত দিন তাঁহাদের কিছু আহার হয় নাই, দুটি ভাত রাঁধিয়া দিলে তাঁহারা প্রাণে বাঁচেন। কিন্তু হিন্দু মাঝি তাহার জন্ম জন্মান্তরের সংস্কার রক্ষাতেই ব্যস্ত; ব্রাহ্মণের প্রাণ রক্ষা হউক আর নাই হউক, ব্রাহ্মণকে আহার করাইয়া সে নরকে যাইতে প্রস্তুত নহে; তাই সে নীচ জাত হইয়া ব্রাহ্মণদের কিছুতেই ভাত রাঁধিয়া দিতে পারে না, অতএব ভাত রাঁধিবার হাঁড়িও দিতে পারে না। এদিকে পুলিশও সন্ধান পাইল যে, যতীন্দ্রনাথ অমুক গ্রামের ভিতর দিয়া সরিয়া পড়িয়াছেন। যতীন্দ্রনাথের পশ্চাতে

পশ্চাতে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী ছুটিয়া চলিয়াছে। এই অঞ্চলে যদি বিপ্লবিদের organisation থাকিত তাহা হইলে এই বিপদেও তাঁহারা রক্ষা পাইতেন। কিন্তু এই organsation না থাকায় তাঁহাদিগকে ক্রমাগত গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পলাইতে হইয়াছিল। এইরূপে তাঁহারা সন্ধ্যার পর বালেশ্বরের সন্নিকটে এক জঙ্গলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট, জেলার Superintendent, armed police, search light ইত্যাদি skirmishএর সকল সরঞ্জাম সঙ্গে লইয়া যতীন্দ্রনাথের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছিলেন। যতীন্দ্রনাথরা আগে আগে চলিয়াছেন, আর পুলিশদল দুইভাগে বিভক্ত হইয়া জঙ্গলের দুইধারে search light ফেলিয়া ক্রমশঃ পরস্পরের সন্নিকটবর্ত্তী হইতে হইতে যতীন্দ্রনাথদের অনুসরণ করিতেছেন। এইরূপে জঙ্গল হইতে সরিয়া পড়া যতীন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব হইল না। আবার রাত্র ভোর হইল। এবার আর নিস্তার নাই। পুলিশ নিতান্তই সন্নিকটে। তখন যতীন্দ্রনাথের সাথীরা সজল নয়নে প্রার্থনা করিলেন—তাঁহারা মরেন মরুন, যতীন্দ্রনাথ ছদ্মবেশে স্থানান্তরে গমন করুন। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন। তিনি বলিলেন,—"লক্ষ্মী ভাই সব, মনে করিয়া দেখ, আমরা পিতামাতার স্নেহ কোল, স্ত্রীপুত্রের মায়া-বন্ধন, স্বজন বান্ধবের ভালবাসা, গৃহের সুখশান্তি, সবই ছাড়িয়া আসিয়াছি—একসঙ্গে কাজ করিব বলিয়া। এক্ষণে এই বিপদের সময় তাহার ব্যতিক্রম করিলে চলিবে কেন? মানুষ ত অমর নহে। একদিন না একদিন তাহাকে মরিতেই হইবে। তবে কাপুরুষের মত মরিয়া লাভ কি?" যুদ্ধ করাই স্থির হইল। একদিকে প্রায় সহস্রাধিক গ্রামবাসী ডাকাত ধরা হইতেছে মনে করিয়া সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর সহিত যোগ দিয়াছে, অপর দিকে মাত্র পাঁচ জন বিপ্লবি! তাঁহারা আবার জঙ্গল ছাড়িয়া গ্রামে আসিয়া পড়িলেন। অনাহারে, অনিদ্রায়, পথশ্রমে তাঁহারা সকলেই ক্লান্ত শ্রান্ত। এক পয়সার মুড়িমুড়কি কিনিয়া যে খাইবেন তাহারও উপায় নাই। ক্রমে দুইদলের সাক্ষাতের ফলে দুইদিকেই গুলি চলিল। পুলিশের দিকের একটি সাহেব বিপ্লবিদের দিকে একটু অধিক অগ্রসর হইয়াছিলেন এমন সময় চিত্তপ্রিয়ের গুলির আঘাতে তাঁহার টুপি শূন্যে উড়িয়া গেল। পুলিশ সাহেব আর অগ্রসর হইলেন না। বিপ্লবিরা অসমতল ভূমিতে শুইয়া পড়িয়া লক্ষ্য করিয়া করিয়া গুলি ছুড়িতে লাগিলেন। পুলিশের দিক হইতেও অবিশ্রান্ত গুলি বর্ষণ হইতে লাগিল। এইরূপে প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ক্লান্ত শ্রান্ত, ক্ষুৎপিপাসাতুর মাত্র জনকয়েক লোক আর কতক্ষণ যুদ্ধ করিতে পারে? বিপ্লবিদের গুলিও প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিল। বিপ্লবিরা সকলেই আহত হইয়াছিলেন। কিন্তু আহত অবস্থাতেও তাঁহারা আত্মসমর্পণ করেন নাই। ক্রমে একটি মারাত্মক গুলি আসিয়া চিত্তপ্রিয়কে অমর ধামে লইয়া গেল, আর সকলেও তখন ভীষণভাবে আহত। যতীন্দ্রনাথ তখন সাথীদের বলিলেন, "আর শক্তি ক্ষয় করিয়া লাভ নাই, চিত্তপ্রিয় গেল, আমিও বাঁচিবনা, তোমরা আর বৃথা প্রাণ দিও না, হয়ত তোমরা আবার ভবিষ্যতের কাজে লাগিতে পার।" সাথীরা কিন্তু লড়িয়া প্রাণ দিতে চাহে। যতীন্দ্রনাথও তাঁহাদের প্রাণ রক্ষা করিতে চান। অবশেষে

তাঁহারা যতীন্দ্রনাথের অশেষ অনুরোধে আত্মসমর্পণ করিলেন। অতিরিক্ত রক্তপাতে যতীন্দ্রনাথের দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, পিপাসায় তাঁহার কণ্ঠনালী শুষ্কপ্রায় হইয়াছিল। তিনি ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, "জল"। বালক মনোরঞ্জনের দেহ হইতে তখনও রক্তধারা ঝরিতেছিল। কিন্তু নেতার এই শেষ আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিবার জন্য সে তখনই নিকটের জলাশয় হইতে চাদর ভিজাইয়া জল আনিতে ছুটিল। এ দৃশ্যে পুলিশ সাহেবও বিচলিত হইয়াছিলেন। তিনি মনোরঞ্জনকে বসিতে বলিয়া অন্য পাত্রাভাবে নিজের টুপীতেই জল পূরিয়া মুমূর্ষুর মুখে ঢালিয়া দিতে লাগিলেন। জলপান করিয়া যতীন্দ্রনাথের মুখে কথা ফুটিল; তখন স্নিগ্ধ মধুর হাসি হাসিয়া তিনি সাহেবকে বলিলেন, "এ ব্যাপারে আমিই একমাত্র দায়ী, ইহারা আমার সাথীরা, আমার আদেশমাত্র পালন করিয়াছে।" যতীন্দ্রনাথ কটকের হাঁসপাতালে প্রাণত্যাগ করিলেন। মনোরঞ্জন ও নীরেন্দ্রের ফাঁসি হইল। জ্যোতিষের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের দণ্ড হইল। এই জ্যোতিষচন্দ্র বাঁচিয়া ছিলেন বলিয়া তাঁহার নিকট হইতে পাওয়া এই সকল সংবাদ আজ আমরা দেশবাসীকে দিতে সক্ষম হইতেছি। আণ্ডামানের জেলের নানারূপ নির্য্যাতন সহ্য করিতে না পারিয়া জ্যোতিষচন্দ্র সেখানেই পাগল হইয়া যান। এখন নাকি তিনি বহরমপুরের পাগলা গারদে অবস্থান করিতেছেন।

মৃত্যুর ক্রোড়ে অবস্থিত হইয়া কটকের ফাঁসি ঘরের অন্ধকার কোণ হইতে মনোরঞ্জন ও নীরেন্দ্র কলিকাতায় যে শেষ চিঠিখানি পাঠাইয়াছিলেন, সেই অতীতের স্বপ্নময় কাহিনী প্রকাশ করিতে বুকে কতই না স্পন্দন অনুভূত হইতেছে! তাঁরা লিখিয়াছিলেন,—

"চিত্তপ্রিয় ও দাদা চলিয়া গিয়াছেন, আমরাও চলিলাম। আশা করি আপনারা পূর্ব্বের ন্যায় কাজ চালাইবেন। ভগবান আপনাদিগকে সাফল্য দান করিবেন। আজ আমাদের জীবনের বিজয়া দশমী। বিদায়! বিদায়! যাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের ফিরিয়া পাইবার কোন উপায় নাই। কিন্তু জ্যোতিষের মুক্তির জন্য কি করা উচিত একমাত্র তাহার স্বদেশবাসীই তাহা নির্দ্ধারণ করিতে সক্ষম।"

এই চিঠি প্রসঙ্গে আরও একটি চিঠির কথা মনে পড়িল। তাঁরা জৈন ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও কর্ত্তব্যের খাতিরে দেশের মঙ্গলের জন্য সশস্ত্র বিপ্লববাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'নিমেজ'এ খুনের দায়ে তাঁহারাও যখন ফাঁসির ঘরে আবদ্ধ, তখন তাঁহারাও সেইরূপ জীবন মরণের সন্ধিস্থল হইতে তাঁহাদের বিপ্লবের সাথীদের নিকট যে পত্রটি পাঠাইয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম এইরূপ ছিল,—"ভাই, মরণেও ভীত নহি, আবার জীবনেও কোন সাধ নাই; ভগবান যখন যেখানে যেরূপ অবস্থায় রাখিবেন সেইরূপ অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকিব।" এই দুইটি যুবকের একজনের নাম মতিচাঁদ এবং অপরটির নাম হয় মাণিকচাঁদ অথবা জয়চাঁদ।

এই সকল বিপ্লবিদের মন এমন উঁচু সুরে বাঁধা ছিল যে, সাধু এবং ফকিরদের মধ্যেই সচরাচর এই রূপটি দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল বিপ্লবিদের যাঁহারা প্রতিপক্ষ সেই

ইংরাজেরাও অনেক সময় মুখ ফুটিয়া ইঁহাদের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। সে যুগের গোয়েন্দাবিভাগের সর্ব্বেসর্ব্বা, বর্ত্তমানে কলিকাতার পুলিশকমিশনার মিঃ টেগার্ট নাকি পরলোকগত লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার মিঃ জে, এন রায়কে যতীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলিয়াছিলেন, "Though I had to do my duties I have great admiration for him. He was the only Bengalee who died in an open fight from a trench." কিন্তু টেগার্ট সাহেব যে সময় কথাগুলি বলিয়াছিলেন তাহার পরে আরও অনেক বাঙ্গালী ঐরূপ oped fightএ জীবন বিসর্জ্জন দেন; তাহারও কতকটা পরিচয় পাঠকবর্গকে দিতেছি।

১৯১৫ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর যতীনবাবুরা প্রকাশ্য সংঘর্ষে প্রাণ দেন। কিন্তু ইহার পরও প্রায় ১৯১৮ সাল পর্য্যন্ত বিপ্লবিদের অস্তিত্বের পরিচয় বিশেষভাবেই পাওয়া গিয়াছিল। ১৯১৬ সালের শেষভাগে গোয়েন্দাবিভাগের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ইতিপূর্ব্বে দুইবার আশ্চর্য্যরূপে নিষ্কৃতি পাইয়া তৃতীয় বারের বেলায় বিপ্লবিদের হাতে প্রাণ দেন। ১৯১৭ সালে গৌহাটিতে বিপ্লবিদের সহিত পুলিশের খণ্ড যুদ্ধ (skirmish) হয়, এবং ১৯১৮ সালে ঢাকায় আবার পুলিশদের সহিত বিপ্লবিদের সশস্ত্র বিরোধ হয় ও এই সংঘর্ষের ফলে বিপ্লবিদের দুইজন হত হন। পাবনাতেও একটি ছোট খাট skirmish হয়; এ সব ছাড়া খুন ডাকাতি ত লাগিয়াই ছিল। এই সব সশস্ত্র দ্বন্দ্বের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় এখানে দিলাম;—সম্ভবত ১৯১৬ খৃঃ বিপ্লবদল হইতে বীরভূমের নলিনী বাক্‌চিকে ভাগলপুরের কলেজে পড়িতে পাঠান হয়, বিহার প্রদেশে বিপ্লববাদ প্রচার করিতে। কিছুদিনের মধ্যেই এই বাঙ্গালীর দিকে পুলিশের নজর পড়িল। নলিনী পড়া ছাড়িয়া ফেরারী হইলেন। নলিনী "জলপানী" পাওয়া ভাল ছেলে, কিন্তু জলপানীর ধার কে ধারে? নলিনী একেবারে খাঁটি বেহারী সাজিয়া বেহারের সহরে সহরে ঘুরিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে আবার পুলিশের দৃষ্টি পড়িল। নলিনী বাঙ্গলায় আসিলেন, তখন ১৯১৭ সাল, বাঙ্গলায় তখন ভাঙ্গা হাট—চারিদিকে ধরপাকড়, খানাতল্লাস, internment, deportation আর গুলি বর্ষণ। তাই তখন বাঙ্গলায় থাকা নিরাপদ নহে। বিপ্লবদল হইতে তখন সাব্যস্ত হইল, দলের ভাল ভাল কর্ম্মীদিগকে আসামের কোনও স্থানে 'reserve force' রূপে রাখা হইবে। তাই আসামের গৌহাটিতেই, নলিনী বাক্‌চি, নলিনী ঘোষ, নরেন বাঁড়ুয্যে ও আরও অনেকে আসিয়া আশ্রয় লইলেন। ঘুমাইবার সময় ইঁহাদের বিছানার তলায় গুলিভরা রিভলভার থাকিত ও তাঁহাদেরই মধ্যে একজন সতর্ক প্রহরীরূপে দুই ঘণ্টা অন্তর জানালার নিকট বসিয়া থাকিতেন। কলিকাতার পুলিশ কোন ধৃত বিপ্লববাদীর নিকট হইতে গৌহাটির সংবাদ পাইয়া ১৯১৭ সালের এই জানুয়ারীতে ঐ বাসা ঘেরাও করে। প্রহরী পুলিশ আসিতেছে দেখিয়া সকলকে জাগাইলেন, কিন্তু চুপি চুপি। রিভলভার ও পিস্তল হাতে লইয়া সবাই বাহিরে আসিয়াই পুলিশের উপর গুলি ছুড়িতে লাগিয়া গেলেন। পুলিশ এই হঠাৎ আক্রমণে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল এবং ইত্যবসরে

বিপ্লবিরাও পাহাড়ের দিকে সরিয়া পড়িলেন; কিন্তু বৈকালে অসংখ্য সশস্ত্র পুলিশ আসিয়া সমগ্র পাহাড়টি ঘেরিয়া ফেলিল; উভয় পক্ষেই গুলি চলিল, ফলে অনেকেই আহত হইয়া ধৃত হইলেন। ইঁহাদের মধ্যে মাত্র দুই জনা পুলিশের দৃষ্টি এড়াইয়া পলাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই দুই জনার মধ্যে একজন এই নলিনী। ছয়দিনের পথশ্রমের পর পাহাড় পার হইয়া নলিনী লামডিং ষ্টেশনে আসিয়া পঁহুছিলেন। সে যাওয়া কি সোজা! অনাহারে অনিদ্রায় দিনের পর দিন চড়াই উৎরাই ভাঙ্গিয়া হাঁটিতে হইয়াছিল। সর্ব্বদা পুলিশের দৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষা করিয়া, কখনও গাছে উঠিয়া কখনও বা পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ স্থানে আরোহণ করিয়া পাথরে শুইয়া রাত কাটিয়াছে। অবিশ্রাম দ্রুতগতিতে পাহাড়ের চড়াই উৎরাই চলিতে চলিতে হাত পায়ের তলদেশ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। শুধু কি এই চলারই বিপদ! একরকম পাহাড়ে' আঠাল পোকা নলিনীর মাথায় ও পিঠে লাগিয়া যায়, অনেক টানা টানিতেও তাহা উঠান যায় নাই। এই পোকার আক্রমণজনিত বিষ বেদনায় জর্জ্জরিত হইয়া নলিনী একেবারে অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়েন। যাহা হউক মরণের সহিত যুদ্ধ করিয়া আসামের পুলিশের হাত এড়াইয়া নলিনী বিহারে আসেন। কিন্তু সেখানে থাকা তখন নিরাপদ নহে দেখিয়া আবার তিনি বাঙ্গলায় চলিয়া আসেন। হাওড়া ষ্টেশনে নামিয়া যাঁহাদের দেখিবার আশা করিয়াছিলেন তাঁহাদের কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। সঙ্গে একটি রিভলভার। কোথায় যাইবেন? একপক্ষাধিককাল অনিদ্রা, অনিয়ম ও অনাহারে শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, বিষাক্ত পার্ব্বত্য পোকা তখনও মাথায় ও দেহে লাগিয়াই রহিয়াছে। নলিনী হাওড়াতেই প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইলেন। অগত্যা নিরুপায় হইয়া তিনি গড়ের মাঠের এক গাছতলায় শুইয়া পড়িলেন। নলিনী মৃতবৎ দিন ও রাত্রি সেই খানেই পড়িয়া রহিলেন। পরের দিন দৈবযোগে তাঁহার এক পরিচিত বিপ্লবি নলিনীকে দেখিতে পাইলেন। নলিনীর সর্ব্বাঙ্গে তখন বসন্তের চিহ্ন দেখা দিয়াছে। কলিকাতায় বিপ্লবিদের অবস্থা তখন নিতান্তই শোচনীয়, প্রায় সকল বিপ্লবিই তখন ধরা পড়িয়াছেন। টাকা পয়সা তখন কাহারও হাতে নাই। দুই চারিজন যাঁহারা অবশিষ্ট ছিলেন তাঁহারাই তখনও ক্ষীণ আশায় এদিক ওদিক ঘুরিয়া ফিরিতেছেন। কলিকাতার এক ক্ষুদ্র কুঠরিতে তাঁহাকে রাখা হইল। বসন্তে তাঁহার চোখ মুখ ঢাকিয়া গেল, জিহ্বা অচল। তিন দিন কথা বন্ধই রহিল। এইরূপে অর্থাভাবে, বিনা চিকিৎসায়, দিন কাটিতে থাকিল। ঐ বাসায় তখন একজন মাত্র বিপ্লববাদী আত্মগোপন করিয়া আছেন। মৃতদেহ সৎকার করিবার লোকও যে কেমন করিয়া জুটিবে জানা নাই। ১৯১৮ সালে বিপ্লবিদের অবস্থা এমনই শোচনীয় হইয়াছিল। নলিনী কিন্তু এ বসন্তেও মরিলেন না। মরণ আরও মহনীয়রূপে দেখা দিবার জন্য তখনও ঢাকায় অপেক্ষা করিতেছিল। নলিনী ভাল হইয়া নির্ব্বাণোন্মুখ বিপ্লবিদের ভার লইয়া আবার ঢাকায় আসিয়া বসিলেন। নলিনী ও তারিণী মজুমদার এক বাসাতেই থাকেন। ১৯১৮ সালের ১৫ই জুন ভোরবেলা পুলিশ আবার নলিনীর বাসা ঘিরিয়া ফেলিল। আবার দুই

দিকেই গুলি চলিল। তারিণীর অঙ্গে বিস্তর গুলি লাগায় তাঁহার মৃতদেহ সেইখানেই পড়িয়া রহিল। নলিনী গুলি খাইয়াও বাহির হইবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু আবার বন্দুকের গুলিতে আহত হইয়া তাঁহার দেহও ভুলুণ্ঠিত হইল।

বিপ্লববাদী নলিনী আহত অবস্থায় হাঁসপাতালে শায়িত—পুলিশ নাম ধাম লইতে ব্যগ্র—dying declaration, মৃত্যুকালীন জবানবন্দী, চাহে।

মৃত্যুশয্যাশায়ী আহত বিপ্লববাদী অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়া আসন্নমৃত্যুর অপেক্ষায় আছেন। এমন সময় সাধারণ ব্যক্তি আত্মগোপন করিতে পারে না, বরং ইচ্ছা হয় তাহার কার্য্যাবলী দেশবাসী সম্যক বুঝুক। যাহাদের জন্য সে মরিয়াছে তাহারা জানুক, কেমন করিয়া সে পরের জন্য প্রাণপাত করিয়া গেল, এইরূপ ইচ্ছাই সাধারণ মানুষের হয়। কিন্তু বিপ্লববাদীদের আত্মগোপন ভঙ্গি সাধারণ নহে। শিক্ষা ও সাধনা ভিন্ন তেমন আত্মগোপন সামর্থ্য আসে না। মৃত্যুর সময়েও ইচ্ছা নাই, কেহ তাঁহাকে জানুক, কেহ তাঁহার "মূল্য" বুঝুক—কোন Message নাই,—"unwept, unhonoured, unsung"ই সে যাইতে চাহে!—তাই মৃত্যুশয্যাশায়ী বিপ্লববাদীর ক্ষীণকণ্ঠ হইতে উত্তর বাহির হইল, "Don't disturb please, let me die peacefully, বিরক্ত কোরো না ভাই, এখন শান্তিতে মরতে দাও।"

পুলিশ নানাভাবে কথা বাহির করিবার চেষ্টা করিল,—বলিল নামটি বল,—বাড়ী কোথায়? কিন্তু তাঁহার সেই একই উত্তর, don't disturb please, let me die peacefully, অনুগ্রহ করে আর গোলমাল কোরো না ভাই, শান্তিতে মরতে দাও।

এমন করিয়া যাঁহারা মরণকে মহিমময় করিয়া তুলিতে পারেন, এমন করিয়া যাঁহারা আত্মগোপন করিতে শিখিয়াছেন তাঁহাদের কথা দেশবাসী একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? ইঁহারা জীবনের সকল আশা ভরসা অপূর্ণ রাখিয়া সংসার হইতে একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছেন, প্রতিষ্ঠার একবিন্দু কামনাও রাখেন নাই। মৃত্যুর দ্বারে গিয়া, যেখানে প্রকাশের ভয় নাই সেখানেও খ্যাতিকে প্রত্যাখ্যান করিয়া শান্তিতে মরিয়াছেন। ইঁহারা নিজের কর্ম্মে নিজেই তৃপ্ত হইয়াছেন বলিয়া কোনও কিছুর অপেক্ষা না রাখিয়াই শান্তিতে মরিতে চাহিয়াছেন। জগতে আর চাওয়ার কিছুই নাই, কেবল দেওয়ারই ইঁহারা মালিক।

এই সকল বিপ্লবিদের যে কি বলিয়া অভিহিত করিব জানি না; হয়ত ইঁহারা পাগল ছিলেন; না হয়ত ইঁহারা বিভ্রান্ত নির্ব্বোধ বালক ছিলেন; কারণ আমাদের এই দুর্ভাগাদেশের অভিজ্ঞ নেতারা ও রাজনীতিবিশারদ বিচক্ষণ পণ্ডিতেরা ইঁহাদিগকে এইরূপই বলিয়া থাকেন।

এই বিপ্লবিদের সর্ব্বাপেক্ষা বড় দোষ বোধ হয় এই ছিল যে, ইঁহারা স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। মাসের পর মাস ও বৎসরের পর বৎসর বিপ্লবের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াও ইঁহারা কেবল এক বিরাট ব্যর্থতাই অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন!

যে পথের শেষ পরিণাম কেবল ব্যর্থতা সে পথ কি ভ্রান্ত নহে? এ ব্যর্থতার কি কোনও মূল্য আছে? ভারতের অভিজ্ঞ নেতারা ও বিচক্ষণ সমালোচকেরা বিপ্লবিদের এইরূপই প্রশ্ন সচরাচর করিয়া থাকেন।

ব্যর্থতার একটা দিকই আমাদের লক্ষ্যে পতিত হয়; কিন্তু এই ব্যর্থতার আড়ালে জগতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ যে কেমন করিয়া আত্মগোপন করিয়া থাকে, বিফলতার মধ্য দিয়াই যে কেমন করিয়া শক্তির সঞ্চার হইতে হইতে একদিন এই ব্যর্থতার মধ্য দিয়াই সার্থকতা আসিয়া দেখা দেয়, বিফলতার, পরাজয়ের নিরাশা বেদনাপূর্ণ অবসাদের সময় এই সকল কথা আমরা অনেকেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। সকল সমাজে সকল সময়েই বিপ্লবিরা সমাজের বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞদের বিচারে উপহসিত ও লাঞ্ছিত হইয়াছেন; তাহার কারণ এই যে, প্রায় সকল দেশের সকল বিপ্লবিদেরই প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে আর সমাজের বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞেরা এই ব্যর্থতার দিকেই লক্ষ্য রাখিয়া সকল বিষয় বিচার করিয়া থাকেন। সেইরূপ ভারতের বিপ্লববাদীরাও বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞদের মধ্যে ভ্রান্ত পথের যাত্রী। আবার এই সমালোচকদের মধ্যে যিনি খুবই প্রবীণ ও বিচক্ষণ তিনি এই বিপ্লবিদের "idiots" বলিতেও সঙ্কুচিত হন নাই। ভারতের এই লব্ধপ্রতিষ্ঠ, বিচক্ষণ "Modern Review" পত্রিকার সম্পাদক বিপ্লবিদের লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে যদি ভারতে জনকয়েকও সশস্ত্র বিপ্লববাদী থাকেন ত' ভারতবাসীকে নিশ্চয়ই নিজের বুদ্ধি বিবেচনায় সন্দিহান হইতে হইবে।

বিপ্লবিদের সহিত সমালোচকদের প্রভেদ এই যে, বিপ্লবিরা নিজেদের আদর্শে অশেষ শ্রদ্ধা সম্পন্ন, তাই তাঁহারা অদ্ভুত নিষ্ঠা সহকারে নিজেদের আদর্শানুযায়ী পথে জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, আর এই সমালোচকগণ সুখাসনে সমাসীন হইয়া সমালোচনা করাকেই জীবনের পেশা করিয়া ফেলিয়াছেন; অনেকের নিকট এই সমালোচনা করাই জীবিকা অর্জ্জনের প্রধান অবলম্বন স্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে। জীবিকা অর্জ্জন করিতে হইলে অনেক হিসাব করিয়া চলিতে হয়; কিন্তু এই হিসাব করিয়া চলিলে সকল সময় সত্যের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা হয়ত সম্ভব হয় না। এ সব ছাড়া বিপ্লবিদের সহিত এই সকল সমালোচকদের আরও একটি বড় প্রভেদ আছে; বিপ্লবিদের নিকট যাহা "Faith" স্বরূপ, সমালোচকদের নিকট তাহা মাত্র "opinion," এই "opinion" প্রায়ই সফলতার মোহ অতিক্রম করিতে পারে না; তাই ফলাফলের উপর নির্ভর করিয়াই অধিকাংশ সময় "opinion" গঠিত হয়। কিন্তু যাঁহারা ইতিহাসে স্রষ্টার আসন গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা এই "opinion"-এর ধার ধারেন না, তাঁহারা নিষ্ঠাবান ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তি। বিফলতা তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধাভ্রষ্ট করিতে পারে না বলিয়াই ইতিহাসে তাঁহারা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকেন, তাই এই শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তিরাই জগতে স্থায়ী কিছু করিয়া যাইতে সক্ষম হন।

ভারতের বিপ্লববাদীরাও এইরূপ শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। ভারতের এই বিপ্লবিদের লক্ষ্য করিয়াই বিখ্যাত আইনব্যবসায়ী ব্যারিষ্টার নর্টন সাহেব একদিন বলিয়াছিলেন "এই সকল বিপ্লবিরা স্বীয় অভিষ্ট সাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই বলিয়াই আজ তাঁহারা রাজদ্বারে অপরাধী, কিন্তু যদি তাঁহারা নিজেদের উদ্দেশ্যকে সফল করিয়া তুলিতে পারিতেন তাহা হইলে আবার ইঁহারাই জগতে স্বদেশভক্ত বীর সাধক বলিয়া পূজিত হইতেন।"

ভারতীয় বিপ্লবিরা যে পথে গিয়াছিলেন সেই পথেই ভারতের মুক্তি হইবে কি না কে বলিতে পারে? হয়ত তাঁহারা ভুল পথেই গিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের সহিত আমাদের মতের মিল হয় না বলিয়াই ত' তাঁহাদিগকে "idiot" বলা উচিত নহে। জানি না জগৎ সভায় ভারতবাসীর মান ইজ্জত এই বিপ্লবিদের দ্বারাই রক্ষা পাইয়াছে কি না, অথবা এই বিপ্লবিদের বিরুদ্ধ সমালোচকদের যুক্তির ধারে ভারত জগৎবাসীর নিকট সমুচিত সম্মান পাইয়াছে কিনা! তবে এ কথা জানি যে গত ৬০ বৎসর যাবৎ যখন রুশবিপ্লববাদীদের সকল প্রয়াসই নিষ্ফল হইয়াছিল, প্রবল প্রতাপান্বিত অষ্ট্রিয়ার রাজশক্তির বিরুদ্ধে যখন ইটালির মুষ্টিমেয় বিপ্লববাদী প্রথম মস্তক উত্তোলন করিয়াছিলেন, তখন ঐ সব দেশের বিপ্লববাদীদেরও এইরূপেই বিদ্রূপ ও গালি সহ্য করিতে হইয়াছিল। ৬০ বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর, নানান বাধা ও ব্যর্থতার মধ্য দিয়া, সারা জগতের উপেক্ষা ও প্রতিকূলতা সহ্য করিয়া আজ রুশবিপ্লববাদীদের আশা সফল হইতে চলিয়াছে। প্রায় ৪০ বৎসরেরর দ্বন্দ্বের ফলে, কত ত্যাগ, কত নির্য্যাতন, কত অশান্তির মধ্য দিয়া ইটালির স্বাধীনতা অর্জ্জিত হইয়াছিল। কিন্তু যাঁহারা এই মুক্তি পথের প্রথম যাত্রী ছিলেন তাঁহাদিগকে, তাঁহাদের প্রথম বিপ্লবচেষ্টার ব্যর্থতার দিনে কত গঞ্জনাই না সহ্য করিতে হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে আইরিশ বীরের সেই চিরস্মরণীয় কথাগুলি মনে পড়ে,—"Any man who tells you that an act of armed resistance—even it offered by ten men only—even it offered by men armed with stones—any man who tells you that such an act of resistance is premature, imprudent, or dangerous, any and every such man should be at once spurned and spat at. For, remark you this and recollect it that somewhere and somehow and by somebody a beginning must be made and that the first act of resistance is always and must be ever premarure, imprudent and dangerous."

আমি আমার সাধ্যমত এই বিপ্লবিদের একটি সঙ্ক্ষিপ্ত ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু ইতিহাসের প্রাণ হইল 'judgment'। এই judgment ব্যতিরেকে

ইতিহাস মাত্র ঘটনাপঞ্জী (chronicle of events) হইয়া পড়ে। তাই আমি সময় সময় ঘটনা ছাড়াও আরও অনেক কথার অবতারণা করিয়াছি। আর বিপ্লবিদের প্রশংসা করিয়াছি বলিয়া একথা যেন কেহ না মনে করেন যে, এইরূপে আমি বিপ্লববাদ প্রচার করিতেছি। আমি বলিতে চাই যে, তাঁহাদের সহিত আমাদের মতভেদ থাকা সত্ত্বেও তাঁহাদের চরিত্রবলকে আমরা অগ্রাহ্য করিতে পারি না। কাহারও সহিত মতভেদ থাকিলেই যে তাঁহাদের ঘৃণা করিতে হইবে অথবা তাঁহাদিগকে গাল মন্দ করিতে হইবে এরূপ ত বাঞ্ছনীয় নহে; এবং এই বিপ্লবিদের প্রতিপক্ষ ইংরাজ রাজ-পুরুষেরাও ইঁহাদের চরিত্রের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়াছেন বলিয়া ত' আর তাঁহারা সত্য সত্যই বিপ্লববাদী হইয়া পড়েন নাই।

ইতিহাস লিখিতে বসিয়াছি, তাই ভারতীয় বিপ্লবিদের ভারতবাসীরা কি চক্ষে দেখিতেন, কেন সেরূপ দেখিতেন, এবং তাঁহাদিগকে কিরূপ চক্ষে দেখা উচিত, আমি সেই সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়াছি। বিপ্লবিরা সত্যই পাগলামি করিয়াছিলেন কিনা, তা জানি না; তবে তাঁহাদের পাগলামির কথা শুনিয়া রবিবাবুর একটি কবিতার কয়েকটি পদ মনে পড়িতেছে;—

"কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ
জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস!
সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো
পাগল ওগো ধরায় আস!" *

ক্রমশঃ

শ্রীশচীন্দ্রনাথ সান্যাল

* এই অধ্যায়ের কোন কোন অংশ নলিনীবাবুর "বিপ্লববাদ," আত্মশক্তিতে প্রকাশিত গেপেন্দ্রনাথ রায়ের একটি প্রবন্ধ ও শঙ্খে প্রকাশিত নলিনীবাক্‌চির কথা হইতে গৃহীত।—লেখক।

"মেবার-পতন"-এর গান *

[রচনা——————স্বর্গীয় মহাত্মা দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এম্‌-এ]

(নবম গীত)

রাজকন্যা মানসী।

মিশ্র সিন্ধু——————যৎ।

কত ভাল বাসি তায়——বলা হোল না।
বড় খেদ মনে র'য়ে গেল——বলা হোল না।
হৃদয়ে বহিল ঝড়, বাষ্প রোধিল স্বর;
মনের কথা মনে র'য়ে গেল——বলা হোল না।
যদি ফুটিল না মুখ——কেন ভাঙিলি না বুক——
খুলে দেখালিনে প্রাণ——বলা হোল না।

[স্বরলিপি——————শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা]

	২´		৩		০		১		
II	মমা	-পধা	পধপধণা		ণা	ণণা	-র্সা	ধর্সণধা	-পমগরসা	I
	কত	••	ভা••••		ল	বাসি	•	তা•••	••••য়	
	২´		৩		০		১		
I	সঃ	সাঃ	ররগা		-রগমপা	পা	-া	-া	-া	I
	ব	লা	হোল•		••••	না	•	•	•	
	২´		৩		০		১		
I	ণণা	ণা	-পমা		মমা	মমপণা	-র্সর্রর্রা	র্সর্সা	-ণপমা	I
	ব ড়	খে	•দ্‌		মনে	রয়ে••	••গে	ল •	•••	

* "মেবার-পতন"-এর গানের স্বরলিপি 'বঙ্গবাণী'র প্রতি সংখ্যায় ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইবে, এবং নাটকান্তর্গত গানগুলি অভিনয়কালে যে সুরে ও তালে গীত হইয়া থাকে, অবিকল সেই সুরের ও তালের অনুসরণ করা হইবে।

I	মমা	পপণা | গা	-ণা | মমজ্ঞা	জ্ঞজ্ঞমা | রা	-ণা	I
	বলা	হোল• না	• বলা•	হোল• না		•
II	গণা	ণর্সর্রা | -র্রর্রা	র্রর্রা | -ণা	র্রা | -ণা		I
	হৃদ	য়ে•• •ব	হি ল •	ঝ ড়্		•
I	র্রর্রা	জ্ঞর্রা | -র্রঃ -র্সা	র্সঃ | র্রা	র্রা | -র্মা	র্মর্মা	I
	বাষ্	প • •	রো ধি	ল •	স্ব র্	
I	জ্ঞর্জ্ঞা	-র্পর্মা | র্মা	জ্ঞর্জ্ঞা | র্রঃ র্রা	-র্সর্রঃ | -ণর্সর্রা	র্রর্রা	I
	মনে	র্ক থা	ম নে র য়ে	•• •••	গে ল	
I	র্সঃ	র্সাঃ | ণণা	-র্সা | ধা	-ণা | -ণা		I
	ব	লা হোল	• না	• •		•
I	মঃ	মাঃ | পপা	-র্রা | র্রা	-ণা | -ণা		I
	ব	লা হোল	• না	• •		•
I	মঃ	মাঃ | জ্ঞঃ জ্ঞা	-মঃ | রা	-ণা | -ণা		II
	ব	লা হো ল	• না	• •		•
II	মা	মা | মা	মা | মমা	-পধা | ধা	-ণা	I
	ব	দি ফু	টি লনা	•• মূ		•

I	-ণা	মমা | মপা	-ধধা | ধধণা	-পধণা | ণা	-ণা	I
	খ্	কেন ভাঃ	•ঙি লিনা•	••• বু	•	
I	-ণা	ণণা | ণণা	-র্রা | র্সঃ	র্রাঃ | র্রা	-ণা	I
	কৃ	খুলে দেখা	• লি	নে প্রা	ণ্	
I	র্রঃ	র্রাঃ | র্রর্সা	-র্জ্ঞা | জ্ঞর্রা	-ণা | -ণা		I
	ব	লা হোল	•• না	• • •	•	
I	মঃ	মাঃ | পপা	-র্সা | র্সা	-ণা | -ণা	-ণা	I
	ব	লা হোল	• না	• •	•	
I	মঃ	মাঃ | জ্ঞজ্ঞা	-মা | রা	-ণা | -ণা		II II
	ব	লা হোল	• না	• •	•	

দ্রষ্টব্য।—ইহা সমপদী 'ষৎ'—তাল্। কতকটা আট্‌মাত্রা বিশিষ্ট কাওয়ালীর মত। প্রভেদ এই যে, 'ষৎ'-এর্ সম্ বিষম পদের দ্বিতীয় মাত্রার স্থায়ীত্বের উপর পড়ে, আর কাওয়ালীতে প্রায় প্রতি বর্ণের উপর তাল্ পড়ে। সমপদী 'ষৎ'-এর্ ঠেকা :—

I	ধা	ধিন্ | ধাগে	তিন্ | না	তিন্ | ধাগে	ধিন্ I

———লেখিকা।

অকালী শিখ্‌দিগের ইতিহাস

বর্ত্তমান অকালী আন্দোলনের সময়ে, অকালীদিগের সাহস বীরত্ব ও সংযম দেখিয়া অনেকেই বিস্মিত হইয়াছেন। কিন্তু অকালীদিগের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে উক্ত সদ্‌গুণগুলি তাঁহাদের বহু শতাব্দীর সাধনার ফল। ইঁহাদের ধারাবাহিক ইতিহাস কোথাও পাওয়া যায় না—আমরা নানা গ্রন্থ হইতে ইঁহাদের বিবরণ ও ইতিহাস যতদূর পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা পাঠকগণের সমীপে উপস্থিত করিলাম।

ইঁহাদের নামের নিরুক্তি লইয়া নানারূপ মতভেদ দেখা যায়। ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, অকাল অর্থাৎ মৃত্যুরহিত সনাতন পুরুষের উপাসক বলিয়া ইঁহাদের নাম অকালী হইয়াছে। মুসলমানগণ যেমন "আল্লা হো আকবর" শব্দে নিস্তব্ধ গগনমণ্ডল কাঁপাইয়া তুলেন, পাশ্চাত্যগণ যেমন "হিপ হিপ হুররে" আনন্দধ্বনি করিয়া হৃদয়ে উত্তেজনার সঞ্চার করেন, তেমনি শিখ সম্প্রদায়ও "সৎশ্রী অকাল" শব্দ করিয়া এক গম্ভীর ভাবের সৃজন করিতেন। এইরূপ অকাল উপাসনা সমগ্র শিখজাতির মধ্যেই প্রচলিত আছে, সুতরাং তাহা যে ধর্ম্মের একটি শাখা সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যের দ্যোতক বলিয়া তাহাদের নাম অকালী হইয়াছে ইহা মনে হয় না। তবে গুরু গোবিন্দ সিংহ এই অকালী সম্প্রদায়কে বিশেষভাবে শিখধর্ম্মের রক্ষার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া ইঁহারা অকাল পুরুষের বিশেষ সেবকরূপে অকালী নাম ধারণ করিতে পারেন। প্রয়াগের তিলক বিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদেব বিদ্যার্থী তাঁহার "অকালী যোঁ কা ইতিহাস" নামক পুস্তিকায় লিখিয়াছেন যে, অকালশব্দের অর্থ অমর—যাহার কিছুতেই মৃত্যু হয় না। ইঁহারা গুরু গোবিন্দ সিংহের নেতৃত্বাধীনে বহু যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন—যুদ্ধ করিয়া যাঁহারা জীবিত ছিলেন তাঁহারা এবং যুদ্ধে যাঁহারা হত হইয়াছিলেন তাঁহারাও অমরকীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের সমুদায় সম্প্রদায়ের নাম অকালী হইয়াছে।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে যখন সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া এক নবজীবনের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল, তখন বাবা নানক শিখধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন। যে পাঞ্জাব একদিন আর্য্যজাতির সামগানে মুখরিত হইত, যেখান হইতে জ্ঞানের আলোক দূর দূরান্তরে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, সেই পাঞ্জাব বাবা নানকের অব্যবহিত পূর্ব্ব সময়ে ঘোর তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। নানক শিখধর্ম্মের স্থাপন করিয়া পাঞ্জাবে নব জাগরণের সূচনা করেন।

রোমানজাতি যেমন তাহাদের চরিত্রের অসাধারণ কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও আদেশানুবর্ত্তিতার বলে জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারিয়াছিল—তেমনি শিখজাতি তাঁহাদের গুরুগণের নিকট কর্ত্তব্যনিষ্ঠা শিক্ষা করিয়া ভারত ইতিহাসে অমরকীর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। গুরু নানক যে

শান্তিপ্রিয় ধর্ম্মপ্রাণ সম্প্রদায় স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা অধিক দিন নিরুপদ্রবে ধর্ম্মচর্চ্চা করিবার সুযোগ পায় নাই।

মোগল সম্রাটগণ তাঁহাদিগকে যেরূপ কঠোরভাবে নির্য্যাতন করিতে আরম্ভ করিলেন তাহাতে তাঁহাদিগকে আত্মরক্ষার জন্য বাধ্য হইয়া অস্ত্রধারণ করিতে হইল। ধর্ম্মান্ধ ঔরংজেব যখন পাঞ্জাবের এই নবজাগ্রত শক্তিকে সমূলে বিনাশ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন, তখন-শিখজাতি সৌভাগ্যক্রমে এক প্রতিভাশালী মহান্ নেতার পরিচালনাধীনে আসিয়াছিল। ভারতবর্ষের সপ্তদশ শতাব্দীর ইতিহাসের সর্ব্বাপেক্ষা ভাস্বরমূর্ত্তি হইতেছেন এই নেতা গুরু গোবিন্দ সিংহ। মোগল সম্রাটের বিরাট কাহিনীর সহিত ক্ষুদ্র শিখজাতি যাহাতে সমভাবে যুদ্ধ করিয়া নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারে, তজ্জন্য গুরু গোবিন্দ সমগ্রজাতিকে নূতনভাবে সামরিক জীবনে দীক্ষিত করিলেন। নানক হইতে আরম্ভ করিয়া নবম গুরু তেজ-বাহাদুর পর্য্যন্ত সকলেই শিখদিগকে সংযম আত্মত্যাগ ও কর্ত্তব্য নিষ্ঠার মন্ত্রে অনুপ্রাণিত করিয়া আসিতেছিলেন। সুতরাং গুরু গোবিন্দের পক্ষে একটী ধর্ম্মপ্রাণ জাতিকে যুদ্ধজীবী করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই—যোদ্ধার সকল গুণই তাঁহাদের মধ্যে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হইয়াছিল। আবার গুরু যে ইঁহাদিগকে যুদ্ধজীবী করিলেন তাহাও কোন জাগতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য নহে।

তিনি তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিলেন যে ধর্ম্মের জন্য জীবনের সুখ স্পৃহা, গৃহসংসার এ সব ত্যাগ করিতে হইবে—এমন কি প্রয়োজন হইলে যথার্থ শিখ—সিংহতুল্য যাহার অন্তরে বল—সে কখনও মৃত্যুকে সাদরে আলিঙ্গন করিতেও পশ্চাৎপদ হইবে না। গুরুর এই শিক্ষা সমগ্র শিখজাতির মধ্যে যেন বৈদ্যুতিক প্রভাবের এক নূতন ভাবের সাড়া আনিয়া দিল। তাহারা নবভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ঔরংজেবের বিরুদ্ধে স্পর্দ্ধার সহিত দণ্ডায়মান হইল এবং মোগল সম্রাট শতচেষ্টা করিয়াও তাহাদিগকে কোনরূপ শাস্তি দিতে পারিলেন না।

গুরু গোবিন্দের ত্যাগের মন্ত্রের সাধনকে যে সম্প্রদায় বিশেষভাবে জীবনের একমাত্র ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিলেন তাঁহাদেরই নাম হইল অকালী সম্প্রদায়।

১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে গুরু গোবিন্দ তখৎ-অকাল-বাঙ্গা নামক অমৃতসরের সুপ্রসিদ্ধ মন্দির স্থাপন করেন।—(Macanliffe). এই মন্দিরের বারান্দায় গুরু গোবিন্দের অস্ত্রশস্ত্র রক্ষিত আছে। অকালীরা ঐ স্থানে উপবেশন করিয়া ঐ মন্দির রক্ষা করিয়া থাকেন। "তখৎ-অকাল-বাঙ্গা" এই মন্দির গুরু গোবিন্দ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিতা, এবং তথায় অকালী শিখদের উপর মন্দির রক্ষার ভার দেখিয়া মনে হয় যে গুরু গোবিন্দই অকালী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। ঐতিহাসিক কানিংহাম বলেন যে গুরু গোবিন্দ শিখদিগকে গৃহ সুখাদি বিসর্জ্জন দিয়া সৈনিক জীবন ও ত্যাগ মন্ত্র গ্রহণ করিতে বলিলেও তিনি বা অন্য কোন গুরুই তাহাদিগকে উদাসীন হইতে বলেন নাই। সুতরাং অকালীরা যখন সংসার ত্যাগ করিয়াছে তখন তাহারা গুরু গোবিন্দের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইতে

পারে না। তিনি আরও বলেন যে গুরু গোবিন্দের কোন লেখাতেও তিনি অকালী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা একথা পাওয়া যায় না। এরূপ Argumentum ad silentioর উপর নির্ভর করিয়া কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না বলিয়া আমাদের মনে হয়। এরূপ স্থলে শিখ জাতির মধ্যে প্রচলিত গুরু প্রণালীকেই আমরা বেশী প্রামাণ্য মনে করিয়া গুরু গোবিন্দকেই অকালী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বলিতে চাই। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে ম্যালকম্ যে শিখজাতির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহাতেও তিনি গুরু গোবিন্দকে অকালী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদেব বিদ্যার্থীও বলেন যে হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে যেমন ব্রাহ্মণের উপর জাতীয় ধর্ম্মানুষ্ঠানের ও ক্ষত্রিয়ের উপর জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার ভার ন্যস্ত ছিল তদ্রূপ গুরু গোবিন্দও দুইটী নবসম্প্রদায় স্থাপন করিয়া ঐ দুই কাজ তাঁহাদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। যাঁহারা বারাণসীতে গমন করিয়া সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া জাতির মধ্যে ধর্ম্মব্যাখ্যা করিবার ভার লইলেন তাঁহারা হইলেন নির্ম্মল সম্প্রদায়। আর যাঁহারা তাঁহাদের উন্মুক্ত কৃপাণের সাহায্যে বিধর্ম্মীর আক্রমণ হইতে নিজেদের ধর্ম্মকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিলেন তাঁহাদের নাম হইল অকালী সম্প্রদায়। কিন্তু এই স্থলে এই কর্ম্ম বিভাগের একটু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিতে হইবে। হিন্দুধর্ম্মে যেমন ব্রাহ্মণেরাই প্রধান—শিখধর্ম্মে নির্ম্মল সম্প্রদায় সম্মানার্হ হইলেও তদ্রূপ প্রধান স্থানীয় নহেন। অকালীরাই তাঁহাদের ত্যাগ ও নিষ্ঠার জন্য সমগ্র জাতির শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য পাইয়া আসিয়াছেন। এ কথা পরে আরও পরিস্ফুট করিয়া বলা হইবে।

আধুনিক অকালী আন্দোলনের হেতু বুঝিতে হইলে শিখজাতির সম্প্রদায় বিভাগ সম্বন্ধে এ স্থলে দুই একটী কথা বলা প্রয়োজন। বাবা নানকের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র চন্দন দাস উদাসী সম্প্রদায় নামে ননকানা সহরে একটী নূতন সম্প্রদায় স্থাপন করেন। ননকানা সহরে নানক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ স্থানকে উদাসীরা পরম পবিত্র তীর্থ বলিয়া মনে করেন—কিন্তু সাধারণ শিখেরা ননকানা সহরকে শিখ ধর্ম্মের কেন্দ্র স্থান বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না। চন্দন দাসের এই সম্প্রদায় নানকের পরবর্ত্তী গুরু অঙ্গদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন নাই—তাঁহারা চন্দনেরই মতানুবর্ত্তী থাকিলেন; এ জন্য তৃতীয় গুরু অমরদাস এই ঘোষণা করিলেন যে, উদাসী সম্প্রদায় ধর্ম্মে শিথিল—অতএব তাঁহাদের সহিত সাধারণ শিখগণের কোন সংশ্রব রাখা বাঞ্ছনীয় নহে। আর তিনি শিখদিগকে উদাসাদের ননকানা সহরের গুরুদ্বার প্রবন্ধে হস্তক্ষেপ করিতে বারণ করিলেন। বর্ত্তমান সময়ে এই গুরুদ্বার প্রবন্ধ লইয়াই অকালী আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে।

গুরুগোবিন্দ সিংহ দেখিলেন যে তাঁহার শিখ জাতি যথাক্রমে দশজন গুরুর নেতৃত্বাধীনে জীবন যাপন করিয়া অনেক সদ্‌গুণ অর্জ্জন করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে যদি তিনি আত্মনির্ভরতার ভাব এখন ফুটাইয়া তুলিতে পারেন, তবেই একটী যথার্থ জাতি গঠিত হইতে পারে। তিনি স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন যে যতদিন একটী জাতি কোন ব্যক্তি বিশেষের অঙ্গুলি সঙ্কেতে সমস্ত কার্য্য নিষ্পন্ন

করে, ততদিন সে জাতির শৈশবভাব অতিক্রান্ত হয় না। সে জাতির জীবনে পূর্ণ বিকাশ আনিতে হইলে তাহার সকলের উপর সমষ্টিগত ভাবে পরিচালনার দায়িত্ব দিতে হইবে। এইজন্য তিনি যথার্থ গণতন্ত্রনীতি প্রণোদিত হইয়া স্থির করিলেন যে তাঁহার পর আর কেহ শিখ জাতির গুরু পদবীতে আরোহণ করিবেন না। শিখ জাতি সাধারণ সভা আহ্বান করিয়া তাঁহাদের জাতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। এইরূপ মহাসভার নাম হইল গুরুমৎ। জাতীয় জীবনের পক্ষে বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচনা করিবার জন্য এই মহা সভা আহূত হইত। অকালী শিখেরাই এই মহা সভা আহ্বান ও পরিচালনা করিবার ভার পাইলেন। তাঁহাদের নিষ্ঠা ও স্বার্থত্যাগ এই সম্মানের পদের উপযুক্ততা তাঁহাদিগকে প্রদান করিয়াছিল। অন্যান্য সম্প্রদায় ও বড় বড় মিছিলের সর্দ্দারগণের পরিবর্ত্তে অকালীগণ যে শিখ জাতির মহা সভা আহ্বানের ভার পাইলেন ইহা হইতে বুঝা যায় যে গুরুগোবিন্দ ইঁহাদিগকে বিশেষ প্রীতি ও স্নেহের চক্ষে দেখিতেন।

১৮১২ খৃষ্টাব্দে ম্যালকম্ সাহেব শিখদিগের যে বিবরণ মুদ্রিত করিয়াছিলেন তাহাতে এই গুরু মতের একটি সুন্দর বর্ণনা আছে। সভায় সমবেত হইয়া প্রথমেই সকলে মিলিয়া প্রার্থনা করিতেন। পরে পরস্পরের প্রতি যদি কোন হিংসা বিদ্বেষের ভাব থাকে, তবে তাহা ভগবানের নাম করিয়া তাঁহারা তৎকালে ত্যাগ করিতেন। ভ্রাতৃভাবপ্রণোদিত হইয়া জাতীয় কার্য্য নিষ্পন্ন করিবেন ইহাই ছিল এরূপ প্রার্থনার উদ্দেশ্য। সভা আরম্ভ করিবার সময়েই অকালীরা একটি বেদীতে মাখন চিনি ও ময়দা দ্বারা প্রস্তুত একরূপ পিষ্টক রাখিয়া বস্ত্র দ্বারা তাহা আবৃত করিয়া দিতেন।

বেদীর উপর শিখদিগের পূজনীয় আদি গ্রন্থ প্রভৃতি সজ্জিত করিয়া রাখা হইত। প্রথম প্রার্থনা শেষ হইবার পরে আচ্ছাদন উন্মুক্ত করিয়া বেদীর উপরিস্থিত পিষ্টকগুলি নিম্নে আনয়ন করা হইত। সেগুলি তৎপরে সমবেত সভ্যবৃন্দের মধ্যে সমভাগে বিভক্ত করিয়া দেওয়া হইত এবং সভা মধ্যেই সকলে তাহা আহার করিতেন। তাহার পর অকালীগণ বলিয়া উঠিতেন—"সর্দ্দারগণ! এইটি গুরুমৎ, সর্দ্দারগণ এইটি গুরুমৎ"—এইরূপে কার্য্য আরম্ভ করিবার জন্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার পর পুনরায় সকলে মিলিয়া প্রার্থনা করিতেন। জাতীয় জীবনের সমস্যা সমাধানে ভগবানের প্রেরণার যে অত্যন্ত আবশ্যক তাহা এইরূপ বারংবার প্রার্থনার দ্বারা স্বীকার করা হইত। আর এইরূপে চিত্ত নির্ম্মল হওয়ায় জাতীয় কার্য্য আলোচনার পক্ষেও সুবিধা হইত। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে যখন ব্রিটিশ সৈন্য হোলকারের অনুসরণার্থ পাঞ্জাবে পদার্পণ করে, তখন শেষ গুরুমৎ আহূত হইয়াছিল। কানিংহাম এই গুরুমৎকে Theocratic feudal confideracy নামে অভিহিত করিয়াছেন। ধর্ম্মের উপর এই সভা প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ইহার নাম Theocratic আর সর্দ্দারগণই ইহাতে বেশীর ভাগ যোগদান করিয়া কার্য্যাদি পরিচালনা করিতেন বলিয়া ইহাকে অনেকটা feudal বলা চলিতে পারে। তবে শিখগণ কোনদিনই ইউরোপীয় মধ্য যুগের কৃষকগণের ন্যায় জমীদার বা সর্দ্দারদিগের হস্তে আত্মসমর্পণ করেন নাই।

গুরুগোবিন্দের পরে বান্দা যখন শিখ ধর্ম্মের মধ্যে নানা রকম অভিনব মত প্রচার করিতে লাগিলেন তখন অকালীগণ তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন।

ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ বলেন যে গুরুগোবিন্দ সিংহের মৃত্যুর পর হইতে অকালীগণ পাঞ্জাবে যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করিতেন। তাঁহাদের ভয়ে শিখ সর্দ্দারগণ পর্য্যন্ত সন্ত্রস্ত থাকিতেন। যে সর্দ্দার অকালীদিগের বিরক্তিভাজন হইতেন তাঁহার পক্ষে অমৃতসরে পদার্পণ করা অসাধ্য হইত। শুধু তাহাই নহে তাঁহার দলস্থ লোকেরা পর্য্যন্ত সময়ে সময়ে তাঁহার প্রতি এজন্য বিদ্রোহী হইয়া উঠিত। কারণ তাহারা যখন অমৃতসরে উপাসনা করিতে আসিত তখন অকালীরা তাহাদিগকে তাহাদের নাস্তিক সর্দ্দারের অধীনতা ত্যাগ না করিলে পুণ্য হইবেনা ইহাই শিক্ষা দিত। এই বিবরণ হইতে শিখ জাতির উপর অকালীদের প্রভাব কিরূপ ছিল তাহা জানিতে পারা যায়। যদি অকালীরা কেবলমাত্র পরদ্রব্য লুণ্ঠনকারী অত্যাচারপরায়ণ দস্যু হইতেন তবে একটী জাতির উপর তাঁহাদের এরূপ প্রভাব কখনই থাকিত না। ইংরাজ ঐতিহাসিকেরাও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে তাঁহাদের রবিন্ হুডের ন্যায় অকালী সর্দ্দার ফুলাসিংহ ধনীর ধন লুণ্ঠন করিয়া দরিদ্রদিগকে ভরণপোষণ করিতেন। দরিদ্রদিগের প্রতি ফুলাসিংহের অকৃত্রিম স্নেহ ছিল। যখন দেশ মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র না থাকে, তখন সময় সময় রাষ্ট্রের শাসনকার্য্য ক্ষমতাশালী ব্যক্তিবিশেষের হস্তে যাওয়া প্রয়োজন হইয়া পড়ে। অকালীরা ধর্ম্ম জগতের নেতা বলিয়া বোধহয় তাঁহারা প্রজানির্য্যাতক ধনীদিগের ধন বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া দীন দরিদ্রদিগকে প্রদান করিতেন।

যাহা হউক ইংরাজ ঐতিহাসিকগণের বিবরণ হইতেই জানা যায় যে ইংরাজ জাতির প্রতি অকালীদের বিশেষ বিদ্বেষভাব ছিল। ইংরাজ দেখিলেই অকালীরা তাঁহার উপর অত্যাচার করিত। ভারতবর্ষের গবর্ণরজেনারল লর্ড অ্যকল্যণ্ডের মিলিটারি সেক্রেটারী অনারেবল ডব্লিউ, জি, ওজবর্ণ তাহার Court and Camp of Ransit Singh নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে তিনি ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জুন তারিখে সান্ধ্য ভ্রমণের সময় একদল অকালীর হাতে পড়িয়া যৎপরোনাস্তি নির্য্যাতিত হইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে "(he) had to endure the usual quality of abuse aud blackguardism they make a point of so lavishly distributing to every one they meet."

ইংরাজদিগের প্রতি যখন অকালীদের এতদূর বিদ্বেষ ছিল তখন ইংরাজগণও যে তাহাদিগকে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখিবেন না তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। ওজবর্ণ সাহেব অকালীদের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা উদ্ধার করিয়া দিলে কিরূপভাবে ইংরাজেরা অকালীদের দেখিতেন তাহা বুঝা যাইবে। তিনি বলিয়াছেন "They are, without any exception, the most worthless race of people in all India. They are religious fanatics and acknowledge no ruler and no laws but their own; think nothing

of robbery or even murder, should they happen to be in the humour for it. They move about constantly armed to the teeth, and it is not an uncommon thing to see them riding about with a drawn sword in each hand, two more in their belt, a match-lock at their back, and 3 or 4 pair of quoits fastened round their turbans"

ইহার ভাবার্থ এই যে অকালীরা সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে সকল জাতি অপেক্ষা উদ্ধত এবং নিকৃষ্ট জাতি। ইহারা ধর্ম্মোন্মত্ত স্বেচ্ছাচারী। ইহারা আইন কানুন কিছুই মানেনা। ইহাদের ইচ্ছামতন ইহারা দস্যুতা এমন কি হত্যাকার্য্য পর্য্যন্ত করিয়া থাকে। ইহারা সর্ব্বদাই সশস্ত্র হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে। প্রায়ই দেখা যায় যে অকালীরা দুইহাতে দুইখানি উন্মুক্ত তরবারী ধারণ করিয়া, ও কটিবন্ধে আর দুইখানি তরবারী রাখিয়া ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রে বিভূষিত হইয়া অশ্বারোহণে কোথাও যাইতেছে।

এরূপভাবে ওজবর্ণের পূর্ব্বে আর একজন ইংরাজও অকালীদের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার নাম ক্যাপটেন স্যার অ্যালেকজাণ্ডার বার্ণেস। ইনি ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাবে ভ্রমণ করিতে গমন করেন। তাঁহার Travels into Bokhara নামক গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন যে তিনি ১৩ই তারিখে শুনিতে পাইলেন যে একদল অকালী একখানি গ্রাম আগুন দিয়া পুড়াইয়া দিয়াছে। নেহাল সিং নামক একজন অকালী সর্দ্দার তাহার সহিত দেখা করিতে চাহেন। কিন্তু তাঁহার অকালী দেখিবার ইচ্ছা মনে খুব প্রবল হইলেও, কার্য্যতঃ তিনি ভয়ে সাক্ষাৎ করিতে সাহসী হইলেন না। ইনি পরে অন্যান্য সাহেবদের নিকট ইহাদের বর্ণনা শুনিয়া লিখিয়াছেন যে "They evince no greater hostility to those of another creed than to a Sikh, and would appear to be at war with mankind." ফলতঃ ইংরাজগণ অকালীদিগকে সমগ্র মানব জাতির শত্রু বলিয়াই স্থির করিয়াছেন।

রণজিৎ সিংহ যখন শিখ জাতিকে একতাসূত্রে বন্ধন করিয়া এক মহাজাতি গঠন করিবার সঙ্কল্প করিলেন তখন তিনি অকালীদিগকে নিজের পক্ষভুক্ত করিয়া লইবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইলেন। অকালীদের শৌর্য্যবীর্য্যের খ্যাতি তাঁহার মনকে আকৃষ্ট করিয়াছিল; আর তিনি ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে অকালিগণ যদি তাঁহার সহিত যোগদান না করে তবে শিখ জাতির উপর তাঁহার আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে না—কারণ ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ যাহাই বলুন না কেন অকালিগণই তখন শিখ ধর্ম্মের নেতা। সুতরাং রণজিৎ সিংহ অকালীদের নেতা ফুলা সিংহকে বহু উপঢৌকন দিয়া ও আদর করিয়া নিজের দলে আনিতে চেষ্টা করিলে।

এই ফুলা সিংহের সহিত রণজিতের প্রথম সাক্ষাৎকার এক কৌতুকাবহ ব্যাপার। আরমাইকেল স্মিথ নামক ঐতিহাসিক তাঁহার ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত Reigning families

of Lahore গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে যখন মেটকাফের সৈন্যদল অমৃতসরে গমন করে তখন ফুলা সিংহ অকালীদের অগ্রণী হইয়া তাহাদের আক্রমণ করেন। বিদেশী বিধর্ম্মীরা যে শিখদিগের পবিত্র নগরে আসিয়া উৎপাত করিবে ইহা অকালীনেতা ফুলাসিংহ সহ্য করিতে পারিলেন না। ইহার পরে তিনি রণজিৎ সিংহের রাজসভায় যাইয়া ঐ বিদেশীদিগকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। আরও বলিলেন যে, বিদেশীরা বিনানুমতিতে অমৃতসরে আসিয়া শিখদিগের শান্তি ভঙ্গ করিতে চায় সুতরাং তাদের বিশেষরূপে শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন। রণজিৎ সিংহ ফুলা সিংহের ধর্ম্মপ্রাণতা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু তিনি ছিলেন রাজনীতি-বিশারদ নৃপতি। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, প্রবল ব্রিটিশ শক্তির সহিত শিখগণ যদি সংগ্রামক্ষেত্রে যুদ্ধ অভিলাষী হয় তবে তাহারা অচিরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। সুতরাং তিনি ফুলা সিংহকে বুঝাইয়া উপঢৌকন সহ বিদায় দিলেন। ফুলা সিংহ তখন নিজেই তিন চারি শত যোদ্ধা অনুচর সংগ্রহ করিয়া বিদেশীর হাত হইতে দেশ রক্ষার ভার লইলেন। এই জন্যই বোধহয় তিনি সর্দ্দারগণের নিকট হইতে জোর করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতেছিলেন। শীঘ্রই তাঁহার দলে চারি পাঁচ সহস্র অকালী দোগদান করিল। কার্ম্মাইকেল স্মিথ বলেন যে, তাঁহারা দেশ মধ্যে নানারূপ উপদ্রব করিতে লাগিলেন। রণজিৎ সিংহ অকালীদিগকে দমন করিবার জন্য এক অভিযান প্রেরণ করেন; কিন্তু তাহা কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারে নাই। পরে অকালীরা রণজিৎ সিংহের নিকট হইতেও টাকা দাবী করিলেন, রণজিৎ সে দাবী পূরণ করিলেন এবং উপরন্তু তাহাদিগকে জায়গীর দিয়া শান্ত করিতে প্রয়াস পাইলেন। অকালিগণ মহারাজ রণজিৎ সিংহের নিকট এরূপ সদ্ব্যবহার পাইয়া মুগ্ধ হইলেন এবং শীঘ্রই তাঁহার সৈন্যদল-ভুক্ত হইলেন।

এইরূপে অকালিগণ রণজিৎ সিংহের পক্ষভুক্ত হইলেও তিনি তাহাদের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। কাপ্তেন বার্ণেস ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে দেখিয়াছেন যে, অকালীদের আক্রমণ হইতে তাঁহার রাজ্য রক্ষার জন্য কয়েকটী প্রধান প্রধান খেয়া ঘাটে তিনি সৈন্য নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। যাহা হউক অকালীরা কিন্তু রণজিতের কার্য্যে তাহাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছিল। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ফুলাসিংহের নেতৃত্বে অকালীগণ মহারাজ রণজিৎ সিংহের জন্য কাশ্মীর জয় করিয়া দেয়। পরে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে আফগানদিগের সহিত তেরার যুদ্ধে যখন মহারাজ রণজিতের সৈন্যদল হার মানিয়া পশ্চাৎপদ হইতেছিল, যখন মহারাজের নিজের জীবন পর্য্যন্ত যুদ্ধ-ক্ষেত্রে বিপন্ন হইয়াছিল, তখন অকালী নেতা ফুলাসিংহ তাঁহার ক্ষুদ্রদলকে অদ্ভুত বীরত্বের সহিত পরিচালনা করিয়া শিখদিগের জয়লাভের পথ পরিষ্কার করিয়া দিলেন। মহারাজ রণজিৎ সিংহ এইরূপে ফুলাসিংহের শৌর্য্যবলে যুদ্ধ জিতিলেন বটে, কিন্তু জন্মের মতন ফুলাসিংহকে হারাইলেন। কাবুল নদীর উপরে ফুজুফঞ্জি নামক স্থানে ফুলাসিংহ এবং তাঁহার বীরসহচরগণের সমাধি আছে।

প্রতি বৎসর সেখানে হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে সকলে যাইয়া সেই বীর অকালিগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া আসেন।

মহারাজ রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর অকালিগণ শিখধর্ম্ম রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া সৈন্য পরিচালনা ভার নিজেদের উপর লইলেন। আর তাঁহারা নিজেদের মধ্যে পঞ্চায়তী প্রথাদ্বারা সাম্রাজ্য পরিচালনা করিবেন ইহাও স্থির করিলেন। অকালী সেনাদিগের সুদৃঢ় সংগঠন দেখিয়া রাজকর্ম্মচারিগণ শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা নানারূপ ষড়যন্ত্র করিয়া অকালীদিগের ক্ষমতা যাহাতে বর্দ্ধিত না হয় তাহার ব্যবস্থা করিলেন। পরে কিরূপে শিখরাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হইল তাহা ইতিহাস পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন।

শিখজাতি বিশেষতঃ অকালিগণ বিশ্বাস করেন যে, দুই ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণের ষড়যন্ত্রের ফলে শিখগণ তাহাদের স্বাধীনতা হারায়। এইজন্য এই সময় হইতে শিখগণের মধ্যে ব্রাহ্মণবিদ্বেষ অত্যন্ত প্রবল হয়। এই ব্রাহ্মণবিদ্বেষের সহিত পরবর্ত্তী অকালী আন্দোলনের কি সম্বন্ধ, মহারাজ রণজিতের পর অকালি সম্প্রদায়ের কিরূপে অবনতি হইয়াছিল ও বিংশ শতাব্দীর অকালী শব্দ কিরূপে এক নব অর্থে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে তাহা আগামীবারে পাঠকগণ সমীপে নিবেদন করিব।

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার

নমস্কার

(গান)

গানের তরী বেয়ে তুমি
এলে সাগর পারে,
নাম্‌লে হেথা আজকে আমার
বিজন বনের ধারে।
তমাল বনে শাখে শাখে
ফুল ফুটেছে থরে থরে ;
গন্ধ পাগল উদাস হাওয়া
থমকে দাঁড়ায় পথের পরে।

ছায়ায় ঘেরা পাতার ফাঁকে,
বিরামবিহীন বিহগ ডাকে,
অঙ্গে আজি পুলক মেখে
তোমার অভিসারে।
পেয়ে তোমার সুরের আলো,
হৃদয় আমার পথ হারাল,
অই চরণে লুটিয়ে রল
একটী নমস্কারে।

শ্রীমতী সুধাময়ী দেবী

---

* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ সরকার মহাশয়দ্বয় প্রবন্ধের উপকরণসংগ্রহ বিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন।

বহুবাজারের প্রাচীন নাট্যসমাজ।*

বঙ্গীয় রঙ্গালয়ের 'অবৈতনিক' অভিনয়ের যুগের একটি কীর্ত্তিময় প্রতিষ্ঠানের কথা আজ বলিব। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বের "বহুবাজার অবৈতনিক নাট্যসমাজের" কথা বোধ হয় অনেকেই জানেন না।

কলিকাতায় 'সাধারণ' রঙ্গালয় স্থাপিত হইবার অনতিকাল পূর্ব্বে যখন পাইকপাড়ার রাজারা ও পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবংশীয়গণ বাঙ্গালায় অবৈতনিক অভিনয়ের স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন, সেই সময় কলিকাতা বহুবাজারে একটি "অবৈনতিক নাট্যসমাজ" প্রতিষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা ৺চুনিলাল বসু ও ৺বলদেব ধর। ১৮৬৫খ্রীঃ পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরবাটিতে "মালবিকাগ্নিমিত্রের" যে অভিনয় হয় ঐ অভিনয়ে চুনিলাল ও বলদেব যোগদান করিয়াছিলেন। তখনও বহুবাজারে নাট্যশালা স্থাপিত হয় নাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা, N. Ganguly ও জানকী ঘোষাল মহাশয়ের চেষ্টায় চুনিলাল বসু ও বলদেব ধর ঠাকুর বাটির অভিনয়ে যোগদান করেন। পাথুরিয়াঘাটার অন্যান্য অভিনয়ে ইঁহারা উভয়ে নানা ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতেন। চুনিলাল প্রধানতঃ স্ত্রী-চরিত্র গ্রহণ করিতেন। এইরূপে ঠাকুরদিগের সহিত ইঁহাদের ঘনিষ্ঠতা বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ১৮৬৭ খ্রীঃ, ৫ই জানুয়ারী গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাটিতে যখন 'নবনাটক' অভিনীত হয় সেই সময় কেবলমাত্র বিশিষ্ট দর্শকগণের নিমিত্ত টিকিট বিতরিত হইত। ইঁহারাও ঐ টিকিটে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। কিন্তু অভিনয়স্থলে যাইতে কিছু বিলম্ব হওয়ায় স্থানাভাব-বশতঃ তাঁহাদিগকে ফিরিয়া আসিতে হয়। ঠাকুরদিগের সহিত এত ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও যখন তাঁহারা অভিনয় দর্শন করিতে পাইলেন না, তখন ঘোর অভিমানে তাঁহারা নিজ পল্লী-মধ্যে একটি নাট্যশালা স্থাপন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন।

কিন্তু নূতন নাটক সহজে পাওয়া গেল না। অনুসন্ধান করিতে করিতে বলদেব ধরের শ্বশুর মহাশয়ের নিকট হইতে সংবাদ পাওয়া গেল যে, মনোমোহন বসু নামে তাঁহার এক বন্ধু আছেন, তিনি 'কবি', 'হাফ্‌আখড়াই' প্রভৃতি তৎকালের সঙ্গীত-সংগ্রামে অতি উৎকৃষ্ট গীত রচনা করেন। অতএব নূতন নাটকের জন্য মনোমোহন বাবুর নিকট যাওয়াই স্থির হইল। প্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক নাট্যামোদী ব্রাহ্মণ তখন বহুবাজারে বাস করিতেন। তিনিও মনোমোহন বাবুর একজন বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন এবং চুনিলাল ও বলদেবকে এ বিষয় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহারা তিন জনে মনোমোহন বাবুর নিকট উপস্থিত হইয়া একটি নূতন নাটকের জন্য অনুরোধ করিয়া বসিলেন। মনোমোহন বাবুও নাটক দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন।

* বহুবাজার 'অবৈতনিক নাট্যসমাজের' অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ৺বলদেব ধরের নিকট হইতে এই প্রবন্ধের অধিকাংশ উপাদান প্রাপ্ত হই। আজ প্রায় একমাস হইল তাঁহার দেহত্যাগ হইয়াছে। তাঁহার আত্মীয় শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ ধরও অনেক বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন।

অতঃপর তাঁহারা রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মাণে মনোনিবেশ করিলেন। বসুদিগের মাতুল ৺গোবিন্দ চন্দ্র সরকার অভিনয়ের জন্য তাঁহার বাটির প্রাঙ্গণটি স্বেচ্ছায় তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন এবং তাঁহার ভ্রাতা ৺গোপাল চন্দ্র সরকারও তাঁহার নিজ বৈঠকখানা মহলার জন্য ব্যবহার করিতে দিলেন। ক্রমে মনোমোহন বাবুর 'রামাভিষেক'-নাটক রচনা শেষ হইয়া গেল, সম্প্রদায়ও মহলা সুরু করিয়া দিলেন। প্রতিবেশী পটুয়া ঈশ্বরচন্দ্র ও তস্য ভাগিনেয় মধুর উপর দৃশ্যপট অঙ্কনের ভার অর্পিত হইল। যথাসময়ে গোবিন্দ চন্দ্র সরকারের বিশ্বনাথ মতিলাল লেনস্থিত ভবনে (অধুনা ৩নং গোবিন্দ সরকারের লেন) রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হইল। সে সময় বহুবাজারের বসু ও ধর বংশীয়গণ নিতান্ত ধনহীন ছিলেন না। পাথুরিয়াঘাটার রাজা বা ঠাকুর বংশীয়গণের ন্যায় ধনশালী

'সতী-নাটক'—১ম অঙ্ক, ১ম দৃশ্য।

না হইলেও তাঁহারা এই অভিনয়ে যে বিপুল অর্থব্যয় হইত তাহাতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন নাই। সহরের ধনী ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে, এমন কি সম্ভ্রান্ত ইংরাজগণকেও, বিনামূল্যে টিকিট বিতরিত হইত এবং সকলে দলে দলে অভিনয় দেখিতে আসিতেন। অভিনয় রাত্রে দর্শকদিগকে পান, তামাক ও জলযোগে আপ্যায়িত করা হইত। ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট হইতে নাট্যশালায় যাইতে সমস্ত পথটি (অর্থাৎ হৃদয়রাম ব্যানার্জ্জির লেন ও বিশ্বনাথ মতিলাল লেন) কুসুম-মালায় ও কারুকার্য্য-সম্বলিত তোরণে সজ্জিত করা হইত। এইরূপে প্রতি শনিবারে অভিনয় রজনীতে পথটি অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিত। ১৮৬৮ খ্রীঃ ৺শারদীয় পূজার পরবর্ত্তী শনিবারে বহুবাজার অবৈতনিক নাট্যসমাজ মনোমোহন বসুর 'রামাভিষেক' নাটক লইয়া প্রথম অভিনয় আরম্ভ করেন এবং এই অভিনয়

সমস্ত শীতকাল ধরিয়া চলিয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ ক্ষেত্র গোস্বামী কর্ত্তৃক শিক্ষিত চন্দ্রধাড়া, পার্ব্বতী দাস প্রভৃতির তত্ত্বাবধানে ঐক্যতান বাদন হইত এবং অভিনয়কালে সুকণ্ঠ 'বেহারী বোষ্টম' নাটকান্তর্গত যাবতীয় গীত নেপথ্য হইতে গাহিতেন। 'রামাভিষেক' নাটকের ভূমিকা লইয়া নিম্নলিখিত অভিনেতৃগণ প্রথম বহুবাজার রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন :—

পুরুষগণ।

দশরথ—অম্বিকা বন্দ্যোপাধ্যায়।
রাম—উমাচরণ ঘোষ (রাজপুরের)।
লক্ষ্মণ—বলদেব ধর।
বশিষ্ঠ—হৃদয় বন্দ্যোপাধ্যায়।
সুমন্ত্র—প্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
বিদূষক—মতিলাল বসু।
বন্দিদ্বয়—বিহারী দাস ও কু[illegible] খুরিয়াঘ।
রাজদূত—কালী হালদার।
নট—নন্দলাল ধর।

স্ত্রীগণ।

কৌশল্যা—চুনিলাল বসু।
সুমিত্রা—চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
সীতা—আশুতোষ চক্রবর্ত্তী (শিবপুরের)।
উর্ম্মিলা—বিহারী ধর।
মন্থরা—ক্ষেত্রমোহন দে।
নটী—নন্দ ঘোষ।

শীতের অবসানে রঙ্গমঞ্চ লইয়া একটু গণ্ডগোলের সূত্রপাত হয়। এই সময় ৺গোবিন্দচন্দ্র সরকার তাঁহার বাটীর অল্পাধিক সংস্কার করিতে ইচ্ছুক হওয়ায় সম্প্রদায়কে তাঁহার প্রাঙ্গণটি ছাড়িয়া

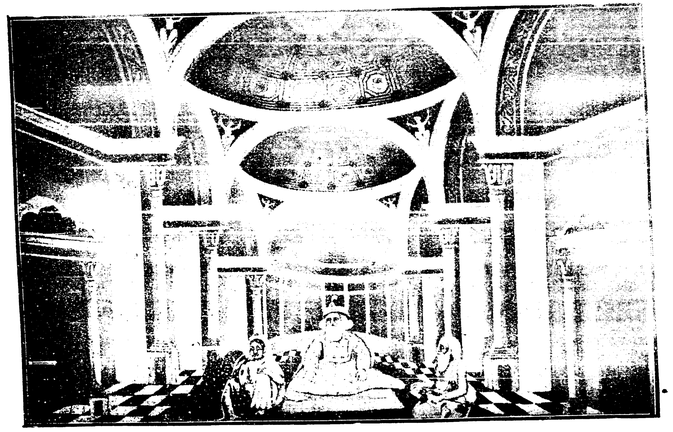

'সতী-নাটক'—১ম অঙ্ক, ২য় দৃশ্য।

দিতে বলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া সম্প্রদায়কেও রঙ্গমঞ্চটি সরকার ভবন হইতে উঠাইয়া লইতে হইল। কিন্তু পল্লীতে স্থানাভাব-বশতঃ অবিলম্বে নূতন রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব হইল। এই সকল কারণে বহুবাজারের অভিনয় দুই বৎসর কাল বন্ধ থাকে।

ইতোমধ্যে 'রামাভিষেকের' অভিনয়-সাফল্যে উৎসাহিত এবং প্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নন্দলাল ধর প্রভৃতি সভ্যগণ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া মনোমোহন বসু ১৮৭১ খ্রীঃ 'সতী নাটক' নামে একখানি পৌরাণিক নাটকের রচনা শেষ করেন। এই নাটকের অভিনয়-বাসনায় সম্প্রদায় নূতন

'সতী-নাটকে'র শেষ দৃশ্য (হর-পার্ব্বতী মিলন)—কৈলাস পর্ব্বত।

করিয়া রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মাণ করিতে উদ্যোগী হইলেন। অগত্যা বসুদিগের গৃহসংলগ্ন কিয়দংশ ভূমি পরিষ্কৃত ও সমতল করিয়া, তাহার উপর একটি স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মাণ করা হইল। বড় বড় নারিকেল গাছ কাটিয়া, মাটির প্রলেপের সহিত সাদা রং মাখাইয়া থাম বা খুঁটি তৈয়ারী করা হয়। 'দক্ষ' রাজার উপযোগী সাজ-সজ্জা, আসন প্রভৃতি ৺রাখালদাস বসু (৺চুনিলাল বসু তৃতীয় অগ্রজ)র শ্যালক হাটখোলার বিখ্যাত ধনী ৺দয়ালচাঁদ দত্তের ভবন হইতে আনীত হইত। সম্প্রদায় এরূপ উদ্যমশীল হইয়া উঠেন যে দুর্জ্জয় শীতেও সুদূর শিবপুর, বেহালা, রাজপুর প্রভৃতি স্থান হইতে

বহুবাজারে আসিতে অভিনেতারা কিছুমাত্র কষ্টবোধ করিতেন না। অভিনয়ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইত। কি পুরুষ চরিত্রে, কি স্ত্রী চরিত্রে প্রত্যেক অভিনেতাই নিজ নিজ ভূমিকায় কৃতিত্ব দেখাইতে পশ্চাদ্‌পদ হন নাই। অধুনা লুপ্ত 'নাট্যমন্দির' নামক নাট্যকলা ও নাট্যশালা সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রের ১৯২১ সালের মাঘ-ফাল্গুন সংখ্যায় 'মনোমোহন বসু' শীর্ষক প্রবন্ধে বহুবাজারের অভিনয়-কৃতিত্বের উল্লেখ আছে।

১৮৭১ খ্রীঃ শীতের প্রারম্ভে, শনিবার, ২৫ নং বিশ্বনাথ মতিলালের লেনে (অধুনা ২৫ নং বাঞ্ছারাম অক্রুর লেন) 'সতী নাটকে'র প্রথমাভিনয় হয়। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেন ঃ—

পুরুষগণ	স্ত্রীগণ
দক্ষ—চুনিলাল বসু।	প্রসূতী—অবিনাশচন্দ্র ঘোষ
শিব—চুনিলাল বসু।	সতী—আশুতোষ চক্রবর্ত্তী।
নারদ—প্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।	অশ্বিনী—চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
শান্তিরাম—মতিলাল বসু।	অশ্লেষা—বিহারী ধর।
সভাপাল—নিত্যানন্দ ধর।	মঘা—কালী চট্টোপাধ্যায় (শিবপুরের)।
নগরপাল—বলদেব ধর।	সনকা—নন্দ ঘোষ।
নন্দী—কুঞ্জবিহারী ধর।	জয়া—নন্দ ঘোষ
বৈষ্ণব—বেণীমাধব দে।	বিজয়া—কালী চট্টোপাধ্যায়।
শৈব—ক্ষেত্রমোহন দে।	নটী—নন্দ ঘোষ
নট—নন্দলাল ধর।	

যে সমস্ত গণ্যমান্য দর্শক এই অভিনয় দেখিতে আসিতেন তাঁহাদের মধ্যে কুচবিহারের নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুর, রাজা দিগম্বর মিত্র, ছাতুবাবু, W. C. Bonerji, চন্দ্রমাধব ঘোষ, কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং হাইকোর্টের বহু ইংরাজ ও দেশীয় বিচারপতিগণের নাম উল্লেখযোগ্য। 'রামাভিষেকের' ন্যায় 'সতী নাটকের' অভিনয়ও মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছিল। অভিনয়টী এত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে, সম্প্রদায় 'সতীনাটকের' সমস্ত দৃশ্যগুলির 'তৈলচিত্র' করাইয়া লইয়াছিলেন। তন্মধ্যে আমরা মাত্র তিনখানি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি ; অবশিষ্টগুলির কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। 'হরিশ্চন্দ্র'

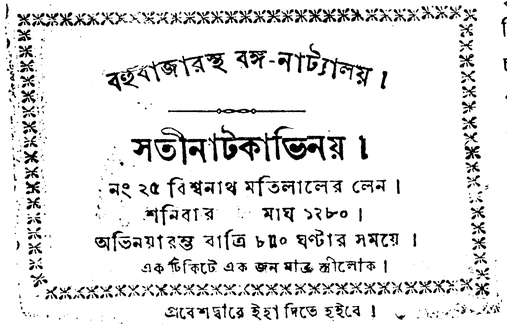

বহুবাজার নাট্যালয়ের টিকিটের নিদর্শন।

নাটকে 'রৌহিতাশ্ব' ভূমিকার অভিনেতা ননীলাল দাসের পিতা বিনোদবিহারী দাস কর্ত্তৃক চিত্র গুলি অঙ্কিত হয়।

'সতী নাটকের' বিয়োগ দৃশ্যের বিষাদবেদনা দর্শকের পক্ষে অসহ্য হওয়াতে উত্তরকালে গ্রন্থকার ইহাতে একটি মিলনান্ত অঙ্ক ('হর-পার্ব্বতী মিলন') সংযোগ করিতে বাধ্য হন। প্রায় চারি বৎসরকাল ধরিয়া 'সতীনাটক' অভিনীত হইলে মনোমোহন বাবুর আর একখানি নাটক 'হরিশ্চন্দ্র' অভিনয়ের জন্য মনোনীত করা হয়। ১৮৭৪ খ্রীঃ, ডিসেম্বর মাসে 'হরিশ্চন্দ্র' নাটকের রচনা শেষ হয় ; অনতিকাল পরেই প্রতি শনিবারে ইহার অভিনয় হইত। 'রামাভিষেক' বা 'সতী নাটকের' তুলনায় এই অভিনয়ের আড়ম্বর বড় কম হয় নাই। 'হরিশ্চন্দ্র নাটকের' ভূমিকা ও অভিনেতৃগণের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

পুরুষগণ		স্ত্রীগণ
হরিশ্চন্দ্র—চুনিলাল বসু।	বিশ্বামিত্র—প্রতাপচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়।	শৈব্যা—অবিনাশ চন্দ্র ঘোষ।
রোহিতাশ্ব—ননীলাল দাস।	পাতঞ্জল—মতিলাল বসু।	কমলা—বিহারী ধর।
খগেন্দ্র—বেণীমাধব দে।	নগরপাল—বলদেব ধর।	মল্লিকা—নন্দ ঘোষ।
নাগেশ্বর—নিত্যানন্দ ধর।	ভ'দো—গোষ্ঠবিহারী লাহা।	
বসন্ত—চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।	বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ—কেদার নাথ চট্টোপাধ্যায়।	

'হরিশ্চন্দ্রের' অভিনয় অতি অল্পকাল স্থায়ী হইয়াছিল। যে সময় 'হরিশ্চন্দ্রে'র অভিনয় চলিতেছিল সেই সময় প্রতাপবাবুর স্ত্রী ও চুনিবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র মারা যাওয়ায় সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেরই এইরূপ অনুভূতি হইল যে বুঝিবা হতভাগ্য হরিশ্চন্দ্রের বিষাদময় জীবনের অনুকৃতি করিতে গিয়া তাঁহাদেরও সাংসারিক জীবন বিষাদময় হইতে আরম্ভ হইল। এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা অভিনয় ব্যাপারে একেবারে যত্নহীন হইয়া পড়িলেন ; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের অনুষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা দেখা যাইতে লাগিল। অবশেষে 'বহুবাজার অবৈতনিক নাট্য-সমাজ' চিরদিনের জন্য লুপ্ত হইয়া গেল।

কিন্তু ইহার স্মৃতি লুপ্ত হইবার নহে। বঙ্গীয় নাটক ও নাট্যশালার ইতিহাসে ইহার নাম চির স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এই বহুবাজার অবৈতনিক নাট্যসমাজের প্রগাঢ় নাট্যানুরাগ-বশতঃই মনোমোহন বসু নাটক রচনায় হস্তক্ষেপ করেন। এই সম্প্রদায়ের অভিনয়ও অতি উচ্চাঙ্গের হইত। একই নাটকে সুদক্ষ অভিনেতা চুনিলাল বসুর 'শিব' ও 'দক্ষের' অভিনয় দেখিয়া

৺চুনিলাল বসু।

নাট্যামোদিগণ প্রথমে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন যে দুইটি গুরুগম্ভীর ও বিপরীত রসাত্মক চরিত্রের অভিনয়ও একজন অভিনেতার দ্বারা সম্ভবপর হইতে পারে। অভিনয়-কলার দ্বারা যাঁহারা ব্যবসায় করিতে সমুদ্যত হইয়াও অবাধে ঐ পন্থা তখন অবলম্বন করিতে পারিতেছিলেন না, তাঁহারাও চুনিলাল বসুর রামভিষেকে 'কৌশল্যা' সতীনাটকে 'শিব' ও 'দক্ষ,'

৺ক্ষেত্রমোহন দে।

হরিশ্চন্দ্রে 'হরিশ্চন্দ্র' প্রভৃতি ভূমিকায় অপূর্ব্ব অভিনয় দেখিয়া অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠেন। রামাভিষেকে 'সুমন্ত্র' সতীনাটকে 'নারদ,' হরিশ্চন্দ্রে 'বিশ্বামিত্র' প্রভৃতি ভূমিকায় প্রতাপচন্দ্র যে অভিনয় করিতেন তাহারও তুলনা হয় না। একদিকে যেমন তিনি সুনিপুণ নট ছিলেন, অপরদিকে তেমনই তখনকার 'Senior Scholarship' পরীক্ষোত্তীর্ণ একজন কৃতবিদ্য

ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার নেতৃত্বে বহুবাজার-নাট্যসমাজের যশঃ কলিকাতার চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এই সম্প্রদায়ের আর একটি উল্লেখযোগ্য অভিনেতা ৺মতিলাল বসু। ইনি চুনীলালের চতুর্থ অগ্রজ। ইঁহার অনাবিল হাস্যরসের অভিনয় দেখিয়া মরা মানুষও বাঁচিয়া উঠিত। রামাভিষেকে 'বিদূষক', সতীনাটকে 'শান্তিরাম', হরিশ্চন্দ্রে 'পাতঞ্জল', প্রভৃতি ভূমিকায় তিনি যে স্বভাব-ছবি ফুটাইতেন, কোনও নিপুণ শিল্পীর তুলিকাতেও তাহা সচরাচর দৃষ্ট হয় না। হাস্য রসাত্মক চরিত্রগুলি মনোমোহন বসু যেন তাঁহাকে দেখিয়াই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অভিনেতার সহিত নাটকের প্রথম চরিত্রগত সামঞ্জস্য উত্তরকালে গিরিশচন্দ্র ছাড়া আর কাহারও নাটক-রচনায় পরিলক্ষিত হয় না। বহুবাজার নাট্য-সমাজের স্ত্রী চরিত্র অভিনয়ও অতি সুন্দর হইত। সতীনাটকে 'প্রসূতি' ও হরিশ্চন্দ্রে 'শৈব্যা'র ভূমিকায় ৺অবিনাশচন্দ্র ঘোষ যেমন অভিনয় করিয়া গিয়াছেন, শুনা যায় তেমন অভিনয় অনেক স্ত্রীলোকের দ্বারাও সম্ভবপর নহে। অবিনাশচন্দ্র, বসুদিগের ভাগিনেয় হইতেন এবং চুনিলালের প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন।

বহুবাজার নাট্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার চারি বৎসর পরে বঙ্গীয় বৈতনিক রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়, এবং ঐ নাট্যসমাজের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গেই অর্দ্ধশতাব্দীর অবৈতনিক যুগেরও অবসান হইল। কিন্তু এই অবৈতনিক যুগের চিতাভস্ম হইতে আমরা যে রত্ন পাইয়াছি তাহা অমূল্য ও অতুল্য। এই অবৈতনিক নাট্যযুগের মধ্য দিয়া আমরা পাশ্চাত্য অভিনয়কলার রস গ্রহণ করিতে আরম্ভ করি এবং বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যের সেবায় প্রথম ব্রতী হই।

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মিত্র

বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম

ওগুস্ত-কোঁতের মতবাদ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বিজ্ঞানসমূহ যে সব গোড়ার তথ্য দর্শনকে যোগাইয়া দিয়াছে, দর্শন তাহার সংশ্লেষণ-কার্য্যে ঐসব তথ্যকে প্রয়োগ করিয়াছে ; দর্শন এ কথা জিজ্ঞাসা করে নাই, স্বয়ং এই সকল তথ্য কি এক নিয়মের অধীন ছিল ? দর্শন দেখিতে পাইল, বিজ্ঞানগুলাকে পদ্ধতিবদ্ধ করিবার একটা মূলসূত্র সমাজ-বিজ্ঞানের মধ্যেই বিদ্যমান,—যাহাতে করিয়া মনুষ্যগণের মধ্যে বুদ্ধিমূলক একটা একতার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হইতে পারে। দর্শন যে কাজ করিতে চাহে তাহার জন্য ইহা অনুসন্ধান করা আবশ্যক নহে যে,—জনসমাজ কি করিয়া অস্তিত্ব লাভ করিল, তাহার অবলম্বিত উপায়ের স্বরূপই বা কি, তাহার মূলসূত্রই বা কি। কিন্তু সমাজকে পুনর্জ্জীবিত করিতে হইলে,—শুধু মুখের

কথায় নহে—সফলভাবে কার্য্যতঃ পুনর্জীবিত করিতে হইলে, এই অনুসন্ধানের ভার মানুষকে লইতে হইবে। বিজ্ঞানগুলা উপকরণ যোগাইবে, দর্শন উপকরণগুলাকে নিয়ম-শৃঙ্খলে বদ্ধ করিবে। কিন্তু তথাপি এই সমস্ত কার্য্য সূক্ষ্মতাত্ত্বিকভাবেই রহিয়া যাইবে, নিয়মাধীন ভাবেই রহিয়া যাইবে। বিজ্ঞান যে সমাজ-গঠনের কল্পনা করিতেছে তাহা বাস্তবে পরিণত হইবে কি না—তাহা স্থায়ী হইবে কি না—এ কথার উত্তর কে দিবে?

ইতিহাস আমাদিগকে দেখায়, এইরূপ কতকগুলি সমাজ বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। এই সকল সমাজ কাহা কর্ত্তৃক উৎপাদিত হইল? বিজ্ঞান-কর্ত্তৃক, না দর্শন কর্ত্তৃক? পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা আমরা জানি যে ধর্ম্ম হইতেই এই সকল সমাজের উৎপত্তি হইয়াছে। ধর্ম্মের সনির্ব্বন্ধ অবিরাম কার্য্যের দরুণই সমাজ-বিজ্ঞান স্বকীয় উদ্দেশ্য লাভ করিয়াছে এবং উহাই তাহার অস্তিত্বের একমাত্র হেতু বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছে। এই উদ্দেশ্য কি টিকিবে যদি ধর্ম্ম অন্তর্হিত হয়? কারণ অপনীত হইলে, কার্য্য কি স্বপদে দণ্ডায়মান থাকিতে পারে?

মানব-স্বভাব আলোচনা করিয়া দেখা যাক্। তাহাতে বুদ্ধিবৃত্তি সামাজিক বন্ধনকে সৃষ্টিও করিতে পারে না, রক্ষা করিতেও পারে না। যতই পাণ্ডিত্যপূর্ণ হউক না কেন, বুদ্ধিবৃত্তির কোনও যোগাযোগই অহংপরতা ও পৃথকত্বের অবস্থাকে একটা সামাজিক গঠন দিতে পারে না। বুদ্ধিবৃত্তি কেবল একটা সাধারণভাবে শৃঙ্খলাবন্ধন, পদ্ধতিবন্ধনের কাজ করিতে পারে মাত্র। বুদ্ধিবৃত্তি, উৎপাদন করিতে পারে না। উৎপাদন করিতে পারে, সৃষ্টি করিতে পারে—হৃদয়। কাজেই, এই সামাজিক গঠনবিন্যাসরূপ সৃষ্টির মূলে বিদ্যমান একমাত্র—হৃদয়। এবং এই হৃদয়, সহজাত সংস্কারের সহিত, স্বভাবের সহিত, সাধাসিধা নিছক তথ্যের সহিত একাকার হইয়া যাইতে পারে না। কারণ, মানব স্বভাবের মধ্যে একটা লক্ষণই এই যে উহাতে অব্যবহিতরূপে যেমন কতকগুলি কম-উন্নত সহজ-সংস্কার ও অপেক্ষাকৃত, বেশী উন্নত অহংনিষ্ঠ প্রবৃত্তি আছে সেইরূপ উহাতে সহানুভূতি ও পরার্থ-পরতারূপ কতকগুলি উচ্চতর বৃত্তিরও আধিপত্য রহিয়াছে। অবশ্য অহংপরতারূপ সংস্কারের মতই গোড়া হইতে এই সকল উচ্চ প্রবৃত্তির অস্তিত্বও মানব স্বভাবের মধ্যেই বিদ্যমান। কিন্তু সহজ সংস্কারের যে কার্য্যশক্তি, যে অধ্যবসায়, তাহা উহাদের মধ্যে নাই। কেবল সহানুভূতি মূলক ভাব গুলাই, ভিন্নপথগামী, উদ্দাম, ব্যক্তিগত সহজ সংস্কারগুলাকে চাপিয়া রাখিয়া সামাজিক অবস্থার উৎপাদন ও সংস্করণ করিতে সমর্থ হয়।

অতএব জনসমাজের অস্তিত্ব এমন একটা অবস্থার সহিত বন্ধন-সূত্রে আবদ্ধ যাহা—কি সহজাত সংস্কার, কি বুদ্ধিবৃত্তি—এই দুয়ের কোনটাই প্রত্যক্ষরূপে উপলব্ধি করিতে পারে না। এক্ষণে, মানুষের সহানুভূতিমূলক প্রবৃত্তির জন্য, এমন একটা সহায় খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, যাহা ঐ প্রবৃত্তিকে বল বিধান করিতে পারে, যাহা অহংনিষ্ঠ সংস্কারের উপর প্রাধান্য স্থাপন করিতে পারে। এবং এই সাহায্য অতীতকালে, ধর্ম্মসমূহ হইতেই পাওয়া গিয়াছে। এই সকল

ধর্ম্ম আপন আপন ধরণে হৃদয়সমূহের সম্মিলনকে, বুদ্ধিবৃত্তিসমূহের সম্মিলনের মূল হেতুরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। পুরাকালের এই সকল প্রতিষ্ঠানের মূলে যে একটা মানবীয় ভিত্তি আছে তাহাকে সংগ্রহ করিতে হইবে—রক্ষা করিতে হইবে—যদি ঐ প্রতিষ্ঠান সকলের অন্তর্ভূত মত-বিশ্বাসগুলাকে দোষাবহ বলিয়া বহিষ্কৃত করিতে হয়। তখন এই ধর্ম্মই নিজে পুনর্জীবিত হইয়া, সমাজসমূহের নবজীবনের প্রথম মূল-সূত্রটি যোগাইয়া দিবে।

এই পুনঃপ্রতিষ্ঠার কার্য্যপ্রণালী অনুসরণ করিতে হইবে এইরূপে:—প্রচলিত ধর্ম্মসমূহের মধ্যে যে সকল অভাবাত্মক ও জরাজীর্ণ উপাদান আছে তাহা হইতে বিযুক্ত করিয়া বাহির করিতে হইবে তদন্তর্গত সেই উপাদানটি যাহা ভাবাত্মক, যাহা মাননীয়, যাহা অবিনশ্বর।

এইরূপেই ধ্রুববাস্তববাদ ধ্রুববাস্তব ধর্ম্মে পর্য্যবসিত হইয়া ধ্রুববাস্তববাদেরই পূর্ণতা বিধান করিবে। ধর্ম্মসমূহের সমস্ত শিক্ষাই সংক্ষেপে এই দুই শব্দের মধ্যে আবদ্ধ—ঈশ্বর ও অমরতা। এই দুই মত বিশ্বাসের অন্তর্গত ভাবাত্মক উপাদানটি কি?

যে হিসাবে মানুষের বাস্তব অভাব-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে—সেই হিসাবে দেখিলে ঈশ্বরমূলক ধারণাটি একটি সর্ব্বভৌমিক ধারণা; ইহা অপরিমেয় ও অনন্ত; ইহার সহিত মানব-আত্মাসমূহের যোগ নিবদ্ধ হয়; ইহা অহংনিষ্ঠ ও ভিন্নপথগামী প্রবৃত্তি সকলকে জয় করিবার জন্য বলবিধান করে; ইহা সামঞ্জস্য বিধান করে, আপনার সহিত সংযুক্ত করে, সম্মিলিত করে।

অমরতার ভাবাত্মক ধারণাটি কি?—না, যাহারা ধার্ম্মিক অর্থাৎ যাহারা ইহ-জীবনেই ঈশ্বরকে ও অন্য মনুষ্যকে যথার্থভাবে ভাল বাসিয়াছে, তাহারা দিব্যপুরুষের নিত্য-সত্তার একটা অংশ লাভ করিবে।

এক্ষণে দেখা যায়, উপরি-উক্ত অভাব পূরণের উপযোগী যাহা বাস্তব ও সর্ব্বজন-অধিগম্য এইরূপ একটা যুগল উদ্দেশ্য খুঁজিয়া বাহির করিতে ধ্রুববাস্তববাদের কোন কষ্টই হয় নাই। এই লক্ষ্যের বিষয়ীভূত বিষয় আমাদের হইতে দূরে নাই, ইহা আমাদের নিকটেই আছে, ইহা আমাদের ভিতরেই আছে—ইহা মানবতা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

বিশ্বমানবতা অনেক সময় একটা সাদাসিধা সার্ব্বভৌমিক ধারণা বলিয়া কল্পিত হইয়া থাকে, তখন উহা টুলোপণ্ডিতী ধরণের একটা সূক্ষ্মতাত্ত্বিকভাবমাত্র হইয়া দাঁড়ায়, একটা ফাঁকা ও নির্জীব জড়পিণ্ড হইয়া দাঁড়ায়। বিশ্বমানবতা বলিতে—এখনই-বিদ্যমান কতকগুলি মনুষ্যের সমবায়—এই অর্থও বুঝা যাইতে পারে।

এই অর্থে ইহা একটা বাস্তব জিনিস; কিন্তু এই সমবায়ের অন্তর্ভূত ব্যক্তিবিশেষ যে-ঈশ্বর ও অমরতাকে চায়, মানবতার মধ্যে কি সেই ঈশ্বর ও অমরতাকে পর্য্যন্ত টানিয়া আনা যাইতে পারে?

কিন্তু বিশ্বমানবতাকে যেরূপ বিবর্দ্ধিত বিরাট আকারে আমাদের নিকট প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা টুলোপণ্ডিতী ধরণের সূক্ষ্মতাত্ত্বিকতা হইতে ভিন্ন, তাহা আকাশ-জোড়া জনসঙ্ঘ হইতে ভিন্ন।

বিশ্বমানবতা হইতেছে—কালের ভিতর দিয়া একটা ধারাবাহিকতা, একটা মিলনের জমাট গাঁথুনী (solidarity)। যাহা ভাল, যাহা উদার, যাহা নিত্য—এইরূপ যাহা কিছু মানুষেরা অনুভব করিয়াছে, চিন্তা করিয়াছে, সংসাধন করিয়াছে, তৎ সমস্তই বিশ্বমানবতার কাজ। বিশ্বমানবতা একটা আকাশাতীত সত্তা; আপনাকে বিশোধিত করিয়া, আপনাকে সর্ব্বতোভাবে গড়িয়া তুলিয়া, এই বিশ্বমানবতা আকাশের অতীত স্থানে আপনাকে স্থিরপ্রতিষ্ঠিত করে এবং সেখানে অমর জীবন লাভ করিয়া অধিষ্ঠাত্রী দেবতার মত ব্যক্তিবিশেষের অনিশ্চিত ও অস্থায়ী প্রয়াস-প্রযত্নের উপর একটা প্রভাব বিস্তার করে।

বিশ্বমানবতাকে এইভাবে বুঝিলে,—ইহাই সেই ঈশ্বর, মানুষেরা যাহার প্রার্থী—ইহা বাস্তব সত্তা, অপরিমেয়, নিত্যচিরন্তন,—যাহার সহিত মানুষেরা অব্যবহিত সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ,—যাহার ভিতরে তাহাদের সত্তা, গতিচাঞ্চল্য, ও জীবনধারা অবস্থিত। বহুশতাব্দীর মধ্য দিয়া, এই বিশ্বমানবতার ভিতরে, নৈতিক শক্তিসমূহের আধার হইতে সঞ্চিত হইয়া, মানব-হৃদয়ে বড় বড় চিন্তাধারা, মহান্ ভাবসমূহ বিকশিত হইয়া উঠে। বিশ্বমানবতা হইতেছে এমন একটি মহা-সত্তা, যাহা আমাদিগকে আমাদের ঊর্দ্ধে লইয়া যায় এবং যাহা আমাদের স্বার্থপ্রবৃত্তিসমূহকে দমন করিতে পারে, এইরূপ কতকগুলি সঞ্চিত শক্তি আমাদের সহানুভূতিমূলক বৃত্তির সহিত সম্মিলিত করিয়া দেয়। বিশ্বমানবতার ভিতরেই মানুষ পরস্পরকে ভালবাসে, পরস্পরের সহিত আদানপ্রদান করিয়া থাকে।

সেইরূপ এই বিশ্বমানবতার ভিতরেই, ব্যক্তি-বিশেষ স্বীয় আকাঙ্খিত অমরতা সত্যসত্যই উপভোগ করিতে পারে। কারণ এই বিশ্বমানবতা সংগ্রহ করে, সংরক্ষণ করে এবং স্বাত্মীকৃত করে—যাহা কিছু তাহার প্রকৃত স্বরূপের অনুরূপ, যাহা কিছু তাহাকে খুব বড় করিয়া তুলে, সুন্দর করিয়া তুলে, শক্তিমান করিয়া তুলে। এই বিশ্বমানবতা বাস্তব মনুষ্যদিগের চিন্তা ও হৃদয়ভাব দিয়াই পরিপুষ্ট এবং অধিকাংশ স্থলে জীবিত অপেক্ষা মৃত লোকের দ্বারাই গঠিত।

এই সকল মৃতব্যক্তি বর্ত্তমান বংশীয়দিগের সজাগ সচেষ্ট স্মৃতির মধ্যে বাঁচিয়া থাকে। এই মৃতব্যক্তিরা জীবিতদিগের সহিত শ্লাঘ্য প্রতিযোগিতার দ্বারা জীবিত ব্যক্তিদিগকে উত্তেজিত করে, এবং জীবিত ব্যক্তিরাও এইরূপ উত্তেজিত হইয়া স্বীয় মহৎ পূর্ব্বপুরুষদিগের সহিত মিলিত হইবার যোগ্যতা লাভের জন্য সচেষ্ট হইয়া উঠে।

একথা সত্য যে, এই ঈশ্বর ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট হইতে পারে না, এই অমরতাও বিষয়গত (objective) হইতে পারে না। ধ্রুববাস্তববাদ, তথা-কথিত আপ্তধর্ম্মসমূহের এই বিশেষ মতবিশ্বাসগুলিকে কপোল-কল্পিত বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু যাহাকে প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্ম বলা যায়, ধ্রুববাস্তববাদ কি এইরূপে সেই ধর্ম্মে উপনীত হইতে পারে? যাহা সকলের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে রহিয়াছে, যাহা খুব সামান্য ব্যক্তির সহিত প্রকৃতরূপে একীভূত হইয়া স্বীয় মহোচ্চভাবের পরিচয় দেয়, সেই বিশ্বমানবতার তুলনায় এই সসীম, আত্মনিষ্ঠ, অতীন্দ্রিয়,

খামখেয়ালি ঈশ্বরের কদর কি? কালের মুখে বাঁচিয়া থাকা, লোকের অন্তরাত্মার মধ্যে বাঁচিয়া থাকা—একমাত্র যাহা মানবহৃদয়ের প্রিয়তম আকাঙ্ক্ষা—ইহার বিনিময়ে আকাশের মধ্যে ভৌতিকরূপে তিষ্ঠিয়া থাকার মূল্য কি?—অনন্তকালের মধ্য দিয়া আত্মাদিগের সম্মিলন,—ইহার দ্বারা কি ধর্ম্মে উপনীত হওয়া যায় না?

ইহা এমন একটা ধর্ম্ম যাহার সম্বন্ধে মানব-স্বভাবের অপরিহার্য্য ধর্ম্মসংক্রান্ত সহজসংস্কার হইতে সায় পাওয়া যায়, ইহাই ধ্রুববাস্তববাদ, অথবা বিশ্বমানবতার ধর্ম্ম।

এই ধর্ম্ম একটা সূক্ষ্মতাত্ত্বিকভাবমাত্র নহে, ইহা একটা জীবন-ধারা; ইহা পরার্থপরতা ও প্রেমের সফল পরিণতি। কিন্তু এই ধর্ম্ম সফলরূপে সাধন করিবার যে প্রণালী অনুসরণ করিতে হইবে, সেই প্রণালীর গুরুত্ব খুব বেশী। পূর্ব্বতন ধর্ম্মসমূহেরও লক্ষ্য ছিল প্রেম; কিন্তু তথাপি, উহাদের চিরপ্রচলিত পুরাতন আকারটা ঠিক্‌মত না হওয়ায়, উহা দূষিত বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। আসলে, কোনও প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বাঁচিয়া থাকা সম্ভব নহে—যে প্রতিষ্ঠান অস্তিত্বের নিয়মাদি মানিয়া না চলে। এক্ষণে দর্শনকে ধ্রুববাস্তব ও স্থায়ী অবস্থা পাইতে হইলে,—বিজ্ঞানের নিকট গঠনের উপাদান সংগ্রহের নিমিত্ত যেমন একদিকে দর্শনের আগে বিজ্ঞানের আসা দরকার হয়, সেইরূপ আবার, অবিনশ্বর হইতে হইলে, ধর্ম্মকেও বিজ্ঞান ও দর্শনের উপর নির্ভর করিতে হয়। এই বাস্তব ও যৌক্তিক (rational) জগতেই এই ধর্ম্মকে কাজ করিতে হইবে;—স্বকীয় কার্য্যের নিয়মাদি অন্বেষণ করিতে হইবে।

বিজ্ঞান ও দর্শনেরই মতো এই ধর্ম্মও, সূক্ষ্মতত্ত্ব হইতে স্থূলতথ্যে নহে পরন্তু, স্থূলতথ্য হইতে স্থূলতরতথ্যে অগ্রসর হইবে। মানবজাতির সূক্ষ্মতাত্ত্বিক ও অস্পষ্ট ধারণাই যে সাদামাটা বিশ্বপ্রেমের একমাত্র প্রবর্ত্তক-হেতু, সেই বিশ্বপ্রেম হইতে, সেই টুলোধরণের অসার বস্তুসত্তা হইতে ইহা বহুদূরে অবস্থিত;—ধ্রুববাস্তববাদ এই সমস্ত হইতে, আমাদিগকে বিনির্ম্মুক্ত করে। পরমার্থ-বিদ্যার (theologique) যুগ, মানবতাকে আংশিকভাবে, স্থূলতাত্থিকভাবে উপলব্ধি করিয়া যাহোক্ একটা যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছে। এখন বিশ্বমানবতাকে যদি অবরোহী যুক্তিসোপানের (a priori) গোড়ায় স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে উহা একটা অহংনিষ্ঠ বিপ্লবাত্মক দার্শনিক তত্ত্ব হইয়া দাঁড়াইবে মাত্র এবং উহার প্রয়োগে উপরি-উক্ত পরমার্থবিদ্যা-প্রবর্ত্তিত মানবতার আংশিক ও স্থূলতাত্থিক অভিব্যক্তি বিনষ্ট হইবার দিকে উন্মুখ হইবে।

শুধু একটা জ্ঞানমূলক ধারণার দ্বারা (an idea) প্রেমকে প্রকাশ করা যায় না। ব্যক্তিগত সম্বন্ধ হইতে, বিশেষতঃ স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ হইতে, প্রেম জন্মগ্রহণ করে। যদি তুমি চাও এই প্রেম শুধু ন্যায়বাগীশের একটা অসার সূক্ষ্মতাত্ত্বিক কল্পনা মাত্র না হইয়া, একটা জীবন্ত কার্য্যকরী প্রেম হইয়া অন্তরাত্মাকে জাগ্রত করিবে, পরিপুষ্ট করিবে, তাহা হইলে উক্ত স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ হইতে যাত্রা আরম্ভ করিতে হইবে। যেমন একদিকে পুরাতন বিজ্ঞানগুলার

লক্ষণে নূতন বিজ্ঞানগুলাকে ভূষিত করিয়া উহাদিগকে বিজ্ঞানের যোগ্য করিয়া তোলা হয়—বৈজ্ঞানিক ধারণার হিসাবে একটা পূর্ণতা বিধান করা হয়; যেমন একদিকের অব্যবহিতরূপে প্রয়োজনীয় যে বিজ্ঞান সেই সামাজিক বিজ্ঞান হইতে যাত্রা আরম্ভ করিতে হয় এবং বিজ্ঞানের সোপানপরম্পরা হইতে নামিবার সময় সামাজিক সম্বন্ধের হিসাবে ঐ সকল বিজ্ঞানকে শুধু কতকগুলি উপায় মাত্র বলিয়া বিবেচনা করিতে হয়; সেইরূপ প্রকৃতির নিয়মানুসারে, স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ হইতে যে প্রেমের জন্ম হয়, সেই প্রেম ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইবে, ক্রমশঃ বিশ্বজনীন হইয়া উঠিবে,—অথচ উহা বাস্তব হইয়াই থাকিবে—যদি ঐ প্রেমের এই মুখ্য উদ্দেশ্য হয় যে, বিশ্বপ্রকৃতি যে সকল বিষয় আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করে, সেই সকল বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত—বৃহৎ হইতে বৃহত্তর বিষয়ের প্রতি—জটিল হইতে জটিলতর বিষয়ের প্রতি—পরম্পরাক্রমে সুপ্রণালীপূর্ব্বক প্রেম আপনাকে নিয়োগ করিবে। স্বকীয় পূর্ণ বিকাশ ও সমগ্র শক্তির হিসাবে প্রেম যদি আত্মোপলব্ধি করিতে চাহে তাহা হইলে প্রেমকে ৪টি নিতান্ত প্রয়োজনীয় আশ্রমের পাশ দিয়া যাইতে হইবে—ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির সম্বন্ধ, পরিবার, স্বদেশ, বিশ্বমানব।

এই দীক্ষার ধাপগুলি পার হইয়া যখন আমরা এইরূপে, খুব উন্নত অথচ বাস্তব প্রীতির সহিত বিশ্বমানবকে ভালবাসিতে প্রবৃত্ত হই, তখনই কেবল তখনই সেই বিশ্বমানবরূপ মহা-সত্তা আমাদের ভিতরে প্রকাশ পায়, আমাদের সত্তার উপর আধিপত্য করে, আমাদের সত্তাকে শাসন করে। এবং এই মহতী শক্তির অদম্য প্রভাবে আমাদের স্বভাব রূপান্তরিত হইয়া যায়, অহংপরতার স্থান পরার্থপরতা আসিয়া অধিকার করে। এবং ঈশ্বর হইতে চলিয়া গিয়া আমাদের প্রেম মানুষের উপর স্থাপিত হয়—ঔপপত্তিকের বদলে ব্যবহারিক হইয়া দাঁড়ায়, শাসনবাধ্য না হইয়া স্বয়ংপ্রবৃত্ত হইয়া দাঁড়ায়। হৃদয়সমূহের বন্ধন সূত্রই ঈশ্বর।

* * *

যেহেতু প্রেমের সম্বন্ধে, বাস্তবতাই সর্ব্বস্ব এবং নিছক মতবাদ উপেক্ষণীয়, অতএব যাহা কিছু এই বাস্তবতাকে উৎপাদন ও পরিপুষ্ট করিতে সাহায্য করে, তাহা অবহেলা করা উচিত নহে। তাই প্রচলিত ধর্ম্মসমূহ মানব-হৃদয়ে যে ভাবরস ও কল্পনা আনিয়া দিয়া বাস্তবতার সাহায্য করিয়াছে, তাহা নিরর্থক হয় নাই। ভাবরস ও কল্পনাই মানবাত্মার পরিচালক। উহা মানবাত্মাকে স্পন্দিত করে, সঞ্জীবিত করে। পক্ষান্তরে জ্ঞানমূলক ধারণাগুলা (ideas) উহার একটু গা-ছুঁইয়া যায় মাত্র। পরমার্থতত্ত্ববেত্তাদের বাস্তবতা সম্বন্ধে কোন একটা বিশেষ মতবাদ না থাকায়, কল্পনামূলক বিজ্ঞানগুলাকে বাস্তব বলিয়া গ্রহণ করিয়া, পরমার্থতত্ত্ববেত্তারা ভুল করিয়াছিল। যে মানুষ প্রকৃত বিজ্ঞান ও প্রকৃত দর্শনের দুর্ভেদ্য দুর্গের মধ্যে দৃঢ়ভাবে অধিষ্ঠিত, কল্পনাকে সেই মানুষের আর সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিতে হয় না। কল্পনার যে কাজ মনস্তত্ত্ববাদীরা প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করিতে সাহস করে না, মানুষ সেই কাজে কল্পনাকে

আবার প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। যখন কোন মিথ্যাকে মিথ্যা, বলিয়া জানা যায়, এবং বাস্তবের স্থান অধিকার করিবার চেষ্টা করিবামাত্রই তাহাকে দূর করিবার জন্য যদি সশস্ত্রে সজ্জিত থাকা যায়, তাহা হইলে সেই মিথ্যা আর প্রতারণা করিতে পারে না। মানুষের গঠনই এইরূপ যে, সত্যরূপে গৃহীত যে মিথ্যা সেই মিথ্যা মানুষের উপর যেরূপ কাজ করে,—মিথ্যা বলিয়া জানা মিথ্যাও মানুষের উপর তাহা অপেক্ষা কিছু কম কাজ করে না। কল্পনা সত্যের দাবী করে না, সত্যের অপেক্ষা কিছু কম কাজ করে না, পরন্তু পদার্থসমূহের মধ্যে আপনাকে প্রক্ষিপ্ত করে। (project). কল্পনার মধুর প্ররোচনায় চিত্ত একবার বিচলিত হইলে কল্পনা মানব-হৃদয়ে ও মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে একটা উদ্দাম বেগ প্রয়োগ করে।

অতএব ধ্রুববাস্তববাদ, বাস্তবতা সম্বন্ধে কতকগুলি মত ও বিশ্বাস নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া তাহার পর, ব্যবহার-ক্ষেত্রে সাহায্যের হিসাবে এবং ধর্ম্মের যৌক্তিক তত্ত্বের অধীনে, এই কল্পনা-মূলক মিথ্যাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে ভয় পায় না। উহা ভাব রসগুলাকে বস্তুগত ও কার্য্যকরী করিয়া গড়িয়া তুলিবার নিমিত্ত, মানব-স্বভাবের অনুযায়ী, কল্পনাকে একটা উপায়স্বরূপ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবে নচেৎ সমগ্র সংশ্লেষণটাই—সমাজের সংস্কারমূলক সমস্ত গঠনটাই একটা জ্ঞানের কথামাত্র (idea) হইয়া থাকিবে।

কোঁৎ যে মিথ্যা বিগ্রহকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাহা আসলে, নিছক কবিত্বমূলক। একটা আনুমানিক সিদ্ধান্ত আশ্রয় করিয়া তিনি আমাদের মত ইচ্ছাশক্তি-সম্পন্ন কতকগুলি প্রাকৃতিক সত্তা, তাঁহার মতবাদের মধ্যে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। অহারা কার্য্য করিতেছে—হিতজনক কার্য্য করিতেছে। মানুষ বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে নিতান্ত বিচ্ছিন্ন ও পৃথক হইয়া পড়ে, যদি বিশ্বপ্রকৃতি শুধু কতকগুলা নিয়তি-নির্দ্দিষ্ট ও অন্ধ নিয়মের অভিব্যক্তি মাত্র হয়। আগ্রহের সহিত, আনন্দের সহিত কাজ করিতে হইলে, আমাদের এই কথাটা মনে করা আবশ্যক হয় যে, আমরা বন্ধুগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া আছি,—সেই বন্ধুরা আমাদিগের কথা বুঝিতেছে, আমাদিগের কাজে সাহায্য করিতেছে। তাই এই কথা কল্পনা করা আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় যে, প্রাকৃতিক শক্তির আকারে আমাদের মতো কতকগুলি সত্তা, আমাদের সহিত সহানুভূতি করিতেছে। নিয়মসমূহের পূর্ণতা বিধানের জন্য, কতকগুলা ইচ্ছাশক্তি থাকা আবশ্যক।

এই জন্যই, ধ্রুববাস্তবতার ধর্ম্ম, কেবল মানবমণ্ডলীর বীরগণের স্মৃতির উদ্দেশে নিয়োজিত হইবে না। তাহার নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ঃ—মহাসত্তা বা বিশ্বমানবতা; মহাবিগ্রহ বা পৃথিবী: ও মহাপরিবেষ্টন বা আকাশ—এই তিন কল্পিত সত্তাই ধ্রুববাস্তব ধর্ম্মের ত্রিমূর্ত্তি। এবং এইরূপভাবে সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়মই কল্পনাকে আকৃষ্ট করিতে পারে, এইরূপভাবেই একপ্রকার পৌত্তলিক দেবতার বিগ্রহরূপে কল্পিত হইতে পারে।

ক্রমশঃ

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

চোর

কম্পিত পদ সচকিত আঁখি
মন্দির মাঝে মোর,
হাতে হাতে আজ ধরা যে পড়িলে
ওগো সুন্দর চোর!
নলিন নয়নে ভয় ভরা দিঠি
পল্লব থর থর—
আপনার ধন করিতে গ্রহণ
কম্পিত দু'টি কর।
মধুর অধরে কি যেন কিসের
গোপন বারতা কহে—
কাঁপে সুকুমার তনুখানি যেন
ধরা পড়িবার ভয়ে।
ওগো তস্কর! তুমি কি জান না?
গৃহস্থ ঘুমহীন;
তোমারি আসার পথে আঁখি তা'র
অপলক নিশিদিন।
তোমারি লাগিয়া ওগো বাঞ্ছিত!
সাজানো বাসর এ যে—
নিশি অবশেষে পিছন দুয়ারে
বর! এলে চোর সেজে'।
মোর দোষ নাই যদি আজি তুমি
লাঞ্ছিত হও রাজা!
সাধে সাধে চোর সাজিলে যেমন
সে তব উচিত সাজা।

শ্রীসুশীলাসুন্দরী দেবী

পথের দাবী *

(১৪)

ভারতী ও অপূর্ব্ব দুজনেই পিছনের বন্ধ দরজার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল, কিন্তু কেহই কোন কথা কহিল না। অপূর্ব্ব কিছুই না বুঝিয়াও এটুকু বুঝিল যে, এমন করিয়া যে-লোক নিজেকে স্বেচ্ছায় বন্দী করিয়া রাখিল তাহার সম্বন্ধে কৌতূহলী হইতে নাই। উভয়ে নীরবে হোটেলের বাহিরে আসিতে ভারতী কহিল, চলুন অপূর্ব্ব বাবু, আমরা সরে যাই—

কিন্তু, আমার যে আবার আফিসের বেলা—

রবিবারেও আফিস?

রবিবার? তাই ত বটে! অপূর্ব্ব খুসি হইয়া বলিল, একথা সকালে মনে হলে নাওয়া-খাওয়ার জন্যে আর ব্যস্ত হতে হোতো না। আপনার এত জিনিস মনে থাকে, কিন্তু এইটুকু ভুলে গিয়াছিলেন।

ভারতী একটু হাসিয়া বলিল, তা' হবে। কিন্তু, কাল রাত্রে আপনার না-খাওয়ার কথা শুনি।

অপূর্ব্ব হঠাৎ দাঁড়াইয়া কহিল, আমার দেরি করবার যো নেই, তেওয়ারী বেচারা হয়ত ভেবে সারা হয়ে যাচ্ছে।

ভারতী বলিল, যাচ্ছে না। তার কারণ, আপনি জাগার পূর্ব্বেই সে খবর পেয়েছে আপনি কুশলে আছেন।

সে জানে আমি আপনার কাছে আছি?

ভারতী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, জানে। ভোর বেলাতেই আমি লোক পাঠিয়ে দিয়েছি।

এই সংবাদ শুনিয়া অপূর্ব্ব শুধু নিশ্চিন্ত নয়, তাহার মনের উপর হইতে একটা সত্যকার বোঝা নামিয়া গেল। কাল রাত্রে কিরিবার পথে ফিরিয়া আসিয়া, খাওয়া শোয়া, সকল কাজে সকল কথার মধ্যে এই ভাবনাই বহুবার তাহাকে ধাক্কা মারিয়া গেছে, কি জানি, কাল কালে তেওয়ারী হয়ত তাহার কথা বিশ্বাস করিবে কি না। এই ব্রহ্মদেশের কতপ্রকার অনুশ্রুতিই না প্রচলিত আছে,—হয়ত, বাড়ীতে মায়ের কাছে কি একটা লিখিয়া দিবে, না হয়ত, ফিরিয়া গিয়া খুন করিবে,—পাকা কালার মত, কাদা গেলেও যাহার দাগ মুছিবে না—এই তুচ্ছ বস্তুটার ছোট্ট কাঁটার মত তাহার পায়ে প্রতি পদক্ষেপেই খচ্ খচ্ করিতেছিল। এতক্ষণ পরে সে যেন নির্ভয়ে পা ফেলিয়া বাঁচিল। তেওয়ারী আর যাহাই করুক, ভারতীর মুখের কথা সে মারিয়া গেলেও অবিশ্বাস করিবে না। যে ছাড়-পত্র ভারতী লিখিয়া দিয়াছে তাহার চেয়ে নিষ্কলঙ্কতার বড় দলিল তেওয়ারীর কাছে যে আর নাই অপূর্ব্ব তাহা

* সম্পূর্ণ সংরক্ষিত

BLOCKED INFORMATION.

চোর

কম্পিত পদ সচকিত আঁখি
মন্দির মাঝে মোর,
হাতে হাতে আজ ধরা যে পড়িলে
ওগো সুন্দর চোর!
নলিন নয়নে ভয় ভরা দিঠি
পল্লব থর থর—
আপনার ধন করিতে গ্রহণ
কম্পিত দু'টি কর।
মধুর অধরে কি যেন কিসের
গোপন বারতা কহে—
কাঁপে সুকুমার তনুখানি যেন
ধরা পড়িবার ভয়ে।
ওগো তস্কর! তুমি কি জান না?
গৃহস্থ ঘুমহীন;
তোমারি আসার পথে আঁখি তা'র
অপলক নিশিদিন।
তোমারি লাগিয়া ওগো বাঞ্ছিত!
সাজানো বাসর এ যে—
নিশি অবশেষে পিছন দুয়ারে
বর! এলে চোর সেজে'।
মোর দোষ নাই যদি আজি তুমি
লাঞ্ছিত হও রাজা!
সাধে সাধে চোর সাজিলে যেমন
সে তব উচিত সাজা।

শ্রীসুশীলাসুন্দরী দেবী

পথের দাবী *

(১৪)

ভারতী ও অপূর্ব্ব দুজনেই পিছনের বন্ধ দরজার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল, কিন্তু কেহই কোন কথা কহিল না। অপূর্ব্ব কিছুই না বুঝিয়াও এটুকু বুঝিল যে, এমন করিয়া যে-লোক নিজেকে স্বেচ্ছায় বন্দী করিয়া রাখিল তাহার সম্বন্ধে কৌতূহলী হইতে নাই। উভয়ে নীরবে হোটেলের বাহিরে আসিতে ভারতী কহিল, চলুন অপূর্ব্ব বাবু, আমরা সরে যাই—

কিন্তু, আমার যে আবার আফিসের বেলা—

রবিবারেও আফিস?

রবিবার? তাই ত বটে! অপূর্ব্ব খুসি হইয়া বলিল, একথা সকালে মনে হলে নাওয়া-খাওয়ার জন্যে আর ব্যস্ত হতে হোতো না। আপনার এত জিনিস মনে থাকে, কিন্তু এটুকু ভুলে গিয়াছিলেন।

ভারতী একটু হাসিয়া বলিল, তা' হবে। কিন্তু কাল রাত্রে আপনার না-খাওয়ার ক[illegible]নি।

অপূর্ব্ব হঠাৎ দাঁড়াইয়া কহিল, আমার দেরি করবার যো নেই, তেওয়ারী বেচারা হয়ত ভেবে সারা হয়ে যাচ্ছে।

ভারতী বলিল, যাচ্ছে না। তার কারণ, আপনি জাগ[illegible] পূর্ব্বেই সে খবর পেয়েছে আপনি কুশলে আছেন।

সে জানে আমি আপনার কাছে আছি?

ভারতী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, জানে। ভোর বেলাতেই আমি লোক পাঠিয়ে দিয়েছি।

এই সম্বাদ শুনিয়া অপূর্ব্ব শুধু নিশ্চিন্ত নয়, তাহার মনের উপর হইতে একটা সত্যকার বোঝা নামিয়া গেল। কাল রাত্রে ফিরিবার পথে, ফিরিয়া আসিয়া, খাওয়া শোয়া, সকল কাজে সকল কথার মধ্যে এই ভাবনাই বহুবার তাহাকে ধাক্কা মারিয়া গেছে, কি জানি, কাল সকালে তেওয়ারী ব্যাটা তাহার কথা বিশ্বাস করিবে কি না। এই ব্রহ্মদেশের কতপ্রকার জনশ্রুতিই না প্রচলিত আছে,—হয়ত, বাড়ীতে মায়ের কাছে কি একটা লিখিয়া দিবে, না. হয়ত, ফিরিয়া গিয়া গল্প করিবে,—পাকা কালীর মত, কালী গেলেও যাহার দাগ মুছিবে না—এই তুচ্ছ বস্তুটাই ছোট্ট কাঁটার মত তাহার পায়ে প্রতি পদক্ষেপেই খচ্ খচ্ করিতেছিল। এতক্ষণ পরে সে যেন নির্ভয়ে পা ফেলিয়া বাঁচিল। তেওয়ারী আর যাহাই করুক, ভারতীর মুখের কথা সে মরিয়া গেলেও অবিশ্বাস করিবে না। যে ছাড়-পত্র ভারতী লিখিয়া দিয়াছে তাহার চেয়ে নিষ্কলঙ্কতার বড় দলিল তেওয়ারীর কাছে যে আর নাই অপূর্ব্ব তাহা

* সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত

BLOCKED INFORMATION.

ভাল করিয়াই জানিত। পুলকিতচিত্তে কহিল, আপনার সকল দিকে চোখ আছে। বাড়ীতে বৌদিদিদেরও দেখেচি, অন্য সব মেয়েদেরও দেখেচি, আমার মাকেও দেখেচি, কিন্তু এমন সর্ব্ব দিকে দৃষ্টি আমি কাউকে দেখি নি। বাস্তবিক বলচি আপনি যে বাড়ীর গৃহিণী হবেন সে বাড়ীর লোকেরা খুব চোক বুজে দিন কাটিয়ে দেবে, কখনো কাউকে দুঃখ পেতে হবে না এ আমি লিখে দিতে পারি।

ভারতীর মুখের উপর দিয়া যেন অকস্মাৎ বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। অপূর্ব্ব ইহার কিছুই দেখিল না, সে পিছনে আসিতেছিল, পিছনে হইতেই পুনরায় কহিল, এই বিদেশে আপনি না থাকলে আমার কি হোত বলুন ত। সমস্ত চুরি যেত, তেওয়ারী হয়ত ঘরেই মরে থাকতো,—বামুনের ছেলেকে মেথর মুর্দ্দফরাসে টানা হেঁচড়া কোরত,—এই ভয়ানক সম্ভাবনায় তাহার গায়ে কাঁটা দিয়া গেল। একটু থামিয়া কহিল,—আমিই কি আর থাকতে পারতাম? চাকরি ছেড়ে দিয়ে হয়ত চলে যেতে হোতো, তারপরে আবার যা-কে তাই। সেই বউদিদিদের গঞ্জনা আর মায়ের চোখের জল। আপনিই ত সব। সমস্ত বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

ভারতী বলিল, বটে, এসেই আমার সঙ্গে ঝগড়া করেছিলেন।

অপূর্ব্ব লজ্জা পাইয়া কহিল, সমস্ত ওই তেওয়ারী ব্যাটার দোষ [illegible] শুনলে আপনাকে যে কত আশীর্ব্বাদ করবেন তা আপনি [illegible]

[illegible] জানবো? মা এলেই ত তবে তাঁর মুখ থেকে শুনতে পাবো?

অপূর্ব্ব আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, [illegible] বর্ম্মায়? আপনি বলেন কি?

ভারতী জোর দিয়া কহিল, কেন যাবেন না,—কত লোকেরই ত মা নিত্য আসচেন। এখানে এলেই কি কারও জাত যেতে পারে নাকি?

অপূর্ব্ব ঘরে ঢুকিয়া সেই আরাম চৌকিটাতেই পুনরায় আসিয়া বসিল। পাশের জানালা দিয়া মুখে রোদ লাগিতেই কথায় কথায় উভয়েই পুনরায় ভারতীর ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। অপূর্ব্ব সেই আরাম চৌকিটায় বসিতে পাশের জানালা দিয়া মুখে তাহার রৌদ্র আসিয়া পড়িল। ভারতী হাত বাড়াইয়া বন্ধ করিয়া দিয়া কহিল, বৌদিদিরা মাকে তেমন যত্ন করেন না, এবং আপনাকে চিরকাল যদি বিদেশে চাকরি করেই কাটাতে হয়, এ বয়সে তাঁর সেবা কে করবে বলুন ত?

অপূর্ব্ব কহিল, মা বলেন ছোট বৌ এসে তাঁর সেবা করবে।

ভারতী বলিল, আর সে যদি সেবা না করে? আপনি থাকবেন বিদেশে, বড় জায়েদের দেখে সে যদি তাঁদের মতই হয়ে দাঁড়ায়, মাকে যত্ন না করে কষ্ট দিতেই সুরু করে, কি করবেন বলুন ত?

অপূর্ব্ব ভীত হইয়া কহিল, সে রকম কখনো হবে না। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের বংশ থেকে এসে কিছুতেই মাকে দুঃখ দিতে পারবে না আপনাকে আমি নিশ্চয় বলচি।

নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের বংশ? এই বলিয়া ভারতী মুচকিয়া শুধু একটু হাসিয়া কহিল, এখন থাক, যদি প্রয়োজন হয় ত সে গল্প আপনার কাছে অন্য একদিন কোরব। ক্ষণকাল নিঃশব্দে থাকিয়া প্রশ্ন করিল, কেবল মাত্র মায়ের সেবা করবার জন্যই যাকে বিবাহ করে আপনি ফেলে আসবেন, তাতে কি তার প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হবে না?

অপূর্ব্ব তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া স্বীকার করিয়া বলিল, তা' হবে।

ভারতী কহিল, এবং এই অবিচারের বদলে তার কাছ থেকে নিজে সুবিচার দাবী করবেন?

অপূর্ব্ব অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া শেষে আস্তে আস্তে বলিল, কিন্তু এ ছাড়া আর আমার উপায় কি ভারতী?

ভারতী কহিল, উপায় না থাকতে পারে, কিন্তু এ অসম্ভব আপনি অতি বড় নিষ্ঠাবানের ঘর থেকেও প্রত্যাশা করবেন না। এর ফল কখনো ভাল হবে না। আপনার নিষ্ঠুরতার বদলে যতই সে নিজের কর্ত্তব্য পালন করবে, ততই তার কাছে আপনি ছোট হয়ে যাবেন। স্ত্রীর কাছে ক্ষয়, হীন হওয়ার চেয়ে বড় দুর্ভোগ সংসারে আর নেই অপূর্ব্ব বাবু।

কথাটা এত [illegible] যে অপূর্ব্ব নিরুত্তর হইয়া রহিল। শাস্ত্রমতে স্ত্রীর কর্ত্তব্য কি, পতিব্রতা কাহাকে বলে, নিঃ [illegible] কতখানি সহ্যগুণ, স্বামীর [illegible] পালন করায় কিরূপ পুণ্য ইত্যাদি নানাবিধ উপাখ্যান সে শাস্ত্রগ্রন্থাদি হইতে [illegible] করিয়া বন্ধু মহলে আধুনিকতার বিরুদ্ধে লড়াই করিবার [illegible] করিয়া তাহাদের স্তব্ধ করিয়া দিয়াছে, কিন্তু এই খৃষ্টান মেয়েটির সম্মুখে তাহার আভাসমাত্রও উচ্চারণ করিতে তাহার মুখ ফুটিল না। খানিক পরে সে কতকটা যেন আপনাকে আপনি বলিল, বাস্তবিক, আজকালকার দিনে এ রকম মেয়ে বোধহয় কেউ নেই।

ভারতী হাসিল, কহিল, একেবারে কেউ নেই তা কেমন কোরে বলবেন? নিষ্ঠাবানের ঘরে না থাকলেও হয়ত, আর কোথাও কেউ থাকতে পারে যে আপনার জন্যে নিজেকে সম্পূর্ণ জলাঞ্জলি দিতে পারে, কিন্তু তাকে আপনারা খুঁজে পাবেন কোথায়?

অপূর্ব্ব নিজের চিন্তাতেই ছিল, ভারতীর কথায় মন দেয় নাই, কহিল সে তো বটেই।

ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কবে বাড়ী যাবেন?

অপূর্ব্ব অন্যমনস্কের মতই জবাব দিল, কি জানি, মা কবে চিঠি লিখে পাঠাবেন। কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া বলিতে লাগিল, বাবার সঙ্গে মতের অমিল নিয়ে মা আমার কোন দিন জীবনে সুখ ভোগ করেন নি। সেই মাকে একলা ফেলে রেখে আসতে আমার কিছুতে মন সরে না। কি জানি, এবার গেলে আর ফিরে আসতে পারবো কি না। হঠাৎ ভারতীর মুখের প্রতি দৃষ্টি স্থির করিয়া কহিল, দেখ ভারতী, বাইরে থেকে দেখতে আমাদের সাংসারিক অবস্থা যতই স্বচ্ছল

হোক্, ভিতরে কিন্তু বড় অনাটন! সহরে অধিকাংশ গৃহস্থেরই এম্‌নি দশা। বৌদিদিরা যে-কোন দিন আমাদের পৃথক করে দিতে পারেন। আমি ফিরে যদি না আস্‌তে পারি ত আমাদের কষ্টের হয়ত সীমা থাক্‌বে না।

ভারতী বলিল, আপনাকে আস্‌তেই হবে।

মায়ের কাছ থেকে চিরদিন আলাদা হয়ে থাক্‌বো?

তাঁকে রাজি করে সঙ্গে নিয়ে আসুন। আমি নিশ্চয় জানি, তিনি আস্‌বেন।

অপূর্ব্ব হাসিয়া কহিল, কখ্‌খনো না। মাকে তুমি জানো না। আচ্ছা, ধরই যদি তিনি আসেন, তাঁকে দেখ্‌বে কে এখানে?

ভারতীও হাসিয়া কহিল, আমি দেখ্‌বো।

আপনি? আপনি ঘরে ঢুকলেই ত মা হাঁড়ি ফেলে দেবেন।

ভারতী জবাব দিল, কতবার দেবেন? আমি রোজ রোজ ঘরে ঢুক্‌বো। দুজনেই হাসিয়া উঠিল। ভারতী সহসা গম্ভীর হইয়া কহিল, আপনি নিজেও ত ওই হাঁড়ি-ফেলার দলে, কিন্তু হাঁড়ি ফেলেই দিলে যদি সব ল্যাঠা চুকে যেতো, পৃথিবীর সমস্যা তাহলে খুব সহজ হয়ে উঠ্‌তো। বিশ্বাস না হয় তেওয়ারীকে জিজ্ঞাসা করে দেখ্‌বেন।

অপূর্ব্ব স্বীকার করিয়া কহিল, তা সত্যি। [illegible] লবে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে [illegible] ভবে। আপনাকে সে এত ভক্তি করে যে, একটু জপালে হয়ত সে কৃষ্টান হতেও রাজী হয়ে পড়ে[illegible] না।

ভারতী কহিল, সংসারে বলা কিছু যায় না। চাকরের কথাও না, মনিবের কথাও না। এই বলিয়া সে হাসি গোপন করিতে যখন মুখ নিচু করিল, তখন অপূর্ব্বর নিজের মুখখানা একেবারে আরক্ত হইয়া উঠিল, কহিল, সংসারে এটুকু কিন্তু স্বচ্ছন্দে বলা যেতে পারে যে চাকর ও মুনিবের বুদ্ধির তারতম্য থাক্‌তে পারে।

ভারতী মুখ তুলিয়া বলিল, আছেই ত। সেই জন্যে তার রাজী হতে দেরি হতে পারে, কিন্তু আপনার হবে না। তাহার চোখের দৃষ্টি চাপা হাসির বেগে একেবারে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, অপূর্ব্ব পরিহাস বুঝিতে পারিয়া খুসি হইয়া কহিল, আচ্ছা তামাসা নয়, বাস্তবিক বলুচি, আমি ধর্ম্ম ত্যাগ করতে পারি এ আপনি ভাব্‌তে পারেন?

ভারতী কহিল, পারি।

সত্যি পারেন?

সত্যিই পারি।

অপূর্ব্ব কহিল, অথচ, সত্যিই আমি প্রাণ গেলেও পারি নে।

ভারতী বলিল, প্রাণ যাওয়া কি জিনিস সে তো আপনি জানেন না। তেওয়ারী জানে।

কিন্তু, এ নিয়ে তর্ক করে আর কি হবে, আপনার মত অন্ধকারের মানুষকে আলোতে আনার চেয়ে ঢের বেশী জরুরি কাজ আমার এখনো বাকি। আপনি বরঞ্চ একটু ঘুমোন্।

অপূর্ব্ব বলিল, দিনের বেলায় আমি ঘুমুই নে। কিন্তু জরুরি কাজটা আবার আপনার কি?

ভারতী কহিল, আপনার বেগার খেটে বেড়ানোই আমার একমাত্র জরুরি কাজ নাকি? আমাকেও দুটি রেঁধে খেতে হয়। ঘুমুতে না পারেন আমার সঙ্গে নিচে চলুন। আমি কি কি রাঁধি কেমন করে রাঁধি দেখ্‌বেন। হাতে যখন একদিন খেতেই হবে তখন একেবারে অনভিজ্ঞ থাকা ভাল নয়। এই বলিয়া সে সহসা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

অপূর্ব্ব কহিল, আমি মরে গেলেও আপনার হাতে খাবো না।

ভারতী বলিল, আমি বেঁচে থেকে খাবার কথাই বল্‌চি। এই বলিয়া সে হাসিমুখে নিচে নামিয়া গেল।

অপূর্ব্ব ডাকিয়া কহিল, আমি তা'হলে এখন বাসায় যাই,—তেওয়ারী বেচারা ভেবে সারা হচ্চে। এই বলিয়া সে কিয়ৎকাল জবাবের জন্য উৎকর্ণ হইয়া থাকিয়া অবশেষে হেলান দিয়া শুইয়া [illegible] হয়ত, সে শুনিতে পায় নাই, হয়ত, শুনিয়াও উত্তর দেয় নাই, কিন্তু ইহাই বড় সমস্যা নয়; বড় সমস্যা [illegible] বিলম্বে বাসায় যাওয়া উচিত। কোন অজুহাতেই আর দেরি করা সাজেনা। অথচ, ভিতর হইতে যাওয়ার [illegible] লাগিল, ততই কিন্তু দেহ যেন তাহার অলসশিথিল হইয়া আসিতে লাগিল। শেষকালে সেই বড় চেয়ারের উপরেই মুখের উপর হাত চাপা দিয়া অপূর্ব্ব ঘুমাইয়া পড়িল।

(১৫)

বেলা যে যায়! উঠুন!

অপূর্ব্ব চোখ রগড়াইয়া উঠিয়া বসিল। দেয়ালের ঘড়ির প্রতি চাহিয়া কহিল, ইস্! তিন-চার ঘণ্টার কম নয়! আমাকে তুলে দেননি কেন? বাঃ—মাথায় একটা বালিশ পর্য্যন্ত কখন্ দিয়ে দিয়েছেন। এতে কি আর কারও ঘুম ভাঙে!

ভারতী কহিল, ঘুম ভাঙ্‌বার হলে তখনি ভাঙ্‌তো। এটা না দিলে মাঝে থেকে ঘাড়ে শুধু একটা ব্যথা হোতো। যান্, মুখ-হাত ধুয়ে আসুন, সরকার মশায় জলখাবারের থালা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন,—তাঁর ঢের কাজ, একটু চট্‌পট্ করে তাঁকে ছুটি দিন।

দ্বারের বাহিরে সে লোকটি দাঁড়াইয়াছিল, মুখ বাড়াইয়া তাহার ত্বরা নিবেদন করিল।

নিচে হইতে হাত-মুখ ধুইয়া আসিয়া অপূর্ব্ব খাবার খাইয়া সুপারি, এলাচ প্রভৃতি মুখে দিয়া সন্তুষ্টচিত্তে কহিল, এবার আমাকে ছুটি দিন, আমি বাসায় যাই।

ভারতী মাথা নাড়িয়া বলিল, সেটি হচ্চে না। তেওয়ারীকে খবর দিয়েছি যে আফিসের

BLOCKED INFORMATION.

ফেরত কাল বিকালে আপনি বাসায় যাবেন, এবং খবর নিয়েচি যে সে সুস্থ দেহে, বহাল তবিয়তে ঘর আগ্‌লাচ্চে,—কোন চিন্তা নেই।

কিন্তু কেন ?

ভারতী বলিল, কারণ, সম্প্রতি আপনি আমাদের অভিভাবক। আজ সুমিত্রা দিদি অসুস্থ, নবতারা গেছেন নিমুখ বাবুকে সঙ্গে নিয়ে ওপারে, আপনাকে যেতে হবে আমার সঙ্গে। আপনার প্রতি প্রেসিডেণ্টের এই আদেশ। ওই ধুতি এনে রেখেচি, পরে নিয়ে চলুন।

কোথায় যেতে হবে ?

মজুরদের লাইনের ঘরে। অর্থাৎ, বড় বড় কারখানার ক্রোরপতি মালিকেরা ওয়ার্কমেনদের জন্যে লাইনবন্দী যে সব বকবুণ্ড তৈরি করে দিয়েছে সেইখানে। আজ রবিবারে ছুটির দিনেই সেখানে কাজ।

অপূর্ব্ব জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু সেখানে কেন ?

ভারতী উত্তর দিল, নইলে, পথের-দাবীর সত্যিকারের কাজ কি এই ঘরে হতে পারে ? একটু হাসিয়া কহিল, আপনি এ সভার আতবর সভ্য, সরজমিনে না গেলে ত কাজ কিছু বুঝ্‌তে পারবেন না অপূর্ব্ববাবু।

চলুন, বলিয়া অপূর্ব্ব আফিসের পোষাক ছাড়িয়া দিয়া প্রস্তুত হইয়া লইল। কি একটা বস্তু লুকাইয়া তাহার জামার পকেটে রাখিতে অপূর্ব্ব দেখিতে পাইয়া কহিল, ওটা আপনি নিচ্চেন ?

গাদা পিস্তল।

পিস্তল ? পিস্তল কেন ?

আত্মরক্ষার জন্যে।

ওর পাশ আছে ?

না।

অপূর্ব্ব বলিল, পুলিশে যদি ধরে ত আত্মরক্ষা দুজনেরই হবে। ক'বছর দেয় ?

দেবেনা,—চলুন।

অপূর্ব্ব নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, দুর্গা—শ্রীহরি। চলুন।

বড় রাস্তা ধরিয়া উত্তরে বর্ম্মা ও চিনা পল্লী পার হইয়া বাজারের পাশ দিয়া দুজনে প্রায় মাইল খানেক পথ হাঁটিয়া একটা প্রকাণ্ড কারখানার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং বন্ধ ফটকের কাটা দরজার ফাঁক দিয়া গলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। ডানদিকে সারি সারি করোগেট লোহার গুদাম ও তাহারই ও-ধারে কারিগর ও মজুরদিগের বাস করিবার ভাঙা কাঠ ও ভাঙা টিনের লম্বা লাইনবন্দী বস্তি। সুমুখ দিকে সারি-সারি কয়েকটা জলের কল, এবং পিছন দিকে

এমনি সারি সারি টিনের পায়খানা। গোড়াতে হয়ত দরজা ছিল, এখন থলে ও চট-ছেঁড়া ঝুলিতেছে। ইহাই ভারতবর্ষীয় কুলি-লাইন। পঞ্জাবী, মাদ্রাজী, বর্ম্মা, বাঙালী, উড়ে, হিন্দু, মুসলমান স্ত্রী ও পুরুষে প্রায় হাজার খানেক জীব এই ব্যবস্থাকে আশ্রয় করিয়া দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া চলিয়াছে।

ভারতী কহিল, আজ কাজের দিন নয়, নইলে এই জলের কলেই দু'একটা রক্তা-রক্তি কাণ্ড দেখ্‌তে পেতেন।

অপূর্ব্ব ঘাড় নাড়িয়া বলিল, ছুটির দিনের ভিড় দেখেই তা' অনুভব কর্‌তে পারচি।

এই জনতার সম্মুখেই একজন মাদ্রাজি স্ত্রীলোক পর্দ্দা ঠেলিয়া পায়খানায় ঢুকিতেছিল, পর্দ্দার অবস্থা দেখিয়া অপূর্ব্ব লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিয়া বলিল, পথের-দাবী করতে হয় ত আর কোথাও শীঘ্র চলুন, এখানে আমি দাঁড়াতে পারব না।

ভারতী নিজেও তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল, কিন্তু প্রত্যুত্তরে শুধু কটুখানি হাসিল। অর্থাৎ মানুষের ধাপ হইতে নামাইয়া যাহাদের পশু করিয়া তোলা হইয়াছে তাহাদের আবার এ সকল বালাই কেন ?

এমন সময়ে ঘর উভয়ে আসিয়া একজন বাঙালী মিস্ত্রির ঘরে প্রবেশ করিল। লোকটার বয়স হইয়াছে, কারখানায় কাজ করে, মদ খাইয়া কাঠে মেঝের উপর পড়িয়া অত্যন্ত মুখ খারাপ করিয়া কাহাকে গালি পাড়িতেছিল, ভারতীর সাড়া পাইয়া আর ওপরে রাগ কোরচ ? সুশীলা কই ? সে আজ দুদিন পড়তে যায় না কেন ?

মাণিক কোন মতে হাতে-পায়ে ভর দিয়া উঠিয়া বসিল, চোখ চাহিয়া চিনিতে পারিয়া বলিল, দিদিমণি ? এস, বোসো। সুশী কি করে তোমার ইস্কুলে যাবে বল ? রাঁধা বাড়া বাসন মাজা মায় ছেলেটাকে সাম্‌লানো পর্য্যন্ত—বুক ফেটে যাচ্চে দিদিমণি, যোদো শালাকে আমি খুন না করি ত আমি কৈবর্ত্ত থেকে খারিজ! বড় সাহেবকে এম্‌নি দরখাস্ত দেব যে শালার চাকরি খেয়ে দেব।

ভারতী সহাস্যে কহিল, তা' দিয়ো। আর বল ত না হয়, সুমিত্রাদিদিকে দিয়ে আমিই তোমার দরখাস্ত লিখে দেব। কিন্তু কাল আমাদের ফয়ার মাঠে মিটিং, তা' মনে আছে ত ?

এমন সময়ে বছর দশ-এগারোর একটি মেয়ে আসিয়া প্রবেশ করিল। সে অঞ্চলের ভিতর হইতে এক বোতল মদ বাহির করিয়া সাবধানে মেঝের উপর রাখিয়া কহিল, বাবা, ঘোঁড়া মার্কা মদ আর নেই, তাই টুপি মার্কা মদ নিয়ে এলুম। চারটে পয়সা বাকি রইল। দেখ বাবা, রাম আইয়া মাতাল হয়ে আমাকে কি বলছিল জানো ?

প্রত্যুত্তরে তাহার পিতা রামিয়ার উদ্দেশে একটা কদর্য্য ভাষা উচ্চারণ করিল। ভারতী কহিল, ওসব যায়গায় তুমি আর যেয়োনা। তোমার মা কোথায় সুশীলা ?

INFORMATION.

মা ? মা তো পরশু রাত্তিরে যদুকাকার সঙ্গে বেরিয়ে গিয়ে লাইনের বাইরে ঘর ভাড়া করেচে। মেয়েটা আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু বাপ গর্জ্জন করিয়া উঠিল,—করাচ্চি! এ বাবা বিয়ে করা পরিবার, বেউশ্যে নয়! এই বলিয়া সে অনিশ্চিত কম্পিত হস্তে ক্ষুর অভাবে ভাঙা খুন্তির ডগা দিয়া নূতন বোতলের ছিপি খুলিতে প্রবৃত্ত হইল।

ভারতী হঠাৎ তাহার অঞ্চলপ্রান্তে একটা প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিয়া পিছন ফিরিয়া দেখিল, অপূর্ব্বর মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হইয়া গেছে। কখনো সে ভারতীকে স্পর্শ করে নাই, কিন্তু এখন সে জ্ঞানই তাহার ছিল না। কহিল, চলুন এখান থেকে।

একটু দাঁড়ান।

না, এক মিনিট না। এই বলিয়া সে এক প্রকার জোর করিয়া তাহাকে বাহিরে আনিল। ঘরের ভিতরে মাণিক ছিপি বোতল ও খুন্তির বাঁট লইয়া বীর দর্পে গর্জ্জাইতে লাগিল যে, খুন করিয়া ফাঁসি যাইতে হয় সেও ভি আচ্ছা। সে দেশো গুণ্ডার ছেলে, সে জেল বা ফাঁসি কোনটাকেই ভয় করে না।

বাহিরে আসিয়া অপূর্ব্ব যেন অগ্নিকাণ্ডের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল,—হারামজাদা, নচ্ছার মাতাল! যেন পিশাচের নরককুণ্ড বানিয়ে রেখেচে। এখানে পা দিতে [illegible] বোধ হয় না?

ভারতী তাহার মুখের পানে চাহিয়া আস্তে আস্তে [illegible] কারণ, এ নরককুণ্ড ত [illegible] প্রায়শ্চিত্ত করচে।

অপূর্ব্ব কহিল, না এরা বাঁচুক আমি বানিয়েচি। মেয়েটার কথা শুনলেন! ওর মা যেন কোন্ তীর্থযাত্রা করেছে! নির্লজ্জ বেহায়া শয়তান! আর কখ্খনো যদি এখানে আসবেন ত টের পাবেন বলে দিচ্চি!

ভারতী একটুখানি হাসিয়া কহিল, আমি ম্লেচ্ছ কৃশ্চান, আমার এখানে আসতে দোষ কি?

অপূর্ব্ব রাগ করিয়া বলিল, দোষ নেই? কৃশ্চানের জন্যে কি সৎ-অসৎ বস্তু নেই, নিজেদের সমাজের কাছে তাদের জবাব-দিহি করতে হয় না?

ভারতী উত্তর দিল, কে আছে আমার যে জবাব-দিহি চাইবে? কার মাথা-ব্যথা পড়েচে আমার জন্যে, আপনিই বলুন?

অপূর্ব্ব সহসা কোন প্রত্যুত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া শুধু বলিল, এ সব আপনার চালাকি। আপনি ঘরে ফিরে চলুন।

আমাকে আরও পাঁচ যায়গায় যেতে হবে। আপনার ভাল না লাগে আপনি ফিরে যান।

ফিরে যান্ বল্লেই কি আপনাকে এখানে রেখে আমি যেতে পারি?

তা'হলে সঙ্গে থাকুন। আমুষের প্রতি মানুষে যত অত্যাচার করচে চোখ মেলে দেখ্তে শিখুন। কেবল ছোঁয়া-ছুঁয়ি বাঁচিয়ে, নিজে সাধু হয়ে থেকে ভেবেচেন পুণ্য সঞ্চয় করে একদিন

স্বর্গে যাবেন? মনেও করবেন না। বলিতে বলিতে ভারতীর মুখের চেহারা কঠোর এবং গলার স্বর তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল, এই মূর্ত্তি ও কণ্ঠ অপূর্ব্বর অত্যন্ত পরিচিত। ভারতী কহিল, ওই মেয়েটার মা এবং যদু যে অপরাধ করেছে সে শুধু ওদের দণ্ড দিয়েই শেষ হবে? আপনি তার কেউ নয়? কখ্খনো না! ডাক্তারবাবুকে না জানা পর্য্যন্ত আমিও ঠিক এম্নি করেই ভেবে এসেচি। কিন্তু আজ আমি নিশ্চয় জানি, এই নরককুণ্ডে যত পাপ জমা হবে তার ভার আপনাদের পর্য্যন্ত স্বর্গের দোর থেকে টেনে এনে এই নরক-কুণ্ডে ডোবাবে। সাধ্য কি আপনার এই দুষ্কৃতির ঋণশোধ না করে পরিত্রাণ পান্! আমরা নিজের গরজেই আসি অপূর্ব্ববাবু, এই উপলব্ধিই আমাদের পথের দাবীর সব চেয়ে বড় সাধনা। চলুন।

অপূর্ব্ব নিরীহ ও নিস্পৃহের ন্যায় কহিল, চলুন। ভারতীর কথা কিন্তু সে বুঝিতেও পারিল না, বিশ্বাসও করিল না।

কিছু দূরে একটা সেগুন গাছ ছিল, ভারতী আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া কহিল, ওই সাম্নে ক'ঘর বাঙালী থাকে,—চলুন।

অপূর্ব্ব জিজ্ঞাসা করিল, বাঙালী ভিন্ন অপর জাতের মধ্যে আপনারা কাজ করেন না?

ভারতী কহিল, করি। সকলকেই আমাদের প্রয়োজন, কিন্তু প্রসিডেণ্ট ছাড়া আর ত কেউ সকলের ভাষা জানে না। তিনি সব [illegible] কাজ তাঁরই, আমার নয়।

তিনি ভারতবর্ষের সমস্ত ভাষা জানেন?

জানেন।

আর ডাক্তার বাবু?

ভারতী আসিয়া বলিল ডাক্তারবাবুর সম্বন্ধে আপনার ভারি কৌতূহল। একথা আপনি বিশ্বাস করতে পারেন না কেন যে, পৃথিবীতে যা'কিছু জানা যায় তিনি জানেন। যা'কিছু পারা যায় তিনি পারেন। কে তাঁর সব্যসাচী নাম রেখেছিল আমরা কেউ জানিনে, কিন্তু তাঁর অসাধ্য তাঁর অজ্ঞাত সংসারে কিছু নেই। এই বলিয়া সে নিজের মনে চলিতেই লাগিল, কিন্তু তাহারই পিছনে সহসা থমকিয়া দাঁড়াইয়া অপূর্ব্বর মুখ দিয়া গভীর নিঃশ্বাস পড়িল। অকস্মাৎ এই কথাটা তাহার বুকের মধ্যে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল যে, এই হতভাগ্য পরাধীন দেশে এতবড় একটা প্রাণের কোন মূল্য নাই, যে-কোন লোকের হাতে যে-কোন মুহূর্ত্তে তাহা কুকুর শিয়ালের মতই বিনষ্ট হইতে পারে! সমস্ত জগৎ বিধাতে এতবড় নিষ্ঠুর অবিচার আর কি আছে? ভগবান মঙ্গলময় এই যদি সত্য, এ ভবে কাহার ও কোন পাপের দণ্ড?

উভয়ে একটা ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। ভারতী ডাকিল, পাঁচকড়ি কেমন আছ আজ?

অন্ধকার কোণ হইতে সাড়া আসিল, আজ একটু ভাল। এই বলিয়া একজন বুড়া গোছের লোক ডান হাতটা উঁচু করিয়া সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার আগাগোড়া কি কতকগুলা

BLOCKED INFORMATION.

প্রলেপ দেওয়া, কহিল, মা, মেয়েটা রক্ত আমাশায় বোধ হয় বাঁচবেনা, ছেলেটার আবার কাল থেকে বেহুঁস জ্বর, এমন একটা পয়সা নেই যে এক ফোঁটা ওষুধ কিনে দি, কি এক বাটি সাগু বার্লী রেঁধে খাওয়াই। তাহার দুই চোখ ছল্ ছল্ করিয়া অসিল।

অপূর্ব্বর মুখ দিয়া হঠাৎ বাহির হইয়া গেল, পয়সা নেই কেন?

এই অপরিচিত বাবুটিকে লোকটা কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, পুলির শেকল গেলে ডানহাতটা দু জখম হয়ে গেছে, মাসখানেক ধরে কাজে বার হতে পারিনি, পয়সা থাকবে কি করে বাবু মশায়?

অপূর্ব্ব প্রশ্ন করিল, কারখানার ম্যানেজার এর ব্যবস্থা করেন না?

পাঁচকড়ি কপালে একবার বাম হাতটা স্পর্শ করিয়া কহিল, হায়! হায়! দিন-মজুরদের আবার ব্যবস্থা! এতেই যদি কাজ করতে না পারো ত ঘর ছেড়ে দাও, আবার যখন ভাল হবে তখন এসো,—কাজ দেবে। এ অবস্থায় কোথায় যাই বলুন ত মশায়? ছোট সাহেবের হাতে পায়ে ধরে বড় জোর আর হপ্তা খানেক থাকতে পাবো। বিশ বচ্ছর কাজ করচি মশায়, এরা এম্‌নি নেমকহারাম!

কথা শুনিয়া অপূর্ব্ব রাগে জ্বলিতে লাগিল। তাহার এম্‌নি ইচ্ছা [illegible] লোকটাকে পায় ত কান ধরিয়া টানিয়া আনিয়া দেয়। অদিনে যাহা [illegible] লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়া দিয়াছে আজ তাহারা কি দুঃখই ভোগ করিতেছে! অপূর্ব্বদের বাটীর কাছে গরুর গাড়ীর আড্ডা, তাহার মনে পড়িল, এক জোড়া গরু সমস্ত জীবন ধরিয়া বোঝা টানিয়া অবশেষে বৃদ্ধ ও অক্ষম হইয়া পড়িলে লোকটা তাহাদের কসাইখানায় বিক্রী করিয়া দিয়াছিল। এই হৃদয়-হীনতা নিবারণ করিবার উপায় নাই, লোকে করেনা, কেহ করিতে চাহিলে সবাই তাহাকে পাগল বলিয়া উড়াইয়া দিবে। এই পথ দিয়া যখনই সে গিয়াছে, তখনই, এই কথা মনে করিয়া তাহার চোখে জল আসিয়াছে। গরুর জন্য নয়, কিন্তু অর্থের পিপাসায় এই বর্ব্বর নিষ্ঠুরতায় মানুষে আপনাকে আপনি কত ছোটই না প্রতিদিন করিয়া আনিতেছে! সহসা ভারতীর কথাটা স্মরণ করিয়া সে মনে মনে কহিল ঠিক কথাই ত! কে কোথায় করিতেছে আমি ত করিনা, অথবা, এম্‌নিই ত হয়, এই ত চিরদিন হইয়া আসিতেছে—এই বলিয়াই ত এত বড় ক্রটীর জবাব-দিহি হয় না! গরু-ঘোড়া শুধু উপলক্ষ। এই হাত-ভাঙা পাঁচকড়িটাও তাই। আপনাকে যে বাঁচাইতে পারেনা তাহার হত্যায়, যে দুর্ব্বল তাহার পীড়নে, যে নিরুপায় তাহার লজ্জাহীন বঞ্চনায় এই যে মানুষে আপনার হৃদয়-বৃত্তির জীবন হরণ করিতেছে, সবলের এই যে আত্মহত্যার অহোরাত্রব্যাপী উৎসব চলিয়াছে ইহার ইতি নিভিবে কবে? এই সর্ব্বনাশা উন্মত্ততার পরিসমাপ্তি ঘটিবে কোন্ পথ দিয়া? মরণের আগে কি আর তাহার চেতনা ফিরিবেনা!

ঘরের একধারে মলিন, শতছিন্ন শয্যায় ছেলে-মেয়ে দুটা মৃতকল্পের ন্যায় পড়িয়াছিল,

ভারতী কাছে গিয়া তাহাদের গায়ে হাত দিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিল। অপূর্ব্ব [illegible] যাইতে পারিল না, কিন্তু দরিদ্র, পীড়িত শিশু দুটির নিঃশব্দ বেদনা তাহার বুকের মধ্যে [illegible] ঘা মারিতে লাগিল। সে সেইখানে দাঁড়াইয়া উচ্ছ্বসিত আবেগে আপনাকে আপনি বা[illegible] লোকে বলে, এই ত দুনিয়া! এম্‌নি ভাবেই ত সংসারের সকল কাজ চিরদিন হই[illegible] কিন্তু এই কি যুক্তি! পৃথিবী কি শুধু অতীতেরই জন্য! মানুষ কি কেবল তাহার [illegible] লইয়া অচল হইয়া থাকিবে! নূতন কিছু কি সে কল্পনা করিবেনা! উন্নতি ক[illegible] হইয়া গেছে! যারা বিগত, যাহা মৃত কেবল তাহারই ইচ্ছা, তাহারই বিধান [illegible] সকল জীবন, সকল বড় হওয়ার দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া চিরকাল ধরিয়া প্রভু[illegible]

চলুন।

অপূর্ব্ব চমকিয়া দেখিল ভারতী। পাঁচকড়ি নীরবে, ম্লান মুখে [illegible] করিয়া ভারতী, স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, ভয় নেই তোমার এরা সেরে উঠ[illegible] ডাক্তার, ওষুধ পথ্য সব পাঠিয়ে দেব—— [illegible] কাল সকালেই আমি

[illegible] কথা শেষ না হইতেই অপূর্ব্ব পকেটে হাত দিয়া টাক[illegible] হাত ভারতী হাত [illegible] পিয়া ধরিয়া নিবারণ করিল। পাঁচকড়ির [illegible] বাহির করিতেছিল, সেই দেখিতে পাইল না, কিন্তু অপূর্ব্ব [illegible] হেতু বুঝিল না। ভারতী তখন [illegible] হইতে চার আনার পয়সা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া কহিল, [illegible] নিজের জামার পকেট চার পয়সার সাগু, আর বাকি দু আনার চাল ডাল এনে তুমি [illegible] বেলার মত খাও পাঁচকড়ি, কাল তোমার ব্যবস্থা করে দেব। আজ আমরা চল্‌লাম। এই বলিয়া অপূর্ব্বকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইয়া আসিল।

পথে আসিতে অপূর্ব্ব ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, আপনি ভারি কৃপণ। আমাকেও দিতে দিলেন না, নিজেও দিলেন না!

ভারতী কহিল, দিয়েই ত এলাম।

একে দিয়ে আসা বলে? তার এই দুঃসময়ে পাই-পয়সার হিসেব করে চার আনা মাত্র হাতে দেওয়া ত শুধু অপমান।

ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কত দিতে যাচ্ছিলেন?

অপূর্ব্ব ঠিক কিছুই করে নাই, খুব সম্ভব হাতে যাহা উঠিত, তাই দিত, কিন্তু এখন ভাবিয়া বলিল, অন্ততঃ গোটা পাঁচেক টাকা।

ভারতী জিভ্ কাটিয়া কহিল, ওরে বাপ্‌রে! সর্ব্বনাশ করেছিলেন আর কি, বাপ ও মা খেয়ে সারারাত বেহুঁস হয়ে পড়ে থাকতো, কিন্তু ছেলে-মেয়ে দুটো মরে যেতো।

মদ খেতো।

BLOCKED INFORMATION.

খেতে ! হাতে টাকা পেলে মদ খায়না এমন অসাধারণ ব্যক্তি সংসারে কে আছে ?

অপূর্ব্ব ক্ষণকাল অভিভূতের ন্যায় স্তব্ধভাবে থাকিয়া বলিল, আপনার সব কথায় তামাসা। চিকিৎসার টাকায় বাপ মদ কিনে খাবে, এ কি কখনো সত্যি হতে পারে ?

রুগ্ন সন্তানের কহিল, সত্যি না হয় ত আপনি যে ঠাকুরের দিব্যি করতে বল্‌বেন,—মা মনসা,

ভারতী হাসিয়া ফেলিয়াই কিন্তু আপনাকে তৎক্ষণাৎ সংযত করিয়া লইয়া বলিল, নইলে, ওলা বিবি—হয় ধরে দুঃখীকে পেতে দেবনা; সত্যি বলুন ত আমি কি এতই ছোট ?

দাতার হাত চেপে করিল, এদের মা নেই ?

অপূর্ব্ব জিজ্ঞা

না।

কোথায় কোন আত্মীয়ও নেই বোধ করি ?

কোথায় কোন অ[illegible] থাকলেও কাজে লাগ্‌বে না। বছর দশ বারো পূর্ব্বে পাঁচকড়ি একবার ভারতী বলিল, থ[illegible] প্রতিবেশীর বিধবা মেয়েকে ভুলিয়ে সাগর পার করে নিয়ে আসে। দেশে যায়, কোন এ[illegible]। বছর দুই হল, গলায় দড়ি দিয়ে সে ভব যন্ত্রণা এড়িয়েছে,—এই ত ছেলে মেয়ে দুটী তার[illegible] হাস।

পাঁচকড়িদের সংক্ষিপ্ত ই[illegible] বলিয়া কহিল, নরককুণ্ডই বটে !

অপূর্ব্ব নিঃশ্বাস [illegible] সহজকণ্ঠে মাথা নাড়িয়া বলিল, [illegible] লেশমাত্র মতভেদ নাই। [illegible] এরা সব ভাই-বোন্। রক্তের সম্বন্ধ অস্বীকার করেই রেহাই মিল্‌বেনা অপূর্ব্ব বাবু, উপরে বসে যে ব্যক্তিটি সমস্ত দেখ্‌চেন, তিনি কড়ায় গণ্ডায় এর কৈফিয়ৎ নিয়ে তবে ছেড়ে দেবেন।

অপূর্ব্ব গম্ভীর হইয়া বলিল, এখন মনে হচ্ছে যেন একেবারে অসম্ভব নয়। ক্ষণকাল পূর্ব্বে এই পাঁচকড়ির ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়াই যে সকল চিন্তা তাহার মনে হইয়াছিল, বিদ্যুদ্বেগে সেই সমস্তই আর একবার তাহার মনের মধ্যে বহিয়া গেল। বলিল, আমিও যখন মানুষ, তখন দায়িত্ব আছে বই কি।

ভারতী সায় দিল। বলিল, আগে আগে আমিও দেখ্‌তে পেতাম না, রাগকরে ঝগড়া করতাম। এই সব অজ্ঞান, দুঃখী, দুর্ব্বল-চিত্ত ভাই-বোনের ঘাড়ে অসহ্য পাপের বোঝা কে অহরহ চাপাচ্ছে এখন স্পষ্ট দেখ্‌তে পাই অপূর্ব্ব বাবু।

পাশের ঘরে একজন উড়িয়া মিস্ত্রি থাকে, তাহার পাশের ঘর হইতে মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ হাসি ও উচ্চ কোলাহল আসিতেছিল, পাঁচকড়ির ঘরের ভিতর হইতেও অপূর্ব্ব তাহা শুনিতে পাইয়াছিল। সেই ঘরে আসিয়া দুজনে উপস্থিত হইল। ভারতী ইহাদের পরিচিত, সকলে সমস্বরে তাহার অভ্যর্থনা করিল। একজন ছুটিয়া গিয়া একটা টুল ও একটা বেতের মোড়া আনিয়া উভয়কে বসিতে দিল। মলাবৃত কাঠের মেঝেতে বসিয়া ছয় সাত জন পুরুষ

ও আট দশ জন স্ত্রীলোকে মিলিয়া মদ খাইতেছিল। একটা ভাঙা হারমোনিয়াম ও একটা বাঁয়া মাঝখানে, নানা রংএর ও নানা আকারের খালি বোতল চতুর্দ্দিকে গড়াইতেছে, একজন বুড়া গোছের স্ত্রীলোক মাতাল হইয়া ঘুমাইতেছে, [illegible] বিবস্ত্রা বলিলেই হয়। যা[illegible] হইতে পঁচিশ ছাব্বিশ পর্য্যন্ত সকল বয়সের স্ত্রী পুরুষই বসিয়া গিয়াছে,—আজ রবিবার, [illegible] রুষদের ছুটির দিন। পিয়াজ-রশুনের তরকারির সঙ্গে মিশিয়া সস্তা জার্ম্মান মদের অবর্ণনী[illegible] গন্ধ অপূর্ব্বর নাকে লাগিতে তাহার গা বমি-বমি করিয়া আসিল। একজন অল্প-বয়সী স্ত্রী[illegible]লোকের হাতে মদের গেলাস ছিল, সে বোধহয় তখনও পাকা হইয়া উঠে নাই, হয়ত অল্প[illegible] পূর্ব্বেই গৃহত্যাগ করিয়াছে, সে বাঁ হাতে সজোরে নিজের নাক টিপিয়া ধরিয়া গেলাসটা [illegible]খে ঢালিয়া দিয়া তক্তার ফাঁক দিয়া অসংখ্য থুথু ফেলিতে লাগিল। একজন পুরুষ তাড়া[illegible]ড়ি তাহার মুখে খানিকটা তরকারি গুঁজিয়া দিল। বাঙালী মেয়ে মানুষকে চোখের সুমুখে মদ [illegible]াইতে দেখিয়া অপূর্ব্ব যেন একেবারে শীর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু সে আড়চোখে চাহিয়া দেখিল এ[illegible]ড় ভয়ঙ্কর বীভৎস দৃশ্যেও ভারতীর মুখের উপরে বিকৃতির চিহ্ন মাত্র নাই। এ সব তাহার সহি[illegible]য়া গেছে। কিন্তু ক্ষণেক পর[illegible]তীর ফরমাসে টুনি যখন গান ধরিল, এই যমুনা সেই যমুন[illegible]—এবং পাশের লোকটা হারমোনিয়াম টা[illegible] খামোকা একটা চাবি টিপিয়া প্রাণ[illegible] করিল, তখন, এত ভার [illegible] সহিল না। সে ব্যস্ত হই[illegible] বলিয়া উঠিল, মিস্ত্রি মশাই, কাল আমাদের মিটিং এ কথা বোধহয় ভোলনি ? যাওয়া [illegible] চাই—

চাই বই কি দিদিমণি। এই বলিয়া কালাচাঁদ একপাত্র মদ গলায় ঢালিয়া দিল।

ভারতী কহিল, ছেলেবেলায় পড়েচ ত খড় পাকিয়ে দড়ি করলে হাতি বাঁধা যায়। এক না হলে তোমরা কখনো কিছু করতে পারবেনা। কেবল তোমাদের ভালর জন্যেই সুমিত্রা দিদি কি পরিশ্রম করচেন বলত।

এ কথায় সকলে একবাক্যে সায় দিল। ভারতী বলিতে লাগিল, তোমরা ছাড়া কি এতবড় কারখানা একদিন চলে ? তোমরাই ত এর সত্যিকারের মালিক, এতো সোজা কথা কালাচাঁদ, এ তোমরা না বুঝতে চাইলে বুঝে কেন ?

সবাই বলিল, এ ঠিক কথা। তাহারা না চালাইলে সমস্ত অন্ধকার।

ভারতী কহিল, অথচ, তোমাদের কত কষ্ট একবার ভেবে দেখ দিকি। যখন-তখন বিনাদোষে সাহেবরা তোমাদের লাথি জুতো মেরে বার করে দেয়। এই পাশের ঘরেই দেখ কাজ করতে গিয়ে পাঁচকড়ির হাত ভেঙ্গেচে বলে আজ সে খেতে পায়না, তার ছেলে-মেয়ে দুটো ওষুধ পথ্যির অভাবে মারা যাচ্চে। ঘর থেকে পর্য্যন্ত বড় সাহেব তাকে দূর করে দিতে চায়। এই যে ক্রোর ক্রোর টাকা এরা লাভ করচে সে কাদের দৌলতে ? আর তোমরা পাও কতটুকু ? এই যে সেদিন শ্যামলালকে ছোট সাহেব ঠেলে ফেলে দিলে, আজও সে হাঁসপাতালে, এ তোমরা সহ্য করবে কেন ? একবার

BLOCKED INFORMATION.

সবাই এক হ[illegible] দাঁড়িয়ে জোর করে বলত, এ নির্য্যাতন আমরা আর সইব না, কেমন তোমাদের গায়ে হাত দি[illegible] সাহস করে দেখি! কেবল একটিবার তোমাদের সত্যিকার জোরটুকু তোমরা চেয়ে দেখ্‌তে শেখে[illegible]—আর আমরা তোমাদের কাছে কিছুই চাইনে কালাচাঁদ!

একজন[illegible] মাতাল এতক্ষণ হাঁ করিয়া শুনিতেছিল, সে কহিল, বাবা! পারিনে কি? এমন একটি ব[illegible] ঢিল করে রেখে দিতে পারি যে—কড়্ কড়্ কড়াৎ! ব্যস্! অর্দ্ধেক কারখানাই ফর্‌সা।

ভারতী সভয়ে[illegible] বলিয়া উঠিল, না না, দুলাল, ওসব কাজ কখ্‌খনো কোরোনা! ওতে তোমাদেরই সর্ব্বনাশ। [illegible]য়ত, লোক মারা যাবে, হয়ত,—না না, এ সব কথা স্বপ্নেও ভার্‌তে যেয়োনা দুলাল। ওর চেয়ে ভয়ান[illegible] পাপ আর নেই!

লোকটা মাতালের [illegible]সি হাসিয়া বলিল, নাঃ—তা'কি আর জানিনে! ও শুধু কথার কথা বল্‌চি আমরা পারিনে কি [illegible]

ভারতী বলিতে লা[illegible]গিল, তোমাদের সৎপথে, সত্যিকার পথে দাঁড়ানো চাই—তাতেই তোমরা সমস্ত পাবে। ওদের কা[illegible] তোমাদের বহু বহু টাকা পাওনা,—তাই কেবল কড়ায় [illegible] করে নিতে হবে।

মেয়ে পুরুষে এই[illegible] লইয়া গণ্ডগোল করিতে লাগিল [illegible]হল, সন্ধ্যা হয়, এখনো [illegible] আমরা তবে এখন আসি, কিন্তু কালকের কথা যেন কিছুতেই না ভুল হয়। এই বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

এই কালাচাঁদের আড্ডার সমস্ত ব্যাপারই অপূর্ব্বর অত্যন্ত বিশ্রী লাগিয়াছিল, কিন্তু শেষের দিকে যে সব আলোচনা হইল তাহাতে তাহার বিরক্তির অবধি রহিল না, বাহিরে আসিয়াই ভয়ানক রাগ করিয়া কহিল, তুমি এ সব কথা এদের বল্‌তে গেলে কেন?

ভারতী একটু আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি সব কথা?

অপূর্ব্ব তেমনি ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, ওই ব্যাটা হারামজাদা মাতাল! দুলাল না কি নাম—কি বল্‌লে শুন্‌লে ত? ধর এ কথা যদি সাহেবদের কানে যায়?

কানে যাবে কি করে?

আরে, এরাই বলে দেবে। এরা কি যুধিষ্ঠির নাকি? মদের ঝোঁকে কখন্ কি কাণ্ড করে বস্‌বে, তখন, তোমার নামেই দোষ হবে। হয়ত বল্‌বে তুমিই শিখিয়ে দিয়েছ।

কিন্তু সে তো মিছে কথা!

অপূর্ব্ব অধীর হইয়া বলিল, মিছে কথা! আরে, ইংরেজ রাজত্বে মিছে কথায় কখনো কারও জেল হয়নি নাকি? [illegible] ত মিছের ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

ভারতী বলিল, আমারও না হয় জেল হবে।

বাহিরের শাসন ছাড়াও যে চঞ্চলমতি যুবকগণকে সংযত ও সাধুশীল করা যায় ইহা দেখিয়া নন্দলাল গোস্বামী মহাশয় নাকি বিস্মিত হইয়াছিলেন এবং ছোট্ট প্রধান শিক্ষকটিকে আনিয়া তাঁর প্রথমে যে আশঙ্কা হইয়াছিল, অতি অল্পদিন মধ্যেই নাকি সে আশঙ্কা দূর হইয়া যায়।

চাত্‌রা স্কুলে অশ্বিনীকুমারের যে কর্ম্মজীবনের সূত্রপাত হয় বরিশালে যাইয়া তাহাই ফুটিয়া এবং গড়িয়া উঠে। প্রথমে অশ্বিনীকুমার ওকালতী ব্যবসায় অবলম্বন করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার প্রকৃতির সঙ্গে ইহা খাপ খাইল না। যে সকল উপাদানে ওকালতী ব্যবসায় জাঁকিয়া উঠে অশ্বিনীকুমারের সে সকলই ছিল। তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিল, সূক্ষ্মদর্শিনী বিচারশক্তি ছিল, অসাধারণ বাক্‌পটুতাও ছিল। এই সকলই ওকালতীর পুঁজি। আপনার প্রকৃতিকে চাপিয়া রাখিয়া বড় [illegible] এই ব্যবসা অবলম্বন করিয়া অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জ্জন [illegible] কাছে খাঁটি হইতে যাইয়া অল্পদিন [illegible] দিলেন। তখন শুনিয়াছি একবার সরকারী কর্ম্ম লইবার জন্যও [illegible] দত্ত মহাশয় খ্যাতনামা সদয়ালা ছিলেন। ইংরাজ [illegible] ছিল। ইচ্ছা করিলেই তিনি পুত্রকে [illegible] করাইয়া দিতে পারিতেন। [illegible] এবং সম্মানলাভ হউক না কেন, অনেক সময় মানুষের মনুষ্যত্বকে পঙ্গু [illegible] ভুক্তভোগী হইয়া ইহা বুঝিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজসেবা অবলম্বন করে, এই জন্য তিনি ইহা চাহেন নাই। মনে হয়, স্বদেশীর যুগে অশ্বিনীকুমারের মুখেই একথাটা শুনিয়াছিলাম। অশ্বিনীকুমার সরকারী চাকুরী গ্রহণের কল্পনা পরিত্যাগ করিয়া লোকশিক্ষাব্রত গ্রহণ করিলেন। চাত্‌রা স্কুলে তাঁহার যে সাধন এবং অভিজ্ঞতালাভ হইয়াছিল, তাহা [illegible] তিনি বরিশালে নিজে একটা উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার [illegible]ার গ্রহণ করেন। এইখানেই অশ্বিনীকুমারের জীবনব্যাপী কর্ম্মযোগের আরম্ভ হয়। [illegible] গোস্বামী মহাশয়ের আশ্রয়লাভ করেন নাই। কিন্তু নিজের প্রকৃতির প্রেরণায় [illegible] আত্মোৎসর্গ করেন।

অশ্বিনীকুমার কেবল স্কুলে ছাত্র পড়াইয়াই আপনার কর্ত্তব্য শেষ হইল মনে করিতেন না। ছাত্রদিগকে লইয়া দল বাধিয়া লোকসেবায় নিযুক্ত হইলেন। সে সময়ে বরিশালে বিসূচিকা প্রায় সারা বছরই লাগিয়া থাকিত। সম্প্রতি জলের কল হইয়া সহরের স্বাস্থ্য অনেকটা শোধরাইয়াছে। গ্রামের লোকেরা মামলা-মোকদ্দমা বা ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে সর্ব্বদাই সহরে যাতায়াত করিত। বিসূচিকার দ্বারা আক্রান্ত হইলে ইহাদের সেবাশুশ্রূষা করিবার কোনও ব্যবস্থা ছিল না। অনেক সময় ইহারা ঔষধ এবং পথ্য পাইত না। মরিলে সৎকারের জন্যও লোক জুটিত না। অশ্বিনীকুমার তাঁহার স্কুলের ছাত্রদিগকে লইয়া এ সকল অসহায় রোগীদিগের সেবার ব্যবস্থা করেন। রোগীর শুশ্রূষা, নিজেদের হাতে কলেরা রোগীর মলমূত্রাদি পরিষ্কার করা, ভিক্ষা করিয়া তাহাদের

BLOCKED INFORMATION.

সবাই এক হ[illegible] দাঁড়িয়ে জোর করে বলত, এ নির্য্যাতন আমরা আর সইব না, কেমন তোমাদের গায়ে হাত দি[illegible] সাহস করে দেখি! কেবল একটিবার তোমাদের সত্যিকার জোরটুকু তোমরা চেয়ে দেখ্‌তে শেখে[illegible]—আর আমরা তোমাদের কাছে কিছুই চাইনে কালাচাঁদ!

একজ[illegible] মাতাল এতক্ষণ হাঁ করিয়া শুনিতেছিল, সে কহিল, বাবা! পারিনে কি? এমন একটি ব[illegible] ঢিল করে রেখে দিতে পারি যে—কড়্ কড়্ কড়াৎ! ব্যস্! অর্দ্ধেক কারখানাই ফর্‌সা!

ভারতী সভয়ে[illegible] বলিয়া উঠিল, না না, দুলাল, ওসব কাজ কখ্‌খনো কোরোনা! ওতে তোমাদেরই সর্ব্বনাশ। [illegible]ত, লোক মারা যাবে, হয়ত—না না, এ সব কথা স্বপ্নেও ভার্‌তে যেয়োনা দুলাল। ওর চেয়ে ভয়ান[illegible] পাপ আর নেই!

লোকটা মাতালের [illegible]সি হাসিয়া বলিল, নাঃ—তা'কি আর জানিনে! ও শুধু কথার কথা বল্‌চি আমরা পারিনে কি [illegible]

ভারতী বলিতে লা[illegible]গিল, তোমাদের সৎপথে, সত্যিকার পথে দাঁড়ানো চাই—তাতেই তো[illegible]রা সমস্ত পাবে। ওদের কা[illegible]ই তোমাদের বহু বহু টাকা পাওনা,—তাই কেবল কড়ায় [illegible] করে নিতে হবে!

মেয়ে পুরুষে এই [illegible] লইয়া গণ্ডগোল করিতে [illegible]হল, সন্ধ্যা হয়, এখনো [illegible] আমরা তবে এখন আসি, কিন্তু কালকের কথা যেন কিছুতেই না ভুল হয়। এই বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

এই কালাচাঁদের আড্ডার সমস্ত [illegible]পারই অপূর্ব্বর অত্যন্ত বিশ্রী লাগিয়াছিল, কিন্তু শেষের দিকে যে সব আলোচনা হইল তাহাতে তাহার বিরক্তির অবধি রহিল না, বাহিরে [illegible] ভয়ানক রাগ করিয়া কহিল তুমি [illegible] কথা এদের বল্‌তে [illegible]লে কেন?

ভারতী একটু আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি সব কথা?

অপূর্ব্ব তেমনি ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলি[illegible] ওই ব্যাটা হারামজাদা [illegible] দুলাল না [illegible] কি বল্‌লে শুন্‌লে ত? ধর এ কথা যদি সাহেবদের কানে যায়?

কানে যাবে কি করে?

আরে, [illegible]রাই বলে দেবে। এরা কি যুধিষ্ঠির নাকি? মদের ঝোঁকে কখন্ কি কাণ্ড করে বস্‌বে, [illegible] তোমার নামেই দোষ হবে। হয়ত বল্‌বে তুমিই শিখিয়ে দিয়েছ।

কিন্তু সে তো মিছে কথা!

অপূর্ব্ব অধীর হইয়া [illegible], মিছে কথা! আরে, ইংরেজ রাজত্বে মিছে কথায় কখনো কারও জেল হয়নি নাকি? [illegible] মিছের ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

ভারতী বলিল, [illegible] হয় জেল হবে!

বাহিরের শাসন ছাড়াও যে চঞ্চলমতি যুবকগণকে সংযত ও সাধুশীল করা যায় ইহা দেখিয়া নন্দলাল গোস্বামী মহাশয় নাকি বিস্মিত হইয়াছিলেন এবং ছোট্ট প্রধান শিক্ষকটিকে আনিয়া তাঁর প্রথমে যে আশঙ্কা হইয়াছিল, অতি অল্পদিন মধ্যেই নাকি সে আশঙ্কা দূর হইয়া যায়।

চাত্‌রা স্কুলে অশ্বিনীকুমারের যে কর্ম্মজীবনের সূত্রপাত হয় বরিশালে যাইয়া তাহাই ফুটিয়া এবং গড়িয়া উঠে। প্রথমে অশ্বিনীকুমার ওকালতী ব্যবসায় অবলম্বন করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার প্রকৃতির সঙ্গে ইহা খাপ খাইল না। যে সকল উপাদানে ওকালতী ব্যবসায় জাঁকিয়া উঠে অশ্বিনীকুমারের সে সকলই ছিল। তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিল, সূক্ষ্মদর্শিনী বিচারশক্তি ছিল, অসাধারণ বাক্‌পটুতাও ছিল। এই সকলই ওকালতীর পুঁজি। আপনার প্রকৃতিকে চাপিয়া রাখিয়া বড় [illegible] ব্যবসা অবলম্বন করিয়া অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জ্জন [illegible] করিলেন [illegible] কাছে খাঁটি হইতে যাইয়া [illegible] তখন শুনিয়াছি একবার সরকারী কর্ম্ম লইবার জন্যও [illegible] দত্ত মহাশয় খ্যাতনামা সদ্‌বালা ছিলেন। ইংরাজ [illegible] ছিল। [illegible] তিনি পুত্রকে [illegible] করাইয়া দিতে পারিতেন। [illegible] হউক না কেন, অনেক সময় মানুষের মনুষ্যত্বকে [illegible] ভুক্তভোগী হইয়া ইহা বুঝিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজসেবা অবলম্বন করে, এই জন্য তিনি ইহা চাহেন নাই। মনে হয়, স্বদেশীর যুগে অশ্বিনীকুমারের মুখেই একথাটা শুনিয়াছিলাম। অশ্বিনীকুমার সরকারী চাকুরী গ্রহণের কল্পনা পরিত্যাগ করিয়া লোকশিক্ষাব্রত গ্রহণ করিলেন। চাত্‌রা স্কুলে তাঁহার যে সাধন এবং অভিজ্ঞতালাভ হইয়াছিল, তাহা[illegible] তিনি বরিশালে নিজে একটা উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার [illegible]র গ্রহণ করেন। এইখানেই অশ্বিনীকুমারের জীবনব্যাপী কর্ম্মযোগের আরম্ভ হয়। [illegible] গোস্বামী মহাশয়ের আশ্রয়লাভ করেন নাই। কিন্তু নিজের প্রকৃতির প্রেরণায় [illegible] আত্মোৎসর্গ করেন।

অশ্বিনীকুমার কেবল স্কুলে ছাত্র পড়াইয়াই আপনার কর্ত্তব্য শেষ হইল মনে করিতেন না। ছাত্রদিগকে লইয়া দল বাধিয়া লোকসেবায় নিযুক্ত হইলেন। সে সময়ে বরিশালে বিসূচিকা প্রায় সারা বছরই লাগিয়া থাকিত। সম্প্রতি জলের কল হইয়া সহরের স্বাস্থ্য অনেকটা শোধরাইয়াছে। গ্রামের লোকেরা মামলা-মোকদ্দমা বা ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে সর্ব্বদাই সহরে যাতায়াত করিত। বিসূচিকার দ্বারা আক্রান্ত হইলে ইহাদের সেবাশুশ্রূষা করিবার কোনও ব্যবস্থা ছিল না। অনেক সময় ইহারা ঔষধ এবং পথ্য পাইত না। মরিলে সৎকারের জন্যও লোক জুটিত না। অশ্বিনীকুমার তাঁহার স্কুলের ছাত্রদিগকে লইয়া এ সকল অসহায় রোগীদিগের সেবার ব্যবস্থা করেন। রোগীর শুশ্রূষা, নিজেদের হাতে কলেরা রোগীর মলমূত্রাদি পরিষ্কার করা, ভিক্ষা করিয়া তাহাদের

BLOCKED INFORMATION.

ঔষধ এবং পথ্য সংগ্রহ করা, এবং মরিলে তাহাদের যথাবিহিত সংস্কার করা; অশ্বিনীকুমার এবং তাঁহার সহসেবীদিগের প্রধান কর্ম্ম হইয়া উঠিল। এই লোকসেবায় ইঁহারা জাতবর্ণের বিচার করিতেন না। ব্রাহ্মণসন্তানেরা চণ্ডালের মলমূত্র পরিষ্কার করিতেন। হিন্দু-যুবকেরা মুসলমান রোগীর সেবা করিতেন। মৃতদেহ সৎকারে জাতিধর্ম্মের ভেদ করিতেন না। এইরূপে বরিশালে অশ্বিনীকুমার এক অপূর্ব্ব সেবাব্রতের প্রতিষ্ঠা করেন। তখনও অশ্বিনীকুমার গোস্বামী মহাশয়ের আশ্রয়-লাভ করেন নাই। পরে তিনি গুরুশক্তির আশ্রয় পাইয়া নরে যে নারায়ণ-বুদ্ধির সাধন করিয়াছিলেন, তখনও সে বুদ্ধি জাগে নাই। কিন্তু এই লোকসেবার উপরেই ক্রমে ক্রমে তাঁহার পরজীবনের ভক্তিপ্রেরিত কর্ম্মযোগের প্রতিষ্ঠা হয়। এই সেবার ভিতর দিয়া অশ্বিনীকুমার ঘৃণা, লজ্জা, ভয় জয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ঘৃণা, লজ্জা, ভয় থাকিতে মানুষ কখনও সাত্ত্বিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারে না। সাত্ত্বিক কর্ম্মের আশ্রয় ব্যতিরেকে কর্ম্মযোগও সাধিত হয় না।

অশ্বিনীকুমারের গুরুদেব তাঁহাকে কর্ম্মযোগের তিনটি মুখ্য সূত্র অবলম্বন করিয়া চলিতে বলিয়াছিলেন—শ্রীমান্ দেবকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়ের নিকটে ইহা শুনিয়াছি। দেবকুমার বাবুকে অশ্বিনীকুমার নিজে একথা কহিয়াছিলেন। কর্ম্মযোগের এই সূত্র তিনটির প্রথম সূত্র সত্যরক্ষা; দ্বিতীয় সূত্র ব্রহ্মচর্য্য বা বীর্য্যধারণ। তৃতীয় সূত্র মানবে দেববুদ্ধির অনুশীলন। অশ্বিনীকুমার সেকালের ব্রাহ্মসমাজের শিক্ষাদীক্ষা হইতেই কর্ম্মযোগের প্রথম দুইটি সাধন অবলম্বন করিয়াছিলেন। যে ভয়কে জয় করিতে না পারে সে কখনও সর্ব্বদা সত্যরক্ষা করিতে পারে না। সত্যরক্ষা করিতে হইলেই ভয়কে জয় করিতে হয়। যে প্রিয়বস্তু প্রাপ্তিতে প্রহৃষ্ট হইয়া উঠে না, অপ্রিয় প্রাপ্তিতে ক্লিষ্ট হয় না, প্রিয় এবং অপ্রিয়ে যার সমবুদ্ধিলাভ হইয়াছে সেই কেবল সর্ব্বদা সত্যরক্ষা করিয়া চলিতে পারে। সত্যরক্ষার দ্বারা চিত্তশুদ্ধি শুক্রধারণের দ্বারা দেহশুদ্ধি হয়। সত্য চিত্তের এবং ব্রহ্মচর্য্য দে এই জন্যই যাঁহারা আত্মসুখবাসনা বিবর্জ্জিত হইয়া নিষ্কাম কর্ম্মসাধন করিতে চাহেন সত্যরক্ষার এবং ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম নিষ্ঠাসহকারে অবলম্বন করিতেই হয়। কিন্তু কেবল ইহাতেই প্রকৃত কর্ম্মযোগ গড়িয়া উঠে না। নিষ্কাম কর্ম্মের অর্থ এ নয় যে কোনও কামনাই করিবে না, যন্ত্রারূঢ়ের মতন কর্ম্ম করিয়া যাইবে। নিষ্কাম কর্ম্মের অর্থ এই যে, আত্মসুখকামনার প্রেরণায় কর্ম্ম করিবে না। প্রাচীন কালের যজ্ঞাদিকর্ম্ম স্বর্গাদিলাভের জন্য অনুষ্ঠিত হইত। সুতরাং সে সকল কর্ম্ম নিষ্কাম ছিল না। পুত্রং দেহি, ধনং দেহি, যশো দেহি দ্বিষো জহি এই প্রার্থনা মুখে করিয়া যে দেব আরাধনা অনুষ্ঠিত হয়, তাহা নিষ্কাম নহে। এই আরাধনার মূলে আত্মসুখ কামনা রহিয়াছে। বিষ্ণু-প্রীতিকাম হইয়া যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই কেবল নিষ্কাম কর্ম্ম। হে অর্জ্জুন, তুমি যে যজ্ঞ যজন কর, যে কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর, যে ভক্ষ্য ভক্ষণ কর,

যে দেয় দান কর—তৎ কুরুষ মদর্পণং—সে সমুদয় আমাতে অর্পণ কর। গীতায় ভগবান নিষ্কাম কর্ম্মের এই সূত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমাদের কর্ম্মের আশ্রয়—মানুষ। এই মানুষকে যতক্ষণ না দেবতা বলিয়া ধরিতে পারা যায়, ততক্ষণ নারায়ণে কর্ম্ম অর্পণ করা অসাধ্য। সামান্য বুদ্ধিতে যতটুকু ধরিতে পারি, অশ্বিনীকুমারের গুরুদেব তাঁহাকে যে কর্ম্মসূত্র ধরাইয়া দিয়াছিলেন ইহাই তাহার নিগূঢ় অর্থ।

অশ্বিনীকুমার গুরুদত্ত নাম পাইয়া ভাবাঙ্গসাধনে প্রবৃত্ত হয়েন। তাঁহার প্রকৃতি বিশেষভাবে ভাবপ্রবণ ছিল। এইজন্য এই ভাবাঙ্গসাধন তাঁহার প্রকৃতিসম্মতই হয়। ভাবাঙ্গসাধনে প্রথম অবস্থা রূপের অন্তরালে অরূপের অনুভব। শ্রেষ্ঠতর কবিগণ সর্ব্বদাই এই প্রত্যক্ষ লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহারা অপ্রাণীতে প্রাণ আরোপ করেন না; কিন্তু বাহিরের চক্ষু যাহাকে প্রাণহীন [illegible] অনন্তদৃষ্ট প্রাণলীলা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। মেঘদূতের [illegible] চেতন প্রাণবান, সহৃদয়, বিরহ বিধুরার দুঃখে সমদুঃখী [illegible] প্রকৃতিবর্ণনে যাহাকে কবিকল্পনা বলিয়া মনে করে, কবির চক্ষে [illegible] এ সত্য প্রকাশিত হয় না। বস্তুর উপরে যখন [illegible] তখনই সেই বস্তুর অন্তরের ভাবাঙ্গ স্ফুরিত হয়; এবং ভাবুক চর্ম্মচক্ষুতে [illegible] দেখিয়া থাকেন। পাতাবাহারের গাছ বা পুষ্প-ভারপূর্ণ বল্লরী কত সময়ই ত দেখিয়াছি। কিন্তু হঠাৎ একদিন চক্ষে কি কাজল মাখিয়া গেল জানি না; এই গাছ ও এই লতা দেখিয়াই সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা তাহাকে ধরিবার জন্য আকুল হইয়া উঠিলাম। এই আকাশ ত প্রতিনিয়তই দেখিতেছি। কিন্তু একদিন নিদাঘ দ্বিপ্রহরে এই [illegible] রূপ ফুটিয়া উঠিল যে প্রাণটা দেহপিঞ্জর ও ইন্দ্রিয়ের শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া ঐ [illegible] যাইবার জন্য আকুলি-বিকুলি করিল। উপবনে পাখী ত শত শত দেখিয়াছি, [illegible] ত দেখিয়াছি, কিন্তু একদিন এমন হইল যে ঐ পাখীর সঙ্গে পাখী হইয়া [illegible] ওড়াউড়ি করিবার সাধ জাগিল, আর ওই ঘোড়ার প্রত্যেক পেশীর ভিতর দিয়া কি [illegible] অপূর্ব্ব রূপের ছটা ফাটিয়া বাহির হইতে লাগিল যে সেই রূপসাগরে ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য [illegible] উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। এইরূপেই প্রথমে ভাবাঙ্গ গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করে। এ অধ্যাস নহে। ইহা বস্তুসাক্ষাৎকার। গুরুশক্তি সঞ্চারে গুরুদত্ত নামের মহিমায় অতি অকৃতী জনেরও [illegible] অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা লাভ হইয়া থাকে। তখনও অরূপ স্বরূপে গড়িয়া উঠে নাই; কিন্তু রূপের [illegible] ভিতরেই আপনার আভা ফুটাইয়া তুলিতে আরম্ভ করিয়াছে। শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য, সদ্‌যুক্তিসিদ্ধ ব্রহ্ম-জ্ঞানের সঙ্গে যখন অন্তরের রস বা ভাব মিলিয়া যায়, তখনই এই ভাবাঙ্গ গড়িতে আরম্ভ করে। এই পথেই সাধক ক্রমে মানুষে সামান্য মনুষ্যবুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়া দেববুদ্ধি সাধন করিতে সমর্থ হয়েন। ইহাই সত্য কর্ম্মযোগের বনিয়াদ।

BLOCKED INFORMATION.

অশ্বিনীকুমার গুরুদেবের নির্দ্দেশ অনুসারে সত্যরক্ষা এবং ব্রহ্মচর্য্যের পথে চলিয়া ক্রমে মানবপ্রীতির অনুশীলনের ভিতর দিয়াই মানুষে ভগবদ্‌বুদ্ধির সাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এইজন্যই তাঁহার কর্ম্মচেষ্টা সর্ব্বদাই নিষ্কাম এবং ভগবদ্‌প্রীতিকাম হইয়া চলিতে প্রয়াস পাইয়াছে। এ পথ অতিশয় কঠিন পথ। পণ্ডিতেরা ইহাকে শানিত ক্ষুরধারের মতন কহিয়াছেন। এই দুর্গম পথে চলিতে হইলে আপনাকে একেবারে আরেক জনের হাতে ছাড়িয়া দিতে হয়। এই ছাড়িয়া দেওয়ার অর্থ এ নহে যে, আপনার বিচারবুদ্ধিকে বা ধর্ম্মবুদ্ধিকে উপেক্ষা বা বর্জ্জন করিয়া চোখ বুজিয়া আরেকজনের হাত ধরিয়া চলিতে হয়। সদ্‌গুরু পথ এ নহে। যে গুরু শিষ্যের ভিতর হইতে তাহাকে তাহার প্রকৃতির সূত্র ধরিয়া সাধনপথে প্রেরিত না করেন, তিনি সদ্‌গুরু নহেন। সদ্‌গুরুর প্রেরণা বাহিরের উপদেশে নহে, অন্তরের জ্ঞান এবং ভাবের উন্মেষে। প্রেমিক যুগল পরস্পরের নিকটে নীরবে বসিয়া একে অন্যের চিত্তকে একে অন্যের ভাবের দ্বারা যেমন উদ্বেলিত করিয়া তুলেন, সদ্‌গুরু সেইরূপ শিষ্যের সঙ্গে একাত্ম হইয়া শিষ্য প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া সেই প্রকৃতিকে মার্জ্জিত, বিশুদ্ধ এবং রসরসায়িত করিয়া তাহার ভিতর হইতেই তাহার ধর্ম্ম এবং সাধনাকে ফুটাইয়া তুলেন। মহাভাগ্যবলে ধন্য সেই যাহার এমন সদ্‌গুরু মিলিয়াছে। গুরু শিষ্যকে অধিকার করেন; শিষ্য গুরুর সঙ্গে একাত্ম হইয়া যান। এখানে আত্মসমর্পণ অর্থই আত্মপ্রতিষ্ঠা। এই কথাটা না বুঝিলে সদ্‌গুরুতত্ত্ব বুঝা যাইবে না। এই কথাটা না বুঝিলে গুরুচরণে আত্মসমর্পণ করার অর্থ ধারণাতে আসিবে না। গুরুর মধ্যে শিষ্য আপনাকেই প্রাপ্ত হন। এইজন্য গুরুর নিকটে আত্মসমর্পণ করাতে শিষ্যের আত্মহত্যা হয় না। হয় সেখানে যেখানে শিষ্য ভিতরে আপনাকে বাঁধিয়া ছাঁদিয়া রাখিয়া বাহিরে গুরুর নিকটে আত্মসমর্পণ করিতে যান।

এইরূপে আরেক জনের হাতে যে আপনাকে না বিকাইয়া দিয়াছে, সে [illegible] কর্ম্মযোগ সাধন করিতে পারে না। অশ্বিনীকুমার সদ্‌গুরুর আশ্রয় [illegible] সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই জন্যই তাঁহার কর্ম্মযোগ বহুল পরিমাণে সা[illegible]

সকল প্রকারে আত্মসুখ কামনা ত্যাগ করিয়া, শুদ্ধ ঈশ্বর প্রীতিকাম হইয়া মানুষ যে কর্ম্ম করে, তাহাই সত্য নিষ্কাম কর্ম্ম। মানুষে দেবতাবুদ্ধি সাধন করিয়া লোকসেবাও এই নিষ্কাম কর্ম্মের পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া লোকসংগ্রহার্থ, সমাজ-রক্ষার জন্য যে নিঃস্বার্থ কর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়, তাহাও নিষ্কাম কর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইতে পারে। ভগবদ্‌গীতায় ইহাকেই নিষ্কাম কর্ম্ম বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বর্ত্তমানকালে, দেশ-ধর্ম্ম বা নেশন ধর্ম্ম প্রাচীন সমাজধর্ম্মকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। প্রাচীনদিগের সমাজের স্থানে, আমাদিগের স্বদেশের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এই যুগে দেশ-সেবাই নিষ্কাম কর্ম্মযোগ সাধনের অতি প্রশস্ত ক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠে, দেবীচৌধুরাণীতে এবং সীতারামে এই দেশ-প্রীতির বা দেশমাতৃকার

প্রতি যে ভক্তি তাহারই উপরে আধুনিকদিগের সত্য নিষ্কাম কর্ম্মযোগের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছেন। অশ্বিনীকুমারও অনেকটা এই পথেই আপনার জীবনের কর্ম্মযোগ সাধন করিয়া গিয়াছেন। অশ্বিনীকুমারের স্বদেশপ্রীতি এবং স্বজাতিবাৎসল্য কতটা পরিমাণে নিঃস্বার্থ ও নিষ্কাম ছিল, স্বদেশীর সময় তার বিশেষ পরিচয় পাইয়াছিলাম।

সাধকেরা আত্মসুখ কামনাকেই "মার" বা "মায়া" বা "শয়তান" বলিয়াছেন। সাধক যখন একে একে আপনার নীচপ্রবৃত্তিগুলিকে জয় করিয়া, সিদ্ধির সন্নিকটবর্ত্তী হয়েন, তখন এই "মার" বা "মোহিনী" বা "শয়তান" তাঁহার সাধন ভঙ্গ করিবার জন্য অগ্রসর হয়। যীশুর জীবনে ইহার কথা পড়িতে পাই। দীক্ষালাভের পরে যীশু চল্লিশ দিন উপবাস করিয়া নিঃশেষ আত্মজয় করিয়াছিলেন। এই সময়ই "শয়তান" তাঁহাকে উচ্চ পর্ব্বতশিখরে লইয়া গিয়া সমগ্র পৃথিবীর একাধিপত্য দিতে চাহিয়াছিল। ইহার অর্থ এই যে, যখন তাঁহার দেহশুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধি হইল, সকল বিষয়বাসনা যখন নষ্ট হইল, তখন তাঁহার সাধনলব্ধ শক্তি ও ঐশ্বর্য্যকে তাঁহার আত্মপ্রতিষ্ঠার দিকে প্রয়োগ করিবার জন্য "শয়তান" তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল। এই প্রলোভন জয় করিয়াই তিনি চরমসিদ্ধি লাভ করেন। এই আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রলোভন অতি ভয়ানক। নানা আকারে, নানা বেশে, নানা ছলাকলা অবলম্বন করিয়া, এই আত্মপ্রতিষ্ঠার বাসনা মানুষকে প্রলুব্ধ করিয়া থাকে। এই প্রলোভন স্বদেশসেবীর নিকটে সর্ব্বদা উপস্থিত হয়। অনেক সময়, কোনটাকে দেশের সত্যস্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা আর কোন্‌টাকে দেশ-নায়কের বা দেশসেবকের [illegible]কে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা, ইহা তিনি নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। অশ্বি[illegible]রুকৃপায়, এই প্রলোভনকে কতটা পরিমাণে জয় [illegible], স্বদেশী আন্দো[illegible] ইহার অনেক প্রমাণপরিচয় পাইয়াছিলাম।

[illegible] মুখে মানুষের [illegible] ভাবই অতিশয় প্রবল হইয়া উঠে। বিরোধের সময় [illegible] কূলে সর্ব্বতোভাবে [illegible]প্রতিষ্ঠা করাই ক্ষাত্রধর্ম্মও বটে। বিরোধের প্রকৃতিই [illegible] প্রণোদিত ও প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকে। স্বদেশীর আন্দোলনে দেশে রাজশক্তি ও প্রজাশক্তির মধ্যে একটা বিরাট বিরোধ জাগাইয়াছিল। [illegible] বিরোধের মাঝখানে লোকনায়কেরা যদি প্রজাপক্ষকে প্রবল করিবার জন্য, রাজশক্তির সম্মুখীন হইয়া, আত্মশক্তি প্রকট করিতে চান, ইহা একদিক দিয়া দেখিলে, কিছুই দোষের হয় না। এই পথেই প্রজাসাধারণের মোহ ও ক্লীবত্ব নষ্ট নইয়া যায়। কিন্তু এই প্রবল সংগ্রামের মাঝখানেও অশ্বিনীকুমার আপনার যোগপথ হইতে ভ্রষ্ট হয়েন নাই, ইহা কম কথা নহে।

আমরা তখন অশ্বিনীকুমারের কোনও কোনও কর্ম্মের মর্য্যাদা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। কখনও কখনও তাঁহাকে ভীরু, কৃপণ, স্বক্ষতিসহনে অসমর্থ বা অপারগ বলিয়াই মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু পরে, সকল দিক তাকাইয়া দেখিবার যখন অবসর পাইলাম, তখন এ সকল

BLOCKED INFORMATION.

বিষয়ে অশ্বিনীকুমারের দুর্ব্বলতার নহে, অসাধারণ আত্মসংযমের শক্তিরই পরিচয় পাইয়াছিলাম।

বরিশাল স্বদেশী আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল ও পীঠস্থান হইয়া উঠিয়াছিল। অশ্বিনীকুমারের জীবনব্যাপী লোকসেবা ও দেশসেবার ফলে, বরিশাল এই অনন্যসাধারণ মহিমা লাভ করিয়াছিল। অশ্বিনীকুমারই, সত্য বলিতে গেলে, দেশে একমাত্র লোকনায়ক ছিলেন। অপরের ধীশক্তি তাঁহার অপেক্ষা বেশি ছিল। কাহারও কাহারও বিদ্যাবুদ্ধি এবং বাক্‌পটুতা অশ্বিনীকুমারের চাইতে অনেক বেশি ছিল। কিন্তু ইঁহারা সকলেই ইংরাজি-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন। দেশের জনসাধারণে ইঁহাদের কথাও সকল সময় বুঝিয়া উঠিত না, আর বুঝিলেও ইঁহাদের কাহারও সঙ্গেই অশিক্ষিত প্রকৃতিপুঞ্জের কোনও সত্য প্রাণের যোগ ছিল না। কেবল বরিশালে, অশ্বিনীকুমারের সহিতই, জেলার জনসাধারণের এই প্রাণের যোগ গড়িয়া উঠিয়াছিল। এরূপ শোনা যায় যে বরিশালের সরল চাষীরা অশ্বিনীকুমারের নামে "মানত" করিত। তরিতরকারীর ফসল বুনিবার সময় প্রথম ফল অশ্বিনীকুমারকে দিবে, এই সংকল্প করিয়া, তাঁহার শুভকামনা প্রার্থনা করিত। এরূপ সম্বন্ধ দেশের জনসাধারণের সঙ্গে অপর কোনও নেতার জন্মে নাই। সে-কালে বরিশালের সর্ব্বসাধারণ লোক অশ্বিনীকুমারের কথায় বা ইঙ্গিতে উঠিত বসিত। ইংরাজ আমলে আর কোথাও তখন পর্য্যন্ত এমন লোকনায়কের জন্ম হয় নাই। অশ্বিনীবাবুর এই অসাধারণ প্রভাব দেখিয়া ইংরাজ রাজপুরুষেরা ভীত হইয়াছিলেন, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। স্বদেশীর সময় বরিশালে এক ছটাক বিলাতি নুন ও এক বিঘত বিলাতি কাপড় বাজারে কেহ কিনিতে পাইত না। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটকে পর্য্যন্ত বিলাতী নুন, বিলাতী চিনি এবং বিলাতি কাপড় কিনিতে হইলে, অশ্বিনীকুমারের হুকুম আনাইতে হইত। ইহাতেই বরিশালের জনসাধারণের উপরে অশ্বিনীকুমারের কতটা প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, বুঝিতে পারা যায়।

অশ্বিনীকুমারের এই অনন্যপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভাব ইংরাজ আমলাতন্ত্রের অসহ্য হইয়াছিল। ইঁহারা যে ভাবে দেশের শাসনযন্ত্রটাকে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাহাতে ইংরাজ পুলিসের প্রতাপের উপরেই দেশের শান্তি ও নিজের আত্মরক্ষা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছিল। কোনও জেলায়, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের চাইতে কোনও প্রজার প্রভাব বেশি হইলে, সে জেলায় ইংরাজ প্রভুশক্তির মূল-উচ্ছেদ হইল, রাজপুরুষদিগের এরূপ ধারণা ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের মুখে, কেবল বরিশালে নহে, কিন্তু, পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বত্র রাজপুরুষদিগের প্রভাব নষ্ট হইতে আরম্ভ করে। নূতন প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তা, স্যার বেমফাইল্‌ড্ ফুলারের পর্য্যন্ত সমুদায় প্রতাপ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ফরিদপুরের রেলের মজুরেরা ছোটলাটের মাল ছুঁইতে চাহে নাই। পুলিশের কনেষ্টবলেরা তাঁহার বিছানাপত্র রেলগাড়ী হইতে নামাইয়া, ডাকবাংলায় বহিয়া লইয়া যায়। ঢাকায় ফুলার বাহাদুরের অভ্যর্থনার জন্য পঞ্চাশ জন লোক পর্য্যন্ত নাকি জাহাজ ঘাটে

BLANK PAGE(S)

BLOCKED INFORMATION.